৫ম বর্ষ ] শ্রাবণ, ১৩৩৩ [ ৪র্থ সংখ্যা

৫ম বর্ষ ] শ্রাবণ, ১৩৩৩ [ ৪র্থ সংখ্যা

দুহিতার কণ্ঠস্বর, সখার কর্ণে প্রিয়সখার কণ্ঠস্বর প্রভৃতি। প্রিয়তমার, পুত্রের, দুহিতার বা প্রিয়সখার কণ্ঠস্বর যে সাক্ষাদ্‌ভাবে আনন্দের স্বাভাবিক অভিব্যঞ্জক, তাহা বলা যায় না ; কারণ, তাহা যদি হইত, তাহা হইলে, তাহা সকল মনুষ্যেরই সর্ব্বদা আনন্দের অভিব্যঞ্জক হইত। বাস্তবপক্ষে, কিন্তু, তাহা সকলের নিকট আনন্দদায়ক নহে। কাহারও কাহারও নিকটে তাহা সুখ বা দুঃখের হেতু না হইতে পারে, আবার কাহারও নিকটে তাহা নিতান্ত কর্কশ বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে ; সুতরাং সে স্থলে তাহা ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে দুঃখেরই হেতু হইয়া থাকে। আবার কোন উদাসীন ব্যক্তির নিকটে তাহা সুখেরও হেতু হয় না, দুঃখেরও হেতু হয় না, কিন্তু প্রেমিক প্রভৃতির কর্ণে তাহা সর্ব্বদাই আনন্দের অভিব্যঞ্জক হইয়া থাকে। কেন এই প্রকার হয় ? ইহার কারণ অন্য কিছু নহে, ইহার কারণ ইহাই হইয়া থাকে, ঐ সকল শব্দ আমাদের কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়া আমাদের অন্তর্নিহিত প্রেম, স্নেহ বা সখ্যময় ভাবগুলিকে জাগাইয়া দেয় এবং সেই উদ্‌বুদ্ধ প্রীতিময় ভাবের যে আলম্বন প্রিয়তমা প্রভৃতি, তাহাদেরই সহিত এই প্রকার স্বরসমূহের অসাধারণ সম্বন্ধ আছে বলিয়া, উহার উপরও আমাদের প্রিয়তাজ্ঞান বা ভোগ্যত্ব-বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ জাতীয় শব্দসমূহ আমাদের নিকট তখন আনন্দের হেতু বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। যাহারা উদাসীন বা যাহারা প্রতিকূলভাবাপন্ন, তাহাদের নিকট ঐ সকল শব্দ তাদৃশ অনুরাগময় অন্তঃকরণবৃত্তিকে উদ্‌বুদ্ধ করিতে সমর্থ হয় না। এই কারণে তাহাদের নিকট ঐ সকল শব্দ সুখের কারণ বলিয়া পরিগৃহীত হয় না, প্রত্যুত দুঃখ বা ক্রোধ প্রভৃতির হেতু হয়। এই ত হইল ভোগ্য শব্দের দুই প্রকার বিভাগ।

বিচার করিয়া দেখিলে, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের ভোগ্যতা এই প্রকারে দ্বিধা বিভক্ত হইতে পারে, বিস্তার-ভয়ে তাহা এখানে প্রদর্শিত হইল না।

কাব্য আমাদের নিকটে এক প্রকার ভোগ্য বস্তু বলিয়া পরিগণিত, সেই কাব্যকে আলঙ্কারিকগণ শব্দের অন্তঃপ্রবিষ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। নব্য আলঙ্কারিক আচার্য্য বিশ্বনাথ কবিরাজ কাব্যের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

‘বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্।’

যাহার আত্মস্বরূপ, এইরূপ বাক্যকেই কাব্য বলা যায়।

বাক্য বলিলে সাকাঙ্ক্ষ শব্দসমষ্টিই বুঝা যায়। এই যে শব্দসমষ্টি, ইহা পূর্ব্বোক্ত দুই প্রকার শব্দের মধ্যে পরিগণিত হইয়া যে আমাদের উপভোগ্য হয়, তাহা বলা যায় না। কারণ, কাব্যরূপ শব্দ নির্ব্বিশেষে বীণা প্রভৃতি শব্দের ন্যায় যে সকল মনুষ্যের শ্রুতিসুখবিধান করে, তাহা বলা যায় না। যে ব্যক্তি সহৃদয় নহেন অথবা কাব্যরূপ শব্দের অর্থবোধে যাঁহার সামর্থ্য নাই, তাঁহার নিকট কাব্যরূপ শব্দ কোন সময়েই সুখের কারণ হইতে পারে না। ইহা দ্বিতীয় প্রকারের যে ভোগ্য শব্দের উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহার মধ্যেও প্রবিষ্ট হইতে পারে না। কারণ, প্রিয়তমের কর্ণে প্রিয়তমার স্বরের ন্যায় ইহা আমাদিগের শ্রুতিসুখাবহ হয় না। কে কাব্যের রচয়িতা, বা কে কাব্যের উচ্চারয়িতা, তদ্বিষয়ে কোন জ্ঞান না থাকিলেও সৎকাব্যরূপ শব্দ আমাদের রসাস্বাদরূপ আনন্দানুভূতির হেতু হইয়া থাকে। এই কারণে কাব্যকে দ্বিতীয় প্রকারের ভোগ্য শব্দ বলিয়াও অঙ্গীকার করা সম্ভবপর নহে।

এই কারণে কাব্যরূপ শব্দকে লৌকিক উপভোগ্য শব্দরাশির শব্দের অন্তর্ভুক্ত না করিয়া আলঙ্কারিকগণ ইহাকে অলৌকিক উপভোগ্য শব্দেরই অন্তর্ভুক্ত করিয়া থাকেন।

কাব্য স্বয়ং শব্দস্বরূপে উপভোগ্য না হইলেও অর্থপ্রতীতিকে জন্মাইয়া আমাদের উপভোগ্য হয়, ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য। কিন্তু সেই অর্থ কি ? দার্শনিক ও বৈয়াকরণ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, শব্দের অর্থ দুই প্রকার হইয়া থাকে ; প্রথম অভিধেয় বা বাচ্য অর্থ, দ্বিতীয় লক্ষ্য অর্থ : যেমন গঙ্গা শব্দের নদীবিশেষরূপ যে অর্থ, তাহা অভিধেয় বা বাচ্য ; কিন্তু যে স্থলে এই অভিধেয় অর্থ বাধিত বা বাক্যার্থে অন্বিত হইবার অযোগ্য হয়, সেই স্থলে অন্বয়ের যোগ্য যে অর্থ পরে আমাদের বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয়, তাহাকেই লক্ষ্য অর্থ বলা যায়। যেমন কেহ যদি বলে, গঙ্গাতে গোয়ালপাড়া আছে, এখানে গঙ্গা শব্দের যাহা বাচ্য অর্থ, অর্থাৎ জলপ্রবাহ, তাহা প্রতীত হইলেও বাধিত বা অন্বয়ের অযোগ্য হয়, কারণ, গোয়ালপাড়া জলপ্রবাহের মধ্যে থাকিতে পারে না। এইরূপে অন্বয় অযোগ্য বলিয়া বোধ হইবার পরে, অন্বয়ের যোগ্য হইতে পারে বলিয়া, সেই

মনে উদিত হয়, তাহার সহিত গোয়ালপাড়ার আধারাধেয়ভাবরূপ সম্বন্ধ থাকিতে পারে বলিয়া, সেই তীররূপ অর্থ ই লক্ষ্য অর্থ হইয়া থাকে। এইরূপে বাচ্য বা লক্ষ্য অর্থ যাহা কাব্যরূপ শব্দের দ্বারা প্রতীত হয়, তাহার দ্বারা কিন্তু কাব্য আমাদের প্রীতি বা সুখের আস্বাদন করাইতে পারে না, অর্থাৎ কাব্যের আত্মস্থানীয় যে রস, যাহাকে সৃষ্টি না করিলে কাব্যের কাব্যত্বই অসিদ্ধ হয় এবং যে রস সাক্ষাৎ প্রকাশমান আনন্দস্বরূপ, সেই রস কাব্যের অভিধেয় বা লক্ষ্য—এই দ্বিবিধ অর্থের মধ্যে কেহই নহে।

এই রসরূপ অলৌকিক অর্থের প্রকাশ করিতে পারে বলিয়াই কাব্য সহৃদয়গণের আস্বাদ্য বা ভোগ্য হইয়া থাকে, অথচ এই রস বাচ্যও নহে, লক্ষ্যও নহে। আলঙ্কারিকগণ বলিয়া থাকেন, এই রসরূপ কাব্যের আত্মভূত যে অর্থ, তাহা বাচ্য বা লক্ষ্যের মধ্যে প্রবিষ্ট না হইলেও তাহাকে ব্যঙ্গ্য বা প্রতীয়মান অর্থ বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। কাব্যের সহিত এই প্রতীয়মান বা ব্যঙ্গ্যরূপ অর্থের কিরূপ সম্বন্ধ, তাহারই নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়া 'ধ্বন্যালোক' নামক অলঙ্কারগ্রন্থ রচয়িতা আনন্দবর্দ্ধনাচার্য্য বলিয়াছেন—

"প্রতীয়মানং পুনরন্যদেব, বস্ত্বস্তি বাণীষু মহাকবীনাম্।
যত্তৎপ্রসিদ্ধাবয়বাতিরিক্তং, বিভাতি লাবণ্যমিবাঙ্গনাসু ॥"

এই শ্লোকটির তাৎপর্য্য এই - মহাকবিগণের বাণীসমূহে যে বিলক্ষণ অর্থ প্রতীত হইয়া থাকে, তাহা লৌকিক পদার্থ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন। ঐ বিলক্ষণ অর্থ কাব্যের অবয়বরূপ বাচ্য প্রভৃতি অর্থ হইতে অতিরিক্ত। যেমন সুন্দরী রমণীসমূহের লাবণ্য তাহাদিগের অবয়বসমূহ হইতে সম্পূর্ণভাবে পৃথক্, এই প্রতীয়মান কাব্যের অর্থও কাব্যের শরীর হইতে সেইরূপ পৃথক্ই হইয়া থাকে।

এই স্বকৃত শ্লোকের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে আনন্দবর্দ্ধনাচার্য্য বলিয়াছেন—

"যথা হি অঙ্গনাসু লাবণ্যং পৃথক্ নির্বর্ণ্যমানং নিখিলাবয়বব্যতিরেকি কিমপ্যন্যদেব সহৃদয়লোচনামৃতং বস্তুন্তরং তদ্বদেব সোঽর্থঃ।"

যেমন অঙ্গনাসমূহের অঙ্গে যতই প্রণিধান সহকারে দেখা যায়, ততই তাহাদের সকল অবয়ব হইতে পৃথক্ বলিয়া

সেইরূপই কাব্যসমূহে এই প্রতীয়মান বস্তু, কাব্যের সকল অবয়ব হইতে পৃথগ্‌ভাবে প্রতীত হইয়া সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেরই আহ্লাদকর হইয়া থাকে।

এই প্রসঙ্গে লাবণ্য কাহাকে বলে, তাহা প্রতিপাদন করিতে যাইয়া ধ্বন্যালোকের টীকাকার আচার্য্য অভিনব গুপ্ত যাহা বলিয়াছেন, তাহাও প্রণিধানযোগ্য, যথা—

"লাবণ্যং হি নাম অবয়বসংস্থানাভিব্যঙ্গ্যং অবয়বব্যতিরিক্তং ধর্ম্মান্তরমেব। ন চাবয়বানাং নির্দোষতা ভূষণযোগো বা লাবণ্যং, পৃথঙ্‌নির্বর্ণ্যমান-কাণাদিদোষশূন্যশরীরাবয়বযোগিন্যামপি অলঙ্কৃতায়ামপি লাবণ্যশূন্যেয়মিতি, অতথাভূতায়ামপি কস্যাঞ্চিৎ লাবণ্যামৃতচন্দ্রিকেয়মিতি সহৃদয়ানাং ব্যবহারাৎ।"

ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই—শরীরের অবয়বসমূহের যে বিলক্ষণ সন্নিবেশ, তাহা দ্বারাই এই লাবণ্য অভিব্যক্ত হয়, কিন্তু ইহা যে শরীরের কোন অবয়ববিশেষ, তাহা নহে, প্রত্যুত অবয়বসমূহ হইতে ইহা সম্পূর্ণভাবে পৃথক্ ধর্ম্মবিশেষ। অবয়বসমূহের যে নির্দোষতা বা অবয়বসমূহের সহিত ভূষণসমূহের যে সম্বন্ধ, তাহাকেও লাবণ্য বলা যায় না, কারণ, প্রণিধান সহকারে ভাল করিয়া দেখিলে, যে অঙ্গনার কোন অবয়বে কোন প্রকার কাণত্বাদি দোষের লেশমাত্রও অনুভূত হয় না অথচ যাহার দেহ সকল প্রকার অলঙ্কার দ্বারা বিভূষিত, তাহাকে দেখিয়াও লোক ইহাতে লাবণ্য নাই, এই প্রকার নির্দ্দেশ করিয়া থাকে, আবার ঈষৎ দোষসম্পর্ক থাকিলেও, বা কোন অলঙ্কার দ্বারা কোন অবয়ব ভূষিত না হইলেও, কোন কোন ললনা সহৃদয়গণের নিকট এ যেন 'লাবণ্যামৃতচন্দ্রিকা' এই ভাবে প্রতীত হইয়া থাকে।

ললনাদেহে লাবণ্য যেরূপ অনির্ব্বচনীয় অথচ অনুভবমাত্রবেদ্য, সেইরূপ সৎকবিপ্রণীত কাব্যে প্রতীয়মান বস্তুও এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় এবং একমাত্র সহৃদয় ব্যক্তিগণেরই স্বানুভবমাত্রবেদ্য। এই প্রতীয়মান বস্তু যে সকল সময় রসই হইবে, তাহা নহে, ইহাকে আলঙ্কারিকগণ বস্তু, অলঙ্কার ও রস এই তিন প্রকারে বিভক্ত করিয়া থাকেন। ইহাদের মধ্যে বস্তু ও অলঙ্কাররূপ যে দ্বিবিধ ব্যঙ্গ্য, তাহাদের কথা পরে বলা যাইবে, আপাততঃ রসরূপ যে ব্যঙ্গ্য, তাহারই

বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী ভাব যাহাকে অভিব্যক্ত করিয়া থাকে এবং সেই ভাবে অভিব্যক্ত হইয়া, যাহা আস্বাদিত হয়, সেই স্থায়ী ভাবকেই রস কহে। এই প্রকার রসের লক্ষণ পূর্ব্বে ভরতমুনির মতানুসারে উক্ত হইয়াছে। এই লক্ষণটির বিশদ ব্যাখ্যা না হইলে রসের প্রকৃত স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে না, সুতরাং এক্ষণে তাহাই করা যাইতেছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কাব্য দুই প্রকার;—শ্রব্য ও দৃশ্য, শ্রব্য কাব্য অপেক্ষা দৃশ্য কাব্য হইতে রসাস্বাদ শীঘ্র ও প্রচুরভাবেই হইয়া থাকে। এই কারণ দৃশ্য কাব্যকেই অবলম্বন করিয়া এই রসের আস্বাদ কিরূপ হইয়া থাকে, তাহাই আপাততঃ দেখাইব।

মনে কর, আমরা বহু লোক একত্র মিলিত হইয়া কোন রঙ্গালয়ে অভিনয় দেখিবার জন্য সমবেত হইয়াছি। রঙ্গালয়ে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে আমাদের প্রত্যেকেরই মধ্যে যে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ বা অহমিকার অনুভূতি ছিল, রঙ্গালয়ে প্রবিষ্ট হইলেই যে সেই ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ বিলুপ্ত হইবে, তাহা সম্ভবপর নহে। সেখানে প্রবিষ্ট হইয়াও আমরা আমাদের সেই ব্যক্তিত্বের স্ফুরণকেই অবলম্বন করিয়া নিজ নিজ পার্শ্ববর্ত্তী সহচরগণের সহিত নানাপ্রকার কথাবার্ত্তা কহিতেছি, এমন সময় হঠাৎ যবনিকা উত্তোলিত হইল। আমাদের সকলের দৃষ্টি যুগপৎ দীপালোকে প্রকাশমান রঙ্গমঞ্চের প্রতি আকৃষ্ট হইল। কি দেখিলাম? দেখিলাম, প্রশান্ত পুণ্য-সলিলা ভাগীরথীর অমল-ধবল সৈকতের উপকণ্ঠে, স্নিগ্ধ শ্যামল তপোবনের পার্শ্বে একখানি সুসজ্জিত রথ হইতে পরিণত-গর্ভ-ভার-বিবশা জানকী মন্থরভাবে অবতীর্ণ হইলেন। পশ্চাতে বিষণ্ণ সৌমিত্রি ধীরে ধীরে অবতরণ করিয়া মাটীর দিকে চাহিয়া বাষ্পনিরুদ্ধ গদ্‌গদকণ্ঠে অযোধ্যাধিপতি প্রজারঞ্জনব্রত মহারাজ রামচন্দ্রের নিদারুণ বিবাসনবার্ত্তা নিবেদন করিলেন, অমনি কঠোর তীব্রবেগ বাত্যায় অকস্মাৎ উন্মূলিত কদলীর ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে দেবী জানকী ভূমিলুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। তাঁহার চৈতন্য লুপ্ত হইল।

এই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে সামাজিকগণের মনোবৃত্তি বাহিরের সকল বিষয় হইতে হঠাৎ প্রত্যাহৃত হইল। আমি ও আমার বলিয়া যে একটা প্রবল ব্যবহারিক আত্মা বা আত্মীয়ের অনুভূতি—এতক্ষণ দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনকে সর্ব্বাংশে ব্যাপিয়া বিদ্যমান ছিল, তাহা যেন অকস্মাৎ কোথায় বিলীন হইয়া গেল—সকলের হৃদয়ে যেন সমবেদনার একতানতা ফুটিয়া উঠিল, তুমি বা আমি, বা তোমার বা আমার, এই প্রকার ব্যবহারমূল সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিত্বের আকস্মিক বিলয় বশতঃ, সকলের হৃদয়েই আত্মবিস্তারের প্রসাদময় অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে সকল প্রকার মানসিক বিক্ষেপ ও অবসাদ বিলুপ্ত হইয়া গেল। চিরপরিচিত পারিপার্শ্বিক সত্য বস্তুগুলি অসত্যে পরিণত হইল, আর মিথ্যা বলিয়া চিরাভ্যস্ত বস্তুনিচয় যেন জাজ্বল্যমান সত্যের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া নয়নের ও মনের সম্মুখে নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রকাশিত হইতে লাগিল, বর্ত্তমানও যেন অতীতের নিবিড় অন্ধকারে মিলাইয়া গেল, প্রত্যক্ষসিদ্ধ বস্তুনিচয় বিস্মৃতির অতলগর্ভে ডুবিয়া গেল, অতীত যেন বর্ত্তমানের আকার ধারণ করিল, আর সেই সঙ্গে চিরবিস্মৃত বস্তুনিচয় যেন প্রত্যক্ষ হইতে লাগিল, তখন সেই বহুকালের অতীত—কল্পনা-জালজড়িত মূর্ত্তি—বাল্মীকির তপোবন, জানকী ও লক্ষ্মণ প্রভৃতির সত্তায় যেন পৃথিবী ভরিয়া গেল। ফলে ইহাই দাঁড়াইল যে, তৎকালে এক অপ্রাকৃত ভাবময় রাজ্যের আবেশময় সম্পর্কে আমরা সকলেই যেন অপ্রাকৃত হইয়া উঠিলাম। এইরূপ অবস্থাই হইতেছে রসাস্বাদের পূর্ব্বাবস্থা, ইহারই নাম সাধারণীকরণ। ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া আলঙ্কারিকগণ বলেন—

পরস্য ন পরস্যেতি মমেতি ন মমেতি চ।
তদাস্বাদে বিভাবাদেঃ পরিচ্ছেদো ন বিদ্যতে॥"

ইহা পরের বা ইহা পরের নহে—ইহা আমার, বা ইহা আমার নহে—এইরূপ যে পরিচ্ছেদ, তাহা বিভাব প্রভৃতির আস্বাদকালে সর্ব্বথা অন্তর্হিত হইয়া থাকে। এই প্রকারে পরিচ্ছিন্ন লৌকিক প্রমাতৃভাব দূর হইলে, সকল সামাজিকেরই অন্তঃকরণে এক প্রকার সাম্যাবস্থা আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে, সেই সাম্যাবস্থা উপস্থিত হইলেই সকল সামাজিকেরই মনোবৃত্তি একাকারতাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এরূপ একীভাব না হইলে অভিনয়ক্ষেত্রে রসসাক্ষাৎকারের সম্ভাবনা নাই।

[ ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ।

# রূপের মোহ

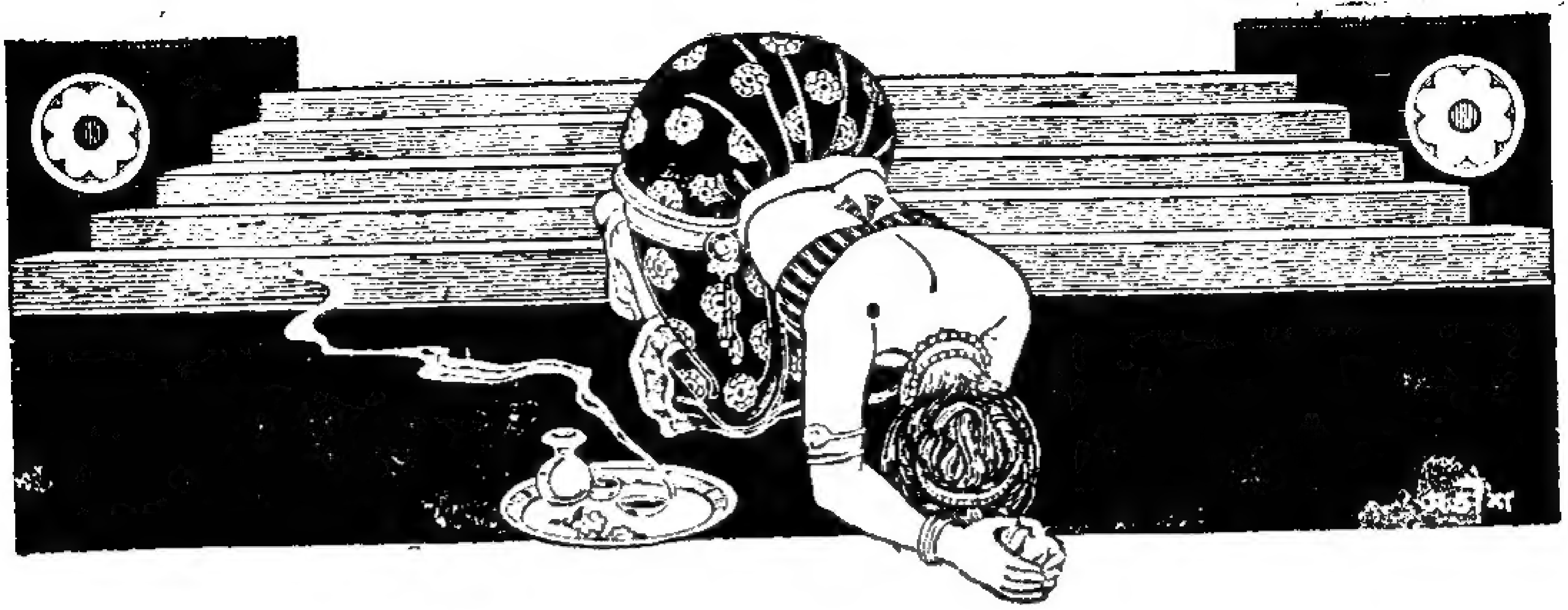

## ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

রমেন্দ্র দেখিল, দুই দিনেই সে ডাক্তার বাবুর যেন আপনার জন হইয়া পড়িয়াছে। তিনি তাহার সহিত এমন ব্যবহার করিতে লাগিলেন যে, রমেন্দ্রকে কোন কুণ্ঠাই বোধ করিতে হইত না। অন্তঃপুরে একত্র ভোজন হইত। অবশ্য ডাক্তার-গৃহিণী তাহার সম্মুখে বাহির হইতেন না; কিন্তু তথাপি সে বুঝিতে পারিত, তাহার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে তাঁহারও দৃষ্টি আছে। প্রভাতে জলযোগের পর ডাক্তার হাঁসপাতালে চলিয়া যাইতেন, রমেন্দ্র বেড়াইতে বাহির হইত, অথবা বাহিরের ঘরে বসিয়া লেখাপড়া করিত। দ্বিপ্রহরে ডাক্তার গৃহে ফিরিয়া আসিলে একত্র স্নান-ভোজন হইত। কোন রোগী দেখিতে ডাক্তার চলিয়া গেলে নির্জ্জন মধ্যাহ্নে রমেন্দ্র আবার খাতা বা বই লইয়া বসিত। সন্ধ্যায় ভ্রমণ বা খোস-গল্প। এইরূপে এই দুই দিন কাটিয়াছে।

রমেন্দ্রের মনের মধ্যে যে আগুন জ্বলিতেছিল, অনুশোচনার গ্লানি তাহার চিত্তে যে অবসাদের সঞ্চার করিয়াছিল, তাহার প্রভাব হইতে সে মুক্তিলাভ করিতে পারিয়াছিল কি? নিশ্চয় নহে। তাহার প্রাণে শান্তি ছিল না। সে একখানা নূতন খাতা কিনিয়াছিল। তাহাতেই সে আত্মজীবনকে বিশ্লেষণ করিয়া দিনলিপির আকারে লিখিয়া যাইতেছিল। ইহাতে মনের যন্ত্রণা সামান্য উপশম হইত।

সে দিন মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর ডাক্তার বাবু অন্তঃপুরে বিশ্রাম করিতেছিলেন। রমেন্দ্র নিজের ঘরে বসিয়া কি লিখিতেছিল।

ডাক্তার-গৃহিণী আহার-শেষে স্বামীর কাছে আসিলেন। আলবোলার নল মুখে করিয়া ডাক্তার একখানা মাসিক পত্র পড়িতেছিলেন। পাণ চিবাইতে চিবাইতে পত্নী স্বামীকে বলিলেন, "দেখ, আজ দু'দিন তোমায় একটা কথা বল্‌ব বল্‌ব ভাবছিলাম।"

কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া স্বামী বলিলেন, "খুব জরুরী কথা বটে! দু'দিনের মধ্যে বলবারই সময় পেলে না!"

স্ত্রী হাসিয়া বলিলেন, "তোমার সঙ্গে পারবার যো নেই। হ্যাঁ, বল্‌ছিলাম কি, তোমার এই নূতন বন্ধু শিশির বাবু—এঁকে প্রথম দিন দেখেই মনে হয়েছিল, কোথায় যেন দেখেছি। আজ আবার ভাল ক'রে দেখলুম—"

শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া বাধা দিয়া ডাক্তার বলিলেন, "সর্ব্বনাশ! এর মধ্যেই গোয়েন্দাগিরী আরম্ভ করেছ? শাস্ত্রকারেরা ঠিকই লিখেছেন। কিন্তু দেখ, এ বেচারীকে শেষে যেন মজিও না!"

পত্নীর মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল। ক্ষুদ্র মুষ্টি উদ্যত করিয়া তিনি বলিলেন, "তোমরা মেয়েমানুষকে কি ভাব, বল ত? নিজেদের মত দুনিয়ার সকলকে দেখ, না? যাও, আমি কোন কথা তোমাকে বল্‌ব না।"

স্বামী তখন পত্নীকে আদর করিয়া বলিলেন, "কি ঠুনকো জিনিষই তোমরা; বাতাসের আঘাতও সহ্য হয় না। এখন যা বল্‌ছিলে, বল।"

সন্ধি স্থাপিত হইলে পত্নী বলিলেন, "সত্যি বল্‌ছি, এ মুখ আমি যেন কোথায় দেখেছি। ওঁর পরিচয় নিয়েছ, বাড়ী কোথায় বলেছেন?"

"ও সবের কোন খোঁজ আমি করি নি। দেখলুম বাঙ্গালী, এ দেশে বেড়াতে এসেছেন। জানই ত, বাঙ্গালী দেখলে আমার প্রাণ কি রকম অস্থির হয়। তাই এখানে নিয়ে এলাম। অত খোঁজ-খবর নেই নি। তবে মনে হয়, বাড়ী থেকে রাগ ক'রে বেরিয়েছেন। আচ্ছা, আমি ওঁর পরিচয়টা জেনে নেব। ছোকরাটি বেশ ভাল বলেই মনে হয়।—তুমি কি ভাবছ, বল ত?"

সুরমা অকস্মাৎ মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "কোথায় দেখেছি, সেই কথা মনে করবার চেষ্টা করছিলুম। বড় চেনা-মুখ বলেই মনে হচ্ছে। ওঁর বাড়ী কোন্ দেশে, খোঁজ নিও ত।"

স্বামী তাঁহার স্ত্রীকে ভাল করিয়াই চিনিতেন। এই সেবাপরায়ণা পরদুঃখকাতরা নারীকে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন, ভালবাসিতেন। তাঁহার পরিহাস-রসিকতার সঙ্গে আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান, গাম্ভীর্য্য এবং ঈশ্বরনিষ্ঠা দেখিয়া ডাক্তার অনেক সময় চমৎকৃত হইতেন। যাহা কিছু অন্যায়, অসঙ্গত ও অসত্য, সুরমা তাহার ঘোর বিরোধী ছিলেন। স্বামীর জীবনযাত্রাকে এই নারী এমন সুশৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন যে, সে জন্য তিনি কৃতজ্ঞ ছিলেন। স্বামী ও স্ত্রী যেন একপ্রাণ। কোনও প্রকার সুখ-দুঃখের অনুভূতি হইলে তখনই পরস্পর তাহা পরস্পরকে জানাইতেন।

নবাগত অতিথি সম্বন্ধে পত্নীর কৌতূহল ডাক্তারের চিত্তকে আকৃষ্ট করিল। তিনি ভাবিলেন, এই কৌতূহল অহেতুক না-ও হইতে পারে। রমেন্দ্র সম্বন্ধে সকল সংবাদ জানিয়া লওয়া দরকার।

পাণ চিবাইতে চিবাইতে ডাক্তার বলিলেন, "আমি কিন্তু এঁকে আগে কোথাও দেখেছি ব'লে মনে হয় না। তবে শিশির বাবুর মনে যে কোন ব্যথা আছে, তা ডাক্তারী বিদ্যার বলে আমি বুঝতে পেরেছি। ওঁর বাড়ী-ঘরের সব খবর আমি কৌশলে বার ক'রে নেব, তবে বেশী কৌতূহল দেখাব না। ছোকরাকে যত্ন ক'রে আরও দিনকতক রাখতে হবে।"

সুরমা তখনও যেন কি মনে করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছিলেন। ডাক্তার বলিলেন, "দেখ, তুমি অত মাথা ঘামাচ্ছ কেন? হয় ত শেষে দেখা যাবে, কোন দিনও ওঁকে তুমি দেখনি।"

"না গো না, আমি মনে করতে পারছি না ঠিক; কিন্তু এ মুখ আমার পরিচিত।"

"আচ্ছা, আমি খবর নিচ্ছি।"

সুরমার ললাটের চিন্তার রেখা বিলুপ্ত হইল না।

## ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

"শিশির বাবু, চলুন, আজ আমার অবকাশ আছে, আপনাকে লক্ষ্ণৌয়ের প্রাচীন কীর্ত্তিগুলি ভাল ক'রে দেখিয়ে আনি।"

রমেন্দ্র একখানি বাঙ্গালা উপন্যাসে মনোযোগ দিবার চেষ্টা করিতেছিল। সে উঠিয়া বসিয়া বলিল, "চলুন।"

ডাক্তার কোচম্যানকে গাড়ী জুতিয়া আনিতে বলিলেন।

আজ সকালবেলা মা'র জন্য রমেন্দ্রের মন ব্যাকুল হইয়াছিল। পুরী হইতে আসিবার পথে সে মাতাকে একখানি পত্র লিখিয়া দিয়াছিল। আর কোনও সংবাদ দেয় নাই। এখন তাহার অজ্ঞাতবাস। প্রায়শ্চিত্ত না হওয়া পর্য্যন্ত সে আর তাঁহাকে সংবাদ দিবে না, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিল, অথচ মনের মধ্যে নানা চিন্তা আসিয়া তাহাকে নিতান্তই উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে। এমন অবস্থায় বাহিরের দৃশ্য-বৈচিত্র্যে যদি মনটা কিছু স্থির হয়।

গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইলে রমেন্দ্র গ্লাডষ্টোন ব্যাগ খুলিয়া মুদ্রাধারটি তাড়াতাড়ি পকেটে ফেলিয়া বাহির হইয়া গেল। ডাক্তার তখন গাড়ীর কাছে।

সুরমার মনটা আজ তেমন ভাল ছিল না। বাড়ীতে কেহ নাই, একা কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। একখানা বই আনিবার জন্য তিনি বাহিরের ঘরে আসিলেন। সবই পড়া, তবু উহার মধ্যে একখানা বাছিয়া লইতে হইবে।

আলমারী খুলিয়া 'কৃষ্ণকান্তের উইলখানা' বাহির করিলেন। অনেকবার পড়া হইলেও এখানি তাঁহার প্রিয় গ্রন্থ ছিল।

অতিথির ঘরের দিকে দৃষ্টি পড়িল। ভৃত্যরা ঘর ঝাঁট দিয়া জিনিষ-পত্রগুলি ভাল করিয়া গুছাইয়া রাখিয়াছে ত?

কর্ত্রী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। হ্যাঁ, সবই ঠিক আছে। টেবলের উপর বাতিদানে বাতি ঠিক আছে। জলের কুঁজা ভরা। কাচের গ্লাসটি ঠিক যায়গায় আছে বটে। না, কোন কিছুর ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

বাঃ! ভদ্রলোকটি ত ভারী অসাবধান! ব্যাগের চাবিটা গায় লাগানই আছে! চাকর-চাকরাণীরা বিশ্বাসী সত্য; কিন্তু তবু ত বলা যায় না। সুরমা ধীরে ধীরে ব্যাগটির দিকে অগ্রসর হইলেন। চাবিটা খুলিয়া লইবার পূর্ব্বে ব্যাগ বন্ধ আছে কি না, পরীক্ষা করিতে গেলেন। সহসা একটা কৌতূহল দুর্দ্দমনীয়ভাবে তাঁহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। অতিথির পরিচয়জ্ঞাপক কোন কিছু এই ব্যাগের মধ্যে নাই? কিন্তু অধিকারীর অজ্ঞাতসারে তাঁহার কোনও জিনিষ দেখা উচিত কি? সুরমার কর্ত্তব্যজ্ঞান—বিবেক তাঁহাকে বাধা দিল। পাশের চেয়ারে তিনি বসিয়া পড়িলেন। কি করা কর্ত্তব্য, তিনি ভাবিতে লাগিলেন।

নারীর কৌতূহল যেমন প্রবল, তেমনই দুর্দ্দমনীয়। যাহা রহস্যময়, তাহাই কৌতূহলোদ্দীপক। কৌতূহল একবার জাগিয়া উঠিলে নারীকে অনেক সময় উদ্দাম করিয়া তুলে। সুশিক্ষা, সংযম, শালীনতা—সকলকে অতিক্রম করিয়া সুরমার প্রকৃতিদত্ত কৌতূহল প্রবল হইয়া উঠিল। সংশয় দূর করিবার বাসনাকে সংযত করিবার সামর্থ্য তাঁহার রহিল না। যুক্তির দ্বারা সুরমা মনকে বুঝাইলেন, তিনি ত চুরি করিতেছেন না; শুধু কৌতূহল চরিতার্থ করিতেছেন। আজ তিন দিন ধরিয়া মনের মধ্যে যে সংশয় জাগিয়াছে, তাহার মীমাংসার কোন সূত্র যদি পাওয়া যায়, তবে তাহা ত্যাগ করা সঙ্গত নহে। এ সব ক্ষেত্রে পরের দ্রব্য পরীক্ষায় অপরাধ হয় না।

খট্ করিয়া চাবি ঘুরিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে ব্যাগের ভিতরের জিনিষগুলি সুরমার আগ্রহ-কম্পিত দৃষ্টির সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিল। খানকয়েক কাপড়, জামা ও দুইখানা খাতা ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। উপরেই রমেন্দ্রের দিনলিপি।

সুরমা উঠিলেন, বাহিরের ঘরের চারিদিকের দ্বারগুলি বন্ধ করিয়া অন্যের প্রবেশপথ রুদ্ধ করিলেন। তাহার পর

বাঃ! চমৎকার হাতের লেখাটি ত! ভাষাও কি সুন্দর! সুরমা রুদ্ধনিঃশ্বাসে পাতার পর পাতা পড়িয়া যাইতে লাগিলেন। কোথাও কোন নামোল্লেখ নাই। শুধু অন্তরের ভাবগুলিকে বিশ্লেষণ করিয়া নির্ম্মমভাবে তাহার আলোচনা আছে। পড়িতে পড়িতে সুরমার মুখ গম্ভীর হইল। ভাবের আতিশয্যে চোখের পাতা ভিজিয়া আসিল। এই অপরিচিত অতিথির অন্তরের ব্যথা যেন রক্তের অক্ষরে ফুটিয়া উঠিয়াছে!

অসন্তুষ্ট চিত্ত, দুষ্প্রাপ্য আদর্শের পশ্চাতে—মরীচিকার সন্ধানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কেমন করিয়া পথভ্রান্ত হয়—আর সেই ভ্রান্তির পরিণাম কি শোচনীয়, কি ভীষণ, কি মর্ম্মভেদী, অতিথি তাহা কি অভ্রান্তরূপেই না বর্ণনা করিয়াছেন!

সহানুভূতিতে সুরমার চিত্ত আর্দ্র হইয়া আসিল। বুকের মধ্যে দুঃখ ও অনুশোচনার আগ্নেয়গিরিকে লইয়া বাহিরে অটল ধৈর্য্যের সহিত অবস্থান করা শক্তিমানের কায। আহা! মানুষটি কি দুঃখী! কিন্তু কেন এই দুঃখ? কে ইনি? ইঁহার পরিচয়ের জন্য প্রথমাবধিই সুরমার এত আগ্রহই বা কেন? দিনলিপিতে অতিথির পরিচয়ের কোন সূত্র ত আবিষ্কৃত হইল না।

দিনলিপির শেষের দিকে লেখা রহিয়াছে, "মা'র জন্য প্রাণ অস্থির। কিন্তু তাঁহার পবিত্র মূর্ত্তির সম্মুখে এ অপবিত্র মন লইয়া দাঁড়াইতে পারিব না। তাই পলাইয়াছি। আর সেই বেচারা—অভাগী! তাহার জীবনে অভিশাপের মতই বুঝি আমি আসিয়াছিলাম। ভাল যদি বাসিতেই না পারিব, তবে এমন গুরু দায়িত্ব 'কেন মাথায় করিয়া লইয়াছিলাম? সে যে কেমন, তাহার পরিচয় লইবার কোন ইচ্ছাই কখন হয় নাই। তাহার মূর্ত্তি কিরূপ, তাহাও ত মনে পড়ে না! আমার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা চমৎকার বটে! অথচ লোকাচার, সমাজ ও ধর্ম্মের নিকট সেই আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধন। এ পরিহাস, এ নিষ্ঠুর বিদ্রূপ কি মর্ম্মান্তিক! এক এক বার মনে হয়, মনটাকে তাহার দিকে ফিরাইয়া লইয়া যাই; কিন্তু তখনই যেন কেহ চীৎকার করিয়া বলে, নির্লজ্জ! ভণ্ড! যাহাকে উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছ, সেই অনাদৃতার কাছে তোমার পাপ-কলুষিত মন লইয়া দাঁড়াইবে কোন্ অধিকারে? না,

সুরমা দিনলিপি রাখিয়া দিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। তাহার পর দ্বিতীয় খাতাখানি তুলিয়া দেখিলেন, কবিতার খাতা। শিশির বাবু কবি? কৌতূহলভরে সুরমা উপরের মলাটের দিকে চাহিলেন। নীচের কোণে মোটা অক্ষরে লেখা—"রমেন্দ্র।"

যুবতী সহসা চমকিয়া উঠিলেন। রমেন্দ্র! শিশির বাবুর নিকট এ খাতা কেন? সুরমার মুখমণ্ডলে গাঢ় চিন্তার রেখা ফুটিয়া উঠিল। খাতাখানি খুলিয়া দুই একটি কবিতা পড়িলেন। পাকা হাতের সুন্দর রচনা। কিন্তু দিনলিপি ও কবিতার খাতার হস্তলিপি, এ যে একই হাতের লেখা!

ঘড়ীতে ৪টা বাজিয়া গেল। সুরমা উঠিলেন; কম্পিত-হস্তে খাতা দুইখানি যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন। চাবি খুলিয়া লওয়া হইল না। দরজাটা ভেজাইয়া দিয়া তিনি দ্রুতপদে শয়নকক্ষে ফিরিয়া গেলেন।

সন্দেহ ঘনীভূত হইল; কিন্তু মীমাংসা সুনিশ্চিত নহে। সুরমা দ্রুতহস্তে একখানি পত্র লিখিয়া ভৃত্যের দ্বারা তখনই তাহা ডাকে পাঠাইয়া দিলেন।

## একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মধ্যাহ্নভোজে প্রচুর আয়োজন হইয়াছিল। এমন মাঝে মাঝে হইত। পাচক থাকা সত্ত্বেও সুরমা প্রায়ই নানাবিধ সুখাদ্য নিজে রাঁধিয়া স্বামীকে ভোজন করাইতেন। তাহাতে তিনি কি তৃপ্তি পাইতেন, তাহা যাঁহারা স্বামিসোহাগিনী, গৃহিণী, তাঁহারাই ভাল বুঝিতে পারিবেন। ডাক্তার গিরীন্দ্রনাথ, জ্যোৎস্না-রজনীতে 'মলয়'বায়ু (অবশ্য পশ্চিমাঞ্চলে তাহার একান্তই অভাব) সেবন করিতে করিতে 'পিয়া-মুখচন্দ্র' নিরীক্ষণ এবং কবির ভাষায় প্রেম-সম্ভাষণ অপেক্ষা রসনাতৃপ্তিকর ভোজ্যের অধিক প্রাধান্য দিতেন। তিনি প্রায়ই বন্ধু-বান্ধবদিগের নিকট বলিতেন, "ভরা-পেটে প্রেমচর্চ্চা কর, আপত্তি নাই; কিন্তু খালি পেটে—ওতে আমি রাজি নই।" তাই পত্নীর স্বহস্তপ্রস্তুত নানা রসপূর্ণ ভোজ্যের মধ্যে তিনি প্রচুর প্রেম ও স্নেহ রসের

ডাক্তার রমেন্দ্রনাথকে বাহিরের ঘরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আজ একটু শীঘ্রই শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। গুরুভোজনে আজ আর বসিবারও ক্ষমতা তাঁহার ছিল না।

দুই চারি বার ধূমোদ্গিরণের পরই তাঁহার নাসিকা-গর্জ্জন আরম্ভ হইল। কতক্ষণ তিনি এমনই আরামে দিবা-নিদ্রার সুখ উপভোগ করিয়াছিলেন, ঠিক স্মরণ নাই। একটি কোমল হস্তের মিঠা, মৃদু ধাক্কায় তাঁহার তন্দ্রা টুটিয়া গেল। ভাবিলেন, এই দ্বিপ্রহরে বুঝি কোন রোগী আসিয়াছে, তাই বুঝি পত্নী তাঁহাকে জাগাইয়া দিতেছেন। নিদ্রাজড়িতকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "রঘুয়াকে দিয়ে ব'লে পাঠাও, আমি এখন কোথাও যেতে পারব না। ৫টার সময় যার দরকার থাকে, যেন আসে।"

ডাক্তার পাশ ফিরিয়া শুইতেই আবার মৃদুকরতাড়নায় নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিল।

"তুমি দিনে কোন দিন ঘুমোও না, আজ যে বড় ঘুমুচ্ছো। অসুখ করবে না?"

হাই তুলিয়া গিরীন্দ্রনাথ বলিলেন, "যে খাইয়ে দিয়েছ আজ, ব'সে থাক্‌বার কি আর উপায় রেখেছ? একটা পাণ দাও।"

আলস্য পরিহার করিয়া ডাক্তার শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন।

বাস্তবিক তিনিই ত সকলকে দিবানিদ্রার বিরুদ্ধে উপদেশ দিয়া থাকেন।

সুরমা স্বামীর দিকে পাণের ডিবা আগাইয়া দিয়া বলিলেন, "ভাল কথা, তোমার বন্ধুটির সব কথা জিজ্ঞাসা করেছিলে?"

"ঐ যাঃ! সে একেবারে ভুলে গিয়েছি গো!"

"এই কয় দিনের মধ্যে খোঁজটা নিতে পার্‌লে না?"

স্বামী বলিলেন, "তোমার এত মাথা-ব্যথা কেন বল দেখি? কোন মতলব-টতলব আছে না কি?"

ক্রূর হাস্যে সুরমা বলিলেন, "তা ত আছেই। অমনি কি আর সন্ধান নিচ্ছি।"

দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া গিরীন্দ্রনাথ বলিলেন, "ব্যাপারটা কি, বল ত?"

দেরাজের টানা খুলিয়া কাগজ-মোড়া একটা জিনিষ লইয়া সুরমা স্বামীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

"দেখ ত, তোমার চেনা কেউ আছে কি না।"

পত্নী স্বামীর সম্মুখে একখানা ফটোগ্রাফ ধরিলেন। গিরীন্দ্রনাথ নিরীক্ষণ করিতে করিতে বলিলেন, "বাঃ! এ ছবিতে তুমিও আছ দেখছি। তোমার বাবা-মাও আছেন। এই যে টুনি; তার পাশে ও কে? শিশির বাবুর মত দেখছি না?"

বিস্ময়-বিহ্বল দৃষ্টিতে ডাক্তার পত্নীর মুখের দিকে চাহিলেন।

"ব্যাপারটা ত বুঝলাম না—এ কি রকম হ'ল?"

সুরমা স্থির দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া ছিলেন। গিরীন্দ্রনাথের মুখমণ্ডল গম্ভীর হইল। ভাল করিয়া তিনি আর একবার আলোকচিত্রখানি দেখিলেন।

সুরমা বলিলেন, "আমার প্রথম দিনই সন্দেহ হয়েছিল। তবে শুধু বিয়ের সময় দেখেছিলাম, তাও বেশী দিন নয়—মাত্র বিয়ের রাত্রি; আর তার পরদিন। কিন্তু তাতেই আমার সন্দেহ হয়েছিল; তথাপি ভরসা ক'রে তোমায় বল্‌তে পারি নি; কি জানি, যদি আমারই ভুল হয়ে থাকে। তুমি ত টুনির বিয়েতে যেতে পার নি। আর রমেন বাবুকে তুমি আগে দেখ নি। কেমন ক'রে তোমার মনে সন্দেহ হবে? তার পর সে দিন—"

বলিতে বলিতে সুরমা স্বামীর দেহে অঙ্গ ঢালিয়া, তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমি একটা অন্যায় কায ক'রে ফেলেছি। তোমাকে না জানিয়ে—যে দিন তোমরা দু'জনে দুপুরবেলা সহর বেড়াতে গিয়েছিলে—বাইরের ঘরে গিয়ে ওঁর ব্যাগ খুলে ডায়রী আর কবিতার খাতা পড়েছিলুম। তাইতে আমার সন্দেহ বেশী হয়। তোমাকে সে দিন বলি নি, পরে সব বলব ঠিক করেছিলুম। এতে আমার উপর তোমার রাগ হয় নি?"

পত্নীকে আদর করিয়া ডাক্তার বলিলেন, "পাগলী! এতে আমার রাগ হবে কেন? আমি হ'লে ঠিক তোমারই মত গোয়েন্দাগিরি করতুম। তার পর?"

সুরমা তখন দিনলিপিতে যাহা পড়িয়াছিলেন, সংক্ষেপে তাহার মর্ম্ম স্বামীকে বলিলেন। "তখনই এসে বাবাকে পত্র [illegible] যে ছবি তোলা হয়েছিল, সে ছবি আমি পাই নি, বাবা যেন পত্র পাঠ একখানা ফটো পাঠিয়ে দেন। আর রমেন বাবু কোথায়, তাও জান্‌তে চেয়েছিলাম। বাবা লিখেছেন যে, তিনি রমেন বাবুর মা'র চিঠিতে জান্‌তে পেরেছেন, পুরী থেকে রমেন বাবু পশ্চিমে বেড়াতে গেছেন। এখন বুঝলে সব?"

"কিন্তু ভায়া এমন নাম ভাঁড়িয়ে বেড়াচ্ছেন কেন? এত বৈরাগ্যই বা কেন?"

সুরমা গম্ভীরভাবে বলিলেন, "বাবা ও মা প্রায়ই চিঠি লেখেন। তা থেকে এখন বুঝতে পারছি, বিয়ের পর হ'তে রমেন বাবু আমাদের বাড়ীতে খুবই কম গিয়েছেন। পড়াশুনার ক্ষতি হবে ব'লে বাবাও তাঁকে আনবার চেষ্টা করেন নি। রমেন বাবুর মাও না কি মা'কে এ বিষয়ে বেশী পীড়াপীড়ি না করবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। তারপর রমেন বাবুর ডায়রী প'ড়ে আমি যা বুঝেছি, তাতে মনে হয়, টুনির সঙ্গেও ওঁর—"

"প্রেমের আদান-প্রদান হয় নি!—বুঝেছি, ভায়া আমার মরীচিকার পেছনে এত দিন ঘুরে বেড়িয়েছেন।"

খোলা জানালা দিয়া আকাশের অনেকখানি দেখা যাইতেছিল। ডাক্তার কয়েক মুহূর্ত্ত সেই দিকে চাহিয়া থাকিয়া সহসা বলিয়া উঠিলেন, "দেখ, মানুষ নিজের মনের দোষেই নিজে কষ্ট পায়। অমন স্ত্রী পেয়েও বেচারা এত দিন সুখী হ'তে পারে নি, এ কি কম দুর্ভাগ্য? কি চমৎকার এই মেয়ে টুনি! এমন মধুর স্বভাব, ধীর বুদ্ধি; দেখতেও চমৎকার। ভায়া রত্ন চেনেন নি। বাস্তবিক বেচারার দুর্ভাগ্যে আমি দুঃখিত। প্রতিভার মত মেয়ে হাজারে একটা পাওয়া কঠিন।"

তখন স্বামী ও স্ত্রী মিলিয়া নানা পরামর্শ চলিল। স্থির হইল, রমেন্দ্রকে এখান হইতে কোনমতেই যাইতে দেওয়া হইবে না। অথচ সে যেন ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে না পারে, তাহার পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। শ্বশুরালয়-সম্পর্কিত আত্মীয়-স্বজন সম্বন্ধে সে যেরূপ উদাসীন, তাহাতে সে যে শ্যালিকার গৃহে অতিথি, ইহা সে কল্পনাও করিতে পারিবে না। গিরীন্দ্রনাথকে সে কোনও দিন দেখে নাই, নামও হয় ত জানে না। জানিলেও মীরট হইতে এলাহাবাদ, তথা হইতে লক্ষ্মৌয়ে তিনি বদলী হইয়া আসিয়াছেন, সে সন্দেহ তাহার মস্তিষ্কে সহসা প্রবেশ করিবার সম্ভাবনাও অল্প।

তবে সুরমাকে খুব সতর্ক হইয়া থাকিতে হইবে। বিবাহের সময় সে তাঁহাকে দেখিয়াছিল, এখন দেখিলে সে হয় ত তাঁহাকে চিনিলেও চিনিতে পারে। সুতরাং রমেন্দ্র যাহাতে তাঁহাকে দেখিতে না পায়, এমনভাবে চলাফেরা করিতে হইবে।

কিন্তু ডাক্তার-দম্পতির এত সতর্কতার কোন প্রয়োজন ছিল না। যে মানসিক অবস্থায় রমেন্দ্র বিবাহ করিয়াছিল এবং পরে শ্বশুরালয় সম্বন্ধে সে যেরূপ উদাসীন ছিল, তাহাতে তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিবার সম্ভাবনা তাহার আদৌ ছিল না। তাহার জ্যেষ্ঠা শ্যালিকা পশ্চিমের কোথাও আছেন, হয় ত এইটুকুমাত্র সংস্কার তাহার মনের প্রান্তে থাকিলেও থাকিতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমানে তাহার মনের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে এ সকল বিষয়ে তাহার কোন খেয়ালই ছিল না।

অনেক আলোচনার পর দম্পতি পত্র লিখিয়া ডাকে পাঠাইয়া দিলেন।

---

## দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ষ্টীমার চলিতেছিল—দ্রুততালে, প্রশস্ত নদীর বিপুল জলরাশি ভেদ করিয়া, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ তুলিয়া চলিতেছিল। সরযূ ও অমিয়া কেবিনের বাহিরে রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে নদীর পরপারস্থ গ্রামের শোভা দেখিতেছিল। প্রভাত-সূর্য্য কি মধুর! শিশির-স্নাত গাছের উপর তরুণ-রবির কনক-কিরণের নৃত্য কি চমৎকার! নদীবক্ষে জেলেডিঙ্গীগুলি তরঙ্গাঘাতে দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছে। সরযূর মুখে একটা অম্লানজ্যোতিঃ, আনন্দের প্রবাহধারা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে বলিয়া উঠিল, "বৌদি! বাঙ্গালাদেশের শোভা এত মধুর, তা ত জান্তাম না!"

অমিয়া নিবিষ্ট-মনে কি ভাবিতেছিল। সে সরযূর প্রশ্নে যেন ঘুম ভাঙ্গিয়া জাগিয়া উঠিল। আপনাকে সংযত করিয়া বলিয়া উঠিল, "বড় চমৎকার!"

ষ্টীমারের গতি ক্রমে কমিয়া আসিল। তীরে ষ্টেশন—একখানি টিনের ঘরমাত্র। প্রায় পাড়ের কাছে আসিয়া ষ্টীমার থামিল। একখানি কাঠের সিঁড়ি ষ্টীমার হইতে তীরদেশে সংলগ্ন হইল। গ্রামের যাত্রীরা পোঁটলা-পুঁটুলিসহ তীরে নামিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

সহসা সরযূর মুখ বিস্ময়ে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল; সে অঙ্গুলিনির্দ্দেশে তীরদেশে কি দেখাইল। প্রায় ৩০।৪০ জন অর্দ্ধনগ্ন পুরুষ ও ছিন্নবসনা নারী কাতরভাবে কি বলিতেছে। সকলেরই দেহ অস্থি-চর্ম্মসার, মুখে ক্ষুধার তীব্র জ্বালা! কোনও রমণীর জীর্ণ বক্ষোদেশে শীর্ণ কঙ্কালসার শিশু। যাত্রিগণের নিকট যুক্তপাণি হইয়া তাহারা ক্ষুধার অন্ন ভিক্ষা করিতেছে! কণ্ঠ হইতে কথাও যেন বাহির হয় না, এমনই ক্ষীণ তাহাদের কণ্ঠস্বর!

তাহাদের দুর্দ্দশা ও কাতরতা যেন যুবতীদিগের অন্তরকে বিদ্ধ করিল। তাহারা মুখ ফিরাইতেই পশ্চাতে সুরেশচন্দ্রকে দেখিতে পাইল। তাঁহার মুখ গম্ভীর, নয়নে একটা উজ্জ্বল দীপ্তি। গাঢ় কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "কি দেখছ? আমার দেশের রূপ?—হাঁ, সুজলা সুফলা বাঙ্গালার—অন্নপূর্ণামূর্ত্তির আদর্শ ছবি এই বটে!"

সুরেশচন্দ্র দ্রুতপদে নীচের তলায় নামিয়া গেলেন। সরযূ ও অমিয়া তাঁহার অনুবর্ত্তিনী হইল। সুরেশচন্দ্র তীরে নামিলেন। ষ্টীমার তখনও কিছুকাল তথায় অবস্থান করিবে।

ক্ষুধিত নর-নারীদিগের কাছে আসিয়া তিনি হাত তুলিয়া সকলকে নীরবে দাঁড়াইতে বলিলেন। তাঁহার আশ্বাসবাণীতে আশ্বস্ত হইয়া সম্ভ্রমভরে সকলেই একটু দূরে দূরে সরিয়া দাঁড়াইল। উঃ! তাহাদের নয়নে ক্ষুধার কি বিকট জ্বালা! তাহাদের মূর্ত্তিতে দারুণ অভাবের কি শোচনীয় নিদর্শন!

মুদ্রাধার খুলিয়া সুরেশচন্দ্র তাহাদের প্রত্যেকের হাতে একটি করিয়া টাকা দিলেন। এক জন রমণী ক্ষীণ ও কাতরকণ্ঠে বলিল, "বাবু, ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন; কিন্তু আমাদের কিছু খেতে দাও, বাবা। আজ ৩ দিন আমার এই ছেলেটির পেটে—"

উদ্গত অশ্রুবাষ্পে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। অমনই সেই জনতা হইতে সম্মিলিত কাতরকণ্ঠে ধ্বনিত হইল, "খেতে দাও, খেতে দাও। এটা গরীবের গ্রাম, বানে সব ভেসে গেছে। আমরা খালি গাছের পাতা—পাতা খেয়ে আছি!"

"দাদা !—"

সুরেশচন্দ্র পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন, অমিয়া ও সরযূ তাঁহারই কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ভ্রাতার কাণে কাণে অমিয়া কি বলিল। সুরেশচন্দ্র সম্মতি দিলেন। সকলকে ডাকিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "তোমরা একটু অপেক্ষা কর, খাবার দিচ্ছি।"

ষ্টীমারের মাঝি, মাল্লা, সারেঙ্গ এবং অন্যান্য যাত্রী সবিস্ময়ে সুরেশচন্দ্র, অমিয়া ও সরযূর কার্য্যপ্রণালী দেখিতেছিল। সুরেশচন্দ্র সারেঙ্গকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ষ্টীমার এখানে আর কতক্ষণ থাকবে ?"

সম্ভ্রমভরে সে বলিল, "আর মিনিট দশেক।"

সুরেশচন্দ্র বলিলেন, "আর আধঘণ্টা অপেক্ষা করা যায় না ?"

"পরের ষ্টেশনে সময়ে না পৌঁছুলে কৈফিয়ৎ দিতে হবে যে, বাবু।"

সুরেশচন্দ্র বলিলেন, "তবে কাযেই আমাদের এখানে নামতে হবে। এদের কিছু না খাইয়ে আমরা ত যেতে পারি নে।"

সারেঙ্গ মাথা নাড়িয়া বলিল, "এখানে কোথায় থাকবেন আপনারা ? এ গ্রামে কারও বাড়ীতে থাকবার যায়গা আছে ব'লে আমি জানি নে।"

অমিয়া তখনও দাদার পার্শ্বেই দাঁড়াইয়া ছিল। সে বলিল, "কিন্তু এই সব অভুক্তকে না খাইয়ে চ'লে গেলে এরা মারা যাবে—সে মহাপাপ আমাদেরই হবে।"

সারেঙ্গ কি ভাবিল; তাহার পর বলিল, "আচ্ছা, আমি এদের খাওয়া শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত ষ্টীমার ছাড়ব না। এতে কৈফিয়ৎ দিতে হয় দেব; কিন্তু আপনাদের এখানে নামিয়ে দিয়ে যাওয়া—না, সে হ'তেই পারে না।"

প্রথম শ্রেণীর যাত্রী ষ্টীমারে আর কেহই ছিল না। বিশেষতঃ সুরেশচন্দ্রের ব্যবহারে তাঁহাকে সম্ভ্রান্ত ও ধনী বলিয়া সারেঙ্গের ধারণা জন্মিয়াছিল। ইঁহাকে খুশী করিতে পারিলে চাই কি ভাল বকশিস্‌ও মিলিতে পারে। ষ্টীমার সময়ে যাওয়া না যাওয়া নদীর স্রোতের উপর অনেকটা নির্ভর করে। সুতরাং সে জন্য কৈফিয়ৎ দিবার দুর্ভাবনা তাহার ছিল না।

কলিকাতা হইতে আসিবার সময় কয়েক হাঁড়ি ভীম নাগের সন্দেশ ও ভাল রসগোল্লা, এক ঝুড়ি ফল, চায়ের জন্য কয়েক কৌটা জমান দুগ্ধ সুরেশচন্দ্রের সঙ্গে আসিয়াছিল। রাত্রির আহারের জন্য প্রচুর লুচিও ছিল। অধিকাংশই তাহাদের ব্যবহারে লাগে নাই। অমিয়া তাড়াতাড়ি ষ্টোভ জ্বালিয়া বড় কেৎলিতে জল চড়াইল। জমান দুগ্ধ গরম জলে মিশাইয়া অভুক্ত শিশুদিগকে পান করাইতে হইবে। দশ মিনিটের মধ্যে কায সারিয়া, সনাতন ও সৌরভীর সাহায্যে খাদ্যদ্রব্যগুলি সহ অমিয়া ও সরযূ তীরে নামিয়া গেল।

সমবেত জনতা অবাক্‌বিস্ময়ে কলিকাতা হইতে আগত সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক ও মহিলা-যুগলের কার্য্যকলাপ দেখিতে লাগিল। গ্রামের যাত্রীরাও গন্তব্যপথে না গিয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল।

ক্ষুধিত নরনারীদিগকে বসিতে বলিয়া অমিয়া ও সরযূ চায়ের পাত্রে সুমিষ্ট পানীয় দুগ্ধ ঢালিয়া শিশুদিগকে সযত্নে ধীরে ধীরে পান করাইতে লাগিল। কত দিন পরে যে শিশুদিগের ভাগ্যে দুগ্ধপান জুটিল—তাহা মনে করিয়া সরযূ ও অমিয়ার নয়নে অশ্রুবাষ্প সঞ্চিত হইতেছিল। অনাহার-পীড়িত নরনারী বা শিশুর শোচনীয় অবস্থা পূর্ব্বে তাহারা কখনও প্রত্যক্ষ করে নাই।

শিশু ও বালকদিগের দুগ্ধপান শেষ হইলে অমিয়া, সরযূ ও সুরেশচন্দ্র অতি সতর্কতার সহিত বুভুক্ষু নরনারীদিগকে আহার্য্য পরিবেষণের উপক্রম করিলেন। সুরেশচন্দ্র স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "তাড়াতাড়ি করবার দরকার নেই, আগে একটু জল খেয়ে গলাটা ভিজিয়ে নেও।" ভৃত্য সনাতন দৌড়িয়া ষ্টীমারে উঠিল এবং কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে দুইটা বাল্‌তি ও দুইটা ঘটী লইয়া হাজির হইল। নদীর মিষ্ট জল তুলিয়া প্রত্যেককে দিবার পর মূর্ত্তিমতী অন্নপূর্ণার ন্যায় অমিয়া ও সরযূ ধীরে ধীরে একে একে আহার্য্য পরিবেষণ করিতে লাগিল। পাত্রাভাবে হাতের উপরেই খাদ্য পড়িতে লাগিল, মুহূর্ত্তমধ্যেই তাহা অন্তর্হিত হইতেছিল। ক্ষুধার প্রচণ্ড তাড়নায় সুরেশচন্দ্রের সতর্ক বাণী ভাসিয়া যাইতে লাগিল। একটি সন্দেশ, একখানি লুচি, পরে ফলের একটু অংশ, এমনইভাবে পরিবেশনের ফলে গোগ্রাস-ভোজন কতকটা সংযত হইতেছিল। আপনাদের

জন্য কিছুই না রাখিয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত খাদ্যই সরযূ ও অমিয়া বিলাইয়া দিল। ইহাতে অনশনক্লিষ্ট নরনারীর পূর্ণ তৃপ্তি হইল না বটে, কিন্তু প্রবল ক্ষুধার তাড়না কিছু কমিল। আহারশেষে তাহারা যুক্তপাণি ঊর্দ্ধে তুলিয়া প্রাণ ভরিয়া অমিয়া, সরযূ ও সুরেশচন্দ্রকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল।

আরক্ত আননে যুবতীরা ষ্টীমারে ফিরিয়া গেল। অনুসন্ধানে সুরেশ জানিতে পারিলেন, সেই ষ্টীমারে জনৈক চাউল-ব্যবসায়ী কয়েক শত মণ চাউল লইয়া নগরে চলিয়াছে। তিনি তাহার সহিত দেখা করিয়া কয়েক মণ চাউল কিনিয়া লইলেন।

গ্রামের যাত্রীরা তখনও সেখানে জটলা করিতেছিল। এক জন দীর্ঘাকার ব্রাহ্মণ-যাত্রী অন্যত্র যাইবেন বলিয়া ষ্টীমারের টিকিট কিনিতেছিলেন। অতিরিক্ত পুরস্কারের লোভে খালাসীরা চাউলের বস্তাগুলি তীরে লইয়া গেলে, সুরেশচন্দ্র সেই সঙ্গে আবার নামিয়া আসিলেন। তখন ব্রাহ্মণ-যাত্রী তাঁহার কাছে আসিয়া বলিলেন, "আপনি কে, জানি না, আমি এতক্ষণ আপনার কায দেখছিলাম। আপনি সত্যি আজ আমাদের চোখ ফুটিয়ে দিয়েছেন। বিদেশী হয়েও আপনি আমাদের এ অঞ্চলের এতগুলি প্রাণীর জীবনরক্ষার জন্য যা কর্‌লেন, তাতে আমার সঙ্কল্প বদলে গেছে। পরের গ্রামেই আমার বাস; যথাসাধ্য বিহিত করবার আশায় আমি সহরেই যাচ্ছিলাম। কিন্তু—"

সুরেশচন্দ্র বাধা দিয়া বলিলেন, "আপনি কে, তাও আমি জানি নে, জান্‌বার তেমন দরকার আছে ব'লে ত মনে হয় না। আপনি যদি আমার সাহায্য করেন, তবে বড় উপকার হয়। আপাততঃ ১০ মণ চাউল কিনেছি। আপনি অভাব-গ্রস্তদের মধ্যে বিবেচনা ক'রে বিতরণ করবার ভার নিলে আমি বেঁচে যাই।"

ব্রাহ্মণ উৎসাহভরে বলিলেন, "নিশ্চয়; যদি আপনি আমাকে বিশ্বাস ক'রে ভার দেন, সানন্দে আমি করব; কিন্তু আমি আপনার সম্পূর্ণ অপরিচিত!"

সুরেশচন্দ্র মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আর্ত্তের সেবার হ'লে এ সকল কায চল্‌তে পারে না। আমি আপাততঃ এই দিলাম, পরে আবার এখানে আস্‌ব।"

গ্রামের কতিপয় যুবক নীরবে সকল ব্যাপার দেখিতেছিল। তাহারা অগ্রসর হইয়া বলিল, "মৃত্যুঞ্জয় ঠাকুরকে আপনি অনায়াসে বিশ্বাস করতে পারেন। ওঁর শেষ কপর্দ্দক উনি অভাবগ্রস্তের সেবায় দান করেছেন। এ অঞ্চলের সকলেই ওঁকে ভালরূপে চেনে। ওঁর উপর ভার দিন, আমরাও কাযে লেগে যাব।"

উন্নতদেহ ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমাদের দরিদ্র পল্লীতে টাকা নেই; কিন্তু কায করবার লোকের অভাব হবে না। এক মাস ধ'রে কোন রকমে নিরন্ন গ্রামের হতভাগ্যদিগকে বাঁচিয়ে রাখা গিয়েছিল; আজ ৪।৫ দিন—"

বাধা দিয়া সুরেশচন্দ্র বলিলেন, "বুঝেছি; আচ্ছা, এই ৪।৫ খানা গ্রামে নিরন্ন লোকের সংখ্যা কত হবে?"

"তা কম নয়। প্রায় ৪শ হবে।"

সুরেশচন্দ্র ব্রাহ্মণ ও যুবক কয়েক জনকে একটু দূরে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন, "আপনারা যদি রীতিমত ব্যবস্থা কর্‌তে পারেন, আমিও যথাসাধ্য টাকা যোগাড় ক'রে দেবার চেষ্টা কর্‌তে পারি।" মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন, "দেখুন, আপাততঃ আমি ৫শ টাকা দিয়ে যাচ্ছি। এই নিয়ে সঙ্ঘবদ্ধভাবে আপনারা কায আরম্ভ করুন; পরে আরও চেষ্টা দেখব।"

নোট-কেস্ হইতে ৫ খানা ১ শত টাকার নোট বাহির করিয়া সুরেশচন্দ্র মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মার হাতে দিলেন। চেক্ লিখিয়া দিলে আপাততঃ টাকা পাইতে বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা বোধে সুরেশচন্দ্র সে পথে গেলেন না।

ব্রাহ্মণের নেত্র অশ্রুভারে পূর্ণ হইল। যুবকদিগের নয়নও শুষ্ক রহিল না। ব্রাহ্মণ গাঢ়কণ্ঠে বলিলেন, "বাবা, বয়সে তুমি আমার অনেক ছোট—ছেলের মত। এই গ্রামের জন্য তুমি যা অযাচিতভাবে করলে, তার জন্য ভগবান—"

মুখ ফিরাইয়া সুরেশ বলিলেন, "আপনি প্রণম্য, আমার প্রণাম নিন। মানুষের যা কর্ত্তব্য, তার বেশী এ ত কিছুই নয়। ভাল কথা, আপনার ঠিকানাটা?"

সুরেশচন্দ্রের নোটবহিতে মৃত্যুঞ্জয় ঠাকুর এবং যুবকগণ

সারেঙ্গ আসিয়া জানাইল, আর বিলম্ব করা অসম্ভব।

সুরেশচন্দ্র দ্রুত ষ্টীমারের দিকে ফিরিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন, "বাবু, আপনার নামটা—"

সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে উঠিতে সুরেশ বলিলেন, "পরে জানাব, পত্র লিখব—আবার এখানে আসতেও হবে।"

## ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সারাদিন কঠোর পরিশ্রমের পর শ্রান্ত-ক্লান্ত-দেহে বাসায় ফিরিয়াও সরযূ এবং অমিয়ার প্রসন্নতা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইতে দেখা যাইত না। সুরেশচন্দ্রের আননে পরিবর্ত্তনের চিহ্ন কদাচিৎ দেখা যাইত—সেবা-কার্য্যে রত হইবার পরও কোনও ভাবের রেখা আজও দেখা গেল না। নগরের এক প্রান্তে একটা ছোট বাড়ী ভাড়া লওয়া হইয়াছিল। জেলার হাকিমের সহিত সুরেশের পূর্ব্ব-পরিচয় ছিল। উভয়ে একই বৎসরে বিলাতে সিবিল সার্ব্বিস পাশ করিয়াছিলেন। প্রথমে জয়েণ্টের কায করিবার পর পূর্ব্ববঙ্গের এই জিলার ভার পাইয়াছেন। পল্লীতে পল্লীতে দুর্ভিক্ষ ও পীড়ার প্রকোপ অসম্ভব বৃদ্ধি পাইয়াছিল—সরকার 'রিলিফের' কায খুলিয়া সে ভীষণ অবস্থার প্রতীকার করিতে পারিতেছিলেন না। এমন সময় সুরেশচন্দ্রের অযাচিত সাহায্য পাইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে যথেষ্ট সুবিধা ও সুযোগের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

সুরেশচন্দ্র নগরকে কেন্দ্র করিয়া সরযূ ও অমিয়ার সাহায্যে কোথাও পদব্রজে, কোথাও বা নৌকা কিংবা গোযানে চড়িয়া দূরবর্ত্তী গ্রামের অবস্থা দেখিতে যাইতেন। স্থানে স্থানে অন্নসত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল—চারি পাঁচখানা গ্রামকে লইয়া এক একটা অস্থায়ী হাঁসপাতাল স্থাপিত হইয়াছিল; তাঁহারা পর্য্যায়ক্রমে এই সকল প্রতিষ্ঠানের কায পরীক্ষা করিয়া বেড়াইতেন।

দেশের ভীষণ দুর্দ্দশা—নর-নারীর শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া চির-সুখলালিতা নবীনাদিগের হৃদয় বিচলিত হইয়াছিল। কর্ম্মানুরাগ ও সেবাপ্রবৃত্তির এমনই শক্তি যে, একবার যদি কোনও চিত্তে তাহারা জাগিয়া উঠে, তবে সহসা তাহার দীপ্তি নিষ্প্রভ হয় না। ষ্টীমার-ঘাটের দৃশ্যেই অমিয়ার স্বভাবকোমল, উন্নত নারীহৃদয় বিগলিত হইয়াছিল। তখনই সে সঙ্কল্প করিয়াছিল যে, পীড়িতের সেবায়, আর্ত্তের শুশ্রূষায় এবং ক্ষুধিতের ক্ষুধাপ্রশমনে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে। স্বামীজীর কথাগুলি তাহার মনে জাগিয়া উঠিয়াছিল,—"মা, জীবসেবায় মানুষের সকল ধর্ম্ম সার্থক হয়!"

স্বহস্তে পাক করিয়া স্বামীজীকে ভোজনে পরিতৃপ্ত করার পর স্বামীজী বলিয়াছিলেন, "মা, একটা কথা মনে রেখ, যত্র জীব, তত্র শিব। জীবের সেবায় তিনি পরিতৃপ্ত হন, তাঁরই সেবা হয়। আর তাঁর সেবাই মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। জীবসেবায় আত্মনিয়োগ কর, অমৃতের স্বাদ পাবে, অনন্ত সুন্দরের পরিচয় তখন গোপন থাক্‌বে না।" কথাগুলি তখন হইতেই অমিয়ার হৃদয়ের তারে থাকিয়া থাকিয়া ঝঙ্কৃত হইয়া থাকে।

স্বয়ং আহার্য্য বিলাইয়া, রোগীর সেবা করিয়া, এই কয় দিনেই অমিয়া আনন্দের আভাস পায় নাই কি? কোমরে কাপড় আঁটিয়া বাঁধিয়া যখন সে ক্ষুধিত নরনারীদিগকে সিদ্ধান্ন পরিবেশণ করে, তখন তাহার হৃদয়ে কে যেন আসিয়া আবির্ভূত হয়! তখনই তাহার মনে হয়, সে যেন জননী—বুভুক্ষু সন্তানদিগকে সে ক্ষুধার সময় অন্ন পরিবেশণ করিতেছে। পীড়িতের পার্শ্বে বসিয়া যখন সে তাহার রোগযন্ত্রণা প্রশমিত করিবার জন্য শুশ্রূষা করে, তখন সংসারের কোন কথাই ত মনে পড়ে না! শুধু যেন মাতৃত্বের অমৃত-প্রবাহধারা তাহার সমগ্র চিত্তকে ভাসাইয়া লইয়া যায়। শুশ্রূষার ফলে ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলির মুখে যখন শান্তির স্নিগ্ধচ্ছায়া ফুটিয়া উঠে, তখন তাহার মনে হয়, এমন তৃপ্তি—এমন আনন্দ আর কিছুতেই পাওয়া যাইবে না।

মানব-হৃদয়ের তত্ত্বদর্শী মহাপ্রাণ স্বামীজীর কথা কত সত্য!—না, তাহার হৃদয়ে আর কোন গ্লানি নাই, অশান্ত হৃদয় শান্ত হইয়া আসিয়াছে। যন্ত্রণাভরা মানসিক চাঞ্চল্য কর্ম্ম-সমুদ্রের প্রবল প্রবাহের স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে—ক্লেদমলিন মনোবৃত্তির রেখা ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে!

সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর ক্ষুদ্র গৃহের অপরিসর কক্ষে ফিরিয়া, সাধারণ শয্যায় শয়ন করিয়া, অমিয়ার মনে অনেক পুরাতন কথা নূতন করিয়া দেখা দিত। অধিকাংশ সময় স্বামীর কথাই মনকে অধিকার করিত। কথাপ্রসঙ্গে

স্বল্পভাষী বৈজ্ঞানিক যখন বলিতেন, "অমিয়া, বিজ্ঞানের সেবায় জীবনটা উৎসর্গ করেছি ব'লে, অনেক সময় গৃহীর কর্ত্তব্য, স্বামীর কর্ত্তব্য পালন করতে পারি না। সে জন্য দুঃখ ক'র না। আমার সামর্থ্য বড় কম, তবু চেষ্টা কচ্ছি, যদি বিজ্ঞানের সাহায্যে আমার দেশের ভাইদের জন্য কোন পথ নির্দ্দেশ ক'রে দিতে পারি। এ যুগে আমাদের দেশ বড় দরিদ্র, বড় অসহায়। বিজ্ঞানের সাহায্যে দেশের নিদারুণ অর্থনৈতিক সমস্যার কোন সহজ উপায় নির্দ্দেশ করা যায় কি না, এই বইখানাতে তারই মীমাংসার চেষ্টা কচ্ছি।" অমিয়া তখন স্বামীর এ সকল কথার প্রকৃত অর্থ ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই, এ কথা স্বীকার করিতে এখন তাহার এতটুকু লজ্জা নাই। সত্যই সে তখন স্বামীর মনের গতির সহিত তাল রাখিয়া চলিতে পারে নাই। কিন্তু ঘটনাপরম্পরার সাহায্যে, নানাবিধ অবস্থার চিত্র দেখিবার পরে এই কয় দিনে সে তাহার স্বামীর কথার মর্ম্ম যেন অনেকটা বুঝিয়া ফেলিয়াছিল। দেশ বলিতে এত দিন সে কিছুই বুঝিত না, দেশের লোক বলিতে সে বিশেষ কোন অর্থ করিতে পারিত না। কিন্তু এখন?

ষ্টীমার-ষ্টেশনের দৃশ্যের পর অমিয়া ষ্টীমারে উঠিয়াই সুরেশচন্দ্রকে তাহার সংকল্পের কথা জানাইয়াছিল। মৃদু হাসিয়া সুরেশচন্দ্র তখনই বলিয়াছিলেন, "তুই যে কি ধাতুতে গড়া, তা আমি জানতুম, অমি।"

তাহার পর কেবিনের মধ্যে গিয়া সুরেশচন্দ্র অমিয়া ও সরযুর নিকট আপনার ভাবী কার্য্যপদ্ধতির কিছু কিছু আভাস দিয়াছিলেন।

"বাবা ৩০ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি রেখে গেছেন। ব্যাঙ্কেও আমার অংশে ৪ লাখ টাকা মজুত। এত দিন প্রজার অর্থে বিলাসভোগ করা গেছে। এখন যদি আমারই দেশের, আমারই ভাই-বোনেরা না খেতে পেয়ে মারা যায়, আর যদি সাধ্যমত তার কোন প্রতীকারের চেষ্টা না করা যায়, তবে অমি, তুইও কি আমায় মানুষ ব'লে ভাবতে পারবি?"

দাদার মুখে সে দিন সে যে ভাব-প্রবাহের গতিবেগ লক্ষ্য করিয়াছিল, অমিয়া কখনও তাহার স্মৃতি ভুলিতে পারিবে না।

"আমাদের নামে ব্যাঙ্কে কত টাকা জমা আছে, দাদা?"

হাসিয়া সুরেশচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "সে টাকা ত তোমার একার নয়, অমিয়া! বাবার উইল অনুসারে সুনীল ও তোমার নামে বিয়ের যৌতুকস্বরূপ ব্যাঙ্কে ৮০ হাজার টাকা জমা আছে।"

অমিয়ার আনন তাহাতে আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু সে বলিয়াছিল, "সে টাকার কথা আমি বল্‌ছি না, দাদা! তুমি আমার নামে আলাদা যে টাকা জমা রেখেছিলে, সেই টাকার কথাই বল্‌ছি।" সুরেশচন্দ্র উত্তরে বলিয়াছিলেন, সে টাকা সুদে আসলে প্রায় ২০ হাজার টাকায় দাঁড়াইয়াছে। অমিয়া দাদাকে একান্ত অনুরোধ করিয়াছিল যে, সুরেশচন্দ্রের অনুষ্ঠানে তাহার ঐ টাকাটাও যেন ব্যয় করা হয়। নহিলে সে মনে বড়ই ব্যথা পাইবে। তখন তাহার মনে হইয়াছিল, টাকায় তাহার প্রয়োজন কি? তাহার স্বামী কৃতী পুরুষ, তিনিও দরিদ্র নহেন। তবে স্বামীর অনুমতি লওয়া দরকার। যদিও উহা ব্যয় করিবার স্বাধীনতা তাহার আছে, তথাপি জীবন-পথের যিনি চির-সঙ্গী, নারীর যিনি সর্ব্বস্ব, তাহার ইহকাল পরকালের সকল অবস্থায় যিনি একমাত্র সুহৃদ, তাঁহার কাছে লুকাইবার কিছু নাই, থাকিতেই পারে না। সুতরাং সে তাঁহার অনুমোদন আনাইয়া লইয়াছিল। সুনীলচন্দ্র শুধু অনুমোদন করেন নাই, তাহার এই প্রচেষ্টায় তিনি আন্তরিক সহানুভূতি ও আগ্রহও জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

আজ অমিয়া বিশ্বস্ত ভৃত্য সনাতনের সঙ্গে নগরের সন্নিহিত কেন্দ্রে চাউল বিতরণ ও দুর্ভিক্ষপীড়িতদের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের জন্য গিয়াছিল। সুরেশ ও সরযু ভিন্ন স্থানে অস্থায়ী হাঁসপাতালে রোগীর শুশ্রূষায় নিযুক্ত ছিল। প্রতিদিন একই স্থানে ৩ জনই উপস্থিত থাকিতে পারিত না—সুবিধা হইত না। এমনই ভাবে কয় সপ্তাহ তাহারা লোক-সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া আসিতেছে।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বেই অমিয়া কায শেষ করিয়া ফিরিয়াছে। সুরেশ ও সরযূর এখনও দেখা নাই। হাত-মুখ ধুইয়া, কাপড় ছাড়িয়া সে বাতায়নের ধারে আসিয়া বসিল।

ক্ষীণচন্দ্রের মৃদু আলোক-রেখা মেঘলেশ-শূন্য গাঢ়নীল গগনে যেন স্বপ্নলেখার মত বোধ হইতেছিল। সারাদিনের

কর্ম্মশ্রান্তি, অবসাদের পরিবর্ত্তে যেন একটা সজীব প্রসন্নতা, আনন্দ আনিয়া দিয়াছিল। মুগ্ধার মত বসিয়া বসিয়া সে কত কি ভাবিতে লাগিল। সদ্যঃপ্রাপ্ত স্বামীর পত্রখানির কথাই আজ যেন বিশেষ করিয়া মনে পড়িতেছিল। ইদানীং স্বামীর চিন্তা তাহার অবসরকালকে ব্যাপৃত রাখিত। সে চিন্তাতে যেন তাহার একটা বিশুদ্ধ আনন্দ জন্মিত। পূর্ব্বেও যে এমন হয় নাই, তাহা নহে, কিন্তু আগে যেন একটা চেষ্টা করিতে হইত; এখন আপনা হইতেই মন সেই চিন্তায় ভরপুর হইয়া উৎফুল্ল ভাব ধারণ করে।

স্বামী লিখিয়াছিলেন, তাঁহাদের কলেজের দীর্ঘ অবকাশ প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছে। হৃদয়ের ব্যাকুল আগ্রহসত্ত্বেও আরব্ধ কার্য্য শেষ হইতেছে না—তিনি তাহাদের সহিত যোগ দিতে পারিতেছেন না। পত্রখানি দীর্ঘ নহে; কিন্তু প্রতি ছত্রে, প্রতি শব্দে কি আন্তরিকতা ও গভীরতার পরিচয় সুস্পষ্ট! বাহুল্যবর্জ্জিত লিপির মধ্যে সুগভীর ভালবাসা ও অকপট শ্রদ্ধার নিদর্শন যেন জমাট হইয়া উঠিয়াছে!

অমিয়া পুনঃ পুনঃ স্বামীর স্মৃতি ধ্যান করিয়া পুলকিত হইয়া উঠিল।

[ ক্রমশঃ।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

## তন্ময়

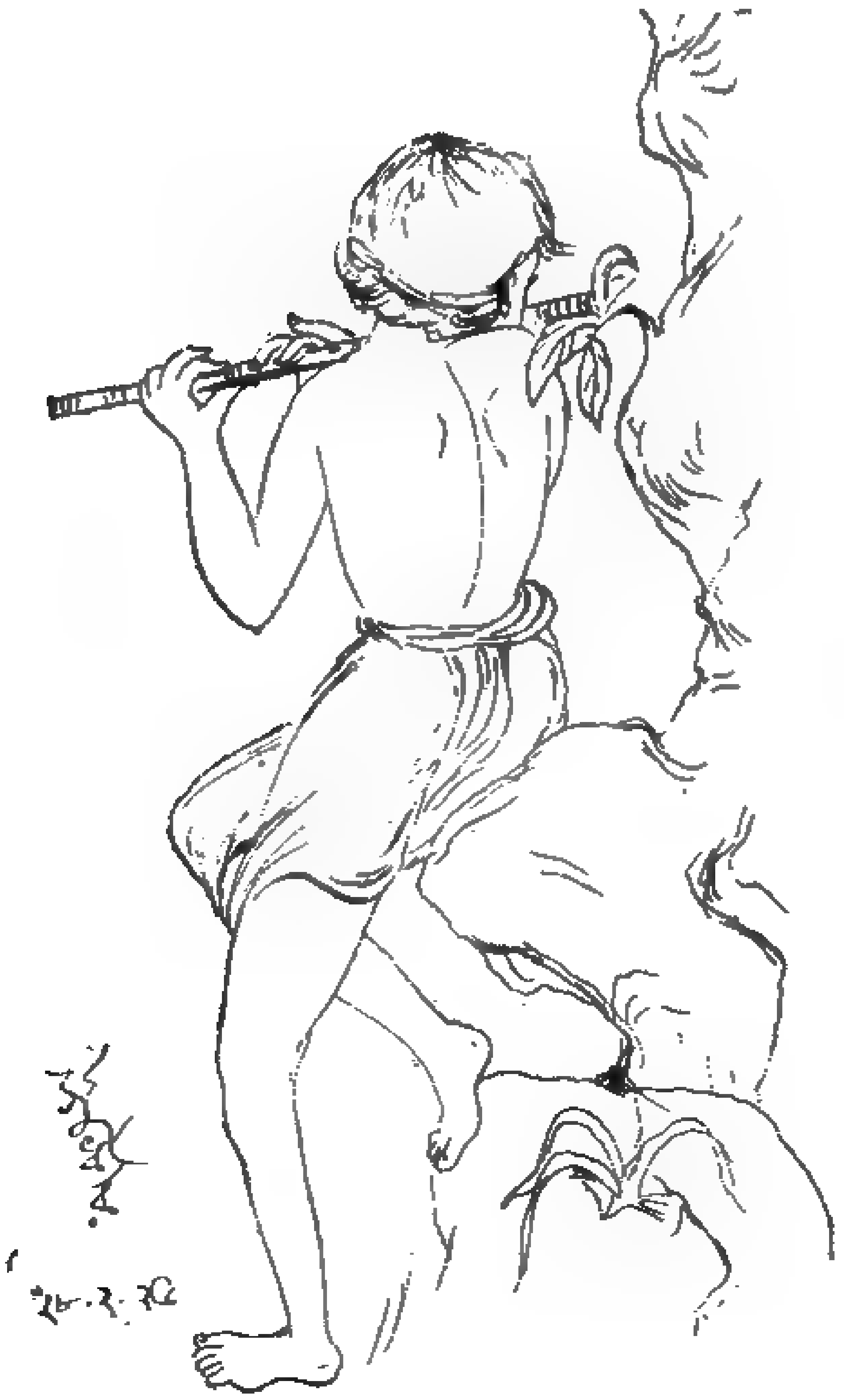

শিল্পী—শ্রীসুধীর খাস্তগীর।

# মহাভারত ও ভারতবর্ষের ইতিহাস

## ৬

সভা হইল ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিচারস্থান; দ্যূতক্রীড়া হইল অক্ষ-দ্যূত, অর্থাৎ তর্ক বা বিচার। এক পক্ষে যুধিষ্ঠির পণ রাখিতেছেন, অপর পক্ষে শকুনি পাশা ফেলিতেছেন। কবি শকুনি সম্বন্ধে বলিতেছেন,—'শকুনিঃ নিকৃতিং সমুপাশ্রিতঃ'—শকুনি নিকৃতি অবলম্বন করিয়া খেলিতেছেন। এখানে একটু কথার খেলা আছে; নিকৃতি অর্থে কপটতা হয়, আর বচনও হয়। যুধিষ্ঠির প্রথমেই বলিতেছেন—

"নার্য্যা ম্লেচ্ছন্তি ভাষাভির্মায়য়া ন চরন্ত্যত।"

১১-৫৯, সভাপর্ব্ব।

আর্য্যপুরুষরা ম্লেচ্ছ ভাষা ব্যবহার ও কপটতাচরণ করেন না।

মহাভারতে কপটতা ও মায়া কথা আমরা অনেক স্থলে দেখিতে পাই। মায়া কথার অর্থ ছল, এই ছল কথা বিশেষ রহস্যপূর্ণ; পরে দেখিব, লিখিত আছে,—বেদে অনেক ছল আছে; বেদের কর্ম্মকাণ্ডকে ছল বলে। মায়া কথার আর এক তাৎপর্য্য, 'অদ্ভুতার্থ প্রদর্শনবাঞ্জনপূর্ব্বকং পরবঞ্চনম্।' ১৬-১২৩, উদ্‌যোগপর্ব্ব।

উপরের ম্লেচ্ছন্তি ভাষা কি? ম্লেচ্ছ কথার সাধারণ অর্থ নীচ, কিন্তু ইহার অপর অর্থও হইতে পারে। মহাভারত-মধ্যে অনেক স্থলে গ্রীক্‌দের সহিত পরিচয়ের ইঙ্গিত আছে। যুধিষ্ঠিরের কথায় গ্রীক্‌ধর্ম্মের বা গ্রীক্‌দর্শনের যে কোনরূপ ইঙ্গিত নাই, তাহা বলিতে পারা যায় না। আমরা পরে 'ম্লেচ্ছাচার্য্য' কথা দেখিতে পাইব।

শকুনি যুধিষ্ঠিরের কথায় উত্তর দিতেছে—

"শ্রোত্রিয়ঃ শ্রোত্রিয়ানেতি নিকৃত্যৈব যুধিষ্ঠির।
বিদ্বানবিদুষোঽভ্যেতি নাহুস্তাং নিকৃতিং জনাঃ॥"

৪৪-৫৯, সভাপর্ব্ব।

শকুনি কহিলেন, যুধিষ্ঠির, দেখ, জিগীষারূপ নিকৃতি সহকারে শ্রোত্রিয় শ্রোত্রিয়দিগের নিকট গমন করেন; তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ নিকৃতি সহকারেই অতত্ত্বজ্ঞের নিকটে উপনীত হন এবং বিদ্বান্ ব্যক্তিও নিকৃতি সহকারে অল্পজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকটে যাইয়া থাকেন; তাদৃশী নিকৃতিকে লোক নিকৃতি বলে না। এ স্থলে নিকৃতি কথার দুই অর্থ স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে এবং কিরূপ দ্যূতক্রীড়া হইতেছে, তাহারও আভাস পাওয়া যাইতেছে।

দ্যূত আরম্ভ হইল, যুধিষ্ঠির একে একে যাহা কিছু তাঁহার ঐশ্বর্য্য-রত্ন ছিল, তাহা হারিলেন।

"কাশ্যো যদ্ধনমাহার্ষীদ্দ্রব্যং যচ্চান্যদুত্তমম্।"

"কাশীরাজ যে ধন ও উত্তম উত্তম দ্রব্য আহরণ করিয়াছিলেন", ধন অর্থে যে সুবর্ণ, রজত নয়, তাহা বলা বাহুল্য এবং 'কাশীরাজ' কথার তলে যে বিশেষ অর্থ আছে, তাহাও বলা বাহুল্য।

কাশী কথার অর্থ শীঘ্রই বুঝিতে চেষ্টা করিব। কি প্রকার দ্যূতক্রীড়া হইতেছিল, সে সম্বন্ধে আরও একটু আলোচনা হইতে পারে। যখন বিদুরকে যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, দ্যূতসভায় কোন কোন কিতব উপস্থিত আছে, তখন বিদুর তাহাদের মধ্যে বিবিংশতির নাম উল্লেখ করেন। ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্র ছিল, তাহাদের মধ্যে জন কয়েকের নাম দিলাম। দুর্ম্মুখ, দুষ্কর্ণ, বিকটানন, সুবাক, উগ্রশ্রবা, বহ্বাশী, বিরাবী। ইহাদের সকলেরই নাম সহিত আনন ও শ্রবণের সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। যখন সভামধ্যে যুধিষ্ঠির ও শকুনি দ্যূত সম্বন্ধে কথা কহিতেছেন, তখন শকুনি বলিল—

"যো বেত্তি সংখ্যাং নিকৃতৌ বিধিজ্ঞ-
শ্চেষ্টাস্বখিন্নঃ কিতবোঽক্ষজাসু।
মহামতির্যশ্চ জানাতি দ্যূতং
স বৈ সর্ব্বং সহতে প্রক্রিয়াসু॥"

৭-৫৯, সভাপর্ব্ব।

শকুনি কহিলেন, যে মহামতি কিতব জয়-পরাজয় বিবেচনায় অভিজ্ঞ প্রতিপক্ষের প্রতারণায় প্রতীকারজ্ঞ এবং অক্ষসম্বন্ধীয় বহুবিধ চেষ্টায় অপরিশ্রান্ত, তিনিই দ্যূতের মর্ম্ম জানেন এবং তৎসংক্রান্ত প্রক্রিয়াতে সকলই সহ্য করেন। এ স্থলে টীকাকার সংখ্যাং শব্দের অর্থ করিতেছেন, সম্যকখ্যানং জয়-পরাজয়-দ্বার-বিবেকম্। এই বিবিংশত্তি ও সংখ্যাং কথার তলে যে সাঙ্খ্যমতের প্রতি ইঙ্গিত নাই, তাহা বলা যায় না।

যখন যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে দ্যূতক্রীড়া করিতে যাইতেছিলেন, তখন তিনি 'ব্রহ্ম-পুরঃসর' হইয়া গিয়াছিলেন। ব্রহ্ম-পুরঃসর কথার দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে। এক অর্থ, যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণকে অগ্রে করিয়া যাইতেছিলেন, আর দ্বিতীয় অর্থ যুধিষ্ঠির বেদকে অগ্রে করিয়া দ্যূত-সভায় যাইতেছিলেন; অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মবিচারস্থানে যুধিষ্ঠির বৈদিক মত সমর্থন করিতে গিয়াছিলেন।

দ্যূতক্রীড়ায় যুধিষ্ঠির হারিলেন, 'গান্ধারবিদ্যয়া', গল্পের অর্থ গান্ধাররাজপুত্রের বিদ্যার দ্বারা যুধিষ্ঠিরের পরাজয় হইল। কিন্তু গান্ধারবিদ্যয়া কথার আরও কিছু অর্থ হইতে পারে। বুদ্ধদেবের দুইটি বৃহৎ প্রস্তরক্ষোদিত মূর্ত্তি আছে, একটি ব্রহ্মদেশে ও যেটি জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, সেইটি বর্ত্তমান কাবুলের চল্লিশ ক্রোশ পশ্চিমে বামিয়ান নামক স্থানে পর্ব্বতগাত্রে ক্ষোদিত আছে। বর্ত্তমান আফগানিস্থান এক সময়ে বৌদ্ধদিগের প্রধান আড্ডা ছিল।

দুঃশাসন দ্রৌপদীর কেশ আকর্ষণ করিয়া তাহাকে সভামধ্যে আনিয়াছিল। 'প্রতিগৃহ্য কেশেষু কৃষ্ণেষু কৃষ্ণায়াঃ';—এই কেশ কথার তলে যে রহস্য আছে, তাহা বলা বাহুল্য। 'কৃষ্ণেষু কেশেষু' ইহার অর্থ কৃষ্ণবর্ণ কেশ; কিন্তু ইহার অন্য প্রকার অর্থও হইতেও পারে। কেশ কথার নামান্তর কচ, কচ হইল দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র। সঞ্জীবনীমন্ত্র শিখিতে তিনি শুক্রাচার্য্যের নিকট গমন করেন; অসুরগণ এ কথা জানিতে পারিয়া কচকে বহু বার বধ করিয়াছিল—কিন্তু শুক্রাচার্য্য নিজ কন্যা দেবযানীর অনুনয়ে প্রতিবার কচ কে পুনর্জ্জীবিত করেন।

একবার অসুরগণ কচকে দগ্ধ ও চূর্ণ করিয়া সুরার সহিত মিশ্রিত করিয়া শুক্রকে তাহা পান করায়। কচ যখন শুক্রাচার্য্যের জঠরে, তখন শুক্রাচার্য্য বলিতেছেন—

"সংসিদ্ধরূপোঽসি বৃহস্পতেঃ সুত
যৎ ত্বাং ভক্তং ভজতে দেবযানী।
বিদ্যামিমাং প্রাপ্নুহি জীবনীং ত্বং
ন চেদিন্দ্রঃ কচরূপী ত্বমদ্য॥
৫৮-৭৬, আদিপর্ব্ব।

তুমি যদি কচরূপী ইন্দ্র না হও। অসুরগণ চিরদিনই যজ্ঞাভিমানী ইন্দ্রের শত্রু, অর্থাৎ বৌদ্ধরা চিরকাল যজ্ঞবিরোধী। এ স্থলে যজ্ঞাভিমানি-দেবতা ইন্দ্র হইল কচ। দুঃশাসন অর্থাৎ কুশাস্ত্র, সেই কচ আকর্ষণ করিয়া দ্রৌপদীর ধর্ষণ করিতেছে; ইহা এক প্রকার অর্থ হইতে পারে।

মহাভারতের সন্ধি-লোপের উদাহরণ অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, "সন্ধি-লোপো আর্ষঃ।" এই কথা অনেক স্থলে আছে, কেশ কথা যদি সেই ভাবে দেখা যায়, তাহা হইলে কঃ+ঈশ হইতে পারে। আমরা এখনই দেখিব যে, ঈশ কথা লইয়াই বিদুর ও দ্রৌপদী সভাতে প্রশ্ন করেন। যুধিষ্ঠির সেশ্বর অথবা নিরীশ্বর হইয়া দ্রৌপদীকে পণে হারিলেন, তাহাই হইল ইঁহাদের প্রশ্ন, অর্থাৎ সেশ্বরবাদী অথবা নিরীশ্বরবাদী ধর্ম্মের সহিত বেদের যজ্ঞকাণ্ডের সম্বন্ধ কি?

ক শব্দের অর্থ অন্য প্রকার হইতে পারে।

"একো নৈকঃ স বঃ কঃ কিং যত্তৎপদমনুত্তমম্।"
৯১-১৪৯, অনুশাসনপর্ব্ব।

এ সব কথা ভগবানের বিশেষণ। এ স্থলে ক কথার অর্থ সুখ অথবা ব্রহ্মারূপে ক; স্থানান্তরে লিখিত আছে, যাহার নাম ক, তাহারই নাম খ; খ অর্থে স্বর্গ। তাহা হইলে ক কথা হইতে যজ্ঞফল স্বর্গ কিংবা বেদের নামান্তর ব্রহ্মা এই দুই ভাব আইসে। ঈশ অর্থে যদি প্রধান করা যায়, তাহা হইলে কেশ কথার অর্থ যজ্ঞ প্রধান হইতে পারে।

দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণের আর এক প্রকার অর্থ হইতে পারে।

"ত্রৈলোক্যং সর্ব্বভূতেশে চক্রবৎ পরিবর্ত্ততে।
যত্তদক্ষরমব্যক্তমমৃতং ব্রহ্ম শাশ্বতম্।
বদন্তি পুরুষব্যাঘ্র কেশবং পুরুষর্ষভম্॥"
১৪-২১০, শান্তিপর্ব্ব।

আদি এবং অন্তহীন যে পরম শ্রেষ্ঠ কালচক্র, তাহাকেই পণ্ডিতরা অক্ষয়, অব্যক্ত, অমৃত, শাশ্বত, ব্রহ্মচৈতন্য, রশ্মিদ্বারা সর্ব্বব্যাপী অন্নময়াদি পঞ্চপুরুষের শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন। উৎপত্তি ও প্রলয়ক্ষণ এই ত্রৈলোক্যচক্রারূঢ় পীপিলিকার ন্যায় সেই সর্ব্বভূতেশ্বরে সর্ব্বতোভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। এ স্থানে টীকাকার কেশব শব্দের অর্থ করিতেছেন,—

"কেশৈরিব চিদ্রশ্মিভির্ব্বাতি সর্ব্বং ব্যাপ্নোতীতি কেশবঃ।"

কেশ কথার অর্থ চিৎ অথবা জ্ঞানরূপ রশ্মি। তাহা হইলে দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ দ্বারা ধর্ষণের তাৎপর্য্য এই ভাবে হইতে পারে যে, জ্ঞানরূপ রশ্মি দ্বারা অথবা জ্ঞানকাণ্ড দ্বারা যজ্ঞ অথবা কর্ম্মকাণ্ডের ধর্ষণ কু-শাস্ত্র দ্বারা সংঘটিত হইয়াছিল।

যখন দুঃশাসন দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করিয়া সভায় আনিয়াছিল, তখন দ্রৌপদী রজস্বলা ছিলেন। রজস্বলা কথার এক অর্থ স্ত্রীধর্ম্মানুসারিণী। সভাস্থ দর্শকদিগের সহানুভূতি এবং করুণা উদ্রেক করিবার নিমিত্ত বোধ হয় কবি দ্রৌপদীকে এই অবস্থায় চিত্রিত করিয়াছেন, কিন্তু এই কথার তলে বিলক্ষণ একটু রহস্য আছে। কথাটা রজস্বলী অর্থাৎ রজোগুণ যাহার বল; বেদের কর্ম্মকাণ্ড রজোগুণপ্রধান। কবি এই অর্থে রজস্বলা কথা স্থানান্তরে প্রয়োগ করিয়াছেন।

"ধর্ম্মাচ্ছরীরসংগুপ্তির্দ্ধর্ম্মার্থং চার্থ উচ্যতে।
কামো রতিফলশ্চাত্র সর্ব্বে তে চ রজস্বলাঃ॥"

৬-১২৩, শান্তিপর্ব্ব।

ধর্ম্মহেতু শরীররক্ষা অর্থাৎ আরোগ্যার্থ ধর্ম্মসেবা কর্ত্তব্য এবং ধর্ম্মের নিমিত্তই অর্থ উপার্জ্জিত বিহিত হয়, আর কামের ফল রতি, অতএব ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিতয়ই রজোগুণপ্রধান।

এ স্থলে আরও একটু রহস্য আছে। দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী, ইঁহারাই দ্রৌপদীর বলস্বরূপ; আর রজোগুণও পঞ্চ প্রকার।

তখন দ্রৌপদী একবস্ত্রা ছিলেন, বোধ হয়, সে সময়ে স্ত্রীলোক ঐ অবস্থায় একবস্ত্রা থাকিত। এই বস্ত্র কথার লে যে রহস্য আছে, তাহা বলা বাহুল্য। এ বস্ত্র কি ?

বস আচ্ছাদনে। এ আচ্ছাদন কি ? যখন নল অর্দ্ধবস্ত্রা দময়ন্তীকে বনে পরিত্যাগ করিয়া যান, তখন তিনি বলিতেছেন, তুমি ধর্ম্মের দ্বারা আবৃত আছ। স্থানান্তরে ১১-১৪৮, শান্তিপর্ব্ব—

কবি লিখিতেছেন—'আবৃতং পুণ্যকর্ম্মভিঃ।' আর এক স্থলে ২-৯১, শান্তিপর্ব্ব –

কবি 'বস্ত্রাণাং' কথার শুক্লানাং বস্ত্রাণাং এই অর্থে ব্যবহার করিতেছেন। শুক্ল শব্দের অর্থ নিষ্পাপ, এই অর্থ পূর্ব্বে বহুবার পাইয়াছি। তাহা হইলে বস্ত্রের সহিত ধর্ম্মের ও পুণ্যের সম্বন্ধ স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধ শ্রুতিমূলক।

উপমন্যু মহেশ্বরকে স্তব করিতেছেন :—

"গণকর্ত্তা গণপতির্দ্দিগ্বাসাঃ কাম এব চ।
মন্ত্রবিৎ পরমো মন্ত্রঃ সর্ব্বভাবকরো হরঃ॥"

৪২-১৭, অনুশাসনপর্ব্ব।

টীকাকার দিগ্বাসা শব্দের অর্থ করিতেছেন---

দিগ্বাসাঃ দারুকাবনে মুনিপত্নীমোহনার্থং নগ্নত্বং ধৃতমিতি জ্ঞেয়ম্, বস্তুতস্তু দিশাম্ অনন্তানামপি বাস ইব বাস আচ্ছাদকঃ। তথা চ শ্রুতিঃ—"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগদিতি।"—ঈশা ঈশ্বরেনাবাস্যমাচ্ছাদনীয়মিতি অর্থাৎ ঈশ্বর সর্ব্বাচ্ছাদক। সেই কারণেই ধর্ম্ম অলক্ষিতভাবে থাকিয়া দ্রৌপদীকে আবরণের নিমিত্ত বস্ত্র প্রদান করিতেছিলেন। স্থানান্তরে দুর্য্যোধন বলিতেছেন।—

"অয়ং হ্যেষাং মহাবাহুঃ সর্ব্বেষাং শর্ম্ম বর্ম্ম চ।"

৭-১৩০, উদ্‌যোগপর্ব্ব।

এই মহাবাহুই ( শ্রীকৃষ্ণ ) তাহাদিগের সর্ব্বাচ্ছাদক এবং সকল কল্যাণের মূল।

দ্যূতক্রীড়া সম্বন্ধে আর একটু আলোচনা করা যাক্। বিদুর ও দ্রৌপদী উভয়ে সভাসদ্‌গণের নিকট প্রায় একই প্রকার প্রশ্ন করিয়াছিলেন। বিদুর বলিয়াছিলেন –

"অনীশেন হি রাজ্ঞৈষা পণে ন্যস্তেতি মে মতিঃ।"

যুধিষ্ঠির প্রভুত্ববিহীন হইয়া তাঁহাকে ( দ্রৌপদীকে ) পণে নিক্ষিপ্ত করিয়াছেন। ইহার এক প্রকার তাৎপর্য্য অতি সহজ। দ্রৌপদীও ঐরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন।

"কস্যেশো নঃ পরাজৈষীরিতি ত্বামাহ দ্রৌপদী।
কিংনু পূর্ব্বং পরাজৈষীরাত্মানমথবাপি মাম্ ॥"
১০-৬৭, সভাপর্ব্ব।

দ্রৌপদী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তিনি ( যুধিষ্ঠির ) কি অগ্রে আপনাকে হারিয়াছেন, না আমাকে ?

তাহা হইলে উভয়ের প্রশ্নের মর্ম্ম হইল যে, যুধিষ্ঠির সেশ্বর অথবা নিরীশ্বর হইয়া দ্রৌপদীকে পণে হারিয়াছিলেন। দুর্য্যোধনের কথায় উভয়ের প্রশ্নের গূঢ়-রহস্যের সুন্দর ইঙ্গিত পাওয়া যায়। দুর্য্যোধন বলিতেছেন,—

"অনীশ্বরং বিব্রুবন্ত্বার্য্যমধ্যে
যুধিষ্ঠিরং তব পাঞ্চালি হেতোঃ ভোঃ।
কুর্ব্বন্তু সর্ব্বে চানৃতং ধর্ম্মরাজং
পাঞ্চালি ত্বং মোক্ষ্যসে দাসভাবাৎ ॥"
৪-৭০, সভাপর্ব্ব।

হে পাঞ্চালি ! তোমার নিমিত্ত ইঁহারা সকলেই আর্য্যগণমধ্যে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে অনীশ্বর বলুন এবং মিথ্যাবাদী করুন, তাহা হইলেই তুমি দাসীত্ব হইতে মুক্ত হইবে।

কথাগুলি একত্র করা যাক্। যুধিষ্ঠির হইলেন ধর্ম্মের পুত্র, অর্থাৎ ধর্ম্মের স্বরূপ। প্রশ্ন হইতেছে, সেই ধর্ম্ম সেশ্বর না নিরীশ্বর ? পণের সামগ্রী হইতেছে যজ্ঞাভিমানিনী দেবতা যাজ্ঞসেনী। সেশ্বর ধর্ম্ম· যজ্ঞকাণ্ড পরিত্যাগ করিতে পারে না, কিন্তু নিরীশ্বর ধর্ম্ম রজোগুণপ্রধান যজ্ঞকাণ্ড পরিত্যাগ করিতে পারে। এ প্রশ্নের কেহই উত্তর দিতে পারিল না, যাঁহার বাক্য বেদতুল্য, সেই পিতামহ ভীষ্মও এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন,—

"উক্তবানস্মি কল্যাণি ধর্ম্মস্য পরমা গতিঃ।
লোকেন শক্যতে জ্ঞাতুমপি বিজ্ঞৈর্ম্মহাত্মভিঃ ॥"
১৪-৬৯, সভাপর্ব্ব।

ভীষ্ম বলিলেন, হে কল্যাণি ! আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ধর্ম্মের পরমা গতি ; লোকমধ্যে মহাত্মা বিজ্ঞ মানবরাও জানিতে পারেন না। তিনি পুনরায় বলিলেন,—

"ন ধর্ম্মসৌক্ষ্ম্যাৎ সুভগে বিবেক্তুং
শক্নোমি তে প্রশ্নমিমং যথাবৎ। ৪৭"

আমি ধর্ম্মের সূক্ষ্মতা প্রযুক্ত তোমার এ প্রশ্নের যাথার্থ্য বিবেচনা করিতে পারিতেছি না। এই সকল প্রশ্ন ও উত্তর পড়িলে সকলেরই মনে একটি কথা স্মরণ হইবে।

"ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ প্রমাণাভাবাৎ।"

তাহা হইলে যেন একটু অর্থের আভাস পাওয়া যাইতেছে। নিরীশ্বরবাদী সাঙ্খ্যমত, সেশ্বরবাদী পাতঞ্জলমত, বেদের যজ্ঞকাণ্ড এই সকল লইয়া বিচার হইতেছে। ভীষ্ম যাহা পরে বলিলেন, তাহাতে এ সন্দেহ আরও গাঢ়তর হয়। তিনি বলিলেন,—

"যুধিষ্ঠিরস্তু প্রশ্নেঽস্মিন্ প্রমাণমিতি মে মতিঃ।"

এই প্রশ্নে যুধিষ্ঠির স্বয়ং প্রমাণ ; ইহাই আমার মত। অর্থাৎ ধর্ম্ম অথবা বেদ হইতেই এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইবে।

মহাভারতে যে সময় চিত্রিত আছে, সেই সময়ে বৈদিক ও অবৈদিক মতের মধ্যে যজ্ঞই ছিল বিবাদের প্রধান মূল। মহাভারতে কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড অর্থাৎ যজ্ঞ ও যোগ এই দুই বিষয় লইয়া অনন্ত বিচার আছে এবং তাহাদের সমন্বয়ও আছে। হিন্দুধর্ম্মের ইতিহাসে এই বিচারের ও সিদ্ধান্তের ফল আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। পরে এ প্রশ্নের আলোচনা হইবে।

পূর্ব্বে প্রশ্ন উঠিয়াছিল, মহাভারতের যুদ্ধকে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ বলে কেন, এখন সে প্রশ্ন সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতে পারে।

দুর্য্যোধন ও তাহার পক্ষীয়গণকে কি কারণে বিশেষ করিয়া কুরু বলিত। 'এতে হি সর্ব্বে কুরবঃ' এ স্থলে দুঃশাসনকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে।

'রুরুদুঃ সুস্বনং সর্ব্বা বিনিন্দন্ত্যঃ কুরূন্ ভৃশংবর।' এ স্থলে কুরু ও কৌরব একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। সেইরূপ "মধ্যে কুরূণাং ধর্ম্মনিবদ্ধমার্গং গৌগৌরিতি স্মাহ্বয়ন্ মুক্তলজ্জঃ। ১৯-৭৭ সভাপর্ব্ব।

এ স্থলেও কুরূনাং অর্থে কৌরবগণ মধ্যে।

ইহৈবৈতামানয় প্রাতিকামিন্ প্রত্যক্ষমস্যাঃ কুরবো ব্রুবন্তু। ২৩-৬৭, সভাপর্ব্ব।

দুর্য্যোধন কহিলেন, প্রাতিকামিন্. এইখানেই উহাকে ( দ্রৌপদীকে ) আনয়ন কর, কৌরবরা প্রত্যক্ষে উহার প্রশ্নের উত্তর করুন। এই স্থানে কুরব ও কৌরব একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। সেইরূপ······

ধিগস্তু নষ্টঃ খলু ভারতানাং ধর্ম্মস্তথা ক্ষত্রবিদাঞ্চ বৃত্তম্।
যত্র হ্যতীতাং কুরুধর্ম্মবেলাং প্রেক্ষন্তি সর্ব্বে কুরবঃ সভায়াম্॥

৪০-৬৭, সভাপর্ব্ব।

সমুদয় কৌরব যখন সভামধ্যে অবলীলাক্রমে স্বধর্ম্ম-সীমা উল্লঙ্ঘিত হইতেছে দেখিতেছেন, তখন নিশ্চয় বোধ হইতেছে, ভরতবংশীয়দিগের ধর্ম্ম নষ্ট হইয়াছে এবং ক্ষত্র-ধর্ম্মজ্ঞদিগেরও চরিত্র দূষিত হইয়াছে। এ স্থলেও কুরব ও কৌরব এই দুই শব্দ একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

"মৃষ্যন্তি কুরবশ্চেমে মন্যে কালস্য পর্য্যয়ম্।"

৭-৬৯, সভাপর্ব্ব।

দেখিয়াও সহ্য করিয়া রহিয়াছেন, সেইরূপ—
"তথাহি কুরবঃ সর্ব্বে লোভমোহপরায়ণাঃ।"

১৭-৬৯, সভাপর্ব্ব।

যখন সকল কৌরবই লোভ-মোহপরতন্ত্র হইয়াছে। তাহা হইলে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়, কুরব ও কৌরব এই দুইটি শব্দ কবি একই অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন। এই দুইটি যে একই কথা, তাহা বুঝা কঠিন নহে। স্বার্থে তদ্ধিত, এ বিষয়ানুসারে কুরব কথা সাধিত হইয়াছে। যেমন পূর্ব্বে দেখিয়াছি, বিশম্পায়ন, বৈশম্পায়ন, দ্বীপায়ন, দ্বৈপায়ন একই কথা। তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কুরু, কুরব ও কৌরব এ তিনই এক কথা। কু এবং রব লইয়া গঠিত হইয়াছে, এ রব আমাদের পূর্ব্বপরিচিত রাবণের রব, মহাভারতে রব সম্বন্ধে কোন প্রকার সংশয় থাকিতে পারে না, ইহা কু—রব, মন্দ অথবা দুষ্টরব। সেই দুষ্টরব হইল এক পক্ষে, ও অপর পক্ষে হইল ধর্ম্মের বীজ অর্থাৎ বেদপন্থা-সেবী পাণ্ডবগণ। কৌরবরা অর্থাৎ কুরবকারীরা যে ধর্ম্মের বিপক্ষে, সে সম্বন্ধে বিদুর এক স্থলে সুন্দর ইঙ্গিত দিয়াছেন। যখন সভামধ্যে এইরূপ কাণ্ড হইতেছিল, তখন বিদুর বলিলেন—

"পরং ভয়ং পশ্যত ভীমসেনাৎ
তদ্বুধ্যধ্বং পার্থিবাঃ প্রাতিপেয়াঃ।
"দৈবেরিতো নূনময়ং পুরস্তাৎ
পরোঽনয়ো ভরতেষূদপাদি॥"

১৬-৭১, সভাপর্ব্ব।

তখন বিদুর বলিলেন, হে প্রতীপবংশীয় পার্থিবগণ এই দেখুন ভীমসেন হইতে মহাভয় উপস্থিত, অতএব আপনারা ইহা নিশ্চয় বোধগম্য করুন, ভারতগণমধ্যে এই যে পরম অনয় উৎপন্ন হইল, তাহা দৈবই অগ্রে প্রেরণ করিলেন। সভাতে পঞ্চপাণ্ডব ব্যতীত ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ ও অপর কৌরবগণ উপস্থিত ছিলেন। বিদুর তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিতেছেন প্রাতিপেয়া, এক পক্ষে কথাটা সম্পূর্ণ সত্য। কারণ, ভীষ্ম প্রভৃতি কৌরবগণ প্রতীপবংশীয়। কিন্তু প্রতীপ কথার অপর অর্থ প্রতিকূল, কু—রব ও প্রতিকূলবাদী এই দুই কথার মধ্যে সম্বন্ধ সহজেই দেখিতে পাওয়া যায়।

উপরের উদ্ধৃত শ্লোকে আরও দুইটি কথার প্রয়োগ লক্ষ্য করিবার বিষয়। উপরে ভরত কথা, ভরতবংশীয়গণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, দ্বিতীয় অনয় কথা, আমার মনে হয়, ন্যায়দর্শনের সহিত এই অনয় কথার সম্বন্ধ আছে।

মহাভারতে অন্ততঃ এক শত স্থলে ভিন্ন ভিন্ন আকৃতিতে এই রব কথার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। পরে কতকগুলির উদাহরণ দিব। এ স্থলে দুই একটা শ্লোক হইতে রব কথার প্রকৃত তাৎপর্য্যের কিছু আভাস পাওয়া যাইবে। সভাস্থলে গান্ধারী বলিলেন—

"ব্যনদজ্জাতমাত্রো হি গোমায়ুরিব ভারত।
অন্তো নূনং কুলস্যাস্য কুরবস্তন্নিবোধত॥"

৩-৭৫, সভাপর্ব্ব।

এই কুলপাংশন পুত্র জন্মিবামাত্র গোমায়ুর ন্যায় বিকট-স্বরে যখন চীৎকার করিয়া উঠিল, তখন এ অবশ্যই এই কুলের ধ্বংসকারী হইবে। বাস্তবিকই দুর্য্যোধন জন্মিবা-মাত্র গর্দ্দভের ন্যায় চীৎকার করিয়াছিল।

"স জাতমাত্র এবাথ ধৃতরাষ্ট্রসুতো নৃপ।
রাসভারাবসদৃশং ররাব চ ননাদ চ॥
তং খরাঃ প্রত্যভাষন্ত গৃধ্রগোমায়ুবায়সাঃ॥"

২৮-১১৫, আদিপর্ব্ব।

হে নৃপ! দুর্য্যোধন জন্ম পরিগ্রহ করিয়াই গর্দ্দভ সদৃশ শব্দ ও চীৎকার করিতে লাগিল। তাহা শুনিয়া গর্দ্দভ, গৃধ্র, শৃগাল ও বায়সগণ প্রতিশব্দ করিতে লাগিল। আবার যখন দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা হইতেছিল—

ততো রাজ্ঞো ধৃতরাষ্ট্রস্য গেহে
গোমায়ুরুচ্চৈর্ব্যাহরদগ্নিহোত্রে।

তং রাসভাঃ প্রত্যভাষন্ত রাজন্
সমন্ততঃ পক্ষিণশ্চৈব রৌদ্রাঃ ॥”

২২-৭১, সভাপর্ব্ব।

অনন্তর ধৃতরাষ্ট্রের ভবনে একটা গোমায়ু অগ্নিহোত্রগৃহে উচ্চৈঃশব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল এবং গর্দ্দভ ও বিকটাকার পক্ষী সকল সেই রবের প্রত্যুত্তর করিতে লাগিল। এই শ্লোকটি যে রহস্যপূর্ণ, তাহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

এই সকল কাণ্ড ঘটিল ধৃতরাষ্ট্রের অগ্নিহোত্রগৃহে, অর্থাৎ যজ্ঞগৃহে। পক্ষী কথায় দ্বিজ অর্থাৎ কোন প্রকার ব্রাহ্মণদিগের ইঙ্গিত আইসে। গোমায়ু ও রাসভ এই দুইটি কথা কেবল নিন্দাবাচক কিংবা ইহাদের মধ্যে অন্য প্রকার অর্থ আছে কি না, তাহা বলা যায় না।

দ্রৌপদী বেদের যজ্ঞ অথবা কর্ম্মকাণ্ডের অভিমানিনী দেবতা, সে বিষয়ে কবি একটি সুন্দর ইঙ্গিত দিয়াছেন। দ্বিতীয়বার দ্যূতক্রীড়ার ফলে যখন পঞ্চ পাণ্ডব ও দ্রৌপদী সভা ত্যাগ করিয়া যাইতেছিলেন, তখন দুঃশাসন ভীমকে উপহাস করিয়া গবি গবি বলিয়া চারিদিকে নৃত্য করিতেছিল।

“এবং ব্রুবাণমজিনৈর্ব্বিবাসিতং,
দুঃশাসনস্তং পরিনৃত্যতি স্ম।
মধ্যে কুরূণাং ধর্ম্মনিবদ্ধমার্গং,
গৌগৌরিতি স্মাহ্বয়ন্ মুক্তলজ্জঃ ॥”

১৯-৭৭, সভাপর্ব্ব।

অজিনবাসিত বৃকোদর ধর্ম্মানুরোধে বৈরনির্য্যাতনের পথবদ্ধ থাকায় কেবল বাক্য দ্বারা এই প্রকার ভর্ৎসনা করিতেছেন, এমন সময় দুঃশাসন তাঁহাকে “ওরে গরু, ওরে গরু” এইরূপ আহ্বান করত নির্লজ্জ হইয়া কুরুগণমধ্যে চতুর্দ্দিকে নৃত্য করিতে লাগিল।

এ শ্লোকের রহস্য স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। পাণ্ডবগণ পরাজিত হইল, অতএব তাহারা পশু সদৃশ, এই কারণে তাহারা গরু। দ্বিতীয়, তাহারা বিচারে পরাজিত হইল, অতএব তাহারা বুদ্ধিতে গরু সদৃশ। তৃতীয়, গো অর্থে বেদ, পাণ্ডবরা বৈদিক মত অনুসরণকারী অতএব দুঃশাসন অর্থাৎ (কুশাস্ত্র) বেদ উদ্দেশ করিয়া গবি গবি বলিয়া শ্লেষ উপহাস করিতেছে, তাহা বিচিত্র নহে। দ্রৌপদীর যখন লাঞ্ছনা হইতেছিল, তখন—

“ব্রাহ্মণাঃ কুপিতাশ্চাসন্ দ্রৌপদ্যাঃ পরিকর্ষণে।”

২২-৮১, সভাপর্ব্ব।

দ্রৌপদীর অবমাননায় ব্রাহ্মণগণ কুপিত হইলেন। যজ্ঞের অবমাননায় ব্রাহ্মণগণ কুপিত হইবেন, তাহা আশ্চর্য্য নহে, দ্রৌপদীর পিতা হইলেন দ্বিজগণের আশ্রয় দ্রুপদ।

বিপদে পড়িয়া দ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিতেছেন, এ বিলাপটি যেমন করুণরসাত্মক, তেমনই ভাবপূর্ণ।

“কৌরবার্ণবমগ্নাং মামুদ্ধরস্ব জনার্দ্দন।”

৪২-৬৮, সভাপর্ব্ব।

কু—রবরূপ (অবৈদিক) সাগরে আমি (যজ্ঞকাণ্ড) নষ্ট হইলাম, হে জনার্দ্দন, আমাকে উদ্ধার করুন।

সে সময়ে দেশে অবৈদিক মতের যে খরস্রোত বহিতেছিল, সে সম্বন্ধে কবি স্থানান্তরে স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়াছেন। যুধিষ্ঠিরের নিকট বিদুর দৌত্যকার্য্যে গমন করিয়াছিলেন। তিনি যখন ফিরিতেছেন, যুধিষ্ঠির তাঁহার দ্বারা হস্তিনাপুরের সকলকে অভিবাদন পাঠাইতেছেন।

“অশ্রোত্রিয়া যে চ বসন্তি বৃদ্ধা, মনস্বিনঃ শীলবলোপপন্নাঃ।
আশংসন্তোঽস্মাকমনুস্মরন্তো, যথাশক্তি ধর্ম্মমাত্রাঞ্চরন্তঃ ॥”

১০-৩০, উদ্‌যোগপর্ব্ব।

মনস্বী ও শীলবলসম্পন্ন যে সমস্ত বৃদ্ধ বেদাধ্যয়নবিরহিত হইয়াও যথাশক্তি ধর্ম্মাংশের আচরণ করত অবস্থান করেন এবং আমাদের অভ্যুদয় আশংসা ও অনুসরণ করেন, তাঁহাদিগকে অনাময় জিজ্ঞাসা করিও।

এ সময়ে দেশে বেদের অবস্থা বুঝিতে এ শ্লোকটি বিশেষ উপযোগী. তখন ব্রাহ্মণরাও বেদাধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়াছেন।

দ্রৌপদী যজ্ঞাভিমানিনী দেবতা, আর পাণ্ডবরা বেদ অথবা পরমাত্মসেবী। সে সম্বন্ধে কবি এক স্থানে সুন্দর ইঙ্গিত দিয়াছেন।

“যথা চ বেদান্ সাবিত্রী যাজ্ঞসেনী তথা পতীন্।
ন জহৌ ধর্ম্মতঃ পার্থান্ মেরুমর্কপ্রভা যথা ॥”

৫-৮১, বনপর্ব্ব।

যে প্রকার সূর্য্যপ্রভা সুমেরুকে ও সাবিত্রী বেদ

সকলকে পরিত্যাগ করেন না, সেই প্রকার যাজ্ঞসেনী পাণ্ডবপতিদিগকে ধর্ম্মানুসারে পরিত্যাগ করেন না।

এতক্ষণ দ্যূতক্রীড়া, দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা, পাণ্ডবদিগের পরাজয়, এই সকল বিষয়ের মর্ম্ম বুঝিতে চেষ্টা করিতেছিলাম। আবছায়ার মত যেন দেখিতে পাইলাম যে, ইহা সাধারণ পাশা-খেলা নয়, এ সভাস্থল হইল ধর্ম্মাধর্ম্মবিচারের স্থান। কি লইয়া বিচার হইল, তাহা নিঃসন্দেহে বলা কঠিন, তবে বেদের যজ্ঞকাণ্ড, ঈশ্বরবাদ, বৈদিক পন্থা এই সকল বিষয় লইয়া যে বিচার চলিতেছিল এবং বৈদিক মত, অন্ততঃ বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড এ বিচারে পরাজিত হইল, তাহা বুঝিতে পারা যায়। এখন দেখা যাক্, ইহার মধ্যে কোন ঐতিহাসিক রহস্য আছে কি না? কাশী কথা হইতে মনে হয় যেন, সে সময়ের ভারতবর্ষের ইতিহাসের কিছু সংবাদ পাই। পূর্ব্বে দেখিয়াছি, দ্যূত আরম্ভ হইলে যুধিষ্ঠির একে একে তাঁহার যাহা কিছু ঐশ্বর্য্যরত্ন ছিল, তাহা হারিলেন। উপরে এ শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি।

"কাশ্যো যদ্ধনমাহার্ষীদ্দ্রব্যং যচ্চান্যদুত্তমম্।"

'কাশিরাজ যে ধন ও উত্তম উত্তম দ্রব্য আহরণ করিয়াছিলেন' এ স্থলে কাশিরাজ কথার প্রয়োগে মনে একটু চিন্তা হয়; চিন্তা করিবার বিলক্ষণ কারণ আছে। কাশী কথার অর্থ বর্ত্তমান বারাণসী হইতে পারে। আবার যজ্ঞ দ্বারা উপলক্ষিত কাশী নামে স্থান হইতে পারে।

যখন যুধিষ্ঠির পণের পর পণে হারিতেছিলেন, তখন প্রতিবারই শকুনি বলিতেছে—এই আমার জয় হইল।

"ইত্যেবংবাদিনং পার্থং প্রহসন্নিব সৌবলঃ।
জিতমিত্যেব শকুনির্যুধিষ্ঠিরমভাষত॥"

১৮-৩১, সভাপর্ব্ব।

কিন্তু যখন দ্রৌপদীকে হারিলেন, তখন কবি জিত কাশী কথা ব্যবহার করিলেন।

"সৌবলস্ত্বভিধায়ৈবং জিতকাশী মদোৎকটঃ।
জিতমিত্যেব তানক্ষান্ পুনরেবান্বপদ্যত॥"

৪৫-৬৫, সভাপর্ব্ব।

জয়াভিমানী মদোদ্ধত সুবলতনয় 'এই ত জিতিলাম' এই বলিয়া সেই অক্ষ সকল পুনরায় গ্রহণ করিল। টীকাকার জিতকাশী অর্থে জয়শোভী করিয়াছেন।

টীকাকার দীপ্তি পায় অর্থে কাশ্ ধাতু হইতে কাশী কথা নিষ্পন্ন করিয়াছেন, কিন্তু কাশী কথার যে অন্য অর্থ হয়, তাহা সহজেই বলা যায়। স্থানান্তরে লিখিত আছে:—

"ততো নির্যায় স্বপুরাৎ কুম্ভকর্ণঃ সহানুগঃ।
অপশ্যৎ কপিসৈন্যং তজ্জিতকাশ্যগ্রতঃ স্থিতম্॥"

১-২৮৬, বনপর্ব্ব।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনন্তর কুম্ভকর্ণ অনুচরবর্গের সহিত নিজপুর হইতে নির্গত হইয়া দেখিল, সেই সমরবিজয়ী কপি-সৈন্য অগ্রে অবস্থিত রহিয়াছে।

এ স্থলে অনুবাদক জিতকাশী শব্দের অর্থে সমরবিজয়ী করিয়াছেন ও টীকাকার দৃঢ়মুষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু এই অর্থ করিতে টীকাকারকে বৈদিক ব্যাকরণের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

আরও এক স্থলে জিতকাশী কথার উল্লেখ আছে, শ্রীকৃষ্ণ শাল্ব অসুরকে বিনাশ করিতে যাইতেছিলেন,—

"প্রয়াতোঽস্মি নরব্যাঘ্র বলেন মহতা বৃতঃ।
ক্লৃপ্তেন চতুরঙ্গেন যুক্তেন জিতকাশিনা॥"

১৪-২০, বনপর্ব্ব।

তিনি যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন, সংযত কাশীদেশজয়ী প্রসিদ্ধ নিয়মিত চতুরঙ্গযুক্ত মহৎ সৈন্য সমভিব্যাহারে যাত্রা করিলাম।

এ স্থলে অনুবাদক জিতকাশী শব্দের অর্থ কাশীজয়ী ও টীকাকার জয়শোভী এই দুই অর্থ করিয়াছেন।

জিতকাশিনা—জয়শোভিনা, কিন্তু তিনি আরও এক অর্থ দিতেছেন। 'জিতাঃ কাশয়ো দেশবিশেষা যেনেতি বা' অর্থাৎ কাশীদেশজয়ী।

এই যে নানা স্থানে কাশী কথার উল্লেখ হইল, ইহা কি স্বনামখ্যাত কাশীদেশ অথবা এই কাশী কথার পশ্চাতে কোন প্রকার রহস্য আছে?

আমাদের ইতিহাসে কাশী হইল বৈদিকধর্ম্মের কেন্দ্রস্থল। পরে দেখিব, প্রধানতঃ কাশীর জন্য বৈদিকধর্ম্ম রক্ষা পাইয়াছে। আর একখানি গ্রন্থের সাহায্য লইলে বৈদিকধর্ম্ম রক্ষা করিতে কাশীর স্থান কিছু বুঝিতে পারা যায়। প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক মহাভারত লিখিবার অনেক পরে লিখিত হয়, উহার অভিনয়স্থান হইল কাশী।

উহা কোন্ সময়ের কাশী, গ্রন্থমধ্যে তাহারও কোন পরিচয় নাই। তথাপি হিন্দুধর্ম্ম-জগতে কাশীর কি স্থান, তাহা বুঝিবার নিমিত্ত ঐ গ্রন্থ হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যায়। নিম্নে প্রবোধচন্দ্রোদয় হইতে কিয়দংশ মূল ও অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। উদ্ধৃত অংশ অতি দীর্ঘ হইলেও উহা পড়িবার বিশেষ উপযুক্ত। যে মহাবিপদ হইতে বৈদিক ধর্ম্ম রক্ষা পাইয়াছে, সে মহাবিপদ সম্বন্ধে আমরা কিছু জানি না বলিলেও চলে, অথচ আমাদের দেশের বর্ত্তমান ইতিহাস সেই ভয়ঙ্কর প্রলয়ের ফল। নিম্নে উদ্ধৃত অংশ হইতে আমরা দেশের প্রকৃত ইতিহাস কিছু বুঝিতে পারিব এবং ইহা বুঝিলে দেশমধ্যে কি প্রকার বিপ্লব চলিতেছিল, তাহারও কিছু ইঙ্গিত পাইব ও সেই সঙ্গে মহাভারত যে কি প্রকার গ্রন্থ, তাহারও প্রকৃত পরিচয় পাইব।

দম্ভ।—

"তত্র পৃথিব্যাং পরমং মুক্তিক্ষেত্রং বারাণসী নাম নগরী তত্রবাং-স্তত্র গত্বা চতুর্ণামপ্যাশ্রমানাং নিঃশ্রেয়সবিদ্যায় প্রযততামিতি। তদিদানীং বশীকৃতভূয়িষ্ঠা ময়া বারাণসী নাম নগরী,সম্পাদিত-নির্দ্দিষ্টশ্চ স্বামিনো যথা নির্দ্দেশঃ,তথাহি মদধিষ্ঠিতৈরিদানীম্—

বেশ্যাবেশ্মসু সীধুগন্ধিললনাবক্ত্রাসবামোদিতৈ-
র্নীত্বা নির্ভরমন্মথোৎসবরসৈরুন্নিদ্রচন্দ্রাঃ ক্ষপাঃ।
সর্ব্বজ্ঞা ইতি দীক্ষিতা ইতি চিরাৎ প্রাপ্তাগ্নিহোত্রা ইতি
ব্রহ্মজ্ঞা ইতি তাপসা ইতি দিবা ধূর্ত্তৈর্জ্জগদ্ বঞ্চ্যতে॥"

২য় অঙ্ক প্রবোধচন্দ্রোদয়।

দম্ভ বলিতেছে—"পৃথিবীর সকল তীর্থের উৎকৃষ্ট মুক্তি-ক্ষেত্র বারাণসী নগরীতে গমন করিয়া ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু এই চারি আশ্রমীর মুক্তিবিঘ্নের নিমিত্ত যত্ন কর। আমি মহারাজের আজ্ঞা অনুসারে বারাণসীতে আগমন করিয়া এই নগরী বিশিষ্টরূপে শাসিত করিয়াছি। আমার শাসিত জনগণ এখন ধূর্ত্ততা আশ্রয় করিয়া রজনী-যোগে বেশ্যালয়ে মদ্যপানে মত্ত ও নিরন্তর বারাঙ্গনা-সেবনে উন্মত্ত থাকিয়া সমস্ত রজনী যাপন করিয়া দিবাভাগে আমরা সর্ব্বজ্ঞ, আমরা দীক্ষিত, আমরা চির-অগ্নিহোত্রী, আমরা তপস্বী, আমরা ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া পরিচয় দিয়া জগৎকে বঞ্চিত ও প্রতারিত করিতেছে।"

তাহার পরই অহঙ্কার কাশীতে প্রবেশ করিয়া বলিতেছে।

অহং। অহো! মূর্খবহুলং জগৎ। তথা হি—

নৈবাশ্রাবি গুরোর্ম্মতং ন বিদিতং তৌতাতিকং দর্শনং
তত্ত্বং জ্ঞাতমহো! ন সালিকগিরাং বাচস্পতেঃ কা কথা।
সূক্তং নৈব মহোদধেরধিগতং মাহাব্রতী নেক্ষিতা
সূক্ষ্মা বস্তুবিচারণা নৃ-পশুভিঃ স্বস্থৈঃ কথং স্থীয়তে॥

(বিলোক্য) এতে তাবদর্থাবধারণবিধুরাঃ স্বাধ্যায়া-ধ্যয়নমাত্রনিরতা বেদবিপ্লাবকা এব। (পুনরন্যতো গত্বা) এতে চ ভিক্ষামাত্রার্থং গৃহীতযতিব্রতা মুণ্ডিতমুণ্ডাঃ পণ্ডিতম্মন্যা বেদান্তশাস্ত্রং ব্যাকুলয়ন্তি। (বিহস্য)

প্রত্যক্ষাদি-প্রমাসিদ্ধ-বিরুদ্ধার্থাভিধায়িনঃ।
বেদান্তা যদি শাস্ত্রাণি বৌদ্ধৈঃ কিমপরাধ্যতে॥

তদেতৈঃ সহ বাক্প্রণমপি গুরুতরদুরিতোদয়ায়। (পুনরন্যতো গত্বা) এতে চ শৈবপাশুপতাদয়ো দুরভ্যস্তাক্ষ-পাদমতাঃ পশবঃ পাষণ্ডা এবামীষাং সন্দর্শনাদপি নরা নরকং প্রয়ান্তি, তদেতে দর্শনপথাদ্দূরং পরিহরণীয়াঃ।

(পুনরন্যতো গত্বা)

এতে চ

গঙ্গাতীরতরঙ্গসঙ্গতশীলা বিন্যস্তভাস্বদ্বৃষী-
সংবিষ্টাঃ কুশমুষ্টিমণ্ডিতমহাদণ্ডাঃ করণ্ডোজ্জ্বলাঃ।
পর্য্যায়গ্রথিতাক্ষসূত্রবলয়প্রত্যেকবীজগ্রহ-
ব্যগ্রাগ্রাঙ্গুলয়ো হরন্তি ধনিনাং বিত্তান্যহো দাম্ভিকাঃ॥

(পুনরন্যতো গত্বা) এতে চ ত্রিদণ্ডোপজীবিনো দ্বৈতা-দ্বৈতমার্গপরিভ্রষ্টা ভ্রান্তা এব। (পুনরন্যতো গত্বা) অয়ে! কস্যেদং দ্বারোপান্ত-নিখাতাতি-প্রাংশুবংশকাণ্ডতাণ্ডবিত-ধৌতসিত-সূক্ষ্মাম্বর-সহস্রমিতস্ততো বিন্যস্তকৃষ্ণাজিন-দৃশদুপল-চমসোদূখল-মুষলমনবরত--হুতাজ্যাগ্নিধূম--শ্যামলিত--গগন-মণ্ডলমমরসরিতো নাতিদূরে বিভাত্যাশ্রমপদম্। নূনমিদং কস্যাপি গৃহমেধিনো গৃহং ভবিষ্যতি। তদ্ভবতু যুক্তমিদমস্মাক-মতিপবিত্রমেতদ্দ্বিত্রিদিবসনিবাসায় স্থানম্।

(ইতি প্রবেশং নাটয়তি)

(বিলোক্য) অয়ে!

মৃদ্বিন্দুলাঞ্ছিত-ললাটভুজোদরোরঃ-
কণ্ঠৌষ্ঠপৃষ্ঠ-চিবুকোরু-কপোল-জানুঃ।

চূড়াগ্র কর্ণকটিপাণি-বিরাজমান-দর্ভাঙ্কুর
স্ফুরিত মূর্ত্ত ইবৈষ দম্ভঃ ॥
তদ্ভবতূপসর্পামি তাবদেনম্।

অহঙ্কার। কি আশ্চর্য্য। জগতের প্রায় সকল লোকই মূর্খ। যে হেতু, এই নরদেহধারী পশুরা গুরু প্রভাকর মীমাংসকের মত শ্রবণ করে নাই। তুতাত ভট্ট-কৃত ন্যায়-দর্শন জানে না. বাচস্পতি-বাক্যের তাৎপর্য্যজ্ঞানের কথা দূরে থাকুক, সালিক নামক গ্রন্থকারের বাক্যের তত্ত্বও অবগত নহে; মহোদধি নামক দর্শন জানে না, যজ্ঞ-মীমাংসা দেখে নাই। এই সকল শাস্ত্রজ্ঞান ব্যতিরেকে বস্তুর তত্ত্ব-নিরূপণ হইতে পারে না; অতএব ইহারা কিরূপে সুস্থ-চিত্তে কালযাপন করিতেছে, বলিতে পারি না। (এক দিকে দৃষ্টি করিয়া) এই যে লোক সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছে, সে সকল কেবল অধ্যয়নমাত্র, শাস্ত্রের অর্থাবধারণ করিতেছে না, বেদের বিপ্লব ঘটাইতেছে। অর্থোপার্জ্জন করিবে বলিয়াই ঐরূপ করিতেছে। (স্থানান্তরে গমন করিয়া) অরে! ইহারা ভিক্ষালাভের নিমিত্ত যতিব্রত ধারণ পূর্ব্বক মস্তক মুণ্ডিত করিয়া ও আপনাদিগকে জ্ঞানী জ্ঞান করিয়া বেদান্তশাস্ত্রকে ব্যাকুলিত করিতেছে। (হাস্য করিয়া) প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই চারি প্রমাণ দ্বারা যাহার জ্ঞান সিদ্ধ হয়, তাহার বিপরীতার্থবাদী বেদান্ত যদি শাস্ত্রপদবাচ্য, তবে বৌদ্ধশাস্ত্রের অপরাধ কি? কেন আমরা তাহাকে নাস্তিক গ্রন্থ বলিয়া নিন্দা করি? সে যাহা হউক, উহাদের সহিত বাক্যালাপেও গুরু পাপের স্পর্শ হয়। অতএব এ স্থানে না থাকাই মঙ্গল। (অন্যত্র গমন করিয়া) এই শৈব-পাশুপতাদি পশুরা অক্ষপাদের মত কষ্টেস্থষ্টে অভ্যাস করিয়া পাষণ্ড হইয়াছে। ইহাদের মুখাবলোকনে লোক নিরয়গামী হয়। অতএব ইহাদের দৃষ্টিপথ পরিত্যাগ করাই উচিত। (স্থানান্তরে গমন করিয়া) ওহে! ইহাদিগকে যে নিতান্ত দাম্ভিক দেখিতেছি, দিবাভাগে প্রতিগ্রহ দ্বারা, রাত্রিতে চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ধনিগণের ধন হরণ করাই ইহাদের নিত্যব্রত। ইঁহারা যে গঙ্গাতীরে তরঙ্গ-সঙ্গত শিলাতলে কুশাসন পাতিয়া উপবিষ্ট আছেন, ইঁহাদিগের দণ্ড যে কুশমুষ্টি দ্বারা সুশোভিত রহিয়াছে, ইঁহাদের সম্মুখে যে সুন্দর কমণ্ডলু বিদ্যমান আছে, ইঁহারা যে অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা জপমালার বীজগুলি এক একটি করিয়া স্পর্শ করিতেছেন, সে কেবল ধার্ম্মিকতার ভাণ ও ধন হরণের সদুপায়। (অন্য স্থানে গমন করিয়া) ইহারা ত নিতান্ত ভ্রান্ত, যজ্ঞসূত্রমাত্র ইহাদিগের জীবনোপায়, ইহারা দ্বৈত ও অদ্বৈত এই উভয় মার্গ হইতে পরিভ্রষ্ট। (কিঞ্চিৎ গমন করিয়া) ওহে! ঐ গঙ্গার অনতিদূরে ও কাহার আশ্রম? বোধ হয়, উহা কোনও গৃহস্থের গৃহ হইবে। কারণ, উহার দ্বারদেশে প্রোথিত অত্যুচ্চ বংশদণ্ডে সূক্ষ্ম শুভ্র ধৌত বস্ত্র সকল আন্দোলিত হইতেছে, স্থানে স্থানে উপবেশনার্থ মৃগচর্ম্ম, শিলা ও প্রস্তর সকল বিন্যস্ত রহিয়াছে, চমস, উদূখল, মুষল প্রভৃতি যজ্ঞপাত্র সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখা যাইতেছে, অগ্নিতে অনবরত আজ্যাহুতি প্রদান করায় তাহার ধুমে গগনমণ্ডল শ্যামবর্ণ হইয়া রহিয়াছে; অতএব ঐ পবিত্র স্থানে দুই তিন দিবস অবস্থিতি করা বিধেয়। (অবলোকন করিয়া) ওহে! ইনি কে? ইঁহাকে যে মূর্ত্তিমান্ দম্ভের মত দেখিতেছি। ইঁহার ললাট, বাহু, উদর, বক্ষঃস্থল, কণ্ঠ, ওষ্ঠ, পৃষ্ঠ, চিবুক, উরু, গণ্ড ও জানু মৃত্তিকা-তিলকে এবং কেশাগ্র, কর্ণচ্ছিদ্র, কটিদেশ ও হস্ত কুশাঙ্কুরে শোভিত হইয়াছে। তাহা হউক, ইঁহার নিকটে ত যাই।

শ্রীকৃষ্ণমিশ্র প্রণীত প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক হইতে উপরের দীর্ঘ অংশ উদ্ধৃত হইল। লেখককে আধুনিক বলিলে বলা যায়। নাটকমধ্যে তুরস্ক দেশ নামের উল্লেখ আছে। দম্ভের পিতামহ অহঙ্কারের বাস লেখক দক্ষিণ-রাঢ়ে ভাগীরথীতীরে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। প্রবোধচন্দ্রোদয়ের অভিনয়স্থল হইল বারাণসী। এ স্থলে বলা প্রয়োজন, কাশী হইল দেশ, বারাণসী হইল পুরী বা নগর। কোন্ সময় লক্ষ্য করিয়া প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক-প্রণেতা বারাণসী পুরীর এই চিত্র আঁকিয়াছিলেন, তাহা বলা যায় না। তবে ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক মত লইয়া দেশমধ্যে ঘোর বিপ্লব চলিতেছিল এবং বারাণসী এই বিপ্লবের কেন্দ্রস্থল ছিল। দার্শনিক মতগুলি যে কেবল বিচারের বিষয় ছিল, তাহা নহে, ভিন্ন ভিন্ন মত যাঁহারা অনুসরণ করিতেন, তাঁহাদের ভিতর ভিন্ন সম্প্রদায়ও গঠিত হইয়াছিল, চতুরাশ্রম তখনও প্রচলিত ছিল, গৃহস্থ-আশ্রম যজ্ঞপ্রধান ছিল; তবে নানা

সম্প্রদায় সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবেশ করিয়াছিল। দেশমধ্যে দার্শনিক মত লইয়া, সম্প্রদায় লইয়া, ধর্ম্মপন্থা লইয়া, যজ্ঞ লইয়া, আশ্রম লইয়া আত্মবিচ্ছেদের অসংখ্য পন্থা গঠিত হইতেছিল। মহাভারতের সময়ে দেশের অবস্থা বুঝিবার সময়ে এই ভাবই দেখিতে পাইব।

উপরে লিখিয়াছি, মতবিরোধ ও ধর্ম্মবিরোধের কাশী ছিল প্রধান রঙ্গভূমি; তাহা হইলে আমরা এখন বুঝিতে পারি, যখন যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে হারিলেন, তখন কবি শকুনিকে কেন জিত-কাশী বলিলেন। চার্ব্বাকমতাবলম্বিগণ চিরদিন যজ্ঞের নিন্দা করিত। ধর্ম্মের পুত্র যুধিষ্ঠির যজ্ঞাভিমানিনী দেবতা দ্রৌপদীকে হারিলেন অর্থাৎ বেদের যজ্ঞকাণ্ডসমর্থনকারীদিগের হার হইল, ইহা চার্ব্বাকমতাবলম্বীদিগের বিশেষ উল্লাসের বিষয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি, কুশ-কাশ-উপলক্ষিত যজ্ঞ ও কাশী ইহাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। যজ্ঞকাণ্ডের পরাজয় ও কাশীজয় একই কথা।

মার্কণ্ডেয় কুম্ভকর্ণের নিজ পুর হইতে যুদ্ধযাত্রা বর্ণনা করিতে বলিয়াছিলেন, সমরবিজয়ী কপি-সৈন্য। এ স্থলে জিতকাশী অর্থে অনুবাদক সমরবিজয়ী করিয়াছেন। এইরূপ করিবার কারণ বুঝিতে পারা যায় না; জিতকাশী অর্থে কাশীজয়ী হইতে পারে, সমর কথার স্থান দেখিতে পাওয়া যায় না। কাশী অর্থে যদি কাশী দেশ করা যায়, তাহা হইলেও কতকটা অর্থ হয়; কিন্তু বানরেরা কখন কাশী দেশ জয় করিয়াছিল, তাহার কোথাও উল্লেখ নাই। বলা বাহুল্য, কপি অর্থে বানর নয়, এই কথার অর্থ ধর্ম্ম। তাহা হইলে এ স্থলে আমরা বোধ হয় প্রকৃত ইতিহাসের একটু ইঙ্গিত পাই; ধর্ম্ম অর্থাৎ বৈদিক ধর্ম্ম কাশীতে প্রতিষ্ঠিত হইবার যেন একটু আভাস আইসে। টীকাকার জিতকাশী অর্থে দৃঢ়মুষ্টি করিয়াছেন। উপরে দেখিয়াছি, এইরূপ করিতে তিনি বৈদিক যাস্কের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। কেন এরূপ করিলেন, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় না, কারণ, তিনি 'কাশয়ো দেশবিশেষা' নিজেই লিখিয়াছেন। যে দিন কুম্ভকর্ণ ঐ ভাবে অভিযান করিতেছিল, সেই দিন যুদ্ধে রামচন্দ্র ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা তাহাকে নিহত করেন। অর্থাৎ বেদরূপ অস্ত্র দ্বারা জ্ঞান ও তাঁহার সহায় ধর্ম্ম কৌশিকী শ্রুতিকে অর্থাৎ নাস্তিক মতকে খণ্ডন করে।

শ্রীকৃষ্ণ যখন শাল্ব অসুরকে বিনাশ করিতে যাইতেছিলেন, তখনও তিনি কাশীদেশজয়ী প্রবল সেনার সহিত যাত্রা করেন। এ স্থলে শ্রীকৃষ্ণের সৈন্য কাশী জয় করিয়াছিল অর্থাৎ কাশীতে ব্রহ্মাদ্বৈতবাদ স্থাপিত অথবা বৈষ্ণব মত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের রথের একটি অশ্বের নাম ছিল শৈব্য, আর একটির নাম ছিল সুগ্রীব। প্রথম নামটির সহিত শিব কথার সম্বন্ধ স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, সুগ্রীব কথায় রাবণের দশ গ্রীবা ও কু-রব এই উভয়েরই সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের কাশীজয় কি প্রকার, কবি আর এক স্থলে তাহার ইঙ্গিত দিয়াছেন।

"অয়ং কপাটেন জঘান পাণ্ড্যং তথা কলিঙ্গান্ দন্তকুরে মমর্দ্দ।
অনেন দগ্ধা বর্ষপূগান্ বিনাথা বারাণসী নগরী সংবভূব ॥"

৭৬-৪৮, উদ্যোগপর্ব্ব।

ইনি বক্ষস্তটের আঘাত দ্বারা পাণ্ড্যরাজকে নিহত এবং দন্তকুর-সমরে কলিঙ্গদিগকে মর্দ্দিত করিয়াছিলেন। ইঁহা কর্ত্তৃক দগ্ধ হইয়া বারাণসী নগরী বহু বর্ষ পর্য্যন্ত রাজশূন্যা ছিল।

এ স্থলে বারাণসী নগরী দগ্ধ ও রাজশূন্যা হইয়াছিল। দগ্ধ কথার অর্থ পরে দেখিব, কথাগুলির সহজ অর্থ কাশীতে বৈদিক মত স্থাপিত হইয়াছিল ও তথা হইতে ক্ষাত্র অর্থাৎ বৌদ্ধমত দূরীকৃত হইয়াছিল।

এখন জিতকাশী শব্দের অর্থ বুঝিবার চেষ্টা হইতে নিরস্ত হওয়া যাক্। পাণ্ডবদিগের হার হইল, দ্রৌপদী দাসী হইলেন। কবি শকুনিকে জিতকাশী বলিলেন; ধৃতরাষ্ট্রের ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিত হইল, আবার আর এক দিন আসিবে, যখন পাণ্ডবরা জিতকাশী হইবে। সে কথা পরে দেখিব।

আর একটি কথা অবশিষ্ট রহিল; দুর্য্যোধন কল্পনার মূল কি? দুর্য্যোধন ও যুধিষ্ঠির এই উভয় শব্দই যুধ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে; এই যুধ্ কথার তাৎপর্য্য কি? সর্ব্বে যুদ্ধার্থাঃ শব্দাঃ যজ্ঞার্থাশ্চ ইতি যাস্কঃ। সকল যুদ্ধার্থ শব্দ যজ্ঞার্থক। ধৃতরাষ্ট্রের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুত্রের নামের সহিত যজ্ঞ সম্বন্ধে দোষ বা হীনতার স্পষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে।

দুর্য্যোধন কল্পনার কি মূল? সে সম্বন্ধে কবি পরিষ্কার ইঙ্গিত দিয়াছেন। যখন দুর্য্যোধনের জন্ম হইল, তখনই

চতুর্দ্দিকে কু—রব ধ্বনি শব্দিত হইল; শ্লোকটি পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি।

"স জাতমাত্র এবাথ ধৃতরাষ্ট্রসুতো নৃপ।"
২৭-১১৫, আদিপর্ব্ব।

"রাসভারাবসদৃশং রুরাব চ ননাদ চ।
তং খরাঃ প্রত্যভাষন্ত গৃধ্রগোমায়ুবায়সাঃ॥"
২৮-১১৫, আদিপর্ব্ব।

হে নৃপ! দুর্য্যোধন জন্ম পরিগ্রহ করিয়াই গর্দ্দভ সদৃশ শব্দ ও চীৎকার করিতে লাগিল; তাহা শুনিয়া গর্দ্দভ, গৃধ্র, শৃগাল ও বায়সগণ প্রতিশব্দ করিতে লাগিল।

এ স্থলে তাঁহার জন্মের সহিত কু-রবের বাহুল্য দেখিতে পাওয়া গেল, কি প্রকার কু-রব, তাহারও ইঙ্গিত শীঘ্রই পাইব।

উরু ভগ্ন হইয়া কুরুক্ষেত্রে দুর্য্যোধন পড়িয়া আছেন, তখন ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য সকলেই নিহত হইয়াছেন; আত্মীয়, স্বজন, মিত্র, সুহৃৎ সকলেরই মৃত্যু হইয়াছে, ভগিনী-পতি জয়দ্রথ, নিজপুত্র লক্ষ্মণ হত হইয়াছে। একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছে; একাকী অসহায় অবস্থায় তখন দুর্য্যোধন ভগ্ন-উরু হইয়া কুরুক্ষেত্রে মৃত্যু অপেক্ষা করিতেছেন, এ অবস্থায় সঞ্জয়ের নিকট বিলাপ করিতে করিতে বলিতেছেন,—

"যদি জানাতি চার্ব্বাকঃ পরিব্রাড়্ বাগ্বিশারদঃ।
করিষ্যতি মহাভাগো ধ্রুবং সোঽপচিতিং মম॥"
৩৮-৬৪, শল্যপর্ব্ব।

বাক্যবিশারদ পরিব্রাট্ চার্ব্বাক যদি আমার এ অবস্থা জানিতে পারেন, তবে অবশ্যই তিনি আমার বৈরনির্য্যাতন করিবেন।

দুর্য্যোধন কল্পনার সম্বন্ধে আলোচনা পুনরায় পরে করিব।

[ ক্রমশঃ।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ( কর্ণেল )।

---

# উড়িষ্যার বঙ্গবিজয়

বাঙ্গালী, কি কর্‌ছ ব'সে—হয়ে এমন বুদ্ধিহারা?
বাঙ্গালা দেশ যে ক'ল্লে বিজয় 'রঘুয়া' ও 'নিধিয়া'রা!
পাণ-ওয়ালা বল্‌ছে এবার পাণের ক্রেতা ভোক্তারে—
"দিব বল কোন্ সে পাণে—সাদা কিংবা দোক্তারে?"
'গুণ্ডি'র ছিল মৌরসি বাস 'দাসো'দিগের বটুয়াতে
জর্দ্দা এবং সুর্ত্তিরূপে মূর্ত্তিবদল পটু হাতে।
দোক্তা বিনা হয় না রুচি পাণ-বিলাসীর তাম্বূলে,
উড়ের ধরণ কর্‌লে বরণ বাংলা দেশের নাম ভুলে!
গ্রীবা এবং জুল্পি হ'তে ক'ল্লে সাবাড় চুলগুলি,
সজ্জা এবার 'টেরিকাটা' ঝুঁটিওলা বুল্‌বুলি!
উৎকলীদের 'চটা' আজি বিঁড়িরূপে সুপ্রচার,
হুকা এবং আলবোলাদের বনেদি মান রয় না আর।
ভাত না পেয়ে খাচ্ছি 'পখাল' উদর-জ্বালা নিবন্ধন—
তিন্তিড়ী ও লঙ্কাযোগে—উড়ের যাত্রা চিরন্তন!
রান্নাঘরের লক্ষ্মীর আসন উড়ে 'ব্রহ্ম' কর্‌লে দখল;
পাণের পিক আর সর্দ্দি খাম নাচার হয়ে গিল্‌ছি সকল!
জলও দিচ্ছে উড়ে বাহক—অন্ন-জলের ভাণ্ডারী গো!
তীর্থযাত্রার পাণ্ডারূপে ভবার্ণবের কাণ্ডারী গো!
মালঞ্চে সে ফুলের মালিক,—প্রিয়ায় আনে স্কন্ধে বহি;—
দুল্‌কি তালে পাল্কী চলে বিরহিপ্রাণ ছন্দে মোহি'!
উড়ে মুটে বটুয়া এঁটে কোমরেতে মোটটি তোলে,
বঙ্গের যোয়ান টেরি কেটে, মুচকি হাসে ঠোঁটটি খোলে।
'বাঙ্গালী জাত মার্‌ছে' ব'লে জগন্নাথে ডাকৃত যা'রা,—
বাঙ্গালীদের 'বাঙ্গালীত্ব' রাখল না আর আস্ত তা'রা!
উড়ে বস্‌লো বাংলা যুড়ে;—কর্‌ছি ফাঁকা তর্ক খালি!
ভাত জাত দু-ই নিচ্ছে কেড়ে—কোথায় আছ রক্ষ কালী!

শ্রীমহেন্দ্রনাথ করণ।

# ভুল বোঝা

প্রায় সন্ধ্যা। পশ্চিম আকাশে রঙ্গের খেলা একরকম শেষ হইয়া আসিয়াছে; কেবল তাহারই একটু ক্ষীণ আভা দূর দিগন্তে ফুটিয়া রহিয়াছে। সন্ধ্যা-বাতাস পরপারে শালের বনে ঝুরু-ঝুরু ফুল ঝরাইয়া, পাতা কাঁপাইয়া বহিয়া যাইতেছে। চারিদিক্ শান্ত নীরব। কেবল কয়েকটা পাখীর অশ্রান্ত কলকাকলীর সঙ্গে দূর কুলী-ধাওড়া হইতে একটা বাঁশীর মিষ্ট সুর ভাসিয়া আসিতেছিল।

মণিয়া নদীর জলে গা ধুইতে আসিয়াছিল। পাথরের কোল ঘেঁসিয়া ছোট নদীটির ক্ষীণ স্রোতোধারা যেখান দিয়া কল্‌কল্ ছল্‌ছল্ শব্দে নাচিয়া যায়, সেইখানটায় গা মুক্ত করিয়া দিয়া সে নদীর শীতল জলে কোমর অবধি ডুবাইয়া বসিয়া ছিল; জল লইয়া খেলা করিতেছিল,—পাথরের উপর ছিটাইতেছিল, কখনও বা নিজের গায়ে ছড়াইতেছিল। প্রকৃতি-মায়ের স্নেহদুলালী সে, প্রকৃতিরাণী নিজের মেয়েটিরই মত সযত্নে তাহার সুচিক্কণ দেহলতাকে যৌবনের প্রাচুর্য্যে ভরিয়া তুলিয়াছিলেন, কোথায়ও তিলমাত্র বঞ্চিত করেন নাই। গায়ের রং কালো হইলেও, পরিপূর্ণ যৌবনশ্রীতে তাহার সমস্ত দেহখানি উদ্ভাসিত হইয়াছিল। নিটোল মুখখানি এক অপরূপ লাবণ্যশ্রীতে সর্ব্বদাই ভরিয়া থাকিত, কৃষ্ণতার চক্ষু দুইটি হইতে হাসিরাশি যেন সব সময়েই ঠিক্‌রাইয়া পড়িত। বাস্তবিক মণিয়াকে তাহার অটুট স্বাস্থ্য, নিটোল গড়ন, সর্ব্বোপরি তাহার স্ফুট যৌবনশ্রীর উপর তরুণী নারীর কোমলতাটুকুতে সুনিপুণ শিল্পীর হাতে কোদাই করা কাল পাথরের মূর্ত্তিটিরই মত সুন্দর শোভন দেখাইত। তাহার দেহের প্রতি ভঙ্গীতে এমন একটা মাধুর্য্য ফুটিয়া উঠিত যে, সবাই অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকিত।

মণিয়া আন্‌মনে বসিয়া বাঁশী শুনিতেছিল। সে বাঁশীর সুর যে তাহার চির-পরিচিত। নানকু এতক্ষণে বাড়ী আসিয়াছে, তাহার পথ চাহিয়া আছে,—দেরী দেখিয়া বাঁশী বাজাইতেছে। মণিয়া তাড়াতাড়ি গা-মাজা শেষ করিতে লাগিল। শুনিতে শুনিতে বাঁশী বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, এবার সে নিজেই আপন মনে বাঁশীর শেষ তানটুকু ধরিয়া গুণ গুণ করিতে আরম্ভ করিল। সে নিজেকে লইয়াই এমন তন্ময় হইয়াছিল যে, পাশের উঁচু পাথরের আড়াল হইতে যে আর এক জোড়া তরুণ চোখের তীব্র লুব্ধ দৃষ্টি ক্ষুধিত শার্দ্দূলের মত তাহার অর্দ্ধ-অনাবৃত দেহের প্রতি চাহিয়া আছে, সে তাহা কল্পনায়ও আনিতে পারে নাই। মণিয়া অসঙ্কোচে গা-মাজা শেষ করিতে লাগিল। গা ধুইয়া সে সবেমাত্র উঠি উঠি করিতেছে, হঠাৎ পিছন হইতে মৃদুকণ্ঠে কে ডাকিল, "মণিয়া!"—মণিয়া প্রথমটা চকিতা হইয়া উঠিয়াছিল, ত্রস্তে নগ্ন বুকের উপর বসন টানিয়া দিতে দিতে বিস্মিতভাবে বলিল, 'ছোটকু!'—পরক্ষণেই তাহার লোলুপ-দৃষ্টির দিকে চাহিয়া রাগ দেখাইয়া বলিল, "তুই হেথাকে কেনে রে?"

ছোট্‌কু দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া হাসিতেছিল, কোনও উত্তর দিল না। মণিয়া আরও চটিয়া গেল; আর কোন কথা না বলিয়া, পাশের জলভরা কলসীটাকে কাঁখে তুলিয়া লইয়া যাইবার জন্য পা বাড়াইল। সে চলিয়া যায় দেখিয়া ছোট্‌কু আবার ডাক দিল। মণিয়া ঘুরিয়া বলিল, "কেনে রে?—ঝট্ বল্, আমার এখন রিণধ্‌তে হবেক।"

ছোট্‌কু একটু চুপ থাকিয়া বলিল,—"আমি কোথাকে গিছলাম জানিস্?"

মণিয়া কুতূহলী হইয়া বলিল, "না—আমি কেমন ক'রে জানব রে?"

'ঐ হোথাকে, ওই পারে।'—ছোট্‌কু দূরের পাহাড়টার দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া দিল।

মণিয়া বিস্মিতা হইয়া বলিল, "অত ধুরে!—কেনে?"

তাহাকে বিস্মিতা হইতে দেখিয়া ছোট্‌কু মনে মনে আনন্দ বোধ করিতেছিল; একটু হাসিয়া বলিল, "কেনে

কি রে? টাকা আন্‌তে হবেক না? এত্ত টাকা লিয়ে এসেছি।”—ছোট্‌কু ছুই হাত অঞ্জলি করিয়া দেখাইল।

মণিয়া কালো চোখ ছুইটি বড় বড় করিয়া বলিল, ‘এত্তো!—কি হবেক রে?”

“তোকে দেবো, তু লিবি?”

মণিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, “খুব ত! তোর টাকা আমি লিতে যাব কেনে রে?”

“লিবি না?”

“না।”—ছোটকুর আরও কিছু তখন বলিবার ছিল, কিন্তু মণিয়ার দৃঢ়স্বরের কাছে চুপ করিয়া গেল। মণিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিতেছিল; ছোটকুর মুখে কোন রা না পাইয়া বিরক্ত হইয়া বলিল, “লে, কিছু থাকে ত ঝট্ বল্, বড় জাড় লাগছেক্।”

ছোটকু এবার মুখ তুলিয়া করুণ-দৃষ্টিতে চাহিল। একটু চুপ থাকিয়া বলিল, “মণিয়া! চল্ না আমরা পাঁলাই যাই।”

মণিয়া বিস্মিতা হইয়া বলিল, “আ মর্! তোর সাথে কোথাকে ভাগব রে! নানকু নাই না কি?”

“চল্ না, ওই সুন্দর গাঁকে পাঁলাই যাই। তোর আর আমার বি’য়া হবে, লিয়ে ছু গোটা আরাম সে থাকব। আমি বহুৎ টাকা লিয়ে দেবো।”—একটু চুপ থাকিয়া বলিল, “মণিয়া! তু আমার ঘর কর্‌বি না গে?”- তাহার কালো মুখের করুণ দৃষ্টি আশা-নিরাশায় ভরিয়া উঠিল।

মণিয়া চটিতেছিল, বিরক্ত হইয়া বলিল, “তোর লাজ লাগছে নাই রে? নানকু শুন্‌লে তোর জান্ লিয়ে লিবেক, খবরদার!”

ছোটকু ঠোঁটের কোণে একটু হাসি আনিয়া চোখ টিপিয়া বলিল, “তু বল্ না, আমি নানকুকে সাবড়ে দিই।”

মণিয়ার নিটোল মুখখানি এবার রাগে লাল হইয়া উঠিল, চোখ হইতে আগুন ছুটাইয়া বলিল, “তোর মুখে আমি লাথাই দিই, জানিস? জানের ডর থাকে ত ফের বলিস্ নাই—হুঁ!”

“কি! আমাকে ডর দেখলাচ্ছিস?—আমার সাথকে হারামজাদ্‌গি!” ছোটকু মণিয়াকে ধরিবার জন্ত ঝাঁপাইয়া পড়িল। পলক ফেলিতে না ফেলিতে মণিয়াও সরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, ছোটকু ঝোঁক সামলাইতে না পারিয়া নদীর জলে পড়িয়া গেল। তাহার অবস্থা দেখিয়া মণিয়ার রাগ কোথায় উড়িয়া গিয়াছিল, খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। পরক্ষণেই ছোটকুকে ভিজা গা ঝাড়া দিয়া উঠিতে দেখিয়া আর তিলমাত্র বিলম্ব করিল না, বিদ্যুদ্‌গতিতে, কলসী কাঁখেই উঁচু পাড় বাহিয়া উপরে উঠিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। ছোটকু রাগে ফুলিতেছিল; তাহার ছুই একটি ক্রুদ্ধ স্বর মণিয়ার কানে আসিল।—‘দেখে লিব তোকে আর নানকুকে—হুঁ!’ মণিয়া আর কিছু শুনিতে পাইল না।

কিছু দূর আসিয়া মণিয়া আবার সহজ গতিতে চলিতে আরম্ভ করিল, কাঁখের কলসীটা মাথায় তুলিয়া লইয়া কাপড়টা ঠিক করিয়া লইল। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া শুক্লা চতুর্দ্দশীর শুভ্র জ্যোৎস্নায় চারিদিক্ ভরিয়া উঠিয়াছে। আশে-পাশের ঘরবাড়ী, গাছপালা, দূরে খাদের বড় বড় চিম্‌নিগুলি সমস্ত সাদা হইয়া উঠিয়া রজতধারায় ঝল্‌মল্ করিতেছে, চারিদিকে মায়াপুরীর মত বোধ হইতেছে। নানকু আবার বাঁশী বাজাইতেছিল, বাঁশীর সুরে সুরে মণিয়ারও বুকখানি দুলিয়া দুলিয়া উঠিতে লাগিল। একটা পুলকচাঞ্চল্যে সমস্ত দেহমন অধীর করিয়া লইয়া সে-ও গাহিতে গাহিতে চলিল,—

“চাঁদ করে ঝিকির-মিকির সূরয করে আলা,
কোন্ বনেতে বাঁশী বাজে ডাকে আমায় কালা রে,
ডাকে আমায় কালা ॥”

মণিয়া গান গাহিতেছিল বটে, কিন্তু অন্য দিনের মত আজ কিছুতেই তাহার মনের সহজ সরল অবস্থা ফিরাইয়া পাইল না। ধাওড়ার কাছে আসিয়া আরও গম্ভীর হইয়া পড়িল। নানকু ঘরের দাওয়ায় একটা খাটিয়া পাতিয়া বসিয়া বাঁশী বাজাইতেছিল; বাঁশী নামাইয়া স্নিগ্ধস্বরে ডাকিল, “মণিয়া!”

“হুঁ”—

“এত দেরী হ’ল কেনে রে?”

মণিয়া কোন উত্তর দিল না। বারান্দার কোণে, উনানে কয়লার আগুন গন্‌গন্ করিতেছিল; তাহারই পাশে ঘড়াটা রাখিয়া ঘরে ঢুকিয়া ভিজা কাপড় ছাড়িল, তাহার পর বাহিরে আসিয়া একটা ছোট্ট হাঁড়ি ধুইতে ধুইতে বলিল, “আগটা গন্‌গন্ করছে, ডালটা চাঁপাই দিস্ নাই কেনে?”

নানকু ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "তোর হাঁথের না হ'লে মিঠ্ লাগে না গে !"

মণিয়া ডাল চড়াইতেছিল, ঠোঁটের কোণে সলজ্জ হাসি চাপিতে চাপিতে ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিল, "ইস্—দেখিস্ রে।—"

নানকু হাসিতে লাগিল। স্বামীর সোহাগে মণিয়ারও সমস্ত অন্তরখানি ভরিয়া উঠিয়াছিল, তবুও কেন জানি সে সহজে স্বামীর হাস্যে যোগ দিতে পারিতেছিল না, ডালটা চাপাইয়া নীরবে বাটনা বাটিতে লাগিল। নানকু একটু বিস্মিত হইল,—"মণিয়া আজ এমন কেন ?"—মণিয়া বসিয়া বাটনা বাটিতেছিল, চাঁদের শুভ্র কিরণ তাহার নাকে, মুখে, হাতে, চাঁদির তাগা বাজু, খোঁপা-বাঁধা কালো চুলের উপর পড়িয়া চিক্ চিক্ করিতেছিল,—নানকু কোন কথা না বলিয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিল। মণিয়া হাতের কাষটুকু সারিয়া রান্না করিতে লাগিল, নানকু চুপ করিয়া তাহাই দেখিতে লাগিল।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া দুই জনে খাটিয়ার উপর বসিয়াছিল। মাথার উপর পূর্ণচন্দ্র সহস্রধারায় সুধা ছড়াইয়া দিয়া সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতিকে অসীম সৌন্দর্য্যে ভরিয়া তুলিয়াছিল, চাঁদের হাসিতে চারিদিক্ যেন ফাটিয়া পড়িতেছিল। মণিয়া ভাবিতেছিল, বিকালের কথাটা নানকুকে বলিবে কি না। সে যে রকম মানুষ, হয় ত ক্ষেপিয়াই যাইবে। তাহাকে তুচ্ছ একটা অপমানের কথা হইতে বাঁচাইবার জন্য সে যে প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারে, মণিয়া তাহা ভালরূপেই জানিত। তাহাকে চুপ দেখিয়া নানকুই আগে কথা কহিল, তাহার হাতের উপর হাত রাখিয়া স্নিগ্ধস্বরে বলিল, "মণিয়া, আজ তু এমন কেনে রে ?"—মণিয়া কিছু বলিতেও পারিতেছিল না, অথচ, একটা অমূলক আশঙ্কার ছায়া যেন তাহাকে বার বার চাপিয়া ধরিতেছিল; অকারণে চোখ দুইটাও জলে ভরিয়া আসিতেছিল। নানকু এবার তাহার মুখখানি তুলিয়া ধরিল, একটু বিস্মিত হইল। ব্যথিত হইয়া হাতটা টানিয়া বলিল, "কানছিস্ কেনে গে ?"—নানকুর আদরে মণিয়ার নিটোল গালের উপর কয়েক ফোঁটা অশ্রুবিন্দু গড়াইয়া পড়িয়া মুক্তাবিন্দুর মত চক্ চক্ করিতে লাগিল। একটু চুপ থাকিয়া বলিল, "আমার বড় ডর লাগছেক।"

নানকু বিস্মিত হইয়া বলিল, "ডর কিসের গে ?"

"তোর কাছকে কেউ যদি আমায় ছিনে লিয়ে যায় !"

নানকু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। পরক্ষণেই যত্ন-পালিত ক্ষুদ্র কপোত-শিশুটির মত মণিয়াকে তাহার কালো বুকের উপর টানিয়া লইয়া নিবিড়ভাবে বেষ্টন করিতে করিতে বলিল, "কে লিবেক রে পাগ্লী, তার জানের ডর নাই ?"

মণিয়া অনেকক্ষণ পরে বড় আরাম অনুভব করিতেছিল, নানকুর বুকে মাথা গুঁজিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। স্বামীর আদরে তাহার চোখের কোণের সঞ্চিত অশ্রুকণাগুলি টপ্ টপ্ ঝরিয়া পড়িতেছিল। নানকু তাহার কালো খোঁপায় গোঁজা ফুলগুলি লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ অতীত হইয়া গেল। দুই জনে সেই ভাবেই বসিয়া ছিল; ধাওড়া হইতে কোন এক শিশুর কাতর ক্রন্দনধ্বনি বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল, মণিয়া আরও ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। শিশুর ঐ ক্রন্দনধ্বনি তাহাকে সে দিনকার আর একটি কচি মুখের কথা মনে করাইয়া দিতেছিল। সে-ও অমনি কাঁদিত, কাছে গেলেই কচি দুই হাতে তাহাকে আঁকড়াইয়া ধরিত, কান্না থামাইয়া ছোট মুখখানি তাহার বুকের মধ্যে লুকাইয়া ফেলিত। অতটুকু শিশু দুই জনের মাঝে কতটা আসন জুড়িয়া বসিয়াছিল কত দিন এমনই রাতে তাহারা বসিয়া থাকিত, ক্ষুদ্র শিশুটি তাহাদের দুই জনের মাঝে খেলা করিত, একবার নানকুর কোলে, একবার মায়ের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িত, কখনও বা কৌতুকদৃষ্টি তুলিয়া দুই জনের পানে চাহিত, অকারণে মধুর হাসিয়া উঠিত,—সেই সঙ্গে মণিয়ারও সমস্ত অন্তরখানি এক অপূর্ব্ব মাতৃ-গর্ব্বে ভরিয়া উঠিত। শিশু শ্রান্ত হইয়া কাঁদিয়া উঠিলে মণিয়া তাহাকে গভীর স্নেহে বুকে চাপিয়া ধরিত, শিশুটি বুকের দুধ খাইতে খাইতে ঘুমাইয়া পড়িত। কিন্তু আজ ? —আজ সে কোথায় ? তাহার বেদনাতুর মাতৃহৃদয়ের উন্মুখ বাসনাকে পূর্ণ করিবার জন্য সে ত আর চাহিয়া থাকে না ! সে যে চিরকালের জন্য ফাঁকি দিয়া গিয়াছে। মণিয়ার বুক ঠেলিয়া কান্না বাহির হইতে লাগিল। ইচ্ছা হইতেছিল, ছুটিয়া গিয়া ঐ ক্রন্দনরত শিশুটিকে তাহার

বুকের উপর চাপিয়া ধরে, সযত্নে তাহার অশ্রু মুছাইয়া দিয়া ঘুম পাড়াইয়া আইসে।

মণিয়া কেন কাঁদিতেছিল, নানকুর তাহা বুঝিতে বাকী ছিল না। তাহারও বুকখানি ফুলিয়া উঠিতেছিল ;—একটা প্রকাণ্ড দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে নানকু গভীর সান্ত্বনার স্বরে বলিল, "পাগ্‌লী, মহাদেওজীর ফুল, লিয়ে গেছেন। তু কি তাকে রাখতে পারতিস্ গে ?"

এ সান্ত্বনার বাণী মণিয়া অনেক দিন শুনিয়াছে। কিন্তু, ব্যথাতুর মাতৃ-হৃদয় কি ইহাতে কখনও বাধা মানে ?—মণিয়া নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

সকালে আহারের পর নানকু খাদে নামিয়া গিয়াছে. সেই সন্ধ্যায় উঠিয়া আসিবে। মণিয়ার কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। কেবলই মনে হইতেছিল, কি একটা বিপদের ছায়া যেন তাহাদের চারিদিকে ঘনাইয়া আসিতেছে। অথচ, এ কথাটা সে নানকুকেও বলিতে পারিতেছিল না। ভয় হইতেছিল, নানকু যে রকম মানুষ,—হয় ত বিপদটা এ দিক্ দিয়াই আসিয়া পড়িবে। অনেকক্ষণ ভাবিয়া ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। চুপ করিয়া রহিল।

ক্রমে বেলা পড়িয়া আসিল। মণিয়া তখনও চুপ করিয়া বসিয়া ছিল ; শেষে কি ভাবিয়া উঠিয়া পড়িল। দূরের বড় বড় চিম্‌নীগুলা হইতে ধুঁয়া উঠিয়া চারিদিক কালো করিয়া তুলিতেছিল, মাঝে মাঝে খাদের ঘড়-ঘড় আওয়াজও কানে আসিয়া ঢুকিতেছিল ; মণিয়া ধাওড়ার সামনের লালমাটীর পথটা ধরিয়া চলিতে সুরু করিল, কিছু দূর গিয়া কি ভাবিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল ; তাহার পর ঘুরিয়া রাস্তায় উঠিয়া 'সাহেবের' বাংলার দিকে চলিতে আরম্ভ করিল।

বাংলায় আসিয়া মণিয়া দেখিল, 'সাহেব' তখনও ফেরে নাই। বারান্দার মেঝেতে পড়িয়া বৃদ্ধা আয়া অকাতরে নিদ্রা দিতেছে, আর তাহারই পাশে ছোট্ট একটি দোল্‌নায় কচি-কচি গোল-গাল হাত-পাগুলি ছড়াইয়া সাহেবের সদ্য মাতৃহারা শিশুকন্যাটি ঘুমাইয়া আছে—যেন জড় করা এক রাশ বেলের কুঁড়ি। যেমন রং, তেমনই নিটোল গড়ন ; কোঁকড়ানো রেশমী চুলের মাঝে কচি মুখখানি পাতার কোলে চাঁপাফুলটির মত ফুটিয়া রহিয়াছে। ঘুমের ঘোরে ক্ষুদ্র বুকখানি কাঁপিতেছে, কখনও আরক্ত ঠোঁট দুইটি নড়িয়া উঠিতেছে। মণিয়া অনিমেষ-নয়নে চাহিয়া রহিল ; কচি-কচি হাত-পা লইয়া নিজের গালে-মুখে ঠেকাইতে লাগিল, আঙ্গুরের মত কচি গাল দুইটি টিপিয়া টমাটোর মত রাঙ্গা করিয়া তুলিল। ঘুমন্ত শিশু হাতের নাড়া পাইয়া জাগিয়া উঠিয়াছিল ; নীল-নীল চোখ মেলিয়া মধুর হাসিয়া উঠিল, দুই হাতে মণিয়ার কালো আঙ্গুল জড়াইয়া ধরিল। মণিয়া এবার তাহার সন্তানহারা বুভুক্ষু মাতৃ-হৃদয়ের সঞ্চিত স্নেহরাশি উন্মুক্ত ধারায় ঢালিয়া দিল ; সযত্নে দোল্‌না হইতে তুলিয়া লইয়া, শিশুকে নিবিড় স্নেহে বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া চুমায় চুমায় তাহার সমস্ত নাক-মুখ অভিষিক্ত করিয়া তুলিল। অবোধ শিশু সুযোগ পাইয়া কচি হাতের দুই মুঠা ভরিয়া মাই খাইতে সুরু করিয়া দিয়াছিল ; শিশুকে বুকে চাপিয়া মণিয়ার দুই গাল বহিয়া অশ্রুবিন্দু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

কতক্ষণ হইবে ঠিক খেয়াল নাই, ক্ষুদ্র শিশু মাই খাইতে খাইতে আবার ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল ; মণিয়া সযত্নে তাহাকে দোল্‌নায় শোয়াইয়া দিল, কচি গালে ছোট আর একটি চুমু খাইল। হঠাৎ মুখ তুলিয়া দেখিল, সিঁড়ির উপর একটা ফুলের টবের পাশে দাঁড়াইয়া বড় সাহেব ; ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি, দৃষ্টিতে বিস্ময়ের ছায়া সুপরিস্ফুট। সাহেবের বিস্ময়-দৃষ্টির সাম্‌নে মণিয়ার মুখখানি রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছিল, একটু সলজ্জ হাসি হাসিয়া সে মুখ নত করিল। মণিয়াকে মুখ তুলিতে দেখিয়াই সাহেব নিজের কামরায় ঢুকিয়া পড়িয়াছিল, ঘরের খোলা জানালাটা দিয়া দূর আকাশের পানে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে অজ্ঞাতসারে দুই এক ফোঁটা অশ্রুবিন্দু আসিয়া চোখের কোণে টল্‌-টল্ করিতে লাগিল। আহা ! মাতৃহারা ছোট শিশুটি ; এমন প্রাণঢালা অনাবিল স্নেহ ত কখনও পায় নাই। পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া নীরবে চোখ মুছিতে লাগিল। মণিয়া দরজার সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, মৃদু কণ্ঠে ডাকিল, "সাহেব !" সাহেব মুখ ঘুরাইতেই চোখে-মুখে জলের রেখা দেখিয়া বিস্মিত, ব্যথিত দৃষ্টি তুলিয়া মণিয়া বলিল, "সাহেব, তু কানছিস্ ?" একটু চুপ থাকিয়া বলিল, "তোর কাছকে আমার একটা নালিশ আছে, কা'ল বিকালকে ছোটকু আমায় বড় দিক্ করেছেক্ ।"

সাহেবের সমস্ত মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিয়াছিল, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কি ভাবিতে লাগিল। তাহাকে চুপ দেখিয়া মণিয়া আবার বলিল, "ছোটকুকে চিনিস্ নাই? পাঁচ নম্বরের খালাসীর বড় বেটাটা—"

Bloody, Bugger! সাহেব নিজের মনেই গর্জ্জন করিয়া উঠিয়া রাগে নিজের ঠোঁট কামড়াইতে লাগিল। মণিয়ার ভারি হাসি পাইতেছিল, খিল্‌-খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। সাহেব অপ্রস্তত হইয়া নিজেকে দমন করিতে করিতে বলিল, "আচ্ছা, তুই যা।" মণিয়া আর অপেক্ষা করিল না; একবার ঘুমন্ত শিশুটির কচি মুখের দিকে চাহিয়া লইয়া বরাবর সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিল। সাহেব তাহার পশ্চাদনুসরণ করিল, ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিল, "তু এখানকে থাক্‌বি?"

মণিয়া দৃষ্টিতে মৃদু ভৎসনার রেখা আনিয়া বলিল, "তোর এখানকে থাকৃতে যাব কেনে রে? লোকে গাল দিবেক্ না?"

"এখানকে কাম করবি।"

"না, আমার আদ্‌মী আমায় কাম করতে দিবেক্ না।" মণিয়া রাস্তায় নামিয়া পড়িল। এই অশিক্ষিতা কুলী-বালিকার সরল অকৃত্রিম ব্যবহারে সাহেব যতটা বিস্মিত, ততোধিক মুগ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এক-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

মণিয়ারও অন্তরখানি আজ এক অনাবিল আনন্দোচ্ছ্বাসে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, অপূর্ণ বুকখানি যেন একটা প্রকাণ্ড তৃপ্তির নিশ্বাসে ভরিয়া উঠিয়াছিল,—যেন কি একটা হারানো জিনিষ সে আজ খুঁজিয়া পাইয়াছে। গেট পার হইয়া বাগানের বেড়া হইতে সে কতকগুলি ফুল ছিঁড়িল, কতক মাথায় গুঁজিল, কতক রাস্তায় ছড়াইতে ছড়াইতে চলিল। কিছু দূর আসিয়া আবার মাঠে নামিয়া পড়িল। সাম্‌নেই একটা আমগাছ অজস্র মুকুলে ভরিয়া উঠিয়া চারিদিকে মিষ্ট গন্ধ ছড়াইয়া দিতেছিল। তাহারই উঁচু ডালে বসিয়া, একটা কোকিল ডাকিয়া ডাকিয়া সারা হইতেছিল; মণিয়া দুই তিনবার তাহার স্বরের অনুকরণ করিল, শেষে হাততালি দিয়া উড়াইয়া দিয়া নিজেই গাহিতে গাহিতে চলিল, "বিদেশী ভাইয়া, হামার বিদেশী ভাইয়া!"—গানের সুরে সুরে, তাহার যৌবন-পুষ্পিত দেহখানি লীলায়িত হইয়া উঠিতে লাগিল।

পথ চলিতে চলিতে মণিয়া হঠাৎ দেখিল, ছোটকু একটা গাছের পাশে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া হাসিতেছে। গান বন্ধ করিয়া সে পাশ কাটাইয়া যাইতেছিল, ছোটকু পথ আগ্‌লাইয়া বলিল, "বড় সাহেবের বাংলাকে গেইছিলি কেনে রে?"

মণিয়া তীব্রদৃষ্টি হানিয়া বলিল, "পথ ছাড়্—হামার খুসী।"

ছোটকুর মুখে কুৎসিত হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া, মণিয়ার ওষ্ঠাধর ঘৃণায় কুঞ্চিত হইয়া উঠিল; তাড়াতাড়ি পাশ কাটাইয়া যাইতেছিল, ছোটকু খপ করিয়া তাহার একটা হাত ধরিয়া ফেলিল। মিনতির সুরে বলিল, "হাঁ গে, আমার সাথকে যাবি নাই!" মণিয়া এক ঝট্‌কায় হাতটা ছাড়াইয়া লইয়া মুখ ঘুরাইয়া বলিল, "খবরদার!"

ছোটকু এবার ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, গর্জ্জন করিতে করিতে শাসাইয়া বলিল, "আচ্ছা, আমিও নানকুকে জানাই দিব।" মণিয়া সে কথায় কান দিল না, হন্ হন্ করিয়া পথ চলিতে লাগিল। খানিক দূর আসিয়া ধাওড়ার পথ ধরিল।

সন্ধ্যার সময় নানকু খাদ হইতে উঠিতেছিল; দেখিল, খাদের মুখে দাঁড়াইয়া ছোটকু। এমন অসময়ে তাহাকে সেখানে দাঁড়াইতে দেখিয়া নানকু জিজ্ঞাসা করিল, "কোথাকে?"

"তোরই কাছকে।"

"আমার কাছকে! কেনে?"

"একটা বাত আছে"—ছোটকু মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল। নানকুর ভাল বোধ হইতেছিল না। ছোটকুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "বাত আছে—কি?"

"তু বিশ্বাস করবি নাই।"

"তু বল্ না।"

ছোটকু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "মণিয়া আজ সাহেবের বাংলাকে গেইছিল।"

নানকু বিস্মিত দৃষ্টি তুলিয়া বলিল, "বাংলাকে, কেনে?"

"উয়াকেই শুধাগে না!" ছোটকুর মুখে আবার সেই

কুৎসিত হাসি ফুটিয়া উঠিল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া, রাগে নানকুর কালো মুখখানি তামার মত লাল হইয়া উঠিল। ছোটকু কি বলিতে যাইতেছিল, নাকের কাছে ঘুষী তুলিয়া নানকু গর্জ্জন করিয়া বলিল, "খবরদার!"

"আমি কি ঝুট বল্ছি?"

"চোপ্! জান্ লিয়ে লিবো"—নানকুর ক্রুদ্ধ দৃষ্টি দিয়া আগুন ছুটিতে লাগিল। ছোটকুর আর সেখানে বেশীক্ষণ থাকিবার ভরসা হইতেছিল না, আস্তে আস্তে সরিয়া পড়িল।

রাত্রিতে চাঁদের আলোকে মণিয়া ও নানকু দুই জনে বসিয়া ছিল; মণিয়া নানকুর গলা জড়াইয়া আব্দারের সুরে বলিল, "কা'ল তোর রাত পইলে, আমায় থাদকে লিয়ে যাবি নানকু?" নানকু বিস্মিত হইল, এমন আব্দার ত সে কখনও করে না। হঠাৎ বলিল, "আজ তু সাহেবের বাংলাকে গিছ্লি?" মণিয়া হঠাৎ থতমত খাইয়া গেল, গলা ছাড়িয়া দিয়া বলিল, "কে কহলেক্ রে?"

"কে আর—তোর মাথাকে ফুল গোঁজা আছে নাই?" মণিয়া আশ্বস্তা হইল। ভয় হইতেছিল, ছোটকু হয় ত কি বলিয়া দিয়াছে। চোখ তুলিয়া দেখিল, নানকুর দৃষ্টিতে কোন সন্দেহের ছায়া আছে কি না। একটু চুপ থাকিয়া বলিল, "ঐ ফুল লান্তেই রে।" নানকু আর কোন প্রশ্ন করিল না, মণিয়ার ঐ কৈফিয়তই যথেষ্ট। ঘর হইতে বাঁশীটা বাহির করিয়া নানকু বাজাইতে সুরু করিল। মণিয়া বাধা দিয়া বলিল, "হাঁ রে! আমায় থাদ্কে লিয়ে যাবি না?" নানকু সে কথায় কোন কানই দিল না। মণিয়া দুই তিনবার বলিল, শেষে অভিমান করিয়া মুখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিল।

এক, দুই, তিন মাস কাটিয়া গিয়াছে। এই তিন মাসের মধ্যে নানকুর অমন বিশাল বলিষ্ঠ দেহটা ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে। সকলে বলে, "ভূত লাগিয়াছে।" মণিয়া কত ভূত-পূজা দিল, মহাদেওজীর পায়ে ফুল দিল, কিন্তু কৈ, কিছুই ত হইল না। এ দিকে মণিয়ার হাতের পুঁজি ফুরাইয়া গেল, শেষে একে একে গলার হাস্লী, হাতের তাগা, বাজু বিক্রয় করিল। তাহার পর ধার ছাড়া আর অন্য উপায় রহিল না। কিন্তু, তাই বা লোক কয় দিন দিবে? আজ সারাদিন সে উপবাসী, গিয়াছে। কিন্তু কা'ল? নিজে না হয় উপবাসী থাকিতে পারে, কিন্তু পীড়িত নানকু, তাহার মুখে কি তুলিয়া দিবে? মণিয়ার চোখ ফাটিয়া জল আসিতেছিল, চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল, কিন্তু তাহার নড়িবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। নানকু একটু বিস্মিত হইয়া বলিল, "আজ তু রিঁধবি না গে?"

"না!"

"কেনে?"

"খুসী।"

নানকুর বুঝিতে বাকী রহিল না, শুধু একটা প্রকাণ্ড দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। হায়! এমন দিন ত তাহাদের ছিল না।

অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল; মণিয়া উঠিয়া বলিল, "ঘরকে চল্ নানকু, বড় জাড় লাগছেক্।" নানকু আস্তে আস্তে ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িল। মণিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছিল, নানকু হাতটা টানিয়া লইয়া স্নিগ্ধ-স্বরে বলিল, "বিহ্নে কি হবেক্, মণিয়া?" মণিয়ার কিছু বলিবার ছিল না, চুপ করিয়া রহিল। সে যেন কি ভাবিতেছিল। নানকু ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিল, "কা'ল আমি থাদ্কে যাব।"

"হুঁ।"

মণিয়ার মুখে রা না পাইয়া নানকু একটু বিস্মিত হইল, মুখ তুলিয়া বলিল, "কি ভাবছিস্ গে?"

"কিছুই লয়। তু একটু নিদ্ যা ত, কা'ল দেখে লিব।" নানকু চুপ করিয়া শুইয়া পড়িল।

নিঝুম রাত। নানকু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। মণিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছিল। হঠাৎ কিসের একটা মৃদু আওয়াজ হইতেই মণিয়ার বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। কয়েক মিনিট নিঃশব্দে কান খাড়া করিয়া রহিল; দেখিল, নানকু ঘুমাইতেছে কি না। তাহার পর আস্তে আস্তে উঠিয়া আসিল। বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিল ছোটকু,—তাহার মুখ হইতে মদের তীব্র গন্ধ বাহির হইতেছিল। ছোটকু মণিয়াকে বাহিরে আসিতে দেখিয়া উৎফুল্ল হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ঠিক ত?"

"তবে ?"

"চল্"—একটু চুপ থাকিয়া বলিল, "কৈ—যা বলেছিলি !" ছোটকু কোমর হইতে কতকগুলি টাকা বাহির করিয়া মণিয়ার হাতে দিল, "এই লে, তিন কুড়ি আছে। এবারকে চল্।" ছোটকুর আর দেরী সহিতেছিল না।

'একটু সবুর,—একটুক্ !" মণিয়া আবার নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিল, অতি সন্তর্পণে দেখিল, নানকু ঘুমাইতেছে কি না। কম্পিত হস্তে টাকাগুলি নানকুর শিয়রের কাছে রাখিয়া একবার চারিদিকে চাহিয়া লইল; সঙ্গে সঙ্গে একটা কম্পিত দীর্ঘনিশ্বাস তাহার বুকের প্রত্যেক পঞ্জরকে মোচড় দিয়া বাহির হইয়া গেল।—'না—আর না !'—ঘুমের ঘোরে নানকু একবার নড়িয়া উঠিয়াছিল; মণিয়া উৎকর্ণভাবে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিল, তার পর আস্তে আস্তে বাহির হইয়া পড়িল। তাহার পা দুইটা তখন থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল,—একটা দুর্জ্জয় রোদনবেগ উচ্ছ্বসিত বুকটাকে ঠেলিয়া বাহির হইবার পূর্ব্বেই মণিয়া অন্ধকারে নামিয়া পড়িল। বাহিরে ছোটকু অধীর হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল, মণিয়া আসিতেই তাহাকে লইয়া নৈশ অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

ভোরের দিকটায় কি যেন একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া নানকু জাগিয়া উঠিয়াছিল; চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, মণিয়া ঘরে নাই। ভাবিল, বোধ হয়, বাহিরে গিয়াছে। নড়িয়া চড়িয়া আবার পাশ ফিরিয়া শুইল। হঠাৎ দৃষ্টি পড়িল শিয়রের কাছে টাকাগুলির দিকে। "এ কি ! এতগুলি টাকা কিসের ?" তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল। মনে মনে একটু বিস্মিত হইয়া টাকাগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে লাগিল। হঠাৎ তাহার বুকটা কাঁপিয়া উঠিল—"তবে কি —না না, তা কখনই হইতে পারে না। মণিয়াকে কি সে চেনে না ?—তবে ?" যে সন্দেহটা তাহার মনের ভিতর বার বার উঁকি মারিতেছিল, সেটাকে সে কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না, অথচ মনটা বার বার চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল। বেলা যতই বাড়িয়া চলিতে লাগিল, ততই সে অধীর হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। "কিন্তু কৈ, মণিয়া ত এখনও ফিরিল না।" তবুও সে তাহার সন্দেহটাকে কিছুতেই মনের ভিতর স্থান দিতে পারিল না; উৎকর্ণভাবে অপেক্ষা করিতে লাগিল। হঠাৎ মুখ তুলিয়া দেখিল, সম্মুখে দাঁড়াইয়া হেমন সর্দ্দার। তাহার মুখে কিসের একটা ক্রূর হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে। মণিয়াকে লইয়াই এই হেমন সর্দ্দারের সহিত তাহার এক দিন মারামারি হইয়া গিয়াছিল। আজ সুযোগ পাইয়া সে তাহার প্রতিশোধ লইতে আসিয়াছিল; বেশ করিয়া নানা রসে ভিজাইয়া, সে নিজে মণিয়াকে ছোটকুর সাথে পলাইতে দেখিয়াছে, এই খবর দিয়া গেল। তাহার প্রত্যেক কথাটি নানকুর বুকে যেন শূল বিঁধিতেছিল; সর্দ্দার চলিয়া গেলে সে একেবারে গুম্ হইয়া বসিয়া পড়িল। এও কি সত্য ! মণিয়া তাহাকে ছাড়িয়া গিয়াছে, এ কথা তাহাকে বিশ্বাস করিতে হইবে ! না—না, অসম্ভব, এ অসম্ভব ! কখনই হইতে পারে না। তাহাকে যে সে এতটুকু হইতে মানুষ করিয়া তুলিয়াছে। আজ না হয় সে রুগ্ন, কিন্তু তাহার এই বিশাল বুকটার আশ্রয় ছাড়া যে মণিয়া এক তিলও থাকে নাই, তবে আজ কি করিয়া সে বিশ্বাস করিবে ? নানকু তাহার অন্তরের ভিতরটুকু তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিল; কৈ, মণিয়ার প্রতি তাহার অনাবিল স্নেহের ত কোথায়ও একটু কম্‌তি নাই। তবে ? না, না—সে নিশ্চয়ই যায় নাই, কোথায় লুকাইয়া আছে। 'মণিয়া—দুলারী আয় গে !' বার বার উৎকর্ণভাবে কান খাড়া করিয়া রহিল। ওই বুঝি তার পায়ের শব্দ—ওই না ?

পাঁচ মিনিট উৎকণ্ঠিতভাবে নানকু চুপ করিয়া রহিল। কোথায় ? কেহ ত নয় ! শেষে সে দুই হাঁটুর ভিতর মুখ গুঁজিয়া দিয়া, সবলে কান্না চাপিতে লাগিল।

সন্ধ্যাবেলা নানকু শীর্ণ মুখে বসিয়া ছিল। সারা দিন সে ভাবিয়াছে,—"মণিয়া কেন এমন বেইমানী করিল ?" টাকাগুলি সে রাখিয়া গিয়াছে, তাহাকে বাঁচাইবার জন্য, কিন্তু সে ত তাহা চায় নাই। আজই ত সে কাযে যাইবে বলিয়াছিল। তবে ? না না, কেন সে এমন ভুল করিল ? নানকুর চোখ ফাটিয়া জল আসিতে লাগিল; অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত স্থিরভাবে সে বসিয়া রহিল। তাহার বার বার কেবলই মনে পড়িতেছিল, সেই যৌবনের স্বপ্নময় তরুণ দিনগুলির কথা, সেই ছোট গ্রামখানি; পাথরের আড়ালে ঘন শালবনের ছায়ায় ছায়ায় সকলের অসাক্ষাতে চুরি করিয়া দুই তরুণ-তরুণীর গোপন মিলন;—কত স্তব্ধ দ্বিপ্রহর অনলস আলাপন, ছেলেখেলায় কাটান। নীরব বনানীর

অন্তরালে ঘুঘু পাখী করুণ সুরে কূজন করিয়া উঠিত,—মণিয়া তাহার অনুকরণ করিত। কখনও নানকু বাঁশীতে ফুঁ দিত; বাঁশীর সুর সমস্ত বন ছাপাইয়া দূর হইতে দূরে ভাসিয়া যাইত, সুরের রেশটুকু আবার কাঁপিয়া কাঁপিয়া ফিরিয়া আসিত। কখনও সবুজ ঘাসের উপর দুই জনে মুখোমুখী বসিয়া থাকিত,—তরুণ বুক দুইটি কত সুখ-দুঃখ, হাসিখুসীর গল্পে জমিয়া উঠিত। মাথার উপর দিয়া টিয়া পাখীর ঝাঁক উড়িয়া গেল, দুই জনে গণিবার চেষ্টা করিত, কখনও সমস্ত ভুলিয়া আশে-পাশে কাঠ-বিড়ালীগুলির ছুটাছুটি দেখিত। হঠাৎ একটু মৃদু আওয়াজ,—গাছের পাতাটুকু নড়িয়া উঠিল, দুই জনই চকিত হইয়া দৃষ্টি ফিরাইত,—"ওই বুঝি কেউ আসিয়া পড়িল!" পরক্ষণেই নিজেদের ভুল বুঝিয়া একসঙ্গে হাসিয়া উঠিত। বিদায়-বেলায়, দুই জনে একসঙ্গে খানিকটা পথ চলিয়া আসিত, নানকু পথের ধারের লতা হইতে রঙ্গীন ফুল তুলিয়া মণিয়ার খোঁপা সাজাইয়া দিত। শেষে, একবার চকিত দৃষ্টি বিনিময় করিয়া,দুই জনে ঘন বনশ্রেণীর মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যাইত। তাহার পর এক দিন, এক উৎসবময় প্রাতে, চারিদিককার কলকোলাহলের মাঝে এক রঙ্গীন অবসরে দুই জনে পরস্পরকে একান্ত নিবিড়ভাবে আপনার করিয়া লইয়াছিল। সেই হইতে, এত দিন পর্য্যন্ত দুই জনে একান্তভাবে আপনারই ছিল; তাহাদের এই কুলী জীবনের শত দুঃখ-সুখ, বাধা-বিঘ্ন এক তিলের জন্যও তাহাদের মধ্যে কোন বিচ্ছেদের রেখা টানিয়া দিতে পারে নাই; কিন্তু আজ?—নানকুর সমস্ত বুকটা হু হু করিয়া উঠিল, একটা প্রকাণ্ড দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া বাতাসে মিশিয়া গেল। সে আর বসিতে পারিতেছিল না; আজ সারা দিন উপবাস;—ধীরে ধীরে উঠিয়া গিয়া শুইয়া পড়িল।

রবিবার। সকাল হইতেই নানকু জিনিষপত্র গুছাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। এই কয় দিন সে এক তিলও স্থির হইয়া থাকিতে পারে নাই, তাহার খালি বুকের বিরাট শূন্যতা যেন, তাহাকে অনবরত চাপিয়া মারিবার চেষ্টা করিতেছিল। ভোরবেলাতেই হেমন সর্দ্দার খবর দিয়া গিয়াছিল,—"আজ মণিয়ার সাধি!"—নানকু স্থিরভাবেই সে আঘাতটা সহ্য করিয়া লইল। একটু বেলা বাড়িতেই নানকু উঠিয়া পড়িল, তাহার মনে পড়িতেছিল সেই টাকাগুলির কথা। যেমন করিয়া হউক, মণিয়াকে তাহা ফিরাইয়া দিতেই হইবে। ব্যস্! তাহার পর সে নিশ্চিন্ত। ঘর হইতে তেল-খাওয়ানো পাকা বাঁশের লাঠিটা বাহির করিয়া লইয়া ঘরে তালা লাগাইল। তাহার পর একবার চারিদিকে চাহিয়া লইয়া আস্তে আস্তে বাহির হইয়া পড়িল।

সমস্ত দিন পথ হাঁটিয়া যখন সে গ্রামে আসিয়া পৌঁছিল, তখন প্রায় অপরাহ্নের শেষ। তরঙ্গায়িত রূপালী মেঘের ধারে ধারে জরির আঁচল, ফাঁকে ফাঁকে নীল আকাশের টুক্‌রা, আর স্তিমিত অপরাহ্নের বিক্ষিপ্ত সিন্দুরটুকু তখন সমস্ত গ্রামখানার উপর একটা রঙ্গীন ছায়া ফেলিয়া নূতন নেশায় ভরিয়া তুলিয়াছিল। নানকু অনেক কষ্টে তাহার এই রুগ্ন শরীরটাকে এত দূর পর্য্যন্ত টানিয়া আনিয়াছিল, আর চলিতে পারিতেছিল না; অবসন্নভাবে একটা পাথরে ঠেস্ দিয়া বসিয়া পড়িল। কত লোক পথ দিয়া চলিতেছিল;—সকলের মুখেই উৎসবের কথা। দূর—অনেক দূর হইতে চারিদিককার কল-কোলাহল, মাদলের আওয়াজের সঙ্গে কতকগুলি বাঁশীর সুর রণিয়া রণিয়া কানে আসিয়া ঢুকিতেছিল; নানকু আর শুনিতে পারিতেছিল না। ঐ না উৎসবের বাঁশী বাজিতেছে? হাঁ, ঐ ত উৎসবশেষের গান! না, না—ও বুঝি তাহার সমস্ত হৃৎপিণ্ডটাকে ছিঁড়িয়া বাহির করিবার জন্য কোন রক্তপিপাসু দানবের বিকট উল্লাস। আর ঐ বেলা-শেষের রক্তিম আভাটুকু? ও বুঝি তাহার রক্তিম চোখ। উঃ! ঐ,—ঐ যে উন্মত্ত লোকগুলির হাসি-গান, আনন্দের হর্‌রা, মাদলের শব্দ, বাঁশীর সুর,—আর ঐ মাঝে মাঝে বিকট উল্লাস! ও বুঝি কোন ভীম সাগরের অশ্রান্ত তরঙ্গ-গর্জ্জন আর তাহার সঙ্গে সেই সৃষ্টিশেষের ভৈরব প্রলয়োল্লাস। উঃ! কি ভীষণ! নানকু আর সহিতে পারিতেছিল না, চারিদিক্ হইতে মৃত্যুর কঙ্কাল ছায়া বিরাট পাষাণস্তূপের মত তাহাকে চাপিয়া ধরিতে লাগিল। উঃ! কি নির্ম্মম!—কঠিন, বড় কঠিন! নানকু অবসন্নভাবে এলাইয়া পড়িল। তখনও একটুখানি স্নিগ্ধতার রেশ নানকুর শ্রান্ত বুকখানিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, ঐখানে সে, এত কাছে! মণিয়া—দুলারী—আর সে!

উৎসব-আসরের মাঝে বধূবেশে মণিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। হঠাৎ সে নাচগানের মধ্য হইতেও দূরাগত কাহার করুণ-স্বর শুনিতে পাইল,—সে স্বর যেন অতি পরিচিত, অতি আপনার। দুই হাতে উৎসবোন্মত্ত জনসঙ্ঘকে ঠেলিয়া দিয়া সে উন্মত্তের মত বাহিরে ছুটিয়া আসিল, মুহূর্ত্তে পরিত্যক্ত অনাদৃত নানকুর ধূল্যবলুণ্ঠিত মাথাটা বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া চীৎকার করিয়া ডাকিল, 'নানকু! নানকু! দেখ, তোর মণিয়া এসেছে।'

ধীরে, অতি ধীরে মৃত্যুযাতনাক্লিষ্ট নয়ন দুইটি উন্মীলন করিয়া নানকু একবার শেষ উদ্যম করিয়া ক্ষীণ স্বরে বলিল, 'মণিয়া, এই তোর টাকা নে—আমারে না বলিয়ে এলি কেনে? তোরে ত ধরিয়ে রাখতেম না।'

নানকু হাঁপাইতে লাগিল। তাহার চোখের সম্মুখে বিরাট অন্ধকার ফুটিয়া উঠিল, কানে সে তখন কিছুই শুনিতে পাইতেছিল না। ধীরে ধীরে তাহার শিথিল মাথাটি মৃত্যু-শ্রান্ত বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। মণিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকার ধীরে ধীরে তাহার ক্লান্ত জীবনের উপর যবনিকা টানিয়া দিল।

শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ।

# বর্ষণান্তে

শ্রাবণের মেঘ-ঘন বৈকালে বৃষ্টি গিয়াছে থেমে,
অস্ত-রবির শেষ-আলোধারা ধরায় এসেছে নেমে,
রবির কনক-রেখা প্রভাতে দেয় নি দেখা
দ্বিপ্রহর ছিল মগ্ন আজিকে সজল-জলদ-প্রেমে।

ঝুম-ঝুম আর ঝুপ ঝুপ ধ্বনি থেমেছে মেদিনী-বুকে,
ফিস্-ফিস্ কথা কহে বারিধারা ধরা সাথে চুপে-চুপে,
নবীন জলদ-দল ঢেকেছে গগনতল
শুনি' গুরুধ্বনি শিখিনী সুখিনী—নাচিছে পুলক-সুখে।

বেণুর কুঞ্জে পাগলা বাতাস বাজায় বেণুর সুর,
সর্ সর্ আর মর্ মর্ ধ্বনি পরাণ করিছে পূর,
বরষা-পরশ-বশা কেতকী বিবশ-দশা
কবরী এলায়ে পড়েছে,—সমীর-সৌরভে ভুর-ভুর।

মন পাখী উড়ে পলায়েছে ঐ হীরা-মতিময় দেশে,
কল্পনা মাথা নোয়ায়েছে আজ বাস্তব-কাছে এসে,
সবুজ পাতার কোলে অশ্রু-মাণিক দোলে
সজ্জিত ওরে সারাটি বিশ্ব অপরূপ রাজবেশে।

সিক্ত তরুর সবুজ শোভায় গোধূলি ঢেলেছে ফাগ্,
অশ্রু-ধোতা-তরুণী-বয়ানে সলাজ হাস্যরাগ,
বাদল-পরশ-ভরে নীপের কেশর ঝরে
পবন হাঁকিছে মল্লিকা-বেল যুঁই তোরা ত্বরা জাগ্।

দেবদারু আর চম্পক গাছে জ্বলে হীরকের গুঁড়া,
দোদুল দোলার নেশায় মেতেছে মাধবী কৃষ্ণচূড়া,
বুঝি বা প্রহরী ভুলে স্বরগের দ্বার খুলে
অমরার শোভা হেথা ঝরে এল—ওরে ধরাবাসী, কুড়া।

বাদলের পরে রৌদ্রের আভা—অশ্রুর শেষে হাসি,
অগ্নিকোণের নীলিমায় ঐ রামধনু এল ভাসি,
ধরাতে বায়ুতে মেঘে গেছে এ কি রং লেগে
স্বপ্নপুরীর রঙিন নেশায় মাতাল কে এক আসি,
বিশ্ববাসীর মনেতে ঢালিল সোণালি রংয়ের রাশি।

শ্রীমতী রাধারাণী দত্ত।

# অধ্যাত্ম-জ্যোতিষ

জ্যোতিষশাস্ত্রের উৎপত্তি ভারতবর্ষে। পৃথিবীর আদি গ্রন্থ বেদ—বেদের অন্যতম অঙ্গ জ্যোতিষ। জ্যোতিষ বেদের নির্ম্মল চক্ষুঃস্বরূপ।

"বেদস্য নির্ম্মলং চক্ষুর্জ্যোতিঃশাস্ত্রমকল্মষম্।"

সুতরাং জ্যোতিষশাস্ত্রে জ্ঞান না থাকিলে কোন শাস্ত্রই সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি হয় না। জ্যোতিষশাস্ত্র সাধারণতঃ ৩ ভাগে বিভক্ত। যথা :—(১) সিদ্ধান্ত, (২) সংহিতা, (৩) হোরাশাস্ত্র। এই সকল বিভাগ আবার বহু শাখাপ্রশাখায় প্রশাখিত বা বিভক্ত। ভারতে অসংখ্য জ্যোতিষগ্রন্থ ছিল। কতক মুদ্রিত হইয়াছে, কতক বিলুপ্ত হইয়াছে এবং কতক প্রাচীন পণ্ডিতগণের গৃহে কীটদষ্টাবস্থায় পতিত আছে।

সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষের নামান্তর গণিত-জ্যোতিষ ( Astronomy )। ইহা আবার ৩ ভাগে বিভক্ত :—সিদ্ধান্ত, তন্ত্র ও করণ। বেদ-পুরাণাদি গ্রন্থের মধ্যে স্থানে স্থানে এরূপভাবে জ্যোতিষের সমাবেশ হইয়াছে, যাহা জ্যোতিষানভিজ্ঞ পণ্ডিতগণেরও দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়ে।

সূর্য্যের উদয়াস্ত সম্বন্ধে ছান্দোগ্য উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, "আদিত্য যে পর্য্যন্ত পূর্ব্বে উদিত ও পশ্চিমে অস্তমিত হয়েন, তাহার দ্বিগুণ কাল দক্ষিণে উদিত ও উত্তরে অস্তমিত হয়েন। আদিত্য যত কাল দক্ষিণে উদিত ও উত্তরে অস্তমিত হয়েন, তাহার দ্বিগুণ কাল পশ্চিমে উদিত ও পূর্ব্বে অস্তমিত হয়েন। আদিত্য যত কাল পশ্চিমে উদিত ও পূর্ব্বে অস্তমিত হয়েন, তাহার দ্বিগুণ কাল উত্তরে উদিত ও দক্ষিণে অস্তমিত হইয়া থাকেন। আদিত্য যত কাল উত্তরে উদিত ও দক্ষিণে অস্তমিত হয়েন, তাহার দ্বিগুণ কাল উর্দ্ধে উদিত ও অধঃ অস্তমিত হইয়া থাকেন।

অনন্তর এই স্থান হইতে উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া উদয়ের পর আর উদয়াস্ত ভোগ করিতে হয় না। এই স্থানে ক্রমিক উদয়াস্ত নাই।"

এই সকল বিষয় বলিয়া ঋষি বলিতেছেন,—"দেবতারা শ্রবণ করুন, আমি সত্য বাক্য বলিতেছি।" পূর্ব্বোক্ত উক্তিগুলি পাঠ করিলে অনেকে গাঁজাখুরি মনে করিতে পারেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হইতে সূর্য্যের উদয়াস্ত ঐরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। বিভিন্ন অনুবাদকের কয়েকখানি ছান্দোগ্য দেখিলাম, কিন্তু কোনখানিতে ইহার সম্যক্ আলোচনা হয় নাই। পৃথিবীর কোন্ কোন্ স্থানে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সূর্য্যের উদয়াস্ত হইয়া থাকে, তাহা গণনা দ্বারা ঠিক করিতে পারেন, এরূপ গণিতজ্ঞ ব্যক্তি এক্ষণে ভারতে আছেন, কি না জানি না। যদি থাকেন এবং এই প্রবন্ধ যদি তাঁহার গোচরীভূত হয়, তাহা হইলে উক্তরূপ উদয়াস্তের স্থানগুলি গণনা-পন্থাসহ আমাদিগকে জানাইলে আমরা চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হইব এবং কলিকাতা ১নং কৃষ্টোফার রোডস্থ-এষ্ট্রো একাডেমি হইতে তাঁহার পুরস্কার প্রদত্ত হইবে।

সংহিতা জ্যোতিষ বা জ্যোতিষ-সংহিতা বা রাষ্ট্র-জ্যোতিষ ( Mundane Astrology )। এই শ্রেণীর জ্যোতিষ গ্রন্থে গ্রহগণের সঞ্চারাদি দ্বারা দেশের সুর্ভিক্ষ, দুর্ভিক্ষ, সংগ্রামাদি এবং সকল প্রকার প্রাকৃতিক উদ্ভিদ্ ও প্রাণিজগতের শুভাশুভ ফল গণনার বিষয় প্রকটিত। বিবিধ বিষয়ের গণনার সংযোগ হেতু এই শাখার নাম সংহিতা হইয়াছে। স্বরশাস্ত্র, শাকুনশাস্ত্র, যাত্রা-বিবাহাদি কালনির্ণয়, মুহূর্ত্তশাস্ত্র এবং সামুদ্রিকশাস্ত্রে এই শাখার অন্তর্গত।

**হোরাশাস্ত্র বা জাতক শাস্ত্র ঃ**—( Astronomy )। এই শাস্ত্র দ্বারা জন্মসময়ের গ্রহসংস্থান দ্বারা মানবজীবনের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান শুভাশুভ ফল নিরূপিত হয়।

**জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক ঃ**—অষ্টাদশ ঋষি জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক ছিলেন :—(১) ব্রহ্মা, ( সৃষ্টিকর্ত্তা আদি ব্রহ্মা নহেন, দেবদেবী ও ঋষিবংশাবলী ১ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য। ) (২) সূর্য্য, ( আকাশের সূর্য্য নহেন, সূর্য্য-নামধেয় জনৈক মহর্ষি ), (৩) বশিষ্ঠ, (৪) অত্রি, (৫) মনু, (৬) পৌলস্ত্য, (৭) লোমশ, (৮) মরীচি, (৯) অঙ্গিরা, (১০ ) ব্যাস, (১১) নারদ, (১২) শৌনক, (১৩) ভৃগু, (১৪) চ্যবন, (১৫) যবন ( গ্রীকজাতীয় ), (১৬) গর্গ, (১৭) কশ্যপ, (১৮) পরাশর।

ইহা ভিন্ন সেকালের সমস্ত যোগী, মুনি ও ঋষিগণ জ্যোতিষশাস্ত্রে দক্ষ ছিলেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা না থাকিলে বেদাদি প্রাচীন গ্রন্থের সারাংশ ও ঐতিহাসিকাংশ ব্যতীত বিষয় সকল সম্যক্ উপলব্ধি হইতে পারে না।

ভারতের বাহিরে পরবর্ত্তী কালে টলেমি, সক্রেটিস্, এ্যারিষ্টটল্, কেপ্লার, পারট্রিজ প্রভৃতি বহু ঋষিকল্প পাশ্চাত্য দার্শনিক পণ্ডিতও জ্যোতিষে গভীর জ্ঞান লাভ করিয়া অনেক জ্যোতিষিক সত্য আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে য়ুরোপ ও আমেরিকায় জ্যোতিষের প্রভূত উন্নতি ও আদর হইয়াছে। ভারতকে এক্ষণে ঐ সকল দেশের মুখাপেক্ষী হইতে হইয়াছে।

অধ্যাত্ম-জ্যোতিষ বা যোগ-জ্যোতিষ নামে পৃথগ্‌ভাবে আলোচিত কোন ভারতীয় গ্রন্থ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। তবে একত্র অন্যান্য বিষয়ের সহিত ইহার আলোচনা আছে। আমরা এই প্রবন্ধে পৃথগ্‌ভাবে অধ্যাত্ম জ্যোতিষ নামে ইহার আলোচনা করিব।

**অধ্যাত্ম-জ্যোতিষ ঃ**—সমুদ্রবিশেষ জ্যোতিষের যে অংশ অধ্যয়ন করিলে অধ্যাত্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান এবং ধর্ম্মবিষয়ের জ্ঞান লাভ হয়, তাহাই অধ্যাত্ম জ্যোতিষ নামে অভিহিত। ইংরাজীতে Astrothelogy, Astrophilosophy, Astrofsychology যে অর্থ-ব্যঞ্জক, বাঙ্গালাতে অধ্যাত্ম-জ্যোতিষ শব্দ সেই অর্থ-দ্যোতক। এই অধ্যাত্ম-জ্যোতিষ শিক্ষার নিমিত্ত সিদ্ধান্তাদি জ্যোতিষের প্রাথমিক জ্ঞান কিয়দংশ থাকা আবশ্যক। নিম্নে সংক্ষেপে তাহাই বিবৃত হইতেছে।

সপ্তবিংশতি নক্ষত্রান্বিত দ্বাদশরাশিবিশিষ্ট রাশিচক্র এবং ৯টি গ্রহ দ্বারা সৃষ্টি-স্থিতি-লয়রূপ পরমেশ্বরের ক্রীড়া চলিতেছে।

কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত সমস্ত জীব এই চক্রের

আবর্ত্তনে জন্মিতেছে এবং কর্ম্মফল ভোগ করিয়া লয়প্রাপ্ত হইতেছে। যেমন কুম্ভকারের একই কুলালচক্রে ছেলেদের খেলার দ্রব্য ছোট ছোট ভাঁড়, খুরি, কলসী হইতে বড় বড় হাঁড়ী, কলসী, জালা প্রভৃতি উৎপন্ন হইতেছে, সেইরূপ রাশিচক্রে জগতের সমস্ত দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে। সেই রাশিচক্রের মহিমা অদ্ভুত। সেই রাশিচক্রের নামান্তর বিশ্বচক্র, কালচক্র, দিব্যচক্র এবং বিষ্ণুহস্তস্থ সুদর্শনচক্র।

> "বিশ্বচক্রং কালচক্রং দিব্যচক্রং সুদর্শনম্।
> বিষ্ণুকরাম্বুজবাসমীড়ে তত্ত্বজ্ঞানদ্ভুতন্॥"—বৃঃ পরাশর।

বিষ্ণুমন্দিরে বিষ্ণুহস্তে যে সুদর্শনচক্র দৃষ্ট হয়, তাহাই এই রাশিচক্র। বিষ্ণুরূপী ভগবান্ এই চক্র ধারণ করিয়া আছেন বলিয়া তাঁহার নাম চক্রধর, চক্রপাণি এবং চক্রভৃৎ হইয়াছে। সূর্য্যের নামান্তর চক্রভৃৎ ও চক্রবন্ধু। সূর্য্য রাশিচক্রের কেন্দ্রে অবস্থান করিয়া রাশিচক্র ধারণ করিয়া অবস্থিত। বিষ্ণুর পরমপদ বা আশ্রয়স্থান নভোমণ্ডলস্থ মার্ত্তণ্ডের মধ্যে। রাশিচক্রের মধ্যেই গ্রহনক্ষত্রাদি সমস্ত বিশ্ব অবস্থিত। কল্পিত চতুর্ভুজ বিষ্ণুহস্তে শঙ্খ চক্র, গদা ও পদ্ম ন্যস্ত হইয়াছে। বিষ্ণুর বা ব্রহ্মের কিরূপে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-প্রবাহ চলিতেছে, তাহা জ্যোতিষশাস্ত্রের সাহায্যে অনুভূত হইয়া থাকে। বহু জন্ম যোগ-তপস্যা করিয়া ভগবানের কৃপা লাভ করিতে পারিলে যে জ্ঞান ও দিব্যদৃষ্টি জন্মে, এক জন ভক্তিসহকারে কঠোর পরিশ্রম করিয়া জ্যোতিষ অধ্যয়ন ও নিঃস্বার্থভাবে আলোচনা করিলে, সেই দিব্যজ্ঞান ও দিব্যদৃষ্টি লাভ হয়।

অধ্যাত্ম-জ্যোতিষ আলোচনা করিতে হইলে নিম্নোক্ত জ্যোতিষিক সংজ্ঞা, সূত্র ও নামগুলি হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক।

## প্রথম অধ্যায়—নক্ষত্রতত্ত্ব

**সপ্তবিংশতি নক্ষত্র ঃ—**(১) অশ্বিনী, (২) ভরণী, (৩) কৃত্তিকা, (৪) রোহিণী, (৫) মৃগশিরা, (৬) আর্দ্রা, (৭) পুনর্ব্বসু, (৮) পুষ্যা, (৯) অশ্লেষা, (১০) মঘা, (১১) পূর্ব্বফল্গুনী, (১২) উত্তরফল্গুনী, (১৩) হস্তা, (১৪) চিত্রা, (১৫) স্বাতী, (১৬) বিশাখা, (১৭) অনুরাধা, (১৮) জ্যেষ্ঠা, (১৯) মূলা, (২০) পূর্ব্বাষাঢ়া, (২১) উত্তরাষাঢ়া, (২২) শ্রবণা, (২২) ধনিষ্ঠা, (২৪) শতভিষা, (২৫) পূর্ব্বভাদ্রপদ, (২৬) উত্তরভাদ্রপদ, (২৭) রেবতী।

এই সকল নক্ষত্রের নাম ও সংখ্যা মনে রাখা একান্ত আবশ্যক। নামের পরিবর্ত্তে সংখ্যা ব্যবহৃত হয় ও হইবে। গগনমণ্ডলে অসংখ্য নক্ষত্র থাকিলেও প্রাচ্য জ্যোতিষে পুরাকাল হইতে জ্যোতিষগণনা-সৌকর্য্যার্থ উক্ত সপ্তবিংশতি নক্ষত্রেরই প্রচলন আছে। ইহা ব্যতীত আর একটি নক্ষত্র আছে, তাহার নাম অভিজিৎ। তাহার সংখ্যা নাই, অর্থাৎ ০। উত্তরাষাঢ়া ও শ্রবণার মধ্যে সেটিকে মিলাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

ঐ নক্ষত্রগুলির গুণও প্রকৃতি অনুসারে ৩ ভাগে বিভক্ত হইয়াছে।

সত্ত্বগুণাশ্রয়ী নক্ষত্র—১,৫,৭,৮,১৩,১৫,১৭,২২ ও ২৭।
রজোগুণাশ্রয়ী নক্ষত্র—২,৪,৬,১১,১২,২০,২১,২৫ ও ২৬।
তমোগুণাশ্রয়ী নক্ষত্র—৩,৯,১০,১৪,১৬,১৮,১৯,২৩ ও ২৪।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রায়।

---

# "প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্যে বৌদ্ধপ্রভাব"

( সমালোচনা )

গত মাঘ মাসের "বসুমতী"তে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত হরিপদ ঘোষাল বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের "প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্যে বৌদ্ধ-প্রভাব" শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করিলাম। দুঃখের বিষয়, প্রবন্ধ-লেখক একটিও মৌলিক কথা বলিতে পারেন নাই; অধিকন্তু তাঁহার প্রবন্ধ পূর্ব্ব পূর্ব্ব লেখকগণের কতকগুলি ভুলের পুনরাবৃত্তিমাত্র। সুতরাং এ বিষয়ে একটু আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

প্রথমেই বঙ্গলিপির প্রাচীনত্ব দেখাইতে গিয়া তিনি লিখিয়াছেন—"খৃষ্টের পঞ্চশত বর্ষ পূর্ব্বেও আমরা দেখিতে পাই যে, বুদ্ধদেব বঙ্গলিপি শিক্ষা করিতেছেন।" শ্রদ্ধেয় দীনেশ বাবুর বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে এই কথাটি আছে বটে, এবং বোধ হয়, ঐ পুস্তক হইতেই তিনি ইহা গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এই কথাটি অবিসংবাদিত সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া যায় না। ললিতবিস্তরে ইহার উল্লেখ আছে বটে; এই বিষয়ে আর কোনই প্রমাণ নাই। এই অবস্থায় একটিমাত্র উক্তিকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করা কতদূর যুক্তিযুক্ত, তাহা বিবেচনাধীন। তদ্ব্যতীত গ্রন্থখানিকে বহু প্রাচীন বলিয়া মনে করিবার বিশেষ কোন হেতু নাই। বরং ললিতবিস্তরে বঙ্গলিপির উল্লেখ হইতে উহা যদি প্রক্ষিপ্ত না হইয়া থাকে, তবে উক্ত লিপির প্রাচীনতা প্রমাণিত না হইয়া এই গ্রন্থখানিরই অপেক্ষাকৃত আধুনিকতা প্রমাণিত হইতেছে—এইরূপ মনে করাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। এই অবস্থায় ললিতবিস্তরের উক্তির উপর নির্ভর করিয়া বঙ্গলিপিকে খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত ঠেলিয়া লইয়া যাওয়া সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক ও অবৈজ্ঞানিক।

সম্রাট অশোকের সময়ে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশসমূহে খরোষ্ঠী এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে ব্রাহ্মী লিপি প্রচলিত ছিল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ ব্যতীত ভারতবর্ষে এ পর্য্যন্ত যত তাম্রশাসন বা প্রস্তরলিপি পাওয়া গিয়াছে, সে সমস্তই ব্রাহ্মী লিপি। কেবল তাহাই নহে, এই বঙ্গদেশেও প্রাচীনতম কাল হইতে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কাল পর্য্যন্ত যত লিপি পাওয়া গিয়াছে, সে সমস্তই ব্রাহ্মী লিপি হইতে অভিন্ন। সুতরাং ব্রাহ্মী হইতে স্বতন্ত্র বঙ্গলিপির অবকাশ রহিল কোথায়?

তিনি এক স্থানে লিখিয়াছেন—"ধর্ম্মঠাকুরের পূজাপদ্ধতি ও মাহাত্ম্য সংকীর্ত্তনের জন্য যে কবিতা রচিত হইয়াছিল, তাহাতেই বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি।" এ যুক্তিটি আমরা ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। ভাষার উৎপত্তি আগে এবং সেই ভাষায় কবিতা রচিত হয় পরে, আমরা ইহাই জানিতাম। কিন্তু কবিতা হইতে ভাষার উৎপত্তি, ইহা নূতন কথা বটে!

প্রবন্ধলেখকের মতে গোরক্ষনাথ মীননাথের প্রধান শিষ্য, এবং গোরক্ষনাথ না কি "পঞ্জাবের জলন্ধর নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়া বাঙ্গালা দেশে জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিয়াছিলেন।" শ্রদ্ধেয় দীনেশ বাবু তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' এই কথাটি লিখিয়াছেন এবং সম্ভবতঃ এই মত প্রকাশ করিতে তিনি একমাত্র 'মীনচেতন' পুথিখানির উপরেই নির্ভর করিয়াছেন। প্রবন্ধলেখকের পক্ষে দীনেশ বাবুর পুস্তক হইতে ইহা গ্রহণ করা অসম্ভব নহে; কিন্তু এই বিষয়ে তাঁহার সহিত আমরা একমত হইতে পারিলাম না। আমাদের বিবেচনায় মীননাথের শিষ্যের নাম মৎস্যেন্দ্রনাথ এবং গোরক্ষনাথ এই মৎস্যেন্দ্রনাথেরই শিষ্য। মৎস্যেন্দ্রনাথের অপর নাম মৎস্যান্ত্রাদ অথবা লুইপাদ। তিনি মাছের অন্ত্র (আঁতড়ী) খাইতে ভালবাসিতেন বলিয়া তাঁহার নাম হয় মৎস্যান্ত্রাদ। পণ্ডিতগণের মতে তাঁহার বাড়ী ছিল বরিশালে, এবং তিনি জাতিতে কৈবর্ত্ত। এখানে বলিয়া রাখা ভাল, কেহ কেহ হয় ত নামের অর্থের অনেকটা সাদৃশ্য দেখিয়া মীননাথ ও

মৎস্যেন্দ্রনাথকে একই ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে ; মীননাথ ও মৎস্যেন্দ্রনাথ বিভিন্ন ব্যক্তি। 'হঠযোগ-প্রদীপিকা' হইতে জানা যায় যে,চৌদ্দ জন নাথ ছিলেন। ইহার একটি শ্লোক এই :—

"শ্রীআদিত্যনাথ-মৎস্যেন্দ্র-শাবরানন্দ-ভৈরবাঃ।
চৌরঙ্গী-মীন-গোরক্ষ-বিরূপাক্ষ-বিলেশয়াঃ ॥"

ইহা হইতে মীননাথ ও মৎস্যেন্দ্রনাথ যে বিভিন্ন ব্যক্তি, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। 'গোরখ্‌বোধ' নাথদের অতি প্রামাণিক গ্রন্থ। ইহা গোরক্ষপুর দরবার লাইব্রেরীতে রক্ষিত ছিল। ইহাতে মীননাথের অনেক কথা আছে, এবং তাহাতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, গোরক্ষনাথ মীননাথের শিষ্য নহেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রভৃতির ইহাই মত। *

বৌদ্ধগণের হাষিতী দেবী বলিয়া কোন দেবী ছিলেন কি না, তাহা আমাদের স্মরণ হয় না। তাঁহাদের হারিতী দেবী আমাদের শীতলাতে পরিণত হইয়াছে বলিয়াই অনেকে অনুমান করেন। বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের হারিতী দেবী ছাপার ভুলে হাষিতী দেবী হইয়া যাওয়াও খুব বিচিত্র নয়।

প্রবন্ধ-লেখকের মতে "রামাই পণ্ডিত মহারাজ দ্বিতীয় ধর্ম্মপালের রাজত্বকালে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।" শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণের মুখবন্ধে এই কথাই লিখিয়াছেন এবং বিদ্যাবিনোদ মহাশয় সেই স্থান হইতেই ইহা গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া আমাদের মনে হয়। এই বিষয়ে আমাদের দুইটি প্রশ্ন আছে ;—প্রথমতঃ, দ্বিতীয় ধর্ম্মপাল বলিতে তিনি কাহাকে বুঝেন ? দ্বিতীয়তঃ, রামাই পণ্ডিতকে দ্বিতীয় ধর্ম্মপালের সময়ের লোক বলা হইল কোন্ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া ? শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় পূর্ব্বোক্ত মুখবন্ধে যে সব প্রমাণের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই অমীমাংসিত এবং সন্দেহজনক। মহারাজ রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয় শিলালিপিতে আমরা দণ্ডভুক্তির এক ধর্ম্মপালের উল্লেখ পাইতেছি ; তাহাতে আছে, রাজেন্দ্র চোল দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া ইঁহাকে যুদ্ধে নিহত করেন। কিন্তু কি কারণে তাঁহাকে দ্বিতীয় ধর্ম্মপাল আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এই ধর্ম্মপালকে মহীপালের কোন আত্মীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন বটে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। †

"খৃষ্টীয় একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে গোবিন্দচন্দ্র পাল বঙ্গে রাজত্ব করিতেছিলেন", এই তথ্য তিনি কোথায় সংগ্রহ করিলেন ? শ্রদ্ধেয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় সম্পাদিত 'বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়ে'র ২৭ পৃষ্ঠায় ঠিক এই কথাটি আছে দেখিতে পাইতেছি। তিনি কি ঐ স্থান হইতেই ইহা গ্রহণ করিয়াছেন ? বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের মতে উক্ত নৃপতি পালরাজবংশীয় ; কিন্তু পালরাজবংশের মধ্যে ঐ প্রকার নাম আমরা খুঁজিয়া পাইলাম না। গোবিন্দপাল বলিয়া এক রাজা দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে (কাহারও কাহারও মতে তাহারও পরে) বিহারে রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি পালবংশীয় নরপতি বলিয়াই ঐতিহাসিকগণ বিবেচনা করেন। আবার মহারাজ রাজেন্দ্র চোলদেবের তিরুমলয় শিলালিপিতে আমরা 'বঙ্গালদেশের' গোবিন্দচন্দ্র বলিয়া এক নৃপতির উল্লেখ পাইতেছি। তিনি না কি এ চোলরাজের প্রবল আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া গজপৃষ্ঠ হইতে নামিয়া পলায়ন করেন। মহারাজ রাজেন্দ্র চোল ১০২১ হইতে ১০২৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে উত্তরপথ আক্রমণ করেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বঙ্গদেশে গোবিন্দচন্দ্র রাজত্ব করিতেছিলেন। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় এই দুই নরপতির নাম খিচুড়ি করিয়া এক অনৈতিহাসিক নাম উপস্থিত করিয়াছেন এবং ফলে তাঁহার রাজত্বকাল খৃষ্টীয় একাদশ হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এখন প্রশ্ন উঠে, উক্ত দুই নরপতির মধ্যে 'গোপীচন্দ্রের গানে' কে স্থান লাভ করিয়াছেন ? উত্তরে এই বিষয়ে নিঃসন্দেহে কিছুই বলা চলে না, তবে নানা কারণে বঙ্গদেশের নৃপতিকেই উপলক্ষ করিয়া এই সব গান রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করিতে পারি।

শ্রীসুধীরা দেবী।

## মহত্তের সম্মান

এ জগতে যে জাতি আপন জাতির মহত্তের সম্মান করিতে শিখিয়াছে, সেই জাতি যথার্থ আত্মসম্মানজ্ঞানে প্রবুদ্ধ হইয়াছে। সেই জাতিই যথার্থ দেশ ও দশের মুক্তির সন্ধান পাইয়াছে। কলিকাতা করপোরেশান কলিকাতার শ্রেষ্ঠ রাজবর্ত্ম 'সেন্ট্রাল এভেনিউর' নাম 'চিত্তরঞ্জন এভেনিউয়ে' পরিণত করিবার সঙ্কল্প করিয়া যথার্থই মহত্তের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন এবং দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। চিত্তরঞ্জন বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর কি ছিলেন, তাঁহার মৃত্যুহীন শবের শোভাযাত্রার দিনে যেমন অনুভূত হইয়াছিল, তেমনই আজ তাঁহার ব্যক্তিত্বের অভাবে বাঙ্গালার দুর্দ্দশা দেখিয়া অনুভূত হইতেছে। ত্যাগের আদর্শ এই বিরাট পুরুষের প্রতি কলিকাতাবাসী আজ শ্রদ্ধাপ্রীতির পরিচয় প্রদান করিয়া তাঁহাকেই যে সম্মানিত করিয়াছেন, তাহা নহে, আপনারাও সম্মানিত হইয়াছেন। কেহ কেহ এই নাম-পরিবর্ত্তনে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। সেন্ট্রাল এভেনিউ নাম এত পরিচিত হইয়া গিয়াছে যে, উহার পরিবর্ত্তন বড়ই বিসদৃশ বোধ হয়। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, যখন 'সেন্ট্রাল রোড' 'হ্যারিসন রোড' নামে পরিচিত হইয়াছিল, তখনও ত এমন ভাব কাহারও কাহারও মনে উদয় হইয়াছিল। কিন্তু আজ কয় জন 'সেন্ট্রাল রোডের' নাম মনে করিয়া রাখিয়াছেন ? 'হ্যারিসন রোড' নাম কি এখন কাহারও নিকট বিসদৃশ বলিয়া মনে হয় ? তবে ? হ্যারিসন কি চিত্তরঞ্জন অপেক্ষা বড় ছিলেন ? তবে চিত্তরঞ্জন নামে আপত্তি কিসের ? চিত্তরঞ্জন কলিকাতার প্রথম মেয়র—সেই মেয়রের কার্য্য তিনি কিরূপ গাম্ভীর্য্য, দক্ষতা ও নিরপেক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন, তাহা সকলেই জানেন। মাত্র এই হিসাবে তাঁহার নাম এইভাবে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখার প্রয়োজন ছিল। সম্ভবতঃ এই হিসাবেই শ্যামবাজারের পার্কের নাম চিত্তরঞ্জন পার্ক রাখা হইবার কথা হইয়াছে। ইহা ছাড়া চিত্তরঞ্জন কলিকাতার বস্তীর দরিদ্রগণের যথার্থ বন্ধু ছিলেন। তিনি দরিদ্রনারায়ণ-সেবার জন্য কর্পোরেশানের ধনভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়াছিলেন। যে পুরুষপ্রবর চাঁদপুরে বিপন্ন দরিদ্র কুলীদের জন্য তরঙ্গভঙ্গ-ভীষণা পদ্মার দুস্তর তরঙ্গে ক্ষুদ্র তরণীবক্ষে পাড়ি দিতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়েন নাই, তিনি যে কলিকাতার দরিদ্র বিপন্ন আতুরের জন্য চিকিৎসা, সেবা, শিক্ষা ও বস্তীর উন্নতির বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন, ইহা ত স্বাভাবিক। এই দরিদ্র-বন্ধুর স্মৃতিসম্মানরক্ষার্থ কলিকাতাবাসী যদি তাঁহার নামে একটি রাস্তার নামকরণ করে, তাহা হইলে কি তাহারা বিশেষ অপরাধে অপরাধী হয় ?

---

* প্রবাসী—১৩২৮, ফাল্গুন ও চৈত্র, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের লিখিত "নাথপন্থ" শীর্ষক প্রবন্ধ এবং Journal of the Bihar and Orissa Research Society, 1919, Vol v, Part II. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের Literary history of the Pala period প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

† শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাঙ্গালার ইতিহাস দ্রষ্টব্য, পৃঃ ২৪৮ ও ২৪৯।

## সার আশুতোষের অভাব

গত ১১ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার কলিকাতার জনগণ পরলোকগত সার আশুতোষ সরস্বতীর স্মৃতি-পূজা করিয়াছিলেন। মহত্তের প্রতি—জাতির পুরুষ-ব্যাঘ্রের প্রতি এই সম্মান-প্রদর্শনে বাঙ্গালী নিশ্চিতই গৌরবান্বিত ও ধন্য হইয়াছে। সার আশুতোষ বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর কত বড় শ্লাঘার জিনিষ ছিলেন, তাহা বোধ হয়, কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। কেবল বাঙ্গালীর কেন, সার আশুতোষের ন্যায় গভীর জ্ঞানী, পরম চরিত্রবান্, বিরাট স্বাধীনচেতা পুরুষ সকল দেশের সকল জাতিরই গৌরবের পদার্থ। তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা-প্রীতির অঞ্জলি দান করিলে কোনও দেশের কোনও জাতিরই ক্ষতির সম্ভাবনা নাই।

আজ বাঙ্গালার এই বিরাট পুরুষের অভাব বাঙ্গালী মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছে। তাঁহার ন্যায় রাজনীতিক দলাদলির অতীত বিচক্ষণ মেধাবী পুরুষের অভাব, এই সাম্প্রদায়িক বিরোধের দিনে সত্যই বিশেষরূপে অনুভূত হইতেছে। তাঁহার বিরাট ব্যক্তিত্ব এ সময়ে উভয় সম্প্রদায়ের মতবিরোধ বা মনোমালিন্য সমাধানে বিশেষ সহায়তা করিত, আমাদের এইরূপই বিশ্বাস। তিনি হিন্দু হইলেও মুসলমানের হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু ছিলেন, তাঁহার মুসলমান গুণগ্রাহীর অভাব নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার নিকট সাম্প্রদায়িকতা ছিল না। এই কারণে এ সময়ে তাঁহার উপদেশ ও পরামর্শ উভয় সম্প্রদায়েরই পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় হইত।

আর এক বিষয়ে তাঁহার অভাব বিশেষরূপে অনুভূত হইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার প্রভাবের অভাব এতই অনুভূত হইতেছে যে, উহাকে যেন বীচিবিক্ষোভিত মহাসমুদ্রে কর্ণধারহীন তরণী বলিয়াই অনুমিত হইতেছে। তাঁহার বিরাট ব্যক্তিত্ব বিশ্ববিদ্যালয়কে যে স্বাধীনতা ও শক্তি প্রদান করিয়াছিল, আজ তাহার অভাবে এই প্রতিষ্ঠান যেন প্রাণহীন যন্ত্রমাত্রে পরিণত হইতে বসিয়াছে। অনেকে এখন শিক্ষার সংস্কারের প্রয়াসী। কেহ বলিতেছেন, পরীক্ষা কঠিন করা হউক, কেহ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, স্কুলের শিক্ষাকে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হউক, কেহ বা বলিতেছেন, মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন হউক, আবার কেহ বা তাহার বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন, ইংরাজী শিক্ষার বাহন না হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর যে সম্মানটুকু আছে, তাহাও কর্পূরের মত উবিয়া যাইবে। এইরূপ নানা মুনি নানা মত দিতেছেন। এ দিকে ধীরে ধীরে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতাও ক্রমশঃ অপহৃত হইতেছে। এ সময়ে শিক্ষার লক্ষ্য নির্দ্দেশ করিবার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা-রক্ষা করিবার নিমিত্ত সার আশুতোষের উপস্থিতি কত প্রয়োজনীয়, তাহা কি কাহাকেও বুঝাইবার প্রয়োজন হয়?

সার আশুতোষ পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল মানব। তাঁহার বিরাট মস্তিষ্ক অনেক ক্ষেত্রে অকূলেও কূল খুঁজিয়া বাহির করিত। যখন অর্থের অভাবে বিশ্ববিদ্যালয় চরম দুর্দ্দশায় উপনীত হইয়াছিল, তখনও অনেকবার সার আশুতোষ বিপৎসাগরে কর্ণধার হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়-তরণীকে কূল দেখাইয়াছিলেন। শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়-কালেও তাঁহার মস্তিষ্ক একটা না একটা উপায় নির্দ্ধারণ করিত সন্দেহ নাই। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়কে ক্রমশঃ জাতীয়ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া আনিতেছিলেন। তাঁহার অকালে মৃত্যু না হইলে এত দিন সে শুভ-কার্য্য বহুদূর অগ্রসর হইত, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

অধুনা জাতীয়ভাবে শিক্ষার সংস্কার ( Back to the Vedas ) প্রার্থনা করিবার একটা তরঙ্গ উঠিয়াছে। লর্ড সিংহের মত পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষায় অনুপ্রাণিত সরকারের সহিত সংশ্লিষ্ট মনীষীও আমাদের বর্ত্তমান বিদেশী বিজাতীয় শিক্ষার পরিবর্ত্তে খাঁটি দেশীয় এবং জাতীয় শিক্ষার প্রবর্ত্তনের কথার অবতারণা করিয়াছেন। তিনি আইন কলেজের দুয়ারে তালা লাগাইতেও পরামর্শ দিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বলিয়াছেন,—আমাদের সেই 'সেকেলে' যাত্রা, কথকতা, রামায়ণ গান, চণ্ডীপাঠ, ভাগবতপাঠ প্রভৃতির পুনরুদ্ধার করিয়া লোকশিক্ষার পথ সহজ, সরল ও অনায়াসলব্ধ করিতে হইবে, অন্যথা শিক্ষার প্রকৃত সংস্কার সম্ভবপর হইবে না। সার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্তের স্বরচিত জীবন-কথা হইতেও আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, তিনিও যাত্রা, কথকতা, রামায়ণ গান ইত্যাদিকে আমাদের লোকশিক্ষার প্রধান ও প্রথম উপকরণ বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। সার আশুতোষ বাঁচিয়া থাকিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যে এই ভাবের লোকশিক্ষার সহায়ক সংস্কারের ব্যবস্থা করিতেন, তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই। অন্ততঃ প্রাথমিক ও মধ্যপন্থী শিক্ষার সঙ্গে যে ক্রমশঃ এই ভাবের সংস্কারের ব্যবস্থা হইত, তাহা সার আশুতোষের কার্য্য-প্রণালী অনুধাবন করিলেই বুঝা যায়। তিনিই প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষার প্রাধান্য দানের সঙ্কল্প করেন এবং নিজের জীবদ্দশায় সেই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করেন। তাঁহার ন্যায় স্বদেশ ও স্বজাতি-প্রেমিক কয় জন বাঙ্গালী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন?

## সতীত্ব বনাম মনুষ্যত্ব

এত কাল লোকের ধারণা ছিল, সতীত্ব একটি সর্ব্বজন-বাঞ্ছনীয়, মহা-মহিমান্বিত ও কঠোর তপস্যার ন্যায় প্রভাবসম্পন্ন পদার্থ, আর সাধ্বী নারী সমাজের পূজার্হ। কিন্তু কিছুকাল হইল, বঙ্গীয় সাহিত্যক্ষেত্রে সূক্ষ্ম-চিন্তার ফলে আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, সতীত্ব নিখুঁত ভাল জিনিষ নহে, ইহা মনুষ্যত্ব-বিকাশের অন্তরায়। প্রধানতঃ মাসিক পত্রাদিতেই এই অভিনব মত প্রচারিত হইতেছে। এই মতটি সত্য হইলে সীতা, সাবিত্রী, সতী, গান্ধারী, বেহুলা, দময়ন্তী প্রমুখ প্রাতঃস্মরণীয়া রমণী-দিগকে তাঁহাদের গৌরবের আসন হইতে নামাইয়া দিতে হয়, রাজস্থানের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ জহরব্রতগুলিকে বর্ব্বরতার নিদর্শনমাত্র মনে করিতে হয়, সাবিত্রী-ব্রত, পীঠ-মাহাত্ম্য প্রভৃতিকে কুসংস্কারের পর্য্যায়-ভুক্ত করিতে হয় এবং ভারতীয় সভ্যতার যাহা একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য—যাহা বিদেশীয় পরিব্রাজকেরও বিস্ময় আকর্ষণ করিয়াছিল, তাহাকে বিস্মৃতি-গর্ভে চিরকালের জন্য বিসর্জ্জন দিতে হয়।

এত বড় বড় অতগুলি কায করিবার পূর্ব্বে উক্ত অভিনব মতটি একবার আলোচনা করিয়া দেখা সাহিত্যিক, সামাজিক সকলের পক্ষেই একান্ত আবশ্যক বলিয়া মনে হয়।

সতীত্বের বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি উঠিয়াছে, তন্মধ্যে এই কয়েকটি প্রধান :—

(১) এ দেশের স্ত্রীলোকদিগকে জোর করিয়া খাঁচায় পুরিয়া রাখার দরুণ তাহারা বাধ্য হইয়া সতী থাকে, উহা যথার্থ সতীত্ব নহে, উহার কিছু মূল্য নাই।

(২) গুণের আদর ও পূজা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক ও উন্নতি-জনক, কিন্তু পতি ভিন্ন অন্য পুরুষের মধ্যে সদ্গুণ দৃষ্ট হইলে তৎপ্রতি যে স্বাভাবিক আকর্ষণ ও শ্রদ্ধা, তাহা স্ত্রীলোকের পক্ষে সমাজ দূষ্য মনে করে, ইহাতে মনুষ্যত্বের অবাধ বিকাশ হইতে পারে না।

(৩) মানসিক অপবিত্রতা বর্ত্তমান থাকিলে দৈহিক সতীত্ব অর্থহীন হয়।

(৪) সতীত্ব যদি খুব প্রয়োজনীয় সদ্গুণই হয়, তবে উহা স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের পক্ষেই প্রয়োজনীয়।

এই আপত্তিগুলির মধ্যে মাত্র শেষোক্তটি ছাড়া অন্যগুলি কত দূর সঙ্গত ও বিচারসহ, তাহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধে বিবেচনা করা হইবে।

## (১) সতীত্ব ও অবরোধ-প্রথা

স্বভাবের উপর অভ্যাসের প্রভাব:—আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্মসংযমের শক্তি ব্যতিরেকে কেহই যথার্থ জিতেন্দ্রিয়তা লাভ করিতে পারে না সত্য, কিন্তু এইরূপ জিতেন্দ্রিয়তা সংসারে একান্ত বিরল। মানুষ যে পর্য্যন্ত শ্রেয়ঃ প্রেয় এতদুভয়ের পার্থক্য ও আপেক্ষিক মূল্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া আত্মনিয়ন্ত্রণশক্তি লাভ না করে, সে পর্য্যন্ত তাহাকে ধরিয়া বাঁধিয়া নিয়মাধীন রাখিতে পারিলে এই নিয়মানুবর্ত্তিতা ক্রমে অভ্যাসে দাঁড়াইয়া অবশেষে তাহার প্রকৃতিগত হইয়া পড়ে। প্রসিদ্ধ মনস্তত্ত্ব-নীতিবিজ্ঞানবিৎ ডাঃ মার্টিনো এইরূপ বাধ্যতামূলক নিয়মানুবর্ত্তিতার নৈতিক মূল্য ও উপযোগিতা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। গীতা ও অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থেও এই অভ্যাসযোগের উপকারিতা বর্ণিত আছে। বালকবালিকাগণের শিক্ষা ও চরিত্র-গঠনকার্য্যে মনোবিজ্ঞানের এই অতি প্রয়োজনীয় নিয়মটির সাহায্য লওয়া হইয়া থাকে। চঞ্চল শিশু পাঠশালায় আসিয়া কিছুদিনের মধ্যেই স্থির হইয়া বসিতে ও পাঠে মনঃসংযোগ করিতে শিক্ষা করে। ড্রিল শিখিয়া আদেশ পাওয়ামাত্র অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি প্রয়োজনমত সন্নিবেশিত করিতে পারে। অরুচি-গ্রস্ত জ্বররোগীকে জোর করিয়া এক আধটুকু মিছরি খাওয়াইলে যেমন তাহার মুখে রুচি আইসে, স্বভাবতঃ ভগবদ্-বিমুখ লোক শুধু নিয়মরক্ষার খাতিরে সন্ধ্যানুষ্ঠান অভ্যাস করিলেও ক্রমে ভগবানের নামে তাহার রুচি হয়। ইহার সঙ্গে সাধুসঙ্গ বা সদ্গ্রন্থাদির প্রভাব যোগ হইলে ঐ রুচি স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হয়।

দণ্ডভয়ে কায করা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ:—প্রথম হইতেই আন্তরিক ইচ্ছাবশতঃ সৎপথে কয় জন লোক থাকে? প্রতিনিয়ত কর্ত্তব্যে ব্যাপৃত থাকা, প্রলোভনের বস্তু হইতে দূরে থাকা,—গুরুজন-সান্নিধ্যে লোকলজ্জা ও গঞ্জনার ভয়, সুযোগের অভাব ইত্যাদি কারণেই অধিকাংশ লোক পাপকার্য্য হইতে বিরত থাকে। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, সদনুষ্ঠান একবার অভ্যস্ত হইয়া গেলে উহা হইতেই ক্রমে অন্তঃশুদ্ধি ও জিতেন্দ্রিয়তা লাভ হয়। শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও কবি Wordsworth তাঁহার Ode to Duty শীর্ষক কবিতার মধ্যে কর্ত্তব্যানুরাগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,—From Vain temptations dost set free, And calmest the weary strife of frail humanity"—"দুর্ব্বলচিত্ত মানুষ যে প্রলোভনের সহিত যুদ্ধ করিয়া অনর্থক ক্লান্ত হইয়া থাকে, তাহা হইতে, হে কর্ত্তব্য, তুমিই তাহাকে রক্ষা করিয়া যুদ্ধের অবসান করিয়া থাক।" বস্তুতঃ, সর্ব্বদা কর্ত্তব্যে তন্ময়চিত্তে ডুবিয়া থাকিলে অসচ্চিন্তা মনে উদিত হইবার অবকাশই পায় না। উদাহরণস্বরূপ বিজ্ঞান-বীর Newtonএর নাম উল্লিখিত হইতে পারে। তাঁহার মনে কামের প্রভাব ছিল না। বেদান্ত-চিন্তায় মগ্ন থাকিয়া কামপ্রভাব খর্ব্ব করিবার উপদেশ হিন্দুশাস্ত্রে আছে।

সাধু সাবধান! ফাঁদে পা দিও না:—"যতনে সঞ্চিত পুণ্য নিমেষে হরণ করে" বলিয়া প্রলোভনের সহিত যুদ্ধ করিবার শক্তি যাহাদের নাই, উহা হইতে দূরে থাকাই তাহাদের পক্ষে কল্যাণজনক। খৃষ্টীয়ানদিগের প্রাতঃকালীন প্রার্থনার মধ্যে আছে, "হে ভগবন্, আমাদিগকে পরীক্ষায় ফেলিও না।" রূপের প্রতি আকর্ষণ স্বাভাবিক। এই আকর্ষণের ফলে নরনারী পরস্পরের সৌন্দর্য্য দর্শনের জন্য লালায়িত। রূপজ মোহ মদ্যের মতই মত্ততা আনয়ন করে। মদ্য মুখের ভিতর দিয়া আর রূপ দর্শনেন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া নিজ নিজ প্রভাব বিস্তার করে, এইটুকু মাত্র প্রভেদ। এই স্বাভাবিক আকর্ষণের প্রভাব অতিক্রম করিতে না পারিলে তেজোহানি অনিবার্য্য। এই জন্যই শঙ্কর, বুদ্ধ, চৈতন্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া ইদানীন্তন কালের শ্রীরামকৃষ্ণ, বিজয়কৃষ্ণ প্রমুখ পুরুষপ্রধানরা নরনারীকে এ সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতাবলম্বন করিবার উপদেশ দিয়াছেন। বিনা দোষে ছোট হরিদাসের প্রতি শ্রীচৈতন্যদেব যে কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা কেবল নিয়মের মর্য্যাদারক্ষা ও আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য। বিষয়টি খুব গুরু বলিয়াই এ সম্বন্ধে এতদূর কড়াকড়ি ব্যবস্থা মহাপুরুষমাত্রেই করিয়া গিয়াছেন। গুণের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল রূপজ-মোহের প্রেরণাবশে কার্য্য করিলে ঠকিতে হয় এবং ঐ মোহ-সম্ভূত প্রণয়ও স্থায়ী হয় না, ইহা বঙ্কিমচন্দ্রও হরদেব ঘোষালের মুখে আমাদিগকে বুঝাইয়াছেন। Shakespeareএর Merchant of Venice নামক নাটকেও এই বিষয়ের উপদেশ আছে। কালিদাসের শকুন্তলাতেও শার্ঙ্গরবের "এবং দহতি চাপলং" ইত্যাদি বাক্যে সেই উপদেশই পাওয়া যায়। লোলুপ নয়নকে শাসনাধীনে রাখিতে না পারিলে কিরূপ অনর্থ ঘটিয়া থাকে, কুন্দ, শৈবলিনী, দেবযানী ও নগেন্দ্র, বিল্বমঙ্গল প্রভৃতি তাহার উদাহরণস্থল। কিয়দ্দিন পূর্ব্বে প্রকাশ্য রাজপথে, দিবালোকে, সর্ব্বজনসমক্ষে, জনৈক পার্শী যুবতীর লাঞ্ছনাও অন্যতম উদাহরণ। "That thou wert beautiful and I not blind, Hath been the fault which shuts me from mankind"—ট্যাসোর এই উক্তিতেও ইহাই প্রকাশিত হইয়াছে। যীশুখৃষ্ট বলিয়াছেন,—"সমস্তটা শরীর নরকাগ্নিতে দগ্ধ হইতে দেওয়ার অপেক্ষা চক্ষু দুইটিকেই বরং উৎপাটিত করিয়া ফেলা শ্রেয়স্কর।" বিল্বমঙ্গল তাহাই করিয়াছিলেন।

প্রলোভন হইতে আত্মরক্ষা করা প্রথম বড়ই কঠিন। রূপজ মোহ যখন এতই আপদবহুল, তখন ইহার হাত এড়াইতে চেষ্টা করাই নিরাপদ ও যুক্তিসঙ্গত। যে দেখাদেখি ও চাওয়া-চাওয়ি হইতে ইহার উদ্ভব ও পুষ্টি হয়, তাহাকে বাধা দেওয়ার ব্যবস্থা করাই সমাজের পক্ষে কল্যাণজনক। অবরোধপ্রথাই সেই ব্যবস্থা। যে কার্য্য মন্দ ও অকল্যাণকর, তাহা যত দুষ্কর হয়, ততই মঙ্গল। গাছ যত দিন চারা থাকে, তত দিন উহাকে বেড়ার মধ্যে রাখাই নিরাপদ,—পরমহংসদেবও ইহা বলিয়া গিয়াছেন। গাছ বড়, দৃঢ় ও প্রতিরোধক্ষম হইলে বেড়া দেওয়ার প্রয়োজন থাকে না। এই কলিকাতা সহরে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত ঘরের বালকবালিকাদের চরিত্রের উপর ফিরিওয়ালাদের কিরূপ প্রভাব, তাহা যিনি লক্ষ্য করিয়াছেন, তিনি অবরোধবিহীনা মেয়েদের অবস্থাও সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। চাই ২২ ভাজা, অবাক্ জলপান, চানাচুর, কুলপী বরফ, কাঠী বরফ, গোলাপছড়ি, জয়নগরের মোয়া, কৃষ্ণনগরের সরভাজা, বাগবাজারের রসগোল্লা, ঢাকাই ক্ষীর ইত্যাদি নাম দিয়া রকম বে-রকম খাদ্য, অখাদ্য, ছাই-মাটী, পচা, বাসি জিনিষ একটির পর আর একটি ক্রমাগত ২৪ ঘণ্টা ফিরিওয়ালারা দ্বারে দ্বারে ফিরি করিয়া যায়, সেই কণ্ঠস্বর কানে প্রবেশ করিলে অরক্ষিত বালকবালিকাগণ আর স্থির থাকিতে পারে না। তাহারা দিশাহারা হইয়া ছুটিয়া আইসে, আর অর্থ ও স্বাস্থ্য বিনিময়ে বিষ কিনিয়া উদরস্থ করে। যখন তখন সম্মুখে ঐ সমস্ত প্রলোভনের বস্তু পাইয়া তাহারা সামলাইতে পারে না, তাহাদের মধ্যে আত্মসংযমের শক্তিটি উন্মেষিত হইবার অবকাশই ঘটে না। কর্ত্তা আফিসে, কর্ত্রী তাস বা কলের গান লইয়া ব্যস্ত। ছেলের আবদার উৎপাত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য দুই চারিটি পয়সা ফেলিয়া দেন, মিটিয়া যায়। হতভাগা বালকবালিকাগণের ভবিষ্যৎ কে চিন্তা করে? অবরোধমুক্ত নারীদিগের অবস্থাও কতকটা এইরূপ। সংযমবিষয়ক শিক্ষা, উপদেশ ও দৃষ্টান্ত প্রভৃতি দ্বারা তাহাদের চরিত্র সম্যক্‌রূপে গঠিত ও সুদৃঢ় না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদিগকে অন্তঃপুরের নিরাপদ আশ্রয়ে রক্ষা করাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

পুরুষও নারীর মতই দুর্ব্বল;—অবলাও আত্মসংযমে অশক্ত বলিয়া অপবাদটা কেবল স্ত্রীজাতির আছে। Shakespeareএর Hamlet, Richard III প্রভৃতি কাব্যে স্ত্রীজাতির দুর্ব্বলতার বিশেষ

পরিচয় পাওয়া যায় ( Frailty ! thy name is woman ! ). বাইবেলেও তাহার অভাব নাই। আমাদের দেশে ব্যাস, মনু, রঘুনন্দন, তুলসীদাস প্রভৃতির গ্রন্থে এবং শাস্ত্রে ও অন্যান্য গ্রন্থেও স্ত্রীলোক সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বনের উপদেশ আছে। কিন্তু ইহাতেই প্রকারান্তরে স্বীকার করা হইয়াছে যে, পুরুষও দুর্ব্বলচিত্ত, নচেৎ স্ত্রীলোককে রাক্ষসী, বাঘিনী, সর্পীর মত ভয় করিবার বা নরক-দ্বারের মত ঘৃণা করিবার কোন কারণ ছিল না। মোহিনী-মূর্ত্তিরূপিণী বিষ্ণুমায়া দ্বারা কন্দর্প-জয়ী মহাদেবের চিত্ত-বিভ্রম, উগ্রতপা ঋষিদিগের নিকট পরতপোভীরু দেবরাজের পুনঃ পুনঃ অপ্সরা প্রেরণ দ্বারা কৃতকার্য্যতা লাভ ইত্যাদি ব্যাপার হইতে এই সিদ্ধান্তই হয়, যদিও শাস্ত্রকারেরা মুখে স্পষ্টতঃ এ সম্বন্ধে কোন উক্তি করেন নাই। কোন শাস্ত্রকারিণীর হস্তে চিত্রফলক পড়িলে পুরুষের কিরূপ চিত্র অঙ্কিত হইত, বলা যায় না। কিন্তু ইহা বোধ হয়, নিশ্চিতরূপেই বলা যাইতে পারে যে, ভগবতী মায়ার প্রভাব স্ত্রী, পুরুষ কেহই অতিক্রম করিতে পারে না,—উভয়েই পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে। স্ত্রী-জাতির স্বাভাবিকী লজ্জার বাঁধ অনেক সময়ই তাহাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকে। কিন্তু "অবরোধের উচ্চ প্রাচীরটি" ভাঙ্গিয়া দিলে সঙ্গে সঙ্গে লজ্জারূপ বাঁধটিও ভাঙ্গিয়া যাইবার বিশেষ আশঙ্কা থাকে। অবরোধপ্রথাকে সতীত্বরক্ষার অনুকূল বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়।

সাধ্বী নারী ও সাধু পুরুষদের আচরণ :—রূপজ মোহ হইতে যে অনর্থ ঘটে, জগতের দুইখানি শ্রেষ্ঠ কাব্য তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। এই রূপের অনলেই স্বর্ণ-কিরীটিনী লঙ্কা ও ট্রয় নগরী ভস্মীভূত হইয়াছিল। রূপের এই মাদকতা-শক্তির বিষয় অবগত ছিলেন বলিয়া ভাগ্যবিপর্য্যয়বশতঃ অবরোধের আশ্রয় হইতে বঞ্চিত হইয়াও নানা উপায়ে অনেক সাধ্বী নারী স্ব স্ব ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছেন। শ্রীবৎস-মহিষী চিন্তা দেবী সূর্য্যের নিকট কুষ্ঠব্যাধির বর ভিক্ষা করিয়া পরাধীন অবস্থায় আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। বেহুলা সতী নিজকে ডোমের মেয়ে বলিয়া পরিচয় দিয়া পরপুরুষস্পর্শ হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। অনেক রাজমহিষী ও বেগম ধর্ম্মরক্ষার শেষ উপায়স্বরূপ বিষ, বিষাক্ত অঙ্গুরী বা তীক্ষ্ণ ছুরিকা গুপ্তভাবে সঙ্গে রাখিতেন। আর রাজস্থানের পদ্মিনী ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়-ললনাগণ যুদ্ধকালে শত্রু-হস্তে পড়িবার আশঙ্কার পূর্ব্ব হইতেই চিতা সাজাইয়া রাখিতেন।

প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা নারীগণের পক্ষে উৎসবাদি হইতে বিরত থাকা প্রভৃতি কতকগুলি নিয়ম পালন করিতে হয়, সেগুলিও সতীত্বরক্ষার অনুকূল।

তেজস্কাম পুরুষরা তাঁহাদের নয়নদ্বয়কে এরূপ শাসনে রাখেন যে, তাঁহাদের আনতদৃষ্টি কখনও পরস্ত্রীর মুখের দিকে উন্নমিত হইতে পারে না। "অনিবর্ণনীয়ং পরকলত্রম্" এই শাস্ত্রীয় আদেশ তাঁহারা মানিয়া চলেন। তাঁহাদের আচরণ দেখিলে মনে হয়, তাঁহারা স্বরচিত একটি অবরোধ বা অবগুণ্ঠনের মধ্যে প্রতিনিয়ত চক্ষুর্দ্বয়কে রক্ষা করেন। রামানুজ লক্ষ্মণ চতুর্দ্দশ বৎসর এই নিয়ম পালন করিয়া অসাধারণ শৌর্য্যবীর্য্য লাভ করিয়াছিলেন। এমন কি, সীতাদেবীর মুখের দিকেও তিনি দৃষ্টিপাত করিতেন না। মাতার আদেশ ছিল, "মাং বিদ্ধি জনকাত্মজাম্"—"সীতাকে সুমিত্রা বলিয়াই জানিবে।" তাই তিনি সীতাদেবীর মুখের দিকে কখনও চাহিতেন না। নারীর মুখের মধ্যে তেজোহানিকর কিছু যদি না-ই থাকিবে, তবে লক্ষ্মণাদি বীরের ও অন্যান্য মহাপুরুষের পক্ষে এইরূপ আচরণ কি পাগ্‌লামী মাত্র ? কেহ কেহ বলিতে পারেন, ইহাতে লক্ষ্মণাদির আত্মসংযমশক্তির অভাবই সূচিত হইতেছে। মানিয়াই লইলাম, কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই, সাধারণের মধ্যে সেই শক্তির অসদ্ভাব-আরও অধিক কি না ? মদ্য ও স্ত্রী-প্রসঙ্গ দ্বারা অবিকৃত থাকা তান্ত্রিক সাধনার অঙ্গ, কিন্তু দুর্ব্বলচিত্ত সাধারণ মানুষের পক্ষে কি তাহা সম্ভবপর ?

হইতে পারে, বর্ত্তমান সময়ে মুষ্টিমেয় মহিলা অবরোধের সাহায্য ব্যতিরেকেও সর্ব্বাংশে পবিত্রতা রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন। ইঁহাদের স্থান বেহুলা, দময়ন্তী প্রভৃতির পার্শ্বে। কিন্তু নিয়মের কড়াকড়ি সাধারণের জন্য। তবে দশের মঙ্গলার্থ অসাধারণকেও নিয়মের শৃঙ্খল স্বীকার করিতে হয়। সৌভাগ্যক্রমে অনেক সম্ভ্রান্ত মহিলাই অবরোধকে কঠোর বিধি-নিষেধের "লৌহ-বেষ্টনী" তুল্য অপ্রীতিকর মনে করেন না ; বরং যাঁহারা সেরূপ মনে করেন, তাঁহাদের "লেখা দেখিয়া লজ্জানুভব" করেন ও "ক্রোধান্ধ চিত্তে" প্রতিবাদ করেন। পক্ষান্তরে, তেজস্কাম পুরুষ-প্রবররা স্বেচ্ছায় স্বীকৃত একটি সংযমের লৌহ-বেষ্টনীমধ্যে তাঁহাদের দৃষ্টি প্রতিনিয়ত নিবদ্ধ রাখেন, পরস্ত্রীর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করেন না। আত্মকল্যাণকামী পুরুষ কিংবা নারী, কেহই অবরোধ-বিদ্বেষী হইতে পারেন না।

## (২) সতীত্ব ও মনুষ্যত্ব,—
## মহত্ত্বের পূজা মনের স্বাভাবিক গতি

সদ্‌গুণের পূজা-পদ্ধতি :—সতীত্বে ও যথার্থ মনুষ্যত্বে বিরোধ থাকিতে পারে, ইতঃপূর্ব্বে এ কথা শুনা যায় নাই ;—উভয়ই নিবৃত্তি-মূলক। পরপুরুষের গুণে মুগ্ধ হওয়া দূষ্য, সুতরাং সতীত্ব মনের স্বাভাবিক গতিরোধ করিয়া মনুষ্যত্বকে সঙ্কুচিত ও জড়ে পরিণত করে, এইরূপ একটি কথা উঠিয়াছে। এখন জিজ্ঞাস্য এই, সদ্‌গুণের পূজা কিরূপে করিতে হয় ? উহাতে সতীত্ব ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কা কোথায় ? ধর্ম্মবীর, দানবীর, জ্ঞানবীর, যুদ্ধবীর ইহাদের সকলের পূজাই এ দেশের নরনারী আবহমানকাল করিয়া আসিতেছে। রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম, দ্রোণ, হরিশ্চন্দ্র, অম্বরীষ, উশীনর, পৃথু, দাতা-কর্ণ, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, নল-দময়ন্তী, সীতা, সাবিত্রী, শৈব্যা, শ্রীবৎস, চিন্তামণি ইঁহারা নরনারী-নির্ব্বিশেষে সকলেরই পূজার্হ। এই বীর-পূজা বা গুণের আদর দ্বারা মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়, হৃদয়ের সম্প্রসারণ হয় সন্দেহ নাই। ইঁহাদের কীর্ত্তি ও অবদান-কাহিনী রামায়ণ-মহাভারতে পাঠ করিবার সময় নরনারী অশ্রুসংবরণ করিতে পারে না। কিন্তু এই বীর-পূজায় বা গুণ-পূজায় সতীত্ব ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা কেহ কোন দিন করিয়াছেন কি ? রাজস্থানের ইতিহাস পাঠ করিবার সময়ও নরনারীমাত্রের হৃদয় বিস্ময়-ভক্তিতে পূর্ণ হয়। ইদানীন্তন কালের বিদ্যাসাগর, রামতনুলাল, ভূদেব, বঙ্কিম, গুরুদাস, আশুতোষ, মহাত্মা গন্ধী, অরবিন্দ প্রভৃতি আমাদের সকলেরই বিস্ময়-ভক্তি আকর্ষণ করিতেছেন, তাহাতে কোনরূপ আশঙ্কার কথা কাহারও মনে উঠিয়াছে কি ?

'রামের মত পতি পাই, লক্ষ্মণের মত দেবর পাই, দশরথের মত শ্বশুর ও কৌশল্যার মত শাশুড়ী পাই' ইত্যাদি কামনা—প্রার্থনা এ দেশের কুমারীগণের মধ্যে চিরপ্রচলিত। যাঁহারা বিবাহিতা, তাঁহারা অমুকের মত সন্তান, অমুকের মত জামাই পাই, এইরূপ কামনাই করিয়া থাকেন।

গুণের আদর বা মহত্ত্বের পূজা বলিতে এই বুঝায় যে, ভক্তিপ্রভাবে সেই গুণ ও মহত্ত্ব অর্জ্জন করিবার জন্য একান্ত আগ্রহপূর্ণ সাধনা। ইহাতে গুণীর সান্নিধ্যলাভ স্থলবিশেষে বাঞ্ছনীয় হইলেও একান্ত আবশ্যক নহে। মৃত বা দূরস্থিত গুণী ও মহতের প্রতিও এই শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পিত হইতে পারে এবং তাহাতে আত্মার উন্নতিও হয়, এমন কি, সেই সদ্‌গুণ ন্যূনাধিকপরিমাণে লাভ হইয়া থাকে। 'ধ্যাতা ধ্যেয় পদার্থের স্বরূপ প্রাপ্ত হয়', পাতঞ্জলদর্শনে ইহা উক্ত হইয়াছে। মনোবিজ্ঞানের এই অত্যাশ্চর্য্য নিয়মের ফলেই একলব্য দ্রোণের

মূর্ত্তি-পূজা করিয়া দ্রোণের অসাধারণ যুদ্ধকৌশল আয়ত্ত করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, দ্রোণাচার্য্য ইহা জানিতেন না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, পূজার্হ ব্যক্তির অজ্ঞাতসারেও তাঁহার পূজা সম্ভবপর। এরূপ পূজায় সতীত্বহানির আশঙ্কা কোথায়? আর সতীত্বের সহিত আত্মসম্প্রসারণের বা মনুষ্যত্ববিকাশের বিরোধই বা কোথায়?

তবে যেখানে 'রূপ লাগি আঁখি ঝোরে গুণে মন ভোর';—যেখানে 'পূজার তরে হিয়া, উঠে যে ব্যাকুলিয়া, কি দিয়া পূজিব তারে গিয়া?' —এবং 'মন-প্রাণ যা ছিল সব সঁপে দিয়েছি'—এইরূপ অবস্থা, সেইখানেই হৃদয়ের দেবতাকে সাক্ষাৎভাবে প্রীতি-নৈবেদ্য দিতে না পারিলে তৃপ্তি ও চরিতার্থতা আইসে না; আকাঙ্ক্ষা মিটে না। দেহ দ্বারা দাস্যভাবে সেবার স্পৃহাও ইহার সঙ্গে জড়িত থাকিতে পারে। ইহা গুণের পূজা বা ভক্তি নহে—মোহ। পরপুরুষের প্রতি এই ভাব কুলস্ত্রীর পক্ষে অমার্জ্জনীয় দুর্ব্বলতা এবং মনুষ্যত্ব-বিকাশের অন্তরায়। ইহাতে আত্মনিয়ন্ত্রণশক্তির অভাব রহিয়াছে, সুতরাং ইহা স্বাধীনতা নহে—স্বেচ্ছাচার বা প্রবৃত্তির সেবা। প্রবৃত্তির সেবাতেই অবশ্য "জীবনের প্রফুল্লতা ও সজীবতা" কিয়ৎপরিমাণে বর্ত্তমান, কিন্তু সে প্রফুল্লতা মত্ততা মাত্র,—যথার্থ আনন্দ নহে। "যথার্থ সৌন্দর্য্য সমাহিত সাধকের কাছেই প্রত্যক্ষ;—লোলুপ ভোগীর কাছে নয়; সৌন্দর্য্যপ্রিয়তার মধ্যে সতীত্বের সংযম না থাকিলে সে কেবলই সৌন্দর্য্যের বাহিরে বাহিরে চঞ্চল হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়,—মত্ততাকেই আনন্দ বলিয়া ভুল করে।"

এইরূপ "সতীত্বের সংযম" কি হৃদয় ও মনকে একটা সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া……মনের স্বাভাবিক গতিরোধ করত…স্বাধীন মানবাত্মাকে সঙ্কুচিত ও জড়ে পরিণত করে?" না ইহাতেই যথার্থ স্বাধীনতা বা আত্মনিয়ন্ত্রণ-শক্তির পরিচয়? অন্ধ-রাজমহিষী গান্ধারী দেবী যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দৃঢ়বস্ত্রাবরণে নিজের চক্ষু দুইটি বাঁধিয়াছিলেন,—ভগবানের দান চক্ষু-রত্নের অধিকারিণী হইয়াও স্বেচ্ছায় অন্ধত্বের দুঃখ-দুর্ভাগ্যকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন, ইহাতে কি তাঁহার আত্মার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল? না সমধিক শক্তিমত্তাই সূচিত হইয়াছিল? "মধুপাত্রে হত-প্রাণ পিপীলিকার মত ভোগসুখে জীর্ণ হয়ে থাকাতেই" বেশী শক্তি? না, "রোগ-শোক-ব্যথিতের হাহাকার ধ্বনিতে" অস্থির ও লুপ্তধৈর্য্য হইয়া রোগি-শুশ্রূষার জন্য কুষ্ঠাশ্রমে প্রবেশ ও কুষ্ঠযন্ত্রণাকে বরণ করাতেই বেশী শক্তি? স্বয়ংকৃত আত্মনিগ্রহ ও আত্মসঙ্কোচেই যথার্থ স্বাধীনতা। নিবৃত্তিতেই আত্মীয়শক্তির প্রকাশ।

এই সংযমমূলক পাতিব্রতাধর্ম্ম প্রায় রূপগুণনিরপেক্ষ। বস্তুতঃ, রূপগুণাদি ভিত্তির উপর যে পতিপ্রেম প্রতিষ্ঠিত, তাহার স্থায়িত্ব কত দিন?—যত দিন পুরুষান্তরের উৎকৃষ্টতর রূপগুণ হৃদয়ের উপর প্রভাব বিস্তার না করে। এই প্রকার বিচারবিহীন অন্ধ-ভক্তি ও অটুট নিষ্ঠা সহজ কথা নহে। আর সহজ কথা নহে বলিয়াই সীতা, সাবিত্রী, গান্ধারী, বেহুলাদির পাতিব্রত্যপ্রভাব উগ্রতপাঃ ঋষিদিগের তপঃপ্রভাব অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন ছিল না। যম-নিয়ম-শমদমাদি তপস্যার সমস্ত অঙ্গই পাতিব্রত্যব্রতের মধ্যে নিহিত আছে। নেত্র-শ্রোত্রাভিরাম রূপ ও শব্দাদি হইতে নেত্র-শ্রোত্রাদিকে প্রত্যাহৃত করিয়া গৃহপ্রাচীরের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে গৃহধর্ম্ম পালন করা, প্রতিনিয়ত একই কর্ত্তব্যে ব্যাপৃত থাকা অসাধারণ ধৈর্য্য ও শক্তিসাপেক্ষ। প্রফুল্ল ( "দেবী চৌধুরাণী" ) সন্ন্যাস ছাড়িয়া সংসারে প্রবেশের সময় বলিয়াছিলেন,—"কঠিন ধর্ম্ম এই সংসারধর্ম্ম। ইহার অপেক্ষা কোন যোগই কঠিন নহে।" বস্তুতঃ উপযুক্ত শিক্ষা, বল ও প্রীতি না থাকিলে এই "কঠোর কর্ত্তব্য-কারাগারের" নিয়মাবলী যথাযথরূপে পালন করা যায় না। সাধ্বী নারী পতিকে ঠিক প্রত্যক্ষ দেবতার মতই দেখেন। পতির পাদোদক পান না করিয়া জল গ্রহণ করেন নাই, এরূপ নারী এই প্রবন্ধ-লেখক দেখিয়াছেন।

মনোবৃত্তির স্বাভাবিক গতিরোধ করিলেই যে মানুষ জড়ে পরিণত হয়, ইহা ঠিক নহে। অভ্যাসবলে স্বভাবকে পরিবর্ত্তিত করা এবং অস্বাভাবিককে স্বাভাবিকে পরিণত করাতেই মনুষ্যের বিশেষত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব। অভ্যাস এই জন্য দ্বিতীয় স্বভাব বলিয়া অভিহিত হয়। বহিঃপ্রকৃতির ন্যায় অন্তঃপ্রকৃতির উপর আধিপত্য করাও মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত। মনোবৃত্তির স্বাভাবিক গতিকে স্থলবিশেষে রুদ্ধ, স্থলবিশেষে নিয়ন্ত্রিত বা পরিবর্ত্তিত করিয়া মানুষ ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। বিশ্বরহস্য-উদ্ঘাটন-প্রয়াসে বিজ্ঞান ও দর্শন-জগতে জ্ঞানযোগিগণের একাগ্রতাও তন্ময়ত্বলাভ; কাম, ক্রোধ, লোভাদিকে জয় করিয়া ভক্তিযোগী বা ধর্ম্মবীরগণের আধ্যাত্মিক বললাভ;—ইন্দ্রিয়-নিরোধ বা প্রত্যাহারাদি দ্বারা তাপসদিগের তপঃপ্রভাবলাভ;—এ সমস্তেরই মূলে মনোবৃত্তির স্বাভাবিক গতির রোধ বা নিয়ন্ত্রণ শুধু মনোবৃত্তি নহে, ক্ষুন্নিদ্রাতৃষ্ণাদি শারীর বৃত্তি, এমন কি, শ্বাসপ্রশ্বাস পর্য্যন্ত আয়ত্তাধীন করিয়া মানুষ নানাপ্রকার অসাধ্যসাধন ও আয়ুর্বৃদ্ধি করিয়া থাকে। কাম, ক্রোধ, লোভাদির স্বাভাবিক গতিরোধ যে সকল নরনারী করিতে সমর্থ হয়েন, তাঁহারা কি জড়ে পরিণত হয়েন, না মনুষ্যত্বের অভিমুখে আরও অগ্রসর হইয়া থাকেন? কুলপাবন পুত্র-কামনা থাকিলে স্ত্রী-পুরুষ উভয়কেই শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট সংযমাভ্যাস করিতে হয়। পতিব্রতা নারী পতির জীবদ্দশায় ও পতি-বিয়োগের পর সংযত হইয়া চলেন। বিধবার ব্রহ্মচর্য্য সংযম ব্যতিরেকে কিরূপে সম্ভবপর হইত? ইন্দ্রিয়সংযমের ও ধৈর্য্যধারণ পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য পালন করা সহমরণ অপেক্ষাও প্রশংসনীয় বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। সহমরণে ধৈর্য্যের অভাব সূচিত হয়।

## (৩) সতীত্ব—শারীরিক ও মানসিক

মানসিক অশৌচ ও হিন্দুশাস্ত্র:—কায়মনোবাক্যে যাঁহারা সতী হইতে পারেন, তাঁহাদের অলৌকিক প্রভাবের বিষয় অনেকেই শুনিয়াছেন। সীতাদেবীর অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া, সাবিত্রী ও বেহুলার মৃত পতির পুনর্জ্জীবনলাভ, গান্ধারীর বাক্‌সিদ্ধি,—এ সমস্তই সতীত্বপ্রভাবের নিদর্শন। কিন্তু সাধারণের পক্ষে এরূপ সতীত্ব সম্ভবপর নহে। মানসিক অপবিত্রতা দণ্ডপ্রায়শ্চিত্তার্হ হইলেও অমার্জ্জনীয় দোষ বলিয়া গণ্য নহে। মহাভারতীয় আখ্যায়িকায় বৃন্তচ্যুত আম্রকে বৃন্তারূঢ় করার জন্য কৃষ্ণার গুপ্ত-কামনাপ্রকাশজনিত নিদারুণ লজ্জা ক্ষণিক নরকযন্ত্রণাতুল্য প্রায়শ্চিত্তই হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনা-সৃষ্ট শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা দ্বিতীয় জন্মলাভ, চন্দ্রশেখর কর্ত্তৃক তাহার পুনর্গ্রহণ প্রভৃতিও এ স্থলে উল্লিখিত হইতে পারে।

মানসিক সতীত্ব অক্ষুণ্ণ রাখা কিরূপ দুরূহ ব্যাপার, চিরযৌবনা কুন্তীদেবী সম্বন্ধে ধর্ম্মপ্রাণ জিতেন্দ্রিয় যুধিষ্ঠিরের উক্তিতে তাহার আভাস পাওয়া যায়। "বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি";—অন্য পরে কা কথা? স্বভাবতঃ পাপপ্রবণ মনকে বিবেক-সাহায্যে সংযত করিতে হয়, কিন্তু এই পাপপ্রবণতাকে মনের স্বাভাবিক গতি মনে করিয়া সাংখ্যের "আকুতি" বা গীতার "মিথ্যাচার" নিন্দাকারী শ্লোকটির দোহাই দিয়া ঐ পাপপ্রবণতা বা প্রবৃত্তি অনুসরণ করিবার ব্যবস্থা বাহির করিলে সাংখ্য, গীতা বা নিজবুদ্ধি এ সকলেরই অপব্যবহার ও অবমাননা করা হয়। মানুষ ও পশুর পার্থক্যবিধানকারী সংযমকেও অনাদর করা হয়। জোর করিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়কে সংযত করিলেই যথেষ্ট হয় না, অভ্যাসবলে অন্তঃশুদ্ধি লাভ করাও দরকার, ইহাই গীতার অভিপ্রায় বলিয়া বোধ হয়। কর্ম্মেন্দ্রিয়-সংযমকেই সম্ভবতঃ প্রাধান্যও দেওয়া হইয়াছে। ঐটি বর্ত্তমান থাকিলে, স্বভাবের উপর অভ্যাসের যে প্রভাব আছে, তৎসাহায্যে অন্যটিও লাভ করা যায়। মানবচরিত্রের অন্তস্তলদর্শী কবি বলিয়াছেন,—"মনুষ্যের ইন্দ্রিয়ের

পথ রোধ কর।……মন কি করিবে? সেই এক পথে যাইবে,—তাহাতে স্থির হইবে।" তাই প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা,—একনিষ্ঠ সাধনা ও অভ্যাস দ্বারা, অসাধ্যসাধন হইল,—"শৈবলিনীর চিত্তে চিরপ্রবাহিত নদী ফিরিল।" 'কর্ম্মেন্দ্রিয়সংযম'রূপ সম্বলটি না থাকিলে শৈবলিনীর কি উপায় হইত?

শ্রীপ্রাণনাথ সরকার।

---

## ঢাকায় ছাত্র-সম্মিলন

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু এই সম্মিলনে বক্তৃতাকালে ছাত্রগণকে সৎসাহস ও জ্ঞানানুশীলনের পরামর্শ প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, "বালকদিগের মধ্যে দুর্ব্বলতা ও ভীরুতার একমাত্র কারণ এই যে, তাহাদের জননীগণ এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র দৃষ্টিক্ষেপ করেন না।"

কথাটা যে সত্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের দেশে ছেলেকে বাল্যাবধি শিক্ষা দেওয়া হয়,—লেখাপড়া করে যে, গাড়ীঘোড়া চড়ে সে। সুশীল সুবোধ ছেলে কেবল লেখাপড়া লইয়া থাকিবে, তাহাতে তাহার শরীর ও মন লেখাপড়ার পাষাণ-চাপে অবসন্ন হইয়া পড়ুক বা ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া উৎসন্নের পথে যাউক, ক্ষতি নাই। তাহাকে শারীরিক শক্তি-চর্চ্চা যে সঙ্গে সঙ্গে করিতে দিতে হয়, মনের স্বাধীন চিন্তার স্ফুরণের যে অবসর ও সুযোগ দিতে হয়, তাহা কোনও জননী একবার চিন্তা করেন কি না সন্দেহ। ছেলে একটু জলে ভিজিলে বা রৌদ্রে পুড়িলেই সর্ব্বনাশ,—ধরা বুঝি রসাতলে গেল! ছেলে বিদেশে যাইতে চাহিলেই তাহাকে পুতু-পুতু করিয়া ঘরে আটক রাখা-ই পরম যুক্তিসঙ্গত! ছেলে দুধ খাইতে না চাহিলে তাহাকে পুতুল কিনিয়া দিবার লোভ দেখাইয়া পরে পুতুলের কথা উড়াইয়া দেওয়ার স্বভাবও অনেক জননীর আছে। তাঁহারা এটা ভাবেন না যে, ইহা দ্বারা ছেলেকে প্রথমাবধি মিথ্যাকথনে অভ্যস্ত করা হয়। এ দেশের ছেলের বাপ যদি জমীদার মহাজন হইল, তাহা হইলে বৈঠকখানায় ইয়ার-বন্ধু লইয়া তাকিয়া ঠেস দিয়া তাসপাশায় সময় অতিবাহিত করিলেই ছেলের মানবজীবনের সফলতা সম্পাদন করা হইল; ইহার উপরে যেটুকু আছে, তাহার চিত্র আর নাই-ই অঙ্কিত করিলাম! কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে অতি বড় অভিজাত-সম্প্রদায়ের ছেলেরাও বিদ্যাশিক্ষা সম্পূর্ণ করিতে দেশ-ঘর ছাড়িয়া পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে—আফ্রিকার কালাজঙ্গলে সিংহ শিকারে অথবা বাঙ্গালার সুন্দরবনে বাঘ শিকারে যায়, পাহাড়ে পর্ব্বতে উঠে, নির্ভয়ে সমুদ্রে বিচরণ করে। উহা দ্বারা তাহারা যে জ্ঞানসঞ্চয় করে, যে আত্মনির্ভরতা এবং আত্মসম্মানজ্ঞানে অভ্যস্ত হয়, সে সুযোগ এ দেশে কোথায়? বিলাতের অভিজাতশ্রেণীর কনিষ্ঠ পুত্রগণ যেরূপ দুর্দ্ধর্ষ ও কর্ম্মঠ, বোধ হয়, জগতে এমন আর কোথাও নাই। তাহারা সর্ব্ববিধ ব্যায়ামে অভ্যস্ত হয় এবং তাহারাই মূলতঃ সামরিক ও নৌ-সামরিক বিভাগে সেনানীর পদ গ্রহণ করিয়া জগতে ইংরাজ-সাম্রাজ্যের দৃঢ়প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। ইংলণ্ডের রাজবংশের রাজকুমাররা যৌবনকাল হইতেই সামরিক বা নৌ-সামরিক বিদ্যায় অভ্যস্ত হইয়া থাকেন। রাজা পঞ্চম জর্জ্জকে Sailor King আখ্যা দেওয়া হয়। তাঁহার পুত্ররাও নানা কার্য্যে দুর্দ্ধর্ষ ও কর্ম্মঠ হইয়া উঠিয়াছেন, কেহ বৈঠকখানায় তাকিয়া ঠেস দিয়া আরাম উপভোগ করেন না।

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু

কথা হইতেছে, আমাদের মা-জননীদের পুত্রের শিক্ষা-দীক্ষাদানে অনেক গলদ আছে। শ্রীমতী নাইডু এ কথাটা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, এ জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। ছেলেকে যে কেবল জ্ঞানানুশীলনই করিতে হইবে, সৎসাহসে অভ্যস্ত হইতে হইবে না, এমন কোনও কথা নাই। শক্তিসঞ্চয় অর্থে গুণ্ডামী করা নহে, আত্মরক্ষার্থ সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকা। যে প্রকৃত শক্তিশালী, সে কখনও শক্তির অপব্যবহার করে না;

যে বুনীয়াদী বড়লোক, সে কখনও টাকার বড়াই করে না। বাঙ্গালীর জীবনে নূতন যুগের উদ্বোধন হইতেছে, এ সময়ে শ্রীমতী নাইডুর কথায় বলি, বাঙ্গালীর জননীদিগকে তাঁহাদের সন্তানগণের শক্তিসঞ্চয়ের দিকে—আত্মসম্মান-জ্ঞান-উন্মেষণের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। নতুবা জাতি হিসাবে আমরা কখনও উন্নতি লাভ করিতে পারিব না।

---

# সংগঠনের সদুপায়

## পাট ও পাটজ-পণ্যের কথা

পাট এ দেশের একচেটিয়া সম্পত্তি। বিদেশের বাজারে পণ্য বিকাইয়া তদ্বিনিময়ে এ দেশে টাকা আনিবার যতপ্রকার পণ্য আছে, তন্মধ্যে পাট সর্ব্বপ্রধান। কিন্তু কেবল কাঁচামালরূপ পাট সরবরাহ করিতে বাধ্য হওয়াতে বিনিময়ের সম্পূর্ণ অর্থ এ দেশে আসিতে পারিতেছে না। বিনিময়ের সম্পূর্ণ মূল্যটা যাহাতে এ দেশবাসীরই হস্তগত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এ দেশে পাট উৎপাদনের জন্য মূলধনিরূপে কোনও ব্যক্তি বিশেষ বা সম্প্রদায়বিশেষকে মূলধন নিয়োগ করিতে হয় না। বাঙ্গালার কৃষকরা নিজ নিজ মূলধন ও শ্রমসহযোগে নিজেদের দায়িত্বেই পাট উৎপাদন করিয়া থাকে। উৎপাদনে কোনও গোলযোগ নাই—গোল যত বিনিময়ের ব্যাপারে। বিশ্বের বাজারে পাট বিনিময়ের সম্পূর্ণ দায়িত্বভার সংসদসমূহকেই গ্রহণ করিতে হইবে।

সংসদের বিধানানুসারে অন্যান্য পণ্যের মত পাটও যথাস্থানে রপ্তানীর জন্য সংসদসমূহেরই হস্তগত হইবে। হস্তগত সেই পাট কাঁচামালরূপে ভিন্ন দেশীয়দের নিকট বিক্রয় না করিয়া, এ দেশীয় কর্ম্মীদের দ্বারা পাকা মাল চট-বস্তাদিতে পরিণত করত দেশ-বিদেশের বাজারে উপস্থাপিত করিবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

চট-বস্তাদির শিল্প অতি স্থূলতর শিল্প। পাটের সূতা করিয়া অপেক্ষাকৃত স্থূল তাঁত প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে দেশের স্ত্রী-পুরুষ সাধারণ কর্ম্মীরা অল্প আয়াসেই নিজ নিজ গৃহে বসিয়াই চট প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে পারিবে।

গৃহে গৃহে চটের তাঁত প্রতিষ্ঠিত করিয়া এই গৃহ-শিল্পটির অনুষ্ঠান ঘটাইলে, দেশের বহু বেকার কর্ম্মীরই অন্নাদি সংস্থানের একটি সুন্দর উপায় হইবে। আর এই উপায়ে কাঁচা পাটকে পাকা মালে পরিণত করিয়া বিদেশের বাজারে বিক্রয় করিলে জাতির ধনভাণ্ডারেও প্রচুর অর্থাগম হইবে।

বিশ্বজোড়া ব্যবসায়ের পণ্য বলিয়া পাটের কারবার বড়ই বিরাট ব্যাপার। পৃথগ্‌ভাবে দেশের সমস্ত পাটের গোটা কারবারটিকে এক হস্তে লইয়া পরিচালিত করা সহজসাধ্য ব্যাপার নহে। তাহার জন্য অপরিমেয় মূলধনেরও প্রয়োজন। তাহা সংগ্রহ করিয়া এই ঘোর প্রতিযোগিতার যুগে পাট ব্যবসায়টি নিয়ন্ত্রিত করা কঠিন ব্যাপার। জাতীয় সংসদের সেই পন্থা অবলম্বনীয় নহে।

সংসদসমূহ পল্লীমণ্ডলীর কেন্দ্রে কেন্দ্রে প্রয়োজনমত পাট হইতে চটের সূত্র উৎপাদনের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কল-কারখানার প্রতিষ্ঠা করিবেন। স্থানীয় কৃষককর্ম্মীরা অবসরসময়ে তাহাতে খাটিয়া পাটের সূত্র উৎপাদন করিবে।

যথাসম্ভবরূপে পল্লীর গৃহে গৃহে চটের তাঁত প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেই সূত্র সরবরাহক্রমে, প্রধানতঃ বালকবালিকা, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা ও মহিলাদের দ্বারা চট ও বস্তা উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

সংসদসমূহ কর্ম্মীদের যোগ্য পারিশ্রমিক দিয়া সেই সব চট ও বস্তা সংগ্রহ পূর্ব্বক বিদেশের বাজারে রপ্তানী করিবার বন্দোবস্ত করিবেন।

স্থানীয় যাবতীয় পাট যাহাতে স্থানীয় তাঁতের কাযেই নিঃশেষে লাগিয়া যাইতে পারে, সেই দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে।

চট ও বস্তা ব্যতীত পাটের দ্বারা দড়ি-দড়া কাগজাদি আরও যে যে পণ্য উৎপাদিত হয়, অনুসন্ধানক্রমে সে সকলেরও তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া ক্রমে সেই সকল পণ্যও দেশেই উৎপন্ন করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

## ভারতের অন্যতম বিরাট বে-ওয়ারিশ সম্পদের কথা

এ দেশের গো-মহিষাদি পশুর মৃতদেহ উপেক্ষিত অবস্থায় ভাগাড়ে পরিত্যক্ত হয়। সেই সকল মৃতদেহ অযথা নষ্ট হইতে না দিয়া, যত্নপূর্ব্বক সংগ্রহ করিলে পর, তাহাদের দেহের প্রতি অংশ হইতেই মূল্যবান্ পণ্য উৎপাদন করা যাইতে পারে।

পূর্ব্বোক্ত পল্লীমণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে এ দেশীয় চর্ম্মকার ও কসাই শ্রেণীর কর্ম্মীদের এই মৃত পশুবিভাগীয় কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়া দেশের যাবতীয় মৃত পশু সংগ্রহ ও চর্ম্ম, মাংস, অস্থি, ক্ষুর, রক্ত, চর্ব্বি প্রভৃতি বিভিন্ন অংশ বিশ্লিষ্ট করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

পরে সেই সব বস্তু লইয়া যথাযথ বৈজ্ঞানিক উপায়ে নির্দ্দিষ্ট কারখানাসমূহে উপযুক্ত কর্ম্মীদের দ্বারা অনুরূপ পণ্য উৎপাদনের বিধিব্যবস্থা করিতে হইবে।

কর্ম্মীদের যোগ্য পারিশ্রমিকাদি খরচ বাদ দিয়া এই ব্যবসায়ে যে অর্থ উদ্বৃত্ত হইবে, কেহ ওয়ারিশ নাই বলিয়া, তাহা সম্পূর্ণরূপেই বিশুদ্ধ জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত হইবে। জাতীয় সংসদের উন্নতি ও স্থায়িত্ব সাধনসংকল্পে উক্ত অর্থ, সংসদের কর্ম্মকর্ত্তারা ন্যায়সঙ্গতভাবে, অবাধেই ব্যবহার করিতে পারিবেন।

সংসদের নিজস্ব ভাণ্ডারে এই বিপুল অর্থরাশি সংগ্রহ করিবার জন্য জাতীয় সংসদকে অনতিবিলম্বে ইহার বিধি-ব্যবস্থায় অবশ্যই অবহিত হইতে হইবে।

## ভারতীয় চা ও খনিজ পণ্যের কথা

ভারতীয় চা ও খনিজ-পণ্যসমূহ প্রকৃতপক্ষে এ দেশবাসী শ্রমিক কর্ম্মীদের সম্পদরূপে পরিণত হইলে, দেশের দৈন্য-দারিদ্র্য বহুলরূপে উপশমিত হইতে পারে। চা এবং খনিজ-পণ্যজাত অর্থের অধিকারী যাহাতে এ দেশীয় শ্রমিক-কর্ম্মীরাই হইতে পারে, জাতীয় সংসদকে তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে।

চা-বাগিচার প্রতিষ্ঠা ও খনি-খননের প্রাথমিক ব্যয়ভার সংসদকেই বহন করিতে হইবে। কালক্রমে সুদে আসলে সংসদের দেওয়া সেই প্রাথমিক মূলধন যখন উঠিয়া আসিবে, খাসে পতিত তখন সেই সব বাগান এবং খনিকর্ম্মী শ্রমিকদেরই স্বকীয় সম্পত্তিতে পরিণত হইবে;—এই মূল সূত্রটির অবলম্বনে চা-বাগান ও খনিখননের কার্য্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে।

বিশেষজ্ঞ কর্ম্মিসমবায়ে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিসমূহের সংগঠন করিয়া জাতীয় সংসদ উক্ত কার্য্য পরিচালনের বন্দোবস্ত করিবেন।

## দেশের প্রয়োজনীয় লবণ সরবরাহের কথা

দেশের প্রয়োজনীয় লবণ দেশবাসীরা দেশেই যাহাতে সমুৎপন্ন করিয়া লইতে পারে, সরকারের সঙ্গে সেইরূপ বন্দোবস্ত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। যদি চেষ্টা সফল হয়, ভাল, না হয়—অন্যান্য প্রদেশীয় সরকারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়া, ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের কোথাও

সামুদ্রিক লবণ উৎপাদন করা যায় কি না, দেখিতে হইবে। এক দল দেশীয় কর্ম্মী যাহাতে এই লবণ উৎপাদন কার্য্যে ব্রতী থাকিতে পারে, জাতীয় মহাসংসদকে বিধিমত তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। জীবন-যাত্রার প্রতি পদক্ষেপেই যাহাতে দেশবাসিমাত্রই আত্মনির্ভরশীল হইয়া চলিতে পারে, তৎপ্রতি সদা সতর্ক দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া সংসদকে কার্য্য-পদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে।

### ভারতীয় বনজ সম্পদের কথা

ভারতের বিরাট বিশাল বনে জঙ্গলে যে পণ্য-সম্ভার পুঞ্জীভূত হইয়া আছে, তৎসমুদয় আহরণ করিয়া ব্যবসায়-ক্ষেত্রে উপস্থাপিত করিবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

মূল্যবান্ কাঠ ভাল ভাল কাযের জন্য বাছাই করিয়া রাখিয়া, বাজে কাঠ 'চুয়াইয়া' তাহা হইতে আল্‌কাত্‌রা প্রভৃতি পণ্য উৎপাদনের বিধিব্যবস্থা করিতে হইবে।

ভেষজ-জাতীয় ফল-মূল লতা-পাতা প্রভৃতি হইতে যথোপযুক্ত বিধানে এ দেশেই ঔষধ উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

দেশের বনজ সম্পদ যাহাতে সামান্য রকমেও নষ্ট হইতে না পারে, সংসদকে সে দিকে সর্ব্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হইবে।

### মৎস্য চাষের কথা

মৎস্য এ দেশবাসীর অনেকেরই অন্যতম প্রধান খাদ্য। বর্ত্তমানে সর্ব্বত্রই প্রায় মৎস্যের দারুণ অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। মৎস্য যাহাতে সমধিকরূপে সমুৎপন্ন হয়, পল্লীমণ্ডলীগুলির সহায়তায় সংসদকে তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ধীবরাদি মৎস্যজীবী কর্ম্মিসম্প্রদায়কে মৎস্য চাষে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে। তাহাদের সর্ব্বপ্রকার অভাব দূরীভূত করিয়া, ধৃত মৎস্যের ব্যবসায়ের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়া দেশবাসীর নিত্যপ্রয়োজনীয় মৎস্যের অভাব মোচন করিতে হইবে।

এই মৎস্য চাষের সৌকর্য্যসাধনোদ্দেশ্যে সংসদসমূহকে দেশের যাবতীয় হাজা-মজা পুরাতন দীঘি ও পুকুরের পঙ্কোদ্ধারের বন্দোবস্ত করিতে হইবে; প্রয়োজনবোধে নূতন নূতন পুষ্করিণীর খনন-ব্যবস্থাও করিতে হইবে। তাহাতে এক দিকে যেমন মৎস্যের অভাব দূরীভূত হইবে, অপর দিকে তেমনই দেশের পানীয় জলের অভাবও ঘুচিয়া যাইবে।

[ ক্রমশঃ।

শ্রীকালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

---

# জীবন-যাপন

[ বর্ষা হইতে আরম্ভ ]

রাত পোহালে কোথায় যাব ছুটে,—
করবো কি তার ঠিকানা নাই মোটে,
চারদিকেতেই অভাব—খালি অভাব;
বাদ্‌লা দিনে 'লাক্‌ড়ি' নাহি ঘরে,
গিন্নী বলেন, "রাঁধবো কেমন ক'রে?"
ভেবে না পাই কি দিব তার জবাব।

ছিদাম মুদীর অনেক দেনা রাখি,—
সওদা দিতে চায় না—বেজায় বাকি,
দুধের হিসাব করতে আসে গয়লা;
কাপুড়ে কয় "পাল মশাইর কাছে
তিন বছরের সাবেক বাকি আছে,
আজকে কড়ার—আজকে মাসের পয়লা।"

এই ত দু'দিন বাদেই ভাদ্র মাসে
জমীদারের লাটের কিস্তী আসে,
মহাজনের খত তামাদি আবার;
শ্বশুরবাড়ীর বায়না ঘটী-লোটা,
দাদার-কেলে জমিন দু'চার কোঠা
বেচ্‌তে বেচ্‌তে করব না কি কাবার?

সারাটা দিন ক'রে ছুটাছুটি,
সোজাসুজি কোন রকম দু'টি—
ভাত মিলে ত মিলে না ভাই কাপড়;
উপায় যত, খরচা তাহার দেড়া,
বুঝে না তা কিচ্ছু বাড়ীর এরা,
ভেবে ভেবে একেবারে কাঁপর!

রাত পোহাতে মাথার উপর পূজা,
ছেলেপুলের কাপড় জুতা মোজা—
প্রিয়তমার দু'একখানা গয়না;
মালী, মেথর, নাপিত, ধোপার টাকা
ভাঁড়ায়ে আর ক'দিন যাবে রাখা?
এবার ও সব না দিলে আর হয় না।

তাহার পরেই ফের কার্ত্তিক মাসে
ঠাকুরদাদার শ্রাদ্ধ-তিথি আসে
আবার খরচ, তাতেও নাহি খালাস;
মেয়ের বয়স পার হয়েছে বারো,
ঘরে রাখা যায় কি তারে আরো?
ছুট্‌তে হবে করতে বরের তালাস।

পিয়ন ডাকে "পত্র আছে বাবু",
এই হয়েছে—এইবারেতেই কাবু—
শ্যালক চাহে এক্‌জামিনের ফি,
গিন্নী বলেন, "দিতেই হবে ওটা,
তা না হ'লে শুন্‌বে নানান খোঁটা,
ছাড় কিছু জমী—উপায় কি!"

ভাই-বেরাদার স্বজন প্রতিবাসী—
সুখের কথা কয় না কেহ আসি'
দুখের দিনে হয় না কেহ আপন;
এ কি শুধু আমার কথাই?—না না—
বাংলা দেশের সাড়ে চৌদ্দ আনা
লোকেই করে এমন জীবন-যাপন!

শ্রীঅক্রুরচন্দ্র ধর।

# উৎকলিঙ্গ

মুহুর্মুহুঃ উৎপীড়িত উৎসাদিত হে উৎকল ভূমি
উদ্ধত উদ্দণ্ড ভুজে যুগে যুগে উপদ্রুত তুমি।
এমনি দুর্ব্বল দীন দুঃস্থ দুঃখী দুর্ভিক্ষদলিত
চিরদিনই ছিলে না ত।   ইতিহাসে নহ অনাদৃত।
গৌরব-সৌরভে তব আমোদিত ঐতিহ্য পুরাণ,
ওদন্তপুরীর  কীর্ত্তি দিগ্ দিগন্তে আজো দীপ্যমান।
গজদন্ত মঞ্জুষায় বুদ্ধদন্ত করিয়া পোষণ,
হ'লে অর্দ্ধ জগতের বন্দনীয়, হে ভক্ত শ্রমণ!
রাজসূয় যজ্ঞে তুমি যোগাইতে গিরি গজঘটা
তোমারি পঞ্জরে জাত ভারতের কিরীটের ছটা।
তোমার ঔষধি দারু, হীরা, ক্ষৌম-কৌষেয় দুকূল,
আনিত মালয় চীন ব্রহ্ম হ'তে ঐশ্বর্য্য প্রতুল।
তব কূল হ'তে স্রোতে পোতশ্রেণী বহি পণ্যভার
দেশে দেশে ভেসে ভেসে পার হ'য়ে যেত পারাবার।
পতিত উৎকল তব বিস্মৃত  সে অতীতগৌরব,
শিলা শুধু ভুলে নাই, বুকে এঁকে রাখিয়াছে সব।

অশোকে করিল লুব্ধ হে কলিঙ্গ, তোমার সম্পদ্,
প্রথম পীড়ক তব সার্ব্বভৌম  লোলুপ মগধ।
গ্রাসিল সে শৌর্য্যচন্দ্রে মৌর্য্য-রাহু দুর্জ্জন দারুণ,
শুভ্রপুষ্প  সম শুভ্র তব বক্ষ হলো রক্তারুণ।
সে আহবে আত্মাহুতি দিল তব অসংখ্য সন্তান,
চণ্ডাশোক দণ্ডদাতা,  শ্রীভাণ্ডার হইল শ্মশান।
ফুটিল অহিংসা-পদ্ম তব হিংসা-শোণিতের স্রোতে
উঠিল অশোকামৃত তব  শোকপারাবার হ'তে,
সে সুধা এসিয়াব্যাপী ধর্ম্ম-ক্ষুধা করিল হরণ,
আজিও 'ধৌলীর' মৌলি সাক্ষ্য তার করিছে বহন।

কৃতী পুত্র  মহামেঘবাহনের  মগধবিজয়ে
ভুলিলে কি সে লাঞ্ছনা? জেগেছিলে আবার নির্ভয়ে?
অর্হতেরা জৈনমন্ত্রে দিল তোমা প্রবোধসান্ত্বনা
হে কলিঙ্গ ভুলিলে কি মর্ম্মন্তুদ শোকের যন্ত্রণা?
নাগার্জ্জুন বোধিমন্ত্রে দিল তোমা সুধার প্রলেপ,
মুছিল কি অশ্রু তব? ঘুচিল কি সে খেদ আক্ষেপ?
শান্তি স্বস্তি শুভ নিয়ে অন্ধ্ররাজ এলো তব বুকে
হে শোকান্ধ চাহিলে না একবার তবু হাসিমুখে।
বঙ্গেশ  শশাঙ্কভয়ে সারানিশি সশঙ্ক রহিয়া
হ'লে ভৃত্য শিলাদিত্য-সূর্য্যোদয়ে শাসন বহিয়া।
লক্ষ্মীর ভাণ্ডার তব রিক্ত নহে তখনো উৎকল,
বেসাতী করিত হাট মুক্তা দিয়ে উৎকলী সকল।
তখনো আছিলে তুমি রত্নপ্রসূ শিল্পের সাধক,
এ কথা বলিয়া গেছে বৌদ্ধবন্ধু চীন পর্য্যটক।

আবার কেশরিবংশ  ফিরাইল গৌরব তোমার,
সিংহল বিহার গৌড় চৌড়ে করি শৌর্য্যের বিস্তার।
উদ্ধত কেশরিসম  শূরবর  উদ্দ্যোত কেশরী
দিগ্বিজয়ে গজমুক্তা-জয়মাল্য আনিল আহরি'।
দোর্দ্দণ্ড বিক্রমে তার দণ্ডভুক্তি হইল দণ্ডিত,
দাসত্ব-কলঙ্কসূত্র  নখে তার হইল খণ্ডিত।
চন্দ্রকুল-"চন্দ্র" পুন উজ্জলিল  তব সিন্ধুতীরে
সৌভাগ্যকুমুদ  তব প্রস্ফুটিল পুনঃ ধীরে ধীরে।

মন্দিরশিখর-শৃঙ্গে ভ'রে  গেল নীলাচলভূমি
শিল্পী রূপদক্ষদের হ'লে বন্দ্য পুণ্যতীর্থ তুমি।
ঘোর অন্ধকূপ হ'তে ধীরোদাত্ত 'যযাতি' তোমার
দেবযানী সম তব কীর্ত্তি পুন করিল উদ্ধার।
ভাস্কর্য্যে শৃঙ্গারবেশ  রচি তব রাজ্ঞী কলাবতী
শ্রীধামে রাখিয়া  গেল স্বনামের সার্থক সঙ্গতি।
অনুগোদ ভূমি হ'তে চোলরাজ গঙ্গবংশকেতু
এলো কুশভদ্রাতীরে রুদ্রতেজে  দিগ্বিজয়হেতু,—
এলো গঙ্গবংশধারা উত্তরঙ্গ গঙ্গাধারা প্রায়,
ঐরাবত-জয়ী যত কেশরীরা সব ভেসে যায়।
বিপ্লব বিদ্রোহ দ্বন্দ্ব মুহুর্মুহুঃ রাষ্ট্র-বিপর্য্যয়
গৃহভেদ, ভ্রাতৃবধ, শিরশ্ছেদ, জয়-পরাজয়
হে উৎকল, তব বক্ষ যুগে যুগে ধ্বস্ত দীর্ণ করি,
শোণিত ঢালিয়া গেছে মহাকাল পানপাত্র ভরি'।

তবু নমি গঙ্গগণে, নহে তারা তোমার পীড়ক
লুণ্ঠিতে আসেনি তারা গজদন্ত মুকুতা হীরক।
পদ্মক্ষেত্রে অভ্রচুম্বি শঙ্করের শ্রীমন্দির গড়ি
তোমার সকল বিত্ত রেখে গেছে  পুঞ্জীভূত করি।
তব  রস-সম্পদেরে, যশোধনে, কলা-প্রতিভারে,
অর্কক্ষেত্রে রেখে গেছে কোণারক মন্দিরপ্রাকারে।
তোমার প্রেমাশ্রুধারা হেমপাত্রে জমায়ে প্রস্তরে
বিন্দুসরোবরতীরে রেখে গেছে মহামেঘেশ্বরে।
তখন কি ভেবেছিলে শিলাময় নৈবেদ্য তোমার
অসুরের ভোগ্য হবে—অর্ঘ্য যাহা  বিশ্বদেবতার?
শ্রীসম্ভার সমারোহ এত সব কার আয়োজন?
অর্থ-শ্যেন ধর্ম্ম-বৈরী দস্যুদের শুধু নিমন্ত্রণ।

শক্তিমত্ত রক্তবীজ বক্তিয়ার অগ্রদূত হয়ে
যেই ধ্বংস-বন্যা দেশে দিল্লী হ'তে এসেছিল লয়ে
ব্যাহত করিলে তারে।   বঙ্গসম হওনি বিনত,
অনঙ্গভীমের গদা মদগর্ব্বে তখনো উদ্যত।

মাতঙ্গসম্পদ  তব লুব্ধ করি রাজদস্যুগণে
লয়ে এলো শুণ্ডে টানি গিরিগাত্রে গজাঢ্য গহনে।
বঙ্গীয় তুগ্রেল এলো, ব্যাঘ্র সম এলো তোঘলক
মালবী হোসাঙ এলো  বাহ্‌মনী ফেরোজ লুণ্ঠক।
শতাব্দী ধরিয়া হলো তব গজশক্তির লুণ্ঠন,
তার সাথে গেল তব মদমত্ত প্রফুল্ল যৌবন।
কেমনে সহিলে তুমি ফতে খাঁর নির্ম্মম নিগ্রহ?
দুর্ম্মদ কামাল হস্তে কলঙ্কিত দেবের বিগ্রহ?
দহিল প্রভুর রথ কেশোমারু কেশীর সমান
মূর্ত্ত অকল্যাণ সম ধূর্ত্ত ক্রূর আসিল 'কল্যাণ'।

শতাব্দী নিশান্তে পুন ঊষা এলো, উদিল তপন,
চন্দ্র হ'তে সূর্য্যকুলে এলো তব রাজসিংহাসন।
বিজয়রাজীব বনে পুন শ্রুত চারণ-ঝঙ্কার
আবিদর্ভ গৌড়বঙ্গে হলো তব শক্তির বিস্তার।
উড়াল কপিশ কেতু গঙ্গাতটে  কপিলেন্দ্র ভূপ,
কৃষ্ণা-কাবেরীর কূলে রচি যত  জয়যজ্ঞযূপ।

বিজয়নগর যুঝি পরাজয় করিল স্বীকার
পুরুষোত্তমের কীর্ত্তি, সাক্ষী—সাক্ষিগোপাল তাহার।
প্রতিহত পদে পদে ইস্মাইল হোসেনের সেনা—
সে সৌভাগ্য-সূর্য্য তব অস্তমিত, আর ফিরিবে না।

তার পর চিরতরে ঘনাইল ঐহিক দুর্দ্দিন
রাজর্ষি প্রতাপ-রুদ্র রাজৈশ্বর্য্য-ভোগে উদাসীন·
গৌরপ্রেমে ত্যাগমন্ত্রে নিল দীক্ষা ; হরিনামতৃষা
ভুলাইল রাজ্যলোভ ক্ষতি ক্ষোভ জিঘাংসা জিগীষা।
গজমতি জয়মালা দূরে ফেলি দিল 'গজপতি',
তুলসীর জপমালা দিল তারে ব্রজরজে মতি।
ত্যজে রাজবেশ সঁপি নিল চীর, চিরদাস্যধন,
সারাদেশ তার সাথে প্রেমাবেশে করিল নর্ত্তন।
মন্ত্রণার ছলে কর্ণে মহামন্ত্র অর্পিয়া রাজায়
করিল সার্থক ধন্য মন্ত্রিনাম রামানন্দ রায়।
কীর্ত্তন তাণ্ডবতলে হলো রাজ 'প্রতাপ' মর্দ্দিত,
ত্যাগের বিজয়বার্ত্তা হলো মর্ত্ত্যে মৃদঙ্গে মন্দ্রিত।
প্রভুর রথের আগে রাজা করে ধুলায় লুণ্ঠন,
শ্যেনদস্যুগণে করে শুকরাজকুলায়-লুণ্ঠন।
চৌদিকে তুলিল মৌলি এ সুযোগে যত বৈরিগণ
পৌরযুদ্ধে সৌরবংশ হারাইল গৌরবকেতন।
রণঝঞ্ঝা, রক্ত-বন্যা, প্রজাদ্রোহ, রাজমুণ্ডপাত
হরিয়া পৌরুষ তব ক্রমে তোমা করিল অনাথ।

দক্ষিণে জাগিল বৈরী ইব্রাহিম, বঙ্গে সুলেমান,
শৃঙ্গযুগে রণষণ্ড আক্রমিতে হলো ধাবমান।
এলো কালাপাহাড়ের কালান্তক হিংসার বাহিনী
শরীর শিহরি উঠে স্মরি সেই ধ্বংসের কাহিনী !
তিল তিল রক্ত দিয়ে ভক্তি দিয়ে যুগ যুগ ধরি,
যা কিছু গড়িয়াছিলে ছিলে বক্ষ-পঞ্জরে আঁকড়ি
করিলে সর্ব্বস্ব পণ যার লাগি হে দুর্ভাগা দেশ,
সকলি হইল চূর্ণ কলঙ্কিত, ধ্বস্ত ধূলিশেষ।
দেবতা শুদ্ধির লাগি চিতাগ্নিতে করিলেন স্নান,
রাবণের চিতাসম সেই চিতা আজো অনির্ব্বাণ।
মর্ম্মাহত 'মুকুন্দের' মর্ম্মভেদী মৃত্যু হাহাকার,
'গোবিন্দের' আর্ত্তনাদ আজো বক্ষে গুমরে তোমার।
কেবল তোমারি বৈরী·নহে—নহে সে কালাপাহাড়,
মহামানবের শত্রু—বৈরী সে যে জ্ঞান সভ্যতার।
দেশকাল, ইতিহাস, কাব্য, প্রত্ন, শিল্প, ধর্ম্ম, জাতি
সবারি অমিত্র সে যে,—সৃষ্টিত্রাস, স্রষ্টারো অরাতি।
চিতাভস্মে নৃকঙ্কালে সারাদেশ করিয়া শ্মশান,
তাণ্ডব-উৎসবলীলা আরম্ভিল প্রমত্ত পাঠান।
দাউদ, কতলু খাঁন, ওস্‌মান, খাঁজাহান লোদী
তার মাঝে একে একে বহাইল শোণিতের নদী।
ভূমিসাৎ পুরসৌধ ভস্মসাৎ পল্লী-জনপদ,
শস্যশূন্য ক্ষেত্রভূমি রক্তারুণ নদীনদ হ্রদ।
শুণ্ডহীন গণপতি, ষণ্ডহীন অচল শঙ্কর,
তুণ্ডহীন নবগ্রহ, মুণ্ডহীন ভক্ত কপিবর।
থামিল মৃদঙ্গ-শঙ্খ, স্তব্ধ—গীতি-গোবিন্দের গান,
পলাইল দলে দলে গিরিবনে তোমার সন্তান।

এ দুর্দ্দিনে পরিত্রাতা শূরসিংহ মানসিংহ রায়
ফিরিল ক্ষণিক শান্তি তাঁর শৌর্য্যে তাঁর করুণায়।
আকবরী উদারতা স্মরো তুমি কৃতজ্ঞতাভরে,
তোমার সন্তানগণ বন ত্যজি ফিরেছিল ঘরে।
তার পর উদাসীন কিছু দিন দিল্লীর মোগল,
শোষক হইল তব যত উপপাসকের দল।
কুলী শা কুলিশসম তব বক্ষে করিল বিহার
শা সুজা তোমার স্কন্ধে চাপাইল গুরু করভার।
রসিদ রসদ হরি' সারাদেশে করিল ভিখারী,
পিইল শোণিত তব তখী খাঁ'র তীক্ষ্ণ তরবারি।
নদীর মন্দির ভিত্তি নিরমিল মস্‌জিদের চূড়া,
আক্রমি নৃসিংহমঠ খাঁ আক্রাম ক'রে দিল গুঁড়া।
বৃদ্ধ আলিবর্দ্দি খাঁ'র কু-শাসনে বর্গী এলো দেশে।
সিন্ধুতীরে হিন্দু এলো মন্দভাগ্যে লুণ্ঠকের বেশে।
হিন্দুরেও বন্ধু বলি হায় তুমি পারনি গণিতে,
মাধোজীর মধুপর্ক ভ'রে দিলে হৃদয়-শোণিতে।
চৌথ লাগি বর্ষে বর্ষে মারাঠার যৌথ-নির্যাতন,
সারাদেশ ভরি শুধু হাহাকার—লুণ্ঠন—লুণ্ঠন।
শ্মশান করিয়া গেল ধ্বংস-নৃত্যে অহিন্দুর দল,
শৃগাল-কুকুরগণ অস্থি নিয়ে বাধাল কোন্দল।
হিন্দুসনে অহিন্দুর তব ভাগ্যে কি রাজযোটক !
কটকে কটক রচি, ছুটাইল মারাঠা ঘোটক,—
চিল্কাতীরে উল্কাসম বিহরিল বর্গী তরবার,
খণ্ডগিরি গুম্ফা হলো যত দস্যুশুল্কের ভাণ্ডার।
ইহারা হরিল সবি মাটী খুঁড়ি ধূলিবালি ছাঁকি,
পিত্তল কাঁসা বা তামা এক তোলা রাখিল না বাকী।
নাসা-কর্ণ ছিঁড়ে এরা স্বর্ণরতি করিল হরণ,
বঁটিতে কাটিয়া নিল শিশুদেরো কটির ভূষণ।
কেড়ে নিল কোশাকুশী ছিঁড়ে নিল কবচ-মাদুলী,
একটি মাথার মূল্য শুধুমাত্র সিকি কি আধুলী।
তীর্থপ্রবেশের আগে যাত্রীদের লুটিল সকল,
মন্দিরে কি মণিবন্ধে শঙ্খ ছাড়া ছিল না সম্বল।
তীর্থপথ রুদ্ধ হলো ভক্তদের করোটিকঙ্কালে,
দোলমঞ্চ পূর্ণ হলো গৃধ্র-কাক-কুকুর-শৃগালে।
এড়াইতে শ্যেনদৃষ্টি মারাঠার লুব্ধ ক্ষুধাতুর,
শ্রীসৌষ্ঠব সারাদেশ বিনাশিল আপন তনুর।
উপবাসে অনাদরে অঙ্গপুষ্টি ধ্বংস করি শেষে
হইল কুটীরবাসী পৌরগণ বাউলের বেশে।

আজো তুমি রহিয়াছ সেইরূপই শ্রীবিলাসহীন,
শীর্ণ রূঢ় ভীতিমূঢ় দীনবেশ কুণ্ঠিত মলিন।
ভবানী পণ্ডিত, সাহু, রাজারাম, মাধোজীর ডরে,
সশঙ্ক শশকসম কাঁপিতেছ আজো ঘরে ঘরে !
পঙ্গু জড় হীনবল করি তোমা বর্গীর অঙ্কুশ—
নির্য্যাতনে নিপীড়নে হরিয়াছে সতেজ পৌরুষ।

শুধু কি মানুষ বাদী ? তোমা পরে দেবতাও বাম।
নিসর্গের উপসর্গ পীড়িতেছে তোমা অবিরাম।
অতিবর্ষ, অনাবর্ষ, ·ঝঞ্ঝা-বন্যা লবণ-পাথার
পুরজনপদ তব ধ্বংস করি তুলে হাহাকার।
পলে পলে দগ্ধ তুমি শস্যাভাবে তুষের অনলে,
সবল সন্তান তব গ্রস্ত মহামারীর কবলে।
লক্ষ্মীর দুলাল ছিলে অন্নদার বদান্য ভাণ্ডারী,
একমুষ্টি অন্নতরে জনারণ্যে আজিকে ভিখারী।

তব দেউলেরি মত ছিল তুঙ্গ তব অন্নকূট,
নিরন্ন ঘুরিছ এবে মঠে মঠে পাতি করপুট।
আজি দগ্ধোদর লাগি মসীদিগ্ধ তোমার তনয়,
দেশে দেশে দ্বারে দ্বারে উঞ্ছবৃত্তি করেছে আশ্রয়।

হায় ধর্ম্মপ্রাণ দেশ, উপদ্রুত প্রহ্লাদের মত,
ধর্ম্মে বক্ষে ধরি তুমি অসি-বনে উগ্রতপোরত।
সিদ্ধার্থের যেই বাণী সুপ্ত ছিল তব পুণ্য বুকে
ধ্বনিল দীক্ষার মন্ত্রে তাই গুরু উপগুপ্তমুখে।
আপন সন্তানগণে বলি দিয়া সমরের যূপে—
ভিক্ষুর গৈরিক দণ্ড ধরাইলে ভারতের ভূপে।
সহস্র লাঞ্ছনা পীড়া উপদ্রব উৎপীড়ন লাজে,
ধর্ম্মে তুমি ভেলা করি ভাসিয়াছ ব্যথাসিন্ধুমাঝে।
দৈত্যে হরিয়াছে অর্ঘ্য—সমর্পিত দেবের মন্দিরে,
আজ্যপুষ্ট যজ্ঞানল বার বার নিভেছে রুধিরে।
দারুণ পরীক্ষা-দণ্ডে বার বার করি দর্প চূর,
রাজসিক অর্ঘ্য তব লননিক কাঙাল ঠাকুর।
নশ্বর বৈভবে অর্ঘ্য যত তুমি করেছ অর্পণ,
বিলায়ে দেছেন প্রভু, অর্ঘ্য চা'ন সনাতন ধন।
তোমার ভক্তির বশে তুষ্ট হয়ে প্রেমের ঈশ্বর,
দুঃখমন্ত্রে দীক্ষা দিয়া ভিক্ষা দিল চির-দৈন্য বর।
দীনে তিনি রাজ্য দেন, আঢ্যে দেন দৈন্য মহাধন,
দুর্ব্বলেরে দেন বল, প্রবলের করেন হরণ।
দৈন্য যেথা শ্রেষ্ঠ ধন সেথা তুমি সকলের বড়,
প্রেমিকের ভিক্ষাপাত্র তুমি তাই অশ্রু দিয়ে ভরো।
সাঙ্গোপাঙ্গ শ্রীগৌরাঙ্গ লভিলেন তব মাধুকরী,
শত শত বাহুপাশে তাঁরে তুমি ছিলে বক্ষে ধরি'।
কত রাজ-রাজেন্দ্রেরা পরিব্রজ্যা করিয়া গ্রহণ,
তোমারে সঁপিয়া গেছে শেষের সম্বল দৈন্য-ধন।
শঙ্কর সর্ব্বস্ব হরি' দিল তোমা মহাশঙ্খহার,
আচার্য্যের রূপে পুন ভুলাইল অনিত্য সংসার।
হারায়েছ সৌধহর্ম্ম্য, আছে মঠ-মন্দির-গৌরব,
সাধু মহাগুরুদের অস্থি তব প্রোথিত বৈভব।
প্রেমের আতিথ্যে তব তুষ্ট হয়ে দুঃখীর ঠাকুর,
করিয়া রেখেছে তোমা চিরতরে কাঙাল বিদুর।

এই দুঃখ-দীক্ষা মন্ত্র এ দারিদ্র্যে করিয়া সম্বল,
জাগো পুনঃ সুপ্তবীর, তোল' শির পতিত উৎকল!
পশুবল পেশীবল বিশ্বজয়ী নহে নহে আর,
পূজার শঙ্খের পাশে নমে অসি ভগ্ন তরবার।
গ্রীষ্মে মহানদী-সম আজি তুমি বালুকা-পাথার,
স্মরো সেই দিন যবে হলো নামকরণ তাহার।
শৈলশিরে আরোহিয়া হের অই দিগন্তসীমাতে,
নাহি আর শত্রুচিহ্ন, দেবতারে হবে না লুকাতে।
রক্তসিন্ধু শুকায়েছে—প্রেম-সিন্ধু হের নীলিমায়,
তার সনে মৈত্রী কর—বিশালতা শিখাবে তোমায়।
নবযুগ-প্রভাতের স্বস্তিগীতি কবিকণ্ঠে শুন,
কুণ্ঠিত শঙ্কিত ভীরু এ প্রভাতে আঁখি মেল' পুনঃ।
চরম সাধনাপথ বিশ্বমাঝে নিঃস্বতার সুরু,
এ কথা তোমারে নিত্য শুনায়েছে শত ধর্ম্মগুরু।
শক্তির শ্মশান তুমি ঐশ্বর্য্যের সমাধিনিলয়,
জান তুমি রাজশক্তি বৈভবের কোথায় বিলয়?
এবার ঐশ্বর্য্যে নহে, জাগো তুমি প্রজ্ঞার জগতে,
যাত্রা কর মৈত্রীলোকে সত্ত্বপুণ্য রজঃশূন্য পথে।
দূর কর সংকীর্ণতা, জীর্ণপ্রথা, ভ্রমের সংস্কার,
জড়তা মূঢ়তা ভীতি তামসিক হীন মিথ্যাচার।
জগতের প্রেমযজ্ঞে পান কর সোমের মাধুরী,
হে উৎকল, ভুলো নাক তব বক্ষে **জগন্নাথপুরী**!

শ্রীকালিদাস রায়।

# হিন্দু-বিধবা

পুণ্য শুক্লাম্বর-পরা রূপে বিশ্ব আলো করা,
তৈলহীন রুক্ষকেশ মুক্ত বিলম্বিত,
কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের মালা মহিমামণ্ডিত।

সন্ধ্যার ললাটে হায় দীপ্ত নক্ষত্রের প্রায়
স্নিগ্ধ কান্তি, বিস্ফারিত আঁখি যুগ স্থির,
কপোল পাণ্ডুর, মুখ প্রসন্ন গম্ভীর।

অঙ্গে নাহি অলঙ্কার কাঞ্চী, বাজু, বালা, হার,
তবু কত দীপ্তিময়ী যেন অরুন্ধতী,
অনল হৃদয়-গতা স্বাহা মূর্ত্তিমতী!

সীমন্তে সিন্দুর নাই আশা তৃষ্ণা—ভস্ম ছাই,
কি দিব্য স্বর্গীয় প্রভা স্বর্গীয় কিরণ,
জীবনের প্রেমরাশি সম্বল মরণ।

স্বামিপূজা স্বামী ধ্যান বিশ্বরূপ স্বামী-জ্ঞান,
দলিছ অশিব সব পতি প্রেম বলে,
বিরাজিতা বিশ্ব-মাতারূপে মহীতলে।

উপবাস একাহার জীর্ণ তনু সুকুমার
নির্ব্বাপিত কামনার দৃপ্ত পরাক্রম,
বিলাস-বাসনা-জিত বিশুদ্ধ সংযম।

কি মহান্ আত্মজয় পরার্থে জীবন ক্ষয়
ধন্য বসুন্ধরা তব পদখানি সেবি।
হিন্দুর বিধবা তুমি মূর্ত্তিমতী দেবী।

শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রনারায়ণ ভৌমিক।

# ইটাজাতির ইতিবৃত্ত

বলবান্ দুর্ব্বলকে পীড়ন করিবে ও বুদ্ধিমান্ নির্ব্বোধকে সংক্ষুব্ধ করিবে, ইহাই চিরন্তন নিয়ম। স্থাবর ও জঙ্গম উভয় রাজ্যেই এই নিয়মের সমান প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। একটি পূর্ণায়তন খর্জ্জুর বা তালবৃক্ষের কাণ্ডসংলগ্ন ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র একটি অশ্বত্থবীজ কালক্রমে নিজ অঙ্গ বিস্তার পূর্ব্বক তাহার অসময়ের আশ্রয়দাতা উক্ত খর্জ্জুর বা তালবৃক্ষকে মূল বন্ধনী দ্বারা পিষ্ট ও ধ্বস্ত করিয়া ফেলে। আবার মুষ্টিমেয় আর্য্য-জনসঙ্ঘ নদ-নদী-বহুল উর্ব্বর প্রদেশবাসী অনার্য্যদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া নিজ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন। প্রবলের সহবাসে দুর্ব্বল অবিরত ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। ভারতবর্ষে যেরূপ বিভিন্ন জাতীয় জনসঙ্ঘ পর্য্যায়ক্রমে আগমন পূর্ব্বক অত্রস্থ আদিম অধিবাসিপুঞ্জকে বিতাড়িত বা বশীভূত করিয়া নিজ নিজ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, পৃথিবীস্থ অনেকানেক ভূখণ্ডসমূহে সেই প্রকার জনসঙ্ঘের গতিবিধি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

প্রশান্ত মহাসাগরস্থ ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জবাসী ইটা নামক একটি ধ্বংসোন্মুখ প্রাচীন জাতির ইতিবৃত্ত এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। এই দ্বীপপুঞ্জে অন্যান্য বহু অনার্য্য জাতি বাস করে, কিন্তু ইটারাই সর্ব্বাপেক্ষা আদিম জাতি বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। এই জাতি পুরাকালে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের প্রায় সর্ব্বত্রই বসবাস করিত। হিন্দু ও বৌদ্ধ পরিব্রাজকবর্গের সংসর্গে ও শিক্ষাগুণে ইহাদের অমার্জ্জিত অনার্য্য চরিত্রের যৎকিঞ্চিৎ বিকাশ হইয়াছিল—উহা ইহাদের ধনুর্ব্বাণের ব্যবহার, অগ্ন্যুৎপাদক প্রক্রিয়া, রোগ-প্রতীকারার্থ ঔষধি-নির্ব্বাচন, অঙ্গাচ্ছাদন প্রস্তুতকরণ ও ব্যবহারপ্রবৃত্তি, পশুহননান্তর উহা অগ্নিতে পাককরণ, কাষ্ঠাদির উপর কারুকার্য্য, বয়োজ্যেষ্ঠের প্রতি সম্মান ও তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তিতা এবং বিবাহাদি বিষয়ে প্রাচীন পদ্ধতির অনুষ্ঠান-প্রবৃত্তি প্রভৃতি কয়েকটি আর্য্যজনোচিত কার্য্যকলাপ দর্শনে কথঞ্চিৎ অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। কালক্রমে মার্কিণ-সাম্রাজ্যের উপনিবেশ-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অপেক্ষাকৃত সভ্য মালয়, পম্পাঙ্গান প্রভৃতি জাতিবর্গের অভ্যুদয় হয় এবং তাহাদের সহিত সংঘর্ষে এবং মার্কিণ ঔপনিবেশিকগণের বুদ্ধি-কৌশলে ও বৈজ্ঞানিক অস্ত্রশস্ত্রপ্রভাবে নিকৃষ্ট অস্ত্রধারী, হীনবুদ্ধি এই আদিম জাতিবর্গ পরাজিত ও বিতাড়িত হইয়া সমুদ্রতীরস্থ দুর্গম অরণ্যানীপ্রদেশে এবং পার্ব্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়। এই জাতির নামকরণ দেখিয়া এই সিদ্ধান্ত অনেকাংশে যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পম্পাঙ্গান ভাষায় "ইটা" শব্দের অর্থ উচ্চতর—অর্থাৎ ইহাদিগকে ক্রমাগত প্রপীড়িত করিতে করিতে ফিলিপাইন দ্বীপের উচ্চতর দুর্গম প্রদেশে বিতাড়িত করা হইয়াছে। এই জাতি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে নিগ্রিটো, বেলুচা, বুকাইল, সিমাং প্রভৃতি নামেও অভিহিত হইয়া থাকে।

ইটাগণ যে প্রদেশে পর্য্যটন করে, উহা নিতান্ত দুর্গম ও নির্জ্জন। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের যে উপকূল বিভাগে সুনীল প্রশান্তমহাসাগরের উত্তাল তরঙ্গমালা জলমগ্ন প্রবাল-গঠিত প্রাচীরশ্রেণীর উপর অপ্রতিহত প্রভাবে প্রোৎক্ষিপ্ত হইয়া অনন্ত ফেনরাশি উদ্গিরণ করিতেছে ও একমাত্র নদী-মোহনা ভিন্ন অন্য পথ দিয়া যে প্রদেশে প্রবেশ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার, সেই অত্যুচ্চ পার্ব্বতীয় উপকূলস্থ চিরহরিৎ বিজন অরণ্যানীপ্রদেশ ইটাদিগের প্রিয় আশ্রয়স্থান। এই বন্যভূমি এতই দুর্গম ও নিবিড় যে, ইহার সহিত পৃথিবীর অন্য কোনও বন্যভূমির তুলনা হইতে পারে না। এই অরণ্যস্থিত মহীরুহসকল অত্যন্ত ঘন-সন্নিবিষ্ট হওয়ায় উহাদিগের কাণ্ড মূলদেশ হইতে ষষ্টি, সপ্ততি হস্ত ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত শাখাপ্রশাখাবিহীন হইয়া থাকে। তদূর্দ্ধে ঐ সকল শাখাপ্রশাখা সুদূর-প্রসারিত হইয়া যেন পরস্পর দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে এবং তদুপরি নানাজাতীয় উপবৃক্ষসকল (orchids) উদ্ভূত হইয়া ফল ও পুষ্পসজ্জায় ঐ অরণ্যের শোভা পরিবর্দ্ধিত করিতেছে। অধিকন্তু স্থানে স্থানে শৈবালরাশি সঞ্চিত হইয়া ঐ স্বভাবসুন্দর পত্রান্তরগুলিকে এরূপ ঘনসংলগ্ন করিয়া রাখিয়াছে যে, তদ্দ্বারা সূর্য্যালোক সর্ব্বতোভাবে সংবৃত করিয়াছে। এমন কি, মধ্যাহ্নকালেও উহার তলদেশ ঊষালোকাপেক্ষা অধিকতর আলোকপ্রাপ্ত হয় না। ঐ সকল আদিম সুদূরব্যাপী অরণ্যপ্রদেশে নানাজাতীয় পশু, পক্ষী, বানর ও নয়নরঞ্জন কীট-পতঙ্গাদি বহু পরিমাণে বিচরণ করিয়া থাকে। অশেষ প্রকার নৈসর্গিক অসুবিধা প্রযুক্ত এবং বোধ হয় আশানুরূপ অর্থাগমের সম্ভাবনা না থাকায় এই সকল প্রদেশ অদ্যাপি সভ্যসম্প্রদায়ের লোলুপদৃষ্টির বহির্ভাগে রহিয়া গিয়াছে।

এইরূপ স্বভাবসম্ভূত বৃক্ষলতাদিগঠিত চির-হরিৎ চন্দ্রাতপের আশ্রয়ে বসবাসের ফলে ইটাগণ গৃহনির্ম্মাণ ও শয্যারচনা বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ও উদাসীন হইয়া পড়িয়াছে। যদিও কচিৎ ইহাদিগকে অস্থায়ী গৃহনির্ম্মাণ করিতে দেখা যায়, কিন্তু দুইটি বংশদণ্ড ভূমিতে প্রোথিত করিয়া তদুপরি এক খণ্ড বংশ ও যৎসামান্য শুষ্ক তৃণ বিছাইয়া দিয়াই উক্ত নির্ম্মাণকার্য্য সম্পন্ন করা হয়। ইহা আশ্রয়স্থান হিসাবে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত এবং প্রবল বায়ুবেগে উহা কোথায় উড়িয়া যায়, তাহার অস্তিত্ব থাকে না।

ইটাগণ কখনও কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসবাস করে না। ইহারা ভারতবর্ষীয় বেদে নামক যাযাবর সম্প্রদায়ের ন্যায় ভ্রমণশীল জাতিরূপে কালাতিপাত করে এবং দৈনন্দিন খাদ্য আহরণোদ্দেশ্যে যে স্থানে যে দিন উপস্থিত হয়, সেই স্থানেই সে দিন বাসস্থান-নির্ব্বিশেষে অবস্থান করে। শুষ্ক ঋতুতে ইহারা সমুদ্র-উপকূলে প্রান্তরাদিতে বা পার্ব্বত্যপ্রদেশে বিচরণ করে, কিন্তু বর্ষাসমাগমে ইহারা সুগভীর অরণ্যপ্রদেশে প্রবেশ করে এবং বৃষ্টি ও ঝঞ্ঝাবাত হইতে শরীররক্ষার্থ কোন প্রাচীন বৃক্ষের কাণ্ডপার্শ্বে, কোন পর্ব্বতের অন্তরালে বা গুহাভ্যন্তরে আশ্রয় লয়। কিন্তু যখন দীর্ঘকালব্যাপী বর্ষা হয় এবং মুষলধারে বৃষ্টিপাত সহযোগে প্রবল বায়ুপ্রবাহ বন্যভূমি বিপর্য্যস্ত করিতে থাকে, তখন হতভাগ্য ইটাগণ উভয় জঙ্ঘার মধ্যে মস্তক সন্নিবেশিত করিয়া এবং তদুপরি হস্তদ্বয় বিন্যস্ত করিয়া কুণ্ডলীকৃত ও নিশ্চলভাবে ঝঞ্ঝাবাত নিবৃত্ত না হওয়া পর্য্যন্ত এক স্থানে অবস্থান করে। এইরূপ অবস্থায় কখন কখন ৫।৬ দিন পর্য্যন্ত অনাহারে কাটিয়া যায়। জন্মাবধি এবম্প্রকার নানাবিধ নৈসর্গিক অত্যাচারে প্রপীড়িত হওয়ায় ইটাগণ অত্যন্ত স্বল্পায়ু হইয়া থাকে এবং সাধারণতঃ ৪০ বৎসরের মধ্যেই জীবলীলা সংবরণ করে। এই জাতির মধ্যে মৃত্যুর পরিমাণ জন্মের পরিমাণ অপেক্ষা অনেক অধিক। ৪ শত বৎসর পূর্ব্বে যখন স্পেনীয় ঔপনিবেশিকরা এখানে আগমন করেন, তখন ফিলিপাইন-দ্বীপপুঞ্জের সর্ব্বত্রই ইটাগণ বসবাস করিত। কিন্তু এক্ষণে ইহাদের সংখ্যা সর্ব্বসমেত ২০ সহস্রের অধিক হইবে কি না সন্দেহ।

ইটা জাতির স্বভাব-চরিত্র, জীবনযাপনোপায় ও আচার-ব্যবহারাদি বিষয়ে ভারতমহাসাগরস্থ দ্বীপপুঞ্জবাসী ও ভারতবর্ষস্থ বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত অনার্য্য জাতি সমূহের সহিত কিয়দংশে সাদৃশ্য আছে। কিন্তু সর্ব্ববিষয়ে সামঞ্জস্য রাখিয়া ইহাদিগকে কোন একটি বিশেষ শ্রেণীভুক্ত করা বড়ই সমস্যার বিষয়। তবে ইহাদিগকে আদিম নিগ্রো-বংশোদ্ভূত খর্ব্ব যাযাবর সম্প্রদায় আখ্যা প্রদান করিলে বোধ হয় ঠিক হয়।

ইহাদিগের পূর্ণবয়স্ক পুরুষগণ দৈর্ঘ্যে সাধারণতঃ ৩ ফুট হইতে সার্দ্ধ ৪ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া থাকে এবং স্ত্রীলোকরা আরও খর্ব্বাকৃতি হয়। ইহারা শৈশবকালে অতিশয় ক্ষীণ ও ক্ষুদ্রাকারবিশিষ্ট হয় বটে, কিন্তু পরিণতবয়সে, বাহ্যদৃষ্টে বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্ট দেখায়, তবে ইহাদের আকারানুযায়ী বলবীর্য্যের কোন প্রমাণই পাওয়া যায় না। বরং সাধারণতঃ ইহারা আলস্যপরতন্ত্র দুর্ব্বল, আত্মগোপনতৎপর, নির্ব্বোধ এবং ভীরুস্বভাবাপন্ন হইয়া থাকে। ইহাদিগের গাত্রের বর্ণ পাথুরিয়া কয়লার ন্যায় ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হয়, কচিৎ গাঢ় খদির্রবর্ণও হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের মধ্যপ্রদেশে যেরূপ "মেড়ুয়া" নামক এক প্রকার শস্য খাদ্যরূপে প্রচলিত থাকায় উক্ত মেড়ুয়া শব্দ জাতি-বিশেষের উদ্দেশে শ্লেষোক্তিরূপে ব্যবহৃত হয়, সেইরূপ "উবি" নামক এক প্রকার গাঢ় বেগুনী রংয়ের মূল ইটাগণ অত্যধিক ব্যবহার করে বলিয়া উক্ত "উবি" শব্দও বর্ণবিচারার্থ ফিলিপাইনদ্বীপবাসীদের মধ্যে একটি শ্লেষোক্তির মধ্যে পরিগণিত হয়। ইটাদিগের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে আরও কয়েকটি বিশেষত্ব আছে। ইহাদিগের ওষ্ঠ মাংসল ও সম্মুখদিকে উল্টাইয়া পড়ে। ইহাদের মস্তকের কেশ এরূপ ঘন-সন্নিবিষ্ট ও কুঞ্চিত হইয়া থাকে যে, ইহা প্রাকৃতিক প্রকোপ হইতে মস্তকরক্ষার্থ যথেষ্ট সাহায্য করে। এমন কি, তদ্দেশীয় দুরন্ত বর্ষাকালে ইটাগণ সামান্য একটি তালপত্র ব্যতীত কোনরূপ শিরস্ত্রাণ ব্যবহারের আবশ্যকতা উপলব্ধি করে না।

ইটা পুরুষদ্বয় ফলাহরণ নিমিত্ত বৃক্ষারোহণ করিতেছে

ঝরণাপার্শ্বে মৎস্য-সংগ্রহরতা ইটা রমণীদ্বয়

ইটাগণের মধ্যে যাহারা বিলাসী, তাহারা সৌন্দর্য্যশালী হইবার জন্য একটি উত্তপ্ত বংশ-শলাকা দ্বারা নিজ বাহুদ্বয়, পৃষ্ঠ ও বক্ষোদেশে বিচিত্র ছাপ অঙ্কিত করে এবং এই চিহ্ন ইহাদিগের মধ্যে সাতিশয় সৌন্দর্য্যের পরিচায়করূপে পরিগণিত হয়। ইহারা কেশ-বিন্যাসার্থ বংশনির্ম্মিত এক প্রকার চিরুণী ব্যবহার করে এবং মস্তকের উত্তাপ বাহির হইয়া গিয়া উহা শীতল হইবে, এইরূপ মনে করিয়া প্রায়শঃ মস্তক মুণ্ডন করিয়া থাকে। উহারা সম্মুখ-দন্তগুলির উভয় পার্শ্ব ভগ্ন করিয়া সূক্ষ্মাগ্রবিশিষ্ট করে। এই কার্য্য নিতান্ত কৌশলহীন উপায়ে নিষ্পন্ন হয়। যে দন্তটি সূক্ষ্মাগ্রবিশিষ্ট করিতে হইবে, উহার নিম্নে একটি কঠিন কাষ্ঠখণ্ড রাখা হয় এবং একটি তীক্ষ্ণধার ছুরিকা উক্ত দন্তোপরি স্থাপন করিয়া তদুপরি এক খণ্ড প্রস্তর দ্বারা আঘাত করা হয়। এইরূপে দন্তের উভয় পার্শ্ব ভগ্ন করিবার পর বালুকা-প্রস্তর দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া মসৃণ করা হয়। এইরূপ করিবার সময় প্রায়ই দন্ত-মূল হইতে প্রভূত রক্তপাত হইয়া থাকে এবং কখন কখন দন্তটি সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়।

উজ্জ্বলবর্ণবিশিষ্ট দ্রব্যসকল ইটাদিগের বড় প্রিয়। ইহারা কাস্তিমান নামক একপ্রকার রক্তবর্ণ বস্ত্র অত্যন্ত পছন্দ করে। কিন্তু অর্থাভাব বশতঃ অল্পসংখ্যক ইটাই এই বস্ত্র ক্রয় করিতে সমর্থ। অঙ্গাচ্ছাদনার্থ ইহারা সাধারণতঃ কৌপীনমাত্র পরিধান করে। উক্ত কৌপীন একপ্রকার বৃক্ষতন্তু হইতে প্রস্তুত হয়। বঙ্গদেশে পাট-গাছ হইতে যেরূপ উপায়ে তন্তু বাহির করা হয়, ইটাগণ ঠিক সেই উপায়ে একপ্রকার বৃক্ষ-ত্বক্ হইতে তন্তু বাহির করিয়া উহা বিনাইয়া কৌপীন প্রস্তুত করে। ঐ কৌপীন-বস্ত্র ধৌত করা হইলে ঠিক সংস্কৃত কৃষ্ণসার মৃগচর্ম্মের (chamois leather) ন্যায় দেখায়। ইটাগণ উক্ত

কৌপীন একবার পরিধান করিলে যত দিন পর্য্যন্ত না উহা একেবারে অব্যবহার্য্য হইয়া যায়, তত দিন পর্য্যন্ত উহার জীর্ণ-সংস্কার বা উহা পরিত্যাগ করে না।

ইটাগণের বুদ্ধি-বৃত্তি পরিচালনায় শক্তি নিতান্ত হীন। এমন কি, দশ সংখ্যা গণনা করিতে হস্তদ্বয়ের অঙ্গুলিগুলির সাহায্য লইতে হয় এবং দুই দশ গণনার আবশ্যক হইলে হস্ত ও পদাঙ্গুলী উভয়ই আবশ্যক হয়। গণিতশাস্ত্রে ইহাই ইহাদের চরম ব্যুৎপত্তি। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ যৎসামান্য কৃষিকার্য্যও করে, কিন্তু ইহারা কাষ্ঠফলকের উপর কারুকার্য্য বিশেষ দক্ষতার সহিত সম্পাদন করে এবং এই প্রকার কার্য্য করার নিমিত্ত ইহাদের দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত প্রখর হয়। ইটাদিগের শ্রবণশক্তিও অতিশয় প্রবল। এই হেতু বহু দূরবর্ত্তী দৃশ্য ও অতি ক্ষীণ শব্দ, যাহা সাধারণ দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তির সম্পূর্ণ বহির্ভূত, উহা তাহারা অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারে।

ইটাগণের প্রিয় বিজন বনপ্রদেশের এক পার্শ্ব

ইটাগণ একত্র দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে না, বা এক স্থানে অধিক দিন অবস্থান করে না। এক একটি দলে সচরাচর ১৪।১৫ জন মাত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই দলের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে সকলে সম্মান করে এবং সর্ব্ববিষয়ে তাহার অনুমতি লইয়া কার্য্য করে। ইটাগণ এরূপ সন্দিগ্ধচিত্ত যে, উহারা নিজ নিজ দলস্থ লোক ব্যতীত কাহাকেও বিশ্বাস করে না। এমন কি, ইহাদের স্বজাতীয় ভিন্ন ভিন্ন দলের লোক যদি বিশেষ পরিচিত না হয়, তবে তাহাকেও শত্রু বলিয়া মনে করে।

ইটাগণ কচিৎ জনপদে আগমন করিয়া থাকে এবং দুর্গম অরণ্যানী-প্রদেশ দিয়া এরূপ প্রচ্ছন্নভাবে গমনাগমন করিয়া থাকে যে, কোন স্থানে ইহাদের আগমনের বিষয় কেবলমাত্র বৃক্ষ গুল্ম উৎপাটন-চিহ্ন দেখিয়া অনুমান করিয়া লওয়া হয়। ইহারা প্রকাণ্ড বৃক্ষান্তরালে বা উহার ঘনসন্নিবিষ্ট পত্রপুষ্পের মধ্যে অথবা কোন পর্ব্বতোপরিস্থ প্রস্তরাদির পার্শ্বে এরূপভাবে আত্মগোপন করিয়া অবস্থান করে যে, অনুসন্ধিৎসু পরিব্রাজকগণ ইহাদিগের কিছুমাত্র সন্ধান পায় না। পরন্তু উহারা দৃষ্টিশক্তির প্রাখর্য্য বশতঃ বহু দূরবর্ত্তী বস্তুসমূহ অনায়াসে দেখিতে পায়। ইহাদিগের এই প্রকার আত্মগোপন-তৎপরতা এবং চঞ্চল চক্ষুর ভীতিব্যঞ্জক দৃষ্টি প্রভৃতির বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে ইহা দৃঢ়তররূপে প্রতীয়মান হয় যে, ইহারা ফিলিপাইনদ্বীপস্থ অন্যান্য সভ্যতাভিমানী জাতিসঙ্ঘের নিকট বহুকাল যাবৎ অত্যাচাররূপে উৎপীড়িত ও নির্য্যাতিত হইয়া আসিতেছে।

ইটাদিগের খাদ্যাখাদ্যের বিচার নাই। উদ্ভিজ্জগতের প্রায় সর্ব্ববিধ ফল-মূল, লতা-গুল্মাদি এবং জীবজগতের ক্ষুদ্রতম কৃমি-কীট হইতে নরভুক্ ব্যাঘ্রভল্লুকাদি ভূচর, খেচর ও জলচর সমস্ত জন্তুই ইহাদের খাদ্যমধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। তাম্রকূট ইহাদের অত্যন্ত প্রিয় বস্তু এবং ইহারা উহা সর্ব্বদা সঙ্গে রাখে। অন্য কোন খাদ্য থাকুক আর না থাকুক, তাম্রকূট অপরিহার্য্য। কোন বৃক্ষে মধুচক্রের সন্ধান পাইলে ইহারা ঐ বৃক্ষতলে অগ্নিপ্রজ্বালন দ্বারা মধুমক্ষিকাগণকে বিতাড়িত করিয়া উক্ত মধুচক্র সংগ্রহ করে এবং সকলে মিলিয়া মধুপান করিয়া মধুথসকল বিক্রয়ার্থ রাখিয়া দেয়। পশুপক্ষিগণ যেরূপ সম্মুখাগত খাদ্যদ্রব্য তৎক্ষণাৎ উদরসাৎ করিয়া ফেলে, পরক্ষণের জন্য কিছুমাত্র সঞ্চয় করিয়া রাখে না, ইহারাও তদ্রূপ। এমন কি, প্রাতঃকালের সংগৃহীত খাদ্যদ্রব্য মধ্যাহ্নভোজনেই নিঃশেষ করিয়া ফেলে, সান্ধ্য-ভোজনের বিষয় কিছুমাত্র চিন্তা করে না। যখন অতিশয় ক্ষুধার উদ্রেক হয় এবং কোনরূপ আহার্য্য বস্তু আহরণ করিতে না পারে, তখন ইহারা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উষ্ণ জল পান করে এবং কুক্ষিদেশ একগাছি রজ্জু দ্বারা দৃঢ়রূপে বন্ধন করে। বলা বাহুল্য, ইহারা খাদ্যদ্রব্য রন্ধন করে না। কেবলমাত্র অগ্নি-সন্তাপে সামান্য ঝলসাইয়া লয়। অর্দ্ধদগ্ধ মাংসাদি দন্ত দ্বারা বলপূর্ব্বক ছিন্ন করিয়া ভক্ষণ করে।

পর্য্যটনকালে ইটা-জাতীয় স্ত্রীলোকগণ শিশুসন্তানসন্ততিগণকে এক

প্রকার লতা-নির্ম্মিত আধার-( ঝুলী ) মধ্যে বসাইয়া পৃষ্ঠোপরি বহন করিয়া থাকে। ইটা শিশুগণ অত্যন্ত চতুর হয়, কিন্তু ক্ষুধা ও নানাবিধ প্রাকৃতিক তাড়নার এবং অধিকাংশ সময় অগ্নিকুণ্ডোদ্ভূত ধূমরাশির সন্নিকটে বসবাস করায় অল্পবয়সেই প্রবীণত্ব প্রাপ্ত হয়। ইটা বালকগণের একটি বিশেষ স্বভাব এই যে, ইহারা কখনও ক্রন্দন করে না; কষ্ট নিতান্ত অসহ্য হইলে এক প্রকার মৃদু কাতর ধ্বনি করে মাত্র। এজন্য কোন ইটাদল অন্যের অলক্ষিতে কোন নির্জ্জন স্থানে লুক্কায়িত থাকিতে ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। ইটা বালকগণ এরূপ শান্তপ্রকৃতির যে, এক খণ্ড উজ্জ্বল প্রস্তর বা একটি রঙ্গীন পুষ্প পাইলে প্রহরাধিক কাল হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে ক্রীড়া করিয়া থাকে।

ইটাগণের ভাষা অন্যান্য সমস্ত ভাষা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ বলিয়া মনে হয়। তবে উহার মৌলিকতা সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় করিবার সুবিধা অদ্যাপি কাহারও ঘটিয়া উঠে নাই।

বামপার্শ্বে জনৈক সভ্য ইটা। দক্ষিণপার্শ্বে বন্য ইটা বালকগণ—ফটোগ্রাফ লইবার কালে ক্যামেরার মধ্যে "অনিতো" প্রেতচ্ছায়া বিদ্যমান আছে, এই ধারণায় ভয়বিহ্বল চিত্তে দণ্ডায়মান। মধ্যস্থলে লম্বমান দণ্ডটি একটি বনজাত বংশের আদর্শ

ইটাগণ লতা, বংশ, মৎস্যাস্থি, পশুকঙ্কাল প্রভৃতি দ্বারা ইহাদের ব্যবহার্য্য দ্রব্যসামগ্রী প্রস্তুত করে। ইহারা লৌহাদি ধাতুসকলের ব্যবহার বিষয়ে এক প্রকার অজ্ঞ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। একখানি সামান্য ছুরিকা বা তীরের ফলক পূর্ব্বপুরুষের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ পুরুষানুক্রমে হস্তান্তরিত হইয়া থাকে। ইটাগণের অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে বল্লম, ধনুর্ব্বাণ এবং দুই একখানি অমার্জ্জিত ছুরিকা মাত্র সম্বল। উক্ত অস্ত্র-শস্ত্র ব্যতীত আরও কয়েকটি দ্রব্য ইহারা সঙ্গে রাখে, যথা—কয়েকটি মৃন্ময় পাত্র, তামাকু, চকমকি, মৎস্য ধরিবার জন্য সূত্র ও বঁড়শী এবং দুই একটি অর্দ্ধশিক্ষিত কুকুর। যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই সমস্ত সামগ্রী ইহাদের সঙ্গে থাকে, ততক্ষণ ইহারা ভূসম্পত্তি বা অন্য সহায়-সম্বল কিছুই চাহে না, বা পৃথিবীর মধ্যে কোনও অনাটনই গ্রাহ্য করে না।

মৃণ্ময়পাত্রনির্ম্মাণ ও ইহার ব্যবহার বিষয়ে ইহাদের যৎসামান্য জ্ঞান আছে। ইহারা এক প্রকার তালবৃক্ষের কাণ্ড বিশ্লিষ্ট করিয়া তদ্দ্বারা ধনু এবং বংশ-শলাকা বা কোন লতা বা বৃক্ষতন্ত দ্বারা উহার জ্যা প্রস্তুত করে। তীরের ফলক সাধারণতঃ মৎস্যকঙ্কাল বা প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত হয়। কাহারও কাহারও বংশপরম্পরাগত লৌহফলকও আছে। ইহাদের প্রত্যেকের অল্পসংখ্যক তীর থাকে, এই জন্য উহা ব্যবহারান্তে পুনঃ পুনঃ সংগ্রহ করিতে হয়। বন্য শূকরাদি বড় বড় জন্তু বধ করিতে হইলে ইটাগণ 'ক্রোটন টিগলিয়ম' নামক এক প্রকার বন্য ঔষধির নির্য্যাস দ্বারা তীরগুলি বিষাক্ত করে এবং যে অঙ্গবিশেষে ঐ তীর বিদ্ধ হয়, তাহারা ঐ স্থানের মাংস কাটিয়া ফেলিয়া দেয়। ইটাগণ পশু-পক্ষী শিকার করিবার জন্য নানাপ্রকার চাতুর্য্য অবলম্বন করে। কখন বা বন্যফলবৃক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক বানরের স্বরের অনুকরণ করিয়া থাকে এবং তচ্ছব্দে বন্য শূকরশ্রেণী নিকটবর্ত্তী হইলে তাহাদিগকে তীরবিদ্ধ করে। বনজাত নানাবিধ ফল যখন পরিপক্ব হইয়া উঠে, সেই সময় শুক, কপোত প্রভৃতি নানাজাতীয় পক্ষী দলে দলে ঐ সকল বৃক্ষে সমবেত হইলে ইটাগণ বিশেষ উৎসাহ সহকারে পক্ষিশিকারে তৎপর হয়। কখন কখন বন্য হরিণ বা বরাহ শিকারার্থ ইহারা সংকীর্ণ বন-পথে তীরসকল গুপ্তভাবে প্রোথিত করিয়া রাখিয়া নিকটবর্ত্তী কোন গুল্মশ্রেণীর মধ্যে লুক্কায়িত থাকে এবং হরিণ-বরাহাদি জন্তু দ্রুত গমনকালে যখন উক্ত তীরসকল দ্বারা বিদ্ধ হইয়া যায়, তখন ইটাগণ গুপ্তস্থান হইতে বহির্গত হইয়া উহাদিগকে সংহার করে।

ইহাদিগের মধ্যে দুই এক ব্যক্তি কখন কখন সাহসে নির্ভর করিয়া পশুচর্ম্ম, মধূপ ও অন্যান্য দুই একটি বনজাত দ্রব্য বিক্রয়ার্থ জনপদে আগমন করে এবং ইহাদের মূল্যস্বরূপ কোনরূপ মুদ্রা না লইয়া কেবলমাত্র যথাসম্ভব তামাকু, লবণ ও রঙ্গিন বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া সত্বর বনমধ্যে প্রবেশ করে। এই কয়টি দ্রব্যই ইটাদিগের বিলাসোপকরণমধ্যে পরিগণিত হয়।

ইটাদিগের প্রায় প্রত্যেক দলেরই নিকট অগ্ন্যুৎপাদনার্থ এক খণ্ড

প্রস্তর ও ইস্পাত থাকে। এতদ্দেশেও দীপশলাকা আমদানীর পূর্ব্বে এই প্রকার "চকমকির" প্রচলন ছিল। প্রস্তর-চকমকির অভাব হইলে ইটারা নিম্নলিখিত উপায়ে অগ্নি উৎপাদন করে। যথা :—এক খণ্ড সুপরিপুষ্ট শুষ্ক বংশের গ্রন্থিদ্বয়ের মধ্যস্থলে একটি ত্রিকোণাকার গর্ত্ত করিয়া ঐ বংশমধ্যস্থ শূন্যাংশ কোন সহজদাহ্য কাষ্ঠরেণু দ্বারা পরিপূর্ণ করে। পরে উক্ত ত্রিকোণাকার গর্ত্তের পরিসরমত আর এক খণ্ড বংশ প্রস্তুত করিয়া উহা ঐ গর্ত্তের উপর দ্রুত ঘর্ষণ করিতে থাকে। এইরূপ ভাবে ক্রমাগত ঘর্ষণ করিতে করিতে বংশদ্বয় উত্তপ্ত হইয়া ১০।১২ মিনিট কালের মধ্যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইয়া বংশমধ্যস্থ কাষ্ঠরেণুতে সংযুক্ত হওয়ায় উহা ক্রমে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে।

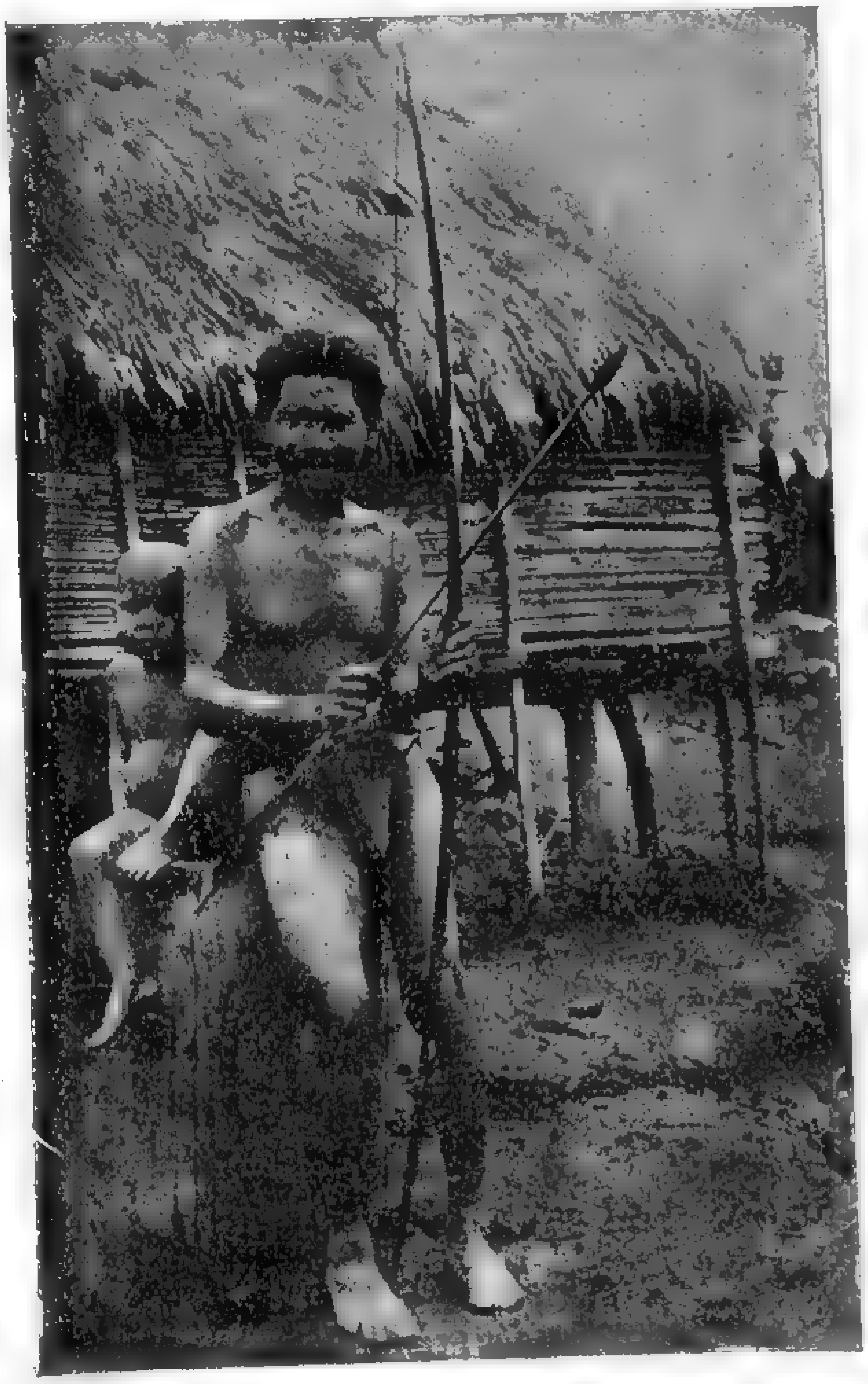

ধনুর্ব্বাণ হস্তে জনৈক বৃদ্ধ ইটা সন্তান সমভিব্যাহারে নিজ কুটীরপার্শ্বে উপবিষ্ট

ইটাগণ যখন যে স্থানে অবস্থান করে, সেই স্থানে সর্ব্বক্ষণ এক বা ততোধিক অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বালিত করিয়া রাখে। এই সকল কাষ্ঠবহুল বনপ্রদেশে এতদুদ্দেশ্যে ইন্ধনসংগ্রহার্থ ইহাদিগকে কিছুমাত্র আয়াস স্বীকার করিতে হয় না।

ইহারা অতিশয় নৃত্যগীতপ্রিয়। তবে এই নৃত্য সভ্যজনমণ্ডলীর দৃষ্টিতে যেন এক প্রকার শৃঙ্খলাবিহীন উল্লম্ফন-ক্রিয়া এবং গীত যেন এক অদ্ভুত ক্রন্দন-ধ্বনির অভিব্যক্তির ন্যায় প্রতীয়মান হয়। নৃত্যকালে ইহারা পরস্পর এক জন অন্য জনের কোমরের বস্ত্র ধারণ করিয়া বৃত্তাকারে নানা ভঙ্গীতে ঘুরিতে থাকে এবং কখন কখন লম্ফ দিয়া উঠে। নৃত্যকালে অবিরত একপ্রকার খোনাস্বরে শব্দ করিতে থাকে এবং মধ্যে মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে বীভৎসভাবে চীৎকার করে। এই নৃত্য-গীতের মাধুর্য্য ইহারা ব্যতীত অন্য কেহ উপলব্ধি করিতে পারে কি না সন্দেহ।

ইটাগণ বংশনির্ম্মিত এক প্রকার বংশী নাসিকার সাহায্যে বাদন করে। উহাও উপরি-উক্ত নৃত্য-গীতের ন্যায় তাল-লয়-বিহীন। বংশ ও বংশতন্তুর সাহায্যে ইহারা ইহুদীদিগের 'হার্প' নামক বাদ্যযন্ত্রের ন্যায় এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুত করে, কিন্তু যখন ঐ যন্ত্র বাদন করে, তখন মনে হয়, যেন কোন বেহালাদার তাহার বেহালার সুর মিলাইতেছে। তাহা হইলেও ইহাদের কিছুমাত্র তাল-লয়-বোধ নাই। কিন্তু তথাপি ইহারা অনেক সময় নৃত্য-গীতাদিতে মত্ত থাকে এবং এতদ্দ্বারা যথেষ্ট আনন্দ উপভোগ করে।

এতদ্দেশীয় অনার্য্য জাতিগণকে অনেক স্থলেই অতিশয় মদিরাসক্ত হইতে ও নানাবিধ মত্ততা-উৎপাদক দ্রব্য ব্যবহার করিতে দেখা যায়, কিন্তু ইটাগণ একমাত্র তামাকু ব্যতীত অন্য কোন প্রকার মাদকদ্রব্য ব্যবহার করে না বা তদ্বিষয় কিছুমাত্র অবগতও নহে। আর একটি বিষয়ে ইহারা অনেক সভ্য জাতি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। ইহাদিগের মধ্যে বহুবিবাহপ্রথা বা ব্যভিচার আদৌ প্রচলিত নাই।

ইটাদিগের বিবাহপ্রথা এক প্রকার রহস্যজনক ঔপন্যাসিক ব্যাপার। কোন পুরুষ ও স্ত্রীলোক বিবাহাভিলাষী হইলে, উহার দলস্থ বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিগণের অনুমতি গ্রহণ করে। পরদিন প্রাতঃকালে স্ত্রীলোকটি দ্রুতপদবিক্ষেপ সহকারে নিবিড় বনমধ্যে প্রবিষ্ট হয়, পরে বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিগণের নির্দ্দেশানুযায়ী কয়েক মুহূর্ত্ত পরে পুরুষটি স্ত্রীলোকটির অনুসরণ করিয়া থাকে। যদি স্ত্রীলোকটির আন্তরিক মিলনেচ্ছা না থাকে, তবে সে বনমধ্যে আত্মগোপন করিয়া থাকে, অথবা বন হইতে বনান্তরে ধাবমানা হইয়া পুরুষটিকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে। কোন প্রকারে যদি স্ত্রীলোকটি পুরুষটির অলক্ষিতে নিজদলে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারে, তবে উহাদের জাতীয় প্রথানুযায়ী উক্ত বিবাহ না-মঞ্জুর হইয়া যায় এবং ঐ স্ত্রীলোকটি অন্য কোন পুরুষের সহিত বিবাহিতা হইতে পারে। কিন্তু যদি এই মিলন স্ত্রীলোকটির মনোমত হয়, অথবা পুরুষটি কোন প্রকারে উহাকে বনমধ্যে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হয়, তবে উভয়ে সারাদিন বনমধ্যে বিহারাদি করিয়া সূর্য্যাস্তের পর দলমধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করে। তৎপরে উক্ত দলস্থ বয়োবৃদ্ধ দম্পতি সমারোহ সহকারে আহার্য্য বস্তু প্রস্তুত করিয়া উহাদিগকে আহারাদি করাইয়া রাত্রিযাপনার্থ একটি অপেক্ষাকৃত নিভৃত স্থানে রাখিয়া আইসে। এইরূপ কার্য্যাদির পর উহাদের উদ্বাহকার্য্য সুসম্পন্ন হইল বলিয়া পরিগণিত হয় এবং পর দিন হইতে ঐ নব-দম্পতি সাধারণভাবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে থাকে।

ইহারা বিশেষ কোন ধর্ম্মাবলম্বী নহে। কেবল "অনিতো" নামক দুষ্ট প্রেতযোনির প্রতি উহাদিগের অটুট বিশ্বাস এবং এই কুসংস্কারবশে শোক-দুঃখাদি-প্রশমনার্থ উহারা ঐ উপদেবতার নানাবিধ উপাসনাদি করিয়া থাকে।

ইটাগণ মৃতদেহ কবরস্থ করিয়া থাকে। দলস্থ কাহারও মৃত্যু হইলে, অনতিবিলম্বে উহারা নিকটস্থ স্থানে একটি অগভীর কবর খনন করিয়া তন্মধ্যে মৃতদেহ প্রোথিত করে এবং যত শীঘ্র সম্ভব ঐ স্থান হইতে পলায়ন করে। এইরূপ করিবার কারণ এই যে, উহাদের

বিশ্বাস, ঐ স্থানে কালবিলম্ব করিলে অন্যান্য ব্যক্তিগণও মৃত্যুকবলিত হইবে এবং ঐ মৃত ব্যক্তির প্রেতাত্মা তাহাদিগকে সহগামী করিয়া লইবে।

ইটাগণ কয়েকটি বন্য ওষধির রোগ-উপশমন-শক্তির বিষয় জ্ঞাত আছে। প্রেম-সঞ্চারার্থ, বশীকরণার্থ, ভীতিপ্রদর্শনার্থ এবং কাহারও প্রতি ঘৃণা বা ক্রোধ প্রশমনার্থ ইহারা কয়েক প্রকার বন্য লতা ও গুল্ম ব্যবহার করে। ঐ সকল লতা ও গুল্ম উক্ত উদ্দেশ্যসাধনার্থ কখনও মুখমধ্যে বা ওষ্ঠে এবং কখনও বা অঙ্গবিশেষে ধারণ করে। আমাদের দেশেও এই সকল প্রক্রিয়া অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত থাকায় বিষয় তন্ত্র ও পুরাণাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি, এই বিংশ শতাব্দীর জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত অনেক বিদুষী ভদ্রমহিলাও ভ্রান্ত বিশ্বাসবশে বিষাক্ত ওষধির অপব্যবহার করিয়া স্বামীর সোহাগলাভের পরিবর্ত্তে তাহাকে চিরজীবনের জন্য উন্মাদরোগগ্রস্ত ও জড়বুদ্ধি করিয়া দেয়।

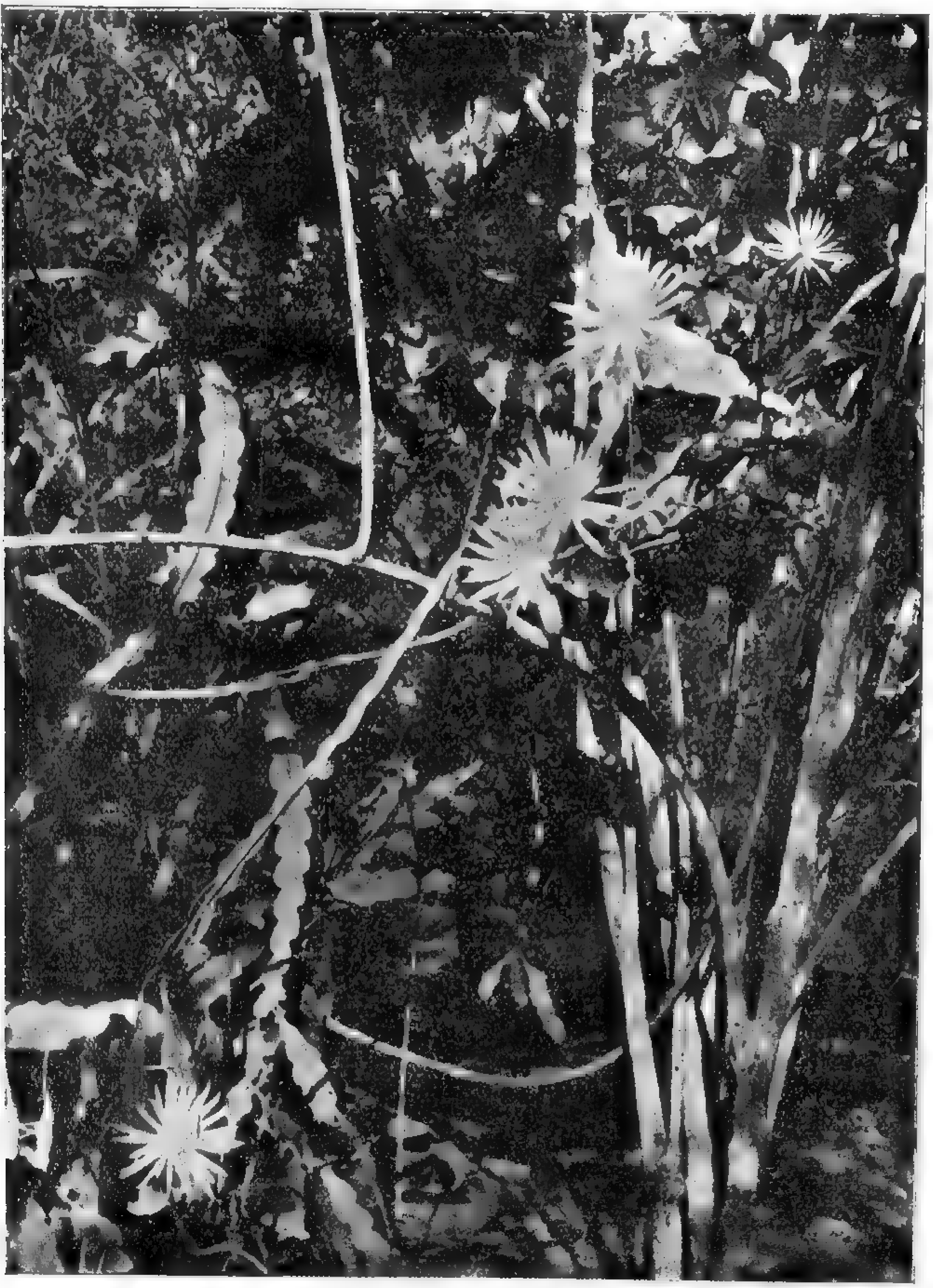

ইটাগণের বাসভূমি—অরণ্যমধ্যস্থ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য

ইহাদের আচার-ব্যবহারাদির বিষয় বিগত ২ শত বৎসরের চেষ্টায় যত দূর পরিজ্ঞাত হওয়া গিয়াছে, তাহা এই প্রবন্ধে যথাসাধ্য বিবৃত হইল। কিন্তু উহাদিগের জীবনের আরও বহুতর গূঢ় রহস্য অদ্যাপি অপ্রকাশিত থাকা সম্ভব। উহাদিগের আত্মগোপন-তৎপরতা, সভ্যজন-মণ্ডলীর সংসর্গ-পরিহার-পরতন্ত্রতা এ বিষয়ে এরূপ অন্তরায় যে, সে রহস্য কেহ কোনকালে জ্ঞাত হইতে পারিবে কি না সন্দেহ।

যাহা হউক, মানবের বাসনার নিবৃত্তিই যদি মুক্তির সোপান হয়, তবে এ বিষয়ে ইটাগণ যে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহার কোন সন্দেহ নাই।

ইহারা নির্জ্জন অন্ধকারময় অরণ্যাবাসে ইহাদের জাতীয় জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অতিবাহিত করিবার জন্য যেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ইটাগণ কোনক্রমেই সভ্যসম্প্রদায়ের সংস্রবে আসিতে চাহে না। কারণ, এইরূপ সংস্রব তাহাদের পক্ষে যেন মৃত্যু-মিলনস্বরূপ। ইটাগণ স্বভাবজাত বিশাল বিটপিকুঞ্জে নৃত্য-গীতাদি আমোদ-প্রমোদে সন্তান-সন্ততি পরিজনবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া মনের সুখে বিচরণ করে। ইহারা ভগবানের অনন্ত বিশ্বরাজ্যের অন্য কোন সুখৈশ্বর্য্যেরই প্রত্যাশী নহে। কেবলমাত্র দৈনন্দিন আহার্য্যবস্তু সংগৃহীত হইলেই সন্তুষ্ট।

এক কালে ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতির আদিপুরুষগণ এবং গ্রীসের প্রাচীন হেলেনীয় জাতি এইরূপ ভাবেই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। তবে তাঁহারা মার্জ্জিত-বুদ্ধি এবং ওজস্বিতাপ্রভাবে অচিরকালমধ্যেই ঐহিক ও পারলৌকিক সর্ব্ববিষয়েই চরম উৎকর্ষলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু এই অতিবৃদ্ধ আদিম ইটাজাতি সর্ব্ববিষয়ে উদাসীন-ভাবে ধীরে ধীরে মৃত্যু-পথের পথিক হইতেছে। যদি কখন উন্নতি অবনতির নিয়ন্তা ইহাদের উদ্ধারসাধন করেন, তবেই রক্ষা, নতুবা এই পরিবর্ত্তনশীল বিশ্ব-প্রাঙ্গণ হইতে ইহারা কালক্রমে কোন্ অনন্তের এক কোণে বিলীন হইয়া যাইবে, তাহা কে বলিতে পারে!

শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

# সান্ধ্য-প্রদীপ

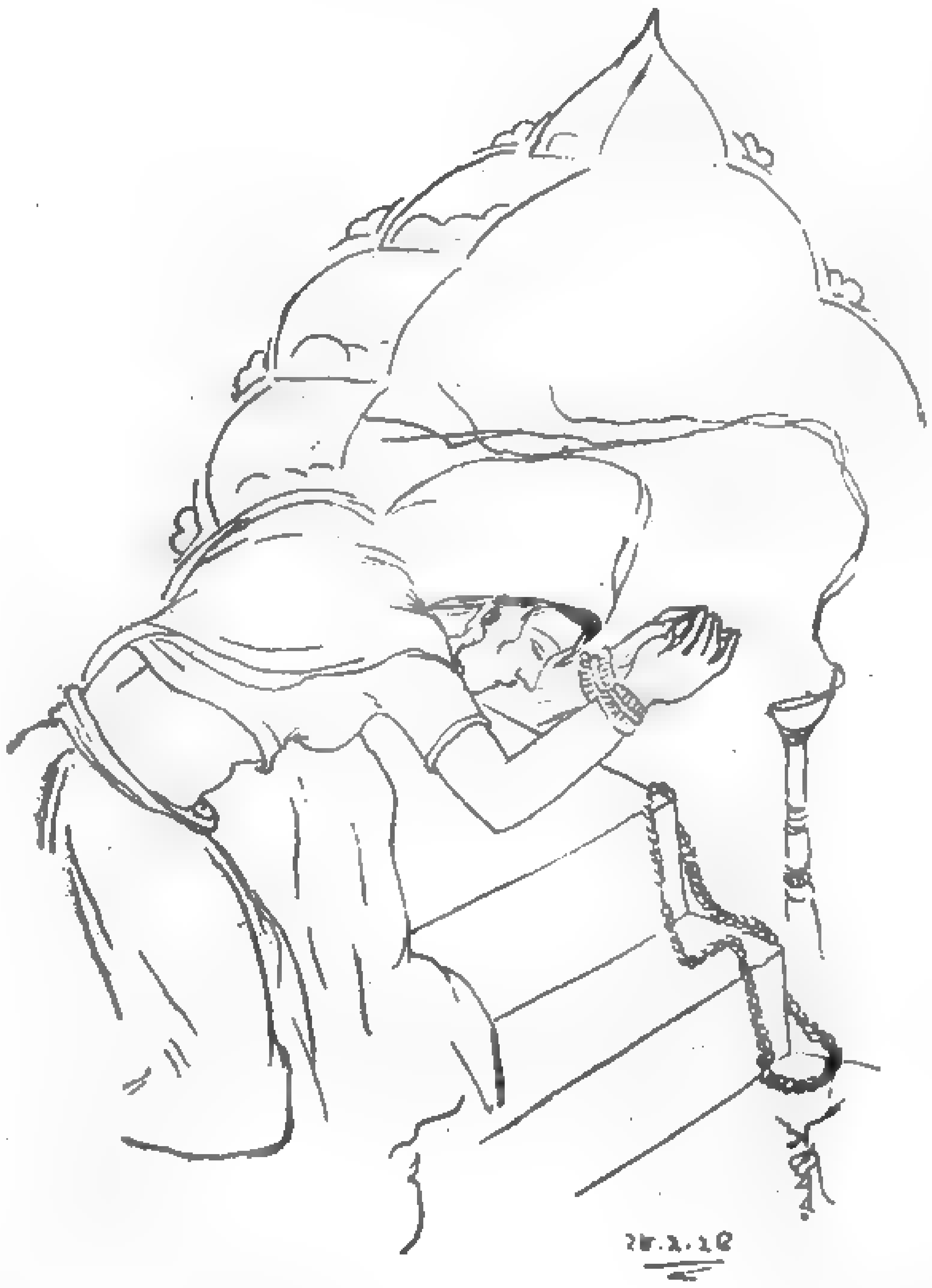

শিল্পী—শ্রীসুধীর খাস্তগীর।

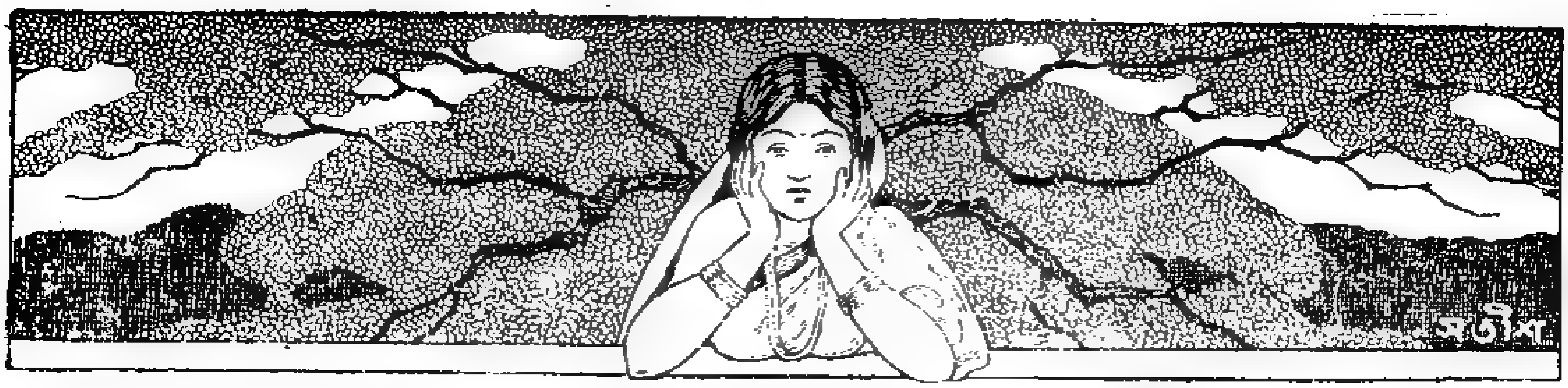

# প্রলয়ের আলো

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

### সুদৃঢ় শৃঙ্খল

কাউণ্ট ভন আরেনবার্গ সেই দিন সন্ধ্যার পর গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। বার্থার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি প্রফুল্লমনে তাহার সহিত গল্প আরম্ভ করিলেন; তাহাকে বলিলেন, সে তাঁহার সঙ্গে যাইলে দিনটি আরও অধিক আনন্দে কাটিত।

কিন্তু বার্থা তাঁহার কথায় বিন্দুমাত্র আনন্দ বা উৎসাহ প্রকাশ করিল না; তাহার মন তখন স্বামীর প্রতি অশ্রদ্ধায় পূর্ণ। যেন রঙ্গীন চশমার ভিতর দিয়া সে এত দিন তাহার স্বামীকে দেখিয়া আসিতেছিল, সেই চশমা তাহার চক্ষু হইতে হঠাৎ অপসারিত হওয়ায় কাউণ্টের প্রকৃত মূর্ত্তি তাহার দৃষ্টিগোচর হইল। কাউণ্ট কিরূপ ইতর, অব্যবস্থিতচিত্ত ও ব্যসনাসক্ত, তাহার প্রমাণ পাইয়া বার্থার হৃদয় বেদনায় টন্-টন্ করিয়া উঠিল। এরূপ স্বামীকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করা অসম্ভব বলিয়াই তাহার মনে হইল। স্বামীকে বিশ্বাস করিতেও আর তাহার প্রবৃত্তি হইল না।

কাউণ্ট বার্থার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইলেন; তাহার বিষাদের কারণ বুঝিতে না পারিয়া সাদরে বলিলেন, “বার্থা, তোমাকে ও রকম বিষণ্ণ দেখিতেছি কেন? কি হইয়াছে, বল।”

স্বামীর প্রশ্নে বার্থার চক্ষু ফাটিয়া অশ্রুর ধারা বহিল; সে অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, “সে সকল কথা কা’ল শুনিও; এখন তুমি পরিশ্রান্ত, বিশ্রাম করিতে যাও।”

বার্থার কথা শুনিয়া কাউণ্টের মুখ হঠাৎ বিবর্ণ হইল, তাঁহার স্ফূর্ত্তি ও উৎসাহ মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হইল। তিনি মুখভার করিয়া ভগ্নস্বরে বলিলেন, “কি হইয়াছে, বল। কোন দুঃসংবাদ আছে না কি?”

বার্থা অবনত মুখে বলিল, “এখন কোন কথা জানিতে চাহিও না। আমি এখন কিছুই বলিব না, বলিতেও পারিব না।”

বার্থার কথাগুলি রহস্যপূর্ণ; তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া কাউণ্ট আশঙ্কায় ও উৎকণ্ঠায় ঘামিয়া উঠিলেন। তিনি সকল কথা শুনিবার জন্য বার্থাকে পুনঃপুনঃ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন; কিন্তু পীড়াপীড়ি করিয়া কোন ফল হইল না। বার্থা সেই রাত্রিতে তাঁহাকে কোন কথা বলিতে সম্মত হইল না; অগত্যা কাউণ্ট ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইয়া তাঁহার শয়নকক্ষে শয়ন করিতে চলিলেন। বার্থা সে রাত্রিতে আর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিল না।

বার্থা সারারাত্রি শয্যায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিল; তাহার মনে হইল, ‘সুখ গেছে, আছে মিছে আদর।’ নানা কথা চিন্তা করিতে করিতে হতভাগ্য জোসেফ কুরেটের কথা তাহার স্মরণ হইল। অশ্রুপ্রবাহে তাহার উপাধান সিক্ত হইল। রাত্রিশেষে তাহার নিদ্রাকর্ষণ হইল। সে স্বপ্ন দেখিল, জোসেফ তাহার শয্যাপ্রান্তে দাঁড়াইয়া বিদ্রূপভরে বলিতেছে, “কেমন শাস্তি! তোমার আশা পূর্ণ হইয়াছে ত? দম্ভ ও অসার গর্ব্বের পাদমূলে তুমি তোমার সুখশান্তি উৎসর্গ করিয়াছ; এখন চিরজীবন অনুতাপানলে দগ্ধ হও।”

পরদিন প্রভাতে বার্থা স্থির করিল - তাহার স্বামীর নিকট সকল কথা প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে তাহার মাতার সহিত পরামর্শ করিবে।—সে সংবাদ লইয়া জানিতে পারিল—তখন পর্য্যন্ত কাউণ্টের নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। স্বামীর অজ্ঞাতসারে সে ‘বো-সিজোরে’ যাত্রা করাই সঙ্গত মনে করিল এবং তাড়াতাড়ি পোষাক পরিয়া, একখানি গাড়ী লইয়া মায়ের সঙ্গে দেখা করিতে চলিল।

তত সকালে বার্থাকে ম্লানমুখে সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া আনা স্মিট, সভয়ে বলিল, “ব্যাপার কি কাউণ্টেস্? রাত্রে কি তুমি শ্রীমান্ কাউণ্ট বাপাজীবনের সঙ্গে কলহ করিয়াছিলে?”

মায়ের প্রশ্নে বার্থার চক্ষু দুইটি অশ্রুপ্লাবিত হইল; কয়েক মিনিট সে কথা বলিতে পারিল না। অবশেষে মন স্থির করিয়া, চক্ষু মুছিয়া, পূর্ব্বদিন মোজে যে ভাবে তাহাকে অপমানিত করিয়াছিল, যে সকল কথা বলিয়াছিল, তাহা ধীরে ধীরে তাহার মাতার নিকট প্রকাশ করিল। তাহার সকল কথা শুনিয়া আনা স্মিট হাসিয়া বলিল, “কি জ্বালা! তোমার ভাবভঙ্গী দেখিয়া আমার মনে হইতেছিল—না জানি কি সর্ব্বনাশই হইয়াছে! এই তুচ্ছ কারণে তুমি মন খারাপ করিয়া অশ্রুপাত করিতেছ? আমি স্বীকার করি, কাউণ্টের এই বন্ধুটির রসিকতা একটু মোটা রকমের, তাহার কথা কহিবার ভঙ্গী তেমন সুরুচি-সঙ্গত নহে; কিন্তু সে জন্য এরূপ মর্ম্মাহত হওয়া নিতান্তই ছেলেমানুষী! সংসার-সম্বন্ধে তোমার অভিজ্ঞতা নিতান্ত অল্প বলিয়াই তুমি এই তুচ্ছ ব্যাপারকে এইরূপ সঙ্গীন করিয়া তুলিয়াছ! তোমার স্বামীর বয়স অল্প, তাহার উপর কাউণ্ট বড়লোকের ছেলে; তাঁহার মত লোকের বিবাহের পূর্ব্বে নানা রকম বদ্‌খেয়াল থাকে, তাঁহারও বোধ হয় এক-আধটু ছিল; সে কথা শুনিয়া তোমার মর্ম্মাহত হইবার কারণ কি, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। জুয়া খেলিতে গিয়া তাঁহার কিছু দেনা হইয়াছে, অর্থাভাবে তিনি সেই ঋণ পরিশোধ করিতে পারেন নাই; ইহা আদৌ গর্হিত কার্য্য নহে। কাউণ্ট জুয়ায় হারিয়া এই লোকটির নিকট ত্রিশ হাজার ফ্রাঙ্ক কর্জ্জ লইয়াছিলেন। আমি স্বীকার করি, টাকার পরিমাণ নিতান্ত অল্প নহে; কিন্তু কাউণ্টকে ত ঋণমুক্ত করিতে হইবে। মোজেকে টাকাগুলি দিয়া বিদায় করিলেই ফ্যাঁসাদ মিটিয়া যাইবে। তবে কাউণ্টের এই ঋণ পরিশোধের পূর্ব্বে আমি তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া কিঞ্চিৎ সদুপদেশ দিব; তাঁহাকে বুঝাইয়া দিব—টাকা গাছের ফল নয় যে, গাছ নাড়িলেই টাকা কুড়াইয়া বস্তা বোঝাই করিতে পারা যাইবে। অতঃপর তিনি যেন তাঁহার অপব্যয়ের বহর একটু খাটো করেন। চল, আমি তোমার সঙ্গেই যাইতেছি। এই অপ্রীতিকর ব্যাপারের শীঘ্রই মীমাংসা করা দরকার।”

বার্থা তাহার মাতার এই প্রস্তাবে আপত্তি করিল না বটে, কিন্তু তাহার মা তাহার অপমানে এই প্রকার উপেক্ষা প্রদর্শন করায় ক্ষোভে ও দুঃখে সে অধিকতর ম্রিয়মাণ হইল। সে মাতার সহানুভূতিলাভের আশায় আসিয়া উপহাসমাত্র লাভ করিল! সে মনে মনে বলিল, “পরমেশ্বর কি ইহাদের সকলেরই হৃদয় অভিন্ন উপাদানে নির্ম্মাণ করিয়াছেন? কি লজ্জা!”

আনা স্মিট বার্থার সহিত যখন ‘সাটু’তে উপস্থিত হইল, তখন কাউণ্ট রডলফ মোজের সহিত কফি-পান শেষ করিয়া বারান্দায় বসিয়া ধূমপান করিতেছিলেন।

কাউণ্ট প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিয়া, প্রত্যূষে কাউণ্টেসের গৃহত্যাগের সংবাদে বিস্মিত হইয়াছিলেন; কয়েক ঘণ্টার পর তাঁহার পত্নীকে তাহার মাতার সহিত গৃহে প্রত্যাগমন করিতে দেখিয়া তাঁহার মন দারুণ দুশ্চিন্তায় পূর্ণ হইল। মোজেও কাউণ্টেসের গৃহত্যাগের সংবাদ জানিত না। ব্যাপার কি, বুঝিতে না পারিয়া সে নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে কাউণ্টের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

আনা স্মিট বারান্দায় উঠিয়া, গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া কাউণ্টকে অভিবাদন করিল; তাহার পর নিম্ন স্বরে বলিল, “কাউণ্ট, যদি তোমার বন্ধুর তোমাকে কয়েক মিনিটের জন্য ছাড়িয়া দিতে আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে গোপনে তোমাকে দুই একটি কথা বলি।”

মোজে প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে কাউণ্টের মুখের দিকে চাহিল; সে বুঝিল, পূর্ব্বদিন কাউণ্টেসের সহিত সে যে অসদ্ব্যবহার করিয়াছিল, সেই ঘটনার সহিত কাউণ্টেস-জননীর আকস্মিক আবির্ভাবের সম্বন্ধ আছে; কিন্তু কাউণ্ট সে সকল কথা জানিতেন না, এ জন্য শাশুড়ীর কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন না। তিনি মুহূর্ত্তকাল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে বসিয়া থাকিয়া ম্লান মুখে বলিলেন, “নিশ্চয়ই মা, আপনার আদেশ পালন করিতে আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছি।”

কাউণ্ট শাশুড়ীকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার খাস-কামরার অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। বার্থা তাঁহাদের অনুসরণ করিতেছিল; মোজে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বার্থার পশ্চাতে উপস্থিত হইল এবং তাহার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল, “কা’ল আমি তোমার ঘরে ঢুকিয়াছিলাম, এ কথা

তুমি কাউণ্টের নিকট প্রকাশ করিও না। এ কথা প্রকাশ হইলে তোমারই ক্ষতি। আমি কাহারও নিন্দা গ্রাহ্য করি না।"

বার্থা কোন কথা না বলিয়া তাহার মুখের উপর অবজ্ঞাপূর্ণ তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল; তাহার পর সে তাহার স্বামীর ও মাতার অনুসরণ করিল।

কাউণ্টের খাস-কামরায় প্রবেশ করিয়া আনা স্মিট কোন প্রকার ভূমিকা না করিয়া অত্যন্ত গম্ভীর স্বরে বলিল, "কাউণ্ট, আমি জানিতে পারিলাম, তোমার ঐ ভদ্রবেশী বন্ধুটি, যে হার রডল্ফ মোজে নামে নিজের পরিচয় দিয়া তোমার অতিথি হইয়াছে, জুয়াখেলার ঋণ বলিয়া তোমার নিকট ত্রিশ হাজার ফ্রাঙ্কের দাবী করিতেছে, এ কথা কি সত্য?"

শাশুড়ীর এই প্রশ্নে কাউণ্টের মুখ হঠাৎ সাদা হইয়া গেল; কিন্তু তিনি মুহূর্ত্তমধ্যে আত্মসংবরণ করিয়া গভীর বিস্ময়ে মুখব্যাদান করিলেন, তাহার পর উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "জুয়াখেলার জন্য দেনা! ত্রিশ হাজার ফ্রাঙ্ক মোজের কাছে আমি ধার লইয়াছি? এ অতি অসম্ভব, অবিশ্বাস্য মিথ্যা কথা।"

আনা স্মিট কাউণ্টের উত্তর শুনিয়া মুহূর্ত্তকাল স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল; তাহার পর কাউণ্টের মুখের উপর তীব্র দৃষ্টি স্থাপন করিয়া ঘৃণাভরে বলিল, "কি? তুমি বলিতে চাও, এই মোজে যে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু পরিচয়ে তোমার আশ্রয়ে বাস করিতেছে, যাহাকে তোমার স্ত্রীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতে দিতে, এমন কি, অভদ্র রসিকতা করিতে দিতেও তোমার আপত্তি নাই—সে মিথ্যাবাদী?"

কাউণ্ট শাশুড়ীর এই তীব্র শ্লেষে আহত হইয়া, অপরাধীর মত মাথা গুঁজিয়া ভগ্ন স্বরে বলিলেন, "হাঁ, ইয়ে, তা কি বলে, তাহাকে ঠিক মিথ্যাবাদী বলা যায় না।" তাহার পর ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বার্থার মুখের দিকে চাহিয়া সক্রোধে বলিলেন, "এ কথা তুমি কিরূপে জানিলে? মোজে কি কা'ল তোমাকে বলিয়াছিল, সে আমার কাছে ত্রিশ হাজার ফ্রাঙ্ক পাইবে? জুয়ায় হারিয়া তাহার কাছে ধার লইয়াছিলাম?"

বার্থা বলিল, "হাঁ; সে কা'ল চোরের মত হঠাৎ আমার খাস-কামরায় প্রবেশ করিয়া এই সুসংবাদটি আমাকে জানাইয়াছিল।"

কাউণ্ট অতঃপর কি বলিবেন, স্থির করিতে না পারিয়া পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া মুখ মুছিলেন; তাহার পর অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "মোজে একটা 'রাস্কেল'।"

বার্থা বলিল, "রাস্কেল কি, পশু বলিলেও তাহার সম্মান করা হয়; সে পশুরও অধম এবং সয়তান তাহার অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ জীব।"

আনা স্মিট বলিল, "সে পশুই হউক আর সয়তানই হউক, যাহাকে বন্ধুভাবে গৃহে আশ্রয় দিয়াছ, তাহার অসাক্ষাতে এ ভাবে নিন্দা করিয়া লাভ কি? কাউণ্ট, তুমি আমার প্রশ্নের ঠিক উত্তর দাও, এই লোকটা তোমার নিকট সত্যই ত্রিশ হাজার ফ্রাঙ্ক পাইবে? না, তাহার দাবী মিথ্যা?"

কাউণ্ট এই প্রশ্নে একবারে কোণ-ঠেসা হইলেন; 'হাঁ' বলাও শক্ত, 'না' বলিলেও বিপদ। এই জন্য তিনি মাথা চুলকাইয়া ম্লানমুখে বলিলেন, "হাঁ, সে কিছু টাকা পাইবে বটে; কিন্তু কত টাকা, আমার ঠিক স্মরণ নাই। মোজেকে জিজ্ঞাসা না করিয়া আমি আপনাকে ঠিক উত্তর দিতে পারিতেছি না।"

আনা স্মিট বলিল, "তোমার ভাব ভঙ্গি দেখিয়া আমার মনে হইতেছে, তোমার ঋণ সত্য। আমার অনুমান সত্য হইলে, ঋণ পরিশোধ করিতে বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই; টাকাগুলি দিয়া আজই তাহাকে বিদায় করিয়া দাও। যে বন্ধু তোমার স্ত্রীর—কাউণ্টেসের সম্মান রক্ষা করিতে জানে না, যাহার ব্যবহারে কাউণ্টেসের সুনামে ও সম্মানে কলঙ্ক আরোপিত হইবার আশঙ্কা অমূলক নহে, তাহাকে আর এক দিনও তোমার গৃহে আশ্রয় দান করা অকর্ত্তব্য; তাহার সহিত বন্ধুবৎ ব্যবহার করাও তোমার পক্ষে অমার্জ্জনীয় দুর্ব্বলতার চিহ্ন। আমি আজই টাকাগুলি তোমাকে পাঠাইয়া দিব; তাহার পরও সে এখানে আছে—এ কথা যেন আমাকে শুনিতে না হয়। কাউণ্টেসের অসম্মান! সে কি মানুষ?"

শাশুড়ীর স্পষ্ট কথা শুনিয়া কাউণ্ট ক্ষোভে ও লজ্জায় মাথা তুলিতে পারিলেন না। কাউণ্টকে নীরব দেখিয়া আনা স্মিট বলিল, "এই দেনা-পাওনার কথা লইয়া সেই

লোকটির সহিত কোন প্রকার আলোচনা বা তর্ক বিতর্কের প্রয়োজন নাই। যে দোষ করিয়া ফেলিয়াছ, এখন তাহার অন্য কোন প্রতীকারও নাই। তোমার এ দোষ আমি মার্জ্জনা করিলাম; আশা করি, কাউণ্টেসও তোমার গত অপরাধ মার্জ্জনা করিবে। কিন্তু কাউণ্ট, এই অপ্রীতিকর ঘটনায় তোমার চৈতন্যোদয় হইলেই আমি সুখী হইব। তোমার স্মরণ রাখা উচিত, জুরিচে আমাদের পরিবারের সম্মান ও সম্ভ্রম সর্ব্বজন-বিদিত; তোমার কোন কার্য্যে বা ব্যবহারে আমাদের পারিবারিক সম্ভ্রম ক্ষুণ্ণ হইলে কেবল আমাদের নহে, তোমারও লজ্জা রাখিবার স্থান থাকিবে না। আর এ কথাও স্মরণ রাখিও যে, আমাদের ধনভাণ্ডারের অর্থ অফুরন্ত নহে; অপব্যয়েরও একটা সীমা নির্দ্দিষ্ট থাকা প্রয়োজন।”

কাউণ্ট অনুতপ্ত স্বরে বলিলেন, “আপনার এই উপদেশ চিরদিন আমার স্মরণ থাকিবে। আজ আপনি দয়া করিয়া আমাকে যে দায় হইতে—”

আনা স্মিট বাধা দিয়া বলিল, “না, না, তোমার ধন্যবাদ প্রকাশের প্রয়োজন নাই। আমার উপদেশ স্মরণ রাখিয়া ভবিষ্যতে যদি তদনুসারে কায কর, তাহা হইলেই আমি সুখী হইব। আমার আর কিছুই বলিবার নাই।”

আনা স্মিট কন্যা-জামাতার মুখচুম্বন করিয়া তাহাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল।

কাউণ্ট বার্থাকে ক্ষুব্ধ স্বরে বলিলেন, “বড়ই লজ্জার বিষয়। এই অপ্রীতিকর ঘটনার জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত হইয়াছি।”

বার্থা বলিল, “দুঃখিত হইবারই ত কথা। আরও ক্ষোভের বিষয় এই যে. আমাকে প্রতারিত করিতেও তুমি কুণ্ঠিত হও নাই। আমাদের বিবাহের পূর্ব্বে যদি এই ঋণের কথাটা আমার বা আমার মায়ের নিকট প্রকাশ করিতে, তাহা হইলে সেই সময় তোমার এই জুয়ার ঋণ পরিশোধেরও ব্যবস্থা হইত; মা তোমার সকল ঋণ পরিশোধ করিয়াছিলেন, এই সামান্য টাকাও ফেলিয়া দিতেন। কিন্তু তুমি যে একটা পাকা জুয়াড়ী, এ কথা আমাদের নিকট প্রকাশ করিতে তখন তোমার লজ্জা হইয়াছিল; তাহার ফলে তুমি ত অপদস্থ হইলেই, কা’ল আমাকে যেরূপ অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছে, তাহা জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত আমার স্মরণ থাকিবে। তোমার কপটাচরণের জন্য আমাকে কঠিন শাস্তি পাইতে হইয়াছে।”

কাউণ্ট লগুড়াহত কুকুরের মত দাঁত বাহির করিয়া বিকট মুখভঙ্গী করিলেন, তাহার পর মিহি আওয়াজে বলিলেন, “তুমি কি আমার উপর রাগ করিয়াছ?”

বার্থা ঈষৎ উত্তেজিত স্বরে বলিল, “তা একটু করিয়াছি বৈ কি। ও ভাবে অপমানিত হইলে রাগ না হয় কার? এই ইতর লোকটাকে আজই তুমি বিদায় করিয়া দাও; নতুবা তোমার সহিত আলাপ করিতে বা তোমাকে ক্ষমা করিতে আমার প্রবৃত্তি হইবে না। যে কাপুরুষ তাহার স্ত্রীর অপমান নীরবে সহ্য করে, তাহার কাপুরুষতা ক্ষমার অযোগ্য।”

কাউণ্ট আর কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই বার্থা সেই কক্ষ ত্যাগ করিল। বার্থার সুতীব্র তিরস্কার চাবুকের ন্যায় কাউণ্টকে আঘাত করিল। তিনি সেই কক্ষে একাকী দাঁড়াইয়া ক্রোধে অধর দংশন করিতে লাগিলেন; তাঁহার চোখ-মুখ লাল হইয়া উঠিল। কয়েক মিনিট চিন্তা করিয়া তিনি অস্ফুট স্বরে বলিলেন, “বড়ই বিশ্রী ব্যাপার! আমার শাশুড়ী বিরক্ত হইয়াছেন, আমার স্ত্রী অপমান বোধ করিয়া রাগে ফুলিতেছে; অথচ আমি নিরুপায়! এখন আমি করি কি? যেরূপেই হউক, এই অশান্তি দূর করিতে হইবে।”

কাউণ্ট বারান্দায় আসিলেন। মোজে তখনও গদীআঁটা সুবৃহৎ ‘সোফা-চেয়ারে’ বসিয়া পরম নিশ্চিন্ত মনে সিগারেট-ধূম পান করিতেছিল। সে কাউণ্টের মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, “তোমার স্ত্রী ও শাশুড়ী এক দিকে, তুমি আর এক দিকে! খুব মজা উপভোগ করিয়া আসিলে, কি বল?”

মোজের রসিকতায় কাউণ্ট দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন; তিনি তাহার মুখের কাছে ঘুসি তুলিয়া সক্রোধে বলিলেন, “তুমি সয়তানই এই সকল উপদ্রবের মূল! ইচ্ছা হইতেছে এক ঘুসিতে তোমার মুখ ভাঙ্গিয়া দিই। তোমার মতলব কি? তুমি কি আমার সর্ব্বনাশ না করিয়া আমার কাঁধ হইতে নামিবে না?”

মোজে নিশ্চিন্ত ভাবে কাউণ্টের মুখের উপর একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া, অচঞ্চল স্বরে বলিল, “মুখসামাল করিয়া

কথা বল বন্ধু! আমাকে চটাইয়া লাভ নাই। তোমার সর্ব্বনাশ হউক, এরূপ আমার ইচ্ছা নহে; কিন্তু তুমি যে সুমিষ্ট ফলের শাঁসটুকু নিজেই ভোগ করিবে, আর আমি ছোব্‌ড়া চুষিয়াই তৃপ্তিলাভ করিব, আমাকে তত দূর নির্ব্বোধ মনে করিও না। আমি যে সয়তান, ইহা সত্য হইতেও পারে, কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে, তুমি আমার অপেক্ষা অনেক উঁচু দরের সয়তান।"

কাউণ্ট মোজেকে আর অধিক ঘাঁটাইতে সাহস করিলেন না; তিনি উত্তেজিত ভাবে বারান্দায় পদচারণ করিতে লাগিলেন, তাহার পর মোজের সম্মুখে হঠাৎ থামিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "শোন মোজে! তুমি যে ত্রিশ হাজার ফ্রাঙ্কের দাবী করিয়াছ, তাহা আমার শাশুড়ী তোমাকে দিবেন বলিয়াছেন; ইহাই তোমার শেষ দাবী ত?"

মোজে অবজ্ঞাভরে হাসিয়া বলিল, "তুমি কি মনে করিয়াছ আমি এতই নির্ব্বোধ যে, এই সামান্য অর্থ লইয়াই তোমাকে নিষ্কৃতি দান করিব? না বন্ধু, আমি তত নির্ব্বোধ নহি। তুমি নিরাপদে যে বিপুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছ, আমি আজীবনকাল তাহার বখরা আদায় করিব; তোমার বা আমার মৃত্যুর পূর্ব্বে তোমার নিষ্কৃতি নাই।"

কাউণ্ট ব্যাকুলস্বরে বলিলেন, "রক্তলুক মোজে! তোমার অত্যাচারে যদি আমাকে জীবিত অবস্থায় নরকযন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়, তাহা হইলে সেই যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণলাভের জন্য হয় ত এক দিন আমাকে আত্মহত্যা করিতে হইবে; কিন্তু স্থির জানিও, তাহার পূর্ব্বে তোমাকেও খুন করিব। যদি মরিবার ইচ্ছা না থাকে, তাহা হইলে আমাকে আর অধিক শোষণের চেষ্টা করিও না। সময় থাকিতে আমি তোমাকে সতর্ক করিলাম।"

মোজে যে ভাবে সোফায় বসিয়াছিল, ঠিক সেই ভাবেই বসিয়া থাকিয়া বিদ্রূপভরে বলিল, "বেশ বন্ধু, বেশ! দেখিতেছি জুরিচে আসিয়া তুমি হঠাৎ নবাব হইয়াছ; তোমার কথায় ও ব্যবহারেও সেই রকম নবাবীর ঝাঁঝ বাহির হইতেছে! খুব লম্বা লম্বা বুলি ছাড়িতেছ! কিন্তু তোমার ঐ ফাঁকা আওয়াজে আমি ভয় পাইবার পাত্র নহি। তোমার প্রলাপ আমার অগ্রাহ্য। তোমার মত কাপুরুষ আত্মহত্যা করিবে? অসম্ভব! কিন্তু পুনর্ব্বার যদি আমাকে হত্যা করিবার কথা মুখে আন, তাহা হইলে আমি তোমাকে জেলে না পুরিয়া ছাড়িব না। আমি সোজা কথার মানুষ।"

কাউণ্ট ক্রোধে অপমানে ক্ষিপ্তবৎ হইয়া নিজের মাথার চুল দুই হাতে ধরিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিলেন, যেন কেশগুলির মূলোৎপাটন করিতে পারিলেই তাঁহার অন্তর্যাতনার অবসান হইবে! কিন্তু তিনি সেই চেষ্টায় বিরত হইয়া অপেক্ষাকৃত সংযতস্বরে বলিলেন, "শোন মোজে! আমি তোমার সহিত বিবাদ করিতে অনিচ্ছুক; কিন্তু আমার সঙ্কট বুঝিয়া দয়া করা উচিত। তুমি আজই আমার নিকট তোমার দাবীর ত্রিশ হাজার ফ্রাঙ্ক পাইবে; তাহা হস্তগত হইলে তোমাকে অবিলম্বে এই বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে।"

মোজে সবিস্ময়ে বলিল, "চলিয়া যাইব? বাঃ! এত সুখ, এই ঐশ্বর্য্য ছাড়িয়া আমাকে চলিয়া যাইতে বলিতেছ? না বন্ধু, ও কথা মুখে আনিও না। আমি এখানে বড়ই সুখে আছি। আমাকে তুমি তাড়াইতে পারিবে না। আমি এখান হইতে নড়িতেছি না।"

কাউণ্ট কাতরভাবে বলিলেন, "না, আমি তোমাকে তাড়াইতেছি না; আমি তোমাকে বিনীতভাবে অনুরোধ করিতেছি, নিরুপায় হইয়া প্রার্থনা করিতেছি, তুমি আমার স্কন্ধ পরিত্যাগ কর। যত দিন আমার কিঞ্চিৎ সম্বল থাকিবে, তুমি তাহার অংশে বঞ্চিত হইবে না, আমি সাধ্যানুসারে তোমাকে সাহায্য করিব, যখন যাহা পারি তোমাকে পাঠাইয়া দিব, কেবল দয়া করিয়া এই গৃহ হইতে বিদায় গ্রহণ কর। আমাকে একটু শান্তিতে থাকিতে দাও। মনে করিও আমি তোমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। কিন্তু তোমাকে যথাসাধ্য সাহায্যদানে কখন বিমুখ হইব না।"

মোজে সোফার উপর সোজা হইয়া বসিয়া বলিল, "তুমি এই অঙ্গীকার পালন করিবে তাহার প্রমাণ কি?"

কাউণ্ট বলিলেন, "অঙ্গীকার পালন না করিলে তুমি আবার আসিয়া, আমার কান মলিয়া টাকা আদায় করিও।"

মোজে বলিল, “তা বটে ; কিন্তু আমি তোমার কানও মলিতে চাহি না, এখান হইতে যাইতেও চাহি না। এখানে বেশ সুখে আছি, এ সুখ ত্যাগ করিয়া যাইবার ইচ্ছা নাই।”

কাউণ্ট অধীর স্বরে বলিলেন, “তোমাকে যাইতেই হইবে। তুমি না যাইলে আমাদের উভয়েরই ক্ষতি। এখানে আসিয়া তুমি আমার যে ক্ষতি করিয়াছ, তাহা সহজে পূরণ হইবে না। আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া তুমি লাভবান্ হইবে, এ আশা ত্যাগ কর।”

মোজে বলিল, “তোমার কথা অসঙ্গত না হইলেও আমাকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিবে, ইহাও আমি সঙ্গত মনে করি না। অন্ততঃ, আরও দুই এক দিন আমাকে থাকিতেই হইবে। আমি যে দিন এখানে আসিয়াছিলাম, সেই দিনই যদি আমার প্রাপ্য টাকাগুলি মিটাইয়া দিতে, তাহা হইলে আমি তোমার আতিথ্য গ্রহণের জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতাম না ; কিন্তু তখন বলিয়াছিলে, তোমার হাতে টাকা নাই, কিছু দিন অপেক্ষা না করিলে ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে না। অগত্যা আমি এখানে অপেক্ষা করিতে সম্মত হইলাম। এখানে বেশ সুখেই আছি ; তাহার উপর তোমার মেয়েমানুষটিকে দেখিয়া আর আমার এখান হইতে যাইতে ইচ্ছা নাই। সত্য কথা বলিতে কি, তাহাকে পাইলে টাকার দাবী ছাড়িয়া দিতেও আমার আপত্তি নাই। তাহার রূপ-রজ্জুতে আমি—”

মোজের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই কাউণ্ট তাহার উপর লাফাইয়া পড়িলেন এবং টুঁটি চাপিয়া ধরিয়া তাহার গালে এক প্রচণ্ড চড় মারিলেন; তাহার পর তাহার ভুঁড়ির উপর পা চাপাইয়া দিয়া তাহাকে চিৎ করিয়া ফেলিলেন। বোধ হয়, সেই স্থানেই কীচকবধ হইত।

কিন্তু শ্রাদ্ধটা আর অধিক দূর গড়াইল না। বার্থা কাউণ্টের অনুসরণ করিয়া, বারান্দার পর্দ্দার আড়ালে দাঁড়াইয়া ছিল ; মোজের সহিত কাউণ্টের তর্ক-বিতর্ক শুনিয়া তাহার মন ঘৃণায় ও বিরক্তিতে পূর্ণ হইয়াছিল। অবশেষে কাউণ্ট মোজেকে আক্রমণ করিয়া ভূতলশায়ী করিলে সে আর স্থির থাকিতে পারিল না ; সে দ্রুতবেগে বারান্দায় প্রবেশ করিয়া কম্পিত স্বরে বলিল, “কাউণ্ট, স্বামী, আমার অনুরোধে এই হতভাগাকে ছাড়িয়া দাও।”

কাউণ্ট তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিবর্ণ মুখে হতাশভাবে বার্থার মুখের দিকে চাহিলেন ; তাঁহার আশঙ্কা হইল, বার্থা হয় ত তাঁহাদের সকল কথাই শুনিয়াছে। ঘৃণায় ও লজ্জায় তাঁহার মস্তক অবনত হইল।

মুক্তিলাভ করিয়া মোজে অতি কষ্টে সোফায় উঠিয়া বসিল। সে আরক্ত নেত্রে কাউণ্টের মুখের দিকে চাহিয়া কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই বার্থা তাহাকে লক্ষ্য করিয়া তীব্রস্বরে বলিল, “মহাশয়, জানি না, আপনি কে ? আপনি কোথা হইতে আসিয়া আমার স্বামীর স্কন্ধে চাপিয়া বসিয়াছেন, তাহাও আমার অজ্ঞাত ; তবে আপনার ব্যবহার দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছি, আপনি পশুরও অধম। আমি আপনাকে স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছি, আপনি যে গৃহে বাস করিয়া আতিথ্যের মর্য্যাদা নষ্ট করিয়াছেন, সে গৃহ আমার ; আমিই এই বাড়ীর একমাত্র অধিকারিণী। আমি আপনাকে আদেশ করিতেছি, আপনি অবিলম্বে আমার বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যাউন। এখানে আর আপনার স্থান নাই।”

এই অপমানে মোজে ক্ষিপ্তের ন্যায় লাফাইয়া উঠিল, এবং চোখ-মুখ 'লাল করিয়া ক্রোধকম্পিত স্বরে বার্থাকে বলিল, “তুমি ? তুমি আমাকে তাড়াইয়া দিতেছ ? উত্তম, আমার কায শেষ হইলে চলিয়া যাইব ; কিন্তু মাদাম, স্মরণ রাখিও, আমার যে ত্রিশ হাজার ফ্রাঙ্ক প্রাপ্য আছে, আর তাহা লইব না ; এই অপমানের মূল্য এক লক্ষ ফ্রাঙ্ক আদায় না করিয়া আমি এখান হইতে নড়িব না। দেখি, কে আমাকে তাড়ায়।”

মোজের কথায় বার্থার মুখ হইতে অস্ফুট আর্ত্তনাদ নিঃসারিত হইল ; হঠাৎ তাহার মূর্চ্ছার উপক্রম হইল। সে পড়িয়া যায় দেখিয়া কাউণ্ট তাড়াতাড়ি তাহাকে ধরিয়া লইয়া উপবেশনকক্ষে প্রবেশ করিলেন ; কিন্তু বার্থা আত্মসংবরণ করিয়া স্বামীর বাহুপাশ হইতে আপনাকে মুক্ত করিল এবং কঠোর দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, “এই সয়তানটা তোমাকে মুঠায় পুরিয়াছে, তুমি তাহার গোলাম হইয়া পড়িয়াছ ! ইহার কোন গুপ্ত কারণ আছে, ইহা নিশ্চয়ই কোন পৈশাচিক

ষড়যন্ত্রের ফল; যে পর্য্যন্ত এই গুপ্তরহস্য তুমি আমার নিকট প্রকাশ না করিবে, সে পর্য্যন্ত তোমার সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই, সে পর্য্যন্ত আমি তোমার স্ত্রী নহি।"

বার্থা ঝড়ের মত বেগে সেই কক্ষ ত্যাগ করিল। কাউণ্ট প্রস্তর-মূর্ত্তির ন্যায় নিস্পন্দভাবে সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

### চাবুক

কাউণ্ট দুই এক মিনিট সেই স্থানে পাষাণ-মূর্ত্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন; তাহার পর হঠাৎ স্কন্ধে কাহার করস্পর্শ হওয়ায় তিনি চম্‌কাইয়া উঠিলেন, পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিয়া মোজেকে দেখিতে পাইলেন। মোজের মুখও মলিন; দারুণ উত্তেজনায় সে তখন কাঁপিতেছিল।

মোজে বলিল, "শোন কাউণ্ট, তুমি আমার যে অপমান করিয়াছ, তাহার উপযুক্ত প্রতিফল পাইবে।"

কাউণ্ট ভগ্ন স্বরে বলিলেন, "তুমি কি ক্ষেপিয়াছ?"

মোজে বলিল, "না, ক্ষেপি নাই, আমি সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ আছি।"

কাউণ্ট বলিলেন, "তবে পাগলের মত কথা বলিতেছ কেন? আমাকে নষ্ট করাই কি তোমার ইচ্ছা?"

মোজে সরোষে বলিল, "নষ্ট কি? তোমাকে কীটের মত পদদলিত করিয়া চূর্ণ করাই আমার ইচ্ছা; আমি তাহা করিবই।—তবে যদি আমার দাবী পূর্ণ কর, তাহা হইলে তোমাকে দয়া করিয়া ছাড়িয়া দিতেও পারি।"

কাউণ্ট হতাশভাবে বলিলেন, "তোমার দাবী এক লক্ষ ফ্রাঙ্ক; এই বিপুল অর্থ দিয়া তোমার সহিত সন্ধি করিব—সে সামর্থ্য আমার নাই।"

মোজে বলিল, "তাহা হইলে আমার নিকট দয়ার প্রত্যাশা করিও না, আমি নিশ্চয়ই তোমাকে চূর্ণ করিব।"

কাউণ্ট বলিলেন, "আমি তোমার এমন কি অনিষ্ট করিয়াছি যে, তুমি আমার সর্ব্বনাশে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছ?"

মোজে সরোষে বলিল, "অনিষ্ট? তুমি আমার টুঁটি চাপিয়া ধরিয়া, আমার শ্বাস রুদ্ধ করিয়াছিলে; আমাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিলে! এই অপমানের—এই অত্যাচারের প্রতিফল না দিয়া আমি তোমাকে ক্ষমা করিব, ততখানি ক্ষমা আমার হৃদয়-ভাণ্ডারে সঞ্চিত নাই; আমি সেরূপ অপদার্থও নহি। এই ভাবে উৎপীড়িত হইয়া যাহারা শত্রুকে ক্ষমা করে—তাহারা কি মানুষ?"

কাউণ্ট বলিলেন, "তুমি কাউণ্টেসকে লক্ষ্য করিয়া যে অপমানসূচক কথা বলিয়াছিলে, তাহা শুনিয়া আমি ক্রোধ দমন করিতে পারি নাই; আমার দিক্‌বিদিক্‌জ্ঞান ছিল না। সুতরাং আমি আত্মবিস্মৃত হইয়া যে অন্যায় কায করিয়াছি, সে জন্য আমাকে দায়ী করিতে পার না। তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা কর; জীবনে অন্ততঃ একটিবার উদারতা প্রকাশ কর। আমি তোমাকে যে ত্রিশ হাজার ফ্রাঙ্ক দিতে চাহিয়াছি—তাহাই লইয়া চলিয়া যাও; আমাকে একটু শান্তিতে থাকিতে দাও। আমি অঙ্গীকার করিতেছি, ভবিষ্যতে সুযোগ পাইলেই তোমাকে সাধ্যানুযায়ী অর্থ-সাহায্য করিব।"

গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ মেঘে বিদ্যুদ্বিকাশের মত মোজের ভ্রূকুটি-কুটিল মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু সে মুহূর্ত্তমধ্যে অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বুকের পকেট হইতে সিগারেটের বাক্সটি বাহির করিল এবং একটি সিগারেট মুখে গুঁজিয়া আর একটি কাউণ্টের হাতে দিতে উদ্যত হইল। কাউণ্ট তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন; তখন সে মিনিট দুই নাক-মুখ দিয়া ধূম উদ্গিরণ করিল, তাহার পর ধীরভাবে বলিল, "তোমার প্রস্তাব সম্বন্ধে আমার কি কর্ত্তব্য, তাহা ভাবিয়া দেখিব; তাহা সময়-সাপেক্ষ। ঐ ত্রিশ হাজার ফ্রাঙ্ক আজই আমাকে দেওয়া হইবে—এইরূপই কথা আছে না?"

কাউণ্ট বলিলেন, "হাঁ, আজই তাহা পাইবে।"

মোজে বলিল, "কিন্তু আমি তোমার লাভের বখরাদার, সৌভাগ্যের দিনে এ কথা ত তোমার ভুলিলে চলিবে না। যদি তুমি আজ সোনার খনি আবিষ্কার করিতে, তাহা হইলে পূর্ব্বের সর্ত্ত অনুসারে আমাকে তোমার লাভের বখরা দিতে হইত। তুমি সোনার খনি আবিষ্কার করিতে না পারিলেও যে ধন-দৌলত তোমার ভাগ্যে জুটিয়াছে, তাহার পরিমাণ অল্প নহে; আমি তাহার বখরা চাই। কিন্তু যদি তুমি আমাকে আমার ন্যায্য অধিকারে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা কর, তাহা হইলে আমি ঈশ্বরের নামে

শপথ করিয়া বলিতেছি, তোমার এই লাভের কারবারটি আমি বিধ্বস্ত করিব।"

কাউণ্ট একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া হতাশভাবে রোদন করিতে লাগিলেন।

মোজে তাঁহার মুখের উপর কটাক্ষপাত করিয়া অবজ্ঞাভরে বলিল, "আমি তোমাকে যত দূর নির্ব্বোধ মনে করিতাম, তুমি তাহা অপেক্ষা অধিকতর নির্ব্বোধ; কেবল নির্ব্বোধ নহ, তুমি একটি গণ্ডমূর্খ! তুমি সৌভাগ্যক্রমে হঠাৎ বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছ, এই সংবাদ শুনিয়া যখন এখানে আসিলাম—তখন তুমি কি করিয়া বিশ্বাস করিলে যে, আমি তোমার সুখ-সম্পদের বখরা না লইয়াই অক্ষম ভিক্ষুকের মত শূন্য হস্তে ফিরিয়া যাইব?"

কাউণ্ট মুখ তুলিয়া বলিলেন, "না, সে ধারণা মুহূর্ত্তের জন্যও আমার মনে স্থান পায় নাই। আমার বিশ্বাস ছিল—এত দিন তোমার মৃত্যু হইয়াছে, না হয় আমি কোথায় আছি, তাহা তুমি জানিতে পার নাই।"

মোজে বিদ্রূপভরে বলিল, "উঃ, কি হিতৈষী বন্ধু তুমি আমার! তুমি আশা করিতেছিলে—আমি মরিয়া গিয়াছি! আমি মরিলে তুমি নিশ্চিন্ত হইতে, ইহা আমি বিশ্বাস করি; কিন্তু পরমেশ্বর তোমার মত পাপিষ্ঠকে নিশ্চিন্ত হইবার সুযোগ দিবেন, তোমার মত নির্ব্বোধ ভিন্ন অন্য কেহ ইহা প্রত্যাশা করিতে পারে না। তুমি জীবনে অনেক ভ্রম করিয়াছ; ইহাও তোমার সেই সকল ভ্রমের অন্যতম! যে শয়তানীর সাহায্যে তুমি ধনবান্ হইয়াছ, আমি তোমার সেই শয়তানীর সুযোগ ত্যাগ করিয়া চিরজীবন অভাবের কষ্ট সহ্য করিব, ইহা তুমি প্রত্যাশা করিতে পার না।"

কাউণ্ট বিকৃত স্বরে বলিলেন, "শয়তানী?"

মোজে বলিল, "হাঁ, একশ বার শয়তানী।—কিন্তু মানুষের স্বভাব এমনই বিচিত্র যে, শয়তানকে শয়তান বলিলে তাহার রাগ হয়। তুমি কি আশা কর—তোমার শয়তানীর পরিচয় পাইয়াও তোমাকে দেবতা বলিয়া সম্বোধন করিব? স্বার্থসিদ্ধির জন্য তোমার তোষামোদ করা আবশ্যক হইলে, আমি তোমাকে দেবতা বলিতাম; মহাপুরুষ বলিয়া তোমার স্তুতিবাদ করিতাম; মিথ্যা কথা বলিতে কুণ্ঠিত হইতাম না; কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন; শয়তানের গালে চড় মারিয়া কার্য্যোদ্ধার করাই আমার অভ্যাস।"

মোজের বিদ্রূপে আহত হইয়া কাউণ্ট সরোষে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "আর তুমি আমার কাটা ঘায়ে নুণের ছিটে দিও না, মোজে!—বখরা আদায়ের জন্য তুমি আমার সঙ্গে যদি নরকে যাইতে চাও, তাহাতে আমার আপত্তি নাই; কিন্তু তুমি অসঙ্গত দাবী করিলে তোমার সে দাবী কিরূপে পূর্ণ করিব? তাহাতে তোমার কোন লাভ নাই, অথচ আমার সর্ব্বনাশ হইবে। এই সহজ কথা কি বুঝিতে পারিতেছ না?"

মোজে বলিল, "সহজ কথা কি শক্ত কথা, তাহা পরে ভাবিয়া দেখিব।"

কাউণ্ট বলিলেন, "ত্রিশ হাজার ফ্রাঙ্ক লইয়া আজই তুমি এখান হইতে চলিয়া যাইবে কি না, জানিতে চাই।"

মোজে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, "ভবিষ্যতের আশা ত্যাগ করা বোধ হয় সঙ্গত হইবে না; এই জন্য আমি তোমার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। টাকাগুলা লইয়া আজই চলিয়া যাইব।"

মোজের কথা শুনিয়া কাউণ্ট স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "উত্তম। আজই তোমাকে টাকাগুলি দেওয়ার ব্যবস্থা করিতেছি; আর ভবিষ্যতে তোমাকে সন্তুষ্ট করিতে পারি, এরূপ একটি উপায়ও স্থির করিব।"

কাউণ্ট অতঃপর তাঁহার স্ত্রীর কক্ষে উপস্থিত হইলেন। বার্থা তখনও নিঃশব্দে রোদন করিতেছিল। কাউণ্ট তাহার পদপ্রান্তে জানু নত করিয়া বসিয়া পড়িলেন এবং তাহার হাত ধরিয়া অনুনয়ের স্বরে বলিলেন, "বার্থা, আমার নির্দ্দয় ব্যবহারে তুমি মনে বড় কষ্ট পাইয়াছ। তুমি আমার রূঢ়তা মার্জ্জনা কর। আমি বড়ই মনের কষ্টে আছি; আমার অবস্থা বুঝিয়া তুমি আমাকে দয়া কর। আমি নিদারুণ যন্ত্রণা পাইয়াই তোমাকে কঠোর কথা বলিয়াছিলাম। সে জন্য আমি বড়ই অনুতপ্ত হইয়াছি।"

বার্থা সরোষে হাত ছাড়াইয়া লইয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, "বল ত এই মোজে লোকটা কে, আর কোথা হইতে আসিয়াই বা আমাদের ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়াছে? সে যে তোমাকে মুঠার ভিতর পুরিয়াছে, বানরের মত তোমাকে নাচাইতেছে, ইহারই বা কারণ কি? তাহার ভয়ে তুমি

দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছ, ইহা কি আমি বুঝিতে পারি না? আমি তোমার স্ত্রী, তোমার গুপ্ত কথা শুনিবার আমার অধিকার আছে। যদি তুমি তাহার কোন জঘন্য ষড়যন্ত্রে যোগদান করিয়া থাক, তাহা হইলে সে কথা আমার নিকট প্রকাশ করিতে তোমার সঙ্কুচিত হওয়াই স্বাভাবিক; কিন্তু আমাদের মঙ্গলের জন্য তাহা আমার জানা দরকার। তাহা জানিতে পারিলে এখনও হয় ত তোমাকে সেই শয়তানের কবল হইতে মুক্ত করিতে পারিব। আমার সঙ্গে প্রতারণা করিয়া তোমার কোন লাভ নাই। কপট ব্যবহার করিলে, তোমার সঙ্গে কখন আমার মনের মিল হইবে না। তুমি আমাকে সকল কথা খুলিয়া না বলিলে আমি তোমার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখিব না; যদি কোন সম্বন্ধ থাকে—সে কেবল নামেই থাকিবে, তাহার অধিক নহে।"

কাউণ্ট বার্থাকে কি উত্তর দিবেন, স্থির করিতে না পারিয়া অসহিষ্ণুভাবে দুই হাত কচলাইতে লাগিলেন; শেষে অভিমান ও ক্ষোভের সহিত বলিলেন, "বার্থা, তুমি আমাকে বড় শক্ত শক্ত কথা বলিলে! হয় ত সত্যই আমি তোমার এইরূপ ভর্ৎসনার পাত্র। মোজে যখন এখানে আসিয়া আমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, সেই সময় তাহার সহিত আমার কি সম্বন্ধ, তাহা তোমাকে খুলিয়া বলিলেই ভাল করিতাম; কিন্তু সে কথা তোমার নিকট প্রকাশ করিতে আমার লজ্জা হইয়াছিল। ইহাতেই তুমি বুঝিতে পারিতেছ—চক্ষু-লজ্জাটা আমি একেবারে ত্যাগ করিতে পারি নাই। আমি যখন সমরবিভাগে চাকরী করিতাম, সেই সময় আমি একটু উচ্ছৃঙ্খল, উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছিলাম, শান্ত শিষ্ট সুবোধ বালক ছিলাম না; সাধুতার সহিত আমার সম্বন্ধ ছিল না, এ কথা শুনিয়া, আশা করি, তোমার 'হিষ্টিরিয়া' হইবে না। সত্যই সে সময় আমার নীতিজ্ঞান টন্‌টনে ছিল না। আমি মধ্যে মধ্যে জুয়ার আড্ডায় ঢুকিয়া জুয়া খেলিতাম; ভারী বদ নেশা! জুয়ায় হারিলেও সে নেশা ছাড়িতে পারিতাম না এবং টাকার অভাব হইলে মোজের নিকট অনেক বেশী সুদে টাকা ধার করিতাম। উহার নিকট বিস্তর টাকা ধার করিয়াছিলাম। আমি মেয়েন্স হইতে চলিয়া আসিবার সময় উহার ঋণ পরিশোধ করিয়া আসিতে পারি নাই। আমি উহার অজ্ঞাতসারে চলিয়া আসিয়াছিলাম; কিন্তু মোজে, কি উপায়ে জানি না—জানিতে পারিয়াছিল, আমি একটি কামধেনুকে বিবাহ করিয়া পরম সুখে ঘরজামাইগিরি করিতেছি, আর দুই হাতে টাকা উড়াইতেছি! তাহার পর সে এখানে আসিয়া আমার স্কন্ধে ভর করিয়াছে এবং আমার সেই সকল বদখেয়ালের কথা প্রকাশ করিয়া দিবে, এই ভয় দেখাইয়া আমাকে শোষণ করিবার চেষ্টা করিতেছে।—সকল কথাই তোমাকে বলিলাম, শুনিয়া খুশী হইলে ত?"

বার্থা অবিশ্বাসভরে কাউণ্টের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "শুধু কি এই জন্যই তুমি তাহাকে এত ভয় কর? আর কোন কারণ নাই?"

কাউণ্ট মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না। আমার অসংযত প্রথম যৌবনের এই কলঙ্ককাহিনী প্রচারিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে, ইহা কি তুমি অস্বীকার করিবে?"

এই সময় এক জন পরিচারক সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া কাউণ্টের হাতে একখানি পত্র দিল। লেফাপায় নিজের নাম দেখিয়া কাউণ্ট পত্রখানি খুলিয়া পাঠ করিলেন; তাহার পর বার্থাকে বলিলেন, "পত্রখানা মা লিখিয়াছেন; তিনি আমাকে বো-সেজুরে যাইতে লিখিয়াছেন বার্থা! আমি তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া সেই ত্রিশ হাজার ফ্রাঙ্ক লইয়া আসি, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। হাতের কাছে কোন লোক না থাকায় তিনি টাকাগুলি এখানে পাঠাইতে পারেন নাই; এই জন্য আমাকেই যাইতে হইবে।"

বার্থা বলিল, "টাকা ত আনিবে, তাহার পর ও হতভাগাকে তাড়াইবার কি ব্যবস্থা করিবে?"

কাউণ্ট বলিলেন, "কে, মোজে? টাকাগুলি লইয়া সে আজই চলিয়া যাইতে রাজী হইয়াছে।"

বার্থা এ কথায় যেন একটু খুশী হইয়া বলিল, "সে এখন আছে কোথায়?"

কাউণ্ট বলিলেন, "আমি যখন এখানে আসি, তখন সে বারান্দায় ছিল।"

বার্থা বলিল, "এখনই মায়ের সঙ্গে দেখা করিতে যাও; শীঘ্র ফিরিয়া আসিও।"

কাউণ্ট তাড়াতাড়ি সেখান হইতে পলায়ন করিতে

পারিলে বাঁচেন! তিনি আর কোন কথা না বলিয়া তৎক্ষণাৎ সেই কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

বার্থা জানালার কাছে দাঁড়াইয়া দেখিল, কাউণ্ট গাড়ী লইয়া দেউড়ী পার হইলেন; তখন সে আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া মুখ মুছিল, চুলগুলি ঠিক করিয়া লইল; তাহার পর একখানি হাঁসিয়াদার শালে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া বারান্দায় উপস্থিত হইল। মোজে বার্থাকে সে সময় বারান্দায় আসিতে দেখিয়া বিস্মিত হইল এবং মুগ্ধ-নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; সে দৃষ্টি লালসাপূর্ণ। তাহার মনে হইল, এরূপ অপরূপ রূপবতী যুবতী আর কখন তাহার দৃষ্টিগোচর হয় নাই, কেবল এক জন ভিন্ন!

মোজে চেয়ার হইতে উঠিয়া, আর একখানি চেয়ারে বার্থাকে বসিতে অনুরোধ করিল। বার্থা তাহার অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইল এবং গম্ভীর স্বরে বলিল, "দেখ মোজে! আমি একটা সঙ্কল্প স্থির করিয়া এখানে আসিয়াছি। আমার স্বামী কোন কাযে বাহিরে গিয়াছেন; তিনি এখানে এখন উপস্থিত নাই, এই সুযোগে তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব। আমার স্বামীর সঙ্গে তোমার এমন কি সম্বন্ধ—যাহার খাতিরে তুমি তাঁহার ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়াছ?"

মোজে বার্থার বাক্যবাণে আহত হইল, একটু অপমানও বোধ করিল; কিন্তু মনের ভাব গোপন করিয়া সহজ স্বরে বলিল. "সম্বন্ধ আর কি? কাউণ্ট আমার বহু দিনের বন্ধু, এই জন্য তাঁহার আতিথ্য স্বীকার করিয়াছি। আমার ভারে তাঁহার শক্ত ঘাড় ভাঙ্গিবার আশঙ্কা নাই; ছোকরার ঘাড় খুবই শক্ত।—তুমি অনর্থক ভয় পাইতেছ, মাই ডিয়ার!"

বার্থা চোখ-মুখ লাল করিয়া বলিল, "তুমি কি রকম লোক! ভদ্রমহিলার সঙ্গে ভদ্রভাবে কথা কহিতে জান না? ভদ্রভাবে বল। তোমার ইতর ব্যবহারে আমরা উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছি। তুমি যে কোন ভদ্রলোকের বন্ধু হইবার যোগ্য—ইহা তোমার ব্যবহার দেখিয়া বিশ্বাস করা কঠিন! এই জন্য আমার ধারণা, তোমাদের সম্বন্ধের মধ্যে কোন জটিল রহস্য আছে। যদি আমার স্বামীর নিকট তোমার ত্রিশ হাজার ফ্রাঙ্ক সত্যই পাওনা থাকে, তাহা হইলে সে টাকা আজই তোমাকে দেওয়া হইবে। টাকাগুলি লইয়া তুমি অবিলম্বে আমাদের বাড়ী হইতে চলিয়া যাও; ভবিষ্যতে কখন যেন আমাদিগকে তোমার মুখ দেখিতে না হয়।"

মোজে বলিল, "তোমার সরলতার পরিচয় পাইয়া আমি সত্যই মুগ্ধ হইলাম। এ রকম স্পষ্ট কথা আমি বহু দিন শুনি নাই। কিন্তু আমিও তোমাকে স্পষ্ট .ভাষায় বলিয়া রাখি - আমার সহিত শত্রুতা করিলে তোমার ক্ষতি ভিন্ন লাভ হইবে না; আমি কাউণ্ট সম্বন্ধে তোমাকে এরূপ কোন গুহ্য কথা বলিতে পারি—যাহা শুনিলে তোমার মাথায় বজ্রাঘাত হইবে! আমি তোমাকে অনেক গুপ্ত কথা বলিতে পারিতাম, কিন্তু তুমি আমার প্রতি যেরূপ অশিষ্ট ব্যবহার করিতেছ, ইহাতে আমার নিকট আর কি প্রত্যাশা করিতে পার?"

বার্থা ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে মোজের মুখের দিকে চাহিয়া ঘৃণাভরে বলিল, "মনুষ্যদেহে তুমি পিশাচ।"

মোজে বলিল, "তুমি রূপবতী পিশাচী—এই জন্যই আমি তোমাকে লাভ করিতে চাই।"—সে বার্থার দুই হাত ধরিয়া তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া আনিল, তাহার পর তাহার মুখচুম্বন করিল।

বার্থা হঠাৎ এই ভাবে আক্রান্ত হইয়া লজ্জায়, ভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। তাহার আর্ত্তনাদ শুনিয়া দুই জন পরিচারক তাড়াতাড়ি বারান্দায় উপস্থিত হইল।

বার্থা মোজের বাহুপাশ হইতে সবলে আপনাকে মুক্ত করিয়া ক্রোধ-কম্পিত স্বরে বলিল, "ওরে নরকের কুকুর! তোর এত সাহস? তোর এত দূর ধৃষ্টতা?"—তাহার পর সে স্তম্ভিত পরিচারকদ্বয়কে বলিল, "কোচম্যান ও সহিসকে ডাকিয়া এই নির্লজ্জ শয়তানটাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দে।"

মোজে তৎক্ষণাৎ তীব্রস্বরে বলিল, "থাম, সুন্দরি! যদি আমাকে এই ভাবে তাড়াইয়া দাও, তাহা হইলে তোমাকে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত অনুতাপ করিতে হইবে। আমি তোমার ঔদ্ধত্য, তোমার গর্ব্ব এ ভাবে চূর্ণ করিব যে, তোমার অভিশপ্ত জীবনের ভার অসহ্য মনে হইবে। তুমি জীবনে কখন মাথা তুলিয়া ভদ্রলোকের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিবে না। আমি তোমার সর্ব্বনাশ করিয়া এই স্থান ত্যাগ করিব।"

মোজের কথায় বার্থার বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল; তাহার বিশ্বাস হইল, মোজের এই স্পর্দ্ধা অমূলক নহে। সে তাহার স্বামীর এরূপ কোন গুপ্ত কথা জানে, যাহা প্রকাশিত হইলে তাহার জীবন বিষময় হইবে, সমাজে মুখ দেখাইবার উপায় থাকিবে না!"

বার্থা মুহূর্ত্তকাল স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল, "আমার স্বামী তোমার এই পাশবিক আচরণের শাস্তি দিবেন; আমি আর এক মুহূর্ত্ত তোমার সম্মুখে থাকিয়া আপনাকে কলুষিত করিব না।"

বার্থা পরিচারকদ্বয়কে তাহার অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই বারান্দা পরিত্যাগ করিল।

বার্থা প্রস্থান করিলে মোজে সরোষে বলিল, "আমি শয়তান, আমি কুকুর! তুই আজ আমায় যে অপমান করিয়াছিস্, তাহার প্রতিফল না দিয়া আমি এখান হইতে নড়িব না। তোর অহঙ্কার চূর্ণ করিব; তোর মাথা মাটীর ধূলার সঙ্গে মিশাইয়া দিব।"

কাউণ্ট তিন ঘণ্টা পরে বাড়ী ফিরিলেন; তিনি শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, বার্থা উপুড় হইয়া শয্যায় পড়িয়া, দুই হাতে মুখ গুঁজিয়া নিঃশব্দে রোদন করিতেছে। কাউণ্ট সস্নেহে বার্থার হাত ধরিয়া তাহাকে টানিয়া তুলিলেন এবং তাহার রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

বার্থা ক্ষুব্ধ স্বরে সকল কথাই কাউণ্টের গোচর করিল, কোন কথা গোপন করিল না। বার্থার কথা শুনিয়া ক্রোধে ও অপমানে কাউণ্টের চোখ-মুখ লাল হইয়া উঠিল; তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। বার্থা তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল, "যদি তোমার বিন্দুমাত্র মনুষ্যত্ব থাকে, যদি তোমার নিজের ও তোমার পত্নীর সম্মানের প্রতি যৎসামান্যও শ্রদ্ধা থাকে, তাহা হইলে তাহাকে চাবুক মারিয়া পদাঘাতে দূর করিয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য। হাঁ, এ কায তোমাকে করিতেই হইবে। যদি তুমি এ কায না কর, তাহা হইলে বুঝিব, তুমি তাহাকে ভয় কর; বুঝিব, সে তোমাকে গোলাম করিয়া রাখিয়াছে! তাহা হইলে, যে বাড়ীতে বাস করিয়া আমাকে পদে পদে অপমানিত হইতে হইতেছে এবং যেখানে আমার স্বামীর ও আমার সম্মান রক্ষা করিবার সামর্থ্য নাই, সে বাড়ীতে আমি আর এক মুহূর্ত্ত বাস করিব না। হাঁ, আমি আমার মায়ের বাড়ীতে আশ্রয় লইব এবং এ জীবনে তোমার বাড়ীতে ফিরিয়া আসিব না; তোমার সহিত বাসও করিব না। তোমার মত কাপুরুষ অযোগ্য স্বামীর মুখদর্শন করিতেও আমার ঘৃণা হইবে।"

বার্থার এই কঠোর প্রতিজ্ঞা শুনিয়া কাউণ্ট স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন; তাহার পর মিষ্ট কথায় তাহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিলেন, দুই চারিটি নীতি-কথাও বলিলেন; কিন্তু বার্থার সঙ্কল্প টলাইতে পারিলেন না।— বার্থা তাঁহাকে কাপুরুষ, মোজের ক্রীতদাস বলিয়া উপহাস করিল, ধিক্কার দিল। পত্নীর বিদ্রূপে ও ধিক্কারে কাউণ্টের ধৈর্য্য বিলুপ্ত হইল; তিনি আত্মসংবরণে অসমর্থ হইয়া কম্পিত পদে তাঁহার উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং একগাছা চাবুক লইয়া মাতালের মত টলিতে টলিতে বারান্দায় উপস্থিত হইলেন।

মোজে তখন চেয়ারে বসিয়া নিশ্চিন্তমনে ধূম-পান করিতেছিল। কাউণ্ট তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া পকেট হইতে এক তাড়া নোট বাহির করিলেন; সেই বাণ্ডিলে ত্রিশ হাজার ফ্রাঙ্কের নোট ছিল। কাউণ্ট সেই নোটের তাড়া সবেগে মোজের মুখের উপর নিক্ষেপ করিয়া, চাবুক দ্বারা প্রচণ্ডবেগে তাহার অঙ্গ-সেবা করিতে লাগিলেন; শপাশপ শব্দে চাবুক পড়িতে লাগিল!

মাথায় ও মুখে দুই এক ঘা চাবুক পড়িতেই হতবুদ্ধি মোজে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল, বিব্রত স্বরে বলিল, "এ কি! এ আবার কি রকম রসিকতা? আহা, থামো না!"

কাউণ্ট চাবুক চালাইতে চালাইতে বিকৃত স্বরে বলিলেন, "রসিকতা নয়; আজ তোমাকে খুন না করিয়া নিশ্চয়ই ছাড়িব না। তোমার অত্যাচার আমি নীরবে সহ্য করিয়াছি, করিতেছি; কিন্তু কাউণ্টেসের অপমান আমি সহ্য করিব না। তোমাকে খুন করিয়া সেই অপমানের প্রতিফল দিব। কাপুরুষ! বর্ব্বর!"

চাবুক প্রচণ্ডবেগে মোজের মুখে পড়িলে তাহার ললাটের কিয়দংশ কাটিয়া গেল। ক্ষতমুখ হইতে রক্ত ঝরিতে লাগিল।

মোজে এক লম্ফে দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়া, দুই হাতে ললাটের রক্ত মুছিতে মুছিতে তীব্রস্বরে বলিল, "শোন্ মূর্খ! আমার এই রক্তপাতের ফল কিরূপ ভীষণ, তাহা তোর

বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, তোকে চূর্ণ করিব; কীটের ন্যায় এই পদতলে নিষ্পেষিত করিব। আজ হইতে আমি তোর শত্রু,—অতি ভীষণ শত্রু। তোর শাশুড়ীর সমস্ত সম্পত্তি আমার পায়ের কাছে ঢালিয়া দিয়া আমার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিলেও আমি তোকে ক্ষমা করিব না। তোর এই নবাবী—এই ঘরজামাই-গিরি ঘুচাইয়া দিব। তোকে পথে বসাইব।"

মোজে দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল; নোটের তাড়াটা সে পূর্ব্বেই পকেটে পূরিয়াছিল। সে কাউণ্টের গৃহত্যাগ করিলে কাউণ্ট চাবুক ফেলিয়া দিয়া, একখানি কৌচের উপর হতাশভাবে বসিয়া পড়িয়া, দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁপিতে লাগিলেন।

[ ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

---

# লাঞ্ছিতা

১

বঙ্গভূমে ছিল এক ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী,
মধ্যবিত্ত গৃহস্থ তাহারা—রূপে গুণে
রমণী পার্ব্বতীসমা, ষোড়শী তরুণী,
সতী-সাধ্বী—পতি ছাড়া দেব নাহি জানে।
শাশুড়ী, ননদী, তার সেবে সযতনে.
পিতৃ-গৃহে পিতামাতা ভাই-বোন সবে
বাঁধা ছিল স্নেহডোরে তার; কোনক্ষণে,
শোক, তাপ, অভাবের জ্বালা, এই ভবে
স্পর্শে নাই তারে। কিন্তু তার রূপরাশি
হ'ল তার কাল। এক সন্ধ্যাকালে বালা
মন্দিরে করিয়া পূজা, সাথে প্রতিবাসী,
ফিরিলা আপন গৃহে। গলে ফুলমালা,
হাতে ফুল-ডালা, রক্তবর্ণ বস্ত্র অঙ্গে,
যেন ত্রিদিবের কোন দেবী! পথে তার
হ'ল দেখা লম্পট যবন যুবা সঙ্গে।
ত্রাসেতে কাঁপিল বক্ষ—অতি ত্বরা ক'রে
গেল চলি গৃহে—নমিলা পতির পদ,
জপিলা অভয়া-নাম, শুচি ভক্তি-ভরে,
কি জানি ঘটে বা বুঝি, বিষম বিপদ।

২

কাম-বহ্নি উঠে জ্বলি' পিশাচ-হৃদয়ে।
যবে পতি-অঙ্কে বালা নিদ্রা যায় সুখে,
ঘোর অন্ধকার নিশি, অনুচর লয়ে,
দুর্দ্দান্ত কৃতান্ত মত, আবরিত মুখে,
সেই ম্লেচ্ছ যুবা আসি পশিল সে কক্ষে,
জাগিল দম্পতি, করিল বিষম রব,
প্রাণাধিকে আবরিল পতি নিজ বক্ষে।
দারুণ আঘাতে তারে করিয়া নীরব,
দুরন্ত পশুর দল উঠায়ে বামায়—
সংজ্ঞাহীন দেহ তার—আনিল বর্ব্বর
পাষণ্ড আপন গৃহে। কাম-লালসায়,
নীচ মনোরথ সিদ্ধ করি, ত্বরাপর—
সতীর অমূল্য রত্ন করিয়া হরণ,
অচৈতন্য দেহখানি রাখিল প্রান্তরে।
কালনিশি হ'ল ভোর; গ্রামবাসিগণ
পাইয়া সতীর দেহ লয়ে গেল ঘরে।

৩

মর্ম্মভেদী হাহাকার গ্রামের মাঝারে,
কাঁদিল সবার হৃদি অবলার দুঃখে:
পাইল পাষণ্ড দণ্ড, রাজার বিচারে,
তবুও অবলা গৃহে থাকে ম্লানমুখে।
প্রাণেশ্বরী ছিল যার—মুহূর্ত্তের তরে,
নারিত রাখিতে তারে নয়নের আড়ে,
আজি সেই পতি নাহি আসে তার ঘরে,
যবন-দূষিতা ব'লে, হেয় জ্ঞান করে।
যেই শ্বশ্রু বধূ লক্ষ্মীস্বরূপিণী বলি
করিত আদর, আজি সেই গুরুজন
চাহে না তাহার পানে—দূরে যায় চলি,
বধূহস্তে অন্নজল করে না গ্রহণ।
ঘুচে গেল অবলার স্বামি-গৃহ-সুখ,
ভাঙ্গিল সুখের স্বপ্ন চিরদিন তরে,
আরাধ্য দেবতা তার হইল বিমুখ,
মনোদুঃখে গেল বালা মাতা-পিতা-ঘরে।
দেখিয়া লাঞ্ছিতা সুতা, মাতার পরাণ
বিদরিল শতধারে, কিন্তু পিতা তার,
জাতিনাশ-ভয়ে তারে, দিল নাকো স্থান;
ঘুচে গেল শেষ আশা, আহা, অবলার!

৪

আজি পুনঃ অন্ধকার নিশি। পাগলিনী
প্রায় বালা উতরিল জাহ্নবীর তীরে,
মর্ম্মভেদী আঁখি-জলে ভাসায়ে ধরণী,
ঘনমুক্ত কেশজাল হেলায় এলায়ে।
খরস্রোতে বহে গঙ্গা পদতলে তার,
বরষার বারিরাশি কাঁপাইয়া তীর,
তরঙ্গ ধাইছে ধরি ভীষণ আকার,
মুছিয়া আঁখির ধারা, বামা হ'ল স্থির।
মাতা, পিতা, পতিপদে প্রণমিয়া সতী,
করযোড়ে জাহ্নবীরে কাতর পরাণে,
জানাল হৃদয়-ব্যথা—বলে "মা গো! পতি
বিনা অন্য দেব তব দাসী নাহি জানে,
অশুচি, অস্পৃশ্যা আমি সেই পতি-ঘরে!
সমাজে নাহিক স্থান, আমি মা! পতিতা,
পতিতপাবনী তুমি! আজি তব নীরে
দাও স্থান, দাসী চাহে এই ভিক্ষা, মাতা!"
এই বলি অভাগিনী তরঙ্গ-ভিতরে
পড়ে ঝাঁপাইয়া দ্রুত যেন সৌদামিনী,
শুভ্র দেহখানি ভাসে ক্ষণেকের তরে,
উত্তাল তরঙ্গ এক গ্রাসিল তখনি!

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

# কপালকুণ্ডলা

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কল্পনার অপূর্ব্ব সৃষ্টি কপালকুণ্ডলার বাল্যজীবন সম্বন্ধে সোজাসুজি এই কয়েকটি কথা মাত্র বলিয়াছেন—

"ইনি ব্রাহ্মণ-কন্যা।—ইনি বাল্যকালে দুরন্ত খৃষ্টীয়ান তস্কর কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়া যান-ভঙ্গ প্রযুক্ত তাহাদিগের দ্বারা কালে এই সমুদ্রতীরে ত্যক্ত হয়েন। ····কাপালিক ইঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া আপন যোগসিদ্ধিমানসে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। অচিরাৎ আত্মপ্রয়োজন সিদ্ধ করিতেন। ইনি এ পর্য্যন্ত অনূঢ়া, ইঁহার চরিত্র পরম পবিত্র।" ( ১।৮ )

যখন অধিকারী কপালকুণ্ডলার এই পরিচয়টুকু দিয়াছিলেন, তখন সে ষোড়শী যুবতী। কাব্যের স্থানে স্থানে প্রসঙ্গক্রমে কপালকুণ্ডলার বাল্য-জীবনের আরও কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়। কপালকুণ্ডলার বাল্যলীলার নিকেতন "অপ্রফুল্ল" অরণ্যময়। "রসুলপুরের মুখ হইতে সুবর্ণরেখা পর্য্যন্ত অবাধে কয়েক যোজন পথ ব্যাপিত করিয়া এক বালুকাস্তূপ-শ্রেণী বিরাজিত আছে। আর কিছু উচ্চ হইলে ঐ বালুকাস্তূপ-শ্রেণীকে বালুকাময় ক্ষুদ্র পর্ব্বত-শ্রেণী বলা যাইতে পারিত। এক্ষণে লোকে উহাকে বালিয়াড়ি বলে। ঐ সকল বালিয়াড়ির ধবল শিখরমালা মধ্যাহ্নে সূর্য্যকিরণে দুর হইতে অপূর্ব্ব প্রভাবিশিষ্ট দেখায়। উহার উপর উচ্চ-বৃক্ষ জন্মে না, স্তূপতলে সামান্য ক্ষুদ্র বন জন্মিয়া থাকে। অধোভাগমণ্ডনকারী বৃক্ষাদির মধ্যে ঝাঁটি, বন-ঝাউ এবং বনপুষ্পই অধিক।" ( ১।৩ )

এই বনবাসিনী কিশোরীর প্রতিপালক কাপালিক যে কি প্রকারের মনুষ্য, প্রথম সন্দর্শনেই তাহার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। রজনী গভীরা। একটি অত্যুচ্চ বালুকাস্তূপের শিরোভাগে অগ্নি জ্বলিতেছে। অগ্নির নিকটে একটি মনুষ্যমূর্ত্তি। "শিখরাসীন মনুষ্য নয়ন মুদ্রিত করিয়া ধ্যান করিতেছিল—নবকুমারকে প্রথম দেখিতে পাইল না। নবকুমার দেখিলেন, তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চাশৎ বৎসর হইবে। পরিধানে কোন কার্পাসবস্ত্র আছে কি না, তাহা লক্ষ্য হইল না; কটিদেশ হইতে জানু পর্য্যন্ত শার্দ্দূলচর্ম্মে আবৃত। গলদেশে রুদ্রাক্ষমালা; আয়ত মুখমণ্ডল শ্মশ্রুজটা-পরিবেষ্টিত। সম্মুখে কাষ্ঠে অগ্নি জ্বলিতেছিল; সেই অগ্নির দীপ্তি লক্ষ্য করিয়া নবকুমার সে স্থলে আসিতে পারিয়াছিলেন। নবকুমার একটা বিকট দুর্গন্ধ পাইতে লাগিলেন; ইহার আসন প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার কারণ অনুভূত করিতে পারিলেন। জটাধারী এক ছিন্নশীর্ষ গলিত শবের উপর বসিয়া আছেন। আরও সভয়ে দেখিলেন যে, সম্মুখে নরকপাল রহিয়াছে; তন্মধ্যে রক্তবর্ণ দ্রব পদার্থ রহিয়াছে। চতুর্দ্দিকে স্থানে স্থানে অস্থি পড়িয়া রহিয়াছে—এমন কি, যোগাসীনের কণ্ঠস্থ রুদ্রাক্ষ-মালামধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থিখণ্ড গ্রথিত রহিয়াছে।" ( ১।৪ )

এই প্রকার বিকট বীভৎস সাধন যাঁহার নিত্যকর্ম্ম, সেই কাপালিক কপালকুণ্ডলাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। প্রতিপালন যে করিয়াছিলেন, সে-ও দয়াপরবশ হইয়া নহে, আপন যোগসিদ্ধি-মানসে। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, কপালকুণ্ডলা কাপালিকের আচরণে স্নেহ-মমতার কোন লেশ পান নাই এবং প্রতিপালকের স্নেহ বা অপত্য-স্নেহের সংস্পর্শে বালক-বালিকার মনে যে সুকুমার ভাবগুলি ফুটিয়া উঠে, কপালকুণ্ডলার মনে সেই সকল ভাব ফুটিয়া উঠিবার অবকাশ পায় নাই। পক্ষান্তরে, আশৈশব অপত্য-স্নেহে বঞ্চিতা, নরবলি এবং শবসাধনা যেখানকার নিত্য ঘটনা, সেখানে বর্দ্ধিতা হইয়াও কপালকুণ্ডলা যে পিশাচী হইয়া উঠেন নাই, তাহার কারণ আর এক জনের প্রভাব, সেই কাননাভ্যন্তরস্থ মন্দিরের কালীর পূজারী অধিকারীর প্রভাব। অধিকারী কপালকুণ্ডলাকে মা বলিয়া সম্বোধন করিতেন এবং মাতার অধিক স্নেহ করিতেন। তিনি কপালকুণ্ডলাকে একটু লেখাপড়াও শিখাইয়াছিলেন, এবং তাঁহার হৃদয়ে দেবীভক্তির বীজ বপন করিয়া দিয়াছিলেন। ফলে ষোড়শী কপালকুণ্ডলার চিত্তে দুইটি বৃত্তি প্রবণতা লাভ করিয়াছিল; একটি ঔদাসীন্য, আর একটি দেবীভক্তি। কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে কাপালিকের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া অধিকারীর আশ্রমে রাখিয়া অসঙ্কোচে সমুদ্রতীরে কাপালিকের সাক্ষাতে প্রত্যাগমন করিবার উদ্যোগ করিলেন।

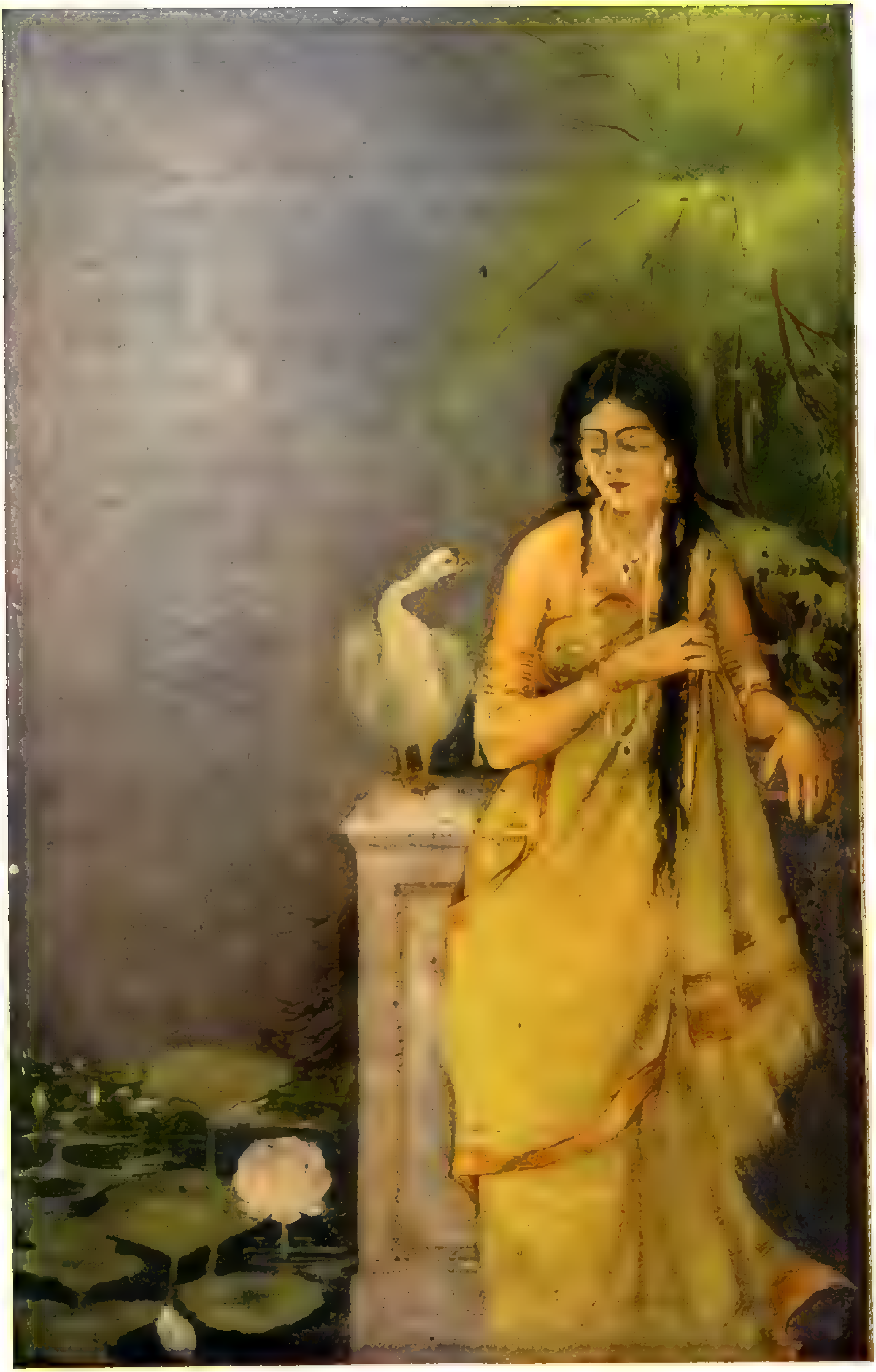

দময়ন্তী

বসুমতী প্রেস

শিল্পী—শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ

"অধিকারী তাঁহার প্রতি সস্নেহ-নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, 'যাইও না, ক্ষণেক দাঁড়াও, এক ভিক্ষা আছে।'

কপালকুণ্ডলা। কি ?

অধিকারী। তোমাকে দেখিয়া পর্য্যন্ত মা বলিয়া থাকি, দেবীর পদস্পর্শ করিয়া শপথ করিতে পারি যে, মাতার অধিক তোমাকে স্নেহ করি। আমার ভিক্ষা অবহেলা করিবে না ?

কপা। করিব না।

অধি। আমার এই ভিক্ষা, তুমি আর সেখানে ফিরিয়া যাইও না।

কপা। কেন ?

অধি। গেলে তোমার রক্ষা নাই।

কপা। তা ত জানি।

অধি। তবে আর জিজ্ঞাসা কর কেন ?

কপা। না গিয়া কোথায় যাইব ?" ( ১।৮ )

এই দৃঢ়বদ্ধ ঔদাসীন্যকে শিথিল করিবার একমাত্র উপায় হইতে পারিত প্রেমোন্মেষ। বালিয়াড়ির মধ্যে বর্দ্ধিতা উদাসিনী কপালকুণ্ডলার বালিয়াড়িকল্প হৃদয়ে প্রেমোন্মেষ সহজ নহে; নায়ককে দেখিবামাত্রই শকুন্তলা বা মিরন্দার মত কপালকুণ্ডলার প্রেমাতুর হওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু যদি প্রথমদর্শন অবধি নায়কের হৃদয়ে কপালকুণ্ডলার প্রতি প্রেম উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত, তবে বোধ হয়, সেই রসধারা বালিয়াড়ির শিখরকেও ভিজাইয়া তুলিতে পারিত, কপালকুণ্ডলার হৃদয়ে প্রেম অঙ্কুরিত করিতে পারিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সময় থাকিতে সে সুযোগ ঘটিল না। উদাসিনী কপালকুণ্ডলা নিজের জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইয়া যাঁহার জীবন রক্ষা করিলেন এবং যাঁহাকে অগত্যা বিবাহ করিলেন, সেই নবকুমারও তখন সংসারবিষয়ে উদাসীন ছিলেন। নবকুমার সপ্তগ্রামনিবাসী বন্দ্যঘটী গাইয়ের ব্রাহ্মণ-সন্তান। তিনি রামগোবিন্দ ঘোষালের কন্যা পদ্মাবতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। পদ্মাবতীর বয়স যখন ত্রয়োদশ বৎসর, তখন সে পুরীর পথে পিতা-মাতার সহিত পাঠানসেনা কর্ত্তৃক ধৃত হয়। পদ্মাবতীর পিতা সপরিবারে মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া প্রাণ বাঁচাইয়া যখন দেশে ফিরিয়া আসিলেন, তখন নবকুমারের পিতা অবশ্যই জাতিচ্যুতা পুত্রবধূকে গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। পদ্মাবতীর পিতা রাজপ্রসাদলাভের আশায় সপরিবারে রাজমহল গেলেন। "নবকুমার বিরাগবশতঃ আর দারপরিগ্রহ করিলেন না।" এই ব্যাপারের হয় ত ১০।১৫ বৎসর পরে এবার নবকুমার গঙ্গা-সাগরে আসিয়াছিলেন। তিনি যে ভাবে সহযাত্রিগণ কর্ত্তৃক সমুদ্রতীরে পরিত্যক্ত হইলেন, তাহা অবশ্যই তাঁহার বৈরাগ্যকে আরও তীব্র করিয়া তুলিল। নবকুমার কাঠ লইয়া ঘাটে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, নৌকা সেখানে নাই। নদীতে তখন জোয়ার আসিয়াছে। প্রথম ভরসা করিলেন, জোয়ার শেষ হইলে নৌকা ফিরিয়া আসিবে। জোয়ার শেষ হইল, তার পর ক্রমশঃ ভাঁটাও শেষ হইল, কিন্তু নৌকা ফিরিল না। তখন নবকুমারের প্রতীতি হইল, হয় নৌকা জলমগ্ন হইয়াছে, নয় সঙ্গিগণ তাঁহাকে বিজনে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। ক্রমে অন্ধকার হইল। নবকুমার বালিয়াড়ির মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে ঘুমাইয়া পড়িলেন। যখন তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন রজনী গভীরা। বহুদূরে আলো দেখিতে পাইলেন। আলোর নিকটবর্ত্তী হইয়া ছিন্ন-শির গলিত শবের উপর ধ্যানমগ্ন কাপালিককে দেখিতে পাইলেন এবং ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হইয়া কাপালিকের আতিথ্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন।

এইরূপে নানা কারণে একান্ত বিরাগী নবকুমারের সম্মুখে পরদিন সন্ধ্যার আধ আঁধারে অপরূপরূপা ষোড়শী-মূর্ত্তি আবির্ভূত হইল। এই ষোড়শী কপালকুণ্ডলা। নবকুমার দেখিয়া নীরব নিস্পন্দ হইয়া চকিত নয়নে চাহিয়া রহিলেন। ষোড়শী উদ্বেগের সহিত অর্থাৎ সকরুণ নয়নে নবকুমারের দিকে চাহিলেন। অনেকক্ষণ পরে ষোড়শী মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ ?" এই প্রশ্নের কি অর্থ, কি উত্তর করিতে হইবে, নবকুমারের কিছুই মনে হইল না। কিন্তু সেই মৃদু মধুরধ্বনি যেন হর্ষ-বিকম্পিত হইয়া বেড়াইতে লাগিল।

উত্তর না পাইয়া কপালকুণ্ডলা "আইস" বলিয়া আগে আগে চলিলেন; নবকুমার কলের পুত্তলিকার ন্যায় পাছে পাছে চলিলেন। কুটীরের নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র কপালকুণ্ডলা অন্তর্হিতা হইলেন। "এ কি দেবী না মানুষী, না কাপালিকের মায়া মাত্র! নবকুমার নিস্পন্দ হইয়া

হৃদয়মধ্যে এই কথার আন্দোলন করিতে লাগিলেন। কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।” কপালকুণ্ডলার কমনীয় কান্তি দেখিয়া এবং তাঁহার হৃদয়ের রমণীয়তার পরিচয় পাইয়া সাধারণ নায়কের মনে যে ভাবের উদয় হওয়া উচিত ছিল, নবকুমারের মনে কিন্তু সেইরূপ ভাবের উদয় হইল না। নবকুমারের মনে প্রেমের সঞ্চার হইল না; নবকুমার আত্মহারা হইয়া সেই রমণীমূর্ত্তির ধ্যানে মগ্ন হইতে পারিলেন না। যদি প্রথম দেখার সময় নবকুমার নিজে মজিতে পারিতেন, তবে বোধ হয়, কপালকুণ্ডলাকেও মজাইতে পারিতেন এবং উভয়ের দাম্পত্য-জীবন অন্য খাতে প্রবাহিত হইতে পারিত। কিন্তু নবকুমারের সে সামর্থ্য ছিল না। নবকুমার বিরাগী, সুতরাং প্রথম সাক্ষাৎকারের সময় যখন নবকুমার ও কপালকুণ্ডলার চারি চক্ষুর মিলন হইল, তখন আর যাহাই হউক, পঞ্চশর শরসন্ধানের অবসর পাইল না। তখনই বিয়োগান্ত কাব্যের সূত্রপাত হইল।

পরদিন প্রাতে স্নান-আহ্নিক করিবার জন্য নবকুমার সমুদ্রতীরে গেলেন। “তথায় প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বদৃষ্টা মায়াবিনী পুনর্ব্বার সে স্থলে যে আসিবেন—এমন আশা নবকুমারের হৃদয়ে কত দূর প্রবল হইয়াছিল, বলিতে পারি না. কিন্তু সে স্থান তিনি ত্যাগ করিতে পারিলেন না।” (১।৬)

এই ভাবে সমুদ্রতীরে দিন কাটাইয়া সূর্য্যাস্তের পর হতাশ-হৃদয়ে নবকুমার কুটীরে ফিরিয়া আসিলেন। বিরক্ত-হৃদয় নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে প্রেমনেত্রে নিরীক্ষণ করিতে পারেন নাই, চিনিতে পারেন নাই। তাই কপালকুণ্ডলা এখনও তাঁহার কাছে মায়াবিনী এবং মায়াবিনীকে আর একবার দেখিবার কৌতূহলপরবশ হইয়া তিনি সমুদ্রতীরে দিনটা কাটাইয়া দিলেন। কুটীরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, তথায় কাপালিক বসিয়া আছেন। কাপালিক নবকুমারকে সঙ্গে লইয়া পূজার স্থানে চলিলেন। কাপালিক আগে চলিলেন, নবকুমার পাছে। তখনও সন্ধ্যালোক অন্তর্হিত হয় নাই। এমন সময় কি জানি কাহার সুকোমল কর নবকুমারের পৃষ্ঠ স্পর্শ করিল। নবকুমার ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন, সেই বনদেবী-মূর্ত্তি। নবকুমার চমৎকৃত হইয়া দাঁড়াইলেন। কাপালিক খানিকটা দূরে সরিয়া গেলে কপালকুণ্ডলা নবকুমারের কানে কানে ‘যাইও না। ফিরিয়া যাও,—পলায়ন কর,’ বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। এবারও বিরাগী নবকুমারের মন গলিল না। তিনি শুধু ভাবিলেন,—‘এ কাহার মায়া? না আমারই ভ্রম হইতেছে।’ তাহার পর নিজের বাঁচিবার কথাই মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন।

অবশেষে কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে কাপালিকের কবল হইতে মুক্ত করিয়া অমাবস্যার ঘোর অন্ধকারে বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। নবকুমার তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। কপালকুণ্ডলা দেবী না মায়াবিনী না কি, নবকুমার তাহা জানিবার যথেষ্ট সুযোগ পাইয়াছেন। নিজের প্রাণপণ করিয়া কপালকুণ্ডলা যে তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন, এ কথা অবশ্যই নবকুমারের বুঝিবার আর বাকী নাই। তথাপি যখন বনমধ্যে সেই “ষোড়শীর” অনুসরণ করিতেছিলেন, তখন নবকুমার কি ভাবিতেছিলেন? নবকুমার মনে মনে ভাবিতেছিলেন, “এও কপালে ছিল!” কবি এখানে ভাষ্য করিয়াছেন, “নবকুমার জানিতেন না যে, বাঙ্গালী অবস্থার বশীভূত, অবস্থা বাঙ্গালীর বশীভূত হয় না। জানিলে এ দুঃখ করিতেন না।” যিনি মন্দিরমধ্যে দেখাদেখিমাত্রেই তিলোত্তমা ও জগৎ সিংহকে অচ্ছেদ্য প্রেমডোরে বাঁধিয়া দিয়াছেন, এই উক্তি সেই কবিরই লেখনী-প্রসূত। সংসারবিরাগী সংযমী প্রৌঢ় ব্যক্তিকে যদি একাকী রজনীতে বনপথে ষোড়শীর পাছে পাছে দৌড়াইতে হয়, তবে সে কপালের দোষ দেওয়া ভিন্ন আর কি করিতে পারে!

কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে লইয়া বনমধ্যস্থ কালী-মন্দিরসংলগ্ন পূজারী বা অধিকারীর গৃহে আশ্রয় লইলেন। অধিকারী নবকুমারকে নিজ রন্ধনশালায় শোওয়াইলেন। তখন কপালকুণ্ডলা সমুদ্রতীরে ফিরিয়া যাইবার উদ্যোগ করায় অধিকারী যে বাধা দিয়াছিলেন, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অধিকারী যখন কপালকুণ্ডলার ‘না গিয়া কোথায় যাইব?’ প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, ‘এই পথিকের সঙ্গে দেশান্তরে যাও, সে প্রস্তাবে কপালকুণ্ডলা সহসা সম্মত হইতে পারিলেন না, কেন না, যখন অধিকারীর এক শিষ্য মন্দিরে আসিয়াছিলেন, তখন তিনি শুনিয়াছিলেন, যুবতীর যুবা-পুরুষের সহিত যাওয়া

অনুচিত। তাহার পর অপরিচিত পথিকের সঙ্গে যাওয়া উচিত কি অনুচিত, তদ্বিষয়ে কালীমাতার অভিমত জানিবার জন্য গুরু ও শিষ্যা মন্দিরে প্রবেশ করিলেন এবং দেবীমূর্ত্তির পদে একটি অচ্ছিন্ন বিল্বপত্র অর্ঘ্যস্বরূপ প্রদান করিলেন। বিল্বপত্র মূর্ত্তির পদের উপর হইতে পড়িয়া গেল না। তখন উভয়ে সিদ্ধান্ত করিলেন, দেবী অর্ঘ্য গ্রহণ করিলেন, কপালকুণ্ডলাকে পথিকের সহিত যাইতে অনুমতি দিলেন। এইবার অধিকারী আর একটি খট্‌কা তুলিলেন। তিনি বলিলেন, অবিবাহিত অবস্থায় গেলে লোকালয়ে বিপদ হইতে পারে। কপালকুণ্ডলা ব্রাহ্মণকন্যা, নবকুমার ব্রাহ্মণ-সন্তান। সুতরাং উভয়ের বিবাহান্তে যাওয়াই সঙ্গত। বিবাহ কি, কপালকুণ্ডলা সবিশেষ জানিতেন না। তাঁহাকে বুঝাইবার জন্য অধিকারী যাহা বলিলেন, তাহার মর্ম্ম "বিবাহ—বিবাহ ছাড়া আর কিছু নয়।" কপালকুণ্ডলা ইহাতেই সব বুঝিলেন মনে করিয়া এক আপত্তি উত্থাপন করিলেন; তিনি বলিলেন, প্রতিপালক কাপালিককে ত্যাগ করিয়া যাইতে তাঁহার মন সরে না। তখন অধিকারী পাকে-প্রকারে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। তান্ত্রিক সাধনের অঙ্গস্বরূপ কোনও দুরভিসন্ধি সাধনের জন্য কাপালিক তাঁহাকে এত দিন প্রতিপালন করিয়াছেন। কপালকুণ্ডলা এ সকল কথায়ও কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু তাঁহার মনে বড় ভয় হইল; সুতরাং "বি-বা-হে" সম্মত হইলেন।

কপালকুণ্ডলাকে সম্মতা করিয়া ঘটক ঠাকুর নবকুমারের নিকট গেলেন। গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কপালকুণ্ডলা তাঁহার প্রাণরক্ষা করিতে গিয়া নিজের প্রাণ হারাইতে বসিয়াছে। সুতরাং এই কন্যার প্রাণরক্ষার কোন উপায় তিনি বিবেচনা করিয়াছেন কি? নবকুমার অমনই শয্যা হইতে উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, কন্যার প্রাণরক্ষার জন্য তিনি কাপালিকের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তুত আছেন। অধিকারী উত্তরে বলিলেন, তাহাতে কোন ফল হইবে না। তিনি সঙ্গে করিয়া লইয়া না গেলে কন্যার প্রাণরক্ষার কোন উপায় নাই। নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে লইয়া গিয়া আত্মপরিবারস্থ করিয়া রাখিতে সম্মত হইলেন। অধিকারী আপত্তি করিলেন, যদি অন্য সঙ্গী না লইয়া তাঁহাদের মত যুবক-যুবতী ১৫ দিনের পথ একত্র যায়েন, তবে লোকে অপবাদ ঘোষণা করিবে এবং তিনি নিজেও এক জন অজ্ঞাতচরিত্র যুবকের সহিত কপালকুণ্ডলাকে একাকিনী দূরদেশে পাঠাইতে প্রস্তুত নহেন। নবকুমার বলিলেন, "আপনি সঙ্গে আসুন।" কিন্তু ভবানীর পূজা ফেলিয়া অধিকারীর পক্ষে যাওয়া সম্ভব ছিল না, সুতরাং প্রস্তাব করিলেন, নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে বিবাহ করিয়া সঙ্গে লইয়া যাউন। প্রস্তাব শুনিয়া—

"নবকুমার শয্যা হইতে দাঁড়াইয়া উঠিলেন। অতি দ্রুতপদবিক্ষেপে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কোন উত্তর করিলেন না।" (১।৮)

কিয়ৎক্ষণ পরে অধিকারী বিদায় লইলেন। পরদিন "প্রাতে অধিকারী নবকুমারের নিকট আসিলেন, দেখিলেন, এখনও নবকুমার শয়ন করেন নাই। জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এখন কি কর্ত্তব্য'?"

নবকুমার কহিলেন, "আজ হইতে কপালকুণ্ডলা আমার ধর্ম্মপত্নী। ইহার জন্য সংসার ত্যাগ করিতে হয়, তাহা করিব। কে কন্যা সম্প্রদান করিবে?" তাহার পর—"গোধুলিলগ্নে নবকুমারের সহিত কাপালিক-পালিতা সন্ন্যাসিনীর বিবাহ হইল।"

"যাত্রাকালে কপালকুণ্ডলা কালী-প্রণামার্থে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া, পুষ্পপাত্র হইতে একটি অভিন্ন বিল্বপত্র প্রতিমার পাদোপরি স্থাপিত করিয়া তৎপ্রতি নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন। পত্রটি পড়িয়া গেল।

"কপালকুণ্ডলা নিতান্ত ভক্তিপরায়ণা। বিল্বদল প্রতিমা-চরণচ্যুত হইল দেখিয়া ভীত হইলেন এবং অধিকারীকে সংবাদ দিলেন। অধিকারীও বিষণ্ণ হইলেন। কহিলেন, "এখন নিরুপায়। এখন পতিমাত্র তোমার ধর্ম্ম। পতি শ্মশানে গেলে তোমাকে সঙ্গে সঙ্গে যাইতে হইবে। অতএব নিঃশব্দে চল।" (১।৯)

কালীপ্রতিমা কপালকুণ্ডলার কাছে জাগ্রত দেবতা। যখন সেই প্রতিমার চরণ হইতে তাঁহার প্রদত্ত বিল্বপত্র পড়িয়া গেল, তখন কপালকুণ্ডলা বুঝিলেন, ভগবতী তাঁহাকে স্বামীর সঙ্গে যাইতে নিষেধ করিতেছেন। তথাপি যে গেলেন, তাহার কারণ, তাঁহার ভক্তিমার্গের শিক্ষাগুরু অধিকারী তাঁহাকে যাইতে আদেশ দিলেন। যাইতে যাইতে একান্ত ভগবতী-ভক্তিপরায়ণা কপালকুণ্ডলা

নিশ্চয়ই ভাবিতে লাগিলেন, যেখানে যাওয়া উচিত নয়, সেইখানেই যাইতেছি।

কপালকুণ্ডলা দয়ার বশবর্ত্তিনী হইয়া নবকুমারের কণ্ঠলগ্না হইয়াছিলেন; নবকুমার দায়ে পড়িয়া তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। পাণিগ্রহণ করিবার পর অবশ্য নবকুমার সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন, কি অমূল্য রমণী-রত্ন তিনি কুড়াইয়া পাইয়াছেন। তাঁহার হৃদয় অনুরাগ-রসে পরিপ্লাবিত হইয়াছিল। কিন্তু কপালকুণ্ডলা যদি গৃহে এবং পল্লীসমাজে সাদরে গৃহীতা না হয়েন, তবে কি দশা হইবে, এই আশঙ্কায় সংযমী ব্রাহ্মণ অনুরাগ-সাগরে তরঙ্গ উঠিতে দেন নাই। "পাণিগ্রহণ করিয়াও গৃহাগমন পর্য্যন্ত বারেকমাত্র কপালকুণ্ডলার সহিত প্রণয়-সম্ভাষণ করেন নাই।" করিলে বোধ হয় ভাল হইত। কালীপ্রতিমার চরণ হইতে বিল্বপত্র-বিচ্যুতির কথা কপালকুণ্ডলার হৃদয়ে দৃঢ়বদ্ধ হইবার অবকাশ পাইত না। কিন্তু নবকুমার সে পাত্র ছিলেন না।

নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে লইয়া গৃহে ফিরিলেন, তাঁহাদিগকে দেখিয়া সকলেই আহ্লাদে অন্ধ হইল। নবকুমারের মাতা মহা সমাদরে বধূবরণ করিয়া গৃহে লইলেন। তখন নবকুমারের প্রণয়-সিন্ধু উছলিয়া উঠিল। "আর কপালকুণ্ডলা? তাঁহার কি ভাব?"

দুঃখের বিষয়, নবকুমারের উচ্ছ্বসিত প্রণয়-তরঙ্গ কপালকুণ্ডলার হৃদয় স্পর্শ করিতে পারিল না। কারণ, কপালকুণ্ডলার হৃদয় ভবানীর চরণচ্যুত অচ্ছিন্ন বিল্বপত্রে 'আচ্ছাদিত ছিল। নবকুমারের প্রণয়সিন্ধু শত তরঙ্গ তুলিয়াও সে মরমে পশিতে পারিল না। ননদী শ্যামাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন, কপালকুণ্ডলা কত দিন যোগিনী থাকিবেন, কবে গৃহিণী হইবেন? কপালকুণ্ডলা উত্তরে জিজ্ঞাসা করিলেন, গৃহিণী হইয়া বা জননী হইয়া সুখ কি? শ্যামাসুন্দরী প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "আচ্ছা, তাই যদি না হইল, —তবে শুনি দেখি তোমার সুখ কি?"

মৃন্ময়ী ( কপালকুণ্ডলা ) কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন, "বলিতে পারি না। বোধ করি, সমুদ্রতীরে সেই বনে বনে বেড়াইতে পারিলে আমার সুখ জন্মে।" "বলিতে পারি না", এই কয়টি কথাতে কপালকুণ্ডলার মনের প্রকৃত ভাব সূচিত হইয়াছিল। কপালকুণ্ডলা সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন। তার পর শ্যামাসুন্দরী বিশেষ পীড়াপীড়ি করায় কপালকুণ্ডলা মনের কথা এই ভাবে খুলিয়া বলিলেন—

"শুন। যে দিন স্বামীর সহিত যাত্রা করি, যাত্রাকালে আমি ভবানীর পায়ে ত্রিপত্র দিতে গেলাম। আমি মা'র পাদপদ্মে ত্রিপত্র না দিয়া কোন কর্ম্ম করিতাম না। যদি অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিত, তবে ত্রিপত্র পড়িয়া যাইত। অপরিচিত ব্যক্তির সহিত অজ্ঞাত দেশে আসিতে শঙ্কা হইতে লাগিল, ভাল মন্দ জানিতে মা'র কাছে গেলাম। ত্রিপত্র মা ধারণ করিলেন না, অতএব কপালে কি আছে, জানি না।" ( ২।৬ )

এই কথা শুনিয়া শ্যামাসুন্দরী শিহরিয়া উঠিলেন। আমরাও যেন শিহরিয়া উঠি। অহেতুক বিশ্বাসের বশবর্ত্তিনী হইয়া কপালকুণ্ডলা সুখের আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, কপালকুণ্ডলা যেন নিজের সুখের আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু মন দিয়া স্বামীকে সুখী করিবার চেষ্টা করিতে ক্ষতি ছিল কি? কপালকুণ্ডলা সে চেষ্টা না করিয়া অন্যায় করেন নাই কি? কবি এরূপ চরিত্র অঙ্কিত করিয়া স্ত্রীধর্ম্মের অবমাননা করেন নাই কি? বঙ্কিমচন্দ্র যদি দেবী চৌধুরাণীর মত কপালকুণ্ডলাকে আর একটু পোষ মানাইতেন, তবে বড় সুন্দর হইত। হয় ত কাহারও কাহারও কাছে সুন্দর হইত; কিন্তু তাহাতে বালিয়াড়ির এবং কাপালিক ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা হইত কি?

আর এক কথা। কপালকুণ্ডলার ভাগ্যে পোষ মানিবার অবকাশই বা জুটিল কৈ। শ্যামাসুন্দরীর সহিত কপালকুণ্ডলার যে কথোপকথন উপরে উদ্ধৃত হইল, তাহা স্বামিগৃহে আসিবার অনতিকাল পরে। তার পর এক বৎসরমাত্র চলিয়া গিয়াছে। যোগিনী বহিরঙ্গে গৃহিণী সাজিয়াছেন। শ্যামাসুন্দরীর উপকারার্থ রাত্রিকালে বনে ঔষধ আনিতে হইবে। কপালকুণ্ডলা ঔষধ আনিতে না গিয়া পারিলেন না। স্বামীর নিষেধ মানিলেন না। বনমধ্যে ব্রাহ্মণবেশী লুৎফ-উন্নিসার সহিত সাক্ষাৎ হইল। ব্রাহ্মণবেশীর অনুরোধমত তাঁহার কথা শুনিবার জন্য সেখানে অনেকক্ষণ প্রতীক্ষা করিলেন এবং অনেকক্ষণ পরেও ব্রাহ্মণবেশী ফিরিল না দেখিয়া গৃহে

ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু শয়নাগারে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সেখানে নবকুমার নাই। তার পর প্রভাতে অপ্রগাঢ় ঘুমঘোরে ভীষণ স্বপ্ন দেখিলেন। দেখিলেন, তিনি যেন প্রবল ঝটিকা-বিক্ষোভিত সাগরমধ্যে নৌকায় আরোহণ করিয়া আছেন। কাপালিক সেই নৌকা ধরিয়া ডুবাইতে চাহিতেছে; ব্রাহ্মণবেশধারী নৌকা ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে, "তোমায় রাখি কি নিমগ্ন করি?" কপালকুণ্ডলা বলিয়া ফেলিলেন, "নিমগ্ন কর।" নৌকাও তাঁহাকে জলে নিক্ষিপ্ত করিয়া পাতালে প্রবেশ করিল। (৪।৩) কপালকুণ্ডলার তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। এমন সময় ব্রাহ্মণবেশীর একখানি চিঠি হাতে পড়িল। কপালকুণ্ডলা চিঠি পাঠ করিয়া জানিলেন, ব্রাহ্মণবেশী আবার তাঁহাকে সন্ধ্যার পরে গিয়া সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। সারাদিন কপালকুণ্ডলা চিন্তা করিলেন, তিনি ব্রাহ্মণবেশীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন কি না, শেষে স্বপ্নের কথা স্মরণ করিয়া যাওয়াই স্থির করিলেন। কারণ, পূর্ব্ব-রাত্রির ঘটনার সহিত স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনার ঐক্য দেখিতে পাইলেন। নিবিড় বনে ভগ্নগৃহে কাপালিক ও ব্রাহ্মণবেশীর মধ্যে তাঁহার মৃত্যুর কথোপকথন হইতেছিল; ব্রাহ্মণবেশী ত তাঁহাকে বাঁচাইতেই চাহিতেছিলেন। এখনও কপালকুণ্ডলার মরিবার ইচ্ছা [illegible] নাই, বাঁচিবার সাধই প্রবল, আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে গিয়াই কপালকুণ্ডলা পতঙ্গের মত অগ্নিতে ঝাঁপ দিলেন এবং বাঁচিয়া গৃহধর্ম্মপালনের ইচ্ছাই প্রবল। কিন্তু আপনার প্রাণ বাঁচাইবার চেষ্টা করিতে গিয়া কপালকুণ্ডলা মৃত্যুর সম্মুখীন হইলেন। কপালকুণ্ডলা স্বপ্নে বলিয়া ফেলিয়াছিলেন, "নিমগ্ন কর।" জাগ্রৎ অবস্থায়ও কি সেইরূপ বলিলেন? না—না—ভক্তবৎসলা ভবানী অনুগ্রহ করিয়া স্বপ্নে তাঁহার রক্ষা হেতু উপদেশ দিয়াছেন, তাঁহাকে উদ্ধার করিতে চাহিতেছেন; ব্রাহ্মণবেশীর সাহায্য ত্যাগ করিলে নিমগ্ন হইতে হইবে। অতএব কপালকুণ্ডলা ব্রাহ্মণবেশীর সহিত সাক্ষাৎ করাই স্থির করিলেন। অন্যে এই অবস্থায় স্বামীর পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিত। কিন্তু ভগবতী-পরায়ণা কপালকুণ্ডলা স্বপ্নে ভগবতীর উপদেশ বলিয়া গ্রহণ করিলেন, সুতরাং পতির সহিত পরামর্শের কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া বুঝিতে পারিলেন না। পতঙ্গ অগ্নির দিকে অগ্রসর হইল।

সন্ধ্যার পর কপালকুণ্ডলা বনে গেলেন; ব্রাহ্মণবেশীর সাক্ষাৎ পাইলেন, তাঁহার পরিচয়ও পাইলেন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি ভীষণ সংবাদ শুনিলেন। কাপালিকের স্বপ্নের কথা শুনিলেন। শুনিলেন, মা ভবানী কাপালিককে স্বপ্নে আদেশ করিয়াছেন, "সেই কপালকুণ্ডলাকে আমার নিকট বলি দিবে।" "স্বপ্ন শুনিয়া কপালকুণ্ডলা চমকিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, চিত্তমধ্যে বিদ্যুচ্চঞ্চলা হইলেন।" এরূপ চমকিয়া, শিহরিয়া উঠিবার কারণ, কপালকুণ্ডলা কাপালিকের স্বপ্ন-কথা নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করিলেন। কাপালিক যে ভবানীর আজ্ঞা প্রতিপালন করিবার জন্য এই বনে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছেন, এই সংবাদ দিয়া ব্রাহ্মণবেশী লুৎফ-উন্নিসা কপালকুণ্ডলার নিকট স্বামী নবকুমারকে ফেরত চাহিলেন। প্রথমতঃ কপালকুণ্ডলা আপত্তি করিলেন, "স্বামী ত্যাগ করিয়া কোথায় যাইব?" কিন্তু "অন্তঃকরণমধ্যে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন, তথায় ত নবকুমারকে দেখিতে পাইলেন না, তবে কেন লুৎফ-উন্নিসার সুখের পথ রোধ করিবেন?" তাই অসঙ্কোচে স্বামী ফেরত দিতে সম্মতা হইয়া সপত্নীর নিকট বিদায় লইয়া—

"কপালকুণ্ডলা ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে চলিলেন। লুৎফ-উন্নিসার সংবাদে কপালকুণ্ডলার একেবারে চিত্তভাব পরিবর্ত্তিত হইল; তিনি আত্মবিসর্জ্জনে প্রস্তুত হইলেন।" আত্মবিসর্জ্জনে প্রস্তুত হইয়াছিলেন বলিয়া কপালকুণ্ডলা অন্তঃকরণে নবকুমারকে দেখিতে পান নাই। আত্মজনের বিসর্জ্জন না দিয়া কেহ আত্মবিসর্জ্জনে প্রস্তুত হইতে পারে না। কাপালিকের স্বপ্নাদেশ শুনিবার পর কপালকুণ্ডলা নিজের অন্তঃকরণে নবকুমারকে দেখিতে পান নাই বলিয়া যে উহার পূর্ব্বে সেই অন্তঃকরণে নবকুমারের কোন স্থান ছিল না, এমন অনুমান সঙ্গত বোধ হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—

> কপালকুণ্ডলা অন্তঃকণ সম্বন্ধে তান্ত্রিকের সন্তান; …কপালকুণ্ডলা যে কাপালিকের ন্যায় অনন্তচিত্ত হইয়া শক্তিপ্রসাদপ্রার্থিনী হইয়াছিলেন, তাহা নহে; তথাপি অহর্নিশ শক্তিভক্তি শ্রবণ, দর্শন ও সাধনে তাঁহার মনে কালিকানুরাগ বিশিষ্ট প্রকারে জন্মিয়াছিল। ভৈরবী যে

সৃষ্টিশাসনকর্ত্রী, মুক্তিদাত্রী, ইহা বিশেষমতে প্রতীত হইয়াছিল। এখন সেই বিশ্বশাসনকর্ত্রী, সুখদুঃখবিধায়িনী, কৈবল্যদায়িনী ভৈরবী স্বপ্নে তাঁহার জীবনসমর্পণ আদেশ করিয়াছেন। কেনই বা কপালকুণ্ডলা সে আদেশ পালন না করিবেন ?……

কপালকুণ্ডলা আপন চিত্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেনই এই শরীর জগদীশ্বরীর চরণে সমর্পণ না করিব ? পঞ্চভূত লইয়া কি হইবে ?" ( ৪।৮ )

এই প্রকার চিন্তায় ভারাক্রান্ত চিত্তে চলিতে চলিতে কপালকুণ্ডলা আকাশবাণী শুনিলেন, "বৎসে, আমি পথ দেখাইতেছি।" চকিতের ন্যায় উর্দ্ধদিকে চাহিয়া দেখিলেন, "যেন ভৈরবী দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া কপালকুণ্ডলাকে ডাকিতেছেন। কপালকুণ্ডলা উর্দ্ধমুখী হইয়া চলিলেন।" ভৈরবী আকাশপথে তাঁহার অগ্রে অগ্রে চলিলেন। কপালকুণ্ডলা তাঁহার দিকে চাহিয়া চলিলেন। এমন সময় ভীমনাদে নবকুমার কর্ত্তৃক উচ্চারিত 'কপালকুণ্ডলা !' ধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। কপালকুণ্ডলা নবকুমার কর্ত্তৃক শ্মশানে কাপালিকের পূজাস্থানে নীত হইলেন। কাপালিকের পূজা শেষ হইল। তখন তাঁহার আদেশমত নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে স্নান করাইতে চলিলেন। যাইতে যাইতে পথে নবকুমারের মদের নেশা ছুটিতে লাগিল, আবার কপালকুণ্ডলার চিত্তও নবকুমারের অবস্থা দেখিয়া দ্রব হইতে লাগিল। শেষে নবকুমার কপালকুণ্ডলার পদতলে লুটাইয়া বলিলেন, "একবার বল যে, তুমি অবিশ্বাসিনী নও—একবার বল, আমি তোমায় হৃদয়ে তুলিয়া গৃহে লইয়া যাই।" কপালকুণ্ডলা প্রকৃত কথা প্রকাশ করিয়া উপসংহার করিলেন, "কিন্তু আমি আর গৃহে যাইব না। ভবানীর চরণে দেহ বিসর্জ্জন করিতে আসিয়াছি—নিশ্চিত তাহা করিব।" তখন তটাভিঘাতী গঙ্গাতরঙ্গ আসিয়া বালিয়াড়ির সেই বনফুল মায়ের পদে অর্পণ করিবার জন্য তুলিয়া লইয়া গেল। ভক্তির জয় হইল।

সমাজের অঙ্কে, পরিবারের অঙ্কে প্রতিপালিতা যুবতীর হৃদয়ে এরূপ সকল প্রকার সংশয়রহিত ভক্তিবিশ্বাসের উদয় সম্ভব নহে। নির্জ্জনে বালিয়াড়ির মধ্যস্থ বনে নির্ম্মম কাপালিকের দ্বারা প্রতিপালিতা হইয়াছিলেন বলিয়াই কপালকুণ্ডলার হৃদয়ে এমন অহেতুকী ভক্তি-বিশ্বাস বিকশিত হইবার অবকাশ পাইয়াছিল ; দেবীর পদধৃত অচ্ছিন্ন বিল্বপত্রের আবরণ সেই ভক্তি-বিশ্বাসকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। তাহার পর যখন মা স্বয়ং ডাকিলেন, তখন আর বাধা দিবে কে ? নবকুমার চরণে লুটাইয়া বাধা দিতে উদ্যত হইলেন। কপালকুণ্ডলার পক্ষে ঘোর সমস্যা উপস্থিত হইল। এমন সময় তটাভিঘাতী গঙ্গাতরঙ্গ এই সমস্যার সমাধা করিয়া ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করিল। ভগবতী চরণ হইতে বিল্বপত্র ফেলিয়া দিয়া স্বপ্নযোগে কাপালিককে কপালকুণ্ডলার বলিদানের আদেশ দিয়া এবং অবশেষে আকাশপথে স্বয়ং আবির্ভূতা হইয়া হাত তুলিয়া মরণের পথ দেখাইয়া দিয়া, কপালকুণ্ডলার পক্ষে ভগবতীভক্তির সহিত পতিভক্তির সামঞ্জস্যসাধন অসাধ্য করিয়া তুলিয়াছিলেন। কপালকুণ্ডলা অন্ধ বিশ্বাসের অথবা বিচারবুদ্ধি-বিহীন, সংশয়শূন্য অহেতুকী ভক্তির সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি।

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ।

# প্রত্যাবর্ত্তন

কত দিন পরে আজ এসেছ ফিরে !
গিয়েছিলে অভিমানে সে দিন ব্যাকুল সাঁঝে,
একেলা ফেলিয়া মোরে আকুল বাদল-মাঝে,
এখন সে রাগ বঁধু, পড়েছে কি রে ?

দেখনি ব্যথায় মোর ম্লান হয়ে গেল মুখ,
বিপুল বেদনাবশে কাঁপিতে লাগিল বুক,
কাঁদন বাঁধন হারা নয়ন-নীরে !

তোমার তরণী গেল মিলায়ে জলের সাথ,
মিলায়ে আসিল আলো, ঘনায়ে আসিল রাত,
আঁধারে কাঁদিতে র'নু জলধি-তীরে !

তোমার সে অভিমানে গেল মোর যত সুখ,
বড় জ্বালা যাতনায় ভরে গেল ভাঙা বুক,
মরণ সকল জ্বালা জুড়া'ত ধীরে !
কেন আর এত দিনে আসিলে ফিরে ?

শ্রীরামেন্দু দত্ত।

# নারী মন্দির

## শিল্প-মঞ্জরী

**গোল গলা সেমিজ**—( Round Collar Chemise ) রকমারী সেমিজের মধ্যে এইটির টাইট ফিটিং সেমিজের ন্যায় ব্যবহার চলে। এই সেমিজে গলার অংশে ও মোহোড়ার অংশে সরু চিকণ বসাইয়া নীচের অংশে ৩" বা ৪" ইঞ্চি চওড়া চিকণ বসাইলে বেশ সুন্দর দেখায়।

**সরঞ্জাম**—(Materials) কাপড় ৮'লম্বা ২½ গজ।

**সেমিজের মাপ**—লম্বা ৪৫" ছাতি ৩২" কোমর ২৮" সেন্ত ১৪" পুট ৬½"।

**সেমিজ কাটিবার প্রণালী**—যে কাপড়ের সেমিজ হইবে, কাপড়কে এড়োয় ডবল ভাঁজ করিয়া লম্বা মাপে ডবল ভাঁজ করিতে হইবে। এইটি লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, এড়ো কাপড় ভাঁজ ছাতির মাপের অর্দ্ধেক হওয়া চাই ( মনে কর খ, ঠ ছাতির মাপের অর্দ্ধেক ১৬" ইঞ্চি ) চিত্র দাগিবার প্রণালী ক, খ লম্বা মাপ ৪৫" ক বিন্দু হইতে ছাতির ¼ অংশ ৮" —১½" ইঞ্চি ৬½" ইঞ্চি স্থানে গ বিন্দু চিহ্ন করিয়া গ বিন্দু হইতে ১½" ইঞ্চি নীচে ঘ বিন্দু চিহ্ন করিতে হইবে। ক বিন্দু চ বিন্দু সেন্ত ১৪" ইঞ্চি স্থানে চিহ্ন করিয়া গ ও ঘ বিন্দু হইতে ছাতির ¼ অংশ ৮" + ১½" = ৯½" ইঞ্চি স্থানে ছ ও জ বিন্দু চিহ্ন করিয়া গ, ছ ও ঘ, জ সম লাইনে টানিতে হইবে। চ বিন্দু হইতে কোমরের মাপের ¼ অংশ ৭" + ১½" = ৮½" ইঞ্চি ঝ বিন্দু চিহ্ন করিয়া ছ, জ ও ঝ বিন্দু সংযোগ করিয়া খ বিন্দু ছাতির মাপের ½ অংশ ১৬" ইঞ্চি স্থানে চিহ্ন করিয়া খ লাইন হইতে ১" ইঞ্চি উপরে ঠ বিন্দু চিহ্ন করিতে হইবে। ঝ, ঠ চিত্রানুযায়ী সংযোগ করিয়া লইতে হইবে। এখন ক বিন্দু হইতে ট বিন্দু পুট মাপ ট বিন্দু হইতে ঢ বিন্দু নিম্নদিকে সোজা টানিয়া গ লাইনে সংযোগ করিয়া ট ও ছ চিত্রানুযায়ী দাগিতে হইবে। কাঁধের অংশ জোড়া থাকিবে। গলার অংশ কাটিতে হইলে ছাতির ⅙ অংশ

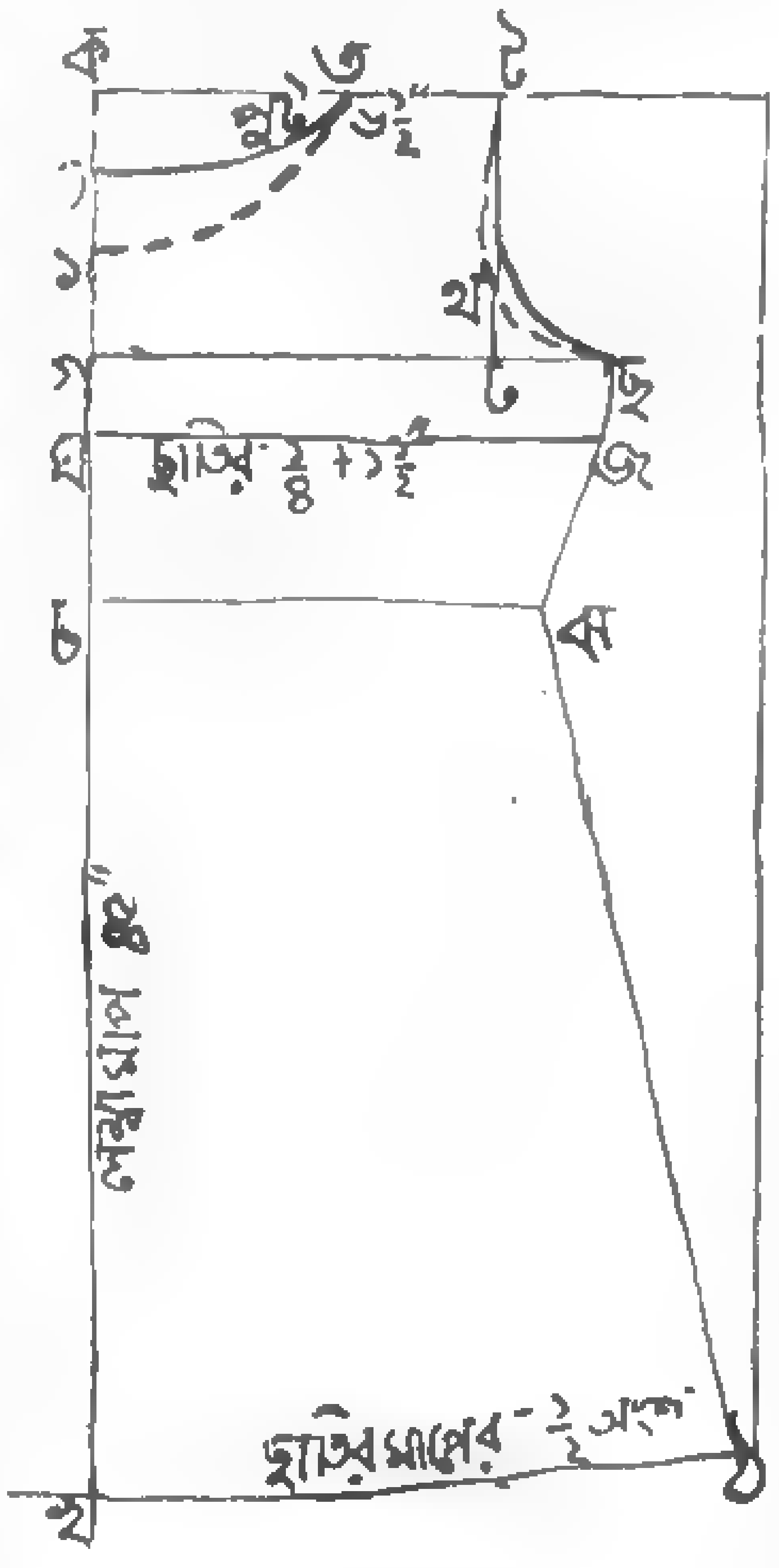

১নং চিত্র

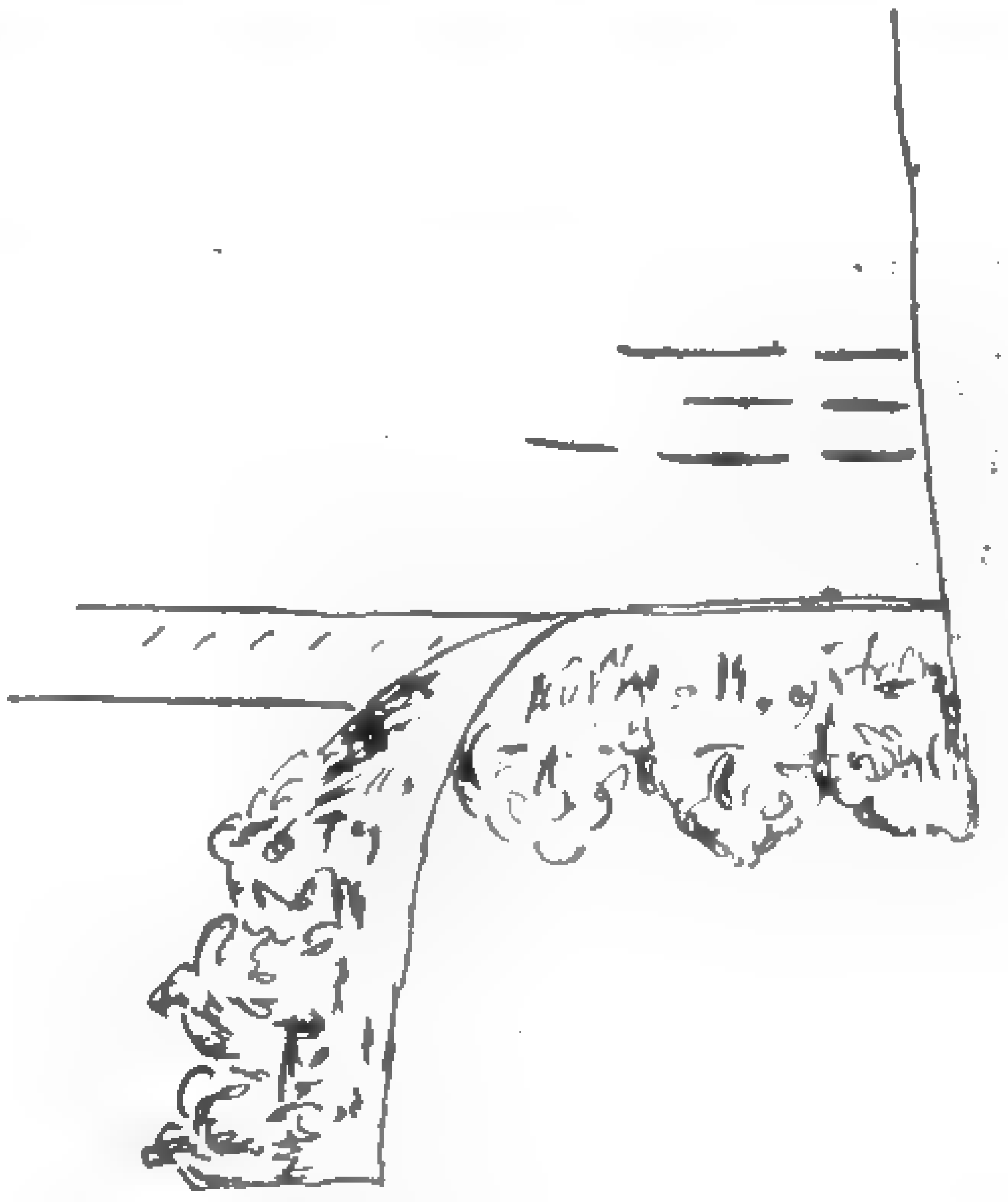

২নং চিত্র

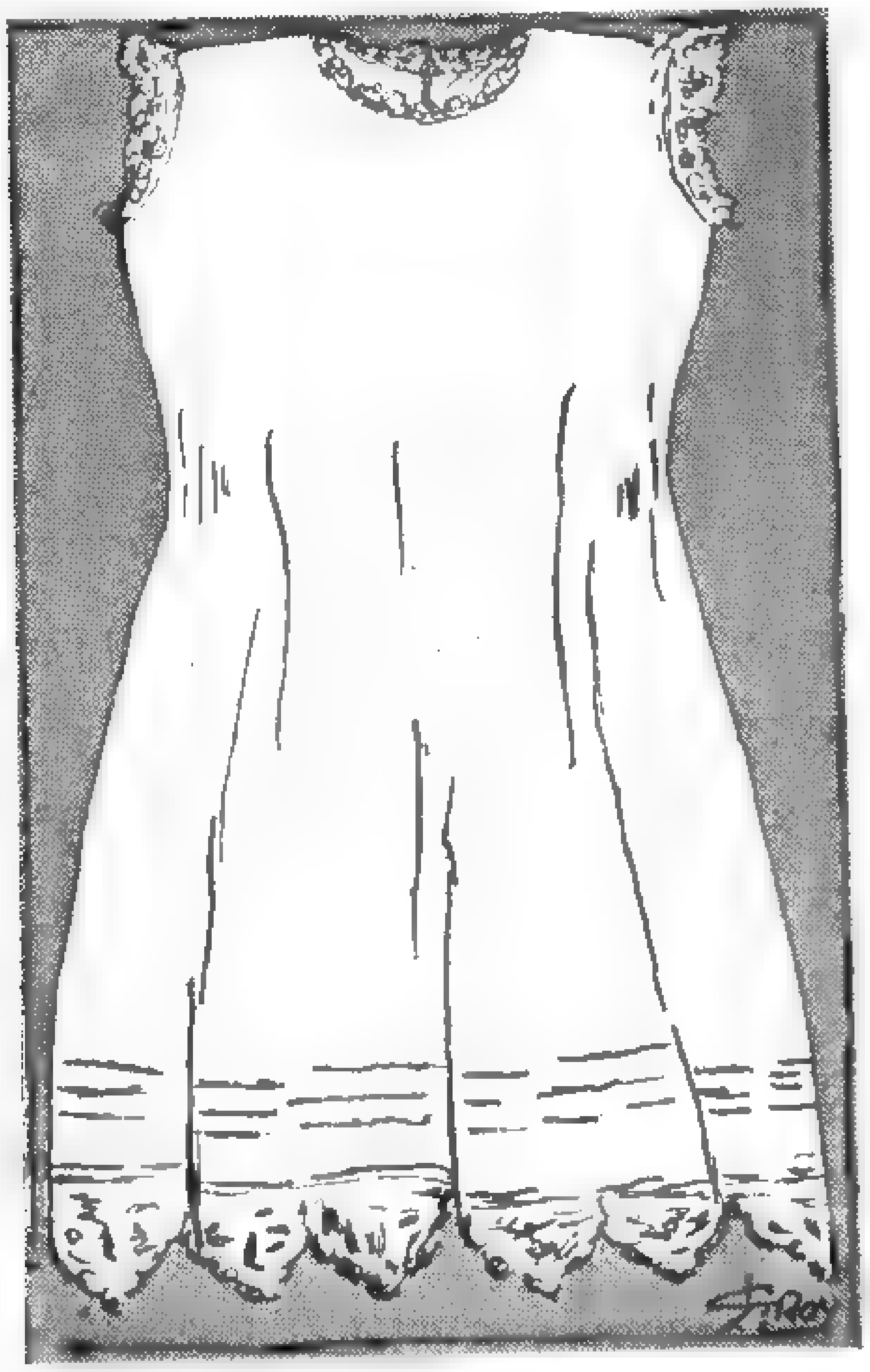

৩নং চিত্র

ত বিন্দু চিহ্ন করিয়া ক বিন্দু হইতে ড বিন্দু ১২″ ইঞ্চি নীচে ত, ড চিত্রানুযায়ী দাগিয়া লইতে হইবে। এখন ত, ড দাগে গলার অংশ কাটিয়া ট, ছ, জ, ঝ, ঠ, ঙ, থ দাগে কাটিয়া লইলে পেছনকার অংশ সম্পূর্ণ কাটা হইল। সাম্‌নের অংশ কাটিতে হইলে উপরের দু'হাত ভাঁজ করা কাপড় লইয়া সাম্‌নের অংশ কাটিতে হইবে। ড বিন্দু হইতে আরও ১২″ ইঞ্চি নীচে ১ বিন্দু চিহ্ন করিয়া ত, ১ বিন্দু চিত্রানুযায়ী সংযোগ করিয়া ত ১ বিন্দু দাগে কাটিয়া মোহোড়ার অংশে ট বিন্দু হইতে থ বিন্দু ১″ ইঞ্চি ভিতরে ছ বিন্দু পর্য্যন্ত চিত্রের ন্যায় দাগিয়া দাগে কাটিয়া লইলে সাম্‌নের অংশ কাটা শেষ হইল।

**সেমিজ সেলাই**—এ সেমিজের পেছনের দিকে বোতাম বুটী ও বোতাম ঘর বসাইতে হইবে। সেস্ত পর্য্যন্ত গলার অংশ হইতে সোজা লাইনে কাটিতে হয়। বোতাম বুটী ও বোতাম ঘরের পটী বসাইয়া গলায় সরু চিকণ বসাইয়া লইয়া মোহোড়ার অংশে চিকণ বসাইয়া লইতে হয়। সেমিজের নীচের অংশে ৩″ বা ৪″ ইঞ্চি চওড়া চিকণ বসাইয়া কলের বকেয়া দিয়া দু' দিকের পাশ সেলাই করিয়া সেমিজের মাপ হইতে অর্থাৎ ৪৫″ ইঞ্চি মাপ হইতে যে কয় ইঞ্চি লম্বা মাপ আছে, তাহাতে চিকণ যেখান হইতে বসান হইয়াছে, তাহার ২২″ ইঞ্চি উপরে তিনটি সরু লাইনে প্লেট সেলাই করিয়া লইতে হইবে। এখন পশ্চাদ্ভাগে বোতাম-পটী ও বোতাম-ঘর পটী বসান হইয়াছে, তাহাতে ৪টি বোতাম-ঘর করিয়া বোতাম-পটীতে সমস্থানে বোতাম বসাইয়া লইলে "গোল গলা সেমিজ" সেলাই সম্পূর্ণ হইল।

শিল্পী—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

# গুরু

ভ্রান্ত আজি কোথা যাও দেশ-দেশান্তরে—
অতৃপ্ত হৃদয়-মাঝে অশান্তির বোঝা,
সংশয়শৈবালদাম রাখিয়া অন্তরে
পর্ব্বতে কন্দরে তব মিথ্যা গুরু খোঁজা।

কুটিল তর্কের জালে পণ্ডিত সজ্জনে
ঘিরিতে বাসনা তব পাণ্ডিত্যের বলে,
অজ্ঞান বোঝ না তুমি গর্ব্ব-স্ফীত মনে
আপনি পড়েছ বাঁধা আপনার জালে।

যে অস্ত্রে বুঝিতে চাহ শক্তি অপরের
সে আয়ুধ করে তব ঘোর অপকার।
পতঙ্গ রচিয়া গৃহ সূক্ষ্ম রেশমের
বন্দী রহে সেই ব্যূহে—মুক্তি কোথা তার!

গম্ভীর শাস্ত্রের সূক্ত উচ্চারণ করি'
পরীক্ষা করিতে যদি যাও গুরুজনে,
গুরুর চরণ আশা মূলে লয় করি'
নিষ্কাম নিস্তব্ধ থেক নিজ গৃহ-কোণে।

শুদ্ধচিত্তে অহঙ্কার তমোনাশ করি'
যাহার চরণে কর আত্ম-সমর্পণ,
ইষ্ট জ্ঞানে যারে লহ যুক্তি পরিহরি'
উৎসর্গ করিবে যারে চিত্ত হৃদি মন।

আপন হৃদয় হ'তে হৃদয় যাহার—
যাহার অন্তর তব সর্ব্বসুখাধার,
তাহার চরণে কর কোটি নমস্কার
সে জন তোমার গুরু সর্ব্বশাস্ত্র সার!

শ্রীনরেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

# ছানাবাড়ী

## ৩২

নিতাই এতক্ষণ তীক্ষ্নদৃষ্টিতে আড়ে আড়ে আমার দিকে দেখিতেছিল। এখন বলিল, "এজ্ঞে, ও বাড়ীতে মই-সিঁড়ি লাগালে পরে, যাওয়া যেতে পারে। আপনিও বোধ হয় ঐ রকমে ও বাড়ীর ছাতে উঠে, তার পর এ বাড়ীর পায়খানার ছাতে এসেছিলেন ? কিন্তু এ দিক্ হ'তে কেউ কখনও সে রকম উপায়ে ও বাড়ীতে নেমেছিল কি না, তা আমি জানি নে। তবে, এক দিন এক জন লোক আমাদের আজনার ঐ কেঠো সিঁড়ি বেয়ে, পায়খানার ছাতে উঠবের লেগে যোগাড় করতেছিল, তা' আমি দেখেছিলেম।"

আমি ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে সে লোক ?"

"সেই চীনা সাহেব।"

"চীনা সাহেব আবার কে ?"

"ঐ যে স্থাস্-ম্যামের সাথে, পালওয়ানী গোঁফওলা সাহেব আস্ত, সে।"

আমি গোঁসাইজীর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "স্থাস্-ম্যামটা কি বস্তু, তা' আমি ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না।"

গোঁসাইজী বলিলেন, "ও বেটার যেমন কথার ভঙ্গী ! বেটা ভদ্রঘরের মেয়েকে বলে কি না স্থাস্-ম্যাম ! স্মৃতিরত্নের কাছে যে স্ত্রীলোকটি মাঝে মাঝে আস্ত, আপনাকে বলেছি, সে যেমন নব্য-ধরণের পোষাক প'রে আস্ত, আমাদের দেশী 'নার্স' ও ধাইরাও ঐ ধরণেই পোষাক প'রে বেড়ায় না ? তাই ও বেটা ঐ রকম পোষাক-পরা সব মেয়েদেরই 'নার্স-মেম' বলে।"

আমি পুনরায় নিতাইকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "সে চীনা সাহেব কবে ঐ রকমে ওঠবার যোগাড় কচ্ছিল, তা' তোর মনে আছে ?"

"হেঁ ! ও বাড়ীতে যে দিন খুন হয়, তার আগের দিন সাঁঝের পরে ;—এই তখন আন্দাদ রাত সাড়ে ৮টা হবে। আমি ঘরের কায সেরে, ( গোঁসাইজীকে ইঙ্গিতে দেখাইয়া ) এনাকে তামুক সেজে দিয়ে, পায়খানা যাবার লেগে আজনার খিড়কীর দিকে এস্তেছিলেম,—তখন দেখলেম, ঐ সিঁড়ি ধ'রে সাহেব উঠতে লেগেছে। আমার সাড়া পেয়ে ঝাঁ ক'রে নেমে প'ড়ে খিড়কীর কপাট খুলে গলি দিয়ে পেইলে গেল।"

"তার সঙ্গে সেই মেমও ছিল কি ?"

"এজ্ঞে না ; সে একেলাই ছিল। সে পেইলে যাবার পর ম্যামও ঐ গলি দিয়ে বা'র হয়ে চ'লে গেল।"

"তারা এসেছিলও কি ঐ পথ দিয়ে ?"

"না ; সদর খোলা থাক্‌লে, তানারা সদর দিয়ে আস্ত। যাবার কালে বুড়ো ওনাদেরকে ঐ গলি দিয়ে বার ক'রে দিত।"

"তারা কি প্রায়ই আস্ত ?"

"না ; মোট আন্দাদ ৫।৭ বার এসেছিল।"

"শেষ কবে এসেছিল ?"

"ঐ সে দিন তেনারা যে চ'লে গেল, তার পরে আর এসে নি। বুড়ো বামুনও তার দু' দিন বাদে ভাড়া চুকিয়ে, ঘর ছেড়ে দিয়ে চ'লে গেল। আমাকে কত বস্‌কিস্ দিবে কয়েছিল, তাহা ত দিলেক না,—কেবল ঐ ছাতাডা রেখে যেয়ে আমারে ফেঁসিয়ে গেল !"

"বক্‌সিস্ দেবে বলেছিল কেন ?"

"ঐ যে সেই রেতের বেলা চীনা সাহেব সিঁড়ি বেয়ে উঠতেছিল, আর আমারে দেখে স'রে পড়লো, না ? সে কথা, স্থাস-ম্যাম চ'লে যাবার পর, বুড়োরে আমি কয়েছিলেম। তখন বুড়ো আমারে ও কথাডা গুম্ খেয়ে যেতে কইলেক ; আর কত মিঠে কথা ক'য়ে আমারে অনেক ট্যাকা দিবে বল্লেক।

"তা' বুড়ো যখন ঘর ছেড়ে দিয়ে চ'লে গেল, তখন তুই বক্‌সিসের টাকা আদায় ক'রে নিলি নি কেন ?"

"আমি কি তাগিদ কর্‌তে ছেড়েছিলেম, বাবু ? তেনার বাস্ক-বিছেনা পর্য্যন্ত এট্‌কে রেখেছিলেম। কিন্তু তেনার ভারি মিঠে বুলি কি না ! আমার হাতে দুটো ট্যাকা দিয়ে, মিঠে কথা ক'য়ে বুঝুলে যে, ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে তেনার হাতের ট্যাকা সব ফুইরে গেল ; তা' ঐ ছাতাডা আমার কাছে থাকুল ; দ্যাস্‌-ম্যাম যে দিন ওডারে নেবার লেগে হেথাকে এস্‌বে, সে দিন তেনার হাতে বুড়ো আমার বস্‌কিসের সব ট্যাকা পেঠিয়ে দিবেক। আমি বুড়োর কথায় ভুলে বোকা ব'নে গেলেম। তার পর যখন কত দিন কেটে গেল, দ্যাস্‌-ম্যামও এলো না, বুড়োও এলো না, তখন বুঝলেম যে, বিট্‌লে বুড়ো আমারে ফাঁকি দিয়ে পেইলেছে।"

"বুড়ো ঐ খুনের পরে হঠাৎ ঘর ছেড়ে দিয়ে চ'লে গেল কেন ?"

উত্তরে গোঁসাইজী বলিলেন, "ভাড়া চুকিয়ে দেবার সময় আমি তাকে সে কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তা'তে সে বল্লে, বাড়ীর পিছনেই ঐ রকম একটা খুনের ব্যাপার হওয়ায় তার বড় ভয় হয়েছে, সেই জন্ত সে আর এখানে থাক্‌তে ইচ্ছা করে না। তাই ঘর ছেড়ে দিলে।"

আচ্ছা, সেই স্ত্রীলোকটি যে আসত, তার পরণের শাড়ীখানা রেশমী কি সাধারণ স্থতী কাপড়ের, তা বল্‌তে পারেন কি ?"

"আমি ঠিক বল্‌তে পারি না। কারণ, আমি তাদের ভাল ক'রে কখনও দেখি নি ; তা' ছাড়া তারা সন্ধ্যার পরে আস্‌ত ব'লে ও সব লক্ষ্য কর্‌বার সুবিধাও হয় নি। তবে আমার বোধ হয়, শেষবারে মেয়েটি একখানা চওড়া পাড়ের ঢাকাই শাড়ী পরেছিল।— কেমন রে, নিতাই ? নয় কি ?"

"এজ্ঞে,— সে ত ঐ একই রকম ডাগর পেড়ের কাপড় প'রে এস্‌তো।"

"মেয়েটিকে দেখতে কেমন, তুই বল্‌তে পারিস্‌ ?"

নিতাই ভ্রূকুটি করিয়া বলিল, "দেখতে আর কেমন, বাবু ? যেমন সবাই হয়, তেম্‌নি। তবে রংডা গোরা ; গায়ে মাসও আছে, কিন্তু মাথায় কিছু খাটো। আর, ম্যাম হ'লে কি হয়,—আমাদের দ্যাশের মেয়ে ত ? একটু লাজ-সরমও ছিল। আমি তেনার মুখের বাগে তাকালে, মাথার কাপড় টেনে মুখ ফিইরে স'রে যেত।"

তাহার পরে দুই জনকেই আরও কয়েকটা প্রশ্ন করিয়া যখন আর বিশেষ কোন নূতন তথ্য জানিতে পারিলাম না, তখন গোঁসাইজীর নিকট বিদায় লইয়া সেখান হইতে চলিয়া আসিলাম। ছাতাটা অবশ্য সঙ্গে আনিতে ভুলি নাই।

## ৩৩

ওকালতীতে নূতন ব্রতীর পক্ষে আমি ইদানীং যেরূপ কাযকর্ম্ম পাইতেছিলাম, তাহা বেশ সন্তোষজনক হইলেও দিন দিন তাহার পরিমাণ আরও বৃদ্ধি হওয়ার আকাঙ্ক্ষা আমার কিছু কমে নাই এবং সপ্তাহে কাযের পরিমাণ যেরূপ হইতেছিল, তাহাতে সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবার যথেষ্ট আশাও পাইতেছিলাম। এমন কি, নিয়ত কাযে ব্যাপৃত থাকায়, সপ্তাহের দিন কয়টা কাটিয়া পুনরায় শনিবার আসিতে যে অযথা বিলম্ব হইতেছে, এরূপ মনে করিবার অবসর পাই নাই,— এ কথা পূর্ব্বে বোধ হয় বলিয়াছি। তথাপি কাযে নিবিষ্ট থাকা সত্ত্বেও শনিবার আসিতে আর কয় দিন বাকী আছে, তাহা যে প্রত্যহই অন্ততঃ একবার করিয়াও গণনা করি নাই,— এ কথা আমি নিঃসংশয়ে বলিতে প্রস্তুত নহি।

আজ শনিবার। প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে মনে এই কথাটাই সর্ব্বাগ্রে জাগিয়া উঠিল এবং সে দিনের জন্ত হাতে যে কয়টা কায ছিল, সে সব সারিয়া বৈকালে ৩টার ট্রেণ ধরিতে পারিব কি না, উৎকণ্ঠিত মনে তাহাই বিবেচনা করিতে করিতে শয্যাত্যাগ করিলাম।

কথাগুলা পড়িয়া হয় ত অনেকে হাসিবেন। অনেকে হয় ত বলিবেন, আমি বড় 'বেহায়া।' যিনি যাহাই বলুন,—আমি কিন্তু তাঁহাদিগকে বেশ দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে, এ বিষয়ে আমার 'নজীরের' অভাব নাই। আমার বেশ মনে আছে যে, পূর্ব্বে যখন 'মেসে' থাকিতাম, তখন সেখানকার নব-পরিণীত বন্ধুগণ শনিবারের প্রত্যাশায় দিন গণনা করিতে করিতে অবশেষে ঐ দিনটা যখন আসিত, তখন সকাল হইতেই তাঁহারা মহা উৎসাহে ব্যাগ গুছাইতে বসিয়া যাইতেন এবং

কলেজ হইতে আর 'মেসে' না ফিরিয়াই যাহাতে সটান শ্বশুরালয় অভিমুখে অভিযান করা যায়, তদনুরূপ ব্যবস্থা করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন।—তবে আপনারা হয় ত আপত্তি করিবেন যে, ও 'নজীর' আমার সম্বন্ধে খাটিতে পারে না; কেন না, আমি এখনও অবিবাহিত। কিন্তু আমার নিবেদন এই যে, উভয় ক্ষেত্রেই অন্তর্নিহিত মূল নীতিটা একই। 'বিবাহিত' বা 'অ-বিবাহিত',—সে কেবল বাহ্য অবস্থার পার্থক্য মাত্র।

যাহা হউক, অনেক চেষ্টা করিয়াও ৩টার ট্রেণ ধরিতে পারিলাম না। নিতাই-প্রদত্ত ছাতা ও আমার ব্যাগ লইয়া যখন "নন্দন-কুঞ্জে" উপস্থিত হইলাম, তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। বিশ্রামান্তে যোগীন বাবুর নিকট শুনিয়া প্রীত হইলাম যে, কাকলীর সে 'গান-মা' আজ দিন-দুই হইল, এখানে আসিয়াছেন।

যোগীন বাবুর নিকট আরও শুনিলাম যে, 'গান-মা'র সহিত কথাবার্ত্তায় জানা গিয়াছে যে, সরস্বতী-পূজার আগের দিন বেলা প্রায় ৪টার সময় যমুনা কলিকাতা হইতে তাঁহার এক পঞ্জাবী বন্ধুর অসুস্থতাজ্ঞাপক টেলিগ্রাম পাইয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই কান সাহেবের সঙ্গে কলিকাতায় গিয়াছিলেন এবং তাহার পরদিনেই আন্দাজ বেলা ১২টার সময় উভয়েই ফিরিয়া আসিয়া বলিয়াছিলেন যে, যমুনার সেই বন্ধুর অসুস্থতা উপশমিত হইয়াছে। কিন্তু সে ভোজালীখানা ঘোষজা মহাশয়ের পাঠাগার হইতে কোন্ সময় অপহরণ করিয়াছিল, তাহা গান-মা ঠিক বলিতে পারেন না; কারণ, স্বয়ং তিনি কাহাকেও তাহা লইতে দেখেন নাই। তবে তাঁহার স্থির বিশ্বাস যে, যমুনাই তাহা লইয়াছে। কেন না, সরস্বতী-পূজার প্রায় ২।৩ দিন আগে —যে দিন সেন সাহেব কলিকাতায় যান, তাহার পূর্ব্বদিন —যমুনা পুস্তকের আলমারিগুলা গুছাইবার ছলে ঐ ঘরে বহু সময় কাটাইয়াছিল; এবং তাহার পরদিন হইতে গান-মা ভোজালীখানা ছবির নীচে আর দেখিতে পান নাই। তাঁহার মুখে এই সকল নূতন সংবাদ শুনিয়া অবধি আর কাহারও (বিশেষতঃ কাকলীর) কোন সংশয় নাই যে, যমুনা এবং কান সাহেব পরস্পর ষড়যন্ত্র করিয়া উভয়েই একযোগে,—অথবা উহাদের মধ্যে এক জন,—ঘোষজা মহাশয়ের হত্যা-সাধন করিয়াছে।

বাহিরে বসিয়া যোগীন বাবুর সহিত এই সব কথাবার্ত্তার পরে তিনি আমাকে জলযোগের জন্য ভিতরে লইয়া গেলেন। তথায় পিসীমা ও কাকী উপস্থিত থাকিয়া নানা কথা কহিতে লাগিলেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কাকলীকে এক বারও দেখিতে পাইলাম না। এমন কি, তাহার সম্বন্ধে কোন কথাই কেহ উল্লেখ পর্য্যন্ত করা আবশ্যক বোধ করিলেন না। বোধ হয় সেই জন্যই,—অথবা কি কারণে ঠিক বলিতে পারি না,—আজ ইঁহাদের বাক্যালাপে আমার ক্রমেই চিত্তগ্রাহিতার বড়ই অভাব বোধ হইতে লাগিল।

জলযোগ সমাপ্ত হইলে, কাকী 'গান-মা'কে লইয়া আসিয়া আমার সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। শুনিলাম, তাঁহার নাম কুমারী দীপ্তি বিশ্বাস। কুমারী হইলেও মুখ দেখিয়া তাঁহার বয়সের হিসাব করা আমার পক্ষে অসাধ্য বোধ হইল। তবে, তাহা যে ৩০শের কম নহে, এবং ৪০শের বেশীও নহে, এইরূপ একটা অনিশ্চিত ধারণা করিতে সমর্থ হইলাম বটে। কিন্তু, তাঁহার "দীপ্তি" নামের সার্থকতা, মুখাবয়বের কোথাও বিশেষ লক্ষ্য করিতে পারিলাম না। বর্ণে গৌরের সামান্য আভাস থাকিলেও, তাহা বড়ই মলিন; এবং চক্ষুর্দ্বয় সুদীর্ঘ ও বিস্ফারিত হইলেও, কিঞ্চিৎ কোটরগত ও কালিমা-মণ্ডিত হওয়ায় সহজ অবস্থায় কিছু ম্রিয়মাণ। তবে, ক্রমে দেখিলাম যে, কথাপ্রসঙ্গে যমুনা ও কান সাহেবের নামোল্লেখের সময় তাঁহার চোখের সেই সহজ ভাব তিরোহিত হইয়া, দৃষ্টিটা যেন কিছু অপ্রীতিকররূপে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিতেছিল বটে।

## ৩৪

কুমারী দীপ্তির সহিত অনেক কথাবার্ত্তা হইল;—অথবা ঠিক বলিতে গেলে, তিনি নিজেই এত কথা কহিতে লাগিলেন যে, মাঝে মাঝে তাঁহার বাক্যস্রোতঃ সংহত করিতে আমাদিগকে বিশেষ আয়াস পাইতে হইয়াছিল। অথচ পূর্ব্বোল্লিখিত ঐ কয়টি সংবাদ ব্যতীত তাঁহার এত কথার মধ্যে আর নূতন বার্ত্তা কিছুই পাওয়া গেল না! তাঁহার অপর সমস্ত কথার মর্ম্ম এই যে, যমুনা নিতান্ত চরিত্রহীনা; কান সাহেবের প্রতি তাহার অবৈধ আসক্তিই তাহার স্বামীর প্রতি সমস্ত দুর্ব্যবহারের মূল কারণ ও সেই লজ্জাহীন আসক্তিই ঘোষজা

মহাশয়ের গৃহত্যাগেরও কারণ। সেই আসক্তির মোহে অন্ধ হইয়া যমুনা কান সাহেব সম্বন্ধে অপর সকল রমণীকেই —এমন কি, ইদানীং দীপ্তিকে পর্য্যন্ত সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিত। এই সন্দেহের বশে ক্রমে তাহার অসদাচরণ এতই বাড়িতে লাগিল যে, দীপ্তি অবশেষে কার্য্যে অবসর লইয়া এখান হইতে প্রস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু যমুনারও সন্দেহ যে শুধু অমূলক, তাহা নহে, সত্যের একেবারে বিপরীত। কেন না, কান সাহেব যে গোপনে দীপ্তির প্রতি নিদারুণ আসক্ত হইয়াছিল এবং দীপ্তি সামান্তমাত্র সম্মতি প্রকাশ করিলেই যে কান সাহেব তাঁহাকে বিবাহ করিয়া ফেলিত, তাহাতে দীপ্তির কোনই সংশয় নাই। কিন্তু না! কুমারী দীপ্তি চিরকুমারী থাকিবেন, ইহাই তাঁহার স্থির প্রতিজ্ঞা; এবং সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া তিনি এক দিনের জন্তও কান সাহেবকে ইঙ্গিতেও প্রশ্রয় দেন নাই। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

কুমারী দীপ্তির এই সুদীর্ঘ বাক্যস্রোতঃ ক্রমে এতই অপ্রাসঙ্গিক হইয়া পড়িতে লাগিল যে, তাহা রোধ করিবার অভিপ্রায়ে অবশেষে আমি ও যোগীন বাবু সে কক্ষ ত্যাগ করিয়া ঘোষজা মহাশয়ের পাঠাগারে আসিয়া বসিলাম।

কিছুক্ষণ পরে কাকী ও পিসীমাও তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, কাকলী ত এখনও দেখা দিল না! তাহার মাসী এবং মেসো এবং আমার পিসীমাও বেশ স্বচ্ছন্দ চিত্তে ও সহাস্ত মুখে আমার সহিত গল্প করিতে বসিয়া গেলেন,—অথচ তাহার অনুপস্থিতির কারণটা প্রকাশ করা, এমন কি, তাহার নামটা পর্য্যন্ত একবার উল্লেখ করাও আবশুক বোধ করিলেন না। তা বেশ! আমিই বা তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিব, এরূপ কোন কারণ ত ছিল না! আমি ত এই হত্যাসম্বন্ধে অনুসন্ধানের ভারপ্রাপ্ত লোক মাত্র এবং ঐ বিষয়ের সংবাদ আদান-প্রদানের জন্তই ত আজ এখানে আসিয়াছি। আর কোন উদ্দেশ্য ত নাই! কাকলী দেখা দিউক আর না দিউক, তাহার কথা কেহ বলুক আর না বলুক—তাহাতে আমার ক্ষতি-বৃদ্ধি কি? অতএব অবিলম্বে এখানকার কার্য্য সমাধা কয়িয়া প্রস্থান করাই আমার এখন কর্ত্তব্য নহে কি?

সেই জন্ত আর বৃথা কথায় সময় নষ্ট না করিয়া কানাই মল্লিক লেনের বাড়ীতে আমার তদন্তের ফল আনুপূর্ব্বিক ইঁহাদিগকে জানাইলাম এবং পরে সেই ছাতাটাও দেখাইলাম। ঘরের প্রবেশদ্বারের পার্শ্বে একটা টেবলের উপর বেশ বড় একটা কেরোসিনের আলো জ্বলিতেছিল। ছাতাটা সেই আলোর কাছে লইয়া গিয়া তাঁহারা তিন জনেই তাহা ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলেন। সেই সময় হঠাৎ সেই দ্বারের দিকে আমার দৃষ্টি পড়ায় দেখিলাম যে, তৎসংলগ্ন পর্দ্দার অন্তরাল হইতে একখানি কমনীয় মুখের আংশিক আবির্ভাব হইয়া প্রথমে সেই ছাতার দিকে তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিল এবং পরক্ষণে তাহা আমার দিকে প্রক্ষিপ্ত হইয়া আমার দৃষ্টির সহিত মিলিত হইবামাত্র মুখখানি ঈষৎ লজ্জা ও হাসিতে মণ্ডিত হইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে আবার সেই পর্দ্দার অন্তরালে বিলীন হইয়া গেল।

মুখটি যে কাহার, তাহা বোধ হয় বলিবার আবশুক নাই এবং এই চকিত দৃশ্যাভিনয়ের ফলে আমার মনে দ্রুত পরিবর্ত্তনশীল যে সকল ভাবের উদ্রেক হইতেছিল, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইতেও ইচ্ছা করি না। মোটের উপর এইটুকু বলিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে যে, কাযের কথাগুলা শেষ করিয়া আজ রাত্রিতেই অথবা অন্ততঃ কাল সকালে এখান হইতে প্রস্থান করা বিধেয় বলিয়া স্থির করিলাম।

এ দিকে কাকী ও পিসীমা ছাতাটা লইয়া বাহিরে গেলেন এবং কিঞ্চিৎ পরে ফিরিয়া আসিয়া কাকী বলিলেন, "ওটা যমুনার ছাতা কি না, ঠিক বলা যায় না। বুড়ী ওটা আগে কখনও দেখেছে কি না, তার মনে নাই। তার অনুমান যে, সে এখান থেকে যাবার পরে হয় ত যমুনা ওটা কিনেছিল! জিনিষটা দেখেও প্রায় নূতন বলেই বোধ হয়। দীপ্তি ত নেহাত অবজ্ঞাভরে বল্লে যে, যমুনার কোন সামগ্রীর দিকে সে কখন চেয়েও দেখতো না।"

যাহা হউক, আমার সঙ্কল্প অনুসারে হত্যাসম্বন্ধে আলোচনাটা শীঘ্র শেষ করিবার অভিপ্রায়ে আমি বলিলাম, "অনুসন্ধান করবার যা কিছু ছিল, তা' বোধ হয় এইবার শেষ হয়েছে? এখন আমাকে আর কি করতে হবে, তা' বলুন।"

কাকী বলিলেন, "সে কথা বোধ হয় এখনই স্থির করা যাবে না। সবাই মিলে ভাল ক'রে বিবেচনা করতে হবে

ত? তা' আজ এখন আর এ সব কথা থাক। কাল সকালে কি দুপুরে এ বিষয়ে কথা কইবার অনেক সময় থাকবে। আজ বরং এখন দীপ্তির একটু গান শুনে নাও। সে বেশ গাইতে পারে।"

আমি কিন্তু এ প্রস্তাবে অসম্মত হইয়া বলিলাম, "না, এবারে তা'র উপায় নাই। আমাকে আজই ফিরে যেতে হবে।"

## ৩৫

আমার কথা শুনিয়া তিন জনেই বিস্মিত নেত্রে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। আমি তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া গম্ভীরভাবে বলিলাম, "একটা কাযের জন্য কাল সকালেই আমার কলকাতায় উপস্থিত থাকা দরকার। তাই আজ রাত্রিতেই এখান থেকে যেতে হবে।"

যোগীন বাবু বলিলেন, "আরে, না, না! তা কি কখন হয়? আজ রাত্রিতে কোনমতেই যাওয়া হ'তে পারে না। কাল সকালের কোন একটা গাড়ীতে না হয় যাবে এখন!"

কাকী ও-কথার প্রতিবাদ করিয়া, যোগীন বাবুকে বলিলেন, "বাঃ! তুমিও ত বেশ লোক দেখছি! কাল সকালেও যাওয়া হবে না। বিমলা দিদিও যে অরুণের সঙ্গেই কাল যাবার স্থির করেছেন, তা' কি ভুলে গেছ? সকালের গাড়ীতে ছেলেদের শুদ্ধ সব গুছিয়ে নিয়ে যাওয়া হ'তে পারে কি কখন?" তৎপরে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "না, অরুণ, তা' হবে না, বাপ! সেই কাল বিকালের আগে আমরা তোমাকে ছাড়ছি না। তোমার ও-সব কায-কাযের কথা আমি শুনব না।"

"কিন্তু তা হ'লে আমার বড় ক্ষতি হবে।"

"না, না; কোন ক্ষতি হবে না। তুমি মনে করলে এক দিনের জন্য কাযটা নিশ্চয়ই পেছিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু তা ত নয়! আসল কথা আমি বুঝেছি। মা-মাসীগুলা বুড়ো-হাবড়া হলেও, ছেলেদের মনের ভাব একটু আধটু বুঝতে পারে না কি?"

"তা' হতে পারে; কিন্তু তাঁরা বাস্তবিক বুড়ো-হাবড়া না হ'লে ছেলেদের কাছে সব কথা যে স্পষ্ট ক'রে খুলে বলেন না, তা'তে কথাগুলার মানে বোঝা শক্ত হয়ে পড়ে। অন্ততঃ আপনার এখনকার এই কথাগুলা আমার যেন হেঁয়ালির মত বোধ হচ্ছে।"

কাকী আবার যোগীন বাবুর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "তুমি যে একেবারে নির্ব্বাক্ হ'য়ে ব'সে রইলে?—তোমাকে যে সব কথা বলতে বলেছিলাম, তা' বুঝি কিছুই বলনি ওকে?"

যোগীন বাবু হাসিয়া বলিলেন, "ও সব কথা বলবার সময় পেলাম কৈ?—তা' ছাড়া আমার দ্বারা ও সব মেয়েলী কথা—"

কাকী বাধা দিয়া বলিলেন, "হাঁ, হাঁ, তা' জানি। আমাদের সব কথাই তোমার কাছে মেয়েলী! বেশ লোক যা হোক!" পরে আবার আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দেখছো ত অরুণ! আমাদের কোন দোষ নাই, বাপু! তোমার এই মেসো-বাবুটিই যত গোল পাকিয়ে বসেছেন!"

যোগীন বাবু এ কথার কোন উত্তর না দিয়া, হো হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

আমি কিছু বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "হেঁয়ালিটা যে আরও বেশী দুর্ব্বোধ হয়ে পড়ছে দেখছি!—আমার মেসো-বাবুই বা কে,—আর তাঁর দোষই বা কি, কিছুই ত বুঝতে পাচ্ছি না।"

যোগীন বাবু পুনরায় উচ্চহাস্য করিয়া তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন, "এঃ! কল্লে কি? রাম না হ'তেই রামায়ণ গেয়ে ফেল্লে যে! তোমার দেখছি মাথা খারাপ হয়ে গেছে!"

"তা' হবে না কেন বল? আমি অত গুছিয়ে কথা কইতে পারি না, তা' কি করবো?—সেই জন্যেই ত তোমার উপর ভার দিয়েছিলাম। আর তুমি বেশ মজা ক'রে নিজের ভারটি আমারই মাথায় চাপিয়ে দিয়ে এখন হাস্তে লেগে গেলে!—বেশ যা' হোক্!"

পিসীমা একটু হাসিয়া বলিলেন, "তা' তুই যদি না পারিস্ ত আমিই না হয় বলছি।" তৎপরে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কথাটা কি জান, বাবা অরুণ! আমরা সবাই মিলে একটা ষড়্‌যন্ত্র ক'রে তোমার আড়ালে একটা কায ক'রে ব'সে আছি!—'আমরা' মানে আমি আর প্রিয়ম্বদা, আর তোমার দিদিরাও কতকটা; আর মিত্তির মশায়ও যে একেবারে বাদ, তা' নয়।"

কাকী। ও মা! বাদ আবার কি? উনিই ত নাটের গুরু!—তোমার সেই প্রথম চিঠি পেয়ে ওঁকে যখন প'ড়ে শুনালাম, তখন উনিই ত আহ্লাদে নেচে উঠে আমাকেও নাচিয়ে তুল্লেন!

যোগীন বাবু। আর, তা'র পরে? কথাটা পাকা ক'রে ফেল্‌বার জন্য আমাকে দিন-রাত উদ্বাস্ত ক'রে তুলেছিল কে, মশায়?

কাকী। হাঁ, তা ত আমি করেছিলাম বটেই; কিন্তু তুমি কি তা' শুনেছিলে?—তা হ'লে ত এত দিনে কোন্‌কালে কায মিটেই যেতো!

পিসীমা। আচ্ছা, তুই একটু চুপ কর্ না, ভাই, প্রিয়ম্বদা! কথাটা আগে শেষই হ'তে দে -

কাকী। কথা শেষ হবার আর বাকী কি আছে দিদি?—আমিই না হয় শেষ ক'রে দিচ্ছি!

## ৩৬

কিন্তু কাকী যত সহজে কথাটা বলিলেন, কাযে বোধ হয় তাঁহার পক্ষে তাহা তত সহজ হইল না। কারণ, কিছুক্ষণ নিস্তব্ধভাবে কি চিন্তা করিয়া শেষে আমাকে বলিলেন, "দেখ, বাবা,—আমাদের এ ষড়যন্ত্রের যোগাড়-যাগাড় সব ঠিক হয়ে গেছে। দিনটিও এক রকম ঠিক হয়েছে। কেবল তুমি এখন প্রফুল্ল মনে রাজী হয়ে কাযটি উদ্ধার ক'রে দিলেই আমরা সবাই সুখী হই!—কেমন, কর্‌বে ত?"

আমি একটু বিদ্রূপচ্ছলে হাসিয়া বলিলাম, "কথাটা মন্দ নয়! কিসের ষড়যন্ত্র, তা' আমাকে বল্লেন না; অথচ কাযটি সমাধা কর্‌বার হুকুম দিচ্ছেন আমাকে! এ প্রস্তাব খুব যুক্তিসঙ্গত বটে!—তা' আমি বলি, আপনারা আমার অজ্ঞাতে যখন ষড়যন্ত্র—যোগাড়-যাগাড় সবই করেছেন, তখন শেষটায় আর আমাকে এর ভিতর না জড়িয়ে, আপনারাই বাকী কাযটুকুও সমাধা ক'রে ফেলুন না কেন?"

যোগীন বাবু পুনরায় উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন, "ঠিক বলেছ বাবাজী!—কিন্তু তা' যে হবার যো নাই, তাই ত ওঁদের মুস্কিল হয়েছে! তোমাকে বাদ দিয়ে এ কায হবার উপায় নাই। তা হ'লে শিবহীন যজ্ঞ হয়ে পড়বে যে!"

কাকী ঈষৎ বিরক্তিভরে বলিলেন, "নাও, নাও! তোমাদের আর রঙ্গ কর্‌তে হবে না! এ কি ঠাট্টা-তামাসার কথা না কি?—দেখ, বাবা অরুণ! তুমি ওঁর কথায় কান দিও না। এখন আমি যা' বল্লাম, তাই কর্‌বে ত? কেমন?—লক্ষ্মীটি!"

"বাঃ! আপনি ত আমাকে বেজায় গোলযোগে ফেল্লেন দেখছি! আপনার কথাটা কি, তাই ত এখনও জান্‌তে পার্‌লুম না,—তা তার জবাব কি দিব, বলুন?"

পিসীমা বলিলেন, "কেন? মিত্তির মশায়রা কল্‌কাতায় পৌঁছাবার পর তোমার হাত দিয়ে যখন প্রিয়ম্বদাকে চিঠি পাঠিয়েছিলুম, তখন কি তোমায় বলি নি যে, আমার একটা ফন্দি আছে?"

আমি একটু চিন্তার ভাণ করিয়া পরে বলিলাম, "হাঁ, তা' বলেছিলেন বটে; কিন্তু ফন্দিটা যে কি, তা ত বলেন নি? তখন বলেছিলেন যে, পরে জান্‌তে পারবো।"

"বেশ,—তা' এখন ত জান্‌তে পেরেছ, বাবা! তোমার দিদিরা তোমাকে সব কথা খুলে লেখেন নি কি?"

আমি এইবারে 'কোণ-ঠাসা' হইয়া গোলযোগে পড়িলাম। আর কথা কটাকাটির উপায় নাই দেখিয়া বলিলাম,—"ও-ওঃ! সেই কথা বল্‌ছেন? তা কি ক'রে বুঝবো বলুন? এতক্ষণ খুলে বল্লেই ত হতো!"

কাকীও অমনি সুবিধা পাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "যা' হোক্, এখন ত বুঝেছ? এইবারে আমার কথার জবাবটা দাও!"

আমি কোন উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া বলিলাম, "দিদিদের চিঠি প'ড়ে মনে হয়েছিল, তাঁদেরই বুঝি মাথা খারাপ হয়েছে। আবার আপনাদেরও যে সেই অবস্থা হয়েছে, তা' জান্‌তুম না।"

"মাথা খারাপ আবার কিসে দেখলে?"

"তা, না হ'লে শুধু এক পক্ষের সম্মতির জন্য আপনারা এত উৎসুক হয়েছেন কেন? আর একটা পক্ষও ত আছে?"

"ওঃ! তাই? তা' সে জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না। আমরা না বুঝে এত দূর অগ্রসর হই নি। তা' ছাড়া আমরা ত সাহেব নয় যে, পাত্র-পাত্রীর এত মতামতের অপেক্ষা করতে হবে?"

"তবে আমারই বা মতামত জান্‌তে চাইছেন কেন?"

"আজকালকার ছেলেদের কত রকম সাহেবী ঢং হয়েছে

কি না,—তাই তাদের একবার জিজ্ঞাসা না করা চলে না।”

“আর মেয়েদেরি বুঝি তা’ হয় নি? তা’ না হ’লে, যখন আপনাদের প্রথম থেকেই এই রকম অভিসন্ধি হয়েছিল, তখন পাত্র-পাত্রীর দেখা-সাক্ষাৎ, আলাপ-পরিচয় করানটা একটু সাহেবী ব্যবস্থা হয় নি কি?”

“না; সেটা তোমার ভুল। এর ভিতর সাহেবী ব্যবস্থা কিছুই হয় নি। প্রথম দিন, ক’নে দেখাবার হিসাবে, আমি বুড়ীকে তোমার সাম্‌নে বা’র করেছিলাম। পরে এই খুনের সব কথা আলোচনার সময় ওর উপস্থিতি নিতান্ত দরকার হয়েছিল বলেই আমরা ওকে তোমার কাছে বা’র হয়ে কথা কইতে দিতেও বাধ্য হয়েছিলাম। তখন আমাদের এই গুপ্ত অভিসন্ধির কথা তোমরা দুজনেই জান্‌তে না বলেই সেটা সম্ভবও হয়েছিল। কিন্তু এখন আর তা’ হ’তে পারে না। এ সপ্তাহে তোমার বড় দিদির চিঠি পেয়ে, আমরা বুড়ীকে আভাসে কথাটা একটু জানিয়েছি। কাযেই, তোমার সাম্‌নে বেরুতে এখন তা’র ভারি লজ্জা। তা’ ওটা যখন স্বাভাবিক, তখন আমরা তাকে জিদ ক’রে বা’র করতে চাই না।”

উত্তরে আর বলিবার কিছু না পাইয়া আমি চুপ করিয়া রহিলাম। কিন্তু তাহাতেও নিস্তার নাই! কাকী অমনই জিজ্ঞাসা করিলেন, “চুপ ক’রে রইলে যে? আমার কথার জবাব না দিলে আমি ছাড়ছি না!”

আমি হাসিয়া বলিলাম, “মতামতের যখন কোন অপেক্ষাই করেন নি, তখন আমার এ বিষয়ে কোন কথা বলবার অবসর আছে ব’লে মনে হয় না। তবে দিদিরা যে রকম লাফালাফি কচ্ছেন, সেটা যেন একটু বাড়াবাড়ি বোধ হয়। কিছু দেরি হ’লেই বা ক্ষতি কি? অন্ততঃ এই খুনের তদন্তটা আগে শেষ হতেই দিন না কেন?”

আমার কথায় সকলেই প্রীত হইলেন, বোধ হইল। কিন্তু কাকী বলিলেন, “সে আমরা যেমন ভাল বুঝবো, তাই করবো;—ও বিষয়ে তোমার সঙ্গে কথা ক’বার আমাদের দরকার নাই।—এখন কিন্তু আজ এখান থেকে তুমি কিছুতেই যেতে পাবে না, তা’ ব’লে দিচ্ছি। কাল বিকেলে বিমলা দিদিকে সঙ্গে নিয়ে যাবে।”

কিঞ্চিৎ বাদানুবাদের পর তাহাই স্থির হইল। যোগীন বাবুরাও সকলেই আগামী সপ্তাহেই কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবেন শুনিলাম।

পরদিন, সকলের পরামর্শে স্থির হইল যে, আমি কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়া যত শীঘ্র সম্ভব ঘোষপত্নীর সহিত দেখা করিব এবং তাঁহার বিরুদ্ধে প্রমাণগুলা সম্বন্ধে কথা কহিয়া তাঁহার ভাব-গতিক বুঝিবার চেষ্টা করিব।

[ ক্রমশঃ।

শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ( এটর্ণি )।

---

# রহিব দেশের হিন্দু

কোরো না ঠাট্টা, কোরো না ব্যঙ্গ, রহিব দেশের হিন্দু,
হ’তে চাও হও বিদেশী সভ্য পার হয়ে নীর-সিন্ধু:
সুখ পাও পর ‘প্যান্ট’ ‘কোট’ ‘টুপী’ গোঁফেতে লাগাও মোম,
গৃহিণীরে দাও সাহেব সঙ্গ, বিলাতেরে কহ ‘হোম’।
হুট-হাট করি যত পার যাও ঘুরাও করেতে ছড়ি,
আমরা আনন্দে রহিব অটুট সনাতন ধুতি পরি’।
লাগে ভাল খাও পেঁয়াজ মোরগ, জাতিভেদে দাও গালি—
‘এই জাতিভেদে গিয়াছে ভারত’ ব’লে দিয়া করতালি।
শেখ নুরুল্লার পক্ক—পশু-মাস বদন-বিবরে দিয়া,
চর্ব্বণ-সুখ-নিমীলিত চোখে শান্ত কর গে হিয়া।
আমরা আনন্দে রহিব অটুট জননীর হাত হ’তে
পাওয়া পুরাতন ঝোল অম্বল আর সেই ডাল ভাতে।
অবরোধ-সুখ না পার সহিতে দাও হে পরদা খুলি’,
মুক্ত বাতাস খাউক রমণী প্রেমের ঝটিকা তুলি’।
ছুটুক সে প্রেম-তরঙ্গ-প্রবাহে দেশের দশের মাঝে,
রেলের গাড়ীতে বাষ্পীয় পোতে প্রভাতে দুপুরে সাঁঝে।
দিক্ উড়াইয়া মাথার বসন সরমের বাঁধ টুটি,
খাউক তোমারে ফেলিয়া প্রেয়সী জীবন-সংগ্রামে ছুটি,
মোদের আনন্দ পুরাতন সেই ফল্গুর বালুতলে,
নয়নের কোণে মলের নিক্বণে ঘোমটার অন্তরালে।
যেখানে যাই না যে কোন করমে চিন্তা করিয়া দূর,
ভাবিব গৃহিণী আছেন গৃহেতে ভরিয়া অন্তঃপুর।

শ্রীজানকীনাথ মুখোপাধ্যায়।

# হীরক

প্রত্যেক মূল্যবান্ প্রস্তরে আমরা তিনটি গুণ দেখিতে পাই ;—সৌন্দর্য্য, স্থায়িত্ব ও অপ্রাচুর্য্য। সুকর্ত্তিত একটি হীরকখণ্ডের সহিত অন্য কোন রত্ন তুলনীয় হইতে পারে না।

কোথায় বা কোন্ সময়ে হীরক আবিষ্কৃত হয়, তাহা সঠিক জানা যায় না। তবে ভারতেই যে ইহা আবিষ্কৃত হয় ও ভারতীয় রাজন্যবর্গ প্রথম ইহার ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বহু প্রাচীন গ্রীক ও রোমক সাহিত্যে ভারতীয় হীরক-খনির কথা লিখিত আছে। সংস্কৃত সাহিত্যের বহু প্রাচীন গ্রন্থে হীরকের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমে হীরক কর্ত্তিত করিতে পারা যাইত না বলিয়া অবজ্ঞাত হইত। কাযেই দেখা যায়, খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতেও পারস্যবাসী কর্ত্তৃক হীরকের আসন অন্যান্য রত্নাপেক্ষা নিম্নেই দেওয়া হইত। পরন্তু সে সময়ের বহুপূর্ব্বে ভারতীয় মণিকাররা আবিষ্কার করিয়াছিলেন যে, হীরকচূর্ণ-সাহায্যে হীরককে কর্ত্তন করিয়া ঔজ্জ্বল্য বিকাশ করিতে পারা যায়। কর্ত্তিত হওয়ার পর হীরকের দ্যুতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। নদীগর্ভে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ডের সহিত প্রাপ্ত হীরকের বহিরাবরণ দেখিয়া বিশ্বাস করিতে পারা যায় না যে, ইহাই সর্ব্বজনবাঞ্ছিত হীরক ; কিন্তু বহিরাবরণ কর্ত্তিত হইবামাত্র স্বতঃই মনে হয়, যেন কোন ঐন্দ্রজালিক যষ্টির স্পর্শে উহাকে একটি জ্যোতির্ম্ময় পদার্থে পরিণত করা হইল। ভারতীয় মণিকাররা ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নিকে মুক্ত করিয়াই সম্ভবতঃ নিরস্ত হইতেন ; প্রস্তরাদিকে কোন বিশিষ্ট আকারে কর্ত্তন করিতেন কি না, তাহা জানা যায় না। তবে, প্রতীচ্যের মণিকাররা ১৪৭২ খৃঃ অঃ অথবা আরও কিছু পূর্ব্ব হইতেই মূল্যবান্ প্রস্তরাদির উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করিবার জন্য তাহাদিগকে কোন না কোন বিশিষ্ট আকারে কর্ত্তন করিতে আরম্ভ করেন। ষোড়শ শতাব্দীতে বহু রত্ন ডি বারকোয়েম ( De Berquem ) আবিষ্কৃত প্রণালী অবলম্বনে কর্ত্তিত হইয়াছিল। ১৫৩২ খৃঃ অঃ কেন্তাউর ( Kentaur ) সেই সময়ে চলিত দুই প্রকার—"বিন্দু" ( Point ) ও টেব্‌ল্ ( Table ) কর্ত্তনের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে "গোলাপ" ( Rose ) আকারে কর্ত্তন-প্রথা প্রচলিত হয় ; ১৬৬৫ খৃঃ অঃ বিখ্যাত "মোগল" হীরক ভিনিসীয় মণিকার বর্‌গিস ( Borghis ) কর্ত্তৃক গোলাপ আকারে কর্ত্তিত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে অন্য এক জন ভিনিসীয় পেরুজি ( Peruzi ) হীরক কর্ত্তনে যুগান্তর আনয়ন করেন। তাঁহার আবিষ্কৃত ব্রিলিয়াণ্ট্ আকারে কর্ত্তিত হইলে হীরকের দ্যুতিমত্তা শতগুণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই প্রকার আকৃতি-বিশিষ্ট হীরকখণ্ডের বৃহত্তম পরিধিকে গার্‌ডেল (Girdle), গার্‌ডেলের উপরিভাগকে ক্রাউন ( Crown ), নিম্নভাগকে কুল্যাস্ (Culasse), ক্রাউনের সর্ব্বোচ্চ পৃষ্ঠভাগকে টেবল্ ও কুল্যাসির সর্ব্বনিম্নস্থ পৃষ্ঠভাগকে কলেট (Collet) বলা হইয়া থাকে। ক্রাউনে সর্ব্বসমেত ৩৩টিপৃষ্ঠভাগ—টেব্‌ল্ (১) ; ( ক চিহ্নিত ) ত্রিভুজাকৃতি ( ৮ ) ( খ চিহ্নিত ) ; নক্ষত্রাকৃতি ( ৮ ) ( গ চিহ্নিত ) ; সমকোণী ত্রিভুজাকৃতি ( ১৬ ) ( • চিহ্নিত ), এবং কুলাসিতে সর্ব্বসমেত ২৫টি ত্রিভুজাকৃতি ( ১০ ) ( প চিহ্নিত ) ; পঞ্চভুজাকৃতি ৮ ( চ চিহ্নিত ) ও কলেট ১ ( ছ চিহ্নিত ) সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ (চিত্র ১) ব্রিলিয়াণ্ট্ আকারে কর্ত্তিতহীরকে সর্ব্বশুদ্ধ ৫৮টি পৃষ্ঠ সংযোজিত করা হয়। টেবল্ ও কলেট পৃষ্ঠভাগ গার্‌ডেলের সহিত সমান্তরালে অবস্থিত থাকে। অভিজ্ঞতার ফলে দেখা গিয়াছে যে, কলেটের ব্যাস গার্‌ডেলের ব্যাসের এক-নবমাংশ ও টেব্‌লের ব্যাসের এক-পঞ্চমাংশ হইলে এবং টেব্‌ল্ ও গার্‌ডেলের দূরত্ব, টেব্‌ল্ ও কলেটের দূরত্বের অর্দ্ধেক হইলে হীরক অধিক পরিমাণে প্রভা বিকিরণ করে ; সুতরাং হীরক কর্ত্তনের সময় এই সকল বিষয়ে দৃষ্টি রাখা হয়।*

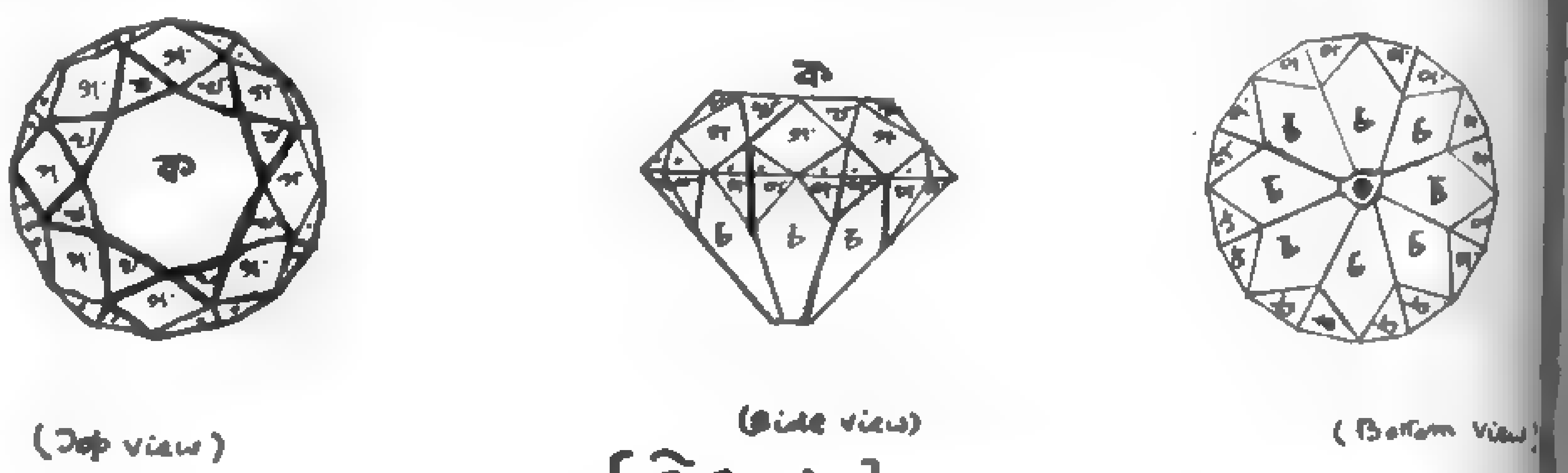

[চিত্র ১]

হীরকের উপাদান বহুদিন পূর্ব্বে গ্যাসিয়ট ( Gassiut ) ও বারজেলিয়াস ( Barzeleus ) কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত হয়। ১৭৭২ খৃঃ অঃ ল্যাভইসিয়ার দেখান যে, হীরকের কঠিনতার ( hardness ) তারতম্যানুসারে ৭৬০° ডিগ্রী হইতে ৮৭৫° ডিগ্রী পরিমাণ তাপ প্রদান করিলে হীরক প্রজ্বলিত হইয়া উঠে এবং বাতাসে বর্ত্তমান অক্সিজেন বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া অঙ্গারদ্রাবক ( Carbonic acid ) সৃষ্টি করে। ১৭৭৯ খৃঃ অঃ স্মিথ্‌সন্ টেনাণ্ট্ ( Smithson Tennant ) প্রমাণ করেন যে, প্রজ্বলিত হীরক হইতে একমাত্র অঙ্গারকদ্রাবক প্রস্তুত হয়। ১৮১৪ খৃঃ অঃ ডেভি এই বাক্যের যাথার্থ্য প্রমাণ করেন এবং তিনিই প্রথম পরীক্ষা করিয়া দেখান যে, প্রজ্বলিত হীরকে শতকরা ০·০৫ ভাগ ভস্ম অবশিষ্ট থাকে ; রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া নিম্নলিখিত পদার্থ কয়টি ভস্ম হইতে পাওয়া যায় :—( ১ ) লৌহ, ( ২ ) চূণ, ( ৩ ) ম্যাগনিসিয়া, ( ৪ ) সিলিকা, ( ৫ ) টাইটানিয়ম ; কিন্তু পরিমাণে এইগুলি এতই অল্প যে, ইহাদের উপেক্ষা করিয়া বলা যাইতে পারে যে, একমাত্র অমিশ্র অঙ্গার হীরকের উপাদান। যে অঙ্গার কয়লায় বর্ত্তমান, যে অঙ্গার হইতে গ্র্যাফাইট সৃষ্ট হয়, সেই অঙ্গারই রূপান্তর গ্রহণ করিয়া হীরকে পরিণত হয়। একই পদার্থ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির পদার্থের উৎপত্তি কিরূপে সম্ভবপর হইল, ইহা ভাবিয়া আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হই ; প্রকৃতির রাজ্যে অত্যাশ্চর্য্যময় ঘটনাপুঞ্জ অহরহঃ সংঘটিত হইতেছে, ইহা তাহারই একটি জ্বলন্ত নিদর্শন। এ ক্ষেত্রে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, অঙ্গার কখনও উজ্জ্বল, স্বচ্ছ ও কঠিন হইয়া হীরকে পরিণত হইতেছে, আবার কখনও বিপরীত গুণাবলম্বন করিয়া গ্র্যাফাইটে পরিণত হইতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হীরকখণ্ড অবিশুদ্ধ ভাবে একত্র হইলে তাহাকে "বোর্‌ট" বলা হয়। হীরক ও বোর্‌টে প্রভেদ এই যে, বোর্‌টের কঠিনতা হীরকাপেক্ষা অধিক, ইহাতে ফাটল ( Cleavage ) থাকে না এবং ইহার বর্ণ ধূসর হইতে ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ

---

* Precious Stores by Goodchild.

হয়, ইহা দেখা যায়। অলঙ্কাররূপে ব্যবহারের অযোগ্য হীরকখণ্ডকে মণিকাররা এক কথায় বোর্ট বলিয়া থাকেন। নিকৃষ্টতম হীরক কারবোন্যাডো (Carbonado) নামে অভিহিত হয়। ইহার কঠিনতা হীরকাপেক্ষা অধিক; দেখিতে ইহা কৃষ্ণবর্ণ ও অস্বচ্ছ। স্বচ্ছ, নিখুঁত, বর্ণহীন হীরকখণ্ড প্রথম শ্রেণীর হীরক বলিয়া পরিগণিত। কিন্তু এরূপ হীরক সমগ্র হীরকের এক-চতুর্থাংশ; অপর চতুর্থাংশ ঈষৎ বর্ণবিশিষ্ট; অবশিষ্ট অর্দ্ধেক ভাগ অল্পবিস্তর বহুবিধ বর্ণে রঞ্জিত। সাধারণতঃ বর্ণসম্পন্ন হীরকের মূল্য বর্ণহীন হীরকের মূল্যাপেক্ষা অল্প হয়; কিন্তু কোন বর্ণের ঈষৎ আভা হীরকে বর্ত্তমান থাকিলে মূল্য হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধি পায়। হরিদ্রাভ হীরক যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়; কিন্তু সেগুলি তাদৃশ সমাদৃত হয় না। সবুজ বর্ণের উত্তম হীরক সংখ্যায় অল্পই আছে। পিঙ্গল বর্ণের হীরক দক্ষিণ-আফ্রিকায় পাওয়া যায়; গোলাপী হীরক অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না; লোহিতাভ ও নীলাভ হীরক কচিৎ কখনও দৃষ্টিগোচর হয়।

কঠিনতা (hardness) মণি, চুণি, হীরকাদি রত্নরাজির একটি প্রধান গুণ; মণি-মুক্তা-খচিত অলঙ্কার ব্যবহার করিবার সময় আমাদিগের অজ্ঞাতসারে বায়ুতে বর্ত্তমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকণার সহিত রত্নাদির গাত্র ঘর্ষিত হয়, ইহার ফলে রত্নরাজির পালিশ ও উজ্জ্বলতা হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা, যদি না বালুকার কঠিনতা অপেক্ষা রত্নের কঠিনতা অধিক হয়। মোহ (Mohs) দশটি বিভিন্ন প্রকার ধাতুকে কঠিনতার তারতম্যানুসারে দশটি স্থান দিয়াছেন। মোজের মতে হীরকের স্থান সকলের উপরে; সর্ব্বনিম্নস্থ স্থান "টাল্‌ক্" (Talc) কর্ত্তৃক অধিকৃত। এখন কোন একটি ধাতুর কঠিনতা কত, ইহা অবগত হইতে হইলে এই দশটি ধাতুর সহিত তুলনা করিতে হয়। বালুকণার কঠিনতা ৫; হীরকের কঠিনতা ১০ বলিয়া বালুকণার দ্বারা হীরকের কোন অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। প্রত্যেক মূল্যবান্ প্রস্তরের কঠিনতা ৮ হইতে ১০এর মধ্যে। একটি প্রস্তরাপেক্ষা অন্য প্রস্তরকে কঠিন বলা হইয়া থাকে, যদি শেষোক্ত প্রস্তরখণ্ডের তীক্ষ্ণ শলাকা-সাহায্যে পূর্ব্বোক্ত প্রস্তরের উপর রেখা টানিতে পারা যায়। ইস্পাতের কঠিনতা সাধারণতঃ ৭ বলিয়া ধরা হইয়া থাকে। তীক্ষ্ণ ইস্পাত-শলাকা সাহায্যে কোন মূল্যবান্ প্রস্তরের উপর দাগ কাটিতে পারা যায় না; কেন না, পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, কোন রত্ন অঙ্গ-শোভাবর্দ্ধনের জন্য সংগৃহীত হয় না—যদি না তাহার কঠিনতা ৭ অপেক্ষা অধিক হয়। স্ফটিকীকৃত (criysallised) হীরকের কঠিনতা অস্ফটিকীকৃত হীরক—বোর্ট, কারবোন্যাডো—অপেক্ষা ঈষৎ অল্প। স্ফটিকীকৃত হীরকের কঠিনতা বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন প্রকার হইতে দেখা গিয়াছে। এমন কি, বিভিন্ন পৃষ্ঠের কঠিনতা একরূপ নহে; বহিরাবরণ সাধারণতঃ মধ্যভাগ অপেক্ষা কঠিনতর। বিভিন্ন খনি হইতে উত্তোলিত হীরকের কঠিনতায় অল্প প্রভেদ থাকে। দক্ষিণ-আফ্রিকার হীরক অপেক্ষা অষ্ট্রেলিয়ার হীরক কঠিনতর। হীরকের কঠিনতা প্রতিপন্ন করিতে হইলে দুই খণ্ড ইস্পাতের মধ্যে এক টুক্‌রা হীরক রাখিয়া চাপযন্ত্র সাহায্যে প্রবল চাপ দিলে দেখা যাইবে যে, হীরক নিঁখুত অবস্থায় ইস্পাতমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহা হইতে কেহ যেন অনুমান না করেন, হীরক ভঙ্গপ্রবণ নহে। এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া কত হীরকখণ্ড যে চূর্ণীকৃত হইয়া গিয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। লৌহ-উদূখলে রাখিয়া মুষল আঘাতে হীরককে অতি আয়াসে চূর্ণ করিতে পারা যায়।

ধাতু, মণি, রত্ন ইত্যাদিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে,—প্রথম কাচ, দ্বিতীয় স্ফটিক (crystal)। কাচ বলিতে সচরাচর আমরা বুঝিয়া থাকি, বালু ও ক্ষার উভয় পদার্থের সংমিশ্রণের ফলে উৎপন্ন এক পদার্থবিশেষ। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, কাচের আভ্যন্তরিক অণুগুলি সুবিন্যস্তভাবে সজ্জিত, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তাহা নহে। ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, অণুগুলি কোন বিশেষ নিয়মে সজ্জিত নহে। সাধারণ কাচের এই গুণটি যে পদার্থে বর্ত্তমান থাকে, তাহাকেই ধাতুশাস্ত্রে (Mineralogy) কাচ বলা হইয়া থাকে। ইহার বিপরীত গুণ, অর্থাৎ যে কোন পদার্থে অণুগুলি এক বিশেষ নিয়মে সজ্জিত, তাহাকে "স্ফটিক" (crystal) বলা হয়। স্ফটিকীভূত ধাতুমাত্রেই একটি বিশিষ্ট জ্যামিতির ক্ষেত্র সম্পন্ন হইয়া থাকে। একই উপাদানে গঠিত কোন ধাতু কাচ ও স্ফটিক উভয় আকারই অবস্থাভেদে ধারণ করিতে পারে। প্রভেদ এই—একের মধ্যে অণুগুলি এক বিশেষ নিয়মে সজ্জিত, অপরটির মধ্যে অণুগুলি অবিন্যস্তভাবে সজ্জিত। হীরকের মধ্যে অণুগুলি এক বিশেষ নিয়মে সজ্জিত বলিয়া হীরক স্ফটিক-পর্য্যায়ভুক্ত। স্ফটিক-তত্ত্বে (crystallography) স্ফটিকীভূত ধাতুগুলি অঙ্গবিন্যাসে তারতম্যানুসারে ৩২ প্রকারে বিভক্ত; ইহারা আবার সাত শ্রেণীর অন্তর্গত। হীরক যে শ্রেণীভুক্ত, সেই শ্রেণীর সুক্রমিকতা (Symmetry) অন্যান্য শ্রেণীস্থ ধাতুগুলির সুক্রমিকতা অপেক্ষা অধিক; এই শ্রেণীকে সমমান শ্রেণী (Isometric system) বলে। এই শ্রেণীর অন্তর্গত স্ফটিকগুলির ক্ষেত্র প্রধানতঃ চারি প্রকার হইয়া থাকে। অষ্ট ত্রিভুজাবচ্ছিন্ন ঘনক্ষেত্র (Octahedron) আকারে হীরক স্ফটিকীভূত হয়। ইহার পৃষ্ঠগুলি (faces) পূর্ণাবয়ব থাকে, কিন্তু তাহাদের ধার (Edge) সাধারণতঃ বক্রাকারে দৃষ্টিগোচর হয়। কতকগুলি স্বাভাবিক হীরক স্ফটিকের চিত্র এই স্থলে সন্নিবেশিত হইল। (চিত্র ২ দ্রষ্টব্য) ১। ৪৮টি অসমবাহু ত্রিভুজবিশিষ্ট ঘন ক্ষেত্র (Hexakis Octahedron)।

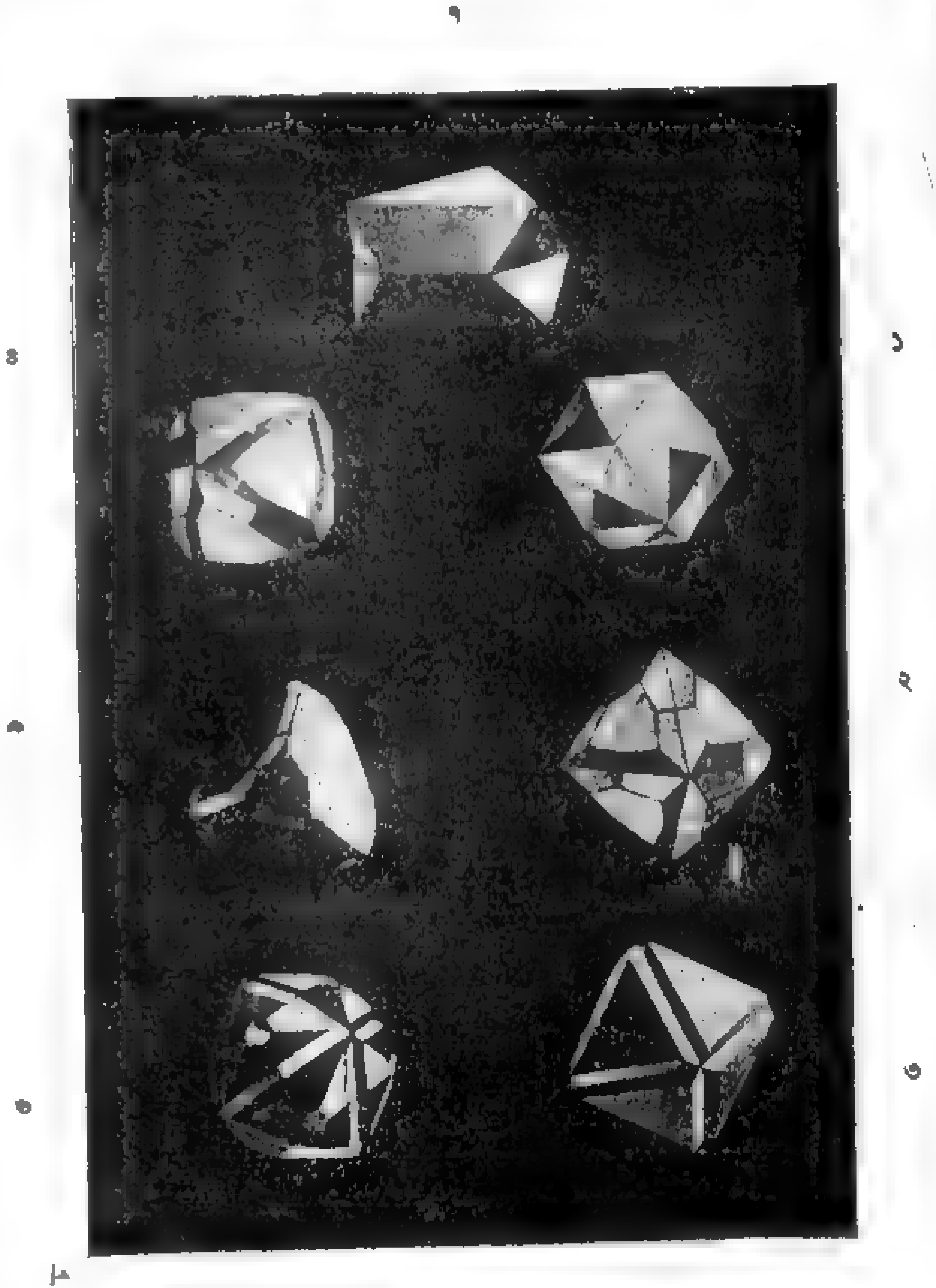

[ চিত্র ২ ]

২। অসমবাহু ত্রিভুজবিশিষ্ট ঘনক্ষেত্র ও অষ্ট ত্রিভুজবিশিষ্ট ঘনক্ষেত্র উভয়ে একত্র মিলিত। ৩। খণ্ডিত অষ্ট ত্রিভুজবিশিষ্ট ঘনক্ষেত্র। ৪। ব্রেজিল খনি হইতে প্রাপ্ত হীরক। ৫। কিম্বারলে হীরক। ৬। ব্রেজিল হীরক। ৭। যমজ হীরক স্ফটিক ( Twin crystal )। কোন কোন হীরক স্ফটিকের পৃষ্ঠে সুন্দর সুন্দর সমবাহুসম্পন্ন ত্রিভুজ অঙ্কিত থাকে।[*]

স্ফটিকীভূত ধাতুমাত্রের আভ্যন্তরিক অণুগুলি কোন এক বিশিষ্ট নিয়মে সজ্জিত বলিয়া একটি ধাতুর বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন প্রকার গুণের বিকাশসাধন হয়। একটি গুণ এই যে, এক সমতলে অণুগুলির পরস্পর সংযোগ অপরতলস্থ অণুগুলির পরস্পর যোগাপেক্ষা নিবিড় হওয়ার ফলে শেষোক্ত তলে ধাতুকে অপেক্ষাকৃত অতি অল্প আয়াসে বিদীর্ণ করা যাইতে পারে। এইরূপ তলকে ‘ভঙ্গতল’ ( cleavage ) বলা হয়। হীরকে এইরূপ চারিটি কাটল বর্ত্তমান থাকায় অসংস্কৃত হীরককে অতি অল্প আয়াসে চারিদিক হইতে বিদীর্ণ করিয়া অষ্ট ত্রিভুজবিশিষ্ট ঘনক্ষেত্রে পরিণত করা যাইতে পারে। এই তথ্য অবগত হওয়ায় হীরক-কর্ত্তকদিগের যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে। অসংস্কৃত হীরকের কাটলের সহিত খুঁতবিশিষ্ট চালতার খোলার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। চালতার খোলা যেরূপ ৩।৪ দিক্ হইতে খুলিয়া ফেলিলে ভিতরকার পরিষ্কার খোলা দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্রূপ হীরকেরও উপরিস্থ ক্ষতপৃষ্ঠ বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলে ভিতরকার মূর্ত্তি প্রকাশ হইয়া পড়ে।

হীরকের আপেক্ষিক গুরুতা ( Specific gravity ) ৩'৫১৪ হইতে ৩'৫১৮ পর্য্যন্ত হয়; এই আপেক্ষিক গুরুতা বহু উপায়ে নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায়।

সূর্য্যকিরণে কিয়ৎক্ষণ রাখার পর অন্ধকারে আনয়ন করিলে অনেক হীরক হইতে আলোক-রশ্মি নির্গত হইতে থাকে; এই গুণকে ফস্‌ফরেসেন্স ( Phosphoresence ) বলে। অপর কতকগুলি হীরক সূর্য্যালোকে দুগ্ধাভ বর্ণ ধারণ করে। ফস্‌ফরেসেণ্ট গুণটি ছোট ছোট হীরকখণ্ডে কেবলমাত্র সূর্য্য-কিরণে বিকাশ লাভ করে, অপেক্ষাকৃত বৃহৎ হীরকখণ্ডে এই গুণটি দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু শূন্য পাত্রে রাখিয়া উচ্চাঙ্গের বৈদ্যুতিক প্রবাহ সঞ্চারণ করিলে সকল হীরকখণ্ডই নানাপ্রকার আলোক—লাল, নীল, হরিদ্রাভ—প্রদান করিতে থাকে। সার উইলিয়াম ক্রুক্‌স্ মহোদয় তাঁহার লিখিত “হীরক” পুস্তিকার এক স্থানে লিখিয়াছেন যে, তাঁহার নিকট এমন একটি হীরকখণ্ড আছে, যাহা হইতে এত অধিক পরিমাণে আলোক নির্গত হইতে থাকে যে, তৎসাহায্যে অনায়াসে পুস্তকাদি পাঠ করিতে পারা যায়। এই আলোকপ্রদানের ক্ষমতার সহিত হীরকমধ্যস্থ তাড়িতকণার ( Electron ) উপরিভাগে সংঘাতের নিশ্চিতই কোন সম্বন্ধ আছে। অর্থাৎ হীরকমধ্যস্থ তাড়িত কণাগুলি নেগেটিভ প্রান্ত হইতে বিদূরিত হইলে বিপুল গতিতে উপরিস্থ তলের সহিত সংঘর্ষ ঘটায় ও তাহার ফলে আলোক নির্গত হইতে থাকে। ইহার অগ্রবল এত প্রবল যে, যদি এই শক্তি প্ল্যাটিনম্ ( Platinum ) ও ইরিডিয়মের মত ধাতুকে আঘাত করে, তাহা হইলে তাহারাও গলিয়া যায়। বিপুল শক্তিশালী নলের ( Radiant matter tube ) মধ্যে রাখিলে ইহা হইতে কেবলমাত্র যে আলোক নির্গত হইতে থাকে, তাহা নহে, পরন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে ইহা কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। এই কৃষ্ণতা কেবলমাত্র পৃষ্ঠদেশে বিস্তৃত থাকিলেও, অর্থাৎ অগভীর হইলেও হীরকচূর্ণ সাহায্যে পালিশ করা ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায়ে দূরীভূত হয় না।[†] এই অগভীর কৃষ্ণাবরণ যে গ্র্যাফাইট, তাহা মিঃ ক্রুক পরীক্ষায় স্থির করিয়াছেন। ময়েজান ( Moissan ) দেখাইয়াছেন যে, এই গ্র্যাফাইট্ ৩ হাজার ৬ শত ডিগ্রী সেন্‌টিগ্রাড পরিমাণ তাপের সংযোগফলে সৃষ্ট হইতে পারে; সুতরাং ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, সংঘাতকারী তাড়িত-কণা হীরকের সহিত এত প্রবলবেগে সংঘর্ষ ঘটায় যে, উপরিস্থ আবরণের তাপ ৩ হাজার ৬ শত ডিগ্রীতে উত্থিত হইয়া গ্র্যাফাইটে পরিণত হয়। অপর পক্ষে হীরকের তাপপরিচালন-শক্তি এত প্রবল যে, হীরকের সাধারণ তাপ অল্প থাকায় নলটি অল্প উষ্ণ থাকে। গ্র্যাফাইটকে আমরা হীরকে পরিবর্ত্তিত করিতে পারি না, হীরককে গ্র্যাফাইটে পরিণত করিতে পারি। বৈদ্যুতিক বৃত্তাংশকার মহানস ( Electric arc furnace )এ উত্তপ্ত করিলে ইহার তাপ বৃদ্ধি পাইয়া ৩ হাজার ৬ শত ডিগ্রী পরিমাণ হইবামাত্র হীরক ভগ্ন হইয়া স্ফীত হইতে থাকে ও অল্পক্ষণ পরেই কৃষ্ণবর্ণ মূল্যহীন গ্র্যাফাইটে পরিণত হয়।

ঘর্ষণ করিলে কোন কোন হীরক হইতে আলোক নির্গত হইতে থাকে—যদিও এ আলোক তত সতেজ নহে ও শীঘ্রই নিঃশেষিত হইয়া যায়। শুষ্ক বস্ত্রে ঘর্ষণফলে হীরক যোগাত্মক বিদ্যুৎ ( Positive Electricity ) গ্রহণ করিয়া থাকে। অন্যান্য প্রকার অঙ্গার—গ্র্যাফাইট্ ও কোক যেরূপ বিদ্যুৎপরিচালক, হীরক তদ্রূপ নহে; ইহা প্রতিরোধক মাত্র।

হীরকের কঠিনতা ইত্যাদি গুণাবলী উল্লিখিত হইল; এতদ্ব্যতিরেকেও নয়নপ্রীতিকর অপর কতকগুলি গুণাবলী বর্ত্তমান আছে বলিয়া হীরক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্নরূপে পরিগণিত। ইহাদিগকে এক কথায় আলোক-গুণাবলী বলা হইয়া থাকে; কেন না, ইহারা আলোক-রশ্মির উপর নির্ভর করে। যাহাতে এই গুণাবলী সম্পূর্ণরূপে বিকাশ লাভ করে, মণিকর্ত্তকদিগের সমস্ত উদ্যম যত্ন সেই পথে পরিচালিত হয়। কোন একটি রত্নোপরি আলোক-রশ্মি পতিত হইলে তাহার গতি ও কার্য্য তিন প্রকারের হইয়া থাকে। (১) প্রতিফলিত হওয়া, (২) পৃষ্ঠ ভেদ করিয়া চলিয়া যাওয়া, (৩) ফস্‌ফরেসেন্স গুণ বিকশিত করা। এই তিন প্রকার কার্য্যের ফলে যে কয়েকটি গুণ রত্নমধ্যে বিকশিত হয়, তাহা একে একে আলোচিত হইবে। বর্ণ ও উজ্জ্বলতা প্রথম গুণের উপর নির্ভর করে। সাধারণতঃ হীরকখণ্ডে কোন প্রকার বর্ণ দৃষ্ট হয় না, তাহার কারণ এই যে, শ্বেত আলোকের সমুদায় রশ্মি হীরকখণ্ডের উপর যে পরিমাণে পতিত হয়, সেই পরিমাণেই প্রতিফলিত হইয়া যায়, অপর ক্ষেত্রে গ্র্যাফাইটে এই রশ্মিগুলি প্রতিফলিত হয় না বলিয়া ইহা দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ। সবুজ হীরকে সবুজ রশ্মি ব্যতীত অপর রশ্মি প্রতিফলিত হয় বলিয়া ইহা দেখিতে সবুজ। বর্ণ দ্বারা প্রস্তর-পরিচয় সম্ভবপর নহে; একই প্রস্তরের বর্ণ বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। লাল, নীল, পীত ইত্যাদি বহুবিধ বর্ণের হীরক পাওয়া যায়, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

উজ্জ্বলতার তারতম্যানুসারে প্রস্তরাদিকে সাত ভাগে বিভক্ত করা হয়। উজ্জ্বলতায় হীরক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আভা-বিকিরণ ক্ষমতায় হীরক অদ্বিতীয়।

আলোকের দ্বিতীয় কার্য্যের উপর প্রস্তরের স্বচ্ছতা এবং আলোক-বক্রতা ও পোলারিজেসন ( Polarisation ) ক্ষমতা নির্ভর করে। হীরক স্বচ্ছ, কেন না, আলোকরশ্মি ইহার ভিতর দিয়া পূর্ণমাত্রায় চলিয়া যাইতে পারে। আলোকরশ্মির দিক্‌পরিবর্ত্তনফলে ( Refraction ) হীরকমধ্যে কতকগুলি গুণের বিকাশ-সাধন হয়। দিক্ পরিবর্ত্তন দ্বিবিধ। প্রথম ক্ষেত্রে আলোকরশ্মির পথ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় মাত্র ( Single refraction ), দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আলোকরশ্মি দ্বিখণ্ডিত হইয়া দুই বিভিন্ন পথ অবলম্বন পূর্ব্বক চলিয়া থাকে। ( Double refraction ). হীরকে আলোকরশ্মি দ্বিখণ্ডিত হয় না, ইহার পথ পরিবর্ত্তিত হয় মাত্র। শ্বেত আলোকরশ্মির উপাদানগুলি

---

[*] Diamond by Sir William Crooks.

[†] Diamond—Crooks,

সমান্তরালে অবস্থিত কাচপৃষ্ঠ ভেদ করিয়া যাইবার সময় সমভাবে বিচলিত হয় না বা দিক্ পরিবর্ত্তন করে না ; কিন্তু দ্বিতীয় পৃষ্ঠ ভেদ করিয়া যাইবার সময় তাহারা পুনরায় বিচলিত হইয়া প্রাথমিক দিকের সমান্তরালে চলিয়া থাকে। ( চিত্র ৩ ) কিন্তু এই রশ্মি ত্রিপার্শ্ববিশিষ্ট স্বচ্ছ ঘন পদার্থের ( Prism ) মধ্য দিয়া চলিবার সময় ইহার দিক অধিকতর বিচলিত হইয়া যায়। ইহাকে বিক্ষেপশক্তি (Dispersion) বলে। হীরকের বিক্ষেপক্ষমতা অত্যন্ত বলবতী। হীরকের সৌন্দর্য্য এই গুণের উপর প্রধানতঃ নির্ভর করে, কেন না, আলোকরশ্মির সমস্ত উপাদানের দিক্ বিভিন্ন মাত্রায় পরিবর্ত্তিত হওয়ায় তাহারা বিভিন্ন বর্ণ ধারণ করিয়া হীরকমধ্য হইতে বাহির হইয়া আইসে। (চিত্র৪) আলোক-রশ্মি প্রতিফলিত ও দিক পরিবর্ত্তিত ( Refraction ) করিতে হীরক অদ্বিতীয়। হীরক কর্ত্তিত করিবার সময় এই বিষয়ে দৃষ্টি রাখা হইয়া থাকে। ব্রিলিয়াণ্ট আকারে কর্ত্তন করিবার সময় নিম্নস্থ পৃষ্ঠগুলি আনত করিয়া রাখা হয়, যাহাতে আলোক-রশ্মি ২৪°১৩´ কোণে পতিত হইয়া সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয়। হীরকের সম্মুখভাগে পতিত আলোক-রশ্মি যে কেবলমাত্র প্রতিফলিত হয়, তাহা নহে, পরন্তু হীরকাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট আলোক-রশ্মি অভ্যন্তরস্থ পৃষ্ঠের সংস্পর্শে প্রতিফলিত হইয়া নির্গত হইবার কালীন দিক্‌পরিবর্ত্তন করিয়া বহুবিধ বর্ণ ধারণ করে। ইহারই ফলে হীরকখণ্ড আলোক বিচ্ছুরিত করিতে থাকে। ( চিত্র ৫ ) 'ক' আলোক-রশ্মি হীরকপৃষ্ঠে পতিত হইয়া হীরকঅভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া দিক্ পরিবর্ত্তন করে ; পরে তাহারা 'খ' রেখায় চলিতে থাকে ও আভ্যন্তরিক তিনটি পৃষ্ঠের ( 'গ' 'চ' 'ছ' ) সংস্পর্শে আসায় পূর্ণমাত্রায় ৩ বার প্রতিফলিত হইয়া পরিশেষে পুনরায় দিক পরিবর্ত্তিত করিয়া বিভিন্ন বর্ণ ধারণ পূর্ব্বক বাহির হইয়া আইসে।

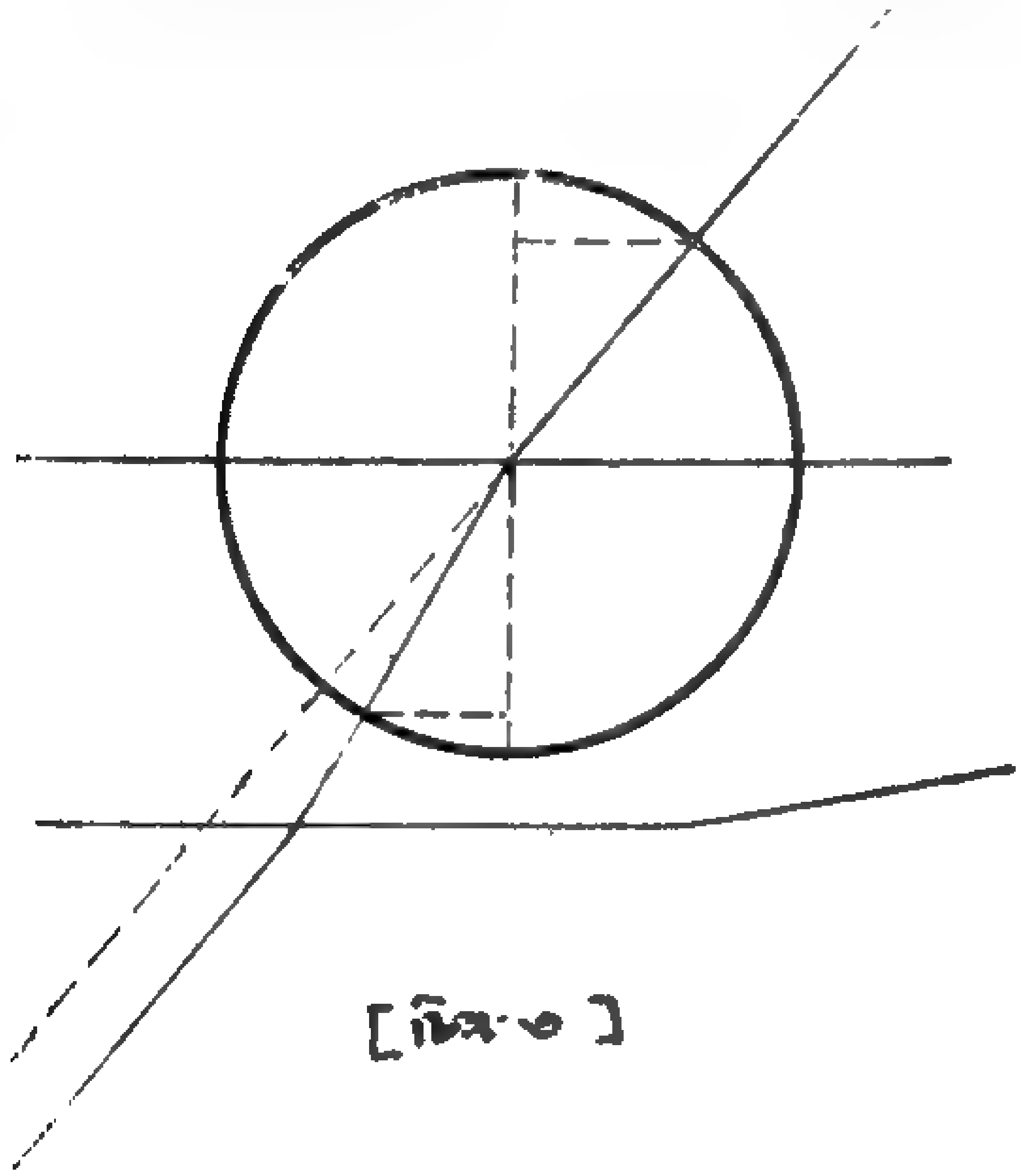

[ চিত্র-৩ ]

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, হীরকে আলোক-রশ্মি দ্বিপথে চালিত হয় না। কাযেই অণুবীক্ষণ যন্ত্রে যুক্ত নিকলের ( Crossed Nicol ) মধ্যে রাখিয়া পরীক্ষা করিলে হীরকখণ্ড প্রতিভাত হয় না।

হীরকখণ্ড রাখিবার পূর্ব্বে অণুবীক্ষণের আধার ( Rotating Stage ) যেরূপ অন্ধকার থাকে, হীরকখণ্ড রাখার পরও সেইরূপ অন্ধকার থাকে, কিন্তু কোন কোন হীরকখণ্ডে ইহার ব্যতিক্রম হইতে দেখা যায় ; ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, অণুগুলির পরস্পর প্রবলবেগে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ করায় ইহার স্বভাবের ব্যতিক্রম ঘটে। কোন কোন হীরকে এইরূপ আকর্ষণের চিহ্ন সুস্পষ্টরূপে পোলারিস্কোপ ( Polariscope ) যন্ত্রে দেখা যায়। সার উইলিয়াম ক্রুকস্ বহু হীরক পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, পরস্পরের আকর্ষণই মূল কারণ। সময়ে সময়ে হীরকমধ্যস্থ আকর্ষণ এত প্রবল থাকে যে, খনি হইতে উত্তোলিত করিয়া উপরে আনিবামাত্র প্রবলবেগে বিদীর্ণ হইয়া যায়! অনেক সময়ে দেখা গিয়াছে যে, সদ্যোত্থিত হীরকখণ্ড মুঠার মধ্যে রাখায়, হস্তের ঐ সামান্য উষ্ণতার সংস্পর্শে বিদীর্ণ হইয়া যায়।

আলোকের তৃতীয় কার্য্য—ফস্ফরেসেন্স গুণের বিকাশ কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

ওয়াল্টার নামক বিশেষজ্ঞ হীরকমধ্য দিয়া আলোক-রশ্মি পাতিত করিয়া স্পেকট্রস্কোপ যন্ত্রে পরীক্ষা করিয়া প্রত্যেক বর্ণহীন এক ক্যারাট অপেক্ষা অধিক ওজনের হীরকের ৪১৫৫ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ( Wave length ) শোষণ বেষ্টনী ( absorption Band ) দেখিতে পাইয়াছেন।

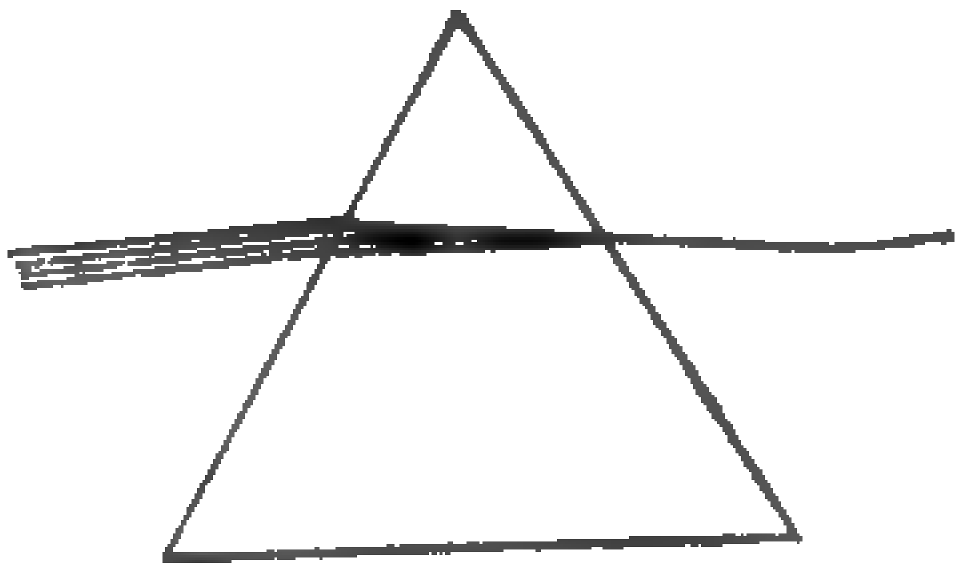

[ চিত্র-৪ ]

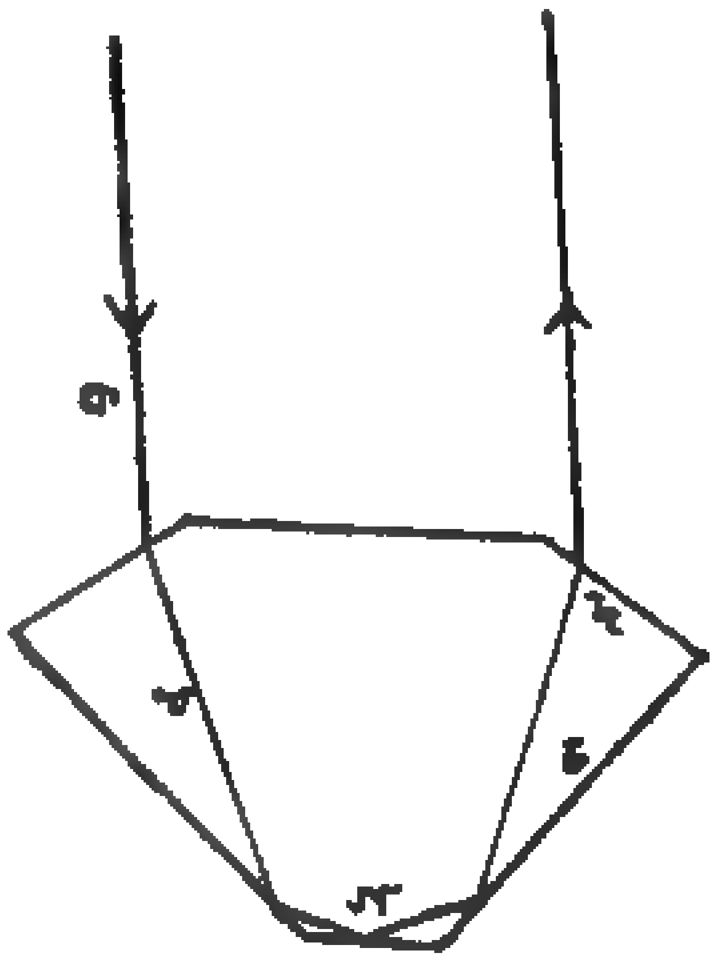

[ চিত্র-৫ ]

আর এক বিষয়ে হীরক সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। রণ্টজেন রশ্মিতে হীরকের স্বচ্ছতা হ্রাস পায় না, অপর পক্ষে কৃত্রিম হীরক ( কাচ ) অস্বচ্ছ প্রতীয়মান হয়। রেডিয়াম হইতে নিঃসৃত রশ্মি ( B-rays ) সংস্পর্শে হীরক আভা বিকিরণ করিতে থাকে। কতকগুলি বর্ণহীন হীরকখণ্ড রেডিয়াম ব্রোমাইডে নিমজ্জিত করিয়া প্রায় ১ মাস পরে মিঃ ক্রুক দেখিয়াছেন যে, তাহারা রেডিয়ামের সংযোগফলে নীলাভ সবুজ বর্ণ ধারণ করিয়াছে, এই বর্ণের জন্য হীরকের মূল্য হ্রাস না পাইয়া বরং বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

সংক্ষিপ্তভাবে হীরকের প্রধান প্রধান গুণাবলী উল্লিখিত হইল ; এই গুণাবলী পরীক্ষা করিয়া অকৃত্রিম হীরক চেনা সহজ।

[ ক্রমশঃ।

শ্রীশিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

# বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ

## গরু-মহিষ

আমেরিকা পশুপালনে কৃতিত্বের জন্ত প্রসিদ্ধ। সেখানে বড় বড় বাথানে গরু, মহিষ, ঘোড়া, ভেড়া, ছাগল প্রভৃতি পালন করা হয়, বংশবৃদ্ধি করা হয়, জাতির উৎকর্ষসাধন করা হয়। সম্প্রতি ক্যানাডার গভর্মেণ্ট সরকারী গোঠে গাই-গরু ও ষাঁড়-মহিষ সংযোগে এক নূতনবিধ সঙ্কর জন্তু সৃষ্টি করেছেন। তার নাম তাঁরা রেখেছেন ক্যাটালো (cattalo); আমরা তাকে গরু-মহিষ বল্‌তে পারি।

এই সঙ্কর পশু তাহাদের জনক-জননী উভয়ের গুণ উত্তরাধিকার-সূত্রে পাচ্ছে; ইহার ফলে ইহাদের চামড়া মহিষ ও গরুর মাঝামাঝি রকমের শক্ত অথচ কোমল হচ্ছে এবং লোমশ হচ্ছে; এই লোম কোঁকড়ানো, অলকগুচ্ছ-বিন্যস্ত ও চক্‌চকে; এই জন্য এই চামড়ার চাষী মজুররা তাদের জামা তৈরী করাচ্ছে। এই পশু খুব কষ্টসহিষ্ণু হয়েছে, ঝড়-বৃষ্টি এবং ব্যাধির আক্রমণে ইহারা বেশ অপ্রতিহত থাকে। ইহারা যা-তা খেয়ে বেশ সুস্থশরীরে জীবন-ধারণ কর্‌তে পারে, সে রকম খাদ্য খেয়ে কেবল গরু বা কেবল মহিষ সুস্থ-সবল থাকে না। বরফ পড়ার সময়ও ইহারা খোলা যায়গায় স্বচ্ছন্দে থাকতে পারে।

কিন্তু প্রকৃতিগত বৈষম্য অত্যন্ত অধিক ব'লে গরু ও মহিষের সঙ্কর শাবক প্রায়ই বাঁচে না, বাঁচলেও তাদের সন্তানোৎপাদনের শক্তি থাকে না। ঘোড়া ও গাধার সঙ্কর শাবক খচ্চরের অবস্থাও এই রকম।

তাহার পর গরু-মহিষে মিলন ঘটানোও এক কঠিন ব্যাপার। কিন্তু পরীক্ষা কর্‌তে কর্‌তে জানা গেছে যে, মহিষ ও গরুর বাছুর শৈশব থেকে একত্র প্রতিপালিত হ'লে তাহাদের মধ্যে মিথুনভাব সহজেই সঞ্জাত হয়।

ক্যানাডায় এখন চেষ্টা চলেছে এসিয়ার য়্যাক দিয়ে গরু বা মহিষ থেকে কোন রকম সঙ্কর শাবক উৎপাদন

গাইগরু ও ষাঁড়মহিষ সংযোগে সঙ্কর জন্তু 'ক্যাটালো'

সঙ্কর মহিষ

করার। য়্যাক জনক ও মহিষী জননী থেকেও উৎকৃষ্ট সঙ্কর প্রাণী উৎপন্ন হয়েছে।

এই সাঙ্কর্য্য-সাধন খুব যত্ন ও ধৈর্য্য-সাধ্য। কিন্তু চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নেই, এ কথা পাশ্চাত্য জাতি বিশেষ-ভাবে উপলব্ধি করেছে। তাহাদের নিরন্তর চেষ্টার ফলে জগতে বহুবিধ নূতন্ প্রাণীর সৃষ্টি হচ্ছে ও হবে।

আমাদের দেশেও গরু ও মহিষের বিবিধ শ্রেণী ও বর্গ আছে; আসামের মিথান, তিব্বতের য়্যাক, দেশী গরু মহিষ প্রভৃতির সম্মিলনে আমাদের নষ্টপ্রায় পশু-সম্পত্তির উন্নতি করার চেষ্টা দেশের কর্ম্মী যুবকদের কর্ত্তব্য।

## মরুভূমিতে মাছ

মরুভূমিতে মাছ

আফ্রিকার সাহারা মরুভূমি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় মরুভূমি। এক কালে এই বিস্তীর্ণ ভূভাগ সমুদ্রের তলে ছিল; সমুদ্রের জল স'রে গেছে, প'ড়ে আছে দিগন্তবিস্তীর্ণ বালুকাময় প্রান্তর—ধূসর ঊষর জলশূন্য উদ্ভিদ্-বর্জ্জিত। সাহারা-পারের যাত্রীরা বালির ঝড়ে আক্রান্ত হয়ে মাটীর উপর সটান হয়ে শুয়ে আত্মরক্ষা করবার চেষ্টা করে; তখন অনেকে মাটীর উপর কান পেতে থেকে শুনেছে, সাহারার শুষ্ক তপ্ত বুকের তলা দিয়ে ফল্গু-নদীর প্রবল জলস্রোত কলকল রবে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। এ বড় বিষম অবস্থা—তপ্ত-বালুকা-দগ্ধ পথিক মরুভূমির বুকের উপরে জলাভাবে তৃষ্ণায় মুমূর্ষু আর মরুভূমির বুকের তলা দিয়ে অনাবশ্যক জলস্রোত মুমূর্ষুর কানে নিষ্ঠুর পিশাচের অট্টহাসির মত কলকল শব্দ ক'রে ছুটে চলেছে, তার একটি বিন্দুও কারও পাবার জো নেই!

মরু-যাত্রীদের পিপাসা-নিবারণের জন্য ফরাসী গভর্ণমেণ্ট প্রথম সাহারার স্থানে স্থানে কূপ খনন করান। এই সব কূপ প্রায় দেড়-শ ফুট গভীর। প্রথম কূপটি খনন করতে করতে মরুতলবাহী ফল্গু-স্রোতের সঙ্গে গর্ত্তের যেই যোগ হয়ে গেল, অমনই হাজার হাজার ট্রাউট-মাছের পোনা কূপের জলে থলথল ক'রে লাফাতে লাগলো। এই মাছগুলির আকার ও রং নদীর মাছের মতই;—যদিও নিকটতম নদী সেই কূপ থেকে অনেক মাইল দূর দিয়ে প্রবাহিত।

আমেরিকার কেণ্টকী জিলার গুহাবাসী মাছেরা অন্ধকারে থেকে অন্ধ; কিন্তু মরুতলের নদীর মাছেরা সে রকম অন্ধ নয়, খোলা নদীর মাছের মতই চক্ষুষ্মান্। পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের প্রভাবে জীবের শারীরিক গঠনের তারতম্য ঘটে। এই বালুকা-তল-বিহারিণী নদীর মাছেদের অন্ধ হওয়ারই কথা; কিন্তু তাহারা চক্ষুষ্মান্ হয়ে অনেক বৈজ্ঞানিকের চক্ষুস্থির ক'রে দিয়েছিল। এখন কিন্তু তাঁহারা ইহার কারণ আবিষ্কার করেছেন।

আরবদের মধ্যে একটা কিংবদন্তী চলিত আছে যে, যখন তাহাদের পূর্ব্বপুরুষরা সপ্তম শতাব্দীতে আফ্রিকার উত্তর উপকূলে উপনিবেশ স্থাপন করে, তখন সাহারা এখনকারমত মরুস্থলী ছিল না; সেখানে জল ও গাছপালা ছিল এবং ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত জল একেবারে শুষ্ক ও গাছপালা একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় নি। আমাদের বাঙ্গালা-দেশের চব্বিশ-পরগণার অনেক স্থানে যেমন লুপ্ত গঙ্গার খাতে সঞ্চিত জল এখন অধিকারীদের নামে, ঘোষের গঙ্গা, বোসের গঙ্গা নামে পরিচিত হয়, তেমনই সাহারার মধ্যেও স্থানে স্থানে যে জলাশয় এখন শুষ্ক হয়ে আছে, সেই সব গর্ত্তকে আরবেরা এখন নদী বলে। ইহা হইতে অনুমান হয়, এক সময়ে যে নদী মাটীর উপর দিয়ে প্রবাহিত হ'ত,

তা কালে বালির তলায় চাপা প'ড়ে গেছে এবং নদীর মাছেরা সেই ফল্গু-স্রোতে এখনও স্বচ্ছন্দে বিচরণ করছে।

এই সব মরু-কূপে যে সব মাছ পাওয়া যাচ্ছে, তাদের সমজাতীয় মাছ প্যালেস্টাইনের নদীতে ও আফ্রিকার নদী হ্রদে দেখতে পাওয়া যায়। অতএব ইহাও সম্ভব যে, এই সব নদী-হ্রদের সঙ্গে মরুতলবাহিনী নদীর সংযোগ আছে এবং বালির তলে তলে স্রোত বেয়ে মাছেরা খোলা নদী-হ্রদে যাতায়াত করে।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

# কুতব-মিনার

কীর্ত্তির সু-উচ্চ স্তম্ভ, সৃষ্ট হ'লে যবে
স্তম্ভিত হইল লোক। দানবে-মানবে
কত কীর্ত্তি বিনাশিল ধরণী-ধূলায়;
অতীতের ইতিহাস হৃদয় ভুলায়
তা'দের গৌরব-গাথা নতশিরে গাহি'।
অতীতের কীর্ত্তি-লীলা-জয়-গীতি বাহি'
তুমি এলে কালস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে
উন্নত—উষ্ণীষ শিরে হাসিতে হাসিতে!
দিল্লী-ভূমে নাই আর সে প্রভাত-আলো,
কবর-যালিকা-ঢাকা শর্ব্বরীর কালো।
নাই সেই সুমহান বিরাট কল্পনা,
সম্রাটের অন্তরের দোহদ বেদনা
কীর্ত্তি তরে। ঘরে ঘরে কোথা সে উল্লাস,
নব নব চমৎকার কীর্ত্তির প্রয়াস!

* * *

সাত শত বৎসরের ঝঞ্ঝা, বজ্ররাশি
গর্ব্বোদ্ধত শিরে তব পড়িয়াছে আসি'—
তুমি অবহেলাভরে হেলাইয়া গ্রীবা
সেই হ'তে দাঁড়াইয়া আছ রাত্রি-দিবা!
আজি আমি আসিয়াছি বহু আশা ক'রে,
সোপানের বাহু মেলি' লহ তুলি মোরে।
দৈত্য-বীর, আসিয়াছি বিস্ময়—নির্ব্বাক্—
ইতিকথা যাক্ আজি, স্তব্ধ হয়ে থাক্!
চাহি না মানিতে আমি, নর-হস্ত দিয়া
মূর্ত্তি তব সৃষ্ট হ'ল প্রস্তর গাঁথিয়া।
মোর কাছে তুমি শুধু দম্ভের প্রতীক
হে অটল শিলাস্তম্ভ, এই কথা ঠিক!
সৃষ্টির প্রারম্ভ তব মহিমা-মণ্ডিত,
সে মহিমা চিরোজ্জ্বল, হ'বে না অতীত।
নীচ, নিম্ন, অল্পতুষ্ট নহ তুমি বীর!
নহ তুমি ঝঞ্ঝাতীত, তুমি চির-স্থির।
নব নব শিশুদল তোমার চৌদিকে
ভীড় ক'রে তোমা' পানে চাহে অনিমিখে!
তা'রা শুভ্র, মঞ্জুবেশ, সে দিন জনম,
মানবের তুলিকায় রূপ অনুপম;
তোমার প্রাচীন চক্ষে উঠে তা'রা ভাসি'
শিশুসম; পিতামহ, তুমি উঠ হাসি'!

* * *

স্মিতহাস্যে চেয়েছিলে কখন্ কে জানে
নৃত্যোচ্ছল, নিত্যোজ্জ্বল দিল্লী-পুরী পানে!
তা'র পর ম্লানমুখে, ব্যথিত-অন্তরে,
দৃষ্টি তব বদ্ধ হ'ল পাণিপথ'পরে।
বৃদ্ধ বীর, অশ্রু তব করিয়া সংযত
ধ্বংস-লীলা দেখেছিলে পাষাণের মত।
তোমার আদর যা'রা করিত, সকলে
বক্ষোরক্ত মিশাইল যমুনার জলে!
নিভে গেল হীরকের মাণিক্যের দ্যুতি,
নূপুর-নিক্কণ মূক, শুষ্ক অনুভূতি!
তা'ও তুমি অচঞ্চল দেখিলে দাঁড়ায়ে,
সে স্মৃতি দিতেছে আজি বেদনা বাড়ায়ে।
যেথা ছিল সুবিশাল অট্টালিকামালা,
প্রমোদ-মালঞ্চ শত, গন্ধ-গীতি ঢালা,
একে একে তাহাদের বক্ষের উপর
লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে হ'ল নির্ম্মিত কবর।

* * *

যাহাদের কীর্ত্তিভরে পৃথ্বী টলমল,
অনুপম সুখৈশ্বর্য্য, অতুলন বল,
আজি তা'রা একে একে তোমার সম্মুখে
শায়িত হয়েছে মৃৎ কবরের বুকে!
শুয়ে আছে বাদশাহ, নবাব, সম্রাট,
শেষ হয়ে গেছে ভোগ, শেষ রাজ্য-পাট;
গোলাপজলের উৎস রুদ্ধ চিরতরে,
নৃত্য-গীত বন্ধ রঙমহলের ঘরে,
বেগমেরা চির-সুপ্ত। আতর-সৌরভ
মুক্তবায়ে বিলায়েছে আপন গৌরব।
মর্ম্মর-প্রাসাদ, আর কক্ষ চমৎকার
অতীতের সাক্ষ্য দেয়, বক্ষে হাহাকার!
শূন্য নভে বৃথা আজ কাঁদিছে বাতাস,
কবরের রাজ্য যুড়ে বিরাজে হুতাশ!
হুতাশের হু-হু শ্বাসে পঞ্জরে তোমার
বেদনা কাঁদিয়া উঠে। ভেদি রুদ্ধ দ্বার
মেঘমন্দ্র দীর্ঘশ্বাস বাজে অহরহ,
তোমার বিপুল ব্যথা মোরে কিছু কহ!
হে বিরাট শিলা-স্তম্ভ, সমীপে তোমার
আসিয়া দাঁড়ানু আজি, চাহ একবার—
তোমার অটল বক্ষে যে বেদনা বাজে,
তা'র প্রতিধ্বনি শুনি মোর হিয়া-মাঝে;
ভ্রমিয়াছি বহু-দূর সম্ভ্রমে, বিস্ময়ে,
যেথা যাই, যেথা চাই, চক্ষে অশ্রু বহে!
নিজ ধ্বজা গর্ব্বভরে বহি' উচ্চশিরে
ধ্বংসহীন দাঁড়ায়েছ মহাকাল-তীরে!
যত ব্যথা বক্ষে চাপি' আছ হে সংযমী!
সংসারের রণ-গুরো, নমি তোমা' নমি!
তব মাঝে বাজে সুর অশ্রুত বীণার—
ক্রন্দন-ও শুনেছি তব, কুতব-মিনার!

শ্রীরামেন্দু দত্ত

# সচিত্র য়ুরোপ *

## হ্বিয়েনায় বিশ্বমেলা

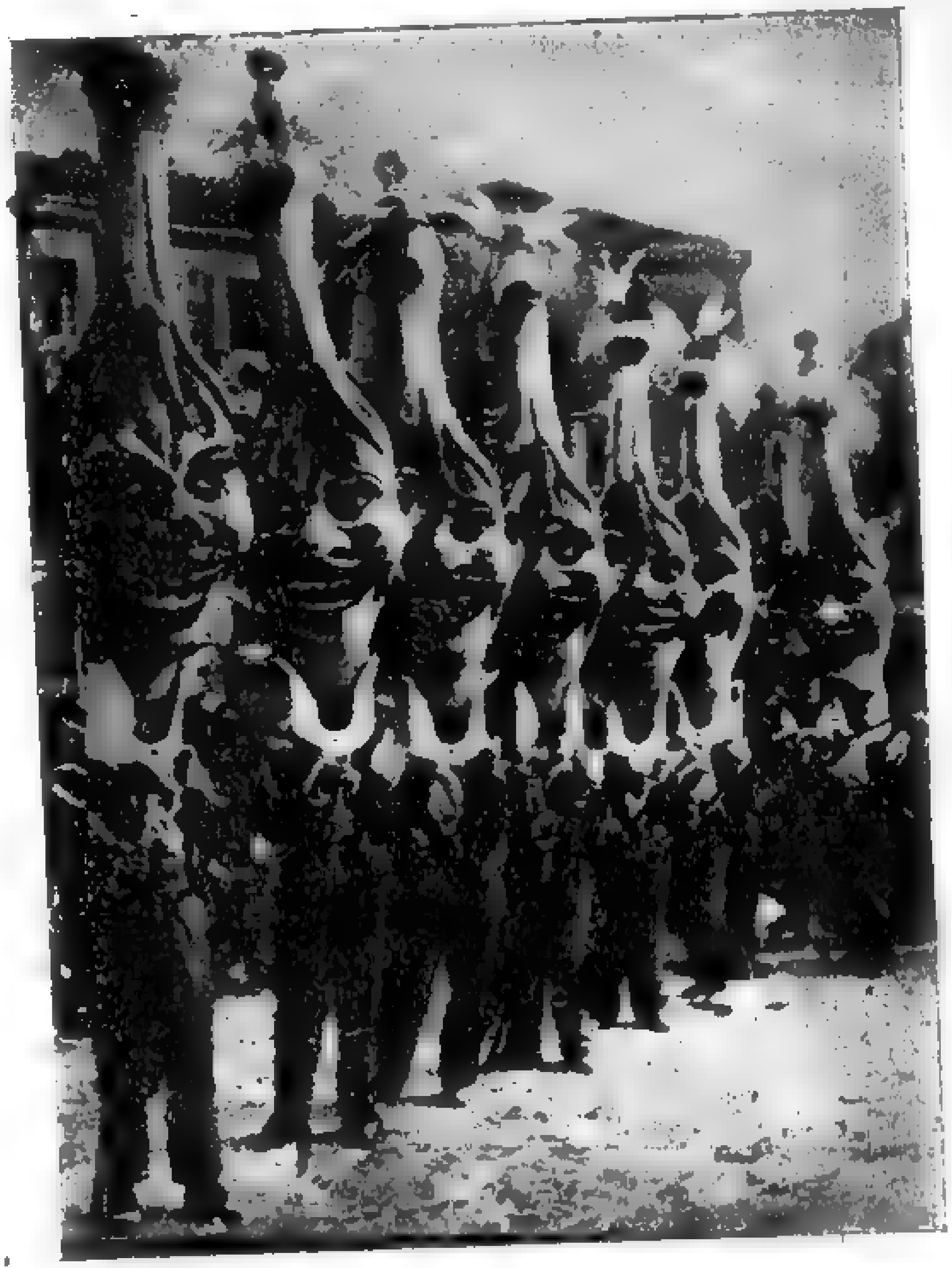

ফরাসীদের মুখোস মিছিল ( নিস নগরে অনুষ্ঠিত—
নিস ভূমধ্যসাগরের কিনারায় দুনিয়ার এক বিলাস-কেন্দ্র )

মার্চ্চ মাসের মাঝামাঝি হ্বিয়েনায় এক আন্তর্জ্জাতিক মেলা বসিয়াছিল। কি য়ুরোপে, কি এসিয়ায় মেলা ছিল মধ্যযুগের সওদা কেনা-বেচার প্রধান প্রতিষ্ঠান। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে পাশ্চাত্য জগতে মেলার আবার আদর বাড়িয়াছে।

হ্বিয়েনায় এই মেলার প্রধান কথা এই যে, মহা লড়াইয়ের ফলে অষ্ট্রীয়া-হাঙ্গারি টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া গিয়াছে। কাযেই বাদশাহী সহর হ্বিয়েনার আর সে কালের রাষ্ট্রীয় গৌরব নাই। কিন্তু মধ্য-য়ুরোপের সর্ব্ব বৃহৎ বাণিজ্য-কেন্দ্র হিসাবে নবীন অষ্ট্রীয়ান রিপাব্লিকের রাজধানী আজও দুনিয়ার ব্যবসায়ী মহলে সুপ্রতিষ্ঠিত।

অষ্ট্রীয়ার শিল্পকর্ম্ম জার্ম্মাণীদের সঙ্গে চিরকালই টক্কর দিয়াছে। বহু অষ্ট্রীয়-মাল ভারতে জার্ম্মাণ মাল নামেই লড়াইয়ের পূর্ব্বে পরিচিত ছিল। লোহালক্কড়, যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, কাচ, কাগজ, রাসায়নিক দ্রব্য, চামড়ার কায ইত্যাদি বহু দিকে অষ্ট্রীয়ান কারখানাগুলা য়ুরোপে এবং আমেরিকায় সুপ্রসিদ্ধ। সেই সব মাল যোগাইবার ক্ষমতা অষ্ট্রীয়ার আজও আছে। হ্বিয়েনার এই মেলায় তাহাই প্রচারিত হইল।

হ্বিয়েনার সঙ্গে ভারতবাসীর লেন-দেন বাড়িলে মধ্য-য়ুরোপের সকল দেশেই ভারতসন্তানের প্রতিপত্তি বাড়িতে থাকিবে। মধ্য-য়ুরোপের সঙ্গে কারবার চালাইতে হইলে ভারতবাসীকে বিলাতের মারফৎ অথবা জার্ম্মাণীর মারফৎ যাইবার দরকার নাই। ভারতসন্তান সোজাসুজি হ্বিয়েনার কারখানা ও ব্যাঙ্কগুলা স্পর্শ করিলেই সুফললাভ হইতে পারিবে।

ফরাসীদের মুখোস-মিছিল ( নিস নগরে অনুষ্ঠিত )
( "ভোআইট্‌সার ইলুষ্ট্রিয়র্টে ৎসাইটুঙ" হইতে উদ্ধৃত )

---

* হ্বিয়েনার ছবিগুলা "সেন্ট্রাল য়ুরোপীয়ান্ রিভিউ" হইতে উদ্ধৃত করা হইতেছে।

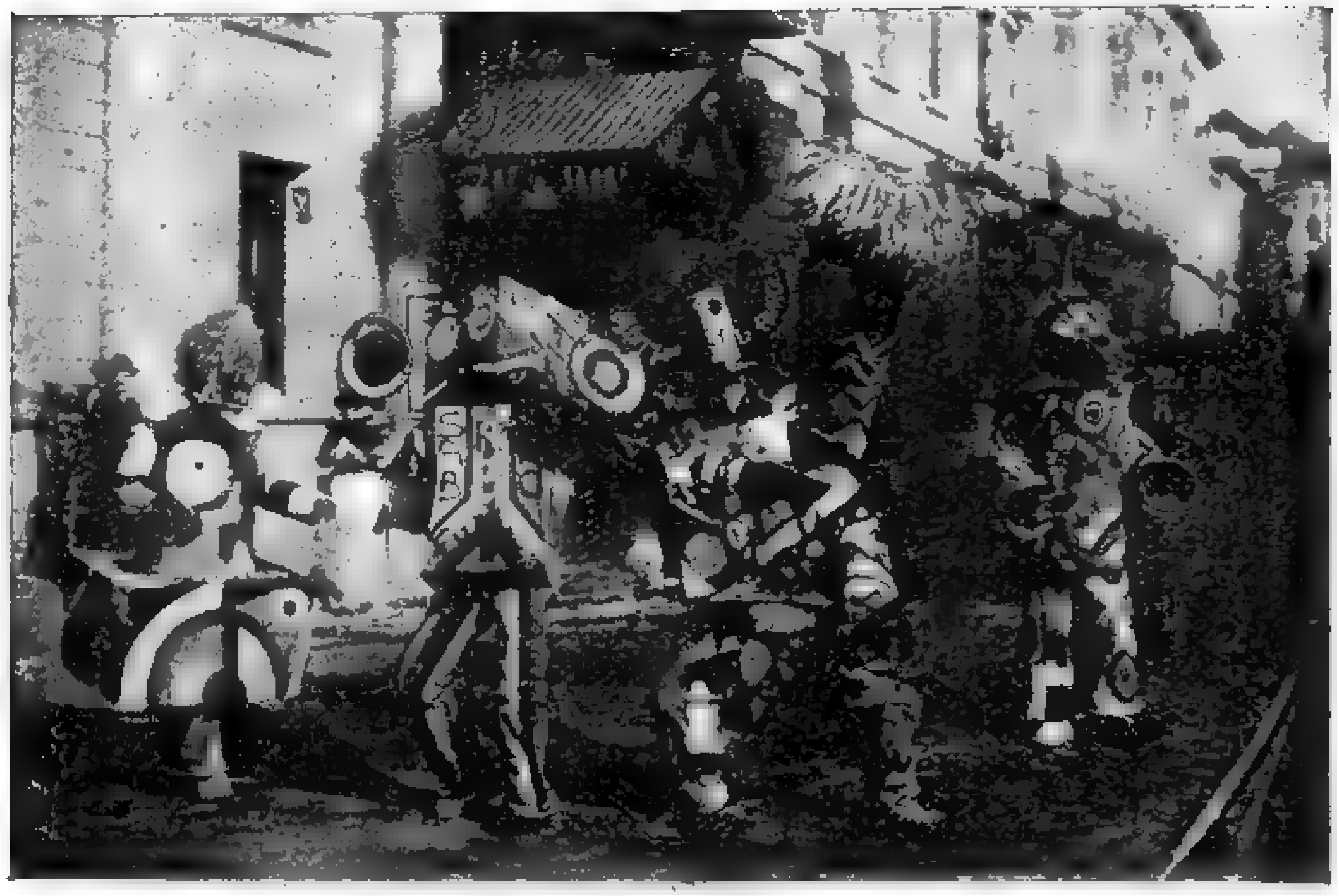

বাজেল সহরে মুখোস-মিছিল ( বাজেল সুইস সহর, জার্ম্মাণীর কিনারায় )

জুরিচে মুখোস-মিছিল ( "বোআইট্সার কামিলিয়ে" হইতে উদ্ধৃত )

সুইট্জার্ল্যাণ্ডে মুখোস-মিছিল ( বাজেল )
( "শ্বোআইট্সার ইলুষ্ট্রিয়ের্টে ৎসাইটুঙ" হইতে উদ্ধৃত )

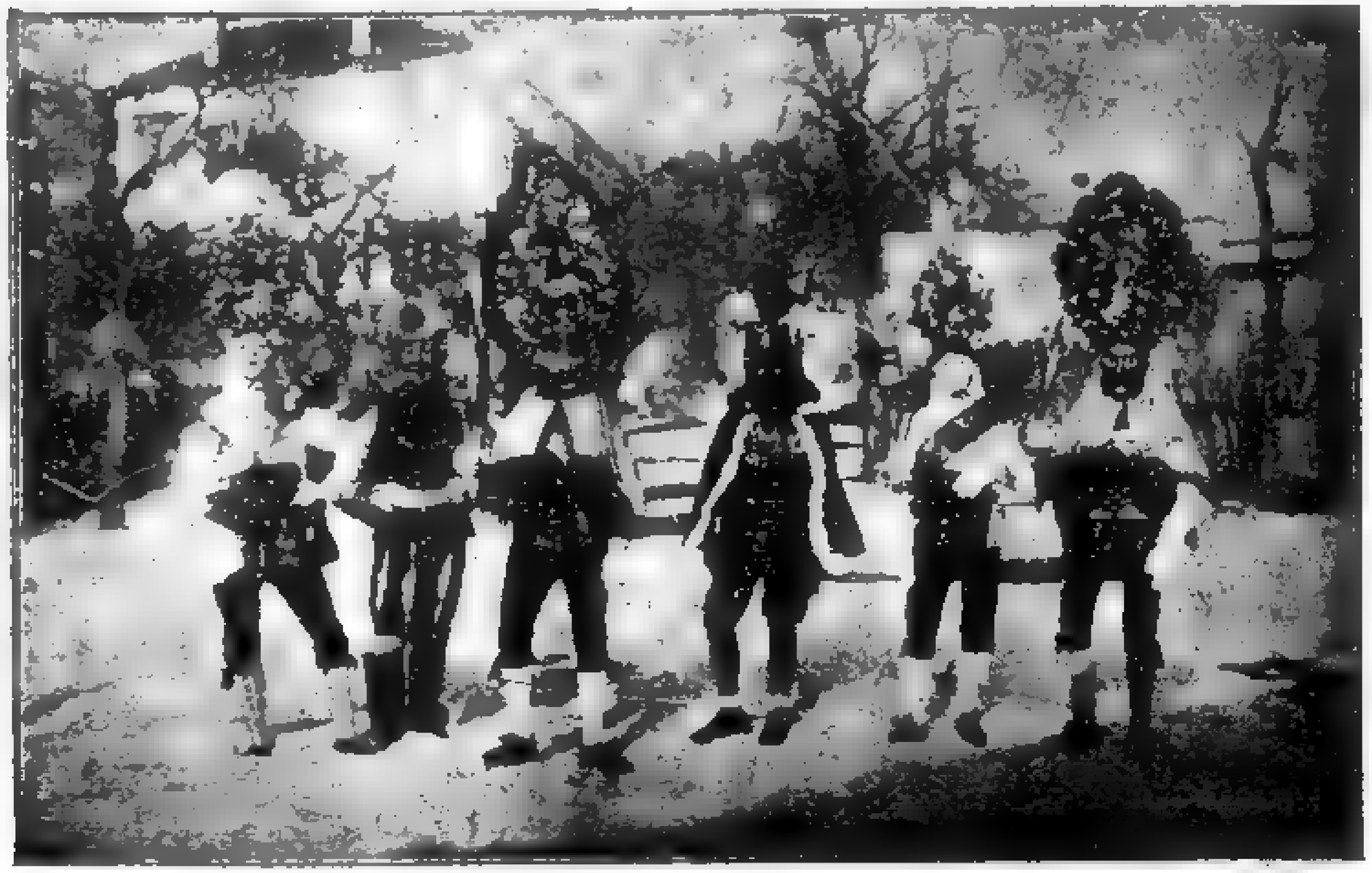

টিরোলীদের মুখোস-নাচ ( টিরোল অষ্ট্রিয়ার আল্পস্ প্রদেশ )
( "বোআইট্সার কামিলিয়ে" হইতে উদ্ধৃত )

## য়ুরোপে মোখা-নাচ

চৈত্র-বৈশাখ মাসে বাঙ্গালী গাজন-গম্ভীরায় মুখোস নাচিতে অভ্যস্ত। য়ুরোপেও দেখিতেছি তাই। মার্চ্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে য়ুরোপের নানা দেশেই "কার্নিহ্বাল" উৎসবের রেওয়াজ প্রচলিত। এই নাচ-গান হল্লার ভিতর মুখোস ব্যবহার করিবার এবং ছদ্মবেশ পরিবার আনন্দই দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

বসন্ত-রথ ( নিস নগরের মুখোস-মিছিলে ব্যবহৃত )

মুখোস-মিছিলের এক দৃশ্য ( বাজেল )

ইতালীর পাদোহ্বা, হ্বেনিস ইত্যাদি নগরে মুখোস-নাচের মিছিল দেখিয়া আসিয়াছি। সুইট্জার্ল্যাণ্ডে ফিরিয়া দেখি, ফ্রান্স, অষ্ট্রীয়া ( টিরোল ), জার্ম্মাণী, সুইট্জার্ল্যাণ্ডে সকল দেশের কাগজেই মুখোস-মিছিলের ছবি।

খৃষ্টানদের "ইষ্টার" তিথিতে খৃষ্ট সশরীরে পুনরায় দেখা দিয়াছিলেন। এই তিথির পূর্ব্ববর্ত্তী ৪০ দিনকে বলে "লেণ্ট।" এই দিনগুলা চরম বিষাদের যুগ। উপবাস, রোজা ইত্যাদি পালন করিতে হয়। ঠিক যে দিন লেণ্ট আরম্ভ হইবার কথা, তাহার আগেকার সাত দিন নর-নারী আমোদ-প্রমোদ, যথেচ্ছ ব্যবহার এবং সকল প্রকার সামাজিক "স্বাধীনতা" ভোগ করিতে অভ্যস্ত।

পাশ্চাত্য মুখোস-নাচের উৎসবে, সাত দিন জাপান ভারতের তদনুরূপ কাণ্ডে "তত্ত্বকথা" একই।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

---

## তখন ও এখন

( আইরিস্ কবি ইয়েট্স্ অবলম্বনে )

আমার সাথে মিল্‌ল সে যে ঘন বকুল-ছায়,
কেয়া-রঙা গালটিকে তার বাতাস চুমে যায়—
বল্লে হেসে, "ভাবনা কেন, মোদের ভালবাসা
এ যেন গো শীতের শেষে বসন্তেরই আসা।"
গাছে যেমন পাতা গজায়, বাগানে ফুল ফোটে,
তেম্নি সহজ—সেই পুলকই বুক ভরে ওর ছোটে।
মূর্খ আমি—তার কথাতেও ঘুচলো নাকো ভয়,
কোথায় যেন রয়ে গেল এক কণা সংশয়।

নদীর ধারে সারা মাঠটি ভরা সবুজ ঘাসে,
তার পরেতে এলিয়ে সে যে বস্‌লো আমার পাশে ;
বুকের পরে রাখলে মাথা জড়িয়ে হাতে হাত,
সরসরিয়ে উঠ্‌ল কেঁপে পূর্ণিমারই রাত!
বীণার সুরে বল্লে, জীবন জ্যোছনা দিয়ে বোনা।
বৃথা কেন ভবিষ্যতের দিনগুলো সব গণা?
মূর্খ আমি—তার কথাতেও ঘুচলো নাকো ভয়,
তাই ভেবে দু'চোখে আজি শ্রাবণ-ধারা বয়।

শ্রীভবানী ভট্টাচার্য্য।

কৃষি
শিল্প
বাণিজ্য
সতীশ

# নারিকেল-ছোবড়ার ব্যবহার

নারিকেলবৃক্ষ এত প্রকারে মানুষের উপকারে আইসে যে, ইহার মহিমা কীর্ত্তন করিতে গেলে একখানি ছোটখাট গ্রন্থ হইয়া দাঁড়ায়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে লণ্ডন সহরে উদ্ঘাটিত Indian and Colonial Exhibitionএ বোম্বাইবাসী মিঃ পেরিরা নামক জনৈক ভদ্রলোক নারিকেলজাত ৮৩ প্রকারের বিভিন্ন দ্রব্য প্রদর্শন করেন। উহার মধ্যে আহার্য্য, পরিধেয়, পানীয়, গৃহসজ্জা, গৃহ-নির্ম্মাণের উপাদান, সুগন্ধ, রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি বহুবিধ প্রয়োজনীয় বস্তু ছিল। কিন্তু নারিকেলবৃক্ষের প্রায় সকল অংশই অল্পবিস্তর ব্যবহারোপযোগী হইলেও ফলই ইহার প্রকৃষ্ট অংশ। ফলের শস্য হইতে তৈল এবং ছোবড়া হইতে দড়ি-দড়া ও অন্য নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত হয়। এই উভয়েরই ব্যবসায়িক প্রাধান্য প্রায় সমান। এ স্থলে শেষোক্তেরই আলোচনা করা যাইতেছে। প্রতি বৎসর যবদ্বীপ, সুমাত্রা প্রভৃতি ওলন্দাজশাসিত দেশসমূহ, মালয়, সিংহল, ভারত, ফিলিপাইন, নিউগিনি, পূর্ব্ব ও পশ্চিম-আফ্রিকা এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে কোটি কোটি টাকা মূল্যের ছোবড়া পৃথিবীর বাজারে আমদানী হয়। ভারতের উপকূল অংশে প্রায় সর্ব্বত্রই গৃহ-শিল্প হিসাবে অল্পবিস্তর নারিকেল-ছোবড়ার দড়ি প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু আজকাল জগতের অন্যান্য উন্নতিশীল দেশসমূহে ছোবড়ার যেরূপ ও যে পরিমাণ সদ্ব্যবহার হইতেছে, এতদ্দেশে এখনও তাহার কিছুই হয় নাই। সেই জন্য নারিকেল-ছোবড়া ও ছোবড়াজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুতপ্রণালীর উপর সাধারণের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়।

## ছোবড়া প্রস্তুত

এ স্থলে নারিকেলবৃক্ষের চাষ-প্রণালী বিবৃত করা অপ্রয়োজনীয়। সাধারণতঃ চারা রোপণের সময় ২।১ বৎসর ব্যতীত লোক নারিকেল-গাছের আর কোন যত্ন করে না। সার, বীজ ও মৃত্তিকা অনুসারে বৎসরে গাছ প্রতি ৪০ হইতে ৭০টি নারিকেল হইতে পারে। বঙ্গদেশে সচরাচর প্রথমোক্ত সংখ্যাই গড়পড়তা ফলনের হার। গ্রীষ্মের প্রারম্ভেই নারিকেল-বৃক্ষের ফুল হয় এবং ফল পরিপক্ক হইতে প্রায় এক বৎসর সময় লাগে। কিন্তু ছোবড়া প্রস্তুত উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করিতে হইলে দশম মাসেই ফল সংগ্রহ করা ভাল। ইহার অধিক সময় ফল গাছে থাকিলে উহার তন্তু শক্ত হইয়া যায়। সেরূপ অবস্থায় উক্ত প্রকার তন্তুকে আবার নরম ও বয়নোপযোগী করিতে অনেক শ্রম ও অর্থব্যয় হয়। অন্য দিকে কম বয়সের নারিকেলের ছোবড়াও কম মজবুত হয়। সেই জন্য একবারে ‘নেয়াপাতি’ ডাবের ছোবড়া স্বতন্ত্রভাবে কম কাযেই লাগিয়া থাকে, যদিও ইহা সম্পূর্ণ অব্যবহার্য্য নহে। কিন্তু একটু শাঁসাল ডাবের ছোবড়া অনেক কাযেই লাগে। যাহা হউক, উপযুক্ত বয়সের নারিকেল সংগ্রহের পরই প্রধান কার্য্য— খোলা হইতে ছোবড়া পৃথক্ করা। এক খণ্ড মোটা তক্তার উপর ৬।৮ ইঞ্চ লম্বা, তীক্ষ্ণাগ্র লোহার শিক সোজা করিয়া দৃঢ়ভাবে বসান হয় এবং তক্তাটিকে মৃত্তিকা অথবা মেঝের সহিত খুব শক্ত করিয়া আটকাইয়া দেওয়া হয়। অতঃপর নারিকেল লইয়া সজোরে উহার উপর আঘাত করিয়া একটু ‘চাড়’ দিলেই ছোবড়া আল্‌গা হইয়া যায়। তখন হস্ত দ্বারাই সহজে ছোবড়া ছাড়াইবার কার্য্য চলিতে পারে। ছোবড়াকে নরম করিবার অর্থাৎ পচাইবার দুইটি দেশীয় প্রথা আছে—প্রথম প্রথায় পৃথক্ করা ছোবড়াকে নদী, খাল অথবা অন্য জলাশয়ের ধারে মাটীতে প্রায় এক বৎসরকাল প্রোথিত করিয়া রাখা হয়; বলা বাহুল্য যে, লবণাক্ত জলাশয়ই এই কার্য্যের পক্ষে উপযুক্ত। অন্য প্রথায় ছোবড়াকে কিছু কাল জলে ডুবাইয়া রাখিয়া, পরে তুলিয়া লইয়া এক খণ্ড পাথরের উপর কাঠের মুগুর দিয়া ‘থেঁতো’ করা হয়। আধুনিক প্রথায় ছোবড়া পচানর সময় অনেক

সংক্ষেপ হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ের ছোবড়ার কারখানায় সিমেণ্ট দিয়া বাঁধান বড় বড় চৌবাচ্চা থাকে। তাহাতে আবশ্যকমত জল পূর্ণ করিয়া ছোবড়া ফেলিয়া দেওয়া হয়। ছোবড়ার উপর ভারযুক্ত তক্তা দিয়া উহাকে জলের মধ্যে ডুবাইয়া রাখার বন্দোবস্ত আছে। ষ্টীম এঞ্জিনের উদ্‌বৃত্ত বাষ্প দিয়া চৌবাচ্চার জল গরম করা হইয়া থাকে; তাহাতে ছোবড়া সম্পূর্ণরূপে ভিজিয়া আল্‌গা হইয়া যায়। ছোবড়ার প্রকৃতি হিসাবে উহাকে নরম করিতে ৩০ হইতে ৪০ ঘণ্টা সময় গরম জলে ডুবাইয়া রাখা আবশ্যক হয়। জল অধিক ময়লা হইয়া গেলে উহাকে ছাড়িয়া দিয়া আবার পরিষ্কার জল দেওয়া এবং মাঝে মাঝে ছোবড়াগুলিকে নাড়িয়া দেওয়া দরকার। তাহা না হইলে উপর ও নীচের সমস্ত ছোবড়া সমভাবে আল্‌গা হইয়া যায় না। ঠিক কোন্ সময়ে জল হইতে ছোবড়া তুলিয়া লইতে হইবে, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে প্রভূত অভিজ্ঞতা আবশ্যক হয়। অল্প অথবা অধিক উত্তপ্ত করিলে ছোবড়ার গুণের লাঘবতা ঘটিয়া থাকে।

## তন্তু-নিষ্কাশন-প্রণালী

উপরি-উক্ত প্রকারে ছোবড়া গরম করিয়া লইবার পর উহাকে Husk Crusher নামক যন্ত্রে দেওয়া হয়। এই যন্ত্রে ছোবড়া উত্তমরূপে পিষ্ট হইলে উহার কঠিনাংশ প্রভৃতি (যেমন কলের নিম্নাংশ) ভাঙ্গিয়া গিয়া এবং ছোবড়া সোজা হইয়া পরবর্ত্তী কার্য্যসমূহের সুবিধা হইয়া থাকে। পিষ্ট ছোবড়া হইতে তন্তু বাহির করিবার জন্য দুই প্রকার তন্তু-নিষ্কাশন যন্ত্র ( Fibre Extractor ) ব্যবহৃত হয়। প্রথম প্রকার যন্ত্রে ব্রুস্, সম্মার্জ্জনী প্রভৃতি প্রস্তুতের উপযোগী দৃঢ় ও মোটা তন্তু হইতে মাদুর ও দড়ি-দড়া ইত্যাদি তৈয়ারী করিবার তন্তু পৃথক্ করিবার ব্যবস্থা আছে। ব্রুসের তন্তু কলের ভিতর টানা হইয়া যায় না; যে মজুর কলে ছোবড়া দিতে থাকে, তাহার হাতে থাকিয়া যায়। দ্বিতীয় প্রকারের কলে সমস্ত ছোবড়াকেই বয়নোপযোগী তন্তুতে পরিণত করা হয়। শেষোক্ত শ্রেণীর নিষ্কাশন-যন্ত্র ব্যবহার করিবার সুবিধা এই যে, অপেক্ষাকৃত তরুণ নারিকেল লইয়া ইহাতে কায চলে। এতদ্ভিন্ন এই কলে অন্যান্য অনেক বৃক্ষের ছাল হইতেও তন্তু-নিষ্কাশন করা যাইতে পারে। ইহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায় যে, সকল প্রকার ও সকল অবস্থার

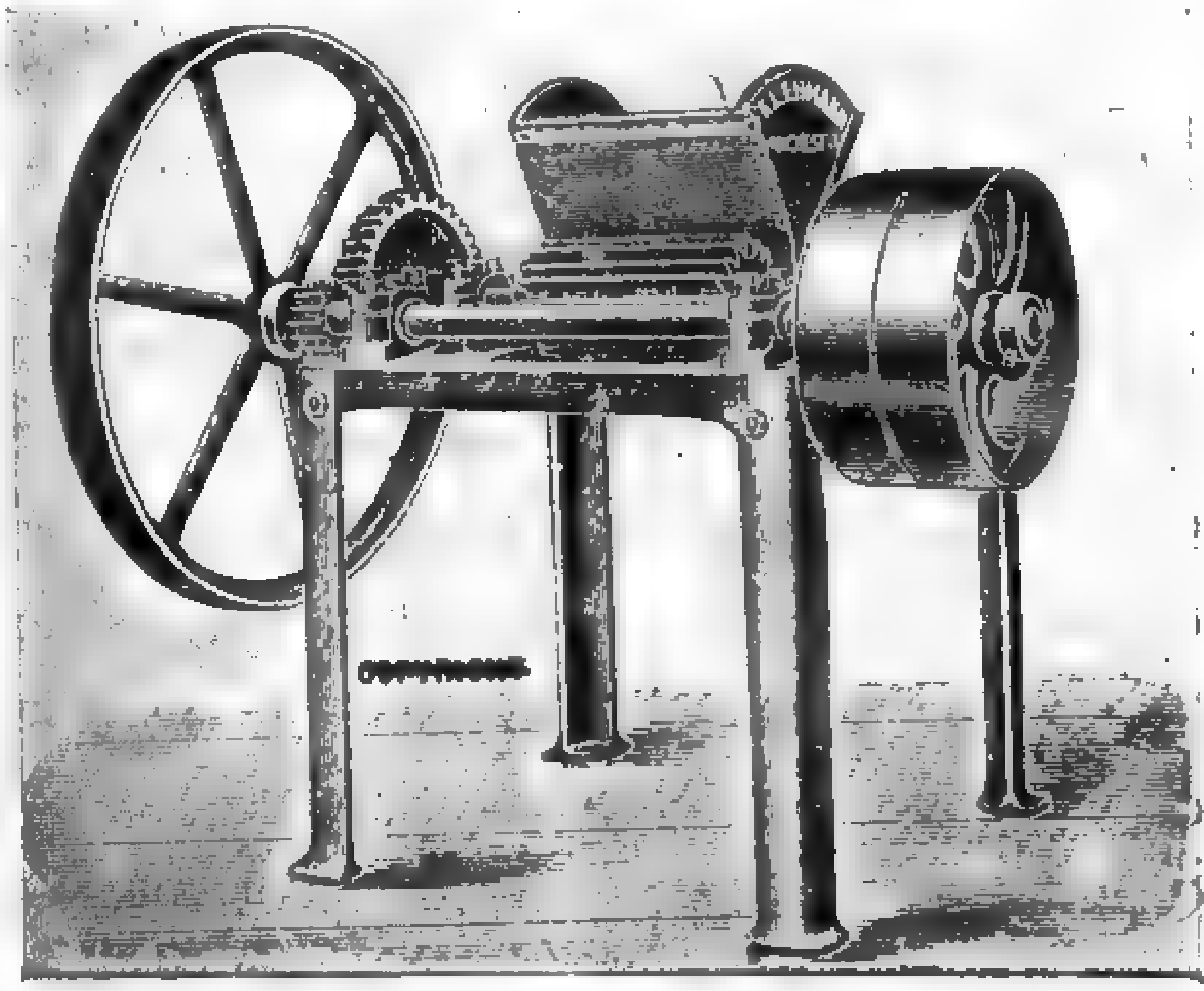

ছোবড়া-পেষণ যন্ত্র

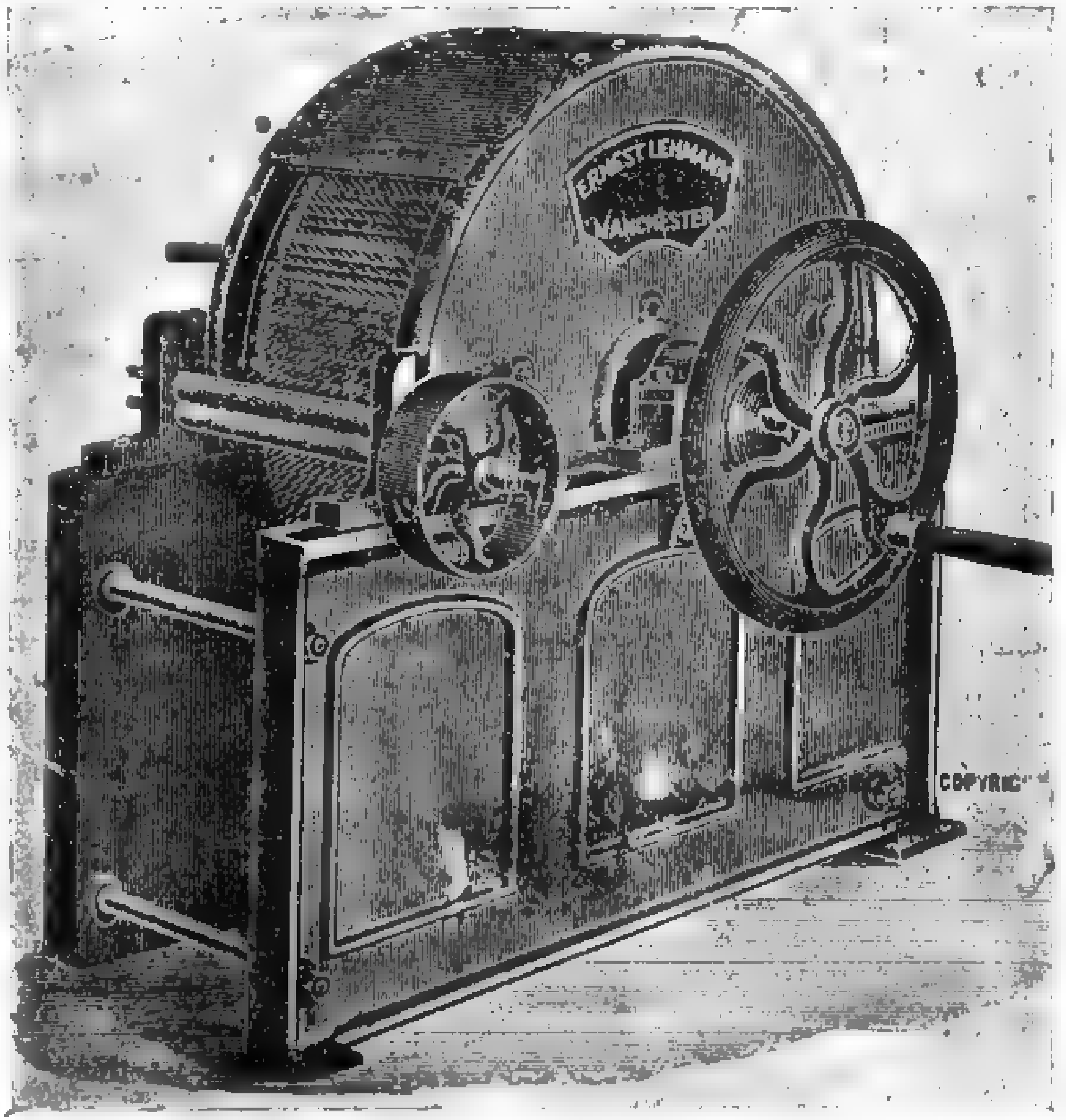

তন্তু-নিষ্কাষণ যন্ত্র

নারিকেলে ছোবড়ার মাত্রা সমান নহে। কিন্তু মোটামুটি হিসাবে দেখা যায় যে, ১ হাজার নারিকেল হইতে দেড় হইতে দুই মণ বয়নোপযোগী তন্তু এবং ১২ হইতে ১৮ সের ক্রসের তন্তু বাহির হইয়া থাকে। তন্তু নিষ্কাশিত হওয়ার পর ঐগুলিকে ঝাড়াই কলে ( Willowing machine ) দেওয়া হয়। উক্ত কলে তন্তু হইতে ধুলা, বালি ও অন্যান্য অবান্তর পদার্থ পৃথক্ হইয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র ও কঠিন তন্তুও পৃথক্ হইয়া পড়ে। ঝাড়িয়া লইবার পর তন্তুগুলিকে উত্তমরূপে শুষ্ক করিয়া গাঁইট বাঁধা হইয়া থাকে। ক্রসের তন্তু, যাহা পূর্ব্বে পৃথক্ করিয়া রাখা হইয়াছে, সেগুলিকে গাঁইট বাঁধার পূর্ব্বে আঁচড়ান এবং দৈর্ঘ্য ও গুণানুসারে পৃথক্করণ আবশ্যক। নারিকেল - ছোবড়ার কারখানায় নিষ্কাশন-যন্ত্রই অধিক। একই সময় কায করিতে হইলে একটি পেষণ-যন্ত্র যে পরিমাণ ছোবড়া ছাড়াইয়া দেয়, তাহাতে ৮টি তন্তু-নিষ্কাশন যন্ত্রের কায চলিতে পারে। আবার উক্ত কয়টি নিষ্কাশন-যন্ত্রের পক্ষে একটি ঝাড়াই কলই যথেষ্ট।

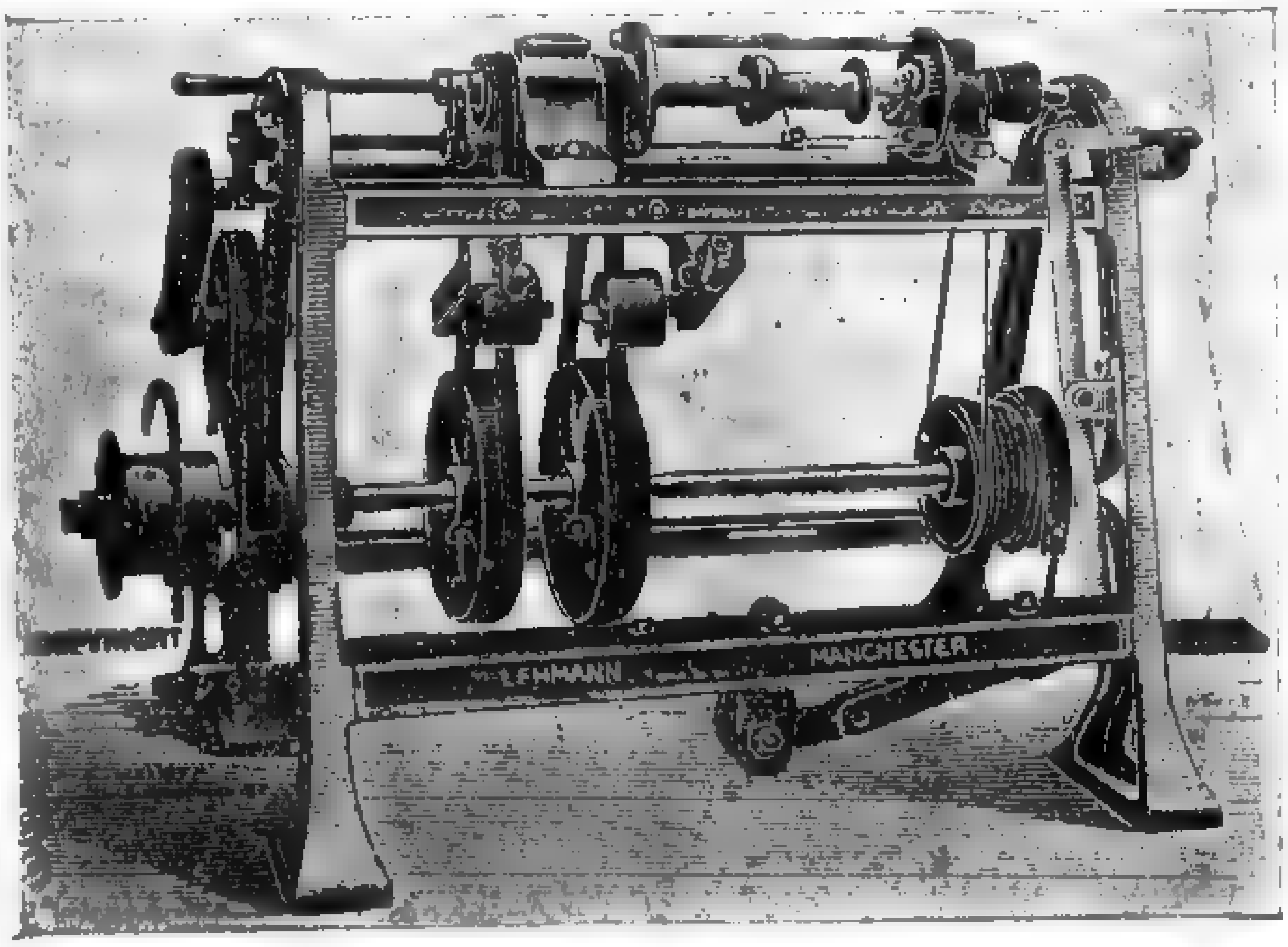

সূতা কাটার যন্ত্র

### তন্তু-বয়ন

ক্ষুদ্র কারবারীর কার্য্য তন্তু বাহির করিয়া গাঁইট বাঁধিলেই শেষ হইয়া গেল ; তাহার পর গাঁইট বাজারে চালান দেওয়া ভিন্ন অন্য কোন কায নাই। কিন্তু বড় বড় ব্যবসায়িগণ তন্তু প্রস্তুত করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন না। তাঁহারা তন্তু হইতে সূতা প্রস্তুত করেন এবং কেহ কেহ দড়ি-দড়াও তৈয়ারী করিয়া থাকেন। সূত্র প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমতঃ তন্তু গাঁইট বাঁধা থাকিলে কার্ডিং ( Carding ) যন্ত্রের সাহায্যে উহাকে খুলিতে হয়। পরে তন্তুকে সরল করিয়া নমনীয় ও নরম করিয়া লইতে হয়। এতদর্থে তিন প্রকার সোজা করিবার যন্ত্র ( hackle ) ব্যবহৃত হইয়া থাকে ;—মোটা, মধ্যম এবং সূক্ষ্ম। সাবানের জল, তৈল প্রভৃতি দ্বারা নরম করিয়া এবং যথাক্রমে মোটা হইতে সরু hackleএর মধ্য দিয়া টানিয়া এক জন সুদক্ষ মজুর ১২ ঘণ্টায় প্রায় সাড়ে ৩ মণ বয়নোপযোগী তন্তু প্রস্তুত করিতে পারে। সাধারণতঃ স্ত্রীলোকরাই এই কার্য্যে যথেষ্ট পটুতা দেখাইয়া থাকে। তন্তুকে বয়নোপযোগী করার পর সূতা কাটার বন্দোবস্ত। সূতা কাটার দুই রকম কল আছে। একটিতে মোটা কাছি, রশি প্রভৃতির উপযোগী স্থূল সূত্র প্রস্তুত হয় ; অন্যটিতে যে সূতা তৈয়ারী হয়, তাহা মধ্যম ও সূক্ষ্ম শ্রেণীর। সেরূপ সূত্র দড়ি, সুতলি, মাদুর, চট ইত্যাদি বয়নের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই সমুদয় সূতা কাটা কলের ( Spinning machine ) কার্য্য-প্রণালী বর্ণনা করা এ স্থলে অনাবশ্যক। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, উক্ত উভয় প্রকার কল পরস্পরের সহিত সম্বন্ধরহিত ; উহাদিগকে স্বতন্ত্রভাবে চালান যায়। প্রত্যেক দিবস মোটা সূতার কল হইতে প্রায় ৫০ সের ও সরু সূতার কল হইতে ২০।২৫ সের সূত্র পাওয়া যাইতে পারে। সূত্র যেমন প্রস্তুত হইতে থাকে, তেমনই সঙ্গে সঙ্গে মাকুতে জড়াইয়া যায়। কার্য্যের এই স্তরে এক খাই সূতাই ( one ply ) প্রস্তুত হয়। বাজারে যে নারিকেল-ছোবড়ার সূতা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা দুই খাই। উক্তরূপ সূতা প্রস্তুত করিতে আর একটি কলের ব্যবহার হয়—উহার নাম Cabling machine অর্থাৎ সূতা পাকাইবার যন্ত্র। Cabling machineএ সূতা পাকান হইলে পুনরায় আর একটি কলের সাহায্যে সূতার বাণ্ডিল ( hank ) বাঁধা হয়। ১০টি মাকুর সূতা দ্বারা এক একটি বাণ্ডিল প্রস্তুত হইয়া

থাকে। বাণ্ডিলগুলি টানিয়া সোজা করিলে প্রত্যেকটি ২ ফুট লম্বা হয়। গাঁইট বাঁধিবার সময় উক্ত প্রকার বাণ্ডিলগুলি একত্র করা হইয়া থাকে; সূত্র হয় বিদেশে রপ্তানী হয় কিংবা নানাবিধ ছোবড়াজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুতকারকগণ কর্ত্তৃক ক্রীত হয়।

## আবশ্যক কল ইত্যাদি

যাঁহারা ব্যবসায়ের জন্য প্রভূত পরিমাণে নারিকেল উৎপাদন করিয়া থাকেন, তাঁহারা সচরাচর সূত্র অথবা দড়ি-দড়া প্রস্তুত করিয়া ছাড়িয়া দেন। দড়ি প্রস্তুতের কল অবশ্য স্বতন্ত্র। মেঝের ও সিঁড়ির জন্য মাদুর, চট্, থলে, ব্রুস্ প্রভৃতি প্রস্তুতের জন্য বিশেষ বিশেষ প্রকারের কল আছে। যাঁহারা উক্ত প্রকার ছোবড়াজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুত করেন, তাঁহারা বাজার হইতেই সূত্রাদি ক্রয় করেন; নিজেরা প্রায়ই প্রস্তুত করেন না। এই বিশেষ শ্রেণীর দ্রব্যাদির প্রস্তুত-প্রণালী বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করা অসম্ভব। বিগত মহাযুদ্ধের সময় আরও এক শ্রেণীর ছোবড়াজাত দ্রব্য প্রস্তুত হইত—উহা পর্দ্দা উদ্দেশ্যে ব্যবহারোপযোগী চট। শত্রুপক্ষকে ধাঁধা লাগাইয়া দেওয়া (Camoublage) জন্য এইরূপ চট বহুল পরিমাণে প্রয়োগ করা হইত।

সেই সময়ে অনেকে ছোবড়ার চট প্রস্তুত ও সরকারকে সরবরাহ করিয়া প্রচুর লাভ করিয়াছেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত এতদ্দেশে নারিকেল-সূত্রের সূক্ষ্ম শিল্প সামান্যমাত্রই অগ্রসর হইয়াছে—যে সকল দ্রব্য এখন প্রস্তুত হয়, তাহার মধ্যে দড়ি ও মাদুরই প্রধান এবং সে সমুদয় অনেক স্থানেই হাতের দ্বারা কিংবা দেশীয় মোটামুটি যন্ত্রাদির সাহায্যে তৈয়ারী হয়। কলের প্রবর্ত্তন হইলে যে অনেক অধিক পরিমাণে নারিকেল-ছোবড়ার সদ্ব্যবহার হইতে পারিবে, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্ত্তমান ছোবড়া-শিল্পের তরুণ অবস্থায় অধিক মূল্যবান্ অথবা জটিল কল-কব্জা ব্যবহার করা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। নারিকেল-চাষের অথবা আমদানীর যে সকল প্রধান কেন্দ্র আছে, সে সকল স্থানে অপেক্ষাকৃত সামান্য ব্যয়ে তন্তু প্রস্তুত করাই বিধেয়। তন্তুপ্রস্তুত কার্য্যে অভিজ্ঞতা জন্মিলে তৎপরে সূত্র ও সূত্রজাত নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুতে হস্তক্ষেপ করা যাইতে পারিবে। বড় বড় নারিকেল-ব্যবসায়ী অথবা উৎপাদকগণ তন্তু প্রস্তুত করিয়া অনায়াসে বাজারে বিক্রয় করিতে পারেন। ইহাতে খুব বেশী মূলধন আবশ্যক হয় না। নিম্নলিখিত কয়েক প্রকার কল লইয়া একটি মধ্যম গোছের কারখানা চালাইতে পারা যায়ঃ—

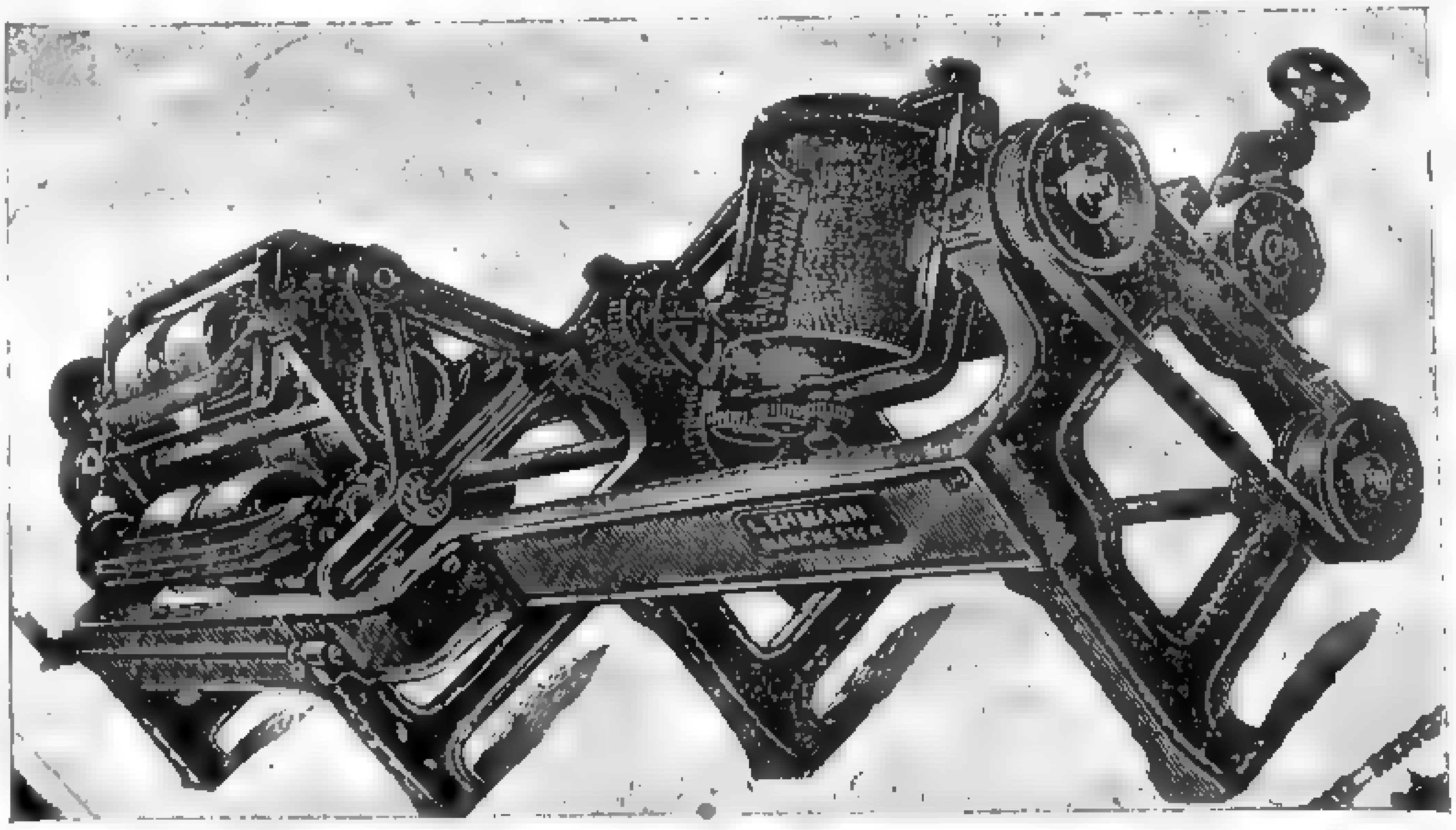

দড়ি প্রস্তুতের যন্ত্র

| | |
|---|---|
| ১টি ছোবড়া-পেষণ যন্ত্র | ৯৭৫৲ |
| ৫টি তন্তু-নিষ্কাশন যন্ত্র (৫ × ১০৫০) | ৫২৫০৲ |
| ১টি ঝাড়াই যন্ত্র | ১১২৫৲ |
| ১টি গাঁইট বাঁধিবার যন্ত্র | ২৯২৫৲ |
| একুন | ১০,২৭৫৲ |

উক্ত সমস্ত যন্ত্রই হাতে চালান যায় এবং যাঁহারা প্রথম প্রথম এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহাদিগের পক্ষে এইগুলি উপযোগী। অবশ্য যেখানে প্রত্যহ এক হাজার নারিকেল-খোলা যোগাড় না হইবে, সে স্থলে কল বসাইয়া সুবিধা নাই। নোয়াখালি, বাখরগঞ্জ ও বাঙ্গালার উপকূলে অন্ত ২।৪ স্থানে বড় রকমের ছোবড়ার কায চলিতে পারে। নারিকেল-ছোবড়াজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুতের কল ও এঞ্জিন

বসাইতে প্রায় লক্ষ টাকা পড়ে। সেরূপ বড় বড় কাযে হাত দেওয়ার পূর্ব্বে শুদ্ধ তন্ত প্রস্তুতের কায করাই ভাল। এরূপ কাযে প্রাথমিক খরচ প্রায় ১২ সহস্র টাকার অধিক পড়া সম্ভব নহে। নির্ম্মাতা হিসাবে কলের মূল্যের অবশ্য কিছু তারতম্য আছে। কারখানা বাড়াইতে হইলে crusher, extractor প্রভৃতির সংখ্যা বাড়াইয়া বাষ্প অথবা তৈল এঞ্জিনের সাহায্যে কার্য্য করিতে পারা যায়।

## শিল্পের প্রসারবৃদ্ধি

ভারতে প্রতি বৎসর ৮।৯ লক্ষ টাকার ছোবড়া ও ছোবড়াজাত দ্রব্য আমদানী হয়। কিন্তু উক্ত শ্রেণীর দ্রব্যের পরিমাণ অনেক অধিক। ১৯২৪-২৫ খৃষ্টাব্দে যে পরিমাণ ছোবড়া, দড়ি-দড়া ও অপরাপর ছোবড়াজাত দ্রব্যাদি রপ্তানী হইয়াছিল, তৎসমুদয়ের মূল্য ১ কোটি ৩৮ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা। দাক্ষিণাত্যই ছোবড়া-শিল্পে অগ্রগণ্য। ভারতীয় ছোবড়া ও তজ্জাত দ্রব্যাদি প্রধানতঃ কোচিন ও ক্যালিকট্ বন্দর হইতেই বিদেশে রপ্তানী হয়। তন্ত ও সূতা প্রস্তুত উভয় কার্য্যেই মালাবার উপকূলবাসিগণ, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকরা সুনিপুণ। আলেপ্পি ও কোচিনে কুটীর-শিল্পরূপে অনেক গৃহস্থই তাঁতে মাদুর প্রভৃতি তৈয়ারী করে। মালাবারে ১০।১২ শ্রেণীর সূতা প্রস্তুত হয়; তাহার মধ্যে 'আলাপাত' নামক সূতার ন্যায় চমৎকার সূতা পৃথিবীর আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। বিলাতী বাজারেও ইহার দর অন্য শ্রেণীর সূত্র অপেক্ষা অধিক। মালাবার, কোচিন, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি দেশে নারিকেল-বৃক্ষের স্বাভাবিক প্রাচুর্য্য অধিক বলিয়াই এই সমুদয় স্থানে বহুকাল হইতে ছোবড়া-শিল্পের প্রচলন রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন নারিকেল-ছোবড়াজাত দ্রব্য এতদ্দেশে একটি কারাশিল্পের ( Prison industry ) মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। আণ্ডামানদ্বীপে নারিকেলবৃক্ষের অভাব নাই এবং তদ্দেশে নির্ব্বাসিত অনেক ভারতবাসীই ছোবড়াজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুত-প্রণালী শিক্ষা করিবার সুযোগ পাইয়াছে। দেশ-প্রত্যাগত এইরূপ শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গকে ছোবড়ার কারখানায় নিয়োগ করিলে অনেক সুবিধা হইতে পারে। ভারতের বিশাল উপকূলভাগের অনেক স্থলেই নারিকেল-বৃক্ষ যথেষ্ট পরিমাণে জন্মিয়া থাকে এবং কতিপয় স্থলে স্থানীয় অভাবমোচনের জন্য যে অল্পবিস্তর নারিকেলকাতা প্রস্তুত না হয়, তাহা নহে। কিন্তু এই সমস্ত কারবারের পরিসর অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং ইহাদের মধ্যে পরস্পরের সহিত সম্বন্ধের অভাব থাকায় ছোবড়া-শিল্প আশানুরূপ উন্নতি লাভ করিতে পারিতেছে না। অনেক পরিমাণ নারিকেল-খোলা কার্য্যে না লাগিয়া পচিয়া নষ্ট হইয়া যাইতেছে। শিক্ষিত ও উদ্যোগী ব্যক্তিবর্গের এই বিষয়ে মনোনিবেশ করার ইহাই প্রকৃষ্ট সময়।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

---

# অসময়ে

যে দিন ডাকিনু তোমা'
আসিলে না বঁধু হে!
শুনিলে না মিনতি আমার,
সে দিন প্রভাত বেলা
অফুরন্ত মধু, হে!
না ধরে পরাণে সুধাভার।

সে দিন অরুণ-আলো
মোর আঁখি পরে, হে!
গিয়েছিল বুলায়ে মাধুরী,
সে দিন আমার কণ্ঠ
প্রভাতীর সুরে, হে!
উচ্ছ্বসিত, উঠেছিল পূরি।

আজি আসিয়াছ বঁধু
ম্লান-সন্ধ্যাবেলা, হে!
ফুটে উঠে বিদায়ের গান,
ফুরায়ে গিয়েছে মধু
ভেঙে গেছে মেলা, হে!
কণ্ঠ তার হারায়েছে তান।

এবে বিদায়ের রবি
পরায়েছে বঁধু হে!
বিদায়ের গৈরিক বসন,
নাহি হাসি, নাহি গান,
ফুরায়েছে মধু, হে!
এলে সখা! কি দিব এখন।

শ্রীবীরেশচন্দ্র মিত্র।

# হামিদের হিম্মৎ

## ১

কলিকাতা সহরের উত্তরে গ্রে ষ্ট্রীট ও দক্ষিণে বিডন ষ্ট্রীটের মধ্যে যে বস্তীবহুল ঘন-জনাবাসপূর্ণ স্থানটি আছে, তাহার অনেকটা অংশ দর্জ্জিপাড়া নামে খ্যাত। ৬০।৬৫ বৎসর পূর্ব্বেও ইংরাজী শিক্ষার সূতিকাগার কলিকাতায় সাধারণ বাঙ্গালী ভদ্রলোকদিগের মধ্যে কাটা কাপড়ের ব্যবহার অত্যন্ত অল্পই প্রচলিত ছিল। এত বড় সহরের ভিতর এই স্থানটিতেই সীবন-শিল্পপটু মুসলমানজাতীয় দর্জ্জিগণ একটি ক্ষুদ্র উপনিবেশ স্থাপন করিয়া পল্লীটিকে দর্জ্জিপাড়া নামে খ্যাত করার হেতু হওয়ায় বুঝিতে পারা যায় যে, এই অঞ্চলেই তখন অনেক কীর্ত্তিমন্ত বড়লোকের বাস ছিল।

বলিয়াছি, সন ১২ শত সালের মধ্যভাগেও সাধারণ গৃহস্থ লোকের বাটীতে কাটা কাপড়, এমন কি, শীতকালে সাদাসিদে আঙ্‌রাখা পিরহানাদি ব্যবহারের প্রচলনও বড়ই অল্প ছিল। বড়লোকরা কিন্তু দরবারে দেওয়ালে, মহ্‌ফেলে মজলিসে, আদালতে, কাছারী, কুঠী প্রভৃতি প্রকাশ্য স্থানে যাইবার সময় পোষাক পরিধান করিতেন।

সমাজে রাজব্যবহারের অনুকরণ যেন প্রাকৃতিক নিয়ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন যেমন বসনে ভাষণে, চলনে উপবেশনে, ভোজনে সাজনে ইংরাজী ধরণের অনুকরণ সকলে করিতেছে, তখন তেমনই মুসলমানী কায়দার অনুকরণ বড়লোকদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। বড়লোকদের মধ্যেই অধিক প্রচলিত ছিল, তাহার কারণ, বাবুয়ানা সে কালে সস্তায় সম্পাদিত হইবার সুযোগ ছিল না। পরিচ্ছদ প্রস্তুতের উপকরণ—কিংখাপ্, মখমল্, সাটিন, মলমল, তাঞ্জাব, জামদান্ প্রভৃতি বস্ত্র এবং সল্‌মা, চুম্‌কি প্রভৃতি জরীর সাজের বস্তুগত মূল্যও যেমন গৃহস্থজনের সঙ্গতির সাধ্যাতীত ছিল, সুনিপুণ চিত্রকুশল সীবন-কার্য্যের বানিও ধনিগণমাত্রেই দিতে সমর্থ হইতেন।

যোড়াসাঁকো পাথুরেঘাটার সিংহ, মল্লিক, ঠাকুর-গোষ্ঠী ও সান্ন্যালবাবুরা হইতে আরম্ভ করিয়া নিমতলা, তথা হাটখোলার দত্তবংশ, সিমলার ছাতুবাবু লাটুবাবু, কাশী ঘোষ, কালীপ্রসাদ ঘোষ, বংশী মিত্র, রাধাকৃষ্ণ মিত্র, নীলমণি মিত্র, বটতলা অঞ্চলের চন্দ্র মিত্র, মদন মিত্র, কালীশঙ্কর ঘোষ, বৃন্দাবন বসাক প্রভৃতি, শ'াবাজারের রাজারা, চূড়ামণি দত্ত, গঙ্গানারায়ণ বসু, নস্করেরা, শ্যামবাজারের কৃষ্ণরাম বসু, তুলসীরাম ঘোষ, কাঁটাপুকুরের বোসেরা, বোস্‌পাড়ার কাশী বোস, বাগবাজারের দুর্গাচরণ মুখুর্য্যে, ভগবতী গাঙ্গুলী, কুমারটুলীর অভয়চরণ মিত্র, বনমালী সরকার, ভৈরব মিত্র প্রভৃতির নাম অদ্যাপি পূজা-পার্ব্বণ কীর্ত্তিকলাপ ও ঐশ্বর্য্যের জাঁক-জমকের সহিত জড়িত।

ভোজনে-ও তাঁরা ব্রাহ্মণ পাচক-প্রস্তুত পোলাও, কালিয়া, কোর্ম্মা, কোপ্তা, শল্য-মাংস প্রভৃতি নবাব-নজর-গ্রাহ্য ভোজ্যবস্তু ব্যবহার করিতেন। ইংরাজ-রাজ্যে আমরা সুলভে চাঁদনীর হ্যাটকোট পরি, আশী টাকা ভরি আতরের পরিবর্ত্তে দেড় টাকা শিশির ল্যাভেণ্ডার ব্যবহার করি, পিরুর দোকানে বা প্যারাগন হোটেলে বসিয়া গোপনে মুরগীমাংস আহার করি; গোপনটা কতক রঙ্গমঞ্চের স্বগতের ন্যায় সর্ব্বজনবিদিত।

ঐ দর্জ্জিপাড়া পল্লীতে হিন্দু ও মুসলমান বাঙ্গালীগণ পাশাপাশি বাটীতে প্রতিবেশীর আত্মীয়ভাব রক্ষা করিয়া স্বচ্ছন্দে বসবাস করিতেন, এবং এখনও অনেকে করিতেছেন। প্রথমে দর্জ্জি উপনিবেশ হইলে-ও অনেক পদস্থ মুসলমান-ও ক্রমে আসিয়া ঐ পল্লীতে বাস করেন এবং দর্জ্জিদিগের মধ্যেও কেহ কেহ সম্ভ্রান্ত ভদ্রাসনের অধিকারী হইয়া বসেন। এখনও রাস্তা, গলির নামগুলি সেই পরস্পরের প্রতিবেশিত্বের পরিচয় প্রদান করিতেছে; যথা—দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট, মসজিদ-বাড়ী ষ্ট্রীট;

কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট, জয়মিত্রের গলি, ইমামবক্স থানাদারের লেন, গুলু ওস্তাগরের লেন, লাল ওস্তাগরের লেন; তারক চ্যাটার্জ্জির লেন, জরিফ লেন।

তখন কোক্ কয়লার নাম-ও কেহ শোনে নাই, ইন্ধনের জন্য সুঁদরী কাষ্ঠের চেলাই ব্যবহার হইত। আমাদের বাটীর পার্শ্বেই একটি খালি জমীর উপর একখানি খোলার ঘরে সোনাউল্লার চেলাকাষ্ঠের দোকান। অনেক কালের দোকান; আমরা যখন সোনাউল্লাকে দেখিয়াছি, তখন তা'র বয়স পঞ্চাশ পার হইয়া গিয়াছে; বেলেঘাটার নৌকা হইতে গুঁড়ি সুঁদরী কাঠ আনাইয়া তাহার দোকানের পূর্ব্বপার্শ্বস্থ জমীতে উড়ে কাঠুরে দ্বারা তাহা চেলা করাইয়া লইয়া খুচরা বিক্রয় করিত।

জমীর সম্মুখের ভাগে কাঠ চেলা হইত, তাহার পশ্চাতে একটি কূয়ার ধারে একটি বকফুলের গাছ, কূয়ার উত্তর ধারে একখানি খোলার ঘর, সেখানি সদানন্দ সার্ব্বভৌমের টোল।

সোনাউল্লা বৃদ্ধ হইলেও তখন-ও বসিয়া একখানি ক্ষুদ্র কুঠার দিয়া সরু চেলা প্রস্তুত করিত এবং তাহার ত্রিশ বত্রিশ বছরের ছেলে বছরদ্দি দোকানদারী করিত।

বছরদ্দির ছেলে হামিদের তখন বয়স বছর নয় হবে। হামিদ শিশুকাল থেকেই আমাদের বাড়ীর ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে এসে খেলা করতো। আমাদের বাড়ীর তার খেলুনী দু' একটি ছেলে ইস্কুলে যেতে আরম্ভ কর্লে দেখে সোনাউল্লা আমার পিতামহকে এসে ব'ল্লে, "কি হুকুম করেন কর্ত্তা, হামিদটারে-ও ইক্স্কুলে দিয়ে দিই, যা হোক্ ক'রে আল্লা দু' পয়সা দিয়ে দিচ্ছেন, তিন পুরুষ ধ'রে আর কাঠ চেলা করাই কেনে?"

দাদা বল্লেন, "ভাল-ই ত, তা দাও না, একটু সভ্য-ভব্য হোক্।"

সোনাউল্লা ব'ল্লে, "তবে গরীবের একটা আর্জ্জি আছে কর্ত্তা, ইক্স্কুলের মেইনেটা যা হোক্ ক'রে দিয়ে দেব, কিন্তু জুদো ম্যাষ্টের-পণ্ডিত রেখে ঘরে পড়া করাতে পারবো না। বছরদ্দির ছাবাল্‌টাকে কালুবাবু ভুলুবাবুর সাথেই আপনকার এহানে ব'সে পণ্ডিতের কাছে ক্যাতাব মথন করাতে এজ্ঞে দেবেন।"

দাদা বল্লেন, "এর আবার কি, ও ত ওদের সঙ্গে খেলে-ধোলে, তা' পড়লেই বা।"

একে পাশাপাশি বাস, তাতে বল্‌তে গেলে হামিদ দিন-রাত্তিরই ছেলেদের সঙ্গে বসা, দাঁড়া, খেলা করে, সুতরাং বাড়ীর মেয়েরাও ক্রমে ক্রমে তার ছোঁয়া-ন্যাপাটা বড় আর বেশী গ্রাহ্য করতেন না। বিশেষতঃ তাঁরা দেখতেন যে, প্রায় প্রত্যহ সকাল-বিকেল পাড়ার নাজিরদের বাড়ীর ছোট মিঞা মোক্তার শোভান্ সাহেব, দারোগাদের জামাই দেদার বক্স প্রভৃতি মুসলমান ভদ্রলোকগণ বাইরের মহলে কেউ বা কর্ত্তার কাছে, কেউ বা বাবুদের বৈঠকখানায় ব'সে আপন আপন ফুর্সিতে তামাক খেতেন ও গল্পসল্প করতেন।

বাঙ্গালা পড়তে পড়তে হামিদেরও মন ক্রমে এম্‌নি বদ্‌লে গেল যে, সে এক দিন লুকিয়ে আমার ভাইপো লালুকে বল্লে, "কি ভাই, তোরা আমায় হামিদ হামিদ করিস্, আমার ভাল লাগে না, তোদের মত আমার একটা বাঙ্গালা নাম ক'রে দে।"

লালুর ভেতরে বোধ হয় একটু কবিত্ব-শক্তি লুকোনো ছিল, সে চট্‌পট্ ব'লে ফেল্লে যে, "আজ থেকে তুই হেম হয়ে গেলি—যা।"

লালু যেই হামিদকে হেম ব'লে ডাক্‌তে আরম্ভ কর্লে, ভুলু, কালু, পুঁটি, নিমি, এমন কি, কাকীমা পিসীমা সবাই তাকে হেম ব'লে ডাক্‌তে সুরু কর্লে। ইস্কুলের লিষ্টিতে তার হামিদ নাম থাক্‌লেও বেঞ্চির ফিস্‌ফিসে ও খেলার উঠোনে সে হেম বই আর কিছু নয়।

প্রকৃতিগত মেধাশক্তি, বাঙ্গালী ভদ্রলোক হইবার বিপুল বাসনার চালনায় হামিদকে শিক্ষালাভে এত সযত্ন করিল যে, অতি শীঘ্রই সে বিদ্যালয়ের মধ্যে একটি বিশিষ্ট বালক বলিয়া খ্যাত হইল। বিদ্যালয়ের পরিণাম-পরীক্ষায় সে প্রথম হইয়া একখানি স্বর্ণ-পদক পাইল এবং মাইনর একজামিনে স্কলারশিপ পাইয়া হিন্দু স্কুলে ভর্ত্তি হইল।

## ২

চার বৎসর চ'লে গেল, হামিদ হিন্দু স্কুল থেকে ফার্ষ্ট ডিভিসানে এন্‌ট্রান্স পাশ ক'রে একটি স্কলারশিপ পেলে। স্নেহের ন্যায্য গর্ব্বে আহ্লাদে গদগদ হয়ে সোনাউল্লা, ল্যাড়্‌কা বছরদ্দি ও পোতা হামিদকে সঙ্গে ক'রে এনে

দাদামশায়কে সেলাম ক'রে বল্লে—"কর্ত্তা বাবু, আপনাগোর হ্যামচন্দর ত আল্লার মর্জিতে আর ঐ কদনের দওয়ায় ভালয় ভালয় পাশটা মেরে দিয়েছে আর জলপানিও ট্যাকা পনেরো না কি জানি কি পাবে, এখন আমায় কি এজ্ঞে করেন ?" ছোট কাকা বল্লেন, "লালুও ত স্কটিশ চার্চ্চেস কলেজে যাচ্ছে, হেমাকেও ওর সঙ্গে সেইখানে ভর্ত্তি ক'রে দাও।" সোনাউল্লা বল্লে, "আমি-ও তাই বলি ছোট বাবু যে, এক সাথে ক-এ আঁকড়ি—খিও থেকে সুরু করেছিস্, খালিজি-ই যাওয়া করিস্ আর গলিজি-ই যাওয়া করিস্, বাবুদের বাড়ীর ছাবালরা যেথ্যাকে যাবেক, তুই-ও সাথে সাথে যাবি ; তা কি বল্‌বো কর্ত্তা বাবু, ওকে যাস্তি কসুর-ও দিতে পারি নি, ইন্‌জিরি এলেমের গর্ম্মিও বটেক্ আর হিন্দি ইক্‌সুলের বড়মানুষির বাড়ীর ছাবালদের সাথে মেলা-মেশার দরুণ হাম্‌দে'র ম্যাজাজটা ওঁনার নানার কাঠ চেলা করা কুড়ুলটা ছেড়িয়ে উঠে পড়েছে ;—বল্ না রে হ্যাম্, কর্ত্তা বাবুর গোড়ের কাছে যা না, সে রাজার ছাবাল্ তোরে কি বল্‌ছে বল্।"

হামিদ। রাজা না, রায় বাহাদুর।

সোনা। আমার অত বড় বড় কথা কি আসে রে বাপজান্, না হয় রায় বেয়াদপ-ই হ'লো ;—কি বল্‌ছে বল্।

হামিদ। আজ্ঞে, রায় কুমার ব্রজসুন্দর বাবু বলেন—

ছোট কাকা। রায় কুমার ?

হামিদ। রায় বাহাদুর গৌরসুন্দর বাবুর পৌত্র ব'লে উনি রায় কুমার লেখেন।

সোনা। তা কুমোরদের রায় বাবু বলেছেন, তাঁর সাথে হামিদকে সেই পিসিধনকে কালেজ না কি, সেইখানেই ভর্ত্তি হ'তে।

হামিদ। প্রেসিডেন্সি কলেজ—সেখানে পড়াটা বেশী respectable।

সোনা। ঐ এক বুলি পেয়েছে, রেস-ফেস আস্তাবল। আমার ঐ বস্তীর বিচে ত্রিশ সনের খাপ্‌রেলের ঘর, আজও বলে কি না রেস-ফেস আস্তাবল নয়।

ছোট কাকা বল্লেন, "তাই দাও গে, স্কলারশিপ ত পাবে, মাইনেটা আর ঘর থেকে লাগবে না।" বাপ ব্যাটায় সেলাম ঠুকিয়া বিদায় হইল, হেম বলিল, "আমি বাড়ীর ভিতর হইতে কাকীমা জ্যাঠাইমাদের প্রণাম ক'রে যাচ্ছি।"

### ৩

মাণিক বোসের ঘাটের সাম্নে যখন গৌর পালের চুটকির দোকান ছিল, সে অনেক দিনের কথা, এখনকার লোক তা জানে না, যারা জান্‌তো, তারা ভুলে গেছে ; ২৫।২৬ বছর ধ'রে গৌরসুন্দর বাবুকে ও অঞ্চলে এক জন বড় মহাজন বলেই জেনে আসছে। মস্ত কারবার, তার ওপর দশ পনেরো লাখ টাকা হ্যাণ্ডনোটে ও বন্ধকি কারবারে হামেসা খাটে। আকৃতি, প্রকৃতি, ভুষিমালের ধুলো, বিষয়বুদ্ধি-চিন্তা-জনিত হাস্তের অভাবযুক্ত কঠোর মুখে কোথাও কোন সৌন্দর্য্য না থাকায়, "সুন্দর"টা এঁরা নিজেদের নামের সঙ্গেই যোগ ক'রে দিয়েছেন। গৌরসুন্দর তস্য পুত্র নরহরিসুন্দর, তস্য পুত্র ব্রজসুন্দর। গৌরসুন্দর পরম বৈষ্ণব, ধর্ম্মকর্ম্মে অতিশয় নিষ্ঠা ; ব্রাহ্মণকে কপালে হাত জোড় করিয়া প্রণাম করেন ; কিন্তু বৈষ্ণব বাবাজী দেখিলেই পদধূলি লইয়া বুকে, মুখে ও মাথায় দেন ; বৈষয়িক সম্বন্ধ ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে মিথ্যা কথা কন না ; বারো হাজার টাকা ধার দিয়া ১৪৩১৩॥/১০ সুদে শেষ কিস্তি জমা লইবার সময় কাকুতি-মিনতি করিলেও ঐ ॥/১০ বাদ দেন না বটে, তথাপি দান আছে, ভিখারী আসিয়া হাত পাতিলে গদি হইতে প্রতি জনকে এক কড়া করিয়া দিবার হুকুম আছে। আজ বছর পাঁচেক পূর্ব্বে ব্রজসুন্দরের কনিষ্ঠ ভ্রাতার অন্নপ্রাশন উপলক্ষে তিনি একটু ঘটা করিয়া খরচপত্র করেন ও সেই উপলক্ষে কলিকাতা হইতে দেশে একটি থিয়েটারের দল লইয়া গিয়া আপন ধনৈশ্বর্য্য দেখাইবার জন্য সদর হইতে কালেক্টার সাহেব, জজ সাহেব, পুলিস সাহেব, ডাক্তার সাহেব ও দিশি হাকিমদেরও নিমন্ত্রণ করিয়া নিজ বাটীতে অভ্যর্থনা করেন। সাহেবরা শ্যাম্পেন, স্যাণ্ডউইচ আদি ভোজনান্তে বৈষ্ণবভবন পবিত্র করিয়া পুলকিতচিত্তে সপুত্র গৌরসুন্দর বাবুর সহিত সেক্‌হ্যাণ্ড করেন ও এমন কি, তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারী সয়ারাম শা মহাশয়ের পিঠ চাপড়াইয়া তাঁহাকে Ha'd'd' Hippopotamus বলিয়া আপ্যায়িত করেন। অই সেক্‌হ্যাণ্ড-ই গৌরসুন্দর বাবুর কাল হইল। এখন থাকে থাকে শ্বেত করপদ্মের স্পর্শলাভ-পিপাসায় তাঁর কালো-কোলো কড়া-পড়া ডান হাতখানি মাঝে মাঝে চুলকাইয়া উঠে

এবং দেশে গেলেই সদরের সাহেবদের সেলাম করিতে না যাইয়া পারেন না আর সেই অবধি দেশে কিছু ঘন ঘন যাইতে আরম্ভ করেন।

যে গৌরসুন্দর কলিকাতা সহরে থাকিয়াও সন্ধ্যাকালে গঙ্গা দর্শনে যাওয়া ছাড়া আর কোন সময়ই প্রমাণ দশ হাত থান-ধুতি ব্যবহার করিতেন না, নরহরি গদি-বাড়ীতেও নয় হাত কাপড় পরিয়া থাকিত বলিয়া কত ভর্ৎসনা করিতেন এবং ব্রজসুন্দর লাট্টু মার্কা কোরা কাপড় পরিতে চাহিত না বলিয়া কত বিরক্ত হইতেন, সেই গৌরসুন্দরকে ডাক্তার সাহেবের চাপরাশীর পরামর্শে সাহেবদের সেলাম দিতে যাইবার পূর্ব্বে এক সুট কালো বনাতের প্যাণ্টুলেন, চাপকান, চোগা প্রস্তুত করাইতে হয় ও মাথার পরিবার জন্য একটা গঙ্গাজলী শাল-মোড়া আমামাও ফরমাস দিয়া বাঁধাইয়া লইতে হয়। কিন্তু গৌরসুন্দর বাবুর একটা সুবুদ্ধির পরিচয় দেওয়া আবশ্যক; পুত্র এবং পৌত্র বারবার জিদ্ করিয়াও কর্ত্তাকে ফটোগ্রাফ তোলাইতে রাজী করাইতে পারে নাই; এ অসম্মতির কারণ যে গৌরসুন্দরের নিজের চেহারার প্রতি অবিশ্বাস, তা ঠিক বলা যায় না; তাঁহার মনে মনে দৃঢ় ধারণা ছিল যে, ফটোগ্রাফ তোলাইলে বা লাইফ ইনসিওর করিলে তিনি ছয় মাসের মধ্যে মরিয়া যাইবেন। কিন্তু সিংহি বাবুদের বন্ধকি জমিদারী সালুই পরগণাখানি ফোরক্লোজ করিয়া লইবার পূর্ব্বে এবং ব্রজসুন্দরের বিবাহ দিয়া তাহার পুত্রের অন্নপ্রাশনে কমিশনার সাহেবের পায়ের ধুলা বাড়ীতে পড়িতে না দেখিয়া তিনি কখন-ই ইহলোক পরিত্যাগ করিবেন না প্রতিজ্ঞা করিয়া রাখিয়াছিলেন।

সাহেবসম্ভাষণ সূত্রে কাটা কাপড় প্রস্তুত ও ফলফুলের ডালিতেই যে গৌরসুন্দরের বাজেখরচের অবসান হ'ল,এমন নয়; যেমন খোস্ গল্পের ছলেও উকীলবাড়ীতে হামাসা যাওয়া আসা কর্‌লেই খুঁজিয়া পাতিয়া একটা কিছু মোকর্দ্দমা বাধাইবার লালসা মনের মধ্যে উঁকি ঝুঁকি মারে; যেমন ঠাকুরবাড়ীতে গেলেও কিছু না কিছু প্রণামী না দিয়ে থাকা যায় না; তেম্‌নি সরকারী সাহেবদের কাছে হামাসা গেলেই সৎকর্ম্মের পর সৎকর্ম্ম করিবার দারুণ পিপাসা প্রাণে জাগিয়া উঠে। এ সৎকর্ম্ম অর্থে পিতামাতার শ্রাদ্ধও নয়, অতিথিশালা পুষ্করিণীপ্রতিষ্ঠাদিও নয়, বিধবা মাসীকে মাসিক তিন টাকা হবিষ্যি খরচ দেওয়াও নয় আর পিতৃহীন নাবালক ভাইপো ভাগ্নেকে বাড়ীতে রেখে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করাও নয়; পৌরোহিত্য দৌরাত্ম্যের সমর্থন বা আলস্যের প্রশ্রয়দান সভ্যতা অনুমোদিত সৎকর্ম্ম নয়।

বৈশ্যরাজ্যে বাণিজ্যে বিপুল বিস্তারের সাহায্য করাই মনুষ্যত্বের পরাকাষ্ঠা বলিয়া ধার্য্য। একটি পুষ্করিণী কাটাইতে হইলে বড় জোর পঁচিশখানা বিলাতী কোদাল কিনিতে সাড়ে সাঁইত্রিশ টাকা মাত্র খরচ হইতে পারে; কিন্তু একটি টিউব ওয়েল বসাইতে অন্ততঃ প্রথমে হাজার পাঁচেক টাকা খরচ এবং বছর তিনেক বাদে তাহার কল বিগড়াইয়া যাইলে ম্যাক্‌লকে এখন আর চলে না—হাজার তের টাকা দিয়ে একটা ল্যাকারষ্টির্ণ আনালে নিদেন ৭।৮ বৎসর নিশ্চিন্ত;—তার পর ক্রমশঃ। এক বছরের ভিতরেই গৌরসুন্দর সদরে চারটে আর নিজ গ্রামে ১টা টিউব ওয়েল বসাইয়া দিলেন।

এক দিন ডাক্তার সাহেব সাতিশয় বিমর্ষভাবে গৌরসুন্দর বাবুকে বলিলেন,—"রায় বাহাদুর Ah! excuse me—বাবু"—; গৌরসুন্দর চমকিয়া উঠিলেন, কেবল যে ভাবিলেন, ডাক্তার সাহেব আমাকে রায়-বাহাদুর বলিয়া ফেলিলেন কেন, তাহা নহে। তাৎপর্য্য ভালরূপে বুঝিবার জন্য তাঁহাকে এ বিষয়ে প্রশ্নও করিলেন। উত্তরে ডাক্তার বলিলেন—"ও একটা—কালেক্টার সাহেবের—যাক্, পরে বল্‌ব। এখন বড় দুঃখের বিষয়, মিস্ জেফারসান এখান হ'তে চ'লে যাচ্ছেন।"

গৌর। মেম্ ডাক্তার সাহেব?

ডাক্তার। হাঁ, তের শ' টাকা মাসে ওঁর মর্য্যাদা রক্ষা হয় না! বিলাতে গেলে ওঁর কত আয় বেশী হ'তে পারে; সেখানে চাঁদি না, চাঁদি না, খালি সোনার সবারেন্।

গৌর। মিসেস্ চাটুয্যেকে ত সবাই ভাল ডাক্তার বলে, শুনি তিনিই ত সব কাযকর্ম্ম দেখেন। ওঃ বাবু—Supervision? Supervision—পরিদর্শন European supervision না থাকলে নেটিভ—ইণ্ডিয়ানরা কি কোন কায কর্‌তে পারে—তা বটে—তা বটে—

ডাক্তার। মিসেস জেফারসানের জন্য ভাবনা কচ্ছি না, বিলাত গেলে উনি তের শ' টাকা নয়, তের শ' পাউণ্ড

মাসে রোজগার কর্ত্তে পারবেন ; আমার ভাবনা এ দেশের নারীজাতির মঙ্গ। একে চার দেওয়ালের মধ্যে কয়েদী. তার উপর কোন এক্সারসাইজ নাই, পায়ে জুতা পর্য্যন্ত পরতে পায় না ; তার ওপর যখন স্ত্রী-ব্যাধি হবে, যখন সন্তান—আঃ, কেবল এ দেশের নারীজাতির মঙ্গলের জন্য উনি হোমের সকল সুখ সকল স্বচ্ছন্দ পরিত্যাগ ক'রে এই সর্প ব্যাঘ্র জঙ্গল ম্যালেরিয়া উত্তাপের দেশে এসেছিলেন।

গৌর। তা—তা উনি কি হ'লে থাকৃতে পারেন ?

ডাক্তার। কম্‌সে কম্‌ another সাত শত টাকা ওঁকে অধিক দিতে হবে। মুদীখালীর চৌধুরী বাবুরা দু' লাখ টাকা জমা দিতে স্বীকার আছেন, তাহার সুদ—

গৌর। ভাববার কথা হুজুর—ভাববার কথা। একবার নরহরির সঙ্গে পরামর্শটা ক'রে—

ডাক্তার। তোমাকে বাবু আমি বড় ভাল বলি, সেই জন্য কথাটা—সা বাবুদের মুকুও আসছিল –

গৌর। এক সপ্তাহ পরে হুজুরের সঙ্গে এসে দেখা করবো ; এই কটা দিন মেম সাহেবকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে—

ডাক্তার। ভয় নাই, ভয় নাই ! নরহরি বাবু সব বুঝবে।

ডাক্তার সাহেব গৌরসুন্দরের সঙ্গে ফটক অবধি এসে তাঁর গাড়ীতে তুলে দিলেন, আজ তিনবার সে করহাও—প্রথম ঘরের ভিতর, দ্বিতীয় বারান্দায়, তৃতীয় এক পা পথে, এক পা রথে গাড়ীর কাছে। সপ্তাহ পরে গৌরসুন্দর ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে দেখা করেন, সে দিন হঠাৎ কালেক্টার সাহেবও তথায় উপস্থিত ছিলেন ; একটামাত্র দুঃখের কথা, দুটি শ্বেতমুখের হৃষ্ট হাসি ও একখানি কৃষ্ণ মুখের কষ্ট হাসির ফটোগ্রাফ তুলিয়া কেহ লয় নাই ; .তবে তৎপরবর্ত্তী রাজজন্মতিথির দিনে উপাধিতালিকা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবার পর বৈকাল হইতে মাণিক বোসের ঘাটে রায়-বাহাদুরের গদির বারান্দায় যে নহবৎ বাজতে আরম্ভ হয়, রাত দুপুর পর্য্যন্ত তার বেহাগের সুর ঘুষুড়ির কলের কুলীরা পর্য্যন্ত শুন্‌তে পেয়েছিল।

নরহরিসুন্দর যখন আহিরীটোলা বাঙ্গালা স্কুলে পড়েন, তখন তিনি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রণীত ভারতবর্ষের ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ; সেই অবধি নিজেদের পাল পদবী ও ইতিহাস-বর্ণিত পাল-বংশের সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকার কথা বরাবরই মনে মনে ভাবতেন ; বাবার রায় বাহাদুর হবার পরই তিনি যে কেবল পরিষ্কার মুখে লোককে বল্‌তে আরম্ভ করলেন যে, তাঁরা সেই প্রাচীন পালবংশেরই একটা বর্ত্তমান শাখা, তা' নয়, বাড়ীর প্রাইভেট টিউটার একটি ছোকরাকে দিয়ে "পালবংশের হালখাতা" নামক একখানি পুস্তিকাও প্রস্তুত করিয়া দিলেন এবং টিউটারটিকে পারিশ্রমিকের পরিবর্ত্তে নগদ ছয় টাকা খরচ করিয়া একখানি রজত-পদক প্রদান করিলেন।

আর দু একটা পুল, সারকুটহাউস কি স্যানাটোরিয়ম নির্ম্মাণে চাঁদা দিলেই ব্রজসুন্দরের রাজপৌত্র হবার বিশেষ সম্ভাবনা। কিন্তু রাজপুত্রই হোন অথবা বক্ষে যজ্ঞসূত্রই ধারণ করুন, আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের গোত্র-ভুক্ত না হ'লে টি-পার্টিতেও আসন পাবার অধিকার লাভ হয় না ; সুতরাং রায়কুমার নিজে প্রেসিডেন্সীতে ভর্ত্তি হবার সময় হামিদকেও সঙ্গে সঙ্গে টেনে নিলেন।

কাঞ্চন-কৌলীন্যের লীলাভূমি প্রেসিডেন্সী কলেজে সকল সময় মাত্র মোটা মাইনে দাখিল করলেই সীট পাওয়ার সুবিধা হয় না ; সময়ে সময়ে প্রবেশার্থী ছাত্রকে প্রশ্ন করা হয়, প্রেসিডেন্সীতে পড়িবার তাহার অধিকার কি, অর্থাৎ তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদের মধ্যে ক'জন পূর্ব্বে প্রেসিডেন্সীতে পড়েছেন বা কে কত সরকারী চাকরী বিভাগে উচ্চ স্থান অধিকার করেছেন এবং বংশের মর্য্যাদা কেমন উচ্চ ও কত পুরাতন। রায় বাহাদুরদের গদি-ঘরে ও দেশের বৈঠকখানায় ইদানীং বংশ-চর্চ্চাটা ভাল রকমই হয় ; সুতরাং তিনি তাঁহার দোস্ত হামিদেরও একটা 'বংশ-বৃক্ষ প্রস্তুত করিতে প্রয়াসী হইলেন। হামিদ যে চেলা-কাঠবেচা সোনাউল্লোর নাতি, এ কথা অবশ্য সে স্কুলে কখন-ও খুলে বলে নাই ; তার গ্র্যাণ্ড ফাদারের একটা বড় টিম্বার ইয়ার্ড আছে, এইটিই সে প্রকাশ করিত। নিরামিষভোজী গোঁড়া বৈষ্ণব গৌরসুন্দরের পৌত্র যে দিন প্রথম হামিদের বস্তীর ভিতরের খোলার বাড়ীতে লুকিয়ে গৃহস্থবাড়ীর রান্না ফাউল-কারি খেতে আসেন, সে দিন হামিদ তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে, দেশের জমি-জারাৎ, বাড়ী, ইমারত সব বরবাদ যাবে, কেউ আর সেখানে যেতে চাইবে

না, এই আশঙ্কায় তার নানা কোনমতেই কল্‌কেতায় কোঠা বানাতে রাজী হন না।

ব্রজসুন্দর চৈতন্য লাইব্রেরীতে ঢুকে অনেক বই ঘেঁটে ঘেঁটে আর গালিফ মিঞার পোতা কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর এক জন ড্রাফটসম্যান মৌলানাজাদা মামুদ্ ফকিরুদ্দীন সাহেবের সাহায্যে হামিদের যে বংশলতিকা প্রস্তুত করলেন, তা' কতকটা এইরূপ :—বহু পূর্ব্বে হামিদের পূর্ব্বপুরুষদিগের বাস ছিল খাস খোরাসানে; লড়াই ফতে কর্‌তে কর্‌তে তাঁহাদের আদিপুরুষ মহম্মদ বেন আবদাল্লা বেন আবদুল মুতালিব পাশা বাহাদুর ইরাণে এসে বাস করেন; সেখান থেকে বংশের এক শাখা আফগানিস্তান দখল ক'রে আমিরী করেন, পরে যখন বাবর বাদশা কাবুলে যান, তখন হামিদের অষ্টতম উর্দ্ধপুরুষ মালিকে উল্‌মুলুক ফতেজান ডার্ডেনেলিস্ খাঁ বাহাদুরকে বন্দী ক'রে দিল্লীতে আনেন এবং তাঁর বীরত্বের পুরস্কারস্বরূপ নিজের এক জন সেনাপতিপদে নিযুক্ত করেন। ডার্ডেনেলিস্ খাঁ রাজা আদিশূরের শ্বশুর নবীন নিয়োগী মহাশয়কে যুদ্ধে পরাজিত ক'রে যশোহর বিভাগ জালিয়ে দিয়ে সেখানে সুঁদরিগাছ রোপণ করিয়ে দেন, ডার্ডেনেলিস্-বিজিত সেই সহরের নাম এখন হয়েছে সুন্দরবন। পূর্ব্বগৌরব স্মরণ ক'রে এখন সাধারণের কাছে এঁরা সামান্য জমীদার ব'লে পরিচয় দেন না, অতি সামান্য সংক্ষিপ্ত নামেই সতত সন্তুষ্ট, যথা—পিতামহ পিতামহ হাজী মামুদ সোণোয়ার উদ্দীন আলিউল্লা খাঁ; পিতা—পিতা মৌলভী গাজি কুদরৎ বসহর্‌উদ্দিন খাঁ সাহেব; পুত্র—পুত্র মিষ্টার নবাবজান্, মামুদ হামিদ সা।

এই পরিচয়েই হামিদ প্রেসিডেন্সীতে কলেজ লাইফে প্রবেশ করিল; কিন্তু হেম নামের মায়া সে এখনও কাটাতে পারে নাই। এখনও আমাদের বাড়ীতে সেই আসা যাওয়া, এখনও আমাদের ছেলেদের সঙ্গে আগেকার মতই বাড়ীর ভিতর গিয়ে সন্দেশ, আম, নাড়ু প্রভৃতি চেয়ে খাওয়া, সে এখনও আমাদের সেই হেম, সেই বাঙলা ধুতি, জামা, চাদর—লম্বা শির।

[ ক্রমশঃ।

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

# পল্লী-জননী

সৌধ-কিরীট না আছে তাঁহার
না আছে সোনার দেহ,
তরুবর—শির মুকুট তাঁহার
শ্যামলবরণী সেহ!
অঞ্চল তাঁর ভরিয়া থাক্তে—
তটিনী বহিয়া যায়,
আয়ুবলপ্রদ স্বাদু নীরে যার
তৃষিত পরাণ পায়!
চরণ পরশে বিপুল হরষ সেবায় শান্তি পাই,
আমার পল্লী-জননী সে যে গো তুলনা তাহার নাই!

বসন্তে সেথা আকুল পরাণ
চূত-মুকুলের গন্ধে,
অশোক মুঞ্জরে বকুল ঝরে গো,
কোকিল কুহরে ছন্দে;
নিদাঘে তাঁহারে সাজায় চম্পক
স্বর্ণ-আভরণ দিয়া,
তড়াগের তীরে দাঁড়ায়ে হিজল
শতেক মালিকা নিয়া!
বর্ষায় শোভে কুমুদ-কহ্লার
মাঠে ঘাটে ভরা জল,
উৎসব-কল-মুখর শরতে
হাসে চাঁদ নিরমল!
অন্নপূর্ণারূপিণী তাঁহারে হেমন্তে হেরিতে পাই,
আমার পল্লী-জননী সে যে গো তুলনা তাহার নাই!

নারিকেল তাল নীপ বেলে ঘেরা
পর্ণকুটীর-মাঝে
কর্ম্ম-নিরতা সাধ্বী বধূর
কাঁকণ দু'খানি বাজে!
বিপদে সম্পদে বামা ঠাকুরাণী
হলধর দাদা আর
দাঁড়ায়ে দুয়ারে ক্ষুধা নিদ্রা নাই,
করুণার অবতার!
কোথা আছে আর সহরালি চাচা গোয়ালা কবুত ভাই?
আমার পল্লী-জননী সে যে গো তুলনা তাহার নাই!

সকাল সন্ধ্যার প্রতি গৃহে তথা
ঘণ্টা-কাঁসর বাজে,
আঙ্গিনার কোণে তুলসী-তলায়
ক্ষীণ দীপটি রাজে!
অতিথির সেবা হরি-কীর্ত্তন
নিত্য ভিক্ষা দান,
পুকুর-প্রতিষ্ঠা পাঠকের কথা
বাউল-প্রসাদী গান!
বার মাসে হেন তের পার্ব্বণ আর কোথা গেলে পাই?
আমার পল্লী-জননী সে যে গো তুলনা তাহার নাই!

শ্রীনিরঞ্জন সেনগুপ্ত।

# বৌদ্ধযুগে সমাজচিত্রের একাংশ *

এই প্রবন্ধের উপাদান বিমানবত্থুঅর্থকথা নামক পালিগ্রন্থ হইতে গৃহীত হইয়াছে। প্রথম যুগের বৌদ্ধ-ধর্ম্মগ্রন্থ রচিত হইবার পরবর্ত্তী কালে এই ধর্ম্মগ্রন্থ রচিত হয়। পেতবত্থু (প্রেতবস্তু), অপদান (অবদান), জাতক প্রভৃতি গল্পের যে সকল পুস্তক রচিত হইয়াছিল, ইহাও সেই শ্রেণীভুক্ত। মাঝে মাঝে এই গ্রন্থে যে চিত্র ধরা পড়িয়াছে, তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস দিবার প্রয়াস পাইতেছি মাত্র।

## উৎসব

প্রাচীন ভারতে আনন্দের উৎস প্রতিনিয়ত ক্ষরিত হইয়া জীবনপ্রবাহকে কিরূপ সরস ও গতিশীল করিয়া রাখিয়াছিল, তাহার নিদর্শন বহুলভাবে সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যে বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহার উল্লেখ করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। উপরি-উক্ত পুস্তকে আমরা দেখিতে পাই—"এক দিন রাজগৃহে সকলে ঘোষণা করিল—আজ হইতে সপ্তাহ পর্য্যন্ত নক্ষত্র-ক্রীড়া হইবে (নক্খত্তং কীলিতব্বং)। নাগরিকগণ রাজবীথিসমূহ সম্মার্জ্জিত করিয়া, তাহার উপর বালুকা বিকিরণ করিয়া দিল এবং পঞ্চবিধ লাজ ও পুষ্প বর্ষণ করিল। প্রতি গৃহদ্বারে পূর্ণঘট ও কদলীবৃক্ষ স্থাপিত হইল। নানাবর্ণের ধ্বজ-পতাকা পত-পত শব্দে বায়ুতে হিল্লোলিত হইতে থাকিল। নিজ নিজ বিত্তানুযায়ী সকলেই সেই দিন উৎকৃষ্ট বেশ-ভূষা আভরণে সজ্জিত হইল। এইরূপে অলঙ্কৃত হইয়া রাজগৃহ দিব্য (স্বর্গ) নগরের শোভা ধারণ করিল। (প্রাক্তন সুকৃতির ফলে) রাজা বিম্বিসার প্রজাবর্গের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত রাজপ্রাসাদ হইতে নির্গত হইয়া—রাজশ্রীমণ্ডিত হইয়া, রাজসম্পদের জ্যোতিতে ভাস্বর হইয়া, বহু অনুচরজনগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া—নগর প্রদক্ষিণ করিলেন।"

নক্ষত্র দেখিয়া শুভমুহূর্ত্তে উৎসবের আরম্ভ হইত। প্রথমতঃ প্রতি মাসের প্রারম্ভে মাসিক উৎসব হইত—পরে যে কোনও উৎসবকেই নক্ষত্র বলা হইত। জাতকগ্রন্থে ইহার প্রচুর উল্লেখ আছে। নক্ষত্র বিচার করিয়া শুভক্ষণে উৎসব স্থিরীকৃত হইত বলিয়া উৎসবের অপর নাম ক্ষণ, পালিভাষায় ছণ, যথা—"অথ একদিবসং নগরে ছণং সজ্জিংসু; মহন্তং ছণং ঘোষয়িংসু।" সুরাপানই প্রধান ব্যাপার যে উৎসবে হইত—তাহার আবার নাম ছিল সুরাছণো। স্ত্রী-পুরুষ অবাধে কয়েকদিন ধরিয়া বারুণী-দেবীর উপাসনায় প্রায় লুপ্তসংজ্ঞ হইয়া পড়িত (সামি, পুব্বে ইমস্মিং কালে সুরাছণো নাম হোতি; কুম্ভজাতকে—সাবত্থিয়ং কির সুরাছণে ঘুট্ঠে তা পঞ্চসতা ইত্থিয়ো সামিকানং ছণকীলাবসানে তিকখসুরং পটিয়াদেত্বা "ছণং কীলিস্সামা" তি সব্বাপি ইত্যাদি)।

রাজা সেই উৎসবে নগর প্রদক্ষিণ করিতেন, ইহার উল্লেখ জাতকেও আছে। (সুসীম জাতক—একদিবসং নগরং সজ্জাপেত্বা সক্কো দেবরাজা বিয়...মত্তবরবারণস্স খন্ধে নিসীদিত্বা নগরপদক্খিনং অকাসি)।

বাতমিগ জাতকে দেখি যে, রাজগৃহে উৎসব ঘোষিত হইলে পুত্রের অনুপস্থিতিতে মাতাপিতার মনে সুখ নাই—উৎসবসময়ে তাহাদের পুত্র যে অলঙ্কার পরিয়া উৎসব দেখিতে যাইত—আজ তাহা রৌপ্য-পেটিকায় বন্ধ। তাহা দেখিয়া দেখিয়া তাঁহারা অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন।

কখনও বা দেখি যে, এমন উৎসবেও শ্রমিকদিগের ভিতরে কেহ কেহ উৎসবে যোগদান করিতে পারিতেছে না—আমরা পাঠ করি যে, "এক দিন রাজগৃহে ঘোষিত হইল যে, সাত দিবস ধরিয়া উৎসব চলিবে। এক শ্রেষ্ঠী তাঁহার মজুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ত্বং কিং নক্খত্তং কীলিস্সসি উদাহু ভতিং করিস্সসি (তুমি কি নক্ষত্র-ক্রীড়া করিবে না খাটিবে?) ভৃত্য উত্তর দিল—'প্রভু, নক্ষত্র ধনবানের জন্য; আমার গৃহে কাল কি খাইব, তাহার সংস্থান নাই—যবাগূ-তণ্ডুলের কণামাত্র নাই। নক্ষত্রের সহিত আর আমার সম্পর্ক কি'?"—কিন্তু জাতকে অন্য রকম চিত্রও দেখিতে পাই। উৎসব উপভোগ করিবার আবার "মেজাজ" থাকা চাই। গঙ্গমাল জাতকে দেখি যে, এক জন দরিদ্র শ্রমিক জল উঠাইয়া (উদকভতিং কত্বা) একটা অর্দ্ধমুদ্রা (অড্ঢমাসকং) পাইয়াছিল। উৎসবের

---

* বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে গৃহীত।

দিনে এক জন দুর্দ্দশাপন্না স্ত্রীলোকের সহিত দেখা হইল – তাহারও মূলধন অর্দ্ধমাসক। তৎপরে দুই জন তাহাদের এই মহামূল্য মূলধন একত্র করিয়া উৎসব পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করিবার নিমিত্ত মালা, গন্ধ, তীক্ষ্ণ সুরা প্রভৃতি সরঞ্জাম কিনিবার পরামর্শ করিতে লাগিল। দেখা গেল যে, ভোগ শুধু ধন থাকিলেই হয় না, মনও চাই।

উৎসবে মালা, গন্ধ, বসন, ভূষণ, অলঙ্কার, প্রেম আলাপন প্রভৃতির ছড়াছড়ি ছিল—য়ুরোপীয় Carnivalএর কথা মনে পড়ে। ইহাতে কোথাও দেখি, ঐন্দ্রজালিক মায়া রচনা করিতেছে, বাজীকর বাজী দেখাইতেছে, নট নৃত্য করিতেছে, কুশীলব অভিনয় করিতেছে, বীণাবাদক বীণাবাদন করিতেছে, শঙ্খধ্মাক শঙ্খনিনাদ করিতেছে, ভেরীবাদক ভেরী বাজাইতেছে, অহিতুণ্ডক সাপ খেলাইতেছে। সকলেই নিজ নিজ শিল্পপ্রদর্শন করিয়া উৎসবকে সার্থক করিত। জাতকে পাঠ করি—পটল নামক নট ভার্য্যাসমভিব্যাহারে বারাণসী গমন করিয়া নাচিয়া গাহিয়া (নচ্চিত্বা, গায়িত্বা) ধনলাভ করিয়া উৎসবান্তে সুরাভক্ত গ্রহণ করিল। এতৎসম্পর্কে ভেরীবাদক, শঙ্খধমন ও অহিগুণ্ডিক জাতক দ্রষ্টব্য।—জৈনগ্রন্থ ‘কল্পসূত্রে’ও এই উৎসবের চাঞ্চল্য দেখিতে পাই। সকল কথা বলা চলে না দুই একটা কথা বলি, “এই উৎসবে অভিনেতৃগণ অভিনয় করিত, নর্ত্তক নাচিত, দড়ির উপরে নাচিবার ও বাজী দেখাইবার লোকও থাকিত, কুস্তিগীর, মুষ্টিযোদ্ধা, ভাঁড়, চারণ জাতীয় লোক (ballad singers), গল্প বলিবার লোক, (আখ্যায়কা) কুশীলব (লসকা ভাণ্ড), বাঁশবাজী দেখাইবার লোক, “আরক্ষক” (messenger) তলার, (?) ব্যাগ-পাইপ বাজাইবার লোক, বীণাবাদক ও তালাচরণগণ (অর্থাৎ যাঁহারা হাতে তালি দিয়া তাল রাখিতেন) উৎসবকে জমাইয়া তুলিত। উৎসবের অন্যান্য আরও কি কি অঙ্গ ছিল, তাহার একটি তালিকা দীঘনিকায়ে দেখিতে পাওয়া যায়– নৃত্য, গীত, বাদিত্র (কনসার্ট), প্রেক্ষা (থিয়েটার), আখ্যান (আবৃত্তি), বেতাল (যন্ত্রবাদ্য) প্রভৃতি থাকিত। বাঁশবাজীও বোধ করি হইত—দীঘনিকায়ে “চণ্ডালং বংসধোপনং” কথাটা আছে। বুদ্ধঘোষ ইহার অর্থ করিতেছেন,

যে কি, তাহা ঠিক বুঝা যাইতেছে না—বাঁশে চড়িয়া balance রাখিবার খেলাও হইতে পারে। চণ্ডাল প্রভৃতি নীচজাতি এই খেলা দেখাইত। দিব্যাবদানে বংশঘটিকা নামক ক্রীড়ার উল্লেখ আছে। ফ্রাঙ্ক ‘সাহেব’ অর্থ করেন, “বংশধমনং” অর্থাৎ বেণুবাদন। যাহা হউক, বাঁশ লইয়া খেলা হইত, এ সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ। তবে তাহার উপর চড়া হইত, না তাহা লইয়া বেণুবাদন হইত, ইহাই মীমাংসার বিষয় হইয়া আছে। আর দেখা যায়, নানা প্রকার যুদ্ধ—যথা হস্তিযুদ্ধ, অশ্বযুদ্ধ, মহিষযুদ্ধ, বৃষভযুদ্ধ, অজযুদ্ধ, মেণ্ডকযুদ্ধ (মেড়ার লড়াই), কুক্কুটযুদ্ধ (মুরগীর লড়াই), বট্টকযুদ্ধ (বটের পাখীর যুদ্ধ—তুলঃ টুনটুনির লড়াই), দণ্ডযুদ্ধ ও মুষ্টিযুদ্ধ। কুস্তী, উয্যোধিক (তলোয়ার খেলা) ইত্যাদিও বেশ চলিত।

উৎসবও একটা আধটা ছিল না –নানা উৎসবের নাম পাওয়া যায়। রাজগৃহে একটি উৎসব হইত, তাহার নাম গিরগ্‌গসমজ্জ। এই উৎসব পাহাড়ের উপর হইত। কর্ষণোপলক্ষে, অর্থাৎ হলচালনে উৎসব হইত। বৈশালীতে ‘সর্বরাত্রিচারো’ (সব্বরত্তিবারো ?) নামক উৎসব হইত —তাহাতে “তুরিয়-তাড়িত-বাদিত নির্ঘোষশব্দ” শুনা যাইত। কুমারক ও কুমারিকাদের একটা মিলনোৎসবও সেকালে দেখা যায়। Mrs. Rhys Davids বলেন, – “The festival was a kind of St. Valentine’s Day. Clansmen’s daughters arrayed in their best, held a parade, the youths having also foregathered, and presents or at least flowers were presented, Festival cakes were also handed about.” ইহা ছাড়া ছিল হস্তিমঙ্গল (Elephant Festival)। আর ছিল কত্তিকছণম্। ইহার বর্ণনা এই—“অথ তস্স নগরে কত্তিকছণম্ ঘোষয়িংসু, কত্তিকপুণ্ণমায় নগরং সজ্জয়িংসু · অথ সুরিয়ে অথং গতে উপগতে পুণ্ণচন্দে দেবনগরে বিয় অলঙ্কতে নগরে সব্বদিসাসু দীপেসু জালন্তেসু রাজা সব্বালঙ্কারপটিমণ্ডিতো আজঞ্ঞ রথবরগতো নগরং পদক্খিনং করোন্তো ··। সূর্য্য অস্ত যাইলে ও পূর্ণচন্দ্র উদিত হইলে দেবনগরের মত অলঙ্কৃত নগরে সর্ব্বদিকে দীপ জ্বালিত হইলে সর্ব্বালঙ্কার-

পূর্ণিমা ও দীপাবলী ( দেওয়ালী ) এই দুই উৎসবের সঙ্গে আংশিক সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। শালবনেও ক্রীড়া হইত।

**চোরভীতি**—রাজগৃহ ছিল রাজধানী। কিন্তু তথাচ চোরভীতি কম ছিল না। এমন কি, চোরের ভয়ে গৃহস্থ দিনের বেলাতেও কবাট দিয়া রাখিত। এক জন উপাসক ( গৃহস্থ ) চারি জন ভিক্ষুকে প্রতিদিন ভোজন করাইত। কিন্তু তাহার চোরের ভয় এমন ছিল যে, দিনেও দরজা বন্ধ করিয়া রাখিত। ফলে ভিক্ষুগণকে কখন কখন অভুক্ত থাকিয়া ফিরিয়া যাইতে হইত,-- "তস্স পন গেহপরিয়ন্তে ঠিতং চোরভয়েন যেভুয্যেন পিহিতদ্বারং এব হোতি।" অবশেষে তাহাকে দ্বারপাল রাখিতে হইয়াছিল। জাতকেও এই কথা দেখিতে পাই। প্রত্যন্তবাসী চোর ও দস্যু দমন করিবার জন্য রাজাকে বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইত। নগরকে নিরাপদ করিবার নিমিত্ত নগরগুত্তিক ( নগররক্ষক ) নিযুক্ত হইতেন। Fiek বলেন,—"Judging from the in security which on account of the frequent mention of robbers and thieves in the Jatakas and other folk-literature must have existed in the Indian cities in ancient times, he ( নগরগুত্তিক ) was no small personage."

**নগরশোভিনী**—রাজগৃহে সিরিমা নামক এক জন প্রধানা গণিকা ছিল, তাহার দর্শনী ছিল দৈনিক সহস্র কার্ষাপণ। ( সিরিমা নামক গণিকা হোতি, দেবসিকং সহস্সং গণ্হতি ) সিরিমা রাজা বিম্বিসার এবং অজাতশত্রুর সভাচিকিৎসক জীবকের ভগিনী। জীবক নিজেই গণিকা-পুত্র। বারহুতস্তূপের সিরিমা দেবতার সহিত এই সিরিমার একত্ব প্রতিপাদন করিতে কানিংহাম 'সাহেব' যত্নবান্ হইয়াছেন।

এই গণিকা তাহার নিজগৃহে প্রত্যহ আট জন ভিক্ষুকে ভোজন করাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিল ( অট্ঠসলাকভত্তানি পট্ঠপেসি )। এক জন ভিক্ষু তাহার রূপে মোহিত হইয়া আহার পরিত্যাগ করিলে বুদ্ধদেব তাহার মোহ ভাঙ্গিয়া দিলেন। সিরিমার মৃত্যু হইলে তাহাকে পোড়ান হইল না। পচিয়া গলিয়া দেহ কৃমিতে ভরিয়া গেল, এত রূপের পাত্রকে এখন কেহ বিনা পয়সাতেও লইল না, সকলেই নাক সিটকাইয়া সরিয়া গেল। ইহারই জন্য এত মোহ!

বৈশালীর গণিকা অম্বপালীর ঐশ্বর্য্য ও খ্যাতিতে ঈর্ষ্যাপরায়ণ হইয়া রাজা বিম্বিসার কুমারী সালাবতীকে রাজগৃহের প্রধানা গণিকা করিলেন, ( অথ খো রাজগেহকো নেগমো সালাবতীং কুমারিং গণিকং বুট্ঠাপেসি মহাবগ্গ—৮, ১,২,৩, )। এই সালাবতীই জীবকের মাতা। গণিকাদের স্থান অতি উচ্চ ছিল। রাজসভায় একাদশ বর্গের ভিতর গণিকা অন্যতম। বিধুরপণ্ডিত জাতকে দেখি, রাজান্তঃপুরেও তাহার স্থান আছে। বারাণসীতে শ্যামা গণিকার দর্শনী এক সহস্র কার্ষাপণ। তাহার রূপ অসামান্য ও সে রাজার অনুগ্রহপাত্রী। নগরশোভিনী শুল্সার 'ফী' ( fee ) ও এক সহস্র মুদ্রা। রাজভাণ্ডারে অর্থাগমে তাহার দরকার হইত। রাজগৃহের নাগরিকগণ অম্বপালীর সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া সেখানে পাছে অর্থ দেয়, এই ভয়ে রাজা সালাবতী কুমারীকে রাজগৃহে প্রধান গণিকা করিয়া স্থাপিত করিলেন, তাহা বলিয়াছি। কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে তাহার স্থান নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন। স্নানাগারে, সম্বাহনে, শয্যাগৃহে, মাল্যগন্ধ যোগাইতে ও অন্যান্য কার্য্যে তাহার দরকার পড়িত। গণিকাধ্যক্ষ রূপযৌবনশিল্পসম্পন্না গণিকাকে সহস্র মুদ্রা দিয়া রাজসভায় রাখিতেন। অর্থশাস্ত্রে দেখি, তাহারা রাজচ্ছত্র ধরিত, চামর ব্যজন করিত, স্বর্ণভৃঙ্গার উপস্থিত করিত। সরভঙ্গ জাতকে গণিকা রাজার নিকট কিরূপ সম্মান পাইত, তাহা দেখা যায় ( লদ্ধ সক্কারম্ গণিকাং )।

বৈশালীর অম্বপালী স্বয়ং বুদ্ধদেবকে সঙ্ঘ সহিত ভোজন করাইয়াছিলেন ও তাঁহাকে তাঁহার উদ্যান দান করিয়াছিলেন। থেরী গাথায় অম্বপালীর উল্লেখ দেখা যায়। দেবমন্দিরে দান অথবা ধর্ম্মের উদ্দেশ্যে দান গণিকাগণ করিত। এই সম্পর্কে প্রাচীন গ্রীসের hetaeraদের কথা মনে পড়ে। তাহারাও রূপযৌবনসম্পন্না ও উদারপ্রকৃতি ছিল, দান-ধ্যানেও খুব নাম ছিল। বাৎস্যায়ন কামসূত্রে ( ২৫০ খৃষ্টাব্দ ) বেশ্যাদের সম্বন্ধে অনেক বলিয়াছেন। তাহারা নয় শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। গণিকার স্থান ছিল প্রধান। রাজা তাহার সম্মান করিতেন, উচ্চপদস্থ ব্যক্তি ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ

তাহার সঙ্গলাভ শ্রেয়ঃ মনে করিতেন। মৃচ্ছকটিকে ধনসম্পন্না উদারপ্রকৃতি বসন্তসেনার সহিত ব্রাহ্মণ চারুদত্তের কোর্টশিপ ও বিবাহ হইয়াছিল। দণ্ডীপ্রণীত দশকুমারচরিতে বেশ্যার শিক্ষার কথা আছে। নৃত্য, গীত, অভিনয়, বাদ্য, চিত্রশিল্প, গন্ধ-দ্রব্য তৈয়ার করা, কৃত্রিম পুষ্পরচনা, কথাবার্ত্তা কহিবার কায়দা প্রভৃতি শিক্ষা ত করিতেই হইত; পরন্তু ন্যায়, ব্যাকরণ, দর্শনেও কিছু কিছু তালিম দেওয়া হইত। নানাবিধ ক্রীড়াতেও তাহারা পারদর্শিনী হইত। রূপ-যৌবনসম্পন্না, সুবেশা, নানাশিল্পাভিজ্ঞা, দর্শনীয়া, মনোহারিণী, বাক্‌পটু, মিষ্টরসনা, সুরসিকা গণিকার সঙ্গলাভ অনেকের পক্ষে প্রেয় ছিল। রাজাও গণিকার সহিত যোগ দিয়া মাঝে মাঝে উৎকট Practical joke করিতেন, তাহাও দেখা যায়। কথাকোষে দেখি, বসন্ততিলকা রাজকুমারী রত্নমঞ্জরীর প্রিয়সখী; রাজান্তঃপুরে যাতায়াত আছে। গণিকা মাগধিকা রাজার নিকট প্রতিশ্রুত হইল যে, সন্ন্যাসী কুলবালককে তাহার নিকট আনিয়া দিবে। নানাবিধ প্রকারে মোহজাল বিস্তার করিয়া মাগধিকা কুলবালককে প্রেমের বন্ধনে বাঁধিল। রাজা কোণিক তাহার দ্বারা স্বকার্য্য সাধন করিল—বৈশালী তাহার করগত হইল। বেশ্যাদের সম্বন্ধে উত্তরকালে অনেকগুলি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, যথা—দামোদর গুপ্তের কুট্টনীমতম্, কল্যাণমল্লের অনঙ্গরঙ্গ, ক্ষেমেন্দ্রের সময়মাতৃকা। স্থানাভাবে বিস্তৃত আলোচনা অসম্ভব।

কখনও কখনও দেখি, তাহার প্রকৃতি রূঢ় ও নির্ঘৃণ। অট্‌ঠানজাতকে পাঠ করি যে, এক শ্রেষ্ঠিপুত্র ঠিক সময়ে প্রতিশ্রুত সহস্র কার্ষাপণ উপস্থিত করিতে পারে নাই বলিয়া অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া তাহার মুখের উপরেই দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া, তাহাকে রাস্তায় তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল—পূর্ব্ব-প্রেম ও ধনদান সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছিল। তক্কারিয় জাতকে গণিকা কালী এক ধনবান্ শ্রেষ্ঠিপুত্রকে বেশ-ভূষা কাড়িয়া লইয়া উলঙ্গ করিয়া গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিল। দেখা যায় যে, পুত্রসন্তান যদি (ভুলক্রমে) জন্মিত, তাহা হইলে তাহাকে শ্মশানে ফেলিয়া দিত। মহাবগ্‌গে (৮,১,৪) দেখি, সালাবতীকুমারী দাসীকে আজ্ঞা করিতেছে—"ইমং দারকং সঙ্কারকুটে ছড্ডেহি"—এই বালককে আঁস্তাকুড়ে ফেলিয়া দিয়া এস। ধর্ম্মপদ অর্থকথায় ও পেতবত্থুতে (কুমারবত্থুতে) ইহার দৃষ্টান্ত আছে—'সা চ নং জাতমত্তম্ এব দারকো তি ঞত্বা সুসানে ছড্ডাপেসি'—সে জাতমাত্র পুত্র জন্মিয়াছে জানিয়া তাহাকে শ্মশানে পরিত্যাগ করিল।

পালি-সাহিত্যে পঞ্চশীল-রক্ষয়িত্রী, ধর্ম্মপরায়ণা, বুদ্ধ ও সঙ্ঘে ভক্তিমতী গণিকার দৃষ্টান্তও আছে।

## গৃহস্থালীর চিত্র

(ক) এক জন রমণী স্বামীর নিকট হইতে এক পক্ষের জন্য সহবাসমুক্তিলাভোদ্দেশ্যে রাজগৃহের প্রধানা গণিকা সিরিমাকে প্রতিদিন সহস্র মুদ্রা দিয়া স্বগৃহে অধিষ্ঠিত করিল। তাহার পুণ্যকর্ম্মে (পুঞ্ঞ কম্ম) যাহাতে বাধা না পড়ে, সেই হেতু এই বন্দোবস্ত করিতে হইয়াছিল। গণিকার দর্শনীর মুদ্রা ঐ রমণীর পিতা দিয়াছিলেন।

(খ) বন্ধ্যা রমণীর আত্মোৎসর্গের একটি মনোরম দৃষ্টান্ত লক্ষিত হয়। বন্ধ্যা দেখিলেন যে, পুত্রের অভাবে স্বামীর বংশনাশ হইতে পারে। সেই জন্য তিনি স্বামীকে বলিলেন—প্রভু, আমার কনিষ্ঠার নাম সুভদ্রা, তাহাকে আনুন; যদি তাহার পুত্র হয়, সে আমারও পুত্র হইবে এবং আপনার কুলবংশও নাশপ্রাপ্ত হইবে না। তাঁহার স্বামী 'সাধু' বলিয়া তাহাই করিলেন। পেতবত্থু অর্থ-কথায় দেখি যে, এক বন্ধ্যা রমণীর অনুরোধে স্বামী দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করিলেন। কিন্তু দ্বিতীয়া গর্ভধারণ করিলে, সাপত্ন্য ঈর্ষাবশে প্রথমা এক পরিব্রাজকের সাহায্যে তাহার গর্ভপাত করিল।

### (গ) বধূর প্রতি শাশুড়ীর ব্যবহার

আমরা দেখি যে, আমাদের সমাজে শাশুড়ী যেন রায়বাঘিনী হইয়া পুত্রবধূদের হৃৎকম্প উপস্থিত করেন। কখনও কখনও অজ্ঞাতে পুলিস সাহেবের সহিত তুলনা আসিয়া পড়ে। সামান্য অপরাধের জন্য বধূ প্রাণ পর্য্যন্ত হারাইত। দ্বারে ভিক্ষু দাঁড়াইয়া আছে—অপরাধ—তাহাকে কিছু ইক্ষুরস, অথবা দুই একটি পিষ্টক দেওয়া। এই না দেখিয়া শাশুড়ী মুষল লইয়া ধাওয়া করিয়া ঘাড়ে এক ঘা বসাইয়া দিল; অংসকূট ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে বধূ

সেইখানেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। কোথাও বা পিঁড়া ছুড়িয়াই মারিয়া দিল। এইরূপ বর্ণনা আছে—"তটতটায়মানা কোধাভিভূতা যথাযুত্তং অচিন্তেত্বা অংসকূটে পহরি" (অর্থাৎ তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া গিয়া ক্রোধাভিভূত হইয়া যথাযুক্ত বিচার না করিয়া স্কন্ধদেশে প্রহার করিল)। কোথাও বা দেখি, এক ঢিলেই বধূকে বধূলীলা সংবরণ করিতে হইল।

"একবগ্‌গা" বৌকে বশ করিবার নিমিত্ত কৌটিল্য হুকুম দিয়াছেন—"বেণুদল-রজ্জুহস্তানামন্যতমেন বা পৃষ্ঠে ত্রিরাঘাতঃ," (অর্থাৎ কি না—বাঁশের ছিলা দিয়া অথবা চপেটাঘাত করিয়া তিনবার মারা যায়,—প্রাণে মারিবার 'ঢালা হুকুম' তিনি দেন নাই।)

(ঘ) **শাশুড়ীর প্রতি বধূর ব্যবহার**—বধূর মন শাশুড়ীর ব্যবহারে তিক্ত হইয়া থাকিত; দিন পাইলে সেও এক হাত লইত। পিতামাতা বৃদ্ধ হইয়া পুত্রকে বলিতেছেন, "বাবা, বৌ আন—আমাদের সেবা করুক।" পুত্র জানিত, বৌ আনিয়া বিপদ্ হইবে, সেই গৃহকর্ত্রী হইয়া রাজত্ব করিবে, পিতামাতার 'অবস্থা' হইবে (ইথিয়ো নাম পতিকুলে ঠিতা ইস্সারিয়ং করোন্তি, সস্সু-সস্সুরানং মনাপচারিনিয়ো দুল্লভা তি মাতাপিতুন্নং চিত্ত-দুক্খং পরিহরন্তো দারপরিগ্‌গহং অকত্বা··)। সে বিবাহ করিল না।

জাতকে অনেক দৃষ্টান্ত আছে। তিক্ত-বিরক্ত নির্য্যাতিত হইয়া যখন লোক সহায়হীন হইয়া পড়ে, তখন ভাবে, সে ধর্ম্ম আর নাই—ধর্ম্ম মরিয়াছে। কচ্চানীজাতকে দেখি যে, বধূর ব্যবহারে শাশুড়ীর এমন অবস্থা হইয়াছে যে, প্রতীকারের কোন আশা না দেখিয়া সে গৃহত্যাগ করিয়া ধর্ম্মের নামে "বহুতমজ্জ" করিতেছে। অর্থাৎ মৃতব্যক্তির উদ্দেশ্যে যে কৃত্য করিতে হয়, ধর্ম্ম মরিয়া গিয়াছে বলিয়া ধর্ম্মেরও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিতে লাগিল। অন্য স্থলে শাশুড়ী বিলাপ করিতেছে—"চন্দনমালা বিলেপন-গন্ধ দিয়া যে কন্যাকে গৃহে বরণ করিয়া আনিলাম—সেই আজ আমাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিল।" বধূ নিদ্রিত শাশুড়ীকে কুমীরভরা নদীতে ফেলিয়া দিতে চাহিল, আর একবার শ্মশানে জলন্ত পোড়াইয়া মারিতে চাহিল। কোথাও বা দেখি, মায়াবিনী স্বামীকে তাহার পিতামাতার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার নিমিত্ত নানা কল-কৌশল উদ্ভাবন করিতেছে। শ্রাবস্তীর এক মহাশাল ব্রাহ্মণ তাঁহার অষ্ট পুত্রকে সমস্ত সম্পত্তি বণ্টন করিয়া দিয়া পথের ভিখারী হইল। বেচারী আট ছেলের আটটি বগলার তাড়া খাইয়া গৃহত্যাগ করিল।

পুত্রবতী জননী পুত্রধনে গরীয়সী হইয়া স্বামীকে উপেক্ষা করিতেছেন দেখা যায়। স্বামীও রাগিয়া গিয়া দারান্তর পরিগ্রহ করিয়া শোধ লয়েন। "তেসং মাতা পুত্তবসেন ভত্তারং অতিমঞ্ঞতি, সো ভরিয়ায় অবমানিতো নিব্বিন্ন মানসো অঞ্ঞং কঞ্ঞং আনেসি।"

উপরে যে চিত্র দেখান হইল, তাহা নিয়মের ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত বলিয়া পরিগণিত হওয়া উচিত। "সস্সুদেবা পতিব্‌বতা" নারীর চিত্র বিরল নহে। শ্বশুর-শাশুড়ীর প্রতি ভক্তিমতী, তাঁহাদের আজ্ঞানুবর্ত্তিনী, পতিব্রতা নারীর যত্নে গৃহে শান্তি বিরাজ করিত। শিক্ষিতা, মেধাবিনী কন্যা শিক্ষাগৌরবে স্ফীত না হইয়া গৃহস্থালী-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া নিপুণ-হস্তে শ্বশুর, শাশুড়ী ও পরিজনস্থ যাবতীয় ব্যক্তির সেবা-শুশ্রূষা করিয়া মহৎ-হৃদয়ের পরিচয় দিত। লতাবিমানে দেখি—"উপাসকস্‌স ধীতা লতা নাম পণ্ডিতা ব্যত্তা মেধাবিনী পতিকুলং গতা। তত্থ সস্সুসস্সুরানঞ্চ মনাপচারিণী পিয়বাদিনী পরিজনস্‌স সংগহকুসলা।"

## বিবাহ

মাতুল কন্যার সহিত বিবাহই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত ছিল দেখিতে পাই। (অথ গস্‌স মাতাপিতারো সম্মুখগেহতো মাতুলধীতরং রেবতীং নাম কঞ্ঞম্ আনেতুকামা অহেসুং)। পেতবথুকথা ও জাতকে ইহার প্রচুর দৃষ্টান্ত দেখি। উত্তর-ভারতে কিন্তু এইরূপ বিবাহ এখনকার কালে নিন্দিত। পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। Weber তাঁহার *Indische Studien* Vol x. এ (Die Kastenverhaltnisse in dem Brahman und Sutra) এইরূপ বিবাহের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। Westermarck তাঁহার History of Human Marriage নামক পুস্তকে (পৃঃ ৩০৪) বলিয়াছেন—"Yet in the older literature marriage with the daughters of the mother's brother and sons of the father's sister is permitted।" প্রদ্যুম্ন তাঁহার মাতার ভ্রাতা রুক্মীর কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্‌ভাগবত দশম স্কন্ধে পড়ি—

> "যদ্যপ্যনুস্মরন বৈরং রুক্মী কৃষ্ণাবমানিতঃ।
> ব্যতরৎ ভাগিনেয়ায় সুতাং কুর্ব্বন্ স্বসুঃ প্রিয়ম্ ॥"

অর্জ্জুন মাতুল-কন্যা কৃষ্ণভগিনী সুভদ্রাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। মহাকবি ভাসের অবিমারক নামক নাটকে দেখি—অবিমারক মাতুল কুন্তীভোজের কন্যা কুরঙ্গীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ আর্য্য ছিলেন কি অনার্য্য ছিলেন, সে বিচার এখানে করিবার উপযুক্ত সময় নয়। দেখা যাইতেছে যে, মাতুল-কন্যা-বিবাহ এক সময়ে উত্তর-ভারতে চলিত। পরাশর-সংহিতার ভাষ্যকার মাধবাচার্য্য বলেন যে, মাতুল-কন্যা-বিবাহ "উদীচ্যশিষ্ট-গর্হিতং" হইলেও দাক্ষিণাত্যে ইহার খুব চলন. উত্তর-ভারতেও ইহা একেবারে "অবিনীত" নহে। শ্রুতিও ইহার বিরুদ্ধ নহে—"মাতুলসুতাবিবাহস্যানুগ্রাহকাঃ শ্রুত্যাদয়ঃ।" কুমারিল ভট্টের তন্ত্রবার্ত্তিক এবং বীরমিত্রোদয়-সংস্কার-প্রকাশেও ইহার অনুমোদন আছে। বুদ্ধদেবও তাঁহার মাতুল-কন্যাকে বিবাহ করেন। পূর্ব্বে কোলিবংশের রামের দ্বাত্রিংশ পুত্রগণ শাক্যবংশভুক্ত মাতুলগণের কন্যা বিবাহ করেন। সেই অবধি এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে। এইরূপ বিবাহকে Cross Cousin marriage কহে। আশ্চর্য্যের বিষয়, এইরূপ বিবাহ দাক্ষিণাত্যের বহু জাতির মধ্যে প্রচলিত – তামিল, তোড়, সিংহলীয়, Torres Straits দ্বীপবাসী, হেব্রাইডিজ, ফিজি প্রভৃতি অধিবাসিগণের মধ্যেও প্রচলিত। ইহার সূত্র আবিষ্কৃত হইলে—একটা চমৎকার ধারার সন্ধান পাওয়া যাইবে।

উদয়ভঙ্গজাতকে দেখি, উদাভদ্দ তাঁহার বৈমাত্রেয় ভগিনীকে বিবাহ করিতেছেন। দশরথজাতকে রাম তাঁহার সহোদরা সীতাকে বিবাহ করিতেছেন—"সীতং অগ্‌গ মহেসিং কত্বা উভিন্নং পি অভিসেকং করিংসু।" দীঘনিকায়ের অম্বট্ঠসুত্তে লিখিত আছে যে, হিমালয়-প্রবাসী ওক্কাকোর ( ইক্ষ্বাকুর ) পুত্রগণ স্বীয় ভগিনীগণকে অন্যথা রক্তদুষ্টির আশঙ্কায় বিবাহ করিয়াছিলেন। মাতুল-কন্যা-বিবাহের উদ্দেশ্যও বোধ হয় রক্তের বিশুদ্ধি রক্ষা করা। পুরাতন মিশরের ইতিহাসে দেখি যে, রাজকুলে ভ্রাতা ও ভগিনীর বিবাহজাত পুত্রই Pharoah হইতেন—এই বিবাহ শুদ্ধ বিবাহ ছিল। ইরাণে Magiদের ভিতর এই বিবাহ প্রচলিত ছিল।

কিন্তু মাতুল-কন্যা-বিবাহ যে কখনও অপবাদের হাত এড়ায় নাই, এমন নহে। কুণালজাতকে দেখি যে, কোলিয়-বংশের কর্ম্মকরগণ ( labourers ) শাক্যবংশীয়দিগকে বলিতেছে—"যে তোমরা সোণ-শৃগালাদির মত নিজ ভগিনীর সহিত বাস কর।"

## দাসদাসীর প্রতি ব্যবহার

রজ্জুমালা বিমানে দেখি যে, বধূ দাসী-কন্যাকে অমানুষিক অত্যাচারে উৎপীড়িত করিতেছে।

হতভাগী গালাগালি খাইয়াই বড় হইয়া উঠিল। তখন চড়-চাপড়ের বরাদ্দ আরও বাড়িয়া গেল। দাসীর চুলের মুঠি ধরিয়া বধূ খুব এক প্রস্থ হাত-পায়ের কসরত করিয়া লইল। এইরূপ দৈনিক আপ্যায়নে দাসী বিপর্য্যস্ত হইয়া এক বুদ্ধি করিল। নাপিত-বাড়ী গিয়া সে মাথা মুড়াইল। ন্যাড়া মাথায় একগাল হাসিয়া যখন সে কর্ত্রীর নিকট আসিয়া দাঁড়াইল, তখন বধূর রাগ দেখে কে? সে গর্জ্জিয়া উঠিল—"তবে রে পোড়ামুখী, ন্যাড়া হয়ে তুমি রক্ষে পাবে?" তাহার ন্যাড়া মাথায় দড়ির পাক ঘুরিয়া গেল। উঠিতে বসিতে হেঁচকা মারিয়া বধূ দাসীর চরম অবস্থা করিয়া তুলিল। হতভাগীর নূতন নাম হইল—রজ্জুমালা! আর সে বাঁচিতে চাহে না। গলায় দড়ি দিয়া সে আত্মহত্যায় প্রবৃত্ত হইল। বনে গিয়া গলায় ফাঁস দিবার সময় বুদ্ধদেবের অনুগ্রহে সে বাঁচিয়া গেল। দাসদাসীর এই ভাগ্য নিয়মের ব্যতিক্রম নহে। উরগজাতকে শক্র দেবরাজ ও দাসীর কথোপকথনে ইহাই প্রমাণিত হয়। কোথাও বা দাসের প্রতি অনুগ্রহও দেখা যায়।

নাগবিমানে পড়ি যে, এক ব্রাহ্মণের ইক্ষুক্ষেত্রপাল কতকগুলি ভিক্ষুকে আশ্রয় দিয়াছিল বলিয়া ক্ষেত্রস্বামী লগুড়-প্রহারে তাহার ভবলীলা সাঙ্গ করিয়া দেয়—( তং সুত্বা ব্রাহ্মণো কুপিতো অনত্তমনো তটতটায়মানো কোধাভিভূতো তস্স পিটিঠতো উপধাবিত্বা মুগ্‌গরেণ তং পহরন্তো একপ্‌পহারেণে ব জীবিতা বোরোপেসি। )

পেতবত্থুতে দেখি যে, এক দাসীকন্যাকে প্রভুপুত্রের সহিত বিবাহ দিয়া তাহাকে পুত্রবধূ হইবার সম্মান দিয়াছেন। কিন্তু এরূপ ভাগ্যের দৃষ্টান্ত বিরল। দাসীগণের অবস্থা কিরূপ শোচনীয় ছিল, তাহার প্রমাণ “দাসীপুত্র” নামক সংস্কৃত ও পালি শব্দে—“দাসীপুত্র” ছিল গালাগালি।

মজুরদের ভিতর কেহ কেহ ( কম্মকরা ) সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে স্বগৃহে নিজ পুত্র-পরিবার লইয়া থাকিত—তবে ‘ভতি’ মজুরী করিয়া সংসার চালাইত; অর্থাৎ তাহারা ছিল free labourers। আবার এমন দুঃস্থ মজুরও ছিল যে, সে ‘পেটভাতায়’ কায করিত—তাহাকে বলিত “ভত্তবেতনভটো।”

জাতকে চারি প্রকার ক্রীতদাসের বর্ণনা আছে। “Some are slaves from their mothers, others are slaves bought for money, of their own will, and those driven by fear।” বিস্তৃত আলোচনার জন্য মনুসংহিতা ৮,৪১৫ এবং অর্থশাস্ত্র “দাস কর্ম্মকার কল্প” দ্রষ্টব্য।

## দৈনন্দিন জীবনের দুই একটা চিত্র—

( ক ) স্বামী মাঠে কাযে গিয়াছে—স্ত্রী তথায় মধ্যাহ্নে অথবা তৎপূর্ব্বে তাহার জন্য ভাত লইয়া যাইতেছে।

( খ ) আমাদের গৃহে দেখি যে, ভোজ্য বস্তু ধরিয়া দিবার পূর্ব্বে গোবরজল দিয়া নিপুণভাবে যায়গাটি পূত করা হয়। এইরূপে ‘ঠাঁই’ করার প্রথা পুরাকালে প্রচলিত ছিল। রেবতীবিমানে দেখি যে, রেবতীর শাশুড়ী বধূকে বলিতেছেন যে, যেখানে ভিক্ষুগণ ভোজন করিতে বসিবেন, সেখানটা যেন বেশ করিয়া কাঁচা গোবর দিয়া লেপা হয়, জল ছিটাইয়া ধুলা মারিয়া পরিষ্কার স্থানে যেন আসন করিয়া দেওয়া হয়। ( অম্ম, ত্বং ইমং গেহং আগন্ত্বা ভিক্ষুসঙ্ঘস্স নিসীদনট্ঠানং হরিতেন গোময়েন উপলিম্পিত্বা আসনং পঞ্ঞাপেহি অন্যত্র সিত্ত সমট্ঠপ্পদেসে আসনং পঞ্ঞাপেত্বা )। জাতকেও এইরূপ দেখা যায়।

গোময়লিপ্ত করিয়া গৃহপ্রাঙ্গণ শুদ্ধ-পূত করা আমাদের গ্রামের গৃহস্থের প্রাত্যহিক অনুষ্ঠান। ব্রত-নিয়মাদি পালনের স্থান, বিবাহমণ্ডপ, শ্রাদ্ধবাসর, জাতকর্ম্মস্থলগুলিকে শুচি করিবার অন্যতম উপায় গোময়লেপন। মৃতাশৌচে ‘গোবর তড়তড়া’র কথা সকলেই জানেন। শুধু এই কাযেই যে গোময় ব্যবহৃত হইত, তাহা নহে, ইহার আরও “সম্মানজনক” ব্যবহার দৃষ্ট হয়। ঘুঁটে করিয়া পোড়ানর ব্যবস্থা সেকালে ছিল। নেত্তিপকরণে “গোময়গ্গি” ( গোময়াগ্নি ) ও জাতকে “গোহণুবেট্ঠনেন” —এই দুই শব্দের দ্বারা ইহার ব্যবহার প্রমাণিত হয়। কুম্ভকার তাহার ‘পাঁজায় আগুন’ দিতে ইহার ব্যবহার করিত। এ সব ব্যবহার উচ্চ অঙ্গের নহে। কিন্তু উচ্চ অঙ্গের ব্যবহারও ছিল বলিয়াছি। অর্থশাস্ত্রে দেখি—অশুদ্ধ স্বর্ণ গোময়যোগে সংস্কৃত হইতেছে। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে দেখি, বাদ্যযন্ত্রের সংস্কারে ইহার ব্যবহার হইতেছে। শ্রীকুমারের শিল্পরত্নে দেখি, পর্ব্বতগাত্রে ও ভিত্তিগাত্রে আলেখ্য রচনার জমী তৈয়ার করিতে ( fresco paintings ) ইহা ব্যবহৃত হইতেছে।

( গ ) এক জন ব্রাহ্মণকন্যা অবকাশ পাইয়া জননীর মাথা হইতে উকুন বাছিতেছে। ( কেশকারী নাম গেহদ্বারসমীপে মাতু সীসতো উকা গণ্হন্তি।)

শ্রীকালীপদ মিত্র ( অধ্যাপক )

## প্রেমিক

বরষার কালে আষাঢ়ের মেঘে,
গগন ছাইয়া গেল, —
প্রেমিক ভাবিছে ‘বাদর ধারায়

# প্রতারক

### ২৩

আজ শেষ দিন। আজ রাত্রিশেষে ইভের ক্ষুদ্র জীবন-নাটকের শেষ যবনিকাপাত হইবে। প্রদীপ যেমন নিভিবার পূর্ব্বে এক বার শেষ মুহূর্ত্তের জন্ত দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, তেমনই ইভের জীবন-প্রদীপ সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে এক বার শেষ জ্বলিয়া উঠিল।

ইভ এমন প্রফুল্ল বহু দিন হয় নাই, তাহার মুখে চোখে একটা অপার্থিব ঔজ্জ্বল্য দেখা দিয়াছিল। সে সকলের সহিত হাসিয়া কথা কহিতেছিল। এত কথা সে রোগ দেখা দিবার পর হইতে কখনও কহে নাই। তখন কেহ বুঝিতে পারে নাই যে, অতি শীঘ্রই দীপ-নির্ব্বাণ হইবে। কেবল বিমলেন্দুর মনে কে যেন বলিয়া দিতেছিল, সে আজ সর্ব্বস্বহারা হইবে।

যখন ইভ সকলের সহিত কথা কহিয়া সকলকে বিদায় দিয়া কেবল স্বামীকে কাছে থাকিতে বলিল, তখন বিমলেন্দুর দুই নয়ন বহিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িতেছিল। ইভ পুলকিত প্রেমভরে বিমলেন্দুর একখানি হাত ধরিয়া মধুর কোমল কণ্ঠে বলিল, "ছিঃ! কাঁদছ কেন? তুমি পুরুষমানুষ, তোমার কি কান্না সাজে? এই দেখ, আমি তোমার কথা শুনছি, তোমার মুখের আলো দেখছি, তুমি কাছে থাকলে স্বর্গের সুখের আনন্দে আমার সমস্ত মন যেমন ক'রে ভ'রে ওঠে, এখন তেমনই ক'রে ভ'রে উঠছে, আমার মনে হচ্ছে, যেন আমি বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছি। এর চেয়ে আমার কি সুখ আছে?"

বিমলেন্দু কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ইভ, কি ব'লে আমায় ভোলাবে? আমি কি বুঝতে পাচ্ছি না, আমার কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়েছে?"

ইভ বিমলেন্দুর হাতখানা লইয়া নিজের ললাটে ও গণ্ডে বুলাইতে বুলাইতে স্নেহভরে বলিল, "দেখ, এই ভোগের দেহ ক'দিনের? এই দেখ, আমার শীর্ণ হাত; এই দেখ, আমার শীর্ণ শরীর। এ শরীর নিয়ে বেঁচে থেকে কেবল তোমার যন্ত্রণার বৃদ্ধি করবো বই ত নয়। তার চেয়ে শয্যাগত না হয়ে এই বেলাই তোমায় ভালবাসতে বাসতে যদি এই পৃথিবী হ'তে বিদায় নিতে পারি, তার চেয়ে কি সুখ আছে?"

বিমলেন্দু তাহাকে বাধা দিতে যাইতেছিল, কিন্তু ইভ তাহাকে কিছু বলিতে না দিয়া আপনিই বলিয়া যাইতে লাগিল, "ইন্দু, বড় ইচ্ছে ছিল, তোমার মত ঐ রকম সুস্থ সবল সুন্দর দেহ নিয়ে তোমার সেবা করতে বেঁচে থাকব। কিন্তু তা হবার নয়। আমার মায়ের দিক থেকে আমাদের সবাই অল্পবয়সে সংসার ছেড়ে বিদায় নিয়ে গিয়েছে। আমার মায়ের মা আমার মত অল্পবয়সে মারা যান, আমার মা-ও তাই, কেউ অনেক দিন বাঁচেন নি। আমি যদি বুঝতুম, তুমি তোমার সুস্থ সবল দেহ নিয়ে আমায় যা দিতে পারবে, আমি বেঁচে থেকে তেমনই তার প্রতিদান দিতে পারব, তা হ'লে আমার বেঁচে থাকা সার্থক হ'ত। কিন্তু কেবল শয্যাগত হয়ে দুর্ব্বহ জীবনভার নিয়ে এই শীর্ণ শরীরে বেঁচে থেকে লাভ কি?"

বিমলেন্দু বলিল, "ইভ, এ সব কথা ব'লে কেবল আমার মনে ব্যথা দিয়ে লাভই বা কি?"

ইভ বলিল, "তোমায় ব্যথা দেব? তোমাদের কত কায আছে, তোমরা কত কাযে ডুবে থেকে এই দুঃখের জীবনের ভার হাল্‌কা করতে পার। আমাদের কি আছে? আমাদের কেবল ভালবাসা আছে, আমরা কেবল ভালবাসা নিয়ে বেঁচে থাকি।"

বিমলেন্দু ব্যথিত স্বরে অনুযোগ করিল, "তবে? তবে সেই ভালবাসা থেকে আমার বঞ্চিত করবার কথা বলছ কেন?"

ইভ আবার বিমলেন্দুর হাত দুইখানা ধরিয়া আপনার ললাটে বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "তোমায় ভালবাসি বলেই ত মরণ কামনা করছি। আমি চিররুগ্ন হয়ে বেঁচে থেকে কেবল তোমার সুখের পথে কাঁটা হব কেন? সেইটেই কি ভাল? তার চেয়ে—"

বিমলেন্দু আঘাতের উপর আঘাত পাইয়া বাধা দিয়া বলিল, "এই রকম করেই কি আমার সুখের পথের কাঁটা সরিয়ে দিতে চাও? যদি তুমি আমায় যথার্থ ভালবাস, তা হ'লে কি আমার মনে কষ্ট দিয়ে সুখ পাবে?"

ইভ ক্ষীণ হাসি হাসিয়া বলিল, "আমার সুখ? আমি কে? তোমার সুখ যাতে হয়, তাই করা কি আমার প্রথম কায নয়? কিসের দুঃখ, ডার্লিং? এই পৃথিবীর দুদিনের ছাড়াছাড়িতে কি দুঃখ প্রিয়তম? ঐ ওপারে আবার আমাদের দেখা হবে, আবার আমরা ভালবাসবো, সে ভালবাসায় ত ছাড়াছাড়ি থাকবে না। তবে দুঃখ কি? কিন্তু যদি এখানে বেঁচে থেকে কেবল তোমার সুখের অন্তরায় হই, তা হ'লে সেখানে কি তুমি আমায় আর ভালবাসবে?"

ইভ এতক্ষণে হাঁপাইতে লাগিল। বিমলেন্দু তাহাকে বাতাস করিতে করিতে বলিল, "চুপ কর ইভ, আর কথা কোয়ো না—আর সহ্য কবতে পারি না।"

বিমলেন্দু কাঁদিয়া ফেলিল।

ইভ আবার কোমল কণ্ঠে বলিল, "ছিঃ, কাঁদে না। এ পৃথিবীতে তোমায় আমায় ছাড়াছাড়ি হবেই, তা আমি দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি। প্রথমটা খুব কষ্ট হবে। ডার্লিং! সহ্য কর, মানুষের মত বুক বাঁধ, ধৈর্য্য ধর।"

বিমলেন্দু চক্ষুর জল মুছিয়া বলিল, "না, না, পারি না, আর—"

ইভ বাধা দিয়া বলিল, "ডার্লিং! সব ভগবানের হাত, তুমি আমি কি করতে পারি?"

বিমলেন্দু বলিল, "যদি তোমায় আমায় দেখা না হ'ত, তা হলেই ভাল হ'ত।"

ইভ দুঃখিত হইয়া বলিল, "না, না, ও কথা বোলো না। যে দিন তোমায় আমায় প্রথম দেখা হয়েছিল, এখনও সে দিনের জন্য ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দিই—আবার সে দিন বার বার ফিরিয়ে আনতে প্রার্থনা করি। সে দিন যা আমি পেয়েছি, তা আমার এ ক্ষুদ্র জীবনে কখন পাই নি। এই মরণের দোরে এসে পৌঁছে শেষ ছাড়াছাড়ির দিনেও বলছি, সে দিনের সুখের বদলে আমি জগতের অন্য কোনও সুখ চাই নি। ইন্দু! জান কি, তোমায় ভালবেসে আমি কি সুখ পেয়েছি, তোমার এক দিনের ভালবাসাও আমার কি গৌরবের জিনিষ?"

ইভ আরও হাঁপাইতে লাগিল, কিন্তু তাহার চক্ষুর জ্যোতি আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বিমলেন্দু তাহাকে বাহুপাশে দৃঢ় আলিঙ্গন করিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "ইভ! ইভ! অমন করছ কেন? সত্যই কি আমায় ফাঁকি দিয়ে চললে?"

ইভের মৃত্যুযাতনা-ক্লিষ্ট পাণ্ডুর বদনে অপূর্ব্ব স্বর্গীয় আলোকরেখাপাত হইল, সে তখনও ক্ষীণ স্বরে বলিতে লাগিল, "ইন্দু, সুখী হও। আমি দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি, আমার মৃত্যুর পর তোমার সাজান সংসারে কেমন সুস্থ, সুন্দর, সবল বালকরা আনন্দে খেলা ক'রে বেড়াচ্ছে; যেন দেখছি, তোমার ফুটফুটে সুন্দর মেয়েদের সুন্দর গণ্ডে গোলাপ ফুটে রয়েছে, তারা তোমার গলা জড়িয়ে ধ'রে পাখীর মত মিষ্টি সুরে তোমায় তাদের হাসিকান্নার কথা শোনাচ্ছে,—আর তাদের সুন্দরী মা হাসি হাসি মুখে তোমায় সংসারের কত সুখ-দুঃখের কথা জানাচ্ছে। যেন তুমি তোমার সন্তানের জননীকে বুকে ধ'রে কত ভালবাসার কথা বলছ। আমার কথা মনে ক'রে প্রতিমা কি তোমায় আমার মত ভালবাসবে না—এই দুঃখিনী বোনের জন্যে দু ফোঁটা চোখের জল ফেলবে না?—ইন্দু, ইন্দু, ডার্লিং।"

ইভ আর কথা কহিতে পারিল না, তাহার দেহ অবশ হইয়া ঢলিয়া পড়িল।

আতঙ্কে বিমলেন্দুর প্রাণ উড়িয়া গেল, সে তাড়াতাড়ি ইভকে দুই বাহুতে দৃঢ় আলিঙ্গন করিয়া ডাকিল, "ইভ! ইভ! ডার্লিং ইভ!"

ইভ মুহূর্ত্ত পরেই প্রকৃতিস্থ হইয়াছিল; অতিরিক্ত শ্রমে সে কিছুক্ষণ শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল মাত্র। স্বামীর বুকে মুখ রাখিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "ভয় কি ইন্দু! এখনও মরি নি।"

বিমলেন্দু কাতর কণ্ঠে বলিল, "পরীক্ষার কি এখনও শেষ হয় নি ইভ? বল, কি করলে তোমার বিশ্বাস হবে, আমার মোহক্ষয় হয়েছে?"

ইভ মৃদু হাসিয়া বলিল, "ছি ইন্দু ! এই শেষ মুহূর্ত্তে আমায় মিথ্যে আশ্বাস দিচ্ছ কেন ? তুমি কি ভাব, আমি তোমার ভেতরটা সব দেখতে পাচ্ছি নি—সব জানতে পাচ্ছি নি ? তা হ'লে এত দিন তোমায় কি ভালবাসলুম ? ও আমার ডার্লিং, তুমি প্রতি মুহূর্ত্তে কি চিন্তা কর, কি চাও, কি অভাব বোধ কর, তা যদি না বুঝতে পারব, তা হ'লে বৃথা তোমায় ভালবেসেছি, বৃথা তোমাতে আমাকে বিলিয়ে দিয়েছি। এ জগতে তোমার সে মোহ কাটবার নয়, তা জেনেই ত মরণ কামনা করেছি,—যদি অনন্ত জীবনে তোমায় পাই, সেই আশায়। ইন্দু ! কথাটা বড় ঘোলা হোলো, না ? তা হোক, তবু সত্যি।"

বিমলেন্দুর ব্যথিত মন আলেখ্যে অর্পিত আপনার চিত্র স্পষ্টই দেখিতে পাইল, লজ্জায়, অপমানে, মরমে সে মরিয়া গেল। সে কোনও জবাব দিতে পারিল না, মাথা হেঁট করিয়া রহিল।

ইভ আবার বলিল, "লজ্জা পেয়েছ ? লজ্জা কি ? মনের উপর ত কারও জোর নেই। তাই ত তোমায় সুখী করবো বলেই মরতে চাইছি। ইন্দু ! ডার্লিং ! মুখ তুলে কথা কও-বোধ হয়, এ জগতে তোমায় আমায় এই শেষ দেখা—"

ইভ অত্যন্ত হাঁপাইতে লাগিল, তাহার চক্ষুর তারকা কেমন হইয়া গেল। বিমলেন্দু বিষম ভীত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল, "ইভ ! ইভ ! এ কি, এমন করছ কেন ?"

তখন তাহার চীৎকারে সকলে সেই কক্ষে ছুটিয়া আসিল। ডাক্তার আসিয়া একটা উত্তেজক ঔষধ ফুটাইয়া দিলেন, কিন্তু কোন আশার কথা বলিতে পারিলেন না।

তাহার পর সারা রাত্রি ইভ জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে অবস্থান করিল, কিন্তু আর কথা কহিল না। শেষ রাত্রিতে যখন ইভের জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইয়া আসিল, তখন এক বার মুহূর্ত্তকালের জন্য ইভের চৈতন্য হইল। সে চারি দিকে চাহিয়া অতি ক্ষীণ স্বরে ডাকিল, "ইন্দু !"

বিমলেন্দু শয্যা-পার্শ্বে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল, তাহার মুখে একটি কথাও সরিল না। শেষ একবার ইভ স্বামীর মস্তকে কম্পিত হস্ত রাখিয়া ডাকিল, "ইন্দু ! ডার্লিং !"—তাহার পর সব শেষ হইয়া গেল।

বিমলেন্দু পাগলের মত শূন্য দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিতে লাগিল। তাহাকে ধরিয়া সেই কক্ষ হইতে সরাইবার চেষ্টা করা হইলেও সে এক পদ নড়িল না, তেমনই অবস্থায় ইভের স্পন্দনহীন হাত দুইখানি ধরিয়া শয্যা-পার্শ্বে জানু পাতিয়া বসিয়া রহিল। তখন পৃথিবীতে কি হইতেছিল, বিমলেন্দুর সে দিকে দৃষ্টি ছিল কি না সন্দেহ।

যখন পূর্ব্বাকাশ রক্তরাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে, যখন কক্ষমধ্যে বিমলেন্দু একাকী ইভের প্রাণহীন দেহ ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছে, তখন সে এক অভাবনীয় আশ্চর্য্য কাণ্ড প্রত্যক্ষ করিল। সে দেখিল, উষার অস্পষ্ট আলোকে আকাশপথে আলোকমণ্ডলের মধ্যে তাহার চক্ষুর সম্মুখে ইভ যেন দাঁড়াইয়া আছে, তাহার মুখে মৃদুমন্দ হাস্য; জীবনেও যেমন, মৃত্যুর পরও তেমনই সে অলোকসামান্য রূপের জ্যোতিতে উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে, তাহার গলিত স্বর্ণপ্রভ আলুলায়িত কুন্তল বায়ু-তাড়নায় ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতেছে, তাহার নীলোৎপল নয়ন দুইটি হইতে স্বর্গীয় অপরিমেয় প্রেমের দৃষ্টি তাহার উপর পতিত হইতেছে।

বিমলেন্দুর সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল; সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া দুই বাহু প্রসারণ করিয়া ইভকে ধরিতে গেল, উচ্চৈঃস্বরে বলিল,—"ইভ ! আমার সর্ব্বস্ব ইভ ! আমায় ফেলে যেয়ো না, তুমি যেখানে আছ, আমায় সেখানে নিয়ে যাও, এ জ্বালাময় জগতে আমি থাকতে চাইনে।"

বিমলেন্দু যেমন অগ্রসর হইতে গেল, অমনই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

## ২৪

শুদ্ধ-গৈরিকধারিণী এক জন যুবতী মঠের দেবতার পূজার আয়োজনে তন্ময় হইয়া কার্য্য করিতেছে, নিকটে কেহ নাই। সে প্রতিমা। তাহার কার্য্যতৎপরতায় মঠের মাতাজী ও তাঁহার শিষ্য-শিষ্যারা সকলেই তৃপ্ত। প্রতিমা স্বহস্তে পূজার বাসনগুলি মাজিয়া ঘষিয়া সাজাইয়া রাখিতেছিল, সেগুলি ঝক্‌ঝক্ তক্‌তক্ করিতেছিল।

প্রতিমার ইহা নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ত্তব্য ছিল। রামপ্রাণ বাবু তাহাকে গৈরিক লইতে বহুবার নিষেধ করিয়াছিলেন, সংসারত্যাগিনী সন্ন্যাসিনীর মত জীবনযাপন

করিতে কত বাধা দিয়াছিলেন, কত অনুনয়-বিনয় করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাহাকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারেন নাই। যখন কিছুতেই কিছু হইল না, তখন তিনি হতাশ হইয়া পুরীতেই বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। প্রতিমা অধিকাংশ সময় মঠেই থাকিত, পূজা-অর্চ্চনায় কাল হরণ করিত, কদাচিৎ পুরীর বাসায় পিতার নিকট যাইত, শৈলকে আদর করিত।

ইভের মৃত্যুর পর মিস্ বেল পুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া এক দিন প্রতিমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তখন প্রতিমা তাহাদের বাসায় থাকিত। মিস্ বেল যে সময়ে দেখা করেন, সে সময়ে মাতাজী ও রামপ্রাণ বাবু বাসায় উপস্থিত ছিলেন। মিস্ বেল সকলকে ইভের কথা বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিলেন; বলিলেন, "এমন মধুর কোমল মন এ জগতে কারও হয় ব'লে জানি নি। মরবার আগে সকলের কথা ভেবেছিল, সকলকার খোঁজ নিয়েছিল। তার উইল যখন পড়া হ'ল, তখন দেখা গেল, সে কাকেও ভোলেনি। নিজের আত্মীয়স্বজনের ত কথাই নেই, যারা তার সেবা করেছিল—যারা তার ঘরের লোকজন ছিল, তাদেরও কিছু না কিছু দিয়ে গিয়েছে, এমন কি, আমাকেও বাদ দেয় নি। আর তার বাকী যা কিছু সম্পত্তি ছিল, যা কিছু নগদ টাকা-কড়ি ছিল, সব মিঃ রায়কে দিয়ে গিয়েছে। কি ভালবাসত মিঃ রায়কে! এমন ক'রে সর্ব্বস্ব-হারা হয়ে আপনাকে বিলিয়ে দিতে কাউকে দেখি নি। আহা! সব বিলিয়ে দিয়ে শেষে আপনার প্রাণটাও বলি দিলে!"

কথাগুলি বলিয়া মিস্ বেল প্রতিমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। প্রতিমার দৃষ্টি মাটীর উপরে ছিল, তাহার দুইটি চোখ জলে ভরিয়া আসিয়াছিল; সে নীরবে নতমুখে বসিয়া ছিল।

মিস্ বেল ইংরাজীতে কথা কহিতেছিলেন, সুতরাং মাতাজী কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহাকে জিজ্ঞাসু দেখিয়া রামপ্রাণ বাবু সংক্ষেপে ইভের উইলের কথা বুঝাইয়া দিলেন। মাতাজী সমস্ত শুনিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া রামপ্রাণ বাবুকে বলিলেন, "জিজ্ঞাসা করুন, বিমলেন্দু বাবু এখন কোথায় আছেন, কেমন আছেন।"

প্রতিমার মাথা আরও নত হইল, সে প্রায় মাটীর সহিত মিশিয়া যাইবার মত হইল। জিজ্ঞাসিত হইয়া মিস্ বেল বলিলেন, "মিঃ রায় দার্জ্জিলিঙ্গেই আছেন, অন্ততঃ আমি তাই দেখে এসেছি। আছেন, ঠিক বলা যায় না, কেন না, তিনি থেকেও নাই। কারুর সঙ্গে দেখা করেন না, কারুর সঙ্গে মেশেন না, সময়ে খান বা ঘুমোন কি না, তাও কেউ বলতে পারে না। যে দিন উইল পড়া হয়, সে দিন ইভের এটর্ণী তাঁকে জোর ক'রে ড্রয়িংরুমে বসিয়েছিলেন, কিন্তু উইলের কোনও কথা তাঁর কানে গিয়েছিল ব'লে আমার মনে হয় না; তিনি যেন কেমন এক রকম হয়ে গেছেন। আমার ভয় হয়, হয় ত তিনি পাগল হয়ে যাবেন, না হয় আত্মহত্যা করবেন। এ সময়ে তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে তাঁর কেউ খুব আপনার জন কাছে থাকলে ভাল হ'ত। আমার আত্মীয় মরিস্ এ সময়ে বন্ধুর মত কায করছে, অথচ ইভ যখন বেঁচে ছিল, তখন সে মিঃ রায়কে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখত। সে আপনাদের নেটিভের উপর বড় সন্তুষ্ট নয়, এ কথা জানেন ত?"

রামপ্রাণ বাবু বলিলেন, "কেন?"

মিস্ বেল বলিলেন, "সে বলে, আপনাদের চরিত্রের দৃঢ়তা নেই, নৈতিক সাহস নেই। মিঃ রায়ের সম্বন্ধে যে তার একটা মন্দ ধারণা ছিল, এটা তার কথাবার্ত্তায় আর ব্যবহারে জান্‌তে পারতুম। তবে ভিতরের কথাটা কি, বুঝতে পারি নি। কথার ভাবে বুঝেছিলুম, মিঃ রায় না কি ইভের সঙ্গে প্রতারণা করেছিলেন। কি প্রতারণা, তা জান্‌তে পারি নি। মরিস্ এই জন্যে মিঃ রায়ের উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু ইভের মৃত্যুর পর ইভের উইল শুনে আর মিঃ রায়ের অবস্থা দেখে মরিসের মনের ভাবের পরিবর্ত্তন হয়েছে, সে এখন ভায়ের মত মিঃ রায়কে যত্ন করে, নানা বিষয়ে ব্যস্ত রেখে ইভের শোক ভুলিয়ে দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু এতে কত দূর সফল হবে, বুঝতে পারি নি। আমি যতটা দেখে এসেছি, মিঃ রায় যে আবার কখনও আগের অবস্থা ফিরিয়ে পাবেন, এমন ত মনে হয় না। তবে রেভারেণ্ড ডেনিস্ বলেছিলেন, যদি কখনও মিঃ রায় এমন কোনও জিনিষ পান, যাতে ক'রে তাঁর মনের শূন্যতা পূর্ণ হয়, তা হ'লে হয় ত কালে সুখের মুখ দেখতে পারেন। মিঃ রায়ের সম্বন্ধে আমার এত কথা বলবার প্রয়োজন ছিল

না। প্রথম প্রথম আমিও মরিসের মত তাঁকে ভাল চোখে দেখতুম না। কিন্তু তার পর ইভের মৃত্যুশয্যায় তাঁকে যে যাতনা পেতে দেখেছি, যে ক'রে ইভের কাছে আহার-নিদ্রা ত্যাগ ক'রে দিন-রাত ব'সে থাকতে দেখেছি, তাতে তাঁর প্রতি সমবেদনায় আমার মন ভ'রে গেছে। আহা, বড় দুঃখী মিঃ রায়! শুনেছি, আপনাদের সঙ্গে তাঁর বিশেষ আলাপ আছে। যদি আপনারা পাঁচ জনে তাঁর এই অবস্থায় দেখাশোনা করেন, তা হ'লে ইভের আত্মার তৃপ্তি হয় ব'লে আমি মনে করি। বিশেষ, মিস্ চক্রবর্ত্তীকে ইভের খুব বন্ধু ব'লে জানি, তিনি এ বিষয়ে খুব সাহায্য করতে পারেন।"

প্রতিমার মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল, সে আর একবার মুখ তুলিয়া কাহারও দিকে চাহিতে পারিল না। রামপ্রাণ বাবু তাহার অবস্থা দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তা এতে আমার কন্তা কি করতে পারেন? আমাদের হিন্দুদের পুরনারীরা ত পরপুরুষের সঙ্গে আপনাদের মত বন্ধুতা পাতাতে পারেন না, বা দুঃখে শোকে সমবেদনা জানাতে পারেন না। আমার মেয়ে ইভের খুব বন্ধু ছিলেন, এ কথা ঠিক; কিন্তু তা ব'লে ইভের স্বামীর সঙ্গে তাঁর কোনও রূপ সম্পর্ক ত থাকতে পারে না।"

মিস্ বেল বলিলেন, "তা ঠিক। কিন্তু তবুও যদি এ সময়ে আপনারা কিছু করতে পারতেন, তা হ'লে ভাল হ'ত। জানেন ত, ইভ তার স্বামীকে কি ভালবাসত! এখন তার স্বামী পাগলের মত হয়ে রয়েছে, এ কথা জেনে তার আত্মা স্বর্গে গিয়েও তৃপ্তি পাবে না।"

এই কথাবার্ত্তার পর প্রায় দুই মাস যাবৎ প্রতিমারা দার্জ্জিলিঙ্গের কোনও সংবাদই পায় নাই। সংসারের জন্ত প্রতিমা যে খুব আগ্রহান্বিত, তাহা তাহার কথাবার্ত্তায় বা ভাবভঙ্গীতে জানা যাইত না। তবে রামপ্রাণ বাবুর স্নেহময় মন বুঝিতে পারিত, প্রতিমা প্রকাশ্যে কোন কথা না বলিলেও তাহার মুখ-চোখ অসম্ভব গাম্ভীর্য্য ধারণ করিয়াছে, সে প্রায় বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া দিয়াছে, দিন দিন কি একটা অব্যক্ত চিন্তায় শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। এক এক সময়ে তিনি দূর হইতে লক্ষ্য করিয়াছিলেন, কি একটা অব্যক্ত যাতনায় তাহার মুখমণ্ডল ক্লিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সে সময়ে রামপ্রাণ বাবুর মনটা হাহাকার করিয়া উঠিত। কি করিলে ভগবান্ তাঁহার ননীর পুতলীর মনে পূর্ব্বের শান্তি ফিরাইয়া দেন। তিনি জানিতেন, প্রতিমা স্বভাবতঃই গম্ভীরপ্রকৃতি—স্বল্পভাষিণী। তাহার অন্তর কোমল হইলেও তাহার বাহিরটায় একটা কেমন অস্বাভাবিক ঝাঁঝ ছিল, যাহার কাছে ভৃত্য, পরিজন ভয়ে ভক্তিতে সর্ব্বদা নতমস্তক থাকিত। এই প্রকৃতির লোক নীরবে অন্তরে কষ্ট সহ্য করে, বুক ফাটিয়া গেলেও কখনও মুখ ফুটিয়া অপরকে আপনার যাতনার কথা বলে না। তাই রামপ্রাণ বাবু তাহার কথা ভাবিয়া মনে অত্যধিক ব্যথা পাইতেন! সে যদি তাহার মনের কথা ব্যক্ত করিত বা ভাবভঙ্গীতেও অন্তরের কামনার কথা জানাইত, তাহা হইলে তাঁহার কষ্টের বিশেষ কারণ থাকিত না।

দুই মাস পরে প্রতিমার এই অবস্থার পরিবর্ত্তন হইল। ঐ সময়ে সে একখানি পত্র পাইল. পত্রখানি কলিকাতা হইতে আসিতেছে। শিরোনামার হস্তাক্ষর দেখিয়াই রামপ্রাণ বাবু শিহরিয়া উঠিলেন,—সে হস্তাক্ষর বিমলেন্দুর। পত্র পাইয়াই রামপ্রাণ বাবু ভাবিলেন, পত্রখানা প্রতিমাকে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত কি না। এক বার তিনি পত্রখানা অগ্নিসাৎ করিতে গেলেন, কিন্তু পরক্ষণেই কি ভাবিয়া উহা হইতে নিরস্ত হইলেন। প্রতিমাকে পত্রখানা দিবার সময় বলিলেন,"আমি ঠিক করতে পারছি না, এ পত্র তোমার পড়া উচিত কি না। তবে তুমি 'বুদ্ধিমতী, তুমিই বুঝে দেখ, তোমার কর্ত্তব্য কি। যদি ভাল মনে কর, পত্র পাঠ কোরো, না হ'লে ছিঁড়ে ফেলো।"

প্রতিমা একান্তে পত্র পাঠ করিল। সে পত্রে কি ছিল, তাহা সে ভিন্ন আর কেহ জানিল না। তবে রামপ্রাণ বাবু লক্ষ্য করিলেন, পত্রপাঠের পর প্রতিমা কয় দিন অত্যন্ত চঞ্চল হইল, তাহার স্বভাবতঃ গম্ভীর, স্থির ও ধীর প্রকৃতির অসম্ভব পরিবর্ত্তন হইল। কিন্তু তাহা হইলেও তিনি কয় দিনে প্রতিমাকে কলিকাতায় ঐ পত্রের উত্তর পাঠাইতে দেখিলেন না। ইহার পর যখন মাসাধিক কাল অতীত হইল, অথচ প্রতিমা কোনও প্রত্যুত্তর দিল না, তখন তিনি কতকটা স্বস্তি অনুভব করিলেন।

কিন্তু এক বিষয়ে রামপ্রাণ বাবুর ভাবনা দূর হইল না। যদি বিমলেন্দু পত্রের উত্তর না পাইয়া স্বয়ং পুরীতে উপস্থিত হয়! এ কথাটা ভাবিতেই তাঁহার মন অস্থির হইয়া

উঠিল; কি যে একটা অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিবে, এই আশঙ্কা প্রবল হইয়া উঠিল। শেষে তিনি আর নীরবে থাকিতে না পারিয়া এক দিন প্রকাশ্যে প্রতিমাকে বলিলেন, "চল না মা, দিন কতক বেড়িয়ে আসি। তুমি ত অনেক দিন থেকে সেতুবন্ধে যাবে ব'লে আসছ, চল না, সেতুবন্ধেই যাই। দক্ষিণের মন্দিরের মত মন্দির ভূভারতে কোথাও নেই। শ্রীরঙ্গ, কাঞ্চী, মদুরা, রামেশ্বর, এ সব তীর্থে যা দেখবে, তার তুলনা কোথাও নেই। এখানে ত অনেক দিন রইলে।"

প্রতিমা প্রথমে নীরব রহিল, তাহার পর অবনত-মস্তকে ধীরে ধীরে বলিল, "না বাবা, কোথাও যাবার আর ইচ্ছে নেই। এই এখানে মঠের কাযেই লেগে যাব। মঠের ঠাকুরবাড়ী আর ধর্ম্মশালা প্রায় শেষ হয়ে এলো, এ সময়ে আমি চ'লে গেলে বাকী কাযটা প'ড়ে থাকবে।"

রামপ্রাণ বাবু বলিলেন, "বেশ যা হ'ক, তুমি ত সব বন্দোবস্তই ক'রে দিয়েছ, মাতাজীর হাতে টাকাও দিয়ে রেখেছ, তিনিই বাকীটা সেরে নেবেন। তোমার থাকবার এখন আর বিশেষ দরকার কি? তার চেয়ে বরং বেড়িয়ে এসে এখানে ফিরে একবারে তৈরী মঠ দেখে কত আনন্দ পাবে। কেমন, তাই ভাল না?"

প্রতিমা এ কথার কোনও উত্তর খুঁজিয়া পাইল না, তাই একটা ছুতা খুঁজিয়া বাহির করিল; বলিল, "আমরা এমন ক'রে ঘুরে ঘুরে বেড়ালে শৈলর পড়াশুনোর কি হবে? ওকে ত ফেলে যেতে পারব না।"

রামপ্রাণ বাবু বলিলেন, "তার বন্দোবস্ত ক'রে দিয়ে যাব। পয়সা খরচ করলে কিছুরই অভাব থাকে না। কি বল?"

প্রতিমা দৃঢ় স্বরে বলিল, "না বাবা, তা হয় না, আমাকে এখানে থাকতেই হবে। বিশেষ, আমি মনে করছি, আসছে মাস থেকে আমি মঠেই থাকব, তবে রোজ এসে তোমাদের দেখে যাব।"

রামপ্রাণ বাবু প্রমাদ গণিলেন। তিনি এক আশঙ্কা করিতেছিলেন, তাহার উপর আর এক আশঙ্কা দেখা দিল। তাঁহার প্রাণটা কেমন করিয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন, তাঁহার কৃত কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে। অন্যায় জিদের বশে তিনি যে বিষবৃক্ষের বীজ রোপণ করিয়াছিলেন, তাহা অঙ্কুরে পরিণত হইয়া এখন পত্র-পুষ্প-ফল-সমন্বিত প্রকাণ্ড বৃক্ষাকারে আকাশে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে। আপনাকে সহস্র ধিক্কার দিয়া ভাবিলেন, ভগবান্ পতি-পত্নীর যে বন্ধন স্বয়ং ঘটাইয়াছিলেন, তিনি তাহা স্বহস্তে ছিন্ন করিতে গিয়া যে পাপসঞ্চয় করিয়াছেন, তাহারই ফলে এই পরিণতবয়সে তাঁহাকে তাহার ফল ভোগ করিতে হইতেছে। অনুতাপানলে তাঁহার মন দগ্ধ হইতে লাগিল।

প্রতিমা তাঁহার কাতর দৃষ্টি লক্ষ্য করিল; দেখিল, তাঁহার মুখে চোখে গভীর দুঃখের ও অনুশোচনার চিহ্ন স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে। তখন সে স্নেহভরে তাঁহার পাকা চুলের উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "বাবা, কেন এত ভাবছ? আমি মঠে দেবতার সেবায় বড় আনন্দ পাই, মাতাজীর উপদেশ শুনে মনে বড় শান্তি পাই, আমার কোনও কষ্ট নেই। তুমি ভাবছ, তোমার মেয়ে মাতাজীর মত তপস্বিনী হয়ে যাবে? তপস্বিনী হওয়া কি সহজ কথা!"

রামপ্রাণ বাবু বিষাদের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "তার আর বাকী কি? মঠে গিয়ে বাস করবে, এত দিন যে আরাম আর সুখে থাকতে অভ্যস্ত হয়েছ, তা ছেড়ে এর মধ্যেই একাহারী হয়েছ, শয্যা ত্যাগ করেছ, গৈরিক পরতে আরম্ভ করেছ,—ভাব কি, এতে তোমার বুড়ো বাপ মনে ব্যথা পায় না? আমার আর কে আছে, মা? আমার এ সব বিষয়সম্পত্তি কার জন্যে?"

বলিতে বলিতে বৃদ্ধের নয়ন অশ্রুসিক্ত হইয়া আসিল, কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইল। প্রতিমার নয়ন দুইটিও সে সময়ে অনার্দ্র ছিল না। কিছুক্ষণ উভয়ের মধ্যে কোন কথা হইল না। তাহার পর রামপ্রাণ বাবু আবার বলিতে লাগিলেন, "আমার যা বলবার, তা বললুম, এখন তুমি যা ভাল বোঝ কর। দেখ মা, তোমায় আমায় আর রেখে ঢেকে কথা কওয়া চলে না। আমার আরও কিছু বলবার আছে, সবই খুলে বলছি। তুমি যে ভাবে থাকতে চাও, সেই ভাবেই থাক, আমার জীবনের বাকী কটা দিন এক রকমে কাটিয়ে দেব। আর বাধা দেবো না, একবার বাধা দিয়ে নিজের সর্ব্বনাশ নিজে ডেকে এনেছি। কিন্তু একটা কথা বলি, আমার আর কটা দিন? কিন্তু তার পর? নিজের ভবিষ্যৎ কিছু ভেবেছ কি? কলকাতা থেকে যে চিঠি

এসেছিল, তাতে কি ছিল, জানি না। তোমার ভাব দেখে মনে হয়েছে, তাতে এমন কিছু ছিল, যাতে তোমায় চঞ্চল ক'রে তুলেছে। কিন্তু এটাও বুঝতে পারছি, তুমি এখনও তাকে ক্ষমা কর নি। হয় ত ইভের সঙ্গে তার প্রতারণাই এখন তোমাদের মিলনের পক্ষে বাধা দিচ্ছে। তাই মনে ভেবেছিলুম, যখন তোমাদের আপাত-মিলনের সম্ভাবনা নেই, তখন কলকাতা হ'তে দূরে চ'লে যাওয়াই ভাল, না হ'লে কোন্ দিন হয় ত সে এখানে এসে পড়বে। তখন তুমি এই মনের অবস্থা নিয়ে এমন একটা কাণ্ড ক'রে বসবে, যাতে ইহকালে আর তোমাদের মিলনের সম্ভাবনা থাকবে না। সেটা কি ভাল? আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে, কিন্তু তোমার সুমুখে এখন আস্ত জীবন প'ড়ে রয়েছে। এ বয়সে সংসার ছেড়ে দিয়ে তপস্বিনী সেজে কি পরে সমস্ত জীবনটা এই রকমে কাটিয়ে দেবে? তা হ'লে তোমার বিষয়-আশয়ের কি হবে? শৈলর কি হবে? যাতে তোমাদের মধ্যে ছাড়াছাড়িটা একবারে পাকা হয়ে না যায়, তারই জন্যে এখন কিছু দিন তীর্থে নিয়ে যেতে চাইছি। পরে সময়ে হয় ত তোমার মন ফিরতে পারে। তখন কি হবে? হাতের পাশা এক বার ফেললে ত আর ফেরে না। আমি স্বীকার করছি, আমিই এই অনিষ্টের মূল, কিন্তু এখন আমার গর্ব্ব খর্ব্ব হয়েছে। আমি কায়মনে বলছি, এখন যদি সে ফিরে এসে তোমায় নিয়ে সংসার করতে চায়, তাতে আমি খুবই আনন্দ পাব।"

প্রতিমা এতক্ষণ নীরবে কথা শুনিয়া যাইতেছিল, এই বার অতি মৃদুস্বরে বলিল, "যে এক জনকে প্রতারণা করেছে, সে যে আর কাউকে করবে না, তা কি ক'রে বিশ্বাস করবো?"

রামপ্রাণ বাবু আগ্রহভরে বলিলেন, "তাই ত এখন তীর্থে তীর্থে বেড়াতে বলছি। যদি তোমার প্রতি তার টান সত্যি হয়, তা হ'লে সে কোথাও থাকতে পারবে না. যেখানেই যাও, তোমার সন্ধান করবে। সে পরীক্ষাটা হয়ে গেলে ক্ষতি কি?"

প্রতিমা স্বামীর সম্পর্কে প্রায় কোন কথা পিতার সহিত কহিত না। কিন্তু আজ হঠাৎ তাহার ভাবপরিবর্ত্তন হইল, সে একটু উচ্চস্বরে বলিল,"আজ তোমার মুখে এ কথা শুনে আশ্চর্য্য হচ্ছি, বাবা। এক দিন দার্জ্জিলিঙ্গে সেধে যখন তার মন ফিরুতে গিয়েছিলে, তখন সে কি ব্যবহার করেছিল, মনে আছে কি? আজ ইভ নেই বলেই কি তার সব দোষ কেটে গেছে? না বাবা, আর উপরোধ-অনুরোধ কোরো না। যেমন আছি, তাই ভাল। এখানে এলেই যে একটা বিষম কাণ্ড ঘট্‌বে, তা ভেবো না। যদিই বা তাই হয়, তাতেও ক্ষতি নেই। যাক্, আসছে বুধবারে মঠে বষ্টুম-ভিখিরী খাওয়ান হবে, তাতে তোমাকেও যেতে হবে। বল, যাবে?"

রামপ্রাণ বাবুর সমস্ত মনটা বিষাদভারাক্রান্ত হইলেও তিনি হাসিয়া বলিলেন, "তা, যাব বৈ কি? আমরাও ত বষ্টুম-ভিখিরী, মার মঠে প্রসাদ পেতে যাব না?"

প্রতিমা বলিল, "না বাবা, তামাসা না, সত্যি যেতে হবে। শুধু যাওয়া না, তোমায় দাঁড়িয়ে থেকে কার্য্য উদ্ধার ক'রে দিতে হবে। মাতাজী আর আমি মেয়েমানুষ, আমরা এত বড় যজ্ঞির কি বুঝি? তুমি এমন কত যজ্ঞি বাড়ীতে দিয়েছ।"

রামপ্রাণ বাবু বলিলেন, "তা আর জানি নি! আমার মা অন্নপূর্ণা হয়ে সে সব যজ্ঞিতে না দাঁড়ালে যজ্ঞি ত পণ্ড হয়ে যেত। মাতাজীকে বোলো, এ যজ্ঞির সব খরচটা এই বুড়োই দেবে। কি কি লাগ্‌বে, কত লোক হবে, তার একটা ফর্দ্দ দিও। তার পর আমি সব বন্দোবস্ত ক'রে দেবো। কেমন, সেই ভাল না?"

প্রতিমার মুখখানি মেঘমুক্ত চন্দ্রমার মত হাসিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি মাতাজীকে এই সংবাদ দিতে গেল।

প্রতিমা চলিয়া গেলে রামপ্রাণ বাবু কিছুক্ষণ একান্তে সেখানে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। প্রতিমা থাকিতে তাঁহার মুখে যে হাসি বা আনন্দের রেখা দেখা দিয়াছিল, প্রতিমা চলিয়া গেলে তাহা মুহূর্ত্তে অন্তর্ধান করিল; মুখমণ্ডল আবার অসম্ভব গম্ভীর আকার ধারণ করিল। তিনি এক বার অস্ফুট স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"যার দাঁড়িয়ে থেকে এ সব করবার কথা, সে আজ কোথা? নিতান্ত অপরিচিত অজানার মত সে আজ কত দূরেই রয়েছে! অদৃষ্ট!"

নিষ্ফল আক্রোশে ও ক্ষোভে রামপ্রাণ বাবুর সমস্ত অন্তরটা ভরিয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন, যাহারা তাঁহার ঐশ্বর্য্য দেখিয়া ঈর্ষান্বিত হয়,—মনে করে, তিনি কতই না

সুখে আছেন,—তাহারা কি সমস্ত জানিয়া শুনিয়া মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার সহিত অবস্থার বিনিময় করিতে অভিলাষী হইতে পারে? ছার ঐশ্বর্য্য! এই ঐশ্বর্য্য তাঁহাকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও ত মনের সুখ দিতে পারিতেছে না। তবে এই ঐশ্বর্য্যের মূল্য কি? অতি দুঃখী দিনান্তে শাকান্ন খাইয়াও যদি মনের তৃপ্তিতে থাকিতে পায়, তাহা হইলে ঐশ্বর্য্যে তাহার প্রয়োজন কি? ঐশ্বর্য্য, বিলাস, আরাম, প্রভুত্ব, প্রতিপত্তি সবই দিতে পারে, কিন্তু পৃথিবীতে যাহা দুর্ল্লভ—সেই মনের তৃপ্তি মনের সুখ দিতে পারে কি? দূর হউক ঐশ্বর্য্য, এখন হইতে দুই হস্তে সাহারার বালুকার মত উত্তপ্ত অসার ঐশ্বর্য্য বিলাইয়া দিব। কাহার জন্য ঐশ্বর্য্য? কাহার জন্য ভোগ? কাহার জন্য প্রভুত্ব?

বৃদ্ধের নয়ন-প্রান্ত হইতে দুই ফোঁটা তপ্ত অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

[ ক্রমশঃ।

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।

# বহিষ্কার

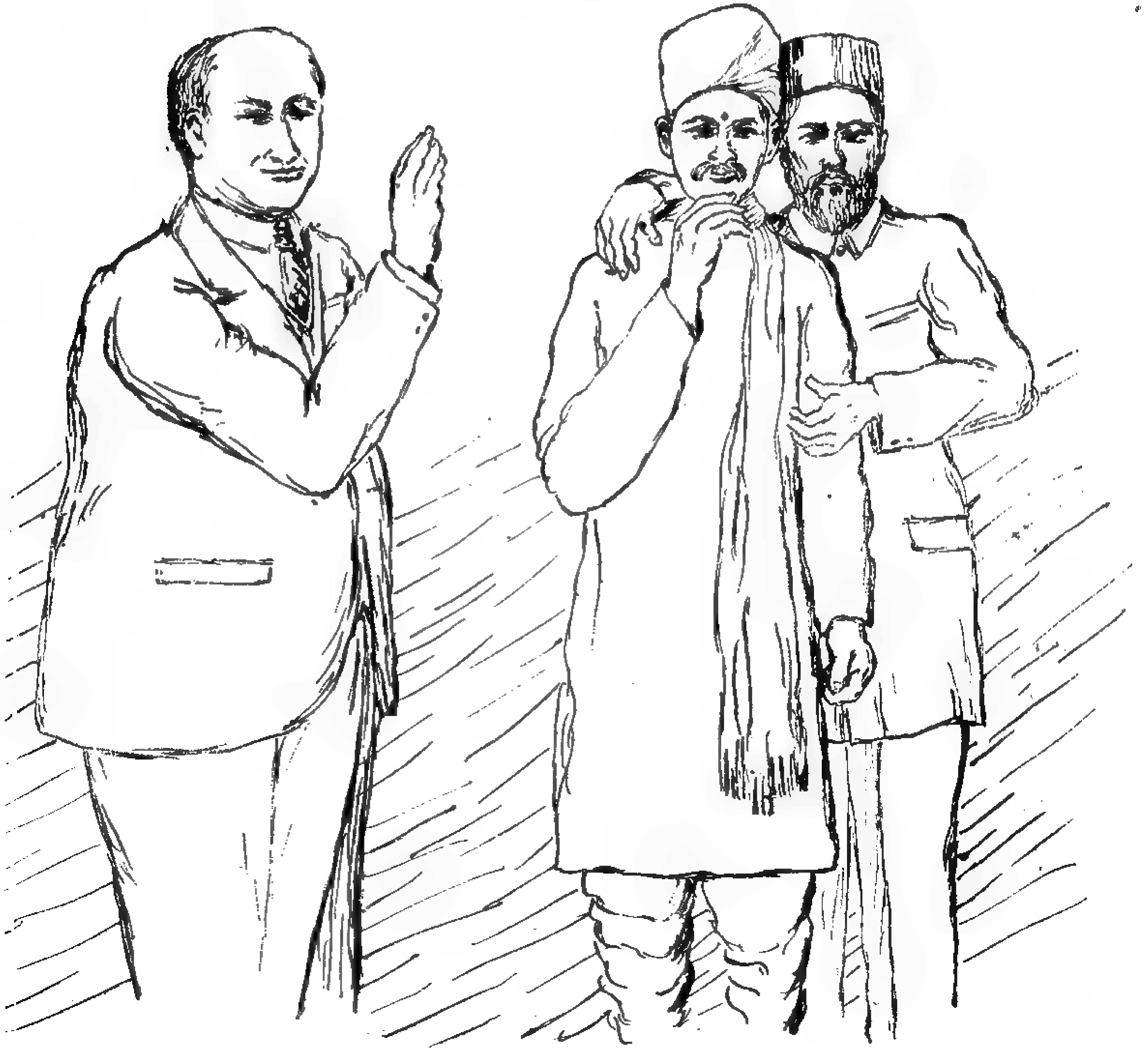

মডার্ণ বৃন্দা।—"ঐখানে দাঁড়ায়ে থাক কুঞ্জে যেতে আর পাবে না,
প্রতিজ্ঞা করেছে রাই কাল বদন আর হেরবে না।"

# বিবাগীর বিড়ম্বনা

( নেহাৎ গল্প নয় )

"নিশ্চয়ই।"

"কখ্‌খনো না। বা রে বা, পড়া-শুনো করব আমি, আর সদ্দারি করবে তুমি?"

"ছোট ভাইয়ের তদারক করা বড় ভাইয়ের একটা কর্ত্তব্য। যখন বড় দাদা হয়েছি—"

"গাঁয়ে মানে না, আপনি মোড়ল। আগে নিজের চরকায় তেল দাও গে, দাদা।"

"কি! বড় দাদার সঙ্গে এই ভাষায় কথা কইতে হয়? যত কিছু না বলি, তত বাড়িয়ে তুল্‌ছিস যে!"

"যত কিছু না বলো? রক্ষে কর দাদা—এই যদি তোমার কিছু না বলা হয়, তা হ'লে বলা না জানি কি বস্তু। এইতেই জীবন দুর্ব্বহ—সে দিন রামা খান্‌সামাও বল্‌ছিল।"

"ফের? বারণ ক'রে দিয়েছি না, কথায় কথায় চাকর-বাকরের নাম না করতে? রামা খান্‌সামার সঙ্গে নাম করা আমি হেন দাদার?—সাক্ষাৎ টইটুম্বুর ব্যারিষ্টার দাদা—"

"হ্যাঃ, ঢের ঢের অমন ব্রীফলেস ব্যারিষ্টার দেখেছি।"

"তবে রে?"—ঠাস্ ঠাস্ ঠাস্। "বেরো বল্‌ছি বাড়ী থেকে। রামা—এই রামা, দে ত ছোঁড়াকে বাড়ী থেকে ঘাড় ধ'রে বের ক'রে, দেখি একবার কিসে ওর অত মুরদ।"

তখন ম্যাট্রিকুলেশন পাশ ক'রে সেণ্টজেভিয়ার কলেজে সবে আই এস সি পড়তে আরম্ভ করেছি। একেই সে সময়ে রাগটা মাথায় একটু চট্ ক'রেই ফুটে ওঠে, তার ওপর এক জন বেলজিয়ান প্রফেসর আমাদের 'জেন্তল্‌ম্যান' ব'লে সম্বোধন করার ফলে মনের নিহিত প্রদেশে আত্মসম্মান বা সেল্‌ফ-রেস্‌পেক্ট বস্তুটির অঙ্কুর হু হু শব্দে প্রায় বনস্পতিতে পরিণত হয়ে পড়েছিল।

কাউকেই বড় ব'লে মান্‌তাম না—এক বাবাকে ছাড়া। মান্‌বার বিশেষ কেউ ছিলেনও না। বাড়ীতে সব শুদ্ধ আমরা চারটিমাত্র প্রাণী—বাবা, পিসীমা, দাদা ও বৌদি। বাবার ছিলাম আমি আদুরে ছেলে ও পিসীমার কাছে ত আমার সাত খুন মাফ। কাযেই দাদা বয়সে আমার চেয়ে ৭।৮ বৎসর বড় হ'লেও তাঁকে ত এক রকম গ্রাহ্যের মধ্যে আন্‌তাম না বল্‌লেও হয়। ফলে আমার মস্তকটি যে অতি সন্তোষজনকরূপে চর্ব্বিত হচ্ছিল, সে বিষয়ে কারুরই সন্দেহ ছিল না।

সে দিন শীতের সকাল। পৌষমাসের মাঝামাঝি। কিন্তু রামা খান্‌সামাকে দিয়ে অর্দ্ধচন্দ্র দেওয়ানর প্রস্তাবে আমার মেজাজের টেম্পারেচার একেবারে সড় সড় ক'রে 'ফীবার হীট' চ'ড়ে গেল। আমি সেই এক কাপড়ে ছেঁড়া চটি পায়েই বাড়ী ছাড়লাম।

## ২

পাশের গলির একটা বাড়ীতে থাক্‌ত আমার ছেলেবেলাকার খেলার সাথী পারুল। সে ডায়োসিসান স্কুলে পড়ত। তার তের বছর বয়স। পাড়ার সকলেই বল্‌ত ফুট্‌ফুটে মেয়েটি। অনেক দিন থেকেই আমাদের প্রতিবেশিনী। তার ছিল কেবল দিদিমা ও এক বিপত্নীক মামা। ছেলেবেলারই সে পিতৃমাতৃহীনা। কিন্তু দিদিমা ও মামার কাছে বড় আদরে মানুষ। পারুলের দিদিমাকে আমি দিদিমা ডাক্‌তাম ও মামাকে মামা ডাক্‌তাম। আমাদের বাড়ীতে তাঁদের খুবই আসা-যাওয়া ছিল। মামা ছিলেন বাবার বন্ধু ও দিদিমা ছিলেন পিসীমার ভারি ভক্ত। লাঠির ওপর ভর ক'রে এই সপ্ততিবর্ষীয়া বৃদ্ধা প্রায়ই দুপুরে আমার পিসীমার কাছে আস্‌তেন—কাশীরাম দাসের অমৃত সমান কথা শুনে পুণ্য অর্জ্জন করতে।

"অমিত দা—ও অমিত দা, কোথা যাচ্ছ ভাই, এই অবেলায়? আজ ত ছুটী।"

"কোথাও না।" হন্ হন্ হন্। (পারুলের গলি দিয়ে আমি ইচ্ছে ক'রেই যাচ্ছিলাম। কারণ, সকালবেলাটা ছুটীর দিন সে প্রায়ই পা এলিয়ে গলির উপরকার বারান্দায় ব'সে পড়া মুখস্থ করত।)

"শোনো শোনো অমিত দা একটি বার—"

"না না, সময় নেই।"

"লক্ষ্মীটি ভাই, বিশেষ দরকার—"

"আঃ কি মুস্কিল।" ফিরলাম।

"কোথায় যাচ্ছিলে অমিত দা, এ অসময়ে স্নান-টান না ক'রে? দুটো মুখে না গুঁজে টোক্‌লা মাথায়, ছেঁড়া চটি পায়ে—তার ওপর এক ওভারকোট চাপিয়ে? এ কি বেশের ছিরি বল ত?"

"এই পাশের দোকান থেকে দাদার জন্যে একটা সানাটোজেন কিনে আন্‌তে যাচ্ছিলাম।"

"বাজে কথা। দাদা সাত জন্মেও সানাটোজেন খান না।"

"এই দরকারের জন্যে আমাকে তিন ক্রোশ পথ থেকে ডেকে আনা হ'ল?"

"অমিত দা, রাগ কর কেন ভাই?"

একটু নরম হয়ে বল্‌লাম, "দাদা খান কি কে খান, সে বিচারের ভার ত আমার নয়। দাদা বল্‌লেন—যাচ্ছি।"

পারুল মুখ টিপে একটু হেসে বল্‌ল, "ওঃ, কি আমার শিষ্ট শান্ত লক্ষ্মী ছেলেটি রে! তোমাকে ত আমি চিনি না। আহা, এমন দাদার নেওটো ছেলে কি কলিযুগে কেউ সাত জন্মেও দেখেছ গা?"

দিদিমার বেশী আদরে পারুলটার মাথা খাওয়া হচ্ছে। নইলে বার বছরের মেয়ের মুখে এমন পাকা পাকা কথা! আমার উষ্ণ মস্তিষ্ক পারুলের কাছে সমবেদনার পরিবর্ত্তে এই ঠাট্টায় একেবারে আগুন হয়ে উঠল। আমি বল্‌লাম,—"মেমসাহেবের কাছে একটু ইংরিজি পড়লেই মানুষ চেনা যায় না। আর দিশী স্কুল-কলেজে পড়লেই কিছু মানুষ এমন অসভ্য হয় না যে, তাদের মুখ দেখ্‌লেই চাষা ব'লে ভুল হয়।"

পারুল আমার তর্জ্জন-গর্জ্জনে অনেকটা অভ্যস্ত হলেও এতটা তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। সে ব্যথিত স্বরে বল্‌লে,—"তোমার আজ বাড়ীতে কি হয়েছে অমিত দা যে, তুমি একটা তুচ্ছ ঠাট্টায় হঠাৎ এমন অগ্নিশর্ম্মা হয়ে উঠলে? আমি কি ভাই তোমাকে অসভ্য বলেছি, না বল্‌তে পারি কখনও?"

রাগটা একটু পড়ল। একটু নরম সুরে বল্‌লাম,—"তবে কেন সময় অসময়ে অমন বাঁকা বাঁকা কথা বল? বিশেষ ক'রে আজকের দিনে যখন আমি জন্মের মত বিবাগী হয়ে চ'লে যাচ্ছি।"

"ও মা, কি হবে! জন্মের মত বিবাগী হয়ে—এ সব কি কথা অমিত দা? কোথায়ই বা যাচ্ছ?"

আমি চুপ।

তার চোখ দুটি ছল ছল ক'রে উঠল।

"লক্ষ্মীটি ভাই, বল না কোথায় যাচ্ছ, কি হয়েছে?"

একটি নারীহৃদয়কে এতটা শঙ্কিত ক'রে তোল্‌বার ক্ষমতা আমার আছে! মনে একটা বিরাট পৌরুষ-গৌরব অনুভব কর্‌লাম। কিন্তু পারুলকে আরও ব্যস্ত করতে হবে ভেবে সমানে চুপ ক'রে রইলাম।

"বল্‌বে না অমি-দা, কোথায় যাচ্ছ?"

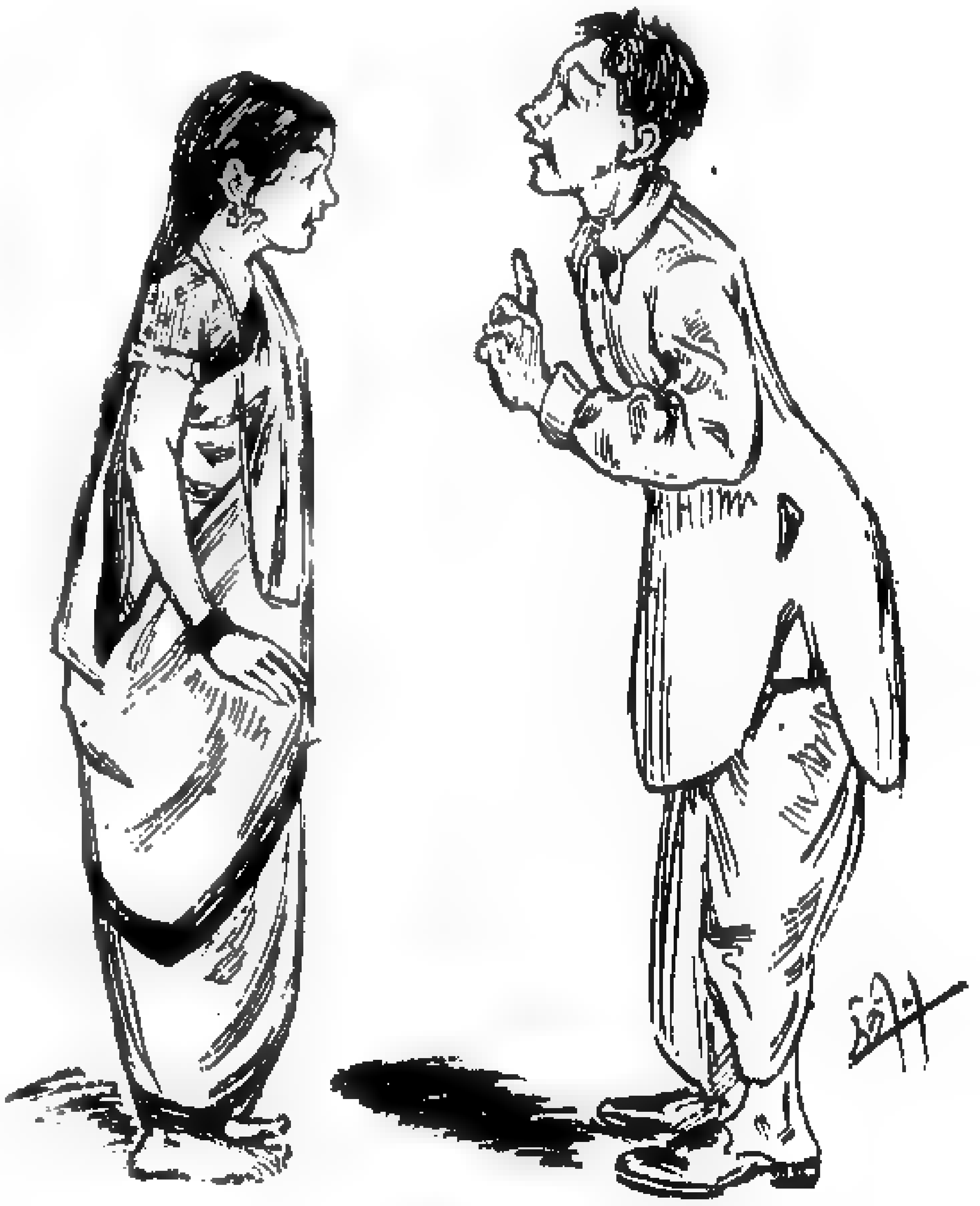

বলবে না অমিদা, কোথায় যাচ্ছ?

"জানি না।"

পারুলের চোখ দুটি এবার জলে উপ্‌ছে পড়ল। কিন্তু সে বড় অভিমানী মেয়ে। ঠোঁট ফুলিয়ে শুধু "বেশ" ব'লেই মাদুরে ব'সে হাতের বইখানি আবার খুলে বস্‌ল।

আমার ইচ্ছে ছিল, পারুলকে দিয়ে আরও একটু সাধিয়ে তবে সব কথা বল্‌ব। কিন্তু তার অভিমানের দৃশ্যে আমারও মনে কেমন একটা অভিমান এল। জগতের হৃদয়হীন অত্যাচারে খিন্ন হয়ে যখন আমি তার কাছে

ছুটে এসেছিলাম দুটো সান্ত্বনার কথা শুনতে, তখন তার নিজের অভিমানটাই তার কাছে এত বড় হ'ল ? বেশ !—"চল্লাম ।"

পারুল কোনও কথা বল্‌ল না। কিন্তু বেশ বুঝতে পারলাম, সে অনেক চেষ্টা ক'রে তার উচ্ছল অশ্রু নিরোধ ক'রে আছে। মনে হ'ল—কাযটা ভাল হ'ল না। কিন্তু পারুল আর এক বারও জিজ্ঞাসা করতে ত পারত !

রাস্তায় বেরিয়েই মনে হ'ল, দোষটা আমারই বেশী। সে দিন কি একটা নভেলে পড়েছিলাম যে, মেয়েদের অভিমানই একমাত্র সম্বল। তাই এ অভিমানের মর্য্যাদা না রাখাটা পৌরুষ নয়—চাষামি। ভাবলাম ফিরি। কিন্তু ভারী বাধ বাধ ঠেক্‌তে লাগল।

এমন সময়ে পারুলের আনত মুখখানি চোখে পড়ল। সে বইখানি ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে রেলিঙের উপরে দুটি হাত রেখে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। মনে হ'ল, সে ইতস্ততঃ করছে আর একবার ডাক্‌বে কি না। তার এলো চুলের দু'চারটে গুচ্ছ শীতের ঝির্‌ঝিরে বাতাসে এ-ধার ও-ধার উড়ছিল। হঠাৎ তা'র কালো চোখ দুটির মৌন আহ্বানে আমার মনটিও যেন দুলে উঠল। ভাবলাম, সে একবার অমিত-দা ব'লে ডাক্‌লেই আমি ফিরি ··

এমন সময়ে · ওরে বাবা রে ··এ কি এ ! একটা লাল ট্যাক্সি যে প্রায় ঘাড়ের উপর এসে পড়েছে ! হোঁচট খেয়ে পড়তে পড়তে এক চুলের জন্যে বেঁচে গেলাম। মোটর-চালক ঘনশ্মশ্রু শিখ-প্রভু আমার অনুমোদনের অপেক্ষা না রেখেই আমার সঙ্গে আপত্তিকর সম্বন্ধ-বিশেষ স্থাপন ক'রে নক্ষত্রবেগে উধাও হয়ে গেলেন।

লজ্জায় অপমানে আমার কর্ণযুগল উত্তপ্ত হয়ে উঠল। আমার 'একমেবাদ্বিতীয়' বিশ্রব্ধা পূজারিণীর ঠিক নাকের সামনেই কি আমার সযত্ন-পুষ্ট পৌরুষ-অভিমান বিধাতার এম্‌নি ক'রেই ধূলিশায়ী ক'রে দিতে হয় ! পারুল হেসে উঠল। আমি দ্রুতপদে তা'দের গলির মোড় বেঁকে হরিশ মুখুয্যের রোডে পড়লাম —তার কৌতুক-দৃষ্টি হ'তে অব্যাহতি পাবার জন্যে।

## ৩

আলিপুরের পুল, বর্দ্ধমানের রাজবাটী, বেহালার পথ, বেহালা, বড়শে বেহালা। লক্ষ্যহীন ভাবে চ'লেইছি।...

বেলা তিনটে। হঠাৎ দু'টি গভীর সত্য আবিষ্কার করা গেল। (১) উদর প্রভুর অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছে ও (২) মাথার মধ্যে যা কিছু জমাট বস্তু ছিল, বেমালুম জলবৎ তরল হয়ে পড়েছে। পকেটে হাত দিতেই একটি সিকি হাতে ঠেকল। পাশেই একটি ময়রার দোকান। মনে হ'ল, সিকিটিও কেন এমন হৃদয়হীন যে, আধুলি না হয়ে তার সিকিত্বটিকেই এমন একান্তভাবে অবলম্বন ক'রে রইল ? তবু মন্দের ভাল ভেবে সিকিটি হাতে ক'রে মিষ্টান্ন-আপণির দিকে অগ্রসর হলাম।

এমন সময়ে "হঠ্ যাও সাম্‌নেওয়ালা, হঠো হ'ঠো" শব্দ ও পিঠে শপাং ক'রে এক চাবুক। সঙ্গে সঙ্গে রিফ্লেক্স অ্যাক্‌শনে আমার উল্লম্ফন প্রদান ও পাশেই একটি খানায় পতন এবং জুড়িগাড়ীর সারথি-প্রবরের মুখে আমার আকৃতির সঙ্গে এমন এক চতুষ্পদ ভারবাহীবিশেষের সাদৃশ্যবর্ণন যে, সাদৃশ্যের চিন্তাও দ্বিপদীমাত্রেরই আত্ম-মর্য্যাদাজ্ঞানের একটু পরিপন্থী না হয়ে পারে না।

"উঃ", ব'লে উঠে দেখলাম যে, কনুয়ের এক যায়গায় ও চিবুকের নীচে দু' যায়গায় বেশ একটু ছ'ড়ে গেছে। কিন্তু সে জন্য যতটা ক্ষোভ হোক্ না হোক্, পাশের একটি অর্দ্ধাবগুণ্ঠনবতীর সমবেদনার দৃষ্টিপাতে যেন একটু বেশী রকমই কুণ্ঠিত হয়ে পড়লাম। সহানুভূতির স্পর্শ যে স্থান, কাল ও পাত্রীভেদে তৃপ্তিদায়কের ঠিক্ উল্টো। গোছের অনুভূতির প্রজায়ক হ'তে পারে, এ কথা সে দিন যেমন উজ্জ্বলভাবে উপলব্ধি করেছিলাম, তেমন বোধ হয় জীবনে আর কখনও করিনি।...

সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি সৃষ্টিতত্ত্ব গভীরভাবে উপলব্ধি করা গেল। সেটি এই যে, দুর্ভাগ্য একা আসে না। কারণ, খানা থেকে উঠতে না উঠতে সিকিটি হাত ফস্‌কে গড়াতে গড়াতে একটি ড্রেণের মধ্যে প'ড়ে গেল।···

মাথার মধ্যে একটু আগের তরলতা যেন অকস্মাৎ 'সলিড' হয়ে গেল। ফলে সেটা ঋজুভাবে না থেকে একটু নুয়ে পড়বারই ইচ্ছা প্রকাশ ক'রে বস্‌ল। তাড়াতাড়ি পাশের একটি দাওয়ায় বস্‌লাম। সেখানে একটু ছায়া ছিল।

খট্ খট্ খট্। "দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু, কৃপাবিন্দু বিতর" গুন গুন ক'রে গাইতে গাইতে,

গায়ে এক বিপুলকায় বৃদ্ধ দাওয়ায় এসে তারস্বরে ডাকলেন, "রেমো, ও রেমো—রামচরণ আঃ! বেটা মরেছিস্ না কি? না হয় সেইটেই খুলে বল, আমার হাড় জুড়ুক।"

ব'লে রাস্তার দিকে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে তাকিয়ে অনুপস্থিত নিষ্ঠুর পরিচারকসম্প্রদায়কে উদ্দেশ ক'রে নানা সারগর্ভ তিরস্কার বিড় বিড় ক'রে আওড়ে যেতে লাগলেন;—"তোদের শরীরে কি দয়া-ধর্ম্ম একটুও নেই? ডেকে ডেকে কাহিল মানুষ আমি—"

ব'লেই আমার উপর তাঁ'র চোখ পড়ল ও তিনি সবিস্ময়ে আতঙ্কে শিহরিত হয়ে উঠলেন।

"অ্যাঁ! ওখানে কে হে ছোক্‌রা! আমার নাকের ডগার সাম্‌নে আমারই দাওয়ায় বেহায়ার মত ব'সে! কলি-যুগে দিন দিন হ'ল কি? কোন্ জাত, তাই বা কে জানে? দূর হও, দূর হও বল্‌ছি! নইলে পুলিস ডাক্‌ব।"

"একটু ব'সে আছি মশয়। আপনার ত ও-তে কোনও ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই?"—

বৃদ্ধ মুখ ভেঙিয়ে বল্‌লেন, "না, ক্ষতি-বৃদ্ধি থাকবে কেন? সে দিন নগদ এগার টাকা সাড়ে তের আনা দিয়ে আমি নিজে ব'সে থেকে দাওয়াটি সিমেণ্ট করিয়েছি। বসলে সিমেণ্ট ক্ষ'য়ে যায় না? দূর হও বল্‌ছি। নইলে—পাহারাওয়ালা, এই পাহারাওয়ালা সাহেব, দয়া করকে এক-বার ইধারকে আস্‌নেকো আজ্ঞে হয়।"

"যাচ্ছি মশয়, যাচ্ছি। খুব দয়াধর্ম্মওয়ালা লোক যা হোক্। একটা লোক শুধু ছায়ার জন্য একটু বসেছিল—"

"ওরে আমার বাপের ঠাকুর রে! তোমার জিরণোর জন্যেই আমি গাঁঠের পয়সা খরচ ক'রে দাওয়াটি মেরামত করিয়েছি কি না? এটা কি মেড়োর চটি, না খেষ্টানের বেঞ্চি যে, যে আসবে, সেই একবার ক'রে ব'সে জিরিয়ে আমার চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার—"

"থামুন মশায়, থামুন, আমি যাচ্ছি।"

আবার পথ চলতে আরম্ভ করলাম। পথে একটা জলের কলে এক পেট জল খেয়ে নিলাম। তাতে ক্ষুধার একটু সাময়িক নিবৃত্তি হ'ল; কিন্তু মাথাধরাটা কম্‌ল না।

যাই হোক্, বরাবর ডায়মণ্ড হারবারের দিকে সোজা চল্‌তে আরম্ভ করলাম।...ক্রমে সূর্য্যদেব পশ্চিমদিকে ঢ'লে পড়লেন। দেখতে দেখতে শীতের ক্ষণস্থায়ী গোধূলিতে সন্ধ্যার ম্লানিমা ঘনিয়ে এল। কেবল আকাশে দু'একটি পলাতক মেঘখণ্ড তপনদেবের নেপথ্যের আলোর দিকে আশা-রক্তিম হয়ে চেয়েছিল—যদি এ অভিনন্দনে তাঁ'র অদৃশ্যমান রাঙা আলোটির চুম্বনকে একটুও ধ'রে রাখা যায়। কিন্তু হিমের গাঢ় ছায়ায় আসন্ন অন্ধকারের আভাস বড় শীঘ্র ফুটে উঠল।...

ফিরব?...নাঃ! বিশেষতঃ এতক্ষণ বাড়ীতে নিশ্চয়ই জানাজানি হয়ে গেছে ও যেটা সব চেয়ে বড় কথা, পারুলও জেনে গেছে যে, দাদা আমাকে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছেন। আমার নষ্ট মানের পুনরুদ্ধার করতে হ'লে একমাত্র পন্থা হচ্ছে—মানুষ হয়ে দেশের দশের এক জন হয়ে বাড়ী ফেরা। নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়। তখন যশো-জ্যোতির্ম্মণ্ডিত হয়ে কেমন ক'রে দাদাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাব, ভাবতে ভাবতে দৈহিক ক্লান্তিও ভুলে বিভোর হয়ে চলতে লাগলাম। হঠাৎ বাঁ দিকে একটা ট্রেণের আওয়াজে চম্‌কে উঠলাম। দেখলাম, একটা রেল-ষ্টেশন।

ষ্টেশনে একটা তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী সাইডিঙে প'ড়ে ছিল। একটু শীত শীত করছিল। দুর্গা ব'লে ঢুকে পড়লাম। হায়, রোজ এ সময়ে পিসীমার যে উৎকণ্ঠার সীমা থাকে না, পাছে ঋতুপরিবর্ত্তনরূপ সঙ্কটসময়ে হিম লেগে চিকিৎসাশাস্ত্রের যাবতীয় কালব্যাধি আমার শরীর-রূপ মন্দিরে মৌরুসী পাট্টা নেয়! (পিসীমার কাছে কোনও ঋতুই কখনও স্থায়ী হ'ত না। ঋতুমাত্রই তাঁ'র কাছে গাঢ় আশঙ্কার বিষয় ছিল, তার পরিবর্ত্তনশীলতা-রূপ বিশ্বাসঘাতকতার প্রবণতার দরুণ।)

কতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, জানি না। হঠাৎ স্বপ্ন দেখলাম, যেন আমার বাঁ পা-টা ডান পায়ের সঙ্গে তার বিধাতৃ-নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধটি অস্বীকার ক'রে ধীরে ধীরে ব্যোম-পথে ধাবমান হচ্ছে। মনটা বেশ একটু খারাপ হয়ে গেল। রাজনীতিতে আমার মত উৎকট অসহযোগ-প্রবণ হ'লেও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে অসহযোগের এ দৃশ্যে আমার চিত্ত একটু উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ার দরুণ আশা করি, কপট-তার অভিযোগে পড়ব না।

এমন সময়ে ঘুম ভেঙ্গে গেল। বুক টিপ টিপ করছিল। জেগে বাঁ পায়ে হাত দিয়ে তাকে যথাস্থানে অবস্থিত দেখে

ভারী আরাম বোধ হ'ল :—"আঃ, কি বিশ্রী স্বপ্ন...যদি সত্যি হ'ত..."

এমন সময়ে হঠাৎ আবার সেই অনুভূতি! কি ভয়ঙ্কর! বাঁ পা-টা যে সত্যি সত্যিই উপর দিকে উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে! কি সর্ব্বনাশ! আমি জেগে, না এখনও স্বপ্ন দেখছি! আমার বুকের রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠল।

হঠাৎ পায়ের কাছেই একটা লাল পাগ্ড়ী—কি হবে? শেষটা কি না পুলিসের হাতে পড়লাম!—"পিসীমা—"

"আরে—হিঁয়া পিসীমা কঁহা মিলেগা? সমুরা মিল্ সক্তা!" ব'লে সে নিজের অনুপম রসিকতায় খুব এক চোট নিখর্চায় হেসে নিল।

পাহারাওয়ালাও তা হ'লে রসিকতা করার প্রয়াস পায়! এক দিন বিবাগী হয়েই এ অভাবনীয় অভিজ্ঞতা!...পরে না জানি কপালে আরও কত কি কর্ম্মভোগ আছে!...

একটু সাহস ক'রে বল্লাম, "পাহারাওয়ালাজী! ওঠো, হামারা পা হায়। বুঝা?"

"আরে বুঝা ত বটে! বাকি হিঁয়া পা রখ্নেকা জগা নেহি?"

"কাহে?'

"আরে—কেয়া মুস্কিল—অর্ডার নেহি।"

হা অদৃষ্ট! একটা ভাঙ্গা প'ড়ো গাড়ী। তা'র মধ্যে একটা রাত কাটালেও কোম্পানীর মহা ক্ষতি!...

কিন্তু কোথায় যাই! প্ল্যাটফরমের এ-ধার ও-ধার ঘুরে শেষটা হঠাৎ চোখে পড়ল যে, দুই সারি মালের মধ্যে একটু যায়গা আছে। মালগুলির উপরে একটা টার্পলিন বিছানো ছিল। তার মধ্যেই অগত্যা আশ্রয় নিতে হ'ল।...

ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলাম, দাদা অনুতপ্ত স্বরে বল্ছেন, "অমিত, মাপ কর ভাই আমাকে। আমি বুঝতে পারিনি তুই কে—তুই ছল্তে এসেছিস্, তা কে জানত?"

আমি উত্তরে যেন দাদার পিঠ চাপড়ে বল্লাম, "দাদা, কথায় বলে না যে, দাঁত থাক্তে লোকে দাঁতের মর্য্যাদা বোঝে না? যাক্, চল, আমি তোমাদের মাফ করলাম, কিন্তু দেখো, আর কখনও যেন—"

এমন সময়ে মনে হ'ল, দাদা যেন আমার গলা টিপে ধরেছেন। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে আর কি! কাসতে কাসতে ঘুম ভেঙ্গে দেখি, মাথার কাছে অরুণালোকে রাশি রাশি ধূলি-কণা চক্ চক্ ক'রে উড়ছে ও এক জন স্থূলকায়া ঝাড়ুদারিণী ধূলারাশিকে একত্র ক'রে কোনও অজ্ঞাত কারণে আমার নাসারন্ধ্রদ্বয়ের দিকেই প্রেরণ করতে বদ্ধপরিকর।

ধড়মড় ক'রে উঠে বেরিয়ে পড়লাম। অকস্মাৎ একটা জলজ্যান্ত মানুষকে এ হেন অপ্রত্যাশিত স্থান হ'তে গজিয়ে উঠতে দেখে স্থূলাঙ্গিনী বিপুলকায়া হওয়া সত্ত্বেও লাফিয়ে সার্দ্ধ তিন হাত দূরে ছিট্‌কে পড়লেন।

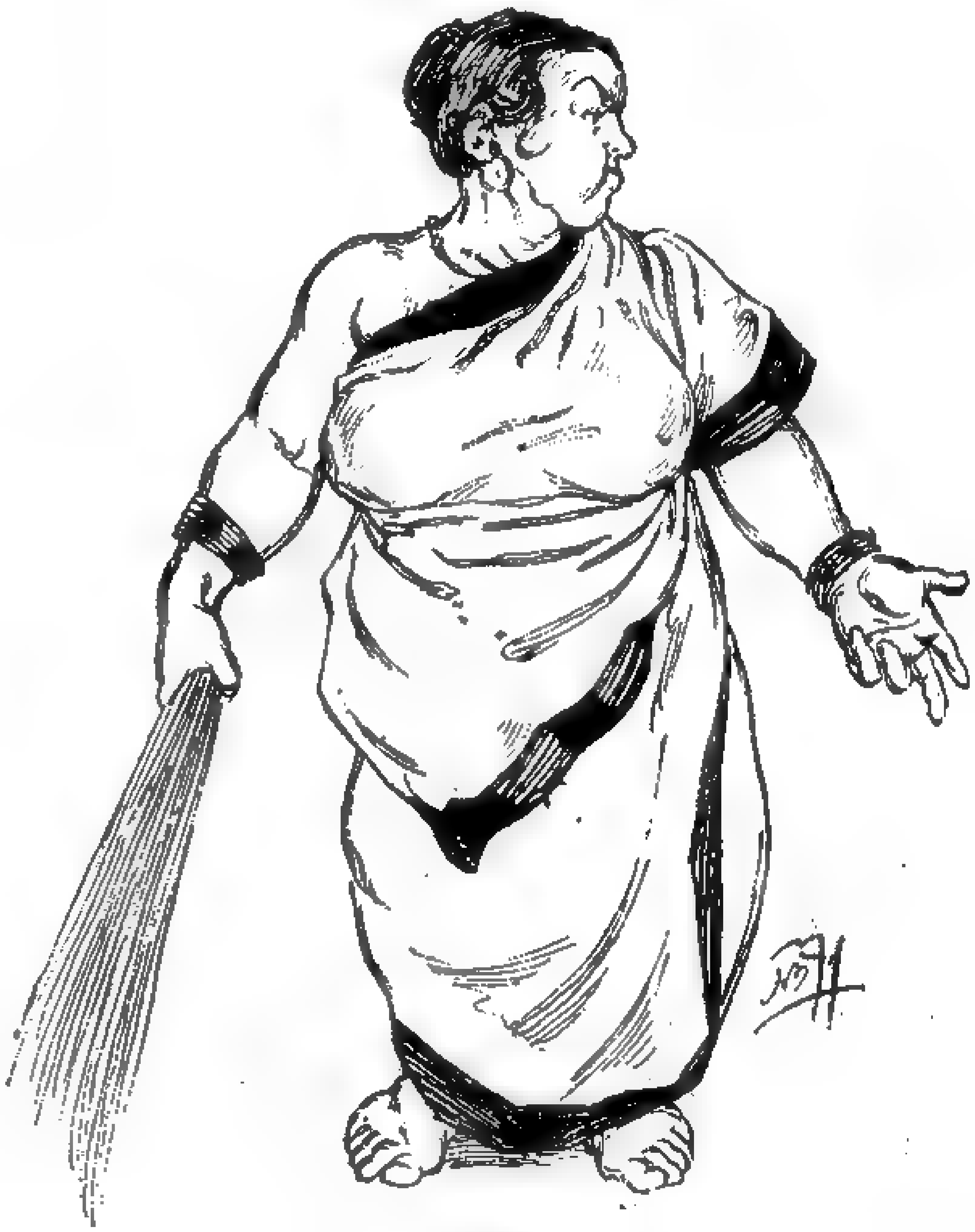

ও মা! এক্‌খানে যে এক মিন্‌ষে বট্টেক গো!

"ও মা, এক্‌খানে যে এক মিন্‌ষে বট্টেক গো! আমি বলি বুঝি শূয়র বা ভূত হবেক। এক্‌খানে কি কর্‌তে-ছেলে গো বাছা? হেথা কি নাক ডাকাবার যায়গা না কি গো?"

### ৪

সেখান থেকে আবার কল্‌কাতার দিকেই ফিরলাম; আবার চলেইছি। দেখতে দেখতে বেলা সাড়ে আটটা।...কিন্তু চা কৈ? ক্ষুধার তাড়না বরং সওয়া যায়, কিন্তু চা-তৃষ্ণা যে বাঙ্গালী-সন্তানের কাছে অসহ্য। বিশেষতঃ গত রাত্রে অনিয়মে অত্যাচারে মাথাও বেশ ধরেছিল ও

একটু জ্বরভাব আমার গ্রন্থিতে বেদনাসঞ্চার ক'রে আমার চা-পিপাসাকে আকণ্ঠ ক'রে তুলেছিল।

এমন সময়ে একটা ট্রামের মধ্য থেকে "বাঁধো বাঁধো" শব্দ কানে গেল। দেখলাম, এক বিশালবপু, অসীম-উদর, ক্ষুদ্র-মস্তক, বিরলকেশ মাড়োয়ারী ভদ্রলোক ট্রামের পাদপীঠে ( foot board ) ভর ক'রে "কুলী কুলী" ক'রে মহাচীৎকার কর্‌ছেন।

মনে করলাম, বুঝি কাছে কোনও কুলী তাঁ'র নয়ন-পথের পথিক হয়েছেন। এ-দিক ও-দিক তাকিয়ে কোনও কুলীকেই দেখতে না পেয়ে তাঁ'র ধারে ফিরে তাকাতেই রাগে আমার মাথা ঝিম্ ঝিম্ ক'রে উঠল।...তিনি যে হাতছানি দিয়ে আমাকেই ডাক্‌ছেন! সাক্ষাৎ নিকষ কুলীনের বংশধরকে কি না কুলী মনে ক'রে ডাকা!

"আমি কুলী না কি?" ব'লে অন্য দিকে বিরাট্ আত্ম-সম্ভ্রমের সঙ্গে দৃষ্টিপাত করলাম।

"আরে ভেইয়া। সরম কোথা? দেখছ না, হামি বুঢ়া মানুষ হচ্ছি। আট ঠো পুইসা দিব। আইসো না।"

"বুড্ডা! উত্‌রো না। ট্রাম কতক্ষণ তোমার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকবে?"

"আরে কণ্ডক্টর সাব, গোসা কর্‌ছ কেনে? একটু ঠারো না ভেইয়া।...আইসো না ছোকরা। এগারটা পুইসা—"

পাশেই একটা দোকানে লেখা ছিল, "আপনাদের হরেকৃষ্ণ পোদ্দারের চিরপরিচিত উচ্চাঙ্গের চা। দুই পয়সায় মূর্ত্তিমতী সুধা। এক চুমুক দিলেই প্রমাণ পাবেন।"

রক্ত-মাংসের শরীর ত।...মোট নামিয়ে নিলাম।

৫

এগার পয়সার মধ্যে দশ পয়সায় দু' পেয়ালা চা, দু' খণ্ড রুটী ও একটা ডিম খেয়ে আবার পথ চল্‌তে আরম্ভ করলাম।

ভাবতে ভাবতে, না না কর্‌তে কর্‌তে অথচ কি এক অনির্দ্দেশ্য আকাঙ্ক্ষার টানে হঠাৎ দেখি যে, আমি আমাদের বাড়ীর একটু আগের গলিতে ঢুকে প'ড়ে ধীর-মন্থর-গতিতে পারুলদের বাড়ীর সাম্‌নে দিয়ে চলেছি। মনটা ভারী খুসীতে ভ'রে উঠল। সদ্যস্নাতা পারুল কালকের মতই রেলিঙে ভর ক'রে চুল এলিয়ে দিয়ে রাস্তার দিকে বিষণ্ণমুখে তাকিয়েছিল।

"অমিত-দা, অমিত-দা—কি ছেলে তুমি গো—ভিতরে এসো না ভাই লক্ষ্মীটি, তোমার দুটি পায়ে পড়ি..." তার শুষ্ক মুখখানি মুহূর্ত্তে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

তখন বেলা বারোটা হবে। জান্‌তাম, পারুলের দিদিমা তাঁর তিনতলার ঘরে কাঁথা সেলাই করছেন ও মামা জলের কল দেখতে টালায় বেরিয়ে গেছেন। কাযেই পারুলের সঙ্গে একটু নিরালায় দুটো প্রাণের কথা বল্‌বার সুযোগ হবেই হবে। তড় তড় ক'রে উপরে উঠে গেলাম।

৬

"মা গো! কি চেহারা হয়েছে বল ত? কা'ল কোথা ছিলে সমস্ত দিন, সমস্ত রাত? আর মেসোমহাশয় ও দাদা কা'ল সমস্ত দিন পুলিস আর বিজ্ঞাপন, এ পাড়া আর সে পাড়া ক'রে সারা। তুমি কি? আমরা ভেবে ভেবে সারা—"

একক আমি এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এতখানি বিক্ষোভ আন্‌তে সমর্থ? মনটা নেচে উঠল,—বিশেষতঃ পারুল ভেবে সারা মনে ক'রে।

"চুপ ক'রে যে? যাক্, এখন বাড়ী যাচ্ছ ত?"

"বাড়ী, পারুল? এ জন্মে আর নয়।"

"ও মা, সে কি ভাই! দাদার ওপর রাগ ক'রে তুমি কি পাগল হ'লে?"

আমার কালকের রাগের উদ্দীপনা এল।

"পারুল, তোমার মুখে এই কথা! একটা ত্রীকলেস ব্যারিষ্টার আমাকে অপমান কর্‌ল, আর তুমি কি না আমাকেই পাগল ব'লে বসলে?"

"ছি অমিত-দা, এমন কথা কি বল্‌তে আছে? যে দাদা তোমায় হাতে ক'রে মানুষ—"

পাখার শীতল হাওয়ায়ও চুল্লীর আগুন জ্ব'লে উঠে থাকে। আমি তীব্রকণ্ঠে বল্‌লাম, "মানুষ করেছেন? পারুল! যাক্—আর না। বুঝেছি, তুমিও আজ আমার বিপক্ষ দলে যোগ দিয়েছ।...তবে আর কেন? যাই, আজ এখনই গিয়ে 'বুড়ীগঙ্গায়' ঝাঁপ দেই।"

"ওঃ! অমিত-দা, তুমি ঠাট্টা কর্‌ছ। 'বুড়ীগঙ্গায়' কি এখন ডুব জল আছে?"

ভারী রাগ হ'ল। বড় গঙ্গার কথা কেন মনে হ'ল না। মুখ ফিরিয়ে অভিমানের স্বরে বল্লাম, "ঠাট্টা করবারই আমার মনের অবস্থা বটে। যে কা'ল থেকে কিছু খায় নি—"

পারুলের মুখখানি মুহূর্ত্তে বিবর্ণ হয়ে গেল। তার চোখ দুটি ছল্ ছল্ ক'রে উঠল। সে কাতর স্বরে বল্ল, "অমিত-দা, মাপ কর ভাই যে, প্রথমেই তোমাকে জিজ্ঞেসা করি নি, তোমার খাওয়া হয়েছে কি না। একটু বোসো ভাই, মাথার দিব্যি রইল যদি পালাও। আমি যা হয় দুটো মুখে দেবার যোগাড় ক'রে—"

বাধা দিয়ে বীরত্বব্যঞ্জক কণ্ঠে আমি বল্লাম, "না, পারুল, যথেষ্ট হয়েছে। তোমার যদি সহানুভূতি না পাই, তবে সেবাও চাই না।"

"ও মা! সহানুভূতি, সেবা এ সব আবার কি অমিত-দা! তুমি আজ যে খাঁটি বঙ্কিমী ঢঙে কথা কইছ। দেখি—" ব'লে সে আমার কপালে হাত দিয়েই বল্ল, "মা গো! তোমার যে জ্বর হয়েছে অমিত-দা। ও! তাই। এসো, আপাততঃ এই ফরাসের ওপর মামার ঐ আলোয়ানটা গায়ে দিয়ে শুয়ে পড় ত। ডাক্তার-বদ্যি আনা ও মেসোমশায়কে খবর দেওয়ার ব্যবস্থা আমি করছি'খনি।"

"খবর্দ্দার পারুল। বাবাকে কি দাদাকে যদি আমার সম্বন্ধে একটা কথাও বলো, তা হ'লে তোমার আর আমি এ জন্মে মুখ দেখব না জেনো।"

"কিন্তু তোমার যে জ্বর হয়েছে, অমিত-দা!"

আমি বীরের মত অগ্রাহ্যভরে বল্লাম, "ও কিছু না। ওকে আমরা আমলই দিই না। আর...আর...তা ছাড়া আমার জ্বর হলেই বা কি, আমি মলেই বা কি? আর আমার জন্যে কাঁদবারই বা কে আছে, বলো?"

জান্তাম, এ ব্রহ্মাস্ত্র পারুলের উপর ব্যর্থ হ'তেই পারে না। নিমেষে তার দু' চোখে জল উপ্ছে পড়ল। সে কাতর স্বরে বল্ল, "তোমার দুটি পায়ে পড়ি অমিত-দা, অমন অলক্ষুণে কথা ব'লে আমায় যন্ত্রণা দিও না। আমার বড্ড কষ্ট হয়—"

বল্তে বল্তে সে তার আঁচল দিয়ে চোখ ঢাক্ল।... আমার মনটা এক অপূর্ব্ব স্নিগ্ধতায় ভ'রে উঠল। আমার অন্তরাত্মা আমার কানের কাছে গুণ্গুনিয়ে গেয়ে উঠল যে, আমার কালকের ও আজকের সমস্ত কষ্ট সার্থক।

রোমান্টিক সুরে বল্লাম, "পারুল, মুখ তোলো ভাই। আমি অতি নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন—অতি—অতি—"

কি মুস্কিল—ঠিক কি এ হেন সময়েই বাক্য হ'রে যেতে আছে! কিন্তু শতচেষ্টায়ও আর যে কথা যোগায় না! এমন ফ্যাসাদেও মানুষ পড়ে! শেষে মহা বিব্রত হয়ে বল্লাম, "যাক্ গে। আমার একটা কথা রাখবে?"

আঁচল থেকে মুখ না তুলেই পারুল বল্ল, "কি কথা?"

"যদি রাখো ত বলি।"

সে রুদ্ধস্বরে বল্ল, "তোমার কথা আমি কতখানি শুনি, তা কি তুমি জানো না অমিত-দা—আমি—" কথাটা সে শেষ করতে পার্ল না।

বীরগর্ব্ব ও কারুণ্যের এক খিঁচুড়ি ভাবে আমার মনটা ভ'রে গেল।

"পারুল, মুখ তোলো ভাই। লক্ষ্মীটি! কেঁদো না। শুন্বে না কথা? শোনো। ছি! কান্না কি? শোনো—আমি যেখানেই থাকি না কেন, তোমায় চিঠি লিখব—কিন্তু আমার কথা তুমি কাউকে বোলো না। এখন আমি চল্লাম।"

এবার সে তার অশ্রুনিষিক্ত মুখখানি তুলে তার কালো চোখ দুটি আমার মুখের ওপর অচঞ্চলভাবে স্থাপন ক'রে বল্ল, "না।"

"সে কি?"

সে দৃঢ়ভাবে বল্ল, "তুমি যেতে পাবে না।"

"লক্ষ্মীটি ভাই। পারু, শোনো। আমাকে যে ভাই যেতেই হবে—মানুষ হ'তে। এখন কি আর আমার মানুষ না হয়ে বাড়ী ফির্লে আত্মসম্মান বজায় থাকে? কিন্তু তোমাকে কথা দিচ্ছি যে, তোমাকে আমি মাঝে মাঝে চিঠি লিখব ও দেখা দেব, যদি তুমিও কথা দাও যে, আমার কথা কাউকে বল্বে না।"

একটু চুপ ক'রে কি ভেবে পারুল বল্ল, "আচ্ছা, কিন্তু তুমিও কথা দাও যে, তুমি তোমার শরীরের অযত্ন করবে না বা বুড়ীগঙ্গায় ঝাঁপ দেবে না!"

শেষ কথাটার মধ্যে একটু প্রচ্ছন্ন ঠাট্টার ভাব ছিল

না কি ? না—না—তার চোখ দুটি এখনও যে ক্ষান্তবর্ষণ অশ্রুস্ফীত হয়ে আছে। যথাসাধ্য গম্ভীর স্বরে বল্‌লাম,—“আচ্ছা, তাই হবে। কিন্তু…কিন্তু ..যত দিন না আমি নিজের পায়ে ভর দিয়ে দেশের ও দশের মুখোজ্জ্বল করতে পারি, তত দিন ..তত দিন…তুমি…আমাকে . মানে ..”

“আমি তোমাকে কি ?”

এ প্রশ্নে আরও বিব্রত হয়ে পড়লাম। ভারী রাগ হ'ল। এ হেন সময়ে এমন গদ্যময় প্রশ্ন করতে আছে ? অসহায়ভাবে বল্‌লাম, “এই বল্‌ছিলাম কি, আমাকে… মানে আমাকে . মাঝে মাঝে…কি জানো · তোমাকে আমি যে কতটা ··”

হঠাৎ তার মুখখানি রাঙা হয়ে উঠল। সে দাঁড়িয়ে উঠে বল্‌ল, “দাঁড়াও, আগে দুখানা লুচি ভেজে আনি।”

কুণ্ঠায় আমি মাটীর সঙ্গে মিশিয়ে গেলাম। কেন মর্‌তে পারুলকে আমার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশের কথা বল্‌তে গিয়ে এমন হাস্যাস্পদ হলাম ?—যখন পারুলের হৃদয়ের গভীরতা এতটুকুও নেই ! ভারী রাগ হ'ল তার ওপর। শেষটায় দার্শনিকের মত এই ব'লে মনকে প্রবোধ দিলাম যে, অপাত্রের কাছে মনের গভীর ভাব ব্যক্ত করতে যাওয়াই বিড়ম্বনা। যাই হোক্‌, পারুলের হাতের লুচি সে জন্য কম তৃপ্তিদায়ক মনে হ'ল না।

### ৭

পথে বেরিয়ে মনে হ'ল যে, আমার বিরাট মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে ধারণাহীনা মেয়েটাকে একবার দেখিয়ে দিতেই হবে আমি কে।…কিন্তু তা করতে হ'লে শুধু যে মানুষ না হয়ে বাড়ী ফেরা চল্‌বে না, তাই নয়, তা কর্‌তে হ'লে পথে পথে ঘোরা ছেড়ে মানুষ হ'তে লেগে যেতে হবে—অদম্য, বিরাট, দুর্জ্জয় উৎসাহে।…

কিন্তু কেমন ক'রে মানুষ হ'তে কোমর বেঁধে লেগে যাওয়া যায় ?···হঠাৎ মনে হ'ল, বিদ্যাসাগর মহাশয় ছেলে পড়িয়ে মস্ত লোক হয়েছিলেন। সুতরাং পন্থা—প্রাইভেট টিউটর হওন।

কিন্তু কোথায় প্রাইভেট টিউশন ? কেমন করেই বা তা যোগাড় করা যায় ?···

দিশেহারা হয়ে অন্যমনস্কভাবে চল্‌তে চল্‌তে বীডন ষ্ট্রীটের মোড়ে দেখি, এক বিরাট জনসমুদ্র একটি শবদেহের পিছনে মহাকীর্ত্তন করতে করতে চলেছে— নিমতলার ঘাটের দিকে।

এক জন প্রবীণ গোছের টিকীধারীকে জিজ্ঞাসা করলাম, মৃত ভাগ্যবান্ মনুষ্যটি কে ?

তাঁহার অশ্রুপূর্ণ চোখ দুটি বিস্ময়ে চক্‌ চক্‌ ক'রে উঠল। তিনি ভাঙ্গা গলায় জিজ্ঞাসা কর্‌লেন,—“বলেন কি ? আমাদের প্রভু যে !” আরও মূঢ়ের মত শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। কিন্তু এর পরও আর একবার জিজ্ঞাসা কর্‌তে সাহস হ'ল না “প্রভুটি কে ?”

পাশের একটি বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করলাম।

“বল কি ছোক্‌রা ? জান না ? প্রভু যে আধ্যাত্মিকচূড়ামণি তর্কচঞ্চু ! বাঙ্গালীর শেষ অবতার। কে হে তুমি ?”

কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম, “শেষ অবতার চূড়ামণিটিকে কি রোগে অবতারলীলা সাঙ্গ করতে হ'ল ?”

বৃদ্ধের প্রধূমিত বাগ্মিতানলে হঠাৎ যেন ঘি-মাখানো অরণী-কাঠের গুচ্ছ কেউ গুঁজে দিল। তিনি চোখ কপালে তুলে বল্‌লেন, “রোগ ? বাপু হে, কি বল্‌লে ? রোগ হবে আমাদের প্রভুর আধ্যাত্মিক তর্কচঞ্চুর ? ছোক্‌রা —আর মুখ দেখিও না ; জানো না কি যে, আমাদের ইচ্ছামৃত্যু প্রভু দেহরক্ষা করেছেন শুধু আবার শীঘ্রই জন্ম নেবেন ব'লে ?”

একটু বিস্ময়ান্বিত হয়ে বল্‌লাম, “ইচ্ছামৃত্যু ?”

বৃদ্ধ চোখ বিস্ফারিত ক'রে বল্‌লেন, “ইচ্ছামৃত্যু নয় ত কি ? একশ বার ইচ্ছামৃত্যু, হাজার বার ইচ্ছামৃত্যু, লক্ষ বার ইচ্ছামৃত্যু। যিনি গো-ব্রাহ্মণ ও শিবা-গীতার মহিমা প্রচার ক'রে তর্কে ম্লেচ্ছ পণ্ডিতদের তূলো ধুনে ছেড়ে দিলেন ; যিনি বেদবেদাঙ্গ হ'তে যুক্তিবারিধি মন্থন ক'রে হাঁচি টিক্‌টিকীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে অবিশ্বাসী চূড়ামণিদেরও চোখ ফুটিয়ে দিলেন ; যিনি আজীবন বরফ খান নি ও ম্লেচ্ছ করপোরেশনের কলের জল স্পর্শ করেন নি ;—এক কথায় যিনি বাঙ্গালার মাথার মণি, না না, ভারতের কাঞ্চনজঙ্ঘা, না না, জগতের বিস্ময়, তাঁর ইচ্ছামৃত্যু, তাঁর সম্বন্ধে তুমি সন্দেহ প্রকাশ কর্‌লে ! এই পাপেই আমরা যাচ্ছেতাই হয়ে গেলাম।”

পাশের একটি জোয়ান ভক্ত হঠাৎ ব'লে উঠলেন, "ভটচায মশায়, কেন বক্‌ছেন ঐ একরত্তি ফাজিল ছেলেটার সঙ্গে? তার চেয়ে বরং দুটো চাপড় দিয়ে ওকে ডিশমিশ ক'রে দিন!"

বিবাগীর একটা সামান্য কথা জিজ্ঞাসা করাও এমন বিপদ! তাড়াতাড়ি সে স্থান হ'তে অপসৃত হয়ে দুটি পুলিসের সহযাত্রী হয়ে শোভাযাত্রার পিছনে পিছনে চল্‌তে সুরু ক'রে দিলাম।

## ৮

নিমতলার ঘাটে আধ্যাত্মিক-চূড়ামণি তর্কচঞ্চুর অজস্র ভক্তবৃন্দ ফুল ছড়িয়ে, কাপড় বিতরণ ক'রে, আশেপাশের লোককে ধাক্কা দিয়ে, নাচানাচি ক'রে, কীর্ত্তন গেয়ে, কারণবারি পান ক'রে, দাহকার্য্য সমাধা ক'রে যখন প্রস্থান করলেন, তখন রাত দশটা বেজে গেছে।

এতক্ষণ জনসঙ্ঘের বিচিত্র ভাবমাতামাতি, হৈ-চৈ প্রভৃতির দৃশ্যে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম ব'লে খেয়াল ছিল না যে, জঠরদেশে পারুলের লুচি-সন্দেশ বহুক্ষণ অদৃশ্য হয়ে গেছে।

পকেটে একটিমাত্র পয়সা ছিল। কিছু বাতাসা কিনে নিমতলার ঘাটের গঙ্গাজল পান ক'রে একটু সুস্থ বোধ হ'ল। বাতাসে ব'সে এ ধার ও ধার তাকাতে লাগলেম।

হঠাৎ দৃষ্টি পড়ল নিমতলার ঘাটের এক কোণে। একটি জটাধারী সাধু ধুনী জ্বালিয়ে আসীন ও তাঁহার ভক্তবৃন্দকে বক্তৃতাদানে তৎপর। সাধুজীর বপুটি সাধন-ভজনের কৃচ্ছ্র-সাধনের ফলে বেশ পুষ্ট দেখা গেল।

হঠাৎ তাঁহার এক ভক্ত নিমীলিত-নেত্রে গান গেয়ে উঠলেন—

"সেই সময় হে দীনবন্ধু দিলাম তোমায় ভার,
যে দিন মোহকূপে হাতড়ে হাতড়ে দেখব অন্ধকার।
(হরি) জ্ঞাতি-বন্ধু-সুতদারা,
কাম অর্থে মাতোয়ারা,
হয়ে থাকি ভাবি না যে দুস্তর পারাবার।

পা—রা—বা—হরি হে দুস্তর পারা—হাঁ। ঐ সম্। কেমন প্রভুজী?"

কর্কশকণ্ঠে সাধুজী বল্‌লেন, "জিতা রহো বেটা। ঠিক আয়েসে। এই রোকম কোরে ভজনানন্দের সহিত গাঞ্জিকানন্দ-লহরীতে সন্তরণ কোরতে কোরতেই এ ভোবো পারাবার তোরে যাবি রে বেটা। তোর হোবে—হোবে। লে অউর এক ছিলিম ফুঁকে লে।"

ব'লে তিনি তাঁর আর এক টাকওয়ালা কোটরগতচক্ষু ভক্তকে ইঙ্গিত করলেন। সে গাইল;—

"তব নীরে স্নান তব জল পান যেই করে
মা গো সেই ভাগ্যবান্,
সায়াহ্নেতে গাঁজা খেয়ে স্নানে তাজা (সে যে)
বেরহ্মদর্শনের প্রথম সোপান।"

সাধুজী কলিকায় এক বিরাট টান দিয়ে এক মুখ ধূমোদ্গার পুরঃসর বল্‌লেন, "হাঁ—ঠিক ঠিক। গাঁজা না খেলে হোবে না। মোহানির্ব্বাণতন্ত্রে লিখা আসে।"

সাধুজীর ডান-পাশে হাত দশেক দূরে চার জন উড়ে একটা নির্ব্বাপিতপ্রায় চিতার কাছে ব'সে একটা ভাঁড় থেকে সন্দেহজনক কি একটা তরল পদার্থের চর্চ্চা করছিল। তার মধ্যে এক জন হঠাৎ প্রেরণাবশে গেয়ে উঠল;—

"তু লাগি গোপদণ্ড মোনা রে কালিয়া সোনা!
দধি-দুধ-সর খাও রে কালিয়া দধি-দুধ-সর খাও,
(আর) কৌড়ি মাগিলে অমনি কালিয়া মুরলী বজাও,
রে কালিয়া সোনা—গোপদণ্ড রে কালিয়া
রে মোনা রে—কালিয়া সোনা তু লাগি হঃ।"

## ৯

ঘাটের চাতালের উপর থেকে নিমতলার শ্মশানে আরও দুটি শব ধীরে ধীরে পুড়তে দেখা যাচ্ছিল ও মাঝে মাঝে একটু বাতাসের ঝটকার সঙ্গে সঙ্গে তাদের নির্ব্বাণোন্মুখ লেলিহান শিখা যেন বাতাসকে জানিয়ে দিচ্ছিল যে, তারা নিজ কার্য্যের প্রতি মোটেই উদাসীন নয়।

একটি ছোট্ট চিতার পাশে একটি কুড়ি একুশ বয়সের ছেলে ব'সে ছিল ও একদৃষ্টে চিতার শিখার দিকে চেয়ে ছিল। তার যেন সময়ের জ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তার সাম্‌নের চিতাটি ছোট। বোধ হয়, তার কোনও ছোট ভাই...

হঠাৎ হৈ হৈ করতে করতে যুবকটির ঠিক ডান ধারেই একটি শবদেহের সঙ্গে আট দশ জন লোক তিন চারটে কালো রঙের বোতল হাতে ক'রে এসে হাজির। চিতার দাহনারম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই অতি দ্রুত 'রেটে' সকলে তরল পদার্থের সদ্ব্যবহারে ব্যস্ত হয়ে উঠল। তার মধ্যে এক জন একটি বড় বোতল একাই একচেটে ক'রে বসেছিলেন ও সঙ্গীরা চাইলে জোরে ঘাড় নেড়ে যেন জানাইলেন যে, তাদের সে অমিতাচারের প্রশ্রয় আর যে-ই দিক্ না কেন, তিনি যে দিতে পারেন না, সেটা নিশ্চিত। মাথায় বড় বড় চুল। খাসা টেরি কাটা। গায়ে মোটা একটা খোসা ও কপালে প্রকাণ্ড এক তিলক। রং বেশ ফরসা।

খানিক বাদে বোতলটি উপুড় ক'রে মুখে সংশ্লিষ্ট ক'রে "হুত্তোর" ব'লে সেটি ছুড়ে ফেলে দিয়েই দাঁড়িয়ে উঠলো। বোধ হয়, তাঁর হঠাৎ বৈরাগ্যসঞ্চার হয়েছিল। তিনি অবিলম্বে জড়িত কণ্ঠে কীর্ত্তনানন্দে মাতোয়ারা হয়ে উঠলেন,—

"ওরে এই অসার
সংসার ছেড়ে
আয় সবে তোরা,
দেখ্ নদীয়ায়
আজ এসেছেন
গোরা।"

দেখতে দেখতে তাঁর আরও দু'চার জন শ্মশান-বন্ধুরও গৌরাঙ্গ-প্রেমের উদয় হ'ল। তাঁরাও প্রাণের মায়া ছেড়ে দোয়ারকি সুরু ক'রে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আঁখরও চল্‌তে লাগল।

"সখি রে—এ সংসারে বল্ কি বা আছে?
শুধু আঁটি আর চামড়া এ সংসার-গাছে।
বৈ ত নয় ওরে - প্রাণসখি—-বই ত নয়।"

সাধুজী আর সইতে পার্‌লেন না। চেঁচিয়ে ব'লে উঠলেন, "আরে এ সম্বরা! হিয়াপর চিল্লাতিছিস্ কেনে? তরি চেয়ে গঞ্জিকানন্দে লেগে যা।"

তাঁর পাশের উৎকলবাসি-চতুষ্টয়ের মধ্যে এক জন ব'লে বস্‌ল, "হঃ বড়া যেন ষণ্ড গো। পুকারিছন্তি দেখ না।"

তিলকাঙ্কিত গৌরবর্ণ গৌরাঙ্গভক্ত ভদ্র লোকটি হঠাৎ সাধুজীর দিকে তাকিয়েই করযোড়ে বলতে আরম্ভ করলেন, "আরে কে ও? বাবা বিশ্বেশ্বর যে! তুমি এখানে কেন বাবা! তাই বলি, গৌরাঙ্গের ওপর নইলে আর এত আক্রোশ কার? তা ত হবেই বাবা। ম্লেচ্ছ শাস্ত্রে বলে struggle for existence হবেই ত। যাক্, আমি চুপ করলাম, বাবা। নইলে কেন মিথ্যে মিথ্যে তোমাদের রাজায় রাজায় যুদ্ধ'র মাঝে আমাদের মত উলুখড়ের প্রাণ যাবে? বিশেষতঃ যখন খাঁটি পৈতৃক প্রাণ!"

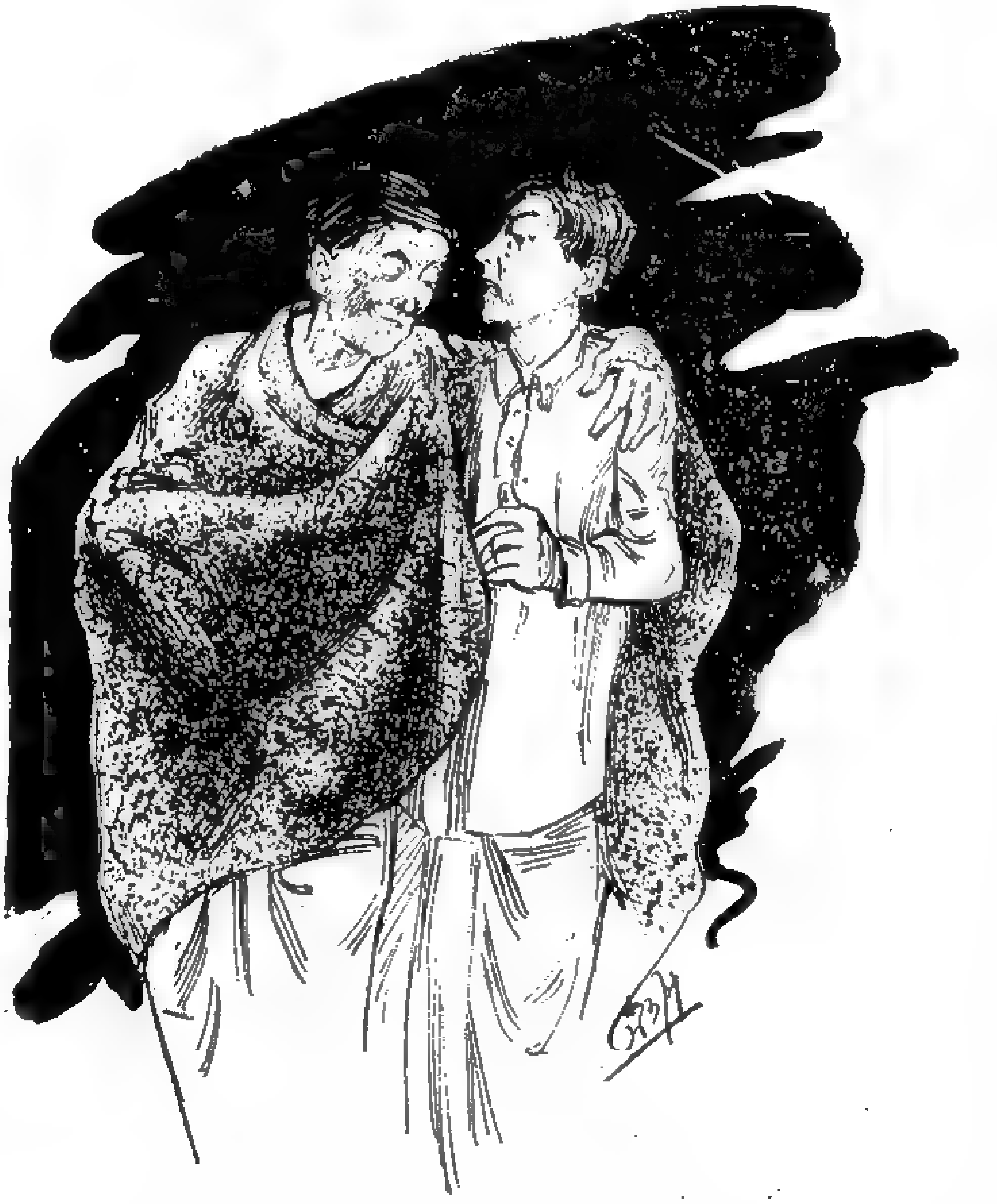
সটাং এসে আমার গলা জড়িয়ে বললেন, "চল দাদা আমার বাড়ী"

তাঁর হঠাৎ কি মনে হ'ল—তিনি ঘাটের দিকে টল্‌তে টল্‌তে ঠিক্ আমার সাম্‌নে এসে হাজির। এসে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন,—"কে? মা গঙ্গা? পায়ে রেখো মা। বাবা বিশ্বেশ্বরের উপদ্রবে আজ ত আর গৌরাঙ্গ

ভজা হ'ল না। তাই তোমায় ডেকেই পুণ্যি ক'রে নিই। শোনো মা—

'রেখো ও চরণে মা গো গঙ্গে—
মিনতি তোমায় দোহাই ফেলো না পাপ-পঙ্কে'—"

হঠাৎ আমার দিকে তাঁর চোখ পড়ল।

"কেমন দাদা? সম্‌টা ঠিক্‌ হয়েছে? বলুন, নইলে ছাড়ছি নি।"

বড় দুঃখেও হাসি এল।

"বুঝেছি দাদা বুঝেছি। ও হাসির মানে কি আমি বুঝিনি ভাবছেন? সাপের হাঁচি, বেদেয় চেনে। আপনার গোঁফ দেখলেই বোঝা যায় যে, আপনি তালিম লোক।"

বল্‌তে না বল্‌তে সটাং এসে আমার গলা জড়িয়ে ধ'রে বল্‌লেন, "চল দাদা—আমার বাড়ী। তুমি যে আমার সহোদর দাদা, তা আমি এক আঁচড়েই চিনে নিয়েছি। নইলে ঠিক সমের মাথায় এমন মোহন হাসি কি আর কেউ হাস্‌তে পারে?"

বারুণীর তীব্র গন্ধে আমি বিব্রত হয়ে পড়লাম। এ আবার কি নতুন বিড়ম্বনা! অতি কষ্টে আমার হঠাৎ-লব্ধ ভ্রাতাটির নিবিড় কণ্ঠালিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে বল্‌লাম, "আরে মশাই! ছাড়ুন ছাড়ুন। লোকে ভাববে কি?"

তৎক্ষণাৎ আমার পা জড়িয়ে ধ'রে ভ্রাতৃবর বল্‌লেন, "দাদা—ভাবুক গে, তোকে আমি ছাড়ব না। চল্‌ আমার বাড়ী। যেতেই হবে তোকে। দাদা-হারা হয়ে আর কত দিন থাকব? ওরে মাধব, যেদো, পুণ্ডরীক! দাদাকে আমার গাড়ীতে তুলে দে ত।"

দেখতে দেখতে আমার অগ্নিময় অভিশাপ ও লজ্জাকর হস্তপদোৎক্ষেপ সত্ত্বেও আমাকে সকলে মিলে ধরাধরি ক'রে একটি দিব্য পাল্কী-গাড়ীতে তুলে দিল।

## ১০

বেশ একটি তক্তকে গদিওয়ালা ফরাসের ওপর আমার নবলব্ধ ভ্রাতাটি আমাকে শুইয়ে দিয়েই আমার কণ্ঠালিঙ্গন ক'রে আমার পাশে শুয়ে দেখতে দেখতে নাসিকা গর্জ্জন সুরু ক'রে দিলেন। ঘোর বিতৃষ্ণার সঙ্গে তাঁর নিবিড় আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে না করতে আমিও আমার অবিশ্বাস্ত অবস্থার কথা নিদ্রা দেবীর কোমল হস্তাবলেপে ভুলে গেলাম।

সকালবেলা যখন ঘুম ভাঙ্‌ল, তখন বেলা বোধ হয় আটটা হবে, বিমল প্রভাতী অরুণকিরণে সমস্ত ঘরটা প্লাবিত হয়ে গেছে ও বাইরে গাড়ী, মোটরকার ও লোক-চলাচলের কলরব-মুখর হয়ে উঠেছে। আমার পাশেই আমার আশ্রয়দাতা তখনও নিদ্রাচ্ছন্ন। দেখলাম, লোকটি সুপুরুষ। তবে চোখের নীচে গভীর কালিমার রেখা অতি স্পষ্ট। বোধ হয় অমিতাচারের গুণে।

আমি চারদিকে তাকাতে না তাকাতেই পুণ্ডরীক এসে বাবুর পা টিপতে ব'সে গেল।

"বাবু চা খেয়ে থাকেন ত?"

"হ্যাঁ।"

খানিক বাদে চা ও সন্দেশ এসে হাজির। মনটা প্রসন্ন হয়ে উঠ্‌ল। এ এক রকম মন্দ অভিজ্ঞতা নয়। কাল এ সময়ে আমি কোথায় আর আজ কোথায়! কাল এক মাড়োয়ারীর মোট বয়েছিলাম আর আজ এক শ্মশানচারীর বাড়ীতে জামাই আদরে সন্দেশের সদ্ব্যবহারে ব্রতী! মনে হ'ল, "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ।"

চা খেতে খেতে পুণ্ডরীকের সঙ্গে গালগল্প চল্‌তে লাগ্‌ল। তাতে জানা গেল যে, বাবুর নাম নীলমণি সেন, দেশে জমীজমা আছে, এখানে আলিপুরে কি এক ম্যাজিষ্ট্রেটের নাজীর। দুটি ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে। তাদের জন্যে একটি গৃহশিক্ষক খোঁজা হচ্ছে। আমি সোৎসাহে পুণ্ডরীককে বল্‌লাম যে, আমিও ঐ মাষ্টারীই খুঁজছি।

পুণ্ডরীক ভারী খুসী হয়ে আর কথাবার্ত্তা না ক'য়ে সটাং মা-মণির কাছে আমাকে নিয়ে গেল। কেন না, এ সংসারে মা-মণি অর্থাৎ কর্ত্তাবাবুর মা-ই না কি হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা।

একটি ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে দেখি, জরাজীর্ণা এক বুড়ী চশমা নাকে রামায়ণ পড়ছেন।

"কে বাছা তুমি?"

আমি হঠাৎ একটা মিথ্যা পরিচয় দিয়ে বসলাম; আমার নাম অরবিন্দ দত্ত, পিতার নাম শ্রীকালিদাস দত্ত।

"উত্তর-রাঢ়ী না দক্ষিণ-রাঢ়ী?"

অকুল পাথার। দুর্গা ব'লে ব'লে ফেল্‌লাম,—"উত্তর-রাঢ়ী।"

"কুলীন না বংশজ ?"

"জানি না !"

"বংশ-পরিচয় জান না কি গা ? নবাবপুত্তুর না কি ?"

ভাবলাম, বলি যে, কোনও কিছু না জানার উপরই নবাবপুত্র হওয়া নির্ভর করলে নেহাৎ মন্দ হ'ত না। কারণ, তা হ'লে জীবনে অনেক সমস্তার সহজেই মীমাংসা হয়ে যেত। কিন্তু সাহস হ'ল না।

"চুপ ক'রে কেনে গো ? যাক্, শোনো বাছা, চুরি-টুরি ক'রে পালাবে না ত ?"

রাগে, ক্ষোভে চোখে জল এল। দাঁতে ঠোঁট চেপে রইলাম। ঘরের এক ধারে একটা পর্দ্দা ছিল; তার ও পাশে শাড়ীর খস্-খস্ শব্দ ও ফিস্-ফিস্ কথা কানে এল। শেষ কথাটা ধরতে পারলাম।

"ভদ্দর লোকের ছেলেকে কি মা অমন কথা—"

মা-মণি পর্দ্দার দিকে ফিরে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে খন্-খন্ ক'রে উঠলেন, "আরে থামো না বৌমা তুমি। তোমার দয়াধর্ম্ম চুটিয়ে কোরো যখন আমি গঙ্গাযাত্রা কর্‌ব। শোন গো ছেলে। দেখ, চুরি-টুরি কর্‌লে চল্‌বে নি এখানে, তা আগে থেকেই ব'লে রাখনু। কারুর চিঠি আছে ?"

"আজ্ঞে না।"

"ও মা ! তবে কেমন ক'রে জান্‌ব যে, তুমি গলায় ছুরি দেবে না, বাছা ? যাও, কোনও রাজারাজড়ার কাছ থেকে সুপারিশ নিয়ে এসো।"

বৌমা আবার পর্দ্দার অন্তরাল থেকে ফিস-ফিস ক'রে বল্‌লেন, "রাজারাজড়ার চিঠি ছেলেটি কোথায় পাবে বলুন মা ? তা হ'লে চাক্‌রী করতে আস্‌বেই বা কি দুঃখে ?"

"আঃ—থাম বৌমা—তোমার বাক্যির ছটা পরে শুনিও। শোনো গো ছেলে,—আচ্ছা, তুমি নিজেই বল ত' গা, কেমন ক'রে জান্‌বো যে, ঘটিটা-বাটিটা শালটা-দোশালাটা তুমি হাতটান ক'রে লম্বা দেবে নি ?"

এবার আমি আর থাকতে পার্‌লাম না;—"আজ্ঞে, আমাদের বাড়ীতে শাল-দোশালার অপ্রতুল নেই।"

তীক্ষ্ণদৃষ্টি আমার মুখের উপর রেখে বৃদ্ধা বল্‌লেন,—"তবে চাকরী করতে এয়েছ কেন গা বাছা ? বাপের

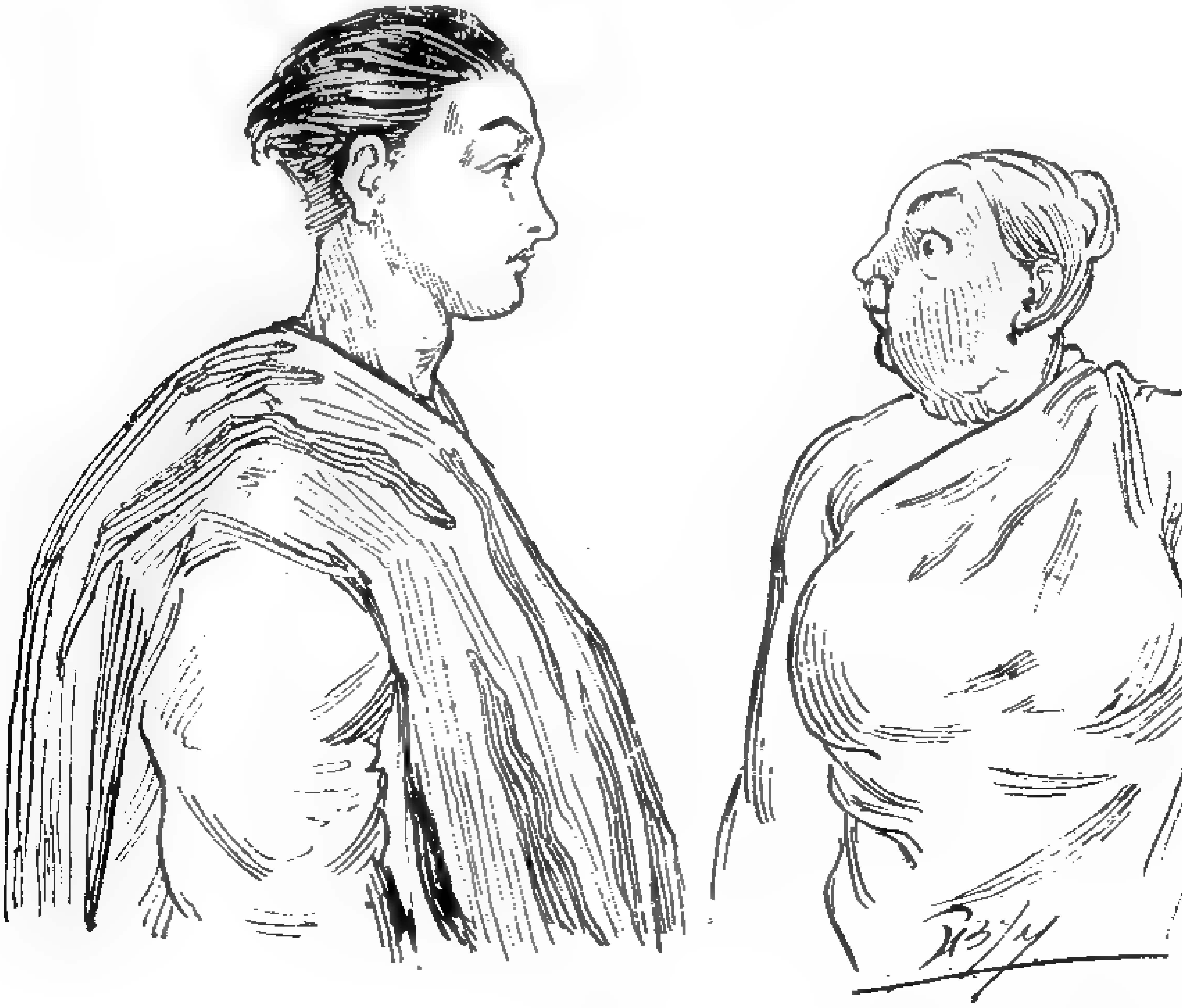

ও-মা, তবে কেমন ক'রে জানব যে, তুমি গলায় ছুরি দেবে না, বাছা !

সুপুত্তুর হয়ে বাড়ীতে শাল-দোশালা মুড়ি দিয়ে নবকাত্তিকটি সেজে ব'সে থাক্‌লেই ত পারতে? ইস্! শাল-দোশালার না কি আবার ওঁদের বাড়ীতে ছড়াছড়ি! বিষ নেই কুলোপানা চক্কর। আবার মুনিবের সঙ্গে মুখোমুখি করার আস্পর্দ্ধাটুকুর গুণে ঘাট নেই।"

ভাবলাম, বলি যে, তাঁকে বিধাতা আমার মুনিব করেই ছাঁচে ঢালেন নি। চাকরী না নিতেই এই!

মা-মণি আমার মুখের পানে চেয়ে মুখ বক্র ক'রে বল্‌লেন, "আহা, দুলালের আবার মুখ ভার ক'রে দাঁড়ানো হ'ল। আধিখ্যেতা দেখ না। আমি যেন কি সব্বনেশে কথাই বল্লুম। শোন না ছেলে! এই ছেলে! বল ত দেখি, তোমাদের যদি অবস্থা এতই ভাল, তবে তোমার আজ এ-রকম হন্তেকুকুরের মতন চেহারার ছিরি বেরিয়েছে কেন—যেন দুর্ভিক্ষের দেশ থেকে পেইলে এসেছ?"

কেন জানি না, হঠাৎ মুখে এসে গেল—"আমার বাবা দ্বিতীয় পক্ষ করেছেন, তাই।" ব'লেই আক্ষেপ হ'ল। কেন এ নির্জ্জলা মিথ্যে কথাটা বল্‌লাম? পর্দ্দার অন্তরাল থেকে একটা চাপা দীর্ঘনিশ্বাস ও একটা ছোট্ট আহা শুন্‌তে পেলাম।

এবার বোধ হয় মা-মণিরও একটু দয়া হ'ল। "আচ্ছা! তোমাকে চাকরীতে বাহাল করা গেল। দশ টাকা মাইনে ও খাওয়া-দাওয়া। বছরে এক জোড়া কাপড় ও এক-খানি ক'রে গামছা। কাযের মধ্যে ছোট খোকা ও খুকীমণিকে পড়াতে হবে ও বাজার করতে হবে।"

হা অদৃষ্ট, বাজার করতে হবে? অস্ফুটস্বরে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, "আজ্ঞে, বাজার—"

"হাঁ গো হাঁ। নইলে কি খোকা-খুকীর গায়ে ফুঁ দিয়ে দুটো 'নীল জল, লাল ফুল' পড়াবার জন্যে তোমায় দশ দশখানি টাকা দেওয়া হবে না কি? চাকরে চুরি ক'রে ছন্নছাড় ক'রে দিলে, তাই ত খোকা-খুকীর ম্যাষ্টের দরকার হয়ে পড়ল। নইলে এত কি সাত তাড়াতাড়ি ছিল?"

"অগত্যা—"

"আচ্ছা। বাইরে যাও এখন! হ্যাঁ, ভাল কথা, বিছানা এনেছ ত?"

"আজ্ঞে না।"

"ও মা! এমন ম্যাষ্টের ত সাত জন্মেও দেখি নি মা। তা হ'লে থেকো বাইরে চ্যাটাইয়ের উপর শুয়ে। যেমন কুকুর, তেম্‌নি মুগুর হবে তা হ'লে।"

পর্দ্দার ভিতর থেকে কোমল কণ্ঠে ফিস্-ফিস্ শব্দ এল, "আহা, ছেলেটিকে আজ না হয় বৈঠকখানা-ঘরের সতরঞ্চের ওপরেই শুতে দেওয়া হোক্ না মা!"

বৃদ্ধা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বল্‌লেন, "হ্যাঁ, আর কালই ভোর-বেলা সেখানি নিয়ে স'রে পড়ুক। না না, ও সব-টোসব হবে নি। সে সব মনের সাধ মিটিয়ে কোরো বৌমা—দু'দিন বাদে আমি চক্ষু বুজলে।"

ব'লে বিড় বিড় ক'রে খানিক কি বক্‌লেন। তার পরে আমার দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন, "যাক্. সে পরের কথা পরেই হবে না হয়। এখন শোনো বাছা! বাজার ক'রে আন্‌তে পারবে? এই নেও আট আনার মাছ এক সের, ছ-আনার আলু এক সের, তিন আনার পটোল, শোন বাপু, আমি ওজন ক'রে নেব কিন্তু। চুরিটি করেছ কি ক্যাঁক্ ক'রে গলা টিপে ধরেছি। আমি যে-সে মেয়ে নই। সাক্ষাৎ কুড়োরাম ভুঁইয়ের নাত্‌নী ও ছিদাম ভুঁইয়ের মেয়ে। এই বাজারের এক টাকা সাড়ে ন আনা নিয়ে যদি গা-ঢাকা দেও, তবে আমি পুলিসে খবর দিয়ে তোমায় ছ ছ মাস ছিরিঘরে পাঠাবো। বুঝলে ত?"

ক্ষোভে দুঃখে আমার চোখ ফেটে জল এল। ঢোক গিলে বল্‌লাম, "কার মাথায় দেব জিনিষ-পত্র? একটা ঝাঁকামুটে ভাড়া করব কি?"

"কর্‌বে বই কি? ওরে আমার নবাবপুত্তুর রে! দু' আনা ক'রে রোজ আমি ঝাঁকামুটের খরচ যোগাই। এতে ওঁর মাস্তির গায়ে কাদার ছিটে লাগে। নইলে আর কলিকাল বলেছে কেন? ঐ ত চেহারা—আবার মান-অপমানের জ্ঞান সাড়ে সতর আনা। আহা, যেন ধামা কাঁধে ক'রে আন্‌লে ঐ চেহারায় কিছু বেমানান হবে!"

ভাবলাম, এক টাকা সাড়ে ন আনা ছুড়ে ফেলে দিই। কানের মধ্যে শোঁ শোঁ করতে লাগল। অতি কষ্টে মুখ নীচু ক'রে চুপ ক'রে রইলাম।

পর্দ্দার আড়াল থেকে চাপা-কণ্ঠে, "মা, পরাণে ত যেতে

পারে। ভালমানুষের ছেলে কেমন ক'রে রোজ রোজ ধামা কাঁধে ক'রে—"

খন্ খন্ ক'রে এবার সুর সপ্তমে চড়িয়ে বৃদ্ধা বল্লেন, "ওরে আমার ননীর গোপাল রে! ওঁকে আমরা কুলুঙ্গিতে সাজিয়ে রেখে দে'বার জন্যে রাখনু। বৌমা, এম্নি ক'রেই তোমরা আমার রোগাছেলের টাকাগুলো লুটিয়ে-পুটিয়ে দিচ্ছ। পরাণে গেলে কি আর রক্ষে আছে না কি? বড় কর্ম্মার সন্দার সে। না না। ও-সব-টোসব হবে নি। আর অত নজ্জাই বা কি? আজকাল ত সায়েবরাও নিজেরা বাজার করে, আমি স্বচক্ষে দেখেছি।"

বাইরের ঘরে গিয়ে নিরালায় আর চোখের জল রাখতে পারলাম না। কিন্তু অন্য উপায়ই বা কি? আর সারা-দিন ধ'রে গত দু'দিনের মত টো-টো ক'রে খা'ল পেটে ঘুরে বেড়াবার শক্তি নেই। মাথার ভিতরটার দপ্‌দপানিও থামে নি। তা ছাড়া নিজে থেকে সুড় সুড় ক'রে বাড়ী ফেরা? সে যে আরও লজ্জা, --বিশেষতঃ পারুলের কাছে দেশের ও দশের এক জন হবার বড়াই ক'রে আসার পর। অন্ততঃ এখান থেকে আই-এ পাশ না দিয়ে বাড়ীমুখো হওয়া কল্পনাতীত। (দেশের ও দশের এক জন না হয়েও ফেরাটা এখন আর কল্পনাতীত ছিল না!)

টালার হাটে বাজার ক'রে ধামা কাঁধে অতি সঙ্গোপনে সেই ধামাটার আড়ালেই নিজের মুখ ঢেকে ফিরছি, এমন সময়ে একটা মোটর-গাড়ীর সাম্‌নে প'ড়ে গেলাম। মোটর-চালক "গিয়া গিয়া, শালা গিয়া," ব'লে উঠল। আমি তাড়াতাড়ি লাফ দিতে যেতেই ধামাটা মোটরের 'হুডে' ঠেকে প'ড়ে গেল—আমার চক্ষুস্থির! গাড়ীতে স্বয়ং পারুলের মামা! তিনি টালায় জলের কল দেখতে বেরিয়েছিলেন।

"অ্যাঁ! অমূতে যে! এখানে ধামা কাঁধে! এ কি কাণ্ড রে!"…

আমি নিরুত্তর।

"আয়, গাড়ীতে ওঠ।"—

### ১১

বাবা বল্লেন, "কলেজে ঢুক্‌তে না ঢুক্‌তেই মাথা গরম, পরে বি-এ এম-এ পাশ করলে না জানি কি হবে? চেহারাটা একবার আয়নায় দেখেছিস কি? যা এখন হাত-মুখ ধুয়ে কাপড়-চোপড় ছেড়ে এসে দুটো ভাত খা। তার পর দুপুরে সব কথা হবে।"

অনুতপ্ত দাদা তখনই আমার জন্যে একটা আদ্ধির পাঞ্জাবী, একটা রেশমী চাদর ও একটা সাদা কিড্‌স্কিনের জুতো কিনে নিয়ে এলেন।

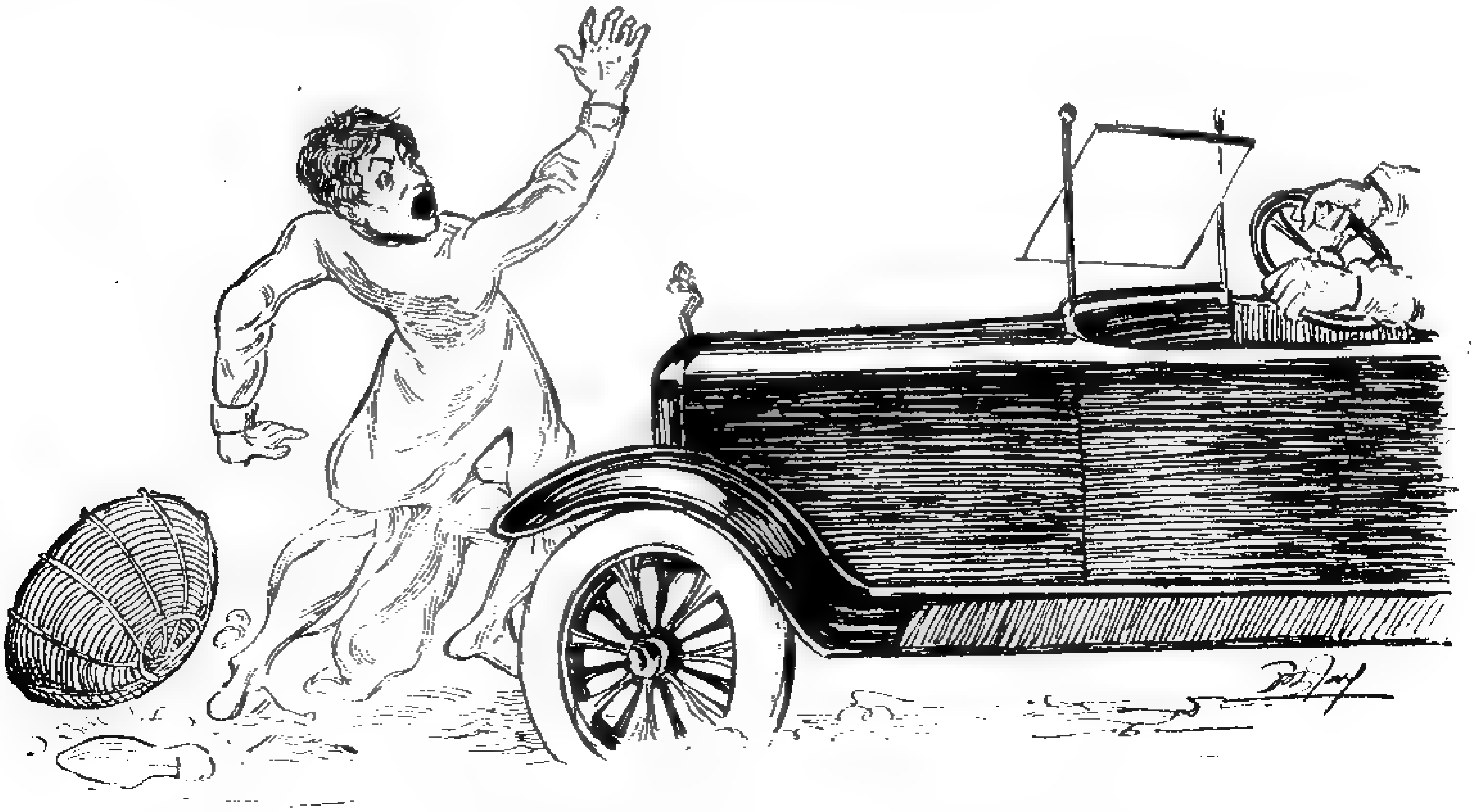

ধামাটা মোটরের হুডে ঠেকে প'ড়ে গেল—আমার চক্ষুস্থির!

"অমিত, আজ বিকেলে আমার মোটরে ক'রে বায়স্কোপ দেখে আয় গে যা।"

## ১২

সেই আদ্দির পাঞ্জাবী চড়িয়ে, রেশমী চাদর উড়িয়ে ও কিডস্কিনের জুতো পায়ে দিয়ে দশ বার টাকার খেল্‌না কিনে সেই দিনই বিকেলবেলা পাঁচটার সময় দাদার মোটরে আসীন হয়ে বায়স্কোপ না গিয়ে বুড়ীকে একটু শিক্ষা দিতে গেলাম।

পুণ্ডরীক লাফিয়ে উঠে বল্‌ল, —"আরে মাষ্টার বাবু যে! এমন বাবু চেহারা? ব্যাপার কি বলুন ত? কোথায় উধাও হয়েছিলেন সমস্ত দিন? মা-মণি ত আপনি তাঁর এক টাকা সাড়ে ন আনা চুরি ক'রে পালিয়েছেন ব'লে সারা বাড়ী মাথায় ক'রে আমাদের শাপমন্তি দিয়ে—"

উঠোন থেকে সেই চিরপরিচিত কাঁসরবিনিন্দিত গলা শোনা গেল; "হ্যাঁ রে পুণ্ডে—কার সঙ্গে কথা কইছিস্ রে, আমার সম্বন্ধে?"

পুণ্ডরীক চোখ বিস্ফারিত ক'রে ফিস্‌-ফিস্ ক'রে বল্‌ল, "সর্ব্বনাশ—মাষ্টার মশায়—মা-মণি যে এখন নীচে নেমে এসেছেন, তা খেয়ালই ছিল না।"

"পুণ্ডে, কে রে? কথা কইছিস্ না যে?"

"আজ্ঞে মা-মণি, মাষ্টার মশায়।"

"অ্যাঁ! ম্যাষ্টের! সেই চোরের সদ্দার! বাজারের ট্যাকা এ দিকে নিয়ে আয় ত।"

আমি গম্ভীরভাবে খোকা-খুকীর জন্যে সেই স্তূপীকৃত খেল্‌না যে সুটকেসের মধ্যে ক'রে নিয়ে এসেছিলাম, সে সুটকেসটা হাতে ক'রে উঠানে গিয়েই দেখি, সাক্ষাৎ চামুণ্ডারূপিণী রাগে গর্‌ গর্‌ করছেন;—"ম্যাষ্টের! এ সব কি ব্যাপার—"

কর্ত্তাবাবু মা'র তীব্রকণ্ঠ শুনে চোখ মুছতে মুছতে হাই তুলে তুড়ি দিতে দিতে বেরিয়ে এলেন। রবিবারের ঘুম কি না।

"কি মা-মণি—হয়েছে কি মা?" এমন সময়ে আমাকে দেখে তিনি একটু থতমত খেয়ে গেলেন।

"কি আবার? তোমাদের আমি ত তখনই পই-পই ক'রে বলেছিনু খোকা যে, চরিত্তির জানা নেই, এমন এক দুর্ভিক্ষির মড়াকে রেখো নি, রেখো নি। তা তোমরা ত শুন্‌লে নি; এখন আমার এক ট্যাকা সাড়ে ন আনার কিনারা—বাছা, ভাল চাও ত ট্যাকা দিয়ে বিদেয় হও। নইলে আমিও কুড়োরাম গুঁইয়ের নাতনী—ছিদাম গুঁইয়ের মেয়ে—"

"মা-মণি! চুপ কর, চুপ কর। দেখছ না, ইনি বড়মানুষের ছেলে। পোষাক দেখছ না? সাম্‌নে প্রকাণ্ড মোটর-গাড়ী।"

সেতারের খুব চড়া পর্দ্দায় বাজাতে বাজাতে হঠাৎ তারের কান আল্‌গা হয়ে গেলে স্বর যেমন মুহূর্ত্তে তীব্র নিখাদ থেকে কোমল রেখাবে নেমে আসে, মা-মণির কানে বড়লোকের ছেলে কথাটি প্রবেশ করামাত্র তাঁহার স্বরও তেমনই অকস্মাৎ মোলায়েম হয়ে এল। তিনি এতক্ষণ রাগের মাথায় আমার বেশ-ভূষার দিকে লক্ষ্য করবার ফুরসৎ পান নি। এখন থতমত খেয়ে আমার আপাদ-মস্তক পর্য্যবেক্ষণ করতে ব্রতী হলেন।

"ও মা! তাই ত গা!—এই কি সকালবেলাকার ম্যাষ্টার না কি গা? আমি ছাই বুড়োমানুষ—চোখেও কি ভালো দেখতে পাই?"

আমি হাসি চেপে বল্‌লাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি সেই সকালবেলাকার খোকা-খুকীর মাষ্টারই বটে—তাতে ভুল নেই। এখন এই নিন আপনার বাজারের দরুণ এক টাকা সাড়ে ন আনা, আর এই নিন খোকা-খুকীর জন্যে যৎসামান্য কিছু খেল্‌না।"

ব'লে হাতের 'সুটকেস'টা থেকে স্তূপাকৃতি ক'রে দশ বার টাকার খেল্‌না উজাড় ক'রে দিলাম।

মা-মণি এবার ফ্যাল-ফ্যাল ক'রে আমার দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন, "তবে তোমাকে তোমার সৎমার যন্ত্রণায় ঘর-ছাড়া হ'তে হওয়া-টওয়া—"

আমি এবার একটু লজ্জিত হয়ে মুখ নীচু ক'রে বল্‌লাম, "মাপ করবেন—সব মিথ্যে। মা মারা যাওয়ার পর বাবা আর বিয়েও করেন নি—তাঁর নাম কালিদাস দত্তও নয়। তাঁর নাম শ্রীপ্রফুল্লকুমার লাহিড়ী—তিনি এখন আলিপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট।"

মা-মণি ও কর্ত্তাবাবু। অ্যাঁ, ম্যাজিষ্টরের ছেলে তুমি?

কি ছেলে বাছা তুমি ? তুমি দেখছি সব করতে পার—ম্যাজিষ্টর—"

কর্ত্তাবাবু। আপনি প্রফুল্ল লাহিড়ী মশায়ের ছেলে ?

আমি হাসি চাপতে না পেরে বল্লাম, "আজ্ঞে হাঁ। কেন ? আপনি কি তাঁকে চেনেন ?"

কর্ত্তাবাবু বিদ্যুদ্বেগে এসে আমার পা জড়িয়ে ধরলেন। "আমরা বদ্যি—আপনারা বেরাহ্মণ—মহাপাপ হয়ে গেছে। লাহিড়ী মশায়কে এ কথা বল্‌বেন না, দোহাই আপনার। আমি—"

"আহা হা ! করেন কি ? করেন কি ? আপনারা ত আর জেনে কিছু করেন নি। তা ছাড়া বাবাকে বল্‌লেই বা ক্ষতি কি ? তাঁর সঙ্গে কি আপনার আলাপ আছে না কি ?"

কর্ত্তাবাবু কাঁদ কাঁদ সুরে বল্লেন, "আজ্ঞে—আমি যে তাঁরই নাজীর।"

মা-মণি এবার ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠলেন, "ও মা রক্ষে-কালী, রক্ষে কর মা। কি হবে গো ? আমি তাই পরাণেকে তখনই বলেছিনু—ছেলেটির চেহারা বড় ভদ্দর রে—ছেঁড়া কাপড় দেখে বেবজ্ঞা করিস্ নি—বেবজ্ঞা করিস্ নি। তা পরাণেটা কি শুন্‌ল ? ভালমানুষের পো'কে বাজারে পাঠাল তবে ছাড়ল। অমন রাজপুত্‌্রের মতন নধর কান্তি কি ম্যাষ্টেরের হয় গো ? না, যে আমি কুড়োরাম শুঁইয়ের নাতনী, ছিদাম শুঁইয়ের মেয়ে সে আমার ভুল হয় ? আমি মানুষ চিনি নি ? আর, বড়ঘরের ছেলে যে শিকারী বেড়াল গো—গোঁফ দেখলে চেনা যায়—তখনই বলেছিনু..."

১৩

সন্ধ্যাবেলা পারুলকে সব কথা খুলে বল্লাম। সে মুখে কাপড় দিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে গড়িয়ে পড়ল।—"ধন্যি ছেলে তুমি !"

নবোদ্ভিন্ন গুম্ফদেশে যথাসাধ্য চাড়া দিয়ে বিজ্ঞভাবে হেসে বল্লাম, "এখন থেকে সমীহ ক'রে কথা কোয়ো। বুঝলে ত ? প্রিন্সিপলের জন্যে কষ্ট স্বীকার—সাধে কি সেক্ষপীয়র বলেছেন, 'The child is the father of man !' জানো ত পিসীমা সর্ব্বদাই বলেন—ও ছেলে সামান্যি নয়—কেবল তোমাদের কপালে বাঁচলে হয়।"

শ্রীদিলীপকুমার রায়।

# বর্ষার মাঠে

ছোট্ট একখান ডিঙী নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম কাল বিকেলে
বর্ষা-ভরা পল্লী-মাঠের মাঝে,—
পরাণ আমার প্রজাপতির মতই পুলক-পক্ষ মেলে'
কাঁপতে লাগল বুকের কাছে !

আউস আমন ধানের গাছের দু'টি সবুজ পাশাপাশি
জড়িয়ে আছে দু'টি ভাইয়ের মত,
পড়েছে তার ওপর স্নিগ্ধ দিবস-শেষের আলোক আসি'—
মায়ের চোখের দৃষ্টি স্নেহ-নত !

ধানের গাছের ফাঁকে ফাঁকে বিচিত্র-রঙ ফড়িংগুলি
আস্‌ছে যাচ্ছে—বস্‌ছে পাতার ডগায়,
শিশুর রঙীন হর্ষ হেন !···মাঝে মাঝে মুখটি তুলি'
'পানকৌড়ি'রা আবার সে মুখ লুকায়।

দিকের কণ্ঠে মালার মত বকের শ্রেণী দুল্‌ছে দূরে,
হোথায় কুমুদ-সম্ভাবনা 'নালে,'
একটা পান্‌সীর করটা দাঁড়ী গাচ্ছে 'সারি' মধুর সুরে,
বুড়ো মাঝি শুন্‌ছে ব'সে হালে।

হাট-ফেরতা মানুষরা সব ফির্‌ছে ছোট-বড় 'না'য়ে
নানান্ কথাবার্ত্তা-কোলাহলে,
তারি মাঝে নীরব আমি মুগ্ধ—মৌন সাঝের ছায়ে,
তারি মাঝে আমার ডিঙা চলে !

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী।

# 'বরষা'র কবিকুঞ্জ

## বাদল

১

সিক্ত মাটীর গন্ধে, আজিকে, ভরেছে সজল হাওয়া
সুনীল আকাশ কাজল মেঘের উত্তরী দিয়ে ছাওয়া।
নদী কূলে কূলে মাথা তুলে কেয়া ;
জলস্রোতে যেন দুলে উঠে খেয়া,
গ্রাম পথে পথে থেমে গেছে আজ পথিকের আসা-যাওয়া.
সিক্ত মাটীর গন্ধে, আজিকে, ভরেছে সজল হাওয়া।

২

বর্ষায় স্নাতা রজনীগন্ধা উঠিয়াছে মাথা তুলে,
ভুঁইচাঁপা আজ বাহির হয়েছে ভূমি-কারাগার খুলে।
ঝরিছে বরষাসিক্ত বকুল,
চামেলির বন পুলকে আকুল,
সোনার কাঠির পরশনে গেছে, সুপ্তির দ্বার খুলে,
কুঞ্জের মাঝে হেনা-মঞ্জরী বায়ে সঞ্চরি দুলে।

৩

মালতী লতাটি কাহারে বন্দে ঝরায়ে পুষ্পরাজি ?
কাহার হাতের একতারাখানি ছন্দে উঠেছে বাজি ?
তাই শুনি আজি সারাদিন ভর,
বাদল ঝরিছে ঝর্-ঝর্-ঝর্,
নূপুর বাজিছে বিরহ-কাতর—বাদল এসেছে আজি।

শ্রীলীলা মিত্র।

## বর্ষায়

বর্ষায় যবে ঝর্-ঝর্ ধারা
দিগ্ দিগন্ত ছায়,
সিক্ত শাখীর অঞ্চল-তলে
পল্লী লুকায় কায় ;
বিরহ দীর্ঘ দিনগুলি মোর
তোমার চরণ-তলে,
ছুটে যায় দেবী জীবনে মরণে
শরণ লভিবে ব'লে ;
ক্লান্ত ব্যাকুল সিক্ত পরাণে
কার পথ চেয়ে থাকি,
চঞ্চল কার মঞ্জীরতলে
জুড়ায় শ্রবণ আঁখি।

রোজী।

## বর্ষাগমে

হেরিনু দাঁড়ায়ে বর্ষা কালিন্দীর তীরে—
প্রাবৃট ঘনায় দূর নভো-বৃন্দাবনে।
সিক্ত হ'ল শ্যাম গোষ্ঠ সুশীতল নীরে—
উঠিল বিপুল হর্ষ রক্ত-গুঞ্জা-বনে।
কদম্বের গন্ধ-ভরা বনবীথি-তল
ব্যাকুল বাতাস বহে বিটপি-কম্পনে
কলাপে ঝঙ্কারে শিখী দিবা ঝলমল।
সুদূর নিরালা হ'তে বাঁশী যেন স্বনে।
চলিয়াছে বিরহিণী তাই অভিসারে
কুমুদ-কহ্লারে ডালি সাজায়ে মোহন,
বিরহ ডুবিবে আজ মিলনাশ্রু-ধারে—
হর্ষ-উচ্ছলিতা রমা কুঞ্জ-নিকেতন।
মোহিত হইয়ে আমি চেয়ে থাকি দূর—
বাজিছে শ্রবণে চির-মিলনের সুর।

শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

## জীর্ণ দীঘি

পুরান দীঘিটি দেহখানি তার ভরিয়া গিয়াছে পাঁকে,
চারি পাশ দিয়ে ঘুরে মরে নিছে মাছরাঙা ঝাঁকে ঝাঁকে।
মৎস্যলোলুপ পল্লী-বালক বারে বারে যায় ফিরে,
অকেজো লতায় ভাঙা ঘাটটিরে ক্রমে ফেলিতেছে ঘিরে ;
দূর অতীতের পুরাতন স্মৃতি কত হাসা কত কাঁদা,
দীঘিটির জলে মিশায়ে রয়েছে কত না বিষাদ-গাথা।
মাথার আঁচল কত গরবীর ঢেউগুলি গেছে ছুঁয়ে,
সিক্ত দেহের ফোঁটা ফোঁটা জলে ঘাটখানি গেছে ধুয়ে।
ভরা কলসীর দাগগুলি আজো ধাপে ধাপে আছে জেগে,
ফাটলের ফাঁকে আল্তার রেখা আর ত রহে না লেগে।
দীঘিধার হ'তে ছায়া-ঘেরা বীথি আকুল কলসী-জলে,
পল্লী-বধূরা মুখর্ করে না বারির ছলাৎছলে।
নিদাঘে তপ্ত বিদেশী পান্থ কত দিন পথ ভুলে,
ক্লান্ত-হৃদয়ে শান্তি লভেছে দীঘি-ঘাটে ছায়া-মূলে।
অতীত কীর্ত্তি ডুবিয়া গিয়াছে লুপ্তির পারাবারে,
জীর্ণ দীঘির বুকখানি শুধু ভ'রে আছে হাহাকারে।
সব সম্পদ্ হেলায় বিলায়ে দীন করি আপনারে,
গাঁয়ের দীঘিটি দাঁড়ায়েছে আজি মরণ-নদীর ধারে।

শ্রীসতীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী।

## বাদল বেলায়

বাদল মেঘে শুনি তোমারি গরজন,
বাদল মেঘে হেরি তোমারি তরজন।
বাদল দিনে আজি লুণ্ঠিত ফুলবালা,
ছিঁড়িয়া ফেলে কেঁদে কুসুম গল-মালা।
বিটপী পানে চাহি—ঝরিছে নয়ন বাহি'
জলধারা,—পড়ে মনে অশ্রু-বরষণ।

বাদল গগনেতে চপলা ঝিলিমিলি,
মনে লয় নিতি দোঁহে থাকি নিরিবিলি,
সুখ-দুখ-কথা, বলিব মরম-ব্যথা,
লভিব দোঁহে মিলি দোঁহার পরশন।

নিবিড় হেরি আজি বসুন্ধরা সজলা,
হেরিয়ে জলধরে চিত্ত মম উতলা,
ঘন-কেশরাশি,—জাগিছে অধর-হাসি,
লভিতে বাসনা জাগে মুখ-দরশন।

শ্রীললিত।

## আষাঢ়ের প্রথম দিন

বর্ষাঋতুর প্রথম দিনে নির্ব্বাসিতের মর্ম্ম-ব্যথা,
জাগিয়ে গেল পূর্ব্ব-স্মৃতি অতীতের সে দুঃখ-কথা।
আজ আষাঢ়ের প্রথম দিবস—কালিদাসের কাব্য-দিন ;
যক্ষসাথে মিলিয়ে সুর ডাক্‌ল প্রিয়ার কণ্ঠ ক্ষীণ।

এম্‌নি দিনে জলদ ভরা আকাশ-মাঝে তাকিয়ে দেখে,
দৈন্যভরা ভগ্ন-মনে কালো মেঘে বল্‌লে ডেকে,—
'যাও গো প্রিয় বন্ধু আমার, দূতরূপে সেই হর্ম্যপুরে,
যেথায় আমার প্রিয়তমা কাঁদ্‌ছে সদা করুণ-স্বরে,
স্মৃতির আলো বক্ষে ধরি' চক্ষে পড়ে জলের ধারা,
কত আশায় মনকে বেঁধে রাখছে চেপে প্রাণের সাড়া ;
সেথায় গিয়ে বল গে দূত ! আমার প্রাণের গোপন-ধ্বনি,
চম্‌কে যেন ওঠে না সে প্রিয়তমের দুঃখ শুনি'।'

সার্দ্ধ হাজার বছর গেছে অতীত মাঝে চিহ্ন দেগে,
কবি চিরনিদ্রাগত—কাব্য তাহার আছে জেগে !
বাদল ধারার সঘন পাতে আজও মোদের মনে পড়ে,
যক্ষজনের মর্ম্মবাণী ক্ষীণস্বরে ওই পড়ছে ঝরে'।
সৌদামিনী চমক্ হানি' মেঘ বিদারি ছুটে যায়,—
মনে ভাবি ওই বুঝি দূত চল্‌ল যক্ষ-প্রিয়ার পায় :
শব্দ শুনি মনে করি সইতে বুঝি পারল না আর,
প্রিয়তমের দুঃখ শুনি দীর্ণ হ'ল বক্ষ তার।
বর্ষাকালের বৃষ্টিপাতে বদ্ধজীবের রুদ্ধ মন,
কি যেন সে খুঁজে বেড়ায় গুমরে মরে সারাক্ষণ ;
প্রিয়জনের করুণ অভাব জাগিয়ে দেয় যে বিয়োগ-গান,
পবিত্র এই বর্ষা ঋতু ভগবানের শ্রেষ্ঠ দান।

শ্রীঅমলকুমার চট্টোপাধ্যায়, পুরাণরত্ন।

## বর্ষায়

গাঢ় বেদনার মত গগনে ঘনায় মেঘ
নয়ন ছাপায়ে ঝরে বারি,
হৃদে মোর দুরু-দুরু কম্পিত কি আবেগ
চাপিয়া রাখিতে নাহি পারি।

কেতকী সুবাস মাখি ছুটে আসে বেণু-বনে
সিক্ত ব্যাকুল পূবে হাওয়া,—
প্রাণে মোর কত ব্যথা দেয়, দোলা অকারণে—
অবিরাম করে আসা-যাওয়া ;

বিরহী এ হিয়াখানি আশায় চাহিয়া থাকে
কোন্ সে সুদূর পথপানে,
যেথায় অজানা প্রিয়া নাম ধরি' ডাকে তাকে
—ঠিকানা তাহার নাহি জানে।

তাহারি করুণ আঁখি নিবিড় হইয়া আসে
মেঘের নিবিড় নীলিমায়,
তাহারি বিরহ-ব্যথা পবনে গুমরি ভাসে,
মোর তরে কেঁদে ফেরে হায় !

কামনার ফুলসাজে পরাণ আমার আজি
সাজিয়া চলিল অভিসারে,
লঙ্ঘিয়া হ্রদ-নদী শত প্রান্তর-রাজি
বনগিরি পর্ব্বত পারে।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

## ছলনা

ওগো, একটিবার বল না !
কেন তুমি দিন-রজনী
আমায় কর ছলনা !
তোমার মুখের মধু হাসি
দেখ্‌ব ব'লে কাছে আসি,
কুণ্ঠিত ওই ঘোম্‌টাখানি
খুলেও তুমি খোল না !—
দেখি দেখি এই দেখি নে—
নিতুই এ কি ছলনা !

মর্ম্ম-কথা কইতে গিয়ে
গোপন কর সব কথা—
সদাই কেন ছলায় হেন
প্রাণে আমার দাও ব্যথা ?
বুঝতে নারি তোমার ছলা,
প্রেমিক জনে মিছে বলা—
খেল্‌ছ সদা এ কোন্ খেলা
লো কুহকী ললনা !
এবার কেন ছলা ভুলে
সরল পথে চল না !

শ্রীসত্যপ্রিয় গুহ।

# ত্রিবেণী

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পালবংশীয় গৌড়াধিপ নরপালের পুত্র তৃতীয় বিগ্রহ পাল যখন জন্মগ্রহণ করেন, দেখিবার আগ্রহে সজ্জনগণ তাঁহাকে যেন লোচনপুটে পান করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। "শত্রুকুল-কালরুদ্র" প্রভৃতি বাক্যেও তাঁহাকে বিশেষ প্রতাপশালী বলিয়াই জানা যায়।

"পীতঃ সজ্জন-লোচনৈঃ স্মররিপোঃ পূজানুরক্তঃ সদা,
সংগ্রামে চতুরোঽধিকঞ্চ হরিতঃ কালে কুলে বিদ্বিষাম্।
চাতুর্বর্ণ্য-সমাশ্রয়ঃ সিতযশঃপুঞ্জৈর্জগদ্রঞ্জয়ন্
শ্রীমদ্ বিগ্রহপালদেবনৃপতির্জজ্ঞে ততো ধামভৃৎ॥"

তাঁহার শুভ্র যশঃপ্রভায় জগৎকে তিনি সুরঞ্জিত করিয়াছিলেন এবং চন্দনবারি সুশীতল করিয়া রাখিয়াছিলেন।

রাজ্যারোহণের অল্পকাল পরেই তাঁহার পিতার পুরাতন শত্রু চেদিরাজ কর্ণের সহিত তাঁহার যুদ্ধ বাধে। কর্ণের পূর্ব্বতন গৌরবোজ্জ্বল দিন এখন চলিয়া গিয়াছে। তাঁহার পূর্ব্বতন পরাজিত শত্রুগণ—পাণ্ড্য, চোল, মুরল, কুঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, কীর, হুণ,, গুর্জ্জর, গৌড় প্রভৃতি সকলেই একে একে বা একসঙ্গে মিলিত হইয়া পূর্ব্ব-পরাজয়ের প্রতিশোধ লইতেছিল।

পালশক্তির নিকট পরাজিত হইয়া কর্ণরাজ সন্ধি প্রার্থনা করিলেন ও বিগ্রহপালের হস্তে নিজ কন্যা যৌবনশ্রীকে সম্প্রদান করিয়া নিষ্কৃতি পাইলেন। এই মাহিষী মহারাজাধিরাজ বিগ্রহপাল দেবের দ্বিতীয়া মহিষী। ইনি পট্টমহাদেবী নহেন। কারণ, ইঁহাকে বিবাহ করিবার পূর্ব্বে তিনি রাষ্ট্রকূট-রাজবংশীয়া মদনদেবের ভগিনী ভাগ্যদেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ভাগ্যদেবী সপত্নীকে পরম স্নেহে গ্রহণ করিলেন।

কিন্তু অল্পদিন পরেই মহাদেবী বুঝিলেন, নামে ভাগ্যদেবী হইলেও কার্য্যতঃ সৌভাগ্য তাঁহার সপত্নীকেই আশ্রয় করিয়াছে। বর্ষমধ্যে পুত্রবতী হইয়া যৌবনশ্রী ভবিষ্যৎ রাজমাতা ও পতির সোহাগিনী পত্নী হইয়া বসিলেন, নামে পট্টমহিষী হইলেও ভাগ্যদেবীই দুর্ভাগা স্ত্রীরূপে গৃহশোভার উপকরণমাত্র হইয়া থাকিলেন।

যৌবনশ্রীর পুত্র মহীপালের বয়স যখন আট বৎসর, তখন ভাগ্যবতীর গর্ভে একে একে সুরপাল ও তাহার চারি বৎসর পরে রামপালের জন্ম হইল। সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্ত সুন্দর শিশু! পুত্রমুখ দেখিয়া নৃপতি গোপনে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। মনে মনে বলিলেন, "হে সুগত! ইহাকেই কেন তুমি প্রথমে পাঠাইলে না!"

প্রিয়তমা যৌবনশ্রীকে ভয় করিলেও মনের মধ্যে বিগ্রহপালদেব সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি ভাগ্যদেবীকে শ্রদ্ধা করিতেন। বিশেষতঃ শৈশবাবধি মাতৃ দ্বারা প্রশ্রয় প্রাপ্ত মহীপালের ঔদ্ধত্য ও যথেচ্ছাচারে তিনি তাহার প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। অথচ প্রেয়সীর গঞ্জনা-ভয়ে মুখ ফুটিয়া তাহাকে কিছু বলিবারও উপায় নাই। যথাকালে মহীপালদেব যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন ও তাঁহার অনতিক্রান্ত কৈশোরেই তাঁহার সহিত কর্ণাট-রাজকন্যা লজ্জাদেবীর শুভ পরিণয়ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল। ইতোমধ্যেই রামপালজননী ভাগ্যদেবীর মৃত্যু ঘটিয়াছিল।

বধূ লজ্জাদেবী শ্বশুরালয়ে আসিয়া সর্ব্বপ্রথম তাঁহার এই মাতৃহীন বালক দেবরটির প্রতি একান্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। বয়সে তিনিও তখন বালিকা। সুরপাল রামপাল অপেক্ষা চারি বৎসর মাত্র বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেও প্রকৃতির বিভিন্নতা বশতঃ তিনি রামপালের ন্যায় জনপ্রিয় ও আনন্দময় প্রকৃতিসম্পন্ন ছিলেন না। শৌর্য্যে, বীর্য্যে,

বিদ্যাবত্তায় প্রভূত উন্নতিশীল থাকিয়াও রামপালদেব নিজের মধুর স্বভাবগুণে ইতর ভদ্র সকলেরই অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। রাজবধূ লজ্জাও তাঁহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে স্নেহ করিয়া বসিলেন। অবশ্য রামপালের বিমাতা বধূকে এ কার্য্যে যথেষ্ট বাধা প্রদান করিয়াছিলেন, বধূর কার্য্যে রামপাল তাঁহার সমধিক বিরাগভাজনই হইলেন, তথাপি ভ্রাতৃস্নেহ-বুভুক্ষিতা লজ্জাদেবী যে অনাস্বাদিত স্নেহের স্বাদ এই ভ্রাতৃপ্রতিম বালকের প্রতি ভালবাসায় লাভ করিয়াছিলেন, তাহাকে বিস্মৃত হইতে পারিলেন না। মহাদেবী যৌবনশ্রীর বিরাগভাগিনী হইয়াও গোপনে গোপনে ঐ সুদর্শন বালক দেবরটিকে নিজের স্নেহচ্ছায়ায় বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন।

যুবরাজ মহীপালদেব প্রথমাবধিই লজ্জাদেবীর প্রতি অনুরক্ত হইতে পারেন নাই। এই কর্ণাট-কুমারীটি তাঁহার পিতৃগৃহ হইতে যে উচ্চশিক্ষা ও মহাপ্রাণতা লইয়া তাঁহাদের মাতা-পুত্রের সঙ্কীর্ণতার মাঝখানে সমাগতা হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাদের অন্তরের কালিমা দিয়া ইঁহার দিকের আলোক-শিখাকে ইঁহারা নিয়তই আড়াল করিয়া রাখিতে চাহিতেন এবং যেটুকুকে পারিতেন না, সেই তীক্ষ্ণ তীব্র অথচ কোমল রশ্মিচ্ছটায় নিজেদের মনের কালো যখনই কয়লার রঙে ফুটিয়া বাহির হইত, তখনই ঐ আলোকশিখাটারই পরে তাঁহাদের মনের জ্বালা ধরিয়া যাইত। যৌবনশ্রী এই বধূর প্রতি বিতৃষ্ণায় তাহার নামে তাঁহার উচ্ছৃঙ্খল ছেলের কাছে লাগাইতে ছাড়িতেন না এবং স্বেচ্ছাপ্রণোদিতা হইয়া ছেলেকে নর্ত্তকী বিদ্যুৎমালার সাহচর্য্যে সময়ক্ষেপ করিতে উৎসাহিত করিয়া বধূর প্রতি শত্রুতাসাধন করিতেন।

লজ্জা গোপনে তাঁহার অন্তরের গভীর বেদনায় ভরা দুই বিন্দু অশ্রু নীরবে মুছিয়া ফেলিতেন, কিন্তু কার্য্যতঃ তাঁহার সেই স্থির-ধীর গাম্ভীর্য্যময় ভাব ও অটুট কর্ত্তব্যপরায়ণতার এতটুকু ব্যতিক্রম ঘটিতে কোন অবস্থাতেই দেখা যাইত না। স্বামীর অনাদর ও শ্বশ্রূর স্নেহহীনতায় মনের ভিতর তাঁহার যতই যাহা হউক, বাহিরে সেই একই প্রশান্ত গম্ভীর অথচ সহজ সানন্দ ভাব।

কর্ণাট-কন্যা বৈদিকধর্ম্মমার্গপরায়ণা। শ্বশুর বিগ্রহপাল নিজে সৌগত হইলেও তাঁহার রাজ্যে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের দৃষ্টান্তে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ও জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে ধর্ম্মচর্য্যায় কাহাকেও বাধা দিতেন না। নব-বধূও সেইমত নিজ উপাস্যদেবতার আরাধনায় অধিকারিণী হইয়াছিলেন। শুধু তাহাই নয়, মহারাজাধিরাজ ইঁহার পূজার জন্য অন্তঃপুর-সান্নিধ্যে একটি দেবালয়ও নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন।

এক দিন শান্ত নির্ম্মল প্রভাতে লজ্জাদেবী পূজাগৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, কুমার রামপাল একগাছি অম্লান পুষ্পমাল্য লইয়া কাহার প্রতীক্ষায় উৎসুক হইয়া চাহিয়া আছেন। তাঁহার সুন্দর সুগৌর মুখখানি যেন ঈষৎ শঙ্কিতভাবাপন্ন, তাঁহার উজ্জ্বল আয়ত নেত্র দুইটিতে সংশয়ের ঘন ছায়া। লোহিতালোক-মণ্ডিত বাল-সূর্য্যের প্রদীপ্তাভায় বালসূর্য্যেরই মত তাঁহাকে সুন্দরতম দেখাইতেছিল। লজ্জাদেবীকে দেখিয়া বালক ছুটিয়া কাছে আসিল—

“দেখুন, আমি কেমন সুন্দর মালা গেঁথেছি।” তাহার পর ঈষৎ স্বর নামাইয়া বলিল, “আমার মালা কি আপনার ঠাকুর নেবেন না? দিলে কিছু দোষ হবে কি?”

লজ্জাদেবী এই প্রশ্নে ঈষৎ বিস্মিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “দোষ হবে কেন?”

ক্ষণমাত্র ইতস্ততঃ করিয়া রামপাল উত্তর করিলেন, “আমি যে সৌগত।”

লজ্জাদেবী স্মিতহাস্যে বালকের মাথায় হাত রাখিয়া মৃদুহাস্যের সহিত কহিলেন, “তাহাতে কিছু দোষ হয় না। সুগতও দেবাবতার।”

রামপাল এবার বধূরাণীর খুব কাছে ঘেঁষিয়া আসিয়া একবার ইতস্ততঃ চাহিয়া দেখিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, “আপনার ঠাকুরের মাথায় দিয়ে ঐ মালাটা আপনি দাদার গলায় পরিয়ে দিবেন, তা হ'লে দাদা আপনাকে ভালবাসবে। কাল আমি মহামন্ত্রীর বাড়ী গেছলুম, সেখানে এক জন পণ্ডিত বলছিলেন, দেবতার অনুগ্রহ হ'লে সর্ব্বকার্য্যই সিদ্ধ হয়।”

এই কথা চুপি চুপি বলিয়া মালাগাছি হাতে দিয়াই রামপাল ছুটিয়া পলাইয়া গেলেন। আর রাজবধূ, যুবরাজ্ঞী লজ্জাদেবী—তিনি তাঁহার পরম স্নেহাস্পদ বালকটির তাঁহার প্রতি এই প্রগাঢ় ভালবাসার অপূর্ব্ব পরিচয়ে যেন

বিস্ময়বিহ্বলতায় কিছুক্ষণের জন্য স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন এবং দেখিতে দেখিতে তাহার পর তাঁহার চক্ষু হইতে হঠাৎ দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

যদিও এই দেব-প্রসাদী ফুলের মালা লজ্জা তাঁহার দুর্ল্লভদর্শন স্বামীর গলায় পরাইবার অবসর খুঁজিয়া না পাওয়াতে তাহা তাঁহার শয়ন-গৃহের প্রাচীরবক্ষে দুলিয়া দুলিয়া শুকাইয়া গেল, কিন্তু এই শুভমুহূর্ত্তটুকুকে তিনি কোন দিনই আর ভুলিতে পারিলেন না। সেই ক্ষুদ্র হৃদয়ের একান্ত শুভেচ্ছাটুকু যেন একটি অচ্ছেদ্য নিবিড় বন্ধন হইয়া তাহাদের দেবর-ভ্রাতৃজায়ার সম্বন্ধটিকে এমনই মধুরতর ও দৃঢ় করিয়া তুলিল যে, মহাদেবী যৌবনশ্রী তাহা দেখিয়া হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়া উঠিলেন; এমন কি, তাঁহার মরণকালেও সুখ হইল না।

এই সময় সহসা মহারাজাধিরাজের মৃত্যু হইল। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি মহামাত্যকে ডাকাইয়া তাঁহার হস্তে সুরপালকে সঁপিয়া দিয়া বলিলেন, "এর ভাল-মন্দ তুমি দেখ।" লজ্জাদেবীকে ডাকিয়া কহিলেন, "মা! রামুকে আমি তোমায় দিলাম।"

মহীপাল গৌড়রাজ্যের সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াই সুরপালকে মগধে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, রামপালকেও সুরপালের সঙ্গে রাজধানী হইতে দূরবর্ত্তী করিয়া দিবেন, কিন্তু তাহা সম্ভব হইল না। মহাদেবী ইহার বিরোধী হইয়া বলিলেন, "রামপালের পাঠ সমাধা না হইলে সে কোথাও যাইবে না।"

স্বামি-স্ত্রীতে এই লইয়া বেশ একটুখানি কথা-কাটাকাটি হইয়া গেল। মহীপাল যখন কোনমতেই স্ত্রীকে রামপালের বিরুদ্ধে লওয়াইতে সমর্থ হইলেন না, তখন রোষভরে তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "তা হ'লে তুমি ওকে নিয়েই থাক, আমায় আর কখনও কিন্তু চেও না।"

বিষাদ-গম্ভীর মুখ সুধীরে উত্তোলন পূর্ব্বক ধীর শান্ত-কণ্ঠে লজ্জাদেবী ধীরে ধীরে কহিলেন, "আপনাকে ত আমি চেয়েও কোন দিন পাই নি। আপনি ত তা জানেন।"

মহীপালের ললাট বিরক্তির কুঞ্চনে কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। নেত্রে তাঁহার ব্যঙ্গের আভাস দেখা দিল। তিনি কহিলেন, "ওঃ, তারই জন্য বুঝি আমার পরম শত্রুর পদতলে আত্মসমর্পণ ক'রে আমার উপর প্রতিশোধ নেওয়া হচ্ছে!"

এই বলিয়াই তিনি রুষ্ট-বিদ্রূপে তাঁহার দিকে চাহিয়া ঈর্ষা-কুটিল হাস্য করিলেন।

এত বড় পরীবাদেও মহাদেবীর এতটুকু চাঞ্চল্য দেখা গেল না, তিনি যথাপূর্ব্ব অবিচলিত স্নিগ্ধ-গম্ভীর ধীর-কণ্ঠে প্রত্যুত্তর করিলেন, "রাজাধিরাজ! আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, এই দুইটা কথাই আপনার একান্ত ভিত্তিহীন।"

মহীপালের মুখ ক্রোধারক্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু তিনিও আত্মদমন করিলেন; বলিলেন, "কোন্ কথা আমার ভিত্তিহীন?"

লজ্জাদেবী কহিলেন, "মহাকুমার রামপালদেব আপনার পরম শত্রু নহেন এবং আমিও যে সেই পুত্রবৎ স্নেহাস্পদ বালকের চরণে আত্মসমর্পণ করি নাই, এ দুইটাই আপনার অবিদিত নয়।"

মহীপালের গর্ব্বিত চিত্ত এই অনবনত অথচ শান্ত, তেজস্বী অথচ অচঞ্চল নারীচিত্তের সমাহিত অথচ অকাট্য-যুক্তিপূর্ণ কথায় নিজেকে অত্যন্ত অবমানিত বোধ করিতেছিল, তিনি ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া জলদ-গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "মহাদেবি! কি বলিব, তুমি স্ত্রীলোক এবং আমার স্ত্রী, নতুবা রামপাল আমার শত্রু নয়, এ কথা অন্য কেহ উচ্চারণ করিলে আমি তার জিভ কেটে আর কপালে তপ্ত লৌহ দ্বারা 'মিথ্যাবাদী' এই ছাপ অঙ্কিত ক'রে দিতাম। রামপাল আমার পরম শত্রু। সাম্রাজ্য শুদ্ধ লোক তারই পক্ষপাতী কেন? তার কুটিল ষড়যন্ত্রে। তার গভীর দুরভিসন্ধির ফলে। সে এতটুকু সুযোগ পেলেই কোন্ দিন সিংহাসন অধিকার ক'রে বসবে। আর তাতে তুমিই তাকে সাহায্য কচ্ছো? জেনে রেখ, আমি যদি তাকে না মারি, সে আমায় মারবে।"

লজ্জাদেবী সহসা কম্পিতকণ্ঠে বাধা দিলেন, "মহারাজাধিরাজ!"

মহীপাল তাঁহার সেই আর্ত্ত-কাতরতায় ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়াই ক্রূরকণ্ঠে নির্দ্দয়ভাবে কহিলেন, "হয় স্বামীর ছিন্ন শির, না হয় প্রিয়বন্ধুর, কোন্‌টা তোমার সহনীয় হবে বোধ কর, বিবেচনা ক'রে দেখ।"

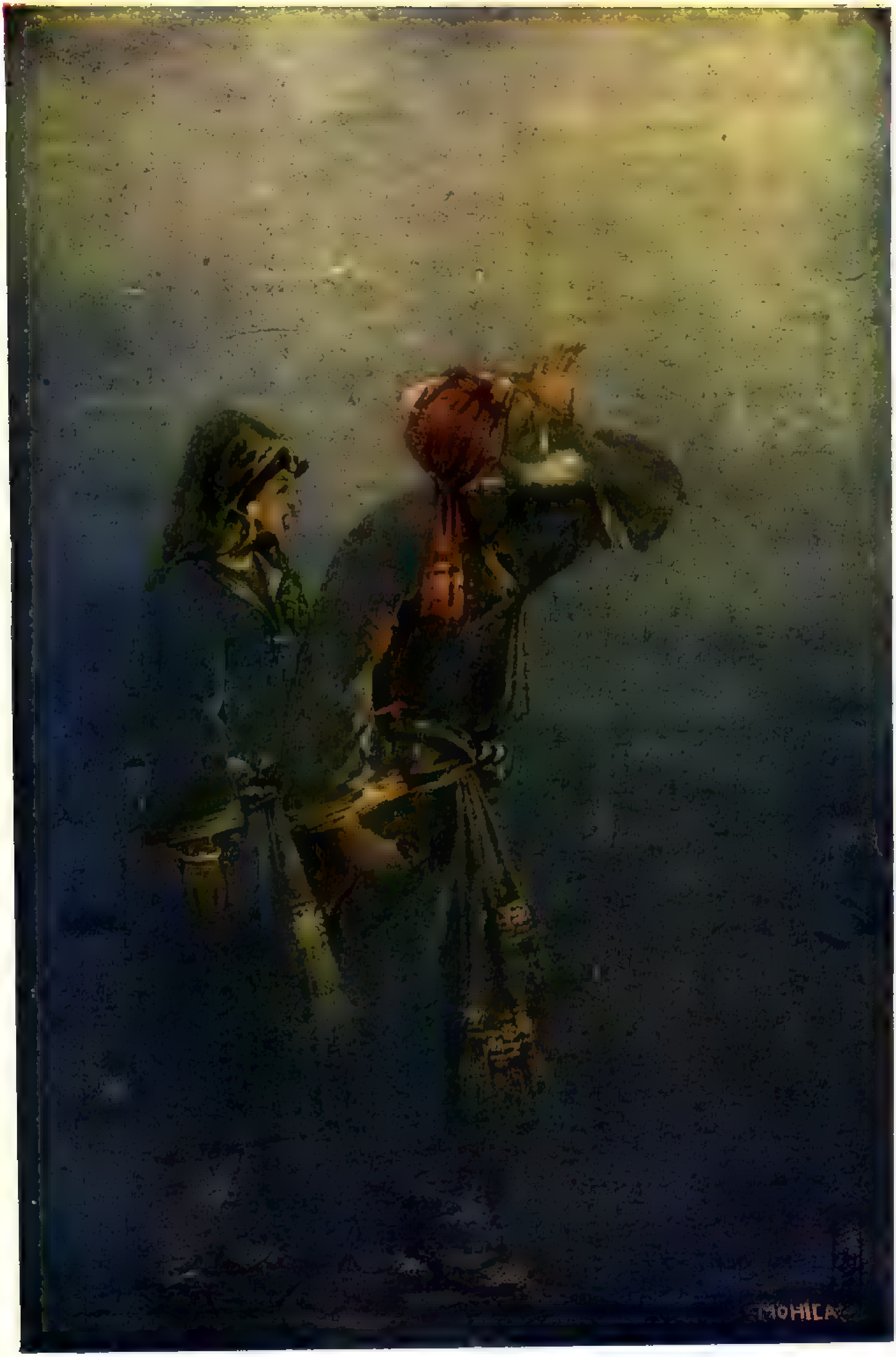

"তিমির পথের যাত্রী মোরা দীপ্ত আশার রশ্মি কই ?
মর্ত্ত্যে হ'য়ে লক্ষ্যহারা—স্বর্গ পানে তাকিয়ে রই ।"

ওমর খৈয়াম ] [ শিল্পী—শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ দস্তিদার ।

রক্তনেত্রে স্তব্ধ অসাড় নতনেত্রা নারীমূর্ত্তির প্রতি বারেক তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া মহারাজাধিরাজ পরম ভট্টারক মহীপালদেব সগর্ব্ব পাদক্ষেপে প্রস্থান করিলেন।

স্বামী পত্নীসম্ভাষণ সমাধা করিয়া প্রস্থান করিলে, বহুক্ষণ পর্য্যন্ত লজ্জাদেবী সেই স্থানে সেই একই ভাবে তাঁহার অসাড় দেহ ও মন লইয়া বসিয়া রহিলেন। কতক্ষণই যে তাঁহার এ ভাবে কাটিয়া গেল, তাহা তিনি জানিতেই পারিলেন না। যখন সেই সুগম্ভীর চিন্তাজাল ভেদ করিয়া তিনি মুখ তুলিলেন, তখন তিনি দেখিলেন, তিনি তখনও একা। ঊর্দ্ধে চন্দ্রমা তাহার কৃষ্ণা প্রতিপদের পূর্ণ সৌন্দর্য্য চারিদিকে বিকীর্ণ করিতেছে, তাহারই স্মিতরশ্মি মুক্ত বাতায়নপথে প্রবেশ করিয়া একরাশি শুভ্র মল্লিকা-পুষ্পের অঞ্জলির মতই হর্ম্ম্যতলে প্রসারিত হইয়া পড়িয়া আছে। দূরে-অদূরে দেবায়তনে সন্ধ্যারতির গম্ভীর ধ্বনি স্বর্গের দিকে উত্থিত হইতেছিল, মধ্যে মধ্যে অদূরস্থ মহাবিহার-মধ্য হইতে সমবেত সুদীকণ্ঠে মহাধার্ম্মিক ভিক্ষুগণের ত্রিশরণ-মন্ত্র ঘন ঘন উচ্চারিত হইতেছিল—"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।"

এই মহাবাক্যত্রয় সুগম্ভীর ঘণ্টা ও বিবিধ বাদ্যধ্বনি সহকারে উত্থিত হইয়া ভূলোকবাসীর জন্য দুর্ল্লভ স্বর্গদ্বার অনাবৃত করিয়া দিতেছিল। ধীরে ধীরে একটি গভীর শান্তি যেন সকলেরই প্রাণের তীরে নামিয়া আসিতেছে।

একটা হৃদয়ভেদী গভীরতর দীর্ঘশ্বাস মোচনপূর্ব্বক গৌড়েশ্বর-মহিষী মহাদেবী উঠিয়া দাঁড়াইয়া সহসা করযোড়ে ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিলেন—"হায় প্রভু! সকলই যখন ঊর্দ্ধগামী, তখন মানুষের মনটাকেই শুধু এমন নিম্নগ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছ কেন? দীপ ঊর্দ্ধশিখায় জ্বলে, ধূপ উপরেই গন্ধ বিলায়, ফুলও তার সৌরভের ডালি ঊর্দ্ধ পথেই প্রেরণ করে, শুধু নদীর জল, আর মানুষের মনই কি কেবল তার নিজের গতিপথ খুঁজিতে নীচুর দিকেই ছুটিবে! না না, নাও দেব! এই হীনতার প্রবৃত্তি তার দূর ক'রে কেড়ে নাও, দাও তাকে মহত্ত্বের, উদারতার, ত্যাগের মহিমময় ঊর্দ্ধচরণশীল উন্নত হৃদয়। উঃ, নতুবা এ বিশ্বরচনা যে তোমার নিরর্থক হয়ে যায়।"

• • "মহাকুমার! আমার একটি অনুরোধ রাখবে?"

"আদেশ করুন, মহাদেবি!"

"তোমার পক্ষে যতই প্রার্থনীয় হোক্, তবুও তুমি ভাইয়ের বিরুদ্ধে কখন বিদ্রোহী হ'তে পাবে না, এই কথা দাও।"

মহাকুমার রামপালদেব স্মিত-গম্ভীর মুখে উত্তর করিলেন, "এ কথা আপনি আমায় না বল্লেও আমি কখন তা করতাম না, মহাদেবি! তার কারণ, তিনি যে আপনার স্বামী।"

মহাদেবীর চোখের মধ্যে অশ্রুর মেঘ বর্ষণোন্মুখ হইয়া উঠিল, তিনি তাহা অতি কষ্টে রোধ করিলেন।

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ইহার পর জ্যেষ্ঠ মহীপালদেবের সকল অন্যায়-অবিচারই কনিষ্ঠ কুমার রামপালদেব নির্ব্বিবাদে সহ্য করিয়া চলিতে লাগিলেন; কিন্তু তথাপি কোন দিনই তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্নেহাকর্ষণ করিতে পারিলেন না। এখানকার শিক্ষা সমাধা করিয়া তিনি বিক্রমশিলায় কিছু দিন ধর্ম্মশিক্ষার্থ অবস্থিতি করিয়া তৎপরে দেশভ্রমণে বাহির হইলেন এবং নিজেদের রাজ্যসীমা সকল সন্দর্শন করিয়া তাহার পর রাষ্ট্রান্তরেও পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অঙ্গাধিপ মাতুল মদনদেব ও সুবর্ণদেব প্রিয় ভাগিনেয়কে সযত্নে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কথায় কথায় মহীপালের কথা উঠিতে মদনদেব বলিলেন, "তোমার পিতৃরাজ্যে তোমারই সিংহাসনপ্রাপ্তি সঙ্গত হইত এবং তাহা হইলে পালসাম্রাজ্য আরও কিছু দিন গৌরবোন্নত থাকিতে পারিত। কেন তুমি নির্ব্বোধের মত দেশ-ছাড়া হইয়া বেড়াইতেছ, বল ত আমি তোমার সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি।"

রামপাল নতমুখে নীরব রহিলেন। তাঁহার নিজ দেশেও তাঁহাদের সুহৃদ্‌বর্গ যথা—মহামাণ্ডলিক, বীরদেব, এমন কি, মহাসেনানায়ক কর্ণভদ্র পর্য্যন্ত অনেকেই তাঁহাকে এই পরামর্শই দিয়াছিল।

তাঁহাকে চিন্তাকুল দেখিয়া মদনদেব কহিলেন, "কি বল? আমার সমস্ত বল, আর তা ভিন্ন আমার যত দূর বিশ্বাস, তোমার নিজ দেশেও তুমি অধিকাংশ লোকেরই সহায়তা লাভ করিতে পারিবে। চেষ্টা করিবে না কি?"

রামপাল গভীর নিশ্বাস মোচন করিলেন,—"না।"

"চিরদিনটা এম্‌নি ছন্নছাড়া হয়েই কি বেড়াবে? অথচ তিন জনের মধ্যে তুমিই শক্তিমান। আর সে কথা বোধ করি তুমি ছাড়া আর সকলেই জানে।"

রামপাল বিষণ্ণমুখেই মুখ তুলিয়া মৃদু হাসিলেন, "সে কথা আমিও না জানি, তা নয়। কিন্তু মামা, আমি আমার যতই ক্ষতি হোক্, সে বরং সহ্য করতে পারবো, কিন্তু মহাদেবীর স্বামীর অণুমাত্র ক্ষতি করতে পারবো না।"

মদনদেব ঈষৎ লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "তা বটে!" তাহার পর কিছু দুঃখিত হইয়া কহিলেন, "তিনিই তবে তোমার সকল উন্নতির অন্তরায় হয়ে রইলেন! এই স্নেহই তোমার পক্ষে আপদ্ হ'ল!"

মাতুলরাজ্য হইতে বাহির হইয়া বহু স্থানে ঘুরিতে ঘুরিতে রামপাল ছদ্মবেশে সমতটে প্রবেশ করিলেন। সম্ভ্রান্ত বণিক বলিয়া সেখানে তাঁহার যথেষ্ট সমাদর হইল এবং সুদর্শন-মূর্ত্তি এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধি. উচ্চশিক্ষা, তেজস্বিতা ও অমায়িকতার একত্র সমন্বয় প্রভৃতি গুণে অল্পদিনের মধ্যেই রাজপুত্রগণের সহিত তাঁহার সৌহার্দ্দ জন্মিয়া গেল। রামপাল ও তাঁহার নিত্যসঙ্গী মন্ত্রিপুত্র বোধিদেব দুই জনেই অতিথিরূপে কয়েক মাস সমুদ্রতীরে বাস করিলেন।

এক দিন, সে দিন বসন্তের সায়াহ্নে আকাশ নীলোজ্জ্বল, পশ্চিমের প্রান্ত সুবর্ণে ও কালিমায় মিশ্রিত হইয়া অভিনব বর্ণবৈচিত্র্য ধারণ করিয়াছে, সেই আলো অচঞ্চল গাম্ভীর্য্যময় সমুদ্রবক্ষে পতিত হইয়া তাহাকে অনির্ব্বচনীয় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করাইয়াছিল।

সমুদ্রতীরে স্থানে স্থানে বালুরাশির উপর আরণ্যক গুল্মজাত জন্মিয়াছে। সেই রাঙ্গা আলো তাহাদের শ্যামশোভার উপর তাহার স্বর্ণ-রেণু মাখাইয়া দিয়া তাহাদেরও স্বভাবজাত সৌন্দর্য্যকে বর্দ্ধিততর করিয়া তুলিয়াছিল। আর তাহার সর্ব্বাপেক্ষা সার্থকতা হইয়াছিল, সেই বালুকাময় বেলাভূমির উপর উপবিষ্টা এক অপূর্ব্বদর্শনা কিশোরীর দেহজ্যোতিকে সংবর্দ্ধিত করিয়া। তরুণী তন্বী, চকিত-হরিণীপ্রেক্ষণা ও তপ্তগৌরাঙ্গী। সঙ্গিনী তাহার এক বর্ষীয়সী নারী। নারী তাহাকে অপ্রসন্ন মুখে মৃদু মৃদু অনুযোগ ও ভর্ৎসনা করিতেছিল, আর সেই বিধাতৃ-সৃষ্টির আত্মভূতা অপূর্ব্বদর্শনা সুন্দরী ভীত-চকিত নেত্রে স্তব্ধ থাকিয়া সেই উপদেশগুলি শ্রবণ পূর্ব্বক মধ্যে মধ্যে মুখ তুলিয়া অশ্রু-ভারাকুল-নেত্রে অনন্ত জলধির পানে চাহিতেছিল। তাহার শান্ত করুণ মুখখানিতে একান্ত ভীতি-বিহ্বলতা।

রামপাল বিমুগ্ধ নির্ব্বাক্ নেত্রে সেই সকরুণ সুন্দর মুখখানির পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন; তাঁহার মনে হইল, এত দিনের দেশপর্য্যটন যেন তাঁহার আজ সফল হইয়া গেল। অনেক দেখিয়াছেন, কিন্তু এমনটি যেন কখন তাঁহার চোখে পড়ে নাই।

একটুখানি নিকটবর্ত্তী হইতেই তাঁহার কানে আসিল, "তুমি নিতান্ত অবোধ! রাজরাজেশ্বরী হবে, এতে তুমি অমত করছো? ছি ছি, এতটুকু বুদ্ধি তোমার নেই! এস, আর বিলম্ব করো না, যাত্রার কাল উপস্থিত হয়েছে।"

তরুণী যথাপূর্ব্ব নিশ্চেষ্ট ও নীরবভাবে বসিয়া রহিল, শুধু তাহার বিশাল নেত্র দুইটিতে অশ্রুজল পরিপূর্ণ হইয়া আসিয়া তাহা পতনোন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে, রামপালের নেত্রে তাহা অদৃশ্য রহিল না।

নারী কহিতে লাগিল, "জ্যোতিষী তোমার করকোষ্ঠী গণনা করেও যখন তোমার জন্ম-পত্রিকার লিখিত বিষয়েরই পুনরাবৃত্তি করলেন, তখন ত আর আমরা অগ্রাহ্য করতে পারি না। মহারাজচক্রবর্ত্তীর সঙ্গে তোমার বিবাহ-কাল আসন্ন হয়েছে এবং তিনি প্রত্যক্ষ তোমায় দেখে নিজে হ'তে আগ্রহ জানিয়ে বিয়ে করবেন, এই তাঁর অভিমত। তখন নিশ্চয়ই আমাদের পৌণ্ডবর্দ্ধনে যাওয়া সঙ্গত। মহারাজাধিরাজ পরম ভট্টারক মহীপালদেবই যে এই আমাদের ঈপ্সিত মহারাজচক্রবর্ত্তী, তা'তে কোনই সংশয় নেই। এ অবস্থায় আমরা তোমার আপত্তি শুনতে পারি না।"

মেয়েটি বারেক তাহার অশ্রুসজল চোখ দুইটি ঈষদুত্তোলন পূর্ব্বক রুদ্ধ কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "শুনেছি, তিনি লোক ভাল নন।"

আর কিছুই তাহাকে বলিতে হইল না, বর্ষীয়সী মহিলাটির সক্রোধ তিরস্কারে তরুণীর এই ক্ষীণ প্রতিবাদটুকু কোথায় ডুবিয়া গেল। নারী তীব্র ভর্ৎসনাপূর্ণ কণ্ঠে সরোষে কহিয়া উঠিল,—"লোক ভাল নন? মহারাজাধিরাজ মহীপালদেব কত বড় প্রবলপরাক্রান্ত রাজা, তা'র তুমি খবর রাখ? এক ফোঁটা মেয়ে, ছোট মুখে তোমাদের বড় কথা! এ বিবাহ হ'লে তোমার চতুর্দ্দশ পুরুষ যে উদ্ধার

হয়ে যাবে, তার তুমি জানো কিছু? সাবধান! এমন অসংলগ্ন কথা আর বলো না। এ কথা তোমার পিতার কর্ণগোচর হ'লে তিনি তোমার মুখদর্শনও করবেন না।"

ধীরে ধীরে সূর্য্যদেব পশ্চাতের তরু-বীথিকার অন্তরালে অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। সুশ্যাম পত্রাবলী দেখিতে দেখিতে তাহার শ্যামলতা হারাইয়া নীলাভ হইয়া গেল। তখন সেই আগমনশীলা যামিনীর অবরোহণ-পথের মহাসন্ধিস্থলে সমুদয় বিশ্ব যেন মহানীল-সরস্বতীর মহানীলিমায় বিমণ্ডিত হইয়া উঠিল। তখন জলে নীল, স্থলে নীল, আকাশের নীলিমা, অনাদি-নীল অনন্তভাবেই সুবিস্তৃত হইয়া রহিল। কুমার রামপালের হৃদয়রাজ্যও বুঝি ঐ অসীম নীল সাগরের মতই তমসাবৃত হইয়া উঠিয়াছিল।

রামপালদেবের সংবিৎ ফিরিয়া আসিল, বন্ধু বোধিদেবের সপরিহাসবাক্যে—"সখে! দ্রষ্টব্য চ'লে গেলেও কি দৃষ্টি তার সঙ্গী হয়ে চক্ষু ছেড়ে চ'লে যায়?"

রামপাল বিস্মিত-হইয়া দেখিলেন, নারী দুই জন কোন্ সময়ে চলিয়া গিয়াছে। তিনি ঈষৎ অপ্রতিভ হইলেও তাহা অপ্রকাশ রাখিয়া হাসিয়া কহিলেন,—"সখা যদি ব্রহ্ম-সূত্রধারী না হতেন, তবেই তাঁর দৃষ্টির বল বুঝতে পারতেন।"

"বটে! দৃষ্টি বুঝি আবার ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের ভেদবুদ্ধিটুকুও হিসাব ক'রে চলে? তবে ত সে বিবেকী দেখছি! কিন্তু কাব্য-নাটক ঠিক উল্টা কথাই রটনা ক'রে থাকে।"

রামপাল ঈষল্লজ্জিত হইয়া মৃদু মৃদু কহিলেন,—"দৃষ্টিকে যে প্রেরণা দিয়েছে, তারই কথা আমি বলেছিলাম, কিন্তু এও বলি সখা! কাব্য-নাটকে প্রায়ই দেখা যায়, নিজ নিজ জাতি বজায় রেখেই নায়ক প্রেমে পতিত হয়ে থাকে। কদাচ কখন ব্যতিক্রম দেখা যায় মাত্র।"

বোধিদেব সহাস্যে কহিলেন, "বেশ, এস তবে এখন আমরা সেই বিবেকবুদ্ধিপ্রণোদিত সম্ভাব্য ঘটনা সম্বন্ধেই কথা কই! শুনলে ত, ঐ মেয়েটির কোন রাজচক্রবর্ত্তীর সঙ্গে বিবাহ হবে, এই কথা উপযুক্ত জ্যোতিষিক গণনায় স্থির হয়েছে। আবার দৃষ্টিকে যিনি প্রেরণা দান করছেন, তিনিও না কি সম্পূর্ণ উৎসুক হয়েছেন, তাও দেখা যাচ্ছে, অতএব এ ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ-সন্তানের পক্ষে তার যথাকর্ত্তব্য সম্পাদনে আর অযথা বিলম্ব ঘটানটাও ত সঙ্গত হয় না, কেমন না? আজ্ঞা কর, যথাকর্ত্তব্য সম্পাদন ক'রে ফেলি?"

রামপাল এতক্ষণ পরে এই বার তাঁহার আনত দৃষ্টি তুলিয়া প্রিয়সখার মুখে তাহা স্থাপন করিলেন, তখন তাঁহার মুখ হইতে আনন্দের সমুদয় স্মিতরশ্মিটুকু সন্ধ্যাগমে দিবালোকের ন্যায় একবারে নিঃশেষেই মুছিয়া গিয়াছিল।

"বোধিদেব! তুমি ত জানই যে, আমার পিতৃরাজ্যে আমার স্থান একটা পথের ভিক্ষুকেরও চেয়ে অনেক নীচে এবং জীবনও আমার বৃক্ষচ্ছায়ার মতই অনিশ্চিত, তবে কেন রাজচক্রবর্ত্তীর মহিষীপদপ্রাপ্তিরূপ ভাগ্যবতীর সঙ্গে আমার মত দুর্ভাগার মিলনরূপ অসম্ভব কল্পনা করছ, বন্ধু?"

রামপালের এই যথার্থ সত্য এবং খেদপূর্ণ কথা শুনিয়া বোধিদেব কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তিনি তাঁহার স্বভাবমৃদু স্নিগ্ধ হাস্যের সহিত উত্তর দিলেন, "ভাল, এই ঘটনাতেই তোমার ভবিষ্যতের আভাস পাওয়া যাবে। যদি ঐ কন্যা যথার্থই রাজরাজেশ্বরীর সৌভাগ্য লয়ে জন্মে থাকে, তোমার হাতে পড়লে উহার ভাগ্যফলের পরিবর্ত্তন ত আর ঘটতে পারে না।"

"কিন্তু বিবাহ ত শুধু তোমার আমার ইচ্ছাতে হবে না, বন্ধু। তুমি পাগল! যারা পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ মহীপালদেবের হস্তে কন্যা দান করতে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন যাত্রা করছে, তারা কিসের দুঃখে আমার মত একটা পথের পথিককে সেই নিরুপমা কন্যারত্ন সঁপে দেবে? না না, কায নেই বন্ধু! রামপাল যেমন চির-দুর্ভাগ্যকে আশ্রয় ক'রে জন্মেছে, তার তাই থাক, বৃথা আশায় নিজেকে সন্তপ্ত করা তার স্বভাব নয়।"

"দেখ সখা! গীতায় শ্রীভগবান্ বলেছেন, কর্ম্মেই আমাদের অধিকার আছে; কিন্তু কর্ম্মফলে নাই। অতএব কাযটাই আগে ক'রে দেখাই যাক্ না কেন। ফলানুসন্ধান না-ই বা করা গেল?"

রামপাল প্রীতনেত্রে বন্ধুর দিকে চাহিলেন, কিন্তু তাঁহার মনের মধ্যের সংশয়-মেঘ যে সম্পূর্ণরূপে অপনীত হয় নাই, তাহা তাঁহার ক্ষণমাত্র পরেই উচ্চারিত বাক্য হইতে জানিতে পারা গেল।

"কিন্তু তুমি কেমন ক'রে জানবে, তারা কে?"

রামপালকে সন্দিগ্ধ দেখিয়া বোধিদেব এবার উচ্চ কণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন।

"মহারাজপুত্র! বৃথাই কি দর্ভপাণি, কেদারমিশ্র,

প্রভৃতির বংশে জন্মগ্রহণ করেছি? এক দিন কি আমারও নামে রাজকবি আমার পূর্ব্বপুরুষের মতই শ্লোক রচনা ক'রে বলবেন না,—

'আ-রেবা-জনকান্মতঙ্গজমদস্তোম্যচ্ছিলাসংহতে-
রা-গৌরীপিতুরীশ্বরেন্দুকিরণৈঃ পুষ্যৎসিতিম্নোগিরেঃ।
মার্ত্তণ্ডাস্তময়োদয়ারুণ-জলাদাবারিরাশিদ্বয়াৎ
নীত্যা যস্ত ভুবং চকার করদাং শ্রী—'

এখানে দেবপালের পরিবর্ত্তে বসবে শ্রীরামপালো নৃপঃ।"

"আঃ, কি যে প্রলাপ বকছো, বুধ! যা অসম্ভব, তা' নিয়ে বৃথা পরিহাস কেন? কিন্তু এ ক্ষেত্রে বৃহস্পতি-নিন্দিত মন্ত্রিবংশধর যে কোন্ নীতিকুশলতার পরিচয় দিলেন, তা ত বুঝলাম না?"

"কেমন ক'রে বুঝবে? তাই যদি ক্ষাত্রবুদ্ধিতে প্রবেশ করতো, তা হ'লে কি আর—নানা মদমত্ত মতঙ্গজ-মদবারি-নিষিক্ত ধরণীতলবিসর্পি ধূলিপটলে দিগন্তরাল সমাচ্ছন্ন ক'রে দিক্‌চক্রাগত ভূপালবৃন্দের চিরসঞ্চরমান সেনা-সমূহ যাঁকে নিরন্তর দুর্ব্বিলোক ক'রে রাখতো, সেই দেব সদৃশ দেবপাল নৃপতি উপদেশ গ্রহণের জন্ম ব্রাহ্মণ দর্ভপাণির অবসরের অপেক্ষায় তাঁর দ্বারদেশেই দণ্ডায়মান থাকতেন? না প্রশস্তিকার রাজকবি বিষ্ণুভদ্র এমন কথাটার উল্লেখ করিতে ভরসা ক'তেন?—

'দত্বাপ্যনল্পমুড়ুপচ্ছবিপীঠমগ্রে
যস্তাসনং নরপতিঃ সুররাজকল্পঃ।
নানা-নরেন্দ্র-মুকুটাঙ্কিত-পাদপাংশুঃ
সিংহাসনং সচকিতঃ স্বয়মাসসাদ।'

আমার ঘোর সন্দেহ হয়, তুমি হয় ত আমার কাছে তোমার পূর্ব্বপুরুষের মত 'সচকিত' ভাবে থাকতে পারবে না! নাঃ, তোমার সঙ্গে এতখানি বন্ধুত্ব করাটা একেবারেই আমার সঙ্গত হয় নি।"

কুমার রামপাল এবার আর তাঁহার অন্তরের অসহিষ্ণুতা ও আগ্রহ রোধ করিতে না পারিয়া ব্যগ্র হইয়া কহিয়া উঠিলেন,—"ভবিষ্যতে তখন এক দিন তোমার সাক্ষাতে না হয় আমি সচকিত হয়েও আসন গ্রহণ করবো না, এই প্রতিজ্ঞাই রইলো, কিন্তু সে সকল আকাশ-কুসুম কল্পনার রহস্য-কথা যেতে দাও, এখন কি উপায়ে এদের সন্ধান নিতে পারবে, বল দেখি?"

মন্ত্রিপুত্র বোধিদেব হাসিয়া কহিলেন,—"সন্ধান আমি নিয়েছি। তুমি যে তখন দৃষ্টি-ক্ষুধায় আত্মহারা হয়েছিলে, তাই শুনতে পাও নাই, ঐ মেয়েটির পিতৃনাম বসুভট্ট, মেয়েটির নাম সন্ধ্যারাণী।"

মহাকুমার রামপালদেব কোন বিখ্যাত রাজবংশের পরিবর্ত্তে মাত্র সামন্তরাজ সমতটনিবাসী বদ্ধিষ্ণু নাগরিক-কন্যাকে বিবাহ করিয়া ঘরে আনাতে আর যাহারই যাহা মনে হয় হউক, তাঁহার সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহারাজাধিরাজের চিত্ত কতকটা যেন সুস্থির হইয়াছিল। অঙ্গাধিপ মাতুল মদনদেব একেই রামপালের পক্ষে বর্ত্তমান, ইহার পর অপর কোন প্রবল রাজশক্তির সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে সংবদ্ধ হইলে যে রামপালের পক্ষে তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করা আদৌ কঠিন হইবে না, তাহা মহীপাল বুঝিতেন এবং সে বিষয়ে তিনি যথেষ্ট সতর্কতাবলম্বন করিয়াই চলিতেন। বিশেষতঃ রামপালের দেশভ্রমণে তাঁহার মনের মধ্যে যথেষ্ট সংশয় জন্মিয়াছিল যে, এই পরিভ্রমণের ভিতর কোন গূঢ় রাজনীতিক অভিসন্ধি নিহিত আছে। কিন্তু তাহাকে এই হীন সম্বন্ধ স্বীকার করিতে দেখিয়া তাঁহার মনে এত দিনে একটুখানি বিশ্বাস হইল যে, হয় ত বা রামপাল প্রজা-বর্গের পক্ষপাতিত্ব সত্বেও তাঁহার অনিষ্টচেষ্টায় চেষ্টিত নহে। নতুবা যে অনায়াসেই গুর্জ্জর, প্রতিহার, মহোদয় প্রভৃতি প্রবলপ্রতাপ রাজন্যসুতা গ্রহণে স্বপক্ষকে যথেষ্ট বলশালী করিতে পারিত, সে কেনই বা এমন সামান্য ঘরে সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া বসিল? ঈষৎ প্রসন্ন চিত্তে তিনি কনিষ্ঠের জন্ম সামান্য বৃত্তির বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। রামপালও জ্যেষ্ঠের উদারতায় অনুগৃহীত বোধ করিলেন। বধূর সুন্দর মুখ দেখিয়া লজ্জাদেবী অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলেন।

কেবল মহামন্ত্রী যোধদেব অন্যের অজ্ঞাতে নিজপুত্রকে ভৎর্সনা পূর্ব্বক কহিলেন, "তুইটা নির্ব্বোধ বালকে মিলে একটা অসঙ্গত কার্য্য করে এসেছো! কলিঙ্গপতি অনন্তবর্ম্মা, পীঠিপতি দেবরক্ষিত, মহোদয়াধিপ এ সকলেই রামপালের হস্তে কন্যাদানে সমুৎসুক থাকতে কোন্ অজানিত সেনানায়কের কন্যা এনে তার ভবিষ্যৎ নষ্ট করবার সাহায্য করা বিখ্যাত পালমন্ত্রিবংশীয়ের উপযুক্ত হয় নাই।"

[ ক্রমশঃ।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

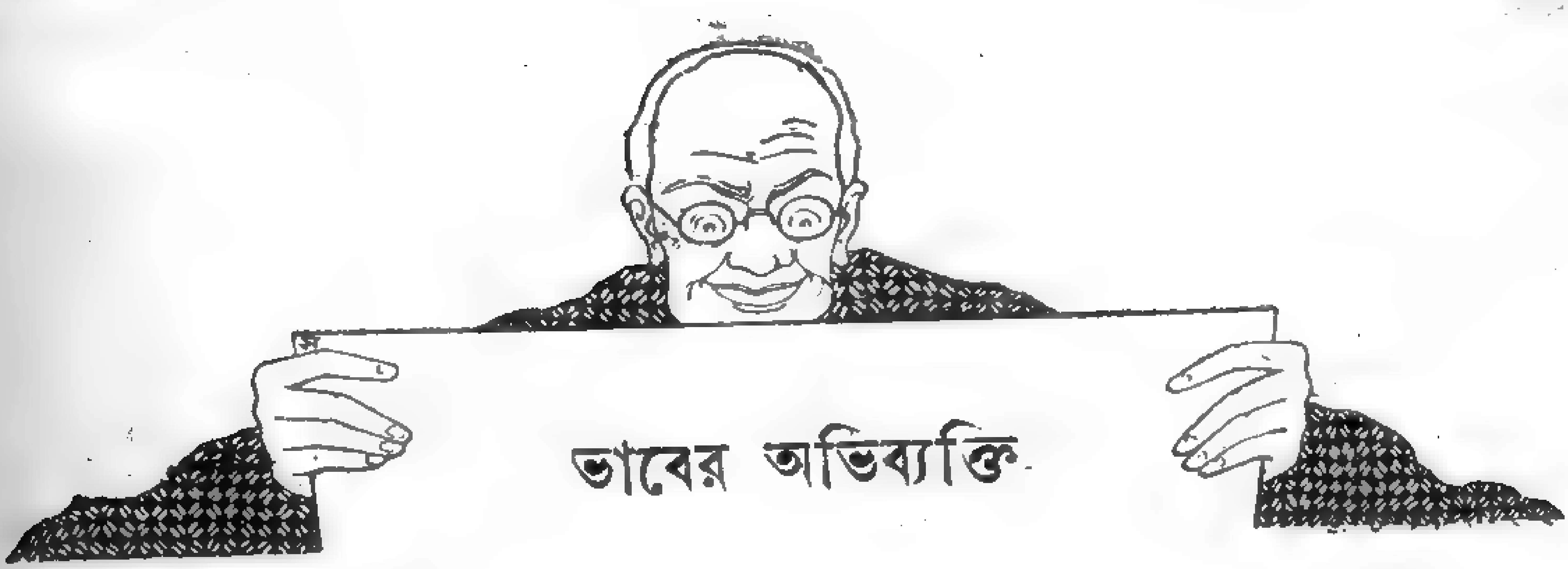

# ভাবের অভিব্যক্তি

অভিনয়-কলাকুশল জনপ্রিয় অভিনেতা শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী একই সময়ে বিভিন্ন বয়সের মনোভাব পরিবর্ত্তনের স্বরূপ ফটো মুখের ভঙ্গীতে প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার মানসিক ভাব-বিকাশ-নৈপুণ্য মুখ-দর্পণে কেমন প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহা দর্শকমাত্রেই অনুভব করিতে পারিবেন। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, বিলাতের কোন প্রসিদ্ধ ফিলিম কোম্পানী ধীরেন্দ্রনাথের এই ফটোগুলি সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন।—মাঃ বঃ সম্পাদক।

কুড়ি বৎসরে

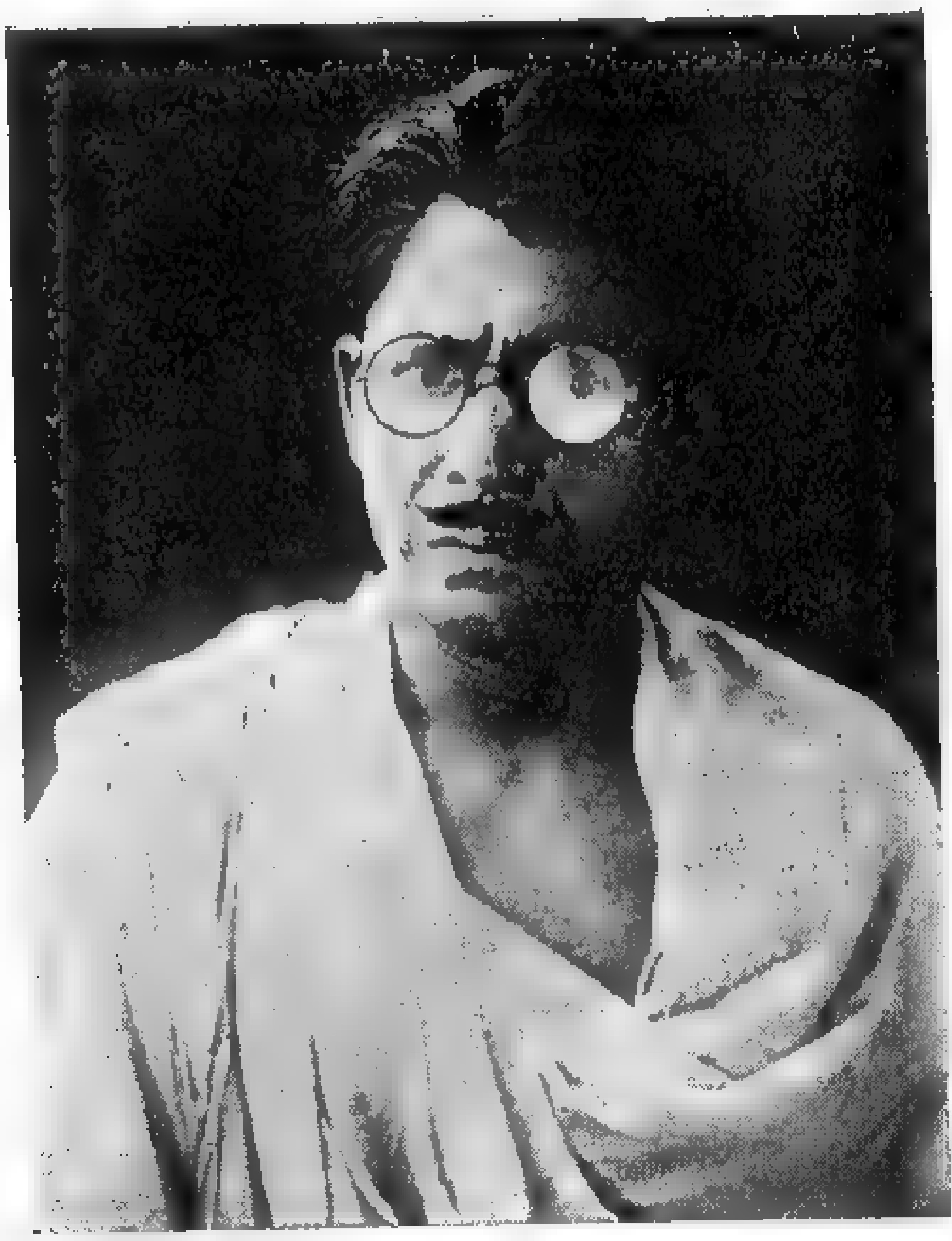

পঁয়ত্রিশ বৎসরে

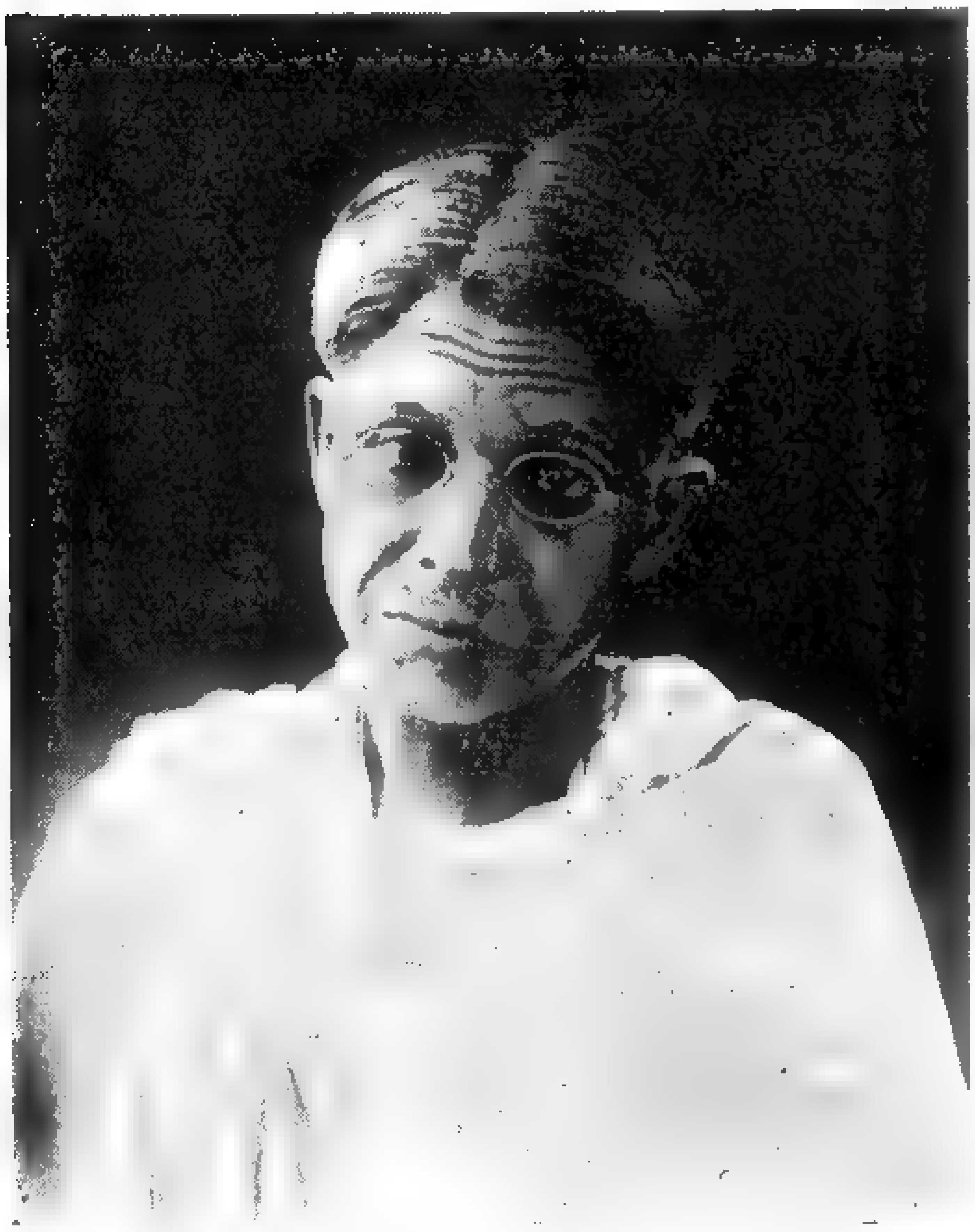

পঁয়তাল্লিশ বৎসরে

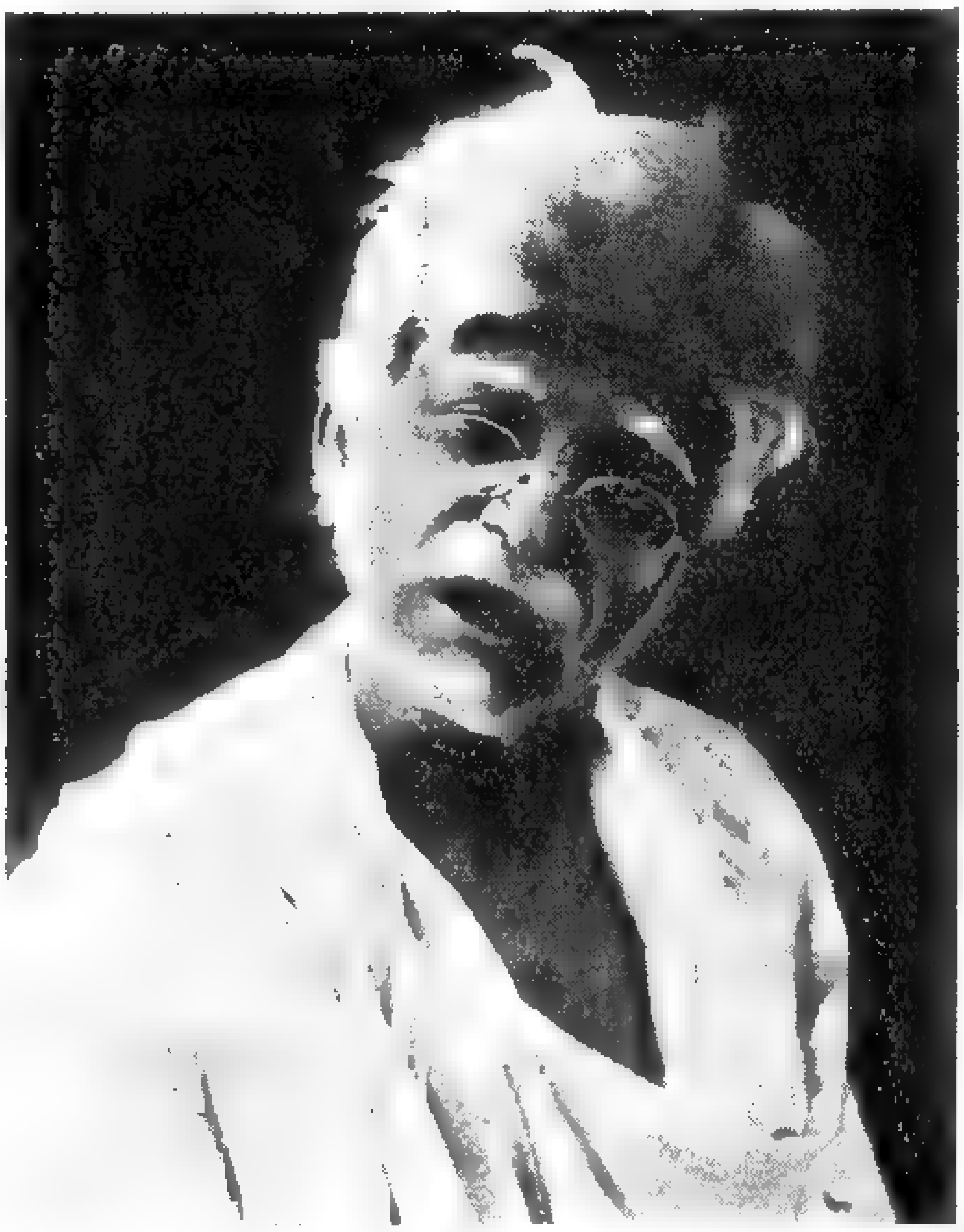

পঞ্চান্ন বৎসরে

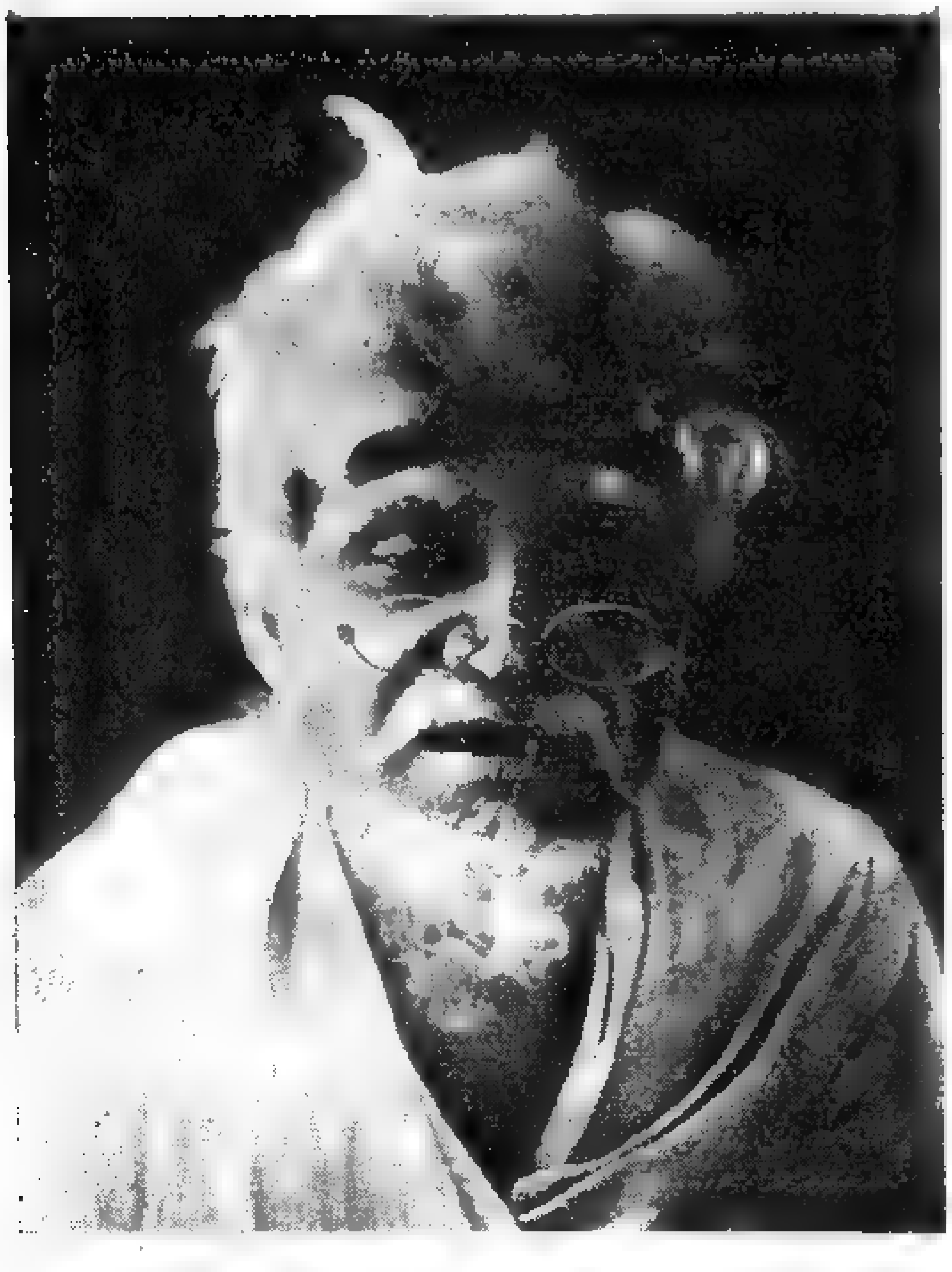

পঁচাত্তর বৎসরে

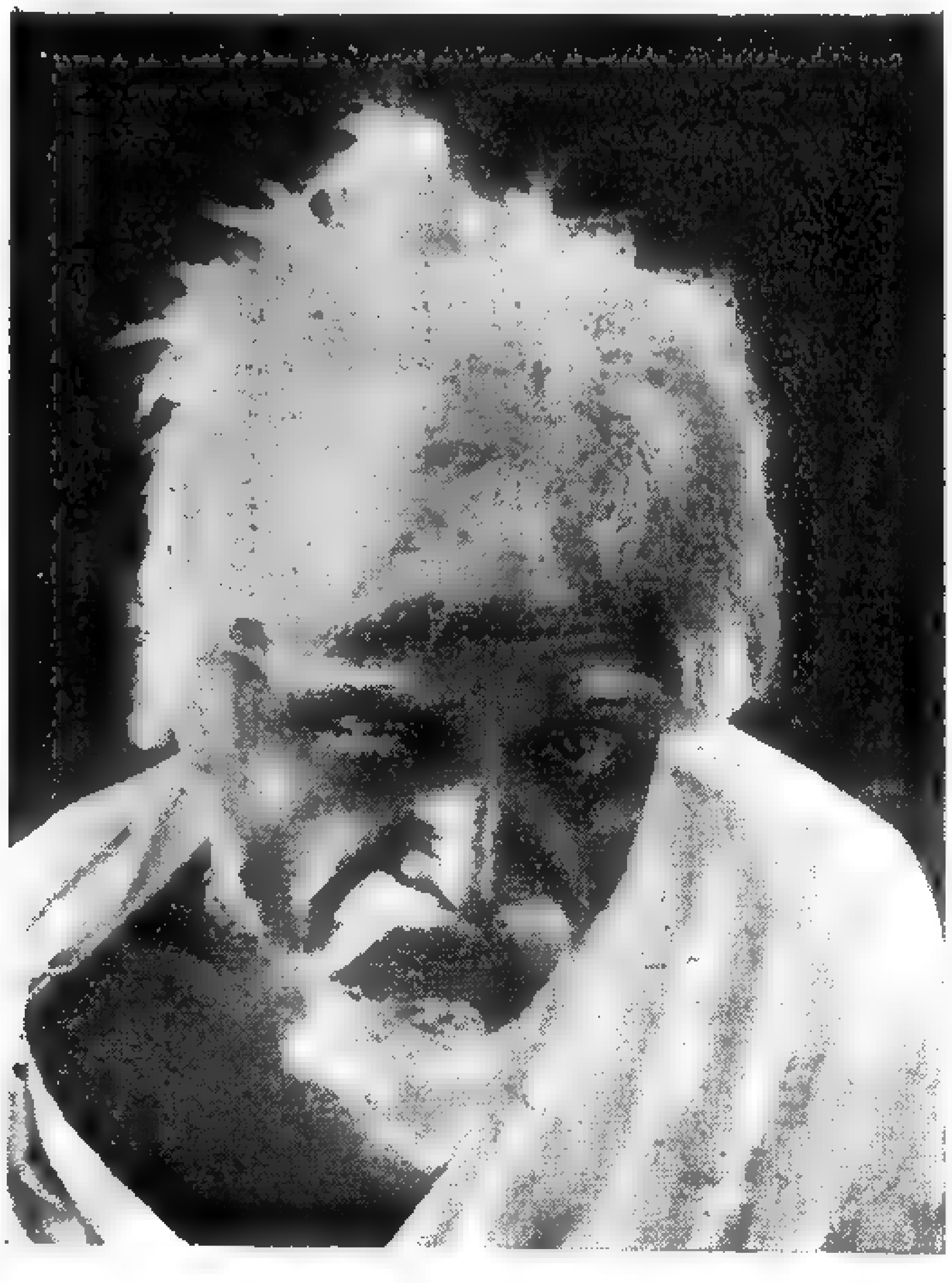

পঁচানব্বই বৎসরে

ফটো শিল্পী—কর্ণওয়ালিস ষ্টুডিও।

অভিনেতা—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী।

# ফুটবল ম্যাচ দর্শকের আনন্দ-রঙ্গ !

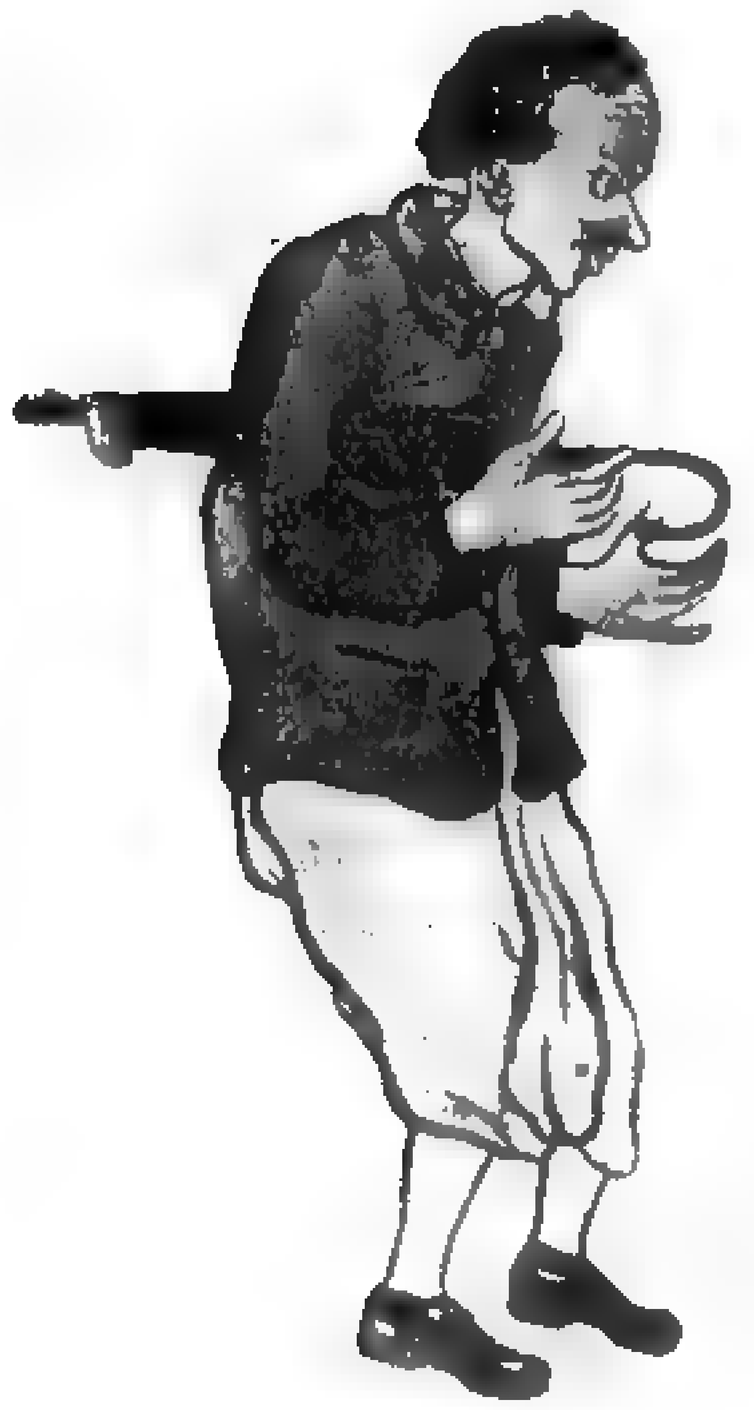

"এই রে—এই রে, দিলে,—দিলে বুঝি গোল !"

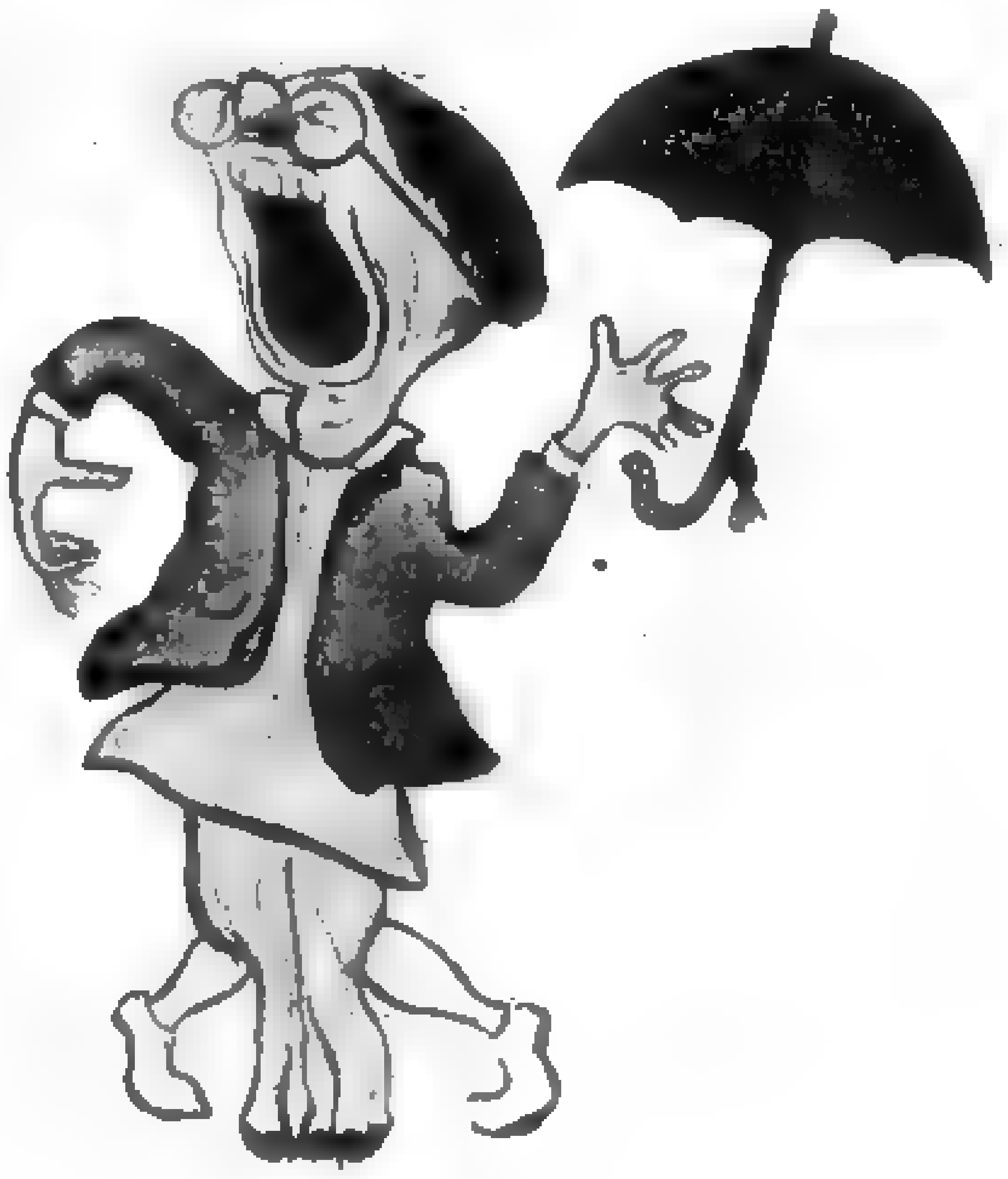

"বাগ্ আপ্—মোহনবাগান !"

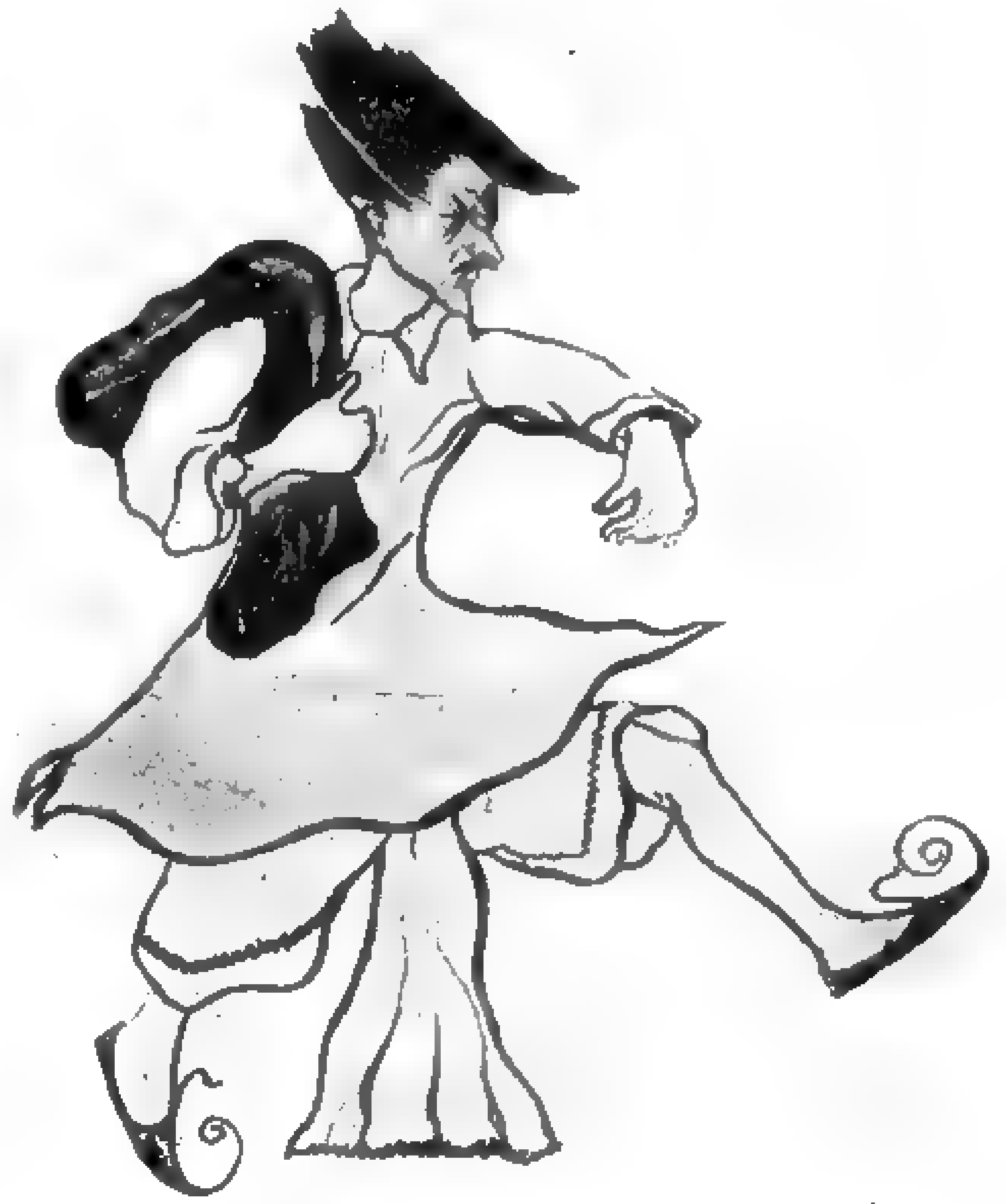

"কিক্ কিক্—ফরোয়ার্ডটা একেবারে—ইয়ে !"
( এই ব'লে ভদ্রলোকটি সামনের লোকটিকে
মেরে দিলেন এক লাথী )

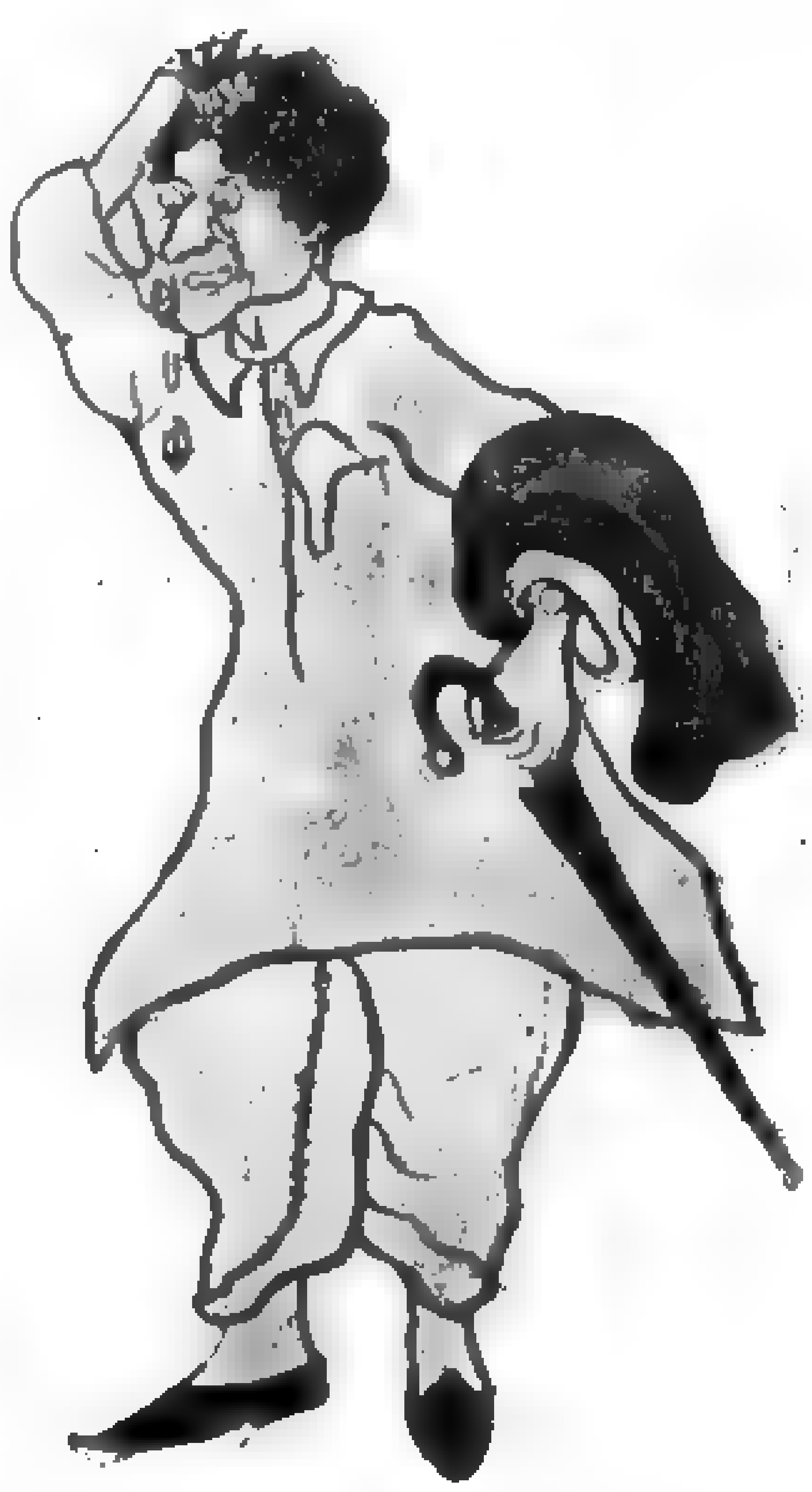

"এ কি হলো—মোহনবাগান গোল খেলে—
গোল !—ও মা !"

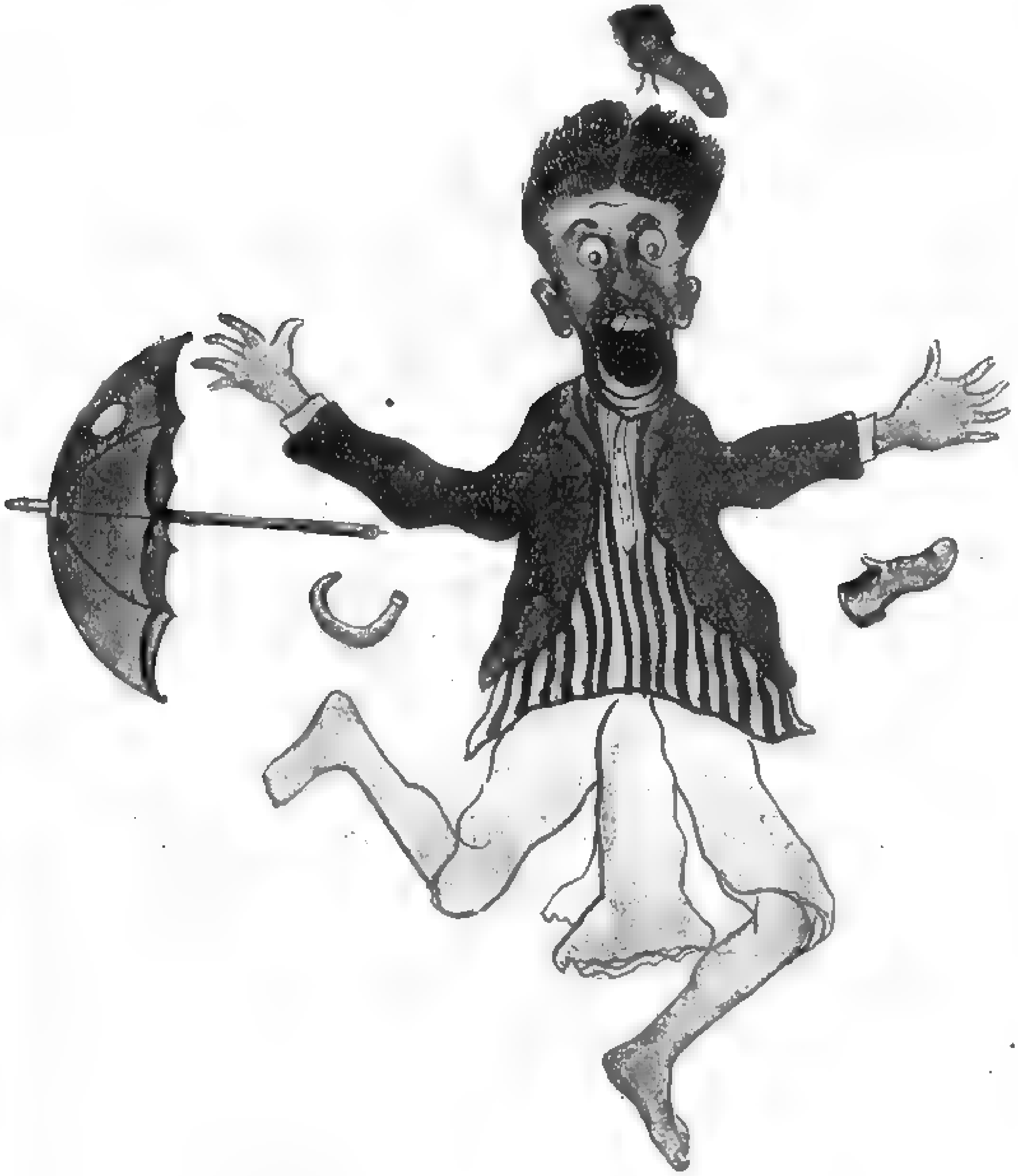

( পরক্ষণেই ক্যালকাটা একখানি সুন্দর
গোল ভক্ষণ করিলেন ]
“গো — ল !”

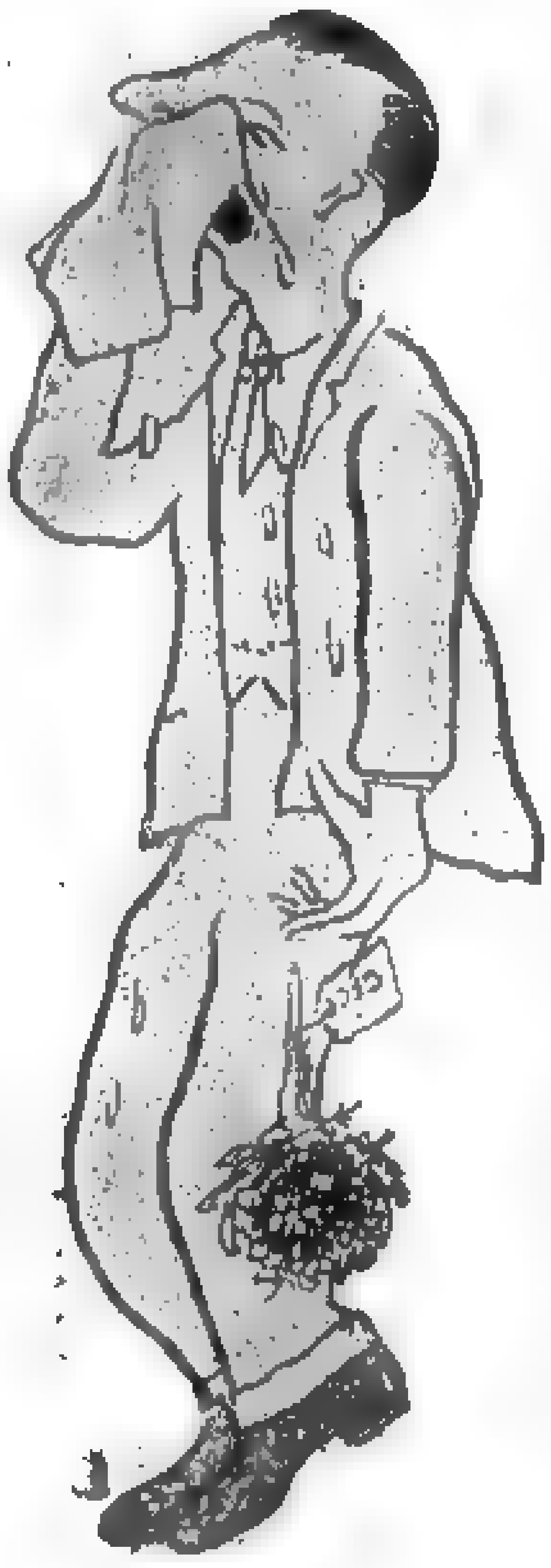

[ ক্যালকাটা একটি গোল উদরস্থ
করাতে বেচারীর হাতের ফুলটি
পপাত ধরণীতলে ! )
“ওঃ ক্যালকাটা !”

শিল্পী—শ্রীকিশোরী বন্দ্যোপাধ্যায় ।

# সাময়িক প্রসঙ্গ

## ভূঁইফোঁড় 'নেতা'

বাঙ্গালার বর্ত্তমান সাম্প্রদায়িক বিবাদ উপলক্ষে মুসলমান-সমাজের মধ্যে যে কয়টি ভূঁইফোঁড় নেতার আবির্ভাব হইয়াছে, হাজী গজনবি তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। অবশ্য, এই ভাবের নেতৃত্বে যদিও তিনি এখন সকলকে ছাপাইয়া গিয়াছেন, তথাপি এ বিষয়ে সার আবদর রহিমকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। কেন না, সার আবদর রহিম সাহেব তাঁহার অনেক পূর্ব্বে আলিগড়ে গজাইয়া উঠিয়াছেন এবং প্রকৃতপক্ষে সার আবদর আলিগড়ে যে কল টিপিয়া দিয়াছেন, তাহার 'ঘর্ঘর' আওয়াজ এখনও শুনা যাইতেছে। তাহা হইলেও বর্ত্তমানে হাজী গজনবি সাহেব সকলকে ছাপাইয়া—মূল গায়েনকে ছাপাইয়া গান ধরিয়াছেন। সে গানের তানে সারা বাঙ্গালা বুঝি ভাসিয়া যায়!

লম্বা লম্বা দেড়গজি ইস্তাহার বাহির করা এই 'হঠাৎ নেতার' যেন এক রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই 'হঠাৎ নেতা' হঠাৎ বাঙ্গালার মুসলমান-সমাজের মস্ত মুরুব্বী ও সুহৃদ্ হইয়া পড়িয়াছেন—সে মুরুব্বীআনার এমনই টান যে, শ্রীযুত সতীশরঞ্জন দাশ প্রমুখ যে সকল বন্ধুদিগের প্রতি তিনি এ যাবৎ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন, সে সকল বন্ধুর কথাও ভুলিয়া গিয়া তিনি এখন মুসলমান পক্ষে মসজেদের সম্মুখে বাদ্যাদি বন্ধের ওকালতী করিতেছেন। এই 'হঠাৎ নেতার' এই 'হঠাৎ দাবীর' কথা অপর কোনও মুসলমান নেতার বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ না করিলেও তিনি কিন্তু এই দাবীর কথা জাগাইয়া রাখিয়াছেন এবং সে জন্য সিমলাশৈলে লাট-দরবারে আরজী পেশ করিতেও গিয়াছেন। যে পাবনায় হিন্দুর উপর মুসলমানের ভীষণ অনাচার আচরিত হইয়াছে এবং যেখানে হিন্দু-মুসলমানে আদৌ সদ্ভাব নাই, সেই পাবনার আঞ্জুমান ইসলামিয়ার সম্পাদক খাঁ বাহাদুর মৌলভী ওয়াসিমুদ্দীন আহ্মেদ এক ইস্তাহারে বলিয়াছেন,—"বর্ত্তমান সময়ে মসজেদের সম্মুখে বাদ্যাদি বন্ধ করিবার রীতি নাই, ইহা স্বীকার্য্য। কিন্তু এখন মুসলমানগণ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছেন, সুতরাং তাঁহারা আর বর্ত্তমান রীতি অনুসারে অনুশাসিত হইতে বাধ্য নহেন।" মুসলমানরা বর্ত্তমানে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছেন বলিয়া অন্য সমাজের ন্যায্য অধিকার পদদলিত করিয়া চিরাচরিত প্রথার পরিবর্ত্তন করা প্রয়োজন কি না, তাহা বিচার-সাপেক্ষ; তবে মৌলভী ওয়াসিমুদ্দীন যে স্বীকার করিয়াছেন, "বর্ত্তমান সময়ে মসজেদের সম্মুখে বাদ্যাদি বন্ধ করিবার রীতি নাই," ইহা ত অস্বীকার করিবার উপায় নাই। মৌলভী ওয়াসিমুদ্দীন হাজী গজনবি হইতে অধিক শরিয়ৎ-জ্ঞানহীন মুসলমান, এ কথা গজনবি সাহেব জোর করিয়া বলিতে পারেন কি? তবে তিনি কোন্ সাহসে কিসের জোরে এই বাদ্য বন্ধের দাবী জাগাইয়া রাখিতেছেন? এই ব্যাপার হইতেই কি বুঝা যায় না যে, হাজী গজনবির আন্দোলন কৃত্রিমতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত? কেবল ওয়াসিমুদ্দীন নহে, মিঃ নুরুদ্দীন নামক এক মুসলমান উকীল "বেঙ্গলী" পত্রে লিখিয়াছেন,—"আমার বিবেচনায় মসজেদের সম্মুখে বাদ্যধ্বনি অতি তুচ্ছ ব্যাপার, ইহার জন্য কোন সম্প্রদায়েরই ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিবার প্রয়োজন নাই। বিশেষতঃ মুসলমানগণের ঐ ভাবে ক্রোধোন্মত্ত না হওয়া উচিত। কারণ, কোরাণ ধর্ম্মমতসহিষ্ণুতার এবং শান্তিরক্ষার জন্য উপদেশ প্রদান করে।" এক জন শিক্ষিত মুসলমান যে বাজনাকে তুচ্ছ ব্যাপার বলিয়া স্বীকার করিতেছেন, আর এক জন শিক্ষিত মুসলমান উহাকে পাকাইয়া তাল করিয়া তুলিতেছেন কেন? ইহার মূলে কি রহস্য নিহিত আছে? উকীল মিঃ নুরুদ্দীন যাহাকে তুচ্ছ ব্যাপার বলিতেছেন, ভূঁইফোড় নেতা মিঃ গজনবি তাহাকে প্রকাণ্ড ব্যাপারে পরিণত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন কেন? মিঃ নুরুদ্দীন আরও বলিয়াছেন, "মসজেদের সম্মুখে বাদ্যধ্বনি-সম্পর্কিত ব্যাপার পরস্পর আপোষে নিষ্পত্তি করিয়া লওয়াই কর্ত্তব্য। যদি তাহা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে সরকারী নির্দ্দেশই নিরপেক্ষ বলিয়া মানিয়া লওয়া কর্ত্তব্য।" এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে যদি মিঃ নুরুদ্দীনের ধর্ম্ম না গিয়া থাকে, তবে মিঃ গজনবির যায় কেন? না হইলে তিনি কলিকাতায় সরকারী নির্দ্দেশ প্রকাশিত হইবার পরেও সিমলাশৈলে মনের ক্ষোভে দৌড়ান কেন? ধর্ম্মের দোহাই দিয়া এ মানের কান্না কাঁদিতে যাওয়ার উদ্দেশ্য কি?

আসল কথা, মিঃ নুরুদ্দীনের কোনও স্বার্থসাধন করিবার উদ্দেশ্য নাই। তিনি কাউন্সিল এসেম্বলিতে যাইতে আগ্রহান্বিত নহেন, বাঙ্গালার মুসলমান মন্ত্রিসভা বাঁধিবার জন্যও কোমর বাঁধেন নাই। স্পষ্ট কথা বলিয়াছেন। তিলকে তাল পাকাইয়া বাঙ্গালায় একটা বিরাট ব্যাপার বাধাইতে তিনি অগ্রসর নহেন, তাই তাঁহার মুখে সত্য কথা শুনা যাইতেছে। যাঁহারা বাঙ্গালায় মুসলমানদিগকে লইয়া একটা স্বতন্ত্র দল পাকাইয়া স্বয়ং কর্ত্তা হইবার লালসায় উন্মত্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই মসজেদের সম্মুখে বাজনাকে একটা প্রকাণ্ড ব্যাপারে পরিণত করিতেছেন।

এই যে সে দিন কলিকাতার উপকণ্ঠে পাইকপাড়ার রথযাত্রা ও উল্টা রথযাত্রা উপলক্ষে মুসলমানরা দাঙ্গা বাধাইল ও রক্তস্রোত বহাইবার কারণ হইল, তাহার মূল কারণ কে বা কাহারা? শত বৎসর ধরিয়া পাইকপাড়ার লালাবাবুদের রথ এই পথ দিয়া শোভাযাত্রা করিয়া যাতায়াত করিয়া আসিতেছে। এত দিন মুসলমানদের তাহাতে আপত্তি হয় নাই, আজই বা হয় কেন? 'ইংলিশম্যান', 'ষ্টেটস্‌ম্যান' প্রমুখ এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্রসমূহও মুসলমানগণকে এ বিষয়ে অপরাধী করিতেছেন। আজ যদি গজনবি রহিম কোম্পানী এই বাজনা বন্ধের আব্দারটাকে ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া জাহির করিবার প্রয়াস না পাইতেন, তাহা হইলে এই রক্তপাত ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইত না। এই সমস্ত ভূঁইফোড় নেতার প্রভাব হইতে সরকার কবে সমাজকে রক্ষা করিবেন?

---

## বড়লাটের উপদেশ

নূতন বড়লাট লর্ড আরউইন এত দিন পরে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ সম্পর্কে কথা কহিয়াছেন। তিনি যে অন্যান্য অবস্থাভিজ্ঞ ভারতের মঙ্গলকামী মনীষীর ন্যায় এই শোচনীয় অবস্থায় দুঃখ প্রকাশ করিবেন, ইহা জানা ছিল। এ অবস্থার পরিবর্ত্তন না হইলে যে ভারতের ও তথা ইংলণ্ডেরও মঙ্গল নাই, এ কথাও তিনি স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু এই পরিবর্ত্তন কিসে সম্ভবপর হইতে পারে, তাহাই এখন সমস্যার

বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহারই ইঙ্গিতে ও ইচ্ছায় সার ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র কলিকাতায় আসিয়া উভয় সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া বিরোধের মীমাংসার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বড়লাট যে বক্তৃতায় হিন্দু-মুসলমান সমস্যার কথা তুলিয়াছেন, তাহাতে সমস্যা-সমাধানের একটা উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "হয় ত মধ্যস্থতার ফলে আপাততঃ একটা রফা হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে বিরোধের জড় মরিবে না। যদি হিন্দু ও মুসলমান নেতৃবর্গ আপনাদের মধ্যে একটা আপোষ মীমাংসা করিয়া লইতে পারেন, তবেই ভাল। নতুবা সরকার আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার নিমিত্ত একটা মধ্য পন্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইবেন। কিন্তু উহাও বিরোধের জড় মারিতে পারিবে না। চিরকালের জন্য বিরোধের অবসান করিতে হইলে উভয় সম্প্রদায়কেই মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তন (Change of heart ) করিতে হইবে।"

লর্ড আরউইন

কথাটা ঠিক। কিন্তু যে মনোবৃত্তির ফলে এই বিরোধের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা পরিবর্ত্তন করা সহজসাধ্য নহে। আলিগড়ে সার আবদর রহিম যে বোমা ফেলিয়াছেন ( 'ষ্টেটস্‌ম্যান' তাঁহার আলিগড়ের বক্তৃতাকে Aligarh Bomb আখ্যা দিয়াছিলেন ), তাহা যে মনোবৃত্তি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, সে মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তন সহজসাধ্য নহে। এই যে কলিকাতার রাজরাজেশ্বরীর দ্বিতীয়বারের শোভাযাত্রায় মুসলমানরা সরকারের আদেশ অমান্য করিয়া শোভাযাত্রায় বাধা প্রদান করিয়াছিল এবং শোভাযাত্রা ও পুলিসকে আক্রমণ করিয়াছিল, এ যাবৎ সার আবদর রহিম প্রমুখ মুসলমান নেতৃবর্গ তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন কি?—উহা যে অন্যায় ও আইন-বিগর্হিত, এমন কথা প্রকাশ্যে বলিয়াছেন কি? এই যে পাবনায় সংখ্যায় অসম্ভব অধিক মুসলমান দলবদ্ধ হইয়া হিন্দুর উপর অনাচার অত্যাচারের একশেষ করিল, হিন্দুর সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিল,—এ যাবৎ কয় জন মুসলমান নেতা সেই গর্হিত কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়াছেন? এই যে কুষ্টিয়ায় অসহায় হিন্দুনারীর মুসলমান দুর্ব্বৃত্তের হস্তে লাঞ্ছনা অবমাননা হইল, সার আবদর রহিম প্রমুখ মুসলমান নেতৃবর্গ সে বিষয়ে নীরব কেন? যে মনোবৃত্তির ফল এইরূপ, তাহা পরিবর্ত্তিত হইবে কিসে?

মসজেদের সম্মুখে বাজনা অধুনা বহু মুসলমানের মস্তিষ্ক বিকৃত করিয়াছে। হিন্দুরা কোনও কালে মুসলমানের নিকট অন্যায় আব্দার করে নাই। কিন্তু এই বাজনার ব্যাপার লইয়া মুসলমানপক্ষ হইতে অনেক অন্যায় আব্দার ও দাবীর কথা উঠিতেছে। এক পুরুষ পূর্ব্বে বাঙ্গালায় যে আব্দারের বা দাবীর কথা কখনও শুনা যায় নাই, এখন তাহা বিরাট আকার ধারণ করিয়াছে। এ কথা কি মুসলমানরাও অস্বীকার করিতে পারেন? আমাদের বাল্যকালেও দেখিয়াছি, হিন্দুরা মুসলমানের মহরমে আনন্দে যোগ প্রদান করিয়াছে, আবার মুসলমানরাও হিন্দুর দুর্গোৎসবে বা সরস্বতী-পূজায় আনন্দে যোগদান করিয়াছে। আজ সেই আনন্দপ্রদ অবস্থার পরিবর্ত্তন কে ঘটাইয়াছে? পাবনার মৌলভী ওয়াসিমুদ্দীন এবং উকীল মিঃ নুরুদ্দীন স্বীকার করিয়াছেন যে, মসজেদের সম্মুখে বাজনা বন্ধ রাখিবার রীতি ছিল না, উহা অতি তুচ্ছ ব্যাপার। অথচ ঐ প্রচলিত রীতির বিরোধী তুচ্ছ ব্যাপারকে কে প্রকাণ্ড করিয়া তুলিতেছে? কিছু দিন পূর্ব্বে কলিকাতায় সরকারের অসংখ্য ফৌজ কুচকাওয়াজ করিয়া বাদ্য বাজাইয়া নানা মসজেদের সম্মুখ দিয়া শোভাযাত্রা করিয়াছিল। সে সময়ে ধর্ম্মকার্য্যে বাধা পড়িতেছে বলিয়া মুসলমানপক্ষ হইতে কোনও আপত্তি উঠে নাই। সে সময়ে 'ধর্ম্মপ্রাণ' মুসলমান গরমের কাছে 'মোম' হইয়াছিলেন। তবে কেবল হিন্দুর শোভাযাত্রার সময়ে তাঁহারা নরমের 'যম' হইয়া দাঁড়ান কেন? ইহাতেও কি তাঁহাদের মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায় না?

ডাক্তার মুঞ্জে হিন্দুর পক্ষ হইতে কয়েকটি সরল সত্য কথা বলিয়াছেন। তাঁহার কথার মর্ম্ম এই যে, যদিও ইংরাজ ঐতিহাসিকরা স্বীকার করেন যে, ইংরাজরা মারাঠা ও শিখ-শক্তির নিকট হইতে ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিলেন, তথাপি এখন মুসলমানরা প্রতিপন্ন করিতে চাহেন যে, ইংরাজের অভ্যুদয়কালে ভারতবর্ষ তাঁহাদেরই ছিল, ইংরাজ তাঁহাদের নিকট হইতে ভারতবর্ষ জয় করিয়া লইয়াছেন, তাঁহারাই ইংরাজের পূর্ব্বে ভারতে 'রাজার জাতি' ছিলেন। কিন্তু ইতিহাসই সাক্ষ্য দেয় যে, দিল্লীর বাদশাহ মারাঠা রাজা সিন্ধিয়ার হস্তে ক্রীড়নক ছিলেন, পরন্তু রণজিৎ সিংহ পঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশ মুসলমানদের নিকট হইতে জয় করিয়া লইয়াছিলেন। গায়ের জোরে ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ করা যায় না। তথাপি কেন যে মুসলমানরা এই অন্যায় দাবী করিতেছেন, তাহার মূলে এক গূঢ় রহস্য আছে। তাঁহারা এই দাবীর জোরে এখন ইংরাজের সংস্কার-আইনের শ্রেষ্ঠ অংশের অধিকারী হইতে চাহেন। ইহাই হইল বিরোধের মূল কারণ।

ডাক্তার মুঞ্জের কথাগুলি নিরপেক্ষ ব্যক্তি অস্বীকার করিতে পারেন না। লর্ড আরউইন তাহা হইলে কিরূপে মুসলমানের মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তন ঘটাইবেন? উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সুবিচার করিতে হইলে লর্ড আর-উইনকে এ কথাগুলি বিশেষভাবে প্রণিধান করিতে হইবে।

## কংগ্রেস-নেতার নিরপেক্ষতা

কংগ্রেস এ দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান। ভারতবাসীর পক্ষে শ্রদ্ধার শ্রেষ্ঠ দান কংগ্রেসের নেতৃত্ব। সুতরাং যিনি দেশের লোকের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়া কংগ্রেসের নেতৃত্ব করেন, তাঁহার পক্ষে সাধারণভাবে কোনও অভিমত প্রকাশ করা, কতটা ওজন বুঝিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া 'ধীরে-সুস্থে' করিতে হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু এ বৎসরের কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট পদে বরিত হইয়াছিলেন এবং আগামী ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত—অর্থাৎ কংগ্রেসের

অধিবেশন আর না হওয়া পর্য্যন্ত কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট। সুতরাং এ দেশের রাজনীতিক সমস্ত সমস্যা সম্পর্কে তাঁহার পরম নিরপেক্ষভাবে 'ধীরে-সুস্থে' অভিমত প্রকাশ করাই যুক্তিসঙ্গত—অন্ততঃ দেশের লোক তাঁহার নিকট এই আশা করিতে পারে। তিনি বিদুষী, কবি, তাঁহার অলন্ত দেশপ্রেমে কাহারও সন্দেহ নাই। এ জন্য তাঁহার প্রতি দেশবাসী বিশেষ শ্রদ্ধাবান্। বিশেষতঃ তিনি নারী, কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্টরূপে তিনিই বলিয়াছিলেন, এ দেশ চিরদিন মাতৃত্বের সম্মান করে, এই হেতু এ দেশবাসী তাঁহাকে প্রেসিডেণ্টরূপে বরিত করিয়া মাতৃত্বের প্রতি সম্মান-প্রদর্শন করিয়াছে।

এ হেন প্রেসিডেণ্ট যদি নিজের পদোচিত গাম্ভীর্য্য ও শালীনতার সীমা অতিক্রম করিয়া দেশের কোন রাজনীতিক সমস্যা সম্বন্ধে নিরপেক্ষ অভিমত প্রকাশ না করেন, তাহা হইলে অন্তর ক্ষোভে ও দুঃখে ভরিয়া যায়। তিনি স্বরাজ্য দলের আগামী কাউন্সিল নির্ব্বাচন উপলক্ষে বাঙ্গালার জিলায় জিলায় প্রচারকার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, ইহাতে অবশ্য দেশবাসীর কিছু বলিবার নাই। তিনি স্বয়ং কাউন্সিল প্রবেশের বিরুদ্ধবাদী। কিন্তু তাহা হইলেও তিনি যদি স্বরাজ্য দলের কাউন্সিল প্রবেশ দেশের পক্ষে মঙ্গলকর বলিয়া মনে করেন এবং উহার জন্য প্রচারকার্য্যে আত্মশক্তি নিয়োগ করেন, তাহা হইলে দেশবাসীর তাহাতে আপত্তি থাকিতে পারে না। এই প্রচারকার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে যদি তিনি ভারতীয় জাতীয়তার দোহাই দিয়া এখনও হিন্দু-মুসলমান প্যাক্টের অনুকূলে প্রচারকার্য্য পরিচালনা করেন, তাহা হইলে তাহাতে হিন্দু বিস্মিত হইতে পারে, কিন্তু তাঁহাকে অপরাধিনী করিতে পারে না।

কিন্তু তিনি যদি এই প্যাক্টের খাতিরে বিবদমান পক্ষদ্বয়ের মধ্যে একপক্ষের সম্বন্ধে অনৃতবাণী প্রচার করেন, তাহা হইলে তাঁহার অপরাধ ক্ষমার যোগ্য হইতে পারে না।

পাবনার খাঁ বাহাদুর ওয়াসিমুদ্দীন আমেদ বলিয়াছেন,—"গত ২১শে জুলাই তারিখে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু পাবনায় আসিয়া সকল ব্যাপার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া অকুণ্ঠকণ্ঠে হিন্দু নেতৃবর্গের ব্যবহারের নিন্দা করিয়া গিয়াছেন ও বলিয়াছেন, তাঁহাদের এই ব্যবহারের ফলেই পাবনায় দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে ও হিন্দু-মুসলমানের দারুণ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে।" মৌলভী সাহেবের এ কথা কি সত্য? যদি সত্য হয়, তাহা হইলে কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর এই উক্তি একান্ত পক্ষপাতিতা-দোষ-দুষ্ট বলিতে হইবে। তিনি কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্টরূপে জাতীয়তার বড়াই করেন, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্যাক্ট বজায় রাখিবার জন্য ওকালতী করেন, অথচ তাঁহার মুখে কেবল হিন্দুদিগের প্রতি এই কোপ-কটাক্ষ কেন? তিনি পাবনার ব্যাপারের বিষয়ে অল্পসময়ের মধ্যে কতটুকু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন? পাবনায় যে হিন্দু দেবমূর্ত্তি সমূহ অপবিত্র ও ভগ্ন হইয়াছিল, এ কথা কি তিনি অস্বীকার করিতে পারেন? হিন্দুরা যদি সেই সকল মূর্ত্তি শোভাযাত্রা করিয়া বিসর্জ্জন করিতে গিয়া থাকে এবং সে বিষয়ে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার্থ কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি লইয়া থাকে, তবে কি তাহারা বিশেষ অপরাধ করিয়াছে? তবে মুসলমানরা ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া হিন্দুগণকে আক্রমণ করে কেন? এ বিষয়ে কি মুসলমানগণের কোনও অপরাধ নাই? কেবল হিন্দুরাই অপরাধী?

আমরা শুনিয়াছি, পাবনার মুসলমান ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিসের অনুমতিক্রমে পাবনায় হিন্দুদিগের এক সঙ্কীর্ত্তনের শোভাযাত্রা নির্গত হইবার কথা স্থির হয়। কর্ত্তৃপক্ষ বেলা ১০টা হইতে ১টার মধ্যে শোভাযাত্রার পাশ দেন। শোভাযাত্রার দিন প্রাতঃকালে স্থানীয় এক মুসলমান নেতা (সরকারী কর্ম্মচারী) ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আসিয়া শোভাযাত্রার পাশ প্রদানে আপত্তি উত্থাপন করেন। ওজুহৎ—শোভাযাত্রার পথে দুইটি মসজেদ পড়িবে। ম্যাজিষ্ট্রেট স্বয়ং মুসলমান, সুতরাং তিনি মসজেদে নামাজের সময় জানিতেন। তাই তিনি বলিলেন, যে হেতু বেলা ১০টা হইতে ১টার মধ্যে ঐ দিন নামাজের সময় নাই, সেই হেতু শোভাযাত্রায় আপত্তি থাকিতে পারে না। তথাপি সেই মুসলমান নেতা ম্যাজিষ্ট্রেটকে ভয়প্রদর্শন করিতে থাকেন যে, যদি শোভাযাত্রার পাশ দেওয়া হয়, তাহা হইলে হাঙ্গামা ঘটিবে। ম্যাজিষ্ট্রেট তখনই তাঁহাকে গ্রেপ্তার করেন। ফলে সেই নেতার মেজাজ ১০৫° ডিগ্রী ফারেণহিট হইতে ৯৫° ডিগ্রীতে নামিয়া যায়।

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু এ ক্ষেত্রেও কি হিন্দুদিগকে অপরাধী করিতে চাহেন? কলিকাতায় দ্বিতীয় রাজরাজেশ্বরী শোভাযাত্রায় যেমন মুসলমানরা সরকারের আদেশ ও নির্দ্দেশ অগ্রাহ্য করিয়া শোভাযাত্রায় বাধা দিয়াছিল, পাবনায় ঠিক তাহাই হইবার উপক্রম হইয়াছিল। কেবল ম্যাজিষ্ট্রেটের দৃঢ়চিত্ততায় ব্যাপার অধিক দূর গড়াইতে পায় নাই। এ ক্ষেত্রে কোন্ পক্ষ দোষী ছিল, তাহা শ্রীমতী নাইডু বুঝাইয়া দিবেন কি?

আরও একটা দৃষ্টান্ত আছে। সিরাজগঞ্জ রেল-লাইনের উল্লাপাড়া রেল ষ্টেশনের নিকটে এক গ্রামে ৫ শত মুসলমানের মধ্যে ৫০ জন হিন্দুর বাস ছিল। বকরিদের দিন রাত্রিকালে কোনও মুসলমান দুর্ব্বৃত্ত চারিটি নিহত গরুর পদ গ্রামস্থ হিন্দু-মন্দিরের বিগ্রহের গলদেশে ঝুলাইয়া দেয়। এই ঘটনার কথা শুনিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট গ্রামে উপস্থিত হইয়া মুসলমান মণ্ডলগণকে বলেন, যদি তাঁহারা অপরাধী ধরাইয়া না দেন, তাহা হইলে সমগ্র মুসলমান অধিবাসীদের প্রতি কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা হইবে এবং ভবিষ্যতে গ্রামে কোরবাণি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। এই ভয়প্রদর্শনের ফলে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সেই দুর্ব্বৃত্ত মুসলমান পিশাচ ধৃত এবং দণ্ডিত হয়।

এ ক্ষেত্রেও দেখা যাইতেছে যে, মুসলমানই প্রথম অপরাধী। হিন্দুরা মুসলমানের ধর্ম্মের বা দেবস্থানের কোনও অসম্মান করে নাই, মুসলমান হিন্দুর দেবস্থানের অমর্য্যাদা করিয়াছিল। শ্রীমতী নাইডু এ কথার উত্তরে কি বলিতে চাহেন?

শ্রীমতী নাইডু 'ফ্রী প্রেসের' প্রতিনিধির নিকট যে ভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহার মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বলিয়াছেন,—"বাঙ্গালার হিন্দুগণের নিকট শুনিয়া শুনিয়া আমার ধারণা জন্মিয়া গিয়াছে যে, মুসলমান প্রতিষ্ঠান সমূহ এবং মুসলমান নেতৃবর্গই (বিশেষতঃ সার আবদর রহিমের মত) কেবল বর্ত্তমান সর্ব্বনাশের কারণ। এই ভাবের অভিমত প্রকাশ করিয়াছি বলিয়া আমার নামে রটনা হইয়াছে। কিন্তু আমি যাহা যথার্থ বলিয়াছি, তাহা এই:—যে সকল হিন্দু-সাম্প্রদায়িক নেতা হিন্দু-সংগঠনের প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হইতে বিচ্যুত হইয়া ঐ প্রতিষ্ঠানের কার্য্য ভিন্ন খাতে পরিচালনা করিতেছেন, তাঁহারা বর্ত্তমানে রাজনীতিক কাউন্সিল নির্ব্বাচন সম্পর্কিত আন্দোলন প্রবর্ত্তন করিয়া সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য ও বিরোধ সংঘটনের কারণ হইয়াছেন। অথচ হিন্দু-সংগঠনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য তাহা ছিল না, হিন্দুর সামাজিক সংস্কার এবং একতা-বিধানই সংগঠনের প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল। সুতরাং হিন্দু নেতারা এ বিষয়ে মুসলমান নেতাদিগের মত সমান দায়ী।" শ্রীমতী নাইডু এ 'অভিনব বার্ত্তা' কোথায় সংগ্রহ করিলেন জানি না। তিনি বাঙ্গালী হইলেও জীবনের অধিকাংশ সময় মুসলমান-প্রধান দেশে (হায়দ্রাবাদে) অতিবাহিত করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার মুসলমান-প্রীতি বিস্ময়ের বিষয় না হইতে পারে। কিন্তু তাহা বলিয়া তিনি ধর্ম্মান্ধ মুসলমান নেতাদিগের সহিত হিন্দু নেতাদিগকে একাসনে বসাইবার কি কারণ পাইয়াছেন? হিন্দু নেতারা হিন্দু-সংগঠনের কার্য্য ভিন্ন খাতে পরিচালনা করিয়াছেন, ইহার প্রমাণ কোথায়? সাম্প্রদায়িক স্বার্থের কথা জাঁকাইয়া তুলিবার মূল কারণ কে, তিনি কি জানেন না? আলিগড়ে সার আবদর রহিম যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন এবং যে বক্তৃতাকে

'ষ্টেটস্‌ম্যান' পত্রও Aligarh Bomb shell বলিয়া অভিহিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, সেই বক্তৃতাই কি যত অনর্থের মূল নহে? সার আবদর আলিগড়ে যে আগুন জ্বালাইয়াছেন, মিঃ গজনবি কি মসজেদের সম্মুখে বাজনা বন্ধের আন্দোলন তুলিয়া তাহাতে ইন্ধন যোগাইতেছেন না? হিন্দু-সংগঠনের নেতৃবর্গ এই আগুনের ঝাঁজ হইতে আপনাদের সমাজকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত হিন্দুদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার প্রয়াস পান, তাহা হইলে তাঁহারা কি বিশেষ অপরাধে অপরাধী হন?

হিন্দু-সংগঠন আন্দোলনের বহু পূর্ব্বে Pan-Islamic প্রচারকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, এ কথা শ্রীমতী নাইডু অস্বীকার করিতে পারেন না। যখন খেলাফৎ আন্দোলন হয়, তখন মিঃ সৌকৎ আলি ও মিঃ মহম্মদ আলি প্রমুখ মুসলমান নেতারা হিন্দুগণের অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়া খেলাফৎ আন্দোলনকে সজীব ও শক্তিশালী করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। গত বলকান যুদ্ধের সময় সৌকৎ আলি তাঁহার Servants of the Caba অর্থাৎ কাবার সেবিসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মুসলমানের ধর্ম্মস্থান রক্ষা তাহার গৌণ উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু এই সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্যের কথা সমিতির Prospectus ও appeal হইতে জানা যায়। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল 'Comrade' পত্র হইতে উহা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, নিখিল জগতের মুসলমানদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করাই তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল। খেলাফৎ কমিটীর প্রতিষ্ঠার পর হইতে এই আন্দোলন আরও দৃঢ়মূল হয়। মিঃ সৌকৎ আলি তাঁহার 'কাবার সেবিসঙ্ঘের' জন্য ১০ লক্ষ সভ্য আহ্বান করিয়াছিলেন। ইহাই কি বর্ত্তমান সাম্প্রদায়িক বিরোধের প্রথম পর্ব্ব নহে? হিন্দুরা যখন সংগঠনের স্বপ্ন পর্য্যন্ত দেখে নাই, তখন হইতে এই নিখিল মুসলমান সংগঠনের চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। তবে হিন্দু সংগঠনের প্রবর্ত্তয়িতারা কিরূপে মুসলমান কাবা সেবিসঙ্ঘ ও খেলাফৎ প্রবর্ত্তয়িতাদের সহিত তুল্য অংশে অপরাধী হইয়াছেন?

পাবনা, কুষ্টিয়া প্রভৃতি স্থানে সংখ্যার অত্যধিক মুসলমানরা যে ভাবে হিন্দুদিগকে আক্রমণ ও বিধ্বস্ত করিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, হঠাৎ বঙ্গের কোন মুসলমান-প্রধান স্থানে মুসলমানরা ক্ষেপিয়া উঠিলে সরকারের পক্ষে আশু সাহায্যদানের বা শান্তিরক্ষা করার ক্ষমতা নাই। হিন্দুর ধনপ্রাণ অথবা মান-ইজ্জৎ নষ্ট হইবার পর স্থানান্তর হইতে শক্তি সংগ্রহ করিয়া সরকার দাঙ্গা-হাঙ্গামা মিটাইতেছেন বটে, কিন্তু দাঙ্গার প্রথম মুখে হিন্দু সংখ্যায় অল্প বলিয়া প্রহৃত ও হতমান হইতেছে। এ ক্ষেত্রে হিন্দুর পক্ষে কর্ত্তব্য কি? সে কি চিরদিনই কৃপার পাত্ররূপে দাঁড়াইয়া মার খাইবে? এ অবস্থায় যদি হিন্দু রাজনীতিক ভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হইবার চেষ্টা করে, তবে তাহারা দোষী হইবে কেন? শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু স্বয়ং নারী হইয়া কুষ্টিয়া প্রভৃতি স্থানে হিন্দু-নারীর অপমান-নির্য্যাতনের কথা শুনিয়াও কি এখন হিন্দু-সংগঠনের নেতৃবর্গকে অপরাধী স্থির করিবেন?

কিন্তু শ্রীমতী নাইডু বিদুষী, কবি, দেশপ্রেমিকা বা কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট—যাহাই হউন, তাঁহার এই অযাচিত উপদেশ হিন্দু গ্রহণ করিবে না। জাতি হিসাবে হিন্দু মরিতে পারে না। যে বাঙ্গালী হিন্দুর মধ্যে রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল, সার আশুতোষ, সুরেন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং এখনও যে বাঙ্গালী হিন্দুর মধ্যে সার জগদীশ, সার প্রফুল্ল ও রবীন্দ্রনাথ জীবিত রহিয়াছেন,—সেই বাঙ্গালী হিন্দু মরিতে পারে না। তাহাকে বাঁচিতে হইলে সঙ্ঘবদ্ধ হইতেই হইবে। কংগ্রেস, কাউন্সিল, স্বরাজ,—এখন দূরের কথা, এখন হিন্দুর হিন্দু হওয়াই প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। এ জন্য হিন্দু-সংগঠনের বিশেষ প্রয়োজন। সে সংগঠন যদি রাজনীতির দিক দিয়াও করা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে তাহাই করিতে হইবে।

# নির্য্যাতিতা হিন্দু-নারী

এত দিনে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভা একটা কাযের মত কায করিয়াছেন, এ জন্য আমরা তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। বাঙ্গালার মুসলমান-প্রধান স্থানে পশুপ্রকৃতির মুসলমান দুর্ব্বৃত্তের হস্তে হিন্দু-নারীর লাঞ্ছনা অবমাননা নূতন নহে। এত দিন এই সকল নির্য্যাতিতা নারী সমাজের কঠোর শাসনে সমাজের বক্ষে স্থান পাইতেন না। ফলে তাঁহাদের মধ্যে অনেককে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিতে অথবা হীনবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইত। গত ২০শে জুলাই তারিখে কলিকাতার ব্রাহ্মণ-সভা-গৃহে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভা কয়টি মন্তব্য গ্রহণ করিয়াছেন। মন্তব্যগুলি এই :—

(১) যে সকল হিন্দুনারী বলপূর্ব্বক অথবা কৌশলক্রমে ধৃত ও অপহৃত হইয়া থাকেন, অথবা বলপূর্ব্বক ধর্ষিত বা সতীত্বরত্নে বঞ্চিত হন, তাঁহাদিগকে প্রায়শ্চিত্তের পর আবার হিন্দু-সমাজে গ্রহণ করা হইবে। এ সম্বন্ধে পবিত্রভাবে গঙ্গাস্নানই দেহশুদ্ধির উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(২) শালগ্রাম-শিলার চক্র যদি ভগ্ন হয়, তাহা হইলে উহা নদীগর্ভে অর্পণ করিয়া নূতন শিলার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। শিলার চক্র যদি ভগ্ন না হয়, তাহা হইলে কেবল নদীগর্ভে ডুবাইয়া লইলেই হইবে। যদি গৃহের দেব-বিগ্রহ বিকলাঙ্গ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে উহা নদীগর্ভে অর্পণ করিয়া নূতন বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

(৩) কেবল কলমা-পড়া হিন্দুর পক্ষে পাপ বলিয়া গৃহীত হইবে না। যদি হিন্দুকে বলপূর্ব্বক নিষিদ্ধ অন্ন বা অন্য খাদ্য আহার করান হয়, তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্তের পর তাহাকে সমাজে গ্রহণ করা হইবে।

ব্রাহ্মণ-সভার জয় হউক। তাঁহারা যে কালের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতেছেন, ইহা পরম সুখের কথা। এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, হিন্দু-সমাজে ব্রাহ্মণের স্থান এখন আর পূর্ব্বের মত না হইলেও হিন্দু ব্রাহ্মণকে শাস্ত্রকার ও ব্যবস্থাদাতা বলিয়া স্বীকার করে। সুতরাং সেই ব্রাহ্মণ-সভার পক্ষ হইতে এই সমস্ত সময়োপযোগী ব্যবস্থা হওয়ায় সমগ্র হিন্দু-সমাজ প্রীতিলাভ করিয়াছে।

ব্রাহ্মণ-সভার নিকট আমাদের আর একটি আবেদন আছে। বাঙ্গালায় অস্পৃশ্য অন্ত্যজগণের সম্বন্ধে বিশেষ কড়াকড়ি ব্যবস্থা ( মাদ্রাজের মত ) নাই। অথচ যেটুকু আছে, তাহার মধ্যে কিছু কিছু বন্ধন কালের উপযোগী করিয়া শিথিল করিয়া দিলে হিন্দুর মধ্যে একতা প্রতিষ্ঠার সুবিধা হয়। আমরা কখনও বলি না যে, 'রোটী বেটী'র বন্ধন উঠাইয়া দিয়া একাকারের প্রতিষ্ঠা করা হউক। কিন্তু তাহা না করিয়াও হিন্দুর সকল জাতির মধ্যে একটা প্রীতির বন্ধন অনায়াসে স্থাপন করা যায়। কি ভাবে সে বন্ধন স্থাপিত হইবে, তাহা ব্রাহ্মণ-সভাই বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত করুন, ইহাই কামনা।

# সকলই কৃষ্ণের ইচ্ছা

পাবনার পিশাচ দস্যুর তাণ্ডবলীলার পর কলিকাতা হইতে কয়েক জন বাঙ্গালী হিন্দু অত্যাচারিত উৎপীড়িত বিপন্ন হিন্দু ভ্রাতৃবর্গকে ভরসা ও সাহায্যদানের উদ্দেশে গমন করিয়াছিলেন, এ কথা সকলেই জানেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে এক জন প্রত্যক্ষদর্শী যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে পাবনার বাঙ্গালী হিন্দুর [illegible] জানিয়া যায়। তিনি

বলিয়াছেন,—"আমরা পাবনা সহরে উপস্থিত হইয়া হিন্দু জনসাধারণকে যেরূপ সন্ত্রস্ত, ভীত ও বিচলিত দেখিলাম, তাহাতে মনে হইল, বাঙ্গালী হিন্দু মনুষ্যত্বশূন্য হইয়াছে। তখন পাবনা সহর মিলিটারী পুলিস ইত্যাদিতে ভরিয়া গিয়াছে। মুসলমান গুণ্ডার অত্যাচারের ভয় তখন একবারেই নাই। সত্য বটে, পূর্ব্বে স্থানীয় সরকারী রক্ষক দুর্ব্বৃত্ত উত্তেজিত মুসলমান জনতাকে যোড়হস্তে কাকুতি-মিনতি করিয়া হিন্দুদিগকে ক্ষমা-ঘৃণা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন ; সত্য বটে, সে জন্য মুসলমান গুণ্ডারা মনে করিয়াছিল, পাবনায় বৃটিশ রাজত্বের অবসান হইয়াছে, অতএব তাহারা ঐ জিলার সহরে-মফঃস্বলে সংখ্যায় অল্প হিন্দুগণের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার করিতে পারে, সত্য বটে সেই সময়ে পাবনা জিলার গ্রামে গ্রামে দলবদ্ধ গুণ্ডা মুসলমান তথায় মুসলমানরাজের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে মনে করিয়া লুঠ-পাঠ ও অত্যাচার অনাচারের চূড়ান্ত করিয়াছিল,—কিন্তু যে সময়ে আমরা পাবনায় উপস্থিত হইয়াছিলাম, তখন মুসলমান অত্যাচারী দস্যুর বিষদন্ত ভগ্ন হইয়াছিল, তখন তাহাদিগের নিকট কোনও আশঙ্কার কারণ ছিল না। তথাপি আমরা আতাইকোলার বাজারে যাইবার জন্য এক জনও স্থানীয় পথিপ্রদর্শক পাইলাম না। কেহই ভয়ে মফঃস্বলে যাইতে চাহে না। পরে বহুকষ্টে আমরা ৩টি বাঙ্গালী যুবককে সম্মত করাইলাম। তাহারাও ভয়ে ভয়ে আমাদের সহিত অগ্রসর হইল। পথে এক স্থানে এক জন পথিক সংবাদ দিল, মাত্র ১ ক্রোশ দূরবর্ত্তী স্থানে প্রায় সহস্রাধিক মুসলমান একটা হাট লুঠ করিয়া আমাদের দিকেই অগ্রসর হইতেছে। শুনিবামাত্র পাবনার সেই ৩ জন যুবক প্রাণভয়ে রুদ্ধশ্বাসে পাবনার দিকে ছুট দিল। পরে অবশ্য খবর পাওয়া গেল, সংবাদটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

"পথে কোন কোন গ্রামে আমরা হিন্দু অধিবাসীদিগের গৃহে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগের সহিত কথাবার্ত্তা কহিলাম। কেহই দেখা করিতে চাহে না, সকলেরই মুখে আশঙ্কার চিহ্ন,—যেন আমরা চলিয়া গেলেই তাহারা স্বস্তি লাভ করে। অনুসন্ধানে জানিলাম, তাহাদের ভয়, পাছে তাহারা আমাদিগকে গৃহে স্থান দিয়াছে শুনিয়া মুসলমানরা আবার তাহাদিগকে আক্রমণ করে!

"সর্ব্বত্রই দেখিলাম, হিন্দুর গৃহ বিধ্বস্ত, বাজার হাট লুণ্ঠিত—সবই যেন শ্মশান সদৃশ! কাহারও গৃহে আহার্য্য বা অর্থ কিছুই নাই। পাষণ্ড মুসলমান দস্যুরা নির্য্যাতন ও লুণ্ঠন করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, তাহারা অযথা বহু আহার্য্য ও গৃহ-সজ্জার দ্রব্যাদি পথে ধ্বংস করিয়া ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছে।

"অধিবাসীদিগের মধ্যে অধিকাংশই বৈষ্ণব। তাহাদের গলদেশে তুলসীর মালা, কণ্ঠী ও টিকিরও অভাব নাই। যে কয় জন হিন্দুকে আমরা কথা কহাইতে পারিয়াছিলাম, তাহাদের সকলেরই মুখে একই কথা শুনিয়াছি :—'সকলই কৃষ্ণের ইচ্ছা! তাঁর ইচ্ছায় আমাদের সর্ব্বনাশ হয়েছে যখন, তখন ও সর্ব্বনাশ আমাদের মঙ্গলের জন্য।' কথাটা শুনিয়া আমাদের হাসিও পাইল, দুঃখও হইল। যদি যথার্থ সরল বিশ্বাসে তাহারা এ কথা বলিত, তাহা হইলে ইহাতে হাসিবার বা দুঃখ করিবার কোনও কথা ছিল না। কিন্তু আপনার অকর্ম্মণ্যতার অপরাধের বোঝা দৈবের স্কন্ধে চাপাইয়া দেওয়া আমরা কোনমতে সমর্থন করিতে পারিলাম না। কেন পারিলাম না, তাহা পরে বলিতেছি।

"আমরা বলিলাম, 'শ্রীকৃষ্ণ কবে কোথায় জনগণকে কাপুরুষতা প্রদর্শন করিতে উপদেশ দিয়াছেন—কবে তিনি হিন্দুকে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে নিষেধ করিয়াছেন?' ইহার কোনও সদুত্তর পাইলাম না। কাপুরুষতার কথা ছাড়িয়া দিলেও হিন্দু যে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে চেষ্টা করে নাই, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। আমরা কোনও এক গ্রামে দেখিলাম, সেখানে অন্যান্য হিন্দুর সহিত আমরা ১২।১৪ ঘর নমঃশূদ্রকেও দেখিলাম। আশ্চর্য্যের কথা, গ্রামের তাবৎ হিন্দুর গৃহই আক্রান্ত ও লুণ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু নমঃশূদ্রগণের গৃহের একটি গাছের পাতাও ছিন্ন হয় নাই। আমরা নমঃশূদ্রগণকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহারা গ্রামে থাকিতে দুর্ব্বৃত্ত দস্যুগণকে বাধা প্রদান করে নাই কেন? উত্তরে তাহারা যাহা বলিয়াছিল, তাহা প্রত্যেক হিন্দুরই বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য। তাহারা বলিল, 'কেন আমরা বাধা দিব? আমরা হিন্দুও নহি, মুসলমানও নহি, কাযেই হিন্দু-মুসলমানের বিরোধে আমরা থাকিব কেন?' আমরা বলিলাম, 'তোমরা ত হিন্দু, তবে হিন্দুর বিপদে তাহাদের সহায় হইলে না কেন?' তাহারা বলিল, 'আমরা- কিসের হিন্দু? আমাদের এই গ্রামের হিন্দুরা মুসলমানকে তাঁহাদের ঘরের দাওয়ায় মাদুরে বসিতে দেন, তাঁহাদের হুঁকা হইতে কলিকা খুলিয়া লইয়া তামাক খাইতে দেন, আরও কত কি করেন ; কিন্তু আমরা দেখা করিতে গেলে ঘরের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে দেন না। সুতরাং আমরা তাঁহাদের আপনার, না মুসলমানরা তাঁহাদের আপনার? এই কথাটা উঁহাদেরই জিজ্ঞাসা করুন না।' আমরা স্তম্ভিত হইলাম। ইহার উত্তর কি দিব, ভাবিয়া পাইলাম না। পরন্তু অন্য হিন্দুগণকে এ বিষয়ে অনুযোগ করিলে তাঁহারা বলিলেন, 'নমঃশূদ্র যে অস্পৃশ্য, তাহাদিগকে কিরূপে বাড়ীতে ঢুকিতে দেওয়া যায়?' আমরা শুনিয়া মর্ম্মাহত হইলাম। এখনও এই কথা! হিন্দুজাতির এই শোচনীয় অধঃপতন কে রোধ করিবে?"

প্রত্যক্ষদর্শী যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে কি মনে হয়? বাঙ্গালী হিন্দু কি এইরূপে অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া ও গণ্ডীর গণ্ডী দিয়া জাতির বেড়া বানাইয়া ধ্বংসমুখে অগ্রসর হইবে? হিন্দু কি সঙ্ঘবদ্ধ হইবার কোনও চেষ্টা করিবে না? বাঙ্গালার অনেক স্থানে 'নিম্নশ্রেণীর' হিন্দুরাই দেবমন্দির ও দেববিগ্রহ রক্ষা করিয়াছে, তথাকথিত উচ্চজাতি সে বিষয়ে কার্য্যতৎপরতা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। অথচ তাঁহারাই হিন্দুয়ানীর বড়াই করিয়া 'নিম্নশ্রেণীদিগকে অস্পৃশ্য বলিয়া দূরে রাখিতে চাহেন! ইহা কি বিড়ম্বনা নহে? কেহ হিন্দুকে জাতির বৈশিষ্ট্য হারাইয়া একাকার করিতে বলে না। 'রোটী ও বেটী' অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া কি সম্ভবপর হয় না? আমরা শুনিয়াছি, চট্টগ্রামের কোনও সম্ভ্রান্ত হিন্দু জমীদার ও ব্যবসাদার তাঁহার এলাকার মধ্যে এক কালীমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া তথায় সকল শ্রেণীর হিন্দুর অবাধ গতির ও পূজার অধিকার সাব্যস্ত করিয়া দিয়াছেন। এমনও ব্যবস্থা হইয়াছে যে, 'নিম্ন জাতির' লোকও যদি অগ্রে মন্দিরে গমন করে, তবে পূজার অধিকার তাহার সর্ব্বাগ্রে। এতদ্ব্যতীত নামসঙ্কীর্ত্তন, যাত্রা, কথকতা, রামায়ণ গান ইত্যাদি দ্বারা সকল শ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে একটা হৃদ্যতা ও সঙ্ঘবদ্ধতার সৃষ্টি করা হইতেছে। এই ভাবে সকল শ্রেণীর হিন্দুর প্রতি মানুষের মত ব্যবহার করিলে হিন্দুর সঙ্ঘবদ্ধ হইতে কয় দিন লাগে? এত লাঞ্ছনা ও অবমাননার পরেও কি হিন্দুর চৈতন্য হইবে না?

তাই বলিতেছি, হিন্দুকে এখন বৃথা দর্প ও অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া সকল শ্রেণীর হিন্দুর সহিত সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে। ইহাতেই তাহার মুক্তি, ইহাতেই তাহার মঙ্গল। অন্যথা অচিরে ধরাপৃষ্ঠ হইতে তাহার নাম মুছিয়া যাইবে।

---

## আবদারের বন্যা

এই বর্ষায় নদীসমূহে যেমন জলস্রোতের বন্যা বহিতেছে, তেমনই বাঙ্গালার মুসলমানদিগের আকাঙ্ক্ষার নদীতে আবদারের স্রোতের বন্যা দেখা দিতেছে। সার ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র যদিও বে-সরকারী ভাবে

কলিকাতায় আসিয়া হিন্দু-মুসলমানে একটা আপোষ বন্দোবস্তের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তথাপি ইহা সকলেরই বিদিত যে, বড়লাট লর্ড আরউইন সরকারী ভাবে না হইলেও এই মিলন-সংঘটনের মূলে ছিলেন, পরন্তু তাঁহারই ইচ্ছায় ও ইঙ্গিতে সার ভূপেন্দ্রনাথ কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। সুতরাং আশা করা গিয়াছিল যে, যে রহিম-গজনবি কোম্পানী মসজেদের সম্মুখে হিন্দুর বাজনা শুনিলে ধর্ম্ম গেল বলিয়া চীৎকার করেন, অথচ সরকারের মিলিটারী ব্যাণ্ড সদর্পে সেই মসজেদের সম্মুখে ঝম ঝম বাজনা বাজাইয়া গেলে বিবরে লুকাইয়া ধর্ম্ম রক্ষা করেন, সেই কোম্পানী সার ভূপেন্দ্রের মান রাখিয়া সম্ভবমত একটা রফায় সম্মত হইবেন। কিন্তু তাঁহারা সার ভূপেন্দ্রকে যে তিনটা রফার সর্ত্ত দিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহাদের আবদারের মাত্রার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহারা কলিকাতার মসজেদগুলিকে ৩ শ্রেণীতে ভাগ করিতে চাহেন:—(১) যে সকল মসজেদ মুসলমান-প্রধান পল্লীমধ্যে অবস্থিত; (২) যে সকল মসজেদ সমান অংশে বিভক্ত হিন্দু-মুসলমান পল্লীর মধ্যে অবস্থিত, (৩) যে সকল মসজেদ হিন্দু-প্রধান পল্লীমধ্যে অবস্থিত। প্রথম শ্রেণীর মসজেদের সম্মুখে বাজনা সম্বন্ধে তাঁহাদের ফতোয়া এই যে, সারা দিন-রাত্রি উহাদের সম্মুখে বাজনা বন্ধ রাখিতে হইবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর মসজেদের সম্মুখে বাজনা সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিমত এই যে, মুসলমানদিগের ৫ বার নামাজের সময় ৫ ঘণ্টা বাজনা বন্ধ রাখিতে হইবে। আর তৃতীয় শ্রেণীর সম্বন্ধে তাঁহাদের ব্যবস্থা এই যে, ঐ ৫ বার নামাজকালে মোট ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট কাল বাজনা বন্ধ রাখিতে হইবে।

ইহাই কি আপোষের উপযোগী সর্ত্ত? বৃটিশ সরকারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদালত প্রিভি কাউন্সিল যে আইন ( Ruling ) নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, হিন্দুরা তাহার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে কেন? বৃটিশ রাজার প্রত্যেক প্রজার রাজপথের উপর সকলের সহিত সমান অধিকার আছে। কাহারও মনস্তুষ্টির জন্য কোনও সম্প্রদায়ের লোক সে অধিকার ত্যাগ করিতে পারে না। যদি মসজেদের সম্মুখে বাজনা এত দিন পরে মুসলমানের ধর্ম্ম ক্ষুণ্ণ করে, তাহা হইলে রাজপথ হইতে দূরে মসজেদ সরাইয়া লইয়া যাইলেই হয়। এ সম্বন্ধে পাটনার ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশকে নজীর বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। দিল্লীর বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ গত ইদের সময় গো-কোরবাণী সম্বন্ধে যেরূপ নিরপেক্ষ আইন বাঁধিয়া দিয়াছিলেন, কলিকাতায় মসজেদের সম্মুখে বাজনা সম্বন্ধে রাজার শ্রেষ্ঠ বিচারালয়ের আইন ত বাঁধিয়া দিলেই হয়। মুসলমান যদি বলিতে পারে, মসজেদের সম্মুখে বাজনা তাহার শরিয়তের বিরুদ্ধ, তাহা হইলে হিন্দুও ত বলিতে পারে, গো-কোরবাণী তাহার শাস্ত্রবিরুদ্ধ—গঙ্গায় মাঝিমাল্লার মলমূত্র ত্যাগ তাহার শাস্ত্রবিরুদ্ধ। তবে কি সরকারকে মুসলমানের শরিয়তের ও হিন্দু-শাস্ত্রের বিশেষ বিধির অনুযায়ী বিশেষ আইন গঠন করিতে হইবে, সাধারণ প্রজার অধিকার ক্ষুণ্ণ করিতে হইবে? হিন্দু যদি বলে, মসজেদে আজান গান হিন্দুর ধর্ম্ম ক্ষুণ্ণ করে, তাহা হইলে কি আজান উঠাইয়া দিতে হইবে? মুসলমান-প্রধান পল্লীতে বাজনা একবারে নিষিদ্ধ করিবার আবদার করা হইয়াছে। তবে আবদার গোরা-পল্টনের ঝম ঝম ব্যাণ্ড বাজনা সম্বন্ধেও করা হয় নাই কেন?

এই ভাবে আবদারের পর আবদার রক্ষা করিতে হইলে অবস্থা কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে? রাজপথে বাজনা বাজাইয়া শোভাযাত্রার যে অধিকার কলিকাতাবাসী হিন্দুরা কলিকাতার প্রতিষ্ঠা অবধি ভোগ করিয়া আসিতেছে, বাঙ্গালা সরকার মুসলমানের আবদারে তাহা সঙ্কুচিত করিতেছেন, আদালতে তাহার মীমাংসা করিতে অবসরও দিলেন না; ইহাতে মুসলমানের আবদার কত বাড়িয়া গিয়াছে, তাহা পর পর কতকগুলি ঘটনায় দেখা যায়।

প্রথম দফায় আমরা নারিকেলডাঙ্গার পোষ্ট মাষ্টারের কথা উল্লেখ করিতে পারি। তিনি হিন্দু। তিনি তাঁহার বাসায় সত্যনারায়ণ পূজা করিতেছিলেন। বাজনা শুনিয়া পল্লীর মুসলমানরা তাঁহাকে পূজার বাজনা বন্ধ করিতে বলে।

দ্বিতীয় দফায় ধর্ম্মতলার মোড়ের মসজেদের সম্মুখে হিন্দু মিঠাইওয়ালা রাত্রি ১০টার পর পূজার বাজনা বাজাইয়াছিল। এত দিন এই বাজনায় কোনও আপত্তি উঠে নাই। হঠাৎ মুসলমানরা বাজনায় আপত্তি করে। ঐ উপলক্ষে 'হঠাৎ' সেই সময়ে সাহিদ সুরাবর্দ্দী সাহেব ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া হিন্দুদিগকে "ইল্লৎ প্রতিমাপূজক" বলিয়া গালি পাড়েন।

তৃতীয় দফায় তালতলার ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রোডের ৮৪ নং ভবনে এবং ৮২ নং ভবনে হিন্দুরা বহুদিন যাবৎ হরিসংকীর্ত্তন করিয়া আসিতেছেন। সংপ্রতি হঠাৎ রাত্রি ১০টার সময় সংকীর্ত্তনকালে নিকটস্থ মসজেদ হইতে মুসলমানরা আসিয়া সংকীর্ত্তন বন্ধ করিতে বলে। অথচ তখন নামাজের সময় নহে।

তাহা হইলে কি বুঝিতে হইবে? মুসলমানের আবদারের পর আবদার বাড়িয়া যাইতেছে না কি? এ আবদারের যদি প্রশ্রয় দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহার পরিণাম কি দাঁড়াইবে? ইহার পর হিন্দুর গৃহদেবতার পূজায় কাঁসর-ঘণ্টা বাজানও কি তাহা হইলে নিষিদ্ধ হইবে? ইহা ত মুসলমান রাজত্বেও কখনও সম্ভব হয় নাই।

মুসলমানদের এরূপ মনোবৃত্তি থাকিলে সার ভূপেন্দ্রনাথের শত চেষ্টাও সফল হইবে না। যদি যথার্থই মুসলমানদের আপোষের ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা এ সকল অন্যায় আবদার ছাড়িয়া দিন। হিন্দু কাহারও ধর্ম্মে আঘাত করিতে চাহে না—সে প্রবৃত্তিই তাহাদের নাই, কেন না, তাহারা সকল ধর্ম্মকেই শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে। তাহারা উত্যক্ত না হইলে প্রতিশোধপরায়ণ হয় না। এ অবস্থায় মুসলমানরা যদি যুক্তিতর্কের দ্বারা আপোষে হিন্দুদিগকে বুঝাইয়া দেন যে, কোনও কোনও মসজেদের সম্মুখে বাজনা বাজাইলে মুসলমানের ধর্ম্মে আঘাত লাগে অথচ সে সময়ে বাজনা বন্ধ করিলে হিন্দুর কোনও ক্ষতি হয় না, তাহা হইলে হিন্দু সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁহাদের কথায় সম্মত হইবেন। কিন্তু ঐ সঙ্গে তাঁহাদিগকেও গো-কোরবাণী সম্বন্ধে এরূপ ভাবে কার্য্য করিবার প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে, যাহাতে উহার দ্বারা হিন্দুর ধর্ম্মে কোনও আঘাত না লাগে। আমাদের মনে হয়, এই ভাবে কার্য্য করিলে আপোষ হইতে পারে, অন্যথা নহে।

## অপরাধ কাহার?

যে সর্ব্বনাশকর সাম্প্রদায়িক বিরোধের ফলে সোনার বাঙ্গালা ছারেখারে যাইতে বসিয়াছে, সেই বিরোধের জন্য মূলতঃ অপরাধী কে? মুসলমান বলিতেছেন, হিন্দুই মূল অপরাধী, সে মুসলমানকে তাহার ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া সকল স্বার্থ নিজেই উপভোগ করিতেছে এবং তাহারই ফলে মুসলমানরা ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত হইয়া নিজের গণ্ডা আদায় করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে। এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বস্তুতঃ হিন্দুই অপরাধী। কিন্তু পূর্ব্বাপর এ দেশের ইংরাজ রাজত্বের রাজনীতিক ইতিহাস আলোচনা করিলে এ কথার যথার্থতা উপলব্ধি হয় না। হিন্দু যখন এ দেশে প্রথম রাজনীতিক আন্দোলন আরম্ভ করে, তখন মুসলমান-সম্প্রদায় সার সৈয়দ আমেদের পরামর্শ অনুসারে সেই আন্দোলন হইতে দূরে ছিল। তাহার পর ক্রমে কতক মুসলমান হিন্দুর রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসে যোগদান করিতে আরম্ভ করেন। উহা সত্ত্বেও এ দেশে মসলেম লীগের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল এবং উহা যে কংগ্রেস হইতে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান, তাহা জগতের লোককে বুঝান হইয়াছিল। পরে এমন

অবস্থা উপস্থিত হয় যে, লীগের সার্থকতা হ্রাস হয়, কংগ্রেস উভয় সম্প্রদায়ের সম্মিলিত রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়, লীগের পরিবর্ত্তে খিলাফৎ প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয়। অসহযোগ আন্দোলনকালে কংগ্রেস ও খিলাফৎ বৈঠক একরূপ একমতাবলম্বী হইয়াছিল। পরন্তু লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট হইতে আরম্ভ করিয়া স্বরাজ্য প্যাক্ট পর্য্যন্ত নানা রফার দ্বারা হিন্দু মুসলমানের অনেক দাবী স্বীকার করিয়া লয়। সকল ক্ষেত্রেই হিন্দু ত্যাগ স্বীকার করিয়া আসিয়াছে, নানারূপে মুসলমানের মনস্তুষ্টিসাধন করিয়া জাতীয়তা জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছে। ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, হিন্দু মুসলমানের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিয়া বিরোধ ঘটাইবার চেষ্টা করে নাই।

কিন্তু মুসলমান মালাবার, কোহাট, সাহারাণপুর, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে বিরোধ ঘটাইয়া হিন্দুর স্বার্থহানি করিয়াছে, এমন কথা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয় না। তবে আবার হিন্দুরাও যে বিরোধ ঘটাইয়া মুসলমানের স্বার্থহানি করিয়াছে, এ কথাও স্বীকার্য্য। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুসলমান হিন্দুকে আক্রমণ করিয়া স্বার্থহানি করিয়াছে, এ কথা অস্বীকার করা যায় না।

তাহার পর কলিকাতার সাম্প্রদায়িক বিরোধের ইতিহাস আলোচনা করা যাউক। ২রা এপ্রেলের দাঙ্গা সম্পর্কে পুলিস কমিশনারের রিপোর্টে প্রকাশ, দীনু মিঞার মসজেদের সম্মুখে মুসলমানরা প্রথমে আক্রমণ করে—The First militant act was committed by some Mahommedans. মুসলমানরা ঐ সময়ে জাকারিয়া ষ্ট্রীটের হিন্দুর মন্দির আক্রমণ করিয়া শিবলিঙ্গ চূর্ণ করে। উহার ফলে কলিকাতায় প্রথম শান্তিভঙ্গ হয়।

দ্বিতীয় দফা—তুলাপটির হাঙ্গামা।—২২শে এপ্রেল বড়বাজার তুলাপটিতে কয় জন মুসলমান মাতালের ভাণ করিয়া হিন্দুদিগকে অকথ্য অশ্রাব্য ভাষায় গালি দেয়। তাহার ফলে দ্বিতীয় বারের দাঙ্গাহাঙ্গামা আরম্ভ হয়।

তৃতীয় দফা—রাজরাজেশ্বরী মিছিল।—১লা জুন বড়বাজারের রাজরাজেশ্বরী প্রতিমা বিসর্জ্জনের শোভাযাত্রার পথে মুসলমানরা গোলযোগ ঘটায়। তাহারা রাজপথের উপর বসিয়া নামাজ করিবার ভাণ করে এবং শোভাযাত্রায় বাধা দেয়।

চতুর্থ দফা—রথযাত্রা।—১১ই জুলাই হিন্দুদিগের রথযাত্রার পর্ব্বে পাইকপাড়ায় মুসলমানরা রথের শোভাযাত্রা আক্রমণ করে। 'ইংলিশম্যান' ও 'ষ্টেটস্‌ম্যান', এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পত্রসমূহও এ বিষয়ে মুসলমানগণকে অপরাধী সাব্যস্ত করিতে বাধ্য হইয়াছেন। পাইকপাড়ার রাজবাটীর এই রথযাত্রার উৎসব শত বৎসর ধরিয়া নির্ব্বিবাদে চলিয়া আসিতেছে, অথচ হঠাৎ এ বৎসর মুসলমানদের এ 'ধর্ম্ম-প্রীতি' জাগিয়া উঠিল কেন, কেহ বলিতে পারে না।

পঞ্চম দফা—রাজরাজেশ্বরী প্রতিমা বিসর্জ্জন (২য় বার)।—১৫ই জুলাই পুলিস কমিশনারের অনুমতিক্রমে পাশ লইয়া ঐ শোভাযাত্রা নির্গত হইলে মুসলমানরা দীনু মিঞার মসজেদ হইতে নির্গত হইয়া রাজপথ আটক করে এবং শোভাযাত্রায় বাধা দেয়, এমন কি, পুলিসের উপরেও চড়াও হয়। অথচ হিন্দুরা কমিশনারের আদেশমত নিরস্ত্র হইয়া যাইতেছিল, পাশের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যারও কম লোক শোভাযাত্রায় যাইতেছিল, বাদ্যবাজনারও আড়ম্বর বা চীৎকার আদি কিছুই করে নাই। পরন্তু যাহা কখনও হয় নাই, কমিশনারের আদেশমত (অপরাহ্ণে না করিয়া) প্রভাতে তাহারা প্রতিমা বিসর্জ্জন দিতে সম্মত হইয়াছিল, কিন্তু ইহাতেও নিস্তার নাই।

ষষ্ঠ দফা—উল্টা রথ।—১৯শে জুলাই উল্টা রথ পর্ব্বে পাইকপাড়ায় মুসলমানরা আবার রথের শোভাযাত্রা আক্রমণ করিয়াছিল, অথচ হিন্দুরা কোনও মসজেদের সম্মুখে বাদ্যাদি করে নাই। এই ইচ্ছাপূর্ব্বক আইনভঙ্গকারী মুসলমানদের উপর পুলিস গুলী চালাইতে বাধ্য হয়।

সপ্তম দফা—মহরম।—এইটিই কলিকাতার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ। ২১শে জুলাই মহরমের শেষ দিনে সহস্র সহস্র উত্তেজিত মুসলমান পুলিস কমিশনারের (১৪৪ ধারার) নিষেধ সত্ত্বেও লাঠি ছোরা লইয়া নানা স্থানে হিন্দু পথিক ও পল্লী আক্রমণ করে এবং অযথা বহু সম্ভ্রান্ত হিন্দুকে গালি দিয়া তাঁহাদের গৃহের জানালা সাসী প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া দেয়। এই আক্রমণ হইতে কুমার নরেন্দ্রনাথ মিত্র, স্যর জগদীশ বসু, পুলিসের শ্রীযুত নলিনীনাথ, মহারাজা কাশিমবাজার প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরাও বাদ পড়েন নাই। পরন্তু ব্রাহ্ম বালিকা-বিদ্যালয়, বিজ্ঞান কলেজ, মূকবধির বিদ্যালয়, নারায়ণ ফার্ম্মাসী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান সমূহ অল্পবিস্তর আক্রান্ত হইয়াছিল।

অষ্টম দফা—পাবনা।—পাবনায় মুসলমানের অত্যাচারের তুলনা নাই। কুষ্টিয়ায় জন আট দশ মুসলমান গুণ্ডা কয়েকটি অসহায়া হিন্দু নারীকে কাপুরুষ কুক্কুরের মত আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু সেখানে অন্য ভদ্র মুসলমান সেই দুর্ব্বৃত্ত পাষণ্ডদিগকে দলন করিয়াছিল। কিন্তু পাবনায় মুসলমান যেন একযোগে হিন্দুর বিপক্ষে জেহাদ ঘোষণা করিয়াছিল। সে যেন মালাবারের মোপলা মুসলমানের পিশাচ-লীলা! গ্রাম, জনপদ, হাট, বাজার, ধনী, মহাজন—হিন্দু অধিকারী হইলেই কেহ পরিত্রাণ পায় নাই। পাবনায় যেন মুসলমানরাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বোধ হয়, মুসলমান আমলেও এমন নৃশংস অনাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল কি না সন্দেহ। পাবনার সে অত্যাচারের বিবরণ আমরা পূর্ব্ব সংখ্যায় দিয়াছি। সুতরাং তাহার পুনরুল্লেখ এ স্থলে নিষ্প্রয়োজন। তবে ইহার মধ্যে লক্ষ্য করিবার কথা এইটুকু যে, পাবনায় অপরাধী মুসলমান।

পূর্ব্বাপর এই অষ্ট দফা অনাচারের আলোচনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, মুসলমানের এত বুক বলিয়া গিয়াছে কিসে? প্রায় সকল ক্ষেত্রেই দেখা যায় (কেবল কলিকাতার প্রথম দুই হাঙ্গামা ও পাবনা ব্যতীত) মুসলমানরা পুলিসের আদেশ অমান্য করিয়া আইন ভঙ্গ করিয়া হিন্দুগণকে আক্রমণ করিয়াছে। মুসলমান কেল্লা দীনু মিঞার মসজেদ হইতে নির্গত হইয়া মুসলমানরা দ্বিতীয় রাজরাজেশ্বরী শোভাযাত্রায় বাধা দিয়াছিল, পুলিসকে আক্রমণ করিয়াছিল। পাইকপাড়ায় সোজা ও উল্টা রথেও মুসলমানরা হিন্দুদের উপর চড়াও হইয়াছিল, পুলিসের কার্য্যে বাধা দিয়াছিল, পুলিসকে আক্রমণ করিয়াছিল।

মহরমের শেষ দিনের ব্যাপার আরও ভীষণ। পুলিস কমিশনার আদেশ দেন যে, মিছিলে কেহ লাঠি, ছোরা ইত্যাদি লইয়া যাইতে পারিবে না। সে আদেশ মুসলমানরা পদতলে দলিত করিয়াছিল। পথে তাহাদের তাজিয়ার মিছিল সকল হিন্দু পথিককে আক্রমণ করিয়াছিল, হিন্দু-গৃহস্থের গৃহ আক্রমণ করিয়াছিল। অথচ পুলিস তাহাদের সঙ্গে ছিল। কুমার নরেন্দ্রনাথ মিত্র সংবাদপত্রে যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে কি মনে হইতে পারে? তাঁহার গৃহ হইতে মিছিলের উপর ইষ্টক বর্ষিত হইয়াছিল, এই ছুতায় মুসলমানরাও তাঁহার গৃহ আক্রমণে উদ্যত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি স্বয়ং বলিতেছেন, তাঁহার গৃহ হইতে কোনও অন্যায় আচরিত হয় নাই। কাহার কথা সত্য? যাহারা পুলিসের আদেশ অমান্য করিয়া লাঠি-সোটা লইয়া হিন্দু পথিক ও হিন্দু গৃহস্থের গৃহ আক্রমণ করিয়াছিল তাহারা, না কুমার নরেন্দ্রনাথের ন্যায় সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত হিন্দু জমীদার?

এখন হিন্দুর পক্ষ হইতে কয়টি কথা জিজ্ঞাসা করিবার আছে। যে মুসলমান দুর্গ দীনু মিঞার মসজেদ হইতে মুসলমানরা পুলিসকে উপহাস করিয়া, কমিশনারের আদেশ অমান্য করিয়া রাজরাজেশ্বরীর শোভাযাত্রায় বাধা দিয়াছিল এবং হিন্দু ও পুলিসকে আক্রমণ করিয়াছিল, সেই মসজেদের ইমাম বা মাতোয়ালি এবং পার্শ্বস্থ সৈয়দ সালি

লেনস্থ মুসলমান বাসিন্দাগণের মধ্যে কাহাকেও ধৃত বা দণ্ডিত করা হইয়াছে কি? যে মসজেদ হইতে মুসলমানরা ইষ্টক নিক্ষেপ করিয়াছিল, তাহা খানাতল্লাস করা হইয়াছে কি? বড়বাজারের কয়েকটি মাড়োয়ারীর বাড়ী হইতে ইষ্টক ও বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, এই সন্দেহে বাড়ী খানাতল্লাস ও ১ শতের অনেক অধিক অবস্থাপন্ন লোককে ধৃত করা হইয়াছিল। দীনু মিঞার মসজেদ হইতেও ইষ্টক নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, এ কথা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রে প্রকাশ। সে মসজেদের মাতোয়ালি বা ইমামকে এ বিষয়ে দায়ী করিবার কি হইতেছে?

পাইকপাড়ায় রথযাত্রায় বাধাপ্রদানকারী আইনভঙ্গকারী মুসলমানগণের রীতিমত দণ্ডের ব্যবস্থা হইতেছে ত?

মহরমের শেষ দিনে যাহারা তাজিয়ার মিছিল করিয়াছিল, তাহারা পুলিসের মার্কামারা। কেন না, প্রত্যেক মিছিলের সম্মুখে নিশানে তাজিয়ার মহল্লা, অধিকারী সর্দ্দার, ও গন্তব্য পথের নাম লিখিত ছিল। যে যে তাজিয়ার মিছিল পথে অনাচার করিয়াছিল, তাহাদিগকে পুলিস দেখিয়াছিল, কেন না, সঙ্গে পুলিসের সম্মুখেই অনাচার সংঘটিত হইয়াছিল, পুলিস প্রথমে অনাচার নিবারণ করিতে না পারিলেও বেটন দিয়া দল হইতে বিচ্ছিন্ন অনাচারকারীদিগকে আবার দলে ভিড়াইয়া দিয়াছিল। এই সমস্ত অনাচারী মিছিলের মহল্লা ও সর্দ্দারের নাম পুলিসের বিদিত। তাহাদিগকে শান্তিভঙ্গের জন্ত দায়ী ও দণ্ডিত করা হইতেছে ত?

পাবনায় যে ঘোর অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে, তাহার পর অবশ্য সরকার শান্তিস্থাপনে উপযুক্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়াছেন, পরন্তু সাজাই পুলিস বসাইতেছেন, ইহা খুবই ভাল কথা। কিন্তু অপরাধীর উপযুক্ত দণ্ড হইতেছে ত? শ্রীযুত যোগেশ চৌধুরীর মত মান্যগণ্য ভদ্রলোক কিন্তু সংবাদপত্রে লিখিয়াছেন যে, অনেক স্থলে লুঠের মালের কিনারার চেষ্টা হইতেছে না, অপরাধীকে ধরা হইতেছে না, সাক্ষীর কড়াকড়ি ব্যবস্থা করায়, অনেক স্থলে অভিযোগ ফাঁসিয়া যাইতেছে, ইত্যাদি। এ সকল কি সত্য কথা? সরকার নিরপেক্ষ বিচারক, তাঁহারা এ সকল অভিযোগের সত্যাসত্য সম্বন্ধে একটা ঘোষণা করিলে ভাল হয় না?

---

## পার্লামেণ্টে ওকালতী

কিছু দিন পূর্ব্বে ভূতপূর্ব্ব ভারতসচিব লর্ড অলিভিয়ার 'টাইমস্' পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, ভারতের সরকারী কর্ম্মচারীরা মুসলমানদিগকে আদর করেন বলিয়া হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ উপস্থিত হয়। এ কথায় এ দেশে ও বিলাতে তীব্র প্রতিবাদ উত্থিত হইয়াছে। প্রতিবাদ চরমে উঠিয়াছে পার্লামেণ্ট মহাসভায়। বর্ত্তমান ভারতসচিব লর্ড বার্কেণহেড বলিয়াছেন, এ কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা; ভারত সরকার ও বড়লাটরা চিরদিন মহারাণীর ঘোষণামত সকল সম্প্রদায়ের প্রতি নিরপেক্ষ ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন, কাহারও প্রতি অধিক আদর দেখানর ফলে বিরোধ বাধিলে তাহা ইংরাজের ভারতশাসনের পক্ষে এবং সাম্রাজ্যের মঙ্গলের পক্ষে পরম অন্তরায়। ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড রেডিংও নিজের অভিজ্ঞতার দোহাই দিয়া বলেন যে, লর্ড অলিভিয়ারের অভিযোগ একেবারে ভিত্তিহীন, তিনি স্বয়ং ভারতশাসনকালে দেখিয়াছেন যে, ভারত সরকারের কর্ম্মচারীরা সকল সম্প্রদায়কে সমান দৃষ্টিতে দেখেন ও সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করেন। লর্ড অলিভিয়ার এইরূপে আক্রান্ত হইয়া নিজের অপরাধ স্বীকার করেন এবং বলেন যে, ভারত সরকার বা বড়লাটরা পক্ষপাতিতা করেন, এমন কথা তিনি বলেন নাই, তবে ভারত সরকারের কর্ম্মচারীদের মধ্যে পক্ষপাতিতা দোষ আছে।

লর্ড অলিভিয়ারের এই দোষ স্বীকারে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজ আনন্দ লাভ করিয়াছেন। কিন্তু লর্ড অলিভিয়ার ভাজা চালকে মুড়ি বলিয়াছেন, তাহা তাঁহারা দেখিয়াও দেখেন নাই। তিনি দোষ স্বীকার করিয়াও বলিতেছেন, কর্ম্মচারীদের মধ্যে পক্ষপাতিতাদোষ আছে।

যাউক সে কথা। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হইতেছে, আমরা দূর হইতে দাঁড়াইয়া দেখি ও মজা উপভোগ করি। কিন্তু লর্ড বার্কেণহেড হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার মূল কারণ যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে। তিনি বলেন, "সংস্কার আইন ও হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার মধ্যে যে কোনও সম্বন্ধ নাই, এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু তাহা বলিয়া সংস্কার আইন উহার মূল কারণ নহে। জার্ম্মাণ-যুদ্ধ অবসানের পর সরকারের শাসনের আসন যে একটু শিথিলমূল হইয়াছিল—যাহার ফলে পূর্ব্বের 'বাপ-মা' শাসনের প্রভাব খর্ব্ব হইয়াছিল এবং যাহা দেখিয়া ভারতীয়রা নিজেদের অধিকারের জন্ত জোর তলবে দাবী করিতেছিল, তাহা হইতেই এই বিরোধ সঞ্জাত হইয়াছে। তাহা ছাড়া হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ ভারতে নূতন নহে, বহু কালের।"

লর্ড বার্কেণহেড বলিতেছেন, হিন্দু মুসলমানের বিরোধ বহুকালের, উহা ভারতের অস্থিমজ্জাগত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভারতে বৃটিশ-শাসিত স্থান ব্যতীত অনেক রাজন্ত-শাসিত প্রদেশ আছে। সে সকল দেশীয় রাজ্যে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ নাই কেন, লর্ড বার্কেণহেড তাহা পার্লামেণ্টকে বুঝাইয়া দিবেন কি? আর 'বাপ-মা' শাসনের সময়েও গো-কোরবাণী লইয়া হিন্দু-মুসলমানে কি দাঙ্গা হইত, তাহা সার এণ্টনি ম্যাকডোনেল ও সার ব্যামফাইল্ড ফুলারের মত ইংরাজ শাসকদের শাসনকালের ইতিহাস আলোচনা করিলেই তিনি জানিতে পারেন। এই বিরোধ যে কেন বৃটিশ ভারতের অস্থিমজ্জাগত হইয়া আছে, তাহা অবস্থাভিজ্ঞমাত্রেই জানেন।

---

## বাঙ্গালা সরকারের বুদ্ধিভ্রংশ

বাঙ্গালায় সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও দাঙ্গাহাঙ্গামার পর হইতে বাঙ্গালা সরকার পর পর এমন কতকগুলি কার্য্যব্যবস্থা করিয়াছেন, যাহাতে সহসা এমন মনে হওয়া বিচিত্র নহে যে, বুঝি বা তাঁহাদের বুদ্ধির কলকাঠিটি কোথাও খারাপ হইয়া গিয়াছে। পণ্ডিত মদনমোহন ও ডাক্তার মুঞ্জের উপর ১৪৪ ধারা প্রয়োগ ইহার চরম পরিণতি। ডাক্তার মুঞ্জে কলিকাতায় আসিয়া হিন্দুগণকে সঙ্ঘবদ্ধ ও শক্তিসম্পন্ন হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন, পরন্তু প্রবল ব্যুরোক্রেশী ও মুসলমানের বাধার বিপক্ষে হিন্দুকে একতাবদ্ধ হইতেও অনুরোধ করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার স্বজাতিপ্রীতির প্রাবল্যের পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু কাহারও প্রতি বিদ্বেষের ভাব ব্যক্ত হয় নাই। হিন্দু হিন্দুকে সঙ্ঘবদ্ধ বা শক্তিসম্পন্ন হইতে বলিলে অথবা অপরের বাধাপ্রদানের বিপক্ষে আত্মস্থ হইতে বলিলে কি বিশেষ অপরাধে অপরাধী হয়, তাহা আমাদের ধারণায় আইসে না। জগতের সকল দেশের মুসলমানের সহিত ভারতের মুসমমান Pan-Islam সম্বন্ধে আবদ্ধ হইবার আয়োজন করে, অথবা ইংরাজের প্রতি বিদ্বেষ-প্রকাশ করিয়া ভারতের বাহিরে মুসলমানরাজ্যে 'মহাজের' হইয়া যাইতে পারে, তাহা হইলে হিন্দু কি হিন্দুস্থানে থাকিয়া সকল হিন্দুর সহিত একতাবদ্ধ হইতে পারে না? হিন্দু ইংরাজ-রাজের অবাধ্য হইয়া গোঁসা বা অভিমান ভরে বিদেশে চলিয়া যাইতে চাহে নাই, মুসলমানকে বর্জ্জন করিয়া ভারতে হিন্দু স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করিতে চাহে নাই, তাহারা চাহিতেছে

শুধু বাঁচিতে, প্রবলের বিপক্ষে আত্মরক্ষা করিয়া তিষ্ঠিতে। ডাক্তার মুঞ্জে হিন্দুকে সেই উপদেশ দিয়াছিলেন। ইহাতেই তাঁহার মহাপাতক হইয়াছে, তাঁহার প্রতি অকস্মাৎ ১৪৪ ধারা জারি হইয়াছে। কেবল জারি নহে, তিনি এই অন্যায় ও বে-আইনী আইন না মানিয়া কলিকাতায় আসিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার উপর শমন জারি হইয়াছে। স্বল্পবুদ্ধির দৌড় কতদূর হইতে পারে, তাহাই কি এই ব্যাপারে প্রদর্শন করা হইল ?

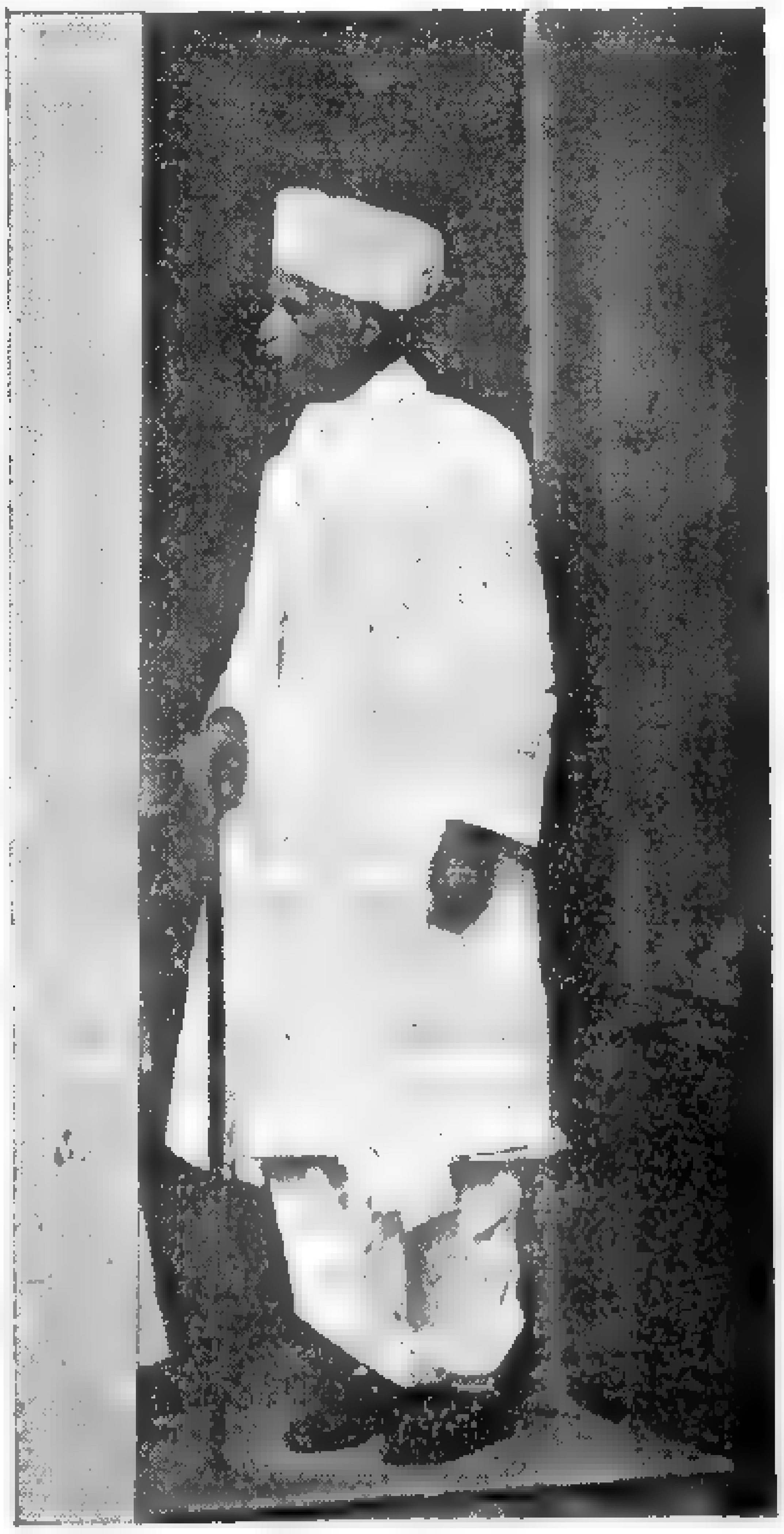
পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য

পণ্ডিত মদনমোহনের ব্যাপার আরও চমৎকার! তিনি আজীবন সরকারের সহিত সহযোগ করিয়া আসিয়াছেন। এখনও তিনি Responsive Co-operationist দলের অন্যতম দলপতি। মহাত্মাজীর অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে তিনি তাঁহার বিরুদ্ধবাদী হইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। তিনি এই পরিণতবয়সেও ইংরাজের ন্যায়বিচারে এবং শেষ সুবুদ্ধিতে পরম আস্থাবান। পরন্তু তিনি হিন্দু দলপতি হইলেও আজীবন হিন্দু-মুসলমানে মিলনবার্ত্তা প্রচার করিয়া আসিয়াছেন। কলিকাতায় আসিয়া তিনি যে সকল বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহার সকলগুলিতেই হিন্দুমুসলমানে মিলনের উপদেশ আছে।

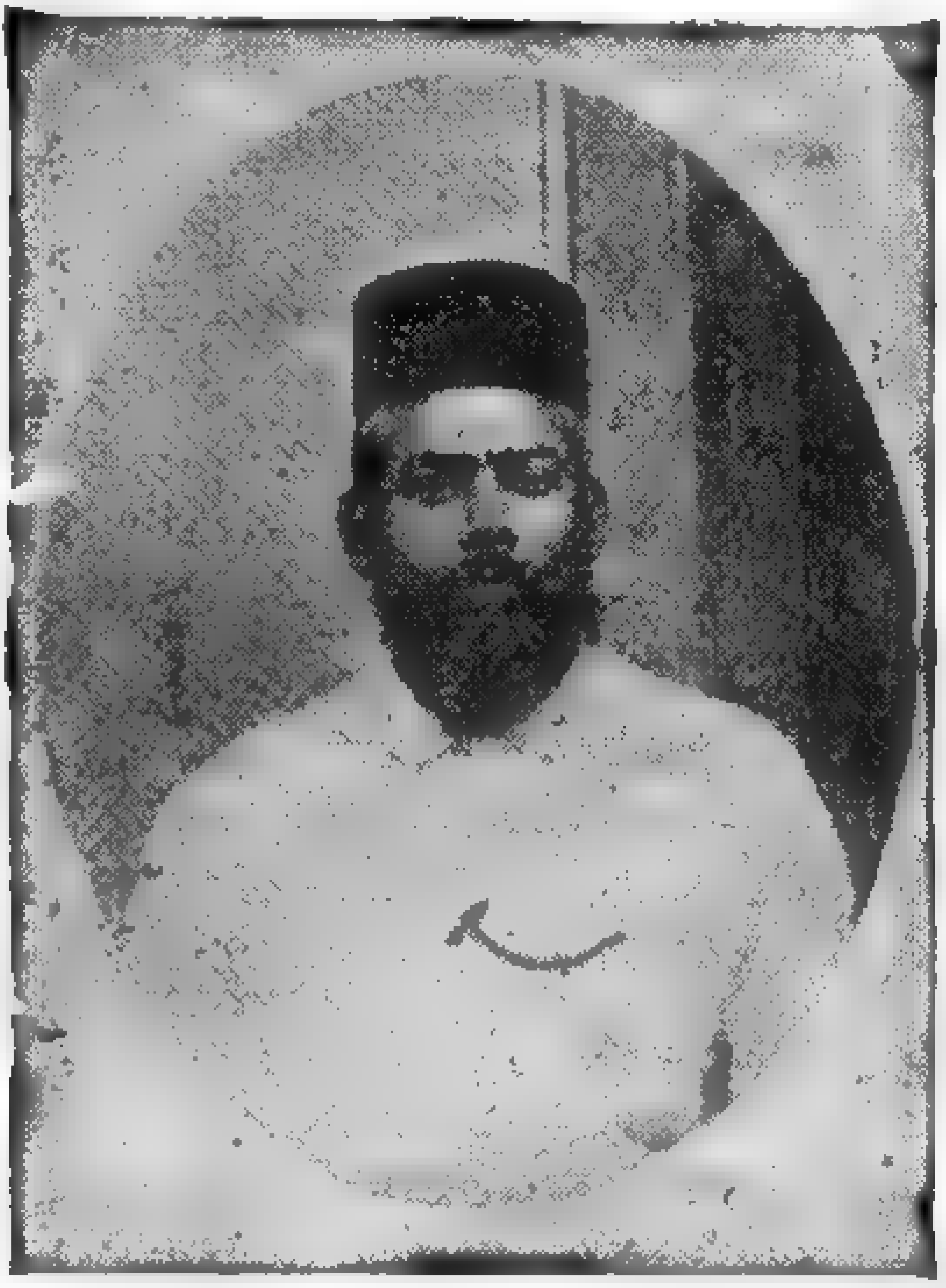
ডাক্তার মুঞ্জে

অথচ হঠাৎ বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত তাঁহার উপর কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট ১৪৪ ধারা প্রয়োগ করিয়া বসিলেন। কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্! সাধারণ লোকের নিকট এরূপ ব্যবহার পাইলে তিনি নিশ্চিতই উহাকে মস্তিষ্ক বিকৃতির ফল বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন; কিন্তু ইহা ত তাহা নহে—এ সিদ্ধান্তের ফলে জগতের সমক্ষে ঘোর অপরাধে অপরাধী বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে হয়। তিনি নির্দ্দোষ, ইহা তিনি নিজেই সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বিনা আপত্তিতে এই অন্যায় আদেশ ঘাড় পাতিয়া মানিয়া লইতে প্রস্তুত হয়েন নাই। তিনি ডাক্তার মুঞ্জের পূর্ব্বেই কলিকাতায় পদার্পণ করিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি

হাওড়া ষ্টেশনে সংবর্দ্ধনা

ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ অমান্য করিয়াছেন। করিবেন বলিয়া পূর্ব্বাহ্নে ঘোষণা করিয়া কলিকাতায় আসিয়াছিলেন এবং কলিকাতাবাসীর সাদরসম্ভাষণ ও জয়স্তুতি লাভ করিয়া মধ্যপ্রদেশে যাত্রা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা সরকার তাঁহার আগমনে বাধাপ্রদানও করেন নাই, তাঁহাকে আইনভঙ্গ করার অপরাধে ধৃতও করেন নাই। কেবল তাঁহার যাত্রার পর তাঁহার উপর শমন জারি করিয়াছেন। ইহাতে জিতিল কে? ছোট হইয়া গেলই বা কে?

হঠকারিতা সুশাসনের পরিচায়ক নহে। আজ যে সারা ভারত জুড়িয়া হিন্দুর মুখে রব উঠিয়াছে, লর্ড অলিভিয়ারের কথা সত্য, সে রব নিবারণ করিবার কি যুক্তি-প্রমাণ আছে? স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রমুখ হিন্দুরা প্রকাশ্যে বলিতেছেন যে, সার আবদর রহিম ও হাজী গজনবি প্রমুখ মুসলমানরা এ যাবৎ যে কীর্ত্তিধ্বজা উড়াইয়া আসিলেন, তাহার বিপক্ষে একটি কথাও উঠিল না, অথচ নিয়মানুগ পথে পরিচালিত হিন্দু-মুসলমানে প্রীতিকামী পণ্ডিত মদনমোহনকে আইনের বন্ধনে যথেচ্ছা কথা কহিতে বা চলিতে ফিরিতে নিষেধ করা হইল,—সাধারণ প্রজার ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইল,—এ কেমন বিচার? বাঙ্গালা সরকার এ অভিযোগের কি উত্তর দিতে চাহেন? আলী ভ্রাতারা হজে যাইবার পূর্ব্বে হিন্দুজাতিকে কাফের ও মরণভীত বলিয়া গালি পাড়িয়া মুসলমানের ক্রোধের ভয় দেখাইয়া যাওয়ার পর হইতে কত মুসলমান হিন্দুর বিপক্ষে প্রচারকার্য্য চালাইতেছে; কতক গোপনে পল্লী-মফঃস্বলে মৌলবী মৌলানার দ্বারা, কতক প্রকাশ্যে বক্তৃতা বা সংবাদ-পত্রের রচনা দ্বারা। সার আবদর রহিমই সর্ব্বপ্রথমে আলিগড়ে হিন্দু-বিদ্বেষ প্রচার করেন। উহাকে 'ষ্টেটসম্যানও' Aligarh Bomb-shell আখ্যা দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার দোসর হাজী গজনবী আবার মসজেদের সম্মুখে বাদ্যবন্ধের যে আন্দোলন-আগুন জ্বালাইয়াছেন, তাহার তাপে বাঙ্গালা এখনও জ্বলিতেছে। মীনা পেশোয়ারীর দোস্ত হঠাৎ নেতা সাহিদ সাহেবের কথা না-ই উল্লেখ করিলাম। বর্ষার ব্যাঙের ছাতার মত খেলাফতের প্রথম আমলে এ দেশে যে সব মৌলভী মওলানা গজাইয়া উঠিয়াছিল, তাহারাও বাদ যায় না। বাঙ্গালায় হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ-সংঘটনে কত দিকে কত কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে, অথচ মজা এই, ১৪৪ ধারা চাপিল গিয়া হিন্দু-নেতা পণ্ডিত মদনমোহন ও ডাক্তার মুঞ্জের স্কন্ধে!

এই বাঙ্গালা সরকার 'ফরওয়ার্ড' পত্রকে অভিযুক্ত করিয়াছিলেন, একখানা মুদ্রিত বিজ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করার জন্য। ঐ পত্রে এক সম্প্রদায়কে অপর সম্প্রদায়ের বিপক্ষে উত্তেজিত করিবার উপাদান ছিল। নিম্ন আদালতে সেই অভিযোগে 'ফরওয়ার্ড' দণ্ডিত হয়েন। কিন্তু হাইকোর্ট সে দণ্ড নাকচ করিয়া দিয়া যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সুবর্ণাক্ষরে মুদ্রিত করিয়া বাঙ্গালার ঘরে ঘরে প্রচার করা কর্ত্তব্য। এই ব্যাপার হইতেই বাঙ্গালা সরকারের 'দূরদর্শিতার' পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল।

পণ্ডিত মদনমোহন ও ডাক্তার মুঞ্জের ব্যাপারে ত আবার বাঙ্গালা সরকারের দূরদর্শিতার বিদ্যা জাহির হইয়া পড়িল। বার বার এইরূপ অপদস্থ প্রতিপন্ন হওয়া কি সরকারের প্রেষ্টিজের হানিকর নহে? লর্ড আরউইন কি এ সব ব্যাপার নীরবে প্রত্যক্ষ করিয়া যাইবেন?

পথে শোভাযাত্রা

## পরলোকে যামিনীভূষণ রায়

লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রতিভাবান আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য ধন্বন্তরিকল্প কবিরাজ—অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা—বহু আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ-সম্পাদক ও প্রণেতা যামিনীভূষণ রায় কর্ম্ম-জীবনের অবসানে ৪৮ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই সাধনোচিত ধামে মহা-প্রয়াণ করিয়াছেন। দুরারোগ্য বহুমূত্র রোগকে উপেক্ষা করিয়া তিনি আয়ুর্ব্বেদের লুপ্ত প্রভাব সঞ্জীবিত করিবার জন্য প্রাণ-পাত সাধনায় আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন। তাঁহার অসমাপ্ত ব্রত সাঙ্গ হইবার পূর্ব্বেই ২৬শে শ্রাবণ, বুধবার প্রাতে রোগের জয় হইয়াছে—তিনি বহু দিনের আকাঙ্ক্ষিত বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যু যেমন অতর্কিত—তেমনই দেশে আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যার মঙ্গলের ক্ষতিকর। তাঁহার বিয়োগে আমরা প্রিয়জন-বিয়োগবেদনায় মর্ম্মাহত হইতেছি।

যামিনীভূষণের জীবনে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞান-শিক্ষার সমন্বয় হইয়াছিল। সাহিত্যে তিনি এম্, এ, চিকিৎসাবিদ্যাতে এম, বি, সংস্কৃত কলেজ হইতে 'বিদ্যাভূষণ উপাধিপ্রাপ্ত। স্বনামখ্যাত কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় বিজয়রত্ন সেনের নিকট তিনি আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র অধ্যয়ন ও কবিরাজী চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষালাভ করিয়া 'কবিরত্ন' উপাধি লাভ করেন। মনীষী আশুতোষ সরস্বতী তাঁহাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য-শ্রেণীভুক্ত করেন এবং নিখিল ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদ সম্মেলনের মাদ্রাজ অধিবেশনে তিনি সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহার অনুরাগ ছিল, তিনি আজীবন অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। বহু ছাত্রকে তিনি স্বগৃহে স্থান ও আহার প্রদান করিয়া বিদ্যাশিক্ষা দিতেন; গ্রামে টোল প্রতিষ্ঠা করিয়া সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চ্চা করিবার জন্য বন্ধুগণকে উদ্বুদ্ধ করিতেন।

যামিনীভূষণের পিতা খুলনা পয়োগ্রামনিবাসী প্রসিদ্ধ কবিরাজ পঞ্চানন রায় মহাশয় মনস্বী আশুতোষের বাড়ীর সম্মুখে ভবানীপুরে

বাস করিয়া চিকিৎসা-নৈপুণ্য প্রদর্শন ও আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা প্রদান করিতেন। তিনি মেধাবী পুত্রকে সংস্কৃত ও ডাক্তারী পড়াইয়া কবিরাজী করিবার কল্পনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সে কল্পনা কার্য্যে পরিণত দেখিবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে কালের আহ্বানে প্রস্থান করিতে হয়। যামিনীভূষণ পিতার সুযোগ্য সন্তান; তিনি পিতার সে ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছিলেন এবং আয়ুর্ব্বেদের গৌরব উদ্ধারের জন্য তাঁহার শেষ রক্তবিন্দু পর্য্যন্ত দান করিয়া গিয়াছেন।

পাঠ্য-জীবনে যামিনীভূষণ একদিন থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের অমর নাট্যকাব্য 'জনার' অভিনয় দেখিতে যায়েন, অভিনয়ের প্রথমেই—

"বর যদি দিবে বৈশ্বানর,
ভুবনবিজয়ী রথী দেহ মোর অরি,
মরি কিংবা মারি।
ঘুচুক সমরবাঞ্ছা মোর।"

এই 'মরি কিংবা মারি' শুনিয়া তিনি আত্মজীবন সংগঠন সম্বন্ধে মত স্থির করেন—জীবনে তিনি কোন মুহূর্ত্তেই সে সঙ্কল্প হইতে বিচলিত হয়েন নাই।

কবিরাজ যামিনীভূষণ রায়

যে সময় যামিনীভূষণ কবিরাজী চিকিৎসা করিবার সঙ্কল্প করেন, সে সময় এলোপ্যাথি চিকিৎসার উপর দেশবাসীর আস্থা সমধিক—আয়ুর্ব্বেদের গৌরব লুপ্ত—আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা কতকগুলি হাতুড়ে কবিরাজের উদরান্ন-সংস্থানের উপায় মাত্র। যামিনীভূষণ রীতিমত এম্, বি, পাশ করা ডাক্তার হইয়াও কবিরাজী চিকিৎসা করিবেন শুনিয়া অনেকের নিকট হাস্যাস্পদ হইয়াছিলেন; কিন্তু কিছুতেই তিনি সঙ্কল্প হইতে বিচলিত হয়েন নাই। ভবিষ্য-জীবনে কেবল আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা-নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হয়েন নাই। আয়ুর্ব্বেদের লুপ্তগৌরব উদ্ধারকল্পে তাঁহার সাধনার মূর্ত্তবিকাশ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজ হাঁসপাতাল। কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য— আমাদের দুর্ভাগ্য—আয়ুর্ব্বেদের দুর্ভাগ্য, তিনি অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজ-প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ করিয়া যাইবার অবসর পাইলেন না, তাঁহার অসমাপ্ত কার্য্য সমাপ্ত করিবার মত দৃঢ়সঙ্কল্প. অন্য কাহারও আছে কি না, জানি না।

যামিনীভূষণ বলিতেন,—ডাক্তাররা হাল ছাড়িয়া না দিলে—চরম অবস্থা না হইলে রোগী আমাদের নিকট আইসে না। সে অবস্থায় রোগীকে আরোগ্য করিতে না পারিলে আয়ুর্ব্বেদের অপযশ হয়—এ জন্য আমাদের কত চিন্তা—কত সাধনা করিতে হয়, তাহা রোগী কি বুঝিবে? ডাক্তার-পরিত্যক্ত আশাহীন বহু রোগীকে নিজ অলৌকিক কৃতিত্ব-বলে নিরাময় করিয়াই যামিনীভূষণ ইংরাজীশিক্ষিত বাঙ্গালীর নিকট উপেক্ষিত নগণ্য আয়ুর্ব্বেদের উপর দেশবাসীর যুগপৎ অনাস্থা—অবিশ্বাস দূর করিয়া তাঁহাদের শ্রদ্ধা-বিশ্বাস আকর্ষণ করিয়াছিলেন। সেই শ্রদ্ধার ভিত্তির উপর অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যামন্দির গঠনের জন্য তিনি প্রাণপাত সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, কিন্তু ক্রমাগত চিন্তা ও অতিশ্রমে দুরারোগ্য বহুমূত্র রোগে আত্মদান করিলেন।

দেশের সকল দিকের দুর্দ্দশার কথা না ভাবিয়া—বক্তৃতার স্রোতে

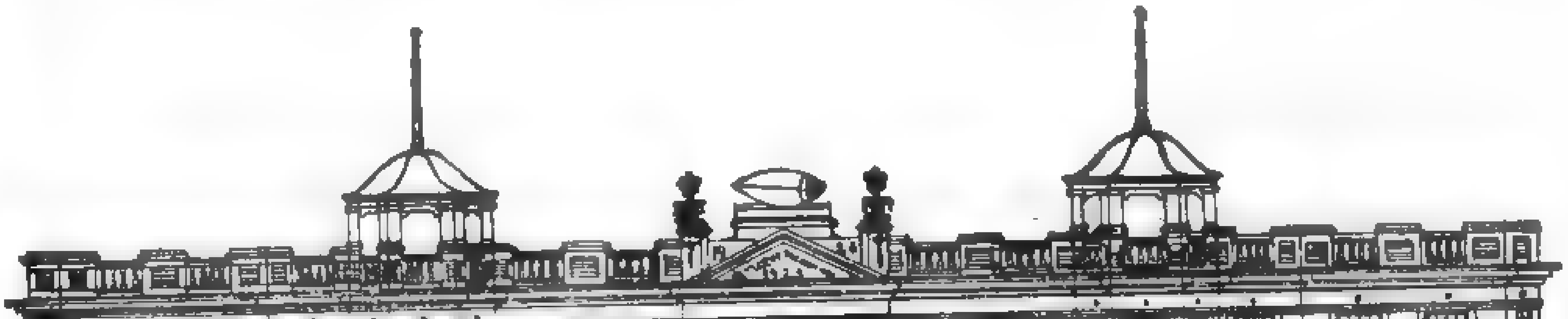

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজ

দেশ না ভাসাইয়া তিনি বলিতেন—বিলাতী ঔষধ বিক্রয়ের জন্ত ইংরাজ হাজার হাজার ডাক্তার-দালাল স্থষ্টি করিয়াছেন—প্রতি বর্ষে মেডিক্যাল কলেজ হইতে নূতন নূতন অসংখ্য ঔষধ বিক্রয়ের জন্ত দালাল স্থষ্ট হইতেছে—তাঁহাদের প্রেস্‌কৃপসনের কৃপায় প্রতি বর্ষে কোটি কোটি টাকার বিলাতী ঔষধ অবাধে বিক্রয় হইতেছে, তাহা দেশবাসীর স্বাস্থ্যের অনুকূল হউক বা না হউক। কিন্তু কত সুলভে সুচিকিৎসা বিতরণ হইতে পারে, কত সুলভে এ দেশে উৎপন্ন অকিঞ্চিৎকর গাছগাছড়া হইতে এ দেশবাসীর স্বাস্থ্যোপযোগী ঔষধ প্রস্তুত হইতে পারে, তাহা তিনি অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজ হইতে দেশবাসীর চক্ষুর উপর প্রমাণ করিবেন, প্রতি বর্ষে দেশের কোটি কোটি টাকার বিলাতযাত্রার পথ রুদ্ধ করিবেন। কিন্তু বিরাট বিশাল বিলাতী চিকিৎসা-বিজ্ঞান-অভিযানের সহিত একক সংগ্রাম করা দীর্ঘকাল তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইল না। প্রথম যৌবনে দৃপ্ত 'জনার' প্রবীরের মতই তাঁহাকে বিপুল পাণ্ডব বাহিনীকে পরাজিত করিবার মুহূর্ত্তে চিরবিদায় গ্রহণ করিতে হইল।

আয়ুর্ব্বেদের লুপ্তগৌরব-প্রতিষ্ঠা তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল। বারংবার রোগের আক্রমণে শয্যাগত অবস্থায় যখনই তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছি, তখনই তিনি রোগযন্ত্রণা উপেক্ষা করিয়া অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজ প্রতিষ্ঠার সার্থকতা—আয়োজন—অনুষ্ঠান—সঙ্কল্পের কথায় শতমুখ হইয়াছেন। জীবনের যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুহূর্ত্তেও জীবনের সেই একমাত্র চিন্তাকে তিনি পরিহার করিতে পারেন নাই।

ফড়িয়াপুকুরের বাড়ীতে সামান্তভাবে আয়ুর্ব্বেদ কলেজ প্রতিষ্ঠা হইতে মহাত্মা গন্ধী কর্ত্তৃক ভিত্তিস্থাপন—কর্পোরেশনের জমী দান—বদান্তবর শ্রীযুত মনোমোহন পাঁড়ের লক্ষ টাকা দানে সৌধনির্ম্মাণ, সমস্তই তাঁহার একক প্রাণপাত চেষ্টা ও একনিষ্ঠার ফল। তাঁহার প্রচেষ্টার পর কলিকাতায় আরও দুইটি আয়ুর্ব্বেদ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—তিনি বহুবার মতভেদ সামঞ্জস্ত করিয়া সম্মিলিত শক্তিতে বিরাট আয়ুর্ব্বেদ কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্ত বিপুল চেষ্টা করিয়াছেন ; কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় নাই। তাঁহার এত সাধনার সফল অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজ সম্পূর্ণ দেখিয়া যাইতে পারিলেন না—তাঁহার বিয়োগ-দুঃখ হইতেও এই দুঃখে আমরা মর্ম্মাহত হইতেছি।

কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্ত স্থান না পাইলে তিনি স্ত্রী-পুত্রকে বঞ্চিত করিয়া তাঁহার বিডন ষ্ট্রীটের বাড়ীতেই আয়ুর্ব্বেদ কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়া বাড়ীখানি কলেজকে দান করিয়া যাইবেন, বহুবার আমাদের সহিত এ কথারও আলোচনা করিয়াছিলেন। দেহত্যাগের পূর্ব্বদিন তিনি স্বেচ্ছায় উইল করিয়া নিজ অর্জ্জিত ২ লক্ষ টাকা আয়ুর্ব্বেদ কলেজের উন্নতির জন্ত দান করিয়া গিয়াছেন।

হিন্দুধর্ম্মে যামিনীভূষণের প্রগাঢ় ভক্তি ছিল—পূজা-অর্চ্চনা না করিয়া তিনি জলগ্রহণ করিতেন না। কোন শাস্ত্রগ্রন্থ তাঁহাকে উপহার দিলে তিনি কপালে স্পর্শ না করিয়া গ্রহণ করিতেন না। ব্রাহ্মণ-ভক্তি তিনি পিতার নিকট হইতে উত্তরাধিকার-সূত্রে লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নিকট কোন ব্রাহ্মণ প্রার্থী হইলে সে দিনের সমস্ত উপার্জ্জন তিনি তাঁহাকে দান করিতেন। যামিনীভূষণের বাড়ীতে কোন ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইলে তিনি শত কায ফেলিয়া ব্রাহ্মণের পদধূলি সাদরে গ্রহণ করিতেন। বহু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকে তিনি বার্ষিক ও মাসিক বৃত্তি দান করিতেন এবং সযত্নে বিনামূল্যে ঔষধ ও ব্যবস্থা দান করিতেন।

## পরলোকে সত্যেন্দ্রনাথ সেন

ইণ্ডিয়ান মিরার পত্রের সম্পাদক রায় সত্যেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুর পরলোকগমন করিয়াছেন। ইনি স্বনামধন্ত রায় নরেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুরের সুযোগ্য পুত্র ছিলেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর সত্যেন্দ্রনাথ "ইণ্ডিয়ান মিরার" ও "সুলভ সমাচারের" সম্পাদকরূপে কার্য্য করিতে থাকেন। বিগত য়ুরোপীয় মহাসমরের সময় তিনি সরকারের পক্ষে 'পবলিসিটি' অফিসার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া তিনি কলিকাতার অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট এবং 'জষ্টিস্ অব্ দি পিস'ও ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৫৯ বৎসর বয়স হইয়াছিল। তাঁহার তিনটি পুত্র ও কয়েকটি কন্তা বিদ্যমান। আমরা তাঁহার বিয়োগে তাঁহার সন্তানদিগের নিকট সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

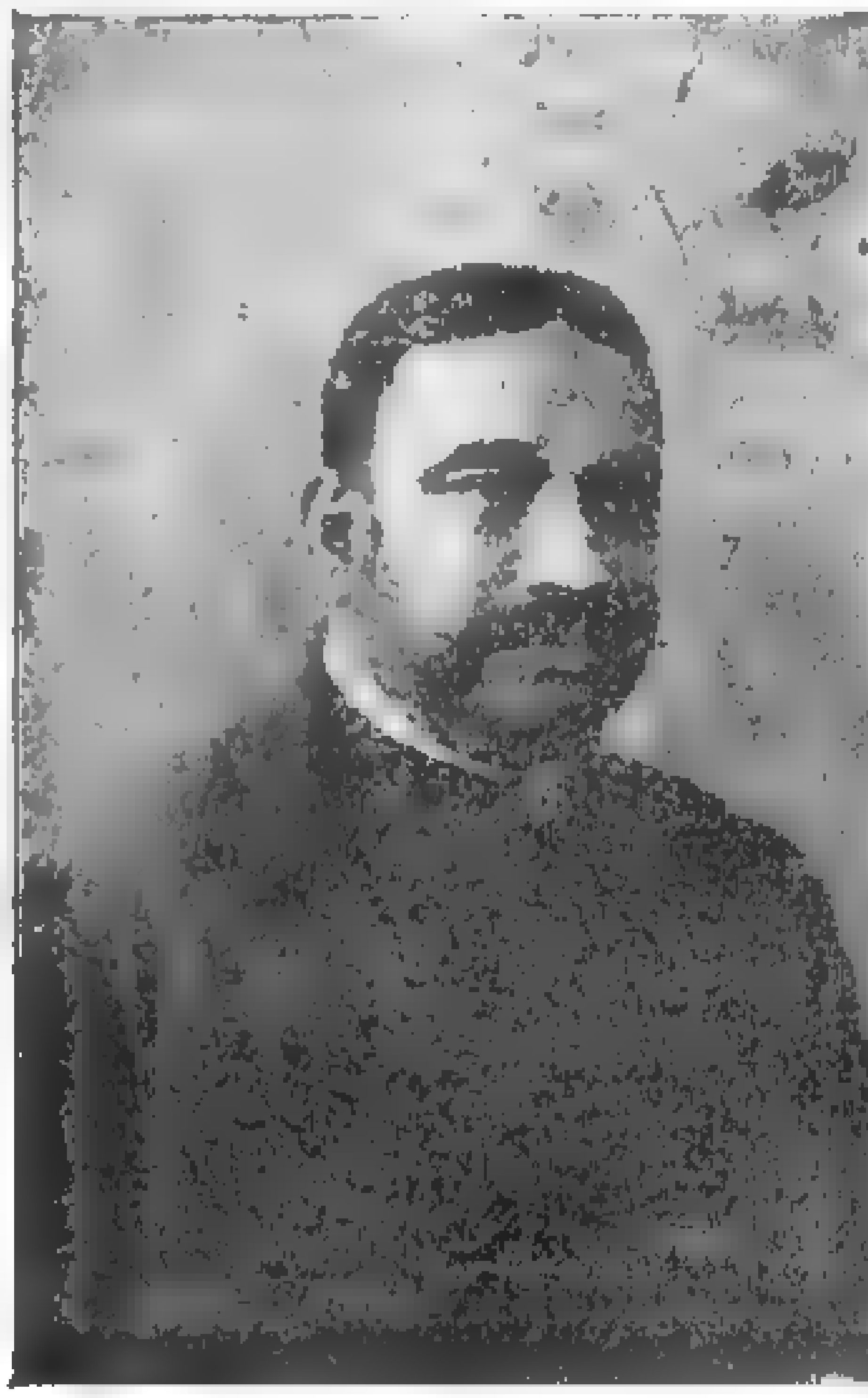

পরলোকে সত্যেন্দ্রনাথ সেন

## জাতিতত্ত্ব গ্রন্থ

কাশীবাসী লব্ধপ্রতিষ্ঠ সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবিরত্ন বিদ্যাবারিধি মহাশয় প্রণীত জাতিতত্ত্ব গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের কয়েকটি অধ্যায় মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। মাসিক বসুমতীতে নিতান্ত স্থানাভাব বশতঃ সময়মত সমস্ত অধ্যায়গুলি প্রকাশ ঘটিয়া উঠিল না। কবিরত্ন মহাশয় অনেক দিন অপেক্ষা করিয়া গ্রন্থখানি মুদ্রণ ও প্রকাশ করিয়াছেন। মাসিক বসুমতীতে এই প্রবন্ধের যে কয় অধ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল—বৈদ্য মহাশয়রা সেই অধ্যায়ের যে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, তাহাও যথাসময়ে প্রকাশ করা হইয়াছিল এবং প্রতিবাদের উত্তর প্রকাশিত হইয়াছিল। অতঃপর যাঁহারা এই বিচার সম্পূর্ণভাবে পাঠ করিতে চাহেন, তাঁহারা এই গ্রন্থের জন্ত এবং যাঁহারা আলোচনা ও প্রতিবাদ করিতে চাহেন, তাঁহারা—৮০ নং মিশির পুকরা বেনারস ঠিকানায় গ্রন্থকারের সহিত পত্রব্যবহার করিলে বাধিত হইব।

# প্রথম দৃশ্য—কলিকাতায় জলপ্লাবন

কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে নৌকা-বিহার

কলিকাতার ভিনীস—জলপ্লাবিত পথে নৌকারোহী বালক-বালিকা

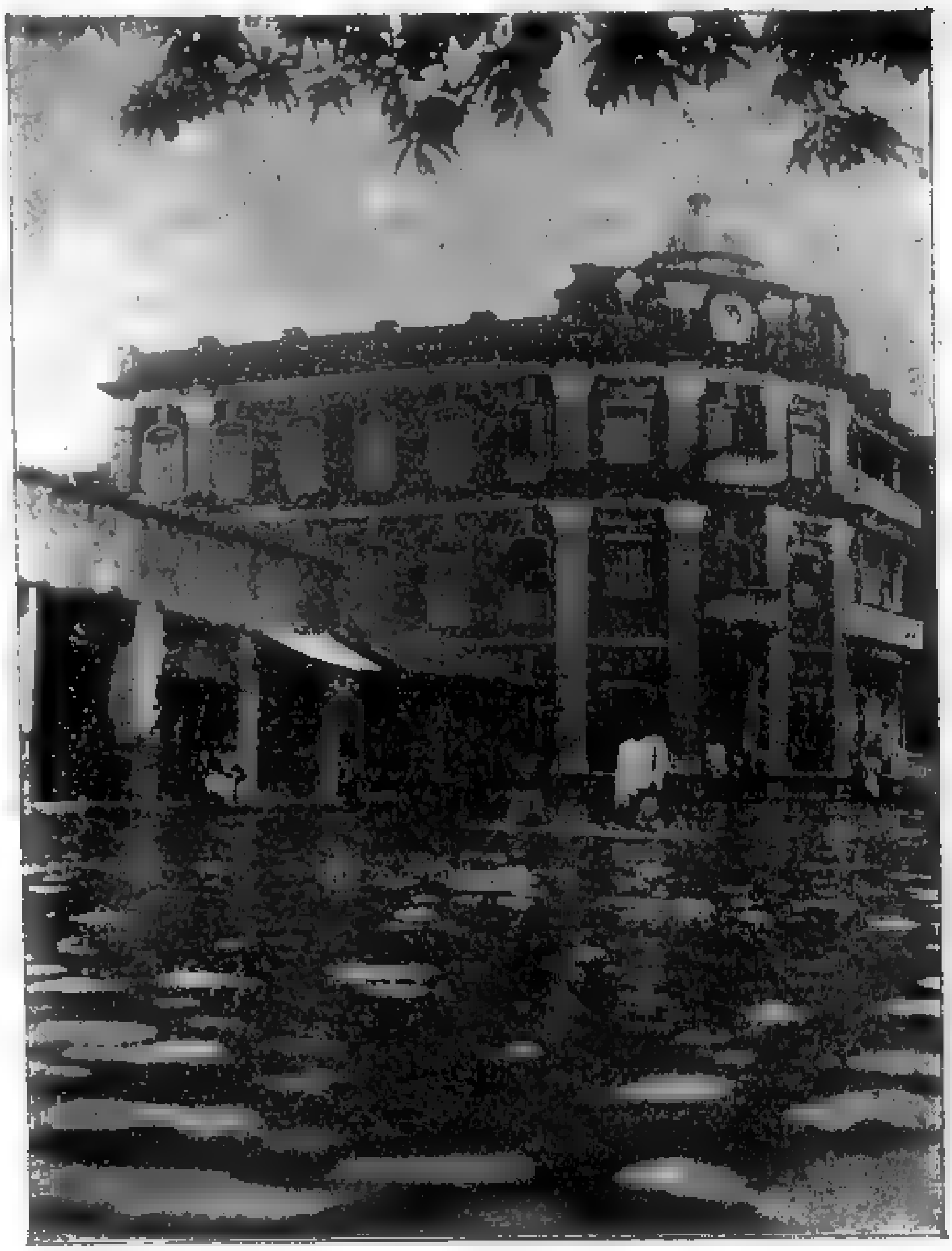

বেচুচাটার্জ্জি ষ্ট্রীটের তরঙ্গলীলা

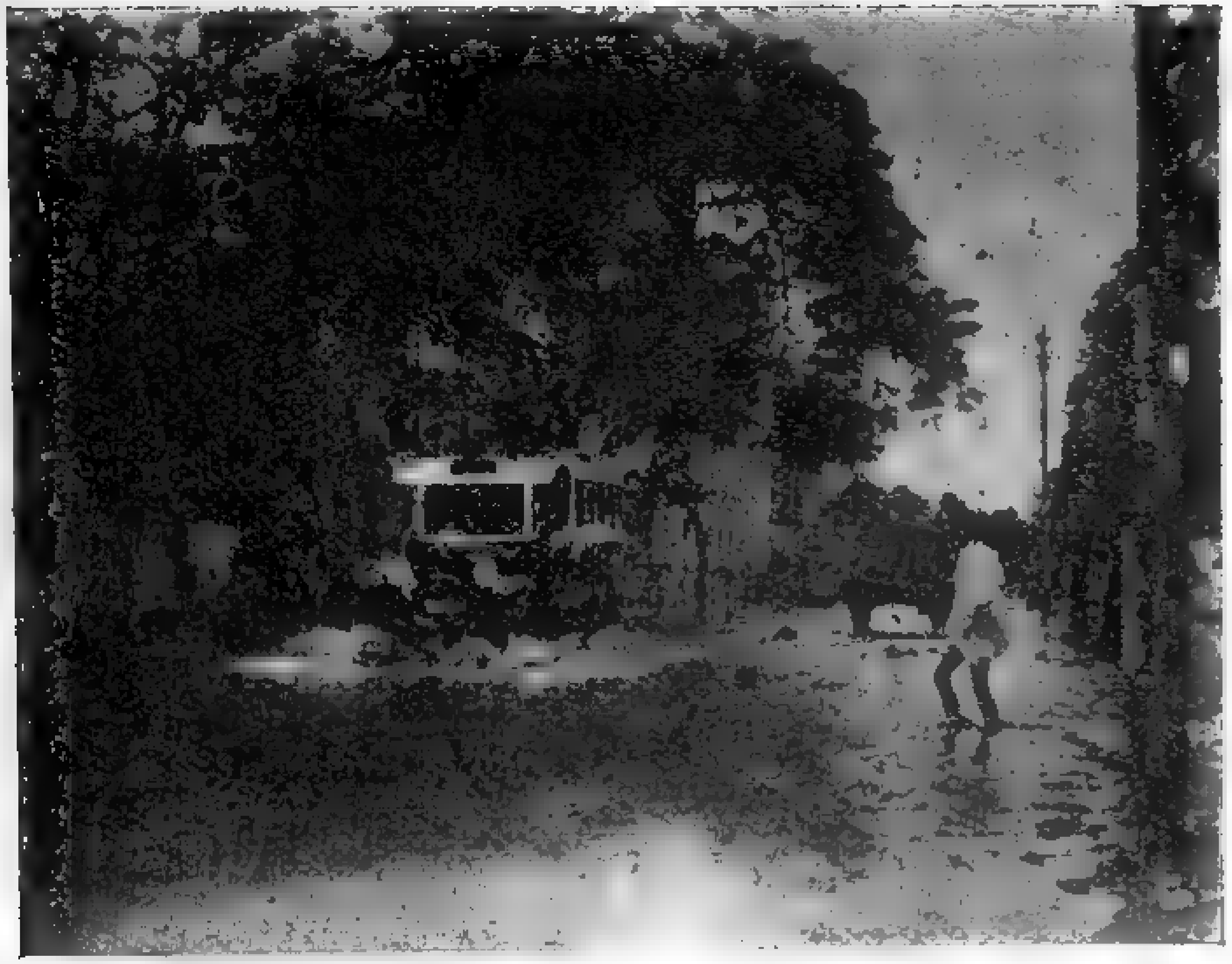

আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের প্লাবন-দৃশ্য

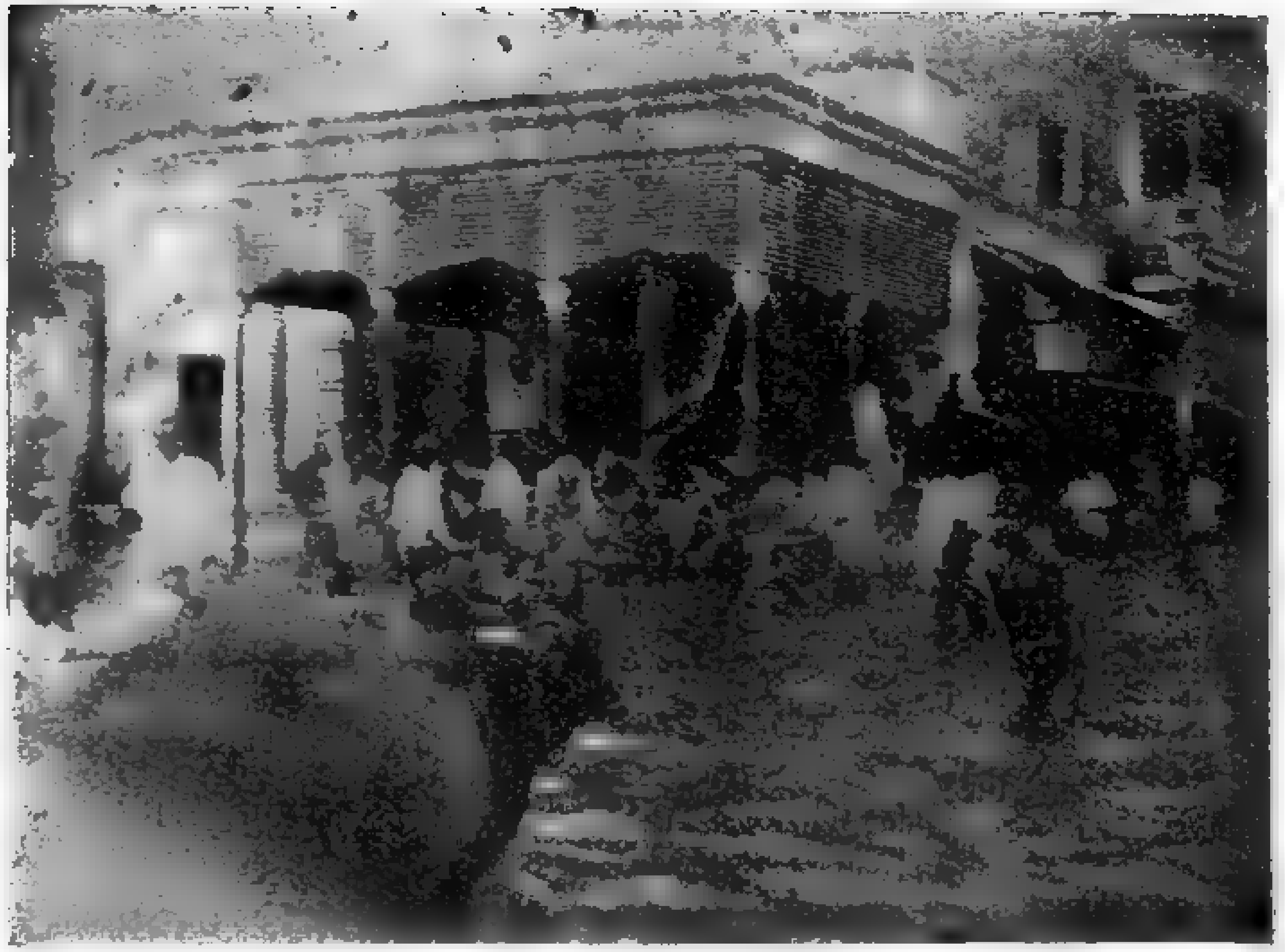

কালীতলার বিচিত্র দৃশ্য

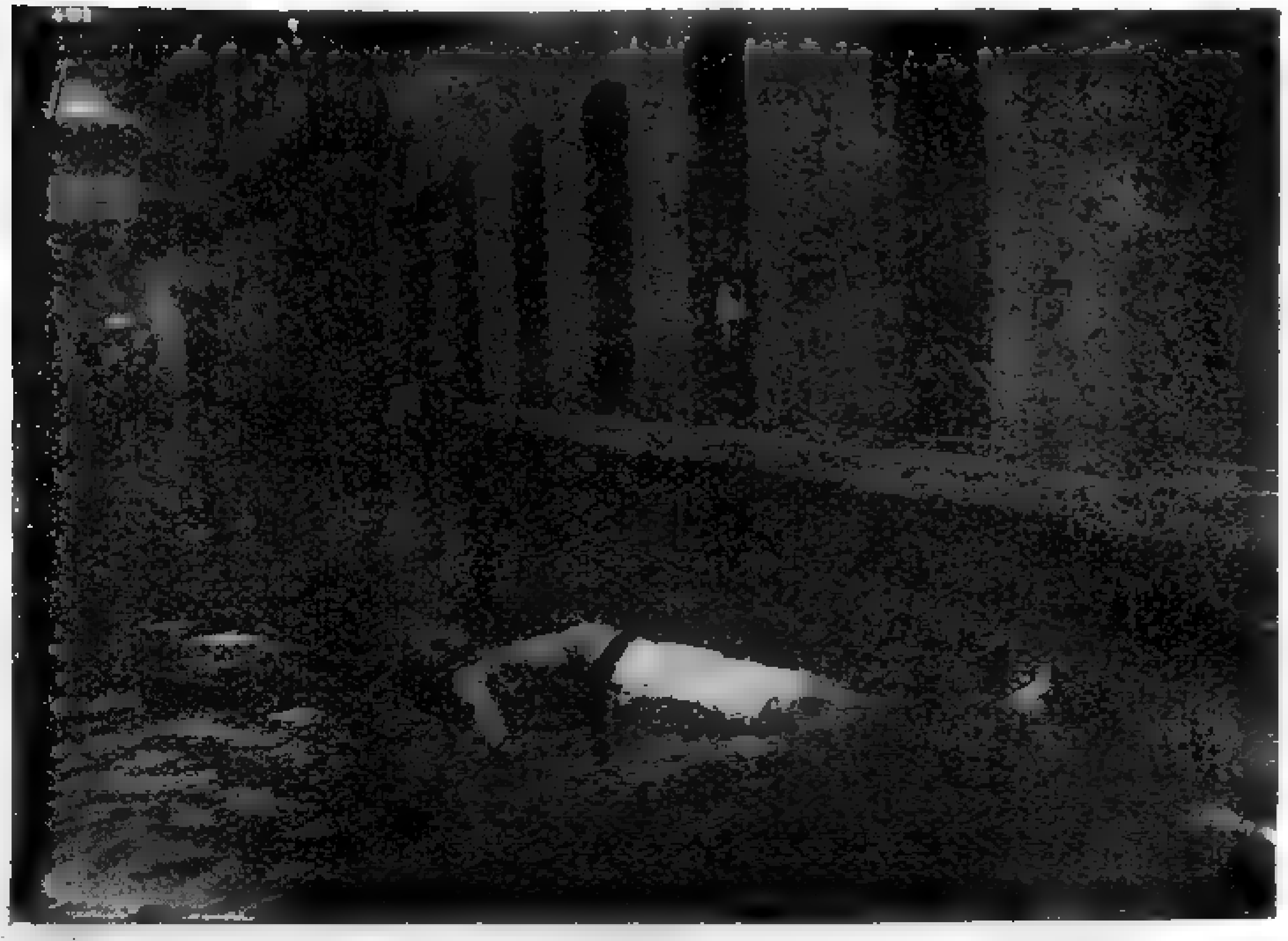

জলপ্লাবিত রাজপথে মনুষ্যদেহ

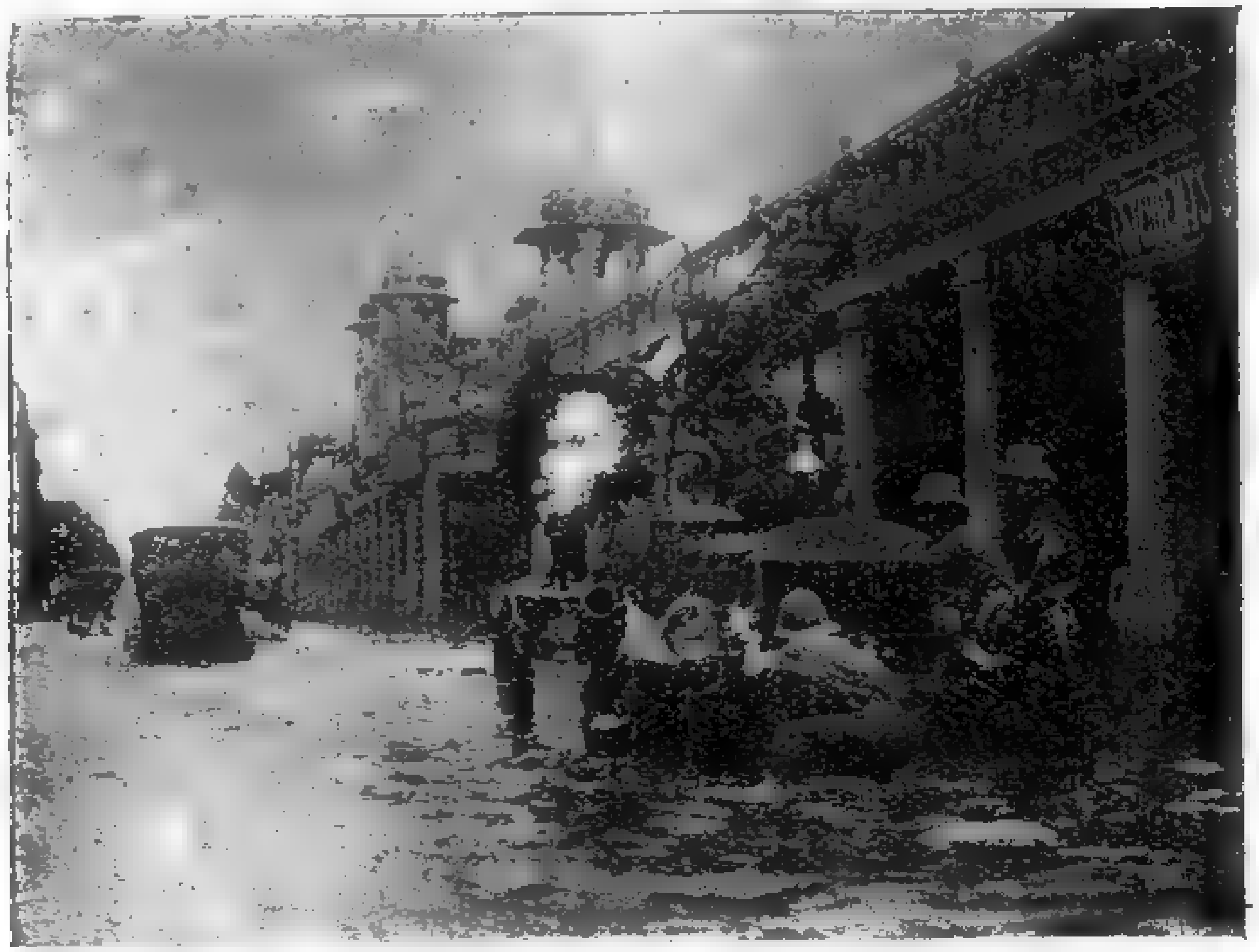

কলেজ ষ্ট্রীট—প্লাবনে ফায়ার ব্রিগেডের অবস্থা

এস্ গাঙ্গুলী মহোদয়ের সৌজন্যে।

কলিকাতা রাজপথে বাচখেলা

জলপ্লাবনে—অশ্বযান

শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাগের সৌজন্ত।

# দ্বিতীয় দৃশ্য—জলাভাব

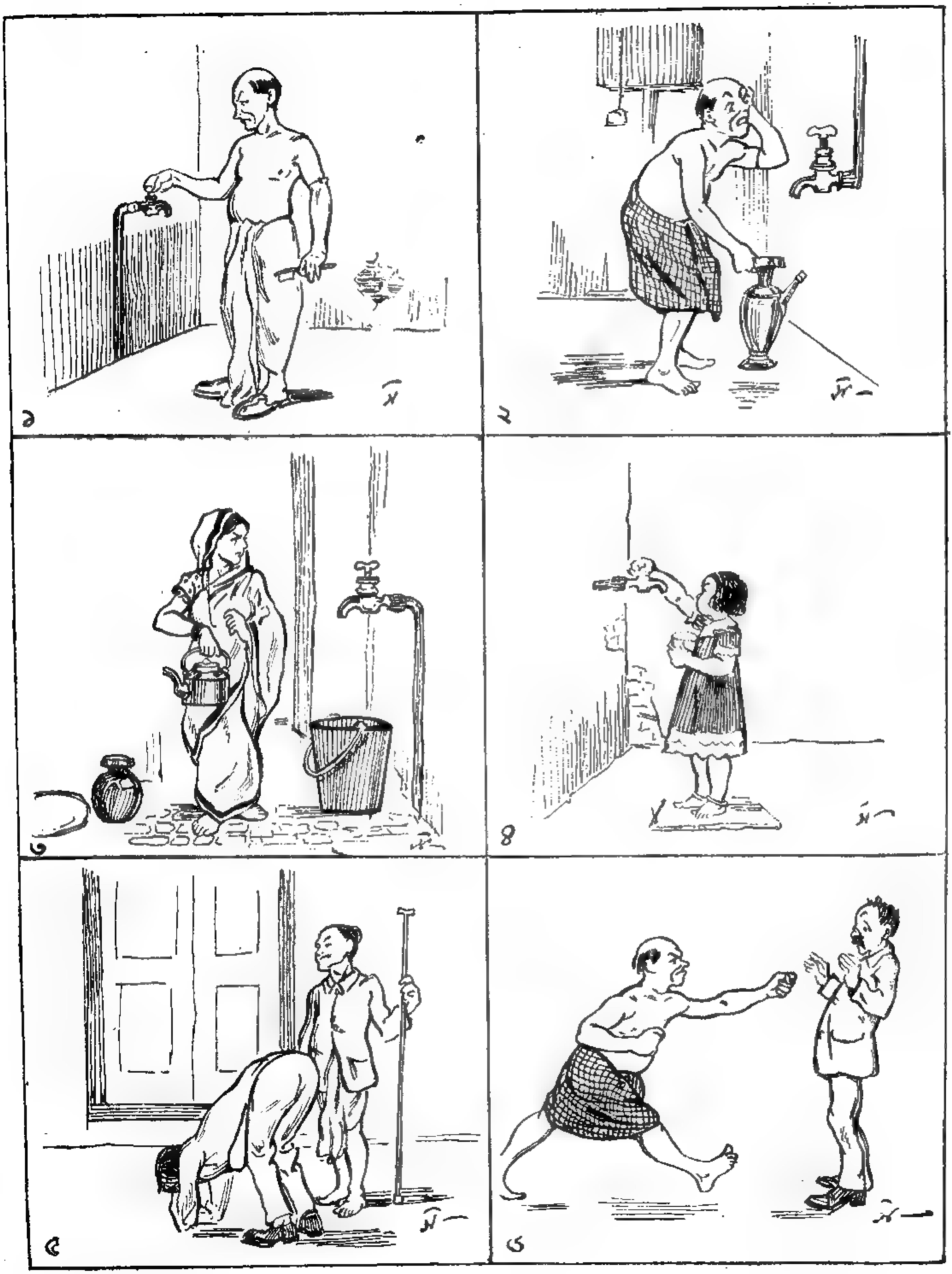

বাঙ্গালার রাজধানী কলিকাতা নগরের অধিবাসী শতকরা ১৯॥০ টাকা হিসাবে কর দিয়া কিরূপ আনন্দে দিনযাপন করিতেছে, উল্লিখিত দৃশ্যগুলি তাহার কতিপয় নিদর্শন।

শিল্পী—শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ।

## তাম্র-বিনির্ম্মিত সঙ্গীতাগার

আমেরিকার সেণ্ট লুই পার্কে একটি তাম্র-নির্ম্মিত আগার স্থাপিত হইয়াছে। উহার মধ্যে বসিয়া বাদিত্রগণ নানাবিধ যন্ত্রযোগে সুরের আলাপ করিয়া থাকে। সঙ্গীতাগারটি তাম্র-নির্ম্মিত হওয়ায় ঝঙ্কার ও সুরের মাধুর্য্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই আগার নির্ম্মাণে প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ টাকা খরচ পড়িয়াছে। আগারটির চারিধারে জলরাশি বিস্তৃত। উহাতে সঙ্গীতালাপে কোন প্রকার বিঘ্ন ঘটে না।

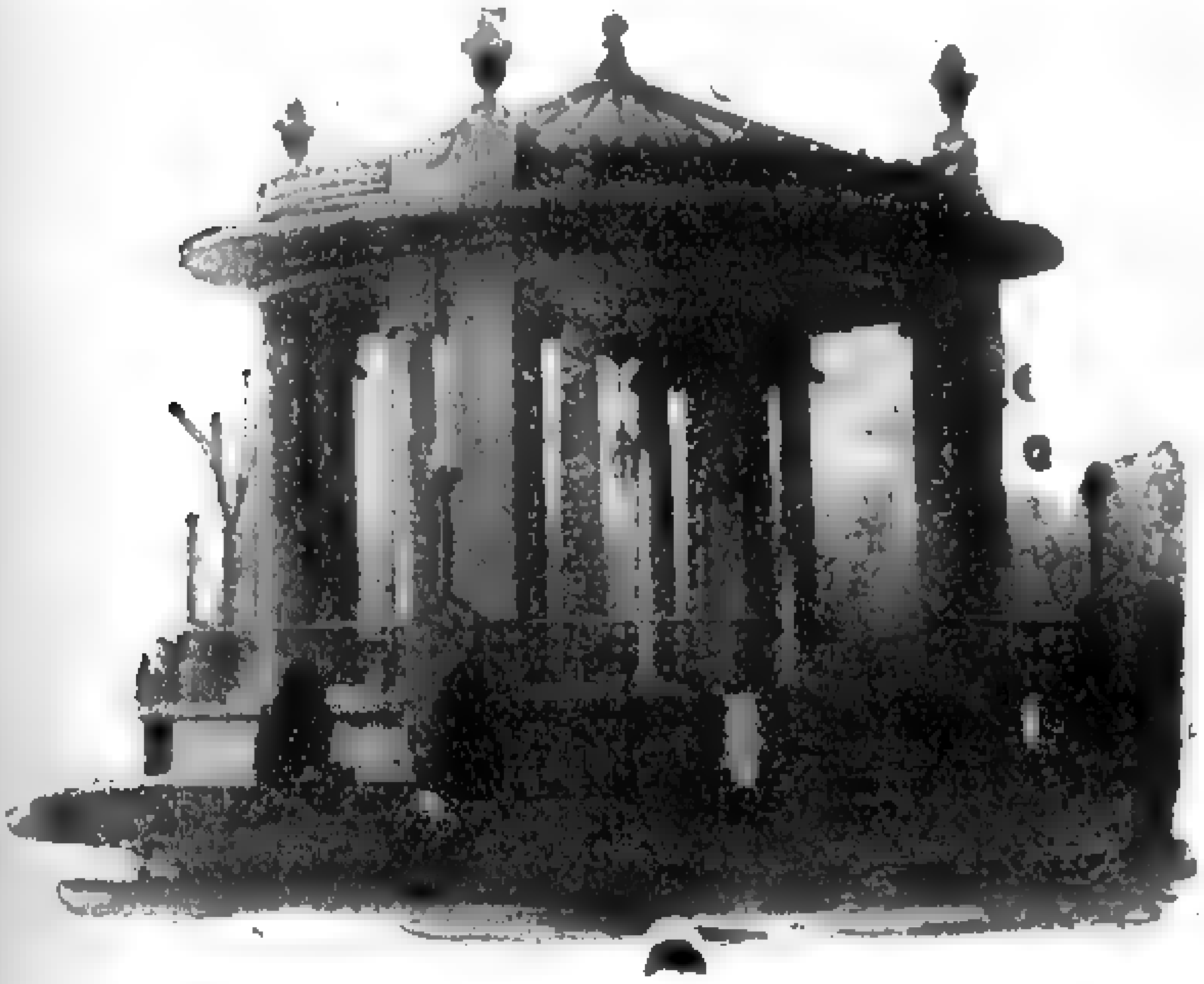
তাম্র-নির্ম্মিত বিচিত্র সঙ্গীতাগার

## চক্ষু-চিকিৎসার নূতন যন্ত্র

বৈজ্ঞানিকগণ দৃষ্টিশক্তি-বর্দ্ধনের জন্য নানাবিধ যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। সম্প্রতি জনৈক অভিজ্ঞ ব্যক্তি এ সম্বন্ধে আর একটা নূতন যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহার দ্বারা দৃষ্টিশক্তিকে বর্দ্ধিত করা যায়। বৈজ্ঞানিক এমনভাবে কতকগুলি কাচ একটি যন্ত্রে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন যে, যখন কোনও ব্যক্তি সেই কাচগুলির মধ্য দিয়া দৃষ্টিপাত করে, তখন ঘন-ঘন দৃষ্টিকেন্দ্রকে পরিবর্ত্তিত করা হয়। ইহাতে সেই ব্যক্তির নয়ন-সন্নিহিত পেশীগুলির ব্যায়াম হয়। চক্ষুরোগে পীড়িত নরনারীর পক্ষে এই যন্ত্র বিশেষ উপকারী বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ মত প্রকাশ করিয়াছেন।

চক্ষু-চিকিৎসার নূতন যন্ত্র

## যন্ত্র-সাহায্যে চরিত্র-বিচার

আমেরিকার জনৈক বৈজ্ঞানিক চরিত্র-বিচারের জন্য এক প্রকার যন্ত্রের উদ্ভাবন করিয়াছেন। একটি অন্ধকার

পরীক্ষক এক জন পরীক্ষার্থিনীর চরিত্র পরীক্ষা করিতেছেন

কক্ষে একটি স্ফটিক-গোলক রক্ষিত হয়। পরীক্ষার্থী গোলকের সম্মুখস্থ আসনে উপবিষ্ট থাকে। তাহাকে বলা হয়, সে যেন কোনও বিষয়ে অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা না করে। শুধু স্ফটিক-গোলক-নির্গত সবুজ অলোকটির প্রতি যেন চাহিয়া থাকে। পরীক্ষার্থীর কানে একটি শব্দবহ যন্ত্র সন্নিবিষ্ট করা হয় এবং তাহার এক হাতে একটি বৈদ্যুতিক তারসংযুক্ত বোতাম থাকে। সন্নিহিত আর একটি কক্ষে পরীক্ষক অপর একটি যন্ত্রের সম্মুখে বসিয়া থাকেন। এই যন্ত্রটির নাম Audiometer বা শব্দমাত্রানির্দ্দেশক যন্ত্র। পরীক্ষক প্রথমতঃ মাঝের 'C' মাত্রার শব্দ প্রয়োগের ব্যবস্থা করেন। যখন তিনি বুঝিতে পারেন; পরীক্ষার্থী স্বাভাবিক শব্দ বেশ শুনিতে পাইতেছে, তখন ক্রমশঃ তিনি শব্দের মাত্রা বাড়াইতে থাকেন। পরীক্ষার্থী শব্দ শুনিবামাত্র হস্তস্থিত বোতাম চাপিয়া ধরে। ইহাতে পরীক্ষকের সম্মুখস্থ যন্ত্রে একটি লাল আলোক জ্বলিয়া উঠে। ইহাতে তিনি বুঝিতে পারেন যে, পরীক্ষার্থী কোন্ মাত্রার শব্দ শুনিতে পাইতেছে। এইরূপে তিনি শব্দের মাত্রা কমাইয়া বা বাড়াইয়া পরীক্ষার্থীর নিবিষ্টতার পরীক্ষা গ্রহণ করেন। যদি সামান্ত শব্দে পরীক্ষার্থীর মনোযোগ আকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সে বিশেষ সামাজিক বলিয়া পরিগণিত হইবে; কিন্তু সামান্ত শব্দ যে শুনিতে পায় না, তাহাকে অসামাজিক লোক বলিয়া বুঝিতে হইবে। এইরূপে বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষায় নরনারীর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এই যন্ত্রযোগে নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায়।

## মুক্তা ও প্লাটিনম্-নির্ম্মিত দুর্গ

জাপানী শিল্পী মুক্তা ও প্লাটিনম্ সাহায্যে একটি মহা-মূল্যবান্ নকল দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছে। উল্লিখিত দ্রব্যটি ফিলাডেলফিয়ার প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে উপস্থাপিত করা হইবে। প্রায় ১৫ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে উহা প্রস্তুত হইয়াছে। আমেরিকার সহিত জাপানের বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ জাপান উহা আমেরিকাকে উপঢৌকন প্রদান করিবে। বহুশত শিল্পী পাঁচ মাস ধরিয়া এই মুক্তার কৃত্রিম দুর্গটি

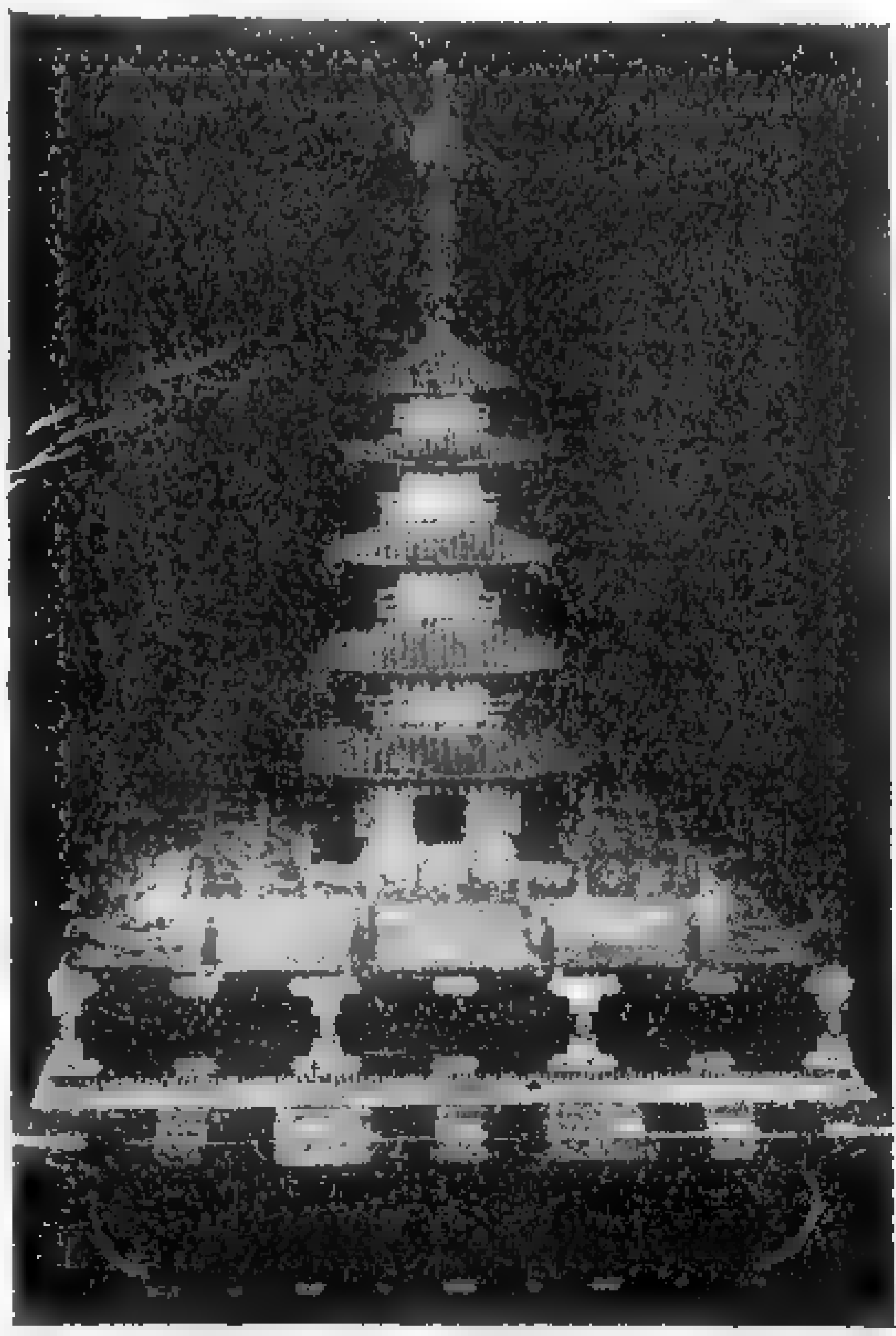

মুক্তা ও প্লাটিনম্-নির্ম্মিত দুর্গ

নির্ম্মাণ করিয়াছে। ইহাতে জাপানী শিল্পীর শিল্পজ্ঞানের প্রকৃষ্ট পরিচয় বিদ্যমান।

## সুটকেস বহনের অভিনব ব্যবস্থা

সুটকেস্, গল্‌ফখেলার সরঞ্জামপূর্ণ ব্যাগ প্রভৃতি বহন করিতে গেলে একটা হাতের দ্বারা অন্য কোন কায করিবার সুবিধা হয় না। এ জন্য সম্প্রতি ঐরূপ দ্রব্য বাহুর যে কোনও স্থানে ঝুলাইয়া রাখিবার জন্য নূতন ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহাতে দুইখানি করপুটই স্বাধীন অবস্থায় থাকে, অথচ দ্রব্য বহনের জন্য কোন প্রকার অসুবিধাও ঘটে না। আলোচ্য ছবিতে দেখা যাইবে, বাহু-সংলগ্ন বন্ধনীতে সুটকেস্ ঝুলিতেছে অথচ লোকটি পুস্তক পাঠ করিতে কোনও অসুবিধা ভোগ করিতেছে না।

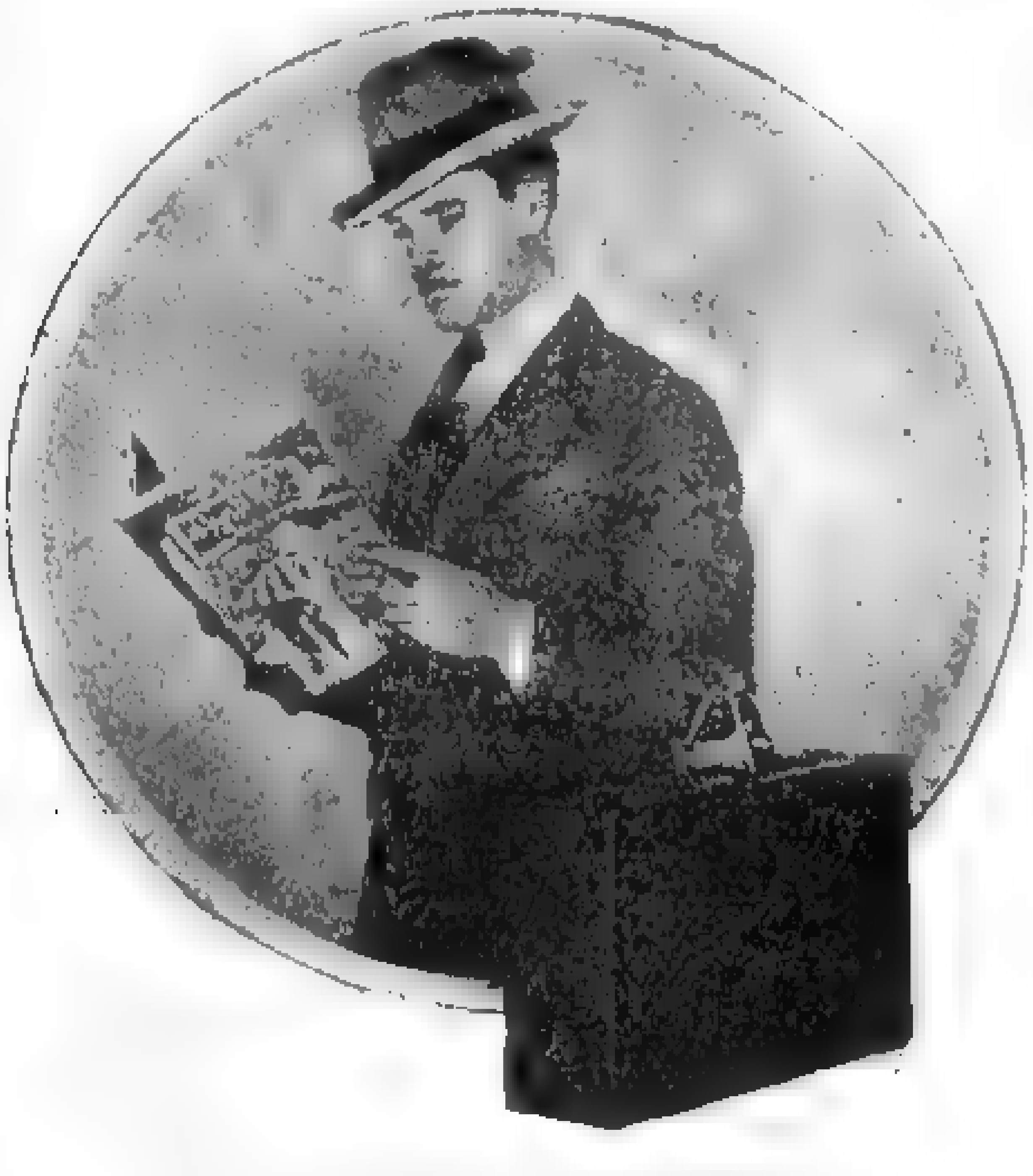
ভার বহনের নূতন উপায়

## চীনের প্রাচীন ঘণ্টা

খৃষ্ট-জন্মের এক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে চীনদেশে একটি ঘণ্টা নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই ঘণ্টাটি সম্প্রতি আমেরিকার মিউজিয়মে সংগৃহীত হইয়াছে। উল্লিখিত ঘণ্টাটি পূর্ব্বে কোনও চীনের দেবমন্দিরে ব্যবহৃত হইত। ইহার গঠন-প্রণালী অনেকটা ডিম্বাকার—গোলাকার নহে এবং দারুখণ্ডের সাহায্যে ঘণ্টাধ্বনি হইত। ঘণ্টাটির দেহে অনেকগুলি বোতামের মত বস্তু সন্নিবিষ্ট আছে। উহার এক একটিতে ক্ষুদ্র মুগুরের দ্বারা আঘাত করিলে এক এক প্রকার শব্দ নির্গত হয়।

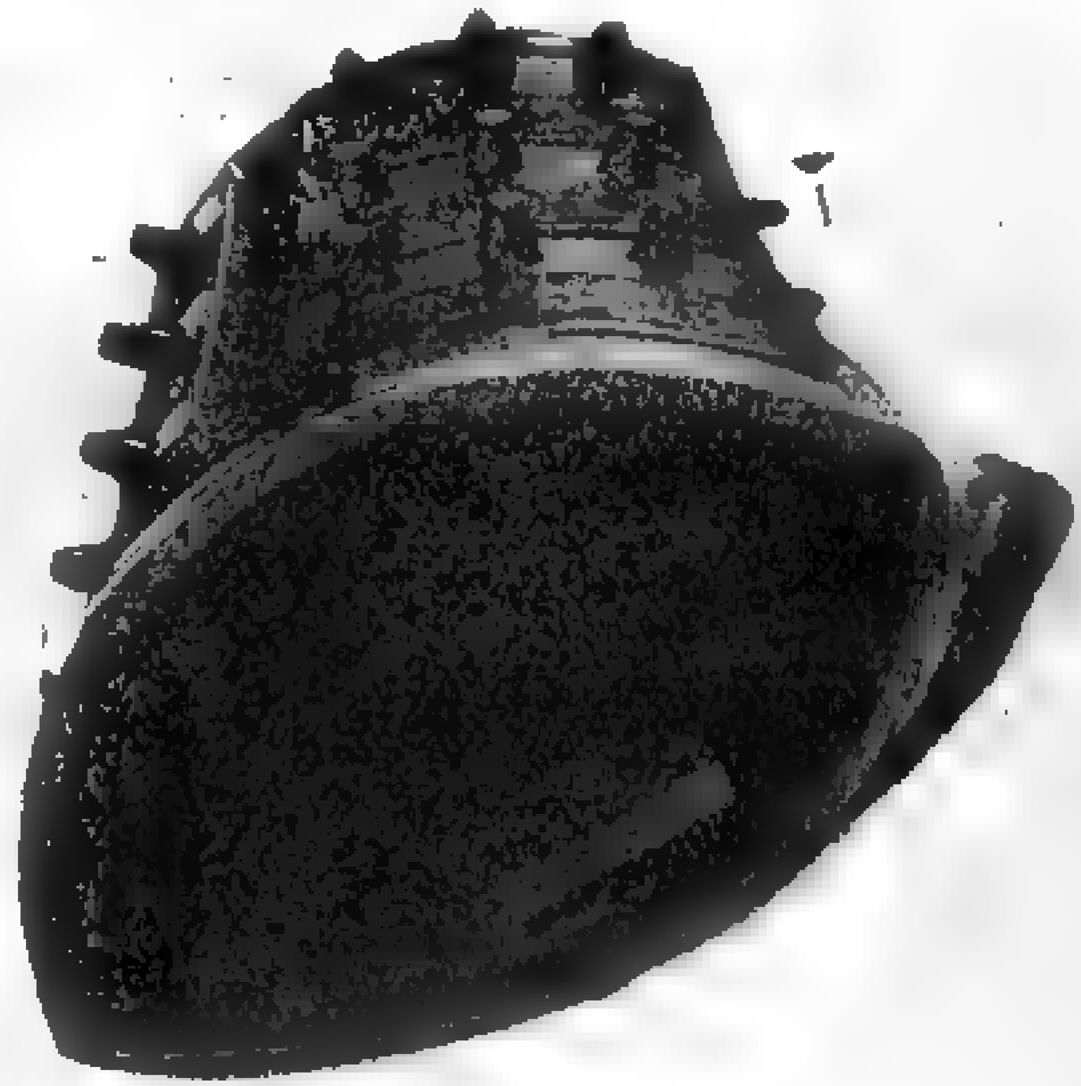
চীনের প্রাচীন ঘণ্টা

## পুলিসের অভিনব আয়ুধ

লস্ এঞ্জেল্‌সের পুলিস বিভাগের জন্য এক প্রকার নূতন আগ্নেয়াস্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। এই বন্দুক পুলিস তাহার স্কন্ধদেশে রক্ষা করিয়া থাকে। এক হস্তে ধৃত রিভলভার হইতে যে ভাবে গুলী নিক্ষিপ্ত হয়, এই নব-নির্ম্মিত বন্দুক হইতে সেই ভাবে গুলী নিক্ষিপ্ত করা যায়। আততায়ীর আকস্মিক আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য এই বন্দুক পিস্তলের ন্যায় ব্যবহার করা যায়।

নূতন প্রণালীর বন্দুক

## মানুষবাহী ঘুঁড়ি

লেফটেনাণ্ট কমাণ্ডার আর, ই, বায়ার্ড আর্কটিক প্রদেশে অভিযান করিতেছেন। অন্যান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সঙ্গে তিনি প্রকাণ্ড ঘুঁড়িও সংগ্রহ করিয়াছেন। এই ঘুঁড়ি এমন বৃহৎ যে, এক জন মানুষের ভার বহন করিতে সমর্থ। ঘুঁড়ি যাহাতে স্থিরভাবে থাকে, তাহার ব্যবস্থাও হইয়াছে। প্রয়োজন হইলে রেডিও যন্ত্র ঘুঁড়িতে সন্নিবিষ্ট করাও চলিবে, এমন ব্যবস্থাও আছে। বিমান-পোতে আরোহণ করিয়া অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের কার্য্য এই ঘুঁড়ির সাহায্যেও চলিতে পারিবে।

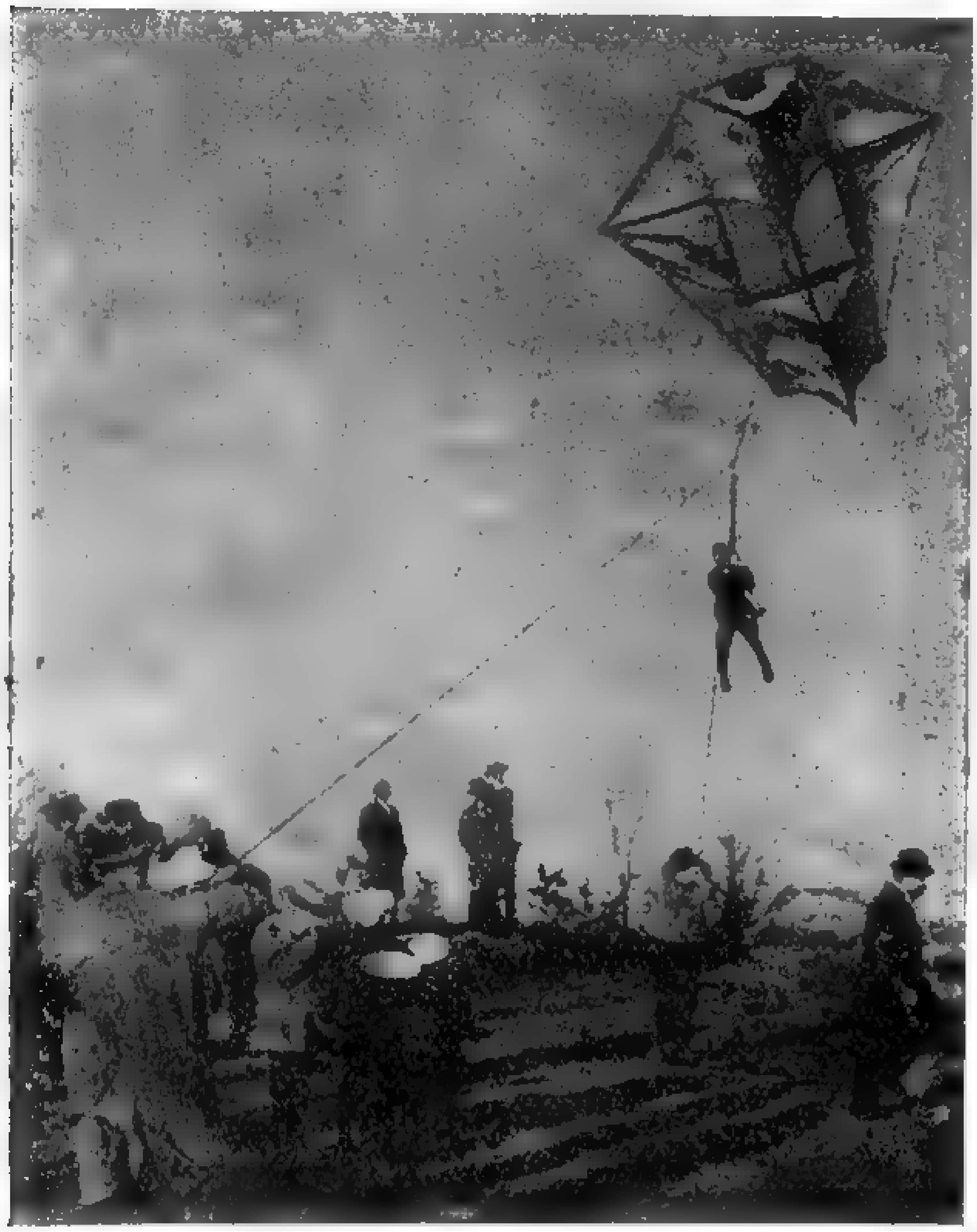
ঘুঁড়ির সাহায্যে মানুষ ঊর্দ্ধের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে

## প্রাগৈতিহাসিক যুগের অষ্ট্রীচ ডিম্ব

আমেরিকার 'ফিল্ড মিউজিয়ম্ ষ্টাকের' জনৈক বিশেষজ্ঞ ৩ হাজার বৎসর পূর্ব্বের একটি অষ্ট্রীচ পক্ষীর ভগ্ন ডিম্বের খোসা সুসন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। সেই ভগ্নপাত্রে পানীয় রাখিয়া উহা পানপাত্র হিসাবে ব্যবহার করিতে পারা যায়। উল্লিখিত ডিম্বটি কিস্‌এর ভগ্নস্তূপের মধ্য হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। চিত্রস্থ ব্যক্তি উল্লিখিত ডিম্বের ভগ্নাংশগুলি একত্র করিয়াছেন এবং স্বয়ং উহা হইতে পানীয় গ্রহণ করিতেছেন।

৩ হাজার বৎসরের প্রাচীন অষ্ট্রীচ পক্ষীর ডিম্বের খোসা

## অভিনব মোটর-বোট

আমেরিকার লস্ এঞ্জেলস্ বন্দরে সম্প্রতি নব-নির্ম্মিত এক প্রকার মোটর-বোটের প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে। এই নৌকায় ৩টি ফাঁপা বল বা গোলক সংলগ্ন—প্রত্যেক গোলকের পরিধি ৪ ফুট। পশ্চাতের গোলক দুইটির গাত্রে অনেকগুলি ডানা সংলগ্ন আছে। মোটর সাহায্যে গোলকগুলি আবর্ত্তিত হয়। ষ্টীমার বা জাহাজের চাকা আবর্ত্তিত হইলে যেমন জল কাটিয়া অগ্রসর হয়, এই ডানাগুলির সাহায্যে তদ্রূপ হইয়া থাকে।

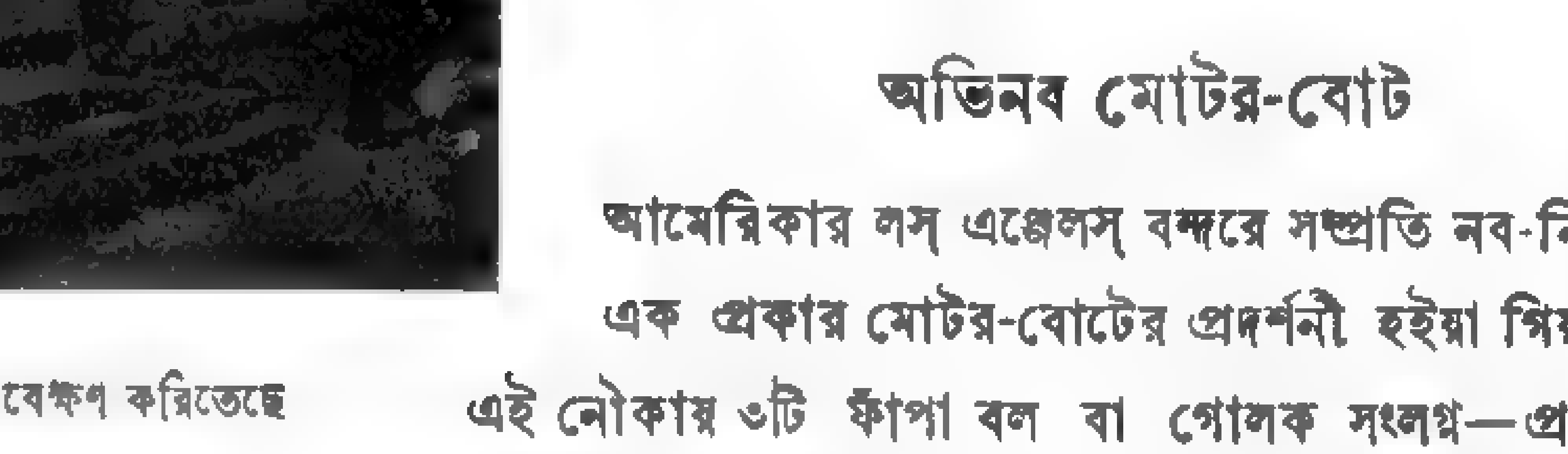
অভিনব মোটর-বোট

# চুপ চুপ

সে দিন বঙ্গবাণীতে দেখছিলুম, শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন যে,আজকাল মুখ ফুটে কোনও কথা বলা এক রকম অসম্ভব হয়ে পড়েছে। কেউ যদি এমন কোনও কথা বলতে উদ্যত হয়—যা পলিটিক্সের মামুলি বুলি নয়—তা হ'লেও চারিদিক্ থেকে বিজ্ঞ পলিটিসিয়ানরা ব'লে উঠেন "চুপ চুপ।"

পলিটিসিয়ানদের স্বধর্ম্মই হচ্ছে, কাউকে এমন কোনও কথা বলতে না দেওয়া—যা তাঁহাদের কথার পুনরাবৃত্তি নয়। মানুষে যাকে গবর্ণমেণ্ট বলে, সে বস্তু ত পলিটিক্সের একটা অঙ্গ বই আর কিছুই নয় এবং প্রকৃতপক্ষে সব চাইতে বড় অঙ্গ। আর সকল দেশে সকল যুগে গবর্ণমেণ্টের প্রয়াস হচ্ছে—নীরবতার উপর প্রতিষ্ঠিত ও প্রবৃদ্ধ হওয়া।

আর গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার উদ্দেশ্যে, দেশে যে সকল পলিটিকাল সঙ্ঘ গঠিত হয়, সে সবও নৈসর্গিক নিয়মে গবর্ণমেণ্টের হালচাল সবই অবলম্বন করতে বাধ্য—কারণ, সে সব সঙ্ঘের উদ্দেশ্য হচ্ছে এক দিন না এক দিন গবর্ণমেণ্টের স্থানাভিষিক্ত হওয়া। সুতরাং এমন কোনও কথা তাঁরা কাউকেও বলতে দিতে চান না, যাতে ক'রে তাঁদের উন্নতির পথে বাধা ঘটে।

এই যে পলিটিক্সের সনাতন ধর্ম্ম, সে কথা স্বয়ং মাকিয়াভেলি আজ পাঁচশ বৎসর আগে ব'লে গিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, পলিটিসিয়ানের দল এক দিন গবর্ণমেণ্ট হবার আশা রাখে, তাদের জানা উচিত যে, লোকমত তারা উপেক্ষা করতে বাধ্য এবং সে মতকে ছলে বলে চেপে দেবার চেষ্টা তাদের করতেই হবে। এতে ভয় পেলে তারা কস্মিন্‌কালে শাসন-কর্ত্তা হ'তে পারবে না। কারণ, শাসন-কর্ত্তার কাযই হচ্ছে জনসাধারণকে শাসন করা, তাদের সঙ্গে প্রেম করা নয়। মাকিয়াভেলির মতামত এ কালে অসাধু ব'লে গণ্য। কিন্তু তাঁর দুর্নীতির কথা আজও যে লোকে শোনে, কারণ, সে সব কথা একেবারে অসত্য নয়। অপরকে চুপ করবার হুকুম কিন্তু একমাত্র পলিটিসিয়ানরাই দেন না। যেমন এক দলের লোক রাজ্যের দোহাই দিয়ে আমাদের মুখ বন্ধ করতে চান, তেমন অন্য অন্য দলের লোকরা, কেউ বা নীতির দোহাই দিয়ে, কেউ বা ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে আমাদের ঠোঁটে ঠোঁট দিয়ে থাকতে আদেশ দেন। অর্থাৎ যাঁরাই পৃথিবীর কোনও একটা মহৎ ব্যাপার নিয়ে কথার ব্যবসা খোলেন, তাঁরাই কথা-বস্তুকে একচেটে করতে চান। কারণ, এ ভয় তাঁদের মনের ভিতর চব্বিশ ঘণ্টা জাগে যে, কে কোথায় কোন সত্য কথা ফস্ ক'রে ব'লে ফেলবে, আর অমনই তাঁদের ব্যবসা ঘা খাবে।

এ প্রবৃত্তির সঙ্গে ঝগড়া করা বৃথা, কেন না, এটা হচ্ছে মানুষের একটা আদিম প্রবৃত্তি। আমরা কি দিনে দুবেলা ছোট ছেলেদের বলি নে—"চুপ চুপ।" আর তার কারণ কি এই নয় যে, তারা অস্থানে অসময়ে এমন সব সত্য কথা ব'লে বসে—যার দরুণ আমাদের বিপদে পড়তে হয়। সত্য কথাটা যে মারাত্মক, তা যিনিই ছোট ছেলে নিয়ে ঘর করেছেন, তিনিই জানেন। এখন আমাদের মধ্যে এক দল যদি এমন বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ লোক—যাঁরা আর সকলকে কাণ্ডজ্ঞানহীন ছোট ছেলে মনে করেন, তা হ'লে তাঁরা উঠতে বসতে আমাদের মুখে হাত দিতে বাধ্য, কেন না, সেটা করা হচ্ছে তাঁদের কর্ত্তব্য। তাঁরা পরম কৃপা ক'রে লোকহিতের জন্য দল গড়তে বাধ্য। সুতরাং যাঁরা দল বাঁধেন, তাঁরাই তাঁদের মতামতকে শৃঙ্খলিত করতে বাধ্য—আর যে মত তাঁদের দলের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে নি, তাকেই উচ্ছৃঙ্খল বলতেই বাধ্য। দল বাঁধাটাও মানুষের একটি আদিম প্রবৃত্তি, এ কালের মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা যে প্রবৃত্তিকে Herd instinct বলেন, তার পরিচয় সর্ব্বপ্রকার জীবের মধ্যে পাওয়া যায়। মানুষে যাকে বলে দল, সে বস্তু হচ্ছে পশুরা যাকে বলে "পাল"—তারই নবসংস্করণ।

সুতরাং "চুপ চুপ" আদেশে কারও কোনও ক্ষতি নেই,—সেই অল্পসংখ্যক লোক ছাড়া যারা নিজের আত্মাকে কোনও প্রকার দলের অন্তরে বিলীন করতে পারে না। এ শ্রেণীর দু' দশ জন লোক সব দেশে সব যুগেই থাকে। আর তারা সব বিষয়ে সত্য কথা বলবার জন্য লালায়িত। এ শ্রেণীর লোকদের সব দলের দলপতিরা আর সেই

সঙ্গে তাঁদের অনুচররা চিরকালই ভয় করেন, অন্ততঃ তাঁরা এদের উপর এ ভরসা পান না যে, এরা দেশ-কাল বিবেচনা ক'রে কথা কইবে না, ছোট ছেলের মত যখন যা মনে হয়, তাই ব'লে বসবে। এ আশঙ্কা অমূলক নয়। যে সত্য কথা বলতে চায়, তাকে সে কথা বেপরোয়া-ভাবেই বলতে হবে। সত্য কথার ফলাফল কি হবে, সে কথার বিচার করতে বসলে কথা বলতে পারা যায়, কিন্তু সত্য বলা যায় না। গীতার একটি বচন একটু বদলে নিলে দাঁড়ায় এই যে, মানুষের সত্য কথা বলবার অধিকার আছে "মা ফলেষু কদাচন।" "যোগস্থো বদ বাক্যানি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।" এই আজ্ঞা শিরোধার্য্য করবার যাঁর সাহস নেই, তাঁর সত্য কথা বলবারও অধিকার নেই। এর প্রমাণ দর্শনের বিজ্ঞানের পাতায় পাতায় আছে। আর পলিটিক্সই বল, আর ধর্ম্মই বল ও দুয়ের কোনটিই দর্শন-বিজ্ঞানের অধিকারবহির্ভূত নয়। সুতরাং যাঁর ইচ্ছে, তিনিই নিজের বিদ্যাবুদ্ধি অনুসারে যা সত্য ব'লে মনে করেন, তিনি অবাধে তাই বলতে পারেন;—যদি না তিনি কোনও দলবলের চোখ-রাঙ্গানি অথবা চোখ-ঠারা দেখে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। জনৈক পেশাদার অভিনেতা আমাকে বলেছিলেন যে, রঙ্গমঞ্চে উঠে দর্শক-শ্রেণীকে বাঁদর মনে করলেই নির্ভয়ে ফূর্ত্তিসে act করা যায়। কথাটা যদি সত্য হয় ত আমার মতে একঘরে লেখকরা যদি দলকে herd ব'লে চিন্‌তে পারেন, তা হলেই তাঁদের কলম ফূর্ত্তিসে চলবে।

সে যাই হোক, "চুপ চুপ" আদেশটা আজকালকার দিনে মানাও কঠিন ও মানা সঙ্গত কি না, সে বিষয়েও সন্দেহ আছে।

বৈষ্ণবরা বলেন :—

"বিষয়-বালিসে আলিস্ রেখো
দেখো যেন ঘুমাও না।"

আমরা দেশশুদ্ধ শিক্ষিত সম্প্রদায় গোটাকতক পলিটিকাল বুলির বালিসে আলিস্ রাখতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। আর সেই জন্য দুদিন আগে সেই বুলির বিরুদ্ধে কেউ কিছু বল্‌তে গেলেই সহৃদয় লোকরা অমনই ফিসফিস ক'রে বলতেন "চুপ চুপ।" কথা কইলেই যে সকলের ঘুম ভেঙ্গে যাবে। আর আধ্যাত্মিক লোকরা এ কথাও আমাদের বুঝিয়েছেন যে, এ ঘুম যে সে ঘুম নয়, একেবারে যোগ-নিদ্রা। আমরা যারা বিশ্বাস করি নি যে, শিক্ষিত সমাজ স্বপ্ন দেখতে দেখতে স্বরাজ্যে গিয়ে পৌঁছবে, আমরাও বেশি কিছু উচ্চবাচ্য করি নি, কারণ, জানতুম যে, দেশের লোকের যোগনিদ্রা ভাঙ্গানো আমাদের মত ক্ষুদ্র ব্যক্তিদের পক্ষে অসাধ্য।

তার পর এক দিন মুসলমানদের এক ধাক্কায় হঠাৎ আমাদের ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছে। ফলে আমরাও বেশির ভাগ লোক এখন হতভম্ব ভাবে চোখ রগড়াচ্ছি আর জন কতক ঘুমের ঘোরে সেই সব পুরানো বুলিই এলোমেলোভাবে আওড়াচ্ছেন। এ অবস্থায় যাঁদের দস্তুরমত চোখ খুলেছে, তাঁদের মনে নানা কথা উদয় হচ্ছে। এ সময়ে চুপ চুপ বলার কোনও সার্থকতা নেই। সে আদেশ যারা জেগে উঠেছে, তারা মানবে না। আজকের দিনে যাঁরা নিজের চোখ দিয়ে দেখতে পারেন, নিজের মনের কথা বলতে পারেন, তাঁদের কথাই আমরা শুনতে চাই—আর তাঁদের কথাই শোনবার যোগ্য। আর তাঁরা কথা কইতে আরম্ভ করছেন, চুপ-চুপ-ওয়ালারাও চুপ হয়ে যাবে। আর এ কায লেখকেরা নির্ভয়ে করতে পারেন। সব কথা স্পষ্ট ক'রে বলাকওয়ার ফলে, স্বরাজের তারিখ এগিয়ে না আসুক, পিছিয়ে যাবে না।

বীরবল।

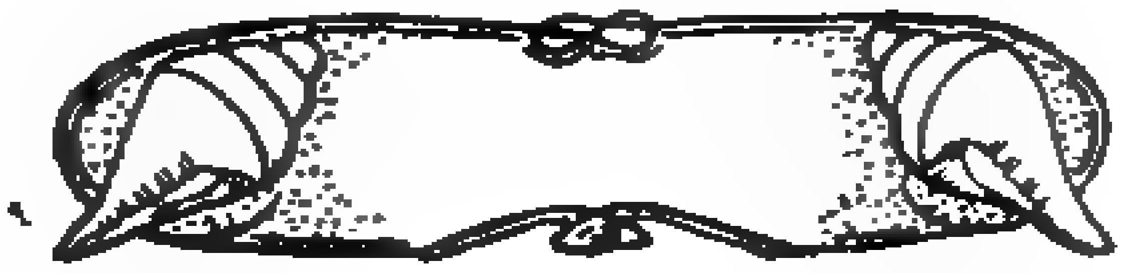

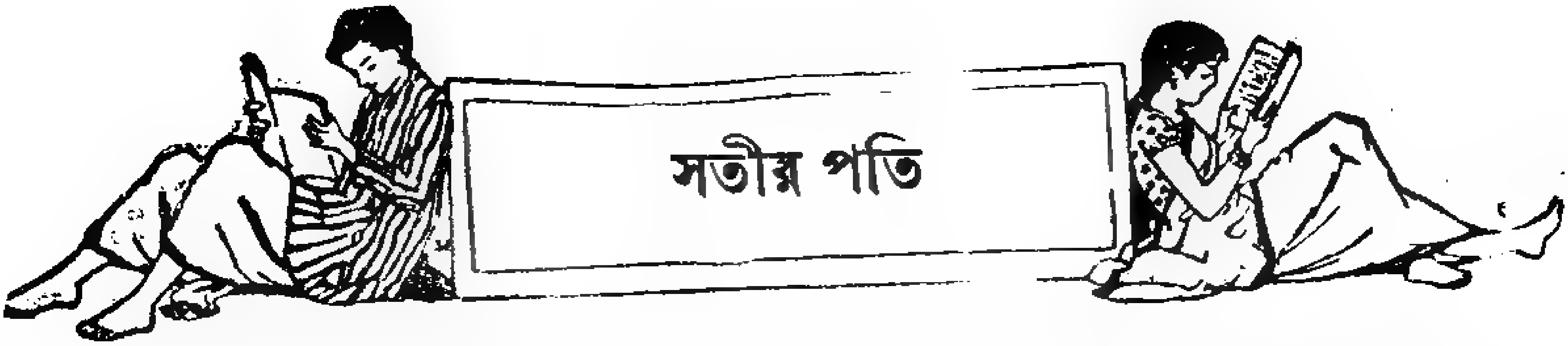

# সতীর পতি

( উপন্যাস )

## সপ্তম পরিচ্ছেদ

### করিমের বক্তৃতা

চাবি বন্ধ করিয়া করিম দোতালা হইতে নামিয়া গেল। নিম্নের হলে যেখানে বহু মুসলমান সমবেত ছিল ; কেহ শুইয়া, কেহ বা বসিয়া ছিল, তাহাদের মাঝখানে গিয়া দাঁড়াইল। সর্দ্দারকে দেখিয়া সকলেই চঞ্চল হইয়া উঠিল। যাহারা শুইয়া ছিল, তাহারা উঠিয়া বসিল ; যাহারা বসিয়া ছিল, তাহারা একটু নড়িয়া চড়িয়া সর্দ্দারের মুখের পানে সসম্ভ্রমে চাহিয়া রহিল।

করিম বলিল, "জোয়ান সব, কা'ল রাত্রে আমাদের যা করবার সল্লা ছিল, তা কা'ল হয় নি, আজ হবে, সে খবর তোমরা জানো ত ?"

অনেকেই বলিল, "হাঁ হুজুর, খবর পেয়েছি, আমরা সব তৈয়ার আছি।"

এক জন নিজ স্থান হইতে উঠিয়া আসিয়া সবিনয়ে বলিল, "হুজুর খাড়া রইলেন কেন, বসেন !"

করিম বলিল, "বসছি। এক জন যাও ত, এরফান মিঞাকে ব'লে আসো, আর আর যে সকল জোয়ান আমাদের সাথে যাবে কথা ছিল, তাদের সকলকে একাট্টা ক'রে নিয়ে আসে।"

"বহুৎখু, সাহেব"—বলিয়া এক যুবক ছুটিয়া বাহিরে গেল।

এক জন নিজের শতরঞ্চিখানা আনিয়া সর্দ্দারের জন্য বিছাইয়া দিল, করিম তাহাতে উপবেশন করিল। জন কয়েক মাতব্বর গোছের মুসলমান তাহার কাছে আসিয়া বসিয়া পরামর্শ আঁটিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে একে একে, দুইয়ে দুইয়ে অনেকগুলি মুসলমান আসিয়া, করিমকে সেলাম করিয়া বসিয়া পড়িল। অবশেষে এরফান আসিয়া বলিল, "সকলেই হাজির আছে হুজুর !"

করিম বলিল, "গিণ্‌তি কর্।"

এরফান এক দুই করিয়া গণনা সুরু করিল। শেষে দেখা গেল, ৯৮ ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত আছে।

করিম বলিল, "আর দু' জন হ'লেই যে হয়। উপরে আর কেউ নেই ?"

এরফান বলিল, "উপরে কেবল এক জন আছে। সেই যে আদমি কা'ল রেলে এসে পৌঁছেছিল। তাকে বলতেই সে অনেক নেহোরা মিন্‌তি ক'রে বল্লে, ভাই সাহেব, আজ আমায় মাফ করতে হবে ; বিকাল থেকে আমার শির বড় দরদ করছে ; তা ছাড়া আমি এ সহরে নূতন এসেছি, তায় রাত্রিকাল, পথ-ঘাট চিনি না, যদি পুলিসে তাড়া করে, তবে কোন্ দিকে পালাতে হবে, তাই আমি জানি না। তোমাদের খিদমতে আমি হাজিরই আছি—কা'ল দিনের বেলা যে কাম আমায় হুকুম করবে, আমি তাই তামিল করবো !"

করিম হাসিয়া বলিল, "মফঃস্বলের লোক কি না—ডরফোক্ ! আচ্ছা এরফান, দেখ্ দেখি, জহুরের বেটা আবদুল আর হোসেনির ভাঞ্জা গফুর ফিরেছে কি না। ফিরে থাকে ত তাদের ডেকে নিয়ে আয়, তা হ'লেই একশো পোরে।"

"বহুৎখু"—বলিয়া এরফান চলিয়া গেল এবং কিয়ৎক্ষণ পরেই নির্দ্দিষ্ট যুবকদ্বয়কে লইয়া পুনঃপ্রবেশ করিল।

করিম বলিল, "হাঁ রে গফুর, হাঁ রে আবদুল, কাযের সময় এতই তোদের আস্কতি ! কি রকম জোয়ান তোরা ?"

গফুর বলিল, "আস্কতি করিনি হুজুর ! যে কামে আমাদের পেঠিয়েছিলেন, তা হাসিল ক'রে এসেছি। বড়ই থ'কে এসেছিলাম,—আধঘণ্টা পরেই এসে হুজুরে হাজির হতাম।"

"আচ্ছা, বোস তোরা !—শোন ভাই সকল ! পাজি নালায়েক হেঁদুরা আমাদের সঙ্গে বড়ই বদিয়তি করেছে। লাঠি-সোটা নিয়ে আমাদের মসজিদে ঢুকে ঝাড়-লণ্ঠন চুরমার করেছে, কোরাণ সরিফ ছিঁড়ে দিয়েছে—মুসলমানদের উপর মাইরপীট করেছে। তার বদলা আমরা লেবই লেবো—নইলে আমরা মুসলমান বাচ্চাই নই। ঠন্‌ঠনিয়ায় ওদের যে কালীমন্দির আছে, আজ আমরা সেই মন্দিরে চড়াও করব। বুতপরস্ত হালাদের জিভ বের করা ঠাউর কি খাপ্‌সুরৎ রে ! হ্যাঃ !"—বলিয়া করিম মুখভঙ্গী করত নিজ জিহ্বাটি যথাসম্ভব বাহির করিল। দেখিয়া সকলেই হাসিতে লাগিল।

করিম পুনরায় বলিতে লাগিল, "কাফের শালারা আমাদের কোরাণ সরিফ ছিঁড়ে দিয়েছে। বেটাদের

ঠাউরের জিভটা ছিঁড়ে কুত্তাকে দিয়ে খাওয়াতে পারি, তবেই মনের দুক্ষু যায়।"

অনেকে বলিয়া উঠিল, "খাওয়াব—খাওয়াব—আলবৎ খাওয়াব।"

করিম বলিল, "একটু ভুল হয়েছে আমার। সেটায় সোনার জিভ। কুত্তায় ত খাবে না। সোনাটা বেচে সেই টাকায় হালুয়া রুটী বেনিয়ে, এক দিন কুত্তাদের ভোজ লেগিয়ে দেওয়া যাবে। কি বল তোমরা?"

অনেকে বলিল, "সেই বেহেতর—সেই বেহেতর।"

করিম বলিল, "শুন ভাই সকল! রাত এখন ১০টা। ঠিক ১২টা বাজলেই আমরা সব বাইর হব। একাট্টা নয়—দুই দলে। ৫০ জোয়ান আমার জিম্মা, ৫০ জোয়ান এরফান মিঞার জিম্মা। দুই দলে দুই দিক থেকে গিয়ে আমরা চড়াও হব। এক দল আমি নিয়ে যাব, মুক্তারাম বাবুর ইষ্টিট দিয়ে। এরফানের দল যাবে, হ্যারিসন রোড দিয়ে, কলেজ ইষ্টিট দিয়ে। মহল্লার হেঁদু ছোকরারা সব কা'ল থেকে মন্দিরে পাহারা দিচ্ছে—কা'ল তারা দু' শো লোক ছিল। আজ রাত ৯টার সময় খবর পেয়েছি, সে যায়গায় বড় জোর পঞ্চাশ ষাইট জন আছে। রাত এগারোটা লাগাৎ—তাদেরও অনেকে ঘরে চ'লে যাবে। যারা পাহারায় থাকবে, তারাও অনেকে ঘুমিয়ে পড়বে। সেই আমাদের সময়। সেই সময় আমরা গিয়ে তাদের ঘাড়ের উপর লেফিয়ে পড়বো। কিন্তু হুঁসিয়ার, প্রথমে কোনও চিল্লাচিল্লি নয়—চুপ-চাপ গিয়ে তাদের উপর পড়তে হবে। লোহার ডাণ্ডা দিয়ে, হালাদের মাথা ফেটিয়ে, মন্দির দখল ক'রে নেওয়া যাবে। লোহার ডাণ্ডা মেরে সেই জিভ বের করা কালো ভূতনীকে ভেঙ্গে চূরমার ক'রে দিয়ে, তার পর মন্দির ভাঙ্গতে হবে। কাফের বেটারা লালবাজারে টেলিফোন করবে—সেখান থেকে লরী-বোঝাই সিপাই আসবার আগেই, কাম হাসিল ক'রে ফেলতে হবে। একশো জোয়ান, একশো লোহার ডাণ্ডা দিয়ে, সামান্য একটা মন্দির ভাঙ্গতে কতক্ষণ সময় লাগে? পুলিস এসে পড়বার আগেই দল ভেঙ্গে আমাদের ছড়িয়ে পড়তে হবে। বড় রাস্তা দিয়ে নয়, গলি-ঘুঁজি দিয়ে। গলির মধ্যে ঢুকে আর ছুটাছুটি নয়—ধীরে-সুস্থে—বেচারা সিধে মুসলমানটির মত। ভাই সকল—তোমরা সব কথা বুঝতে পারলে?"

সকলে বলিয়া উঠিল, "জি হুজুর! জি হুজুর!"

করিম বলিল, "বহুৎ আচ্ছা!—এখনও দেড় ঘণ্টা সময় আছে। তোমরা, যাদের খানাপিনা হয়নি, খানাপিনা সেরে নাও। আমি একবার ঘুরে আসছি।"—বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে সে ফিরিয়া আসিল। সঙ্গে ৫।৬ জন মুটিয়া শ্রেণীর মুসলমান, প্রত্যেকের মাথায় চটে জড়ান কতকগুলি করিয়া লোহার ডাণ্ডা। দেখিলে বোধ হয়, এককালে সেগুলি জানালার গরাদে ছিল। প্রত্যেক জোয়ানকে এক একটি ডাণ্ডা দিবার জন্য এরফানকে আদেশ করিয়া করিম উপরে চলিয়া গেল। যে কক্ষে রেবতী তালাবন্ধ আছে, তাহা খুলিয়া দেখিল, রেবতী বস্ত্রাঞ্চল পাতিয়া খালি মেঝের উপর শয়ন করিয়া আছে।

দ্বার খোলার শব্দে রেবতী তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল এবং করিমকে দেখিয়া, বক্ষবস্ত্রে হস্তার্পণ করিল। করিম দেখিল, তাহার মুখখানি অশ্রুসিক্ত। বলিল, "এক মিনিটের জন্য একটা কথা বলতে এলাম। আবার কান্না কিসের বিবি? কার জন্যেই বা? দেখলে ত, শওহর তোমার কি রকম বেইমান! এল না, টাকা দিয়ে তোমায় খালাস ক'রে নিতে এল না। ভাবলে বোধ হয়, এ আওরৎ ত পুরানী হয়ে গিয়েছে—পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে একে খালাস ক'রে আর কি হবে, তার চেয়ে দোসরা একটা সাদি করা যাক্, তাজা চিজ্ মিলবে। তার আশা তুমি ছেড়ে দাও। দেখবে, আমার বিবি হয়ে কত সুখে তুমি থাকবে। তোমার যে সকল জ্যাওর সে সব ত তুমি ফিরে পাবেই, তা ছাড়া আরও কত ভাল ভাল জ্যাওর আমি তোমায় কিনিয়ে দেবো পিয়ারী! আমার আরও দুটি বিবি আছে, কিন্তু তোমার মত খাপসুরতি কেউ নয়। আর, তোমায় দেখে অবধি, কা'ল থেকে আমার যে বেহাল হয়েছে—তা কেবল আমি জানি আর খোদা জানেন। এই ছাতির ভিতরটা হুহু ক'রে জ্ব'লে যাচ্ছে। এখন আমরা একটু জরুরী কাযে বেরুচ্ছি—সে কাযটা হাসিল করেই, ঘণ্টাখানেক পরেই আমি আসছি—আমার দিল-আরামকে নিয়ে দিলখুস্ হব—আমার পিয়ারীকে নিয়ে কলিজা ঠাণ্ডা করবো—বেহেস্তের হুরীকে নিয়ে, বেহেস্ত কি জিনিষ, তা মালুম করবো। তুমি ততক্ষণ বরং একটু ঘুমিয়ে নাও। আমি এসে দুয়ারে ধাক্কা দিলেই খুলে দিও।"—বলিয়া করিম রেবতীর দাড়ীটি ধরিয়া সাদরে একবার নাড়িয়া দিল। এই প্রথম সে তাহাকে স্পর্শ করিল।

জাল আবু হোসেন নগ্নপদে আসিয়া এতক্ষণ দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া ইহাদের কথোপকথন শুনিতেছিল, এই সময় সে ধীরে ধীরে সরিয়া গিয়া, ভাল ছেলেটির মত নিজের বিছানায় বসিল।

রেবতী কোনও কথা বলিল না—কোনও উত্তর দিল না। মৌনং সম্মতিলক্ষণং—এই সূত্রের অনুরূপ কোনও সূত্র মুসলমান শাস্ত্রেও আছে বোধ হয়—কারণ, করিম যেন আশাপূর্ণ হৃদয় লইয়া প্রফুল্ল মুখে বাহির হইয়া গেল।

দ্বারে পূর্ব্ববৎ তালা বন্ধ করিয়া করিম দেখিল, নবাগত আবু মিঞা হলের প্রান্তভাগে নিজ বিছানায় বসিয়া আছে। তাহার ললাট বেষ্টন করিয়া রুমাল বাঁধা।

করিম তাহার নিকট গিয়া বলিল, "আবু মিঞা, শুনলাম, তোমার তবিয়ৎটা কিছু মান্দা আছে!"

হীরালাল বলিল, "হাঁ, সাহেব, বিকাল থেকে শির বড়ই দরদ করছে। আঃ, উঃ,—ইয়া আল্লা!"—বলিয়া জাল-আবু নিজ রগ দুটি টিপিতে লাগিল।

করিম বলিল, "ব'সে কেন তক্‌লীফ করছ। শোও—শুয়ে আরাম কর। একটু নিদ হলেই শিরদর্দ্দি আরাম হয়ে যাবে।"

"জী হাঁ, তাই শুই।"—বলিয়া কপালে রুমালের ফাঁস আরও টান করিয়া হীরালাল শুইয়া পড়িল।

করিম বলিল, "দেখ মিঞা, একটা কথা তোমায় ব'লে যাই। আমরা ত আজ সবাই ঠনঠনিয়ার কালীমন্দির ভাঙ্গতে চল্লাম। তারা অনেক লোক সেখানে জমায়েৎ আছে—তাই বেশী লোক নিয়ে যাওয়াই আমাদের দরকার। তোমার তবিয়ৎ মাঁদা—তাই তুমি রইলে, নইলে বাড়ী ত একবারে শূনাটা হয়ে গেল। ও দিকে ঐ যে কামরাটা রয়েছে, ওর ভিতর এক হিন্দু আওরাৎকে চাবি বন্ ক'রে রেখেছি—তোমরা ত দেখেছ। তুমি একটু হুঁসিয়ার থেক, কোন রকমে ও যেন না ভাগে। দুয়ার মজবুদ আছে, ভাঙ্গতে পারবে না। বোধ হয়, কোনও গোলযোগ করবে না—অনেকটা পোষ মেনে এসেছে বলেই মনে হ'ল। তবু বলা যায় না, আওরতের মন ত! যদি দোর ভাঙ্গতে চেষ্টা করে, কি চিল্লাচিল্লি বাধায়, তবে তুমি খুব ধমকাবে—শাসাবে—বলবে, এই হারামজাদি, চুপ রহ্—নইলে এখনি ঘরে ঢুকে তোকে জবাহ্ ক'রে ফেলবো।"

হীরালাল জিজ্ঞাসা করিল, "তালা বন্ধ যে—ঢুকবো কি ক'রে?"

করিম বলিল, "ঢুকতে হবে না—ঐ কথা ব'লে ডর দেখালেই হবে। অনেকটা পোষ মেনেছে ব'লে বোধ হ'ল, চেঁচামেচি বোধ হয় করবে না—তবু, হুঁসিয়ার থাকা ভাল।"

"বহুৎখু"—বলিয়া হীরালাল নিজ রগ টিপিতে টিপিতে বলিতে লাগিল—"ইয়া আল্লা! ইয়া আল্লা!"

আর্ম্মাণী গির্জ্জার ঘড়ীতে ঢং ঢং করিয়া ১২টা বাজিতে আরম্ভ হইল। করিম উঠিয়া বলিল, "আচ্ছা, আবু সাহেব—এখন তবে চল্লাম! তুমি এস, নীচে নেমে সদর বন্ধ ক'রে যাও। একটু সজাগ থেক, আমরা এসে কড়া নাড়লে, নেমে গিয়ে খুলে দিও।"—বলিয়া করিম উঠিল। হীরালাল কাৎরাইতে কাৎরাইতে তাহার অনুসরণ করিল।

করিম ও তাহার দলবল সকলে বাহির হইয়া গেলে, হীরালাল দ্বারে অর্গল বন্ধ করিয়া সেখানে নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। প্রায় দশ মিনিটকাল অপেক্ষা করিল—কেহ আবার ফিরিয়া আসে কি না। কেহ ফিরিল না দেখিয়া সে ধীরে ধীরে উপরে উঠিয়া গেল।

হলের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া, "জয় মা কালী!"—বলিয়া হীরালাল কপালের রুমালটা খুলিয়া বিছানায় ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। তার পর রেবতীর কক্ষদ্বারে গিয়া ধীরে ধীরে করাঘাত করিতে করিতে ডাকিল—"বলি শুন্‌ছেন!"

## অষ্টম পরিচ্ছেদ

### পলায়ন

রেবতী মাথা তুলিয়া চাহিল। কে ডাকে? এ স্বর ত করিম পোড়ারমুখোর বলিয়া মনে হয় না। উত্তর না দিয়া রেবতী একদৃষ্টে বন্ধ দ্বারের পানে চাহিয়া রহিল।

"শুনছেন? এক বার দরজার কাছে আসুন, কথা আছে।"—বলিয়া আবার দুয়ারে ধাক্কা।

রেবতী উঠিয়া বলিল, "কে আপনি?"

উত্তর আসিল—"বল্‌ছি! দরজার কাছে আসুন।"

রেবতী উঠিয়া দরজার নিকট গিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "কি বলছেন? কে আপনি?"

উত্তর আসিল, "আমি শত্রু নই—বন্ধু। আমি আপনাকে উদ্ধার করতে এসেছি। তালাটা ভাঙ্গতে হবে। এ ঘরে অনেক ছোরা-ছুরি টাঙ্গানো আছে। একটা মজবুদ দেখে ছোরা কিংবা ভোজালী, পিছনের জানালার গরাদে গলিয়ে নীচে ফেলে দিন। আমি সেটা কুড়িয়ে এনে, এই তালা ভেঙ্গে, আপনাকে নিয়ে পালাবো—আপনার স্বামীর বাড়ী পৌঁছে দেবো।"

রেবতী সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার নাম কি? আপনাকে কে পাঠিয়েছে? কোথা থেকে আসছেন?"

"আমার নাম শ্রীহীরালাল বসু। আমার বাড়ী বর্দ্ধমান জিলার মাধবপুর গ্রামে। আমি ঘটনাচক্রে এখানে এসে প'ড়ে আপনারই মত বিপন্ন হয়েছি। ঈশ্বরের ইচ্ছায় পালাবার সুযোগ উপস্থিত। আমি একলাই পালাতে পারতাম, কিন্তু আপনার সব কথা আমি জানি—আপনাকেও নিয়ে যেতে চাই। আপনি কুলবধূ, কিন্তু এ বিপদের সময় আপনার লজ্জা পরিত্যাগ করা উচিত।"

রেবতী বলিল, "এরা সব কি বাড়ী নেই?—তালা ভেঙ্গে পালাতে বাধা দেবে না?"

হীরালাল বলিল, "জনপ্রাণী নেই। সবাই কালী-মন্দির ভাঙ্গতে গেছে। সাহসে বুক বাঁধুন। শীগ্‌গির যা বলি, তা করুন। একখানা ছোরা কি ভোজালী নীচে ফেলে দিন।"

রেবতী মহা দুর্ভাবনায় পড়িয়া গেল। সত্যই কি এ ব্যক্তি শত্রু নয়—বন্ধু, তাহাকে উদ্ধারের জন্য আসিয়াছে? অথবা এ সমস্ত ছলনা মাত্র? করিমের অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া অপর কোনও দুর্ব্বৃত্ত কি তাহার উপর অত্যাচার করিবার মতলবে আসিয়াছে?—তাহার ফেলিয়া দেওয়া ছোরায় তালা ভাঙ্গিয়া, তার পর সেই ছোরা দেখাইয়া তাহার উপর যদি অত্যাচার করে?

"কি ভাবছেন ? দেরী করছেন কেন ? লজ্জার খাতিরে সব পণ্ড করবেন ? তবে এখানে থাকাই যদি আপনার অভিপ্রায় হয়, তা-ও বলুন, আমি গরীব স'রে পড়ি।"

রেবতী বলিল, "আচ্ছা, আমি ছোরা ফেলছি। আপনি নীচে যান।"

রেবতী একখানা মজবুত দেখিয়া ভোজালী পাড়িয়া লইয়া পশ্চাতের জানালার নিকটে দাঁড়াইয়া দেখিল, কিছু দূরে একটা মনুষ্যমূর্ত্তি আসিতেছে। সে ব্যক্তি হিন্দু কি মুসলমান, সেই অল্পালোকে কিছুই নির্ণয় করিতে পারিল না। মনুষ্যমূর্ত্তি কাছাকাছি আসিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "ফেলে দিন।"—রেবতী ভোজালীখানা ফেলিয়া দিল। মনুষ্যমূর্ত্তি আসিয়া সেখানা কুড়াইয়া লইয়া প্রস্থান করিল।

রেবতী দুরু-দুরু বক্ষে আবার দ্বারের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। অল্পক্ষণ পরেই পদ-শব্দ শুনিতে পাইল। পদশব্দ তাহার দ্বারের কাছে আসিয়া থামিলে আগন্তুক বলিল, "আমি ততক্ষণ তালা ভাঙ্গি আপনি ততক্ষণ আপনার জিনিষপত্রের মধ্যে বিশেষ ক'রে যা নেবার—বেছে নিন। যা সহজে হাতে নেওয়া যেতে পারে—তাই নিন, ভারি কিছু নেবেন না।"

"আচ্ছা, আপনি তালা ভাঙ্গুন।"—বলিয়া রেবতী তাড়াতাড়ি তাহার ও সতীশের বাক্স খুলিল। অর্থ ও অলঙ্কার ত পূর্ব্বেই অপহৃত হইয়াছিল। বস্ত্রাদির জন্য রেবতী মাথা ঘামাইল না। কেবল চিঠি ও কাগজপত্র যাহা ছিল, সমস্ত বাহির করিয়া লইল, যাহাতে পরে এই দুর্ব্বৃত্তগণ তাহাদের নাম-ধাম প্রভৃতির কোনও সংবাদ না পায়।

দরজায় অস্ত্রাঘাতের শব্দ আরম্ভ হইল। কিছুক্ষণ মড় মড় শব্দ—শেষে মড় মড় মড়াৎ—তালা ভাঙ্গিয়া গেল। রেবতী তখন খিলটি খুলিয়া দিল।

পরক্ষণেই ভোজালী-হস্তে হীরালাল প্রবেশ করিল। তাহার মূর্ত্তি দেখিয়া ভীত হইয়া রেবতী পিছু হটিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "এই যে বল্লেন, আপনি হিন্দু ?"

হীরালাল হাসিয়া বলিল, "আমার এ বেশ দেখে ভয় পাবেন না। এটা আমি সেজেছি মাত্র—মুসলমান নই—আমি সত্যিই হিন্দু। আগে চলুন এ বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়া যাক্—আর এক মুহূর্ত্ত দেরী নয়। পুলিসের তাড়া খেয়ে হয় ত তারা এখনই ফিরে আসতে পারে।"—বলিয়া ভোজালীখানা মেঝের উপর ফেলিয়া হীরালাল বাহির হইল।

রেবতীও কম্পিতপদে দুরু-দুরু বক্ষে তাহার অনুসরণ করিল। বাটীর বাহির হইয়া উভয়ে গলি-পথে চলিল। কোনও লোককে দেখিতে পাইল না—এ পাড়ার অধিবাসী অধিকাংশ মুসলমানই মন্দির ভাঙ্গিতে গিয়াছে।

নীরবে চলিয়া উভয়ে হ্যারিসন রোডে আসিয়া পড়িল। হীরালাল চুপি চুপি বলিল, "আপনার বাড়ী কোথা বলুন দেখি ? ট্যাক্সি কিংবা গাড়ী ত একখানিও দেখছি নে। আর পেলেও উঠতে সাহস হয় না—হেঁটে যাওয়াই বোধ হয় নিরাপদ।"

রেবতী বলিল, "আমার বাড়ী জয় মিত্তিরের গলি !"

"সে কোথা ?"

"চিৎপুর রোডে। আহিরীটোলা ছাড়িয়ে—প্রায় শোভাবাজারের কাছাকাছি।"

"ওঃ—সে ত অনেক দূর। অত দূর কি হেঁটে যেতে পারবেন আপনি ?"

"উপায় কি ?"

"এখানে কাছাকাছি আপনাদের কোনও আত্মীয়-বন্ধুর বাড়ী নেই ? - তা হ'লে সেখানে রাতটুকু কাটিয়ে—"

রেবতী বলিল, "না, কাছাকাছি তেমন কারু বাড়ী নেই।"

"তবে চলুন, নতুন রাস্তা ধ'রে যাই—বিডন ষ্ট্রীট দিয়ে চিৎপুর রোডে যাব।"

"চলুন।"

উভয়ে পদব্রজে নূতন রাস্তা দিয়া চলিল। এ রাস্তাটিও এ সময় জনশূন্য। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে গোরা সৈন্য বোঝাই একখানা মোটর লরী পশ্চাৎ দিক্ হইতে আসিয়া ইহাদিগকে অতিক্রম করিয়া গেল। তাহা দেখিয়া ইহারা একটু সাহস পাইল, এতক্ষণে মুখে কথা ফুটিল।

হীরালাল বলিল, "একটা কথা বলি। আপনাদের বাড়ীতে আজ রাতটুকুর জন্যে দয়া ক'রে আমায় আশ্রয় দিতে হবে।"

রেবতী বলিল, "তা বেশ ত ! আপনি আমার এত উপকার করলেন,—এ ঋণ কি আমি জীবনে শোধ করতে পারব ? রাতটুকু কেন—আপনার যত দিন ইচ্ছা আমার ওখানে থাকবেন।"

হীরালাল বলিল, "অতটা উপদ্রব আপনাদের উপর করবো না। কা'ল একটা বাসাটাসা ঠিক ক'রে নেবো।"

এই সময় রেবতীর প্রশ্নে হীরালাল নিজ ক'লকাতায় আগমনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসটুকুও বিবৃত করিল।

আর কিছু পথ চলিয়া হীরালাল বলিল, "আচ্ছা, আপনার স্বামীর যে টাকা নিয়ে আসবার কথা ছিল, তিনি এলেন না কেন ? বোধ হয়, টাকার যোগাড় করতে পারেন নি।"

রেবতী বলিল, "তাও হ'তে পারে। কিংবা হয় ত ভেবেছেন, সারারাত সারাদিন আমি মুসলমান গুণ্ডার আড্ডায় ছিলাম, আমি কি আর ঘরে নেবার মত আছি !"

হীরালাল বলিল, "কি সর্ব্বনাশ ! না না—তা কি তিনি মনে করতে পারেন ?"

রেবতী বলিল, "সীতা দশ মাস রাবণের বাগানে ছিলেন

ব'লে রাম যদি তাঁকে পরিত্যাগ করতে পেরে থাকেন, তবে আমার স্বামী ও রকম মনে করতে পারবেন না কেন ?"

হীরালাল বলিল, "কিন্তু আমি সাক্ষী আছি—আমি আপনার স্বামীকে গিয়ে সমস্ত ঘটনা বলবো।"

"আপনার কথা যদি তিনি না বিশ্বাস করেন ? তার পর দেখুন, আপনি এক জন যুবাপুরুষ, আমি এক জন যুবতী—এই গভীর নিশীথে -মনোরমা আর হেমচন্দ্রের মত দু'জনে একত্র ভ্রমণ, এটাও লোকে দোষের চোখে দেখতে পারে ত !"—বলিয়া রেবতী মুখ টিপিয়া হাসিল। কিন্তু হীরালাল সেটা দেখিতে পাইল না। ভাবিল, 'এ স্ত্রীলোক বেশ লেখা-পড়া জানে দেখছি। সাধুভাষায় কথা কয়. বঙ্কিম কোট করে।' তবে ইহাও তাহার মনে হইল, কথাবার্ত্তাগুলো কি রকম ? এ ত লজ্জাশীলা হিন্দু-কুলবধূর মত নয় ! ব্যাপার কি ?

কিছুক্ষণ নীরবে পথ চলিবার পর রেবতী জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা হীরালাল বাবু, আপনার বিয়ে হয়েছে ?"

"হয়েছে। কেন ?"

"আপনার স্ত্রী কত বড় ?"

"এই—১৫।১৬ বছরের।"

"ছেলে হয়েছে ?"

"একটি মেয়ে।"

"কোথায় তারা ?"

"আমার বাড়ীতে, মাধবপুরে।"

"আচ্ছা, আমার যেমন অবস্থা হয়েছে—আপনার স্ত্রীর যদি সেই রকম অবস্থা হ'ত,—এক রাত্রি এক দিন গুণ্ডার আড্ডায় কাটিয়ে তার পর অপরিচিত এক জন সুশ্রী যুবকের সঙ্গে রাত দুটোর সময় যদি সে বাড়ী এসে পৌছত, আপনি কি বিনা দ্বিধায় তাকে ঘরে নিতেন ?"

তাহার সঙ্গিনী যে প্রকারান্তরে তাহাকে "সুশ্রী" বলিয়া সার্টিফিকেট দিল, ইহা হীরালাল লক্ষ্য করিল। উত্তরে বলিল, "তা নিতাম বৈ কি !"

রেবতী একটি কৃত্রিম দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "পৃথিবীর সবাই যদি আপনার মত ভাল হ'ত হীরালাল বাবু, তা হ'লে আর ভাবনা ছিল কি বলুন। দেখি, আমাদের তিনি কি বলেন। যদি ধরুন, তিনি আমায় বাড়ী থেকে হাঁকিয়েই দেন, তা হ'লে কি উপায় হবে ? আমি আপনার ঘাড়ে প'ড়ে গেলে আপনি আমায় নিয়ে কি করবেন বলুন দেখি ?"

হীরালাল বলিল, "ছি ছি, ও সব অমঙ্গলের কথা কেন ভাবছেন আপনি ?"

রেবতী বলিল, "বিপদের ছায়া দেখতে পেলেই, বিপদের জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাকা ভাল নয় ? বিপদ যদি না আসে, অমনি অমনি যদি কেটে যায়—ভালই ! নইলে ?"

"বাড়ীতে আপনার কে কে আছেন ? আপনার সন্তানাদি—"

রেবতী সংক্ষেপে উত্তর দিল, "হয় নি।"

"আপনার শ্বশুর-শাশুড়ী ?"

"মারা গেছেন।"

"ভাসুর, দেওর—অপর কোনও আত্মীয়-স্বজন ?"

"কেউ নেই।"

"তা হ'লে বাড়ীতে শুধু আপনি আর আপনার স্বামী ?"

"শুধুই আমি।"

"সে কি রকম ?"

"আমার স্বামী দিনের বেলা থাকেন আপিসে, আর রাত্রে থাকেন কোন্ চুলোয়, তা জানিনে।"—বলিয়া আবার রেবতী মুখ টিপিয়া হাসিল।

হীরালাল বুঝিল, এই নারী বড় দুর্ভাগিনী, ইহার স্বামী একটি নরপশু। স্বামী যে ইহাকে উদ্ধার করিতে আসিল না কেন, তাহার কারণও অনুমান করিল। বলিল, "তা হ'লে আমরা যখন গিয়ে পৌছব, আপনার স্বামীকে তখন বাড়ীতে পাব না ?"

রেবতী বলিল, "সম্ভাবনা কম।"

ইহা শুনিয়া হীরালাল মনে মনে বিপদ গণিল। আজ বাকী রাতটুকু ইহাদের আশ্রয়ে কাটাইয়া দিবে ভাবিয়াছিল, কিন্তু এ অবস্থায় ত আর তাহা চলে না। বলিল, "ওঃ, তা জানতাম না। আচ্ছা, আমি তা হ'লে আপনাকে বাড়ী পৌছে দিয়ে চ'লে যাব এখন।"

"কেন, এই যে বল্লেন, আমাদের বাড়ীতে রাতটুকু থাকবেন। কা'ল সকালে উঠে, চা-টা খেয়ে তখন যাবেন।"

হীরালাল বলিল, "তা আর সুবিধে হ'ল কৈ !"

"না না, কিছু অসুবিধে হবে না—চলুন। বিশেষ, আপনি নিজ মুখে স্বীকার করেছেন, আমার স্বামীর কাছে

আমার নিষ্কলঙ্কতার বিষয়ে সাক্ষ্য দেবেন। অসহায় অবলাকে বিপদের মধ্যে নিক্ষেপ ক'রে এখন পালাতে চাচ্ছেন কেন? এ আপনার ভারি অন্যায় কিন্তু হীরালাল বাবু।"

হীরালালের মনের সংশয় আরও বৃদ্ধি পাইল। এরূপ ভাবের কথাবার্ত্তা—এক প্রকার বাচালতা বলিলেই হয়—এ কি সত্যই গৃহস্থ ঘরের কুলবধূ, না কোনও ভ্রষ্টা রমণী? গৃহস্থ ঘরের বধূ কন্যা এক জন অপরিচিত পুরুষের সহিত এরূপ ভাবে কথাবার্ত্তা কহিবে, ইহা কি সম্ভব? তবে বলা যায় না—কলিকাতা সহর—আজকাল কলিকাতায় এইরূপই ফ্যাসন হইয়া দাঁড়াইয়াছে বোধ হয়!

রাস্তার দুই ধারে থিয়েটারের প্ল্যাকার্ড—দুই মাস বিদায়ের পর অদ্য রজনীতে সেই অপূর্ব্ব প্রতিভাশালিনী অভিনেত্রী রেবতীসুন্দরী মর্জ্জিয়ানার ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া কি কাণ্ড বাধাইবেন, তাহা উচ্ছ্বসিত ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। এই প্ল্যাকার্ড রেবতী ও হীরালাল উভয়েই দেখিতে দেখিতে আসিতেছিল। হীরালাল এই সময় সহসা বলিয়া উঠিল, "অদৃষ্ট দেখুন! এই সব বিপদ না হ'লে আজ রাত্রে আমি নিশ্চয়ই রেবতীর মর্জ্জিয়ানা দেখতে যেতাম। শুনেছি, তার অভিনয়, নাচ-গান একেবারে চমৎকার।"

রেবতী বলিল, "দেখেন নি কখনও?"

"না, সে সৌভাগ্য আমার হয় নি। আপনি কলকাতায় থাকেন, আপনি দেখেছেন নিশ্চয়? তার চেহারাও না কি খুব সুন্দর?"

"হ্যাঁ, দেখেছি। সুন্দর না ছাই! রঙ-টঙ মেখে রেবতী অমন পরীটি সাজে। কিন্তু আসলে বোধ হয় একটি কালপেঁচী!"

হীরালাল বলিল, "না, আমি শুনেছি, রেবতী নাচতে গাইতেও যেমন, চেহারাটিও তেমনই সুন্দর। এবার যে দিন হবে, আমি নিশ্চয়ই দেখতে যাব।"

এ সময় তাহারা মাণিকতলা ষ্ট্রীটের মোড়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। রেবতী বলিল, "ঐ দেখুন, ঐ বীডন ষ্ট্রীটে সামনে মনোমোহন থিয়েটার। এবার বাঁ-দিকে খানিকটা গেলেই চিৎপুর রোড।"

মিনিট ১৫।২০ পরেই উহারা জয় মিত্রের গলিতে পৌঁছিল। খানিক দূর গিয়া বামদিকের একটা বাড়ীর সামনে দাঁড়াইয়া, রেবতী দরজার কড়া নাড়িল। ভিতর হইতে মোটা গলায় প্রশ্ন আসিল, "কৌন হায়?"

রেবতী বলিল, "হরি সিং, দরোয়াজা খোলো।"

খট্ করিয়া শব্দ হইল—প্রবেশপথে বিদ্যুৎ-বাতি জ্বলিয়া উঠিল। দ্বারবান্ দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিল। সেলাম করিয়া মহা বিস্ময়ে বলিল, "মা-জী—পাঁয়দল আয়া?"

রেবতী বলিল, "হ্যাঁ হরি সিং—বড়ই বিপদে পড়েছিলাম। বাড়ীর সব ঠিক আছে ত?"

"হাঁ মাইজী, সব ঠিক হায়।"

"ঝি দুটো কোথা?"

"উপর মে শুতা হায়।"

"আচ্ছা, এ দরজা বন্ধ ক'রে উপরে গিয়ে আমার কামরা খোল। ঝিদের উঠিয়ে আমার ঘরে পাঠিয়ে দেবে। আসুন হীরালাল বাবু।"

দ্বারবান্ ক্ষিপ্রহস্তে দ্বার অর্গলিত করিয়া, দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেল। হীরালাল বলিল, "আমি তা হ'লে এখন যাই—নমস্কার।"

"এত রাত্রে কোথায় যাবেন আপনি? এই ডামাডোলের বাজার। কোথায় এখন আশ্রয় খুঁজে বেড়াবেন?"

হীরালাল বলিল, "কিন্তু—"

রেবতী হাসিয়া বলিল, "কিন্তু—আমি আপনাকে যেতে নাহি দিব। আপনার কোনও সঙ্কোচেরই কারণ নেই হীরালাল বাবু! আমি পতিবিরহখিন্না কুলবধূ নই। কেন না, আমি থিয়েটারের নটী—রাস্তায় আসতে আসতে বড় বড় প্ল্যাকার্ডে যার নাম দেখলেন—আমি সেই রেবতী।"

হীরালাল বিস্ময়ে আত্মহারা হইয়া বলিল—"আপনি! আপনিই রেবতীসুন্দরী?"

রেবতী হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ, আমিই সেই পোড়ারমুখী! সুন্দরী কি না, সেটা আপনি বিচার করবেন—তবে মুখে আমার রঙমাখা নেই, এ আমি হলফ ক'রে বলছি! এখন আসুন দেখি লক্ষ্মীছেলেটির মত!" বলিয়া রেবতী অগ্রসর হইল।

হীরালাল মন্ত্রমুগ্ধবৎ রেবতীর অনুকরণ করিল।

[ ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

সম্পাদক—শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু
কলিকাতা, ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' 'বৈদ্যুতিক-রোটারী-মেসিনে' শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

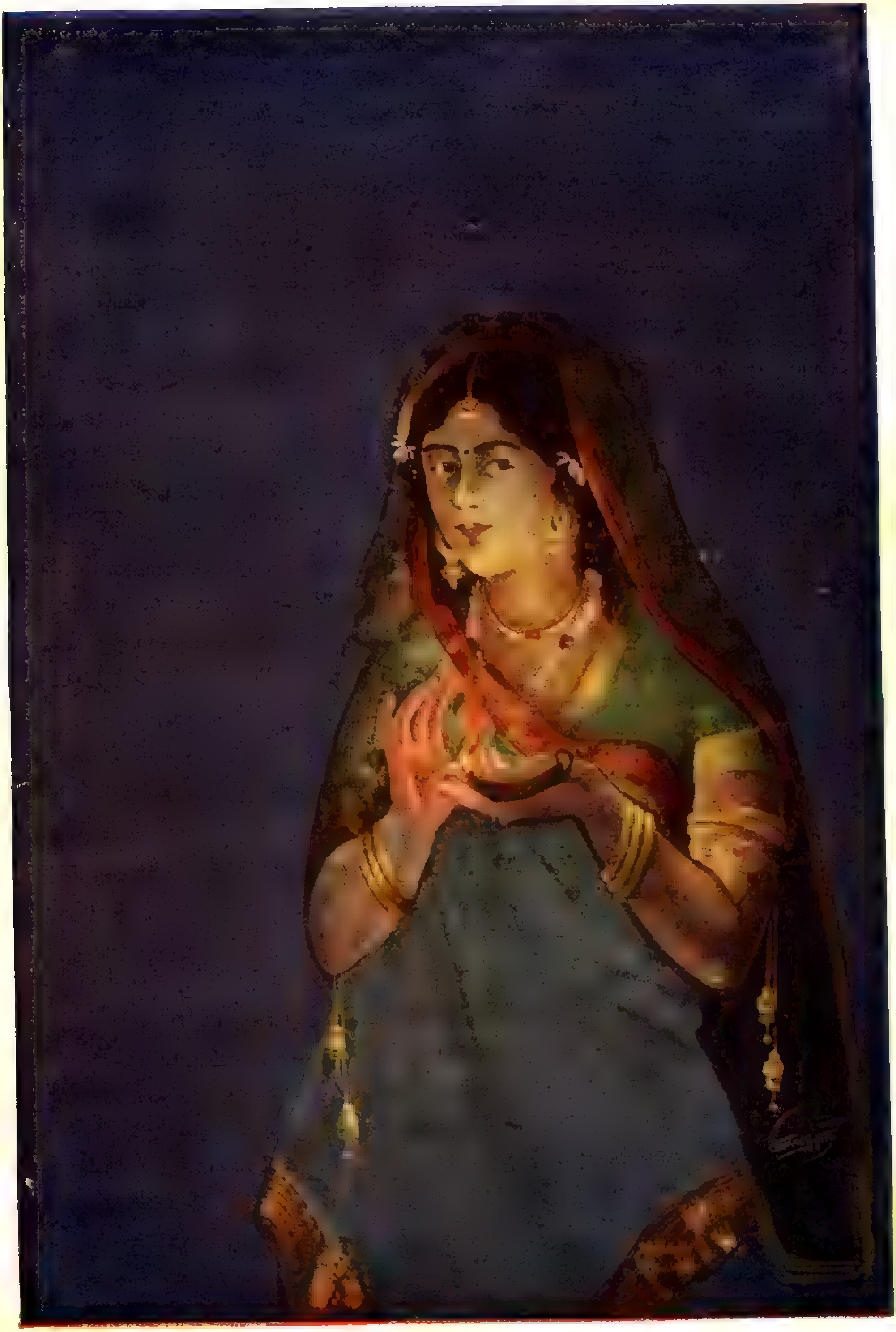

"নগরীর  নটি চলে অভিসারে
যৌবন-মদে মত্তা—"

৫ম বর্ষ ] ভাদ্র, ১৩৩৩ [ ৫ম সংখ্যা

# সাহিত্যে শ্রীরাধা

বাঙ্গালার বৈষ্ণব-সাহিত্যে শ্রীমতী রাধিকার যে রসভাবময়ী সমুজ্জ্বল মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার মুখ্য উপকরণ কোথা হইতে কি ভাবে আসিয়াছে, এ প্রবন্ধে তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্যে রাধার স্থান অতি উচ্চে। এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, বাঙ্গালার রসভাব-সমুজ্জ্বল বৈষ্ণবদর্শনের বা শ্রীগৌরাঙ্গদেব-প্রবর্ত্তিত অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদের মূল ভিত্তি শ্রীরাধা। পুরাণ এই ভিত্তির শিলান্যাস করিয়াছে, তন্ত্র ইহার সংগঠন করিয়াছে, সংস্কৃত ভাষার অমর কবিগণ ইহাকে সুধা-লিপ্ত করিয়াছেন, আর সর্ব্বশেষে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ প্রেমময় তুলিকায় রসের বিচিত্র বর্ণরাজিতে ইহাকে সুচিত্রিত করিয়া, জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন। একাধারে ভারতীয় সকল দর্শনের সারতত্ত্ব ও ভারতীয় রস-শাস্ত্রের নিগূঢ় রহস্য যদি কেহ দেখিয়া নির্বৃতি লাভ করিতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে সর্ব্বপ্রধান আলোচ্য বিষয় হইতেছে—গৌড়ীয় কবি ও ভক্ত দার্শনিক-গণের কল্পনাময় ভাব-তুলিকায় সুচিত্রিত এই রাধাতত্ত্ব।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সর্ব্ব-প্রধান উপজীব্য শ্রীমদ্ভাগবতে ব্যক্তভাবে শ্রীরাধিকার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্রীকৃষ্ণলীলা-প্রধান বিষ্ণুপুরাণে রাধিকার কোন উদ্দেশই নাই, হরিবংশে বা মহাভারতের কোথায়ও রাধার নামগন্ধ নাই, পদ্মপুরাণের মধ্যে প্রচুরভাবে শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণিত হইলেও শ্রীরাধিকার অস্তিত্বের প্রমাণ নিতান্তই অল্প। * ব্রহ্ম-বৈবর্ত্তপুরাণে এই রাধাতত্ত্ব বিশদভাবে কতকটা প্রস্ফুটিত হইলেও, উহার প্রামাণিকতা বিষয়ে অনেকেই সন্দেহ করিয়া থাকেন, কেবল বৃহদ্‌গোতমীয় তন্ত্রে শ্রীরাধিকার তত্ত্ব অতি বিস্পষ্টভাবে অথচ সূত্ররূপে মাত্র বর্ণিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

> “দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
> সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা॥”

---

* চৈতন্যচরিতামৃতে—পদ্মপুরাণের বলিয়া এই শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে, যথা—

> “যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
> সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা॥”

বৃহদ্গৌতমীয় তন্ত্রের এই মূল বচনটিকে অবলম্বন করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ যে ভাবে শ্রীরাধিকার তত্ত্ব বিশদীকৃত ও বিস্তারিত করিয়াছেন, তাহা পরে যথাস্থানে প্রতিপাদিত হইবে। পুরাণে, তন্ত্রে ও শ্রীচৈতন্যদেবের পরবর্ত্তী গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে শ্রীরাধাকে শ্রীভগবানের পরাশক্তিরূপে যে বর্ণনা করা হইয়াছে, সে বিষয়ের বিশদ আলোচনা করিবার পূর্ব্বে সংস্কৃত সাহিত্যে শ্রীরাধাকে আমরা কি ভাবে দেখিতে পাই এবং কোন্ সময় হইতে লৌকিক সংস্কৃত সাহিত্যে শ্রীরাধার মূর্ত্তি চিত্রিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহারই আলোচনা আপাততঃ করা যাইতেছে।

পুরাণ প্রভৃতি ধর্ম্ম-সাহিত্যের কথা ছাড়িয়া দিলে—শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্কৃত কাব্য ও নাটকে শ্রীরাধার নাম কত দিন হইতে পাওয়া যায়, তাহা নিঃসন্দিগ্ধভাবে নির্ণয় করা কঠিন। কারণ, এখনও সংস্কৃত-সাহিত্যের অন্তর্গত বহু পুস্তকের নাম মাত্রই আমরা জানিতে পারিলেও ঐ সকল পুস্তক আমাদের এখনও দৃষ্টিগোচর হয় নাই ; কিন্তু যে সকল প্রামাণিক সাহিত্য গ্রন্থ আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অনুসন্ধান করিলে বেশ বুঝা যায় যে, খ্রীষ্টজন্মের পরবর্ত্তী নবম শতাব্দী হইতেই সংস্কৃত-সাহিত্যে শ্রীরাধার নাম ও সংক্ষিপ্ত চরিত্র দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার পূর্ব্বে সংস্কৃত-সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণাবতার-লীলাবর্ণন প্রসঙ্গে শ্রীরাধার প্রসঙ্গ বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। নবম শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবযুগের আরম্ভাবধি এই দীর্ঘকালের মধ্যে যে সকল সংস্কৃত কবি অল্প বা বিস্তরভাবে স্বকৃত সাহিত্যে শ্রীরাধার বর্ণন করিয়াছেন, তাঁহারা কিন্তু কেহই রাধাকে শ্রীকৃষ্ণের পরাশক্তি বা হ্লাদিনীর সার প্রেমভক্তির পূর্ণ আদর্শ বলিয়া বর্ণন করেন নাই ; প্রত্যুত সকলেই তাঁহাকে কৃষ্ণপ্রেমার্থিনী সমাজভয়বিহ্বলা পরকীয়া গোপরমণীরূপেই বর্ণনা করিয়াছেন। কয়েকটি উদাহরণ দেখিলেই ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষভাগে প্রসিদ্ধ অলঙ্কারাচার্য্য আনন্দবর্দ্ধন জীবিত ছিলেন, তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ ধ্বন্যালোকনামক অলঙ্কার-গ্রন্থে আমরা তাঁহার উদ্ধৃত দুইটি শ্লোকে শ্রীরাধার উল্লেখ দেখিতে পাই। যথা—

> "দুরারাধা রাধা সুভগ যদনেনাপি মৃজতঃ
> তবৈতৎ প্রাণেশাজঘনবসনেনাশ্রু পতিতম্।
> কঠোরং স্ত্রীচেতস্তদলমুপচারৈর্বিরম হে
> ক্রিয়াৎ কল্যাণং বো হরিরনুনয়েষ্বেবমুদিতঃ।"

এই শ্লোকটির রচনা-প্রণালী দেখিলে বোধ হয়, ইহা কোন নাটকের অথবা কাব্যের মঙ্গলাচরণ-শ্লোক। কোন্ গ্রন্থ হইতে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা আনন্দবর্দ্ধন বলেন নাই অথচ ইহা আনন্দবর্দ্ধনের স্বরচিত শ্লোক নহে, তাহাও ঠিক। কারণ, ধ্বন্যালোক গ্রন্থে তাঁহার নিজ কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করিবার পূর্ব্বে সর্ব্বত্রই তিনি "যথা মম" এই প্রকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করিতে যাইয়া তিনি কেবল 'যথা চ' এইরূপই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই শ্লোকটির তাৎপর্য্য এইরূপ—

"রাধার আরাধনা যে বড়ই দুঃখের, তাহা সত্য, কারণ, হে সুভগ! তোমার যে বড়ই প্রিয়তমা—তাহার পরিহিত বস্ত্রেরই অঞ্চল দিয়া তুমি আমার এই নয়নের পতিত অশ্রুধারা মুছাইতেছ, ( আর বলিতেছ ) স্ত্রীলোকের হৃদয় বড়ই কঠোর, থাক, আর প্রিয় বচন বা নব নব সেবার উপচার-দ্রব্যের আবশ্যক নাই, তুমি বিরত হও। বহু বার অনুনয়-কালে শ্রীরাধা যাঁহাকে এইরূপ বলিয়াছিলেন, সেই হরি তোমাদিগের মঙ্গলবিধান করুন।"

এই শ্লোকে অভিমানিনী শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের অবিনয় দর্শনে রোদন করিতেছেন, তাঁহার দুই চক্ষু হইতে ধারা বহিয়া অশ্রু পতিত হইতেছে আর শ্রীকৃষ্ণ নিজের পরিহিত বসনের অঞ্চল দিয়া সেই অশ্রু মুছাইতেছেন, দৈব-দুর্বিপাকে তাঁহার পরিহিত বস্ত্রখানি নিজের নহে, কিন্তু উহা যে সৌভাগ্যবতী গোপললনার কুঞ্জে তিনি রাত্রি-যাপন করিয়াছিলেন, তাহারই বসন, প্রাণপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের অবিশ্বস্ততার এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়া শ্রীরাধা দলিতা ফণিনীর ন্যায় মর্ম্মন্তুদ মন্যুর আবেশে প্রিয়তমের সেবার প্রতি নিতান্ত বিমুখ হইয়া কেবল কাঁদিতেছেন। ইহাই হইল এই শ্লোকে কৃষ্ণপ্রাণা রাধিকার চিত্র। আলঙ্কারিকগণ এই প্রকার প্রিয়তমের অবিনয়ে বিক্ষুব্ধহৃদয়া প্রেমবতী রমণীকে খণ্ডিতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যথা,—

> "পার্শ্বমেতি প্রিয়ো যস্যা অন্যসম্ভোগচিহ্নিতঃ।
> সা খণ্ডিতেতি কথিতা ধীরৈরীর্ষ্যাকষায়িতা॥"

( সাহিত্যদর্পণ তৃতীয় পরিচ্ছেদ )

অন্য কোন বনিতার সহিত সমাগম যাহা দ্বারা সূচিত হইয়া থাকে, এইরূপ কোন চিহ্নযুক্ত প্রিয়তম যাহার পার্শ্বে উপস্থিত হয়, সেই ঈর্ষ্যা-কষায়িতা রমণীকে পণ্ডিতগণ 'খণ্ডিতা' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

ধ্বন্যালোকে শ্রীরাধা সম্বন্ধে উদ্ধৃত দ্বিতীয় শ্লোকটি এই,—

"তেষাং গোপবধূ-বিলাসসুহৃদাং রাধারহঃসাক্ষিণাং
ক্ষেমং ভদ্র কলিন্দশৈলতনয়া-তীরে লতাবেশ্মনাম্।
বিচ্ছিন্নে স্মরতল্পকল্পন-মৃদুচ্ছেদপ্রসঙ্গেঽধুনা
জানে তে জরঠীভবন্তি বিগলন্নীলত্বিষঃ পল্লবাঃ॥"

মথুরায় অথবা দ্বারকায় যখন শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমান ছিলেন, সেই সময় বৃন্দাবন হইতে সমাগত ( খুব সম্ভব উদ্ধব ) ব্যক্তি-বিশেষকে সম্বোধন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

হে ভদ্র! যমুনার তীরে সেই লতাগৃহ-সমূহের মঙ্গল ত? যে লতাগৃহ-সমূহ গোপবধূগণের নানাপ্রকার বিলাসের সুহৃদ্ এবং যাহারা শ্রীরাধার ( হরিবিরহব্যাকুলতাময় ) একান্ত স্থিতির সাক্ষী, ( অথবা তাহাদের মঙ্গলের সম্ভাবনা কোথায়? ) এখন সেই লতাগৃহ-সমূহে ( রাধাকৃষ্ণের ) মিলনের জন্য কোমল শয্যা রচনার্থ আর কোমল কিশলয়-সমূহের ছেদের আবশ্যকতা নাই, তাই আমার মনে হয়, ঐ সকল লতা-গৃহের পল্লব-সমূহ পাকিয়া কঠোর ভাব ধারণ করিতেছে, তাহাদের সেই ( নয়নমনোহর ) নীল প্রভা নিশ্চয়ই আর দেখিতে পাওয়া যায় না।

এই শ্লোকটিতে বড়ই গূঢ়ভাবে বড়ই সংক্ষেপে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার প্রধান সহচরী শ্রীরাধার তত্ত্ব কেমন সুন্দর-রূপে ফুটিয়া উঠিতেছে! শ্রীরাধার প্রিয় সহচরী গোপবধূগণ সকল গৃহকৃত্যের উপেক্ষা করিয়া, সর্ব্বদা যমুনা-তীরের লতাকুঞ্জ-সমূহে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের সেবার জন্য নব নব বিলাস-রচনায় সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত আর সেই বিলাস-রচনা-পরিশোভিত কুঞ্জমণ্ডপের কোন এক নিভৃত স্থানে শ্রীকৃষ্ণ-সমাগমার্থিনী শ্রীরাধা একাকিনী প্রতি পল্লবকম্পজনিত শব্দে প্রিয়তমের আগমন-সূচক পদশব্দের সম্ভাবনায় কম্পিত-হৃদয়া হইয়া কত রাত্রি অপেক্ষা করিতেছেন—সেই সময়ে তাঁহার প্রেমপ্রবণ হৃদয়-সমুদ্রের প্রতিক্ষণ আশা ও নৈরাশ্যের, আনন্দের ও বিষাদের উত্তালতরঙ্গমালার মধুর ঘাত-প্রতিঘাতের অপূর্ব্ব চিত্রগুলি যেন জীবন্ত চিত্রের আবেগময় ছায়াসমূহ প্রতি পুষ্পগুচ্ছে, প্রতি পল্লবসম্ভারে স্বপ্নময় নৃত্য করিতেছে। এই সকল সুখের স্মৃতি রাজকার্য্যে ব্যাপৃত নূতন রাজা শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময় হৃদয়-সমুদ্রের ভাব-তরঙ্গাবলীকে উদ্বেল করিয়া তুলিতেছে; মিলনের সুখময় স্মৃতি ও বিরহের বিষাদময় বিবর্ত্ত এই পরস্পর প্রতিকূল ভাব-সমাবেশের এত স্পষ্ট অথচ এত সংক্ষিপ্ত মর্ম্মস্পর্শী চিত্র সংস্কৃত সাহিত্যের আর কোথায়ও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

ইহার পর খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষে মহাকবি ক্ষেমেন্দ্রের 'দশাবতার-চরিতে' শ্রীকৃষ্ণলীলার মধ্যে শ্রীরাধার স্বরূপ যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও বলি—

"ন স সখি যমুনায়াস্তীরবানীরকুঞ্জে
গহনভুবি ভবত্যা মৎপ্রিয়ঃ ক্বাপি দৃষ্টঃ।
সুমুখি ফলমিয়ত্তু স্নেহমোহাৎ ত্বয়াপ্তং
যদুরসি লিখিতেয়ং কণ্টকোল্লেখরেখা॥ ১
ইত্যভূন্মদনোদ্দাম-যৌবনে কালিয়দ্বিষঃ।
গোপাঙ্গনানাং সংরম্ভগর্ভোপালম্ভবিভ্রমঃ॥ ২
প্রীত্যৈ বভূব কৃষ্ণস্য শ্যামানিচয়চুম্বিনঃ।
জাতী মধুকরস্যেব রাধৈবাধিকবল্লভা॥" ৩

শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণার্থ কোন সহচরীকে যমুনাতীরে গহনবনে প্রেরণ করিয়া শ্রীমতী সঙ্কেতকুঞ্জে অপেক্ষা করিতেছিলেন। কিয়ৎকাল পরে সহচরী ফিরিয়া আসিলে শ্রীরাধা তাহাকে শ্রীকৃষ্ণের কোন সন্ধান পাওয়া গেল কি না জিজ্ঞাসা করায় সহচরী উত্তর দিতেছেন—

"সখি! যমুনার তীরে গহনকাননের মধ্যে সেই বেতস-লতা-কুঞ্জে কোথায়ও তোমার প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাওয়া গেল না।" এই কথা শুনিয়া পরিহাসের ছলে সহচরীর প্রীতি-প্রফুল্ল মুখের দিকে চাহিয়া শ্রীরাধা বলিতেছেন যে, "ও সুমুখি! ( তাহার দেখা ত পাইলেই না ) কিন্তু আমার প্রতি ভালবাসার মোহে পড়িয়া তুমি কি ফল পাইয়াছ! আহা, গহনকাননের মধ্যে তাহাকে খুঁজিতে যাইয়া তোমার বুকের উপর এই যে কঠোর কণ্টকের ক্ষতরেখা অঙ্কিত হইয়াছে!" ১

"কালিয়দমনকারী শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকার মদনোন্মাদ-দুর্দ্দম যৌবনারম্ভকালে গোপাঙ্গনা-সমূহের তৎসংক্রান্ত

হর্ষমিশ্রিত তিরস্কারবাক্যসমূহ এই ভাবে প্রায়ই শ্রুত হইত।” ২

“যদিও শ্রীকৃষ্ণ বহু গোপবধূর প্রতি আসক্ত ছিলেন, তথাপি কিন্তু ভ্রমরের প্রীতি যেমন জাতী কুসুমের প্রতি অধিকই হইয়া থাকে, সেইরূপ শ্রীরাধাই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তমা ছিলেন।” ৩

মহাকবি ক্ষেমেন্দ্র যে কৃষ্ণলীলার বর্ণন করিয়াছেন, তাহা যে কোন পুরাণ বা সাহিত্য গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার নির্ণয় করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। কারণ, হরিবংশ, মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ বা শ্রীমদ্‌ভাগবতে আমরা যে ভাবে কৃষ্ণচরিত বর্ণিত হইয়াছে দেখিতে পাই, ক্ষেমেন্দ্র-রচিত কৃষ্ণচরিতের সহিত তাহার বহুস্থানে বৈপরীত্যই দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ, ক্ষেমেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমনের পূর্ব্বেই তাঁহাকে প্ররূঢ়যৌবন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু উল্লিখিত গ্রন্থসমূহে আমরা দেখিতে পাই,—যৌবনারম্ভের পূর্ব্বে অর্থাৎ কিশোরাবস্থাতেই শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ভাগবত প্রভৃতিতে দেখা যায়, নন্দ প্রভৃতি গোপবৃন্দগণ গোকুলে নানাপ্রকার উৎপাত হইতেছে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের শৈশবাবস্থায় গোকুল পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৃন্দাবনে ব্রজে চলিয়া আসিয়াছিলেন। এই বৃন্দাবনস্থিত ব্রজেই অক্রূরের আগমন হইয়াছিল এবং তিনি এইখান হইতেই শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া গিয়াছিলেন। ক্ষেমেন্দ্র-কৃত কৃষ্ণাবতার গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অক্রূর গোকুল হইতেই শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া গিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া ভাগবত প্রভৃতিতে বর্ণিত রাসলীলা ও বস্ত্রহরণ-লীলা প্রভৃতির নামও ক্ষেমেন্দ্র করেন না। এমন কি, তাঁহার কৃষ্ণাবতার গ্রন্থে বৃন্দাবনের নাম পর্য্যন্তও দেখা যায় না। এই গ্রন্থে ভাগবত প্রভৃতির সহিত আর একটি গুরুতর বিষয়ে এইরূপ মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, মহাভারত ও হরিবংশে শ্রীকৃষ্ণকে কংসের ভাগিনেয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; এই গ্রন্থে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের গর্ভধারিণী দেবকীকে কংসের পিতৃস্বসা বলা হইয়াছে, যথা—

“পিতৃস্বসুস্তে দেবক্যা যঃ সমুৎপৎস্যতে সুতঃ।
স সুরৈর্নিশ্চিতো হন্তা বিভূতের্জীবিতস্য তে॥”

ক্ষেমেন্দ্রকৃত কৃষ্ণাবতার-চরিত।

নারদ এক দিন গোপনে আসিয়া কংসকে বলিয়াছিলেন—

“তোমার পিতার ভগিনী দেবকীর যে পুত্র জন্মিবে, দেবগণ ইহা স্থির করিয়াছেন যে, সেই পুত্র তোমার ঐশ্বর্য্য ও জীবনকে বিধ্বস্ত করিবে।”

এইরূপ আরও কতকগুলি কৃষ্ণচরিত সম্বন্ধে কথা ক্ষেমেন্দ্র লিখিয়াছেন—যাহা বর্ত্তমান সময়ে প্রচলিত পুরাণাদি-গ্রথিত কৃষ্ণ-চরিতের সহিত নিতান্ত বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীত হয়, বিস্তারভয়ে এ স্থানে আর তাহা উদ্ধৃত হইল না।

এই সকল কৃষ্ণচরিত-সংক্রান্ত মতভেদ দেখিয়া স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, যে সকল প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া মহাকবি ক্ষেমেন্দ্র কৃষ্ণচরিত বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমান সময়ে আর আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না, এবং ইহার সঙ্গে ইহাও স্পষ্টভাবে অনুমিত হয় যে, বর্ত্তমান সময়ে কৃষ্ণচরিত বিষয়ে যে সকল ভাগবত প্রভৃতি পুরাণ সাধারণে প্রধান প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইতেছে, ক্ষেমেন্দ্রের সময় ঐ সকল পুরাণের প্রচার ছিল না বা প্রচার থাকিলেও ক্ষেমেন্দ্র প্রভৃতির নিকট তাহা প্রমাণ বলিয়া পরিগৃহীত হইত না। যাহা হউক, ইহা স্থির যে, শ্রীকৃষ্ণলীলা বিষয়ে পূর্ব্বে এরূপ অনেক গ্রন্থ ছিল, যাহা এক্ষণে বিলুপ্ত হইয়াছে এবং ঐ সময়ে প্রচলিত সেই সকল গ্রন্থের বর্ণনা অনুসারে শ্রীরাধার চরিত্রে এমন কিছু বর্ণিত হয় নাই, যাহা দ্বারা তাঁহাকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের পরা প্রকৃতি প্রেমভক্তির পরম আদর্শ শ্রীরাধিকার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। এই খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত পরবনিতা কৃষ্ণপ্রেমার্থিনী সমাজভয়বিহ্বলা শ্রীরাধা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে পড়িয়া যে অপূর্ব্ব আকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহারই সমালোচনা পরবর্ত্তী প্রবন্ধে করা যাইবে।

[ ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ।

# দাদাঠাকুরের নিষ্ঠা

## ১

অনেক আদরের মেয়ে হারাণী—সেই হারাণী অল্পবয়সে বিধবা হইয়া, সীঁথির সিঁদূর মুছিয়া, হাতের চুড়ী ভাঙ্গিয়া যখন মায়ের সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইল, মা তখন ধুলায় লুটোপুটি খাইয়া কাঁদিয়া বলিল, "হারাণী রে, তোর কপালে এই ছিল ?"

হারাণী চোখের জল মুছিয়া, মাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, "কপালের লেখা, তুমি কি করবে মা !"

জেলের মেয়ে হইলেও হারাণী কুৎসিতা ছিল না। সুতরাং অনেকেই পরামর্শ দিল, "তোদের জাতে যখন রয়েছে, তখন হারাণীর সাঙ্গা দে, হারাণীর মা।"

হারাণীর মা-ও এই কথাটা লইয়া মনের ভিতর তোলাপাড়া করিতেছিল। হারাণী কিন্তু ইহাতে আপত্তি জানাইয়া বলিল, "ছি মা, পরাণ জেলের মেয়ে আমি, সাঙ্গা ক'রে বাবার মাথা নীচু করবো ?"

সদুঃখে মা বলিল, "সাঙ্গা করবি না ত খাবি কি ক'রে রে আবাগী ? তোর বাবা ত শুধু এই কুঁড়েটুকু রেখে গিয়েছে।"

সদর্পে হারাণী উত্তর করিল, "দুখ্যু-মেহনত ক'রে দু'টো পেট কি চালাতে পারবো না ?"

কিন্তু গোবর কুড়াইয়া, ঘুঁটে বেচিয়া, লোকের ধান ভানিয়া পেটের ভাত, পরণের কাপড় যোগান দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। বর্ষার বারিপাতে মাঠ-ঘাট যখন প্লাবিত হইয়া আসিল, তখন মায়ে-ঝিয়ে এক দিন উপবাস দিয়া দ্বিতীয় দিনে হারাণী জল খাইবার সম্বল ঘটীটি লইয়া তেলী-দিদির কাছে বাঁধা দিতে গেল। তেলী-দিদি তাহার দুঃখে দুঃখিত হইয়া তিরস্কার করিয়া বলিল, "মর্ পোড়ারমুখী, গতর থাক্‌তে ঘটী-বাটি বেচে খেয়ে মচ্ছিস্ কেন ?"

হারাণী বলিল, "কি করবো দিদি, গতর খাটাব কোথায় ?"

তেলী-দিদি বলিল, "কলকাতায় গিয়ে চাকরী করবি ?"

হারাণী ইহাতে সম্মত হইল। তখন হারাণী মাতার অনুমতি লইয়া তেলী-দিদির সঙ্গে কলিকাতা যাত্রা করিল।

সেখানে এক বড়লোকের বাড়ীতে হারাণীর চাকরী হইল। খাওয়া-পরা বাদে মাসিক বেতন পাঁচ টাকা। চাকরী পাইয়া হারাণী কৃতার্থ হইল।

এক মাস চাকরী করিয়া হারাণী তেলী-দিদির ভাইপোর মারফতে মায়ের জন্য একখানি কাপড় ও দুইটি টাকা পাঠাইয়া দিল।

হারাণীর মাকে নূতন কাপড় পরিতে দেখিয়া লোক জিজ্ঞাসা করিল, "কাপড় কোথায় পেলি হারাণীর মা ?"

সাহ্লাদে হারাণীর মা উত্তর দিল, "আমার হারাণী পাঠিয়ে দিয়েছে।"

"এই দশ দিন কলকাতায় না যেতেই তোর জন্যে কাপড় পাঠিয়ে দিয়েছে !"

অপরে বলিল, "তা আর পাঠাবে না ? হারাণী যখন কলকাতায় গিয়েছে, তখন তাকে আর পায় কে। আর দু' মাস বাদে দেখবি, হারাণীর মা গরদের শাড়ী পরেছে।"

তাহার এই উক্তির মধ্যে যে তীব্র শ্লেষটুকু নিহিত ছিল, হারাণীর মা তাহা বুঝিতে পারিল না। সে এক গাল হাসিয়া আহ্লাদ-গদগদ কণ্ঠে বলিল, "তোমরা পাঁচ জন তাই বল মা, আমি গরদের কাপড় পরতে চাইনি, হারাণী আমার খেয়ে পরে সুখে থাক।"

## ২

হারাণীর নম্র স্বভাবে ও অক্লান্ত পরিশ্রমে সকলেই মুগ্ধ হইয়া পড়িল। সকলেই তাহাকে স্নেহ ও ভালবাসার দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। বাড়ীর ছেলেমেয়েগুলা হারাণীর এত ন্যাওটো হইয়া পড়িল যে, না ঘুমাইলে অনেককেই হারাণীর কাছছাড়া করিবার উপায় ছিল না। গৃহিণী বলিতেন, "অনেক ঝি রেখেছি, কিন্তু হারাণীর মত ঝি কখনও দেখি নাই।"

বাড়ীর গৃহিণী যখন এত দূর সন্তুষ্ট, তখন সে বাড়ীতে হারাণী যে বেশ সুখেই ছিল, ইহা বলাই বাহুল্য। সুখে থাকিলেও একটা অব্যক্ত আশঙ্কায় হারাণীর বুকটা কিন্তু মাঝে মাঝে ধুক্ ধুক্ করিত। চাকরী করিয়া দিবার পর তেলী-দিদি তাহাকে সাবধান করিয়া বলিয়া দিয়াছিল, "খবরদার হারাণী, তুই যে জেলের মেয়ে, এ কথা কাউকে

বলিস্ না। কেউ জাতের কথা জিজ্ঞেস করলে বল্‌বি, তিলীর মেয়ে; বাপের নাম পরাণ জেলে নয়, পরাণ পাল।"

বাড়ীর সকলের নিকট তেলী-দিদি পরিচিত ছিল, সুতরাং তাহার কথাতেই সকলে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল; হারাণীকে জাতির কথা জিজ্ঞাসা করা বড় প্রয়োজন বোধ করে নাই। না করিলেও হারাণী কিন্তু নিরুদ্বিগ্ন হইতে পারে নাই। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, তাহা হইলে হারাণী এত বড় মিথ্যাটা কেমন করিয়া উচ্চারণ করিবে? বলিতে তাহার গলা বাধিয়া যাইবে যে? যদি কেহ ঘুণাক্ষরে তাহার জাতির পরিচয় জানিতে পারে, তাহা হইলে ত রক্ষা-রাখিবে না। জেলের মেয়ে হইয়া কায়েতের ঘর মজাইতেছে;—জল তুলিতেছে, বাটনা বাটিতেছে, পান-জল দিতেছে, দোকান হইতে খাবার আনিতেছে। কোনরূপে জাতির কথা প্রকাশ পাইলে তাহাকে কুচি-কুচি করিয়া কাটিয়া ফেলিবে নিশ্চয়। হায়, কেন সে মাথা খাইয়া এখানে চাকরী করিতে আসিল? ইহা অপেক্ষা দেশে উপবাস দিয়া মরাও যে ভাল ছিল!

কিন্তু চার পাঁচ মাসেও কেহই যখন জাতি সম্বন্ধে কোনই উল্লেখ করিল না, হারাণী তখন অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া আসিল। তাহার ভয়টুকু অল্পে অল্পে দূরীভূত হইয়া মনটাকে অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছন্দ করিয়া তুলিল। নাঃ, এখন কেহ জিজ্ঞাসা করিলেও হারাণী অসঙ্কুচিত কণ্ঠেই উত্তর দিতে পারিবে, সে তিলীর মেয়ে।

এইরূপে নিশ্চিন্ত হইয়া হারাণী যখন সকলের প্রীতি ও ভালবাসা আকর্ষণ পূর্ব্বক কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া যাইতেছিল, তখন সহসা এক দিন রান্নার জল তুলিতে তুলিতে হারাণী শুনিল যে, বাড়ীর গুরুদেব আসিয়াছেন। গুরুদেবের আগমনে গৃহিণী অতিশয় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। গুরুদেব পরম ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ। তাঁহার আহ্নিকের উদ্যোগ, জলযোগ ও রন্ধনের আয়োজন—গৃহিণী ভক্তি ও সাবধানতা সহকারে সম্পন্ন করিতে লাগিলেন।

গুরুদেবের হবিষ্যান্নের জন্য আতপ চাউল কিনিতে হারাণী দোকানে গিয়াছিল, ফিরিবার সময় কৌতূহলবশতঃ সে বাহিরের ঘরের জানালা দিয়া গুরুদেবের দর্শনাভিলাষী হইল। কিন্তু কি সর্ব্বনাশ, গুরুদেব যে তাহাদেরই গ্রামের ভট্‌চায্যি মশায়। ভয়ে হারাণীর পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত থর-থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। তাহার হাত হইতে আতপ চাউলের ঠোঙ্গাটা পড়িয়া যাইতেছিল, হারাণী দুই হাতে সেটাকে কোলের কাছে চাপিয়া ধরিল।

গুরুদেব তখন তৈলমর্দ্দনান্তে ধূমপান করিতেছিলেন। তাঁহার চঞ্চল দৃষ্টি সহসা জানালার দিকে নিপতিত হইল। হারাণী ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে সত্বরপদে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল।

### ৩

ভট্টাচার্য্য মহাশয় গঙ্গাস্নান করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতেছিলেন। হারাণী গলির মোড়ে দাঁড়াইয়া তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় সম্মুখীন হইলে সে গলবস্ত্রে ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহার মুখের দিকে চাহিয়াই সচকিতে বলিয়া উঠিলেন, "কে, হারাণী না কি?"

"হাঁ, দাদাঠাকুর।"

"তুই এখানে?"

শঙ্কা-কম্পিত কণ্ঠে হারাণী উত্তর দিল, "আমি এখানে চাকরী করি।"

"চাকরী? কি চাকরী করিস্ তুই?"

"ঝি-গিরী।"

"কোথায়?"

"ঐ বাড়ীতে।"

বলিয়া হারাণী অঙ্গুলিনির্দ্দেশে বাড়ীখানা দেখাইয়া দিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় যেন আতঙ্ক-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে বাড়ীখানার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ঐ বাড়ীতে? ও বাড়ী ত আমার শিষ্য দেবেন বোসের।"

হারাণী শঙ্কা-বিবর্ণ মুখে নত-মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় তখন ক্রোধ-রুক্ষ কণ্ঠে বলিলেন, "সর্ব্বনাশ! জেলের মেয়ে তুই, ভদ্র লোকের জাত-কুল খাচ্চিস্?"

ভীতিজড়িত স্বরে হারাণী বলিল, "জাত-কুল কিছু খাইনি দাদাঠাকুর, আমি শুধু এঁটো বাসন মাজি, জল তুলে দিই, আর দোকান থেকে খাবার-টাবার—"

রোষ-ক্ষুব্ধ কণ্ঠে ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, "তবে আর বাকী রইল কি? রামচন্দ্র! কলিতে দেখছি সব একাকার হয়ে গেল। আচ্ছা সাহস ত তোর হারাণী।"

ভয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে হারাণী বলিল, "কি করবো দাদাঠাকুর, পেটের জ্বালায়।"

"ওরা বোধ হয় তোর জাতের খবর জানে নি ?"

"না।"

"জানে নি ব'লেই রেখেছে তোকে। এখন কিন্তু জানতে পারলে তোকে আস্ত রাখবে না।"

"আমাকে বাঁচাও দাদাঠাকুর।" বলিয়া হারাণী ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পা দুটা জড়াইয়া ধরিতে গেল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাড়াতাড়ি পিছনে সরিয়া দাঁড়াইয়া ঘৃণার সহিত বলিয়া উঠিলেন, "ছুঁস্ নে, ছুঁস্ নে, আমি গঙ্গাস্নান ক'রে আসছি।"

হারাণী একটু থতমত খাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আমার কি হবে, দাদাঠাকুর ?"

দাদাঠাকুর বলিলেন, "হবে আর কি, মেরে হয় ত গুঁড়ো ক'রে দেবে। আমি ত জেনে শুনে অধর্ম্ম কত্তে পারবো না।"

হারাণী তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য বিস্তর কাকুতি-মিনতি করিতে লাগিল। তাহার কাতরতা দর্শনে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বোধ হয় দয়ার উদ্রেক হইল। তিনি খানিক ভাবিয়া পরামর্শ দিলেন, "যা হবার হয়ে গিয়েছে, এখন যদি বাঁচতে চাস্, এখান থেকে পালিয়ে যা।"

হারাণী জিজ্ঞাসা করিল, "পালিয়ে কোথায় যাব ?"

সক্রোধে ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "চুলোয় যাবি। দেশে এত লোকের অন্ন জুটে, তোরই জুটবে না ? এই ত তিন পা তফাতে শিয়ালদা ইষ্টিশেন। যদি ভাল চাস্ ত আস্তে আস্তে গিয়ে গাড়ীতে উঠে দেশে চ'লে যা।"

হারাণী বলিল, "আমার যে তিন মাসের মাইনে পাওনা আছে, দাদাঠাকুর।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, মাহিনার আশা করিতে গেলে, তাহাকে জীবনের আশা ত্যাগ করিতে হইবে। ভয়ে ভয়ে হারাণী দেশে চলিয়া যাইতেই স্বীকৃত হইল। কিন্তু রেল-ভাড়া ত চাই। একটু ভাবিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় নামাবলীর খুঁট হইতে ছয় আনার পয়সা খুলিয়া দিয়া বলিলেন, "এই নে টিকিটের দাম। খবরদার, আর কক্ষনো এমন কায করিস্ না।"

পয়সাগুলি পেট-কাপড়ের খুঁটে বাঁধিয়া, হারাণী শিয়ালদহ অভিমুখে রওনা হইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় রামচন্দ্রকে স্মরণ করিতে করিতে শিষ্য-গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন।

### ৪

গুরুদেবের প্রমুখাৎ হারাণী ঝির জাতিতত্ত্ব অবগত হইয়া দেবেন বাবু ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি ঝি-মাগীকে রীতিমত শিক্ষা দিয়া, তাহার মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু হারাণী তখন তাঁহার ক্রোধাগ্নির বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। গুরুদেব তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন, "হারাণীকে আর পাবে কোথায় ? আমাকে দেখেই ভয়ে সে পালিয়ে গিয়েছে। এখন অস্পৃশ্য জাতির স্পৃষ্ট জলাদি গ্রহণ করার জন্য তোমাদের সকলের প্রায়শ্চিত্ত করা আবশ্যক। নচেৎ এ বাটীতে আমি জলগ্রহণ করতে পারবো না।"

তাহাই হইল। নিতান্ত শিশু ব্যতীত আর সকলেই প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইল। প্রায়শ্চিত্তের টাকাগুলি ট্যাঁকে গুঁজিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় শিষ্যের গৃহে জলগ্রহণ করিলেন।

অতঃপর গৃহিণী জানাইলেন যে, হারাণী চলিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার তিন মাসের মাহিনা বারো টাকা তাঁহার কাছে জমা আছে। দেবেন বাবু বলিলেন, "ও টাকা কোন পুণ্যের ফণ্ডে পাঠিয়ে দেব।"

গুরুদেব কিন্তু শিষ্যকে বুঝাইয়া বলিলেন, "গরীবের খাটুনির টাকা তাকে ফেলে দেওয়া দরকার। সে যতই দোষ করুক, টাকাগুলা তার ন্যায্য প্রাপ্য বটে ত।"

গুরুদেবের আদেশ দেবেন বাবু অমান্য করিতে পারিলেন না; কিন্তু হারাণীকে টাকা পাঠান হইবে কিরূপে ? ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "আমাকেই দাও। এক গাঁয়েই ত বাড়ী। গরীবের মেয়ের টাকা কটা না হয় বয়ে নিয়ে গেলাম।"

হারাণীর মাহিনার টাকাগুলি ট্যাঁকে গুঁজিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় উৎফুল্ল চিত্তে ভাবিতে লাগিলেন, 'এবারে বাটী হইতে যাত্রাকালে তাঁহার বামদিক্ দিয়া শৃগাল চলিয়া গিয়াছিল কি না !'

দেশে গিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় দেখিলেন, হারাণী ঘরে ফিরে নাই। ফিরিলেও তিনি টাকাগুলা হারাণীকে দিতেন কি না সন্দেহ; কিন্তু ফিরে নাই যখন, তখন হারাণীর পরিশ্রমের টাকা তাহার বুড়া মাকে দেওয়া অসঙ্গত বোধ করিলেন। ইহার পর হারাণী যদি টাকার দাবী করিয়া বসে !

সুতরাং ভট্টাচার্য্য মহাশয় টাকাগুলি নিজের বাক্সেই ফেলিয়া রাখিতে বাধ্য হইলেন, এবং মাস দুই পরে সেই টাকা দিয়া মেয়ের কানের মাকড়ী দুইটা গড়াইয়া দিলেন। দুই মাসের মধ্যেও হারাণী যখন ফিরিল না, তখন সে আর ফিরিবে কি? যদি ফিরে, তখন দেখা যাইবে।

ইহার মধ্যে হারাণীর মা আসিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে অনুরোধ করিয়াছিল, "আমার হারাণীর তিন চার মাস কোন খবর পাই না, টাকা-কড়িও সে পাঠায় না। তাকে একখানা চিঠি লিখে দেবে, বাবাঠাকুর? আমি এখানে খেতে পাই না।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহাকে ধমক দিয়া বলিয়াছিলেন, "মর্ মাগী, তোর মেয়ে কোথায় ঝি-গিরী কচ্ছে, আমি যাব তাকে চিঠি লিখতে! ছোটলোকের বেটীর আস্পর্দ্ধা দেখ।"

## ৫

হারাণী শিয়ালদহ ষ্টেশনে যাইবার জন্য বাহির হইল বটে, কিন্তু অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়াও তথায় উপস্থিত হইতে পারিল না। সে তেলী-দিদির সঙ্গে একবারমাত্র শিয়ালদহ হইতে আসিয়াছিল, সুতরাং রাস্তা ঠিক করিতে পারিল না। ঘুরিতে ঘুরিতে দিক্ ভুল করিয়া শ্যামবাজারের দিকে চলিয়া গেল। সেখানে পথিকদিগকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া যখন জানিতে পারিল যে, শিয়ালদহ হইতে সে বহুদূরে চলিয়া আসিয়াছে, তখন সে নিরুপায়ভাবে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল।

এমন সময় জনৈক প্রৌঢ়বয়স্ক ভদ্রলোক সম্মুখে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কি হয়েছে বাছা?"

কাঁদিতে কাঁদিতে হারাণী উত্তর দিল, "আমি রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি।"

"রাস্তা হারিয়েছ? কোথায় যাবে তুমি?"

"শিয়ালদা।"

"শিয়ালদা ত এখান থেকে অনেক দূর।"

হতাশভাবে গ্যাসের থামটা ধরিয়া হারাণী বলিল, "আমাকে রাস্তা দেখিয়ে দিতে পারেন?"

ভদ্রলোক বলিল, "দেখিয়ে দিতে পারি, কিন্তু রাস্তা চিনে তুমি যেতে পারবে কি?"

রাস্তা চিনিয়া যাইতে পারিলে হারাণীর এ দুর্গতি হইবে কেন? সুতরাং লোকটির কথায় সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল। ভদ্রলোকটি তখন তাহার মুখের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার বাড়ী কোথায়?"

হারাণী বলিল, "ফুলবেড়ে।"

ব্যস্ততা সহকারে ভদ্রলোকটি বলিয়া উঠিল, "ফুলবেড়ে! সে ত আমাদেরই দেশের কাছে। জনারগাছা জান তুমি?"

হারাণী জনারগাছার নাম কখনও শুনে নাই, সে উত্তর করিল, "কৈ না।"

সাতিশয় বিস্ময় সহকারে লোকটি বলিল, "কি আশ্চর্য্য, জনারগাছা তুমি জান না? ফুলবেড়ের কোশ তিনেক দক্ষিণেই যে জনারগাছা।"

স্বীয় অজ্ঞতায় লজ্জিত হইয়া হারাণী বলিল, "তা হ'তে পারে।"

"তোমরা কি জাত?"

"জেলে।"

"তোমার বাপের নাম কি বল দেখি।"

"পরাণ।"

অতিমাত্র উল্লসিতভাবে লোকটি বলিল, "কি আশ্চর্য্য, পরাণ জেলের মেয়ে তুমি? পরাণের সঙ্গে আমার যে বেশ জানা ছিল। আমাদের বাড়ীতে কায-কর্ম্মে যত মাছের দরকার হ'ত, পরাণই সব দিয়ে আসতো। আহা, চমৎকার লোক ছিল সে। মাছের দরদস্তুর নিয়ে কক্ষনো মন-কষাকষি করেনি।"

এই বিপৎ-সমুদ্রে সহসা এমন একটা পরিচিত লোক পাইয়া হারাণীর আনন্দের সীমা রহিল না। সে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "দয়া ক'রে আমাকে ইষ্টিশানে পৌঁছে দেবেন?"

লোকটি বলিল, "নিশ্চয় দেব। কিন্তু এখন ইষ্টিশানে গিয়ে ত কোন ফল হবে না, সেই ৫টায় গাড়ী। খাওয়া-দাওয়া হয়েছে তোমার?"

"না।"

"তবে আমার বাসায় গিয়ে খাওয়া-দাওয়া ক'রে তার পর যাবে। এই কাছেই আমার বাসা। এস আমার সঙ্গে।"

হারাণী অগত্যা ভদ্রলোকটির সহিত তাহার বাসায় চলিল।

আহারাদির পরে হারাণী যাইতে চাহিলে লোকটি বলিল, "তাও কি হয়, পরাণ দাদার মেয়ে তুমি, আমার বাসায় যখন এসেছ, তখন আজকার দিনটা থাক্‌তে হবে।"

পরদিন লোকটির এত কায পড়িল যে, হারাণীকে লইয়া শিয়ালদহে যাইবার সময় পাইল না, প্রায় সমস্ত দিনটাই তাহাকে বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইল।

তৃতীয় দিবসে সন্ধ্যার অল্প পূর্ব্বে সে একখানা গাড়ী ডাকিয়া হারাণীকে লইয়া বাহির হইল এবং কতকগুলা গলী-রাস্তা ঘুরিয়া পরিশেষে এক সরু গলীর ধারে আসিয়া গাড়ী থামাইল। তাহার পর হারাণীকে গাড়ী হইতে নামাইয়া গলীর শেষ প্রান্তে একখানা বাড়ীর ভিতর আসিয়া ঢুকিল। বাড়ীতে ঢুকিবামাত্র এক প্রৌঢ়াবয়স্কা স্থূলাঙ্গী রমণী হারাণীর হাত ধরিয়া উপরতলার একখানা ঘরে লইয়া গিয়া বসাইল। সে ঘরের সাজসজ্জা দেখিয়া হারাণী চমৎকৃত হইল। একটু উদ্বিগ্নভাবে সঙ্গী লোকটিকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে এখানে নিয়ে এলেন কেন?"

লোকটি বলিল, "এখানে আমার একটু জরুরী কায আছে। বসো তুমি একটু, আমি এক্ষুনি আসছি।"

বলিয়া সে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। হারাণী বসিয়া সশঙ্কনেত্রে ঘরের আসবাবপত্র নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

তাহার পর হারাণীর অদৃষ্টে যাহা ঘটিল, তাহা না বলিলেও চলে। অনিচ্ছা সত্বেও বাধ্য হইয়া তাহাকে পাপের পথে পদার্পণ করিতে হইল।

## ৬

"দাদাঠাকুর যে। চিন্‌তে পাচ্ছো না আমাকে? আমি হারাণী।"

দৃষ্টিটাকে যথাসম্ভব তীক্ষ্ণ করিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় সবিস্ময়ে বলিলেন, "হারাণী! তোর চেহারা যে একেবারে বদলে গিয়েছে।"

একটু মিষ্টি হাসি হাসিয়া হারাণী বলিল, "হাতে পয়সা হ'লে, গায়ে গয়না হ'লে চেহারা আপনি বদলে যায়।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় আশ্চর্য্যান্বিতভাবে হারাণীর অলঙ্কারমণ্ডিত পরিপুষ্ট দেহখানির দিকে চাহিয়া রহিলেন। হারাণী জিজ্ঞাসা করিল, "আমার মায়ের খবর কি, দাদাঠাকুর? মরেছে না বেঁচে আছে?"

প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে হারাণীর সহাস্য মুখখানা ম্লান হইয়া আসিল। দাদাঠাকুর ঘাড় নাড়িয়া উত্তর করিলেন, "মরে নি, তবে আধমরা হয়ে রয়েছে। চোখে ভাল দেখ্‌তে পায় না, পেটে খেতে পায় না।"

হারাণী নীরবে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। দাদাঠাকুর বলিলেন, "তোর রকম কি হারাণী? নিজে দিব্যি গয়নাগাঁটি প'রে সুখে স্বচ্ছন্দে রয়েছিস্। কিন্তু আজ দু'বছরের মধ্যে বুড়ো মায়ের একটা খোঁজখবর নিলি না।"

বিষাদগম্ভীর কণ্ঠে হারাণী উত্তর করিল, "মায়ের খোঁজ কোন্ মুখে আর নেব, দাদাঠাকুর? আমার পোড়ামুখ যে পুড়ে গিয়েছে।"

অতঃপর দাদাঠাকুরের প্রশ্নে হারাণী কিরূপ বিপদে পড়িয়া এই পাপপথ অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করিল। বলিতে বলিতে সে চোখের জল রাখিতে পারিল না। দাদাঠাকুর তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "দুঃখ ক'রে কি করবি হারাণী, সকলই অদৃষ্ট। আর আমার মতে এতে তোর মন্দই বা এমন কি হয়েছে? বিশ বছর চাকরী করলেও এত গয়না তোর গায়ে উঠতো না বোধ হয়।"

দাদাঠাকুরের কথায় হারাণীর হাসি আসিল। সে চোখের জল মুছিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এখন কোথায় যাবে, দাদাঠাকুর?"

দাদাঠাকুর বলিলেন, "আমাকে শিষ্যবাড়ীতে যেতে হবে। ছোট মেয়েটার বিয়ে। আজকাল বামুন-কায়েতের ঘরে মেয়ের বিয়ে কি ভয়ানক দায়, তা জানিস্ তো। সাত আট শো টাকা খরচ। দেখি, শিষ্যদের কাছে যদি কিছু সাহায্য পাই।"

হারাণী বলিল, "দয়া ক'রে একবার আমার ঘরে যাবে, দাদাঠাকুর? ধরতে গেলে আমিও ত তোমার এক রকম শিষ্য। তুমি সে দিন যদি আমাকে পালিয়ে আস্‌তে উপদেশ না দিতে, তা হ'লে আমাকে ত বরাবর বাসন মেজে—জল তুলেই খেতে হ'তো। তা আমারও ত কিছু পেন্নামী দেওয়া দরকার।"

কেশবিরল মস্তকে হস্তাবমর্ষণ করিতে করিতে দাদাঠাকুর ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "বটে, বটে, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের উপর চিরকালই তোর অচলা ভক্তি, হারাণী। তবে কি জানিস্, দিনমানে—"

দাদাঠকুরের সঙ্কোচের কারণ বুঝিতে পারিয়া হারাণী বলিল, "দিনমানে না হয়, সন্ধ্যার পর যেও। ঐ সাম্‌নে গলীর ভিতর ৭নং বাড়ী। ওখানে গিয়ে ডালিমমনির খোঁজ কর্‌লেই হবে।"

দাদাঠাকুর বলিলেন, "অবস্থার সঙ্গে নামটাও বুঝি বদ্‌লে ফেলেছিস্?"

হারাণী বলিল, "নইলে হারাণী নাম নিয়ে এ ব্যবসা চলে কি?"

হাসিতে হাসিতে হারাণী গঙ্গাস্নানের পথে অগ্রসর হইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও হারাণীর প্রদর্শিত গলীটার দিকে বারবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে গন্তব্য পথে প্রস্থান করিলেন।

সন্ধ্যার পর ভট্টাচার্য্য মহাশয় হারাণীর ঘরে উপস্থিত হইলে হারাণী মহাসমাদরে একখানি কম্বলাসন পাতিয়া তাঁহাকে বসাইল। হারাণীর ঘরের সাজসজ্জা দেখিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় অবাক্ হইয়া গেলেন। তাহার পর হারাণী যখন এক শত টাকার নোট তাঁহার পায়ের কাছে রাখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল, তখন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বুকটা ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল। এই কন্যাদায়ের সময় একেবারে এক শত টাকা! দোষের মধ্যে উহা বেশ্যার দান। কিন্তু স্বর্ণ বা রজতখণ্ড নহে ত, কাগজমাত্র। তাহা ব্যতীত বেশ্যার দান গ্রহণ করে না, কলিকাতা সহরে এমন ব্রাহ্মণ কয় জন আছে? মনে মনে এই সকল বিষয় চিন্তা করিতে করিতে ভট্টাচার্য্য মহাশয় নোটখানি মুড়িয়া পেটের কাপড়ের খুঁটে বাঁধিয়া ফেলিলেন।

হারাণী মাকে দিবার জন্য আর পঁচিশটি টাকা দাদাঠাকুরের হাতে দিল। দাদাঠাকুর সে টাকাগুলিও পেটের কাপড়ে বাঁধিয়া হারাণীকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

* * * *

কলিকাতা হইতে কেহ দেশে ফিরিলেই হারাণীর মা তাহার নিকট গিয়া হারাণীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করিত। ভট্টাচার্য্য মহাশয় কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন শুনিয়া হারাণীর মা জ্বরে ধুঁকিতে ধুঁকিতে তাঁহার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমার হারাণের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, বাবাঠাকুর?"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিরক্তিসূচক মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন, "মর্ মাগী, তোর হারাণী বেশ্যাবৃত্তি কচ্ছে, আর আমি যাব তার সঙ্গে দেখা কর্‌তে? রামচন্দ্র, রামচন্দ্র!"

হারাণীর মা ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে লাঠি ধরিয়া স্বীয় কুটীরে প্রত্যাবৃত্ত হইল।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় এক শত পঁচিশ টাকায় নবীন জামাতাকে ঘড়ী-চেইন উপহার দিয়া বৈবাহিকের নিকট হইতে মহাশয় ব্যক্তি বলিয়া অজস্র সুখ্যাতি লাভ করিলেন। কিন্তু এই ঘড়ী-চেইন কোথা হইতে আসিল, তাহা কেহ কখন অনুসন্ধান করিয়া দেখে নাই।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

---

# পূর্ণিমায়

চাঁদের ভেলা চল্‌ছে ভেসে সুনীল সাগরে,
ঢুল্‌ছে যেন তারার আঁখি নিশার বাসরে;
দূর সুদূরে মেঘের কোলে,
নিভেও আবার উঠে জ্ব'লে,
ফুলের কলি ধরার বুকে চম্‌কে শিহরে।

গাছের পাতায় লুকোচুরি আলোয় ছায়াতে,
দীঘির জলে ঘুম লেগেছে কোন্ সে মায়াতে;
ঝাউএর শাখা সোনার রঙে,
হেলে দোলে নূতন ঢঙে,
ঝিঁঝির ঝাঁঝর ঝিমিয়ে বাজে রাতের আসরে।

শ্রান্ত প্রিয়া ঘুমিয়ে আছে বিছানার পাশে,
পরাণ আমার মাতায় শিথিল চুলের সুবাসে;
আলোর লহর তারি মুখে,
খেলে বেড়ায় কি কৌতুকে,
জানে যে চাঁদ এত খেলা জান্‌বো কি ক'রে?

ভাব্‌ছি আমি চাঁদের হাসি মনের গোপনে,
প্রিয়ার মুখে মধুর ধারা ঢাল্‌ছে স্বপনে;
তাইতে আলোর ছলা দিয়ে,
সারা ভুবন ঘুম পাড়িয়ে,
আমায় শুধু জাগিয়ে রাখে একলা এ ঘরে।

শ্রীসতীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী।

# অদ্ভুত প্রতিশোধ

পেয়োলো সেভারিণির বিধবা পত্নী তাহার একমাত্র পুত্রের সহিত কর্সিকা দ্বীপে বনিফেসিয়ো প্রণালীর ধারে পাহাড়ের উপর বনিফেসিয়ো নগরে একটি ক্ষুদ্র কুটীরে বাস করিত। পর্ব্বত-গাত্রে সংস্থিত বিধবার এই কুটীরে বসিয়া সঙ্কীর্ণ বনিফেসিয়ো প্রণালীর সমস্ত অংশ ও অপর পারে সার্দ্দিনিয়া দ্বীপেরও অনেকটা দূর পর্য্যন্ত বেশ স্পষ্ট দেখা যাইত। এই নগরীটির অপর ধারে পর্ব্বত ভেদ করিয়া সমুদ্রের একটি খাড়ী, একটি প্রকাণ্ড লম্বা বারান্দার মত বরাবর এই নগরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। এইটিই এই সহরের বন্দর। এই বন্দরে ইটালীর ও সার্দ্দিনিয়ার জেলেরা নৌকা লইয়া মাছ ধরিবার জন্ত আসিত-যাইত এবং মাসে দুই ক্ষেপ করিয়া একখানি জীর্ণ যাত্রি-জাহাজও এই সহর হইতে যাত্রী ও মাল লইয়া যাওয়া-আসা করিত।

ধূসর পর্ব্বতমালার গায়ে স্তরে স্তরে শ্রেণীবদ্ধভাবে অবস্থিত শ্বেতবর্ণের বাড়ীগুলি দূর হইতে শ্বেতাভ জমীর উপর শুভ্র দাগের মত দেখা যাইত। সেগুলি দেখিলেই কতকগুলি শ্বেতবর্ণের পক্ষিকুলায় বলিয়া ভ্রম হইত। সেই বাড়ীগুলি যেন পর্ব্বত-গাত্রে দৃঢ়ভাবে কীলক দিয়া আঁটা। এই প্রণালীর দুই ধারেই পর্ব্বতমালা যেন সেই সঙ্কীর্ণ বিপৎসঙ্কুল জলপথের উপর দুই ধার হইতে ঝুঁকিয়া রহিয়াছে। এই সঙ্কীর্ণ গিরিমালা-সঙ্কুল জলপথে নাবিকগণ পোত-পরিচালন ভয়ানক বিপজ্জনক ব্যাপার বলিয়া মনে করিত। এই স্থানে সমুদ্র-বক্ষ সদাই ঝঞ্ঝানলাকুল ও সমুদ্রতীর বন্ধুর, অনুর্ব্বর ও সজীবতার লেশশূন্ত থাকিত। প্রণালীটির স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড জলাবর্ত্ত, স্থানে স্থানে বিশাল দহ। এই প্রণালীর সর্ব্বত্র কালো কালো পর্ব্বতের চূড়াগুলি সমুদ্র-বক্ষে জলের ভিতর হইতে মাথা জাগাইয়া রহিয়াছে। সেই সকল পর্ব্বত-শৃঙ্গের চারিধারে শুভ্র ফেনপুঞ্জ জমাট বাঁধিয়া ঘুরিতেছে। দেখিয়া বোধ হয় যেন সমুদ্র-বক্ষে রাশি রাশি সাদা নেকড়ার টুক্‌রা ভাসিতেছে।

বিধবা সেভারিণির কুটীরটি যেন পাহাড়ের গায়ে ঝাল দিয়া জুড়িয়া রাখা হইয়াছে। ইহার তিনটি জানালা, সে জানালা তিনটি হইতে দেখিলে সমুদ্রের অপর পারে দিক্‌চক্রবালের শেষ সীমা পর্য্যন্ত লক্ষিত হয়।

বিধবা সেভারিণি তাহার পুত্র এণ্টোনিয়ো ও পালিতা কুক্কুরী সেমিলাণ্টিকে লইয়া সেই নির্জ্জন কুটীরে একান্তে বাস করিত। সেমিলাণ্টি ছিল একটি বড়জাতের কুকুর ;—কৃশ, কিন্তু আকারে দীর্ঘ। ইহার গায়ে লম্বা লম্বা উস্কো-খুস্কো লোম। সেমিলাণ্টিকে লইয়া এণ্টোনিয়ো মাঝে মাঝে শিকারেও যাইত। * * *

এক দিন রাত্রিতে এণ্টোনিয়ো সেভারিণির সহিত নিকোলাস রেভোলাটির ঝগড়া হইল। রেভোলাটি এণ্টোনিয়োর বুকে ছুরি মারিয়া তাহাকে হত্যা করিল এবং সেই রাত্রিতেই কর্সিকা হইতে পলাইয়া সার্দ্দিনিয়াতে গিয়া লুকাইয়া রহিল।

রাস্তার লোকরা এণ্টোনিয়োর মৃতদেহ আনিয়া তাহার বৃদ্ধা জননীর নিকট পৌঁছাইয়া দিল। পুত্রের মৃতদেহ দেখিয়া প্রথমে মাতা সেভারিণি এক ফোঁটাও অশ্রু বিসর্জ্জন করিল না। সে নির্ব্বাক্ ও নিস্পন্দভাবে অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহার মৃত পুত্রের দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। তাহার পর সে তাহার জরা-শীর্ণ হস্তে পুত্রের মৃতদেহ স্পর্শ করিয়া পুত্র-হন্তার উপর মর্ম্মান্তিক প্রতিশোধ লইবে, এই প্রতিজ্ঞা করিল। সেই রাত্রিতে সে অন্ত কাহাকেও তাহার কাছে থাকিতে দিল না। সে একাকী তাহার পুত্রের মৃতদেহ ও পালিতা কুক্কুরীটিকে ঘরের মধ্যে রাখিয়া ভিতর হইতে ঘরের দরজা অর্গল-বদ্ধ করিয়া দিল। কুকুরটি তাহার প্রভুর শোকে অধীর হইয়া কাতর চীৎকার করিতে লাগিল। সে তাহার প্রভুর শয্যার পার্শ্বে বসিয়া তাহার মৃত পালকের মুখের পানে বার বার করুণ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল, আর থাকিয়া থাকিয়া বিকট চীৎকার করিতে লাগিল। মৃতদেহের কাছ ছাড়িয়া মর্ম্মাহতা জননীও নড়িল না, শোকগ্রস্তা কুক্কুরী সেমিলাণ্টিও নড়িল না। এণ্টোনিয়োর মাতা সমস্ত রাত্রি তাহার মৃত পুত্রের মুখের নিকট মুখ লইয়া কাতর দৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। তাহার দুই চক্ষু দিয়া অজস্র শোকাশ্রু ঝরিতে লাগিল।

মৃত যুবককে তাহার বিছানার উপর চিৎ করিয়া শোয়াইয়া রাখা হইয়াছিল। তাহার গায়ে একটি মোটা কাপড়ের জামা। সেই জামার বুকের কাছটা ছোরার আঘাতে ছিন্ন। যুবক ঠিক যেন বিছানায় শুইয়া ঘুমাইতেছে। তাহার জামা ও ইজারের স্থানে স্থানে ও হাতে রক্তের দাগ। কয়েক ফোঁটা জমাট-বাঁধা রক্ত তাহার দাড়িতে ও চুলে লাগিয়া রহিয়াছে।

মাতা সেভারিণি তাহার মৃত পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া কি কথা বলিতেছিল। সেই কথা শুনিয়া কুক্কুরীটি চীৎকার বন্ধ করিল।

বৃদ্ধা তাহার মৃত পুত্রকে কহিতেছিল, "বাছা! আশ্বস্ত হও; আমি এই হত্যার প্রতিশোধ লইব। পুত্র! আমি আততায়ীর উপর মর্ম্মান্তিক প্রতিশোধ লইব। তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাও। আমার কথা কি শুনিতে পাইতেছ না? শুন,—যে দুষ্ট তোমাকে হত্যা করিয়াছে, আমি তাহাকে হত্যা করিব। ইহাই আমার পণ। তোমার মা ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া এই প্রতিজ্ঞা করিতেছে। তুমি জান ত বৎস! তোমার বৃদ্ধা জননীর যে কথা, সেই কায। ইহা তুমি বিলক্ষণ জান।"

এই কথা বলিয়া বৃদ্ধা এণ্টোনিয়ো-জননী কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার মৃত পুত্রের শীতল ওষ্ঠে নিজের ওষ্ঠ মিলাইয়া একটি অতিদীর্ঘ চরম চুম্বন অঙ্কিত করিল।

বৃদ্ধা চুপ করিলে সেমিলাণ্টি আবার বিকট স্বরে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। তাহার সেই নিরন্তর কাতর ক্রন্দনে নিদারুণ মর্ম্ম-ব্যথা সূচিত হইতে লাগিল। পরদিন সকাল হইতে বৃদ্ধা জননী ও কুক্কুরী সেমিলাণ্টি সারারাত্রি একভাবে তাহাদের উভয়েরই নিতান্ত প্রিয় সেই মৃতদেহটি আগুলিয়া বসিয়া রহিল।

পরদিন এণ্টোনিয়ো সেভারিণির মৃতদেহ সমাহিত করা হইল। বনিফেসিয়ো নগরে আর কাহারও মুখে এণ্টোনিয়োর কথা বা নাম-গন্ধ বড় একটা কিছু শুনিতে পাওয়া যাইত না।

এণ্টোনিয়োর সহোদর ভাই ছিল না। তাহার কোন নিকট-সম্পর্কীয় জ্ঞাতি-ভাইও ছিল না। তাহার এমন কোন আত্মীয়ও ছিল না, যে তাহার হত্যার প্রতিশোধ লইতে পারে। নিহত যুবক পুত্রের মর্ম্মাহতা স্থবিরা জননী বসিয়া বসিয়া প্রতিশোধের উপায় চিন্তা করিতে লাগিল।

বৃদ্ধা তাহার ঘরের জানালা খুলিয়া সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এক ভাবে জানালার নিকট বসিয়া প্রণালীর পরপারে একটি সাদা বিন্দুর দিকে চাহিয়া থাকিত। এই শ্বেতবর্ণের বিন্দুটি হইতেছে সার্দ্দিনিয়া দ্বীপের একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। এই গ্রামটির নাম—লংসার্দ্দো। কর্সিকা দ্বীপের চোর-ডাকাতরা যখন পুলিসের হাতে বেশী তাড়া খাইত, তখন তাহারা সমুদ্র পার হইয়া এই নির্জ্জন দ্বীপ সার্দ্দিনিয়ায় গিয়া

আশ্রয় লইত। লংসার্দ্দো গ্রামটির বারো আনা অংশ লোকই ছিল কর্সিকা দ্বীপ হইতে পলায়িত চোর-ডাকাত। এণ্টোনিয়োর মাতা খবর পাইয়াছিল যে, তাহার পুত্র-হন্তা নিকোলাস রেভোলাটি এই গ্রামে গিয়া আড্ডা গাড়িয়াছে।

দিনের পর দিন, সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত, সন্ধ্যা হইতে সকাল পর্য্যন্ত অভাগী জননী জানালায় বসিয়া সাগর-পারের সেই ক্ষুদ্র গ্রামখানির দিকে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া থাকিত, আর মনে মনে তাহার পুত্র-হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য উপায় অন্বেষণ করিত। সে কেমন করিয়া কি করিবে? তাহাকে তাহার কার্য্যে সহায়তা করে, এমন কেহই নাই। সে নিজে বৃদ্ধা, দুর্ব্বলা, মরণপথযাত্রী। কিন্তু সে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, ঈশ্বরের দিব্য করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, তাহার মৃত পুত্রের গা ছুঁইয়া শপথ করিয়াছে, সে প্রতিশোধ লইবেই লইবে। সে সেই কথা ভুলিতেই পারে না। সে আর দেরী করিতে পারে না। সে কি করিবে? কি উপায়ে সে তাহার পুত্র-হন্তার উপর মর্ম্মান্তিক প্রতিশোধ লইবে? * * *

সেই রাত্রিতে বৃদ্ধার চোখে আদৌ নিদ্রা আসিল না। কিছুতেই সে তাহার চিন্তা ও আবেগ প্রশমিত করিতে পারিল না। একমাত্র ভাবনা তাহার মস্তিষ্ক নিপীড়িত করিতে লাগিল। সেমিলাণ্টি তাহার পায়ের কাছে শুইয়া ঘুমাইতেছিল ও মাঝে মাঝে চমকিয়া উঠিয়া যেন দূরে কাহাকে দেখিয়া ঘেউ ঘেউ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেছিল। সেমিলাণ্টি তাহার প্রভুর মৃত্যুর পরে মাঝে মাঝে এইরূপ চীৎকার করিত, যেন সংস্কার তাহার হৃদয়ে মাঝে মাঝে পূর্ব্বস্মৃতি জাগাইয়া দিত—যে স্মৃতির দাগ মনুষ্যেতর জীবের মন হইতে কিছুতেই উঠিতে চাহে না। সেই স্মৃতির তাড়নে সে মাঝে মাঝে ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিত।

এক দিন গভীর রাত্রিতে সেমিলাণ্টি হঠাৎ ঘেউ ঘেউ করিয়া ডাকিয়া উঠিয়াছে, এমন সময় মাতা সেভারিণির মাথার মধ্যে একটি নৃশংস কল্পনা, পুত্র-হন্তার উপর প্রতিহিংসা পরিতর্পণের একটি বর্ব্বরোচিত উপায় উদ্ভাবিত হইল। রাত্রি ভোর হওয়া পর্য্যন্ত সেই কল্পনাটি লইয়া জল্পনা ও তোলাপাড়া করিতে লাগিল। তাহার পর অতি প্রত্যূষে উঠিয়াই সে গির্জ্জায় চলিয়া গেল। গির্জ্জার পাথরের মেঝের উপর উবুড় হইয়া পড়িয়া সে তাহার অভীষ্টসিদ্ধির জন্য একান্ত কাতরভাবে দেবতার সহায়তা প্রার্থনা করিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে বৃদ্ধা বাড়ী ফিরিয়া আসিল। তাহার বাড়ীর উঠানে একটি বড় কাঠের পিপা পড়িয়া ছিল। এই পিপাটিতে বৃষ্টির সময় উঠানের জল গড়াইয়া জমা হইত। বহু কাল ব্যবহারে পিপার কাঠগুলি জীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। মাতা সেভারিণি সেই পিপাটি উল্টাইয়া দিয়া খালি করিয়া ফেলিল ও কাঠের ও প্রস্তরের টুক্রা জড় করিয়া তাহার চারিধারে সাজাইয়া সেটিকে খুব শক্ত করিয়া বসাইল। পিপাটি একটি সুন্দর কুকুর রাখিবার ঘরে পরিণত হইল। এণ্টোনিয়ো-জননী তখন সেমিলাণ্টিকে সেই পিপা-নির্ম্মিত ঘরের মধ্যে বাঁধিয়া রাখিয়া নিজে আপনার ঘরে গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

কুকুরটি সমস্ত দিন ও সমস্ত রাত্রি ধরিয়া ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় চীৎকার করিতে লাগিল। মাতা সেভারিণি সমস্ত দিন-রাত্রির মধ্যে আর ঘরের বাহির হইল না। পরদিন সকালে উঠিয়া সে কুকুরটিকে একটু জলপান করিতে দিল, কিন্তু ঝোল রুটী কিছুই খাইতে দিল না।

আর এক দিন-রাত্রিও এই ভাবেই কাটিয়া গেল। সেমিলাণ্টি ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় কাতর হইয়া অবসন্নভাবে শুইয়া ঘুমাইতে লাগিল। পরদিন সেমিলাণ্টির চক্ষু দুইটি জ্বলন্ত অঙ্গারের মত ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। তাহার গায়ের লোমগুলি সজারুর কাঁটার মত খাড়া খাড়া হইয়া উঠিল। সে বার বার তাহার শিকল ছিঁড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তথাপি বৃদ্ধা তাহাকে আহার্য্য কিছুই দিল না। কুকুরটি ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় একেবারে ক্ষেপিয়া যাইবার উপক্রম করিল এবং সমভাবে কাতরকণ্ঠে চীৎকার করিতে লাগিল। সেই রাত্রিটাও সেমিলাণ্টির সেইরূপ ভাবেই কাটিল।

পরদিন প্রত্যূষে উঠিয়া মাতা সেভারিণি তাহার এক জন পাড়াপড়শীর বাড়ী হইতে দুই বোঝা খড় চাহিয়া আনিল। সেই খড় দড়ি দিয়া জড়াইয়া সে একটি সুন্দর কুশ-পুত্তলি প্রস্তুত করিল। ঘরে তাহার স্বামীর পরণের যে ছিন্ন পুরাতন ইজের, কামিজ ও কোট ছিল, সেই পোষাকগুলি সে এই কুশ-পুত্তলিটিকে পরাইয়া সেটিকে দিব্য একটি মানুষ সাজাইল। সে সেই কুশ-পুত্তলিটিকে উঠানের মাঝখানে একটি বাঁশ পুতিয়া সেই বাঁশের গায়ে বাঁধিয়া খাড়া করিয়া রাখিল।

সেমিলাণ্টি তাহার ঘরে বসিয়া আশ্চর্য্যান্বিতভাবে এই অদ্ভুত মানুষটিকে দেখিতে লাগিল। যদিও ক্ষুধায় তাহার পেটের নাড়ীভুঁড়ি পর্য্যন্ত হজম হইয়া যাইবার জোগাড় হইয়া উঠিয়াছিল, তথাপি এই জাল মানুষটিকে দেখিয়া অবধি সে আর চীৎকার করিল না; চুপ করিয়া রহিল।

বৃদ্ধা তখন দোকান হইতে একটি লম্বা মাংসের কাবাব কিনিয়া আনিল ও সেমিলাণ্টির ঘরের সম্মুখে উঠানে একটি চুলা প্রস্তুত করিয়া কাঠের আঁচে সেই কাবাবখানি ভর্জ্জিত করিতে আরম্ভ করিয়া দিল। তাজা মাংসের গন্ধ পাইয়া সেমিলাণ্টি শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থাতেই লাফাইতে ঝাঁপাইতে আরম্ভ করিল। তাহার মুখ হইতে শুভ্র ফেন নির্গত হইতে লাগিল, তাহার জিহ্বা হইতে টস্ টস্ করিয়া লালা ঝরিতে লাগিল। তাহার চক্ষু দুইটি সেই তাজা মাংসের দিকে নির্নিমেষভাবে আবদ্ধ। মাংসের গন্ধে সেমিলাণ্টি পাগল হইয়া উঠিয়াছিল।

বৃদ্ধা তখন সেই তাজা মাংসের কাবাবটি লইয়া সেটিকে দড়ি দিয়া জড়াইয়া জড়াইয়া সেই কুশ-পুত্তলিটির গলায় শক্ত করিয়া বাঁধিয়া দিল। এই কাবাব-বন্ধন ব্যাপারটি শেষ করিতে বৃদ্ধার অনেকক্ষণ সময় লাগিল। সেই ব্যাপার শেষ হইলে বৃদ্ধা গিয়া সেমিলাণ্টির শৃঙ্খল মোচন করিয়া দিল।

বাঁধন খুলিয়া দেওয়া মাত্র সেমিলাণ্টি এক লাফে গিয়া কুশ-পুত্তলিটির টুঁটি কামড়াইয়া ধরিল এবং স্কন্ধে নখ বসাইয়া দিয়া সেটিকে আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িতে লাগিল। পুত্তলিটির গলায় জড়ানো রজ্জুগুলির ভিতরে দাঁত বসাইয়া দিয়া সে সেই কাবাবের একটা টুক্‌রা ছিঁড়িয়া লইয়া ভূতলে পতিত হইল। আবার দ্বিগুণ রাগের সহিত আর এক লাফ দিয়া সে সেই কুশ-পুত্তলিটির গলা কামড়াইয়া ধরিল। পুনঃ পুনঃ আক্রমণে কুশ-পুত্তলিটির স্কন্ধদেশ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেল।

বৃদ্ধা নির্ব্বাক্ ও নিশ্চেষ্টভাবে এই ব্যাপার দেখিতে লাগিল। পরে সে কুকুরটিকে আবার তাহার সেই পিপা-নির্ম্মিত ঘরে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিয়া আসিল। দুই দিন দুই রাত্রি আর তাহাকে কোন আহার্য্য দিল না। তৃতীয় দিন প্রভাতে আবার তাহাকে পূর্ব্বের মত শিক্ষা দিল।

পূর্ণ তিন মাস ধরিয়া বৃদ্ধা সেমিলাণ্টিকে এই অদ্ভুত উপায়ে তাহার আহার্য্য সংগ্রহ করিতে শিখাইল। ৩ মাস ধরিয়া এইভাবে শিক্ষা দিয়া বৃদ্ধা কুকুরটিকে ছাড়িয়া রাখিয়া দিতে আরম্ভ করিল এবং যখন ইচ্ছা তাহাকে কুশ-পুত্তলিটির দিকে লেলাইয়া দিয়া সেটিকে ছিন্ন ও বিধ্বস্ত করিতে শিক্ষা দিতে লাগিল। তখন সে আর সেই কুশ-পুত্তলিটির গলায় কাবাব বাঁধিয়া দিত না। সে কাবাব ভাজিয়া নিজের ঘরের মধ্যে রাখিয়া দিত। সেমিলাণ্টি তাহার শিক্ষা শেষ হইলে পুরস্কারস্বরূপ সেই খাদ্য অর্জ্জন করিত।

কৃশ-পুত্তলিটিকে দেখিবামাত্র সেমিলাণ্টি আহ্লাদে শিহরিয়া উঠিত ও মাতা সেভারিণির মুখের দিকে চাহিত। বৃদ্ধা তাহার জরাজীর্ণ অঙ্গুলিনির্দ্দেশে কৃশ-পুত্তলিটিকে দেখাইয়া কর্কশকণ্ঠে 'লে' 'লে' বলিয়া তাহাকে লেলাইয়া দিত।

মাতা সেভারিণি যখন বুঝিল যে, তাহার কুকুরের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইয়াছে, তখন সে এক রবিবার প্রভাতে গির্জ্জায় দীর্ঘ উপাসনা করিয়া আসিল। উপাসনার পর বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া সে পুরুষের পরিচ্ছদ পরিধান করিল। এই পরিচ্ছদে তাহাকে এক জন বৃদ্ধ ভিখারীর মত দেখাইতে লাগিল। সার্ড্ডিনিয়া দ্বীপের এক জন জেলে-নৌকার মাঝির সহিত বন্দোবস্ত করিয়া বৃদ্ধা বনিফেসিয়ো প্রণালী পার হইয়া অপর পারে গেল।

যাইবার সময় বৃদ্ধা খুব বড় এক টুকরা কাবাব প্রস্তুত করিয়া একটি কাপড়ের পুঁটলির মধ্যে ভরিয়া সঙ্গে করিয়া লইল। সেমিলাণ্টিকে দুই দিন পূর্ব্ব হইতে উপবাস করাইয়া রাখা হইয়াছিল। পথে যাইতে যাইতে বৃদ্ধা মধ্যে মধ্যে সেমিলাণ্টিকে তাহার পুঁটলির ভিতরের কাবাবের সুগন্ধ আঘ্রাণ করিতে দিতেছিল।

তাহারা সংসার্দ্দোতে গিয়া পৌঁছিল। এই বৃদ্ধা জরাগ্রস্তা কর্সিকান্ রমণী নেংচাইয়া নেংচাইয়া চলিতে লাগিল ও একটি নাপিতের দোকানে গিয়া নিকোলাস্ রেভোলাটির ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিল। রেভোলাটির বাড়ী নিকটেই ছিল। সে একটি কাঠের কারখানা খুলিয়াছিল ও সূত্রধরের কায আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। রেভোলাটি তখন তাহার সেই কারখানার পিছন দিকে উঠানে বসিয়া কায করিতেছিল।

বৃদ্ধা দরজা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া কহিল, "কি হে নিকোলাস! কেমন আছ?"

নিকোলাস চমকিয়া উঠিয়া আগন্তুকের দিকে মুখ ফিরাইল। বৃদ্ধা অমনই কুকুরটিকে ছাড়িয়া দিল ও নিকোলাসকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশে দেখাইয়া কর্কশকণ্ঠে কহিল, "লে! লে!"

ক্ষুধার উন্মত্ত সেমিলাণ্টি এক লাফে গিয়া রেভোলাটির টুঁটি কামড়াইয়া ধরিল। রেভোলাটিও দুই বাহু দ্বারা কুকুরটিকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে চাপিয়া মারিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। দুই জন কুস্তীগির পালোয়ানের মত আসল পশু ও মানুষ-পশু উঠানে গড়াগড়ি দিতে লাগিল। শেষে সেমিলাণ্টিই জয়লাভ করিল। সে নিকোলাস রেভোলাটির গলা দাঁতে করিয়া ছিঁড়িয়া তাহার পূর্ব্বঅভ্যাসমত আহার্য্য অনুসন্ধান করিতে লাগিল। রেভোলাটি যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল ও পা আছড়াইতে লাগিল। সেমিলাণ্টি তাহার গলার মাংসগুলি ছিঁড়িয়া ফিতার মত সরু লম্বা লম্বা টুক্‌রা করিয়া ফেলিল। * * *

দুই জন পাড়ার লোক তাহাদের বাড়ীর দ্বারের নিকট বসিয়া দেখিল যে, এক জন বৃদ্ধ ভিক্ষুক নিকোলাস রেভোলাটির কাঠের কারখানা হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে। তাহার সঙ্গে একটি কৃশ দীর্ঘাকৃতি ক্ষুধার্ত্ত কুকুর। বৃদ্ধ ভিক্ষুক তাহার পুঁটলি হইতে কি জানি কি কালো কালো জিনিষ বাহির করিয়া কুকুরটিকে খাইতে দিতেছে ও পথ দিয়া চলিয়া যাইতেছে।

সেই দিন সন্ধ্যাকালেই মাতা সেভারিণি তাহার বাড়ীতে ফিরিয়া গেল। সেই দিন রাত্রিতে সে নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইল। *

শ্রীমনোমোহন রায়।

---

* মোপাসার 'ভেনডেটা' গল্প হইতে অনুদিত।

# কাঁঠালপাড়া বঙ্কিম সাহিত্য-সম্মিলন

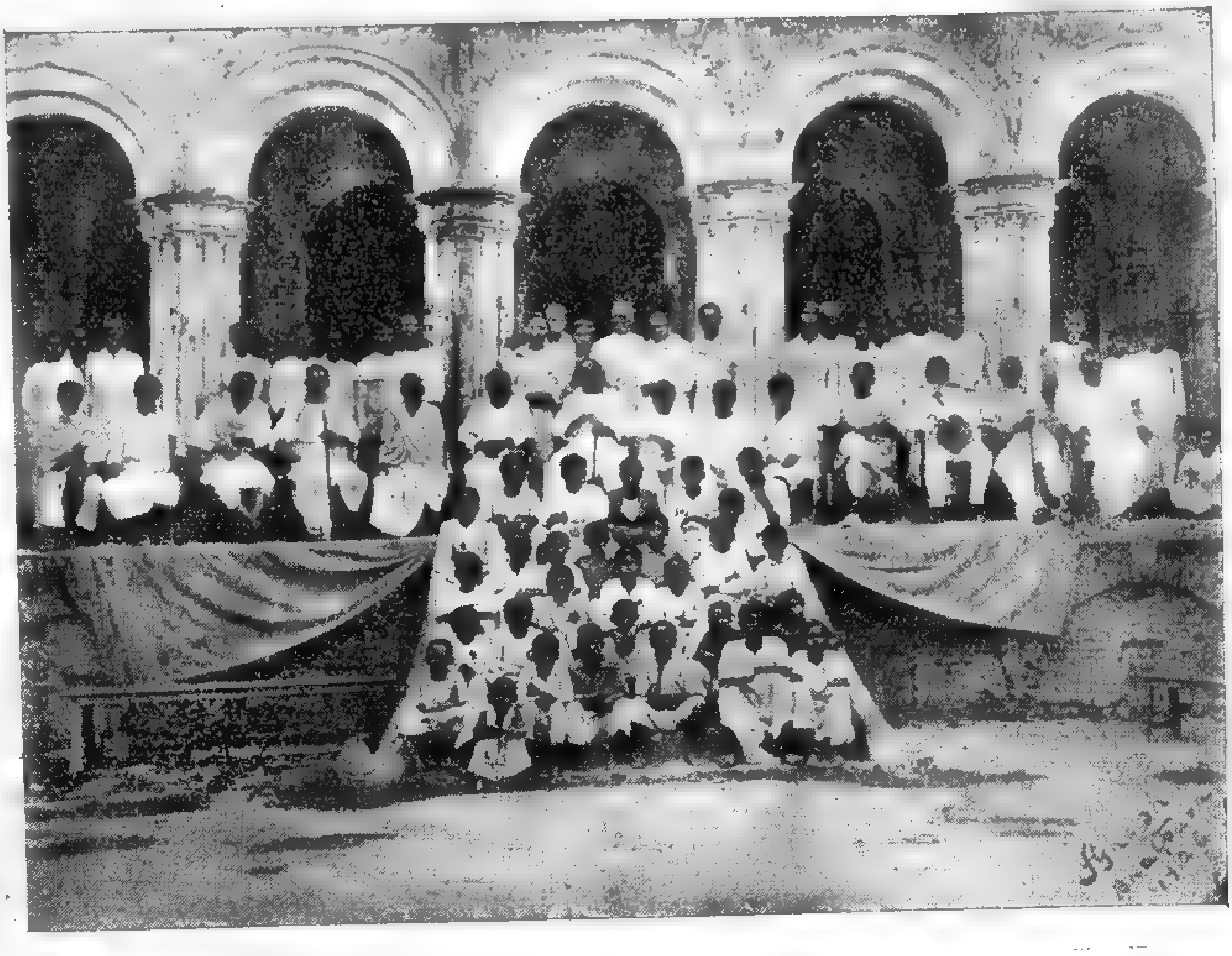

কৃষি
শিল্প
বাণিজ্য
সতীশ

## দেশীয় গন্ধ-শিল্পের ভবিষ্যৎ

সুবাসের আদর সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বশ্রেণীর লোকের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে, যেখানে গন্ধোৎপাদক দ্রব্যের প্রাচুর্য্য অধিক, সেখানে যে সকল প্রকার সদ্গন্ধই বিশেষরূপে সমাদৃত হইবে, তাহা স্বাভাবিক। গন্ধ প্রাণিজ, খনিজ ও উদ্ভিজ্জ—তিন শ্রেণীর উপাদান হইতেই পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু গন্ধ প্রস্তুতে শেষোক্ত শ্রেণীর উপাদানের প্রাধান্যই সমধিক। উদ্ভিদের গন্ধ যে শুধু পুষ্পেই থাকে, তাহা নহে; উদ্ভিদ্‌বিশেষে ফল ( যেমন লেবু ), বীজ ( লতাকস্তুরী ), মূল ( খস্ খস্ ), পত্র ( তেজপাতা ), কাষ্ঠ ( চন্দন ) অথবা নির্য্যাস ( ধুনা ) গন্ধের আধার হইয়া থাকে। ভারতে গন্ধোৎপাদক দ্রব্যের প্রাচুর্য্যের বিষয় উল্লেখ করা অনাবশ্যক। প্রাচীন জগতে ভারতের অগুরু, চন্দন, চুয়া, ধূপ ইত্যাদি তদানীন্তন সকল সভ্যজাতিই বহুমূল্য দিয়া ক্রয় করিত এবং খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যের দ্রব্যাদির মধ্যে গন্ধদ্রব্য একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিত। এক্ষণে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বর্ত্তমান জগতের অনেক স্থানে গন্ধোৎপাদক উদ্ভিদের চাষ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে ও বৃদ্ধি পাইয়াছে। বৈজ্ঞানিক প্রথায় বায়ি তৈল ( Essential Oil ) নিষ্কাশিত হওয়ায় তৈলের অপচয় কম হইয়া উহা অপেক্ষাকৃত সুলভ হইয়াছে এবং সর্ব্বোপরি আল্‌কাতরা ( Coal tar ) হইতে যেমন নানাপ্রকার রং প্রস্তুত হইয়া উদ্ভিজ্জ রঙের বহুল পরিমাণে উচ্ছেদসাধন করিয়াছে, সেইরূপ উক্ত দ্রব্য হইতে প্রাপ্ত গন্ধশ্রেণীও স্বভাবজ গন্ধের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অবস্থা-পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও উপযুক্ত প্রণালীতে সংগ্রহ অথবা চাষ করিলে গন্ধদ্রব্য হইতে দেশবাসী অনেক লাভ করিতে পারে, কিন্তু দেশে প্রচুর পরিমাণ গন্ধদ্রব্য থাকিলেও সদ্ব্যবহারের অভাবে তৎসমুদয়ের অধিকাংশেরই অপচয় হইতেছে।

## গন্ধ-নিষ্কাশন-প্রণালী

আমরা যে গন্ধ রুমালে অথবা পোষাক-পরিচ্ছদে ব্যবহার করি, তাহা কাঁচা মাল হইতে কতিপয় স্তরের মধ্য দিয়া প্রস্তুত হইয়াছে; তাহার প্রথম স্তর পুষ্প ইত্যাদি হইতে গন্ধ নিষ্কাশন করা। যাহাকে আমরা সৌরভ বলি, তাহা অধিকাংশ স্থলে উদ্ভিদের অঙ্গবিশেষে সঞ্চিত বায়ি তৈলজনিত। উহা যে কত সামান্য মাত্রায় থাকে, তাহা এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, কুড়ি হাজার গোলাপ-ফুলের পাপড়ি ( প্রায় ১০ সের ) চোঁয়াইলে মাত্র ১ তোলা বায়ি তৈল কিংবা আতর পাওয়া যায়। যাহা হউক, গন্ধ সংগ্রহের অর্থ গন্ধদ্রব্য হইতে এই বায়ি তৈল পৃথক্ করিয়া লওয়া। সুগন্ধযুক্ত স্থায়ি তৈল ( Fixed Oil ) নিষ্কাশনের জন্য প্রায়ই চাপ প্রয়োগ করা হয়। সাধারণতঃ চারিটি উপায়ে বায়ি তৈল সংগৃহীত হইয়া থাকে।

১। চোলাই ( Distillation ):—বকযন্ত্র ( Still ) জলের সহিত গন্ধদ্রব্য দিয়া অগ্নিপ্রয়োগে ফুটান হয়; তাহাতে গন্ধদ্রব্যের বায়ি তৈল জলীয় বাষ্পের সহিত মিশ্রিত হইয়া বাহির হইয়া আইসে এবং ঘন করিবার পাত্রে ( Condensor ) উহা জমিয়া গিয়া তৈল জলের উপর ভাসিতে থাকে। যে স্থলে সাক্ষাৎভাবে উত্তাপ প্রয়োগ করিলে গন্ধদ্রব্যের ক্ষতি হওয়া সম্ভব, সে স্থলে গন্ধদ্রব্য জলে না দিয়া বকযন্ত্রমধ্যে স্বতন্ত্র ও সচ্ছিদ্র পাত্রে এরূপভাবে রাখা হয় যে, উহার মধ্য দিয়া জলীয় বাষ্প প্রবাহিত হইতে পারে। গোলাপের আতর প্রস্তুত চোলাই প্রথার অন্যতম দৃষ্টান্ত।

২। চাপ-প্রয়োগ ( Expression ):—কোন কোন প্রকার উপাদানের জন্য, যেমন কমলা ও অন্য লেবুর খোসা, চাপ-প্রয়োগই তৈল-নিষ্কাশনের সহজ উপায়। কিন্তু লেবু-খোসার তৈল বাহির করিয়া লইবার অন্য উপায়ও আছে। এক খণ্ড স্পঞ্জের উপর লেবুর খোসা 'নিংড়াইলে' বায়ি

তৈল স্পঞ্জ দ্বারা শোষিত হইয়া যায়। অন্তর্ভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণ্টকযুক্ত পেয়ালা-সদৃশ যন্ত্রে লেবু দিয়া নাড়িলেও লেবুর তৈল কতক পরিমাণে বাহির হইয়া আইসে।

৩। নিমজ্জন ( Maceration ) :—জলস্বেদন ( Water bath ) যন্ত্রে উদ্ভিজ্জ অথবা খনিজ চর্ব্বি গলাইয়া লইয়া তাহাতে ফুলগুলি নিমজ্জিত করিয়া কিছু সময় রাখিয়া দিলে গন্ধ চর্ব্বির মধ্যে চলিয়া আইসে, পরে বসার সহিত সুরাসার একত্র করিয়া নাড়িলে গন্ধ বসা হইতে পৃথক্ হইয়া যায়।

৪। শোষণ ( Absorption ) :—এই প্রথায় উপযুক্তরূপ কাচপাত্রে এক স্তর চর্ব্বি রাখিয়া উহার উপর পুষ্পগুলি বিছাইয়া দেওয়া হয়। প্রতিদিন নির্গন্ধ ফুলগুলি তুলিয়া ফেলিয়া সেগুলির স্থানে টাট্‌কা ফুল দেওয়া আবশ্যক। ক্রমশঃ চর্ব্বি সুরভিত হইয়া উঠে।

পর্ব্বতগাত্রে পুষ্পিত চোহর গুল্ম

## শিল্পের জন্য কাঁচা মাল

ভারতে গন্ধোৎপাদক উদ্ভিদের অভাব নাই। আমরা একবার হিসাব করিয়া দেখিয়াছিলাম যে, ভারতের নানা স্থানোৎপন্ন গন্ধদ্রব্যাদি একত্র করিলে ১ শতের কম হইবে না। তাহার তালিকা প্রদান করা এ স্থলে নিষ্প্রয়োজন। কারণ, অনেকগুলিই বঙ্গদেশে পরিচিত অথবা সুলভ নহে। ব্যবসায়িক হিসাবে যে সমুদয় গন্ধদ্রব্য সংগ্রহ অথবা উৎপাদন করিয়া এতৎপ্রদেশে লাভ আছে, কেবলমাত্র সেইরূপ কয়েকটির নাম এ স্থলে উল্লিখিত হইল। বলা আবশ্যক যে, কতকগুলি গন্ধদ্রব্যের ব্যবহার সুগন্ধ প্রস্তুত অপেক্ষা মশলা হিসাবে অধিক। জীরকবর্গীয় ( Umbelliperæ ) জীরা, রাঁধুনী, মৌরী, শুলফা, ধনিয়া, জোয়ান প্রভৃতি সম্বন্ধে এই মন্তব্য বিশেষরূপে প্রযুজ্য ; এগুলি অবশ্য ক্ষেত্রজ ফসল, কিন্তু জীরকবর্গীয় দুই একটি উৎকৃষ্ট গন্ধদ্রব্য বন্য অবস্থায় পাওয়া যায়—সা-জীরা ও চোহর ( Angelica glanca ) তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। রামপুর-বুসায়র ও সিমলা পাহাড়ে এই দুইটি গন্ধোৎপাদক গাছ স্থানে স্থানে যথেষ্ট পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যান্য বন্য শ্রেণীর গন্ধোৎপাদক উদ্ভিদের মধ্যে ঘোড়বচ, বড় এলাচ, অগুরু, তেজপাতা, কর্পূর-কাচরী, গন্ধমাতৃ, চন্দ্রমূল, নাগকেশর প্রভৃতি বঙ্গদেশে পাওয়া যায়। উদ্যানপার্শ্বে দৃষ্ট হইলেও গুয়েবাবলা, গন্ধতৃণ, কেয়া ইত্যাদি অর্দ্ধবন্য উদ্ভিদ্‌রূপে পরিগণিত হয়। প্রকৃত উদ্যানজাত গন্ধোৎপাদক গাছের মধ্যে চামেলী, বেল, হেনা, চাঁপা, বকুল, কামিনী, সিউলী, রজনীগন্ধা প্রভৃতি সুপরিচিত।

বস্তুতঃ আমাদের বনজঙ্গল, বাগান-বাগিচা ও ক্ষেত্র হইতে যে পরিমাণ গন্ধদ্রব্য পাওয়া যাইতে পারে, তাহার পরিমাণ নিতান্ত সামান্য নহে। বর্ত্তমান সময় উহাদের সদ্ব্যবহার না হওয়ার অন্যান্য কারণের মধ্যে প্রধান কারণ এই যে, উক্ত শ্রেণীর দ্রব্যের ব্যবসায়িক মূল্য এখনও পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধ হয় নাই।

## সংগ্রহ ও চাষ

কোন শিল্পের আবশ্যক উপাদানস্বরূপ যখন কোন কাঁচা মাল সংগ্রহ করিতে হয়, তখন ইহা জানা দরকার যে, কাঁচা মাল ঠিক শিল্পের উপযোগী করিয়াই বাজারে আনিতে হইবে। দুঃখের বিষয়, এতদ্দেশের ব্যবসায়ীরা সে দিকে আদৌ মনোযোগ দেয় না অথবা তাহাদের শিক্ষা-দীক্ষা সেরূপ মনোযোগ প্রদানের প্রতিকূল। সেই জন্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, বাজারে অধিকাংশ গন্ধের মশলাতেই অত্যধিক ভেজাল। কারখানাওয়ালাগণ এইরূপ উপাদান সহজে লইতে চায় না, কিংবা লইলেও অনেক কম দর দিয়া থাকে। কারণ, এই সমুদয় দ্রব্য আবার বাছিয়া পরিষ্কার করিয়া লইতে অনেক শ্রম ও অর্থ ব্যয় হয়। ভেজাল দেওয়া অপরিষ্কৃত মাল বিক্রয় করিবার জন্যই বিদেশীয় বাজারে অনেক ভারতীয় মালের অন্য দেশীয় সমশ্রেণীর মাল অপেক্ষা কম

মূল্য হইয়া থাকে ;—যদিও পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, বিশুদ্ধ, পরিষ্কৃত ভারতীয় মাল কোন অংশে হীন নহে, বরং উৎকৃষ্টতর। এই প্রকার মাল লইয়া শুধুই যে বিলাতী চালানের ক্ষতি হয়, তাহা নহে, দেশমধ্যেও কার্য্যে প্রয়োগ করিতে হইলে এইরূপ মাল লইয়া লোক উত্তম ফল না পাইয়া, মূলতঃ ভাল জিনিষের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়ে। গন্ধ-শিল্পের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে প্রথমেই যাহাতে গন্ধ-দ্রব্য সমূহ বিশুদ্ধ অবস্থায় এবং যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়, তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। অরণ্যজাত গন্ধ-দ্রব্য লইয়া কায করিবার ইহাই প্রধান অসুবিধা। অর্দ্ধ-বন্য ও উদ্যানজাত গন্ধ-দ্রব্যাদির সমধিক প্রচলনের মূল অন্তরায় এই যে, বর্ত্তমান সময়ে কোন এক স্থানে অথবা কেন্দ্রে অধিক মাল একত্র সংগ্রহ করার সুবিধা নাই। আবার ক্ষেত্রজ গন্ধ-দ্রব্যগুলিও সকল সময়ে সন্তোষজনক হয় না। উৎকর্ষতার পরিবর্ত্তে শুধু উৎপাদনের হারের উপর লক্ষ্য রাখিয়া চাষ করায় দেশীয় কৃষি-জাত গন্ধ-দ্রব্য ক্রমশঃ অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছে। এতদ্দেশোৎপাদিত ধনিয়া, মৌরী প্রভৃতিতে তৈলের ভাগ অন্য দেশীয় মাল অপেক্ষা কম। স্থানান্তর হইতে বীজ আনাইয়া অথবা উৎকৃষ্টতর বীজ নির্ব্বাচন পূর্ব্বক চাষ করিলে ইহার প্রতীকার অচিরে হওয়া সম্ভবপর।

ল্যাভেণ্ডার-ক্ষেত্র

## বাগিচার ফসল

একত্র বহু বিস্তৃতভাবে গন্ধ-ফসলের চাষ ভারতে খুবই কম। যুক্ত-প্রদেশের গাজিপুর এবং পঞ্চনদে, লাহোর ও অমৃতসহরের উপকণ্ঠে এবং হোসিয়ারপুর জিলায় অল্প-বিস্তর গোলাপের চাষ আছে। জৌনপুর ও কনৌজেও যুঁই, চামেলী প্রভৃতি কিয়ৎপরিমাণে উৎপাদিত হয়। ইদানীন্তন যুক্ত-প্রদেশের অন্য দুই এক স্থানেও ফুল-চাষ হইতেছে। এই প্রকারে উৎপাদিত ফুল গন্ধ-নিষ্কাশনের জন্যই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু মধুপুর, বৈদ্যনাথ অথবা তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে যে গোলাপ উৎপাদিত হয়, কিংবা কলিকাতার নিকটে গড়িয়া প্রভৃতি গ্রামে যে বেল, যুঁই ইত্যাদি জন্মান হয়, সেগুলি টাট্‌কা ফুলস্বরূপই বিক্রয় হইয়া থাকে। ব্যবসায় হিসাবে কার্য্যকর হইতে পারে, এরূপ ফুল-বাগিচা বঙ্গদেশে নাই বলিলেই হয়। কেবল উত্তর-বঙ্গে কালিমপং প্রভৃতি অঞ্চলে কমলালেবু বন্য ও কর্ষিত অবস্থায় যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় এবং সেরূপ স্থলে কমলালেবুর ফুল অথবা ফলত্বক্ হইতে গন্ধ-নিষ্কাশন-কার্য্য চলিতে পারে। ইতালী, ফ্রান্স, বুলগেরিয়া, তুর্কী, পারস্য প্রভৃতি যে সমস্ত দেশে গন্ধ-শিল্প সুপ্রতিষ্ঠিত, সে সকল দেশেই প্রভূত পরিমাণে ফুল উৎপাদিত হইয়া থাকে। ফ্রান্সের grasse নামক বিশ্ব-বিশ্রুত গন্ধ-শিল্পকেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে ক্রোশ ক্রোশব্যাপী কুসুম-ক্ষেত্র বিস্তৃত। ইংলণ্ডের মিচাম্ ( Mitcham ) নামক স্থানে ল্যাভেণ্ডার-ক্ষেত্র বিরল নহে। বঙ্গদেশেও গন্ধোৎপাদন উদ্দেশ্যে বাগিচা স্থাপন করিয়া লাভবান্ না হইবার কোন কারণ নাই। চাঁপা, বকুল, চামেলী, রজনীগন্ধা প্রভৃতি সমস্তই বাগিচায় চাষের উপযুক্ত। বিলাতী ফুলের মধ্যে দেরাদুনে ল্যাভেণ্ডার ও নীলগিরিতে জিরানিয়ম চাষের চেষ্টা সুফল প্রসব করিয়াছে। কিন্তু এতৎপ্রসঙ্গে বঙ্গদেশের জলবায়ু ও মৃত্তিকার উপযোগী দুইটি পুষ্পবৃক্ষ বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য :—

১। লতাকস্তূরী অথবা কস্তূরীবীজ ( **Hibiscus Abelmoschus** ); ইহা ঢেঁড়সের নিকট-আত্মীয় এবং গাছও প্রায় উক্ত প্রকার; ইহার ছোট ছোট কাল অথবা কটা বীজগুলি হস্তে ঘর্ষণ করিলে মৃগনাভির গন্ধ পাওয়া যায়। বস্তুতঃ ইহা হইতেই **Ambretta musk** নামক কৃত্রিম কস্তূরী প্রস্তুত হয়। এতদ্দেশে ইহা কেবল উচ্চ-শ্রেণীর তামাক ও সূর্ত্তী প্রভৃতির মসলারূপে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বিলাতী বাজারে এই বীজের যথেষ্ট চাহিদা আছে এবং মূল্যও সামান্য নয়; সময়ে সময়ে আশী টাকা মণ পর্য্যন্তও বিক্রয় হইয়া থাকে। আপাততঃ বিলাতী বাজারে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ-জাত কস্তূরী-বীজের আমদানীই অধিক, কিন্তু চেষ্টা করিলে এতদ্দেশেও যথেষ্ট পরিমাণে এই মূল্যবান্ বীজ জন্মাইতে পারা যায়। ডাঙ্গা জমী, সামান্য সারযুক্ত দোঁয়াস মাটী ও সারি বাঁধিয়া দেড় হাত অন্তর অগভীর গর্ত্ত করিয়া বর্ষার শেষে বীজ-রোপণ—ইহার পক্ষে আবশ্যক।

গুয়েবাবলা ( **Acacia Farneaisna** ) গাছ গ্রামাঞ্চলে বোধ হয় অনেকেই দেখিয়াছেন। শীতের শেষে যখন ইহার পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়, তখন অনেক দূর পর্য্যন্ত গন্ধ ছড়াইয়া পড়ে। গুয়েবাবলা অথবা বিলাতী কিকরের ফুলই সুপ্রসিদ্ধ **Cassie** নামক গন্ধের উপাদান। দক্ষিণ-ফ্রান্সে ইহার প্রভূত পরিমাণে চাষ হয়। বাগিচায় শ্রেণীবদ্ধভাবে উৎপাদন করিলে বিঘা প্রতি ৪ শত গাছ জন্মান যাইতে পারে এবং প্রতি বৃক্ষ হইতে গড়ে ১ সের ফুল পাওয়া সম্ভবপর। ফুলের মূল্য সের প্রতি ৮ আঁনার কম হইবে না; সুতরাং বিঘা প্রতি ২ শত টাকা আয় হইতে পারে। একই গাছ ১০।১২ বৎসর ফুল প্রসব করিতে সমর্থ; সেই জন্য উক্ত সময়ের মধ্যে গাছ ছাঁটিয়া দেওয়া ও বাগান পরিষ্কার রাখা ভিন্ন অন্য কোন কার্য্যের খরচ নাই। অবশ্য গাছ পুতিয়া ২।৩ বৎসর ফসলের জন্য অপেক্ষা করার খরচ আছে। সকল প্রকার খরচ বাদ দিলেও বিঘা প্রতি দেড় শত টাকা আয়ের সম্ভাবনা থাকে। নৈনিতালের নিকট জনৈক শ্বেতাঙ্গ কয়েক বৎসর গুয়েবাবলার চাষ ও ফুল হইতে গন্ধ-নিষ্কাশন করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। তাঁহার বাগিচায় প্রস্তুত গন্ধসার এমন কি ফরাসী দেশোৎপন্ন দ্রব্য হইতেও উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহার মৃত্যুর সহিত উক্ত শিল্প বিলোপ পাইয়াছে। পূর্ব্বোল্লিখিত নিমজ্জন প্রথায় ২ সের ফুল এক সের চর্ব্বিতে ভিজাইয়া গুয়েবাবলার গন্ধ সহজে বাহির করিতে পারা যায়।

উক্ত দুইটি উদ্ভিদ ভিন্ন গন্ধ-তৃণ ও তজ্জাতীয় ঘাসের চাষও সহজ এবং বেশ লাভজনক। তৃণ-তৈলের বিশেষ বিবরণ ইতঃপূর্ব্বে ( ফাল্গুন, ১৩৩০ ) প্রদত্ত হইয়াছে।

## শিল্পের বর্ত্তমান অবস্থা

সময় ও রুচি পরিবর্ত্তনের সহিত দেশীয় গন্ধ-শিল্পের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। গন্ধ-ব্যবহার পূর্ব্বে অবস্থাপন্ন ব্যক্তি-বর্গের মধ্যে আবদ্ধ ছিল; এখন জনসাধারণের মধ্যে ইহার ব্যবহারের মাত্রা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং রাসায়নিক শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি উক্তরূপ ভূরি-ব্যবহারের পথ সুগম করিয়া দিয়াছে। পুরাতন ধরণের গন্ধ-দ্রব্যের মধ্যে এতৎ-প্রদেশে 'মাথাঘসার মশলা', উত্তরপশ্চিমে আতর এবং দাক্ষিণাত্যে "অঙ্গরাগ" এই কয়েকটির সামান্য প্রচলন এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের ব্যবহার্য্য গন্ধ বলিতেই বিলাত হইতে আমদানী করা সুলভ কৃত্রিম গন্ধ সমূহের সংমিশ্রণ বুঝায়। নানাপ্রকার বিচিত্র নামযুক্ত এসেন্স, পমেটম, কেশ-তৈল, ক্রিম প্রভৃতি এই প্রকার গন্ধ দিয়াই সুবাসিত করা হয়। দেশীয় গন্ধ-দ্রব্যের প্রয়োগ অতি সামান্য পরিমাণেই হইয়া থাকে। দেশীয় গন্ধ-দ্রব্যাদির যে চাহিদা নাই, তাহা নহে; বিলাতী বাজারে ইহাদের আদর যথেষ্ট। উচ্চ শ্রেণীর গন্ধ প্রস্তুত করিতে এইগুলি আবশ্যক হয় এবং কিয়ৎপরিমাণে স্বভাবজ গন্ধ সংযোগ না করিলেও কোন কোন কৃত্রিম গন্ধ প্রস্তুত করা যায় না। কিন্তু দেশীয় বাজারে যাহার কাটতি অধিক, সে সকল গন্ধ নিকৃষ্ট শ্রেণীর এবং তৎসমুদয় প্রস্তুতের উপাদান অধিকাংশ স্থলেই কৃত্রিম গন্ধ। সেইরূপ উপাদান ব্যবহৃত হয় বলিয়াই এত অল্প মূল্যে চাকচিক্যময় সুন্দর শিশিতে এক বা দেড় আউন্স গন্ধ বিক্রয় করা সম্ভবপর হয়। এইরূপ গন্ধের ব্যবহারও নিতান্ত কম নহে। বিগত তিন বৎসরের হিসাব হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, গড়ে এতদ্দেশে প্রতি বৎসর কিঞ্চিদধিক প্রায় সাড়ে ২৩ লক্ষ টাকার সুবাসিত সুরাসার, প্রস্তুতীকৃত গন্ধ ও বাসি তৈল আমদানী হয়। দেশ হইতে এই শ্রেণীর যে সকল দ্রব্য রপ্তানী হয়, তাহাদের মূল্য প্রায় ১ কোটি টাকা হইবে; ইহার প্রায় অর্দ্ধেক কাঁচা মাল অর্থাৎ

বায়ি তৈল-বীজ ; বায়ি তৈলের মধ্যে চন্দন-তৈলই প্রধান ; মৃগনাভিও এই পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে ; কিন্তু এই হিসাবের মধ্যে গন্ধোৎপাদক পত্র, মূল, ফুল প্রভৃতি ধরা হয় নাই ; সেগুলির স্বতন্ত্র হিসাব পাইবারও উপায় নাই ; কারণ, তৎসমুদয় ঔষধের কাঁচা মালের সহিত গণ্য হইয়া থাকে। ফলতঃ রপ্তানীর মালের মধ্যে শিল্পজাত দ্রব্যের অনুপাত নিতান্ত কম।

## উন্নতির উপায়

বিদেশ হইতে সুলভ কৃত্রিম গন্ধ আনাইয়া সুরাসার, তৈল, চর্ব্বি অথবা অন্য উপাদান সহযোগে উহা হইতে ব্যবহার্য্য গন্ধ প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় দ্বারা যে কোন স্থায়ী শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, তাহা শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারেন। প্রকৃত গন্ধ-শিল্প প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে দেশীয় উপাদান সমূহের সদ্ব্যবহার করা একান্ত আবশ্যক। সুখের বিষয় যে, নব-জাগ্রত ভারতে এতদর্থে চেষ্টা চলিতেছে। মহীশূরের দুইটি চন্দন-তৈলের কারখানা ও Essenflor Company, গোয়ালিয়র রাজ্যে বিশুদ্ধ বায়ি-তৈল উৎপাদন, কানপুর ও কনৌজে আধুনিক প্রথায় তৈল-নিষ্কাশনের জন্য কল স্থাপন ইত্যাদি ভারতীয় গন্ধ-শিল্পে নবযুগ আগমনের সূচনা করিতেছে। এই সমুদয় নূতন প্রতিষ্ঠান যে সকল গন্ধসার অথবা বায়ি-তৈল বাজারে বাহির করিতে সমর্থ হইয়াছে, তন্মধ্যে চন্দন, বকুল, চাঁপা, চামেলী, গোলাপ, হেনা, যূঁই, মোতিয়া, মগরা, সেফালিকা, কেওড়া, গুয়েবাবলা ও তৃণ-তৈলগুলির নাম করিতে পারা যায়। কিন্তু অন্যান্য দেশের তুলনায় উৎপাদনের মাত্রা নিতান্ত কম এবং এক চন্দন-তৈল ব্যতীত অন্য কোন বায়ি-তৈল এত অধিক মাত্রায় প্রস্তুত হইতেছে না যে, উহা বিদেশীয় তৈলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারে। ফলতঃ কাঁচা মালের প্রাচুর্য্যের অনুপাতে উক্ত দ্রব্যাদি কার্য্যে প্রয়োগ করিয়া ব্যবহারোপযোগী যে গন্ধ প্রস্তুত হইতেছে, তাহা নিতান্তই কম। কত বহুল পরিমাণে সুগন্ধ ফুল যে নষ্ট হইতেছে, তাহা যাঁহারা হিমালয়গাত্রে বর্ষার প্রারম্ভে অসংখ্য 'কুজো,' গোলাপ ও অন্যান্য পুষ্পের ঘন কুঞ্জ দেখিয়াছেন, তাঁহারা সহজেই অনুমান করিতে পারিবেন। স্পেন ও ইতালীতে প্রচলিত বহনাবহনযোগ্য বকযন্ত্র দ্বারা মরসুমের সময় উৎপাদনস্থলে এইরূপ ফুল হইতে গন্ধ নিষ্কাশন করিয়া লইতে পারা যায়। কিন্তু সেরূপ চেষ্টা এখনও হয় নাই। পক্ষান্তরে, গন্ধোৎপাদক উদ্ভিদের বড় বড় বাগিচা না থাকিলেও স্থায়িভাবে গন্ধ-শিল্প প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভবপর নহে। ফ্রান্স এবং ইতালী দেশে গন্ধ-শিল্পিগণের এক একটি সমিতি আছে ; উক্ত সমিতির কার্য্য—বন্য অথবা অর্দ্ধ-বন্য গন্ধ-দ্রব্য সংগ্রহ বিষয়ে উপদেশ প্রদান ও উপযুক্ত কেন্দ্রে উক্তরূপ মাল হইতে গন্ধ-নিষ্কাশনের সহায়তা করা, ফুলবাগিচাওয়ালাগণের সহিত গন্ধ প্রস্তুতকারকগণের সম্বন্ধ স্থাপন, এবং বাজারে যাহাতে নিকৃষ্ট শ্রেণীর অথবা ভেজাল দেওয়া মাল বিক্রয় হইতে না পারে, তৎসম্বন্ধে ব্যবস্থা করা। এতদ্দেশেও এইরূপ সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টা ব্যতীত গন্ধ-শিল্পের উন্নতির কোন আশা করিতে পারা যায় না।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

## লক্ষ্য

সংসারের কোলাহলে বধির শ্রবণ
শান্তি নাই তৃপ্তি নাই সদা শূন্য প্রাণ,
তারি মাঝে থেকে থেকে ধ্বনিছে হৃদয়ে
দূরদূরান্তর হ'তে মৃদু-মন্দ গান।

নীল আকাশের পানে চেয়ে থাকি যবে
মুগ্ধপ্রাণ ; মাঝে মাঝে যায় দেখা
পৃথিবীর পরপারে অজানা প্রদেশে
মধুর শান্তির ছবি অস্ফুট আলোক-রেখা।

ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ এই জগতের মাঝে
মোরা স্বরগের শিশু, তাই স্বর্গ হ'তে
মাঝে মাঝে আসে গান, দেখা যায় ছবি
শান্তিহীন লক্ষ্যহীন জীবনের পথে।

এই আধ-দেখা ছবি, ( এই ) আধ-শোনা গান
লক্ষ্য রাখি চলি যাব, পূর্ণ হবে প্রাণ।

শ্রীঅতুলচন্দ্র সেন।

# কাল-পূর্ণিমা

গল্প

## ১

পূর্ণিমাতে জন্ম হওয়ায় বাবা আমার নাম পূর্ণশশী রাখিয়াছিলেন। পূর্ণচন্দ্রের সঙ্গে এ মুখের তুলনা—জ্ঞান-সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গেই সর্ব্বদা শুনিতাম আর গর্ব্বে আমার বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠিত।

* * * *

হঠাৎ এক দিন শুনিলাম—সে দিনও পূর্ণিমা ছিল—আমাদের শয়ন-ঘরটিকে বড়ই সুন্দর, বড়ই মনোরম করিয়া তুলিয়াছিল, চারি দিকের খোলা জানালা দিয়া জ্যোৎস্নার প্লাবনে. প্রাচীর-সংলগ্ন ঝুলান ছোট প্রদীপটি যেন আপনা হইতেই নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছিল;—সে দিনও শুনিলাম, পূর্ণচন্দ্রও না কি এ মুখের উপমেয় নহে—শশাঙ্ক কলঙ্কিত—এ পোড়া মুখ না কি নিষ্কলঙ্ক! এই নূতন কথাটি যাঁহার মুখে শুনিলাম, একটিবারমাত্র জীবনের এক অপূর্ব্ব স্মরণীয় মুহূর্ত্তে তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম। এখন আর একবার তাঁহার মুখের পানে চাহিলাম—চুরি করিয়া। মনে হইল, নিখিল বিশ্বের যাবতীয় সৌন্দর্য্য-সম্ভার সেই মুখে, চোখে, অধরোষ্ঠে—সর্ব্বাবয়বে কে যেন ঢালিয়া দিয়াছে। দৃষ্টি ফিরাইতে পারিলাম না। চারি চক্ষুর মিলন হইল, আমি দৃষ্টি নত করিলাম। মুহূর্ত্তে আমার মস্তক তাঁহার চরণে সংলগ্ন হইল। তিনি আনন্দভরে আমাকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করিলেন—আমার পলায়নের চেষ্টা ব্যর্থ হইল।

## ২

আমাদের গ্রামে বহু ব্রাহ্মণ—বহু পণ্ডিতের বাস ছিল। গ্রামে একটি বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় বাবা যথাসাধ্য আনুকূল্য করিয়াছিলেন বলিয়া অনেকের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য হইয়াছিল।

পিতা শুভদিনে ভগবতী বাগ্‌দেবীর অর্চ্চনাতে আমার বিদ্যারম্ভ করাইলেন। তদুপলক্ষে গ্রামের সকলকে আহারের নিমন্ত্রণও করিলেন। এই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে কেহ কোন আপত্তি করিলেন না। যাঁহারা স্ত্রীশিক্ষার ঘোর বিরোধী ছিলেন, তাঁহারাও এই ভোজের উৎসবে অনুগ্রহ পূর্ব্বক যোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু আমার বেশ মনে আছে, এই অভ্যাগত পণ্ডিত-মণ্ডলীর মধ্যে সে দিন তুমুল বাগ্‌যুদ্ধ হইয়াছিল। "কন্যাপ্যেব পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"—এই শ্লোকার্দ্ধের ভাবার্থ লইয়া তর্ক আরম্ভ হয়। এক জন পণ্ডিত বলিলেন, "কন্যা শিক্ষণীয়া, তা স্বীকার্য্য সন্দেহ নেই, শিক্ষা কিরূপ হওয়া উচিত, তাই হচ্ছে বিচার্য্য!" তাঁহার মতে, গৃহকার্য্যাদি শিক্ষাই স্ত্রীলোকের পক্ষে যথেষ্ট, বিদ্যা-শিক্ষা নিষ্প্রয়োজন। তর্কানুরোধে বিদ্যাশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইলেও, কার্য্যে পরিণত করা সম্ভবপর নয়, কেন না, বিবাহ-যোগ্য বয়সের পূর্ব্বে আশানুরূপ শিক্ষালাভ অসম্ভব, আর অসম্পূর্ণ শিক্ষা অনন্ত দোষের নিদান। এই সব আপত্তির সমর্থন করিতে গিয়া আর এক জন বলিলেন যে, বিদুষী স্ত্রী সাধারণতঃ গৃহকার্য্যে ও স্বামিসেবায় উদাসীনা হইয়া থাকেন; আর এই উক্তির পোষক উদাহরণস্বরূপ গার্গী ও মৈত্রেয়ীর উল্লেখ করিতে ভুলিলেন না। বিদুষী-শিরোমণি গার্গী না কি চির-কুমারী; সুতরাং গৃহকর্ম্মে অনভিজ্ঞা ছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য-পত্নী মৈত্রেয়ীও না কি গৃহিণী হইয়াও গৃহিণীপনা জানিতেন না। সংসারের ভার সপত্নীর হস্তে সমর্পণ করিয়া শুদ্ধ পরমাত্মচিন্তায় তিনি সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এইরূপ নানা তর্ক-বিতর্কের পর পিতা সুন্দরভাবে তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন—নানারূপ শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও অকাট্য যুক্তি প্রয়োগ করিলেন।

## ৩

বাবার বড় সাধ ছিল, তাঁহার কন্যা গার্গী ও মৈত্রেয়ীর মত বিদুষী হয়; কিন্তু অভাগী আমি জীবনের চতুর্দ্দশ বর্ষ অতিক্রম করিলাম, তবু শিক্ষার প্রথম সোপান উত্তীর্ণ

হইতে পারিলাম না। কারণ, চেষ্টা আমার আদৌ ছিল না। পড়া-শুনায় আমার মন লাগিত না। মাঝে মাঝে বই লইয়া বাবার অনুরোধে পড়িতে বসিতাম বটে; কিন্তু মন আমার অন্যত্র বেড়াইয়া বেড়াইত। বাবা আমার পাঠে অমনোযোগ দেখিয়া যদি কখনও কিছু বলিতেন, যাহারা নিকটে থাকিত, তাহারা বলিত, "এ মেয়ের বে' আটকাবে না—পড়াশুনো না হ'লেও না; যে দেখবে—আদর ক'রে নেবে।" এইরূপ প্রতিবাদে আমার স্বাভাবিক শৈথিল্য বিলক্ষণ প্রশ্রয় পাইত আর মনে হইত, আমার রূপরাশি সর্ব্বত্র জয়ী হইয়া সকলের সুখ্যাতি ও সহানুভূতি অর্জ্জন করিবে। পিতার ইচ্ছা ছিল, আমায় সুশিক্ষিতা করিয়া একটি সুপাত্রে সমর্পণ করেন। সমাজের অজস্র নিন্দাবাদ এবং কোন কোন বিষয়ে কথঞ্চিৎ নির্য্যাতন পর্য্যন্ত সহ্য করিয়াও তিনি এত দিন আমার বিবাহের উদ্যোগ করেন নাই। শেষে যখন দেখিলেন, কিছুতেই কিছু হইবার নহে, তখন "লক্ষ্মীর মত মেয়ে আমার, তাই বুঝি মা সরস্বতীর কৃপা হ'ল না"—বলিয়া এই শুষ্ক সান্ত্বনায় মনকে প্রবোধ দিয়া যত শীঘ্র সম্ভব আমায় পাত্রস্থা করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিলেন।

আর্থিক অবস্থা আমাদের মন্দ ছিল না; এ জন্য আমাদের প্রতিবাসীদের অনেকেরই নিদ্রার বেশ ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল। আবার যখন সংবাদ আসিল, দাদা এম-এ ও ল' ক্লাসে ভর্ত্তি হইয়াছেন, তখন তাঁহাদের গাত্র-দাহ অসহ্য হইয়া উঠিল। তবে এই অকথনীয় অথচ অসহনীয় মর্ম্ম-পীড়ার কথঞ্চিৎ উপশম অল্পদিনমধ্যেই হইয়াছিল। তাঁহাদের সমবেত যত্নে পর পর যখন তিন চারটি বিবাহের সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গেল, তখন তাঁহারা স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন। তবুও সম্বন্ধ আসিতে লাগিল—আশু পিতৃ-গৃহ-পরিত্যাগ-আশঙ্কায় প্রাণ আমার বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল।

সে দিন রাত্রিতে গাঢ় নিদ্রা আসিয়াছিল। হঠাৎ কথার শব্দে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। শুনিলাম, বাবা ও দাদাতে কথা হইতেছে—আমারই সম্বন্ধে। চুপ করিয়া শুনিতে লাগিলাম।

বাবা বলিতেছিলেন, "আমি দেখেছি মন্মথকে; দিব্যি ছেলেটি। এম্-এ পাশ করেছে—ডেপুটীগিরী পরীক্ষা দিবে শুনেছি। বেশ বাঞ্ছনীয় সম্বন্ধ—পণের জন্যও তেমন পীড়াপীড়ি নেই।"

দাদা বলিলেন, "তাই ত আমি অবাক্ হয়ে গেলুম, এই সম্বন্ধেও আপনার মত নেই শুনে—তাই তাড়াতাড়ি ছুটে এলুম।"

নিশীথ রজনীর স্তব্ধ নীরবতা ভেদ করিয়া একটা চাপা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনিতে পাইলাম। বাবা বলিলেন, "অমত কি সাধে হয় বাবা? তোমার কি বিশ্বাস হয়, এই এম্-এ পাশ ছেলে—যে হয় ত দু'দিন পরে এক জন হাকিম হবে—নিদেন একটা প্রফেসারের কায ত পাবেই, সে একটি নিরক্ষরা স্ত্রী নিয়ে ঘর ক'রে সুখী হবে? মন্মথের দাদা সে দিন প্রথমে পূর্ণকে দেখে খুবই খুসী হলেন; কিন্তু পরক্ষণেই যখন শুন্‌লেন, লেখা-পড়া খুব সামান্যই জানে, মুখখানি তখন একেবারে কালো হয়ে গেল।"

দাদা বলিলেন, "আমারও তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে। আমায় তিনি বল্লেন, তেমন ভাল লেখা-পড়া জানে না বটে, তবে একেবারে ত আর না জানে, এমন নয়? চলন-সই গোছ শিখিয়ে নিতে আর কত দিন লাগবে? বিশেষতঃ আমাদের বাড়ী ত আর তেমন কায-কর্ম্ম কত্তে হবে না—বেশ সময় পাবে শিখতে।"

আবার একটা চাপা নিশ্বাসের শব্দ শুনিতে পাইলাম। বাবা মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "তবেই হ'ল, লেখা-পড়া ছাড়া চল্‌বে না—আর যেটুকু জানে, তাতেও চল্‌বে না—তবে তাঁরা কিছু সময় দেবেন, এই যা। ওঁদের ধারণা, ওঁদের যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু শিখতে বেশী সময় লাগবে না; আর ওঁদের বিশ্বাস, আমি টোলের পণ্ডিত, স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষপাতী নই, তাই মেয়ের শিক্ষার জন্য তেমন যত্ন করি নি। ওঁদের এই অনুমান খুবই স্বাভাবিক সন্দেহ নেই; কিন্তু আমাদের যে দুরদৃষ্ট, তা ত ওঁরা জানেন না? মেয়ের আমার যেরূপ অমনোযোগ ও অবহেলা, আমাদের পর্য্যন্ত বিরক্তি ধ'রে যায়, অন্যে সহ্য করবে কেন? এই নিয়ে উভয়ের মধ্যে একটা মনোমালিন্য হওয়াও বিচিত্র নয়। বিবাহের যা মুখ্য উদ্দেশ্য, সেই মনোমিলনই যদি না হ'ল, তবে ঐশ্বর্য্যই বল, সৌন্দর্য্যই বল, পদগৌরবই বল—সব বৃথা নয় কি?"

দাদা বলিলেন, "তা হ'লে শিক্ষিত বরের আশা

একেবারে ছেড়ে দিতে হয়। উচ্চ ইংরেজী-শিক্ষাপ্রাপ্ত কোন ছেলেরই এইটুকু লেখা-পড়ায় মন উঠবে না।"

বাবা খানিক স্তব্ধভাবে থাকিয়া বলিলেন, "যেখানে লেখা-পড়ার জন্য তত বেশী পীড়াপীড়ি নেই, অথচ খেতে-পরতে কোনরূপ কষ্ট হবে না, এমন কোন মধ্যবিত্ত ঘরের দুটো একটা পাশ-করা সচ্চরিত্র বুদ্ধিমান্ ছেলের সন্ধান করা যাক্।"

দাদা বলিলেন, "সেই ভাল।"

বাবা বলিলেন, "আমি ওর কর পরীক্ষা ক'রে দেখলুম, বেশ বিদ্যা হওয়ার কথা, মেধাও বেশ আছে দেখতে পাচ্ছি, তবু কেন যে এরূপ হচ্ছে, কিছুই বুঝতে পাচ্ছি নি।"

আলোচনা বন্ধ হইল। বোধ হয়, তাঁহারা ঘুমাইয়া পড়িলেন। আমার কিন্তু আর ঘুম আসিল না। আমার রূপ-গর্ব্বে এই প্রথম আঘাত লাগিল।

### ৪

আমি স্বামি-গৃহে। "কন্যা বরয়তে রূপং" যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমার কোন ক্ষোভের কারণ ছিল না, পূর্ব্বেই সে কথা বলিয়াছি। পিতাও মনোমত জামাতা পাইয়াছিলেন। দুইটি পরীক্ষা পাশ করিবার পরই তাঁহাকে কলেজ ছাড়িতে হইয়াছিল। হঠাৎ পিতৃবিয়োগ বশতঃ জমীজমার তত্ত্বাবধানের জন্য বাধ্য হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্রব তাঁহাকে ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। সংসারের ভার লইবার অন্য কোন পুরুষ ছিল না। বাড়ীটি বেশ বড়-সড়—চারিদিকে নানা রকম ফল ও ফুলের বাগান; তরি-তরকারি প্রচুর হইত। পুকুরভরা মাছ, গোয়ালে দুগ্ধবতী গাভী। এক কথায় বলিতে গেলে, সংসারের প্রয়োজনীয় দ্রব্যজাত বড় একটা কিনিতে হইত না। কিন্তু তত্ত্বাবধানের প্রয়োজন। এক শ্বশ্রূমাতা সকল দিক্ সামলাইতে পারিতেন না।

উনি গ্রামের উচ্চ ইংরাজী স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন। দক্ষিণা বার্ষিক ৫ শত টাকা। ইহা ছাড়া মাসে আরও দশটি টাকা গৃহশিক্ষকতা করিয়া উপার্জ্জন করিতেন। এই টাকার একটি কপর্দ্দকও সংসারে ব্যয়িত হইত না; প্রয়োজনও ছিল না। তবু না কি একটি পয়সাও সঞ্চিত থাকিত না। পুস্তক ক্রয়ে সমস্ত অর্থ ব্যয়িত হইত। ওঁর পড়ার ঘরটি একটি ছোট-খাট পুঁথির দোকান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রথম যে দিন ঐ ঘরটি আমার চোখে পড়িল, কেন যেন আমার প্রাণটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। পিতা এই অর্দ্ধশিক্ষিত, বিষয়-বুদ্ধি-বিশিষ্ট, আড়ম্বরহীন সাদাসিধে অথচ শিষ্ট, শান্ত ও বুদ্ধিমান্ জামাতা পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইয়াছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, সহর হইতে বহু দূরবর্ত্তী পল্লীগ্রামের এক নিভৃত কোণে অবস্থিত এই কৃষিজীবীর গৃহে শিক্ষার আলোক তেমনভাবে প্রবেশ করে নাই। সুতরাং অশিক্ষিতা কন্যা এখানে বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিবে। বিবাহের পূর্ব্বে এই পুস্তকাগারটি যদি তাঁহার চোখে পড়িত, সম্ভবতঃ এ বিবাহ হইত না। কিন্তু "নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে?"

মাষ্টার বাবু স্কুলের ন্যায় বাড়ীতেও গুরুমহাশয়গিরী আরম্ভ করিলেন। কিছু দিন গেল, কিন্তু বিশেষ কোন ফলোদয় হইল না। অবশেষে গৃহ-শিক্ষকতা ছাড়িয়া দিয়া এই অনাবিষ্টা ছাত্রীটির প্রতি গভীর আগ্রহে মনোযোগ প্রদান করিলেন, ছাত্রী অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল।

এই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা সম্বন্ধে ওঁর সুদীর্ঘ বক্তৃতা শুনিয়া একটু বিরক্তভাবে আমি হঠাৎ বলিয়া ফেলিলাম, "ভাগ্যিস্, সবে দুটি পাশ, তিন চারটে হ'লে না জানি"—এইটু বলিতেই উনি বাধা দিয়া বলিলেন, "বটে, চারটে পাশ হ'লে বুঝি পড়া-শুনো করতে?"

সমান ওজনে আমিও বলিলাম, "করতুম বই কি?"

"আচ্ছা, মনে থাকে যেন" বলিয়া উনি ঘর হইতে চলিয়া গেলেন।

এই ঘটনার কয়েক মাস পরে এক দিন একখানি সংবাদ-পত্র আনিয়া আমার কোলের উপর ছুড়িয়া দিয়া বলিলেন, "তুমি শুনে সুখী হবে কি দুঃখিত হবে বলতে পারি নে, আমি আরও তিনটে পরীক্ষায় পাশ হয়েছি।" সত্যই তিনটি যায়গায় ওঁর নাম দেখিলাম—লাল পেন্সিলে দাগ দেওয়া—মনোবিজ্ঞানে অনার সমেত বি-এ আর সংস্কৃত কাব্য ও বেদান্তের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদিগের তালিকার শীর্ষস্থানে। আমার যেন প্রথমে স্বপ্ন বলিয়া মনে হইল—অবাক্ বিস্ময়ে তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম—তাঁহার আননে, নয়নে যেন এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিয়াছে। মাথাটি আপনা হইতেই তাঁহার চরণতলে লুণ্ঠিত হইল। "থাক, থাক, সাতটি বৎসরের পরিশ্রমের ফল—

পূর্ণ! সাতটি বৎসরের অক্লান্ত সাধনার—হাড়ভাঙ্গা খাটুনির এই পুরস্কার!"

"তুমি কখন্ পরীক্ষা দিলে? একবারে তিন তিনটে পরীক্ষা দিলে—এর বিন্দু-বিসর্গও আমরা জান্তে পাল্লুম না?"

"কাকেও কিছু বলি নি। কেউ জান্ত না—যদি ফেল হতুম। এরূপ ফল যে হবে, আমি কল্পনাও করি নি। এই বেলা, পূর্ণ! এইবার আমার কথা রাখবে?"

এতক্ষণ আত্ম-বিস্মৃত ছিলাম—আনন্দে; তাঁহার এই কথায় আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলাম। কি দুর্ভাগ্য! এমন স্বামীর মনোরঞ্জন করিতে পারিলাম না! মাথা তুলিতেই প্রাচীর-বিলম্বিত আয়নায় এই পোড়ারমুখের প্রতিবিম্ব দেখিয়া মনে হইল, একটু হাসি, একটি মিষ্ট কথাই যথেষ্ট নহে কি? আমি ত ওঁকে ওঁর লেখাপড়া ছাড়াও প্রাণ ভরিয়া ভালবাসি—উনি কেন পড়াশুনার জন্য মিছামিছি আমাকে কষ্ট দেন! লেখাপড়া করা যে আমার পক্ষে কতখানি কষ্টকর, তাহা বুঝেন না কেন?

আমায় নীরব দেখিয়া উনি আবার বলিলেন, "এইবার পড়া-শুনো করবে ত, পূর্ণ?" যাচক যেমন অতি দীনভাবে অনুগ্রাহকের প্রতিশ্রুতি স্মরণ করাইয়া দেয়, ভয়ে-সঙ্কোচে জড়সড় হইয়া, সেইরূপ কোমল ও করুণস্বরে আমায় এই কথাটি বলিয়া উদগ্রীবভাবে আমার মুখের পানে তিনি চাহিয়া রহিলেন। সেই মর্ম্ম-স্পর্শী দৃষ্টিতে তাঁহার অন্তরের আকুল ঔৎসুক্য ফুটিয়া উঠিল। কি উত্তর দিব? তাঁহার মনোমত উত্তর দিবার সাধ্য আমার আছে কি? বাধ্য হইয়া শাঠ্যের আশ্রয় লইলাম। নত নেত্রে চাহিয়া গম্ভীরভাবে বলিলাম—"চারটে পাশ হ'ল কোথা?

"চারটে কেন—পাঁচটা হ'ল?"

"ও—ওই সংস্কেত পরীক্ষা? ওর মূল্য কি?"

এই অপ্রত্যাশিত নিষ্ঠুর উপহাসে উনি যেন হঠাৎ সর্পদষ্টের মত চমকিত হইয়া উঠিলেন। বড় দুঃখে, বড় ক্ষোভে বলিলেন, "কেন তোমার পি—" যাহা বলিতে যাইতেছিলেন, তাহা বলিলে খুবই উচিত উত্তর হইত সন্দেহ নাই। তবে, না বলাই মহত্ত্ব—না বলাই পুণ্য! উনি সেই পুণ্য-সঞ্চয় করিলেন। আর অভাগী আমি অপরাধিনীর মত অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

"আচ্ছা, এম্-এ পাশ কল্লে কথা রাখবে ত?" বলিয়াই উনি একখানি চিঠি লিখিতে বসিলেন। লিখিতে লিখিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার দাদা কি নিয়েছিলেন এম্-এতে জান?"

"ইংরেজী—ইংরেজী ব'লেই যেন মনে হয়।"

"ইংরেজী?—আচ্ছা।" এই বলিয়া অর্দ্ধলিখিত পত্রখানি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া আর একখানি লিখিতে আরম্ভ করিলেন।

"কোথা চিঠি লিখছ?"

"বইয়ের দোকানে; এম্-এ পড়ব, তাই বইয়ের অর্ডার দিলুম।"

"যেখানা ছিঁড়ে ফেল্লে, সেখানা কোথা লিখেছিলে?"

"ওখানাও বইয়ের দোকানেই লিখেছিলুম; আগে মনে করেছিলুম সংস্কৃত নেব।"

"তার পর মত বদ্লে গেল?"

"হাঁ, ইংরেজীই নেব স্থির কল্লুম। খাটুনি একটু বেশী হবে, সে কি করব?"

"ইংরেজী নিলে কেন? দাদা নিয়েছেন ব'লে?"

"কতকটা সে জন্যও বল্তে পার—তা ছাড়া, ঐ 'সংস্কেত' যদি ধর্ত্তব্যের মধ্যে না হয়—সেই ভয়ে।"

## ৫

বাবা যখন শুনিলেন, তাঁহার জামাতা একসঙ্গে তিনটি পরীক্ষা পাশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে দুইটা সংস্কৃতের—তাঁহার অতি প্রিয় অতি আদরের দুইটি বিষয়ের, তখন তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। সেবার আবার তিনিই এই দুটি বিষয়ের প্রধান পরীক্ষক ছিলেন।

এক দিন তিনি কতকগুলি খাতা লইয়া আমাদের বাড়ী উপস্থিত হইলেন। বলা বাহুল্য, এইগুলি কাব্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের পরীক্ষার খাতা। প্রথমতঃ আলাপ হইল, যে সব স্থানে ভ্রম-প্রমাদ ছিল, সে সব লইয়া; তার পর নানারূপ শাস্ত্রচর্চ্চা এবং কোন কোন কবি ও কাব্যের সমালোচনা চলিল। শ্বশুর-জামাতার সে দিনের আনন্দ দেখিয়া এইরূপ আনন্দ উপভোগের যোগ্যতা অর্জ্জন করিবার আকাঙ্ক্ষা আমার প্রাণেও জাগিয়া উঠিল!

কথাপ্রসঙ্গে উনি পিতার নিকট বলিলেন, "আমি ওঁর অধ্যয়নের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছি।" পিতার বুঝিতে

কিছু বাকী রহিল না। তিনি আমাকেই দোষী মনে করিয়া আমার আলস্য ও ঔদাসীন্যের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন; আর "এখনও সময় আছে, এখনও সাবধান হ'লে সব বজায় থাকে, তা নইলে পরিণাম অশুভ হ'তে পারে," এই বলিয়া একটি সুগভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। পিতার এই উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস আগুনের শিখার মত আমার অন্তস্তল দগ্ধ করিল। পর-মুহূর্ত্তেই যখন তিনি আবার বলিলেন যে, ওঁর ইচ্ছে নয়, আমি ওঁর কাছে থাকি---আমি বজ্রাহতের ন্যায় নির্ব্বাক্, নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম! আমার রূপ-দর্পে এই দ্বিতীয় আঘাত! ইহা পূর্ব্বাপেক্ষা কঠোর হইলেও আমার দারুণ অভিমানের বিন্দুমাত্র খর্ব্বতা-সম্পাদনেও সমর্থ হইল না। আমি ঐ দিনই পিতৃ-গৃহে যাইব প্রতিজ্ঞা করিলাম।

তাঁহার কাছে বিদায় লইবার সময় কেন যেন হঠাৎ আমার সেই আজন্ম-দুঃখিনী রাজরাণী হইয়াও ভিখারিণী, পূর্ণ-গর্ভবতী জনক-নন্দিনীর কথা—তাঁহার সেই করুণ নির্ব্বাসন-বৃত্তান্তটি মনে পড়িল, আর সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল! এই সময় আমাকে স্থানান্তরিত করা শ্বশ্রূমাতার সম্পূর্ণ অমত ছিল, পিতারও আমাকে বাড়ী লইবার জন্য তত মত ছিল না। কারণ, আমি মাতৃহীনা। কেবল আমারই ঐকান্তিক আগ্রহে তিনি সম্মত হইলেন---মা-ও আর আপত্তি করিলেন না।

* * * *

পরে সংবাদ পাইলাম, আমি চলিয়া আসিবার পরই মাকে কাশীধামে পাঠাইয়া দিয়াছেন। জমীগুলি প্রজার হাতে দিয়া কায-কর্ম্ম কমাইয়া এক বেলা স্বপাক ভাতে-ভাত রাঁধিয়া তিনি দিনরাত কেবল পড়াশুনা লইয়াই ব্যস্ত আছেন। এক একবার খুবই কষ্ট হইত, আবার যখন মনে করিতাম, শুদ্ধ একটা খেয়ালের জন্য এই কষ্ট নিজে পাইতেছেন এবং আমাকেও দিতেছেন, তখন মনকে আশ্বাস দিতাম, কত দিন আর এই ভাবে চলিবে? পড়াশুনা ছাড়িতে হইবে। কিন্তু তাহা হইল না—পড়াশুনা তিনি ছাড়িলেন না। স্নেহ-মমতা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, স্বাস্থ্য সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া অনন্য-চিত্তে বিদ্যাদেবীর অর্চ্চনায় নিযুক্ত হইলেন। বাবার মুখে যখন শুনিতাম, (তিনি প্রায়ই ওঁর সংবাদ লইতেন) কি অধ্যবসায়, কি একাগ্রতা, কি কষ্ট সহিষ্ণুতা ওঁর---তখন আমার চক্ষু বাষ্পভারে দৃষ্টিশূন্য হইত, তবু আমার অধ্যয়নে বিন্দুমাত্র প্রবৃত্তি হইত না।

আমার কাছে তিনি পত্র লেখা বন্ধ করিয়াছিলেন। আমি প্রথমে একখানি লিখিয়াছিলাম, উত্তর পাই নাই। খোকাকেও একবার দেখিয়া গেলেন না! বাবার ইচ্ছা ছিল, আমি শ্বশুরবাড়ী ফিরিয়া যাই, কিন্তু উপযাচিকা হইয়া যাইবার পথে অভিমান বাধা দিল। আমার এত কষ্টের, এত যত্নের, এত সাধের, এত আদরের পত্রখানি---ক'খানা লিখিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া তবে একখানা খাড়া করিয়াছিলাম, হউক না ভ্রমপূর্ণ, হউক না দুষ্পাঠ্য, রচনার পারিপাট্যই কি কেবল দেখিবার? হৃদয়ের ভাব কি কিছুই নয়? আমার সেই চিঠিখানির উত্তর দিলেন না! আমার বড় দুঃখ—বড় রাগ হইল! আর একটি কথা, ভাবিলাম, উনি ত বই লইয়াই ব্যস্ত থাকিবেন, আমাকে হয় ত ওঁর কৃপা-প্রতীক্ষায় তীর্থের কাকের মত দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে, সে আমি পারিব না। কখনই নয়।

* * * *

দেখিতে দেখিতে দুই বৎসর চলিয়া গেল—পরীক্ষাও শেষ হইল; কিন্তু উনি আসিলেন না। দাদার বিবাহের সময়ও কত করিয়া লেখা হইয়াছিল, তবুও আইসেন নাই। শুনিলাম, বিবাহ-সভায় না কি একবার হাজিরা দিয়া আসিয়াছিলেন। এখানে আসেন নাই---আমার ভয়ে?

* * * *

খোকা বেশ বড়-সড় হইয়াছে---হাঁটিতে, কথা কহিতে পারে। একবার দেখিতে ইচ্ছাও হয় না? কি নিষ্ঠুর! আপন মনে নিরালায় বসিয়া ভাবিতেছি, এমন সময় দাদার তার পাইলাম, ওঁর পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে। এবারও উনি প্রথম হইয়াছেন। বাবা চাদরখানি কাঁধে ফেলিয়া ওঁকে সংবাদ দিতে গেলেন। ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, উনি বাড়ী নাই, কাশী গিয়াছেন। 'মা' নাকি ছেলের আবার বিবাহ দিবার উদ্যোগ করিতেছেন। এই আঘাতটি (এইটি তৃতীয়) আমায় একেবারে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল। আমার ইচ্ছা হইল---কিন্তু শুদ্ধ খোকার মুখের দিকে চাহিয়া নিরস্ত হইলাম। তিন চারি দিন পরে উনি 'তার' করিলেন, মা খোকাকে দেখিতে

চাহিয়াছেন। ৫০টি টাকাও সেই সঙ্গে পাথেয় বাবদ আসিয়াছিল; তবে বিবাহের সংবাদ সত্য নহে?

## ৬

বাবা বিশ্বেশ্বরের চরণতলে উপস্থিত হইলাম। দাদা সঙ্গে আসিয়াছিলেন। মা খোকাকে দেখিয়া অত্যন্ত খুসী হইলেন। সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, “গেন্দুর আমার শৈশব ফিরে এসেছে।”

ওঁর কাছে যাইবার সময় আমার পা কাঁপিয়া উঠিল। বাবা বিশ্বনাথের পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া ওঁকে প্রণাম করিলাম।

“আমার পরীক্ষার ফল জান্‌তে পেরেছ বোধ হয়?”

“পেরেছি।”

“শুনে তুমি সুখী হবে না মনে ক’রে তোমায় লিখিনি।”

“তা তুমি যা ভাল মনে করেছ, তাই করেছ, এতে আর আমি কি বলব?”

“বেশ, আমি যা ভাল মনে করেছি, তাই করেছি, এখন তুমি যা ভাল মনে কর, করতে পার।”

“কোন্ বিষয়ে?”

“কোন্ বিষয়ে? তা তোমায় মনে ক’রে দিতে হবে—কোন্ বিষয়ে?”

“ও—তা দেখ, ঐ কথা ছাড়া কি আর তোমার কথা নেই? দু’টি বৎসর পর দেখা হ’ল, একবার জিজ্ঞেস করলে না, কেমন আছি, কেমন ছিলুম?”

“সব শুনেছি ত তোমার দাদার কাছে, তুমিও সব শুনেছ মা’র কাছে। নূতন ক’রে আর কি জিজ্ঞেস করব?”

“তা বটে, ওরূপ প্রত্যাশা করাই আমার অন্যায় হয়েছে।”

“এখন আসল কথার কি বল? দুই বছর খাটালে, এখন পারিশ্রমিকের বেলা বাজে কথা ব’লে ভাঁড়ালে চলবে কেন?”

“এইগুলো সব বাজে কথা?”

এই সময় খোকা ছুটিয়া আসিয়া আমার আঁচল ধরিয়া দাঁড়াইল।

“এই নাও পারিশ্রমিক” বলিয়া খোকাকে ওঁর কোলে তুলিয়া দিলাম। খোকা রহিল না, তাহার কাঁদ-কাঁদ মুখ দেখিয়া ছাড়িয়া দিলাম। সে দৌড়িয়া মা’র কাছে চলিয়া গেল। আমি বলিলাম, “ঐ গম্ভীর মুখ দেখে আমার ভয় করে—ও ছেলেমানুষ ভয় পাবে না?”

আশা করিয়াছিলাম, একটি সরস অথচ উচিত উত্তর পাইব। কিন্তু উনি কথাটা কানেও তুলিলেন না।

“এখন তোমার অভিপ্রায় কি, খুলে বল।”

আমার বলিবার কিছুই ছিল না। হঠাৎ যেন মুখে আসিল, “দেখ, কালিদাস শুনেছি স্ত্রীর প্ররোচনায় লেখাপড়া শিখে মস্ত পণ্ডিত হয়েছিলেন, তুমিও—”

বাধা দিয়া উনি বলিলেন, “উপমাটা খাটল না। অত মূর্খ আমি ছিলুম না,—কালিদাস প্রথম যেমন ছিলেন। আর তোমার কথায়, বড় জোর একটা পরীক্ষা দিইছি—বল্‌তে পার। তা এই পরীক্ষা আমি দিতুমই—তুমি বল্‌লেও দিতুম, না বল্‌লেও দিতুম। কথাটা বরং এক ভাবে কতকটা খাটে—তুমি যদি স্বামীর অনুরোধে লেখাপড়া শেখ, কালিদাস যেমন স্ত্রীর তাড়নায় শিখেছিলেন। বল, এখন তুমি তা করবে কি না?”

“স্ত্রীলোকের লেখাপড়া শেখার কি দরকার?” বোধ হয়, একটু উচ্চ স্বরেই আমি এই কথাটা বলিয়াছিলাম। সম্ভবতঃ কণ্ঠস্বরে একটু বিরক্তির আভাসও ছিল। উনিও একটু রুক্ষস্বরেই বলিলেন, “সত্যানন্দ সার্ব্বভৌমের মেয়েকেও বুঝিয়ে দিতে হবে এর কি প্রয়োজন?” পিতার নাম করিয়া এই শ্লেষটি করায় আমার প্রাণে বড় আঘাত লাগিল। তবু আমি বেশ দৃঢ় ভাবেই বলিলাম, “দেখ, কথা হচ্ছে তোমায় আমায়, এর ভিতর বাপ-মাকে টেনে আন্‌ছ কেন?”

“সে কি! তোমার পিতাকে আমি কি বল্লুম? দেবতুল্য ব্যক্তি তিনি, আমার পিতৃস্থানীয়, আমি কি তাঁর প্রতি কোন অবজ্ঞাসূচক বাক্য প্রয়োগ করেছি? একটা সামান্য কথার মর্ম্ম গ্রহণ করবার যোগ্যতাটুকুও তোমার নেই? এই স্বর্ণাবরণের নীচে কি ভগবান্ একরাশ ভস্ম পূরে রেখেছিলেন?” তিনি দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন।

তিনি চারিদিন পরে একখানি টেলিগ্রাম হাতে করিয়া আমায় বলিলেন, “আমি আজ এলাহাবাদ যাচ্ছি, সেখানকার কলেজে একটি কায খালি আছে, প্রিন্সিপ্যাল তার করেছেন, তাঁ’র সঙ্গে দেখা করতে। মা-ও যাচ্ছেন আমার সঙ্গে—এই সুযোগে প্রয়াগটা দেখে আসবেন।”

এই কথাটা যেন কেমন কেমন বোধ হইল। কেন যেন একটু সন্দেহ—একটু শঙ্কাও হইল। কিন্তু সে সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কবে ফিরবে?"

"যে দিন তোমার চিঠি পাব।"

বুঝিতে পারিলাম, আমার আশঙ্কা অমূলক নহে। বলিলাম, "যদি চিঠি না পাও?"

"তবে আমার যে দিন খুসী" বলিয়া উনি অধোমুখ হইলেন। আমিও "আচ্ছা" বলিয়া সেখান হইতে চলিয়া আসিলাম। আমার যেন মনে হইল, কে আমার পশ্চাতে আসিতেছে। ইচ্ছা হইল ফিরিয়া দেখি, কিন্তু আমার কাঁধের ভূতটি বলিল, "ভয় কি, খোকাকে যখন একবার দেখেছেন, আর কি ছেড়ে থাকতে পারবেন?"

কয়েক দিবস প্রতীক্ষায় রহিলাম। কিন্তু তাঁহারা ফিরিলেন না। দাদা পত্র লিখিলেন, কোন উত্তর আসিল না। আমাকে একা কাশীর বাড়ীতে রাখিয়া যাওয়া সঙ্গত নহে অথচ তিনিও আর বিলম্ব করিতে পারেন না। কাযেই বাধ্য হইয়া দাদার সঙ্গে পিত্রালয়ে আবার ফিরিয়া আসিলাম।

* * * *

এক বৎসর পরে তাঁহার একখানি পত্র পাইলাম—এই তাঁহার প্রথম পত্র।

"পূর্ণ,

মাতাঠাকুরাণী আর ইহজগতে নাই। আমি আর ঘরে ফিরিব না। সম্ভবতঃ তোমার সঙ্গে আর আমার সাক্ষাৎ হইবে না। আমার যাহা কিছু আছে, তোমরা যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পার।

জ্ঞানেন্দ্র।"

এইবার আমার আশার সমাধি হইল। সেই দিনই কাশী যাইব স্থির করিলাম, কিন্তু দাদা বলিলেন, সেখানে তাঁহার দেখা পাইব না। আমার চোখে পড়ে নাই, পত্রের শেষভাগে লেখা ছিল, "পুনশ্চ;—আমি অদ্যই স্থানান্তরে চলিলাম, পত্রের উত্তর দিলেও পাইব না।" কাযেই কাশী যাওয়া হইল না। পর-বৎসরে বাবাও আমাদের ছাড়িয়া গেলেন। দাদা বৌদিদিকে লইয়া কর্ম্মস্থানে গেলেন, আমি তাঁহার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও তাঁহার সঙ্গে না গিয়া স্বামিগৃহেই আশ্রয় লইলাম।

### ৭

দেখিতে দেখিতে ১২ বৎসর কাটিয়া গেল। দ্বাদশ বর্ষ যে অতীত হইয়াছে, আমাদের এক জন পরম হিতৈষী প্রতিবাসী একান্ত অযাচিতভাবে তাহা স্মরণ করাইয়া দিলেন, পাছে আমাদের তদানীন্তন কর্ত্তব্যের কোনরূপ ত্রুটি হয় এবং আমরা ধর্ম্মে পতিত হই, সেই জন্য।

আজকাল করিয়া আরও ৫।৬ বৎসর চলিয়া গেল, উনি আসিলেন না, কোন সংবাদও দিলেন না। সমাজপতিগণের উপদেশ তখন আদেশরূপে পরিণত হইল। তাহাতেও আমাদের ঔদাসীন্য দেখিয়া গ্রাম্য দেবতারা নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন, আমাদের উপর ছোটখাট রকমের দৌরাত্ম্য আরম্ভ হইল, কাযেই আমরা গ্রাম ছাড়িয়া যাইব স্থির করিলাম।

আমি অনেক দিন হইতেই নিরামিষ ধরিয়াছিলাম, তাই আমাদের পাড়ার মোড়লরা কথঞ্চিৎ শান্ত ছিলেন।

আমরা চলিয়া যাইতেছি শুনিয়া তাঁহাদের জন কয়েক মিলিয়া একটি মীমাংসার প্রস্তাব করিলেন, শুনিয়া আমার শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ বহিতে লাগিল; আমি স্পষ্ট বলিলাম, "তা হবে না, তা আমি পারব না।" আমি জানিতাম—আমার মন বলিত, আমার স্বামী জীবিত আছেন। খোকাও শুনিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া আমাকে দাদার কাছে রাখিয়া আসিল।

### ৮

খোকা (কেশব) এখন উকীল। হাইকোর্টে যাইতেছে, কিছু কিছু উপার্জ্জনও করিতেছে। আমরা কলিকাতায় আছি। উনি ফিরেন নাই, কোন পত্রও দেন নাই। কেশব অনেক অনুসন্ধান করিয়াও কোন সংবাদ পায় নাই।

* * * * *

হঠাৎ এক দিন কেশব আমার গলা ধরিয়া বলিল, "আমার একটা কথা রাখবে, মা?"

বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করিয়া আমি বলিলাম, "তোর কথা আমি রাখব না, বাবা? এর জন্য এত কাকুতি কেন?"

"শুধু কাকুতি নয় মা, আমার মাথার দিব্য।" শরীর ও মন শিহরিয়া উঠিল, তাহার মুখে হাত চাপা দিয়া আমি বলিলাম, "ছি বাবা, অমন ক'রে বলতে আছে? বল, তোর কি কথা, আমি নিশ্চয়ই রাখব।"

"তোমায় লেখা-পড়া শিখতে হবে।"

বজ্রাহতের ন্যায় আমি স্তব্ধ হইলাম; আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় মুহূর্ত্তে নিশ্চল হইয়া গেল।

আমার দুরদৃষ্টের প্রকৃত কারণ দাদা ও বাবা ছাড়া আর কেহ জানিত না বলিয়াই আমার ধারণা ছিল। সে জন্য মর্ম্মান্তিক দুঃখের মধ্যেও আমার প্রাণে একটু শান্তি ছিল। আমার আত্মীয়-স্বজন আর প্রতিবাসীদের মধ্যে এক এক জন এক একটি কারণ অনুমান করিয়া কেবল নিজ নিজ মস্তিষ্কের উর্ব্বরতা-শক্তির পরিচয় দিত; আমি কিছু বলিতাম না। আমার বিশ্বাস ছিল, কেশব প্রকৃত কারণের বিন্দু-বিসর্গও জানে না। প্রাণে আমার দৃঢ় সংকল্প ছিল, উহাকে কিছু জানিতে দিবও না। তাই এই ভীষণ আগ্নেয় গিরি বুকে করিয়াও আমি যথাসাধ্য হাসিয়া কথা বলিতাম। উহার মনে যাহাতে কোনরূপ সন্দেহ না আসিতে পারে, সে বিষয়ে সবিশেষ সাবধান ছিলাম। আজ সব শেষ হইল। কেশবের একটি কথায় ধিক্কারে সমগ্র অন্তর পূর্ণ হইয়া গেল। প্রাণভরা একটা ক্রন্দন বুকের পঞ্জর ভাঙ্গিয়া বাহিরে আসিতে চাহিল। অনেক চিন্তার পর সঙ্কল্প স্থির করিলাম।

* * * * *

'অর্ঘ্য'—আমার প্রথম কবিতা—একটি মাসিকে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু আমি জানিতে পারিলাম না, আমার এই সাধের অর্ঘ্য—আমার সবটুকু শক্তি-সামর্থ্য, বিদ্যা-বুদ্ধি, ভক্তি-শ্রদ্ধা, স্নেহ-মমতা, ব্যথা-বেদনা, আশা-ভরসা, আদর-যত্ন দিয়া রচিত এই অর্ঘ্য যাঁহার চরণোদ্দেশে নিবেদিত হইয়াছিল—আমার সেই আরাধ্য দেবের পাদ-পদ্মে পৌঁছিল কি না?

* * * * *

এক দিন কোন একটি মাসিক পত্রে একটি সুন্দর সুচিন্তিত দার্শনিক প্রবন্ধ পড়িলাম। আমার যেন মনে হইল, ইহার কোন কোন কথা আমি কোথায় শুনিয়াছি। লেখকের নাম নাই, স্বাক্ষর "জনৈক সন্ন্যাসী।" এই সন্ন্যাসীর সন্ধান লইবার জন্য কেশবকে বলিবামাত্র সে বলিল যে, একখানি ইংরাজী মাসিকেও প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মনোবিজ্ঞানের তুলনা-সংবলিত একটি সুলিখিত প্রবন্ধ প্রতি মাসে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইতেছে। উহারও লেখক এক জন সন্ন্যাসী। এই উভয় প্রবন্ধের যে একই রচয়িতা, সে বিষয়ে কেশবের মনে আর কোনও সন্দেহ রহিল না। কিন্তু কত চেষ্টা হইল, তথাপি সেই প্রচ্ছন্ননামা সন্ন্যাসীর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

## ৯

আমি এখন কাশীতে আছি। জীবনের শেষ কয় দিন কাশীতেই থাকিব মনে করিয়াছি, এখানে আমাদের একখানি বাড়ী হইয়াছে। উপরে আমি এবং আমার একটি দূর-সম্পর্কীয়া পিতৃষ্বসা, একটি দাসী ও একটি পাচিকাও আছে। কেশবের জিদ, পাচিকা রাখিতেই হইবে। নীচে দুইটি ব্রাহ্মণ-পরিবার—ভাড়া দিয়া এক প্রকার স্থায়িভাবেই আছেন।

বাড়ীর সম্মুখেই সরকারী বড় রাস্তা। রাস্তার ও-পারে একটি সাধুর আশ্রম। বড় সুন্দর, বড় মনোহর, এ আশ্রমটি বেশ পরিষ্কৃত, পরিচ্ছন্ন এবং পবিত্র বলিয়া মনে হয়। নানা রকম ফুলের গাছে ঘেরা ছোট একটি একতলা ঘর। আশ্রমে প্রত্যহই বেদ-গান হইত। ভাড়াটেরা প্রায়ই শুনিতে যাইতেন। তাঁহাদের কাছে শুনিতাম, বহু লোক এখানে বেদাধ্যয়ন করিতেছে। এরূপ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ না কি কাশীতে অতি অল্পই আছেন। এক বৃদ্ধা বলিলেন, "সাধুকে দেখিলেই মনে ভক্তির উদ্রেক হয়। যেমন কাঁচা সোনার মত বর্ণ, তেমনই দেবতার মত চেহারা। লোক বলে, দু'শ বৎসর বয়স। দেখে কিন্তু মনে হয় ত্রিশ পেরোয় নি।" স্বামীজীকে দেখিবার আগ্রহ সত্ত্বেও আমার যাওয়া হয় নাই; কারণ, সেখানে যেরূপ ভীড় হইত, তাহাতে আমার যাওয়ার বিশেষ সুবিধা হইত না।

## ১০

কেশব পূজার বন্ধে কাশী আসিয়াছে, সে স্বামীজীর কাছে বেদ পড়িতেছে। স্বামীজী না কি কেশবের মেধা ও শিক্ষার আগ্রহ দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছেন। তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে একমাত্র কেশবই গৃহী। আমি স্বামীজীকে দেখিবার আগ্রহ প্রকাশ করায় কেশব বলিয়াছিল যে, সে এক দিন তাঁহাকে বাড়ীতে আনিবার চেষ্টা করিবে। আজ সাধু আমাদের বাড়ী পায়ের ধূলা দিবেন স্বীকার করিয়াছেন।

কেশবের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছে। কারণ, তিনি কাহারও বাড়ী যাইতেন না, কত রাজা, কত জমীদার কত কাকুতি-মিনতি করিয়াছেন—তাঁহাকে গৃহে লইতে পারেন নাই।

তিনি আসিলেন। বাড়ীতে প্রবেশ করিবার সময় তাঁহাকে বারান্দায় দাঁড়াইয়া দেখিলাম, সর্ব্বাঙ্গ ভস্মাচ্ছাদিত, মাথায় সুদীর্ঘ জটাজুট—আবক্ষোবিলম্বিত শ্মশ্রু—পরিধানে নাভি হইতে জানু পর্য্যন্ত গৈরিক বস্ত্র; গলায় রুদ্রাক্ষ-মালা।

* * * * *

কেশব আমার কম্পিত হস্ত শক্ত করিয়া ধরিয়া আমায় স্বামীজীর কাছে লইয়া গেল। তাঁহার দিকে চাহিলাম—সহসা চারি দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। মনে হইল, আকাশ ঘুরিতেছে, পৃথিবী টলিতেছে, পা যেন সরিয়া যাইতেছে। তার পর কি হইল, জানি না। যখন জ্ঞান হইল, দেখিলাম, একটি মাদুরে শুইয়া আছি, মেঝের উপর খোকা আমার শুশ্রূষা করিতেছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কতক্ষণ এই ভাবে আছি?"

"বেশী নয়, দশ বারো মিনিট" বলিয়া কেশব চলিয়া গেল।

তিনি আবার আসিলেন। সে দিনও পূর্ণিমা ছিল, জ্যোৎস্নায় ঘর ভরিয়া গিয়াছিল। আমার সেই ফুল-শয্যার রাত্রির কথা মনে পড়িল। সেই দিনের মতই ধীরে ধীরে আসিয়া তিনি শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইলেন, সেই দিনের মতই সসঙ্কোচে আগে কথা কহিলেন। আমার চক্ষু মুদ্রিত, কণ্ঠ রুদ্ধপ্রায়।

তিনি মৃদু অথচ গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "তুমি বেশ লেখা-পড়া শিখেছ, আমি জান্‌তে পেরেছি; তোমার কবিতা, তোমার প্রবন্ধ আমি পড়েছি, পড়েই তোমায় চিনেছি। তার পূর্ব্বেই আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলুম, তা নৈলে—"

"কথা শেষ হইল না। আমার যেন মনে হইল, তাঁহার কণ্ঠ-স্বরে ঈষৎ স্পন্দনবেগ অনুভূত হইতেছে।

তখন আমার অবসাদ অন্তর্হিত হইয়াছে। পূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার পানে চাহিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলাম, "তা নৈলে কি?"

কোনও উত্তর নাই। তখন আমিই আবার বলিলাম, "দেখ, ত্রিশ বৎসর কাঁদিয়েছ, এতেও কি আমার শাস্তি হয় নি? যদি না হয়ে থাকে, আমায় ক্ষমা কর, আর আমায় কাঁদিও না। বল, তা নৈলে কি বল্‌তে যাচ্ছিলে?"

"দেখ, আমি সন্ন্যাসী, তোমার সঙ্গে সাক্ষাতে ও বাক্যালাপে আমার ব্রতভঙ্গ হয়। আমার ব্রতভঙ্গ করালে তোমারও প্রত্যবায় আছে, তোমারও পাপ হবে।"

"হোক হোক, আমার পাপ, এই বিশ্বনাথের চরণতলে দাঁড়িয়ে তাঁর নাম স্মরণ ক'রে বল্‌ছি—তাই বা কেন, আমার বিশ্বনাথের পা ছুঁয়ে বল্‌ছি, এতে যদি কোন পাপ হয়, সে পাপ আমার, আমি সব মাথা পেতে নিচ্ছি। দেখ, মন আমার বরাবর বলেছে, তুমি বেঁচে আছ, তাই এই অশ্রুরাশি—এই মর্ম্ম-বেদনার নৈবেদ্য সাজিয়ে দেশে বিদেশে পাঠিয়েছি, মাসিক পত্রিকার সাহায্যে—যদি কোন দিন আমার দেবতার দৃষ্টি এতে পতিত হয়, সেই আশায়। সে আশা আমার ফলবতী হয়েছে, এখন আমায় ফেলে যেও না। তুমি ঘরে না এসো, আশ্রমেই থাক, তোমার অনিচ্ছা হ'লে আমি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব না, দূর থেকে তোমার বেদ-গান শুন্‌ব।"

"তা হয় না, তাতে উভয়তঃ—যাক্—দেখ, তুমি লেখাপড়া শিখেছ। এই আমার পরম সুখ—চরম শান্তি। সংসারে আমার ঐ একটি সাধ অপূর্ণ ছিল, তুমি তা পূর্ণ ক'রে প্রকৃত সহধর্ম্মিণীর কার্য্য করেছ; বাবা বিশ্বনাথ তোমার মঙ্গল করবেন। আমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ করবার চেষ্টা ক'র না, আমি এখন আসি।" তিনি চলিয়া গেলেন। কেশবের সঙ্গেও আর সাক্ষাৎ করিলেন না।

পূর্ণিমাতে আমার জন্ম, পূর্ণিমাতে আমার বিবাহ, আজ পূর্ণিমাতে আমি জীবন্মৃত হইলাম।

শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বৈজ্ঞানিক
প্রসঙ্গ
ম

## রেডিও টেলিফোনি

অধুনা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে বে-তারবার্ত্তা-প্রেরণ সাফল্যলাভ করিয়াছে। ইহার পূর্ব্বে তাড়িত-পরিচালক তারের সাহায্যে এই কার্য্য নির্ব্বাহিত হইত। আজকাল বে-তারবার্ত্তা প্রেরণের বা রেডিও টেলিফোনির উপযোগী অনেক যন্ত্রাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং ইহার সাহায্যে দূরবর্ত্তী স্থানেও সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা প্রেরিত হইতেছে; কোনও নগরে কোনও প্রসিদ্ধ বক্তা বক্তৃতা করিতেছেন, দূরবর্ত্তী নগরের অধিবাসীরা তাহা শুনিতেছে। এই সমস্ত কারণে ইহা জনসমাজে এত প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে যে, ইহা আর শুধু বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে আবদ্ধ নাই। যাঁহারা কখনও বিজ্ঞানের ধার দিয়াও যান নাই, য়ুরোপ ও আমেরিকা ইত্যাদি দেশের এরূপ বহু সহস্র লোক কেবল আনন্দ উপভোগের জন্য রেডিওবার্ত্তা-ধারণ-যন্ত্র ( Radio receiving apparatus ) সকল গৃহে রাখিয়াছেন। ইহার দ্রুত উন্নতি ও উপকারিতা হইতে আশা করা যায় যে, আর ২।১ বৎসরের মধ্যে ইহা আমাদের দেশের ও প্রত্যেকের দৈনন্দিন জীবনের একটি প্রয়োজনীয় জিনিষের মধ্যে পরিগণিত হইবে। মানুষ বুদ্ধিমত্তার প্রভাবে প্রকৃতিকে কিরূপে আয়ত্ত করিয়া আমোদ-প্রমোদের কার্য্যে লাগাইতে সমর্থ হইয়াছে, সে বিষয়ে কিছু কিছু জ্ঞানলাভ করা প্রত্যেকের পক্ষে সঙ্গত। বর্ত্তমান প্রবন্ধে ঐ বিষয়েই কিছু আলোচনা করা যাইতেছে।

সকলেই জানেন যে, রেডিওবার্ত্তা-প্রেরণ তাড়িত-শক্তিযোগে সম্পন্ন হয়, কিন্তু কিরূপে হয়; তাহা বলিয়া বুঝাইতে গেলে একটু গোড়া হইতে আরম্ভ করিতে হয়। শব্দ যেরূপভাবে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে পৌছায়, ইহা তাহারই অনেকটা অনুরূপ। মনে করুন, একটি ছোট জলাশয়ের দুই বিপরীত দিকে দুইটি কাষ্ঠখণ্ড ভাসিতেছে। যদি একটিকে আঘাত করা যায় বা জলটা নাড়িয়া দেওয়া যায়, তবে দেখা যাইবে, সেই স্থান হইতে ছোট ছোট তরঙ্গ সৃষ্ট হইতেছে ও ক্রমশঃ বড় হইয়া জলাশয়ের অপর প্রান্তে পৌছিয়া তত্রত্য কাষ্ঠখণ্ডটিকে নাচাইতেছে। বক্তা বা শ্রোতার ভিতরে বা দুইটি বে-তার-বার্ত্তাবহ ষ্টেশনের মধ্যে এইরূপ ব্যাপারই চলে। প্রথম কাষ্ঠখণ্ডটিকে বার্ত্তাপ্রেরণস্থান ( Transmitting Station ), দ্বিতীয়টিকে বার্ত্তাগ্রহণস্থান ( Receiving Station ) ও জলকে বার্ত্তাবাহক আশ্রয় ( medium ) ভাবিতে পারা যায়। কোন জলাশয়ে একটি প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করিলে সেই স্থান হইতে অসংখ্য তরঙ্গ সৃষ্ট হয় ও তাহারা আয়তনে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া জলাশয়ের অপর দিকে পৌছায় বা তৎপূর্ব্বেই জলে মিশিয়া যায়। সেইরূপ কোন স্থানে কোন কথা বলিয়া শব্দতরঙ্গ সৃষ্টি করিলে সেই তরঙ্গ জলতরঙ্গের ন্যায় দূরে নীত হয় এবং অপর ব্যক্তি শুনিতে পায়।

বস্তুর ইতস্ততঃ আন্দোলনে শব্দের উৎপত্তি। অবশ্য যে কোনরূপ আন্দোলনেই শব্দ উৎপন্ন হয় না, সাধারণভাবে বলিতে পারা যায় যে, শব্দের আন্দোলন বা কম্পনসংখ্যা ( frequency ) এক সেকেণ্ডে ৩০এর কম ও ৩০ হাজারের বেশী হইলে আমরা সে শব্দ শুনিতে পাই না। যে স্থান হইতে দোলন বা কম্পন আরম্ভ হয়, দক্ষিণে ও বামে যাইবার পর পুনরায় সেই স্থানে ফিরিয়া আসিলে একটি সম্পূর্ণ দোলন হয় ও এক সেকেণ্ডে এইরূপ যতগুলি দোলন হইত, ততগুলি সেই বস্তুর কম্পনসংখ্যা ( Frequency )। কোন বস্তু উল্লিখিতভাবে আন্দোলিত হইলে সেখান হইতে

তরঙ্গ সৃষ্ট হইয়া চারিদিকে বিস্তৃত হয় এবং বায়ু বা অন্য কোন আশ্রয় ( medium ) দ্বারা ক্রমশঃ দূরে নীত হইয়া আমাদের কর্ণে পৌছাইয়া তাহার ভিতরে যে একটি পাতলা পর্দ্দা ( Drum ) আছে, তাহাকে আন্দোলিত করে ও তথা হইতে সেই শব্দচৈতন্য মস্তিষ্কে পৌছায় এবং তখন আমরা শুনিতে পাই। শব্দতরঙ্গ সর্ব্বদা কোন জড় বস্তুকে ( material medium ) আশ্রয় করিয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নীত হয়, এই আশ্রয় কঠিন (solid), তরল ( liquid ) অথবা বাষ্পীয় ( gas ) যে কোনরূপ হইতে পারে; কিন্তু আলোক, উত্তাপ ও তাড়িত তরঙ্গ-প্রবাহ ব্যাখ্যা করিতে বৈজ্ঞানিকগণ "ইথার" নামক এক আশ্রয়ের ( medium ) কল্পনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ইহা কতকটা ইস্পাতের মত গুণবিশিষ্ট, অথচ ইহা জগতের প্রত্যেক স্থানে—এমন কি, প্রত্যেক বস্তুর অণু-পরমাণুর মধ্যস্থিত সংকীর্ণ স্থানেও বিরাজমান। ইহার গুণ সম্বন্ধে খুব কম কথাই জানা গিয়াছে, এমন কি, ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধেও আজকাল বিশেষ সন্দেহ প্রকাশ করা হইতেছে। যাহা হউক, আপাততঃ আমাদের কার্য্যের জন্য ইহার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

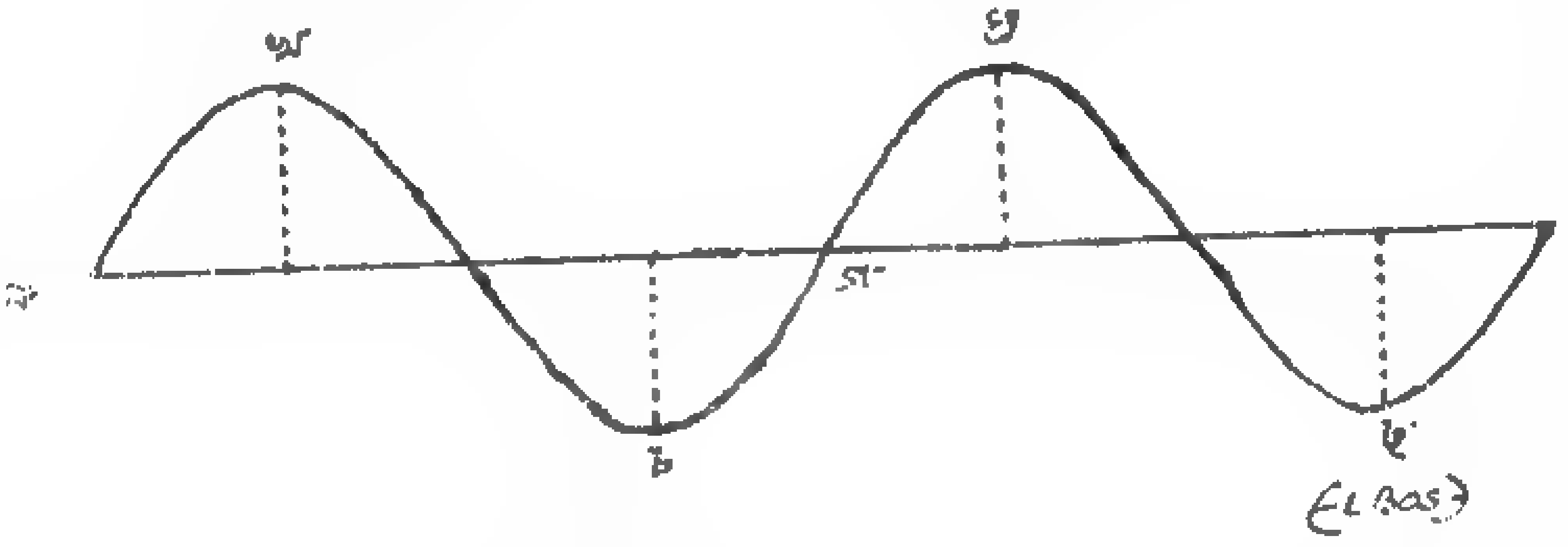

১ নং চিত্র

ইথার আশ্রয় করিয়া প্রবাহিত কতকগুলি তরঙ্গের দৈর্ঘ্য প্রদত্ত হইল। এক তরঙ্গের চূড়া বা খোল হইতে ঠিক পরবর্ত্তী তরঙ্গের চূড়া বা খোল পর্য্যন্ত যত মাপ হয়, তাহাকে তরঙ্গদৈর্ঘ্য ( wave length ) বলে। সমুদ্রতরঙ্গ দেখিলে ঠিক বুঝিতে পারা যায় যে, তরঙ্গের চূড়ার পর খোল ও খোলের পর চূড়া ঠিক এইরূপভাবে প্রবাহিত হয়। ( ১ নং চিত্র )

রঞ্জন-রশ্মি—আন্দাজ $\frac{১}{১০০০০০০}$ ইঞ্চ। যে কাগজে সিগারেট প্রস্তুত হয়, তাহার সহস্র ভাগের এক ভাগ পুরু হইলে $\frac{১}{১০০০০০০}$ ইঞ্চ পুরু হয়।

দৃশ্যমান ( visible ) আলোক-তরঙ্গ—$\frac{১}{৩০০০০}$ হইতে $\frac{১}{৬০০০০}$ ইঞ্চ পর্য্যন্ত হইতে পারে।

তাড়িত-তরঙ্গ ( ছোট )—.২৫ ইঞ্চ এবং যাহা বে-তার-বার্ত্তা প্রেরণে ব্যবহার হয়, তাহার দৈর্ঘ্য ১ হাজার ফুট হইতে ৫০ হাজার ফুট বা তাহারও বেশী হইতে পারে।

এই সমস্ত তরঙ্গ প্রতি সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল বেগে ইথারের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়; কিন্তু বায়ুর মধ্যস্থিত শব্দ-তরঙ্গের গতি প্রতি সেকেণ্ডে আন্দাজ ১ হাজার ৯০ ফুট। এই জন্যই বন্দুকের আওয়াজ হইলে শব্দ শুনিবার পূর্ব্বেই দূর হইতে আলোক দেখা যায়।

বার্ত্তা-প্রেরণ ও বার্ত্তাগ্রহণ স্থানের কার্য্যাবলী ও কিরূপে তাড়িত-তরঙ্গ প্রস্তুত, প্রবাহিত ও গৃহীত হয়, তাহা ব্যাখ্যা করিবার পূর্ব্বে দুই একটি প্রয়োজনীয় যন্ত্রের বিবরণ ও ক্রিয়া সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার।

আজকাল প্রায় প্রত্যেকেই দৈনন্দিন জীবনে তাড়িত-শক্তির অনেক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। এই শক্তি রাত্রিকালে ঘরে আলো দিতেছে, গরমে হাওয়া করিতেছে, রাস্তায় গাড়ী টানিতেছে এবং আরও নানাবিধ কায করিতেছে; কিন্তু এই সমস্ত তাড়িতকে ( electricity ) কোন জড় বস্তু বলা চলে না।

অল্পদিন পূর্ব্বেও বৈজ্ঞানিকগণ পরমাণুকেই বস্তুর সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম ও অবিভাজ্য অংশ বলিয়া জানিতেন; কিন্তু এখন ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, প্রত্যেক অণু 'ইলেকট্রন' নামক কতকগুলি আরও ক্ষুদ্র কণার সমষ্টি। এই কণাগুলি কোন আভ্যন্তরিক শক্তি দ্বারা পরস্পর সংবদ্ধ হইয়া অণু বলিয়া পরিচিত হয়। ইলেকট্রনগুলি ঋণাত্মক ( negative ) তাড়িতকণা বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। পরমাণুর আভ্যন্তরিক গঠনের আধুনিক মত অনুসারে পরমাণুগুলি ছোটখাট সৌরজগতের মত। সৌরজগতের সূর্য্যের মত ইহার মধ্যস্থলে একটি ধনাত্মক (positive) কেন্দ্র থাকে এবং তাহার চতুর্দ্দিকে ইলেকট্রনগুলি গ্রহসমূহের মত আবর্ত্তিত হয়। যদিও বিভিন্ন বস্তুর পরমাণু সমূহের গুণও বিভিন্ন, তথাপি বিস্ময়ের বিষয় যে,

তাহারা একই ইলেকট্রন দ্বারা গঠিত। ইলেকট্রনগুচ্ছের আকার ও গঠনের উপর বিভিন্ন পরমাণুর পার্থক্য নির্ভর করে। যদি কোন অজ্ঞাত শক্তি দ্বারা পরমাণু হইতে ইলেকট্রন বিচ্ছিন্ন করিয়া পুনরায় ইচ্ছামত দলবদ্ধ করা যায়, তাহা হইলে লৌহকে স্বর্ণে পরিণত করা বিশেষ কষ্টকর হইবে না। জগতের প্রত্যেক বস্তুই অণু-পরমাণুর সমষ্টি; কিন্তু যে কয়টি অণু-পরমাণু লইয়া ইহা গঠিত হয়, তাহা ছাড়াও অনেক বিচ্ছিন্ন ইলেকট্রন অণুকণা সকলের মধ্যবর্ত্তী সংকীর্ণ স্থানসমূহে অবস্থান করে এবং এই ইলেকট্রনগুলির সঞ্চালনই তাড়িত সৃষ্টি করে। ইহা হইতে কেহ যেন মনে করিবেন না যে, সাধারণ কোন যন্ত্র দ্বারা বলপ্রয়োগে ইলেকট্রনগুলি সঞ্চালিত করিতে পারা যায়। কতিপয় রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা বা চুম্বক-শক্তিপ্রভাবে এক প্রকার শক্তির উদ্ভব হয়, যাহাকে তাড়িত-বিজ্ঞানে তাড়িতসঞ্চালনশক্তি ( electromotive force ) বা তাড়িত-চাপ ( electric pressure ) বলে। যেমন কোন জিনিষের দৈর্ঘ্যের পরিমাণ 'গজ'এ বা ওজনের পরিমাণ 'সের'এ প্রকাশিত হয়, সেইরূপ তাড়িত-সঞ্চালন-শক্তির পরিমাণ Voltএ প্রকাশ করা হয়।

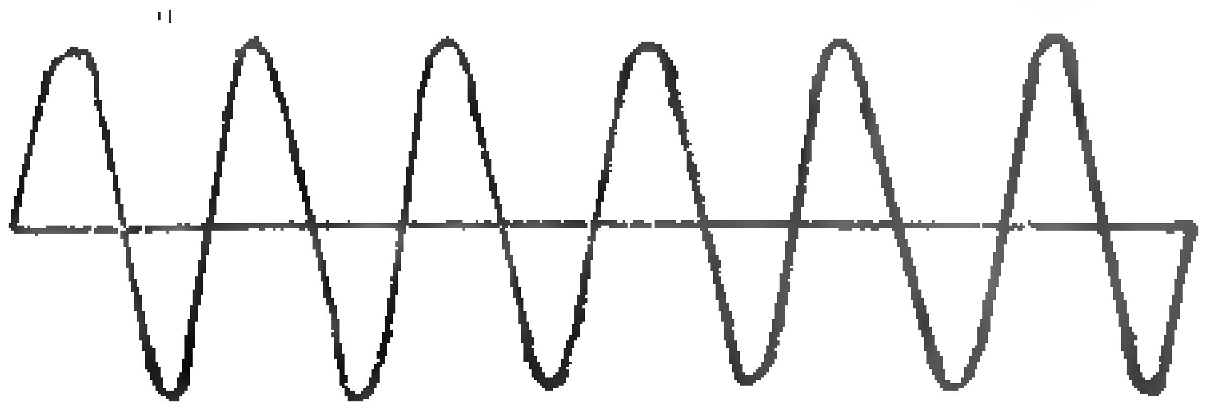

২নং চিত্র

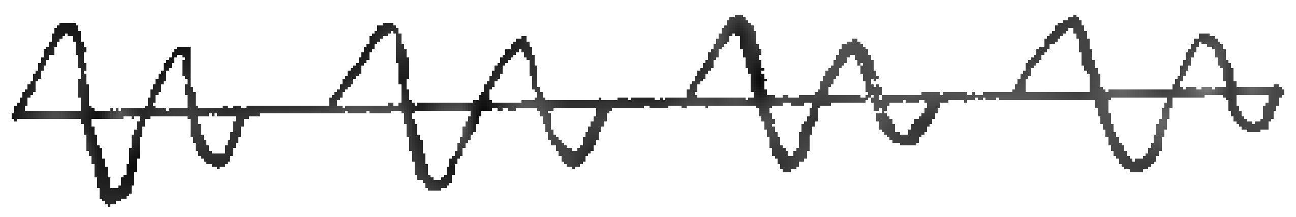

৩নং চিত্র

মনে করুন, একটি নলের ভিতর দিয়া জল যাইতেছে। এই জলকে ইচ্ছামত একই দিকে অথবা এক বার অগ্রে ও পুনরায় পশ্চাতে প্রবাহিত করিতে পারা যায়। সেইরূপ তাড়িতশক্তিও উল্লিখিত দুই প্রকারে প্রবাহিত হইতে পারে; প্রথমটিকে অবিচ্ছিন্ন ( continuous ) ২ নং চিত্র ও দ্বিতীয়টিকে পর্য্যায়—ক্রমাগত (alternate) তাড়িত প্রবাহ কহে। এই দুই প্রকার ব্যতীত অন্য আর এক প্রকারের তাড়িত প্রবাহিত হইতে পারে। ইহাতে তাড়িতশক্তি অবিচ্ছিন্নভাবে না বহিয়া যেন ইতস্ততঃ বিকম্পিত হইয়া প্রবাহিত হয়। ইহাকে দোদুল্যমান (oscillatory) তাড়িত প্রবাহ কহে। ৩ নং চিত্র হইতে ইহার কতক ধারণা হইতে পারে।

কোন চক্রের (circuit) ভিতর তাড়িত প্রবাহের ফলে উত্তাপ, রাসায়নিক ক্রিয়া ও চুম্বক-শক্তি সম্বন্ধে মাত্র দুই একটি কথা বলিব।

ভিতর দিয়া তাড়িত প্রবাহিত হইতেছে, এরূপ কোন তারের নিকট একটি শূন্যে প্রলম্বিত চুম্বক শলাকা আনিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, (৪ নং চিত্র) উহা বিচলিত হইতেছে। ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে,ঐ স্থানে তাড়িত শক্তি-দ্বারা চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্ট হইয়াছে। একটি তারের কুণ্ডলীর (coil) ভিতর একখানি লৌহ রাখিয়া ঐ তারের ভিতর দিয়া তাড়িত প্রবাহিত করিলে ঐ লৌহখণ্ড চুম্বকশক্তি প্রাপ্ত হইবে; কিন্তু যখনই তাড়িত প্রবাহ বন্ধ হইবে, তখনই ঐ শক্তি অন্তর্হিত হইবে। ভিতরে তাড়িত প্রবাহিত হইতেছে, এরূপ একটি তারের কুণ্ডলী 'ক' আনিলে দ্বিতীয় কুণ্ডলীর 'খ' ভিতর ক্ষণিক তাড়িত প্রবাহিত হইবে, যদি ইহার চক্র (circuit) সম্পূর্ণ থাকে অর্থাৎ ঐ তারের দুই মুখ যুক্ত থাকে। যখনই প্রথম কুণ্ডলীতে তাড়িতের শক্তির পরিবর্ত্তন হইবে বা দ্বিতীয়টি ঐ চৌম্বকক্ষেত্রের ভিতর ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইবে, তখনই দ্বিতীয়টিতে তাড়িত প্রবাহিত

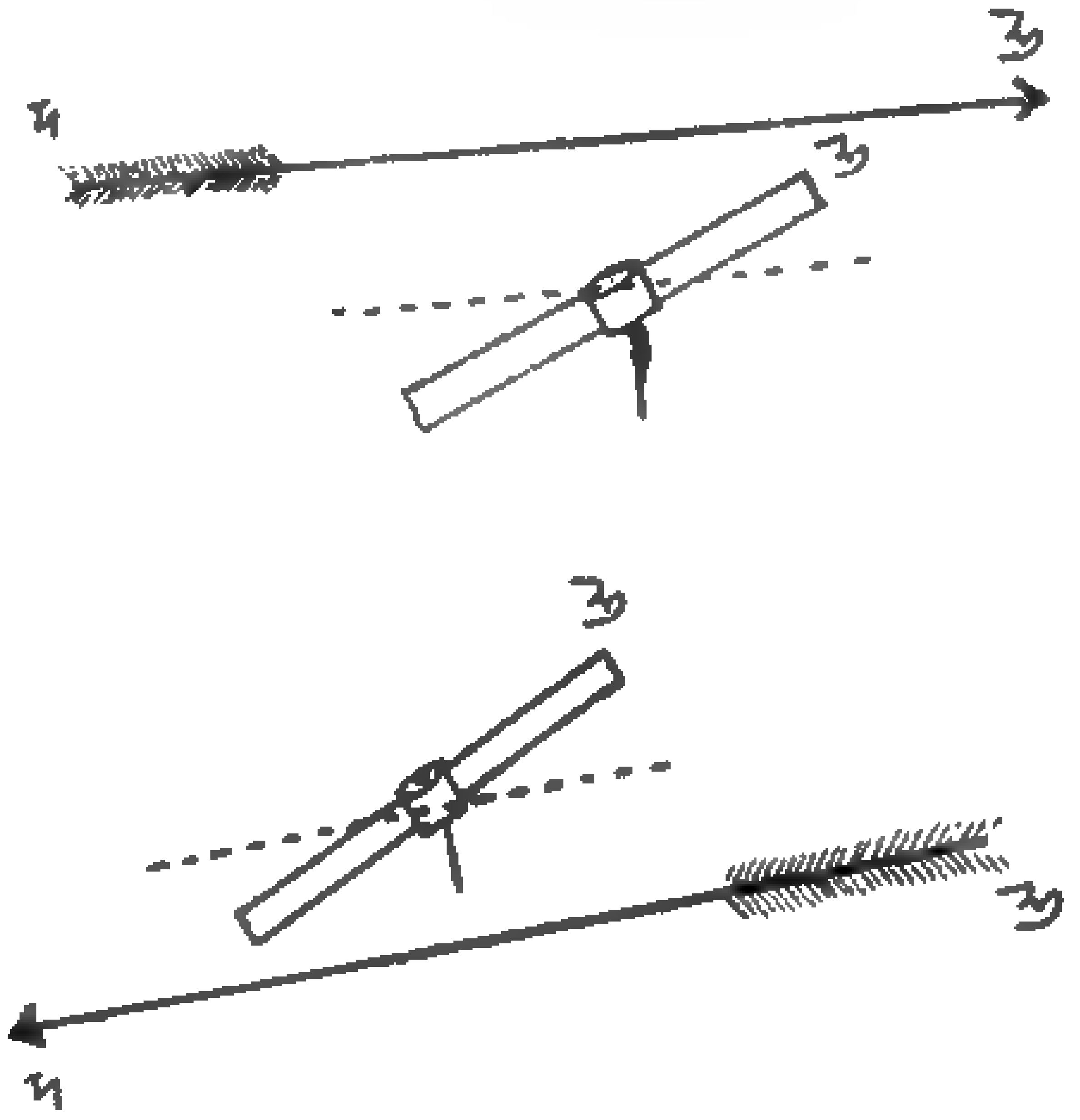

৪নং চিত্র

হইবে, এবং এই তড়িতকে (Induced) তাড়িত বলে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, দুইটি কুণ্ডলীর ভিতর কোন যোগ না থাকিলে ও একটির ভিতর তাড়িত প্রবাহিত হইলে অপরটিতে তাড়িত স্রোত পাওয়া অসম্ভব। (৫ নং চিত্র)।

ইহা অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন যে, কোন এঞ্জিন চলিতে আরম্ভ করিবার পর পূর্ণগতি প্রাপ্ত হইতে কিছু সময় লাগে ও পুনরায় থামিবার সময়ও এঞ্জিনের বাষ্পশক্তি অন্তর্হিত করিলেও ইহার গতি সম্পূর্ণ নষ্ট হইতে কিছু সময় লাগে। এই ব্যাপার ট্রেণে ভ্রমণকালে ষ্টেশনে ট্রেণ থামিবার বা ষ্টেশন হইতে ট্রেণ ছাড়িবার সময় সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন।

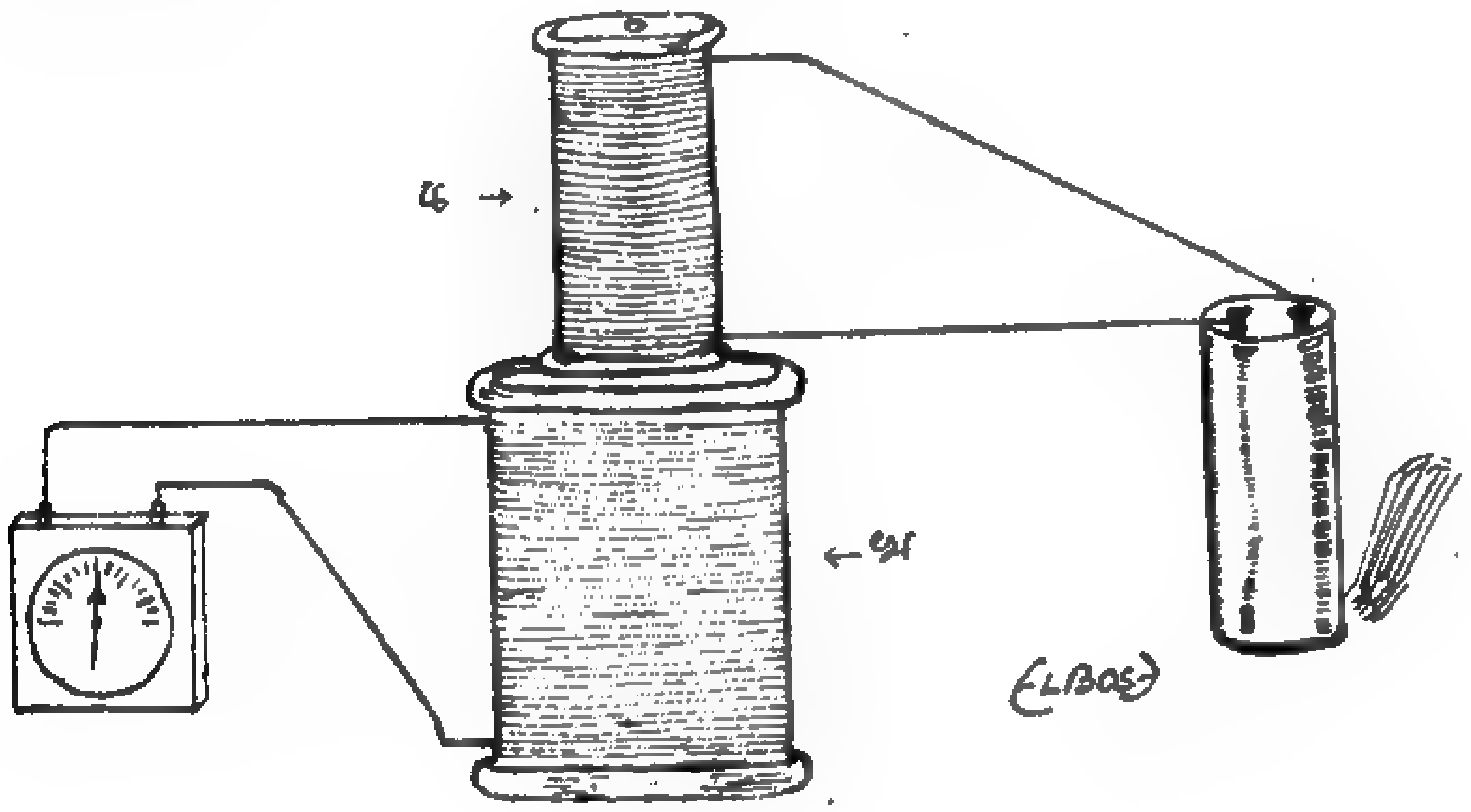

৫নং চিত্র

সেইরূপ কোন চক্রস্থিত কুণ্ডলীমধ্যে তাড়িত প্রবাহের সঞ্চালনকালে ঐ প্রবাহ একেবারেই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না, বা প্রবাহ বন্ধ হইবার সময় একেবারেই হঠাৎ বন্ধ হয় না। এই কুণ্ডলী যেন এই কার্য্যে বাধা প্রদান করে। এই ধর্ম্মকে উহার (Inductance) বলে, এবং ইহা বেতার-বার্ত্তা-প্রেরণ কার্য্যে বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই কার্য্যে আর এক প্রকার যন্ত্রের দরকার হয়, তাহার নাম "কনডেন্সর।" ইহা তাড়িত শক্তিকে সঞ্চিত করিয়া রাখিতে পারে, এবং ইহার এই ধর্ম্মকে ইহার "তাড়িত-ধারণ-ক্ষমতা" (capacity) বলে। সামান্ত পৃথক্‌ভাবে অবস্থিত দুইটি ধাতুপাত্রের মধ্যে বায়ু, কাচ বা অন্য কোন তাড়িত অপরিচালক (Insulator) বস্তু থাকিলে সেই সবটাকে একটা সাধারণ "কনডেন্সর" বলা হয়।

"কনডেন্‌সরের" কার্য্য অনেকটা কোন যন্ত্রের স্প্রীংএর কার্য্যের মত। ইহার বিষয় পরে বলা যাইবে।

বেতার-বার্ত্তার বিষয় ব্যাখ্যা করিবার পূর্ব্বে সতার-বার্ত্তাপ্রেরণের (wire telephone) বিষয় ব্যাখ্যা করিলে ব্যাপারটা অনেক সহজ বোধ হইবে। ইহাতে বার্ত্তাপ্রেরণ-স্থানে (Transmitting end) একটি খুব পাতলা ধাতুর পর্দ্দার (diaphragm) সম্মুখে কথা বলিয়া তাহাকে কম্পিত করা হয়, এবং এই কম্পন তাড়িত-স্রোতেও কম্পন উপস্থিত করে। এই রূপান্তরিত তাড়িতস্রোত পরিচালক তারের ভিতর দিয়া বার্ত্তাগ্রহণস্থলে পৌঁছিয়া তথায় রক্ষিত অপর একটি পর্দ্দাকে সমভাবে কম্পিত করে, এবং এই কম্পন দ্বারা একই শব্দ পুনরুৎপাদন করে। এখন জিজ্ঞাসা এই যে, কিরূপে শব্দতরঙ্গ দ্বারা তাড়িত-স্রোতে রূপান্তরিত হয়, এবং কিরূপেই বা তাড়িতস্রোত পুনরায় একই শব্দের সৃষ্টি করে।

এই ব্যাপারের প্রথম কার্য্য "মাইক্রোফন্" (microphone) নামক এক যন্ত্রের সাহায্যে সম্পন্ন হয়। একটি সাধারণ ও সহজ মাইক্রোফনের ছবি (৬নং) দেওয়া গেল। 'ক' পর্দ্দাটি একটি কঠিন বেষ্টনের ভিতর খাড়া আছে, এবং ইহার ঠিক মধ্যস্থলে একটি অঙ্গারের (carbon) বোতাম 'খ' সংলগ্ন আছে। আর 'চ' 'ছ' দুইটি পাতলা স্প্রীং দ্বারা 'খ'এর সহিত খুব সামান্যভাবে স্পর্শ করিয়া আর একটি বোতাম 'গ' আছে। ছবিতে যেরূপ আছে, সেইরূপ ভাবে একটি তাড়িত-উৎপাদক যন্ত্র (Battery) 'ব' সংযুক্ত করা হইলে ক, খ, গ, চ, এর ভিতর দিয়া তাড়িত প্রবাহিত হইবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত পর্দ্দাটি স্থির থাকে অর্থাৎ বোতাম (খ, গ) দুইটি পরস্পর স্পর্শ করিয়া থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাড়িত-স্রোত সমভাবে প্রবাহিত হয়। কিন্তু পর্দ্দাটি সামান্য বিচলিত হইলেই খ ও গ এর ভিতরের চাপের পরিবর্ত্তন হয় ও ঐ স্থলে তাড়িত প্রবাহে বাধা (Resistance) উৎপন্ন হয় এবং তদ্দ্বারা চক্রে প্রবাহিত তাড়িত শক্তির

হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। ইহা সহজে বুঝা যাইবে যে, ঐ পর্দ্দার সম্মুখে যেরূপ শব্দ উচ্চারিত হইবে, সেই শব্দের প্রকৃতি অনুযায়ী তরঙ্গের সৃষ্টি হইবে এবং তদনুসারে পর্দ্দাটিও কম্পিত হইবে। এই কম্পনই পুনরায় চক্র-প্রবাহিত তাড়িতের প্রকৃতি তদনুযায়ী পরিবর্ত্তিত করিবে।

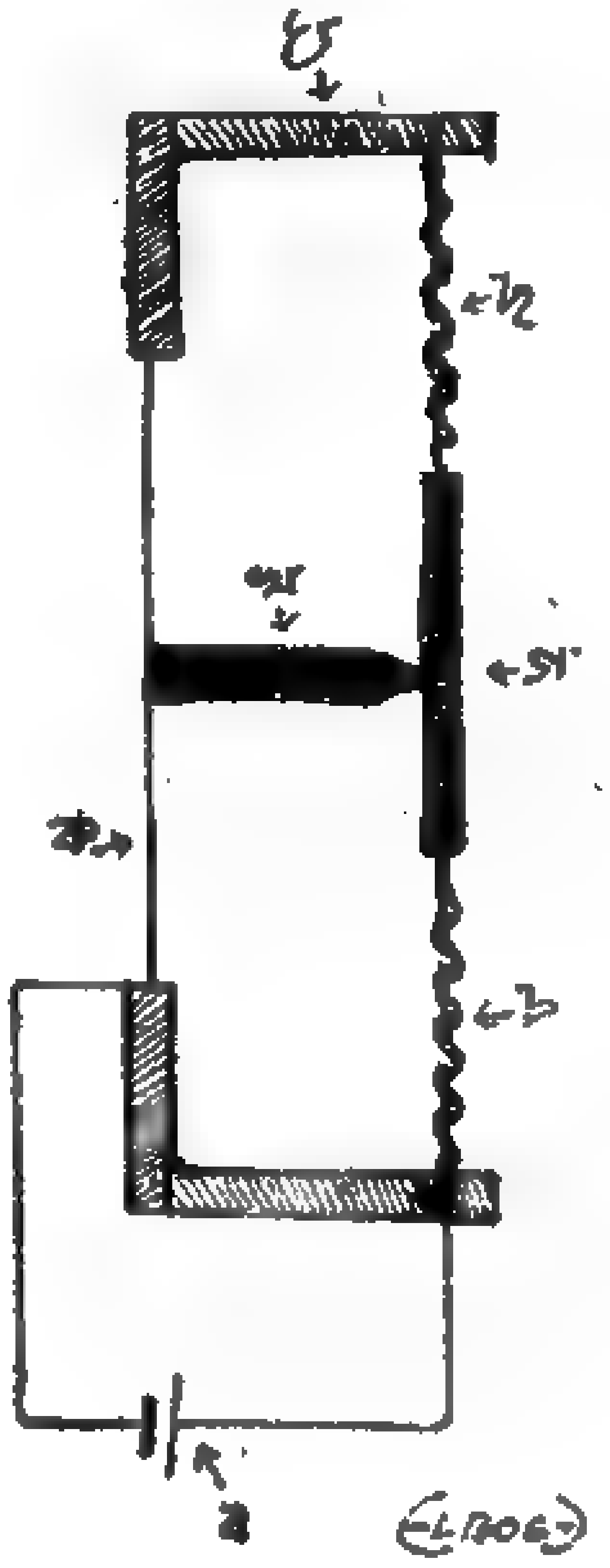

৬নং চিত্র

'মাইক্রোফন' দ্বারা সাধিত তাড়িতের এই প্রকৃতি-পরিবর্ত্তন হইতে যে যন্ত্র দ্বারা পুনরায় উহা শব্দে রূপান্তরিত হয়, তাহার নাম বার্ত্তাগ্রহণ যন্ত্র (Teleph one receiver)। (৭নং চিত্র)। ইহার কার্য্যপ্রণালী পূর্ব্ববর্ণিত তাড়িতের চুম্বক-শক্তির উপর নির্ভর করে। এই ছবিতে 'ক' একটি নিত্য চুম্বক (Permanent magnet); ইহার দুই প্রান্ত দুইটি তারের কুণ্ডলী দ্বারা বেষ্টিত- যাহার ভিতর দিয়া তাড়িত প্রবাহিত করিয়া ইহার চুম্বক-শক্তিকে আবশ্যকমত সংযত করিতে পারা যায়। একটি লৌহ-পর্দ্দা 'খ' ঠিক ঐ চুম্বকের সম্মুখে, কিন্তু উহাকে স্পর্শ না করিয়া, অবস্থিত আছে। যখন কুণ্ডলীর মধ্যস্থিত তাড়িত প্রবাহিতহয়, তখন চুম্বক-শক্তির আকর্ষণে লৌহ-পর্দ্দাটি সামান্য সম্মুখদিকে সরিয়া আইসে এবং কুণ্ডলী-প্রবাহিত তাড়িত-শক্তির পরিবর্ত্তন হইলে চুম্বকের আকর্ষণীশক্তিও তদনুযায়ী পরিবর্ত্তিত হয়।

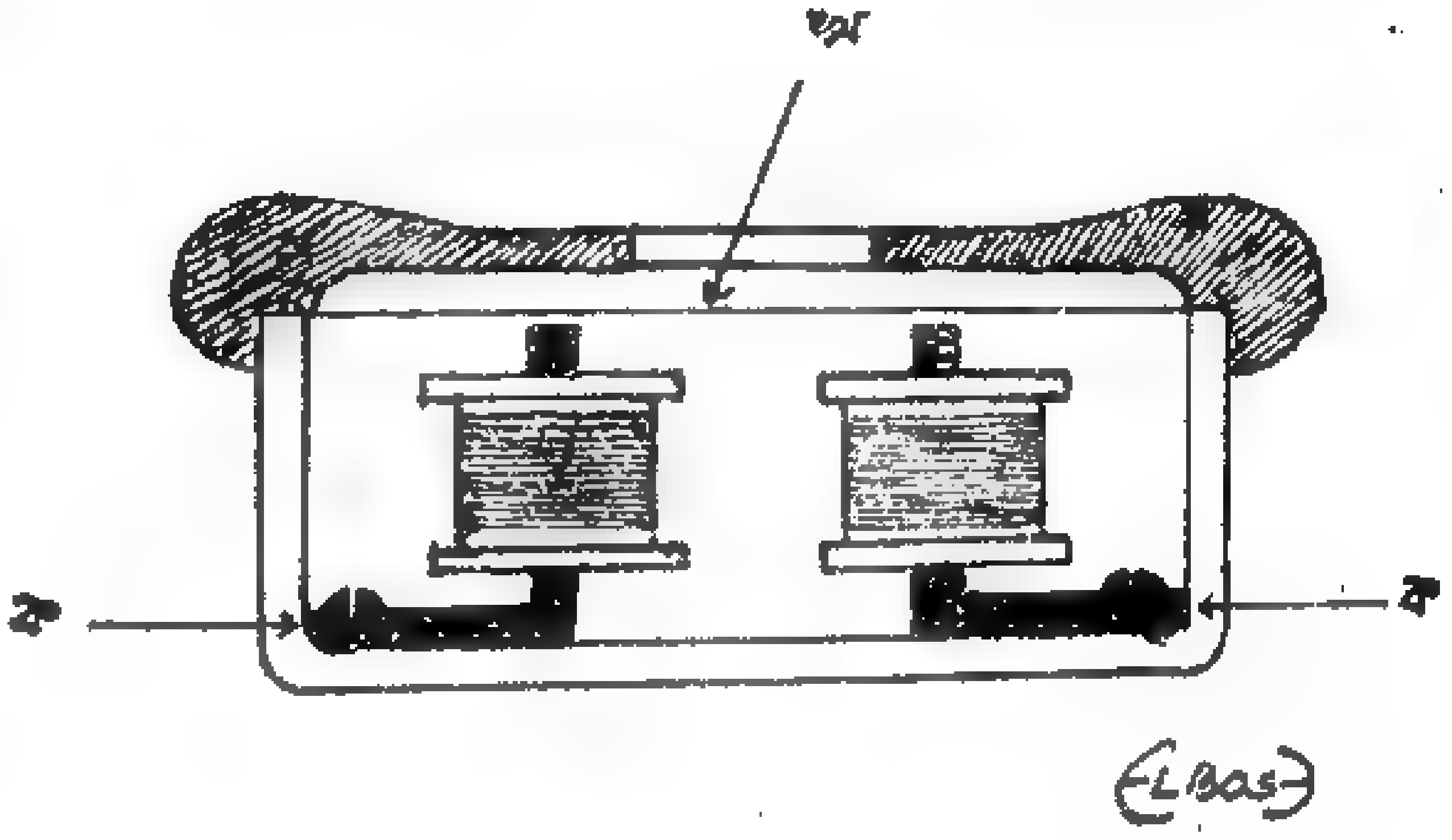

৭নং চিত্র

পর্দ্দার স্থিতি-স্থাপকতা ( elasticity ) গুণবশতঃ সম্মুখে ও পশ্চাতে সঞ্চালিত হইয়া কুণ্ডলী-প্রবাহিত তাড়িত-শক্তির পরিবর্ত্তনের অনুরূপ কম্পন সৃষ্টি করে। নিম্নের ৮নং ছবি হইতে সতারবার্ত্তা প্রেরণের সম্পূর্ণ বন্দোবস্ত বুঝা যাইবে। মাইক্রোফনের সম্মুখে শব্দতরঙ্গ সৃষ্ট হইলে উহার পর্দ্দা কম্পিত হয় এবং এই কম্পনের ফলে তাড়িত-শক্তির পরিবর্ত্তন হয়। এই পরিবর্ত্তন চুম্বকের আকর্ষণীশক্তিরও অনুরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত করে, যদ্দ্বারা বার্ত্তা-গ্রহণ যন্ত্রের পর্দ্দাও প্রথম পর্দ্দাটির ন্যায় কম্পন সুরু করে। আর এই কম্পন শব্দ-তরঙ্গের সৃষ্টি করে।

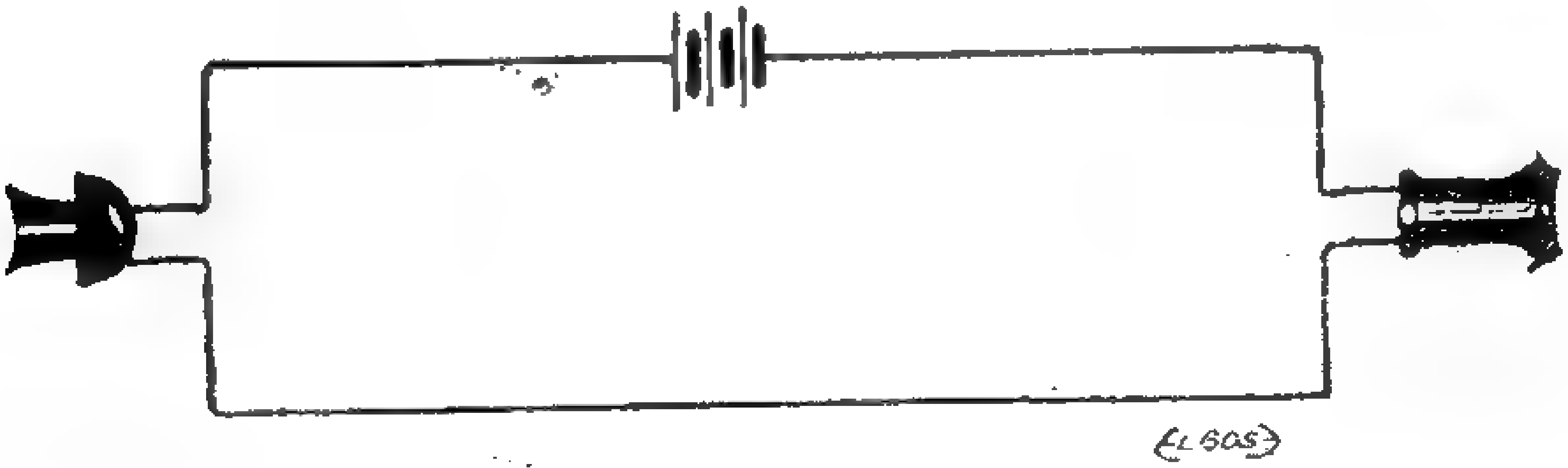

৮নং চিত্র

[ ক্রমশঃ।

শ্রীসুশীলচন্দ্র রায় চৌধুরী ( অধ্যাপক )।

# হীরক

## ২

এবার কৃত্রিম ও অকৃত্রিম হীরকের মধ্যে প্রভেদ দেখাইবার চেষ্টা করিব। কৃত্রিম হীরক সাধারণতঃ তিন প্রকার হইয়া থাকে।

প্রথম বর্ণহীন পোখরাজ, জারকন্, স্পাইনেল ইত্যাদি; দ্বিতীয় হীরকের অনুকরণে নির্ম্মিত কাচখণ্ড; তৃতীয় পরীক্ষাগারে নির্ম্মিত হীরক। প্রথম দুই প্রকারের কৃত্রিম হীরক বাজারে চালান হইয়া থাকে; পরীক্ষাগারে প্রস্তুত হীরকের সহিত প্রকৃত হীরকের কোনরূপ পার্থক্য নাই, কিন্তু তাহারা আকারে এত ক্ষুদ্র ও অল্পকালস্থায়ী যে, তাহারা হীরক বলিয়া বিক্রীত হয় না। এই হীরক কিরূপে প্রস্তুত করিতে পারা যায়, তাহা পরে উল্লেখ করা যাইবে। তবে এ কথা সত্য যে, ভবিষ্যতে হীরক-প্রস্তুতপ্রণালী এতদূর উন্নত হইতে পারে যে, তখন খনি হইতে প্রাপ্ত হীরকের অনুরূপ হীরক পরীক্ষাগারে নির্ম্মিত হইবে ও হীরক বহুমূল্য পদার্থ বলিয়া বিবেচিত হইবে না। অপর দুই প্রকার কৃত্রিম হীরকের পরিচয় জ্ঞাত হইতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয় কয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত।

(১) হীরকের বিক্ষেপ শক্তি ( Dispersive power ) অন্যান্য রত্ন অপেক্ষা অধিক বলিয়া ইহার দ্যুতি পোখরাজাদি অপেক্ষা অধিক।

(২) হীরক ক্রয় করিবার সময় ইহাকে আধার হইতে ভিন্ন করিয়া 'কারবোর‍্যান্ডম্' দ্বারা ইহার কাঠিন্য পরীক্ষা করা আবশ্যক; অকৃত্রিম হীরকের উপর কোন রেখা টানিতে পারা যায় না, কিন্তু কৃত্রিম হীরকে অতি সহজেই রেখা টানিতে পারা যাইবে। 'টেবল' ও 'কলেট' এই পৃষ্ঠদ্বয়ের কঠিনতা প্রথমেই পরীক্ষা করা আবশ্যক।

(৩) অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, হীরক সমমান শ্রেণীর অন্তর্গত স্ফটিক, অর্থাৎ আলোকরশ্মি দ্বিখণ্ডিত হইয়া দুই বিভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়া চলে না; একমাত্র 'স্পাইনেল'এর সহিত এই বিষয়ে সাদৃশ্য থাকিলেও স্পাইনেলের কঠিনতা হীরক অপেক্ষা যথেষ্ট অল্প।

(৪) হীরকের আপেক্ষিক গুরুতা নিরূপণ করা আবশ্যক। হীরকের অনুকরণে কর্ত্তিত কাচখণ্ডের বিক্ষেপক্ষমতায় হীরকের সহিত সাদৃশ্য থাকিলেও কঠিনতায় তাহা হীরকের সমতুল্য নহে। রণ্টজেন রশ্মির কৃপায় কাচখণ্ডকে হীরক বলিয়া ভ্রম হইবার কোন কারণ নাই।

হীরকের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কিছু না বর্ণন করিলে হীরকের গুণাবলী অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। হীরক অঙ্গ-শোভা বর্দ্ধনের জন্য অলঙ্কাররূপে যে ব্যবহৃত হয়, তাহা আমরা সকলেই অবগত আছি। বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত ইহার প্রয়োজনীয়তাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। কাচ কাটার হীরক ব্যবহৃত হয়, ইহাও অনেকে অবগত আছেন। কিন্তু হীরকের যে কোন অংশ দ্বারা কাচ কাটা যায়, এ ধারণা ভুল; তাহা দ্বারা মাত্র দাগ টানা যায়। সুচারুরূপে কাচ কাটিতে হইলে এমন একটি খণ্ড নির্ব্বাচন করা উচিত, যাহার স্বাভাবিক বক্র পৃষ্ঠদ্বয় স্থূল কোণে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। মৃত্তিকা-গর্ভে মূল্যবান্ খনিজ পদার্থ বর্ত্তমান আছে কি না, ইহা অবগত হইতে হইলে প্রস্তর-স্তর ভেদ করিয়া কিছুদূর খনন করিয়া দেখিতে হয়; এই প্রস্তর-স্তর স্থানে স্থানে এত কঠিন যে, হীরকখণ্ড-সমন্বিত খনন যন্ত্রের ( Diamond Drill ) সাহায্য লওয়া ব্যতিরেকে খননকার্য্য সুসম্পন্ন হয় না। এই যন্ত্রে নিকৃষ্ট হীরক বোর্ট্ ও কারবনাডো ব্যবহৃত হয়। অলঙ্কারে সংযোজিত অন্যান্য রত্নে ছিদ্র করিতে হইলে হীরকের সাহায্য লওয়া আবশ্যক। হীরকের সাহায্য লইয়া অধুনা যন্ত্র ও খনিজবিদ্যা-সংক্রান্ত বহু কার্য্য দ্রুত ও অল্প ব্যয়ে করিতে পারা যায়। কামানের জন্য ব্যবহৃত কঠিন ইস্পাতে ছিদ্র করিতে হইলে যন্ত্রের অগ্রভাগে হীরকখণ্ড সন্নিবিষ্ট থাকে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের লেন্স নির্ম্মাণে হীরক উপযোগী, কিন্তু মূল্য অত্যধিক হওয়ায় ইহার প্রচলন হয় নাই। প্রাচীনকালে বিষের প্রতিষেধক ও উন্মাদ রোগের মহৌষধিরূপে হীরক ব্যবহৃত হইত। কোন রাজার নিকট সুন্দর এক খণ্ড হীরক থাকিলে সে রাজ্যে মহামারী, দুর্ভিক্ষ, বজ্রপাত ইত্যাদি নৈসর্গিক ঘটনা কখনও সংঘটিত হইত না। স্ত্রী-পুরুষের মনোমালিন্য দূর করিতে হীরক অদ্বিতীয়—শুনিতে পাওয়া যায়। পরীক্ষা করিয়া ইহার সত্যাসত্য কেহ নিরূপণ করিয়া দেখিতে পারেন।

হীরকের মূল্য কোন বিশেষ নিয়মে নির্দ্ধারিত হয় না,—যদিও বহু নিয়ম সৃষ্ট হইয়াছে। ইহার মূল্য প্রধানতঃ বিক্রেতার বিক্রয়েচ্ছা ও ক্রেতার ক্রয়েচ্ছার উপর নির্ভর করে। অপেক্ষাকৃত আকারে বৃহৎ হীরকখণ্ড সংখ্যায় অল্পই আছে। কাযেই তাহাদের মূল্য অনেকাংশে বিক্রেতার ইচ্ছামত হইয়া থাকে। তবে সাধারণতঃ আকারে ক্ষুদ্র হীরকের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হইলে প্রতীচ্য মণিকারর। হীরককে প্রথমে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। প্রথম শ্রেণী অর্থাৎ ফাষ্ট ওয়াটার—বর্ণ ও দোষহীন স্বচ্ছ হীরক। দ্বিতীয় শ্রেণী অর্থাৎ সেকেণ্ড ওয়াটার—দোষহীন অল্প বর্ণবিশিষ্ট অথবা বর্ণহীন অল্প দোষবিশিষ্ট। বর্ণের গভীরতা ও দোষের আধিক্যের জন্য হীরক যথাক্রমে থার্ড ও ফোর্থ ওয়াটার হীরক বলিয়া পরিগণিত হয়। প্রথমে দেখিতে হয়, হীরক কোন্ শ্রেণী-( Water ) ভুক্ত ও কি আকারে তাহারা কর্ত্তিত, শেষে তাহার ওজন দেখিয়া মূল্য নিরূপিত হয়। হীরকের ওজন সাধারণতঃ ক্যারাটে হইয়া থাকে। ১ ক্যারাট্ = ৩$\frac{১}{৪}$ গ্রেণ অথবা = ২০৫ মিলিগ্রাম; প্রায় $\frac{১}{২}$ রতি।

ব্রিলিয়াণ্ট আকারে কর্ত্তিত ফাষ্ট ওয়াটার ১ ক্যারাট্ ওজনের হীরকের মূল্য সাধারণতঃ ২ শত ২৫৲ টাকা হইতে ৩ শত ৭৫৲ টাকা পর্য্যন্ত হয়। 'রোজ' আকারে কর্ত্তিত হীরকের মূল্য তাহার $\frac{৪}{৫}$ অংশ অর্থাৎ ১ শত ৭০ টাকা হইতে ৩ শত টাকা পর্য্যন্ত হইতে পারে। মিঃ স্ক্রাউফ ( Schrauf ) নিম্নলিখিত নিয়মে যাহাতে হীরক বিক্রীত হয়, তাহার চেষ্টা করেন। তাঁহার মতে ৪ ক্যারাট ওজনের হীরকের মূল্য ( ৪+২ )×১ ক্যারাটের বাজা মূল্য = ১২×১৫ পাউণ্ড অথবা ১২×২৫ পাউণ্ড = ১ শত ৮০ পাউণ্ড অথবা ৩ শত পাউণ্ড।

ট্যাভারনিয়েরের মতে ২ ক্যারাট্ ওজনের হীরকের মূল্য ২×২×৮ = ৩২ পাউণ্ড ( ৪ শত ৮০ টাকা )। ৩ ক্যারাট্ হীরক—৩×৩×৮ = ৭২ পাউণ্ড ( ১ হাজার ৮০ টাকা )।

প্রাচ্য মণিকাররা হীরককে চারি বর্ণে—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—বিভক্ত করিয়া মূল্য নিরূপণ করিতেন। হেইলি এক স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন যে, দক্ষিণ-ভারতের ওয়ালুম পল্লী খনির ব্রাহ্মণ-শ্রেণীভুক্ত ১ মান্জলি অর্থাৎ ২ ক্যারাট্ ওজনের হীরকের মূল্য ১ শত ৩৫ টাকা ছিল; শূদ্র-শ্রেণীভুক্ত হীরকের মূল্য ব্রাহ্মণ হীরকের অর্দ্ধেক। ৮ মান্জলি ওজনের ব্রাহ্মণ হীরকের মূল্য ২ হাজার ৭ শত টাকা। ঐ ওজনের শূদ্র-শ্রেণীর হীরকের মূল্য ২ হাজার ২ শত ২৫ টাকা হইতে তিনি দেখিয়াছেন। অন্যান্য খনির হীরকের মূল্য আমরা সঠিক অবগত নহি।

হীরকের উৎপত্তির বিভিন্ন মতাবলী আলোচনা করিবার পূর্ব্বে

দেখা যাউক, পৃথিবীর কোথায় ও কি অবস্থায় হীরক পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে হীরকের জন্য জগতের সর্ব্বত্র ভারত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। অধুনা ভারতের সে সৌভাগ্য-সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছে। ভারতের আকরগুলি হইতে হীরক প্রায় নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে।

চিত্র নং ৬

বাৎসরিক যে পরিমাণ হীরক উত্তোলিত হয়, তাহার শতকরা ৯০ অংশ দক্ষিণ-আফ্রিকার খনি হইতে আইসে। প্রথমে দক্ষিণ-আফ্রিকার খনিগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রকাশ করিয়া পরে জগতের অন্যান্য যে সকল স্থানে হীরক আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের নামোল্লেখ করিয়া পরিশেষে ভারতীয় খনিগুলির বিশদ বর্ণনা করিব।

দক্ষিণ-আফ্রিকার হীরক-আকরগুলি হীরক উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকৃত করিয়া আছে। কোন এক শুভ মুহূর্ত্তে কৃষক-বালক জ্যাকবের ক্রীড়নক প্রস্তরখণ্ডের প্রতি শাক্ ভান্ নিকেরকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়া হীরক আবিষ্কারের প্রথম সূত্রপাত করিয়া দেয় ও তাহার ফলে আজ বৎসরে লক্ষ লক্ষ টাকার হীরক আফ্রিকার খনিগুলি হইতে উত্তোলিত হইতেছে। প্রথম প্রথম ভাল নদীর কিনারায় পলিতে হীরক অন্বেষণ করা হইত ও তাহার ফলে সেই সময়ে বহু হীরক পাওয়া যায়, কিন্তু ক্রমেই হীরকের সংখ্যা হ্রাস পাইয়া আসিতে লাগিল। পরে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে নদী হইতে বহু দূরে এক স্থলে এক খণ্ড হীরক আবিষ্কৃত হইলে নদী-পলি ব্যতীত অপর কোন প্রস্তর-স্তরে হীরক পাওয়া যায় না, এ ধারণা জনসাধারণের মন হইতে দূর হইল। তখন অযথা উৎসাহে প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়া বহু ব্যক্তি হীরক অন্বেষণে নিযুক্ত হইলেন ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি খনি আবিষ্কৃত হয়। "কিম্বারলে" ও "দবিয়ার" ( De Beer ) এই খনি দুইটি প্রধান। কিম্বারলের চতুর্দ্দিকে লোহিত লৌহময় মৃত্তিকা বিস্তৃত। ঐ মৃত্তিকার নিম্নে ক্ষয়-প্রাপ্ত অগ্নিজ ৩০।৯০ ফুট প্রস্তর বেসল্ট ( Basalt ), তন্নিম্নে ২০০।২৫০ ফুট কৃষ্ণবর্ণ শ্লেট তুল্য 'শেল' প্রস্তর, নিম্নে ১০ ফুট 'কন্‌গ্লোমারেট' প্রস্তর, তন্নিম্নে যথাক্রমে 'মেলাফায়ার', 'কোয়ার্টজাইট' 'শেল' বর্ত্তমান। উপর হইতে এই বিশিষ্ট স্তরের বিশেষত্ব সহজে জ্ঞাত হওয়া যায় না। তবে এই স্থানগুলি অপেক্ষাকৃত উচ্চ। অল্প নিম্নে হীরক-স্তরের সহিত পারিপার্শ্বিক প্রস্তর-স্তরের বিভিন্নতা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। এ স্থানের হীরক-আকরগুলি ৩½ মাইল দীর্ঘ ব্যাসের বৃত্তমধ্যে অবস্থিত। এই খনিগুলির বিশেষত্ব এই যে, তাহারা প্রত্যেকটি প্রায় বৃত্তাকার নল সদৃশ ও মৃত্তিকার বহু নিম্ন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান। এই নল অর্থাৎ গহ্বরগুলি আগ্নেয়গিরি যে কারণে সৃষ্ট হয়, সেই কারণেই সৃষ্ট হইয়াছিল, তবে সাধারণতঃ আগ্নেয়গিরির মধ্য হইতে গলিত প্রস্তরাদি যেরূপ ভীষণ বেগে বহির্গত হইয়া আইসে, ও চতুর্দ্দিক প্লাবিত করিয়া এক মহা অশান্তির সৃষ্টি করে, সেরূপ কোন ঘটনা এ ক্ষেত্রে সংঘটিত হয় নাই। অনুমান করা হয় যে, বহু নিম্নে নৈসর্গিক কোন কারণে জাত হীরক গলিত প্রস্তরাদির সহিত মিশ্রিত হইয়া ধীরে ধীরে উপরে উত্থিত হয় ও গহ্বরগুলি পূর্ণ করিয়া ফেলে। পার্শ্বস্থ ও নিম্নস্থ বিভিন্ন প্রকার প্রস্তরখণ্ডগুলি অবিন্যস্তভাবে এক প্রকার নীল মৃত্তিকায় দৃঢ়ীভূত হইয়া গহ্বরের মধ্যে অবস্থান করে, এত বিভিন্ন প্রকার প্রস্তর একত্র মিশ্রিত অবস্থায় পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে দৃষ্টিগোচর হয় না। এই নীল মৃত্তিকায় হীরক পাওয়া যায়; নীল মৃত্তিকা জল ও বায়ুর ক্রিয়ায় ফলে হরিদ্রা-বর্ণ ধারণ করিয়া উপরিভাগে অবস্থান করে। এই কঠিন নীল মৃত্তিকা উপরে উত্তোলিত হইয়া প্রাচীর-বেষ্টিত স্থানে রক্ষিত হয়। কঠিন চ্যাঙ্গড়গুলি সূর্য্যের উত্তাপ ও বাষ্পের সংস্পর্শে নরম হইতে আরম্ভ করে। এই সময়ে এই মৃত্তিকাতে রীতিমত জলসেচন করা হয় ও লাঙ্গল দিয়া কর্ষণ করা হয় ( চিত্র ৬ )। কয়েক মাস পরে এই মৃত্তিকা ট্রলি-পূর্ণ করিয়া লইয়া যাওয়া হয় ও নিষ্কাশন যন্ত্র ( Washing and Concentrating machine ) মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া হীরক নির্ব্বাচিত হয়।

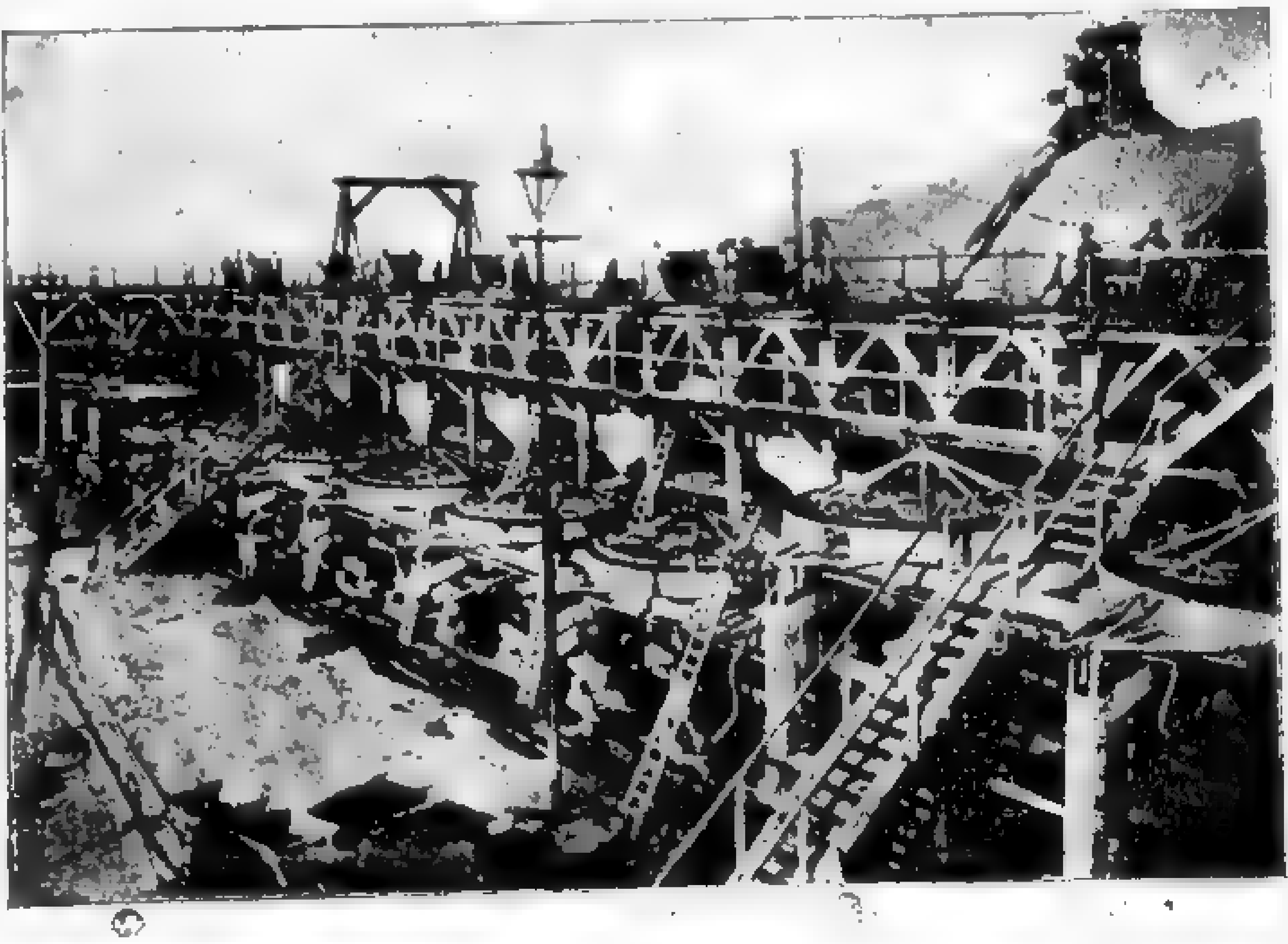

চিত্র নং ৭

এই যন্ত্রে ( চিত্র ৭ ) জলের গতির বেগ হ্রাস ও বৃদ্ধি করিয়া জলের সহিত হীরকাপেক্ষা হাল্কা চূর্ণ প্রস্তরখণ্ড যাহাতে বহির্গত হইয়া যায়, সেই প্রণালী অবলম্বন করা হয়। প্রথম স্থান হইতে বহির্গত চূর্ণ প্রস্তর ও মৃত্তিকাকে পুনরায় কতিপয় স্থানে ধৌত করা হয়। হীরকের আপেক্ষিক গুরুতা অধিক; সুতরাং উহা নিম্নে অবস্থান করে ও তথা হইতে হীরক সংগৃহীত হয়। এই যন্ত্র এতদূর উন্নত যে, এক কণা হীরক ইহা হইতে বহির্গত হইয়া যাইতে পারে না, তবে মনে রাখিতে হইবে যে, শত শত মণ মৃত্তিকা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড ধৌত করিয়া কয়েক খণ্ড মাত্র হীরক পাওয়া যায়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, আফ্রিকার হীরক-খনির মধ্যে 'কিম্বারলে' ও "দবিয়ার সন্স" এই দুইটি প্রধান। ওয়েস্‌লেটন খনি "দবিয়ার সন্সের" অন্তর্গত। অন্যান্য হীরক-খনিতে যেরূপ উপরে আচ্ছাদন থাকে ও তন্নিম্নে হীরকের জন্য প্রস্তর-খননকার্য্য চলিতে থাকে, ইহাতে সেরূপ হয় না। ( চিত্র ৮ )

চিত্র নং ৮

আফ্রিকার খনি আবিষ্কারের বহু পূর্ব্বে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ব্রেজিলে তেজুকোর পশ্চিমে একটি স্থানে হীরক প্রথম আবিষ্কৃত হয়, সেই স্থানটি পরে ডায়মাণ্টিনা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ব্রেজিলের অন্যান্য কতিপয় স্থানে যথা—বাগাজেম্, বাহিয়া ইত্যাদি স্থানে হীরকপ্রাপ্তির কথা শুনা যায়।

য়ুরোপ ভূখণ্ডে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে এ্যাডোলস্কয় স্বর্ণ ( Adolfskoi ) স্বর্ণের জন্য সংগৃহীত প্রস্তরের মধ্যে হীরক আবিষ্কৃত হয়। ল্যাপল্যাণ্ডে একটি উপত্যকামধ্যে হীরক পাওয়া যায়।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে উত্তর-আমেরিকায় ক্যালিফোর্ণিয়ায় প্রথম হীরক আবিষ্কৃত হয়, পরে নানা স্থানে পাওয়া যায়।

মালকা, জাভা, সেলিবিসেও হীরক পাওয়া যায়।

অষ্ট্রেলিয়ায় ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে স্বর্ণের জন্য সংগৃহীত প্রস্তরে হীরক পাওয়া যায়। অষ্ট্রেলিয়ার হীরক আকারে ক্ষুদ্র।

ভারতের হীরক-আকরগুলির বর্ণনা প্রাচীন বহু সংস্কৃত গ্রন্থে লিখিত আছে। পুরাণ ও বহু সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করিয়া ভারতে প্রাপ্ত রত্নরাজির গুণাবলী, আকরের সংক্ষিপ্ত বিবরণী ইত্যাদি বহু তথ্য ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় তাঁহার লিখিত 'মণিমালা' গ্রন্থে প্রকাশ করেন। নিম্নলিখিত স্থান কয়টিতে হীরকপ্রাপ্তির কথা শুনা যায়।

১। হৈম ( হিমালয় )।
২। মাতঙ্গ ( কৃষ্ণা, গোদাবরী অর্থাৎ গোলকোণ্ডা )।
৩। সৌরাষ্ট্র ( সুরাট )।
৪। পৌণ্ড্র ( ছোটনাগপুর )।
৫। কলিঙ্গ ( উড়িষ্যা ও গোদাবরীর মধ্যস্থ প্রদেশ )।
৬। কোশল ( অযোধ্যা )।
৭। বেণগঙ্গা ( বাইন্ গঙ্গা )।
৮। সৌবীর ( সারহিন্দ্ ও সিন্ধু নদের মধ্যস্থ প্রদেশ )।

উপরি-উক্ত প্রাচীন স্থানগুলির পার্শ্বে তাহাদিগের আধুনিক নাম লিখিত হইল। মিঃ বল্ কয়েকটি প্রবন্ধে উপরি-উক্ত স্থানগুলিতে বর্ত্তমানকালে হীরক পাওয়া যায় কি না, আলোচনা করেন। তাঁহার মতে মহারাজ সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় বৃহৎ সংহিতা হইতে উপরি-উক্ত বিবরণী সংগ্রহ করিয়াছেন। মিঃ বল্ দেখান যে, হিমালয় প্রদেশে হীরক-আকর আধুনিক কালে নাই, তবে সিমলার নিকটবর্ত্তী এক নদীগর্ভে কয়েক খণ্ড হীরক পাওয়া গিয়াছিল। ইহা হইতে তিনি অনুমান করেন যে, প্রাচীনকালে এই সকল স্থানে হীরক-খনি থাকা অসম্ভব নহে। দ্বিতীয় স্থান মাতঙ্গ অর্থাৎ গোলকোণ্ডার হীরক আকর সুপ্রসিদ্ধ। সৌরাষ্ট্রে কোন হীরক-আকর নাই ও অনুমান করা হয় যে, প্রাচীনকালে ঐ স্থানে হীরক ক্রয়-বিক্রয় হইত মাত্র। ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ পর্য্যটক ফিট্চ ও নিউবোল্ড বেলগাঁওসহরে যে হীরক ক্রয়-বিক্রয় হইত, তাহার কথা প্রকাশ করেন। সম্বলপুর ও ছোটনাগপুরের কতক অংশের প্রাচীন নাম পৌণ্ড্র। এই দুইটি স্থানে হীরক পরে পাওয়া গিয়াছিল। মহানদীর মোহানা ও সমুদ্র-তীরবর্ত্তী কতিপয় স্থানে হীরক ক্রয়-বিক্রয় হইত, ইহারই প্রাচীন নাম কলিঙ্গ। বেণ-গঙ্গার আধুনিক নাম বৈরাগড়; হীরক-খনি এ স্থানে ছিল। মিঃ বল দেখাইয়াছেন যে, একমাত্র সৌবীর ব্যতীত বিবরণীর অপর সকল স্থল হীরকের সহিত সংশ্লিষ্ট; কোথাও হীরক পাওয়া যাইত—আবার অপর কোথাও হীরক ক্রয়-বিক্রয় হইত।

পাশ্চাত্য ভাষায় ভারতের হীরকখনির বৃত্তান্ত ট্যাভারনিয়ের প্রথম প্রকাশ করেন। তিনি ১৬৬৫—১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে ভারতের হীরকখনিগুলি পরিদর্শন করিয়াছিলেন। হেন্‌রী হাওয়ার্ড, পরে ডিউক অফ নরফোক কতকগুলি অপ্রকাশিত হীরকখনির বিবরণী ১৬৭৭ খৃষ্টাব্দে রয়্যাল সোসাইটীতে প্রেরণ করেন। দুই শত বৎসর পরে মিঃ বল পূর্ব্বোক্ত হীরকখনিগুলির অবস্থা দর্শন করিয়া কয়েকটি প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। ট্যাভারনিয়েরের পর হইতে বহু পাশ্চাত্য পর্য্যটক হীরক-আকরগুলি দর্শন করিয়া নিজ নিজ ভ্রমণ-বৃত্তান্তে প্রকাশ করিয়াছেন। দক্ষিণ-ভারতের হীরক-আকরের কথা হেন, রিটার, নিউবোল্ড লিখিত প্রবন্ধ হইতে আমরা অবগত হই।

এখন দেখা যাউক, ভারতের কোন্ কোন্ স্থলে হীরক-প্রাপ্তির সঠিক খবর আমরা জ্ঞাত। ভারতবর্ষে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন তিনটি বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে হীরক আবিষ্কৃত হয়, ইহা আমরা প্রথমেই দেখিতে পাই। সকল স্থলেই হীরক বহু প্রাচীন ক্যাম্ব্রিয়ান যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের প্রস্তরের সহিত পাওয়া যায়। এই তিনটি ভূখণ্ডের দক্ষিণে বেষ্ট অবস্থিত, তাহাই বিখ্যাত গোলকোণ্ডা খনি বলিয়া পরিচিত।

খনিগুলি কিন্তু গোলকোণ্ডার বহুদূরে অবস্থিত; গোলকোণ্ডায় প্রকৃতপক্ষে কোন খনি ছিল না, এ স্থানে হীরক ক্রয়-বিক্রয় হইত মাত্র। তোগলক্‌বংশের পতনের পর ১৩৯৯ খৃষ্টাব্দে গোলকোণ্ডায় মুসলমানরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, এই রাজ্যের রাজধানী গোলকোণ্ডায়—অধুনা একটি পরিত্যক্ত দুর্গ ব্যতীত প্রাচীন কালের কোন গৌরব-চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হয় না। এই দক্ষিণ ভূখণ্ডে, মাদ্রাজ প্রদেশে পাঁচটি জিলায় (১) কুডাপা, (২) বেল্লারী, (৩) কারনুল, (৪) কৃষ্ণা, (৫) গোদাবরী হীরক সংগৃহীত হইত। এই পাঁচটি জিলার মধ্যে শেষোক্ত তিনটি জিলা হীরক উৎপাদনে অধিকতর প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কৃষ্ণা ও গোদাবরী জিলার খনিগুলিই তথাকথিত গোলকোণ্ডার হীরকখনি বলিয়া পরিচিত। কুডাপা জিলার খনিগুলিকে তিনটি নাম দেওয়া হয়—১। চেন্নুর, ২। কুণাপরতি, ৩। ওবালুমপল্লি। চেন্নুরে পরিত্যক্ত অনেকগুলি হীরকের খাদ দেখিতে পাওয়া যায়। শুনা যায়, এই খনি হইতে দুইটি হীরকখণ্ড আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহাদিগের মূল্য যথাক্রমে ৭৫ হাজার ও ৪৫ হাজার টাকা। কুণাপরতির খনিগুলি ডাঃ হেন ও নিউবোল্ড বর্ণিত কোণ্ডাপেটা খনি। নিউবোল্ড লিখিয়াছেন যে, কোণ্ডাপেটা খনিগুলি চতুষ্কোণাকার এবং ০ হইতে ১২ ফুট পর্যন্ত গভীর। উপরিস্থ মৃত্তিকা কৃষ্ণবর্ণ—স্থানীয় নাম রেগুর, ইহাতে তুলা জন্মে। ৩ হইতে ১০ ফুট গভীর রেগুরের নিম্নে ক্ষুদ্র, বৃহৎ, বহু প্রস্তরখণ্ড পাওয়া যায়; ইহারই মধ্যে হীরক অবস্থান করে। এই প্রস্তরখণ্ডগুলি বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে; ইহারা নিকটস্থ অথবা দূরস্থ পর্ব্বত-গাত্র হইতে নদী কর্ত্তৃক আনীত হইয়া এই স্থলে পুঞ্জীভূত হইয়াছে। এই প্রস্তরখণ্ড খনন করিয়া উপরে উত্তোলিত হইত এবং উচ্চভূমিতে নির্ম্মিত জলপূর্ণ আধারে সযত্নে রক্ষিত হইয়া তন্মধ্য হইতে হীরকখণ্ড নির্ব্বাচন করা হইত। হীরকের আপেক্ষিক গুরুত্ব অধিক, সুতরাং আধারের তলদেশে পতিত হয়। পরে অপ্রয়োজনীয় প্রস্তরখণ্ডগুলিকে পূর্ব্বোক্ত আধারের চতুষ্পার্শ্বে বিস্তারিত করিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হীরক অন্বেষণ করা হইত। জলনিকাশনে সুবিধা ছিল না বলিয়া বর্ষাকালে খনির কার্য্য বন্ধ রাখা হইত।

ওবালুম পল্লীর খনিগুলি সম্ভবতঃ ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হয়।

(২) বেল্লারী জিলায় নিম্নলিখিত স্থান তিনটিতে হীরক পাওয়া যাইত। ১। মুনিমাদাগু। ২। ভাজরাকারুর। ৩। গুটি। বানাগানপিল্লীর ১৬ মাইল পশ্চিম-দক্ষিণে মুনিমাদাগুতে নাতিপ্রশস্ত হীরক-স্তর কুডাপা স্তরের উপর অবস্থিত। নিউবোল্ডের যাওয়ার বহু পূর্ব্বেই এই খনিগুলি পরিত্যক্ত হইয়াছিল, কিন্তু সে সময়েও বহু হীরক-পালিশকারক মুনিমাদাগুতে বাস করিত। যে যন্ত্র-সাহায্যে তাহারা হীরক পালিশ করিত, সে যন্ত্রের প্রতিচিত্র তিনি তাঁহার প্রবন্ধের সহিত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, এখানকার পালিশকরেরা, হীরক-চূর্ণ দ্বারা হীরক-সংস্কার করিতে পারা যায় ও হীরক-কর্ত্তনের সময় স্বাভাবিক ভঙ্গ তলভাগের সাহায্য লইতে হয়, এই তথ্য দুইটি অবগত ছিল। মুনিমাদাগুতে যেরূপ স্তরমধ্যে হীরক পাওয়া যায়, ভাজরাকারুতেও সেরূপ স্তরমধ্যে হীরক পাওয়া যায়। এক পশলা বৃষ্টি হওয়ার পর মৃত্তিকার উপর কখনও কখনও হীরক পতিত হইয়া থাকিতে দেখা যায়। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে মিঃ চ্যাপার এই স্থানের একটি প্রাকারপ্রস্তর-মধ্যে ( Pegmatite Vein ) দুই খণ্ড হীরক পাইয়াছিলেন।

মুনিমাদাগু ও ভাজরাকারুর মধ্যভাগে গুটি খনি অবস্থিত ছিল। এই খনির উল্লেখ ডাঃ হেইনের প্রবন্ধমধ্যে পাওয়া যায়।

(৩) কারনুল জিলায় বহু স্থানে হীরক আবিষ্কৃত হইয়াছে; বানাগানপিল্লী তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ। এই স্থানের হীরক-স্তর বানাগানপিল্লী বালু-স্তর বলিয়া পরিচিত। উত্তর-ভারতে রিওয়া-স্তর যেরূপ হীরক-উৎপাদক, দক্ষিণ-ভারতে বানাগানপিল্লী স্তরও তদ্রূপ। বানাগানপিল্লী কারনুলের ৩৭ মাইল দূরে দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত। হেইন, নিউবোল্ড, ম্যালকমসন, ভয়সে, কিঙ্গ প্রভৃতি পর্য্যটকগণ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রবন্ধে এখানকার খনিগুলির বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন। মিঃ কিঙ্গ বলেন, "বানাগানপিল্লী 'কোয়ার্টজাইট' প্রস্তর ক্ষয় প্রাপ্ত প্রাচীন 'শৈল'স্তর ও অগ্নিজ প্রস্তর ট্রাপ ( trap ) এর উপর অবস্থিত। এই স্তরের গভীরতা ২০ হইতে ৩০ ফুট পর্য্যন্ত হইতে দেখা যায়। প্রায় ১৫ ফুট গভীর গহ্বর খনন করিয়া চক্রবালের সহিত সমান্তরালে সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ করা হয় ও হীরক-স্তরের নিকট উপনীত হওয়া যায়। খনির মধ্যে ৬ ফুট গভীর এক প্রকার স্তর অপেক্ষাকৃত গভীর বালু-স্তরের সহিত অবস্থিত; ইহার মধ্যে হীরক পাওয়া যায় শুনিলাম; উপরে উত্তোলিত হইলে দেখা গেল, ইহা 'কাংগলোমারেট' প্রস্তর। এই স্থানের সমস্ত খনিতেই এই প্রকার প্রস্তরমধ্য হইতে হীরক পাওয়া যায়। ভূমিগর্ভ হইতে কাংগ্‌লোমারেট উত্তোলিত করিয়া চূর্ণ করিয়া ফেলা হয় [illegible] উত্তমরূপে ধৌত করিয়া শুষ্ক হইবার জন্য বিস্তৃত করিয়া রাখা হয়; পরে শুষ্ক-বালু হইতে হীরক নির্ব্বাচন করা হয়। আকারে বৃহৎ হীরকখণ্ড এ স্থানে কখনও পাওয়া গিয়াছে, এমত শুনা যায় না। কারনুল জিলায় অন্যান্য খনিগুলির মধ্যে রামুলকোটা, তিম্মাপুরম, গুরামনকোণ্ডা, ডেওনুরো, বসওয়াপুর ইত্যাদির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। ট্যাভারনিয়ারের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে এ প্রদেশের রাওলকোণ্ডা হীরকখনির কথা পাওয়া যায়। অনুমান করা হয়, প্রাচীন রাওলকোণ্ডার বর্ত্তমান নাম রামুলকোটা। এই রাওলকোণ্ডার খনির বিষয় ট্যাভারনিয়ের এক স্থলে লিখিয়াছেন, "এই স্থানের হীরক-স্তর মাত্র অর্দ্ধ ইঞ্চি হইতে এক ইঞ্চি পুরু। লৌহ-আঁকড়াশী দ্বারা এই স্তরটিকে উপরে উত্তোলন করা হয়। এই স্থানের এক একটি হীরকখণ্ডের মূল্য ২ হাজার হইতে ৬ হাজার স্বর্ণ-মুদ্রা হইতে দেখা গিয়াছে। হীরক কর্ত্তনের জন্য লৌহচক্র ব্যবহৃত হয়।"

(৪, ৫) কৃষ্ণা ও গোদাবরী জিলা ( গোলকোণ্ডা হীরকখনি )। কৃষ্ণা নদীর উপত্যকায় পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে ভ্রমণ করিলে প্রথমেই কোলার খনি আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হয়। পরে যথাক্রমে উশ্‌তাপিল্লী, কেণ্ডাভেতিকালু, আৎকুর, বারথেনিপাডু, পারসিয়ান্‌, মুলাভেলি, গোলাপিল্লী খনি আমরা দেখিতে পাই। আরও একটু পশ্চিমে ডামারপড় ও মালাভরমে পরিত্যক্ত খনি দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাদিগের বিষয় কোন পর্য্যটক উল্লেখ করেন নাই। মিঃ বল বলেন যে, বর্ত্তমান কোলার খনিই ট্যাভারনিয়ের লিখিত গানিকুলুর ও অন্যান্য পর্য্যটকগণ লিখিত গানি খনি। এই কোলার খনি হইতেই সুবিখ্যাত কোহিনুর হীরক আবিষ্কৃত হয়। ট্যাভারনিয়ের যে বৎসর হীরকখনি পরিদর্শন করিতে ভারতে আগমন করিয়াছিলেন, তাহার মাত্র ১ শত বৎসর পূর্ব্বে এই খনিটি আবিষ্কৃত হয়। কথিত আছে, এক কৃষক জমী কর্ষণ করিতে করিতে ৫০ রতি পরিমাণ এক খণ্ড উজ্জ্বল প্রস্তর পাইয়া গোলকোণ্ডার এক হীরক-বিক্রেতার নিকট দেখাইলে সে তৎক্ষণাৎ এই প্রস্তরটিকে হীরক বলিয়া চিনিতে পারে। তখন লোকমুখে ঐ প্রদেশে হীরকপ্রাপ্তির কথা চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইলে বহু ধনী ব্যক্তি অর্থ ব্যয় করিয়া মৃত্তিকা খনন করাইতে আরম্ভ করেন। সে সময়ে ২০ হইতে ৮০ রতি ওজনের বহু হীরক ঐ স্থান হইতে পাওয়া গিয়াছিল। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হীরকের ওজন ১ হাজার ৮ শত রতি পরিমাণ। এই হীরকখণ্ডটি মিরিমগোলা আওরঙ্গজেবকে উপঢৌকন প্রদান করেন। ট্যাভারনিয়ের এই স্থানে ৬০ হাজার মজুর লোককে হীরকখনন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে দেখিয়াছিলেন। তাহাদিগের কার্য্যপদ্ধতি সম্বন্ধে ট্যাভারনিয়ের এক স্থলে লিখিয়াছেন যে, প্রথমেই তাহারা এমন একটি স্থান নির্ব্বাচন করিয়া লইত, যাহার নিম্নে প্রস্তরস্তরমধ্যে হীরকপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। সেই স্থানের অনতিদূরে অপর এক খণ্ড জমী পরিষ্কার করিয়া প্রাচীর দ্বারা বেষ্টন

করিয়া লইত। প্রাচীরের নিম্নভাগে জমীর উপর ২ ফুট অন্তর ছোট ছোট গর্ত্ত চতুর্দ্দিকে খনন করিয়া জলে পূর্ণ করিয়া রাখিত। ইচ্ছামত জল-নির্গমনের ব্যবস্থা ছিল। পরে ১৪ ফুট গর্ব খনন করিয়া হীরকস্তরস্থ মৃত্তিকা উত্তোলন-করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রাচীর-বেষ্টিত জমীর মধ্যে আনয়ন করিয়া গর্ত্তের মধ্যে রাখিয়া দিত। ২।৩ দিন পরে জল-নির্গমনের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিলে কর্দ্দমমিশ্রিত জল বহির্গত হইয়া যাইত। এই ভাবে সমস্ত কর্দ্দম বাহির হইয়া গেলে মাত্র বালি পড়িয়া থাকিত। পরে রৌদ্রে বালি শুষ্ক হইয়া গেলে চাল্‌নির দ্বারা চালিয়া হীরক সংগৃহীত হইত।

পার্‌সিয়াল্‌ খনির সহিত উত্তাপিল্লী, কদাভেটি, কাল্‌, মুগালুর, আটকুর খনিগুলির যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। যে অবস্থায় পারসিয়াল্‌ খনিতে হীরক পাওয়া যায়, অর্থাৎ যেরূপ রূপান্তরিত ( Metamorphosed ) প্রস্তর-স্তরের উপর অবস্থিত নদী কর্ত্তৃক কারনুল প্রস্তর হইতে আনীত প্রস্তর-স্তরে হীরক পাওয়া যায়, সেই-ভাবে উপরি-উক্ত প্রত্যেক খনিতে হীরক পাওয়া যাইত। মুলেলি ও গোলাপিল্লী এই দুইটি গ্রামের মধ্যবর্ত্তী খনিগুলি এক শ্রেণীভুক্ত। ডাক্তার হেইনী, ভ্যলে, বেঙ্গা, নিউবোল্ড প্রভৃতি প্রত্যেকেই এই খনির বিষয় কিছু না কিছু লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সময়েই কার্য্য-বন্ধ হইয়া যায়। মিঃ কিঙ বলেন যে, ডুডুগট্‌ পাহাড়ের বালু-স্তর হীরকপ্রাপ্তির জন্য খনিত হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত পর্য্যটকগণ হীরক-স্তরের সহিত অপর একটি কঙ্কর-স্তরের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ডাক্তার বেল্লারোর মতে সেই স্তরটি সামুলকোটার পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল; সামুলকোটার ঐ স্তর হইতে হীরক পাওয়া যায়। আরও একটু উত্তরে ভদ্রচেলমে গোদাবরী-তীরে হীরক-খনির কথা ভ্যলে ও নিউবোল্ড উল্লেখ করিয়াছেন।

দ্বিতীয় খণ্ড বেহার ও উড়িষ্যার মহানদীর উপত্যকায়, পশ্চিমে মধ্যদেশে, উত্তরে শোণ নদীর একটি শাখা-নদীর উপত্যকায় বিস্তৃত। দ্বিতীয় ভূখণ্ডের অন্তর্গত সম্বলপুরের নিকটবর্ত্তী হীরাকুণ্ডে হীরক পাওয়া যাইত। সম্বলপুর-রাজার অধীনে এই খনিটি ছিল। ঝুনাল্‌ গ্রামের এক বৃদ্ধা 'ঝি'র ( হীরক-সংগ্রাহক ) নিকট অনুসন্ধান করিয়া ও অন্যান্য বহু স্থান হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া বল লিখিয়াছেন যে, মহানদীর মধ্যভাগে ঝুনালের নিকট একটি দ্বীপ ছিল, এই দ্বীপটির নাম 'হীরাকুণ্ড।' দৈর্ঘ্যে ইহা ৪ মাইল। নদীস্রোত দ্বিখণ্ডিত হইয়া ইহার উভয় পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইত। বৈশাখের খরতপ্ত সূর্য্য-কিরণে নদীর জল যথেষ্ট হ্রাস পাইলে ৪।৫ হাজার লোক মিলিত হইয়া উত্তরের জলপ্রবাহের গতি বাঁধ দিয়া রুদ্ধ করিয়া দিলে সমস্ত জল দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়াই প্রবাহিত হইত। তখন নদী-গর্ভের প্রস্তর-খণ্ডের মধ্য হইতে হীরক সংগ্রহ করা হইত। এই অনুসন্ধানকালীন স্বর্ণ পাওয়া গেলে তাহা 'ঝি'দিগের প্রাপ্য ছিল। যদি কোন 'ঝি'র ভাগ্যবলে এক খণ্ড হীরক পাইত, তাহা হইলে রাজা সেই হীরকটির পরিবর্ত্তে তাহাকে একখানি গ্রাম দান করিতেন।

গঙ্গা-গর্ভে হীরকপ্রাপ্তির কথা কেহ কেহ বলেন, কিন্তু কোন বিবরণী লিপিবদ্ধ নাই। মিঃ ব্লচম্যান আইন-ই-আকবরি হইতে সঙ্কলন করিয়া বলেন যে, হির্‌পা গ্রামে হীরক পাওয়া গিয়াছিল। এই গ্রামটি বর্দ্ধমান জিলায় অবস্থিত।

সিমলার নিকটবর্ত্তী একটি পার্ব্বত্য নদীতে কয়েক খণ্ড হীরক পাওয়া যায়; কলিকাতার মিউজিয়মে ঐগুলি রক্ষিত আছে।

তিনটি মুখ্য স্থানের মধ্যে ২টির বৃত্তান্ত লিখিত হইল। তৃতীয়টি মধ্যপ্রদেশের বুন্দেলখণ্ডে অবস্থিত। বুন্দেলখণ্ডের একটি দেশীয় রাজ্য পান্নার নিকটে অধিকাংশ খনি অবস্থিত। বুন্দেলখণ্ডের খনিগুলি 'পান্না খনি' বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ। নিম্নলিখিত স্থান কয়টিতে হীরক-প্রাপ্তির কথা শুনিতে পাওয়া যায়, যথা,—পান্না, কামারিয়া, ব্রিজ-পুর, মাজগোহা, উদ্‌সেনা, সাকারিয়া, এট্‌ওয়া ইত্যাদি।

পান্নার হীরক-খনির নাম টাভার্‌নিয়েরের ও অন্যান্য পর্য্যটকদের তালিকামধ্যে নাই, সুতরাং মনে হয়, ইহা বহু পরে আবিষ্কৃত হয়। পান্নায় অগভীর কন্‌গলোমারেট স্তরমধ্যে হীরক পাওয়া যায়, এই স্তরটি উপর কাইমুর বালুস্তর ও পান্না শেলের মধ্যে অবস্থিত; এই স্তরটি কোথাও ২ ফুট অপেক্ষা অধিক গভীর নহে। এই স্থানের অপর একটি হীরক-স্তর রিওয়া বালু-স্তরের উপর ও ভাণ্ডের সিরীজের নিম্নে অবস্থিত। উভয় স্থানেই কান্‌গেলোমারেট স্তর-মধ্যে হীরক পাওয়া যায়, তবে এই স্থানের কন্‌গলোমারেট বহু স্ফটিকখণ্ড ও জ্যাসপার আছে। কন্‌গলোমারেট স্তর ব্যতীত নদীগর্ভে ও পার্শ্বে কখনও কখনও হীরক পাওয়া যায়। ভূতত্ত্বে জলজ স্তরগুলিকে বয়স হিসাবে বিভক্ত করা হইয়াছে। হীরক কিরূপ স্তরের মধ্যে পাওয়া যায়, তাহা নিম্নে লিখিত বিবরণী দৃষ্টে বোধগম্য হইবে।

ভাণ্ডের বিভাগ—গন্নুরগড় শেল।

হীরক-সমন্বিত কংগলোমরেট স্তর—

রিওয়া বিভাগ—উচ্চরিওয়া বালুস্তর, ঝিরি শেল, নিম্ন রিওয়া বালুস্তর, পান্না শেল।

হীরক-সমন্বিত—কংগ্‌লোমারেট স্তর—

কাইমুর বিভাগ—উচ্চ কাইমুর বালু-স্তর, কাইমুর কংগ্‌লোমারেট, বিজয়গড় 'শেল', নিম্ন কাইমুর বালুস্তর।

এই স্তরগুলির মধ্যে কাইমুর বিভাগীয় স্তরগুলি বয়সে সর্ব্ব-প্রাচীন। মিঃ ভ্রেডেন্‌বর এই প্রদেশে তিন প্রকার পদ্ধতি অবলম্বনে হীরকখননকার্য্য দেখিয়াছিলেন।

(১) ৫০ ফুট গভীর গর্ত্ত খনন করিয়া কংগ্‌লোমারেট স্তর খনন করিয়া উপরে উত্তোলিত হয়। যথাসম্ভব হীরক বাহির করার পর খনি পরিত্যক্ত হয়।

(২) হীরক-স্তরের আবরণ শেল-স্তর নদী কর্ত্তৃক ক্ষয় পাইয়া যাওয়ায় হীরক-স্তর উপরিভাগে দৃষ্টিগোচর হয়, সুতরাং এ ক্ষেত্রে গর্ত্ত খনন করিবার প্রয়োজন হয় না। কার্য্য অত্যন্ত সহজ।

(৩) নদী-পলি যেখানে 'কংগ্‌লোমারেট' স্তরের সহিত মিলিত হইয়াছে, সে স্থানে ৩০।৪০ ফুট গভীর গর্ত্ত খনন করিয়া প্রস্তর উপরে উত্তোলিত হয়, এই প্রস্তরের স্থানীয় নাম 'মুন্দা।' *

মধ্যভারতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে যত হীরক আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার এক তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল। মাদ্রাজ প্রদেশ হইতে আর হীরক পাওয়া যায় না।

| খৃষ্টাব্দ | ক্যারাট | মূল্য | লোক নিযুক্ত |
|---|---|---|---|
| ১৯১৪ | ৫৪·৬৫ | ৭৯১ | ৯১৩ |
| ১৯১৫ | ৩৫·৯৯ | ৬০৩ | ৫৫৫ |
| ১৯১৬ | ২০·৪২ | ৩৬১ | ৬১৪ |
| ১৯১৭ | ২৮·৫২ | ১৭০০ | ৫১৯ |
| ১৯১৮ | ৭৩·২৯ | ২৬২৫ | ২৩৭৫ † |

এই পান্না হীরকখনি হইতে পূর্ব্বে বহু হীরক আবিষ্কৃত হইত। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার হ্যামিণ্টন এই স্থানের খনি হইতে প্রাপ্ত এক খণ্ড হীরকের ৫০ হাজার টাকা মূল্য হইতে দেখিয়াছেন। আকবরের সময়ে বাৎসরিক ৮ লক্ষ টাকা মূল্যের হীরক উত্তোলিত হইত। বাৎসরিক ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা মূল্যের হীরক প্রাপ্ত হইতে ফ্রাঙ্কলিন সাহেব দেখিয়াছিলেন। ইহার এক-চতুর্থাংশ পান্নারাজের প্রাপ্য ছিল, অবশিষ্টাংশ বাঙ্গা, চার্‌খারি, জয়েৎপুররাজের প্রাপ্য ছিল। ‡

---

* Rec. Geol. Survey of India vol xxxiii, by Vredenburg.

† Rec, Geol, Survey vollii, by Pascoe,

‡ Ball's The Ceology of India, part iii.

পৃথিবীর কোথায় কি অবস্থায় হীরক আবিষ্কৃত হয়, তাহা লিখিত হইল। কিন্তু কিরূপে তাহারা খনিমধ্যে প্রবেশ করিল, তাহাদের উৎপত্তির সঠিক ইতিহাস কি, এই তথ্য অবগত হইবার জন্য বৈজ্ঞানিকগণ বহু দিন হইতে গবেষণা করিয়া আসিতেছেন। ব্রিউষ্টার এই বিষয় লইয়া গবেষণা করিয়া প্রথম এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন যে, উদ্ভিদাদি হইতে নির্গত এক প্রকার রজন তুলা পদার্থ জমিয়া হীরকে পরিণত হয়। পরে বহু মতবাদ সৃষ্ট হয়। কিন্তু সকলেই এই বিষয়ে একমত হয়েন যে, উদ্ভিদাদি অথবা প্রাণি-শরীর পচিয়া যে অঙ্গার সৃষ্ট হয়, হীরক তাহারই উপাদান, কিন্তু কিরূপে অঙ্গার রূপান্তর গ্রহণ করিয়া হীরকে পরিণত হইল, ইহার বিভিন্ন মতবাদ দেখিতে পাই। কেহ কেহ বলেন যে, প্রবল উত্তাপ দ্বারা অঙ্গার হইতে হীরক সৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু পরে যখন দেখা গেল, প্রবল উত্তপ্ত অঙ্গার গ্রেফাইটে রূপান্তরিত হয়, তখন তাঁহারা বলিতে আরম্ভ করেন যে, ভৌগর্ভিক মহাশক্তি-ক্রিয়ার ফলে এই অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে। মিঃ প্যারটের ধারণা, অত্যুগ্র জ্বলন্ত অঙ্গার সহসা শীতল হওয়ার ফলে হীরক সৃষ্ট হইয়াছে। দক্ষিণ-আফ্রিকার হীরক-স্তরগুলি পরীক্ষা করিয়া লিউইস্ সাহেব অনুমান করেন যে, গলিত প্রস্তর ভূগর্ভ হইতে উত্থিত হওয়া কালীন অঙ্গারক-শেল হইতে অঙ্গার গ্রহণ করে এবং কঠিন অবস্থায় রূপান্তরিত হওয়ার সময়ে অঙ্গার হীরকে পরিণত হয়।

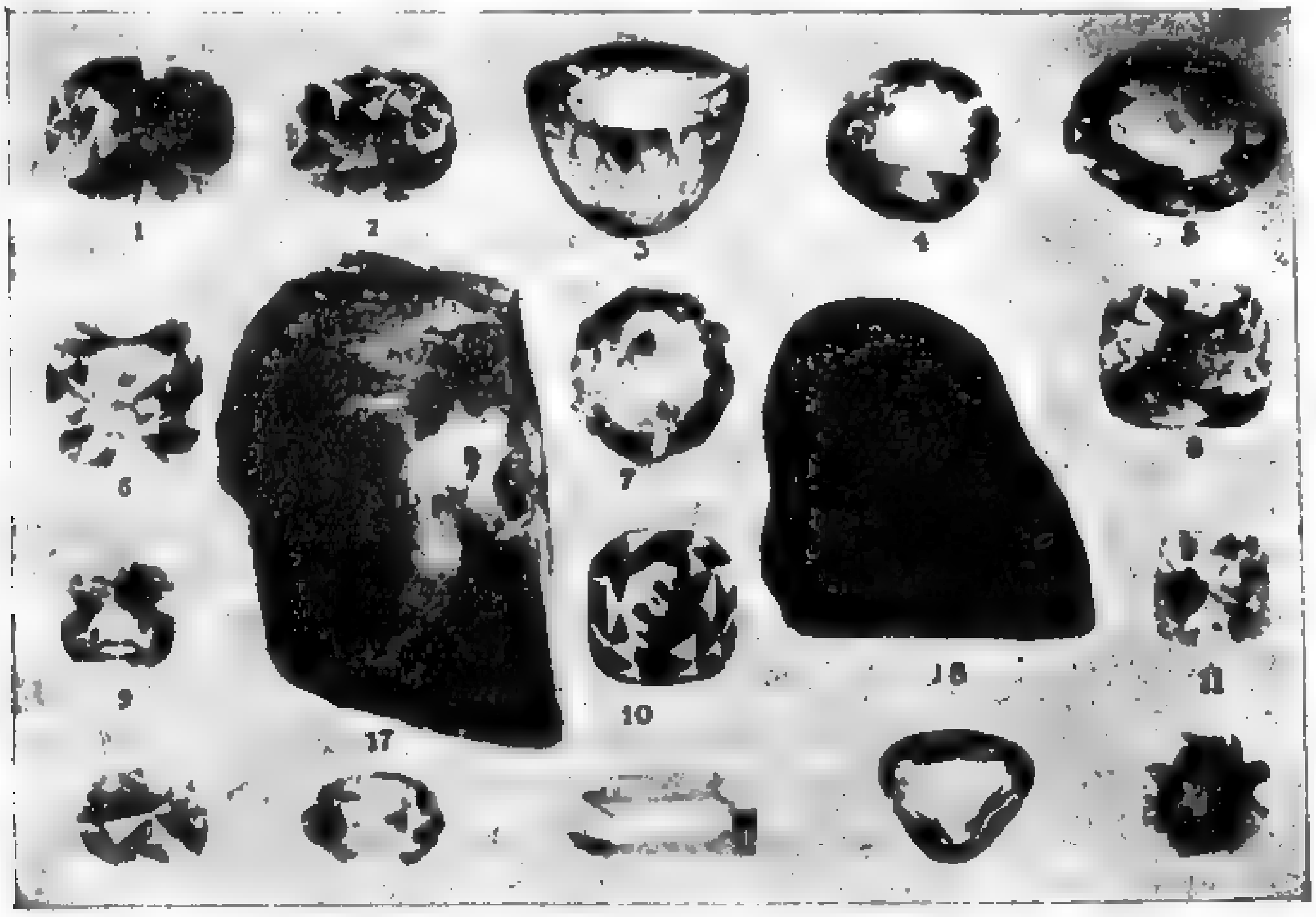

চিত্র নং ৯

এখন দেখা যাউক, পরীক্ষাগারে কিরূপে হীরক নির্ম্মিত হইতে পারে। ময়সান ( Moissan ) বৈদ্যুতিক চুল্লী ( Electrical arc furnace ) মধ্যে হীরক নির্ম্মাণ করিয়াছেন। পরে সার উইলিয়াম ক্রুকস্ মহাশয় বহু পরিশ্রম করিয়া ময়সানের বৈদ্যুতিক মহানলে কয়েক খণ্ড হীরক প্রস্তুত করেন।

হীরক-প্রস্তুত-প্রণালী,—"অমিশ্র লৌহ, গন্ধক, সিলিকন্, ফস্ফরাস্ বিহীন ও শর্করাজাত অঙ্গার উভয় পদার্থ মিশ্রিত করিয়া অঙ্গার-পাত্রে ( Carbon crucille ) রাখিয়া বৈদ্যুতিক মহানলে ৪০হাজার ডিগ্রী পরিমাণ তাপ প্রদান করিলে দেখা যায়, লৌহ মোমের মত দ্রবীভূত হইতে আরম্ভ করে। পরে সেই অগ্ন্যুত্তপ্ত পদার্থটিকে বাহিরে আনয়ন করিয়া শীতল জলের মধ্যে স্থাপন করিলে গলিত লৌহ কঠিন হওয়া কালীন আয়তনে বৃদ্ধি পায় ও মধ্যস্থ অঙ্গারকে প্রবলবেগে চাপিতে থাকে; অঙ্গারও আয়তনে বৃদ্ধি পায়; আয়তনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত পদার্থের পাত্রমধ্যে স্থান না হওয়ার জন্য পরস্পর পরস্পরকে প্রবল শক্তিতে ঠেসিতে থাকে। এই ঠেসাঠেসি অর্থাৎ চাপনের ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হীরকখণ্ড নির্ম্মিত হয়। আকারে ইহা ক্ষুদ্র হইলেও বাহ্যাবয়বে, বর্ণে, স্বচ্ছতায় প্রকৃত হীরকাপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে।" * ভীষণ চাপনের ফলে সৃষ্ট হীরকখণ্ড কিছু দিন পরে আপনা আপনি ভগ্ন হইয়া যায়। আমরা জানি যে, বহু হীরকখণ্ড ভূগর্ভ হইতে উত্থিত করিয়া উপরে আনিবার সময় বিদীর্ণ হইয়া যায়। আফ্রিকার হীরক-খনির বিভিন্ন স্তরে প্রাপ্ত কয়েক অংশ হীরক একত্র সংযোজিত করিয়া একটি হীরকে পরিণত করা গিয়াছিল, ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, নীল মৃত্তিকা-স্তরে হীরক সৃষ্ট হয় নাই, পরন্তু বহু নিম্নে ভূগর্ভে অত্যধিক চাপের ফলে ঐগুলি সৃষ্ট হইয়াছিল, পরে উপরে উত্থিত হওয়া কালীন চাপের হ্রাস হয় ও ঐগুলি বিদীর্ণ হইতে আরম্ভ করে।

মূল কথা, হীরকসৃষ্টির প্রকৃত রহস্য আমরা সঠিক অবগত নহি। যাহা অনুমান করা হয়, তাহা এখনও সম্যক্রূপে প্রমাণিত হয় নাই, অদূর-ভবিষ্যতে যে এই বিষয়ে অধিকতর অবগত হইব, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

অনেকের মতে উল্কাপতনের সহিত হীরক পৃথিবীপৃষ্ঠে পতিত হয়। যে সকল স্থানে হীরক আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেই সেই স্থানে প্রাগৈতিহাসিক সময়ে উল্কা পতিত হইয়াছিল; কোথাও মৃত্তিকা নরম বলিয়া গলিত পিণ্ড পৃথিবী-গর্ভে কিয়দ্দূর প্রবিষ্ট হইয়াছে, অপর কোন স্থানে মৃত্তিকা কঠিন বলিয়া পৃথিবীমধ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই। পরে জল, বাতাসের সংস্পর্শে তাহারা ক্ষয় পায় ও তাহাদের সকল চিহ্ন লুপ্ত হইয়া যায়, কিন্তু হীরক সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন বলিয়া ক্ষয় পায় নাই; বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। এ্যারিজোনা প্রদেশের এক স্থানে ক্ষুদ্র বৃহৎ ০২ হাজার লৌহ-খণ্ড ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া থাকিতে দেখা গিয়াছে। এক বৃহৎ উত্তপ্ত লৌহখণ্ড কোন স্থলে পতিত হইলে যেমন একটি গহ্বর সৃষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ একটি গহ্বর এই স্থানে দৃষ্টিগোচর হয়। ইহা হইতে অনুমান করা হয়, কোন সময়ে এখানে উল্কাপাত হইয়াছিল। ডাক্তার ফুটে এক খণ্ড লৌহমধ্যে হীরকের কণা আছে, ইহা পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারিয়াছেন। পরে অধ্যাপক ময়স্যান্ ক্রিডেল্ স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ কয়েকটি হীরক-কণা লৌহমধ্য হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন। উপরি-উক্ত তথ্য সত্য হইলে উল্কাপাতের বিভীষিকা আমাদিগকে ভীত করিতে পারিবে না। হীরকখচিত উল্কার আগমন শুভ চিহ্ন বলিয়া সূচিত হইবে।

## ঐতিহাসিক হীরক

আকারে বৃহৎ হীরক সচরাচর পাওয়া যায় না। কচিৎ কখনও যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা কোন নাম গ্রহণ করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। অধিকাংশ প্রসিদ্ধ হীরক ভারতের খনি হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। কয়েকটি বিখ্যাত ঐতিহাসিক হীরকের ( চিত্র নং ৯ ) সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নে লিখিত হইল :—

(১) "কোহিনূর" :—১৩০৪ খৃষ্টাব্দে এই হীরকটি মোগল-সম্রাটের

---

* Diamond by Sir William Crookes.

হস্তে পতিত হয়। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে নাদির শাহ দিল্লী লুণ্ঠন করিয়া এই হীরকটি হস্তগত করেন। পরে তাঁহার মৃত্যুর পর এই হীরকটি বিভিন্ন ব্যক্তির হস্ত ঘুরিয়া পঞ্জাবাধিপতি রণজিৎ সিংহের অধীনে আইসে। শিখসাম্রাজ্যের পতন হইলে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইহাকে হস্তগত করেন। লর্ড ডালহৌসী মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে ইহা উপহার প্রদান করেন। এই ভাবে এই বিখ্যাত হীরকটি ভারত হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া ইংলণ্ডের রাজমুকুটে শোভা বৃদ্ধি করিতেছে। প্রবাদ আছে যে, এই হীরকটি দক্ষিণ-ভারতের কোলার খনিতে আবিষ্কৃত হয়।

(২) "লোত্‌ রি দ এ্যাঙ্গলেতর" :—ওজন ৪৯ ক্যারাট্।

(৩) "হাইদ্রাবাদ নিজাম" :—নিজামের সম্পত্তি। ইহার ওজন ৩ শত ৪০ ক্যারাট ছিল, কিন্তু সিপাহী-বিদ্রোহের সময় ইহা ভগ্ন হইয়া যায়। ইহার বর্ত্তমান ওজন ২ শত ৭৯ ক্যারাট্।

(৪) "অর্‌লফ" :—রুস রাজবংশ ধ্বংসের পর সোভিয়েট্ গভর্ণমেণ্টের অধীনে এই হীরকটি আইসে। কথিত আছে, এই হীরকটি এক সময়ে ত্রিচিন্নাপল্লীর নিকটবর্ত্তী কাবেরীতটস্থ একটি মন্দিরে ব্রহ্মামূর্ত্তির নয়নরূপে বিরাজ করিত। সেই স্থান হইতে জনৈক ফরাসী সৈনিক ইহাকে অপহরণ করিয়া এক জাহাজের কাপ্তেনকে বিক্রয় করে। প্রিন্স অরলফ্ ৯০ হাজার পাউণ্ড মূল্যে এক বণিকের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া জার-মহিষী দ্বিতীয় ক্যাথারিণকে উপহার প্রদান করেন।

৫। "কোহিনূর"—প্রথম কর্ত্তনের পর ওজন ২ শত ৭৯ ক্যারাট্।

৬। "পিট"—ওজন ১ শত ৩৭ ক্যারাট্। ১৭০১ খৃষ্টাব্দে পারসিয়াল (গোলকোণ্ডা) খনিতে ইহা আবিষ্কৃত হয়। ইহার ওজন তখন ৪০১ ক্যারাট্ ছিল। মাদ্রাজের গভর্ণর উইলিয়াম পিট ইহা ৩ লক্ষ ৬ সহস্র টাকায় ক্রয় করেন। পরে ৭৫ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া ইংলণ্ডে তিনি ইহাকে কর্ত্তন করান ; কর্ত্তন করিবার সময়ে ইহার চূর্ণ বিক্রয় করিয়া তিনি ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা পাইয়াছিলেন। কর্ত্তনের পর ইহার ওজন ১ শত ৬৩ ক্যারাট্ হয়। তিনি পরিশেষে ফরাসী রাজপ্রতিনিধিকে ২০ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার বিক্রয় করেন। ফরাসী-বিপ্লবের সময় ইহা দস্যু কর্ত্তৃক অপহৃত হয়, কিন্তু ঐ দস্যু বিক্রয়ে অসমর্থ হইয়া অক্ষত অবস্থায় প্রত্যর্পণ করে। এই হীরকটি এখন প্যারিসের প্রদর্শনীতে রক্ষিত আছে।

৭। "টাস্‌কানি"—ওজন ১ শত ৩৩ ক্যারাট্। বর্ণ ঈষৎ হরিদ্রাভ ; এই বর্ণের জন্ম হীরকটির মূল্য হ্রাস না পাইয়া বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা প্রথমে টাস্‌কানির ডিউকের সম্পত্তি ছিল, পরে অষ্ট্রিয়ার সম্রাটের হস্তগত হয়।

৮। "ষ্টার অফ্ দি সাউথ"—১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ব্রেজিলে বাগাজেম হীরকখনিতে ইহা আবিষ্কৃত হয়। ইহা স্বচ্ছ ও বর্ণহীন—বর্ত্তমান ওজন ১ শত সাড়ে ২৫ ক্যারাট্। কর্ত্তনের পূর্ব্বে ৬ লক্ষ টাকায় ইহা বিক্রীত হয়।

৯। "পোল ষ্টার"—৪০ ক্যারাট্—ব্রিলিয়াণ্ট আকারে কর্ত্তিত। জনৈক রুসীয় ধনী ব্যক্তির সম্পত্তি।

১০। "টিফানি"—১২৫½ ক্যারাট্। বর্ণ ঈষৎ লোহিতাভ পীত। নিউ ইয়র্কের বিখ্যাত জুয়েলার টিফানি এণ্ড কোম্পানীর সম্পত্তি।

১১। "হোপ"—নীলবর্ণ—৪৪ ক্যারাট্। ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে টাভারনিয়ের কোলার খনি হইতে সংগ্রহ করিয়া ফরাসী-সম্রাট চতুর্দ্দশ লুইকে বিক্রয় করেন। তখন ইহার ওজন ৬৭ ক্যারাট্ ছিল। ফরাসী-বিপ্লবের সময় ইহা অপহৃত হয়। বহু দিন পরে লণ্ডনের এক হীরক-ব্যবসায়ীর নিকট ইহার সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁহার নিকট হইতে ২ লক্ষ ৭০ হাজার টাকায় টমাস্ ফিলিপ হোপ ক্রয় করিয়া, ১২ লক্ষ টাকায় হাবিব বেকে বিক্রয় করেন। এক বৎসর পরে প্যারিসের নীলামে হীরক-ব্যবসায়ী রোজিনান্ মাত্র ২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকায় ক্রয় করিয়া ১৯১১ খৃষ্টাব্দে এডওয়ার্ড ম্যাকলিনকে [illegible] লক্ষ টাকায় বিক্রয় করেন। একই প্রকার ৩ খণ্ড হীরক পাওয়া যায়, ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, ট্যাভারনিয়েরের হীরকটি পরে তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল।

১২। "সান্সি"—২৩টি হীরক এই নামে পরিচিত। চার্লস্ দে বোল্ডএর মৃত্যুর পর নিকোলাস্ সান্সি ইহাকে সংগ্রহ করিয়া রাণী এলিজাবেথকে বিক্রয় করেন ; ১ শত বৎসর পরে ইংলণ্ডরাজ দ্বিতীয় জেমস্ ফরাসী নৃপতি চতুর্দ্দশ লুইকে বিক্রয় করেন। ফরাসী-বিপ্লবের সময় ইহা অপহৃত হয়।

১৩। "ইউজিন সাম্রাজ্ঞী"—৫১ ক্যারাট্। রুসের জার-মহিষী দ্বিতীয় ক্যাথারিণ জনৈক ব্যক্তিকে ইহা উপহার প্রদান করেন। পরে তৃতীয় নেপোলিয়ান তাঁহার নব-পরিণীতা বধূর জন্য ক্রয় করেন। ফরাসী রাজবংশের ধ্বংস হইলে বরোদার গাইক্‌ওয়াড় ক্রয় করিয়া লয়েন।

১৪। "সা"—৮৬ ক্যারাট্। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে এই হীরকটি পারস্য-রাজপুত্র Chosroes জার নিকোলাসকে উপঢৌকন প্রদান করেন। সেই সময়ে শুনিতে পাওয়া যায় যে, হীরকে ৩টি ভগ্ন পৃষ্ঠ ছিল ও তিন স্থলেই পারস্য-সম্রাটের নাম অঙ্কিত থাকে। কর্ত্তিত হওয়ার পর ইহার ওজন স্বভাবতঃ হ্রাস হইয়া যায়।

১৫। "নাসক"—ওজন ৯০ ক্যারাট্। দক্ষিণ-ভারতের একটি হীরকখনিতে আবিষ্কৃত হয় ও ভারতীয় জনৈক নৃপতি ক্রয় করেন। কিন্তু পরে সে স্থান হইতে অপহৃত হইয়া ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের এক নীলামে ওয়েষ্ট মিনিষ্টারের ডিউক ক্রয় করিয়া লয়েন।

১৬। "পাশা"—৪০ ক্যারাট্। ইজিপ্টের ভাইস্‌রয় ইব্রাহিম ৪ লক্ষ ২০ হাজার টাকায় ক্রয় করেন।

১৭। "কলিনন্"—৩ হাজার ২৫ ক্যারাট্। এই হীরকটি ট্রান্সভালের প্রিটোরিয়া খনি হইতে আবিষ্কৃত হয় ; ওজনে এত বড় হীরক আর কোথাও পাওয়া যায় নাই। ট্রান্সভাল গভর্ণমেণ্ট ২২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকায় ইহা ক্রয় করিয়া ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ডের জন্মদিবসে উপহার প্রদান করেন। পরে এই হীরকটিকে দুই খণ্ডে বিভক্ত করা হয়। ইহা ইংলণ্ডের রাজমুকুট ও রাজদণ্ডের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে।

১৮। "এক্‌সেলসর"—কলিনন্ আবিষ্কারের পূর্ব্বে দক্ষিণ-আফ্রিকার হীরকের মধ্যে ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত ছিল। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে জগরেস্‌ফণ্টাইন্ হীরকখনি হইতে ইহা আবিষ্কৃত হয়।

উপরি-উক্ত হীরকগুলি ব্যতীত বহু প্রসিদ্ধ হীরক পৃথিবীর বহু স্থানে আছে। কয়েকটির কথা লিখিত হইল।

"মোগল"—ওজন ৭ শত ৮৭ ক্যারাট, ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে কোলার খনিতে ইহা আবিষ্কৃত হয়। ট্যাভারনিয়ের ইহার বর্ণনা করিয়াছেন।

"আকবর শাহ"—বরোদার গাইকওয়াড় সাড়ে ৩ লক্ষ টাকায় ইহা ক্রয় করেন।

"দারয়াই-নোর"—নাদির শাহ দিল্লী লুণ্ঠন করিয়া ইহা হস্তগত করেন। এক আফগান সৈনিক অপহরণ করিয়া লয়। পরে বহু হস্তান্তরিত হইলে রুসিয়ার জার ক্রয় করিয়া লয়েন। রাজবংশ ধ্বংসের পর সম্ভবতঃ সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের নিকট আছে।

"নেপোলিয়ান", "কিম্বরল্যাণ্ড" ইত্যাদি বহু হীরকের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

শ্রীশিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

# প্রতারক

## ২৮

তিমিরাবগুণ্ঠিতা রজনী, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, প্রকৃতি গম্ভীরা। ইডেন উদ্যান ক্ষণপূর্ব্বে লোক-কোলাহলমুখরিত ছিল বটে, কিন্তু এই মাত্র জনশূন্য হইয়াছে। এই লোক-বিরল রজনীতে সার্পেণ্টাইন খালের তটস্থ কাষ্ঠাসনে বসিয়া একা বিমলেন্দু রায়।

মেঘের পর মেঘ আকাশকে ছাইয়া ফেলিতেছে, দুই একবার বিদ্যুৎ হানিতেছে, ক্ষণপরেই বৃষ্টি নামিবে। সে দিকে বিমলেন্দুর দৃষ্টি ছিল না। সে তন্ময় হইয়া খালের জলরাশির দিকে নির্নিমেষনয়নে চাহিয়া ছিল। তাহার মনের মধ্যে তখন ভাবসমুদ্রের কি তরঙ্গভঙ্গ হইতেছিল, সে-ই বলিতে পারে।

উদ্যানের এক জন শান্তিরক্ষক দূর হইতে তাহাকে দেখিয়াছিল, নিকটে আসিয়া স্থান ত্যাগ করিতে বলিল, তখন রাত্রি গভীর। বিমলেন্দুর সমাধিভঙ্গ হইল, সে ধীরে ধীরে উদ্যানের বাহির হইয়া গেল।

তখন মাঝে মাঝে মেঘগর্জ্জন হইতেছিল, মুহূর্ত্ত পরেই বিন্দু বিন্দু বারিপাত হইতে লাগিল, কিন্তু প্রবল বায়ুতাড়নায় মেঘ সরিয়া যাইতেছিল বলিয়া আশানুরূপ বারিপাত হইল না।

বিমলেন্দুর অঙ্গে বারি বর্ষিত হইল, কিন্তু তখনও তাহার সে দিকে লক্ষ্য ছিল না। তাহার গতির একটা লক্ষ্য ছিল বলিয়াও অনুমিত হইল না। সে ময়দানের উপর দিয়া দক্ষিণমুখে অগ্রসর হইল। তখন আবার আকাশ হইতে বিন্দু বিন্দু বারিপাত হইতেছিল। বিমলেন্দুর সর্ব্বাঙ্গ জলসিক্ত হইল, আর্দ্র কেশ হইতে জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। বোধ হয়, তখনও বিমলেন্দুর সে দিকে দৃষ্টি নিপতিত হয় নাই,—সে আর্দ্রবসনেই লক্ষ্যহীন অবস্থায় শূন্য দৃষ্টিতে দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইতেছিল।

এমনই তন্ময় অবস্থায় সে কতক্ষণ পথ চলিয়াছে, তাহা জানিতেই পারে নাই। যখন তাহার চৈতন্য হইল, তখন দেখিল, সে কালীঘাটের আদিগঙ্গার ঘাটে উপনীত হইয়াছে। তখন ঘাট জনশূন্য। শ্রান্ত বিমলেন্দু ঘাটে উপবেশন করিল। গঙ্গার তখন পূর্ণ জুয়ার। বৃষ্টি তখন থামিয়াছে বটে, কিন্তু বায়ুর বেগ উপশমিত হয় নাই। বায়ুতাড়নায় দেশীয় নৌকাগুলি গঙ্গাতরঙ্গে নাচিতেছিল—তাহাদের দীপশিখাও সেই সঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া গঙ্গাবক্ষে কত প্রতিবিম্বই ফুটাইয়া তুলিতেছিল! নাতিদূরে নৌকার উপরে মাঝি মনের আনন্দে বাঁশী বাজাইতেছিল, সেই বংশীধ্বনি নীরব নিশীথে মনের মধ্যে অতীতের কত সুখস্মৃতিই জাগাইয়া তুলিতেছিল!

বিমলেন্দুর সে দিকে তখন দৃষ্টি ছিল কি না সন্দেহ। সে তখন কত কি ভাবিতেছিল। ভাবিবার তাহার অনেক ছিল। তাহার ইভ যে দিন তাহাকে ছাড়িয়া ইহলোক হইতে পরপারে চলিয়া গিয়াছে, তাহার পর হইতে আজ এক বৎসরেরও অধিক অতীত হইয়াছে। সে দুষ্টগ্রহের মত—লক্ষ্মীছাড়ার মত আজ এক বৎসরকাল পথে পথে ঘুরিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই শান্তি পায় নাই। সুধাংশুর স্নিগ্ধ রশ্মি বলিয়া সে যাহাকে অঙ্গে ধারণ করিয়াছিল, গ্রহবশে জীবনে মরণে সে তাহার নিকট তপ্ত অঙ্গারের মতই অনুমিত হইয়াছে। প্রথম প্রথম লেফটানেণ্ট সিবরাইট ও পাদরী ডেনিস তাহাকে কত সান্ত্বনা দিয়াছেন ও সংসারী করিবার নিমিত্ত কত আয়াস স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে, সে ক্ষিপ্তের মত মন্দারমালাকে সর্পভ্রমে দূরে পরিত্যাগ করিয়াছে। ক্ষিপ্তের মত দুই মাসকাল সে ইভের প্রতি কৃত পাপের অনুশোচনায় ক্ষতবিক্ষত হইয়া দার্জ্জিলিঙ্গে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইয়াছে, তাহার পর এক দিন কাহাকেও কিছু না জানাইয়া দার্জ্জিলিঙ্গ ত্যাগ করিয়াছে।

সে কতকটা প্রকৃতিস্থ হইলে প্রতিমাকে এক পত্র লিখিয়াছিল। সে পত্রের ছত্রে ছত্রে অনুতাপের জ্বলন্ত রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছিল।—ক্ষমা? কিন্তু এক বিন্দু করুণাও সে তাহার উত্তরে পায় নাই, প্রতিমা পত্রের উত্তরই দেয় নাই। তাহার পর সে ভারতের দিকে দিকে ছুটিয়া বেড়াইয়াছে। অশান্ত প্রেতাত্মার স্থায় তাহার আত্মা কোথাও শান্তি পায় নাই। মাসে মাসে পুরীতে তাহার পত্র গিয়াছে, কিন্তু এ যাবৎ কোনও পত্রেরই প্রত্যুত্তর সে পায় নাই। বৎসরাধিক পরে কোথাও শান্তি না পাইয়া সে আবার কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। কে বলে, ইহজীবনে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই?

বিমলেন্দু ভাবিতেছিল, তাহার প্রতারণার কথা,—তাহার পাপের কথা। মিথ্যা কথায় ভুলাইয়া সে সরলা একান্ত-নির্ভরশীলা বালিকার অকাল-মৃত্যুর কারণ হইয়াছে। হৃদয়ের অন্তস্তলে পাপ-বাসনা লুকাইয়া রাখিয়া কলুষিত মনে তাহার প্রতি ভালবাসার ভাণ দেখাইয়াছে। তাহার এ পাপের—এ প্রতারণার শাস্তি কি, প্রায়শ্চিত্ত কি? ঐ ভাগীরথীর শীতল চঞ্চল বারিরাশির মধ্যে চিরনিদ্রায় শায়িত হইলে কি এই অনুতাপের তুষানলের জ্বালার নিবৃত্তি হয়? কে বলিয়া দিবে তাহাকে, এ পথে সে শান্তি পাইবে কি না?

আর এক নারীকে সে নির্ম্মম নিষ্ঠুর পশুর মত নির্য্যাতিত করিয়াছে। নিষ্পাপ নিরপরাধ সে—নিজের আত্মম্ভরিতা, স্বার্থপরতা ও নির্ব্বন্ধাতিশয়তার যূপকাষ্ঠে সে তাহাকে বলি দিয়াছে। দলিত কীটও ফিরিয়া দংশন করে, কিন্তু সে ত নিপীড়িতা হইয়াও তাহার অনুগ্রহপ্রার্থিনী হইয়া তাহারই সন্ধানে আসিয়াছিল, কিন্তু হৃদয়হীন পিশাচ সে, তাহার অযাচিত প্রেমের অর্ঘ্য পদাঘাতে দূরে ফেলিয়া দিয়াছে; নিষ্ঠুর নরহন্তা সে, তাহার বুভুক্ষু আত্মার কাতর করুণা-ভিক্ষাকে শ্বাসরুদ্ধ করিয়া হত্যা করিয়াছে। তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি? এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত—জীবন-বিসর্জ্জন!

বিমলেন্দুর ভাবতন্ময়তা চরম অবস্থায় উপনীত হইল, সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া নির্নিমেষ লোলুপ নয়নে আবিল গঙ্গা-বারির দিকে চাহিয়া রহিল; তাহার মনে হইল, যেন জাহ্নবী তরঙ্গসঙ্কেতে তাহাকে আহ্বান করিতেছেন। বিমলেন্দুও কি এক অব্যক্ত শক্তির বলে সেই দিকে আকৃষ্ট হইয়া সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িল।

মুহূর্ত্তকালমাত্র সে এমনই তন্ময় হইয়াছিল। তাহার পর সে সম্মুখে যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার তন্ময়তা দূরে গেল, তাহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। অস্পষ্ট আলোকে বিমলেন্দু দেখিল, সম্মুখে দাঁড়াইয়া দীর্ঘ-জটাজূট-মণ্ডিতা গৈরিকপরিহিতা সন্ন্যাসিনী-মূর্ত্তি!

সন্ন্যাসিনী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "বাছা, পুরুষমানুষ কি এমনই ক'রে হা-হুতাশ ক'রে বেড়ায়, না গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে যায়? ছিঃ ছিঃ!"

বিমলেন্দু বিস্মিত হইয়া বলিল, "কে মা আপনি?"

সন্ন্যাসিনী বলিলেন, "আমি যে হই, তোমায় একটা কথা ব'লে যাব। যাকে চাইছ, তার কাছ থেকে দূরে দূরে থাকলেই কি তাকে পাবে? পুরী যাও, শান্তি পাবে। আত্মঘাতী হয়ে আর পাপের মাত্রা বাড়িও না।"

সন্ন্যাসিনী চলিয়া যাইতেছিলেন, বিমলেন্দু বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া বাধা দিয়া বলিল, "মা, আপনি কি অন্তর্যামিনী? পুরীর কথা আপনি জান্‌লেন কি ক'রে? কে আপনি মা?"

সন্ন্যাসিনী বলিলেন, "সে অনেক কথা। পুরী যাও, সব জান্‌তে পারবে, তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হবে। আর্দ্রবসনে আর থেকো না। যাও।"

সন্ন্যাসিনী আর দাঁড়াইলেন না, মুহূর্ত্তে স্থান ত্যাগ করিয়া গেলেন। বিমলেন্দু এই আশ্চর্য্য প্রহেলিকার কোন সমাধান করিতে পারিল না, সে কেবলই ভাবিতে লাগিল, কে ইনি, কোথায় থাকেন, আমার মনের কথা কিরূপে জানিতে পারিলেন?

## ২৬

'যাও মা, একবার শেষ দেখা ক'রে এস', মাতাজী কোমল স্নেহার্দ্র স্বরে প্রতিমাকে কথা কয়টি বলিলেন।

প্রতিমা অবনতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল, কথার কোন প্রত্যুত্তর করিল না, কক্ষও ত্যাগ করিল না। মঠের মাতাজীর কক্ষে উভয়ে কথা হইতেছিল।

মাতাজী আবার বলিলেন, 'যাও মা, কুণ্ঠা বোধ কোরো না।'

প্রতিমা মুখখানি না তুলিয়াই অস্ফুট স্বরে বলিল, "মা!"

মাতাজী সস্নেহে তাহার মস্তকে হস্ত ন্যস্ত করিয়া বলিলেন, "বুঝিছি, এ দেখায় কি বিপদ তোমার। কিন্তু এই একটিবারমাত্র বৈ ত নয়। বিশেষ সে কত আশা ক'রে এসেছে, তাকে বুঝিয়ে আসাও ত দরকার।"

প্রতিমা বলিল, "বোঝাবার কি আছে? দেখা আর না হ'লেই ত ভাল।"

মাতাজী বলিলেন, "না, তা ভাল না। তোমার কি বলবার আছে, তাকে জানবার অবসর দাও। যাও মা।"

মাতাজী এই কথা বলিয়া প্রতিমাকে দ্বারপথের দিকে আগাইয়া দিলেন, প্রতিমা যন্ত্রচালিত পুত্তলিকাবৎ কক্ষের বাহির হইয়া গেল।

প্রশস্ত দালান পার হইতে তাহার পা কাঁপিতেছিল। সম্মুখের কক্ষদ্বার উন্মুক্ত ছিল, সে কক্ষে প্রবেশকালে তাহার চরণ আর যেন চলিতে চাহে না! তাহার বক্ষ দুরু দুরু স্পন্দিত হইতেছিল, সে ক্ষণকাল দ্বারপ্রান্তে থমকিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর ধীরে ধীরে কক্ষমধ্যে পাদবিক্ষেপ করিল।

কক্ষের অপর প্রান্তে এক জন লোক একখানি কাষ্ঠাসনে বসিয়া ছিল, তাহার দৃষ্টি অনুক্ষণ দ্বার-পথেই নিবদ্ধ ছিল, সে যেন কি এক আশায় কাহার প্রতীক্ষায় তথায় অপেক্ষা করিতেছিল—সে বিমলেন্দু রায়।

দ্বার-পথে প্রতিমাকে দেখিয়াই সে মুহূর্ত্তে কাষ্ঠাসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর তাহার শরীরের রক্ত-চলাচল যেন বন্ধ হইয়া গেল, সে কেবল নির্নিমেষ-নয়নে প্রতিমার দিকে চাহিয়া রহিল। উভয়ে উভয়ের প্রতি নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া কতক্ষণ এই ভাবে রহিল, তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না। কত কাল পরে এই দেখা—সে যে এক যুগ!

বিমলেন্দুরই প্রথমে চমক ভাঙ্গিল, সে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে ডাকিল, "প্রতিমা!"

প্রতিমা শুনিয়াও যেন সে ডাক শুনিতে পাইল না, চিত্রার্পিত প্রতিমার মতই নিশ্চল, নির্ব্বাক্, নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বিমলেন্দু এইবার দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া প্রতিমার সম্মুখীন হইল, কাতরকণ্ঠে বলিল, "প্রতিমা! অনেক আশা ক'রে এসেছি, কথার জবাবও দেবে না?"

প্রতিমা তথাপি নিরুত্তর রহিল। বিমলেন্দু ব্যথিত অভিমানাহত স্বরে বলিল, "জানি, আমার পাপের দণ্ডবিধান ক'রে রেখেছ, কিন্তু এ দণ্ডের কি সীমা নাই? বল প্রতিমা, একটি কথা বল, আমার এই বুভুক্ষু হৃদয় তোমার একটা কথা শোন্‌বার জন্যে হাহাকার কর্‌ছে। তবুও কথা কইবে না? এই দেখ, আমি তোমার পায়ে ধ'রে ক্ষমা ভিক্ষা করছি, আমায় ক্ষমা কর।"

বলিতে বলিতে বিমলেন্দু নতজানু হইয়া প্রতিমার সম্মুখে বসিয়া পড়িল। প্রতিমা দুই হস্ত পশ্চাতে সরিয়া গিয়া ভৎর্সনার স্বরে বলিল, "ছিঃ ছিঃ! আপনি পুরুষমানুষ, নারীর কাছে আপনার এ ভিক্ষা সাজে না।"

বিমলেন্দু দাঁড়াইয়া উঠিয়া গদ্‌গদকণ্ঠে বলিল, "তবে বল, আমায় ক্ষমা করেছ? আমি যতই অপরাধ ক'রে থাকি, তোমার স্বামী।"

প্রতিমা অবিকম্পিতকণ্ঠে বলিল, "আবার ও কথা কেন? সে সম্বন্ধ ত ঘুচে গেছে।"

বিমলেন্দু মাথা নাড়িয়া বলিল, "যা ইহকালে ঘোচবার নয়, তা তুমি আমি কি ক'রে ঘোচাব?"

প্রতিমা সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, "এখানে আপনার কি প্রয়োজন, তা ত আপনি বল্লেন না।"

বিমলেন্দু উন্মত্তের মত বলিল, "প্রতিমা! প্রতিমা! তুমি এত নিষ্ঠুর! আমি সংসারের সকল আশা, সকল কামনা ত্যাগ ক'রে বৎসরের পর বৎসর কেবল তোমার আশায় সারা জগতে ছুটোছুটি ক'রে বেড়িয়েছি—তোমার চিন্তাই ধ্যান, জ্ঞান, জপমালা করেছি, আমার রক্তে-মাংসে তোমার কামনা জড়িয়ে মাখিয়ে রেখেছি, তোমায় ভুল্‌তে না পেরে সব মান-অভিমান ছেড়ে তোমার কাছে ছুটে এসেছি,—তার কি এই প্রতিদান? তার কি এই পুরস্কার? উঃ, নারী কি এত নিষ্ঠুর! জান কি, তোমারই জন্যে আমি ইভকে হারিয়েছি? ইভ—সরলা অপাপবিদ্ধা ইভ—আমা বই সে ত কিছু জান্‌ত না, আমাকে তার উপযুক্ত কর্‌বার জন্যে হৃদয়ের সঙ্গে কত সংগ্রাম করেছি, কিন্তু তুমি, তুমি ত আমায় তার হ'তে দাও নি, অনুক্ষণ এই মনের মধ্যে তোমার সিংহাসন পেতে রেখেছিলে, মুহূর্ত্তের জন্য তোমাকে ভুল্‌তে দাও নি—"

প্রতিমা দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "সে কি আমার দোষ? আমি ত আমাকে দূরেই রেখেছিলেম, আপনার সুখের পথে আমি ত কণ্টক হই নি। তবে এখন কেন ও-সব কথা তুল্‌ছেন?"

বিমলেন্দু ক্ষিপ্রহস্তে প্রতিমার দুইখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল, "এক বিন্দুও দয়া নেই—অতি সামান্য এক ক্ষুদ্র বিন্দু? তা হ'লে জন্মের মত আমায় বিদায় দিচ্ছ? বল প্রতিমা! বল, আমি দুঃস্বপ্ন দেখছি।"

প্রতিমা বিমলেন্দুর হস্ত হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "আমি সন্ন্যাসিনী।"

প্রতিমা আর দাঁড়াইল না, ত্বরিত-পদে দালানের দিকে অগ্রসর হইল। বিমলেন্দু কাতরকণ্ঠে বলিল, "দয়া করলে না? তবে চল্লুম, এই শেষ বিদায়!"

প্রতিমা একবার পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিল, বিমলেন্দু প্রায় টলিতে টলিতে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। তখন প্রতিমার মনের মধ্যে কি সংগ্রাম চলিতেছিল, তাহা সে ভিন্ন আর কেহ বলিতে পারে না। একবার সে দ্বারের দিকে হস্তপ্রসারণ করিল, তাহার যাতনাক্লিষ্ট অন্তরের অন্তস্তল হইতে একটা করুণ কাতর আহ্বানের ধ্বনি উঠিয়াই হৃদয়ে বিলীন হইয়া গেল।

## ২৭

যখন মাতাজী প্রতিমার সান্নিধ্যে উপস্থিত হইলেন, তখন দেখিলেন, সে মেঝের ধূলায় লুটাইয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে। কিছুক্ষণ তিনি নীরবে স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর সস্নেহে তাহার কুঞ্চিত আলুলায়িত ভ্রমরকৃষ্ণ কেশদামের উপর হস্তাবমর্ষণ করিয়া বলিলেন, "ছি মা! তোমার কি সন্ন্যাসিনীর বেশ সাজে?"

প্রতিমা ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিল, কিন্তু মাতাজীর দিকে একবার চাহিয়াই অশ্রুসিক্ত মুখখানি নামাইয়া লইল। মাতাজী তাহার পার্শ্বে বসিয়া তাহার মাথাটা বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "ভুল্‌তে ত পার নি মা। তবে এ সাজ কেন? ভেতরে সন্ন্যাস না হ'লে বাইরে গেরুয়া রুদ্রাক্ষি কি করবে মা! সত্যি বল দিকি মা, স্বামীকে বাইরে রাখতে পেরেছো কি?"

প্রতিমা উত্তর করিবার পরিবর্ত্তে উপুড় হইয়া তাঁহার দুই পায়ে মাথা গুঁজিয়া কতকটা কাঁদিল মাত্র। মাতাজী আবার তাহার অঙ্গে হস্তাবমর্ষণ করিতে করিতে বলিলেন, "তাই জানি বলেই ত কালীঘাটে তোমার স্বামীকে দেখে এখানে আস্‌তে ব'লে দিয়েছিলুম—তাকে নিরাশ ক'রে ফিরিয়ে দিয়ে ভাল কর নি মা।"

প্রতিমা বিস্মিত হইয়া বলিল, "সে কি মা?"

মাতাজী তখন সবিস্তারে কালীঘাটে বিমলেন্দুর সহিত সাক্ষাতের ঘটনা বর্ণনা করিলেন; শেষে বলিলেন, "তোমায় ভুল্‌তে পারে নি ব'লে সে সে দিন আত্মঘাতী হ'তে যাচ্ছিল। তার আগে জেনেছিলুম, তুমিও তাকে ভুল্‌তে পার নি। তাই তোমাদের মিলনের সুযোগ ক'রে দিয়েছিলুম। তোমার বুদ্ধি আছে মা, তুমিই ভেবে দেখ, এমন ক'রে এই বয়সে মিথ্যে অভিমান ক'রে দু'জনের জীবন বৃথা নষ্ট করা কি ভাল? যা ভগবানের অভিপ্রেত, তাতে মিথ্যে বাধা দিয়ে ফল কি? আর বাধা দিয়েও তা ধ'রে রাখতে পারবে না। আমি ব'লে দিচ্ছি, তোমাদের মিলন হবেই হবে।"

প্রতিমা অবনত-মস্তকে অস্ফুটস্বরে বলিল, "আপনার কি তাই ইচ্ছে মা?"

মাতাজী বলিলেন, "পাঁচশ' বার। মনের মধ্যে বাসনা চেপে রেখে বাইরে ত্যাগ দেখালে কি হবে? সে ত ত্যাগ নয়, ত্যাগের ভাণ। আর দেখ, ভগবান্ তোমাদের মিলন ক'রে দিয়েছেন, তাতে অন্তরায় হয়ে কেবল পাপ সঞ্চয় করছ বৈ ত নয়।"

প্রতিমা চমকিত হইয়া বলিল, "পাপ?"

মাতাজী বলিলেন, "হাঁ, পাপ। তাই বলছি, এইবার সংসারাশ্রম কর, বিধাতার ব্যবস্থার উপর কলম চালাতে যেও না।"

প্রতিমা অবনত-মস্তকে নখে নখ খুঁটিতে খুঁটিতে অস্ফুটস্বরে বলিল, "কিন্তু মা—"

আর কথা সরিল না। মাতাজী হাসিয়া বলিলেন, "বুঝেছি মা, আর বল্‌তে হবে না। ভাবছ, সে জন্মের মত চ'লে গেছে, আর আস্‌বে না?"

প্রতিমা তখনও অবনত-মস্তকে বলিল, "সে যে বড় অভিমানী—"

মাতাজী বলিলেন, "কিছু ভেবো না, বিধাতার বিধান কেউ এড়াতে পার্বে না। ঐ, বোধ হয় ফিরে আস্ছে।"

এই সময়ে শৈল মহাকোলাহল করিতে করিতে বিমলেন্দুকে হাত ধরিয়া ঘরের মধ্যে টানিয়া লইয়া আসিল। তাহার চোখ-মুখ দিয়া কথার ফুলঝুরি ঝরিতেছিল,—"দেখ মা,আমাদের না ব'লে লুকিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। আমি বালির চড়ায় খেলা কর্ছিলুম কি না, চুপি চুপি পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিল, ধ'রে নিয়ে এলুম। আস্তে চায় না মা, বলে, তুমি না কি তাড়িয়ে দিয়েছ। হাঁ, তাই বুঝি? গল্প বল্বার ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল, না মা?"

বিমলেন্দু এতক্ষণ বিস্ময়-বিহ্বল-নেত্রে মাতাজীর প্রতি তাকাইয়া ছিল, মাতাজীও তাহাকে দেখিয়া হাসিতেছিলেন। বিমলেন্দু বলিল, "আপনি?"

মাতাজী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "হাঁ বাবা, আমি। সেই কালীঘাটে দেখা হয়েছিল। আমিই সেই।"

বিমলেন্দু বলিল, "আপনি মা অন্তর্যামিনী—না হ'লে আপনি কি ক'রে জান্তে পেরেছিলেন যে, আমি তত রাত্রে ঘাটে যাব।"

মাতাজী বলিলেন, "ছি বাবা! তুমি বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ হয়ে অমন কথা বোলো না। আমার কালীঘাটে দরকার ছিল, তুমিও ঠিক সেই সময়ে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলে, জগবন্ধু যোগাযোগ ক'রে দিয়েছিলেন। আবার জগবন্ধুর দয়ায় এই তোমাদের যোগাযোগ হ'ল। প্রতিমা, তোমাদের যোগাযোগ ভগবান্ই ঘটিয়ে দিয়েছেন; শৈল নিমিত্তমাত্র। আয় শৈল! তোর বালির মন্দির গ'ড়ে দিই গে যাই।"

মাতাজী কাহাকেও কিছু বলিবার অবসর না দিয়া শৈলকে লইয়া ঘরের বাহির হইয়া গেলেন। বিমলেন্দু কম্পিতচরণে প্রতিমার পার্শ্বে গিয়া মেঝের উপর উপবেশন করিল, কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "মাতাজী যা ব'লে গেলেন, তা কি সত্যি? বল প্রতিমা, এ স্বপ্ন নয়?"

প্রতিমাও বায়ুতাড়নায় বেতসপত্রের ন্যায় কাঁপিতেছিল, সে বিমলেন্দুর পায়ের উপর মাথা রাখিয়া গদ্গদকণ্ঠে বলিল, "মিথ্যে কিছুই নয়, মাতাজী আমায় সত্যি পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। আমি না বুঝে তোমার উপর মিথ্যে অভিমান করেছিলুম। বল, আমায় ক্ষমা করবে?"

বিমলেন্দুর বিস্মিত স্তম্ভিত দৃষ্টির সম্মুখে বিশ্বসংসার ঘুরিতেছিল, সে মুহূর্ত্তকাল নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল, তাহার পর দুই হাতে প্রতিমার অশ্রুসিক্ত মুখখানি বুকের মাঝে তুলিয়া লইয়া বলিল, "ক্ষমা? এই ভণ্ড প্রবঞ্চক স্বামীকে তুমিই ত ক্ষমা করবে প্রতিমা। তোমায় আমি যে যাতনা দিয়েছি, তার উপযুক্ত শাস্তিও পেয়েছি। কিন্তু তাতেও যদি—"

প্রতিমা বিমলেন্দুর মুখে করপল্লব আবৃত করিয়া বলিল, "ছিঃ! ও কথা বলে না।"

বিমলেন্দু কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া ধীরে ধীরে বলিল, "দেখ, এক একবার মনে হ'ত, আমি নিষ্ঠুর পশুর মত ব্যবহার করলেও, তুমি আমায় ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখতে না,—এমন কি, এক একবার আমার অহঙ্কারের সীমা আকাশ স্পর্শ করত, মনে হ'ত, তুমি আমায় ভালবাস। সত্যি বলবে প্রতিমা, তুমি কবে হ'তে আমায় ভালবেসেছ?"

প্রতিমা—সদা গাম্ভীর্য্যময়ী স্বল্পভাষিণী প্রতিমা স্বামীর বুকে মুখ লুকাইয়া অনুচ্চ স্বরে বলিল, "তোমায় আমি গোড়া থেকেই ভালবেসেছিলুম।"

বিমলেন্দু পূর্ণ হৃদয়ে হর্ষ ও আগ্রহভরে বলিল, "যখন আমি ইভের অনুসরণ ক'রে তোমার অনাদর করেছিলুম—ত্যাগ করেছিলুম, তখনও?"

প্রতিমা এইবার মুখ তুলিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, "হাঁ, তখনও। ইভকে তুমি বুকে নিয়েছিলে, তাতে আমি প্রথমে কষ্ট পেয়েছিলুম বটে, কিন্তু পরে ইভকে চিন্তে পেরে আমি তাতে সুখী হয়েছিলুম। অমন লক্ষ্মী তোমায় যে সুখী করতে পারবে, এই চিন্তাতেই সুখ পেতুম। আহা, সতী লক্ষ্মী ইভ!"

প্রতিমার দুই গণ্ড বহিয়া নয়নাশ্রু ঝরিয়া পড়িল। বিমলেন্দুর চক্ষুও অনার্দ্র রহিল না। সে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "আমি অধম পাতকী, তার যোগ্য হবার আমার সাধ্য কি? জান প্রতিমা, ফাঁকি দিয়ে পালাবার আগে সে আমায় বলেছিল, আমি তোমায় না পেলে সুখী হব না বলেই সে অসময়ে ছেড়ে চ'লে যাচ্ছে।"

প্রতিমাও ভারী গলায় বলিল, "জানি। যাবার আগে সে আমাকেও ব'লে গিয়েছিল, তোমার এই শূন্য স্থান পূর্ণ করতে।"

কথাটা বলিয়া প্রতিমা আবার স্বামীর বিশাল উরসে

মস্তক ন্যস্ত করিল। তাহাদের উভয়ের নয়নের জলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতেছিল। তাহারা এতই তন্ময় হইয়াছিল যে, কখন্ মাতাজী রামপ্রাণ বাবুকে লইয়া দ্বারের অপর প্রান্তে নিঃশব্দে উপস্থিত হইয়াছেন, জানিতেই পারে নাই।

রামপ্রাণ বাবু সম্মুখে যে দৃশ্য দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয় চন্দ্রোদয়ে অম্বুধির মত আলোড়িত হইয়া উঠিল। মাতাজী অঙ্গুলীসঙ্কেতে তাঁহাকে নীরব থাকিতে বলিলেন। রামপ্রাণ বাবু অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "আমায় আজ যে আনন্দ দিয়েছেন, তার প্রতিদানে আপনাকে দেবার আমার কিছু নেই। চলুন, আজ মঠে মহোৎসবের ঘোষণা ক'রে দিই গিয়ে।"

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।

সমাপ্ত

## পঞ্জাব চিত্র-প্রদর্শনীর উদ্বোধন-উৎসব

# প্রাচীন ও আধুনিক শিল্পের আদর্শ

শিল্পী কথাটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। আমরা শিল্পী বলি তাঁহাকে, যিনি তাঁহার চিন্তাকে আকার দান করেন, "নলিনীদলগত" জলের ন্যায় তরল ভাবরাশিকে মূর্ত্ত আকার দিয়া, ভাবের সুকুমার কোমল মাংসপিণ্ডে অস্থি যোজনা করিয়া তাহাকে চলাফেরা করিবার উপযোগী করেন। এই আকার বিভিন্ন রকমের হইতে পারে। বাক্য, রং, কিংবা স্বররূপে—সাহিত্য, চিত্রবিদ্যা, ভাস্কর্য্য বা সঙ্গীতরূপে শিল্পীর মনোভাব ব্যক্ত হয়। শিল্প দ্বারা জাতির মনোভাব, জীবনযাত্রা-প্রণালী, সাজসজ্জা, রীতি পরিস্ফুট হইয়া লোকলোচনের সমক্ষে প্রতিভাত হয়। এই জন্য কাব্য-শিল্প বুঝিতে হইলে কবিহৃদয়ের অন্তরতম প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিতে হইবে, কবির সহিত সমভাবাপন্ন হইতে হইবে। সেইরূপ চিত্র-শিল্পীকে বুঝিতে হইলে তাঁহার সহিত সমভাবে চিন্তা ও অনুভব করিতে হইবে, ভাবগ্রাহিতার চাবি সাহায্যে শিল্পি-হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটন করিতে হইবে—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়, শিল্পীকে বুঝিবার অন্য কোন উপায় নাই।

শিল্পকলা জাতির উৎকর্ষ ও সভ্যতার নিদর্শন। শিল্পের সাহায্যে জাতি তাহার তরল মনোভাবকে স্থায়ী আকার দান করে, বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত সত্য, শিব ও সুন্দরের সহিত মানব-মনের যে নিত্য সম্বন্ধ, যে চিরন্তন সংযোগ, তাহা গানে ও ছন্দে, বর্ণবৈচিত্র্যে ও তুলিকা-সংস্পর্শে ফুটাইয়া তুলে। এই সৌন্দর্য্যানুভূতি অযত্নপ্রসূত। ইহা স্বতঃ মানুষের হৃদয়কন্দর হইতে অজস্রধারায় উৎসারিত হইয়া দুকূলপ্লাবী স্রোতস্বতীর ন্যায় জাতির ইতিহাস-ক্ষেত্রে নিজ-স্থান অধিকার করিয়া লয়। জাতির মনের ভাব ও আকাঙ্ক্ষা, উদ্যম ও উৎসাহ, আশা ও ভরসা তাহার সাহিত্যের ভিতর দিয়া ঘনতা লাভ করে। জাতির সৌন্দর্য্যানুভূতি তাহার ভাস্কর্য্য, চিত্র ও স্থাপত্যে মূর্ত্ত হইয়া পরিপূর্ণতা লাভ করে।

প্রাচীন জগতের শিল্পে আমরা একটি বিশেষ বস্তু লক্ষ্য করি। প্রাচীনের সেই চিত্তবৃত্তিনিরোধপ্রসূত শান্তভাব ও ঔদার্য্য, স্থৈর্য্য ও নিস্তব্ধতা, অমৃতত্ব-পিপাসায়, ভূমায় পূর্ণ তৃপ্তিরসের বিরাট ও মহান্ ভাব—মানুষের অন্তরাত্মার বৃহত্ত্ব, ধ্যানের নিরবচ্ছিন্ন তন্ময়তা, সমাধির নিরুপম শান্তি তাহার শিল্পকে আধুনিকতায় ক্ষুদ্রতা, বহুমুখীত্ব, উচ্ছৃঙ্খলতা, প্রাণাবেগের জটিলতা ও উদ্বেলতা হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে।

অঙ্গসৌষ্ঠব ও দৈহিক সৌন্দর্য্যের দিকে গ্রীক্ ও লাতিন স্থপতির দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাহার সৌন্দর্য্যকল্পনা প্রস্তরের লীলায়িত মূর্ত্তিতে অমর হইয়া রহিয়াছে। এই সৌন্দর্য্য অনুভূতি মিশরে পিরামিড আকারে যে বিশালতা লাভ করিয়াছিল এবং ভারতে বুদ্ধের ধ্যানস্তিমিত লোচনের অপার্থিব শান্তভাবে, সাধনা-প্রোজ্জ্বল হৃদয়ের প্রাণারাম অনুপম আত্মক্রীড় অবস্থায় যে মধুর পবিত্র আনন্দময়তা পরিমূর্ত্ত হইয়াছিল, তাহা বিশ্বের ইতিহাসে অতুলনীয়। এই শান্তি, এই তৃপ্তি মহাসাগরের গম্ভীর প্রশান্তভাবের ন্যায়, আকাশচুম্বী হিমালয়-শৃঙ্গের ন্যায় বিশাল, বিরাট ও উদার। ভারতীয় শিল্পের বিশেষত্ব প্রকৃতির দৃশ্য বস্তুর অনুকরণ করিয়া, হুবহু নকল করিয়া নহে, উহার শ্রেষ্ঠত্ব ব্যঞ্জনা-শক্তিতে, জীবন্তভাবপ্রকাশে, নির্ব্বাচনী ক্ষমতায়, নব-নব ভাবোন্মেষণে। মিশরের ভাস্কর্য্যে শান্তরস বর্ত্তমান বটে, কিন্তু তাহাতে ভারতীয় ভাস্কর্য্যের জীবন্তভাব প্রকটিত হয় নাই। সিংহলের সুন্দরামূর্ত্তিস্বামীর মূর্ত্তিতে যে অনুরাগ ও আনন্দ-ব্যঞ্জক ভাব—ধ্যানী বুদ্ধে যে শান্তভাব, ধর্ম্মপালের মূর্ত্তিতে যে উদ্বেলভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা অন্য কোন দেশের ভাস্কর্য্যে পরিস্ফুট হয় নাই। শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য্য কেবলমাত্র মুখাকৃতি লইয়া ব্যস্ত নহে, ইহা সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৌষ্ঠবে, হস্ত-পদ ও দেহের সামঞ্জস্যে ও মিলনে। ভারতীয় চিত্র ও ভাস্কর্য্যের পূর্ণতা সেই স্থানে—যে স্থানে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও দেহাবয়বের মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে একটা অপার্থিব ভাব, মানবতার মধ্য দিয়া প্রতিফলিত হইয়াছে একটা স্বর্গীয় কান্তি, ধীশক্তি ও হৃদয়ের কোমলতার মধুর সমাবেশ, ঔদার্য্য, শান্তি ও কমনীয়তার রমণীয় মিলন।

এই বিরাট মহান্ ও ভাব প্রাচীন সাহিত্যেও প্রতিফলিত। আমরা মেকলে-প্রমুখাৎ শুনিয়া আসিতেছি যে, সাহিত্যে মহাকাব্যের যুগ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান

যুগ গীতি-কবিতা ও খণ্ড কবিতার যুগ। কথাটা খাঁটি সত্য না হইলেও একেবারে অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। প্রাচীনের বৃহত্ত্ব ও বিশালতা বর্ত্তমানের ক্ষুদ্রতায় নাই। অতীতে জীবন-সংগ্রাম এত তীব্র ছিল না। তখন চিন্তার অবসর ছিল, একটানা জীবন-স্রোত মৃদুমন্দ গতিতে সংসার-খাতে প্রবাহিত হইত। বর্ত্তমানে "প্রাণ রাখিতেই প্রাণান্ত" হইতে হয়। এক্ষণে জীবনের গতি উদ্দাম, বহুধা বিচ্ছুরিত, আমাদের মন বিক্ষিপ্ত। এই জন্য কোন ব্যাপক কর্ম্মে আমরা নিযুক্ত থাকিতে চাই না, কালব্যাপিনী চেষ্টার নাম শুনিলে আমাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, কর্ম্মধারা এক ভাবে পরিচালিত করিবার শক্তি আমাদের নাই, চিন্তা-প্রবাহকে দৈনন্দিন জীবনের কুটিল বক্রগতির মধ্যে স্থির রাখিবার সামর্থ্য আমরা হারাইয়াছি। আমাদের সাহিত্য-সেবা চুটকী গল্পে, শ্রুতিসুখকর চটুল কবিতার ফেনায়মান উচ্ছ্বাসে। বর্ত্তমানে আমাদের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের লেখনীতে বড় একটা আদর্শ-চরিত্র অঙ্কিত হয় না, আদর্শ-সৃষ্টি সাহিত্য হইতে একরূপ বিদায় লইয়াছে। আমাদের অধিকাংশ সাহিত্যিক আদর্শ-চরিত্র অঙ্কন করিতে ভুলিয়াছেন, সময় ও সমাজের উপযোগী করিয়া নিপুণতার সহিত পুরাতনকে নূতন আকার দিয়া দেশের নরনারীর মধ্যে শক্তি-সঞ্চার করিতেছেন না, বরং বিলাসী ও সৌখীন জীবনের আলেখ্য, পতিতা ও কলঙ্কিনী নারীর চিত্র লোকচক্ষুর সম্মুখে ধরিয়া ইন্দ্রিয়লালসার উদ্রেক করিতেছেন, কামহোমানলে ঘৃতাহুতি দিতেছেন।

সাহিত্য মানব-জীবনের মুকুরস্বরূপ। যুগে যুগে বিশ্বমানবের মন সাহিত্যে অভিব্যক্ত হইয়াছে। যে অনাবিল প্রশান্তি হোমর ও দান্তের মহাকাব্যে, সেক্ষপীয়রের অতুলনীয় নাট্যসাহিত্যে, বৈদিক ঋষিগণের অমল দিব্যভাবপ্রসূত উদাত্ত সঙ্গীতে, বাল্মীকির অফুরন্ত ছন্দের মহনীয় আবেগে প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা আমরা মিলটন ও কালিদাসের ক্ষুরধার ধীশক্তিপ্রসূত কাব্যে দেখিতে পাই না। পরবর্ত্তী কালে সাহিত্য শিক্ষকের আসন গ্রহণ করিল। ইংলণ্ডে পোপ্ ও ফ্রান্সে বইলু ছন্দে নীতি-শিক্ষা প্রচার করিতে লাগিলেন। এই কবিতার ছন্দের বন্ধন সুদৃঢ়, ইহা গুরুগিরির দৌরাত্ম্যে প্রাণহীন। তাহার পর দেখি, সাহিত্যে বর্ত্তমানের অশান্তি ও চাঞ্চল্য। এখানে ভাবের বেগ উদ্দাম, কিন্তু ইহার গতি খণ্ড। ইহাতে আছে কালবৈশাখীর তর্জ্জন-গর্জ্জন, ধূর্জ্জটীর রুদ্র তেজ, বিদ্যুতের আলোকসম্পাত, দুরন্ত ভৈরব নর্ত্তন, কিন্তু ইহাতে নাই শান্তির আতিশয্য, সংযমের আনন্দধারা, তপস্যার গভীর সুখ, করুণা ও মৈত্রীর নির্ম্মল সাত্ত্বিকতা, এক কথায় চিত্তনৈর্ম্মল্যজাত "ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা।" বর্ত্তমানে শিল্পী ভাবাবেগের উচ্চতা হইতে, বিশালতার উচ্চশিখর হইতে নিম্নে অবতরণ করিয়াছেন। তিনি আত্মভাবে ব্যস্ত, তাঁহার বীণায় বিভিন্ন ছিদ্রে যখন যে ভাবের বাতাস খেলে, তখন সেই সুর ঝঙ্কৃত হয়—তাহাতে চৌতাল ও ধ্রুপদের গাম্ভীর্য্য ফুটে না, তাহাতে ছায়ানটের মূর্চ্ছনা মনপ্রাণ উতলা করিয়া দেয়।

মাইকেল এঞ্জেলো প্যানথিয়নের গম্ভীর সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা সমস্ত প্রাচীন শিল্পসম্বন্ধে প্রযুজ্য। তিনি বলিয়াছিলেন, ইহার কল্পনা মানুষে করে নাই, দেবদূতরা করিয়াছিল। বিশালতায় যে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ, তাহা বৈদিক মন্ত্রে, সেক্ষপীয়র, গেটে, হোমর, দান্তে বাল্মিকীর মহাকাব্যে পরিস্ফুট হইয়াছিল—তাহা মরুদেশের পিরামিডে, জগৎবিশ্রুত রোমের কলোসিয়মে ও ভারতীয় শিল্পে প্রতিফলিত হইয়াছিল—ইহা যেন 'অস্তস্তব্ধ মহাসাগরের বিপুল দোল'। খণ্ডতার যে উত্তেজনা ও চাঞ্চল্য, তাহা দেখি বর্ত্তমানের স্থাপত্যে ও ভাস্কর্য্যে, শেলির কাব্যে ও ভিক্‌টর হিউগোর সাহিত্যে—প্রাণময়তায় যে বিপুল আবেগ, কল্পনার অদ্ভুত বিদ্যুৎখেলা, "নিত্য নূতন সাধনাতে নিত্য নূতন ব্যথা" সহ্য করিতে যে "অসীম ব্যাকুলতা" ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা দেখি রবীন্দ্রসাহিত্যে। খণ্ড-সৌন্দর্য্যের সমাবেশ ও তাহার মধ্য দিয়া চিরসুন্দরের ভজনা করিবার লিপ্সা প্রকাশ পাইয়াছে আধুনিক সাহিত্যে, চিত্রে, শিল্পে, স্থাপত্যে ও ভাস্কর্য্যে।

চিত্রেই হউক, ভাস্কর্য্যেই হউক, কাব্যেই হউক, শিল্পীর অন্তরাত্মা সৌন্দর্য্যান্বেষণে বহির্গত হয়। এক জন কাব্যের সুষমা-মণ্ডিত উদ্যানে বিচরণ করিয়া কল্পনা-পুষ্পের মধু আহরণ করিয়া মধুচক্র রচনা করেন। কাব্যামোদী যুগযুগান্তর ধরিয়া সেই মধু পান করিয়া চিত্তবিনোদন করে। আর এক জন তুলিকা সাহায্যে কিংবা হাতুড়ির ঘা মারিয়া কুৎসিৎ প্রস্তরখণ্ড ক্ষোদাই করিয়া প্রাণের সৌন্দর্য্যানুভূতিকে মূর্ত্তভাব দান করেন। দুই জনই সৌন্দর্য্যপথের যাত্রী। এই সৌন্দর্য্য অন্বেষণে বহির্গত হইয়া যিনি সমস্ত

সৌন্দর্য্যের আধার, যাঁহার অনন্ত সৌন্দর্য্যে কণামাত্র উষার সোনালী রংএ, মধ্যাহ্নের মার্ত্তণ্ডকিরণে, গোধূলির ধূসর বর্ণে, জ্যোৎস্নাস্নাত মুক্তাম্বরের রজতশুভ্র আলোকে, বসন্তের কোকিল-কাকলি গুঞ্জরিত কুঞ্জবনে, বর্ষাপ্রপাত ধৌত-শেফালির উদ্যানে প্রতিফলিত হয়—সেই সৌন্দর্য্যময়ের ভাবনা শিল্পীর মানসপটে উদিত হয় এবং সেই ভাবনা যে পরিমাণে খণ্ডতা ও ক্ষুদ্রতা অতিক্রম করে, যে পরিমাণে শিল্পী "অরূপরতন" লাভ করিবার জন্য "রূপসাগরে ডুব" দেন, সেই পরিমাণে তিনি শিল্পজগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। যেখানে আনন্দের অনুভূতি যত প্রচুর, সেখানে বিকারের সম্ভাবনা তত কম। ঘন-সুষুপ্তি নিষ্ক্রিয় অবস্থা, কিন্তু তৎকালে যে শান্তি অনুভূত হয়, তাহা অপরিসীম ও অনির্ব্বচনীয়। যে শিল্পী তাঁহার নিজ সত্তাকে শিল্পের মধ্যে যত দূর ডুবাইতে পারিয়াছেন, তিনি তত দূর মহান্। 'ভূমা বৈ সুখম্ নাল্পে সুখমস্তি' ভূমাতেই সুখ, অল্পে সুখ নাই। এই ভূমাকে শান্ত উপাসীত—এষঃ আদেশঃ; এষঃ উপদেশঃ; এতদনুশাসনম্; এবমুপাসিতব্যম্—ইহাই আদেশ ইহাই উপদেশ, ইহাই অনুশাসন, ইহা এই রূপে উপাসনা করিবে। বিশ্বস্রষ্টা কামনা করিয়াছিলেন, বহু স্যাং প্রজায়েয়—আমি বহু হইব, আমি প্রভূত ভাবে উৎপন্ন হইব। এই জন্য স তপোঽতপ্যত, তিনি তপস্যা করিলেন। 'স তপস্তপ্তা ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ' তিনি তপস্যা করিয়া এই যাহা কিছু রহিয়াছে, তৎসমুদয় সৃষ্টি করিলেন এবং তৎ সৃষ্টা তদেবাণুপ্রাবিশৎ—তাহা সৃষ্টি করিয়া তাহাতেই অনুপ্রবিষ্ট হইলেন। তিনি সকল রসের আধার—'রসো বৈঃ সঃ'। এই লোক বা জীব সকল সেই রস বা সেই আনন্দলাভ করিয়াই আনন্দিত হয়। শ্রেষ্ঠ শিল্পী সেই নিরতিশয় আনন্দ লাভ করিয়া আনন্দপ্রচুর অবস্থা প্রাপ্ত হন। এই আনন্দ ও তপস্যাই ভূমা—এই আনন্দ ও তপস্যায় বিশ্বসৃষ্টির বীজ নিহিত—এই সৌন্দর্য্যানুভূতি ও সংযমে নিবিড় শান্তি বর্ত্তমান এবং ইহাতেই শিল্পসৃষ্টির সুমহান্ অভিব্যক্তি।

শ্রীহরিপদ ঘোষাল বিদ্যাবিনোদ।

# বিংশ শতাব্দীর যীশুখৃষ্ট

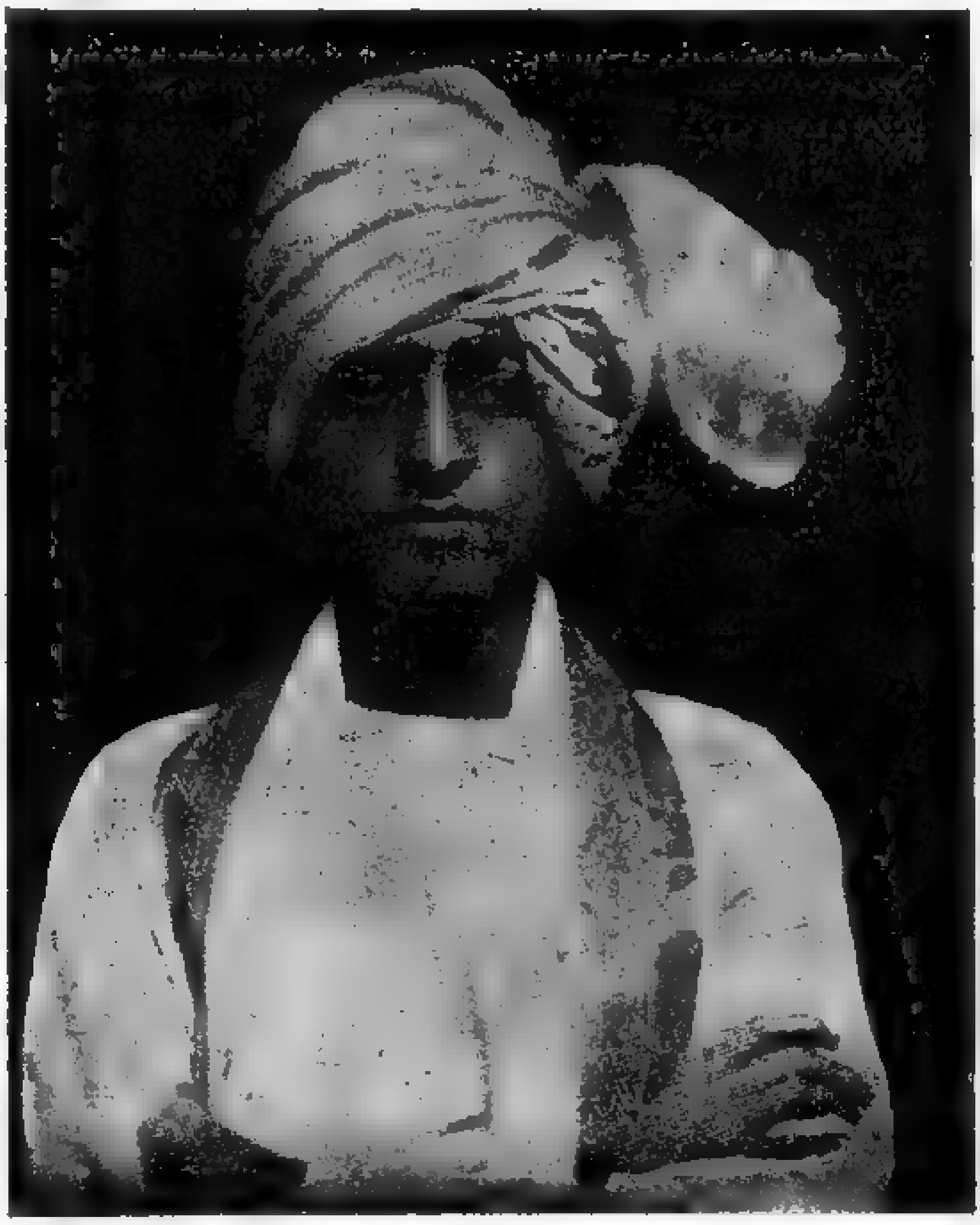

শ্রীমতী আনীবেসাণ্ট মাদ্রাজের কৃষ্ণমূর্ত্তি নামক ব্রাহ্মণ যুবককে বর্ত্তমান যুগের যীশুখৃষ্ট বলিয়া প্রচার করিয়াছেন।

# ভাব-প্রবাহ

সমুদ্রে জোয়ার-ভাটা হয়। কখনও জলরাশি বর্দ্ধিত ও উচ্ছ্বসিত হইয়া মহাকল্লোলে সৈকত-ভূমি নিমজ্জিত করিয়া পুলিন-সীমা প্লাবিত করিয়া দেয়, আবার কখনও নিস্তেজ ও বিশীর্ণ হইয়া পরাজিত ও পলায়নপর সৈন্যশ্রেণীর মত কর্দ্দমাক্ত তটভূমি হইতে বহুদূর হঠিয়া গিয়া স্থির হইয়া থাকে। পল্লীর নদীগুলিতে বৎসরে একবার করিয়া নববর্ষা-সমাগমে বন্যা আইসে। বর্ষাশেষে সে বান কমিয়া সরিয়া গিয়া দূরস্থিত সুবৃহৎ নদ-নদীর তলদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে। বৈশাখের অপরাহ্নে চারিদিকে প্রকৃতি শান্ত স্থির; মৃদুমন্দ মলয়-মারুত-হিল্লোল-স্পর্শে ঈষৎ সুখ-নিদ্রালস। সহসা কোথা হইতে একটি দুর্দ্দমনীয় বায়ুপ্রবাহ মত্তবেগে ছুটিয়া আসিয়া চতুর্দ্দিক্ আলোড়িত, মথিত, ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া চলিয়া যায়।

এই সমস্ত ব্যাপার বাহ্যজগতের। অন্তর্জ্জগতেও ইহার অনুরূপ ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। বাহিরের প্রাকৃত ঘটনাগুলি সহজেই অনুভব করা যায়। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জগতের ঘটনাসমূহ বহিরিন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ নহে বলিয়া সহজে অনুভবগম্য হয় না। সুদূরপ্রসারিণী এবং শক্তিশালিনী অন্তর্দৃষ্টির সাহায্য ব্যতিরেকে কেবল বুদ্ধিবৃত্তির বিষয়ীভূত ব্যাপারসমূহ কেহই ধারণা করিয়া গ্রহণ করিতে পারে না, কিন্তু এই প্রকার অন্তর্দৃষ্টি খুব সুলভ বস্তু নহে। পরন্তু বহির্জ্জগতের এবং অন্তর্জ্জগতের ব্যাপারের মধ্যে এক প্রধান পার্থক্য এই যে, একটি প্রায়শঃই সঙ্কীর্ণ সীমাসমূহের মধ্যে আবদ্ধ এবং সঙ্কীর্ণ সময়সাপেক্ষ; কিন্তু অপরটি দূরদূরান্ত ও দিগ্‌দিগন্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত এবং সুদীর্ঘ যুগব্যাপী হইয়া থাকে। আর এক প্রধান প্রভেদ এই যে, আমরা একটির বাহিরে থাকিয়া উহাকে সকল দিক্ হইতে পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারি, কিন্তু অপরটির মধ্যে মগ্ন হইয়া উহার অঙ্গীভূত হইয়া যাই। সুতরাং দেখিতেও পারি না, বুঝিতেও পারি না।

যোগদৃষ্টিসম্পন্ন জ্ঞানিগণ কহিয়া থাকেন, সময়ে সময়ে সমস্ত জগতের উপর দিয়া এক একটি মহাভাবের বিরাট প্রবাহ চলিয়া যায়, এক একটি সুমহতী শক্তির সুবিশাল বন্যা বহিয়া যায়। এই সব প্রবাহের এক প্রবাহ শেষ হইয়া অন্য প্রবাহ আরম্ভ হইতে ন্যূনাধিক ৫ শত বৎসর সময় লাগে। অর্থাৎ প্রতি ৫ শত বৎসর পর পর জগতে একবার করিয়া বিশ্বব্যাপী ভাবের জোয়ার আইসে। এই ভাব-প্রবাহ যখন জাগিতে আরম্ভ করে, তখন জগতে চৈতন্য বা অধ্যাত্মশক্তিসমূহের অপেক্ষাকৃত সাম্যাবস্থার মধ্যে সর্ব্বত্র বিক্ষোভ ঘটিতে থাকে।

দিনে দিনে স্থানে স্থানে বিবিধ "কম্পনে স্পন্দনে নিঃশ্বাসে উচ্ছ্বাসে ভাবে-আভাসে গুঞ্জনে চমকে-ঝমকে" বিশ্ব-মানবের মন, বুদ্ধি, চিত্ত বিচলিত হইতে থাকে। অভিনব কর্ম্মের প্রেরণা মানবসমাজকে চঞ্চল করিয়া দিয়া নানা ধারায় নানা দিকে প্রবাহিত হয়। অতি মহৎ, অতি বৃহৎ, অচিন্তিতপূর্ব্ব কিছু সম্পাদন করিবার জন্য সর্ব্বত্র প্রয়াস দেখা যায়। অপূর্ব্ব কল্পনা, বিচিত্র ভাবনা, নবীন চিন্তাস্রোত, জীবন্ত অন্তর্দর্শন বিচিত্র প্রকারে মনুষ্যসমাজে মূর্ত্তরূপে প্রকাশিত হইতে থাকে। কোথাও যুদ্ধবিগ্রহাদি মত্ত দৃপ্ত শক্তির ক্রিয়া, কোথাও সাম্রাজ্যগঠন, কোথাও সমাজ-সংস্কার, কোথাও অভিনব ধর্ম্ম-সংস্থাপন, কোথাও সাহিত্য, কোথাও শিল্প, কোথাও সঙ্গীত, কোথাও বাণিজ্য, সর্ব্বত্রই কিছু না কিছুর সাধনা চলিতে থাকে।

একই ভাব-প্রবাহরূপ কারণ ভিন্ন ভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং জাতিগত ও ব্যক্তিগত মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চেতনার বিবিধ ক্রম ও স্তর অনুসারে নানা প্রকার কার্য্য উৎপাদন করিয়া থাকে। একই সূর্য্যকিরণ যেমন গ্রহণকারী বস্তুর সূর্য্যালোকাভ্যন্তরস্থ সপ্ত প্রকার বর্ণোপাদান আত্মসাৎ করিবার শক্তির তারতম্যানুসারে কোথাও নীল, কোথাও শ্যাম, কোথাও লোহিত, কোথাও পীত, কোথাও পিঙ্গল প্রভৃতি রূপ ধারণ করে, অথবা একই জলীয় বাষ্পরূপে যেরূপ অবস্থাভেদে কখনও অদৃশ্য বায়ুভূত, কখনও কুয়াশা, কখনও মেঘ, কখনও তুষার, আবার কখনও বারিধারা হইয়া প্রকাশ পায়, এই ভাব-প্রবাহও সেইরূপ।

বর্ত্তমান যুগ হইতে ধরিয়া ৫ হাজার বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অর্থাৎ ২ হাজার খৃষ্টপূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান ১৯২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, এই পৃথিবীতে যে সমস্ত ভাবের প্লাবন আসিয়াছে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা তাহাই বাহ্যভাবে এবং সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিব। ইহাতে কোনও ঐতিহাসিক গবেষণা থাকিবে না। বিশ্বের অনেকগুলি বড় বড় ঘটনা-নিবহের উপর দিয়া শুধু দূর হইতে বহির্দৃষ্টিতে চক্ষু বুলাইয়া যাইব। ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিব না।

## ১

## ২০০০ খ্রীষ্টপূর্ব্ব

বেদ অনাদি ও অপৌরুষেয়, ইহা বিশ্বাস করিতে পারি কি না, এখানে সে বিষয়ের আলোচনা করিব না। যে বেদমন্ত্রগুলি এখন আমরা পাই, অর্থাৎ সংহিতাংশের ঋক্ ও সামগুলি, তাহা কোন না কোন সময়ে নিশ্চয়ই ঋষিরা লাভ করিয়াছিলেন, এবং রমা-পদ-পাঠ-পূর্ণ ভাষাময়ী মূর্ত্তি দান করিয়াছিলেন। ঠিক কোন্ সময়ে, তাহা নির্দ্দেশ করা বোধ হয় অসম্ভব। যাহা হউক, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের উপদেশ বিশ্বাস করিয়া এবং তাঁহাদের ইঙ্গিত লক্ষ্য করিয়া বলিতে পারি, খৃষ্টপূর্ব্ব ২০০০তম শতাব্দীতে কিংবা তাহার অগ্র-পশ্চাৎ কোনও সময়ে পৃথিবীতে একটি পূর্ব্ব-বর্ণিত ভাব-বন্যা প্রবাহিত হইয়াছিল। সমুদ্র-মন্থনে অমৃতের মত এই অমৃতচ্ছন্দগুলি সেই মহাবন্যায় ভাসিয়া আসিয়াছিল, এই প্রকার অনুমান করা যায়। এই বন্যাকে অভিনন্দিত করিয়া গ্রহণ করিবার মত মানুষ সে যুগে চীন, ভারতবর্ষ, বাবিলোনিয়া এবং মিশরের বাহিরে পৃথিবীতে কোথাও জন্মে নাই। এই বন্যা বিশেষ করিয়া ভারতীয় আর্য্যজাতিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। আর আর্য্যজাতির পরে ইহা বাবিলোনীয় সাম্রাজ্যের অধিবাসীদিগকে নূতন শক্তিতে ও নূতন সংকল্পে উত্তেজিত করিয়াছিল। ফলে তাহারা নবীন আশায়, নবীন উৎসাহে এবং নবীন উদ্যমে দলে দলে বাবিলোনিয়া পরিত্যাগ করিয়া আসিরীয়া দেশে আসিয়া একটি নূতন সাম্রাজ্যের সূত্রপাত করিয়াছিল, যে সাম্রাজ্যের অধিপতিগণ সহস্র বৎসরেরও অধিককাল ধরিয়া বিপুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে প্রবলপ্রতাপে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন।

সম্ভবতঃ এই যুগেই আর্য্যদিগের মধ্যে বৈদিক ধর্ম্মের সম্যক্ প্রতিষ্ঠা এবং বেদানুগত জীবনযাপন-পদ্ধতির প্রচুর প্রচার হইয়াছিল, এবং সম্ভবতঃ ইহারই ফলে অথবা এই উদ্দেশ্যেই বেদের ব্রাহ্মণাংশ এবং বেদাঙ্গসমূহ ক্রমে ক্রমে রচিত হয়। বৈদিক ক্রিয়াকলাপ, যাগযজ্ঞ প্রভৃতি অত্যন্ত জটিল ও দুর্ব্বোধ্য বিষয় ছিল। এই সমস্ত যাগযজ্ঞের দুরূহ ব্যাপার ঋষি-সন্তানগণ যাহাতে সহজে বুঝিতে পারে ও সম্পাদন করিতে পারে, তাহারই সুবিধার জন্য যে সমস্ত ব্যাখ্যা, টীকা-টিপ্পনী, উপদেশাদি রচিত হইয়াছিল, সেই বৈদিক কর্ম্মসমূহের দর্পণ-স্বরূপ যে রচনা, তাহাই ব্রাহ্মণ। 'ব্রহ্মের' অর্থাৎ বেদের জন্য অর্থাৎ বেদের তাৎপর্য্য প্রকাশের জন্য যাহা, তাহাই ব্রাহ্মণ।

বিবিধ বৈদিক কর্ম্মরাশি, যাগযজ্ঞ, হোম, দর্শ, পৌর্ণমাস, অগ্নিহোত্র, বহু বৈদিক দেবতা, মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতির জটিল জনতার মধ্যে পাছে মানুষ সেই এক, অদ্বিতীয়, সত্য, সদ্রূপ, সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বাত্মা, সনাতন বস্তুকে ভুলিয়া যায়, এই আশঙ্কায় ঋষিগণ বিশ্বজগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানপূর্ণ উপনিষদ্রাজি এই সময়ে প্রকাশ করেন। ইহা জগতের সর্ব্বপ্রধান অধ্যাত্ম-তত্ত্বজ্ঞানের যুগ। পৃথিবীতে যত ভাব-প্রবাহ আসিয়াছে, তাহার মধ্যে এইটিই সর্ব্বাপেক্ষা গভীর এবং সর্ব্বাপেক্ষা নিগূঢ়। ইহা আর্য্য ঋষিগণের হৃদয়ে এমন ঐক উদ্দীপনা আনিয়া দিয়াছিল, তাঁহাদের অন্তরে এমন এক সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম সুদূরগামিনী দৃষ্টি স্ফুরিত করিয়া দিয়াছিল, যাহাতে তাঁহারা ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র, জীবে-জড়ে, স্থাবরে-জঙ্গমে, স্বর্গে-মর্ত্ত্যে, আকাশে-বাতাসে, গ্রহ-তারকায়, তৃণে-গুল্মে, জলে-স্থলে, সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ব্রহ্মসত্তা উপলব্ধি করিতে পারিতেন। সেই যুগে তাঁহারা বিশ্বের মানবমণ্ডলীকে ডাকিয়া চীৎকার করিয়া ঘোষণা করিতেছিলেন,—"বেদাহমেতম্ পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।" জানিয়াছি—জানিয়াছি, মহান্ পুরুষ সেই—হে জগদ্বাসী! তোমরা শুন, শুন। তাঁহারা তারস্বরে গাহিতে লাগিলেন,—"যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ। য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ।" এই যুগে ঋষিগণ 'দেবতার উর্দ্ধে যেই মানবের স্থান', সেই স্থান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কাযেই তখন তাঁহাদের কাছে—"শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রান্। বহূন্ পশূন্ হস্তিহিরণ্যমশ্বান্, ভূমের্ম্মহদায়তনং"—অথবা "ইমা রামাঃ সরথাঃ সতূর্য্যা। নহীদৃশা লম্ভনীয়া মনুষ্যৈঃ।" সমস্তই ঘৃণার বিষয় হইয়া পড়িয়াছিল। কেন না, তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন,—

"অজীর্য্যতামমৃতানামুপেত্য
জীর্য্যন্ মর্ত্ত্যঃ ক্বধঃস্থঃ প্রজানন্।
অভিধ্যায়ন বর্ণ রতি-প্রমোদান্
অতিদীর্ঘে জীবিতে কো রমেত।"

## ২

## ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্ব্ব

এই সমস্ত ব্যাপারের ৫ শত বৎসর পরে আবার একটি ভাব-প্রবাহ পৃথিবীর উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছিল। এই সময়ে আর্য্যাবর্ত্তে কি কি মহৎ কার্য্য সংসাধিত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য; কিন্তু এই প্লাবনে মিশরদেশে এক আশ্চর্য্য শক্তির উদ্বোধন হইয়াছিল। এই শক্তির অধিনায়ক ছিলেন মহর্ষি মুশা (Moses)। এই শক্তির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল ইস্রেলবাসী হিব্রু জাতির মধ্যে এবং ইহার আঘাতে চূর্ণ হইয়াছিল দুষ্কৃতকারী ফেরাও-নৃপতির রাজ্যসম্পদ্। ইস্রেলবাসীরা মিশররাজ্যে রাজা ফেরাওর অধীনে পদদলিত নিষ্পেষিত দাসজাতিরূপে বহুকাল ধরিয়া বাস করিয়া আসিতেছিল। তাহাদের উদ্ধারের কোন উপায়ই ছিল না। তাহাদের মধ্যে যত পুত্র-সন্তান জন্মিত, তাহার প্রায় সমস্তই রাজার আদেশে নীল নদের জলে ডুবাইয়া দেওয়া হইত। এক দিন এক দুঃখিনী হিব্রু-জননী একটি অতি সুন্দর কুন্দ-ফুলের মত ফুটফুটে পুত্রসন্তান প্রসব করিল। রাজার অনুচরগণ জানিতে পারিলে এখনই শিশুকে লইয়া নীল-জলে নিক্ষেপ করিবে, এই ভয়ে হতভাগী উহাকে একটি ঝুড়ির মধ্যে পুরিয়া গোপনে কাশ-তৃণাচ্ছন্ন নদীর জলে ভাসাইয়া দিলেন,—কেহ দেখিয়া শিশুকে রক্ষা করিবে, এই ভরসায়। দৈবক্রমে এক রাজকুমারী এই ভাসমান শিশুকে দেখিতে পান এবং সহচরীদিগের সাহায্যে ইহাকে উঠাইয়া জননীর মত করিয়া ইহাকে পালন করেন। ইহা উপন্যাস নহে, ইতিহাস। এই শিশুই বিশ্ব-বিখ্যাত ঋষি ইস্রেলের প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা মুশা। ইনি ভগবানের আদেশ পাইলেন, হতভাগ্য চিরবন্দী মিশরপ্রবাসী ইস্রেলবাসিগণকে উদ্ধার করিতে হইবে। এইরূপে তিনি ঐ প্রকাণ্ড ভাব-প্লাবনের একটি ধারা হৃদয়ে ধারণ করিলেন। তাঁহার প্রাণে অসীম শক্তি উদ্দীপিত হইল। তাঁহার অন্তরে দিব্যদৃষ্টি খুলিয়া গেল। প্রথমে তিনি তাঁহার প্রতি ভগবানের নানা প্রকার ইঙ্গিত-ভঙ্গী অনুভব করিতে লাগিলেন। আর সাক্ষাৎভাবে ভগবানের বিভূতি দর্শন এবং তাঁহার আদেশ লাভ করিতে লাগিলেন। তিনি রাজাকে বলিলেন, "তুমি ইস্রেলীয়দিগকে স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে দাও।" রাজা অবশ্য অস্বীকার করিলেন। তাহাতে তাঁহার ভয়ঙ্কর দৈব-দুর্ব্বিপাকজনিত শাস্তি আরম্ভ হইল। তখন একবার বলেন, তোমরা যাও; আবার বলেন, না, যাইতে পারিবে না। দৈব-দুর্ব্বিপাক চলিতে লাগিল। ব্যাধি, দুর্ঘটনা, মৃত্যু, মহামারী নানারূপে রাজাকে ও মিশরীয় প্রজাবৃন্দকে আক্রমণ করিতে লাগিল। অবশেষে রাজার আদেশ পাইয়া মুশা ইস্রেলীয়দিগকে লইয়া ইস্রেলাভিমুখে যাত্রা করিলেন। দুই এক দিন পরে আবার রাজার দুর্ব্বুদ্ধি হইল। সসৈন্যে রাজা তাহাদিগকে ধরিবার জন্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। তাহার পর লোহিতসাগরের সেই সব আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার সংঘটিত হইল। সাগর দ্বিধা বিভক্ত হইয়া মুশা ও তাঁহার অনুবর্ত্তিগণের অতিক্রমণের জন্য শুষ্ক স্থলপথ সৃষ্টি করিয়া দিল। তাহারা নির্ব্বিঘ্নে পার হইয়া গেল। পরে সমুদ্রের অসীম জলরাশি দুই দিক্ হইতে গর্জ্জন করিয়া আসিয়া অনুসরণকারী ফেরাও ও তাঁহার সৈন্যসমূহকে মুহূর্ত্তমধ্যে নিমজ্জিত করিয়া ধ্বংস করিয়া ফেলিল। দেশে যাইয়া মুশা বিপুল উদ্যমে অল্পকালের মধ্যে একটি প্রকাণ্ড ধর্ম্মশাস্ত্র এবং একটি সুশৃঙ্খলানিবদ্ধ ধর্ম্মমণ্ডল সংস্থাপিত করিয়া ফেলিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি গড়িয়া তুলিলেন একটি সুসম্মিলিত, সুসংবদ্ধ, শক্তিশালী জাতি। এই জাতির আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, বিধিপদ্ধতি, আইন-কানুন এবং ঈশ্বরোপাসনা-প্রণালী কি প্রকার হইবে, তাহা নিঃসন্দেহরূপে নির্দ্ধারণ করিয়া সুনির্দ্দিষ্ট স্মৃতিশাস্ত্রসমূহও তিনি অবিলম্বে লিপিবদ্ধ করিয়া দিলেন। এক দিন দুই দিনের জন্য নয়, ১০।২০ বৎসরের জন্য নয়, যুগযুগান্তরের জন্য। আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর সমস্ত খৃষ্টান ও য়িহুদীরা এই মুশার রচিত ধর্ম্ম ও নীতিশাস্ত্র মানিয়া চলিতেছে। সুবিশাল জগজ্জনীন ভাব-প্লাবনের মুখে না হইলে এমন সুমহৎ কার্য্যনিবহ কেহ কখনও একাকী সম্পন্ন করিতে পারে না।

মিশরীয়গণ আমন, অসিরিস, আইসিস, আপিস প্রভৃতি কাল্পনিক দেবতার পূজা করিত, কিন্তু এই সময় হইতে তাহারা অস্পষ্টরূপে বুঝিতে আরম্ভ করে যে, দেবতা-উপদেবতা সমস্তই এক পরমেশ্বরের শক্তির প্রকাশ। চতুর্থ আমেনহোটেপের রাজত্বকালে এই নব-ভাবের উদয় হয়।

## ৩

## ১০০০ খ্রীষ্টপূর্ব্ব

ইহার ৫ শত বৎসর পরে জগতে আবার একটা জাগরণ আসিয়াছিল—একটা চেতনার বন্যা সমস্ত পৃথিবীর উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছিল। খুব সম্ভবতঃ এই যুগেই ভারতের বৈদিক ধর্ম্মের একটা বিশিষ্ট সংস্কার হয়। বেদ, সংহিতা, উপনিষদাদি এবং বৈদিক ক্রিয়া-কলাপ অনেকাংশে তখন সুদূর অতীতের জিনিষ হইয়া পড়িয়াছে। বৈদিক ভাষা তখন সর্ব্বসাধারণের দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং বেদোপনিষদের গূঢ় মর্ম্ম পরিস্ফুট করিয়া ভগবানের মূর্ত্তরূপ ও মর্ত্ত্য লীলা এবং সাকারোপসনাকে ভিত্তি করিয়া এবং তৎসঙ্গে শক্তিশালী প্রাচীন রাজন্যবৃন্দ এবং অদ্ভুতকর্ম্মা মহাপুরুষগণের ইতিহাস বিবৃত করিয়া এই সময়ে বিবিধ পুরাণ রচনা করিবার আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল।

পুরাণগুলি এক দিকে যেমন অসীম জ্ঞানের সমুদ্র, অন্য দিকে তেমনই অফুরন্ত কবিত্বের আধার। গভীর দার্শনিক গবেষণা, অতি সূক্ষ্ম তত্ত্ব-বিশ্লেষণ, প্রাঞ্জল ঐতিহাসিক উপাখ্যান, মনোহর ভক্তি-রসাত্মিকা ভগবল্লীলা-কথা, নগর পল্লী সরিৎ সাগর গিরিদরী প্রভৃতির হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা, যোগী ভোগী রাজা ঋষি যক্ষ রক্ষ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার চরিত্র-চিত্রণ এবং সর্ব্বত্র নব নব সৌন্দর্য্যসৃষ্টিকারিণী স্বচ্ছন্দগামিনী কল্পনার অনায়াস লীলা সমস্তই একাধারে আমরা এই পুরাণসমূহে সমাবিষ্ট দেখিতে পাই। পুরাণের ভাষা এক অতি আশ্চর্য্য জিনিষ। কোথাও যেন এক বিন্দু আয়াস নাই। ভাদ্রমাসের ভরা নদীর জলপ্রবাহের মত আপনার পরিপূর্ণতার ভরে, শান্ত অথচ দ্রুতগতিতে অবিশ্রান্ত বহিয়া চলিয়াছে। কোমল অথচ তেজস্বী, সরল অথচ গভীর, সহজ অথচ মনোরম। মনে হয়, আমরা যেমন করিয়া কথা বলি, ঋষিরা তেমনই করিয়া পুরাণ লিখিয়াছিলেন। মনে রাখিতে হইবে, শ্রীমদ্ভাগবত সমস্ত পুরাণ হইতে স্বতন্ত্র প্রকারের জিনিষ। সকল পুরাণ এক সময়ে রচিত হয় নাই। য়ুরোপীয়দের মতে পুরাণ অনেক পরের রচনা। কতক খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীরও পরে রচিত। আমরা তাহা বিশ্বাস করি না। দুই চারিখানি পুরাণ বৌদ্ধযুগে সংস্কৃত হইয়াছিল। যথা,—স্কন্দপুরাণান্তর্গত কাশীখণ্ডে বৌদ্ধধর্ম্মের ও বৌদ্ধদের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। তাহার পরেও কখন কখন কোনও বিশেষ যুগের ভাবে কথঞ্চিৎ ভাবান্বিত করিবার জন্য পণ্ডিতগণ কোনও কোনও পুরাণের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া থাকিবেন, কিন্তু অধিকাংশ এবং শ্রেষ্ঠ পুরাণগুলির রচনাকাল বৌদ্ধপূর্ব্ব যুগ। পুরাণে অনেক প্রক্ষিপ্ত জিনিষ আছে। সাধারণতঃ এই সমস্ত হইতেই পুরাণের অপেক্ষাকৃত আধুনিকতা প্রমাণ করা হয়। যাহা হউক, যে সময়ে ভারতে পুরাণগুলি রচিত হইতেছিল, সেটা নিশ্চয়ই একটা আধ্যাত্মিক জাগরণের যুগ। সে সময়ে একটা প্রকাণ্ড ভাবের প্রবাহ ধরাতলে নামিয়া আসিয়াছিল। সেই মহাপ্রবাহে না ভাসিলে ঋষিগণ কখনই গভীর জ্ঞান-গৌরবান্বিত এবং বিচিত্র সৌন্দর্য্যসম্পন্ন একটা বিশাল ধর্ম্মসাহিত্য অমন করিয়া অবলীলাক্রমে গড়িয়া তুলিতে পারিতেন না। এই প্রবাহের যুগ যদি আমরা মোটামুটিভাবে খৃষ্টের এক হাজার বৎসর পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করি, তবে সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইলেও বহুদূরে যাইব না।

খুব সম্ভবতঃ এই সময়ে গ্রীসদেশে হোমরের আবির্ভাব হইয়াছিল। হোমরের যুগ একটি মহাজাগরণের যুগ; একটি পরিপুষ্ট পৌরাণিক সাহিত্যসৃষ্টির যুগ। খণ্ড খণ্ড ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুরাতন উপকথা, রূপকথা, প্রচলিত কাহিনী এবং কল্পনা-রঞ্জিত ইতিহাস প্রভৃতি একটি তেজস্বিনী কল্পনাশক্তির সাহায্যে বাছিয়া গুছাইয়া সংগ্রহ করিয়া আনিয়া, তাহাদের সামঞ্জস্য ও ঐক্যবিধান করিয়া তাহাতে অখণ্ড ভাব-রসের প্রাণসঞ্চার করিয়া হোমর দুইখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কালজয়ী মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন—ইলিয়ড ও অডিসি। দেশময় মহা-উদ্দীপনার যুগে ভিন্ন এই প্রকার সাহিত্য কখনও জন্মে না।

এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত ভাব-প্লাবনের ও তাহাদের সময়ের কথা বলিলাম, তাহা অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া এবং অনেকগুলি 'সম্ভবের' আশ্রয় গ্রহণ করিয়া। কারণ, এ সব প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিষয়। ইহার পর হইতে আমরা ইতিহাসের স্থির-নির্দ্দিষ্ট দৃঢ় ভূমির উপর দাঁড়াইয়া কথা বলিতে পারিব। অনুমানের নৈশালোকে অনিশ্চয়ের বালুকাভূমিতে আর অনির্দ্দিষ্টের অন্বেষণ করিব না। পরন্তু এতক্ষণ যে সব ভাব-বন্যার কথা বলা হইল, তাহা যে সমস্ত পৃথিবীর উপর দিয়াই বহিয়া গিয়াছিল, তাহা কেহ অস্বীকার করিলে তাহার সহিত তর্ক চলিবে না, কিন্তু এখন হইতে যে সমস্ত মহাভাবের উচ্ছ্বাসের কথা বলিব, তাহা যে বিশ্বব্যাপী, তাহা অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ থাকিবে না। এখন হইতে যে সমস্ত বিশ্ব-ব্যাপারের উল্লেখ করিব, তাহাতে নিঃসন্দেহ সত্যের উজ্জ্বল আলোকে পূর্ব্বোল্লিখিত বিষয়গুলির সন্দেহের অন্ধকার কিয়দংশে দূর হইতে পারে। [ ক্রমশঃ।

শ্রীক্ষেত্রমোহন সাহা।

# উষার স্বপন

আজি শত চুম্বনে কে চুরি করিল
শত চুম্বন মোর,
আজি শত আলিঙ্গনে কে আলিঙ্গিলা মোরে
না হইতে রাতি ভোর।

মোর অধর হইল রঞ্জিত রাগে
কাহারি পরশ লাগি,
কাহার আঁখির কাজল মাখিল
সারারাতি আঁখি জাগি।

কাহারি সীঁথির সিন্দুর-রেখা
চুম্বিল মোর হৃদয়োপরি,
চন্দন-ফোঁটা কোথা গেল মোর
কোথায় লুকাল বুঝিতে নারি।

( আজ ) পরিধেয় মোর কোথায় পাইলি
সোনালি চুম্‌কা জরীর কায,
লোক-অপবাদ শুনাইয়া কানে
কোন্ সুখ তুই পাইবি আজ !

চন্দন কোথা অগুরু পাইলি
কোথা হ'তে তারে লইলি ডাকি,
উষার স্বপন শুধু প্রলোভন
আঁখি মিলে দেখি সকলি ফাঁকি।

বারিদবরণ।

# রূপের মোহ

## চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

"ডাক্তার বাবু, ছেলেটি বাঁচবে ত ?"

সাফল্যের আনন্দ চিকিৎসকের আননেও দীপ্তরেখা টানিয়া দিয়াছিল। তিনি প্রসন্নচিত্তে বলিলেন, "এমন নিপুণ শুশ্রূষা পেলে সকল রোগীই রক্ষা পেতে পারে। বাস্তবিক শিক্ষিতা ধাত্রীও এত যত্ন নিতে পারে না।"

আত্মপ্রশংসায় সরযূ লজ্জিতা হইল। বেলা ৯টা হইতে অপরাহ্ণ ৫টা পর্য্যন্ত একবারও সে রোগীর সান্নিধ্য ত্যাগ করে নাই। আজ কয় দিন ধরিয়া এমনই ভাবে সে পীড়িত বালকটির শুশ্রূষা করিয়া আসিতেছে। হাঁসপাতালের ৫০ জন রোগীর মধ্যে এই বালকের অবস্থাই সাংঘাতিক হইয়াছিল। তাই দিনের বেলা ধাত্রীকে অবকাশ দিয়া সে স্বয়ং ইহার শুশ্রূষার ভার লইয়াছিল। বালকের পীড়িতা মাতারও অবস্থা দিন দিন ভাল হইতেছিল।

সুরেশচন্দ্রের যত্ন ও অর্থব্যয়ে নগরোপকণ্ঠে এই হাঁসপাতালটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ৪ জন বিচক্ষণ ডাক্তার ও স্থানীয় শুশ্রূষাকারিণী ব্যতীত আরও ৪ জন নিপুণা ধাত্রীকে কলিকাতা হইতে আনাইয়া পীড়িতদিগের সেবায় নিযুক্ত করা হইয়াছিল। দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদিগের জন্য চাউলাদি বিতরণ যেমন নিতান্তই প্রয়োজনীয় ব্যাপার, পীড়িতদের সুচিকিৎসা ও শুশ্রূষারও তেমনই বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছিল।

সরযূর অক্লান্ত সেবা ও নিপুণ শুশ্রূষা দেখিয়া সুরেশচন্দ্রও বিস্মিত হইয়াছিলেন। যাহারা চিরদিন ভোগবিলাসে, আরামে-বিরামে অভ্যস্ত, প্রয়োজন হইলে তাহারাও যে কত দূর আত্মত্যাগ করিতে পারে, তাহার পরিচয় তিনি অমিয়া ও সরযূর কার্য্যে পাইতেছিলেন। অমিয়ার সম্বন্ধে তিনি নিঃসংশয় ছিলেন। কারণ, পরলোকগতা জননীদেবীর গর্ভেই তাহার জন্ম। পিতা স্বকৃতভঙ্গ হইয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছিলেন। মাতা, পিতার কার্য্যের কোন প্রতিবাদ করেন নাই, স্বামীকে সুখী করিবার জন্য তাঁহার মতানুসারেই চলিয়াছিলেন। কিন্তু পূর্ব্বপুরুষগণের চিরাচরিত সংস্কার হইতে তিনি আপনাকে সম্পূর্ণ বিমুক্ত করিতে পারেন নাই। পাশ্চাত্য-সভ্যতার আবহাওয়ায় আজন্মের দেশাচার ও লোকাচারের মহনীয় অনুষ্ঠানগুলির প্রভাব তাঁহার চিত্ত হইতে মুছিয়া যাইতে পারে নাই। জ্যাকেটে, জামায়, জুতা ও মোজায় তাঁহার স্বর্গগত জননী কখনও অভ্যস্ত হইতে পারেন নাই। শুধু যখন বাহিরে যাইতে হইত, সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ না দিলে চলিত না, তখনই শুধু স্বামীর সন্তোষ-সাধনের জন্য যতটুকু না করিলে চলে না, তিনি ততটুকুই করিতেন। জ্ঞানসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গেই সুরেশচন্দ্র সেগুলি গভীরভাবে লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছিলেন। রোগীর সেবায়, অভাবগ্রস্তের দুঃখবিমোচনে তাঁহার দেবীরূপিণী জননী নির্ব্বিচারে যেরূপভাবে আত্মনিয়োগ করিতেন, সুরেশচন্দ্র কখনও তাহার স্মৃতি ভুলিতে পারিবেন না। তাই তাঁহার বিশ্বাস ছিল, অমিয়ার দেহে যখন জননীর পবিত্র রক্তস্রোত প্রবাহিত আছে, তখন প্রয়োজনকালে সে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সেবাপরায়ণতার উদাহরণ দেখাইতে পারিবে। কিন্তু সরযূর সম্বন্ধে তেমন বিশ্বাস তাঁহার ছিল না।

কিন্তু কয় দিন ধরিয়া সরযূ যেরূপভাবে পীড়িতের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিল, তাহাতে তিনি বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। এই দৃষ্টান্তের পর তাঁহার মনে একটা ধারণা

জন্মিয়াছিল যে, ভারতবর্ষের নারীর বৈশিষ্ট্য তাহার রক্তে মিশানই আছে। প্রতীচ্যের অনুকরণ-দুষ্ট হইলেও উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা ও ক্ষেত্র পাইলে বাঙ্গালার প্রাণধারা, স্বাভাবিক মনোবৃত্তি আপনা হইতেই আত্মপ্রকাশ করিতে পারে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে দেখিয়া সুরেশচন্দ্র বাসায় ফিরিতে উদ্যত হইলেন। অমিয়া এতক্ষণ বাসায় ফিরিয়া একা রহিয়াছে। শুশ্রূষাকারিণী আসিয়া বালকের পরিচর্য্যার ভার গ্রহণ করিল। রাত্রিতে সরযূর শুশ্রূষার প্রয়োজন হইবে না।

সুরেশচন্দ্র গাড়ী আনাইবার আয়োজন করিতেছেন দেখিয়া সরযূ বলিল, "গাড়ীর কোন দরকার নেই, হেঁটে যাওয়া যাক্।"

"সারাদিনের পরিশ্রমের পর হাঁট্‌তে কষ্ট হবে না?"

মৃদুহাস্যে সরযূ বলিল, "মাইল দুয়েক পথ—হাঁট্‌তে পারব না? আপনি কি সত্যই আমাদের মোমের পুতুল মনে করেন?"

সুরেশচন্দ্র বলিলেন, "না, না, আপনাদের সম্বন্ধে অতটা অবিচার চলে না। সন্ধ্যার বাতাসে হেঁটে গেলে শরীরের পক্ষে খুবই ভাল; তবে বল্‌ছিলাম, গাড়ীতে হ'লে শীঘ্র পৌঁছান যাবে, আর ক্লান্তিটা তেমন হবে না।"

সরযূ বলিল, "চলুন হেঁটেই যাই।" এই বলিয়া উত্তরীয়খানির দ্বারা দেহ আবৃত করিয়া সে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল।

নদীর তীরে তীরে পথ। তখন সে পথে জনসমাগম বিরল। সহরটা খানিক দূরে। কদাচিৎ দুই চারি জন পথিক সহর হইতে গ্রামে ফিরিতেছিল। আকাশে নবোদিত ক্ষীণ শশাঙ্কের মৃদু আলোক-রেখায় চারিদিকে যেন একটা স্বপ্নময় ছবি ফুটিয়া উঠিতেছিল।

সুরেশচন্দ্র অনেক দিন হইতেই সরযূকে দেখিয়া আসিতেছেন। এই বাক্‌চতুরা, সরলা ও সদানন্দময়ী কিশোরীকে তিনি চপলা, সুখভোগ-লালিতা, সাধারণ শিক্ষিতা নারীর মতই মনে করিতেন। সংসারের সুখের পথে, ভোগবিলাসের রাজ্যে তাহাদেরই মত এক জন। এ জন্য তাহার সম্বন্ধে গভীরভাবে তিনি কোনও দিনই চিন্তা করেন নাই। কিন্তু এই কয় সপ্তাহের কার্য্যে তাঁহার ভ্রম ঘুচিয়া গিয়াছিল। সরযূর দৃঢ়তা, কর্ম্মপ্রবণতা, অকুণ্ঠিত সেবা ও আত্মত্যাগে তিনি সত্যই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, এই তরুণী-সুন্দরীকে সাধারণ নারীর পর্য্যায়ে ফেলিলে তাহার সম্বন্ধে গুরু অবিচার করা হয়। নিম্নজাতীয়, সম্পূর্ণ অপরিচিত, অসহায় ও পীড়িত বালককে সন্তানের মত স্নেহে সেবা করায়, সুরেশচন্দ্র সরযূর প্রকৃতিতে মাতৃত্বের যে বিকাশ দেখিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বত্র সুলভ নহে।

"দেখুন, আপনার সম্বন্ধে আমার একটা বড় ভুল ধারণা ছিল, সে জন্য আপনি আমায় ক্ষমা করবেন কি?"

বিস্মিতা সরযূ সুরেশচন্দ্রের দিকে ফিরিয়া বলিল, "কি রকম?"

ধীরকণ্ঠে সুরেশ বলিলেন, "আমি ভাবতুম, আপনারা যে রকম কোমলা, তাতে পৃথিবীর দুঃখ, ঝঞ্ঝা সহ্য করবার সহিষ্ণুতা আপনাদের নেই। শুধু ফুলের মতই আপনারা গন্ধ-ভরা—আলো-করা। একটু জোরে বাতাস বহিলেই আপনারা ঝ'রে পড়েন, প্রখর সূর্য্যতেজে ম্লান হয়ে যান।"

চলিতে চলিতে সরযূ উচ্ছল নদীর মত কলহাস্যে বলিয়া উঠিল, "কি অপরাধ করেছি আমরা যে, আমাদের সম্বন্ধে এমন মহৎ ধারণা আপনার হ'ল? সত্যই কি আমরা এত লঘুপ্রকৃতি?"

"সে ভুল ধারণার জন্য আমি আগেই ত ক্ষমা চেয়েছি! আমিও ত মানুষ, ভুল হওয়া স্বাভাবিক।"

সহসা গম্ভীর হইয়া সরযূ বলিল, "দেখুন, আপনারা যত বড় পণ্ডিতই হন্ না কেন, স্ত্রীজাতিকে অতটা ক্ষুদ্রচেতা ও দুর্ব্বলা ভাববেন না। হ'তে পারে, আমাদের অনেক দোষ আছে; আমরা সহজে বিচলিতা হই, পুরুষের মত সকল কাযে দৃঢ়তার সঙ্গে অগ্রসর হ'তে পারি না; কিন্তু তার জন্য দোষ পুরুষের যত বেশী—নারীর তা নয়। আপনারা আমাদের গ'ড়ে তুল্‌তে পারেন নি। যেমন চেয়েছেন, তেম্‌নি পেয়েছেন।"

সুরেশচন্দ্র নদীর জলস্রোতের দিকে চাহিলেন। তাহার পর মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "কথাটা খুবই সত্য। আমরা আমাদের অর্দ্ধাঙ্গের প্রতি, শ্রেষ্ঠাঙ্গের প্রতি, আমাদের বিবেচনা-বুদ্ধির দোষে, কর্ত্তব্যপালন করিনি। ইদানীং আমরা ভুলে গিয়েছি যে, আমরা ভারতবর্ষের লোক—আমর

বাঙ্গালী। তাই বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্যকে, প্রাচ্যের ব্যবস্থা-প্রণালীকে প্রতীচ্যের আদর্শে গ'ড়ে তুল্‌তে চেয়েছিলাম। তাই প্রাচ্যকেও হারাতে বসেছি, প্রতীচ্যকেও পাইনি।"

কয়েক মুহূর্ত্ত কেহ কোন কথা বলিল না। নীরবে পথ চলিতে লাগিল। প্রথম হেমন্তের আকাশ—গাঢ় নীল, বাতাসে ঈষৎ শৈত্য। উন্মুক্ত আকাশতলে, সন্ধ্যার বাতাসে শান্ত নীরবতা বিরাজ করিতেছিল। প্রকৃতির অনবদ্য সুষমা যেন দিকে-দিকে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সুরেশচন্দ্রের মনে কি আজ উদাস ভাবের বান ডাকিয়াছিল?

তিনি বলিয়া উঠিলেন, "দেখুন, সংসারের দীনতা, রিক্ততা—করুণ ক্রন্দনের শব্দ শুনে-শুনে মনটা এমন উদাস হয়ে যায়! কিছু যেন ভাল লাগে না। আমাদের জন্মভূমির শোচনীয় অবস্থা দেখে প্রাণে মোটে শান্তি পাই না।"

সুরেশচন্দ্র সহসা থামিয়া গেলেন। আজ মনের এই ভাবধারাকে এই তরুণীর কাছে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা তাঁহাকে পাইয়া বসিল কেন?

সরযূ কি তাঁহার মানসিক চাঞ্চল্য দেখিয়া বিব্রত হইয়াছিল? সে একবার চকিতে সুরেশের দিকে চাহিয়া মৃদু অথচ পরিষ্কার কণ্ঠে বলিল, "আপনি কি চিরদিন এমনই সন্ন্যাসীর মতই বেড়াবেন?"

প্রশ্নটা খুবই স্বাভাবিক। অন্ততঃ সুরেশচন্দ্র তাহাতে কোন অসামঞ্জস্য দেখিতে পাইলেন না। বাস্তবিক গৃহধর্ম্মে তাঁহার আসক্তির অভাব, যে কোনও সুপরিচিত আত্মীয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে। সুরেশচন্দ্র চলিতে চলিতেই বলিলেন, "সন্ন্যাসী?—না, সে রকম শক্তিও আমার নেই, ইচ্ছাও যে আছে, তাও বল্‌তে পারি না। গৃহীর কর্ত্তব্য শ্রেষ্ঠ, এ জন্য কর্ত্তব্যপরায়ণ গৃহীকে আমি শ্রদ্ধা করি। আর যিনি সর্ব্বস্ব ভগবান্‌কে অর্পণ কর্‌তে পারেন, তাঁকে—সেই সন্ন্যাসীকে আমি মহাপুরুষ বোধে পূজা করি। সেরূপ সন্ন্যাসী হবার মত শক্তি বা মনোবৃত্তি আমার নেই। আমি গৃহধর্ম্ম পালনের সঙ্গে মানুষের কর্ত্তব্যপালনেরই পক্ষপাতী।"

নীরবে আরও কিছু পথ চলিবার পর তিনি আবার বলিলেন, "কি জানেন, আমার জীবনটা যেন স্বপ্নময়! খালি একটা স্বপ্নকে সার্থক ক'রে তুল্‌বার কল্পনায় ঘুরে বেড়াচ্ছি। এ জন্য আমার বাস্তবতাশূন্য জীবনযাত্রার প্রণালীটা অন্যের চক্ষুতে আদৌ স্পৃহণীয় নয়। আমি কায ভালবাসি—কাযে মেতে থাক্‌তে চাই। সে কায সংসারীর পক্ষে অনেক সময় প্রেয় নয়। সংসারের অন্য সব বিষয়ের প্রতি আসক্তি যেন আমার কাছে বস্তুতন্ত্রহীন মনে হয়। তাই আমার এই জীবনযাত্রার পথে—শ্যামলতাহারা, শোভাসম্পদহীন যাত্রাপথে কাহাকেও চিরসঙ্গী কর্‌তে ভয় পাই। আর কেই বা এমন উদ্ভটপ্রকৃতি মানুষের সাহচর্য্য স্পৃহণীয় ব'লে মনে কর্‌বে?"

সরযূ একটু দ্রুত চলিল। এতক্ষণ সে নীরবই ছিল—তাহার দৃষ্টি নত।

সহসা সরযূ বলিয়া উঠিল, "কি বল্‌লেন আপনি? এমন জীবনযাত্রা—এমন স্বার্থশূন্য মানুষের সঙ্গ কারও স্পৃহণীয় নয়?"

গম্ভীরভাবে সুরেশচন্দ্র বলিলেন, "না। মানুষ—পুরুষ বা নারী যেই কেন হোক্ না, এমন ভাবে সংসারযাত্রা কর্‌তে চায় না। সবাই চায় পার্থিব আমোদ। ভোজ, নৃত্য, সঙ্গীত—যা কিছু আরামের, যা কিছু ভোগের, সবাই তাই পেতে চায়। আমার হৃদয় চীৎকার ক'রে ব'লে ওঠে—চাই সেবা। আর্ত্ত, পীড়িত, দুঃস্থের মুখে যাতে শান্তির হাসি ফুটে উঠে, তাই দেখবার জন্য আমার পাগল মন ব্যস্ত হয়ে উঠে। আমি যাঁকে গুরু ব'লে কায়মনোবাক্যে শ্রদ্ধা করি, পূজা করি, তাঁর জীবনে এই মহত্তম অনুষ্ঠানের আদর্শ দেখেছি। গৃহে থেকে, গৃহী হয়ে সেই মহৎ আদর্শের কণামাত্র যদি পালন কর্‌তে পারি, তবেই না মানবজন্মটা সার্থক হয়ে উঠত! এখন বলুন, এমন লোকের সংস্রবে কে আস্‌তে চাইবে?"

গাঢ়কণ্ঠে সরযূ বলিয়া উঠিল, "আছে!—এমন লোক আছে—যারা এ রকম সঙ্গলাভের অধিকার পেলে চরিতার্থ হয়ে যায়!"

সুরেশচন্দ্র সহসা থমকিয়া দাঁড়াইলেন। সরযূর কণ্ঠস্বরে তিনি কি চমকিত হইয়াছিলেন? সরযূও সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়াইল। দূর-বিসর্পিত রাজপথ যেন স্তব্ধ হইয়া মৃদু চন্দ্রালোকস্পর্শের মাধুর্য্য অনুভব করিতেছিল। সুরেশচন্দ্র একবার দক্ষিণ বাহু উত্থিত করিলেন, আবার কি ভাবিয়া তিনি উহা নামাইয়া লইলেন। সংযত মৃদু স্বরে বলিলেন, "না, থাক্। আপনার দাদার কাছেই বল্‌ব।"

সরযূর সুগৌর আননে যেন এক ঝলক্ রক্তরাগ ফুটিয়া উঠিল।

উভয়ে নীরবে দ্রুত পথ চলিতে লাগিলেন। ক্রমে রাজপথ জনবহুল হইয়া আসিল। অদূরে তাহাদের শুভ্র ভবনটি দেখা যাইতেছিল।

বহির্দ্বারে সনাতন দাঁড়াইয়া ছিল। নীরবে উভয়ে ভিতরে প্রবেশ করিল।

অমিয়া ভ্রাতা ও ননদীর আগমনে উঠিয়া দাঁড়াইল। সুরেশচন্দ্র দুই একটা সাময়িক প্রশ্নের পর নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন। উজ্জ্বলালোকে অমিয়া সরযূর মুখে কি দেখিল, সেই জানে। সে যেন সরযূর নিকট হইতে কোনও কথা শুনিবার জন্য মুহূর্ত্ত প্রতীক্ষা করিল; তাহার পর স্নেহভরে ননন্দার স্কন্ধদেশে একখানি হাত রাখিল। সরযূর মুখমণ্ডলে উত্তেজনার লোহিত আভা ক্ষণে ক্ষণে দীপ্ত হইয়া উঠিতেছিল। অমিয়া ডাকিল, "সরযূ!"

সেই এক সম্বোধনে সমস্ত প্রশ্ন যেন স্পষ্টতর হইয়া উঠিল। "বৌদি!"—বলিয়া তরুণী, অমিয়ার বক্ষোদেশে মুখ লুকাইল।

অমিয়া তাহার মৃণাল-কোমল ভুজবন্ধনে স্পন্দিতা সরযূকে চাপিয়া ধরিল। তাহার পর ধীরে ধীরে তাহার লজ্জানত আননে স্নেহের চুম্বন-রেখা মুদ্রিত করিয়া দিল।

## পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সে দিন বৈকালে বেশ ঝড় হইয়াছিল; বৃষ্টিও মন্দ হয় নাই। আকাশ তখনও মেঘে ঢাকা ছিল, তবে বৃষ্টি পড়া বন্ধ হইয়াছিল। সন্ধ্যার অন্ধকার তখনও ঠিক নামিয়া আইসে নাই। মাধব কায সারিয়া বাহিরের দরজার সম্মুখে দাঁড়াইতেই দেখিতে পাইল, পথের উপর দিয়া কয়েক জন লোক যেন তাহাদেরই বাড়ীর দিকে আসিতেছে। দূর হইতে মূর্ত্তিগুলি তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিত মনে হইল।

সহসা তাহার মুখমণ্ডলে কৌতূহলের রেখা ফুটিয়া উঠিল। তিন জনের মধ্যে দুই জনকে স্ত্রীলোক বলিয়াই বোধ হইতেছে না? সত্যই ত! বেশভূষা এ দেশের মেয়েদের মত নয়। এ গ্রামের অথবা নিকটবর্ত্তী পল্লীর প্রায় সকলকেই ত সে চিনে। কে ইহারা?

মূর্ত্তিগুলি আরও কাছে আসিলে মাধব দেখিল, অগ্রবর্ত্তী দীর্ঘকায় পুরুষের বেশভূষা বাহুল্যবর্জ্জিত হইলেও সম্ভ্রান্ত-জনোচিত, পশ্চাতের মহিলারা ভদ্র-ঘরাণা। মাধব ভাবিতে লাগিল।

নিকটে আসিয়া অগ্রবর্ত্তী পুরুষ বলিলেন, "আমরা বড় বিপন্ন। ঝড়ে নদীতে নৌকা ডুবে গেছে। আমরা কোন রকমে রক্ষা পেয়েছি। মাঝি-মাল্লারাও বেঁচে গেছে। এ গ্রাম আমাদের অপরিচিত; আজ রাত্রির মত যদি কোথাও—"

মাধব এতক্ষণ বিস্মিতভাবে ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকাইয়া ছিল। সহসা সে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, "আপনাকে যেন চিনি চিনি মনে হচ্ছে!"

আগন্তুক মাধবকে ভালরূপে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "আপনাকেও আমি আগে কোথায় যেন দেখেছি।"

অকস্মাৎ যেন কূল পাইয়া মাধব বলিয়া উঠিল, "ও! আপনি সুরেশ বাবু না?—পুরীতে দেখা হয়েছিল। আসুন আসুন!"

সুরেশচন্দ্রও সেই দীর্ঘাকার বলিষ্ঠ মূর্ত্তিকে চিনিতে পারিয়া বলিলেন, "ঠিক বটে!—আপনি রমেনের সন্ধানে গিয়েছিলেন, আপনাদের একই গ্রামে বাড়ী বলেছিলেন। রমেনের বাড়ীও এই গ্রামে না কি?"

সঙ্গের রমণী দুই জনও এই কথায় সবিস্ময়ে মাধবের দিকে চাহিলেন।

মাধব উৎফুল্ল কণ্ঠে বলিল, "রমেন?—এটাই ত তাঁর বাড়ী!"

সুরেশচন্দ্র পুলকিতভাবে বলিলেন, "বটে! এই বাড়ী রমেনের? তবে আপনি—আপনি মাধব বাবু?"

রমেনের কাছে সুরেশ তাহার মাধব দা'র অনেক কথাই শুনিয়াছিলেন।

কুণ্ঠিতভাবে মাধব বলিল, "আমায় বাবু বল্বেন না। আমরা——"

বাধা দিয়া সুরেশ বলিলেন, "আপনি রমেনের দাদা, তা হ'লে আমারও তাই। আচ্ছা মাধব দা, রমেন এখন বাড়ী আছে ত?"

"না, সে এখন বাড়ী নেই। সে সব কথা পরে হবে। ইস, আপনারা যে তিন জনে একেবারে ভিজে ঢিব-ঢিবে হয়ে গেছেন। এতক্ষণ ভাল ক'রে দেখিনি। চলুন, শীঘ্র কাপড় ছাড়বেন। মা, আপনারা ভিতরে আসুন!"

সুরেশচন্দ্র বলিলেন, "এটি আমার বোন্ অমিয়া, আর উনি অমিয়ার ননদ।"

"শীঘ্র ভিতরে চলুন, মা। ওঃ, আপনাদের বড় কষ্ট হয়েছে ত!"

অন্তঃপুরের পথ দেখাইয়া মাধব সবিনয়ে তাহাদিগকে অগ্রসর হইতে অনুরোধ করিল। বাহিরের বসিবার ঘরে সুরেশচন্দ্র প্রবেশ করিলে, মাধব বলিল, "আপনারা সোজা ভিতরে চ'লে যান, মা। কোন লজ্জা করবেন না, এ আপনাদেরই বাড়ী।"

অমিয়া ও সরযূ অন্তঃপুরের দিকে অগ্রসর হইল। দ্বারপথে আসিয়া তাহারা থমকিয়া দাঁড়াইল। প্রাঙ্গণমধ্যস্থ তুলসীতলে দীপ রাখিয়া, নতজানু কে ঐ তরুণী! নিমীলিত নয়নে সে যেন কাহার ধ্যানে তন্ময়! প্রদীপালোক-শিখা তাহার স্নিগ্ধ আননে প্রতিফলিত। উভয়ে মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখিল, সেই শান্ত, সুন্দর আননে যেন শান্তির ছবি সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

তরুণী যুক্তকরে কাহাকে উদ্দেশ করিয়া কি নিবেদন করিতেছিল, কে বলিবে? কিন্তু এমন নিষ্ঠাভরা ঐকান্তিক পূজার ছবি, আত্মনিবেদনের চিত্র তাহারা কোন দিন দেখিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তাহারা দেখিল, যেন এক অপূর্ব্ব আলোকদীপ্তি এই পূজারিণী নবীনার আননকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছে।

সরযূ সিক্তবসনে শীতে কাঁপিতেছিল, তখনই সে জড়িত কণ্ঠে মৃদুস্বরে বলিয়া উঠিল, "কি চমৎকার, বৌদি!"

চমৎকার! এ দৃশ্যের তুলনা হয় না। হায়! অমিয়া যদি কখনও আরাধ্য দেবতার চরণতলে মুহূর্ত্তের জন্যও এমনই ভাবে আত্মনিবেদন করিতে পারিত! অন্য সময় হইলে—অন্ততঃ আর এক মাস পূর্ব্বে হইলেও এমন পূজার দৃশ্য তাহার মনকে বিন্দুমাত্র অভিভূত করিতে পারিত না। একটা গাছের কাছে মানুষ এমন ভাবে নত হইলে সেটাকে ঘোর কুসংস্কার বলিয়া সে হয় ত উপহাসও করিত। কিন্তু কয় সপ্তাহের অভিজ্ঞতায় তাহার পূর্ব্ব-মতের বহুল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। পূজানিরতা তরুণীর প্রতি শ্রদ্ধায় আজ তাহার চিত্ত ভরিয়া উঠিল। কিন্তু মুখে সে কোন কথা প্রকাশ করিতে পারিল না।

ধ্যানরতা প্রতিভা মাথা নত করিয়া প্রণাম করিয়া উঠিতেই অদূরে দ্বারপার্শ্বে স্তব্ধ সুন্দরীযুগলকে দেখিতে পাইল। সহসা তাহার মনে হইল, দুই দেবকন্যা আকাশ হইতে নামিয়া আসিলেন কি?

তাহার বিস্ময়-বিমূঢ়ভাব দূরীভূত হইবার পূর্ব্বেই মাধব বাহির হইতে চেঁচাইয়া বলিল, "মা, বাড়ীতে অতিথি এসেছেন। ওঁরা জলে ভিজে কষ্ট পাচ্ছেন। তাড়াতাড়ি কাপড়-চোপড় বদলাবার ব্যবস্থা ক'রে দিতে হবে।"

প্রতিভা চকিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। ব্যাপারটা না বুঝিলেও সে তাড়াতাড়ি দ্বারবর্ত্তিনীদিগের নিকটে গিয়া মধুর কণ্ঠে বলিল, "আসুন আপনারা।"

পরক্ষণেই পুরোবর্ত্তিনী অমিয়ার হাত ধরিয়া সে অগ্রসর হইল। পরিচয়ের বালাই পল্লীগ্রামে বড় একটা নাই। বিশেষতঃ আতিথ্যসংকারের প্রচুর দৃষ্টান্ত সে পিত্রালয়ে ও শ্বশুরালয়ে সর্ব্বদাই দেখিয়া থাকে। রাজধানীর নীরস লৌকিকতা, অথবা বিনীত, অন্তঃসারশূন্য ভদ্রতার শিক্ষা তাহাদের ছিল না।

প্রতিভার মিষ্ট সম্ভাষণে আকৃষ্ট হইয়া অমিয়া ও সরযূ ঘরের দিকে অগ্রসর হইল। রমেনের মাতা তখনই পূজা-আহ্নিক সারিয়া বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। মাধবের কণ্ঠস্বর শুনিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "মাধব, কি বল্‌ছিস্ রে?"

মাধব ক্ষিপ্রচরণে তখন অন্তঃপুরের প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে বলিল, "মা, খোকার বন্ধু সুরেশবাবু ও তাঁর বোনেরা ভারী বিপদ্‌গ্রস্ত হয়ে এসেছেন। নদীতে নৌকা ডুবে গিয়েছিল। পরে সব শুনো, এখন আমাকে একখানা কাপড় ও একখানা র‍্যাপার-ট্যাপার দাও। মেয়েদের পাঠিয়ে দিয়েছি, শীঘ্র তাঁদের ভিজে কাপড় ছাড়াবার ব্যবস্থা কর।"

গৃহিণী দ্রুতপদে ঘরের মধ্য হইতে একখানি ধৌত বস্ত্র ও একখানি আলোয়ান আনিয়া মাধবকে দিলেন। তাহার পর রাধারাণীকে কি আদেশ দিয়া তিনি অভ্যাগতাদিগকে দেখিতে চলিলেন। অকস্মাৎ পুরাতন অনেক কথাই তাঁহার মনে পড়িয়াছিল।

দেশে আসিলে রমেন্দ্র সকলের বড় ঘরখানি ব্যবহার করিত। সেই ঘরে প্রতিভা ও তাহার শাশুড়ী রাত্রিতে শয়ন করিতেন। প্রতিভা নবাগতাদিগকে সেই ঘরেই লইয়া গেল।

আলনা হইতে তুইখানি কোঁচান শাড়ী লইয়া সে হাসি-মুখে অমিয়া ও সরযূর হাতে দিল। তাহার পর বাক্স খুলিয়া তুইটি সেমিজ বাহির করিয়া লইল। তোয়ালে তাহাদের ছিল না, তাহার বদলে তুইখানা গামছা লইয়া সে বলিল, "ঘাটে যাবেন ; না, এখানেই জল আনিয়ে দেব ? কাপড়-গুলো আগে ছেড়ে ফেলুন।"

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিবার সময় গৃহিণীর কানে বধূর কথার শেষ ভাগ প্রবেশ করিয়াছিল। তিনি বলিয়া উঠি-লেন, "বড় বৌকে ব'লে দিয়েছি, রোয়াকের পশ্চিমদিকে সে এতক্ষণ জল রেখে এসেছে, মা। ঘাটে যেতে হবে না। চল মা-লক্ষ্মীরা, সেইখানেই নিরিবিলিতে কাপড় ছাড়বে। আহা, ভিজে একেবারে সারা হয়ে গেছ যে, মা !"

সম্পূর্ণ অপরিচিতার সঙ্গে এ কি মিষ্ট আত্মীয়তা ! সরযূ ও অমিয়া মুগ্ধ হইল। উভয়ে আর্দ্র বস্ত্রেই রমেন্দ্রের মাতাকে প্রণাম করিল।

"থাক্, থাক্ মা। ও সব পরে হবে। আগে তোমরা কাপড়-চোপড় ছাড়, বাছা ! আহা, কি কষ্টই পেয়েছ ! বৌমা, তুমি বড় বৌকে নিয়ে চট্ ক'রে চায়ের বন্দোবস্ত কর গে। রমেনের বন্ধু সুরেশ আজ মায়েদের নিয়ে অতিথি !"

অমিয়া কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "না, মা, আমাদের জন্য অত ব্যস্ত হবেন না।"

গৃহিণী বলিলেন, "তোমরা আগে চল ত বাছা, কাপড় ছাড়বে। বৌমা, নূতন টিনের চার কৌটোটা বা'র ক'রে নিয়ে এস। শীতে বাছারা থর থর ক'রে কাঁপছে, এখন গরম চা ভারী দরকার। যাও।"

সে বাড়ীতে চায়ের ভক্ত কেহ ছিল না বটে ; কিন্তু ব্যবস্থা সবই ছিল। পুত্র চা-ভক্ত, সে জন্যও বটে এবং গৃহ-স্থের বাড়ী বলিয়াও বটে।

অমিয়া ভাবিতেছিল, "বৌমা !" এই লক্ষ্মী প্রতিমার মত চমৎকার মেয়েটি কি রমেন বাবুর স্ত্রী ? তিনি কি বিবাহিত ? কৈ, এ সংবাদ ত কোন দিন তাহারা শুনে নাই—রমেন্দ্রও বলে নাই !

উভয়কে নির্দ্দিষ্ট স্থান দেখাইয়া দিয়া গৃহিণী লণ্ঠনটি সেখানে রাখিয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন। কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে সরযূ বলিল, "বৌদি ! রমেন বাবুর কি বিয়ে হয়ে গেছে ? কৈ, এ খবর ত কোন দিন আমরা শুনি নি ?"

অমিয়ার মনেও যে ঐ একই প্রশ্ন উঠিয়াছিল, তাহা সে প্রকাশ করিল না। রমেন বাবু বিবাহিত ! তথাপি—না, সে চিন্তার কোন প্রয়োজন নাই। রমেন বিবাহিত কি চিরকুমার, তাহা জানিয়া তাহার লাভ-লোকসান নাই—সংস্রবই বা কি ? কিন্তু কি হতভাগ্য এই রমেন্দ্রনাথ ! এমন পত্নী থাকিতে, কেন তাহার মনের এমন অধঃপতন হইয়াছিল ?

বাঃ ! এ ত চমৎকার সমালোচনা ! রমেন্দ্রের মান-সিক অধঃপতন সম্বন্ধে সে অকুণ্ঠিতভাবে সমালোচক হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহারও ত দেবতার মত গুণবান্, রূপবান্ স্বামী। তবে সেই বা কেন যম-যন্ত্রণা, আত্মার কঠোর পীড়ন সহ্য করিয়াছিল ?

সিক্ত বস্ত্র ত্যাগ করিয়া, হাত-মুখ ধুইবার পর উভয়ে যেন অনেকটা আরাম বোধ করিল। তাহারা বালতির জলে কাপড়-জামা কাচিতে যাইতেছে, এমন সময় প্রতিভা সেখানে আসিল। সে বলিল, "ও সব থাক্। ও জন্য আপনাদের কিছু ভাবতে হবে না। আপনারা অতিথি—দেবতা।"

সরযূ বলিল, "তা কি হয় ? অতিথি ব'লে কি আমরা কাপড় কাচলে আপনাদের আতিথ্যধর্ম্ম ক্ষুণ্ণ হবে—পাপ হবে ?"

সলজ্জ কণ্ঠে প্রতিভা বলিল, "পাপ হবে কি না, জানি না ; কিন্তু তাতে সেবা-ধর্ম্মের ব্যাঘাত যে হবে, সেটা ঠিক। ও সব থাক্, এখন আপনারা চলুন ; চা জুড়িয়ে যাচ্ছে।"

প্রতিভার অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া উভয়ে তাহার অনুবর্ত্তিনী হইল।

## ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বস্ত্রত্যাগের পর এক একখানি পাতলা আলোয়ান গায়ে জড়াইয়া উভয়ের অত্যন্ত আরাম বোধ হইল। তখন তাহারা দীপালোকিত ঘরের চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। কোথাও কিছুমাত্র বাহুল্য নাই, অথচ প্রত্যেক প্রয়োজনীয় দ্রব্যই এমন শৃঙ্খলার সহিত সজ্জিত যে, রুচি, সৌন্দর্য্যানুরাগ ও পরিচ্ছন্ন-প্রিয়তার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। প্রাচীরগাত্রে কয়েকখানি চিত্র—অরণ্যে নলদময়ন্তী, ভীষ্মের

শরশয্যা, সীতার পাতালপ্রবেশ,—প্রত্যেক চিত্রেই শিল্পীর নিপুণতা সপ্রকাশ। বৈদেশিক শিল্পীর কয়েকখানি নিসর্গ-চিত্রও গৃহের শোভা বাড়াইয়া দিয়াছে। রমেন্দ্রের মাতা ও পত্নী ঘরখানিকে আপনাদের চিত্তবৃত্তির অনুযায়ী করিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন। হিন্দুর পবিত্র, অনাবিল জীবন-যাত্রার পরিচয় যেন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেই পাওয়া যায়। সরযূ ও অমিয়া মুগ্ধ হইল। সুদূর বঙ্গপল্লীর গৃহস্থ-ভবনে আজ তাহারা যাহা দেখিতেছে, তাহা সহরবাসিনী, পাশ্চাত্য-ভাবানুরাগিণী বহু বিলাসিনী মহিলার শয়নকক্ষে দুর্ল্লভ-দর্শন নহে কি?

প্রতিভা দুই পেয়ালা চা লইয়া প্রবেশ করিল, পশ্চাতে রমেন্দ্রের মাতা রেকাবীতে গরম লুচি, কচুরী ও ভাজা সাজাইয়া লইয়া আসিলেন। অমিয়া ও সরযূ যেন সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। গৃহিণী তাহাদের মনের ভাব বুঝিয়া বলিলেন, "মা লক্ষ্মীরা, তোমরা কুণ্ঠিত হচ্ছ কেন? তোমরা শুধু অতিথি নও—এই বাড়ীর মেয়ে। রমেন ও সুরেশ ত আমার কাছে আলাদা নয়। মা'র কাছে মেয়ের লজ্জা থাকতে পারে না। নাও মা, খাও।"

সরযূ প্রতিভার দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনার চা?"

আরক্ত মুখে, মৃদু কণ্ঠে প্রতিভা বলিল, "আমি ত চা বড় একটা খাই না। কদাচিৎ কখন—'

বাধা দিয়া সরযূ বলিল, "তবে আমাদের জন্য কোন দরকারই ছিল না। আপনি না খেলে, আমরাও খাব না কিন্তু।"

সহাস্য মুখে প্রতিভা বলিল, "আপনারা জলে ভিজেছেন, আপনাদের এখন চা খুব দরকার।"

সরযূ মাথা নাড়িয়া বলিল, "সে হবে না, আর এক পেয়ালা আনুন। তিন জনে একসঙ্গে খাব।"

রমেন্দ্রের মাতা বলিলেন, "ওঁরা যখন বল্‌ছেন, ওঁদের সম্মান রাখবার জন্যও তোমার খাওয়া উচিত, বৌ-মা। আমি আর এক পেয়ালা এনে দিচ্ছি, তুমি ব'স।"

অল্পক্ষণ পরেই এক পেয়ালা চা ও এক রেকাবী খাবার লইয়া তিনি ফিরিয়া আসিলেন। প্রতিভা শাশুড়ীর আদেশ অবহেলা করিতে পারিল না। সে চায়ের পেয়ালা তুলিয়া লইল।

নবাগতাদিগের কোনও পরিচয়ই প্রতিভা জানিত না। কথাপ্রসঙ্গে সে শুধু বুঝিয়াছিল, অমিয়া স্বামীর বন্ধুর ভগিনী। সরযূ তাহার ননদ। অমিয়ার সহিত স্বামীর পরিচয় বা ঘনিষ্ঠতা আছে কি না, এ সকল সংবাদ জানিবার কোনও সুযোগ তাহার হয় নাই। স্বামীর নিকট সে নিজেই অপরিচিতা। বিবাহের পর হইতে এ পর্য্যন্ত সে কয়বারই বা স্বামীর সাক্ষাৎ পাইয়াছে! স্বল্পসময়ের জন্য যে দেখা-সাক্ষাৎ, তাহাতে যে সংক্ষিপ্ত বাক্যালাপ, তাহাতে মনে রাখিবার মত কোন কথা কি সে স্বামীর নিকট হইতে পাইয়াছিল? সাধারণ যে দুই চারিটি কথা সে শুনিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল, কৃপণের ধনের মত সে অতি সঙ্গোপনে মনের নিভৃত কক্ষে তাহা লুকাইয়া রাখিয়াছিল। ঐটুকুই তাহার সম্বল। তাহার মনের মধ্যে মাঝে মাঝে একটা অস্পষ্ট চিন্তা জাগিয়া উঠিত—তাহাকে বিবাহ করিয়া স্বামী বোধ হয় সুখী হন নাই। কিন্তু বিদ্যালয়ের চরম শিক্ষা লাভ করিবার জন্য স্বামী তপস্যা করিতেছেন, পিতা, মাতা, শাশুড়ী প্রত্যেকেরই কথার ভাবে এই তত্ত্বটা প্রকাশ পাইলেও তাহার নারীহৃদয়ে মাঝে মাঝে যে চিন্তাটা এক একবার উঁকি মারিত, তাহাকে অতি কষ্টেই সে তাড়াইতে পারিত। স্বামীকে সুখী করিবার জন্য তাহার হৃদয়ে একটা প্রবল আগ্রহ ছিল; কিন্তু এমনই দুরদৃষ্ট যে, ৪ বৎসরের মধ্যে সে শুভ সুযোগ সে কোন দিনই পায় নাই। পত্র? স্বামীর পত্র কিরূপ, তাহা সে জানে না। লজ্জার মাথা খাইয়া, হৃদয়ের আবেগবশে সে উপযাচিকা হইয়া মাঝে মাঝে কয়েকখানি পত্র লিখিয়াছিল; কিন্তু উত্তর কোনও দিন সে পায় নাই। শুধু একবার রমেন্দ্র স্বরচিত "যূথিকা" তাহাকে পাঠাইয়াছিল—'শ্রীমতী প্রতিভার করকমলে' শুধু এইটুকু ছাড়া স্বামীর কোনও হস্তাক্ষর তাহার কাছে নাই। স্বামীর প্রথম উপহার হিসাবে বইখানি তাহার বড় আদরের। কাব্যগ্রন্থের প্রত্যেক ছত্রটি যে সে কণ্ঠাগ্রে রাখিয়াছিল, তাহার ইতিহাসই বা কে জানে?

স্বামী যে তাহাকে পত্র পর্য্যন্ত লেখেন না, এ সংবাদ সে ঘুণাক্ষরেও কাহাকে জানিতে দেয় নাই। সে যে বড় অপমান—বড় দীনতা! সে মরিয়া গেলেও এ রিক্ততার কথা প্রকাশ করিতে পারে না। শুধু এক দিন তাহার মাতৃসমা—মা'র চেয়েও বড়, অগাধ স্নেহময়ী শাশুড়ীর নিকট জেরায় পড়িয়া, তাহার উপেক্ষিত জীবনের আভাসমাত্র দিয়াছিল।

অমিয়াকে যে রমেন্দ্র এক দিন গৃহলক্ষ্মীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়াছিল, সে ইতিহাস মাধব ও গৃহিণী ছাড়া আর কেহই জানিত না। তাঁহারা সর্ব্বপ্রযত্নে সে কথা প্রকাশ পাইতে দেন নাই। এমন কি, মাধবের স্ত্রী রাধারাণী পর্য্যন্ত তাহার কোন আভাসই পায় নাই। সুতরাং প্রতিভা তাহার স্বামীর জীবনের এই অধ্যায়টুকুর কোন সন্ধানই পায় নাই। স্বভাবতঃ সে ধীর, গম্ভীর। অযথা কৌতূহলপ্রিয়তা তাহার ছিল না। পিতা-মাতার নিকট হইতে সে বাল্যকাল হইতেই সংযমশিক্ষা পাইয়াছিল। পিতা ও মাতার জীবনের আদর্শ তাহাকে যে ভাবে গড়িয়া তুলিয়াছিল, তাহাতে প্রতিভার চরিত্রে ও ব্যবহারে এমন একটা স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য ছিল যে, দর্শকের মনে তাহার সম্বন্ধে একটা সম্ভ্রম আপনা হইতেই জাগিয়া উঠিত।

অমিয়াদের কোনও বিশেষ পরিচয় তাহার জানা না থাকিলেও শুধু সামাজিক কর্ত্তব্য, গৃহস্থের ধর্ম্ম, মানুষের প্রতি মানুষের কর্ত্তব্যের প্রেরণায় সহজ, সরল ভাবে নবাগতাদিগের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রীতির জন্য সে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিল। চা-পানে তাহার আসক্তি নাই, অথচ এই নির্দ্দোষ পানের দ্বারা যদি সে অতিথিদিগের তৃপ্তি-বিধান করিতে পারে, তবে কেন সে তাহা করিবে না?

গরম কচুরী মুখে ফেলিয়া সরযূ বলিল, "আপনারা এর মধ্যেই এমন সব আয়োজন ক'রে ফেলেছেন? বড় সুন্দর ব্যবস্থা ত?"

প্রতিভা মৃদু হাসিয়া বলিল, "এ আর বেশী কি? আমরা পাড়াগাঁর লোক, আপনাদের রুচির মত ক'রে—কিই বা আমরা জানি!"

সরযূ বলিল, "আমি মৌখিক ভদ্রতা রাখার কথা বল্‌ছি না। সত্যি এ সময়ে কড়াইসুঁটির কচুরী পাড়াগাঁয়ে পাওয়া যেতে পারে, এ ধারণাই আমার ছিল না। কড়াইসুঁটি কোথায় পেলেন বলুন ত?"

প্রতিভা বলিল, "আমাদের বাগানে। ভাশুর মশাই নিজের হাতে সব করেন।"

"ভাশুর?—রমেন্দ্র বাবুর বড় ভাই আছেন না কি?"

সরযূ মাধবের পরিচয় জানিত না। কিন্তু অমিয়ার কিছু কিছু জানা ছিল। সে বলিল, "রমেন বাবু মায়ের এক ছেলে। উনি সম্পর্কে রমেন বাবুর ভাই—মায়ের পেটের ভাইয়ের মত।"

প্রতিভা বিস্মিত হইল। বুঝিল, তাহার স্বামীর পরিচয় ইহাদের অনেক জানা আছে।

সরযূ নিবিষ্টমনে কিয়ংকাল প্রতিভার দিকে চাহিয়া বলিল, "বৌদি! রমেন বাবু এমন সুন্দরী স্ত্রীকে ছেড়ে দেশভ্রমণে গেলেন কি ক'রে?"

প্রশ্নটা খুব সরল, খুব স্বাভাবিক। কিন্তু উহা তীক্ষ্ণমুখ শলাকার ন্যায় প্রতিভা ও অমিয়ার হৃদয়ে বিদ্ধ হইল। প্রতিভা যে স্বামিকর্ত্তৃক অনাদৃতা, তাহা এ সংসারের আর কেহই জানে না—ইহার দুঃখ সে নিজেই মনে মনে ভোগ করে; কিন্তু অন্যের মুখ হইতে সেই ভাবের কথা উচ্চারিত হইলে হৃদয়ে যন্ত্রণার সঞ্চার করে না কি? অমিয়ার মনেও প্রশ্নটা তীব্রভাবে বিদ্ধ হইল। এত দিন যাহা অপরিস্ফুট ছিল, আজ এই কথা কয়টিতে তাহা পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। পত্নীর প্রতি আসক্তি, ভালবাসা থাকিলে রমেন্দ্রনাথ কখনও—

চিন্তায় সহসা বাধা পড়িল। রমেন্দ্রের মাতা ঘরের মধ্যে আসিয়া বলিলেন, "বৌমা, তোমার হয়েছে? একবার ও দিকে যেতে হবে, বাছা!"

"যাই মা", বলিয়া প্রতিভা উঠিয়া দাঁড়াইল। রেকাবী ও পেয়ালাগুলি সে গুছাইয়া লইল। তাহার অন্তরতলে যে শেলাঘাতের বেদনা বাজিতেছিল, আননে তাহার কোনও আভাস ছিল না।

গৃহিণী বলিলেন, "মা-লক্ষ্মীরা, তোমরা এই বিছানায় খানিক গড়াও। বই যদি পড়তে চাও, ঐ আলমারীতে অনেক রকম বাঙ্গালা বই আছে। আমরা একটু বাদেই আস্‌ছি। বৌমা, মাথার ধারের বড় আলোটা জ্বেলে দাও ত; আলমারীটাও খুলে দাও।"

উচ্ছিষ্ট পাত্রগুলি বারান্দায় রাখিয়া প্রতিভা বড় আলোটা জ্বালিয়া দিল। একটা আলমারী খুলিয়া সরযূকে বলিল, "অনেক রকম বই আছে, যা ইচ্ছে হয়, বেছে নিন্।"

এও এক বিস্ময়! কৌতূহলপরবশ হইয়া সরযূ আলমারীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, বাঁধান পুস্তকে আলমারী পরিপূর্ণ। রমেন্দ্র সযত্নে নানাবিধ উৎকৃষ্ট কাব্য, উপন্যাস, ইতিহাস প্রভৃতি কিনিয়া বাঁধাইয়া রাখিয়াছিল। তাহার মাতা বই পড়িতে ভালবাসিতেন। পূর্ব্বে সাধারণ পাঠের বিশেষ চর্চ্চা ছিল, ইদানীং উপন্যাস প্রভৃতি

পড়া ছাড়াও রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি বেশীর ভাগ পড়িতেন।

সরযূ বঙ্কিমচন্দ্রের চিরপরিচিত, অথচ চির-নূতন 'কমলাকান্তের দপ্তর' বাহির করিয়া লইল। এই বইখানি তাহার বড়ই ভাল লাগিত।

"বৌদি, তুমি কি পড়বে বল ?"

অমিয়া বলিল, "তুমি পড়, আমি ততক্ষণ একটু গড়াই।"

সে দুগ্ধফেনশুভ্র শয্যায় অঙ্গ ঢালিয়া দিল। চারিদিকের জানালা খোলা। পার্শ্বের উদ্যান হইতে ফুলের গন্ধ ভিজা বাতাসে ভর করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল।

শাশুড়ীর সহিত প্রতিভা চলিয়া গেল। আলোকের সম্মুখে বসিয়া সরযূ নিবিষ্টমনে পড়িতে লাগিল।

অমিয়ার মনে একটা কথা আজ নূতনভাবে জাগিয়া উঠিয়াছিল। সেই স্মরণীয় দুর্য্যোগময়ী রজনীর স্মৃতি সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া যাওয়া অসম্ভব। যদিও রমেন্দ্রের বুভুক্ষু, পঙ্কিল স্পর্শের স্মৃতির জ্বালা এখন তাহাকে তেমন পীড়িত করিতে পারিত না; কিন্তু স্মৃতির দাগ কখনও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় না। তাই সে অনেক সময় আপনার হৃদয়কে, মনোবৃত্তিকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিত। নিরপেক্ষ সমালোচকের ন্যায় সে আপনার কার্য্যপরম্পরাকে বিশ্লেষণ করিত। আলোচনার ফলে সে মনে মনে অনেক বিষয়ের মীমাংসা একরূপ করিয়া লইয়াছিল; কিন্তু একটা বিষয়ে সে কোনও মীমাংসায় উপনীত হইতে পারে নাই। রমেন্দ্রের অশিষ্ট আচরণকে সে একটু হাল্কাভাবে দেখিবার চেষ্টা করিত। কিন্তু আজ আকস্মিক পরিচয়ের ফলে সে যখন সর্ব্বপ্রথম জানিতে পারিল, রমেন্দ্র বিবাহিত, গৃহে মধুরস্বভাবা, সুন্দরী স্ত্রী বর্ত্তমান, তখন রমেন্দ্রকে সে আর পূর্ব্বের মত লঘু অপরাধী বলিয়া ভাবিতে পারিল না। তাহার আচরণের অসামঞ্জস্য অমিয়াকে পীড়িত করিতে লাগিল।

তাহার প্রতি রমেন্দ্রের আকর্ষণ সামাজিক হিসাবে অসঙ্গত ও অশোভন হইলেও অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু তাহাকে ভালবাসা বলা যায় না। যদি যথার্থই সে অমিয়াকে ভালবাসিত, তবে বিবাহ করিল কিরূপে ?

মনের মধ্যে সমালোচকরূপে যিনি বসিয়াছিলেন, তিনি দৃঢ়স্বরে বলিয়া উঠিলেন, বাঃ! তাহাতেই রমেন্দ্র অপরাধী হইল? তবে সে-ও ত অপরাধিনী! সে-ও কি কৈশোরে রমেন্দ্রকে মনে মনে চিন্তা করে নাই? তবে সেই বা অনিলচন্দ্রকে তাহার পর বিবাহ করিল কিরূপে? এক জনের স্মৃতি মনের নিভৃত কন্দরে লুকাইয়া রাখিয়া, সহস্র লোকের সম্মুখে ভগবানের নাম লইয়া সে কি অন্যকে হৃদয়-মন দান করিবার অঙ্গীকার করে নাই? তাহাই বা সম্ভব হইয়াছিল কিরূপে?

না, না—যাহাকে পাওয়া যাইবে না, বিবাহিত জীবনে তাহার স্মৃতি যাহাতে মনকে অধিকার করিয়া না থাকে, ইহা ভাবিয়া সে তখন রমেন্দ্রের স্মৃতি মানসপট হইতে মুছিয়া ফেলিয়াছিল, কৈশোরের অপরিণত মনোবৃত্তিকে মোড় ফিরাইয়া ভিন্ন পথে চালিত করিয়াছিল। দুর্ব্বলের ন্যায় সে মনের আবেগস্রোতে আপনাকে ভাসাইয়া দেয় নাই। জীবনসখারূপে সে কায়মনোবাক্যে যাঁহাকে বরণ করিয়াছিল, তাঁহাকে লইয়াই সুখী হইবার চেষ্টা করিয়াছিল। রমেন্দ্রের সহিত যখন তাহার বিবাহের কথা হইয়াছিল, তখন মনোমন্দিরে সত্যই একটা আশার আলোক জ্বলিয়া উঠিয়াছিল—তাহাতে অস্বাভাবিকতা কিছু ছিল না। উপন্যাসের নায়িকার ন্যায়, রমেন্দ্র-লাভ হইল না বলিয়া সে জীবনকে দুর্ব্বহ বলিয়া মনে করিতে পারে নাই। বিবাহ হইলে হয় ত সে সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত হইত; কিন্তু সে বিবাহ না হওয়াতে এমন কিছু বিশেষ অনিষ্ট ঘটিল, এরূপ কোন ভাব তাহার মনে উদিত হয় নাই। প্রথম-যৌবনে মনে অনেক আশা, অনেক আকাঙ্ক্ষার বীজ উপ্ত হয়; কিন্তু সবগুলি কাহারই পূর্ণ হয় না। সে-ও তাহাই মনে করিয়া সমাজ ও ধর্ম্মবিধান অনুসারে যাঁহাকে স্বামিত্বে বরণ করিয়াছিল, তাঁহারই প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা অর্পণ করিয়াছিল।

রমেন্দ্র কিন্তু তাহা করে নাই। সে যখন বিবাহ করিয়াছিল, তখন সেই জীবন-সঙ্গিনীকে তাহার সর্ব্বস্ব অর্পণ করা কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু পুরুষ—দৃঢ়চেতা শিক্ষিত মানুষ হইয়া রমেন্দ্র কি সে কর্ত্তব্য পালন করিয়াছিল? কখনই নহে, তাহা হইলে তাহার এমন মানসিক অধঃপতন হইবে কেন? নিরবলম্বচিত্তে অনেক রেখাপাত হয়, হইবার সম্ভাবনা; কিন্তু যাহার সত্যনিষ্ঠা আছে, সে কখনই মিথ্যা আশাকে অবলম্বন করিয়া থাকিবে না। যাহা ধ্রুব, যাহাকে

সত্য বলিয়া স্বেচ্ছায় বরণ করিয়াছে, সহস্র দুর্দ্দমনীয় বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও তাহাকে দৃঢ়রূপে ধরিয়া না থাকাই গুরু অন্যায়, অমার্জ্জনীয় অপরাধ। না—রমেন্দ্রের কার্য্যকে লঘু বলিয়া উপেক্ষা করা চলে না। যাহার সহিত ইহলোকের কোন বন্ধন নাই, যাহার উপর সামাজিক বা নৈতিক কোন অধিকার নাই, ধর্ম্মজগতের সহিত যে বিষয়ের কোন সংস্রব নাই, তাহা যতই মধুর, যতই লোভনীয় হউক না কেন, সে বিষয়ে লোভ করা শুধু অসঙ্গত নহে, ঘোরতর অন্যায়—পাপ! অমিয়ার সংস্কার তাহাকে এই কথাই ভাবিতে শিখাইয়াছিল। পরিণীতা ধর্ম্মপত্নী বিদ্যমান, তবু রমেন্দ্র কেন তাহাকে চাহিয়াছিল? উহা কি প্রেম?—কখনই নহে। রমেন্দ্র শুধু তাহার দেহকে চাহিয়াছিল—তাহার বাহিরের রূপে মুগ্ধ, উন্মত্ত হইয়া সে তাহার স্থূলদেহকে লালসার দ্বারা অপবিত্র ও দগ্ধ করিতে চাহিয়াছিল মাত্র! উহাতে প্রেম ছিল না, ছিল শুধু ঘৃণিত লিপ্সা, নারকীয় আকর্ষণ! সেই পাপকলুষিত চিত্তের স্পর্শ তাই এত দিন তাহাকে দগ্ধ করিয়াছে। আর সেই জন্য সে-ও এই স্মৃতির তাড়না হইতে মুক্ত হইতে পারে নাই। রমেন্দ্রের দুর্দ্দমনীয় স্পৃহা তাহার অন্তরে সঞ্চারিত হইয়া তাহার প্রথম-যৌবনের সুষুপ্ত চিন্তাকে জাগাইয়া তুলিয়াছিল।

এখন সে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। এখন আর তাহার চিত্তে দহনজ্বালা নাই। এখন সে আপনাকে বুঝিতে শিখিয়াছে; নিজের অবস্থা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে। কর্ম্ম-সমুদ্রের পবিত্র নীরে অবগাহন করিয়া সে আপনার নারীত্ব ও মাতৃত্বকে নূতনভাবে ফিরাইয়া পাইয়াছে। জীবসেবায় প্রেমময় অনন্তসুন্দরের আভাসমাত্র সে পাইয়াছে। সে বুঝিয়াছে, প্রেম কত মধুর, কত মহান্, কি পবিত্র! তাহাতে ইন্দ্রিয়ের বিকার থাকিতে পারে না। প্রেমেই মাতৃত্বের চরম বিকাশ হইয়া থাকে। সে এখন বুঝিতে শিখিয়াছে, এক জন আছেন, যিনি সর্ব্বজীবে—জড়ে ও চেতনে সমভাবে বিদ্যমান। জীবের সেবায়, পরিচর্য্যায় তিনি যে ভাবে মানুষের চিত্তে আবির্ভূত হন, তাহা অতি বিস্ময়কর আনন্দের দ্যোতক। অবশ্য তাঁহার রূপজ্যোতিঃ দর্শনের সৌভাগ্য তাহার হয় নাই—যুগ-যুগ ধরিয়া সাধনা করিলে তবে তাহা পাওয়া যায়; কিন্তু এত দিনে সে পথের সন্ধান পাইয়াছে। তুলসীতলে প্রদীপ জ্বালিয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে, মুক্ত গগনতলে একনিষ্ঠ উপাসিকার অকৃত্রিম প্রার্থনার মূর্ত্ত প্রকাশও সে দেখিয়াছে। সে দৃশ্য চিরস্মরণীয় হইয়া তাহার চিত্তে বিরাজ করিবে। সে যে পথের সন্ধান পাইয়াছিল, আজ তাহা বিশালতর হইয়া তাহার সম্মুখে দেখা দিয়াছে। সে স্বামীর প্রেমে মগ্ন হইয়া স্বামীকে সর্ব্বান্তঃকরণে ভালবাসিয়া তাহারই সাহায্যে বিশ্ববাসীকে ভালবাসিতে, স্নেহ বিলাইতে চেষ্টা করিবে। ইহাই ভারতবর্ষের ভাবধারার বৈশিষ্ট্য। এমনইভাবে সাধনা করিলে সে কি চিরসুন্দরের প্রেমময় মূর্ত্তি দেখিবার সুযোগ পাইবে না?

নিমীলিত নেত্রে অমিয়া তখন স্বামীর কথা ভাবিতে লাগিল। একমনে কোনও বস্তুকে চিন্তা করিলে তাহা যেন প্রত্যক্ষ করা যায়। অমিয়ার মনে হইল, সে যেন স্বামীর মূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছে। এই কয় দিনে চিরন্তন সংস্কারের প্রভাব তাহার অন্তরতলে যেন ক্রমে ক্রমে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছিল। তাহার দাদা যে মাঝে মাঝে বলিতেন, প্রতি শোণিতবিন্দুতে যাহা বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হইয়া আসিতেছে, চর্চ্চা করিলে তাহার প্রভাব সহজেই পরিপুষ্ট হইয়া উঠে, ইহা গঞ্জিকাসেবীর খেয়ালের কথা নহে, বৈজ্ঞানিক সত্য। স্বামীর কথা ভাবিতে ভাবিতে, তাঁহার ছবি মানসপটে ফুটিয়া উঠিতে দেখিয়া সান্নিধ্যলাভের আনন্দে তাহার চিত্ত পুলকিত ও স্পন্দিত হইয়া উঠিল।

কিন্তু কি হতভাগ্য এই রমেন্দ্রনাথ! পত্নীর প্রেম উপেক্ষা করিয়া সে কোন্ অনিশ্চিত পথে, মরীচিকার সন্ধানে ঘুরিয়া মরিয়াছে! রমেন্দ্রের জন্য সত্যই অমিয়া দুঃখিত হইল। সে তাহার বাল্যসখা, ভ্রাতৃবন্ধু। পথিভ্রান্তকে পথ দেখাইয়া দেওয়া তাহারও অন্যতম কর্ত্তব্য নহে কি? নিশ্চয়। অমিয়া চেষ্টা করিবে।

কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে রমেন্দ্রের আচরণ-আলোচনায় তাহার মনে রমেন্দ্রের প্রতি ঘোরতর বিরাগ জাগিয়া উঠিয়াছিল। পুনঃ পুনঃ আলোচনায় তাহা অন্তর্হিত হইল। মানুষের প্রতি ঘৃণা করিবার অধিকার কাহারও নাই। ভ্রম সকলেরই হইতে পারে—হইয়া থাকে। সে জন্য দুঃখিত হওয়া চলে; কিন্তু রাগ বা ঘৃণা করা চলে না। তাহার মনও মুহূর্ত্তের জন্য পথিভ্রান্ত হইয়াছিল।

"কি কচ্ছেন,—পড়ছেন বুঝি? দিদি, ঘুমুলেন না কি?"

অমিয়া এমনই আত্মবিস্মৃত হইয়াছিল যে, প্রতিভার প্রথম আহ্বান শুনিতে পাইল না।

সরযূ বলিল, "ওঃ! আপনার চোখ-মুখ একেবারে লাল হয়ে উঠেছে দেখছি! রাঁধছিলেন বুঝি? আমরা আপনাদের ভারী ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলেছি ত!"

অঞ্চলে আরক্ত আনন ও ললাটতলের স্বেদবিন্দুগুলি মুছিয়া ফেলিয়া প্রতিভা বলিল, "বাড়ীতে আপনার জন এলে যদিই বা একটু ব্যস্ত হ'তে হয়, সেটা কি মন্দ?"

লজ্জিতভাবে সরযূ বলিল, "না, তা বল্‌ছি না—বাঃ! বৌদি—তুমি বেশ ত ঘুমুচ্ছো!"

অমিয়ার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল। সচকিতে সে শয্যায় উঠিয়া বসিল। গায়ে র‍্যাপারটা টানিয়া দিয়া বলিল, "না, না, আমি ত ঘুমুইনি। শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম।"

প্রতিভা বলিল, "শরীর ক্লান্ত হয়েছে, বেশ ত, খানিক ঘুমিয়ে নিন। আর আধ ঘণ্টা বাদে আপনাকে ডেকে তুল্‌ব।" সরযূর দিকে ফিরিয়া বলিল, "আপনাদের কাছে বেশীক্ষণ থাকৃতে পাচ্ছি না ব'লে অপরাধ নেবেন না।"

"না, না! সে কি কথা। আমরা বেশ আছি। আমাদের জন্য কিছু ভাববেন না।"

প্রতিভা গৃহকর্ম্মে ফিরিয়া গেল। কায থাকা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে অতিথির সংবাদ লইতে আসায় যে আন্তরিকতা প্রকাশ পাইল, তাহাতে সরযূ ও অমিয়া মুগ্ধ হইল।

[ ক্রমশঃ।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

# মান-ভঞ্জন

তোমায় কেন লিখ্‌ছি না ক' চিঠি—
শুধু তুমি এইটুকুরই তরে,
নিলে তোমার সরল আঁখি দুটি
অভিমানের অশ্রুজলে ভ'রে!
অম্‌নি তুমি বুঝে নিলে আমি
স্মৃতিখানি গেছি তোমার ভুলে;
কেমন ক'রে, জানেন অন্তর্যামী,
আছ তুমি আমার হৃদয়-মূলে!
দিবস নিশি সকল কাযের মাঝে
তোমার মুখই জাগে আমার মনে,
বিরহ মোর মিলন-রূপে সাজে,—
মিশিয়ে যায় মিলন-স্মৃতির সনে।
সত্যি-কথা নিষ্ঠুরতা করি,
দিই নি তোমায় কদিন কোন চিঠি।
দিই নি কেন—কইতে লাজে মরি,
অশ্রুজলে ভ'রে আসে দিঠি।
সময় আমার অনেক আছে বটে,
শেষ মাসের এই দিনগুলো সব হেথা,
রিক্ত হাতে বড়ই দুখে কাটে
চিঠি লেখার পয়সা পাব কোথা!
দুঃখী ভেবে ক্ষমা ক'রো, যেন
ভুল ভেবে রোষ হয় নি আমার পরে;
আমি তোমার সাথী চিরন্তন
যতই কেন থাকি দূরান্তরে!
দুখের তরেই ছাড়াছাড়ি ভবে,
দুখের তরেই বিদেশ এসে থাকা!
পয়সা যদি থাক্‌ত সবার তবে,
কেই বা প'ড়ে থাক্‌ত একা একা!
ভাব্‌ছ তুমি একাই শুধু বুঝি
কষ্টটা সব সইছ আমার তরে!
তোমার তরে কতই ব্যথা পুঁজি
করছি আমি আমার হৃদয় ভ'রে!
পয়লা তারিখ মাইনে আমার হবে;
ভাবনা কিসের? এই শনিবার এলে,
সত্যি যাব তোমার কাছে তবে
হেথায় আমার যা কিছু কায ফেলে।
প্রণাম তোমার পায়ে কেন মোর?—
তুলে নিলুম যত্ন ক'রে বুকে
ভালবাসা করবে হৃদয় ভোর—
বারেক কেন?—সদাই সুখে-দুখে।
ব্যারিং ডাকে দিলুম চিঠি, নিয়ো—
দুটি আনার ডাকের মাশুল দিয়ো;
শুধ্‌বো দিয়ে লক্ষ টাকার চুম,
সারাটা রাত হবে নাক ঘুম।

ইতি—

তোমারই "বৌ।"

# কালিদাসের পক্ষিতত্ত্ব-জ্ঞান

আজ যাঁহার নাম কীর্ত্তন করিতেছি, তাঁহার সম্বন্ধে সাধারণতঃ যে সকল বর্ণনা শুনিয়া আসিতেছি, তাহাতে আর আমাদের মন ভিজে না। তিনি না কি সৌন্দর্য্যের কবি; তিনি না কি কেবলমাত্র 'ভারতের কালিদাস'; আবার কেহ কেহ তাঁহার সমস্ত রচনার ভিতর হইতে কেবল উপমাগুলি বাহির করিয়া লইয়া রসে মস্‌গুল হইয়া বলিয়াছেন—'উপমা কালিদাসস্য।' কত শত বৎসর পূর্ব্বে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কোথায় তাঁহার জন্মস্থান, উজ্জয়িনীর রাজসভায় তিনি কত দিন ছিলেন, কাশ্মীরে তিনি গিয়াছিলেন কি না এবং সিংহলে তাঁহার সমাধি হইয়াছিল কি না—এ সকল বিষয়ে বিজ্ঞ পণ্ডিতমহলে আলোচনা হউক, মহাকবির তাহাতে কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। এই সমস্ত বর্ণনা তাঁহাকে খর্ব্ব করে কি না, এই সমস্ত ঐতিহাসিক গবেষণা আমাদের চিত্তকে কাব্যরস-প্রাচুর্য্যের ভিতর হইতে টানিয়া আনিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয় কি না, সুধীগণের ইহাই বিবেচ্য। কালিদাসের কাব্য পড়িবার সময় এই সমস্ত প্রশ্ন কোনও রসজ্ঞ পাঠকের মনে উদিত হয় কি না, চিন্তার বিষয়। আমার মনে হয়, কালিদাস সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতিতে ব্যাপ্ত হইয়া সমস্ত রূপ-রস-গন্ধ-শব্দের মধ্যে ওতপ্রোত হইয়া সকলের মধ্যে বিলীন হইয়া আছেন। কোন্ অতীত যুগে তাঁহার অমৃতনিস্যন্দিনী বীণা বাজিয়াছিল, জানি না, কিন্তু আজিও তাহার সুর সমস্ত শিক্ষিত জগতের whispering galleryর ভিতর দিয়া ধ্বনিত হইয়া আসিতেছে। তিনি সৌন্দর্য্যের অন্ধ স্তাবক ছিলেন না। যেটি নিত্য, সত্য, সেইটিই তাঁহার কাব্যে সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিত। বিপুলা প্রকৃতির পটভূমিকায় আকাশ, মেঘ, পাহাড়, নদীসৈকতের মধ্যে তাঁহার তুলিকায় মানুষ যেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে, তেমনই আনুষঙ্গিক পারিপার্শ্বিক লতাটি, গাছটি, পাখীটি, ফুলটি সুন্দর সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া সৌন্দর্য্যের একটা বিপুল সমন্বয়ের ভিতর আশ্চর্য্যভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। মানুষের সুখ, দুঃখ, বেদনা, হর্ষ বুঝিতে হইলে সমস্ত প্রকৃতির ভিতর হইতে শুধু মানুষটিকে টানিয়া ছিঁড়িয়া উপাড়িয়া লইলে চলিবে না, অন্য মানুষের সংঘর্ষে আনিলেও ঠিক ছবিটি, হৃদয়ের ঠিক ভাবটি ফুটাইয়া তুলা যাইবে না; তাই মহাকবি বিরহী যক্ষের বেদনা বুঝিবার জন্য মেঘের দৌত্য লইয়া কাব্য আরম্ভ করিয়াছেন। আর আমাদের চক্ষুর সমক্ষে ভবনশিখী কেমন করিয়া বাসযষ্টির উপর বসিয়া আছে, নৃত্যপর কলাপী কি ভঙ্গিমায় কলাপবিস্তার করিয়া পর্ব্বতে পর্ব্বতে কেকারব করিতেছে, কোথায় গৃহবলভিতে পারাবত সুপ্ত, বর্ষাগমে বিস-কিসলয় মুখে করিয়া মানসোৎক রাজহংস কোন্ রহস্যময় মানস-সরোবরের দিকে যাইবার জন্য গিরিদরী লঙ্ঘন করিতেছে, ঋতুসংহারের দীপক রাগে মর্ম্মর-খচিত হর্ম্যতলে নায়িকার অলক্তরাগ-রঞ্জিত চরণে নূপুর-নিক্বণ শুনিয়া কবির মনে চঞ্চুচরণ-লোহিত হংসরুতি বলিয়া ভ্রম হইয়াছে, শরৎলক্ষ্মী বিদায়ের কালে নারীর বদনে শশাঙ্ক-শোভা রাখিয়া আর মণিনূপুরে হংসকাকলী অর্পণ করিয়া বিদায় হইতেছেন, কেমন করিয়া শুকোদর সুকুমার নলিনীপত্রে শকুন্তলার প্রেমপত্র লিখিত হইল, উর্ব্বশীর বিরহে উন্মত্ত রাজা হংসকে দেখিয়া মনে করিতেছেন যে, পাখীটি উর্ব্বশীর কল-গুঞ্জিত গতিভঙ্গীটুকু চোরের মত অপহরণ করিতেছে। এতদ্ব্যতীত গোরোচনা-কুঙ্কুমবর্ণ চক্রবাক্ হইতে আরম্ভ করিয়া চাতক, গৃধ্র, সারস, কারণ্ডব, শ্যেন, কুররী, পরভৃৎ পুংস্কোকিল প্রভৃতি কত পাখীর ছবি তাঁহার কাব্য-নাটকে বিচিত্র সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তিনি এত সূক্ষ্মভাবে বিহঙ্গ-জীবনলীলা পর্য্যবেক্ষণ

করিয়াছেন যে, আজিকার এই বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক কষ্টিপাথরে যাচাই করিলে তাহাদের কোনটাই মেকি বলিয়া মনে হইবে না। এত তীক্ষ্ণদৃষ্টি, এমন সুসঙ্গত বিশ্লেষণ! শুধু সুন্দর হইলেই হয় না। সত্যের সহিত সুন্দরের একটা গভীর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। এ বিষয়ে যাঁহাদের কৌতূহল জাগিয়াছে, তাঁহারা কালিদাস-সাহিত্য হইতে যে আনন্দ লাভ করিয়াছেন, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। গয়টের উচ্ছ্বাসের কথা আমাদের মনে আছে, কিন্তু গয়টে ত কালিদাসের অনুবাদ পড়িয়াছিলেন মাত্র। বড় বড় নামের উল্লেখ করিলে আমার মূল প্রতিপাদ্য কথাটা হয় ত চাপা পড়িয়া যাইবে; কিন্তু আমি পক্ষিতত্ত্বের দিক্ হইতে শুধু দুই একটি কথা সংক্ষেপে বলিয়া মহাকবির প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিব। তাঁহার বর্ণিত যে পাখীটির কথাই মনে করি, সে পাখীটি যে আজিকালিকার আধুনিক আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক সত্যের সহিত আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য রক্ষা করিতেছে, এই কথা মনে হইলে আমি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া যাই। কুররীর নাদ আর্ত্ত নারীর কণ্ঠস্বরের মত কি না, হংসরুতি মণিনূপুরনিক্কণকে স্মরণ করাইয়া দেয় কি না, সে প্রসঙ্গ উত্থাপন না করিয়া রাজহংসের বিচিত্র যাযাবরত্বের কথা ভাবিয়া দেখিলেই আমি যে কথাটা বলিতে চাই, সেই কথাটা বোধ হয় ভাল করিয়া ফুটাইয়া তুলিতে প্রয়াস পাইব। বিষয়টি যতই অনুধাবন করিয়াছি, ততই মহাকবির বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্মদর্শিতায় বিস্মিত হইয়াছি। রাজহংসরা দলবদ্ধ হইয়া আষাঢ়মাসে ভারতের জলাভূমি হইতে পাথেয় সংগ্রহ করিয়া মেঘরাজ্যে উঠিয়া পড়ে; কোন্ এক অন্ধ শক্তির প্রেরণায় সে উত্তর অভিমুখে গিরিরাজ হিমাচল অতিক্রম করিয়া কৈলাসের দিকে ধাবিত হয়, তাহার ভিতর কিসের যেন একটা উৎকণ্ঠা আছে,—বর্ষাকালে যেখানেই এই রাজহংস-প্রয়াণের কথা দেখিতে পাই, সেইখানেই এই উৎকণ্ঠা সূচিত হইয়াছে—

“প্রবাসোৎসুকমনসা, মানসোৎসুকচেতসা,
মানসোৎকা রাজহংসাঃ।”

কিন্তু যখন তাহারা আবার হিমালয় অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষে ফিরিয়া আইসে, তখনকার বর্ণনায় আর সেই উৎকণ্ঠা নাই। তখন তাহারা কেবলমাত্র মানস-সরোবরের স্মৃতিটুকু লইয়া ফিরিয়া আইসে। কবি তখন তাহাদের মাত্র—

“প্রিয়মানসা, মানসরাজহংসী”

বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

রহস্য মন্দ নয়! গেলই বা কেন, আর আসিলই বা কেন? আর হিমালয় অতিক্রম করিবার জন্য কোন্ নিগূঢ় শক্তির প্রেরণায় তাহারা “হংসদ্বার” বা ক্রৌঞ্চরন্ধ্রের ভিতর দিয়া যাওয়া-আসা করিল? এ সমস্তই আগাগোড়া একটা রহস্যময় instinct বা ‘অশিক্ষিতপটুত্বম্’এর প্রক্রিয়া বলিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া চলে না। এই যে প্রবল instinct, এত দীর্ঘ পথপ্রব্রজন,—ইহার কারণ কি? বর্ষাগম বা বর্ষাপগমের সঙ্গে ইহার কোনও অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে কি? আছে বৈ কি, না হইলে সমস্ত বর্ণনাই ভ্রমাত্মক হইয়া যায়।

পাখীর এই যাযাবরত্বের মত আশ্চর্য্য নৈসর্গিক ব্যাপার খুব কমই আছে। ঋতুবিশেষে সমগ্র উত্তর-য়ুরোপ হইতে কতকগুলি পাখী চঞ্চল হইয়া বাহির হইয়া পড়ে, গভীর নিশীথে যখন সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি সুপ্ত, তখন তাহারা কি একটা অন্ধ আবেগের তাড়নায় দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করে। আলোকরশ্মি-বিচ্ছুরণকারী সমুদ্রতীরস্থ Light houseএ ধাক্কা খাইয়া অনেকের প্রাণবিয়োগ ঘটে, কিন্তু তবুও তাহারা প্রতিবৎসরই কোন নির্দ্দিষ্ট ঋতুতে যথাসময়ে এক প্রকাণ্ড উদ্দাম আবেগের বশীভূত হইয়া, অন্ধকার ভেদ করিয়া, ভূমধ্যসাগরের উপর পাড়ি দিয়া একেবারে দক্ষিণ-আফ্রিকায় গিয়া উপস্থিত হয়। মধ্য এবং উত্তর-এসিয়ার কতকগুলি পাখী সেইরূপ এক নিগূঢ় উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া ঋতুবিশেষে প্রতিবৎসর হিমাচল অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষে, শ্যামে, সিংহলে, যবদ্বীপে উপস্থিত হয়। য়ুরোপ মহাদেশের পাখীর পক্ষে যেমন ভূমধ্য-সাগর অতিক্রম করা চাই, এসিয়া ভূখণ্ডের কতকগুলি পাখীর পক্ষে সেইরূপ হিমাচল অতিক্রম করা একান্ত আবশ্যক। কেন আবশ্যক, সে কথা পরে বলিতেছি। কিন্তু অহোরাত্র আলোকে আঁধারে কেমন করিয়া তাহারা এই সহস্র যোজন পথ অতিক্রম করিয়া যাওয়া-আসা করে, উত্তুঙ্গ হিমালয়ের ভিতর কেমন করিয়া তাহারা এই ক্রৌঞ্চরন্ধ্র—যাহাকে কোন কোন ঐতিহাসিক পণ্ডিত Niti pass বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন—আবিষ্কার করিল এবং কিছুতেই যাওয়া-আসার সময় এই গিরিসঙ্কট সম্বন্ধে তাহাদের একটুও ভুল

হয় না—এ রহস্যের মর্ম্মভেদ আজিও কোনও পক্ষিতত্ত্ববিৎ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এই যাওয়া-আসা, এই যাযাবরত্ব যখন কতকগুলি পাখীর পক্ষে স্বাভাবিক, তখন বিষয়টা একটু তলাইয়া দেখা আবশ্যক। কেন যায়, কেন আইসে, কিসের এই উৎকণ্ঠা ?—এ সম্বন্ধে যতটুকু স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে আমরা দেখি, কতকটা খাদ্যাভাবের তাড়না, কতকটা প্রজনন-ঋতুর তাড়না। বাহিরে গিয়া কোথাও এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে তাহাকে নীড় রচনা করিয়া ডিম্ব প্রসব করিতে হইবে, তাই এই উৎকণ্ঠা। তাহার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন এক অননুভূত আবেগে চঞ্চল হইয়া উঠে। কোথায় উত্তর-য়ুরোপ, আর কোথায় দক্ষিণ-আফ্রিকা! কোথায় উত্তর ও মধ্য-এসিয়া আর কোথায় দক্ষিণ-ভারত, সিংহল, যবদ্বীপ! উত্তরে যাত্রার সময় কালিদাসের রাজহংস অল্পক্ষণের জন্য দশার্ণ-গ্রামে অবস্থান করিবে,—

"কতিপয়দিনস্থায়িহংসা দশার্ণাঃ।"

Migration বা যাযাবরত্বের ইহাই একটি লক্ষণ। একটা প্রকাণ্ড মহাদেশ অতিক্রম করিতে হইবে। যে পাথেয়টুকু সম্বল করিয়া পাখীর ঝাঁক যাত্রা সুরু করিয়াছিল, সেটুকু নিঃশেষ হইয়া যাইতে অধিক বিলম্ব হয় না। পথের মধ্যে আবার কিছু খাদ্য সংগ্রহ করিতে হইবে; তাই স্থানে স্থানে তাহাদের এক আধ দিন থাকিতে হয়। বর্ষা-ঋতু অনেক পাখীর গর্ভাধানকাল। এই সময়ে যে তাহাদের মনে কেবলমাত্র উৎকণ্ঠা বা চাঞ্চল্য দেখা দেয়, তাহা নহে, তাহাদের স্বভাবেরও পরিবর্ত্তন ঘটে;—কালিদাস সেটিও লক্ষ্য করিয়াছেন। বলাকা দল বাঁধিয়া আকাশে উড়িতে থাকে; সারস পটু মদকলে অন্তরীক্ষ কাঁপাইয়া তুলে। মানসোৎক রাজহংসের প্রয়াণের কথা কবি-কল্পিত বলিয়া ধরা চলে না। আধুনিক পক্ষিতত্ত্ববিদ্‌দের পর্য্যবেক্ষণের ফলে জানা গিয়াছে, মেঘের সঙ্গে হংসপ্রব্রজনের এক নিবিড় সম্বন্ধ আছে; গ্রীষ্মাপগমে বর্ষার প্রাক্কালে তাহাকে ভারতবর্ষ ছাড়িয়া যাইতেই হইবে; গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়া হিমাচল অতিক্রম করিয়া, উত্তরে তিব্বত ও মধ্য-এসিয়ার হ্রদ-সান্নিধ্যে অনুকূল জলাভূমিতে গিয়া ডিম্ব প্রসব ও শাবকোৎপাদনাদি কার্য্য সমাধা করিতে হইবে। এই সময়ে এই পাখীগুলিকে আর ভারতবর্ষের মধ্যে দেখা যাইবে না। প্রজনন কার্য্য শেষ করিয়া তাহারা আবার শরৎকালে দক্ষিণে ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিবে। বাস্তবিক ঋতুসংহারে তাই দেখি—নিদাঘ-প্রকৃতির অন্তরালে যে হংস প্রচ্ছন্ন ছিল, বর্ষাগমে মেঘদূতের কবি যাহাকে ক্রৌঞ্চরন্ধ্রের ভিতর দিয়া মানসাভিমুখে উড়াইয়া লইয়া গিয়াছেন, শরৎকালে আর্য্যাবর্ত্তের নদীবক্ষে সন্তরণশীল সেই হংস বর্ষাশেষে ঈষন্মলিন নদীজলকে শুভ্র করিয়া, হিল্লোলিত কমল-রাগরঞ্জিত বীচিমালাকে মুখরিত করিয়া, সিতা শরৎলক্ষ্মীর বাহনরূপে আমাদের অত্যন্ত নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

মহাকবির কাব্যসাহিত্য মন্থন করিয়া অনেক সুধী সমালোচক সুধাভাণ্ড লাভ করিয়াছেন এবং আপামর সাধারণকে তাহার কিঞ্চিৎ বণ্টন করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছেন। বিহঙ্গতত্ত্বের দিক্ হইতে আমি শুধু তাঁহার অপূর্ব্ব সূক্ষ্মদৃষ্টির একটু ইঙ্গিত করিয়াছি মাত্র। তিনি যে পাখীগুলির উল্লেখ করিয়াছেন, সেগুলির আধুনিক বৈজ্ঞানিক পরিচয় কি, সে সম্বন্ধে গবেষণার যথেষ্ট অবসর আমাদের শিক্ষিত-সমাজে আছে। যে শব্দবিন্যাসে তিনি উহাদিগকে বিশেষিত করিয়াছেন, সেগুলি যে শুধু তাঁহার লিপিচাতুর্য্যের উদাহরণস্বরূপ মাত্র, আর কিছু নহে, এই ভুল ধারণা বোধ করি কাহারও মনে হইবে না। যদি এ সম্বন্ধে আমাদের দেশে কিছুমাত্র কৌতূহল জাগে, তাহা হইলেই আমি মনে করিব যে, মহাকবি কালিদাসের প্রতিভা সর্ব্বতোভাবে আলোচিত হইবার উপযুক্ত সময় আসিয়াছে। তখন আর আমরা শুধু মহাকবির জয়গান করিয়া ক্ষান্ত হইব না। যে প্রকৃতি-বিশ্লেষণ-সৌন্দর্য্যের দিকে তিনি তাঁহার তর্জ্জনীসঙ্কেতে আমাদের আহ্বান করিয়াছেন, অবনত মস্তকে দ্বিগুণ ভক্তিভরে আমরা সেই দিকেই অগ্রসর হইতে পারিব। আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা তখন সার্থক হইবে, আমাদের মাতৃভূমি ধন্য হইবে, আমরাও কৃতার্থ হইব। *

শ্রীসত্যচরণ লাহা।

---

* কালিদাস-স্মৃতি দিবসে য়ুনিভারসিটি ইনষ্টিটিউটে পঠিত।

# উলা

## ৮

মহামারীর পূর্ব্বে উলায় কয়েক জন ভোজনবিলাসী বা 'খাইয়ে' লোক ছিলেন, তন্মধ্যে বেণীমাধব মুস্তৌফী ও রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন। বেণীমাধব অশীতিপর বৃদ্ধ হইলেও তখনও তিনি সাধারণ ৭।৮ জন লোকের আহার্য্য অবলীলাক্রমে ভোজন করিতে পারিতেন।

রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য "মুনকে রোখো" নামে খ্যাত। তিনি সর্ব্বপ্রকারে এক মণ আহার্য্য উদরস্থ করিতে পারিতেন। দেনার দায়ে রঘুনাথ একবার কারারুদ্ধ হয়েন। সে সময়ের সস্তার দিনে দশ বার পয়সা দৈনিক খোরাকী এক জন লোকের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। রঘুনাথের পাওনাদার তাঁহার জন্য ঐরূপ খোরাকী জমা দিয়াছিলেন। রঘুনাথ জজ 'সাহেব'কে জানাইলেন যে, ১০।১২ পয়সায় তাঁহার খোরাকী হয় না, প্রত্যহ অন্ততঃ ২ টাকা হইলে তাঁহার খোরাকী হইতে পারে। ইহা শুনিয়া জজ 'সাহেব' নিজে দুইটি টাকা রঘুনাথকে পাঠাইয়া দিয়া বলিয়া দিলেন যে, রঘুনাথ যেন প্রহরীর সঙ্গে যাইয়া স্বয়ং বাজার করিয়া আনেন; তাঁহার রন্ধন হইয়া-গেলে জজ 'সাহেব' যেন সংবাদ পান, কারণ, তিনি নিজে রঘুনাথের আহার দেখিবেন। রঘুনাথ পরদিন নিজের অভিরুচিমত বৃহৎ মৎস্য, রাশীকৃত চাউল, দাইল, ঘৃত ও তৈলাদি আনিয়া রন্ধন শেষ করিলেন। তৎপরে তিনি কতকগুলি আস্ত কলার পাতা ভূমির উপর বিছাইয়া তদুপরি সেই সকল আহার্য্য স্তূপাকার করিয়া রাখিলেন। জজ 'সাহেবকে' সংবাদ দেওয়া হইলে তিনি অশ্বারোহণে রঘুনাথের আহার দেখিতে আসিলেন এবং অদূরে অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া সেই স্তূপাকার আহার্য্য এক জন লোকের পক্ষে খাওয়া কিরূপে সম্ভব, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। রঘুনাথ গণ্ডূষ করিয়া আহারে বসিলেন এবং অল্পকালমধ্যে অর্দ্ধেক সামগ্রী খাইয়া ফেলিলেন। তৎপরে তিনি বিশাল বদনব্যাদান করিয়া দশ সের ওজনের রোহিত মৎস্যের মুড়া কামড়াইয়া লইয়া সশব্দে চিবাইতে লাগিলেন। অমনই জজ 'সাহেব' বলিয়া উঠিলেন, "এ দানা হ্যায়। হামকো মৎ খাও বেটা, দোসরা মুন্দার হ্যায়, উস্‌কো খাও।" ইহা বলিয়া জজ 'সাহেব' বেগে ঘোড়া ছুটাইয়া চলিয়া গেলেন। তৎপরে জজ 'সাহেব' পাওনাদারকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সে প্রত্যহ রঘুনাথকে ২ টাকা খোরাকী দিতে পারিবে কি না? সে ব্যক্তি অক্ষমতা জানাইলে জজ 'সাহেব' রঘুনাথের মুক্তির আদেশ দিলেন। রঘুনাথ আহারে কৃতিত্ব দেখাইয়া বহু ধনীর গৃহ হইতে বাৎসরিক বৃত্তি প্রাপ্ত হইতেন, তদ্দারা তিনি সুখে সংসার প্রতিপালন করিয়া দুর্গোৎসবাদি পর্য্যন্ত করিতেন।

জঙ্গলাবৃত কয়েকটি স্তম্ভ

বনাকীর্ণ অট্টালিকা

## ৯

মহামারীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উলায় কয়েক জন সাধক ছিলেন। রামেশ্বর মুস্তৌফীর জ্যেষ্ঠ পুত্র রঘুনন্দন মুস্তৌফী এক জন সাধক ছিলেন। তিনি ঢাকার নবাব সায়েস্তা খাঁর শাসনকালে অনেক সিদ্ধ পুরুষের নিকটে দীক্ষিত হইয়া পরে নায়িকা-সিদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি গণনা দ্বারা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান জানিতে পারিতেন। তাঁহার গণনার ফল তাঁহার নিকটে উপবিষ্ট অষ্টমবর্ষীয়া বালিকার হস্তস্থিত লেখনী হইতে সংস্কৃত শ্লোকরূপে বাহির হইত। নদীয়ার রাজা গণনা করাইবার জন্য রঘুনন্দনকে ঘন ঘন কৃষ্ণনগরে লইয়া যাইতেন।

মধুনন্দনের সমসাময়িক কালে কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক বিখ্যাত সাধক "আউলিয়া চাঁদ" উলায় মহাদেব বারুইয়ের গৃহে ছিলেন। আউলিয়াচাঁদ তখন অষ্টমবর্ষীয় বালক।

ইহার পরে উলায় আর এক জন সাধক ছিলেন, ইহার নাম নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রহ্মচারী। ইনি উলার ব্রহ্মচারি-বংশের প্রতিষ্ঠাতা। নন্দলাল ঘোর তান্ত্রিক ছিলেন। তিনি গ্রামের মধ্যে গৃহস্থ-পল্লীতে শব ও নরমুণ্ডাদি লইয়া সাধনা করিতেন। তাঁহার পঞ্চমুণ্ডী আসনের স্থান আজিও বর্ত্তমান আছে।

মহামারীর অব্যবহিত পূর্ব্বে বিখ্যাত বিশ্বনাথ বা বিশে পাগলা জীবিত ছিলেন। ইনিই রজতখণ্ডকে কাকবিষ্ঠা জ্ঞানে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

এই সময় উলার বেলিয়াডাঙ্গা পাড়ায় গোলোক নামক এক জন দীন সাধক ছিলেন। তিনি জাতিতে মুচি এবং কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তিনি নির্ম্মল ধর্ম্ম পালন করিতেন। তাঁহার সম্প্রদায়ে জীবহত্যা, নানা দেবদেবীর পূজা প্রভৃতি নিষিদ্ধ ছিল। তাঁহার অনেকগুলি শিষ্য ছিল। তিনি মন্ত্র দ্বারা কঠিন ব্যাধি আরাম করিতেন। মহামারী আরম্ভ হইবার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে গোলোক ভবিষ্যৎ-বাণী করিয়াছিলেন যে, সত্বর উলা ধ্বংসপ্রায় হইবে। তাঁহার ভবিষ্যৎ-বাণী ফলিতে বিলম্ব হয় নাই।

১০

মহামারীর পূর্ব্বে উলায় অনেকগুলি শিক্ষিত ও বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তৌফী নদীয়া জিলার শ্রেষ্ঠ অন্যতম জমীদার ছিলেন। তিনি মহানুভবতা ও দানের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। উলার উত্তরপাড়ায় আর এক জন দাতা ছিলেন, তাঁহার নাম উমানাথ মুখোপাধ্যায়। শুনা যায় যে, ইনি নিজের কোশাকুশী পর্য্যন্ত দান করিয়া ফেলিয়া রিক্তহস্ত হইয়াছিলেন। উলার বামনদাস মুখোপাধ্যায় এক জন দাতা ছিলেন। তিনি সনাতন হিন্দুধর্ম্মের জন্য ও নানা হিতকর কার্য্যে বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। উলার শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁহার অধিকাংশ সম্পত্তি উইল দ্বারা মিউনিসিপ্যালিটীকে দান করিয়াছিলেন, কিন্তু সে সম্পত্তি মিউনিসিপ্যালিটী উদ্ধার করিতে পারে নাই।

নদীয়ার রাজা শ্রীশচন্দ্রের সহিত ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তৌফীর প্রণয় ছিল। ইঁহারা উভয়ে ইংরাজী শিক্ষার ও সমাজ-সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন। গীতবাদ্য, হাস্য-পরিহাস ও উৎসবে বজ্জনতার আনন্দে যখন উলার জনগণ মগ্ন থাকিত, সেই সময় যমরূপী মহামারী উলার দক্ষিণ প্রান্ত দিয়া গ্রামে প্রবেশ করিল। ইহা ১২৬৩ সালের ভাদ্রমাসের কথা। সুস্থ লোকের সহসা ভীষণ কম্প দিয়া জ্বর হইতে লাগিল, সেই জ্বরে কেহ ৬।৫ ঘণ্টা, কেহ বা ২।১ দিনের মধ্যে মরিয়া যাইতে লাগিল। এইমাত্র যে ব্যক্তি এক জন রোগীর জন্য বৈদ্য ডাকিয়া আনিল, ক্ষণপরে তাহারই জন্য আর এক জন বৈদ্য ডাকিতে গেল। তখন ডাক্তার ছিল না, কবিরাজ ছিল। প্রত্যহ শত শত লোক মরিতে লাগিল। অবশেষে এত অধিক লোক মরিতে লাগিল যে, মৃতদেহ সৎকার করা দূরের কথা, উহা ফেলিবার লোক পাওয়া গেল না। গ্রামের বাহিরে ও গ্রামের মধ্যে খাল-বিল ও মাঠে, রাস্তার ধারে ও বাটীর প্রাঙ্গণে সৎকারাভাবে মৃতদেহ পচিতে লাগিল এবং শৃগাল, কুকুর ও গৃধিনীর ভক্ষ্য হইল। উলার লোকের দেহ পচিয়া পোকা পড়িয়া উলার মাটীতে মিশাইল। সে সময় পিতা পুত্রকে, স্ত্রী স্বামীকে ও ভ্রাতা ভগিনীকে রোগশয্যায় বিজন গৃহে ফেলিয়া রাখিয়া প্রাণভয়ে পলাইয়াছিল। অনেক গৃহে রোগক্লিষ্ট শক্তিহীন জীবিত ব্যক্তিকে শৃগাল ও গৃধিনীর দল গৃহমধ্যেই ছিঁড়িয়া খাইয়া ফেলিয়াছিল।

মহামারীর ভয়ে বহু লোক গ্রাম ছাড়িয়া পলাইল আর ফিরিয়া আসিল না। সে সময় গ্রামে এক প্রকার পক্ষী দেখা দিয়াছিল, তাহারা রাত্রিতে গভীর স্বরে "আয় আয়" বলিয়া ডাকিত। ইহাকে লোক অমঙ্গলজনক বলিয়া মনে করিত। সে সময় উলার বাতাসে সর্ব্বদা যেন অমঙ্গলসূচক এক প্রকার হাহাকার স্বর ভাসিয়া বেড়াইত। নানাপ্রকার ভৌতিক গল্প লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হইতে লাগিল। 'ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার' হইতে জানা যায় যে, গবর্ণমেণ্ট মহামারী হইতে গ্রামবাসীদিগকে রক্ষা করিবার জন্য কিছুই করেন নাই। গবর্ণমেণ্ট তখন সিপাহী-বিদ্রোহ-দমনে ব্যস্ত।

সে কালে লোক ইহাকে "মহামারী" ও "নূতন জ্বর" কহিত। প্রায় ৫ বৎসর কাল এই ব্যাধির সংহারক্রিয়া প্রবল তেজে চলিয়াছিল। তাহার পরেও ২।৩ বৎসরকাল ইহা গ্রামে ছিল, তখন ইহার তেজ মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে। অবশেষে ১২৭১ সালের আশ্বিন মাসের বিখ্যাত ঝড়ের পরে মহামারীর শান্তি হইল বটে, কিন্তু সেই হইতে ম্যালেরিয়া জ্বর চিরতরে গ্রামে বাসা বাঁধিল। উলার এই মহামারী পরবর্ত্তীকালে সমগ্র বঙ্গদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল এবং তৎপরে উলার ম্যালেরিয়া বাঙ্গালার সকল স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়া বঙ্গের পল্লীগুলিকে শ্মশানে পরিণত করিয়াছে। মহামারীর পরবর্ত্তী মন্দীভূত অবস্থার নাম ম্যালেরিয়া।

শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র মুস্তৌফী
ইনি লণ্ডন সহরে কাশিমের ভূমিকা অভিনয় করিয়াছেন

মহামারীর সংহার-লীলার ফলে কয়েক বৎসরমধ্যে সহস্র সহস্র লোক মরিয়া উলা ধ্বংস হইয়া গেল। উৎসবের আনন্দকোলাহল নীরব হইল; শিল্প-বাণিজ্য ও বিদ্যাচর্চ্চা চিরতরে লোপ পাইল। লোকালয় জনশূন্য হইয়া নিবিড় অরণ্যে পরিণত হইল।

১১

স্যর উইলিয়ম হাণ্টার তাঁহার "Statistical account of Nadia and Jessore" গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, উলায় যে মহামারী

পশ্চিম-বঙ্গের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, উহা বিখ্যাত বীর সীতারাম রায়ের রাজধানী মহম্মদপুরে সর্ব্বপ্রথম ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে দেখা দেয়। ঐ বৎসর ৫।৭ শত কয়েদী যশোহর-ঢাকা রাজবর্ত্মের যে অংশ মহম্মদপুরের রামসাগর দীঘি ও হরেকৃষ্ণপুর গ্রামের মধ্যে অবস্থিত, উহা মেরামত করিতে নিযুক্ত ছিল। উক্ত বৎসর মার্চ্চ মাসে মহামারী-জ্বর সর্ব্বপ্রথম উহাদিগের মধ্যে আবির্ভূত হইয়া নিমেষমধ্যে ১ শত ৫০ জন কয়েদীর প্রাণসংহার করে; ইহা দেখিয়া রক্ষিগণ কয়েদীদিগকে ফেলিয়া রাখিয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করে। এই ব্যাধি মহম্মদপুরে ৭ বৎসর থাকিয়া উক্ত বৃহৎ নগরীকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে।

গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া ডাক্তার এলিয়ট ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁহার "Epidemic, Remittent and Intermittent Fever" নামক রিপোর্টে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, এই ব্যাধি মহম্মদপুরে ১৮২৪-২৫ খৃষ্টাব্দে দেখা দিয়াছিল। (এই উক্তির সহিত স্থানীয় লোকের উক্তি ও হাণ্টার 'সাহেবের' বর্ণনার সামঞ্জস্য দেখা যায় না। এতদ্দ্বয়ের মতে মহম্মদপুরে ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে মহামারী প্রথমে দেখা দেয়।) তৎপরে এই মহামারী নলডাঙ্গায় ও ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে চাঁচড়া ও কসবায় দেখা দিয়া ঐ গ্রামগুলিকে ধ্বংস করে। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ইহা তদানীন্তন সুবিস্তৃত নদীয়া জিলার এলাকার মধ্যে প্রবেশ করে। ইহা ১৮৩২ এবং ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে বৃহৎ জনপদ গদখালিতে উপস্থিত হইয়া গ্রামটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে। তৎপরে ১৮৪৫-৪৬ খৃষ্টাব্দে ইহা বনগাম ও চাকদহের মধ্যবর্ত্তী গ্রামসমূহকে ধ্বংস করিয়া ১৮৫০-৫১ খৃষ্টাব্দে পশ্চিমদিকে অগ্রসর হয় এবং দেবগ্রাম, মুড়াগাছা প্রভৃতি করিয়া গ্রামগুলি উৎসন্ন দেয়।

উলা ডাক্তারখানা

তৎপরে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের বর্ষাকালে এই মহামারী উলায় উপস্থিত হয়। এলিয়ট লিখিয়াছেন যে, তৎকালে উলা সেঁৎসেঁতে স্থানে অবস্থিত ছিল এবং ৩ বৎসরের মহামারীতে অন্যূন ১০ হাজার লোক মরিয়াছিল। (এলিয়ট-বর্ণিত এই মৃত্যুসংখ্যা গবর্ণমেণ্ট রিপোর্টে স্থান পাইলেও উহা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নহে। উলার মহামারীর ধ্বংস-লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, এরূপ বৃদ্ধ লোক আজিও জীবিত আছেন। তাঁহারা বলেন যে, প্রথম তিন বৎসরেই উলায় ১৬ হাজার লোক মরিয়াছিল। ইহার পরেও মহামারীর ধ্বংসলীলা ৫।৬ বৎসর চলিয়াছিল, কিন্তু তখন উহা মন্দীভূত হইয়াছে।) তৎপরে উলাকে কেন্দ্র করিয়া উলা হইতে এই মড়ক নদীয়া জিলার দক্ষিণভাগে এবং হুগলী ও বারাসত জিলায় (তৎকালে বারাসত একটি জিলা ছিল, পরবর্ত্তী কালে উহা মহকুমায় পরিণত হইয়াছে) প্রবেশ করে। তৎপরবর্ত্তী ৩ বৎসর কালমধ্যে এই ব্যাধি উলার উত্তরে স্থিত বারাসত, বাদকুলা ও সিমুলিয়া প্রভৃতি গ্রামে ধ্বংসলীলা শেষ করিয়া কৃষ্ণনগরের দক্ষিণ-পূর্ব্ব সীমার অদূরে উপস্থিত হয় এবং ১৮৫৯-৬০ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দপুর ও দিগনগর প্রভৃতি গ্রামে বিস্তৃতি লাভ করে। ইহা ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে চাকদহে উপস্থিত হইয়া গঙ্গাতীরের গ্রাম ও নগরগুলি বিধ্বস্ত করিয়া ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে কাঁচড়াপাড়ায় উপস্থিত হয়। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে মহামারী বারাসত, হুগলী এবং বর্দ্ধমান জিলায় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ঐ বৎসর ইহা বাঁশবেড়িয়া, শিবপুর ও ত্রিবেণী প্রভৃতি স্থানে এবং ত্রিবেণী হইতে পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইয়া মগরা, সপ্তগ্রাম, এমন কি, হোসেনাবাদ পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়াছিল। ১৮৬১-৬২ খৃষ্টাব্দে ইহা ত্রিবেণীর উত্তরে স্থিত জয়পুর, বাগাটি, নয়াসরাই, দিগ্রে, ডুমুরদহ, জিরেট ও বলাগড়ে সংহারক্রিয়া শেষ করিয়া ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে পাণ্ডুয়ায় উপস্থিত হইয়াছিল। ইহাই এলিয়ট কর্ত্তৃক লিখিত মহামারীর বর্ণনা। এলিয়ট লিখিয়াছেন যে, উলা ও বগুলা প্রভৃতি গ্রামের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বুঝা যায়, এই সকল গ্রামের উদ্ধারের আশা সুদূরপরাহত—ইহাদিগের দুর্দ্দশা অবর্ণনীয়। এলিয়ট রোগোৎপত্তির যে সকল কারণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার সার মর্ম্ম এই যে, অস্বাস্থ্যকর স্থানে অস্বাস্থ্যকরভাবে বাস, অপরিষ্কার পানীয় জল ব্যবহার ও জলনিকাশের ব্যবস্থার অভাবে এই রোগের উৎপত্তি হইয়াছিল। এলিয়ট মহামারী উৎপত্তির কারণের যে বিস্তৃত তালিকা দিয়াছেন, তাহার অধিকাংশ মহামারী উৎপত্তির কারণ নহে, পরন্তু মহামারীর ধ্বংসলীলার পরবর্ত্তী ফল। এই মহামারীর পরবর্ত্তী মন্দীভূত অবস্থা বর্ত্তমান কালের ম্যালেরিয়া। ডাক্তার পেনের ( Payne ) ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ৩০শে ডিসেম্বরের যে রিপোর্ট ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারীর কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে, উহাতে এই মহামারীর পরবর্ত্তী অবস্থাকে (অর্থাৎ ম্যালেরিয়াকে) "বর্দ্ধমানের জ্বর" ( Burdwan Fever ) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

## ১২

মহামারীর বেগ কথঞ্চিৎ মন্দীভূত হইলে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে জ্বরচিকিৎসার জন্য উলায় একটি অস্থায়ী দাতব্য চিকিৎসালয় খোলা হয়। ইহা প্রধানতঃ সাধারণের চাঁদার উপরে নির্ভর করিত। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে এই ডাক্তারখানা স্থায়ী হয়। ডাক্তারখানার নিজস্ব একটি গৃহ-নির্ম্মাণের জন্য উপেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ৭৫ টাকা মূল্যের ১৫ কাঠা নিষ্কর ভূমি দান করেন। ঐ ভূমিখণ্ডের উপর ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ডাক্তারখানার বর্ত্তমান কোঠাঘর নির্ম্মিত হইয়াছে। উলার ডাক্তারখানায় ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ১ হাজার ৩ শত ৩৯ জন, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ১ হাজার ৫ শত ৩৪ জন (গড়ে প্রত্যহ ৩৫·৫৫ জন) রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে। গত ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে মোট ৩ হাজার ৭ শত ৩২ জন (গড়ে প্রত্যহ ৬৭·৪৯ জন) রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ১ হাজার ৮ শত ১৫ জন ম্যালেরিয়ার রোগী। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে ডাক্তারখানার মোট আয় ১ হাজার ৬ শত ৪৬ টাকা ও মোট ব্যয় ১ হাজার ৮ শত ৯২ টাকা হইয়াছিল। উলার বাহিরের বহু রোগী এই ডাক্তারখানায় বিনামূল্যে ঔষধ প্রাপ্ত হয়। বর্ত্তমান ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে ডাক্তারখানার সর্ব্ববিষয়ে উন্নতি হইয়াছে।

গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম মিউনিসিপালিটী প্রতিষ্ঠিত হয়। চারিটি ওয়ার্ডে গ্রামটি বিভক্ত। ইহার ১২ জন কমিশনার আছেন, তন্মধ্যে ৪ জন গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাণাঘাটের সবডিভিসনাল অফিসার ইহার সরকারী চেয়ারম্যান ছিলেন। সরকারী চেয়ারম্যানদিগের মধ্যে কবিবর নবীনচন্দ্র সেন ও সিভিলিয়ান শ্রীযুত কিরণচন্দ্র দে উলার মিউনিসিপ্যালিটীর নানাবিধ উন্নতির চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বে মিউনিসিপ্যালিটীর আফিস পর্ণকুটীরে ছিল। চেয়ারম্যান কবিবর

নবীনচন্দ্র ও ভাইস-চেয়ারম্যান বারাণসী বসুর আন্তরিক চেষ্টায় মিউনিসিপ্যালিটীর বর্ত্তমান কোঠাঘর ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয় এবং উহার সম্মুখস্থ পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করা হয়। যে জমীর উপরে বর্ত্তমান মিউনিসিপ্যাল আফিস ও পুকুর আছে, উহা পূর্ব্বে তারানাথ, উপেন্দ্রলাল, বিজয়গোপাল ও শঙ্করনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ১২ জন সরিকের এজমালি সম্পত্তি ছিল। এই জমীর পরিমাণ ১৩ বিঘা ও মূল্য অনুমান ৭ শত টাকা। চেয়ারম্যান কবিবর নবীনচন্দ্র ও ভাইস-চেয়ারম্যান বারাণসী বসু বহু কষ্টে এই সম্পত্তির ১২ জন মালিকের মধ্যে ৮ জনের নিকট হইতে তাঁহাদের অংশের একখানি দানপত্র ১৩০১ সনে লিখাইয়া লয়েন। বাকী ৪ জন সরিক যখন শ্রীযুত কিরণচন্দ্র দে চেয়ারম্যান ও বারাণসী বসু ভাইস-চেয়ারম্যান ছিলেন, সেই সময় তাঁহাদের অংশের দানপত্র লিখিয়া দেন। এই শেষোক্ত দানপত্র ১৩০৪ সনে সম্পাদিত হয়।

মিউনিসিপালিটী ও ডাক্তারখানা ম্যালেরিয়ার প্রতীকার করিতে অক্ষম বলিয়া গ্রামের কতিপয় ভদ্র-সন্তান গত ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের শারদীয়া পূজার সময় "বীরনগর পল্লী-মণ্ডলী" নাম দিয়া গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য একটি সমিতি গড়িয়াছেন। এ বাবৎ ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ইহাকে ১ শত টাকা সাহায্য করিয়াছেন। রাণাঘাটের সবডিভিসনাল অফিসার প্রতি বৎসর ইহাকে ৫০ টাকা সাহায্য করিতেছেন। গ্রামবাসীদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত চাঁদা ও প্রধানতঃ শ্রীযুত বিভূতিভূষণ মিত্রের অর্থসাহায্যে এই পল্লীমণ্ডলীর কার্য্য চলিতেছে। বিভূতিভূষণ প্রথম বৎসর এক সহস্র মুদ্রা মণ্ডলীকে দান করিয়াছেন এবং প্রতি বৎসর ৫ শত টাকা করিয়া দান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

১৯২০-২১ খৃষ্টাব্দে গ্রামে একটি রেটপেয়ার্স এসোসিয়েসন বা করদাতাদিগের সভা স্থাপিত হয়। এ দেশের চিরন্তন প্রথা অনুসারে উক্ত সমিতি কিয়ৎকাল মিউনিসিপ্যালিটীর কার্য্যের গলদ বাহির করিয়া ও সভা-সমিতি করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। গ্রামে পল্লীমণ্ডলী হওয়ায় এই সমিতির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় না। স্কুলের ছেলে ও মাষ্টারদিগের চেষ্টায় গ্রামে একটি সেবা-সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। স্কুলের কতিপয় বালক ইহার জন্য চাউল ও অর্থ ভিক্ষা করিয়া সংগ্রহ করে; তদ্দ্বারা অনাথ ও আতুরদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করা হয়। এই নিঃস্বার্থ বালক কয় জন স্কুলের হেডমাষ্টার ও অন্যতম পরোপকারী শিক্ষক শ্রীমান্ সত্যচরণ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে গ্রামে একটি "কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক" স্থাপিত হইয়াছে। প্রথম বৎসর ইহার সভ্যসংখ্যা ১১ জন ছিল, এক্ষণে ৯৯ জন হইয়াছে। ইহার ৯ জন ডিরেক্টর আছেন।

এইগুলি ব্যতীত উলায় আর কোন সরকারী বা বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান নাই।

উলার এক্ষণে ভয়াবহ অবস্থা। যে উলায় মহামারীর পূর্ব্বে প্রায় ৫০ সহস্র লোক ছিল, তথায় এক্ষণে লোক নাই বলিলেই হয়। সেন্সাস রিপোর্টে দেখা যায় যে, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে গ্রামে ৪ হাজার ৫ শত জন লোক এবং ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ২ হাজার ৩ শত ৫ জন মাত্র লোক ছিল। বর্ত্তমানে লোকসংখ্যা আরও কমিয়া গিয়াছে। জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুর হার অত্যন্ত অধিক। গত ১১ বৎসরের জন্ম মৃত্যুর হার তুলনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, গড়ে প্রতি বৎসর জন্মের সংখ্যা ৫২ জন এবং মৃত্যুর সংখ্যা ৭২ জন। শিশুদিগের মৃত্যুর হার অত্যন্ত অধিক, তাহারা অধিক দিন বাঁচে না। সাধারণতঃ গ্রামের লোকের দেহ শুষ্ক ও রক্তশূন্য, এবং প্লীহা-যকৃতে পরিপূর্ণ উদরের স্ফীতি অত্যন্ত অধিক। তাহারা জীবন্মৃত হইয়া আছে, কোন বিষয়ে উৎসাহ নাই, কোন জিনিষের ভাল দিক্ হৃদয়ঙ্গম করিবার ক্ষমতা তাহাদিগের নাই। তাহাদিগের অর্থের অভাব অত্যন্ত অধিক, সকলের নিয়মিত দুই বেলা অন্ন জুটে না। গ্রামের সর্ব্বত্র নিবিড় অরণ্য, বহুবিধ পক্ষীর কূজনে মুখরিত এবং ব্যাঘ্র, শূকর ও সর্প প্রভৃতি হিংস্রজন্তুসমাকুল। তাহারা নির্ভয়ে বিচরণ করে। গত ৬০।৭০ বৎসর মধ্যে যাহারা উলায় জন্মিয়াছে, তাহারা সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের শোভা কাহাকে বলে, জানে না। তাহারা বৎসরের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত রোগভোগ করিয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে।

শ্রীসুজননাথ মিত্র মুস্তৌফী।

# স্মৃতির দাগ

প্রবাসে কত দিন সহিয়া কত ক্লেশ,
ফিরিয়া এনু যবে আপন গৃহ-দেশ,
গ্রামের বাঁকা পথে, সাঁঝের দীপ হাতে,
শুধা'ল শুধু হেসে, "ছিলে তো ভাল বেশ ?"

সে দিনও সাঁঝে পুনঃ গ্রামেরে পিছু রাখি,
প্রবাসে ফিরি যবে, চমকি চাহি দেখি,
কলস ছিল কাঁকে, সলাজ জোড়া আঁখে,
সজল ভাষে মোরে বিদায় দিল ডাকি।

আলোকে উজ্জ্বল তাহারি রাঙা মুখ,
কি রঙে রেঙে গেল আমার এ সারা বুক !
সলাজ জোড়া দুটি কাজল-আঁখি-জল,
বুকে যে জেলে গেল, দারুণ দাবানল !

কভু সে বাঁকা পথে ফিরেছি যদি আর,
এখনো মনে হয় দেখা কি পাব তার ?
শিবের ভাঙা মঠে, নদীর বাঁধা-ঘাটে,
"অভাগী বেঁচে নাই," কে বলে বারবার ?

এখনো ক্ষণে ক্ষণে পিছনে চেয়ে দেখি,
কুশল কিছু মোর, শুধা'বে কেহ না কি ?
ওই যে দীপ হাতে, ওই যে চ'লে যায়,
দেখিনু এই যেন, আর না দেখি তায় !

শ্রীগুরুপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

# নারী মন্দির

## প্রজাপতি ব্লাউজ

এই ব্লাউজে সূচের কাষ বেশ সুন্দর দেখিতে হয়, অথচ খুব সাদাসিদা। লংক্লথ ও চায়নীজ সিল্কজাতীয় কাপড়ে অধিকাংশ এই ব্লাউজ সেলাই হইয়া থাকে।

**সরঞ্জাম** ঃ—( Materials ) কাপড় ৩' লম্বা ৩২"+৪"=৩৬" ইঞ্চি বা ১ গজ।

**ব্লাউজের মাপ** ঃ—লম্বা --১৬" ছাতি---৩২" কোমর --২৮" সেন্ত---১৪" পুট --৬½" পুটহাতা—১২½"।

**ব্লাউজ কাটিবার প্রণালী** ঃ---যে কাপড়ের ব্লাউজ হইবে, কাপড়কে এড়োয় ডবল ভাঁজ করিয়া পিছনের অংশ কাটিতে হইবে। ক, খ লম্বা মাপ ১৬" ক, ঘ ছাতির মাপের ¼ অংশ ৮"—১"=৭" ইঞ্চি ঘ, চ ১½" ইঞ্চি নীচের ছাতির মাপ লাইন। ক, জ সেন্ত মাপ ১৪" এখন ঘ বিন্দু হইতে ছাতির মাপের ¼ অংশ ৮"+১½"=৯½" ইঞ্চি ছ বিন্দু চিহ্ন করিয়া চ, ঝ ঠিক ঘ, ছ সম লাইনে টানিয়া লইতে হইবে। এখন জ বিন্দু হইতে কোমরের মাপের ¼ অংশ ৭"+১½"=৮½" ইঞ্চি স্থানে ঠ বিন্দু চিহ্ন করিয়া ছ, ঝ হইতে ঠ বিন্দু সংযোগ করিয়া খ বিন্দু হইতে ট বিন্দু ½" ইঞ্চি উপরে বাঁকা ভাবে সংযোগ করিয়া ঠ, ট সংযোগ করিতে হইবে। এইবার ক বিন্দু হইতে পুট মাপ ৬½" ইঞ্চির একটু বেশী ঢ বিন্দু চিহ্ন করিয়া ঢ বিন্দু হইতে ২½" ইঞ্চি ভিতরে ড বিন্দু চিহ্ন করিয়া ঢ বিন্দু থ বিন্দু ১½" ড, থ সংযোগ করিয়া লইলে পুটের অংশ দাগ দেওয়া হইল। এখন ক বিন্দু হইতে ২" ইঞ্চি নীচে বা ততোধিক পছন্দানুযায়ী চিহ্ন করিয়া ড, গ বাঁকা ভাবে সংযোগ করিতে হইবে। তাহার পর থ বিন্দু ত বিন্দু ছাতির লাইনে সংযোগ করিয়া থ বিন্দু হইতে বাঁকাভাবে চিত্রানুযায়ী ছ বিন্দু পর্য্যন্ত দাগিয়া লইলে মোহোড়ার অংশ দাগ দেওয়া হইল। এবার গ, ড, থ, ছ, ঝ, ঠ, ট ও খ বিন্দুর দাগে কাটিয়া লইলে পিছনের অংশ কাটা হইল।

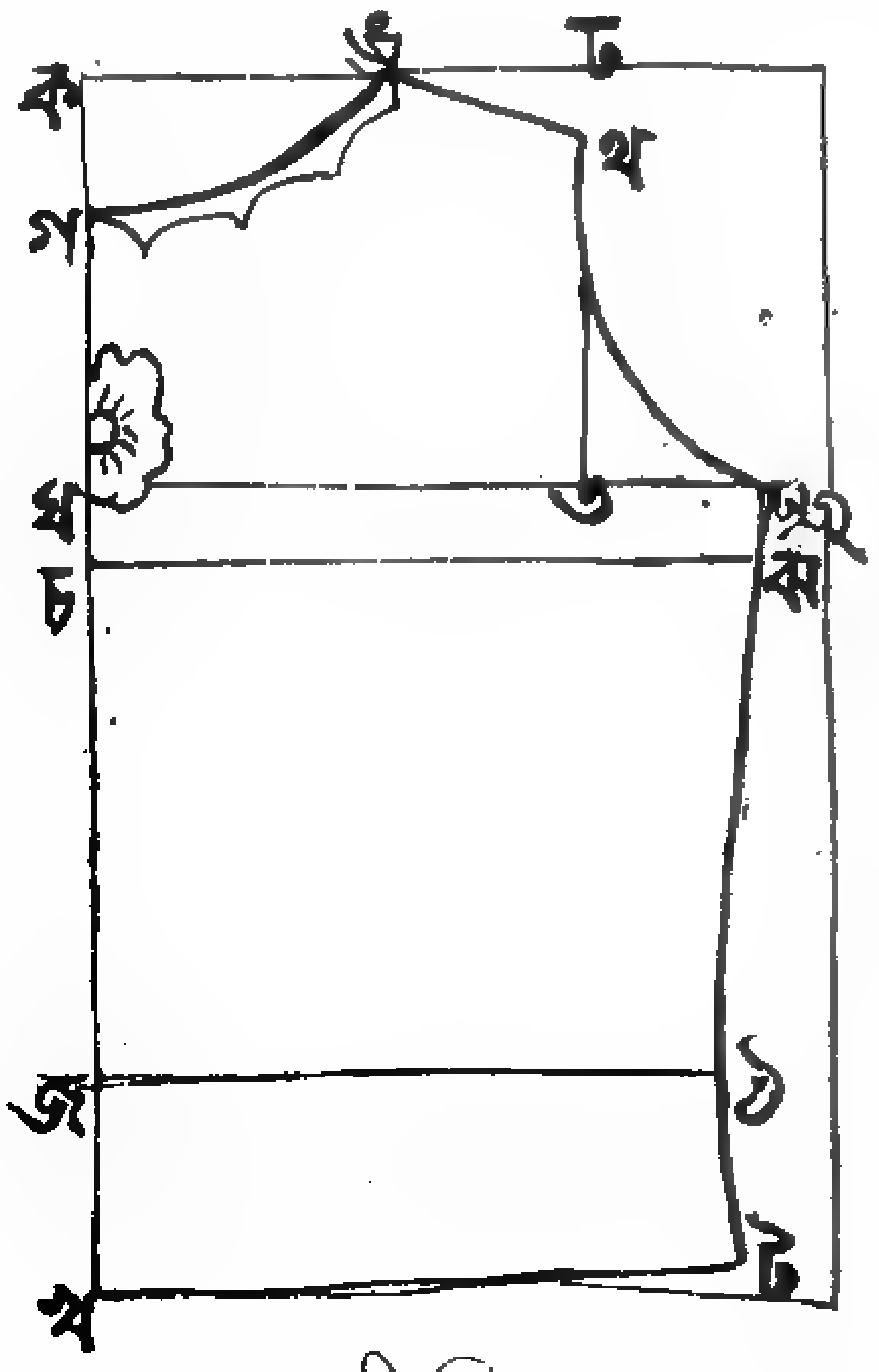

১নং চিত্র—

সম্মুখের অংশ কাটিবার সময় এড়ো দিকে ডবল ভাঁজ করিয়া পিছনের অংশ তাহার উপর রাখিয়া ছাতির, মোহোড়ার ও কোমরের মাপের দাগে সোজা দাগ টানিয়া ঘ বিন্দু স্থানে ত বিন্দু চ বিন্দু ৪ বিন্দু ছাতির মাপের জ বিন্দু স্থানে ৯ বিন্দু কোমরের মাপের লাইন। এখন চ বিন্দু হইতে ঝ বিন্দু যত মাপ বাদ দিয়া ছাতির মাপ ৪ বিন্দু হইতে ৬ বিন্দু ½ অংশ ১৬"+৩"=১৯" ইঞ্চি স্থানে চিহ্ন করিয়া কোমরের জ বিন্দু হইতে ঠ বিন্দু যত মাপ বাদ দিয়া ৯ বিন্দু হইতে কোমরের মাপের অর্দ্ধেক ১৪"+৮"=২২" ইঞ্চি স্থানে এখন পাশের অংশ ৫ বিন্দু হইতে ৭ বিন্দু পর্য্যন্ত ৬ ও ১০ বিন্দুর

দাগে ঠিক রাখিয়া চিত্রানুযায়ী দাগিয়া লইতে হইবে। ২ বিন্দু হইতে ½" ইঞ্চি উপরে ৭ বিন্দু একটু বাঁকাভাবে দাগিয়া পুটের অংশ দাগিতে হইবে। পুট থ বিন্দু ৮ বিন্দু ½" ইঞ্চি উপরে ড ও থ স্থানে ১৩ ও ৮ চিত্রানুযায়ী ঘাঁদ অংশ দাগিয়া ৮, ১২ ও ৫ পিছনের অংশের দাগ হইতে ১" ইঞ্চি ভিতরে বেশ একটু বাঁকাভাবে দাগিয়া লইতে হইবে। সাম্‌নের অংশ একটু বেশী কাটিবার কারণ, তাহা হইলে মোহড়ার অংশ ভাল বসিবে। গ বিন্দু হইতে ১ বিন্দু আরও ৩" ইঞ্চি নীচে, অর্থাৎ ক বিন্দু হইতে ৫" ইঞ্চি নীচে সাম্‌নের গলার অংশ দাগিয়া ১৩ হইতে ১ বিন্দু পর্য্যন্ত চিত্রানুযায়ী বাঁকাভাবে সংযোগ করিতে হইবে। সম্মুখের অংশ কাটিবার সময় ১, ১৩, ৮, ১২, ৫, ৬, ১০, ৭ ও ২ চিহ্নিত দাগে কাটিয়া লইলে সম্মুখের অংশ কাটা শেষ হইল।

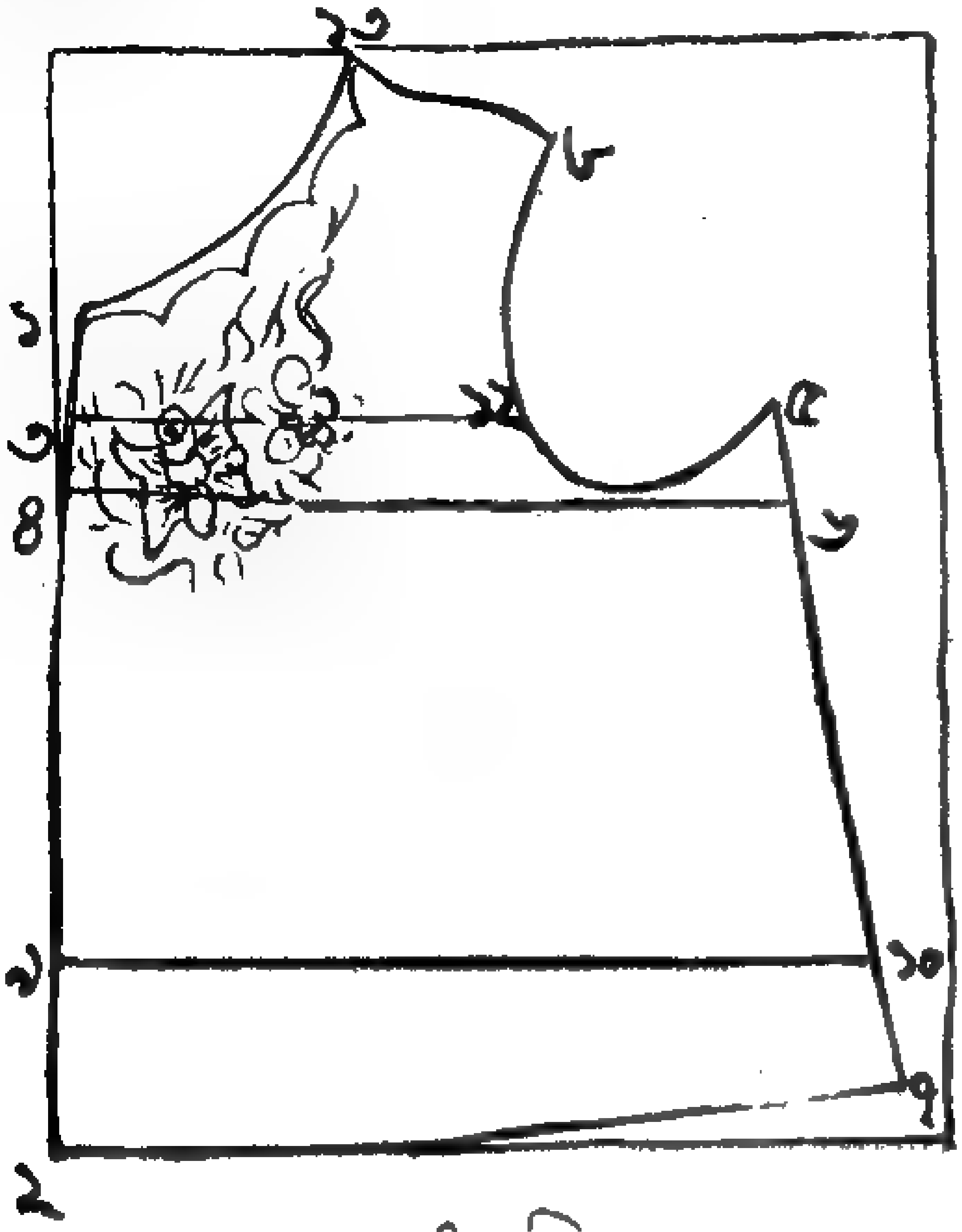

২নং চিত্র—

**হাতের অংশ কাটিবার প্রণালীঃ—** অ বিন্দু হইতে পুট বাদ দিয়া ই বিন্দু পর্য্যন্ত ১২½" ইঞ্চি অর্থাৎ ৬" ইঞ্চি অ বিন্দু হইতে আ বিন্দু ছাতির ¼ অংশ ৮" ইঞ্চি পিছনের অংশে ত ও ছ বিন্দু যত ইঞ্চি অ, উ তত ইঞ্চি স্থানে দাগ দিয়া উ ও উ সোজা ভাবে টানিয়া লইয়া অ ও উ সংযোগ করিয়া অ ও উ ১" ইঞ্চি বাহিরে, একটু বাঁকা ভাবে দাগ দিয়া সংযোগ করিয়া ঈ বিন্দু ½" ইঞ্চি ভিতরে হাতের (Shape) এর জন্য উ হইতে ঈ পর্য্যন্ত একটু বাঁকাভাবে সংযোগ করিয়া ই, ঈ সংযোগ করিয়া লইতে হইবে। এখন অ, উ, ঈ ও ই চিহ্নিত দাগে কাটিয়া লইলে হাতের অংশ কাটা হইল।

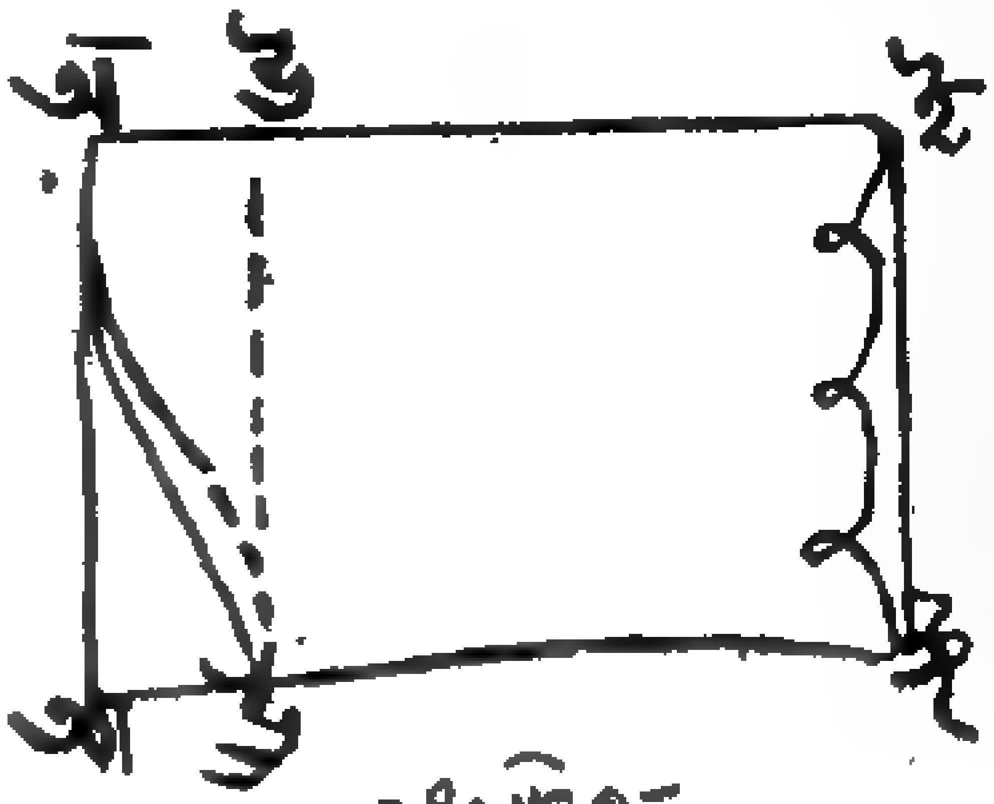

৩নং চিত্র—

**সেলাইয়ের প্রণালী**ঃ—ব্লাউজের পিছনের ও সম্মুখের অংশে যে গলার অংশ কাটা হইয়াছে, তাহাতে চিত্রে যেরূপ দাগ চিহ্নিত করা হইয়াছে, তদনুরূপ চিত্র করিয়া সম্মুখের অংশে দুই দিকের বুকে দুইটি প্রজাপতির চিত্র ও সামান্য লতাপাতার চিত্র আঁকিয়া তাহার উপর সূচের কায করিয়া লইয়া গলার অংশে ও হাতের অংশে মুখে প্রায় বোতামের যেরূপ কায-ঘর করা হয়, তদনুরূপ সূচের

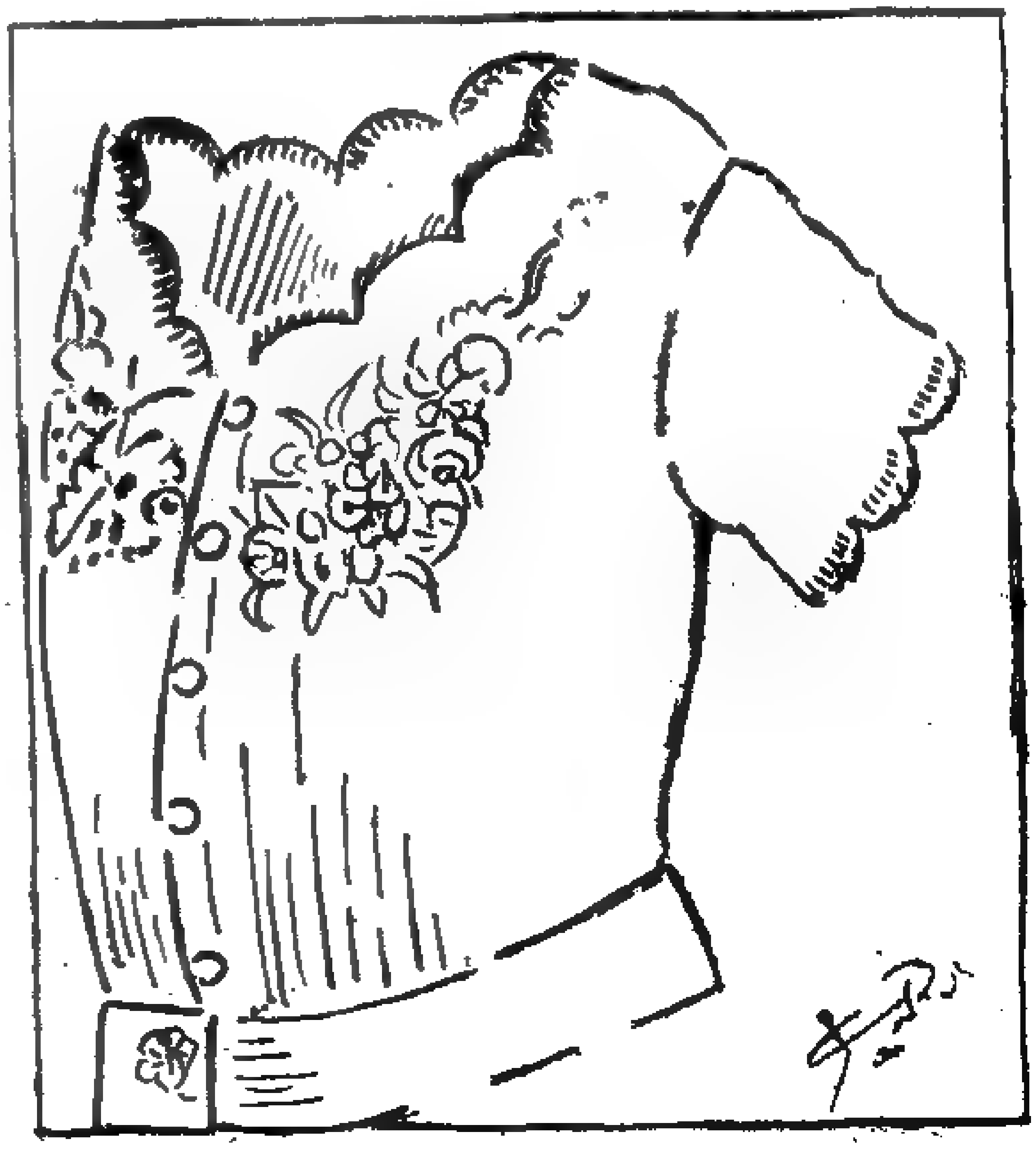

৪নং চিত্র

কায করিয়া কাঁচির সাহায্যে বাহিরের সাদা অংশ কাটিয়া ফেলিতে হইবে। ইহাও বলিয়া রাখি যে, ব্লাউজের সমস্ত সেলাইয়ের কায শেষ করিয়া কাঁচির সাহায্যে সূচের কাযের বাহিরের সাদা অংশ কাটিয়া ফেলা যায়। বোতাম-পটী ও কায-ঘরের পটী বসাইয়া পাশ ও কাঁধ সেলাই করিয়া নীচের অংশে কোমরের মাপের ২৮" + ৫" = ৩৩ ইঞ্চি লম্বা ও "৩" ইঞ্চি চওড়া একখানি পটী কাটিয়া ব্লাউজের নীচের অংশে জুড়িয়া দিবার সময় সম্মুখের অংশে কুচি দিয়া সেলাই করিতে হইবে। সম্মুখের বোতাম-পটী ও কায-ঘর পটীতে ৫টি বোতাম-ঘর তৈয়ার করিয়া বোতাম-পটীতে সমস্থানে বোতাম বসাইয়া লইলে "প্রজাপতি ব্লাউজ" সেলাই সম্পূর্ণ হইল।

শিল্পী—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

# ভাদরে

আজি এ বাদরে এ মাহ ভাদরে
শূন্য ভবনখানি।
কি যে মনে জাগে কি যে ভাল লাগে
সে কথা নাহিক জানি।
রহি রহি ওই উতলা পবন
ফেরে দ্বারে দ্বারে উদাসীন মন
কি জানাতে চায় বোঝা নাহি যায়
কি কহে অস্ফুট বাণী ?
আজি এ বাদরে এ মাহ ভাদরে
শূন্য ভবনখানি।

কত অতীতের বিনিদ্র রাতের
কাহিনী পড়িছে মনে।
ফুটিত বকুল আমের মুকুল
ঝরিত রে বনে বনে।
কুহু কুহু কুহু কুহরিত পিক,
দুঁহু মুখ চাহি দুঁহু অনিমিখ
প্রাণের গোপন যে কথা দু'জন
লিখিয়াছি নিরজনে,
নয়নের নীরে, আজি ফিরে ফিরে
সে কথা পড়িছে মনে।

আজি বার বার পরাণে আমার
জাগে সে সোনার স্মৃতি।
অমিয় পরশ উছল হরষ
বচন মধুর প্রীতি।
নিজ হাতে রচি মালিকাখানিরে
কার গলে দিছি নাহি ত জানি রে।
কত অনুরাগ অসীম সোহাগ
কুণ্ঠা সরম ভীতি।
আজি বার বার পরাণে আমার
জাগে সে সবার স্মৃতি।

ওরে, সে মনে আমার হিয়ার মাঝার
জাগে এ কি ক্রন্দন !
মনে হয় হেন ছিঁড়ে যায় যেন
মরমের বন্ধন।
আয় ফিরে সেই সোনার স্বপন !
লভি তারি মাঝে তারি দরশন !
আয় সে জীবন নব যৌবন
মধু-ঢালা গুঞ্জন !
সেই মধু মাস মলয়-বাতাস
দুখ-তাপ-ভঞ্জন।

আজি এ বাদরে এ মাহ ভাদরে
শূন্য ভবন মোর।
যে দিকে তাকাই দেখিবারে পাই
প্রলয়ের ঘন ঘোর।
মুহু মুহু ওই চকিছে দামিনী
মনে হয় যেন সেই বিরহিণী
ভ্রমে একাকিনী দিবস-যামিনী
বাদলে বরষি লোর।
গগনে গগনে নিশসি সঘনে
পরাণ বিঁধিয়া মোর।

ওরে, চিনি চিনি চিনি ওই রিণি রিণি
নূপুরের ঝঙ্কার।
ওই যে এলায়ে আকাশের গায়ে
তারি সে চিকুরভার।
পেয়েছি তাহার আঁখির দরশ,
সজল হাওয়ায় হিয়ার পরশ,
সেই মধু বাণী ভুবন-ভুলানি,
ভুলিতে কি পারি আর ?
পেয়েছি এবারে হৃদয়-মাঝারে
অমিয় পরশ তার।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সরকার।

## ৩৭

কলিকাতায় আসিয়া কয়েক দিন পরে অবসরমত এক দিন কোর্ট হইতে বেলা ৩টার সময় প্রমাণের দ্রব্যগুলা সঙ্গে লইয়া ঘোষ-পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। চাকরের হাতে 'কার্ড' পাঠাইয়া বসিবার ঘরে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। নিতাই-প্রদত্ত ছাতাটা সেই ঘরের মধ্যে একটা কৌচের আড়ালে রাখিয়া দিলাম। অল্পক্ষণ পরে ঘোষ-পত্নী তথায় উপস্থিত হইয়া সহাস্য মুখে আমাকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন, "ইস্! আজ আমার কি সৌভাগ্য যে, এত দিন পরে হঠাৎ এ রকম অসময়ে আপনার দর্শন-লাভ হ'লো! একেবারে ভুলে গিয়েছিলেন যে!"

"না, তা কি হ'তে পারে? আপনার স্বামীর হত্যাকাণ্ডের অনুসন্ধান সম্পর্কে আপনাকে বাদ দেওয়া বা ভুলে যাওয়া ত সম্ভব নয়!—সে যা হোক্, আজ কিন্তু আপনার সঙ্গে আমার এই সাক্ষাৎটা আপনার পক্ষে একটুও প্রীতিজনক হবে না, মিসেস্ ঘোষ!"

তিনি কিছু উৎকণ্ঠিতভাবে বলিলেন, "কেন বলুন দেখি?"

"কারও কিছু হোক্ আর না হোক্, আপনার নিজের কিছু অমঙ্গলের সম্ভাবনা হয়েছে।"

"সে কি? আপনি যে আমাকে বড় ভয় লাগিয়ে দিচ্ছেন দেখছি! কি হয়েছে, সিধে করেই বলুন না!"

"হাঁ, তাই বলবার জন্যই আজ এখানে এসেছি।—দেখুন, মিসেস্ ঘোষ, এই খুনের বিষয় অনুসন্ধান ত এক রকম শেষ হয়েছে। খুনীর সম্বন্ধে যতগুলা প্রমাণ আমরা এ পর্য্যন্ত পেয়েছি, সেগুলা সব আপনারই বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছে,—সেই কথা আপনাকে জানাতে, আর এ বিষয়ে আপনার কি বলবার আছে, তাই জান্‌তে এসেছি।"

যমুনা প্রথমে নিতান্ত বিস্মিতভাবে আমার দিকে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া, পরে শ্লেষভরে একটু হাসিয়া বলিলেন, "প্রমাণ?—আমার বিরুদ্ধে? তা হ'লে আপনাদের এত দিনের এ সব মেহনত খুব সার্থক হয়েছে বল্‌তে হবে! আপনাদের তারিফ না ক'রে থাকা যায় না!—এ কোন্ গোয়েন্দার বাহাদুরী? আপনার, না, সেই গাঙ্গুলী বাবুর?"

"যারই হোক্,—সে খবর জেনে আপনার কোন লাভ হবে, তা বোধ হয় না। কিন্তু কথাটা এ রকম ক'রে হেসে উড়িয়ে দিলে চল্‌বে না, মিসেস্ ঘোষ! এখনও ব্যাপারটা আমাদেরই হাতে আছে; কিন্তু আপনি যদি আমার সব কথার সরলভাবে উত্তর না দিয়ে হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেন, তা হ'লে প্রমাণগুলা আমি 'সি-আই-ডি' পুলিসের হাতে দিতে বাধ্য হব। তখন অবশ্য তারাই এ বিষয়ের উচিতমত ব্যবস্থা করবে।"

ঘোষ-পত্নী অসীম অবজ্ঞাভরে বলিলেন, "তাতে আমি ডরি না, মিঃ দত্ত! আমি নিজে যখন জানি যে, এই খুনের ব্যাপারে আমার কোনই এলাকা নাই, তখন পুলিসের নামে আমার ভয় পাবার কোন কারণ নাই।"

তাঁহার এরূপ অবজ্ঞাভাব আমার সহ্য হইল না। আমি তাঁহাকে একেবারে স্তম্ভিত করিবার উদ্দেশ্যে বলিলাম, "খুনের সহিত যদি আপনার কোন সম্পর্ক নাই ত সেই হানাবাড়ীতে আপনি যেতেন কি জন্য?"

"হানাবাড়ী?—সে কোথায়?"

"রামপাল লেনের যে বাড়ীতে আপনার স্বামী খুন হয়েছিলেন, সেই বাড়ী। আপনার কাছে সব কথাই যে নূতন হয়ে পড়ছে দেখছি!"

"সেটা আমার বদ্-নসীব! ও বাড়ীটা যে হানা, তা আগে কখনও শুনেছি ব'লে মনে হয় না। সে যাই হোক্, সে বাড়ী ত আমি এ পর্য্যন্ত কখন চোখে দেখিনি,—সেখানে যাওয়া ত দূরের কথা।"

"বলেন কি? তা হ'লে ও-বাড়ীতে আপনার পোষাকের এই দুটো ছেঁড়া টুক্‌রা পাওয়া গেল কি ক'রে?" বলিয়া আমি সেই ঢাকাই শাড়ীর পাড় সমেত ছিন্নাংশ ও পেটিকোটের লেসের পাড়ের টুক্‌রাটা তাঁহাকে দেখাইলাম।

সেগুলা তাচ্ছীল্যভাবে পরীক্ষা করিয়া তিনি পুনরায় অবজ্ঞাভরে বলিলেন, "এগুলা আমারই পোষাকের টুক্‌রা, তা আপনি কিসে জান্‌লেন? এ রকম ঢাকাই কাপড় ও লেসের পাড় ত যে কোন স্ত্রীলোকেরই হ'তে পারে?"

“তা পারে, কিন্তু এগুলা যে আপনারই পোষাকের অংশ, তা যার ভাল রকম জানা সম্ভব, সে-ই চিনেছে।”

“আমি ছাড়া আমার পোষাকের সঙ্গে এত পরিচয় আর কার হ’তে পারে, তা বুঝতে পাচ্ছি না। কে সেই লোকটি, তা জানাতে কিছু ওজর আছে কি ?”

“না, কোন আপত্তি নাই। ইনি ঘোষজা মশায়ের মেয়ে।”

“কে ? কাকলী ?—ওঃ! তারা এখানে এসেছে বুঝি ? তা আমার উপর তার যে রকম ভয়ানক পেয়ার, তাতে আমার সব রকম পোষাকের বেওরা মনে ক’রে রাখা তার পক্ষে খুব সম্ভব বটে! দেখছেন না টানের বহরটা একবার ? এখানে হয় ত অনেক দিন হলো এসেছে ;—কেন না, আস্‌বার পরে এত সব খানাতল্লাসী হয়েছে,—আপনার সঙ্গেও আলাপ হয়েছে দেখছি,—অথচ এ পর্য্যন্ত আমাকে একবার আসার খবরটাও দিলে না!”

“তার সঙ্গে আপনার সম্পর্কই যখন ঘুচে গেছে, তখন তার খবরাখবরে আপনার কি দরকার ?”

“তা হ’লেও আমি যখন এই খুনের কথা প্রথম জান্‌লাম, তখন ওকে চিঠি লিখে সব খবর দিয়েছিলাম। উইল প্রোবেট হবার পরেও ওকে চিঠি লিখেছিলাম।”

“ও-সব খবর না দিলে হয় ত প্রথম থেকে আপনার প্রতিই ওদের সন্দেহ হতো। সে যা হোক্, ও-সব বাজে কথায় এখন আবশ্যক নাই। আমার প্রশ্নের ত এখনও ঠিক ক’রে জবাব দিলেন না ?”

“জবাব আবার কি দেবো ? এগুলা কার পোষাকের টুক্‌রা, তা আমি জান্‌লে ত বল্‌বো ? আমার নয়, এই পর্য্যন্ত বল্‌তে পারি। শাড়ীখানা বোধ হয় ঢাকাই ; কিন্তু নেহাৎ খেলো। লেসটাও বেজায় মোটা সূতার। আমি ও রকম খেলো কাপড় বা মোটা লেস কখনও ব্যবহার করি না। আমার পোষাকের কাপড় যে লোক বাস্তবিক ভাল ক’রে কখনও দেখেছে, সেই তা বল্‌তে পারবে।—না, মিঃ দত্ত! আপনার এ সব প্রমাণ আমার সম্বন্ধে খাটতেই পারে না। ওগুলা আমার পোষাকের টুক্‌রাও নয়, আর আমি সে খুনের বাড়ীতে কোনকালে পদার্পণও করি নি।”

“তবে আপনি ৩৪ নং কানাই মল্লিক লেনের বাড়ীতে গেছেন কেন ?”

অতিশয় বিস্মিতভাবে তিনি বলিলেন, “কানাই মল্লিক লেন ?—সে আবার কোথায় ?”

“ও রকম ঠাট করলে চল্‌বে না, মিসেস্ ঘোষ! ৩৪ নং কানাই মল্লিক লেনের বাড়ী, সেই খুনের বাড়ীর ঠিক পিছনে, তা কি আপনি জানেন না ?”

“না, তা কি ক’রে জান্‌বো বলুন ? আমি ও খুনের বাড়ীও কখনও দেখি নি, তার পিছনের বাড়ীও কখনও দেখি নি। কানাই মল্লিক লেনের নামও এর আগে কখনও শুনি নি।”

আমি একটু শ্লেষ করিয়া বলিলাম, “আর ঐ কানাই মল্লিক লেনের বাড়ীতে একতলার ঘরের ভাড়াটে স্মৃতিরত্ন মশায়কেও অবশ্যই চেনেন না ?”

“আপনি কি বলছেন, আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না। স্মৃতিরত্ন মশায় আবার কে ?”

তখন বিদ্রূপচ্ছলে একটু হাসিয়া আমি সেই কৌচের অন্তরাল হইতে আমার শেষ ও অমোঘ অস্ত্র,—সেই ছাতাটা আনিয়া তাঁহার নিকটে রাখিয়া বলিলাম, “তা হ’লে আপনার এই ছাতাটা সেই স্মৃতিরত্ন মশায়ের ঘরে আপনি ফেলে এসেছিলেন কি ক’রে ?”

## ৩৮

ঘোষ-পত্নী কিন্তু ছাতাটা স্পর্শও করিলেন না। একবার-মাত্র সেটার দিকে চাহিয়া দারুণ অবজ্ঞাভরে আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, “আপনি কোথা হ’তে এ সব জিনিষগুলা সংগ্রহ করেছেন, তা জানি না, মিঃ দত্ত! হয় ত আপনাকে কেউ অপদস্থ করবার জন্য এগুলা আমার দ্রব্য ব’লে আপনার কাছে গছিয়েছে। সে যাই হোক্, ওগুলার কোনটাই আমার নয়। আমি এ পর্য্যন্ত কখনও ছাতা ব্যবহার করি নাই। আর ও ছাতাটা ত আমি এর আগে কখনও চোখেও দেখি নাই।” বলিয়া বিরক্তিভরে আমাকে বিদায় দিবার অভিপ্রায়ে তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

ঘোষ-পত্নী যে এ সকল দ্রব্য তাঁহার সামগ্রী বলিয়া নিজ মুখে স্বীকার করিবেন, সে আশা আমি কখনই করি নাই। তবে এটুকু আশা করিয়াছিলাম বটে যে, সহসা ওগুলা দেখিয়া হত্যা সম্বন্ধে তাঁহার সংস্রব ধরা পড়িয়াছে বুঝিলে, তাঁহার ভয় বা উৎকণ্ঠার ভাব নিশ্চয়ই কিছু-না-কিছু

প্রকাশ পাইবে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁহার মুখের ভাবে বা আচরণে সেরূপ কোন লক্ষণের সম্পূর্ণ অভাবই দেখিলাম। বরং বিস্ময়, অবজ্ঞা ও বিরক্তি এত স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইতেছিল যে, আমার বেশ বোধ হইল যে, হয় ও সব সত্যই আন্তরিক, নয় তিনি অভিনয়-কার্য্যে অসাধারণ পারদর্শী। এ দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টা ঠিক, তাহা বুঝিতে না পারিয়া, আমিও বিরক্তি সহকারে বলিলাম, "বেশ! আপনি যখন আমার কাছে কিছুই স্বীকার করতে সম্মত নন, তখন এইবার আমি এ সব জিনিষ পুলিসের জিম্মায় গচ্ছিত ক'রে তাদেরই হাতে কার্য্যভার অর্পণ করবো। এখন থেকে আর এ বিষয়ে আমার কোন দায়িত্ব থাকবে না।"

"সে আপনার যা' খুসী, তা'ই করবেন; আমার তাতে লাভ-লোকসান কিছু নাই।—তা'দের কিন্তু ব'লে দেবেন যে, ছাতাটা কোন্ দোকানের মাল, সেটা যেন তারা একটু খোঁজ ক'রে দেখে। কেন না, তা' হ'লে হয় ত, কে ওটা কিনেছিল তা' প্রকাশ হ'তে পারে।"

কথাটা খুবই সঙ্গত বোধ হইল। এরূপ অনুসন্ধানটা এতই আবশ্যক যে, ইতঃপূর্ব্বে তাহা আমার মনে একবারও উদয় হয় নাই ভাবিয়া, আমার নিজের উপর বড় বিরক্তি জন্মিল। যাহা হউক, ঘোষ-পত্নী উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন দেখিয়া, কাপড়ের টুকরা দুইটা পকেটে রাখিয়া ও ছাতাটা হাতে লইয়া আমিও উঠিলাম। পরে বলিলাম, "সে সম্বন্ধে পুলিসের লোক যা' ভাল বুঝবে, তাই করবে। সে জন্য আপনার বা আমার মাথা ঘামাবার দরকার নাই। কিন্তু তা'দের কাছে যাবার আগে আপনাকে আরও দু-একটা কথা আমার বল্‌বার আছে।"

"আবার কি কথা? যা বলবার থাকে, শীঘ্র ব'লে শেষ করুন।" বিরক্তিভরে এই কথা বলিয়া তিনি পুনরায় বসিলেন। আমিও আবার বসিয়া বলিলাম, "যে ভোজালী দ্বারা ঘোষজা মশায় খুন হয়েছিলেন, সেটা যে তাঁর বর্দ্ধমানের বাড়ীর ভোজালী, এবং জরির কাযকরা যে ফিতা দ্বারা সেটা ছবির নীচে ঝুলানো থাক্‌তো, সেই ফিতা সমেত সেটা যে ঐ হানাবাড়ীতে আনা হয়েছিল, তার বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে।"

এইবারে যমুনা বেশ স্পষ্টই বিচলিত হইলেন দেখিলাম। তাঁহার মুখে 'পাউডারের' প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও তাহার ভিতর হইতে একটু রক্তিম আভা দেখা দিল, এবং তিনি বেশ একটু উৎকণ্ঠিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলেন কি?—এ প্রমাণটা কি রকম?"

"ভোজালীখানা এখনও পাওয়া যায়নি বটে, কিন্তু সে ফিতাটি ঐ হানা বাড়ীতেই পাওয়া গেছে।"

যমুনা যেন কষ্টে কণ্ঠস্বর সংযত করিয়া, ধীরে ধীরে বলিলেন, "হয় ত আমার স্বামী নিজেই সেটা তাঁর সঙ্গে এনেছিলেন।"

"না; তা যে আনেননি, তারও প্রমাণ পাওয়া গেছে। ঘোষজা মশায়ের গৃহত্যাগের বহুদিন পরে পর্য্যন্ত বর্দ্ধমানের বাড়ীর পুরানো মালী ফিতাবাঁধা ভোজালীখানা সে বাড়ীতে যথাস্থানে দেখেছে। কুমারী দীপ্তিও সেটা ঘোষজা মশায়ের খুনের প্রায় এক সপ্তাহ আগেও যথাস্থানে দেখেছিল। সেই সময় এক দিন আপনি না কি ঐ পড়বার ঘরে বই-এর আলমারী গুছাবার ছলে অনেকক্ষণ ছিলেন। তার পর থেকেই ভোজালীখানা আর দেখতে পাওয়া যায়নি।"

"ওঃ! দীপ্তি মাগীও আবার এসে যুটেছে বুঝি? আর এসেই আমার উপর দুষমনি করতে লেগেছে দেখছি! তা' ওরা যা'ই বলুক, ভোজালীখানা স্থানান্তর করা সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না, তা' আপনাকে নিশ্চিত বলতে পারি।"

"দীপ্তির কাছে আরও জানা গেছে যে, যে রাত্রে ঘোষজা মশায় খুন হন, সে দিন বৈকালে আপনি কান সাহেবের সঙ্গে কল্‌কাতায় এসেছিলেন, আর সমস্ত রাত এখানেই কাটিয়েছিলেন।"

"হাঁ, তা' ত ছিলামই বটে। আমার এক জন বাল্যবন্ধু অনেক দিন থেকে রোগের চিকিৎসার জন্য কল্‌কাতায় আছে। তা'কে আমি মাঝে মাঝে দেখতে যাই। সে দিন হঠাৎ তার অবস্থা খারাপ ব'লে এক টেলিগ্রাম পেয়ে কল্‌কাতায় এসে তাদেরই বাড়ীতে ছিলাম। পরদিন সকালে তার অবস্থা ভাল দেখে আবার বর্দ্ধমানে ফিরে গিয়েছিলাম।"

"আপনি এ কথা প্রমাণ করতে পারেন?"

"স্বচ্ছন্দে! সৌভাগ্যক্রমে তারা এখন এখানেই আছে। আমার সঙ্গে সেই জানুয়ারী মাসে দেখা হবার পর তারা কয়েক স্থানে হাওয়া বদলের জন্য গিয়েছিল। সম্প্রতি ফিরে এসেছে, খবর পেয়েছি। দু-একদিন পরে দেখা করতে যাব,

মনে করেছিলাম, তা না হয় আজই যাব। একসঙ্গে দুই কাযই হবে। চলুন আমার সঙ্গে, আমি এখনই যেতে প্রস্তুত আছি। তারা ভবানীপুরে থাকে।"

আমি তৎক্ষণাৎ ঘোষ-পত্নীর প্রস্তাবে সম্মত হইয়া, তাঁহার সঙ্গে একখানা খোলা গাড়ীতে ভবানীপুর অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

### ৩৯

তখন বেলা প্রায় ৪টা। পশ্চিমের রৌদ্র বড় প্রখর ছিল বলিয়া গাড়ীতে উঠিয়াই আমার হস্তস্থিত ছাতাটার যৎকিঞ্চিৎ সদ্ব্যবহার করিবার অভিপ্রায়ে সেটা খুলিয়া শিষ্টতা সহকারে তাহা ঘোষপত্নীর হাতে দিলাম। তিনি কিন্তু আপত্তি করিয়া বলিলেন, "না, না, আমার ছাতার দরকার নাই। গাড়ীর 'হুড'টা তুলে দিলেই হবে। ছাতা ব্যবহার করার অভ্যাস আমার নাই।" বলিয়া, তিনি সহিসকে গাড়ীর 'টাপ' উঠাইতে আজ্ঞা করিলেন। সে-ও আজ্ঞাপালনে রত হইল।

ইত্যবসরে ছাতাটার ভিতরদিকে সোনালী অক্ষরে মুদ্রিত কলিকাতার এক বিখ্যাত বিলাতী দোকানের নাম আমাদের দুই জনেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট করিল। যমুনা সেই নামের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "বাঃ! বেশ হয়েছে। ও দোকানটা ত আমাদের পথে পড়বে। তা'হ'লে চলুন না কেন, সেখানে এ ছাতাটার সম্বন্ধেও অমনি খোঁজ ক'রে যাওয়া যাক?"

আমি সোৎসাহে এই প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। অল্পক্ষণ পরেই সে দোকানে উপস্থিত হইয়া, আমরা ম্যানেজারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। আমাদের অনুরোধে ম্যানেজার অনুসন্ধান করিয়া বলিলেন যে, গত ডিসেম্বর মাসে ঐ দোকানের 'মাল সাবাড়ী' বিক্রীর সময় ঐ ছাতা এবং আরও কয়েকটা সামগ্রী দোকানের এক জন কর্ম্মচারী ধারে খরিদ করিয়াছিল। তাহার নাম উইল্‌সন্। সে পূর্ব্বে ঐ দোকানের দার্জ্জিলিঙ্গের শাখা-দোকানে কায করিত, এবং এক বৎসর হইল, কলিকাতার দোকানে বাহাল হইয়াছে।

এই উইল্‌সনের নাম উল্লেখ হইবামাত্র আমার বোধ হইল, যেন ঘোষপত্নী ক্ষণেকের জন্য কিছু চকিত, এমন কি, একটু উৎকণ্ঠিতও হইয়াছিলেন। কিন্তু লোকটির সহিত আমি দেখা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় ম্যানেজারের আহ্বানে সে যখন আমাদের নিকট উপস্থিত হইল, তখন তাহার আচরণে এটুকু বেশ বুঝা গেল যে, ঘোষপত্নীর সহিত তাহার পূর্ব্বে কখনও পরিচয় ছিল না। পরে তাহার সহিত বাক্যালাপের ফলেও তাহাই জানিলাম। ছাতার সম্বন্ধে সে বলিল যে, সে উহা নিজের জন্য ক্রয় করে নাই। তাহার এক পুরুষ-বন্ধুর অনুরোধে সেই বন্ধুর পরিচিতা এক মহিলার জন্য ছাতাটা কিনিয়া দিয়াছিল মাত্র। কিন্তু উইলসন্ তাহার সেই বন্ধুর নাম, ধাম বা অপর কোন পরিচয়, তাহার বিনা অনুমতিতে বলিতে সম্মত হইল না। কেবল এইমাত্র বলিল যে, বন্ধু ও সেই মহিলা উভয়েই এদেশী লোক; কিন্তু মহিলাটির সম্বন্ধে সে নিজে কিছুই জানে না। সে ছাতা কিনিবার দিন তাহার বন্ধুর সঙ্গে উহাকে দেখিয়াছিল মাত্র। উইলসনের নামটা বিলাতী হইলেও, তাহার দেহের বর্ণ ও মুখাবয়ব খাঁটি এদেশী। বাক্যালাপে যতদূর বুঝা গেল, তাহাতে তাহাকে বেশ 'সাদা-সিধা' ধরণের লোক বলিয়া বোধ হইল, এবং তাহার কথাগুলা অবিশ্বাস করিবার বিশেষ কোন কারণ দেখিলাম না।

যাহা হউক, ছাতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান এক রকম শেষ হওয়ায় আমি উইলসনের উপস্থিত বাসস্থানের ঠিকানা লইয়া, এবং তাহাকে ও ম্যানেজার মহাশয়কে প্রভূত পরিমাণে ধন্যবাদে আপ্যায়িত করিয়া তাহাদের নিকট বিদায় লইলাম। পরে, ঘোষজায়ার সহিত তথা হইতে পুনরায় ভবানীপুর অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

গাড়ীতে যাইতে যাইতে যমুনা তাঁহার সেই বাল্যবন্ধুর পরিচয় দিতে লাগিলেন। বন্ধুটি রমণী; তাঁহার পিতামাতা দুই-ই বর্ত্তমান আছেন। তাঁহারা পঞ্জাবী উন্নতিশীল সমাজের লোক এবং খুব সঙ্গতিপন্ন। বাপ বিলাত-ফেরত, এবং পরিবারের সকলেই অনেকটা বিলাতী ভাবাপন্ন। গত বৎসর বন্ধুর একটি পুত্রসন্তান হওয়ার পর হইতে তিনি সূতিকা-রোগে বড়ই ভুগিতেছেন ও নানা স্থানে বায়ু-পরিবর্ত্তন করিয়া আপাততঃ অনেকটা সুস্থাবস্থায় কলিকাতায় ফিরিয়াছেন।

এই সকল ও আরও পাঁচ রকম কথা কহিতে কহিতে আমরা অবশেষে গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হইলাম। যমুনা

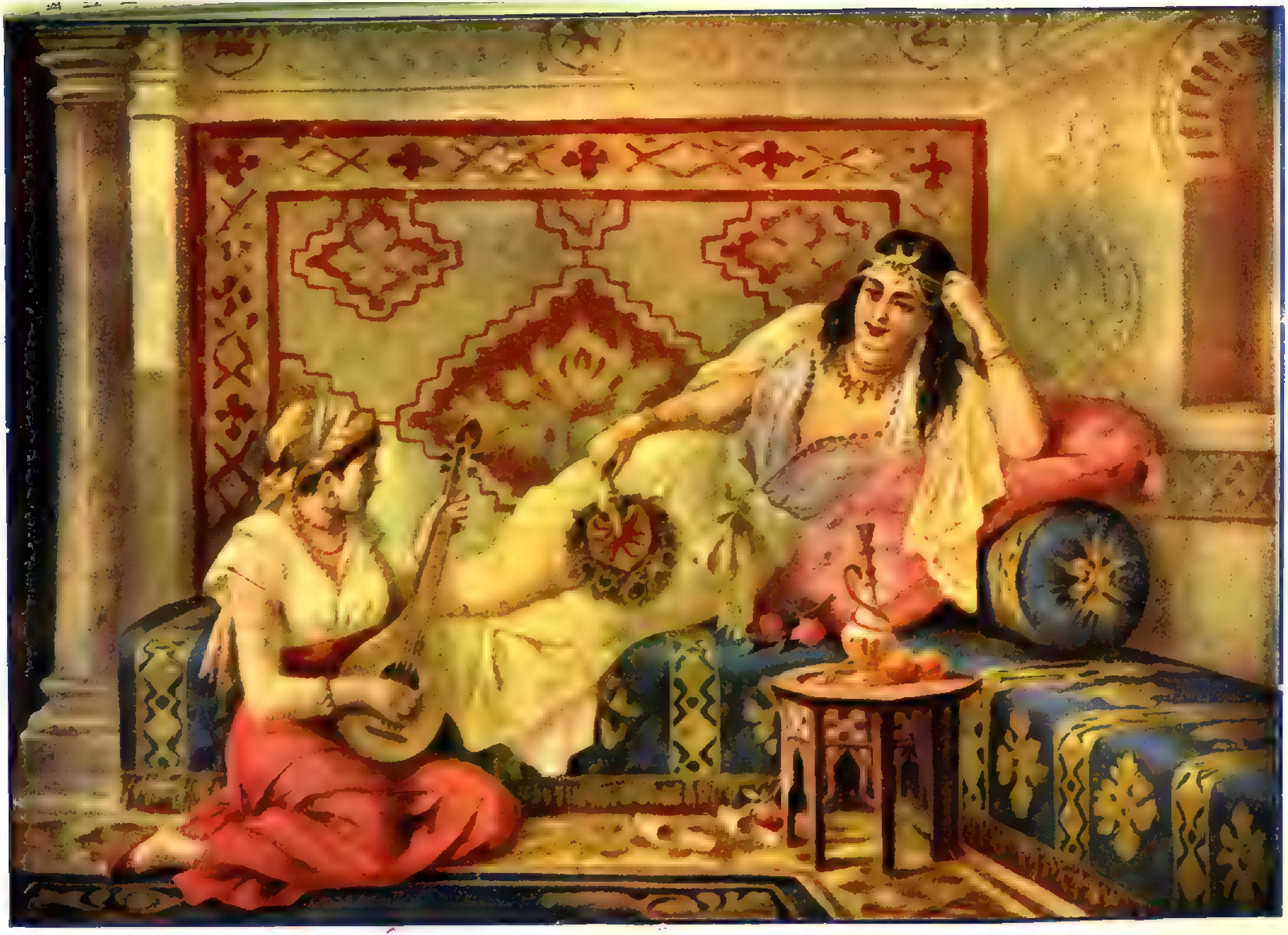

কি সে যে মরম কথা
বেজে উঠে বীণার ঝঙ্কারে—

তখন আমাকে সঙ্গে লইয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন, ও ভৃত্যের হস্তে নিজের নামের 'কার্ড' পাঠাইয়া দিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। বাড়ীটি দ্বিতল ও সাহেবী ধরণে সুসজ্জিত; বাড়ীর অধিবাসিগণের মার্জ্জিত রুচির পরিচায়ক।

যাহা হউক, অল্পক্ষণ পরেই এক জন প্রবীণা মহিলা সত্বর নীচে আসিয়া যমুনাকে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের ন্যায় সাদরে সম্ভাষণ করিলেন, এবং যমুনার দ্বারা আমার সহিত পরিচিত হইয়া, আমাকেও সৌজন্য সহকারে অভ্যর্থনা করিয়া, দুই জনকেই উপরে লইয়া গেলেন। জানিলাম, তিনি বাড়ীর গৃহিণী, এবং যমুনার বন্ধুর মাতা। উপরে যাইবামাত্র তাঁহার কন্যাও যমুনাকে বাস্তবিকই বন্ধুর ন্যায় মহা আনন্দে সংবর্দ্ধনা করিলেন। ক্রমে আমার সহিতও তাঁহার পরিচয় হইল। বন্ধুটি শীর্ণদেহ হইলেও বেশ সুন্দরী এবং যমুনার সমবয়স্কাই বোধ হইল। সকলে আসন গ্রহণ করিবার পর, দুই বন্ধুতে নানা বাক্যালাপ হইতে লাগিল; গৃহিণীও মাঝে মাঝে যোগ দিতে লাগিলেন এবং কথাবার্ত্তা অধিকাংশ ইংরাজীতে ও কখনও বা হিন্দীতে হইতে লাগিল।

এইরূপে কিয়ৎক্ষণ বাক্যালাপের পর গত জানুয়ারী মাসে যমুনা যে ইঁহাদের বাড়ীতে রাত্রিযাপন করিয়াছিলেন, প্রসঙ্গক্রমে তিনি সে কথা উত্থাপন করিলেন। তখন সুবিধামত আমিও তাঁহাদের কথায় যোগ দিয়া, মাঝে মাঝে প্রশ্নাদির দ্বারা যাহা জানিলাম, তাহার সংক্ষিপ্ত সমষ্টি এই যে, সে সময়ে ইঁহারা এ বাড়ীর নিকটবর্ত্তী অপর একটা বাড়ীতে বাস করিতেন; যমুনার বন্ধুর পীড়া তখন বেশী ছিল বলিয়া যমুনা প্রায়ই তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন। জানুয়ারী মাসে যে দিন আসিয়াছিলেন, সে দিনটা ইঁহাদের বিশেষরূপে স্মরণ আছে; কারণ, যমুনার বন্ধুর সে দিনটা রোগের বৃদ্ধি ও যন্ত্রণা এত বেশী হইয়াছিল যে, তাঁহার জীবনসংশয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, এবং তাঁহারই ইচ্ছায় তাঁহার পিতা যমুনাকে আসিবার জন্য টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন, যমুনা সন্ধ্যার পরেই এখানে পৌঁছিয়াছিলেন, এবং সমস্ত রাত্রি বন্ধুর নিকটে থাকিয়া, সকালে তাঁহার অবস্থা বেশ ভাল দেখিয়া এখান হইতে বেলা ৯টায় ফিরিয়া গিয়াছিলেন। যমুনার পিতার বন্ধু কান সাহেব সন্ধ্যার পরে যমুনাকে পৌঁছাইয়া দিয়াই প্রস্থান করিয়াছিলেন, এবং পরদিন সকালে ৮টার সময় পুনরায় আসিয়া, যমুনার সঙ্গেই বেলা ৯টার সময় চলিয়া গিয়াছিলেন।

তাঁহাদের নিকট আরও জানিলাম যে, যে দিন সকালে যমুনা ফিরিয়া যান, সেটা যে সরস্বতীপূজার দিন, তাহা ইঁহাদের বেশ মনে আছে। কারণ, তাঁহাদের ঠিক পাশের বাড়ীতেই সে দিন ঐ পূজা মহা সমারোহের সহিত হইয়াছিল। সে দিন দিবারাত্রি ও তাহার পরদিনেও বৈকাল পর্য্যন্ত সানাই ও ঢোল-কাঁসরের বাদ্যে, এবং লোকজনের কলরবে তাঁহারা মাঝে মাঝে উত্যক্ত হইয়াছিলেন। বিসর্জ্জনের দিন বৈকালে বাদ্যাদি লইয়া প্রতিমার সহিত লোকজনের শোভাযাত্রাও তাঁহারা দেখিয়াছিলেন।

## ১০

এই সকল বাক্যালাপে ক্রমে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। ইতোমধ্যে গৃহিণী আমাদিগকে চা ও মিষ্টান্নের দ্বারা রীতিমত অতিথি-সংকার করিতে ছাড়েন নাই। অবশেষে যমুনা শীঘ্রই আবার দেখা করিতে আসিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া বন্ধুর নিকট সে দিনের মত বিদায় লইলেন।

ফিরিবার সময় গাড়ীতে বসিয়া যমুনা তাঁহার বন্ধুর পরিবারবর্গের সম্বন্ধে নানা গল্প করিতে লাগিলেন। কিন্তু আমি ও সকল কথায় বিশেষ মনোযোগ দিতে পারিলাম না। ঘোষজা মহাশয়ের হত্যা সম্বন্ধে এত দিন এত অনুসন্ধানের ফলে যমুনার বিরুদ্ধে যে কয়টা প্রমাণ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম, তাহার মধ্যে প্রথম দুইটা যমুনা ত অবলীলাক্রমে তাঁহার সম্বন্ধে অপ্রযোজ্য বলিয়া সাব্যস্ত করিতে সমর্থ হইলেন। তাহা হইলে আমাদের সিদ্ধান্তগুলা ত সবই অসিদ্ধ হইয়া গেল! যমুনা যে এই হত্যাব্যাপারে বাস্তবিকই লিপ্ত নহে, তাহা অস্বীকার করিবার ত আর কোন উপায়ই রহিল না! অথচ হানাবাড়ীতে কোন একটি রমণী যে নিশ্চয়ই আসিত, তাহাতেও সন্দেহ নাই এবং ঐ বাড়ীতে প্রাপ্ত কাপড়ের টুক্‌রা দুইটা ও কানাই মল্লিক লেনের বাড়ীতে প্রাপ্ত ছাতাটাও যে সেই রমণীরই সম্পত্তি,ইহাও এক প্রকার নিশ্চিত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। তাহা হইলে সে রমণী কে এবং ঘোষজা মহাশয়ের নিকট তাহার ওরূপ গোপনে যাওয়া-আসা করিবার এবং শেষে তাঁহাকে হত্যা করিবারই বা উদ্দেশ্য কি? ইহাই ত সমস্যা! প্রথম

হইতেই ত এই একই সমস্যা চলিতেছে এবং এখনও সেই সমস্যাই যেন মূর্ত্তিমান্ হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া বিদ্রূপের হাসি হাসিতে লাগিল।

কিন্তু রমণীটি যেই হউক, তাহার সঙ্গে কান সাহেবের যে কোনওরূপ সংস্রব ছিল, তাহাও ত হইতে পারে? সে রমণীর এক জন পুরুষ সহচর যে সর্ব্বদাই থাকিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কেন না, হানাবাড়ীর পর্দ্দার উপর সেই যে ছায়া দেখিয়াছিলাম, তাহাতে পুরুষ ও নারী উভয়ই ছিল। আবার মল্লিক লেনের বাড়ীতে যে রমণী আসিত, তাহার সহিত প্রতি বারেই এক জন পুরুষ সঙ্গী থাকিত এবং খুনের কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে ঐ বাড়ীতে কাঠের সিঁড়ি দ্বারা সেই পুরুষটাই ছাতে উঠিবার উপক্রম করিয়াছিল। কান সাহেবই যে সেই পুরুষ, তাহা ত অসম্ভব নয়? যে রাত্রিতে খুন হইয়াছিল, সে দিন সন্ধ্যার পরে যমুনাকে ভবানীপুরে পৌঁছাইয়া দিয়া কান সাহেবের পক্ষে কানাই মল্লিক লেনের বাড়ীতে রাত্রি ৮টার সময় উপস্থিত হওয়া মোটেই অসম্ভব নয় এবং তথায় যাইবার সময় সে হয় ত পথে অন্য কোথাও হইতে সেই অপর রমণীকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল, তাহাও হইতে পারে। তাহা ছাড়া ঐ ছাতাটা উইলসন্ তাহার যে পুরুষ-বন্ধুর অনুরোধে ক্রয় করিয়াছিল, কান সাহেবই হয় ত সেই বন্ধু, তাহাও ত হইতে পারে?—আচ্ছা, তা না হয় হইল; কিন্তু খুনের সঙ্গে তাহার বা সেই রমণীর কি সংস্রব? তাহারা ত উভয়েই রাত্রি ৯টার পূর্ব্বেই মল্লিক লেনের বাড়ী হইতে প্রস্থান করিয়াছিল। অথচ 'পোষ্ট-মর্টেমের' ডাক্তারের মতে খুনটা রাত্রি ১২টার পূর্ব্বে হয় নাই। তাহা হইলেই আবার সেই পুরাতন সমস্যা—খুন করিল কে? এবং সে রমণীটিই বা কে, ও ঘোষজায়ার সহিত তাহার সম্পর্কই বা কি?

সমস্যাগুলার সন্তোষজনক মীমাংসার আপাততঃ আর কোন উপায় দেখিতে না পাইয়া ঘোষ-পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা, সে রাত্রিতে কান সাহেব আপনাকে ভবানীপুরে পৌঁছে দিয়ে কোথায় রাত কাটিয়েছিলেন?"

"সে কলকাতায় এসে যেখানে থাকে, বোধ হয়, সেইখানেই ছিল।"

"সে কোথায়?"

"শুনেছি, সেটা তার এক বন্ধুর বাড়ী। সেখানে তার জন্য একটা ঘর স্বতন্ত্র ক'রে রাখা থাকে। সে কলকাতায় এসে সেইখানে থাকে।"

"বন্ধুর নাম আর ঠিকানাটা বল্‌তে পারেন কি?"

ঘোষ-পত্নী একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "না, আমি ঠিক জানি না। আমি সেখানে কখনও যাই নি। তবে শুনেছি, বাড়ীটা না কি শিয়ালদার কাছে। কিন্তু ঠিকানা জেনে কি হবে? সেখানে তার সঙ্গে দেখা হওয়া মুস্কিল। কারণ, বাড়ীতে সে কখন্ থাকে, না থাকে, তার কিছুই ঠিক নাই।"

"কেন?"

"থিয়েটারে তার ভারি ঝোঁক। সে অনেক রকম বাজনাও বেশ ভাল বাজাতে পারে। সেই জন্যে এখানে এলেই কোন-না-কোন একটা থিয়েটারে সে বাজনার দলে কায করতে লেগে যায়—আর তাতে দু' পয়সা রোজগারও করে। কিন্তু এ কাযে মহলা দেবার কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই ব'লে যখন তখন থিয়েটারে হাজির থাকতে হয়।"

"তিনি না দার্জ্জিলিং অঞ্চলে কোন্ একটা চা-বাগানে কায করেন শুনেছি?"

"ওঃ! সে কায ত অনেক দিন হলো সে ছেড়ে দিয়েছে। আপাততঃ তার স্থায়ী কোন চাকরী নাই। তবে মাস কয়েক থেকে সে আসামে একটা খুব বড় চা-বাগানের ম্যানেজারী পাবার চেষ্টায় ঘুরছে। সেই জন্য সেখানে প্রায়ই যেতে হয়। কাযটা এইবার না কি পাওয়া নিশ্চয় হয়েছে।"

## ৪১

আমাদের গাড়ীখানা এতক্ষণে ঘোষ-পত্নীর উপস্থিত বাসা-বাড়ীর অঞ্চলে আসিয়া সেই দিকে মোড় ফিরিবার উপক্রম করিতেছিল। সেই সময় হঠাৎ একটা নূতন কল্পনার বশবর্ত্তী হইয়া আমি গাড়োয়ানকে সে দিকে যাইতে নিষেধ করিলাম এবং তৎপরিবর্ত্তে কানাই মল্লিক লেনে যাইবার অভিপ্রায়ে তাহাকে সেই অঞ্চলের দিকে গাড়ী চালাইতে আদেশ করিলাম। ঘোষ-পত্নী আমাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে বলিলাম, "আপনাকে আজ আমার জন্য অনেক কষ্ট ভোগ করতে হলো। কিন্তু আপনার উপর সন্দেহটা এমন বিশিষ্টভাবে পড়েছিল যে, এটুকু কষ্ট-স্বীকার না কর্‌লে পরে হয় ত আপনাকে অনেক বেশী বিরক্তি সহ্য করতে হতো। এখন আর একটু কষ্ট ক'রে আমার সঙ্গে

আর কিছু দূরে গেলে, আপনার উপর সন্দেহটা একেবারে নিঃসংশয়ে দূর হয়ে যেতে পারে।”

“আপনার সঙ্গে সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়াতেও আমার কোন ওজর নাই। কিন্তু আপনাদের ও-সব সন্দেহ আমি মোটেই গ্রাহ্য করি না, তা জান্‌বেন!—যাক্, এখন কোথায় যেতে হবে, বলুন দেখি?”

“সেই কানাই মল্লিক লেনের বাড়ীতে।”

“সে এখান থেকে কত দূর?”

“বেশী নয়। বোধ হয় আর আধঘণ্টার মধ্যেই ফিরতে পারবেন।”

“বেশ—চলুন।”

তখন আমি গাড়োয়ানকে আরও বেগে হাঁকাইতে আদেশ করিয়া ঘোষ-পত্নীর সহিত নানারূপ অবান্তর কথায় তাঁহার বিরক্তি দূর করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। ক্রমে গাড়ীখানা যখন কানাই মল্লিক লেনে প্রবেশ করিয়া ৩৪ নং বাড়ীর নিকটবর্ত্তী হইল, তখন আমি যমুনার ভাব-গতিকের প্রতি বিশেষরূপে লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। কিন্তু যত দূর বুঝিতে পারিলাম, তাহাতে তিনি যে পূর্ব্বে এখানে কখনও আসিয়াছিলেন, তাহা বোধ হইল না।

গাড়ীখানার ‘হুড’ অনেক পূর্ব্বেই পুনরায় নামাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। আমরা যখন ৩৪ নং বাড়ী ছাড়াইয়া তাহার পরে প্রথম গ্যাস-স্তম্ভের নিকট উপস্থিত হইলাম, তখন আমি গাড়ী থামাইয়া ছাতা লইয়া অবতরণ করিলাম এবং ঘোষ-পত্নীকে গাড়ীতেই অপেক্ষা করিতে বলিয়া ৩৪ নং বাড়ীর সদরে উপস্থিত হইলাম। দ্বার তখন বন্ধ ছিল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ঠিক সেই সময় দ্বার খুলিয়া স্বয়ং গোঁসাইজী বাড়ী হইতে বাহির হইলেন এবং বোধ হয়, তাঁহার প্রস্থানের পর দ্বার আবার বন্ধ করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার পশ্চাতেই নিতাই-ও তথায় উপস্থিত হইল।

গোঁসাইজী প্রথমে আমাকে চিনিতে পারেন নাই বোধ হইল। কিয়ৎক্ষণ আমার দিকে অপরিচিতের ন্যায় চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি কাকে চান মশায়?”

নিতাই কিন্তু আমাকে চিনিয়াছিল। সে বলিল, “সে কি কর্তা! ওনাকে চিন্‌তে পাচ্ছেন না? উনি যে পুলিসের সেই বাবু গো!”

তখন গোঁসাইজী বলিলেন, “ওঃ! বটেই ত! তা—আমি এখন একটু বাইরে যাচ্ছি—”

আমি তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিলাম, “তাতে কোন ক্ষতি নাই। আমি আপনার নিতাইকে দুটো কথা বল্‌তে এসেছি। আপনি উপস্থিত না থাক্‌লেও চল্‌বে।”

তৎপরে নিতাইকে আমার হস্তস্থিত ছাতাটা দেখাইয়া বলিলাম, “কি হে, নিতাইচাঁদ! এ ছাতাটার কথা মনে আছে ত?”

“এজ্ঞে, আছে বৈ কি!”

“আর ছাতাটার মালিককেও বেশ মনে আছে, বোধ হয়?”

“কে? সেই হ্যাম্‌-ম্যাম্ ত? ওঃ! তেনাকে কি ভুল্‌তে পারি, বাবু?”

“তাকে এখন দেখলে চিন্‌তে পারবি?”

“এজ্ঞে, তা কেনে পারবো না?”

“আচ্ছা, দেখ্ দেখি—ঐ যে গ্যাসের ধারে খোলা গাড়ীখানা দাঁড়িয়ে আছে, তাতে যে মেয়েমানুষটি ব’সে আছে—”

আমার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই নিতাই সদর হইতে বাহির হইয়া ক্ষিপ্রগতিতে গাড়ী অভিমুখে চলিল। আমিও তাহার অনুসরণ করিলাম। নিতাই গাড়ীর পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া তথায় দাঁড়াইবামাত্র যমুনা তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া তাহাকে দেখিলেন এবং সম্ভবতঃ অপরিচিত বোধে আবার মুখ ফিরাইয়া লইলেন। তাঁহার মুখের উপর গ্যাসের আলো বেশ উজ্জ্বলভাবেই পড়িয়াছিল, অথচ নিতাইও সম্পূর্ণ অপরিচিতের ন্যায় কিছুক্ষণ যমুনার মুখের দিকে চাহিয়া শেষে ফিরিবার উপক্রম করিল। কিন্তু পরক্ষণেই বোধ হয় আর একবার ভাল করিয়া দেখিবার উদ্দেশ্যে গলা বাড়াইয়া একেবারে যমুনার মুখের সম্মুখে নিজের মুখ লইয়া গেল। ব্যাপার দেখিয়া যমুনা বোধ হয় কিছু ভীত হইয়া চীৎকার স্বরে বলিয়া উঠিল, “কে তুমি? স’রে যাও বলছি! নয় ত এখনই পাহারাওয়ালা ডাক্‌বো।”

নিতাই মুখ সরাইয়া লইয়া বলিল, “এজ্ঞে, তা নয়! পুলিস-বাবু বল্লেক কি না যে, আপনি হ্যাম্‌-ম্যাম্—তাই দেখতেছিলাম। তেনার হাতে সেই বুড়া বামুন আমার ট্যাকা পেঠিয়ে দেবে কয়েছিল কি না!”

"হ্যাস্-ম্যাম্, কে? কিসের টাকা? বুড়ো বামুনই বা কে?"

"এজ্ঞে, না; পুলিস-বাবু ভুল করেছে। আপনি সে হ্যাস্-ম্যাম্ নয়। তা আমি জান্‌বো কেম্‌নে? তাই ভাল ক'রে দেখবার লেগে আপনকার দিকে মুখ বাড়ায়ে তাকিয়েছিলেম।"

এই বলিয়া সে গাড়ীর নিকট হইতে ফিরিয়া আমাকে সম্মুখে দেখিয়া বলিল, "না, বাবু, ও ত সে হ্যাস্-ম্যাম্ নয়! আপনি ভুল ক'রে আর কারে নিয়ে এসেছেন।"

"ওঃ! বটে? আচ্ছা, তা হ'লে আমি আবার আর এক দিন আস্‌বো এখন।" বলিয়া আমি গাড়ীতে উঠিয়া পড়িলাম এবং গাড়োয়ানকে বেগে হাঁকাইতে বলিয়া ঘোষ-পত্নীর সঙ্গে তথা হইতে প্রস্থান করিলাম। [ক্রমশঃ।

শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (এটর্ণি)।

# আকিঞ্চন

যেথায় যমুনা-জল
বহি যায় ছল-ছল,
কেলি করে কাল জলে হংস-মিথুন;
ভাটিয়াল গান গেয়ে
পাল তুলে যায় নেয়ে,
বাতাসে মিশায়ে ব্যথা কণ্ঠে নিপুণ।

যেথায় বিটপী বট
শ্যামল করেছে তট,
সমীরে করেছে চির-শান্ত শীতল;
যেথায় কানন-ছায়
বহিলে বাদল বায়,
ঠমকে চমকি নাচে ময়ূরীর দল।

পাথায় পাথায় যার
ত্রিদিবের রূপ-ধার,
মানস মুগধ করে নর-দেবতার;
পাতার আড়ালে থাকি
অবিরত গাহে পাখী,
ফুলে ফুলে অলি করে প্রণয় প্রচার।

সুদূরে নদীর বাঁকে
পাখীকুল ঝাঁকে ঝাঁকে,
উড়ে পড়ে কুতূহলে নাহি ভয়-লেশ;
বেণা ধরা নভপানে
চাহিয়া বিহ্বল প্রাণে,
সতত সাধক সম সমাহিত বেশ।

আবেগে পূরিত হিয়া,
রহে সদা প্রসারিয়া,
দিগন্তের ছায়াময় ক্ষীণ বাহুলতা:
সেই বনচ্ছায়াতলে,
দিনে দিনে পলে পলে,
রচিব কুটীর মা গো মুক্ত মলিনতা!

বিরলে বসিয়া একা
মরমের চিত্র-লেখা,
নেহারি মানস-নেত্রে, হৃদি-রক্ত-রাগে,—
আঁকিব মূরতি তব
এ জগতে অভিনব,
হাসিবে সে মুখপদ্ম নিত্য অনুরাগে।

প্রভাতে ও সন্ধ্যায়
বসি ও চরণ-ছায়,
ডাকিব তোমারে মা গো, উচ্চে মা মা বলি;
ভকতি কুসুম-হার
চন্দন নয়নাসার,
অর্ঘ্য দিব পদতলে, দৈন্য দিব বলি।

স্নেহে মোর শির চুমি
কোলে তুলে লবে তুমি,
সোহাগে পরাবে নেত্রে জ্ঞানের অঞ্জন;
সোনার বীণাটি তুলে
বাজাইবে কর্ণমূলে,
অনাদি সে বিশ্ব-গীতি মানস-রঞ্জন।

নয়নে করুণা-জল
পরাণে অসীম বল,
হৃদয়ে ক'র মা মধু পরিমল দান;
কণ্ঠেতে দিও মা সুর,
মাধুরীতে ভরপুর,
দিও মা সরল ভাষা জীবন্ত মহান্।

গাহিব পরাণ খুলে
কুটীরে প্রাসাদ-মূলে,
সুদূর এ বাংলার প্রতি ঘরে ঘরে;
ভাসিব নয়ন-নীরে
দেখাব এ বক্ষ চিরে,
তোমারি মানসী মূর্ত্তি বরাভয় করে।

কব আমি ডেকে ডেকে,—
ওঠ্ তোরা ঘুমায়ে কে?
ওই দেখ্ ডাকিছে মা মুক্তি-মন্ত্র নিতে;
ওঠ্ তোরা ওঠ্ জেগে
চল্ প্রভঞ্জন বেগে,
প্রলয়পয়োধি জলে আজি প্রক্ষালিতে,—

অধীনতা হীনতার
কলুষ-কালিমা ভার,
পরিতে বিমল ভালে রক্ত জয়-টীকা!
মরে কে বাঁচিবি আর,
আয় আয় ছুটে আয়,
দু'হাতে ডাকিছে মৃত্যু-লোল-বহ্নি-শিখা!!

শ্রীঅমূল্যকুমার রায় চৌধুরী।

# পুরাণে আয়ুষ্কাল

## ২

রামায়ণের অবস্থা মহাভারতের মত নহে। রামায়ণের কালপরিমাণ অন্যান্য পুরাণের অনুরূপ। রাম ১১ হাজার বৎসর রাজত্ব করেন (১)। দশরথের ৬০ হাজার বৎসর বয়স হইয়াছিল (২)। মহীপাল সগর ত্রিশ হাজার বৎসর রাজ্যপালন করিয়া স্বর্গারোহণ করেন (৩)। অংশুমান্ হিমাচলশিখরে ৩২ হাজার বৎসর কঠোর তপশ্চরণ করিয়া স্বর্গলাভ করেন (৪)। রাজা দিলীপ বহুবিধ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক ৩০ হাজার বৎসর রাজ্যপালন করিয়াছিলেন (৫)। ভগীরথ ঊর্দ্ধবাহু ও পঞ্চতপাঃ হইয়া এবং মাসান্তে আহার করিয়া সহস্র বৎসর অতিবাহিত করেন (৬)। বিশ্বামিত্র বহু সহস্র বৎসর রাজত্ব করেন (৭)। অনসূয়া ক্রমে ১০ সহস্র বৎসর যোগাবলম্বনে অতিবাহিত করেন এবং কত শত তাপস ইঁহার শরণাপন্ন হইয়া তপোবিঘ্ন নিবারণ করিয়াছিলেন (৮)। মহর্ষি মাণ্ডকর্ণি বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিয়া সরোবরমধ্যে ১০ সহস্র বৎসর অতি কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন (৯)। রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ প্রত্যেকেই ১০ সহস্র বৎসর তপস্যা করেন (১)। কৈলাসপর্ব্বত উত্তোলনসময়ে রাবণের ক্রন্দন করিতে করিতেই সহস্র বৎসর গত হইয়াছিল (২)।

স্বয়ং বাল্মীকিও সীতার পাতালপ্রবেশোপক্রমে নিজের বহু সহস্র বৎসর তপস্যা করার কথা বলিয়াছিলেন (৩)। ৫ হাজার বর্ষবয়স্ক বালকেরও (!) অকালমৃত্যু (৪)। কুম্ভকর্ণ বহু সহস্র বৎসর নিদ্রামগ্ন ছিলেন (৫)। জটায়ু বলিতেছেন,—"রাবণ! ৬০ হাজার বৎসর অতীত হইল, আমি জন্মগ্রহণ করিয়া পিতৃপিতামহপ্রাপ্ত রাজ্য পালন করিয়াছি (৬)।"

পুরাণোক্ত বয়স বা কালমান লইয়া যে সমস্যা, তাহা আমরা সপ্রমাণ উপস্থাপিত করিলাম। হাজার হাজার বৎসর মানুষ যে বাঁচিতে পারে, ইহা আমাদের কল্পনাতেও সহজে আসিতে পারে না এবং ইহা সম্ভবপর কি না, তাহা প্রকৃতই সমস্যার বিষয়। এই সন্দেহের নিরসনই আমাদের প্রার্থনীয়।

মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহোদয় বলিয়াছেন,—"বৈদিক আখ্যায়িকার কিন্তু যাথার্থ্য নাই। অভিপ্রেত বিষয়ের উৎকর্ষখ্যাপনের জন্য আখ্যায়িকাগুলি পরিকল্পিত হইয়াছে।" (শ্রীগোপাল বসু মল্লিক ফেলোশিপের লেক্‌চার—২য় বর্ষ ১৮ লেক্‌চার ৩৪।৩৫ পৃষ্ঠা।)

পুরাণাদি সম্বন্ধে এই সন্দেহ যে বর্ত্তমান যুগের লোক বলিয়া কেবল আমাদের নিকট আবির্ভূত হইয়াছে, তাহা

---

(১) দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ।
রামো রাজ্যমুপাসিত্বা ব্রহ্মলোকং প্রযাস্যতি॥
বাল, ১।৯৮; উত্তর, ৬১।২১।

(ক) দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ।
বৎস্যামি মানুষে লোকে পালয়ন্ পৃথিবীমিমাম্॥
বাল, ১৫।৩০।

(খ) দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ।
কৃত্বা বাসস্য নিয়মং স্বয়মেবাত্মনা পুরা॥ উত্তর, ১১৭।১২।

(২) ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি জাতস্য মম কৌশিক।
কৃচ্ছ্রেণোৎপাদিতশ্চায়ং ন রামং নেতুমর্হসি॥ বাল, ২০।১০

(৩) ত্রিংশদ্বর্ষসহস্রাণি রাজ্যং কৃত্বা দিবং গতঃ॥ বাল, ৪১।২৬।

(৪) হিমবচ্ছিখরে রম্যে তপস্তেপে সুদারুণম্।
দ্বাত্রিংশচ্ছতসাহস্রং বর্ষাণি সুমহাযশাঃ॥ বাল, ৪২।৩।

(৫) দিলীপস্তু মহাতেজা যজ্ঞৈর্বহুভিরিষ্টবান্।
ত্রিংশদ্বর্ষসহস্রাণি রাজা রাজ্যমকারয়ৎ॥ বাল, ৪২।৮।

(৬) ঊর্দ্ধবাহুঃ পঞ্চতপা মাসাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
তস্য বর্ষসহস্রাণি ঘোরে তপসি তিষ্ঠতঃ॥ বাল, ৪২।১৩।

(৭) বিশ্বামিত্রো মহাতেজাঃ পালয়ামাস মেদিনীম্।
বহুবর্ষসহস্রাণি........................৫১।২০।

(৮) দশবর্ষসহস্রাণি যয়া তপ্তং মহত্তপঃ।
অনসূয়া ব্রতৈস্তাত প্রত্যূহাশ্চ নিবর্হিতাঃ॥ অযো, ১১৭।১১।

(৯) স হি তেপে তপস্তীব্রং মাণ্ডকর্ণির্মহামুনিঃ।
দশবর্ষসহস্রাণি-বায়ুভক্ষো জলাশয়ে॥ আরণ্য, ১১।১২।

(১) উত্তরকাণ্ড, ১০ সর্গ।

(২) সংবৎসরসহস্রন্তু রুদতো রক্ষসো গতম্। উত্তর, ১৬।৩৪।

(৩) বহুবর্ষসহস্রাণি তপশ্চর্য্যা ময়া কৃতা।
নোপাশ্নীয়াম্ ফলং তস্যা দুষ্টেয়ং যদি মৈথিলী॥
উত্তর, ১০৯।১৯।

(৪) অপ্রাপ্তযৌবনং বালং পঞ্চবর্ষসহস্রকম্।
অকালে কালমাপন্নং মম দুঃখায় পুত্রক॥ উত্তর, ৮৬।৫।
"বর্ষশব্দোঽত্র দিনপরঃ, তেন কিঞ্চিন্ন্যূনচতুর্দ্দশবর্ষমিত্যর্থঃ।"
—রামানুজ।

(৫) বহুন্যব্দসহস্রাণি শয়ানো ন চ বুধ্যতে॥ উত্তর, ১৩।৭।

(৬) ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি জাতস্য মম রাবণ।
পিতৃপৈতামহং রাজ্যং যথাবদনুতিষ্ঠতঃ॥ আরণ্য, ৫০।২০।

নহে। শঙ্করাচার্য্যেরও (১) পূর্ব্ববর্ত্তী মীমাংসক-প্রধান কুমারিল, তাঁহার অক্ষয়-কীর্ত্তিস্বরূপ "তন্ত্রবার্ত্তিকে" বলিয়াছেন—পুরাণ কেবল অর্থবাদ, উহা কেবল প্রশংসাপর। পৌরাণিক আখ্যানের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা রাখা চলে না; কারণ, উহার সত্যতা অল্প (২)। অর্থবাদ প্রস্তাবে উপাখ্যান সকল ব্যাখ্যাত হইয়াছে (৩)। "ব্যবহারময়ূখ" পুস্তকে নীলকণ্ঠ ভট্টও এই কথারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন।

মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ৩৩৩ অধ্যায়ে বিবৃত আছে,—ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন যে, শুকদেব বায়ুর ঊর্দ্ধে গমন পূর্ব্বক স্বীয় প্রভাব প্রদর্শন করাইয়া পরব্রহ্মে লীন হইলেন (৪)। তবে ইহার অনেক পরে তিনি পরীক্ষিৎকে ভাগবত শুনাইলেন কিরূপে? (৫) শরশয্যাশায়ী ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে পুরাতন কথা শুনাইয়াছিলেন, পরীক্ষিৎ তখন মাতৃগর্ভে।

পুরাণ অর্থবাদই হউক বা মিথ্যাবাদই হউক, সে বিষয়ে আমরা আলোচনা করিতে চাহি না; তাহা প্রবন্ধের প্রারম্ভে সংক্ষেপে বলিয়াছি। পুরাণের কালমান আমাদের নিকট বিশেষ অসামঞ্জস্যমূলক লক্ষিত হইতেছে। পুরাণের বাস্তবতা যদি না-ই থাকে, ইহাতে অপ্রাকৃত কালমান থাকিবে কেন? দ্বিতীয়তঃ,যদি ১০।২০ হাজার বৎসর বয়সের কথাও থাকে, তবে সমস্ত স্থলেই এরূপ যথাযোগ্য অনন্যসাধারণ কালমানের কথা থাকা উচিত এবং যাহাতে সমগ্র পুরাণগুলিতে কোনও অসামঞ্জস্য না থাকে, তাহাও দেখা আবশ্যক। কিন্তু ইহার ব্যতিক্রম অনেক স্থলেই দেখা যায়। উপন্যাস স্বকপোলকল্পিত হইলেও বাস্তবের সহিত তাহার এতাদৃশ অসামঞ্জস্য থাকে না। পুরাণ সম্বন্ধেও আমরা অন্ততঃ তাহাই পাইতে চাই।

ভেক ও সর্প শ্বাসরোধ করিয়া অনেক দিন থাকিতে পারে। পঞ্জাবের হরিদাস সাধুর কথা সকলেই জানেন। তিনি শ্বাসরোধ করিয়া মাটীর নীচে ৪০ দিন ছিলেন। সুতরাং যোগিগণ যে দীর্ঘায়ু ছিলেন, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। *

হাজার হাজার বৎসর বয়স সম্বন্ধে মীমাংসা করিতে যাইয়া মীমাংসাদর্শন ৬ষ্ঠ অধ্যায় ৭ম পাদে "সহস্র-সংবৎসরশব্দস্য সহস্রদিনপরতাধিকরণম্" ইত্যাদি বলিয়া "সহস্রসংবৎসরং তদায়ুষামসম্ভবাৎ মনুষ্যেষু" (৩১ সূত্র) প্রভৃতি

---

(১) "শঙ্কর মন্দার সৌরভ" নামক গ্রন্থের রচয়িতা নীলকণ্ঠ ভট্ট লিখিয়াছেন,—

কলিযুগের ৩ হাজার ৮ শত ৮৯ বৎসর গত হইলে শঙ্করের জন্ম হয়।

(২) তৎপরত্বাচ্চ নাতীব উপাখ্যানেষু তত্ত্বাভিনিবেশঃ কার্য্যঃ।

তন্ত্রবার্ত্তিক, ১৬।১৭ পৃঃ।

(৩) উপাখ্যানানি ত্বর্থবাদেষু ব্যাখ্যাতানি। ঐ

(৪) শুকস্তু মারুতাদূর্দ্ধং গতিং কৃত্বান্তরীক্ষগাম্।

দর্শয়িত্বা প্রভাবং স্বং ব্রহ্মভূতোঽভবত্তদা॥ ২০ শ্লোক।

(৫) শুকদেব যে পরীক্ষিৎকে ভাগবত শুনাইয়াছিলেন, ইহা কেবল ভাগবতের উক্তি নহে। পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড ১৯৩-১৯৮ অধ্যায়ে যে ভাগবত মাহাত্ম্য আছে, তাহাতেও রহিয়াছে,—"শুকেনোক্তং কদা রাজ্ঞে"—"ভাদ্রশুক্লনবম্যাং বৈ কথারম্ভং শুকোঽকরোৎ" ইত্যাদি। ব্রহ্মসূত্রের ৪ অধ্যায়, ২ পাদ, ১৪ সূত্রের ভাষ্যে শুকদেবের গতি সম্বন্ধে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন,—

ননু গতিরপি ব্রহ্মবিদঃ সর্ব্বগতব্রহ্মাত্মভূতস্য স্মর্য্যতে—শুকঃ কিল বৈয়াসকিঃ মুমুক্ষুরাদিত্যমণ্ডলম্ অভিপ্রতস্থে, পিত্রা চ অনুগম্য আহূতঃ ভো ইতি প্রতিশুশ্রাব ইতি। ন। সশরীরস্যৈব অয়ং যোগবলেন বিশিষ্টদেশপ্রাপ্তিপূর্ব্বকঃ শরীরোৎসর্গ ইতি দ্রষ্টব্যম্। সর্ব্বভূতদৃশ্যত্বাদ্যুপন্যাসাৎ। ন হি অশরীরং গচ্ছন্তং সর্ব্বভূতানি দ্রষ্টুং শক্নুযুঃ। তথাচ তত্রৈব উপসংহৃতম্—

"শুকস্তু মারুতাচ্ছীঘ্রাং গতিং কৃত্বান্তরীক্ষগাম্।
দর্শয়িত্বা প্রভাবং স্বং সর্ব্বভূতগতোঽভবৎ॥" ইতি।

ব্রহ্মভূতের গতি (পুনঃ সংসারে গমন, পুনর্জ্জন্ম) ও উৎক্রান্তি (দেহ হইতে প্রাণাদির নির্গমন) নাই, এই কথা বলিতে গিয়া সূত্রকার প্রথমে বেদপ্রমাণ দেখাইয়া, স্মৃতিপ্রমাণ দেখাইবার জন্য সূত্র করিয়াছেন "স্মর্য্যতে চ" অর্থাৎ স্মৃতিকাররাও এই কথা বলেন। ভাষ্যকার মহাভারতের বর্ণনা উপলক্ষে এই সূত্রের উপর আপত্তি উত্থাপন করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—

(আপত্তি) যদি বল, ব্রহ্মবিদ্ ও ব্রহ্মভূত (সর্ব্বগত যে ব্রহ্ম তদাত্মভূত—তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত) ব্যক্তিরও গতি ত অন্যতম স্মৃতি মহাভারতে উক্ত হইয়াছে, যথা,—মুমুক্ষু ব্যাসপুত্র শুক সূর্য্যমণ্ডলাভিমুখে গমন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পিতা অনুগমন করিয়া আহ্বান করিলে "ভোঃ" বলিয়া উত্তর দিয়াছিলেন।

(সিদ্ধান্ত) তাহা নহে (অর্থাৎ শুক ব্রহ্মভূত হইয়া সূর্য্যমণ্ডলে গমন করেন নাই)। তিনি সশরীরেই যোগবলে গমন করিয়া উৎকৃষ্ট স্থান পাইয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন জানিও, (অর্থাৎ ব্রহ্মভূত হইবার পূর্ব্বে সূর্য্যমণ্ডলে গমন করিয়াছিলেন)। যেহেতু, সর্ব্বপ্রাণীরা তাঁহাকে দেখিয়াছিল ইত্যাদির উপন্যাস (উল্লেখ) মহাভারতে আছে। যে দেহ ত্যাগ করিয়া গমন করে, তাহাকে সর্ব্বপ্রাণী দেখিতে সমর্থ হয় না। (শরীরধারী আত্মাকেই অর্থাৎ আত্মাধিষ্ঠিত শরীরকেই সকলে দেখিতে পায়, শরীরত্যাগের পর তাহাকে কেহ দেখিতে পায় না)।

সেই মহাভারতেই ঐ উপাখ্যানের উপসংহারে এইরূপ কথাই আছে, যথা,—শুক (সূর্য্যমণ্ডল হইতে) বায়ুলোকে গিয়া, সেখান হইতে আবার দ্রুতগমনে অন্তরীক্ষলোকে গিয়া, স্বীয় প্রভাব দেখাইয়া ব্রহ্মভূত হইয়াছিলেন। ভাগবতে জড়ভরতকেও ব্রহ্মভূত বলা হইয়াছে। (৫।৯।১৭)।

মূলগ্রন্থ অপেক্ষা টীকাকারদিগের মতভেদে অধিকতর সংশয় জন্মে।

* "ভূকৈলাসের রাজবাড়ীতে যে এক জন সমাধিস্থ যোগী আনীত হইয়াছিলেন,—সমাধিভঙ্গের পর তিনি যে সময়ের কথা বলিয়াছিলেন, তাহা মুসলমান-বিজয়ের পূর্ব্বের কথা। এই সময়ে কোনও কোনও

সূত্রের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার শবরস্বামী বহু কথা বলিয়াছেন। তাঁহার মূল বক্তব্য এই যে, রসায়ন প্রভৃতি দ্বারা আয়ুঃ দীর্ঘ হয় বটে, কিন্তু এত দীর্ঘ হয় না যে, তদ্দ্বারা সহস্র বৎসর জীবিত থাকা চলে। অতএব সহস্র সংবৎসর শব্দকে সহস্র দিন ধরিতে হইবে। অর্থাৎ এ সকল স্থলে বর্ষ শব্দ দিনবাচক। (১)

"অত্যক্রামন্মহাভাগঃ কালঃ শৈশিরো ভোগদঃ সদা। দশ বর্ষসহস্রাণি গতানি সুমহাত্মনোঃ॥" রামায়ণ উত্তরকাণ্ড, ৫২ সর্গ, ২৬ সংখ্যক শ্লোকের ব্যাখ্যায় রামানুজও মীমাংসা-দর্শনের উপরি-উক্ত মত গ্রহণ করিয়া দশবর্ষসহস্রাণি দ্বারা ২৭ বৎসর ধরিয়াছেন। অর্থাৎ রামানুজের মতে রামায়ণের বর্ষ শব্দ অন্ততঃ এ প্রকার স্থলে দিনপর বুঝিতে হইবে। অতএব "দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ। রামো রাজ্যমুপাসিত্বা ব্রহ্মলোকং প্রযাস্যতি॥" এবংবিধ রামায়ণ ( বাল, ১।৯৮ ; উত্তর, ৬১।২১ ) বা মহাভারতের ( দ্রোণ, ৫৭।২১ ; শান্তি, ২৯।৬১ ) শ্লোক রামচন্দ্রের রাজত্বকালসূচক। ১১ হাজার বর্ষ অর্থাৎ তৎপরিমাণ দিনে প্রায় লৌকিক ৩০ বৎসর হয় এবং উহা রামের রাজত্বকাল ; জীবনকাল নহে। কারণ, সর্ব্বত্রই "রাজ্যমুপাসিত্বা" ইত্যাকার শব্দগ্রহণ দেখা যায়। জীবনকাল বর্ণনা স্থলের উদাহরণ দশরথ সম্বন্ধে দৃষ্ট হয়, যথা—"ষষ্টির্বর্ষসহস্রাণি জাতস্য মম কৌশিক।" ইত্যাদি। অতএব রামচন্দ্রের জীবনকালের ৭১ বা ৭২ বৎসর পর্য্যন্ত আমরা নিম্নোক্ত উপায়ে পাইতে পারি। ১৫ বৎসর বয়সে রামচন্দ্র সীতার পাণিগ্রহণ করেন (২)। বিবাহের পর উভয়ে দ্বাদশবর্ষ অযোধ্যায় অতিবাহিত করেন (১)। এই ২৭ বৎসর পরে ১৪ বৎসর বনবাস হয় এবং তদন্তে ( ২৭+১৪ = ৪১ ) উভয়ে অযোধ্যায় আইসেন। তখন রামের বয়স ৪১ বা ৪২ বৎসর (২)। তৎপরে প্রায় ৩০ বৎসর রাজত্ব করেন। সুতরাং ৪১+৩০ = ৭১ বা ৭২ বৎসরের সংবাদ পাওয়া গেল। বোধ হয়, এ অনুমান করা যাইতে পারে যে, ইহার অব্যবহিত পরেই সরযূপ্রবেশ ঘটিয়াছিল এবং তখন রামচন্দ্রের বয়স ৭১ বা ৭২ বৎসর। এই হিসাবে সীতার ৬ বৎসর বয়সে বিবাহ হয়। এ স্থলে দ্বাদশ বর্ষ, চতুর্দ্দশ বর্ষ ইত্যাদি কালপরিমাণ দ্বারা ১২শ ও ১৪শ দিন গণনা করা যে অতীব অসঙ্গত, তাহা রামায়ণের তত্তৎকালের বর্ণনা-পাঠকারীর নিকট যে প্রকার অসমঞ্জস বলিয়া বিবেচিত হইবে, অপরের নিকটেও প্রায় তদ্রূপই প্রতিভাত হইবে। পূর্ব্বে চান্দ্র, সৌর, সাবন, নাক্ষত্র, সংবৎসর, পরিবৎসর, অনুবৎসর, ইদাবৎসর, উদাবৎসর প্রভৃতি অনেক বর্ষ বর্ত্তমান ছিল ; ১০।১৫ দিনেও এক একটি প্রভবাদি বর্ষ শেষ হইত ; কিন্তু ঐরূপ ক্ষুদ্র বৎসর ধরিলেও সমস্ত পুরাণের উপাখ্যান-সমূহের সঙ্গতি রক্ষা হয় না। বিশেষতঃ এই প্রকার বিশেষ বর্ষগণনা সাধারণ গণনায় গ্রহণ করা সঙ্গতও নহে।

পদ্মপুরাণান্তর্গত পাতালখণ্ডের ৩১ অধ্যায় ১৭৪ শ্লোক হইতে সীতার নিকট শুকমিথুনের উক্তিতে রামায়ণের ভবিষ্যত্তা-কথন আছে। আরও বিবৃত আছে—সীতা যখন যুবতী, তখন রামের কথা দূরে থাকুক, দশরথেরও জন্ম হয় নাই। দশরথের ষাটি হাজার বৎসর বয়সে রামের জন্ম হয়। তাহা হইলে বিবাহের সময় সীতার বয়স কত হইয়াছিল ?

---

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক ডাক্তার বলিয়াছিলেন যে, যোগিবরের সমাধি-কালে জীবনীশক্তি স্তম্ভিত ছিল, তাই তিনি হয় ত অত দিন বাঁচিয়াছিলেন। জীবনীশক্তি যে এইরূপ শুষ্ক হইয়া বহুকাল থাকিতে পারে, তাৎকালিক শারীরবিজ্ঞান তাহা স্বীকার করিতেন না। কাযেই হূকৈলাসের যোগিবর কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ডাক্তারদিগের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিলেন।"

—দৈনিক বসুমতী, ১৩৩১, ২রা জ্যৈষ্ঠ।

(১) "আদিত্যো বা সর্ব্ব ঋতবঃ, স যদৈবোদেতি অথ বসন্তো, যদা সঙ্গবোঽথ গ্রীষ্মো, যদা মধ্যন্দিনোঽথ বর্ষা, যদাঽপরাহ্ণোঽথ শরৎ, যদাঽস্তমেতি অথ হেমন্তশিশিরৌ।" ইতি ব্রাহ্মণম্। অত্র খলু সর্ব্বান্ ঋতূন্ অহনি সম্পাদয়তি ; সর্ব্বে চ ঋতবঃ সংবৎসরঃ। তস্মাদহঃ সংবৎসরশব্দেনোচ্যতে।—ইতি পূর্ব্বমীমাংসাভাষ্যে শবরস্বামী।

(২) রাক্ষসগণের উৎপাত হইতে যজ্ঞরক্ষার্থ বিশ্বামিত্র যখন রামকে লইবার জন্য দশরথের নিকট আসিয়াছিলেন, তখন রামের বয়স ১৫ বৎসর। ঐ সময়েই রামচন্দ্র সীতার পাণিগ্রহণ করেন। দশরথ বিশ্বামিত্রকে বলিয়াছিলেন,—

ঊনষোড়শবর্ষো মে রামো রাজীবলোচনঃ।
ন যুদ্ধযোগ্যতামস্য পশ্যামি সহ রাক্ষসৈঃ॥ বাল, ২০।২।

(১) পরিব্রাজকরূপী রাবণ সীতাকে হরণ করিবার সময় পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সীতা বলিয়াছিলেন,—আমি বিবাহের পর ১২ বৎসর শ্বশুর-গৃহে ছিলাম।

উষিত্বা দ্বাদশ সমা ইক্ষ্বাকূণাং নিবেশনে। আরণ্য, ৪৭।৪।

(২) ঈশ্বরস্য ধনুর্ভগ্নং জনকস্য গৃহে স্থিতম্।
রামঃ পঞ্চদশে বর্ষে ষড়্‌বর্ষামথ মৈথিলীম্॥ ১৫।
ততো দ্বাদশবর্ষাণি রেমে রামস্তয়া সহ।
সপ্তবিংশতিমে বর্ষে যৌবরাজ্যমকল্পয়ৎ॥ ১৭।
দ্বিচত্বারিংশবর্ষে তু রামো রাজ্যমকারয়ৎ।
সীতায়াশ্চ ত্রয়স্ত্রিংশদ্ বৎসরাণি তদাভবন্॥ ৭৭।

পদ্মপুরাণ, পাতালখণ্ড, ২১ অধ্যায় এবং
স্কন্দপুরাণ, ধর্ম্মারণ্যখণ্ড, ৩০ অধ্যায়।

"পালয়ামাস চৈবেমাঃ পিতৃবন্মুদিতাঃ প্রজাঃ। অযোধ্যাধিপতিঃ শ্রীমান্ রামো দশরথাত্মজঃ॥" (রামায়ণ, বালকাণ্ড, ১মসর্গ, ৯০ শ্লোক।) এই শ্লোকের টীকায় রামানুজ লিখিয়াছেন—"অনেন রাবণবধানন্তরং রামে রাজ্যং প্রশাসতি বাল্মীকের্নারদং প্রতি প্রশ্ন ইতি জ্ঞায়তে॥" ইহারই বা সামঞ্জস্য কি? মহাকবি কালিদাসও লিখিয়াছেন—"পৃথিবীং শাসতস্তস্য পাকশাসনতেজসঃ। কিঞ্চিদূনমনূনর্দ্ধেঃ শরদামযুতং যযৌ॥" (রঘুবংশ, ১০ সর্গ, ১ শ্লোক।) কিঞ্চিদূন দশ সহস্র বৎসর রাজত্ব করিলেন। মহাকবিই বা এরূপ অসম্ভব কালপরিমাণ লিখিলেন কেন?

পৌরাণিক কালমানের সমাধানযোগ্য অপর কোনও প্রমাণ আমরা পাই নাই। তবে মনুষ্যের আয়ুষ্কাল সম্বন্ধে যেটুকু জানিতে পারিয়াছি, তাহা ইহার পরিপোষক নহে। বিরোধপ্রদর্শনকল্পে তাহার সামান্য উল্লেখ করিতে চাই। প্রথমতঃ বেদের কথা,—তাহা সকলের জানাও আছে এবং আমরাও পূর্ব্বে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিয়াছি। এতদ্ভিন্ন "শতায়ুর্বৈ পুরুষঃ", "পশ্যেম শরদঃ শতম্", "জীবেম শরদঃ শতম্", এবং "ধান্যং ধনং বহুপুত্রলাভং শতসংবৎসরং দীর্ঘমায়ুঃ" (শ্রীসূক্ত) ইত্যাদি বৈদিক প্রয়োগ দেখা যায়। বিবাহের লাজহোমে নারী বলিতেছে—"দীর্ঘায়ুরস্তু মে পতিঃ শতং বর্ষাণি জীবতু" ইত্যাদি (গোভিল গৃহ্য, ২য় প্রপাঠক, ২য় খণ্ড, ৫—১০ সূত্র)। উপনিষদেও "জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ" আছে (ঈশোপনিষৎ)। কঠোপনিষদে যমরাজ নচিকেতাকে দীর্ঘায়ুঃ প্রভৃতির প্রলোভনে মুগ্ধ করিবার জন্য বলিয়াছেন—"শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ্ব।" তন্ত্রেও শতায়ুর কথা পাওয়া যায় (১)। স্কন্দপুরাণে ৬০ বৎসর আয়ুর কথাও দেখিতে পাই (২)। আয়ুষ্কালনির্ণয় সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদের প্রামাণ্য। আয়ুর্ব্বেদে রসায়নের গুণকীর্ত্তনপ্রসঙ্গে প্রায় সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায় যে, অমুক রসায়ন সেবনে মানব শতায়ুঃ হয়। কাযেই আয়ুর্ব্বেদমতেও আয়ুঃ শত বর্ষ (১)। যাহার শরীরস্থ পঞ্চবিধ বায়ু অব্যাহতগতি, স্বস্থানস্থিত ও প্রকৃতিস্থ থাকে, সে ব্যক্তি নীরোগ হইয়া এক শত কুড়ি বৎসর পাঁচ দিন অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত সমস্ত আয়ুষ্কাল পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে (২)। এই কলিকালে মানবের আয়ুর পরিমাণ এক শত বৎসর (৩)। এক শত বৎসর পরে এক বৎসর করিয়া আয়ুঃ কমিয়া যাইতেছে (৪)। ৭৭ বৎসরের সপ্তম মাসের সপ্তমী রাত্রির নাম "ভীমরথী"; এই রাত্রি মনুষ্যদিগের দুরতিক্রমণীয়। যে সকল ব্যক্তি এই বয়স অতিক্রম করিয়া জীবিত থাকে, তাহারা অতিশয় পুণ্যাত্মা (৫)।

প্রাচীন জ্যোতিষ গ্রন্থেও দেখা যায় যে, মানুষের আয়ুষ্কাল ১ শত ২০ বৎসর ৫ রাত্রি (৬)। সামুদ্রিক শাস্ত্রও উহারই সমর্থন করে। যাহা হউক, আয়ুর্ব্বেদ ও জ্যোতিষের আয়ুষ্কালে মারাত্মক অসামঞ্জস্য নাই।

মনুসংহিতায় কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। মনুর মতে সত্যযুগে মানুষের আয়ুষ্কাল ৪ শত বৎসর এবং তাহার পরে শত বর্ষ করিয়া কমিয়া কলিতে মাত্র ১ শত বৎসর (৭)। কিন্তু এই শ্লোকের টীকায় কুল্লুকভট্ট বলিয়াছেন, চতুর্ব্বর্ষশতায়ুঃ স্বাভাবিক। অধিক আয়ুঃপ্রাপক ধর্ম্ম তাঁহাদের ছিল, কাযেই এতদপেক্ষা অধিক আয়ুঃ সম্ভব; এবং এই যুক্তিতেই রামের ১১ হাজার বৎসর রাজত্ব করা অনৈসর্গিক নহে

---

(১) শতং জীবিতমর্ত্ত্যাস্ত নিদ্রা স্যাদর্দ্ধহারিণী।
বাল্যরোগজরাদুঃখৈরর্দ্ধং তদপি নিষ্ফলম্॥
কুলার্ণবতন্ত্র ও শাক্তানন্দতরঙ্গিণী, ১ম উল্লাস।

(২) কিং ন পশ্যসি মাতস্ত্বং সহস্রস্যাপি মধ্যতঃ।
জনাঃ শতায়ুষঃ পঞ্চ ভবন্তি ন ভবন্তি বা॥ ১০৮।
অশীতিকা বিপদ্যন্তে কেচিৎ সপ্ততিকা নরাঃ।
পরমায়ুঃ স্থিতা ষষ্টিস্তদপ্যস্তি ন নিশ্চিতম্॥ ১০৯॥
কুমারিকাখণ্ড, ৪২ অঃ।

(১) বাল্যং বৃদ্ধির্ব্বপুর্মেধা ত্বক্ দৃষ্টিঃ শুক্রবিক্রমৌ।
বুদ্ধিঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়ঞ্চেতো জীবিতং দশতো হ্রসেৎ॥

(২) অব্যাহতগতির্যস্য স্থানস্থঃ প্রকৃতিস্থিতঃ।
বায়ুঃ স্যাৎ সোঽধিকং জীবেদ্ বীতরোগঃ সমাঃ শতম্॥ ৪৯
বাতব্যাধিনিদান।

(৩) "বর্ষশতং খল্বায়ুষঃ প্রমাণমস্মিন্ কালে।"
চরক-সংহিতা, বিমানস্থান, ৮।১৪৩

(৪) সংবৎসরশতে পূর্ণে যাতি সংবৎসরঃ ক্ষয়ম্।
দেহিনামায়ুষঃ কালে যত্র যন্মানমিষ্যতে॥ বিমানস্থান, ৩।৩১

(৫) সপ্তসপ্ততিবর্ষাণাং সপ্তমে মাসি সপ্তমী।
রাত্রির্ভীমরথী নাম নরাণামতিদুস্তরা।
তামতীতা নরো যোঽসৌ দিনানি যানি জীবতি।
ক্রতুভিস্তানি তুল্যানি স্বর্ণশতদক্ষিণৈঃ॥

যদাহ বরাহঃ আয়ুর্নিরূপণে—

(৬) (ক) সমাঃ ষষ্টির্দ্বিঘ্না মনুজকরিণাং পঞ্চ চ নিশাঃ।

(খ) শতং বর্ষাণি বিংশত্যা নিশাভিঃ পঞ্চভিঃ সহ।
পরমায়ুরিদং প্রোক্তং নরাণাং করিণামিহ॥

(গ) পঞ্চাহা নখ-ভূ-সমা নৃকরিণাম্।

(৭) অরোগাঃ সর্ব্বসিদ্ধার্থাশ্চতুর্ব্বর্ষশতায়ুষঃ।
কৃতে ত্রেতাদিষু হ্যেষামায়ুর্হ্রসতি পাদশঃ॥ ১।৮৩।

"শতায়ুর্বৈ পুরুষঃ" এই শ্রুতিবাক্যের সহিত ইহার বিরোধ নাই। কারণ, এই শ্রুতিতে শত শব্দ বহুত্বপর বা কলিপর। কাযেই কলির পূর্ব্বে শতাধিক বয়স সম্ভব, ইহাই যেন ধ্বনি (১)। আবার মনুর ৩য় অধ্যায়, ৪০ শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহারা রূপবান্, ধনবান্, সদ্‌গুণবিশিষ্ট, যশস্বী, ভোগসম্পন্ন ও ধার্ম্মিক হয় এবং শত বর্ষজীবিত থাকে (২)। মনুর সময়েও যে যক্ষ্মা, অপস্মার, শ্বিত্র, কুষ্ঠ প্রভৃতি মহাব্যাধি ছিল, তাহা তৃতীয় অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোক পাঠ করিলেই জানা যায়। ঐ সময়ে যে অকালমৃত্যু ছিল, দুই বৎসরের বালকও মরিত, তাহা ৫ম অধ্যায়ের ৬৭।৬৮ শ্লোকে উল্লেখ আছে। সত্যযুগের রাজা বেণের পাপাচরণের কথা সকলেই জানেন।

ঋষিরা ভৃগুকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণরা সকলেই ত আপন আপন ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন, তবে তাঁহারা চারি শত বৎসর পরমায়ুঃ ভোগ করিতে পারেন না কেন? কি নিমিত্ত তাঁহাদের অকালমৃত্যু ঘটিতেছে? এই কথার উত্তরে ভৃগু বলিলেন—বেদাভ্যাস না করায়, সদাচার ত্যাগ করায়, অলস হওয়ায় এবং অখাদ্য অন্ন ভোজন করায় ব্রাহ্মণগণ অকালমৃত্যু কর্ত্তৃক হিংসিত হইয়া থাকেন (৩)। কুল্লূকভট্ট বর্ষ শব্দ দিনপর ধরিতে চাহেন না, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। তবে কলির পূর্ব্বে ৪ শত বৎসর আয়ুষ্কালের কথা মানিয়া লইতে আপত্তির কোনও কারণ নাই; কেন না, উহা অসম্ভব বা কল্পনাতীত নয় বলিয়াই বিশ্বাস হয়। মনুসংহিতা ভিন্ন মহাভারত (১), স্কন্দ পুরাণ (২), বৈদ্যক (৩) প্রভৃতিতেও উহার পরিপোষক প্রমাণ পাওয়া যায়।

বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক মতে আয়ুষ্কাল সম্বন্ধে যে ধারণা, তাহা "Encyclopœdia Britannica" নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে longevity (দীর্ঘায়ুঃ) শব্দে দেখিতে পাই যে,—

"An increasing number of persons have chance of reaching and do reach ages between 90 & 100. Careful investigation has thrown doubt, almost amounting to disprove, on the much quoted cases of great longevity. T. Parto, the Shropshire peasant, is supposed to have reached his hundred & fiftythird year (153) and although the existence of Centenarians is thoroughly established any ages exceeding 100 (hundred) by more than two or three, are almost dubious. (11th Edition, pages 975-77).

অর্থাৎ অনেক লোকেরই ৯০ হইতে ১ শত বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিবার সম্ভাবনা দেখা যায় এবং বস্তুতঃ তাহা হইয়াও থাকে। দীর্ঘ-জীবন সম্বন্ধে যে সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ আমরা পাই, সূক্ষ্ম গবেষণা দ্বারা সেগুলি প্রায় ভ্রান্ত বলিয়াই প্রতিপন্ন হইয়াছে। স্রপ্‌শায়ারবাসী টি পার্টো নামক জনৈক কৃষক ১ শত ৫৩ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। অবশ্য শতবর্ষজীবীদিগের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হইয়া গিয়াছে বটে; কিন্তু এক শত বৎসর অপেক্ষা মাত্র দুই বা তিন বৎসরের অধিককাল বাঁচিয়া থাকিবার কথা সন্দেহজনক বলিয়াই মনে হয়।

ইহাই আমাদের প্রশ্ন ও জ্ঞাতব্য বিষয়। পুস্তকের অভাবে আশানুরূপ অনুসন্ধান করিতে পারি নাই। বিচারের ক্ষমতা নাই, সুতরাং মীমাংসার যেটুকু উপকরণ পাইয়াছি, তদ্দ্বারা সমাধান করিতে পারি নাই। আলোচনায় মীমাংসা হইবে, আশা করি। তত্ত্বনির্ণয়ই উদ্দেশ্য, পুরাণের প্রতি অভক্তি উৎপাদন উদ্দেশ্য নহে। বিশেষজ্ঞগণের নিকট আলোচিত বিষয়ের সুমীমাংসা প্রার্থনা করি। "সত্যং ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি।" (ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৭।১৬।১)

পরিশেষে ঋগ্বেদের ভাষায় বলিতেছি—আমি তত্ত্ব জানি না। যাঁহারা জানেন, তাঁহাদিগকে তত্ত্ব জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছি। জানিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি না, না জানিয়াই জিজ্ঞাসা করিতেছি।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র ঘোষাল।

---

(ক) রোগনিমিত্তাধর্ম্মাভাবাদরোগাঃ। সর্ব্বার্দ্ধিকাম্যফলাপ্রতিবন্ধকাধর্ম্মাভাবাচ্চতুর্ব্বর্ষশতায়ুষ্ট্বঞ্চ স্বাভাবিকম্। অধিকায়ুঃপ্রাপক ধর্ম্মবশাদধিকায়ুষোঽপি ভবন্তি। তেন "দশ বর্ষসহস্রাণি রামো রাজ্যমকারয়ৎ" ইত্যাদ্যবিরোধঃ। "শতায়ুর্বৈ পুরুষঃ" ইত্যাদিশ্রুতৌ তু শতশব্দো বহুত্বপরঃ কলিপরো বা। এবংরূপা মনুষ্যাঃ কৃতে ভবন্তি, ত্রেতাদিষু পুনঃ পাদং পাদমায়ুরল্পং ভবতি ইতি। "নির্বণ্ট" গ্রন্থেও শত শব্দ বহুত্ববাচক বলা হইয়াছে।৩।১।

(১) রূপসত্ত্বগুণোপেতা ধনবন্তো যশস্বিনঃ।
পর্য্যাপ্তভোগা ধর্ম্মিষ্ঠা জীবন্তি চ শতং সমাঃ॥

(২) অনভ্যাসেন বেদানামাচারস্য চ বর্জ্জনাৎ।
আলস্যাদন্নদোষাচ্চ মৃত্যুর্ব্বিপ্রান্ জিঘাংসতি॥ মনু, ৫।৪।

(৩) যমরাজ সাবিত্রীকে বর দিলেন,—সত্যবান্ তোমার সহিত ৪ শত বৎসর পরমায়ুঃ লাভ করিবেন।
চতুর্ব্বর্ষশতায়ুশ্চ ত্বয়া সার্দ্ধমবাপ্স্যতি। বন, ২৯৬।৫৭।

(ক) অরোগাঃ সর্ব্বসিদ্ধার্থাশ্চতুর্ব্বর্ষশতায়ুষঃ।
কৃতে ত্রেতাযুগে ত্বেষাং পাদশো হ্রসতে বয়ঃ॥ শান্তি, ২৩১।২৫।

(খ) চত্বারি ত্রীণি চ দ্বে চ তথৈকৈকং শরচ্ছতম্।
জীবন্ত্যত্র নরা দেবি! কৃতত্রেতাদিষু ক্রমাৎ॥ প্রভাসখণ্ড, ১১।১০।

(গ) পুরুষাঃ সর্ব্বসিদ্ধাশ্চ চতুর্ব্বর্ষশতায়ুষঃ।
কৃতে ত্রেতাদিকেঽপ্যেবং পাদশো হ্রসতি ক্রমাৎ॥ বৈদ্যক।

## ভারত ও প্রাচীন প্রতীচ্য গ্রন্থ

স্মরণাতীত কাল হইতে বাণিজ্য উপলক্ষে ভারতের সহিত পাশ্চাত্য দেশের সংস্রব স্থাপিত হইয়াছে। প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র ভারতের ধনৈশ্বর্য্যের বার্ত্তা পাইয়া অনেক দিগ্বিজয়ী পাশ্চাত্য নরপতি এখানে রাজত্ববিস্তারে মনোযোগী হইয়াছিলেন। সহস্রাধিক বৎসর ধরিয়া প্রাচীন ভারত ও প্রতীচ্যদেশের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল। এই সংস্রবাধিক্য নিবন্ধন অনেক প্রতীচ্য পণ্ডিত স্ব স্ব গ্রন্থে ভারতবর্ষের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

খৃঃ পূঃ নবম শতাব্দীতে গ্রীকদিগের আদিকবি হোমার 'অডীসি' নামক যে মহাকাব্য রচনা করেন, তাহাতে দুইটি ইথিওপিয়ান জাতির বর্ণনা করিয়াছেন; একটি পশ্চিমদেশীয় অর্থাৎ আফ্রিকানিবাসী, অপরটি পূর্ব্বদেশীয় অর্থাৎ দক্ষিণ-ভারতের দ্রাবিড় দেশের কৃষ্ণবর্ণ অধিবাসী।

খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে পারস্ত-সম্রাট দরায়ুস ভারতভূমিতে স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করিবার অভিপ্রায়ে বাহ্লীক দেশ হইতে কান্দাহারে উপস্থিত হয়েন। তিনি স্বীয় কর্ম্মচারী স্কাইলাক্স নামক এক জন গ্রীককে সিন্ধুনদ বাহিয়া সমুদ্রপথে পারস্তে যাইবার পথ আবিষ্কার করিবার জন্ত নিযুক্ত করেন। স্কাইলাক্স সিন্ধুনদ দিয়া আরবসাগরে উপনীত হয়েন এবং নানা বিঘ্ন-বিপত্তি সহ্য করিয়া ৩০ মাস পরে লোহিতসাগর অতিক্রম করিয়া সুয়েজে উপস্থিত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অতিক্রান্ত উপকূলের আকৃতি-প্রকৃতির বিবরণসহ তিনি ভারতবর্ষের একখানি ভূবৃত্তান্ত প্রণয়ন করেন। ঐ পুস্তক এক্ষণে বিলুপ্তপ্রায়।

মিলিটাস নগরনিবাসী প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক হেক্‌টেয়াস্ খৃঃ পূঃ পঞ্চম কি ষষ্ঠ শতাব্দীতে একখানি ভূবৃত্তান্ত প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ঐ গ্রন্থের অধিকাংশই বিলুপ্ত হইয়াছে, যৎসামান্ত যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহাতে নিম্নলিখিত সাতটি ভারতীয় নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়;—

(১) ইণ্ডাস ( The Indus ), (২) ইণ্ডিয়া ( India ), (৩) কাসপাপিরাস ( The City of Kaspapyrus ), (৪) গান্ধারের দেশ ( The Country of the Gandarie ), (৫) ওপিয়ে ও কালিয়েটিক ( The Opiae and Kalliactie ), (৬) স্কিয়াপডী ( The Skiapades ), (৭) আরগাণ্টি ( The City of Argante ).

সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক ঐতিহাসিক হিরোডটাস ( Herodotus ) খৃঃ পূঃ ৪৮৪ অব্দে হালিকার্ণাসাস ( Halikarnassus ) নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভারতের যে বিবরণ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে লিখিত আছে, পৃথিবীর পূর্ব্বদিকে যত জাতির বাস আছে, তাহাদিগের মধ্যে ভারতবাসিগণ সর্ব্বশেষ জাতি, পঞ্জাবের পর রাজপুতানার মরুস্থলী পৃথিবীর শেষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত; ভারতে নানা ভাষাভাষী লোকরা বাস করে। তিনি ভারতীয়গণকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন; এক শ্রেণীর লোকরা কৃষ্ণবর্ণ, অসভ্য ও যাযাবর, অপর শ্রেণীর লোকরা উত্তর-ভারতীয় কস্তপপুর ও পাখতু ( Pakhtu ) নিবাসী সুসভ্য আর্য্যগণের বংশোদ্ভূত। ইহা ভিন্ন তিনি ভারতের সুদূর দক্ষিণাংশনিবাসী ইথিওপিয়ানদিগের অনুরূপ এক জাতির উল্লেখ করিয়াছেন। ইহারা বোধ হয়, দ্রাবিড়দেশীয় লোক। ভারতের অসভ্য জাতিদিগের সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, সিন্ধুনদের জলাভূমিতে যে সকল আদিম জাতি বাস করে, তাহারা আমমাংস ভক্ষণ, তৃণাদি পরিধান এবং নদীতীরস্থ বংশজাতীয় বৃক্ষবিশেষে নৌকা নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। ইহার অদূরবর্ত্তী আর এক অসভ্য জাতি পীড়িত আত্মীয়গণকে নিধন করিয়া তাহাদিগের মাংসভক্ষণে অভ্যস্ত।

হিরোডটাসের বিবরণীতে ভারতের এক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের কথা লিখিত আছে। ঐ সম্প্রদায়ের লোকরা আদৌ জীব-হিংসা করে না, শস্ত খাইয়া জীবনধারণ করে এবং গৃহাদি নির্ম্মাণ ও দারপরিগ্রহ করিয়া গৃহী হইতে ইচ্ছুক নহে। বৌদ্ধধর্ম্মসম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া ইহা যে লিখিত হইয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। গৌতম বুদ্ধ খৃঃ পূঃ ৪৮৮ অব্দে হিরোডটাসের জন্মের চারি বৎসর পূর্ব্বে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। ঐ পুস্তকে ভারতের পূর্ব্বসীমান্থ দরদ ( Dardistan ) নামক দেশের এক প্রকার পিপীলিকার বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ পিপীলিকাগুলি আকৃতিতে কুক্কুর অপেক্ষা ক্ষুদ্র, কিন্তু উঁকামুখী অপেক্ষা বৃহৎ এবং তাহারা শিকার করিয়া জীবনধারণ করে। বাসস্থান নির্ম্মাণ করিবার সময় উহারা যে মৃত্তিকা উত্তোলন করে, তাহাতে স্বর্ণ মিশ্রিত থাকে। পাছে কেহ ঐ মৃত্তিকা অপহরণ করে, এই জন্ত তাহারা বিশেষ সতর্ক হয়, কিন্তু মধ্যাহ্নকালে তাহারা গর্ত্তমধ্যে নিদ্রিত হইলে লোক দ্রুতগামী উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া ঐ স্বর্ণমিশ্রিত মৃত্তিকা বহন করিয়া লইয়া যায়। পিপীলিকা জানিতে পারিলে পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া অপহরণকারীর প্রাণসংহার করে।

সিন্ধুদেশের প্রচণ্ড শীত-গ্রীষ্ম, ঘোটকাদি নানাবিধ পশু, বিভিন্ন আকৃতি-প্রকৃতির পক্ষী এবং সিন্ধুনদের কুম্ভীরের বিবরণ তাঁহার গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

হিরোডটাসের পূর্ব্বে খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে পারস্তসম্রাট আর্টজরাক্‌সিসের কর্ম্মচারী এসিয়া-মাইনরের অন্তর্গত ক্নীডস্‌নিবাসী কিটসিয়াস ( Ktesias ) ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। ঐ পুস্তক বিলুপ্ত হইয়াছে। তবে হিরোডটাস প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ তাঁহার লিখিত বিবরণ হইতে যে সংক্ষিপ্ত সার সঙ্কলন করিয়াছিলেন, তাহাই এক্ষণে বর্ত্তমান আছে।

খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সেলিউকস্ নিকেটস্ মেগাস্থিনীসকে মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের সভায় গ্রীক রাজদূতরূপে প্রেরণ করেন। মেগাস্থিনীস একখানি উৎকৃষ্ট ভারত-বিবরণ লিখিয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, উহা এক্ষণে বিলুপ্তপ্রায়। ষ্ট্রাবো, প্লিনি, আরিয়ান, ডায়ডোরাস এবং ফোসিয়াস্ প্রভৃতি বিখ্যাত পণ্ডিতগণ ঐ পুস্তক হইতে যে যে অংশ স্ব স্ব গ্রন্থমধ্যে উদ্ধার করিয়াছেন, কেবল সেইগুলিই এক্ষণে বর্ত্তমান আছে। ঐ সকল গ্রন্থকারের গ্রন্থ হইতে পাশ্চাত্য

দেশের লোকরা ভারতের প্রাকৃতিক শোভা-সম্পত্তি, ধনৈশ্বর্য্য এবং অধিবাসিগণের বিদ্যাবুদ্ধি, ন্যায়নিষ্ঠা, ধর্ম্মপ্রবণতার বিষয় অনেক পরিমাণে অবগত হইতে পারিয়াছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে বিক্ষিপ্ত মেগাস্থিনীসের বিবরণ বর্ত্তমানে যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইতে মৌর্য্যবংশীয় সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সময়ে ভারতের অবস্থার বিষয় যাহা অবগত হওয়া গিয়াছে, তাহা সংক্ষেপে এ স্থলে লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে।

ভারতের সীমান্তপ্রদেশস্থ পুষ্কলাবতী হইতে তক্ষশিলা পর্য্যন্ত রাজপথের দীর্ঘতা ৬০ মাইল, বিতস্তা পর্য্যন্ত বিস্তৃত রাজপথ ১ শত ২০ মাইল এবং বিপাসা পর্য্যন্ত বিস্তৃত পথ ৩ শত ৯০ মাইল। বিপাসা হইতে হিসিড্রাস ( Hisidrus ), হিসিড্রাস হইতে যমুনা, যমুনা হইতে গঙ্গা এবং গঙ্গা হইতে রাধাপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত পথ দৈর্ঘ্যে যথাক্রমে ১ শত ৬৮, ১ শত ৭৩, ১ শত ১২ ও ১ শত ১৯ মাইল। রাজপথের প্রত্যেক মাইল অন্তে দূরতাবোধক এক একখানি প্রস্তর-ফলক ছিল। তক্ষশিলা, কনৌজ, হস্তিনাপুর, প্রয়াগ প্রভৃতি প্রধান প্রধান নগরগুলি রাজধানী পাটলিপুত্রের সহিত প্রশস্ত রাজপথের দ্বারা সংযুক্ত হওয়ায়, কি বাণিজ্যব্যাপার, কি দূরদেশে সৈন্য ও যুদ্ধোপকরণ প্রেরণ, কি বিভিন্ন স্থানে সংবাদাদির আদান-প্রদান সকল বিষয়ে বিশেষ সুবিধা ছিল। রাজপথের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রাজকীয় কর্ম্মচারী সকল নিযুক্ত থাকিত।

গমনাগমনের সুবিধা নিবন্ধন এবং চৌর্য্য-প্রতারণার অসদ্ভাব হেতু বাণিজ্যের বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। সিরি ( Seres ) হইতে রেশম, গাঙ্গেয় প্রদেশ হইতে সূক্ষ্ম কার্পাস-বস্ত্র, আরব দেশ হইতে মসলা এবং সুবর্ণভূমি হইতে নানাবিধ বহুমূল্য পণ্য আনিয়া পাটলিপুত্রের পণ্য-বীথিকা পরিপূর্ণ হইত। গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্ত্তী স্থানে বৎসরে দুইবার শস্য উৎপন্ন হইত।

মগধ সাম্রাজ্যের রাজধানী পাটলিপুত্র নগর গঙ্গা ও শোণ নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। উহা সমান্তরাল ক্ষেত্রের ন্যায় আকারবিশিষ্ট এবং চতুঃষষ্টিদ্বার ও পঞ্চশত সপ্ততিসংখ্যক দুর্গ-সমন্বিত সুদৃঢ় প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। এই নগরের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথাক্রমে অশীতি ও পঞ্চবিংশতি ষ্টাডিয়ম। * নগরের দুই দিক্ নদী দ্বারা ও অন্য দুই দিক্ প্রশস্ত পরিখা দ্বারা সুরক্ষিত। ইহা পৃথিবীর তাবৎ নগর অপেক্ষা সুদৃঢ় হইলেও কাষ্ঠ ও অদগ্ধ ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহে সমাচ্ছন্ন ছিল।

মগধরাজ চন্দ্রগুপ্ত বিদেশীয়া রক্ষিণী কর্ত্তৃক পরিবৃত থাকিতেন। ঐ রক্ষিণীরাই তাঁহার পাচিকা ও তাম্বূলপাত্রপ্রবাহিকা ছিল। সন্ধ্যাকালে তিনি শ্রান্ত-ক্লান্ত হইলে তাহারাই তাঁহাকে গৃহে বহন করিয়া আনিত এবং সঙ্গীতালাপে নিদ্রোৎপাদন করিয়া তাঁহার শ্রমাপনোদন করিত। ঘাতুক হইতে রক্ষা পাইবার উদ্দেশ্যে রাজা রাত্রির মধ্যে বহুবার শয্যা পরিবর্ত্তন করিতেন। পূজোপলক্ষে বা মৃগয়ার্থ রাজা বহির্গত হইলে ঐ রক্ষিণীরা তাঁহার রথের চতুষ্পার্শ্ব বেষ্টন করিয়া অশ্ব বা গজারোহণে অগ্রসর হইত, অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত দুই জন রক্ষিণী তাঁহার রথেও আরোহণ করিত, পথের দুই ধার রজ্জু দ্বারা সীমাবদ্ধ করা হইত এবং ভল্লধারিগণ শোভাযাত্রার চতুর্দ্দিক্ রক্ষা কবিবার জন্য বিশেষভাবে নিযুক্ত থাকিত।

দার্শনিক, কৃষক, পশুপালক, শিল্পী, সামরিক, পর্য্যবেক্ষক এবং রাজকীয় মন্ত্রণাদাতা এই সপ্ত শ্রেণীর লোক ভারতে বাস করে। রাজধানীর দূরস্থিত পল্লীসমূহের শাসনভার এক দল রাজকীয় কর্ম্মচারীর উপর ন্যস্ত থাকিত। উঁহারা রাজস্ব-সংগ্রাহকও ছিলেন। পয়ঃপ্রণালীর নির্ম্মাণ ও সংস্কার, ভূমির পরিমাণ নির্ণয় ও রাজস্ব নির্দ্ধারণ, রাজপথের সংস্কার ও উহাতে দূরত্বজ্ঞাপক চিহ্ন সংস্থাপন, নূতন সেতু নির্ম্মাণ ও পুরাতনের সংস্কার, মৃগয়াকারী ও বনকর্ত্তকদিগের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ এবং খনিসমূহের তত্ত্বাবধান উঁহাদিগের কর্ত্তব্যমধ্যে পরিগণিত হইত।

রাজধানী পাটলিপুত্রে ছয়টি পঞ্চায়েৎ সভা ছিল। পাঁচ জন কর্ম্মচারী লইয়া এক একটি পঞ্চায়েৎ সভা গঠিত হইত। ভিন্ন ভিন্ন পঞ্চায়েৎ সভা ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য সম্পাদন করিত। প্রথম, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ পঞ্চায়েৎ সভা শিল্পাদির উন্নতির বিষয়ে লক্ষ্য রাখিত। পথিক, বণিক্, রাজদূত এবং বিদেশীয়গণের সুখ-সুবিধার তত্ত্বাবধান করা দ্বিতীয় পঞ্চায়েৎ সভার কার্য্য ছিল। বিদেশীয় ব্যক্তি পীড়িত হইলে তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থাকরণ, গতায়ু বিদেশীয়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদনের উপায়বিধান ও মৃতের আত্মীয়-স্বজনের নিকট সংবাদ প্রেরণ উক্ত সমিতির অন্যতম কর্ত্তব্যমধ্যে গণ্য হইত। লোকসংখ্যা-গণনা এবং জন্ম-মৃত্যুর তালিকা প্রস্তুত করিবার ভার তৃতীয় পঞ্চায়েৎ সভার উপর ন্যস্ত ছিল।

অপরাধের জন্য মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত অতি গুরু দণ্ড প্রদান করিতেন। এই জন্য তিনি লোকপ্রিয় ছিলেন না। সামান্য অপরাধেও লোকের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইত। দাসত্ব-প্রথা ভারতে প্রচলিত ছিল না। হিন্দুরা মিতব্যয়ী, সংযমী ও নীতিপরায়ণ ছিলেন এবং সুখে-স্বচ্ছন্দে জীবন অতিবাহিত করিতেন। তাঁহাদিগের মধ্যে মদ্যপান প্রচলিত ছিল না, কেবল পুরোহিতগণ ধর্ম্মকর্ম্মাদি সম্পাদনসময়ে সোমরস পান করিতেন। বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল বটে, কিন্তু হিন্দু রমণীদিগের যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল। সহমরণপ্রথা কেবল কাথিয়ওয়ার ও তক্ষশিলার হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। ভারতের লোকরা এতদূর ধর্ম্মভীরু ও সজ্জন যে, প্রতারণা বা চৌর্য্য তাহারা কল্পনাও করিতে পারিত না। ধন-সম্পত্তি রক্ষা করিবার জন্য গৃহের অর্গল বা তালকাদির প্রয়োজন হইত না। বিবাদ-বিসংবাদ উপস্থিত হইলে কেহ বিচারালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিত না, স্থানীয় পঞ্চায়েৎ সভা চিরন্তন প্রথাক্রমে যাহা মীমাংসা করিয়া দিত, তাহাতে উভয় পক্ষই সন্তুষ্ট হইত।

পাটলিপুত্র নগরের ভদ্রলোকরা হীরকাদি-খচিত বিচিত্র কার্পাস-বস্ত্র পরিধান করিতেন। তাঁহারা পদব্রজে গমন করিবার সময় এক জন ভৃত্য তাঁহাদিগের মস্তকে ছত্র ধারণ করিয়া যাইত। ভারতের অন্যান্য স্থানের মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকরা শ্বেতবর্ণ বস্ত্র পরিধান এবং মস্তকে উষ্ণীষ ব্যবহার করিতেন। ভারতবাসীরা ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগের ধর্ম্মানুসরণ করে। ব্রাহ্মণরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, পৃথিবী বর্ত্তুলাকার ও অনিত্য ; ক্ষিতি, অপ্ প্রভৃতি পঞ্চভূত বিশ্বের মূলস্বরূপ এবং পৃথিবী বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। শ্রমণদিগের মধ্যে এক দল বানপ্রস্থ অবলম্বনে বনে বাস, বন্য ফলমূলে ক্ষুন্নিবারণ, বল্কল পরিধান, হস্তে জলপান এবং ইন্দ্রিয়সম্ভোগ পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে ঈশ্বরচিন্তায় জীবনযাপন করিয়া থাকেন।

মেগাস্থিনীসের বিবরণ হইতে আরও অনেক বৃত্তান্ত সংগ্রহ করা যাইতে পারে, কিন্তু বাহুল্যভয়ে তাহা আর লিপিবদ্ধ করা হইল না। এক্ষণে অন্যান্য গ্রন্থে ভারতের কি পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইতেছে।

এসিয়া-মাইনরের-অন্তঃপাতী আমাসিয়া-নিবাসী ষ্ট্রাবো নামক এক জন গ্রীক পণ্ডিত ভারতের একখানি ভূগোল-বিবরণ প্রণয়ন করিয়াছেন। তাহাতে ভারতের বাণিজ্যের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, তাহা হইতে জ্ঞাত হওয়া যায়, তিনি যখন মাওজ হরমজ নামক বন্দরে উপস্থিত ছিলেন, সেই সময় তথা হইতে ১ শত কুড়িখানি পোত বাণিজ্যার্থ ভারতে যাত্রা করিয়াছিল। খৃঃ পূঃ তৃতীয় চতুর্থ শতাব্দীর ভারত-বিবরণ যাহা তাঁহার পুস্তকে প্রদত্ত হইয়াছে, তাঁহা আলেকজান্দ্রিয়া-নিবাসী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ইরাটস্থনীস

---

* এক ষ্টাডিয়ম ৫ শত ৮২ ফিটের সমান।

এবং সেকেন্দর সাহের অনুচর মেগাস্থিনীস, এরিষ্টবুলাস ও অনিসিক্রিটাস প্রভৃতির বিবরণের পুনরুক্তি মাত্র।

প্লিনি খৃঃ পূঃ ৭৭ অব্দে 'প্রাকৃতিক বৃত্তান্ত' নামক যে পুস্তক রচনা করেন, তাহাতে ভারতের ভূবৃত্তান্ত, জীবজন্তু, উদ্ভিদ্, খনিজ পদার্থ এবং ভেষজ প্রভৃতির বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। ঐ পুস্তক-প্রচারের প্রায় সমকালেই পেরিপ্লস ( Pariplus, Maris Erythrari ) মারিস ইরিথেরি অর্থাৎ আরব-সমুদ্রের দিগ্‌দর্শন নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রচারিত হয়। ইহা কাহার রচিত, তাহা জানিতে পারা যায় না। তবে গ্রন্থকারের উক্তিতে বুঝিতে পারা যায়, লোহিতসাগরতীরস্থ বন্দর, আরব ও ভারতবর্ষের পশ্চিমাংশ যাহা তিনি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, সেই সকল স্থানসম্বন্ধীয় বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

পেরিপ্লসে উল্লিখিত হইয়াছে, লোহিতসাগরের তীরস্থ যে সকল বন্দর ভারতের সহিত বাণিজ্যে লিপ্ত ছিল, সেগুলির মধ্যে মোজা ( বোধ হয় বর্ত্তমান মোচা ) প্রথম। তাহার পরবর্ত্তী বন্দর ওকিলিস। প্রণালীর ( বাবেলমাণ্ডব প্রণালীর ) তীরস্থ কেন ( Kane ) নামক বন্দর হইতে দক্ষিণ-ভারতযাত্রী নাবিকরা খাদ্য ও পানীয় জল সংগ্রহ করিয়া লইত। এই স্থান হইতে কোন কোন বাণিজ্যপোত একবারে সুখতরা বা সকোট্রা দ্বীপ অতিক্রম করিয়া সমুদ্রপথে পরিচালিত হইত, আর কোন কোনটি উপকূল দিয়া গমন করিত। ঐ গ্রন্থকার ভারতের যে যে বন্দর দেখিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে সিন্ধুনদের মোহানার মধ্যস্থলে একটি বন্দরের উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ বন্দর গ্রীকগণ কর্তৃক বারবারিকন নামে অভিহিত হইত। এখানে প্রতীচ্যদেশীয় পণ্য পোত হইতে নৌকায় উত্তোলিত করিয়া সিন্ধুদেশের রাজধানী মীননগরে প্রেরণ করা হইত। দক্ষিণাপথ সম্বন্ধে উক্ত গ্রন্থ হইতে জ্ঞাত হওয়া যায়, উহা অন্ধ্র-রাজাদিগের রাজ্য ছিল। ঘাট পর্ব্বতশ্রেণীর বহিঃস্থ ভূমি জঙ্গলপূর্ণ, নির্জ্জন এবং ব্যাঘ্র, বানর ও অজগর সর্প প্রভৃতির আবাসভূমি। তগর, শূর্পারক, প্রতিষ্ঠান ও কল্যাণ নামক স্থানে মধ্যভারত হইতে পণ্যদ্রব্য আসিত। যে রাজপথ দৌলতাবাদ হইতে হায়দরাবাদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, তাহা উক্ত নগর কয়েকটির মধ্য দিয়া গিয়াছে। পশ্চিম-তামিল রাজ্যের কেরলপুত্র দেশে মুজিরিস নামক নগর, পাণ্ডরাজ্যে নীলকুণ্ড, কুমারী অন্তরীপে কুমারী দেবীর মন্দির, চোলমণ্ডল উপকূলে কামারা, পণ্ডিচেরী এবং সুপাটন বা সপ্‌টম ( Saptam ) প্রভৃতি উক্ত গ্রন্থকার কর্তৃক দৃষ্ট হইয়াছিল। উক্ত গ্রন্থ হইতে আরও জ্ঞাত হওয়া যায়, চোলমণ্ডল ( বর্ত্তমান করমণ্ডল ) উপকূল হইতে অনেক পণ্যদ্রব্য রোমরাজ্যে প্রেরিত হইত। মছলিপট্টনে সূক্ষ্ম সূতী বস্ত্রের এবং দরশনে হস্তিদন্তের বিস্তৃত বাণিজ্য ছিল। তিনি গঙ্গার মোহানাস্থিত একটি বন্দরের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, উহা বোধ হয় তাম্রলিপ্তি বা তমলুক।

খৃঃ ১৫০ অব্দে টলেমির ভূগোল রচিত হইয়াছে। উহাতে কোন দেশের বিবরণ বিশেষভাবে বর্ণনা করা হয় নাই। শুদ্ধ ভারত কেন, ভিন্ন ভিন্ন দেশের অক্ষ-রেখা, দ্রাঘিমা প্রভৃতির নির্দ্দেশ করিয়া গ্রন্থকার উক্ত ভূগোলখানি গণিতের উপযোগী করিয়াছেন।

ইহার পরবর্ত্তী আরও অনেক গ্রন্থে ভারতের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু এ স্থলে তাহা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।

শ্রীমন্মথনাথ সিংহ।

## সংগঠনের সদুপায়

১৬। ফল ও ফল-বাগানের কথা।

"সুফলা" হইলেও দেশে আহার্য্য ফলের দারুণ অভাব। ফলাহারের অভাবে এ দেশবাসীর শারীরিক বল ও স্বাস্থ্যের হানিও বড় কম হইতেছে না। সংসদসমূহকে আম, জাম, কলা, আনারস, কমলা, বেল, নারিকেল, আতা, কুল, পেয়ারা, ডালিম, লিচু, কাঁঠাল, লেবু আদি সুরসাল ফলের অভাব দূরীকরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

পল্লীবাসীরা নিজ নিজ অধিকৃত ভূমিতে বাজে গাছ না রাখিয়া ফলের চাষে যাহাতে অবহিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রয়োজনমত কলম চারা বা বীজ দিয়া তাঁহাদের সহায়তা করিতে হইবে।

এতদ্ব্যতীত সংসদসমূহ উপযুক্ত স্থান নির্ব্বাচন করত তাহাতে উক্ত প্রকার ফলের আবাদ করিয়া দেশের ফলাভাব দূর করিতে চেষ্টা করিবেন।

১৭। দেশ-বিদেশে যাতায়াত ও মাল-সরবরাহের প্রণালী নির্দ্ধারণের কথা।

পল্লীমণ্ডলী-সমূহে যাতায়াত ও মাল-সরবরাহের জন্য প্রধানতঃ মানুষ ভারবাহী, গো-যান, মহিষ-যান, মটর-লরী, সাধারণ নৌকা বা মটর-বোটেরই বন্দোবস্ত করিতে হইবে। অপেক্ষাকৃত দূরদেশের জন্য বর্ত্তমানে রেলগাড়ীর সাহায্যই গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু সাধ্যমত অপরের জাহাজ-ষ্টীমারের সহায়তা গ্রহণ করা সমীচীন হইবে না। সংসদসমূহকে নিজেদের কাযের জন্য পৃথক্ এক নৌবহরের সৃষ্টি করিতে হইবে। অন্তর্ব্বাণিজ্য হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে বহির্ব্বাণিজ্য পরিচালনের জন্য জাতীয় সংসদকে ক্রমে দেশ-বিদেশগামী জাহাজাদির বন্দোবস্ত নিজেই করিয়া লইতে হইবে। এই উদ্দেশ্যসংসাধন জন্য বিশিষ্ট একটি কর্ম্মী দল সংগঠিত করিয়া লইতে হইবে।

১৮। পুষ্পচাষের ও পুষ্পজাত আতরাদি সুগন্ধ দ্রব্যের এবং মধু, মোম প্রভৃতি উৎপাদনের ব্যবস্থার কথা।

পুষ্পচাষেরও এ দেশে দারুণ অবনতি সংঘটিত হইয়াছে। প্রতি পল্লীতে পুনঃ যাহাতে প্রচুর পরিমাণে পুষ্পের চাষ প্রবর্ত্তিত হইতে পারে, তাহার উপায়বিধান করিতে হইবে।

শুধু সখের বা বিলাসিতার খাতিরে পুষ্পের চাষ করিবার মত অবস্থা বর্ত্তমানে এ দেশবাসীদের নহে। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান হইতেই যাহাতে কিছু না কিছু আয় হইতে পারে, সে দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এখন এ দেশের কার্য্যপ্রণালী নিয়মিত করিতে হইবে।

তাই, পল্লীগুলির স্বাস্থ্য ও সৌষ্ঠব-সাধন জন্য পল্লীতে পল্লীতে পুষ্পোদ্যান রচনার বিধান করা সমীচীন বলিয়া বিবেচিত হইলেও, এমন মধু ও সুরভিময় পুষ্প নির্ব্বাচন করিয়া লইতে হইবে, যাহাতে মধু, মোম ও সুগন্ধ আতরাদি পুষ্পসারের ব্যবসায় বেশ সুন্দররূপে পরিচালিত করা যাইতে পারে।

গোলাপ, বেলা, যূঁই, চম্পা প্রভৃতি সুগন্ধ পুষ্পের আবাদ বিশেষ কর্ম্মী সম্প্রদায়ের বিনিয়োগে, পুষ্পসারাদি প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিতে হইবে। আতরাদি পুষ্পসার বিলাসী ধনীদের উপক্ষুধা-নিবৃত্তির অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপাদান। এতৎসূত্রে অবলম্বনে ধনীদের বহু অর্থ দরিদ্র কর্ম্মীদের হস্তগত হইতে পারিবে।

তাহার পর মধু। মধু এক পরম পদার্থ, যেমনই উৎকৃষ্ট পেয়—তেমনই অতি উৎকৃষ্ট ভেষজ। মানুষের স্বাস্থ্য, শক্তি, বল, পুষ্টি, আরোগ্য ও কান্তির জন্য বিশুদ্ধ মধুর সবিশেষ প্রয়োজন। পরম উপাদেয় এই অমৃতকল্প মধুরও দেশে দারুণ অভাব ঘটিয়াছে। দেশে আবার মধুময় পুষ্পের চাষাবাদ বাড়াইয়া মধু উৎপাদনের বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইবে।

পুষ্পচাষের সঙ্গে সঙ্গে মধু-উৎপাদনের জন্য মৌমাছি পালনেরও বিধিব্যবস্থা করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যসংসাধন জন্য বিশেষ এক কর্ম্মিসম্প্রদায়ের সংগঠন করিতে হইবে। যথাবিহিত বিধানে তাঁহারা এতদ্বিষয়ে সুশিক্ষিত হইয়া মধু উৎপাদন কার্য্যে ব্রতী থাকিবেন।

পদ্মমধু চক্ষুরোগের এক অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ; দেশে পদ্মফুলের চাষোপযোগী বিল, ঝিল, জলাশয়াদির অভাব নাই। সুনির্ব্বাচিত জলাভূমিতে পদ্মের চাষ করিয়া মৌমাছি দ্বারা পদ্ম হইতে বিশুদ্ধ পদ্মমধু উৎপাদনেরও ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ছাতক, করিমগঞ্জ, নাগপুর প্রভৃতি অঞ্চলে কমলার চাষ বেশ হয়। সে সব অঞ্চলে গিয়া কমলালেবুর চাষ-আবাদ, ক্রমে ফলের সঙ্গে সঙ্গে অতি উপাদেয় কমলা-মধু উৎপাদনেরও ব্যবস্থা করিতে হইবে।

দেশের অভাব সম্পূর্ণরূপে সম্পূরণের পর এই সব বস্তু পণ্যরূপে যাহাতে বিশ্ববাজারে বিক্রীত হইতে পারে, তদনুরূপ ব্যবস্থা করিয়া লইতে হইবে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীকালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

## উপন্যাস পাঠের উপকারিতা ও অপকারিতা

### উপন্যাসের সাধারণ সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ।

কাল্পনিক ঘটনাবলি আশ্রয় পূর্ব্বক মনুষ্যসমাজ ও চরিত্রের চিত্র গ্রন্থনিবদ্ধ করিতে গিয়া সাহিত্যে উপন্যাসের সৃষ্টি হইয়াছে। বর্ণনা ও কথোপকথনের সাহায্যে অঙ্কিত চরিত্র-চিত্র এবং সুসংবদ্ধ সুবিন্যস্ত প্লটই ( plot ) উপন্যাসের প্রধান উপাদান। নাটকের সঙ্গে রঙ্গালয়ের সম্বন্ধটুকু বাদ দিলেই তাহা উপন্যাসে পরিণত হয় ( A novel is a drama minus the stage. )। বাস্তবজগতে যে সব ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল অথচ ঘটে নাই, যে সব চরিত্র সমাজে থাকা সম্ভবপর ছিল অথচ ছিল না, সেই সব ঘটনা ও চরিত্র কল্পনাবলে একত্র গ্রথিত হইয়াই উপন্যাস রচিত হইয়া থাকে। এই উপন্যাসের আবার শ্রেণী-বিভাগ আছে। উপন্যাস প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত;—সামাজিক, ঐতিহাসিক, কৌতূহলোদ্দীপক বা ডিটেক্‌টিভ ( sensational ); 'নবন্যাস' বা romance উপন্যাসেরই একটি ক্ষুদ্র শাখা।

### সংসার, সমাজ ও ব্যক্তি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ।

এক্ষণে নানা জাতীয় উপন্যাস পাঠের উপকারিতা কি, তাহাই আমরা আলোচনা করিব।

শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকগণ প্রথমতঃ জগৎকে বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করেন এবং ব্যক্তি ও সমাজ সম্বন্ধে জ্ঞানার্জ্জন করেন। পরে পর্য্যবেক্ষণলব্ধ তথ্য সহায়ে উপন্যাস লিখিয়া থাকেন। অনেক ক্ষেত্রে উপন্যাস অবাস্তবতা বা অতিরঞ্জন দোষ-দুষ্ট ( unreal and exaggerated ) হয় বটে, কিন্তু প্রথম শ্রেণীর উপন্যাসে গ্রন্থকারদিগের সংসার ও সমাজ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। পাঠকবর্গ সেই সব উপন্যাস পাঠ করিয়া স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ না করিয়াও পারিপার্শ্বিক জগৎসম্বন্ধে একটা সাধারণ জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। সকলের পর্য্যবেক্ষণশক্তি সমান নহে, আবার অনেকের ঐ শক্তিটা সুযোগাভাবে বিকসিত হয় না, কিন্তু নানারূপ উপন্যাস পড়িয়া তাঁহারা পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি বিকাশের কৌশল আয়ত্ত করিতে পারেন। ভূয়োদর্শন ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে লিখিত প্রবীণ ঔপন্যাসিকগণের লিখিত গ্রন্থ পাঠ করিয়া সংসারানভিজ্ঞ পাঠকগণ লোক-চরিত্র বুঝিবার ক্ষমতাও অর্জ্জন করিতে পারেন। জগতের স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নিকট ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রতিভাত হয়—সকলে সমান দৃষ্টিতে ইহাকে দেখে না। উপন্যাসকারগণও প্রত্যেকে নিজ নিজ শিক্ষা, সংস্কার ও রুচি অনুসারে সংসার ও সমাজকে পর্য্যবেক্ষণ করেন ও তাহা নিজ নিজ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া যান। তাই বিভিন্ন ঔপন্যাসিকের পুস্তকে সংসার ও সমাজের ভিন্ন ভিন্ন চিত্র প্রতিফলিত হইয়া থাকে। নানা গ্রন্থকারের লিখিত উপন্যাস পাঠ করিয়া জগৎসম্বন্ধে একটা বাস্তবজ্ঞান ( practical knowledge ) পূর্ব্ব হইতে আহরণ করিয়া রাখিলে অনভিজ্ঞ পাঠকের পক্ষে বিপৎ-সঙ্কুল সংসারপথে চলা কিঞ্চিৎ সহজ হইবার সম্ভাবনা আছে।

### জগতের মনীষিগণের চিন্তাধারার সহিত
### সংস্পর্শ ও পরিচয়।

আধুনিক কালে জগতের বহু শ্রেষ্ঠ মনীষী লেখক উপন্যাসের মধ্য দিয়াই তাঁহাদের মহান্ ভাবরাশি প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কারণ, ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সাহিত্য-ক্ষেত্রে উপন্যাসই একচ্ছত্র সম্রাট্, সাহিত্যের বাজারে তাহার একচেটিয়া অধিকার। উপন্যাস এত অধিক লোকপ্রিয় হইয়াছে যে, যে কেহ মাতৃভাষা পড়িতে ও বুঝিতে পারে, সেই উপন্যাস পাঠ করে। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই উপন্যাসের পক্ষপাতী। এই কারণেই চিন্তাশীল মনস্বী ব্যক্তিগণ উপন্যাসের ছদ্মবেশ পরাইয়া তাঁহাদের ভাব ও চিন্তা জগৎকে উপহার দিয়া গিয়াছেন। পুং-স্ত্রী-সম্বন্ধ, ব্যক্তি ও সমাজ-সম্বন্ধ, পরলোকতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা, সমস্যা, ধনিক-শ্রমিক-সমস্যা, ভাল-মন্দ দ্বন্দ্ব-সমস্যা, ক্রম-বিবর্ত্তনবাদ, পিতামাতার শারীরিক মানসিক বৃত্তির সন্তানে বর্ত্তনবাদ ( problem of heredity ) প্রভৃতি জীবন-মরণের যাবতীয় সমস্যা ও জটিল তত্ত্ব সম্বন্ধে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাবুকগণের সমাধানগুলি আমরা তাঁহাদের উপন্যাসপাঠে জানিতে পারি। এই বিষম জীবন-সংগ্রামের দিনে মহাব্যস্ততার যুগে অল্প অবসরের মধ্যে সহজপাঠ্য উপন্যাস পড়িয়া জগতের প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণের মস্তিষ্ক-প্রসূত গভীর চিন্তারাশির সংস্পর্শে আসিতে পারা বড় কম লাভের কথা নহে। অধিক কি, ভিক্টর হিউগো, কাউন্ট লিও টলষ্টয়, অঁাতোল ফ্রাঁস, এইচ, জি, ওয়েলস্, ওয়েণ্ডেল হোমস্, ওয়াণ্টার স্কট, জর্জ্জ ইলিয়ট, বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্র ঠাকুর, শরৎ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বর্ত্তমান ও অতীতের বিশ্ব-বিশ্রুত শ্রেষ্ঠতম মনীষিগণের উচ্চ উচ্চ চিন্তাগুলি তাঁহাদের রচিত উপন্যাসসমূহ পাঠ করিলেই সম্যক্ অবগত হওয়া যায়। সাহিত্যের অন্য কোন শাখায় আমরা এরূপ বিভিন্ন রকম উচ্চ চিন্তারাশির সমাবেশ দেখিতে পাই না। নানাজাতীয় উচ্চস্তরের লেখকগণ উপন্যাসকেই তাঁহাদের আত্মপ্রকাশের একমাত্র যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়াছেন—যেন তাঁহারা সকলে ষড়যন্ত্র করিয়াই বর্ত্তমান যুগে উপন্যাস সাহিত্যের শিরোমণি করিয়াছেন। যে উপন্যাস জগতের চিন্তা-সমুদ্র হইতে বিবিধরূপ শ্রেষ্ঠ রত্নরাজি আহরণ করিয়া আত্মকলেবর সুসজ্জিত করিয়াছে, তাহা পাঠের উপকারিতা সুধীবৃন্দ একবাক্যে স্বীকার করিবেন। তুলনামূলক সমালোচনা দ্বারা পাঠক এই সব বিভিন্ন চিন্তাপ্রবাহের উৎকৃষ্টতা অপকৃষ্টতা নির্দ্ধারণ করিতে পারেন ও স্বয়ং একটি স্থিরসিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারেন।

### বিভিন্ন রকম উপন্যাস পাঠের ভিন্ন ভিন্ন উপকারিতা।

এক এক রকম উপন্যাস পাঠের এক এক প্রকার উপকারিতা। ঐতিহাসিক উপন্যাস পাঠে পাঠকের হৃদয়ে দেশাত্মবোধ, স্বজাতি-স্বধর্ম্মপ্রীতি জাগিয়া উঠে। শুনিয়াছি, এ দেশে বিগত স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বঙ্কিম বাবুর "আনন্দ-মঠ" বঙ্গীয় যুবকগণের উপর আশ্চর্য্য রকম প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। "দুর্গেশনন্দিনী" "দেবী চৌধুরাণী" "চন্দ্রশেখর" পাঠে বাঙ্গালীর অতীত শৌর্য্যবীর্য্যের পরিচয় পাইয়া কোন্ বাঙ্গালী পাঠক না আত্মগৌরব অনুভব করেন? স্বদেশ—

স্বজাতির প্রতি শ্রদ্ধা-বিশ্বাসে কোন্ বাঙ্গালীর মন-প্রাণ পূর্ণ না হইয়া যায়। সার ওয়াণ্টার স্কটের উপন্যাস পড়িয়া স্কটজাতির মধ্যেও না কি স্বদেশপ্রেম উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল। আবার ঐতিহাসিক উপন্যাস পাঠে অতীতকালের সামাজিক রীতিনীতি, রাজ্যশাসনপদ্ধতি প্রভৃতি জানিতে পারা যায়। অতীতের সহিত বর্ত্তমানের সামঞ্জস্য বা পার্থক্য কি,—কোথায় উভয়ের নাড়ী-সংযোগ ইত্যাদি পরিষ্কাররূপে বুঝা যায়। মোট কথা, ঐতিহাসিক উপন্যাস গতপ্রাণ নীরস ইতিহাসকেই সরস ও সজীব করিয়া প্রচার করে। প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাস খাঁটি ঐতিহাসিক সত্যকে রূপান্তরিত করে না বা ধামা-চাপা দেয় না, পরন্তু উহাকে মূলভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়া তাহার উপর কল্পনার প্রাসাদ নির্ম্মাণ করে। ইহাতে নিছক ইতিহাসের জ্ঞানই লোকের মধ্যে প্রচারিত হয়। রমেশ বাবুর "জীবন-সন্ধ্যা" ও "জীবন-প্রভাত," স্কটের "কেনিলওয়ার্থ" "ওল্ডমর্ট্যালিটি", কিংসলীর "ওয়েষ্টওয়ার্ড হো" প্রভৃতি অতীতের অস্থিকঙ্কালময় ইতিহাসকে পাঠকের মানস চক্ষুর নিকট সঞ্জীবিত ও সুস্পষ্ট করিয়া ধরে।

সামাজিক উপন্যাসসমূহ সমাজের দোষ ও গুণাবলী প্রকাশ করে ও সমাজসংস্কারের সহায়তা করে। পাঠকবর্গ ভাল ও মন্দ বিচার করিয়া যাহা ভাল, তাহা গ্রহণ করিতে পারেন। লোকচক্ষুর অন্তরালে সমাজের স্তরে স্তরে যে সব ঘৃণিত দোষসমূহ লুক্কায়িত আছে, যে সব কুপ্রথা ধীরে ধীরে মানব-সমাজে ঢুকিয়া বিষময় ফল প্রসব করিতেছে, সামাজিক উপন্যাস তাহাদের উপর সমালোচনার তীব্র কশাঘাত করিয়া তাহাদিগকে বিনাশ করিতে চেষ্টা করে। দৃষ্টান্তস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, শ্রীযুত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "অরক্ষণীয়া" পাঠে বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের কন্যা-বিবাহপ্রথার অপকারিতা কি, তাহা জানা যায়। দরিদ্র বিধবা যে, বিবাহযোগ্যা কন্যা লইয়া নিষ্ঠুর হিন্দুসমাজে মহা বিপদে পতিতা হয়, তাহা তিনি চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়াছেন। উক্ত গ্রন্থকারের "দত্তা" পুস্তকে ব্রাহ্মসমাজের দোষগুণ প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্রাহ্মগণ তাহা পাঠ করিয়া বকধার্ম্মিকদিগকে সমাজচ্যুত করিতে পারেন ও তাঁহাদের বিবাহের কোর্টশিপ প্রথার সংস্কার করিতে পারেন। স্বর্গীয় তারকনাথ বাবুর "স্বর্ণলতা" পড়িয়া একান্নবর্ত্তী হিন্দু-পরিবারের দোষগুণ জানিতে পারা যায়। পাঠকগণ ইচ্ছা করিলে নিজেদের পরিবারের দোষগুলি সংস্কার করিতে পারেন। ইংরাজ মহিলা লেখিকা মিসেস্ হেনরী উড তাঁহার "ঈষ্টলীনে" ইংরাজসমাজে স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মেলামেশায় যে গরল উত্থিত হয়, তাহা দেখাইয়াছেন। উহা পাঠ করিয়া জানিতে পারা যায় যে, ইংরাজ পরিবারের গিন্নীগণ সময় সময় পরিবার-বন্ধন ছিন্ন করিয়া গুপ্তপ্রণয়ীর সহিত উধাও হইয়া যান। "ওলিভার টুইষ্ট" ও "ডেভিড কপারফিল্ড" নামক উপন্যাস দুইখানিতে ডিকেন্স দেখাইয়াছেন যে, দরিদ্র হইয়া ইংরাজ-সমাজে জন্মগ্রহণ করিলে ভয়াবহ অত্যাচার-উৎপীড়ন সহ্য করিতে হয়। মহাত্মা টলষ্টয় তাঁহার উপন্যাসগুলিতে সামাজিক সাম্যবাদ ও ধর্ম্মভাব প্রচার করিয়াছেন। ব্যক্তি ও সমাজ তাহা পাঠ করিয়া বিশেষভাবে উপকৃত হইয়াছে। অনেকে মনে করেন, বিশ্বালোড়নকারী বলশেভিকবাদ টলষ্টয়ের গ্রন্থ হইতেই উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। সামাজিক উপন্যাস এক দিকে যেমন সমাজের দোষ দেখাইয়া দেয়, অপর দিকে তেমনই উহার গুণগুলিকেও বর্ণ ফলাইয়া উজ্জ্বলতর করিয়া লোকচক্ষুর গোচর করে।

সমস্যা-পরিপূরক উপন্যাস-পাঠে ( Problem novels ) পাঠকগণ নানা দুরূহ সমস্যার সহজ সমাধান জানিতে পারেন। সমস্যা এখানে দুই অর্থে ব্যবহার করিতেছি। প্রথমতঃ, সমাজ বা ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যা যথা স্ত্রী-শিক্ষা বা পল্লী-সংস্কার। দ্বিতীয়তঃ, যেমন কোন ব্যক্তির পারিপার্শ্বিক অবস্থা, চরিত্র, মনের ভাব জানা আছে—অবস্থান্তরে ঘটনাবিপর্য্যয়ে তাহার জীবনের গতি কোন্ দিকে যাইবে, তাহার চরিত্রের কিরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিবে ইত্যাদি জটিল প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে তাহাও সমস্যাপরিপূরণ হইবে। শরৎ বাবুর "পল্লী-সমাজ" প্রথমোক্তরূপ সমস্যা-পরিপূরক গ্রন্থ। এগুলি পাঠ করিয়া পাঠক পল্লীসংস্কার-সমস্যা সম্বন্ধে ইঁহাদের মতামত জানিতে পারেন। বঙ্কিম বাবুর "বিষবৃক্ষ" দ্বিতীয় প্রকার সমস্যাপরিপূরক উপন্যাস। সচ্চরিত্র যুবক জমীদার নগেন্দ্র অবস্থান্তরে প্রলোভনে পড়িয়া নিজ চরিত্র সঠিক রাখিতে পারিবে কি না, এই প্রশ্নের উত্তরই বঙ্কিম বাবু দিয়াছেন। জর্জ্জ ইলিয়টের "সাইলাস মার্ণার," নিরুপমা দেবীর "দিদি", শরৎ বাবুর "বিন্দুর ছেলে" একই সমস্যার সমাধান করিয়াছে। উহারা দেখাইতেছে যে, প্রতিকূল অবস্থাতেও নানা বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বিশ্বগ্রাসী স্নেহ মানব-হৃদয়কে জয় করিতে পারে। শেষোক্ত সমস্যাপরিপূরক উপন্যাসগুলি অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক ও শিক্ষাপ্রদ। উপন্যাসের পাঠকগণ নানা সমাজের অবস্থা, আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়া থাকে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বঙ্কিম বাবুর ও রমেশ বাবুর ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি পাঠ করিয়া আমরা অতীতের মুসলমানসমাজ সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারি। প্রভাত বাবুর "দেশী ও বিলাতী"র বিলাতী গল্পগুলি পড়িয়া বিলাতী সমাজের অনেক গুপ্তরহস্য আমরা জানিতে পারি। রবি বাবুর উপন্যাসগুলি পাঠে ব্রাহ্মসমাজের ভিতরের অনেক কথা বাহিরের লোক জানিতে পারে। উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা গরীব বা মধ্যবিত্ত হইলে অভিজাত সম্প্রদায় তাহা পাঠ করিয়া গরীব ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবস্থার পরিচয় পায় এবং নায়ক-নায়িকা সমাজের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর হইলে নিম্নশ্রেণীর পাঠকগণ তাহা পড়িয়া অভিজাত সম্প্রদায়ের আচার-ব্যবহার, আশা-আকাঙ্ক্ষা জানিতে পারে। যেমন ডিকেন্সের উপন্যাস পাঠ করিয়া লোক লণ্ডনের গরীবের কথা জানিতে পারে ও থ্যাকারের উপন্যাস পড়িয়া বিলাতী সমাজের উচ্চশ্রেণীর কথা অবগত হইতে পারে। সকল সমাজের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিলিয়া মিশিয়া তাহাদের সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা অনেকের পক্ষেই সম্ভবপর নহে। তাই উপন্যাসপাঠে সকল সমাজের কথা জানিয়া রাখা মন্দ নহে।

## উপন্যাস মনস্তত্ত্বের জ্ঞান বিতরণ করে ; পাঠক লোকচরিত্র বুঝিয়া চলিবার ক্ষমতা লাভ করে।

অনেক বড় বড় ঔপন্যাসিক গভীর মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণে সিদ্ধহস্ত। এমন কি, অনেকের উপন্যাসের মূলভিত্তি মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণ ( study of psychology )। ইংরাজী সাহিত্যে জর্জ্জ ইলিয়ট ও মেরিডিথ এবং বঙ্গ সাহিত্যে শরৎ বাবু, অনুরূপা দেবী নিপুণ মনস্তত্ত্ববিৎ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণমূলক উপন্যাস পাঠে এই লাভ হয় যে, স্ত্রীপাঠকগণ পুং-মনোভাবের সহিত পরিচিত হয় ও পুরুষ পাঠকগণ স্ত্রীমনোজগতের পরিচয় পায়। বাস্তব জীবনে পুরুষগণ নারীজাতির এবং নারীগণ পুরুষজাতির সংস্পর্শে আসিয়া উভয়ে উভয়ের মনস্তত্ত্ব বুঝিবার সুযোগ নাও পাইতে পারে ; কিন্তু উভয় জাতির মনস্তত্ত্ববিৎ ঔপন্যাসিকগণের পুস্তক পড়িয়া নরনারীগণ তাঁহাদের মানবচরিত্রজ্ঞান সম্পূর্ণ করিতে পারেন। পুরুষ লেখকগণ অনেক ক্ষেত্রে নারী-মনোভাবের লীলাখেলা সম্যক্ ধরিতে বুঝিতে পারেন না ; কিন্তু এই অভাবপূরণের জন্য বর্ত্তমান যুগে অনেক মহীয়সী মহিলা মসিজীবিনী হইয়াছেন। ইংলণ্ডের জেন অষ্টেন্, এমিল ব্রোণ্ট, ইলিয়ট, বাঙ্গালায় স্বর্ণকুমারী, অনুরূপা, নিরুপমা এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের উপন্যাসগুলিতে স্ত্রীচরিত্রের নিখুঁৎ চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপে নারী যদি পুরুষের এবং পুরুষ যদি নারীর মনোভাব বুঝিবার ক্ষমতা অর্জ্জন করে, তাহা হইলে সংসারে ও সমাজে অনেক অনর্থের অর্থহীন কারণ দূর হইবে। আবার বুদ্ধিমান্

পাঠকের সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব ধারণ করিবার শক্তি জন্মিলে সঙ্গে সঙ্গে লোক-চরিত্র বুঝিবার শক্তিও বিকসিত হয়। প্রকৃতির গূঢ়তম রহস্যের অনেক দুর্ব্বোধ্য মানব-চরিত্র বুঝিতে পারিলে পাঠক বাস্তবজগতে আসল ও মেকী, চিটা ও চিনি চিনিয়া লইতে পারিবেন। তাহা হইলে সংসারে প্রতারণা বা মায়া-মরীচিকার ফাঁদে পা দিতে হইবে না। উপন্যাসপাঠের উপকারিতা ইহার অধিক আর কি হইতে পারে?

### নৈতিক চরিত্রের উপর উপন্যাসপাঠের প্রভাব।

ভাল ও মন্দ লইয়াই জগৎ। আবহমানকাল হইতে সংসার ও সমাজে এই দুই সুরাসুরের দ্বন্দ্বযুদ্ধ অবিরাম চলিতেছে। প্রাচীন পারসীকগণ এই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান সু ও কুর উপর ঈশ্বরত্ব আরোপ করিয়া শ্রদ্ধানতহৃদয়ে পূজা করিয়াছিলেন। উপন্যাস মানবসমাজের খাঁটি চিত্র বলিয়া তাহাতেও মানব-মনের সৎ ও অসৎ ভাব পাশাপাশি স্থান পাইয়া থাকে। ইহাদের একটিকে বাদ দিয়া সমাজ-চিত্র বা চরিত্র-চিত্র অঙ্কিত হইলে তাহা একঘেয়ে একরঙা হইয়া পড়ে, ও তাহার কোন বর্ণবৈচিত্র্য থাকে না; সুতরাং তাহা নিখুঁৎ ও চিত্তাকর্ষক হয় না। তাই উপন্যাসলেখকগণ ভাল ও মন্দের চিত্র একাধারে স্থাপন করিয়া দেখাইয়া থাকেন। কিন্তু কোন কোন ঔপন্যাসিক পুণ্যের জয়, পাপের পরাজয় প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যেই যেন উপন্যাস লিখিয়া থাকেন। এই শ্রেণীর উপন্যাসকে উদ্দেশ্যমূলক (purpose novels) উপন্যাস বলে। ইংলণ্ডের রিচার্ডসন, গোল্ডস্মিথ, থ্যাকারে, কিংসলী ও বঙ্গদেশের দামোদর বাবু প্রভৃতি এরূপ উপন্যাস লিখিয়াছেন। যাঁহারা আর্ট লইয়া চুলচেরা বিচার করেন না এবং যাঁহাদের তথাকথিত উচ্চশিক্ষালাভের সুযোগ ঘটে নাই, সমাজের এমন অনেক সরল স্ত্রী ও পুরুষের নৈতিক চরিত্রের উপর এই জাতীয় উপন্যাস ভাল প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। পাপের ভীষণ পরিণামের চিত্র উপন্যাসে দেখিতে পাইয়া বাস্তব-জীবনেও তাঁহারা পাপকে ঘৃণা করিতে শিখেন। ইচ্ছা হইলে যে তাঁহারা সাধু দৃষ্টান্তের অনুকরণও করিতে পারেন, তাহা ইতঃপূর্ব্বেই আমরা উল্লেখ করিয়াছি। কোন কোন লেখক আবার কেবল ধর্ম্ম-তত্ত্ব প্রচার বা সামাজিক কুপ্রথা নিবারণের উদ্দেশ্যেই উপন্যাস লিখেন। মহামতি ঈশপ বা হিতোপদেশের বিষ্ণুশর্ম্মার ন্যায় তাঁহাদের কাহিনী বা গল্পাংশ দৃষ্টান্ত দ্বারা নীতিকথা (sermons) বুঝাইবার জন্যই লিখিয়া থাকেন। গল্পের পাতলা আবরণের ভিতর হইতে তত্ত্বকথাগুলি যেন মাথা বাহির করিয়া উঁকি দিতে থাকে। মহাত্মা টলষ্টয় পৃথিবীর এই শ্রেণীর লেখকগণের শীর্ষস্থানীয়। তাঁহার গল্পকথাগুলি যে নৈতিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত।

আর একপ্রকার উপন্যাসলেখক আছেন—যাঁহারা পাপ ও পুণ্য, ভাল ও মন্দ এই দুয়ের মধ্যে কোন একটির পক্ষসমর্থন না করিয়া, কোন একটির পক্ষে কোলটানা কথা না বলিয়া, সমাজ ও চরিত্রের ছবি জগতে যেরূপ দেখিতে পান, হুবহু তাহাদের তদ্রূপ প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়া থাকেন। ইঁহারা সাহিত্যে 'আর্টের জন্যই আর্ট' নীতির (Principle of art for art's sake) পরিপোষক। এই শ্রেণীর উপন্যাস পাঠে পাঠকবর্গ নিজ অভিরুচি অনুসারে স্বাধীনভাবে যে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন। গ্রন্থকারগণ নিজেদের মতবাদগুলি পাঠকের স্কন্ধে বোঝার মত চাপাইয়া দিতে চাহেন না। পাঠকের চরিত্রের উপর সাক্ষাৎসম্বন্ধে এই সকল উপন্যাস কোন নৈতিক প্রভাব বিস্তার করে না, পরোক্ষভাবে করে। পাঠক সচ্চরিত্র হইলে এইরূপ উপন্যাস হইতে সৎশিক্ষাই লাভ করেন; কিন্তু কলুষিত-চরিত্র পাঠক মনে করেন, গ্রন্থকার বুঝি পাপকে প্রশ্রয় দিয়া পাপীকেই লাভবান্ করিতেছেন। সুতরাং পাপকে ঘৃণা করিতে শিখেন না। অনেক নীতিবাগীশ ব্যক্তি শরৎ বাবুর "চরিত্রহীন" বা "শ্রীকান্তের ভ্রমণকাহিনী"র নামে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া থাকেন। তাঁহারা আশঙ্কা করেন যে, "চরিত্রহীন" পড়িয়া সমাজে নূতন নূতন কিরণময়ী-দিবাকরের উদ্ভব হইবে। তাঁহাদের নীতিশাস্ত্রের আদর্শটা (Standard of morality), কিন্তু সংকীর্ণ ও ভ্রমপূর্ণ; তাই তাঁহারা এরূপ অলীক ধারণা পোষণ করেন। কিরণময়ী-দিবাকর-স্রষ্টকর্ত্তা কি ইচ্ছা করেন যে, সমাজ এইরূপ চরিত্রের আদর্শ অনুসরণ করুক? কখনই নহে। তাঁহারা সমাজের ঘোমটা খুলিয়া যে দৃশ্য দেখিয়াছেন, তাহারই অবিকল আলোক-চিত্র গ্রহণ করিয়াছেন। সমাজ এই সব চরিত্রকে শ্রেয়ঃ কি হেয় জ্ঞান করিবে, সেই ভার প্রকৃতপক্ষে তাহারই উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। মোট কথা, লেখকগণ এইরূপ ক্ষেত্রে পাঠকের ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র জ্ঞান-বুদ্ধির উপর হস্তক্ষেপ করেন না, পরোক্ষভাবে নৈতিক শিক্ষা দান করেন।

নাটকের ন্যায় উপন্যাসকেও বিয়োগান্তক ও মিলনান্তক এই দুই ভাবে বিভক্ত করা যায়। বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক এরিষ্টটল বলিয়াছেন,—"Tragedy excites pity and terror in the mind" (বিয়োগান্তক নাটক দর্শকের মনে যুগপৎ করুণা ও ভীতির সঞ্চার করে)। বিয়োগান্তক উপন্যাসও পাঠকের চিত্তে এই দুই মহাভাবকে জাগ্রত করে। ইহাও পাঠকগণের নৈতিক শিক্ষার বিশেষ সহায়তা করে। কারণ, ঘটনার স্রোতে পর্য্যুদস্ত, বিধ্বস্ত, কুলোকের চক্রান্তে হৃতসর্ব্বস্ব, মন্দভাগ্য কাল্পনিক চরিত্রগুলির প্রতি সমবেদনায় অশ্রুপাত করিতে শিখিলে বাস্তব-জীবনেও পদদলিত, অত্যাচারিতগণের প্রতি মমত্ববোধ করিতে শিখা যায়। ঔপন্যাসিকের সৃষ্ট পাপ-কালিমাময় নরকের কীটগুলির কীর্ত্তিলোপে ভীতির সঞ্চার হইলে আসল জগতেও পাঠক ভয়ে পাপের পথে পা বাড়াইবে না। জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিয়োগান্তক উপন্যাস ভিক্টর হিউগোর "লা মিজারেবল" পাঠে কোন্ পাঠক অশ্রুসংবরণ করিতে পারিয়াছে? জিন্ ভালজিনের শত্রুগণের অমানুষিক কাণ্ডকারখানা দেখিয়া কোন্ পাঠক ভয়ে শিহরিয়া উঠে নাই? বঙ্কিমবাবুর মানসী-কন্যা কপালকুণ্ডলা চৈত্রের বাত্যা-বিক্ষোভিত নদীতে ঝাঁপ দিয়া নিমজ্জিতা হইল, আর উঠিল না,—এই কাহিনী পাঠ করিয়া কোন্ পাঠক-পাঠিকার হৃদয় করুণায় বিগলিত হয় না? সঙ্গে সঙ্গে দুর্দ্দম কাপালিকের আচরণে ভীতির সঞ্চার হয়। শরৎবাবুর "অরক্ষণীয়া"র মাতা যখন গঙ্গাকূলে শ্মশানাগ্নিতে পুড়িয়া খাক্ হইতে থাকে, তখন পাঠকের নয়ন-কোণে সমবেদনার অশ্রু দেখা দেয় ও বাঙ্গালীর নিষ্ঠুর বিবাহপ্রথার কথা স্মরণ করিয়া প্রাণ স্বভাবতঃই কাঁদিয়া উঠে। নৈতিক চরিত্রের উপর এই শ্রেণীর উপন্যাসের প্রভাব বড় কম নহে।

### উপন্যাসপাঠ কল্পনাশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি-বিকাশের একটি পন্থা। ইহাতে নির্দ্দোষ আমোদও পাওয়া যায়।

নানাশ্রেণীর উপন্যাস পাঠে পাঠকের কল্পনাশক্তি বিকাশ পায় ও বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত হয়। যাঁহারা অবিরত ঔপন্যাসিকের কল্পনারাজ্যে বিচরণ করেন, তাঁহাদের কল্পনাশক্তি এতদূর বৃদ্ধি পায় যে, পরিচিত লেখকের যে কোন নূতন বই পড়িতে আরম্ভ করিয়াই প্লটের পরিণতি কিরূপ হইবে, তাঁহারা বলিয়া দিতে পারেন। উপন্যাসের ঘটনাবলীর সুসঙ্গত বিন্যাস, মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ, বিবিধ প্রসঙ্গের আলোচনা, চটুল শ্লেষ (subtle humour) ইত্যাদি পাঠ করিয়া বুদ্ধিবৃত্তিও শাণিত হইয়া থাকে। ফুটবল, ক্রিকেট প্রভৃতি শারীরিক ক্রীড়ার ন্যায় উপন্যাসপাঠও একটি নির্দ্দোষ মানসিক ক্রীড়াবিশেষ (intellectual pastime)। তাস, পাশা, প্রভৃতি অলস ক্রীড়ায় মত্ত না হইয়া ভাল ভাল উপন্যাস পাঠ করিলে সময়ের অপব্যবহার হয়

না। সময়ের বোঝা যখন দুর্ব্বহ বোধ হয় এবং যখন মন গভীর চিন্তা, পাঠ ইত্যাদির দরুণ অবসাদগ্রস্ত হয়, তখন উপন্যাস পাঠ করিলে সময় ত কাটেই, মনের সজীবতাও ফিরিয়া আইসে। অনেক সময় দেখা যায় যে, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও শোকে-তাপে মুহ্যমান ব্যক্তি উপন্যাস পাঠ করিয়া মনের প্রফুল্লতা ও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া পায়। যখন পীড়া সারিয়া যায়, কিন্তু রোগীর পূর্ণস্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইতে বিলম্ব হয়, তখন রোগীর এমন একটা অবস্থা হয় ( Convalescent stage ) যে, সে আর কিছুতেই রোগশয্যায় পা রাখিতে চায় না অথচ সুস্থ লোকের ন্যায় চলাফেরাও করিতে পারে না। সেই অবস্থায় ডাক্তার-বৈদ্যগণও রোগীকে সরস উপন্যাস ( light literature ) পাঠ করিতে উপদেশ দেন। ইহাতে রোগীর অবসাদ অনেকটা লাঘব হয় ও সে শীঘ্র সবল হইয়া উঠে। তবে খুব উত্তেজনাপূর্ণ উপন্যাস এই সময় রোগীর হাতে দিতে নাই। উপন্যাসপাঠের সার্থকতা আমরা এ স্থলে দেখিতে পারি।

### ভাষা ও লিখিবার ভঙ্গী শিখিবার উপায়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, মনস্বী সাহিত্যিকগণ প্রায় সকলেই উপন্যাস লিখিয়া থাকেন। কাযেই কোন ভাষা ভালভাবে শিক্ষা করিতে হইলে উপন্যাস পাঠ করিতেই হইবে। ভাষাশিক্ষার সঙ্গে লিখিবার ভঙ্গীও ( style ) শিখিতে পারা যায়। এক এক জন লেখকের ভঙ্গী এক এক প্রকার। বিভিন্ন লেখকের উপন্যাস পাঠ করিয়া নানারকম লিখিবার ভঙ্গী দেখিয়া শুনিয়া পাঠক একটি নিজস্ব লিখিবার ভঙ্গী গঠন করিতে পারেন। সাহিত্যের মধ্যে উপন্যাস পাঠেই বেশী আমোদ পাওয়া যায় বলিয়া জনসাধারণ উপন্যাস পড়িয়াই ভাষা শিক্ষা করিয়া থাকে। আবার লিখিত ভাষা ও কথিত ভাষার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। উপন্যাসের কথোপকথন সাধারণতঃ কথিত ভাষাতেই হইয়া থাকে। অতএব কোন ভাষার কথিতাংশ ( Colloquialism ) শিখিতে হইলে সেই ভাষার উপন্যাস পাঠ করাই উৎকৃষ্ট পন্থা। অবশ্য, উক্ত ভাষাভাষীদের সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়াও উহা শিক্ষা করা যায়। কিন্তু সে সুযোগ কালে-ভদ্রে মিলে। যেমন ইংরাজীভাষার Clloquialism শিখিতে হইলে ইংরাজদের সহিত কথাবার্ত্তা বলিবার সুযোগ না পাইলেও আমরা ইংরাজী উপন্যাস পাঠ করিয়া আমাদের অভীষ্টসিদ্ধি করিতে পারি। উপন্যাস পাঠের ইহাও একটি উপকারিতা।

[ ক্রমশঃ।

শ্রীবিধুরঞ্জন দাস।

---

# বারবিলাসিনী

রক্তলোলুপা রাক্ষসী আমি দয়ামায়াহীনা ভীষণা অতি ;
সখী ও প্রেমিকা নহি কেহ নহি নহি কল্যাণী নহি কো সতী।

শীকারের লাগি রয়েছি দাঁড়ায়ে এ ঘোর আধারে পথের পারে।
এই সীমানায় আসিলে পথিক নরকের তুমি আসিবে দ্বারে ;

পালাও, পালাও, আসিও না পাশে মোর নিশ্বাস লাগিলে গায় ;
এক নিমেষেই প্রতি রোমকূপে বিষের প্রবাহ ছুটিবে হায় !

কি দেখিছ চাহি, এ মুখের পানে সুন্দরী আমি রূপসী বড় ?
নাগিনীর চেয়ে হিংস্র এ রূপ বাঘিনীর চেয়ে উগ্রতর !

আমার রূপেতে আমি পুড়েছি গোপনে তুষের অনল সম ;
কত সোনা ছাই হয়ে গেল হায় লাগিয়া দেহের আগুন মম !

মেজে-ঘষে হায় রূপসী হয়েছি স্বভাব-সুষমা নাহিকো কিছু ;
খুলে ফেলি যদি এ কপট সাজ চ'লে যা'বে মাথা করিয়া নীচু।

আমারে হেরিছ ? আমি নাই হেথা নকলের খোসা ঢেকেছে দেহ ;
ঘায়ের উপর লেপিয়া প্রলেপ লুকায়ে রেখেছি কীটের গেহ !

প্রেমের জ্যোতি ত নাহি মোর মুখে লাবণ্য-রেখা ললাটে কই ?
নয়নে নারীর মহিমা যে নাই তাই ত নারীর বাহিরে রই !

বিজলী-আলোকে হেরিছ আমার দেখিও এ দেহ দেখিও দিনে ;
নিশি-খদ্যোত কত সুন্দর নিমেষে তখন লইবে চিনে !

কত দিন আমি দিবস-আলোকে দর্পণে যবে হেরেছি মুখ ;
সহসা নিজেই শিহরি উঠেছি কাঁদিয়া উঠেছে পাষাণ-বুক।

নিজ দেহ মোর বিদ্রোহ করে বিদ্রূপ করে নিজের রূপ ;
বুকে যেন কোথা লুকায়ে রয়েছে হীন কদর্য্য ক্লেদ-কূপ !

সেই দিন হ'তে দর্পণে আর পারি না চাহিতে দর্পভরে ;
তীব্র আঘাতে বিবেক আমার ক্ষণে ক্ষণে যেন বিদ্ধ করে।

শ্রান্ত পথিক, শান্তি কি চাও সুখ কি গো চাও আমার পাশে ?
সুখ যে কেমন ভুলিয়া গিয়াছি ডুবিয়া এ ঘোর নরকবাসে !

তনয়বয়সী তরুণ এসেছে পিতার বয়সী এসেছে কত ;
জানি নাকো তা'রা কি সুখ পেয়েছে আমি শুধু হায় পেয়েছি ক্ষত !

পঁচিশ বছর কামনা-যজ্ঞে নিজের এ দেহ আহুতি দিয়া ;
মরমের কোণে মরিতে বসেছি পাপ-কালিমার পঙ্ক নিয়া !

আহা ফিরে যাও তরুণ পথিক করুণা জাগিছে তোমায় হেরি ,
বাঁচিবার তব রয়েছে সময় আমার নাহিকো মরণে দেরি !

প্রেমময়ী তব বধূ যে এখন সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালিয়া ঘরে ;—
মন্দিরে গিয়ে তব দেব-বিগ্রহে প্রণাম করিছে ভকতি-ভরে।

আহা সে বালিকা জানে না তোমার এ হীন আচার ছলনাময় ;
প্রেম-গৌরবে তোমার উপরে নির্ভর করি' বাঁচিয়া রয় !

মায়ের যে তুমি স্নেহের পুতলী বধূর যে তুমি জীবন সম ;
ভগিনীর তুমি আদরের ধন সকলের তুমি নিকটতম !

গৃহ-পরিবার রয়েছে তোমার তুমি কেন হেথা ডুবিতে চাও ?
পরিজন-স্নেহ-স্বরগ-ছায়ায় যাও, যাও ওগো, ফিরিয়া যাও !

সামান্ত গৃহ-মার্জ্জার হয়ে ঘরে ফিরে যদি থাকিতে পাই ;
এ জীবন চেয়ে সেও বুঝি ভালো সে সুখেরো বুঝি তুলনা নাই !

ধরো না, ধরো না, ছুঁয়ো না আমায় আমার পরশি কেমন ক'রে ;
সঙ্কোচ-হীন চরণে পশিবে ভগিনী ও মাতা বধূর ঘরে ?

এ পরশ-পাপ ছড়া'ও না তুমি মানবের মহাসমাজ-গেহে ;
যেথায় রয়েছে সতী প্রণয়িনী নির্ভয় সুখে স্বামীর স্নেহে !

পাতকিনী আমি, বিলাসিনী আমি পথমাঝে মোরে মরিতে দাও ;
হে পথিক, তুমি গৃহ-সুখছায়ে স্বজনের বুকে ফিরিয়া যাও !

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়।

# ত্রিবেণী

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রাজধানীর এক প্রান্তে দরিদ্রপল্লীর মধ্যভাগে দিব্বোক ও উদ্দোক জালিকদিগের কুটীর কয়খানি নিতান্তই দারিদ্র্য-ব্যঞ্জক নহে। মধ্যে বড় একখানি আটচালা, ইহার এক ধারে কয়েকখানা সুন্দরভাবে মার্জ্জিত সুসংবদ্ধভাবে অবস্থিত পর্ণগৃহ এবং অপর পার্শ্বে একটুখানি শাক-সব্জীর বাগান ও একটি ছোট ডোবা। তদ্‌ভিন্ন কয়েক বিঘা ধান-জমীও আছে।

পল্লীবাসীদিগের অধিকাংশই ধীবর;—প্রায় পঁচিশ ত্রিশ ঘর হইবে। এই দিব্বোক ও তাহার ভাই উদ্দোক জেলে কৈবর্ত্ত-সমাজের সমাজপতি বা শীর্ষস্থানীয়। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে একতা বা একপ্রাণতা যে কোন ভদ্রসমাজেরই অনুকরণীয় ছিল। ইহাদের একের বিপদে সমস্ত পল্লীবাসী নিজের বিপদ এবং সম্পদে নিজ সম্পদ মনে করিয়া একত্র হইতে পারিত। এই জেলেপাড়ার পরই ডোম ও বাগ্দীপাড়া। বাগ্দী-জাতীয় অধিকাংশ পুরুষই পাইক-পেয়াদার কার্য্যে ভর্ত্তি থাকে। দৈহিক বল ও বিক্রমে ইহারা প্রায় ক্ষাত্র শক্তির পার্শ্ববর্ত্তী হইতে সমর্থ—আর তাহা হইয়াও ছিল। রাজা, জমীদার, ধনী সম্প্রদায় সকলেরই অধীনে বহু দিন অবধি বাগ্দী তীরন্দাজ পাইক বা দৌবারিকও অপরিমিত পরিমাণে পোষিত হইত। প্রতিবেশী বাগ্দী পালোয়ানের নিকট কৈবর্ত্ত যুবকরা রীতিমত লাঠি-খেলা ও সর্ব্বপ্রকার ব্যায়াম-কৌশল শিক্ষা করিত। সে সময়ে উদ্দোক কৈবর্ত্তের ছেলে ভীম কৈবর্ত্তের সমকক্ষ পালোয়ান সে অঞ্চলে প্রায় ছিল না।

সন্ধ্যার কিছু বিলম্ব আছে। গত বর্ষায় বৃষ্টি কম হওয়ায় ছোট-খাট ডোবা, পুকুর এ বৎসর শীতারম্ভেই শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। উদ্দোক জেলের বাড়ীর ক্ষুদ্র ডোবাটি বাসনমাজা ভস্ম-পঙ্কে ও তদুপরি পানায় এবং কলমীলতায় প্রায় মজিয়া উঠিয়াছে। পানীয় জলের সংস্থান সেখানে কোন দিনই হয় না, এখন এমন কি, যাবতীয় গৃহকার্য্যের জন্যই জল পাওয়া কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে দিন অপরাহ্নে উদ্দোকের পুত্রবধূ ভীমের স্ত্রী উজ্জ্বলা গৃহকার্য্য ত্বরিত হস্তে সম্পাদন করিয়া সকল কার্য্যশেষে নিশ্চিন্ত শ্লথ গতিতে কলসীকক্ষে জল আনিতে চলিয়াছিল। প্রায়শঃই ইহারা দলবদ্ধ হইয়া একসঙ্গে প্রায় দশ পনের জন মিলিয়া জল আনিতে নিকটবর্ত্তী কোন গৃহস্থের গৃহসংলগ্ন পুষ্করিণীতে গিয়া থাকে; কিন্তু এ বৎসর বর্ষার অভাবে সকল পুষ্করিণীই সলিলশূন্য; কাযেই একটু দূরে মহীপালদীঘি নামক প্রকাণ্ড রাজকীয় দীঘিটি হইতেই ইহাদিগকেও জল আহরণ করিতে হয়। সে দিন উজ্জ্বলার গৃহকার্য্য সমাধায় বিলম্ব ঘটিয়াছিল, কারণ, তাহার শাশুড়ীর চরকা কাটায় তাহাকে অনেকগুলি পাইজ পাকাইয়া দিতে হইয়াছে, জ্যেষ্ঠ-শ্বশুরের জাল মেরামতের সাহায্য করিতে হইয়াছে, সাম্‌নে নবান্ন-পর্ব্ব আসিতেছে, তাহার জন্য ছোট জায়ের সঙ্গে মিলিয়া নূতন ধান কুটিতে হইয়াছে, ইহার মধ্যে নিত্যসঙ্গিনীগণ ডাকিতে আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছে, কাযেই আজ তাহার মনটা বেজার-বেজার ঠেকিতেছিল। পথটুকুও আর কম নয়, একাকিনী হাঁটিতে মন যায় কি! একটা তামার কলসী টানিয়া লইয়া সে বাহির হয়, এমন সময় উত্তর-দাওয়ার এক ধার হইতে উজ্জ্বলার দিদিশাশুড়ী ডাক দিয়া বলিল, “ওলো নাতবৌ, জলকে যাচ্ছিস্ ত, আমার লেগে একটু আগুন ক’রে দিয়ে যা না।”

উজ্জ্বলা এতক্ষণের খাটুনীর পরে বাহিরমুখো পা করিয়াই এই আদেশ পাইয়া মনে মনে একটু চটিয়া বলিল, “যাচ্ছি তা’ কি আর জন্মের শোধ যাচ্ছি, এখুনি ত ফিরে এসে গোয়াল-ঘরে সাঁজাল দিতে হবে, সেই সঙ্গে তোকেও আগুন দেবো।”

শীতভীতা বৃদ্ধা এই উত্তরে মুখ খিঁচাইয়া উঠিল—“আ মর্ মর্ ছুঁড়ী, রূপ-যৈবনের ভারে গুমরে যেন মেঝেতে পা

পড়ে না। ওলো, আমাদেরও এক দিন রূপও ছিল, যৌবনও ছিল, চিরকাল কারুর এক সমান যায় না। আগুন এক দিন তোর মুখেও কি না পড়বে ভাবছিস্!"

"তার এখনও ঢের দেরী আছে, তোদের যে মাথার উপুরে ঘুনিয়ে এসেছে"—অস্পষ্ট স্বরে এই কথা বলিতে বলিতে ক্রুদ্ধা উজ্জ্বলা কতকগুলা লতাপাতা খড়-কুটায় আগুন ধরাইয়া একটা মাটীর ভাঙ্গা গামলায় করিয়া সেটা ব্যাধিগ্রস্তা বৃদ্ধার পায়ের কাছে টিপ করিয়া নামাইয়া দিল ও তাহার পর একটি ছোট দেবর যেমন ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়াছে, অমনই তাহার গালে একটা চড় মারিয়া ঠেলিয়া দিয়া ঝঙ্কার করিয়া উঠিল, "যা যা, আর আদর কাড়াতে হবে না, জল না আন্‌লে এখুনি ত আবার 'হাক্কা' প'ড়ে যাবে। আগুন খেয়ে ত আর কারু ভর রাত কাটবে না।"

এই বলিয়া রোরুদ্যমান শিশুর দিকে দৃক্‌পাত না করিয়াই প্রকাণ্ড তামার কলসীটা টানিয়া লইয়া বাহির হইয়া যায়, আবার কি ভাবিয়া ফিরিয়া আসিয়া প্রহৃত শিশুর গায়ে মুখে হাত বুলাইয়া, চুমা খাইয়া, তাহার কানে কানে মিষ্ট স্বরে কহিল, "চুপ কর বিশু, লক্ষ্মী দাদাটি আমার! ফিরে এসে রান্‌তে রান্‌তে আজ তোকে একটা রূপকথা শোনাব।"

বিশু তখন আদর পাইয়া আদরদাত্রীকে পাইয়া বসিল। তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া সে জিদ করিয়া বলিল 'আমায় তোর সঙ্গে নিয়ে চল্।'

উজ্জ্বলা ধমক দিয়া বলিল, "মা—মা—মা! এ যে দেখি খেতে পেলে শুতে চায় রে! ভাল ত জ্বালা হলো রে বাপু, এক পহর রাত হ'তে যায়, কখন্ অত পথখানি যাব, কখনই বা ফিরবো, যা—যা, ঘাড় থেকে নাম বল্‌ছি। ও মা, বাদুড়ের মত গলা ধ'রে ঝোলে যে! শীগ্‌গির নাম্, গেলে মেরে তোর হাড়-গোড় ভেঙ্গে দেব'খুনি।"

বিশু তাহার ভ্রাতৃজায়ার আদরে শাসনে অভ্যস্ত হইয়াই এই চারি বৎসর বয়স কাটাইয়াছে, সে এই শাসনে ভীত না হইয়া তাহার আবদার বাড়াইয়া দিল। তখন অনুপায় হইয়া সেই দুরন্ত ছেলেটাকে কোলে ও কলসীটা হাতে ঝুলাইয়া লইয়া উজ্জ্বলা দাঁতে দাঁত ঘষিয়া বলিল, "চল্ তা হ'লে, রাজার দীঘিতে তোকে আজ ভাসিয়ে দিয়ে একেবারেই নিচ্ছিন্দি হয়ে ফিরে আসি গে।"

উহারা চলিয়া গেলে দিদিশাশুড়ী তাঁহার মেয়েকে ডাকিয়া সব কথা কয়টি আরও একটুখানি রঙ্গ চড়াইয়া জানাইলেন, এবং নিজেও সেই সঙ্গে মন্তব্য করিলেন—"কি ডাকাত মেয়ে-মানুষই ভীমে ছোঁড়া বে' ক'রে ঘরে আন্‌লে মা! জ্যান্ত ছেলেটাকে বলে কি না 'আয় তোকে জলে ভাসিয়ে দিয়ে আসি গে', একটু ডর-ভয়ও কি ওর পরাণটায় নেই?"

মেয়ে কহিল, "মা, তুই পাগল না কি? ওর যদি পরাণে ভয়-ডরই থাক্‌বে, তা হ'লে এই রাত পহরে সেই কোন্ রাজার দীঘিতে জল আন্‌তে যায়? দে না কেন ভীমের আর একটা বউ এনে, তোদের যেমন মায়ার শরীল। ভীমেকে ও যে পায়ের তলায় বেঁধে রেখেছে, তাই না অত তেজ! সতীন এলে কেমন দপ্প চূর্ণ্য হয়, দেখি তখন।"

শাশুড়ী কহিল, "আমার কি মা অসাধ! কত যে ভজাচ্ছি, তা না ভীমের মত আছে, না ওই অলপ্পেয়ে বুড়ো ছুটোরই মত হচ্ছে! ছুঁড়ী তুক করেছে মদ্দামানুষ কটাকে, তা কি তুই চোখ মেলে দেখতে পাচ্ছিস্ নে যে, কেবল আমারেই দুষিস্?"

"ও মা, তা আর পাই নে! কৈবর্ত্ত-পাড়ার ছাঁ-পো-ডিন সব্বাইকারই যে উজ্জ্বলী বল্‌তে মুখ দিয়ে নাল পড়ে। এক রত্তি ছোঁড়াগুলোই দেখিস্ নে, মার্‌ছে, কাটছে, তবু সেই বৌ আর বৌ, ও মা, কেন গো?"

মসী বিনিন্দিতা ভীম-জননী একটুখানি চাপা নিশ্বাস ফেলিয়া উত্তর দিলেন,—"ও, ওই ভদ্দর নোকদের মতন কটা চামড়াখানার গুণে লো, মা!"

## সপ্তম পরিচ্ছেদ

চৈত্য-বিহার-মন্দির-সৌধ-শোভাশালিনী বিপুলায়তন গৌড়-রাজধানী মহানগরী পৌণ্ড্র-বর্দ্ধনের আর এক প্রান্তভাগে মহীপালদীঘি অবস্থিত। দীর্ঘিকা অতি-বিস্তৃত, স্বচ্ছ ও সুস্বাদু সলিলরাশিতে পরিপূর্ণ। ইহার তীরদেশ ও সোপান-শ্রেণী সুমসৃণ প্রস্তর-নির্ম্মিত; তদুপরি সুদৃশ্য কারুযুক্ত প্রস্তর-বিনির্ম্মিত সুদৃশ্য বিশ্রামাসন। ঐ দীর্ঘিকার চারি পার্শ্বে সুরচিত ও সুরক্ষিত রাজকীয় উদ্যানসমূহ।

বর্ষা-সন্ধ্যার অনতিপূর্ব্বেই সেই জন-অধ্যুষিত জল-আহরণার্থিনী মহিলাকুলসমাবৃত দীর্ঘিকাতীর জনশূন্য হইয়া গিয়াছিল। ভীম কৈবর্ত্তের তরুণী পত্নী উজ্জ্বলার যদিও দৈহিক শক্তির অভাব ছিল না, তথাপি অন্যমনস্কতাপ্রযুক্ত

সে আজ যে প্রকাণ্ড তাম্রঘট লইয়া আসিয়াছে, সেটি এমনই বৃহদায়তন যে, জলপূর্ণ কলস অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে একা সে কক্ষে তুলিতে পারিতেছিল না। ইহার উপর সঙ্গে একটা ছোট ছেলে। এই দীর্ঘ পথ চলিতে অন্ততঃ তাহার হাতখানাও ধরিতে হইবে। বিপন্না উজ্জ্বলা সাহায্যার্থীর বৃথা অন্বেষণে এ-দিক ও-দিক চাহিয়া দেখিয়া কলসীটা আর একবার টানাটানি করিল, তাহার পর অনুপায়ের কোপে অদৃশ্য শত্রুপক্ষের উদ্দেশ্যে কটূক্তি করিয়া উঠিল, "গুষ্টীর পিণ্ডি চট্‌কানো যে আর শেষ হয় না, বেলাবেলি এলে ত আর এমন বিপদ্ ঘট্‌ত না। দুবার করেই যে নিয়ে যেতে পারি। এখন উপায় কি? থাক্ গে যা, সব তেষ্টায় মরে মরুক, নিয়ে যাব না ত জল।"

অনতিদূরের কামিনী ও কুরুবকের ঝাড় সহসা নড়িয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে সেখান হইতে এক সুপরিচ্ছদধারী ভদ্রলোক বাহির হইয়া জলের ধারে উজ্জ্বলার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর কোন উচ্চপদস্থ লোক বলিয়াই মনে হইল। উজ্জ্বলা এই আকস্মিক পুরুষসান্নিধ্যে ঈষৎ বিপন্না বোধ করিলেও তৎক্ষণাৎ তাহার সে ভাব দূরে চলিয়া গেল, কারণ, সে সবিস্ময়ে শুনিল যে, সেই সহসাগত ভদ্র ব্যক্তি অতি কোমল সহানুভূতিপূর্ণ মধুর স্বরে বলিতেছেন, "এসো, আমি তোমার কলসী উঠিয়ে দিচ্ছি।"

আহা! কে গো এই দয়াময়! কৃতজ্ঞতার হর্ষে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়া উজ্জ্বলা সাহ্লাদে কলসী ছাড়িয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল। বিশু ভীতভাবে তাহার গা ঘেঁসিয়া আসিল।

আগন্তুকের সবল হস্তে পূর্ণ কুম্ভ অবলীলাক্রমেই উঠিয়া আসিল। তিনি দুই হস্তে ধরিয়া তাহা কৈবর্ত্ত-যুবতীর ক্ষীণ কটিদেশে স্থাপন করিতে করিতে পুনশ্চ তেমনই মধুর স্বরে, পরন্তু করুণা-তরল-মুগ্ধ-কণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন,—"সুন্দরি! যে চারু নিতম্বে সুবর্ণ-মেখলা পরাতে পেলে এ জীবন ধন্য বোধ কর্‌তে পারতাম, সেখানে এই গুরুভার পূর্ণকুম্ভ প্রদান করা যে অত্যধিক নিষ্ঠুরতার কায। আজ্ঞা কর, দাসগণ ইহা বহন ক'রে নিয়ে যাক।"

সুরূপ, সুপরিচ্ছদধারী, সম্ভ্রান্ত পুরুষের মুখের এই স্তুতির বাণী, আকস্মিক অপরিচিত বীণা-ধ্বনির ন্যায় দরিদ্র বধূর কর্ণে ষড়জ-গান্ধারে বাজিয়া উঠিল।

উজ্জ্বলা সুন্দরী, চতুরা, হাস্যময়ী, কর্ম্মনিপুণা এবং হৃদয়বতী। দরিদ্র অশিক্ষিত গৃহে পালিতা হইলেও তাহাতে ভদ্র-সংস্পর্শ থাকায় অন্তরের পূর্ণ আকর্ষণ তাহার ভদ্র-সমাজেরই সহিত। তাহার উপর জল আনার উপলক্ষে তাহার অতুলনীয় রূপের সহায়তায় ভদ্র পরিবারের বধূ-কন্যাগণের সহিত তাহার অল্প-স্বল্প বন্ধুত্বও জন্মিয়াছিল। নিষ্ঠুরপ্রকৃতি শাশুড়ী প্রভৃতি পরিজনবর্গের নিকট কু-ব্যবহার পাইলেও, সর্ব্বদা প্রাণান্তকর শ্রমসাধ্য গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা থাকিলেও, তাহার অন্তরের নিভৃত কন্দরে একটা প্রচ্ছন্ন কাব্য-কল্পনা আত্মগোপন করিয়া বাস করিত। স্বামী ভীম তাহার রূপে মুগ্ধ ছিল, সেই জন্য মাতা ও দিদিমাতার সহস্র চেষ্টা সত্বেও সে আর দুই চারিটা বিবাহ করে নাই; কিন্তু পালোয়ান ভীম নিজের বল-বিক্রমে এবং তাহারই উৎকর্ষসাধনের চেষ্টায় এতই বিব্রত হইয়া বেড়াইত যে, একটা তুচ্ছ মেয়েমানুষের খবর লইবার অবসর তাহার বড় একটা থাকিত না। তদ্ভিন্ন ঘরের মধ্যে যে দুর্দ্ধর্ষ মাতা ও দিদিমাতা প্রভৃতি পরিজনবর্গ খড়্গ-হস্তে পাহারা দিয়া ফিরিতেছে, তাহাদিগকে এড়াইয়া পত্নী-সম্ভাষণ তাহার পক্ষে সম্ভবপরই নহে। কদাচিৎ এক এক রাত্রিতে সমস্ত সংসার নিশুতি হইলে পতিপত্নীর নিভৃত সাক্ষাৎ ঘটিতে পায়। সে ঘটনাও কিন্তু সর্ব্বদা ঘটে না।

উজ্জ্বলা যে সুন্দরী, সে সংবাদে সে নিজে কিছুমাত্রই অজ্ঞ নহে, কিন্তু আজিকার পূর্ব্বে কোন পুরুষের মুখ হইতে তাহার সে অনন্যসাধারণ রূপরাশির এত বড় স্তবগাথা তাহার কর্ণগোচর হয় নাই। তাই ইহা শ্রবণে একটিবারের জন্য তাহার সর্ব্বশরীর পুলক-লজ্জার তড়িৎস্পন্দনে শিহরিয়া নর্ত্তিত হইল, প্রবলোদিত আনন্দোচ্ছ্বাসে চোখের পাতা স্বতঃই নামিয়া আসিয়া নিটোল গণ্ড সরসরাগে রক্ত-কমলের শোভা ধারণ করিল।

সাহসপ্রাপ্ত আগন্তুক অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইয়া তেমনই আবেগ-কম্পিত কোমল কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন,—"আজ্ঞা কর, রূপরাণি! সহস্র দাস এখনই তোমার ক্ষুদ্র ইচ্ছাটি পর্য্যন্ত পালন করিয়া ধন্য হইবে। ঐ বল্লরী-কোমল দেহলতা কি এই পর্ব্বতধারণের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে? কোন্ পাষণ্ড বর্ব্বর এত বড় নিষ্ঠুরের কার্য্য করিতে সমর্থ, তাহার নামটা শুনিবার জন্য যে বড়ই কৌতূহল হইতেছে। সুন্দরি! তুমি

কোন্ ভাগ্যবানের গৃহ অলঙ্কৃত করিয়া তাহাকে চরিতার্থ করিয়াছ, এ হতভাগ্যকে তাহা জানাইবে কি ?”

উজ্জ্বলা নির্ব্বোধ নহে। ত্বরিতচক্ষুতে বারেকমাত্র সে অহাত্র সাহায্যকারী সম্ভ্রান্তবেশী পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। সঙ্গে সঙ্গেই আকস্মিক সমাগত একটা মহাতঙ্কে তাহার আপাদ-মস্তক যেন কম্পিত হইয়া উঠিল ও সচকিতে দূরে সরিয়া গিয়া সে সভয় উচ্চ কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, “আমি গরীবের মেয়ে গো, আপনাদিগের কাছে পরিচয় দেবার যুগ্যিই নই। আপনি আমায় যে দয়া করেছেন, তার জন্যে আপনাকে এই গড় করছি। আয় রে বিশু, চ’লে আয়।”

বলিতে বলিতে গুরুভার কলসী বহিয়া যতটা সম্ভব দ্রুত-পদে উজ্জ্বলা সোপান অধিরোহণ করিতে আরম্ভ করিল এবং কিছু দূর উঠিয়া কটাক্ষে পশ্চাতে চাহিয়া যখন আগন্তুককে যথাস্থানেই স্থির থাকিতে দেখিল, তখন যেন তাহার দেহে প্রাণ ফিরিয়া আসিল। একটু দাঁড়াইয়া কলসী হেলাইয়া প্রায় অর্দ্ধেকখানি জল মাটীতে ঢালিয়া ফেলিল এবং রোরুদ্যমান বিশুর হাত ধরিয়া পুনশ্চ ত্বরিতপদে নিজ গন্তব্য পথেই অগ্রসর হইতে লাগিল। শিশু বিশু তাহার সহিত সমান গতিতে চলিতে না পারায় বারংবার পায়ে উছোট লাগিয়া পতনোন্মুখ হইতেছিল এবং এই সন্ত ভয় পাওয়ার সকলটুকু ক্রোধ,চিন্তা ঐ প্রিয় শিশুটির উপর প্রয়োগ করিতে করিতে উজ্জলা তাহাকে টিপিয়া টানিয়া গালি দিয়া অস্থির করিতে করিতে পথ চলিতে লাগিল :—“আয় তোর শুষ্টীর পিণ্ডি দিই গে আয়, লোকের মরবারও একটু সময় আছে, আমার তাও নেই। সকল সময় ওঁদের ছরাদের পিণ্ডি চটকাতেই হবে। কা’ল থেকে দেখবো, কে জলকে আসে। তেষ্টায় ‘টা-টা’ ক’রে গলা শুকিয়ে থাকবে সাত গুষ্টীতে মরে।” ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কথাই সে বলিতে বলিতে বাড়ী আসিয়া ঢুকিল এবং ফিরিবামাত্রই শাশুড়ী ও দিদি-শাশুড়ী যেমন বিশুর পক্ষ লইয়া আক্রমণ করিতে আসিলেন, অমনই সে-ও তাঁহাদের দুই জনের সহিত রীতিমত কোন্দল সুরু করিয়া দিয়া শেষে শাশুড়ীর হাতের কিল খাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গোয়াল-ঘরে সাঁজাল এবং রান্না-ঘরে আগুন জ্বালাইতে গেল।

সন্ধ্যার আকাশে চাঁদ দেখা দিয়াছে, লহরে লহরে নক্ষত্রমালা গগনপথের সর্ব্বত্র ঝুলিয়া পড়িয়াছে। কুন্দ, কুরুবক, সেফালিকা প্রভৃতি উদ্যান-কুসুমরা উদ্যানের সর্ব্বত্র প্রস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। আগন্তুক সর্ব্বক্ষণই নিশ্চল হইয়া উজ্জ্বলার প্রস্থানপথের শেষ প্রান্তটি পর্য্যন্ত নির্নিমেষে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর যখন সেই অর্দ্ধস্ফুট জ্যোৎস্নালোকের ক্ষীণ ছায়ায় সেই ভীত, ত্রস্ত, চলন্ত নারীমূর্ত্তি অদৃশ্য হইয়া গেল, তখন নিজের দৃষ্টিকে সে দিক্ হইতে ছিনাইয়া লইয়া আসিয়া মৃদু মৃদু আত্মগত এই কথা বলিলেন, “এমন রূপ অনেক দিন চোখে পড়ে নাই, কিন্তু কে এ নারী ?”

সোপানোপরি কাহার পদধ্বনি শ্রুত হইল। প্রত্যাশিত নেত্রে চাহিতেই চক্ষুতে পড়িল এক কর্ত্তিতকুন্তলা, মসি-বিনিন্দিতা, বর্ষীয়সী রমণীর কুদর্শন মূর্ত্তি। তাঁহাকে দেখিয়া সেই রমণী লজ্জায় প্রায় আধ হাত ঘোমটা টানিয়া পাশের দিকে সরিয়া দাঁড়াইল। বড়ই লজ্জাশীলা !

কিন্তু ভদ্রলোকটি তাহার সেই নারীর ভূষণস্বরূপ লজ্জার আরাধনায় বিশেষ প্রীত হইলেন মনে হয় না এবং তাহার সম্মান রক্ষা করাও কর্ত্তব্য বিবেচনা না করিয়াই তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, “ভদ্রে ! জল আহরণার্থ আসিয়া থাকিলে অনায়াসেই তাহা লইতে পার, সঙ্কোচ করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।”

এই আমন্ত্রণের পর লজ্জাবতী যেমন অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া এক পা এক পা করিতে করিতে জলের ধারে আসিয়া পৌছিয়াছে, অমনই কাছে আসিয়া তিনি সমবেদনা-পূর্ণভাবে কহিয়া উঠিলেন,—“আহা, একটি পিত্তলের ঘটও কি আপনার নাই ? এই নিন, ধরুন, একটি সুবর্ণ-নিষ্ক আপনাকে দিচ্ছি, ইহা দ্বারা আবশ্যকীয় তৈজস-পত্র ক্রয় ক’রে নেবেন,” এই বলিয়া একটি উজ্জ্বল স্বর্ণখণ্ড প্রদর্শন করিলেন।

বর্ষীয়সী চন্দ্রালোকে সেই অপরিচিতমূর্ত্তি সুবর্ণ-মুদ্রাটি দেখিয়া বিস্মিত ও লোভে চমৎকৃত হইল। মুখের লজ্জাবস্ত্র অপসৃত করিয়া ফেলিয়া তৎক্ষণাৎ দন্ত-বিহীন মুখ আনন্দ-হাস্যে বিকসিত করিয়া তুলিয়া সাগ্রহে করপ্রসারণ পূর্ব্বক সহাস্যে বলিয়া উঠিল, “রাজা হও বাবা ! তোমার সোনার দোত-কলম হোক, আহা, গরীবের প্রতি তোমার এত দয়া ! বেঁচে থাক, বেঁচে থাক।”

দাতা পুরুষ ঈষৎ হাস্য করিয়া আশীর্ব্বচন গ্রহণ করিলেন, পরে তাহাকে প্রশ্ন করিলেন, “আসিবার পথে কোন স্ত্রীলোককে দেখে এসেছ কি ?”

"মেয়েমানুষ ! না বাবা, কারুকে ত দেখলুম না, জনমনিষ্যির গন্ধটি পর্য্যন্ত কোথাও নেই বাবা, আমার কেমন পোড়া বরাত—তাই এই রাত দুপুরে জল আন্‌তে এসেছি বাবা, এমন ত আর কারুর হয় না বাবা, সবার ঘরেই বউ-ঝি আছে, দাসী আছে, আমার যেমন আগুন-লাগা বরাতে সব ম'রে-ত'রে উজোড় হয়ে গেল, তেমন ত আর রাজ্যের ভাল-খেকো ভাল-থাকীদের হয় না বাবা, আমার যেমন—"

আগন্তুক পুরুষ নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া অধৈর্য্যের সহিত বাধা দিয়া পুনঃ প্রশ্ন করিলেন, "তাম্র-কলস কক্ষে শিশু সঙ্গে কোন নারীকে কি উদ্যানপথ দিয়ে ফিরতে দেখতে পাও নাই ?"

"ও মা, তাই বলুন। সে দেখবো না কেন, দেওর সঙ্গে নিয়ে ও যে ভীমের বউ, বাড়ী ফিরছে দেখে এলুম।"

"ভীমের স্ত্রী ! ভীম কৈবর্ত্তের স্ত্রী ! না না, সে যে এক আশ্চর্য্য সুন্দরী !"

এতক্ষণের পর সহসা এই অপরিচিত দাতার অপর্য্যাপ্ত করুণার গোপন রহস্য পূর্ব্বতন চৌরোদ্ধরণিকপত্নী, অধুনা বিধবা অবীরা রল্লার নিকট প্রকাশ হইয়া গেল। সে তখন মুখ টিপিয়া একটুখানি অর্থপূর্ণ হাস্যের সহিত উত্তর করিল, "হ'লে কি হয়, সে ভীম কৈবর্ত্তের বউ উজ্জলী।"

"তুমি নিশ্চিত জান, সে ভীমের স্ত্রী ?"

"হ্যাঁ বাবা ! তোমার শপথ, আমি আর ওকে চিনি নে ? বাঘতটী গাঁয়ে ওর বাপের ঘরের পাশেই এক সময়ে আমরা থাকতাম।"

সেই পুরুষ তখন অন্যমনস্কভাবে মৃদুনিক্ষিপ্তশ্বাসে যেন কতকটা আত্মগতই কহিয়া উঠিলেন, "অদ্ভুত ! রাজান্তঃপুরেও যে এত রূপ নাই !"

প্রগল্‌ভা প্রৌঢ়া এই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ সাগ্রহে বলিয়া উঠিল, "ঠিক কথাই বলেছেন বাবা, রাজবাড়ীতেও অমন রূপ নেই। তা হবে নাই বা কেন ? ও-ও ত আর ছোট ঘরের মেয়ে হয়ে জন্মায় নি, দস্যুতে ওর মা-বাপকে মেরে গেল, সেই দস্যুতেই না কি ওকে বাঘতটী গ্রামের ভভট কৈবর্ত্তের কাছে সাতট দ্রম্ম নিয়ে বিক্রী ক'রে যায়। ভীমের কপাল ভাল, তাই সে ওকে বিয়ে ক'রে ঘরে এনেছে। তা শুধু কি রূপই ? ওর শরীরে পাঁচটা হাতির বল আছে। ভীম পালোয়ানের বৌ হবার যুগ্যি বটে ! তা হ'লে এখন আসি বাবা, ঘরে দুটো কচি ছেলে-মেয়ে নিয়ে বৌমাটি রয়েছেন। ছেলেটা রাজার হুকুম পেয়ে তাঁর যশোধর্ম্মপুরের সৈন্যদলে কায করতে গেছে, ঘরে ত আর ছুটি নেই।"

ক্ষুদ্র মৃৎ-কলস পূর্ণ করিয়া বর্ষীয়সী সোপানারোহণ করিতে করিতে দেখিতে পাইল, কতিপয় উল্কাধারী পাদমূলিক এবং রাজপাদোপজীবী যেন ব্যস্তভাবে ইতস্ততঃ কাহার অন্বেষণ করিতে করিতে এই দিকেই আগমন করিতেছে। তাহারা নিকটবর্ত্তী হইয়া রল্লাকে দেখিতে পাইয়া সমস্বরে প্রশ্ন করিয়া উঠিল, "এই মাগী ! এ দিকে কি মহারাজাধিরাজকে আসতে দেখেছিস্ ?"

রাজ-ভৃত্যবর্গের এরূপ অবমাননাজনক সম্বোধনে মনে মনে যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইলেও প্রকাশ্যে ভয়-সম্ভ্রমে জড়ীভূত-প্রায় হইয়া গিয়া অস্পষ্ট স্বরে রল্লা বলিতে আরম্ভ করিয়া দিল, "আজ্ঞে না, বাবামশাইরা সব, এ দিকে ত কৈ কোথায়ও—"

কিন্তু তাহার সবটুকু কথা বলা শেষ হইবার পূর্ব্বেই তাহার পশ্চাতে কাহার গুরু পদক্ষেপ শ্রুত হইল এবং তাহার সদ্যোপরিচিত সেই সুবর্ণদাতা পুরুষের কণ্ঠ তৎক্ষণাৎ রাজ-ভৃত্যবর্গের জিজ্ঞাসার উত্তরস্বরূপেই প্রত্যুত্তর করিল,—"শুভদাস, এই যে আমি।"

সে রাত্রিতে বাড়ী ফিরিয়া ভূতপূর্ব্ব চৌরোদ্ধরণিক-পত্নী তাহার পুত্রবধূ ইচ্ছাময়ীর নিকট মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিল যে, উদ্দোক কৈবর্ত্তের পুত্রবধূ উজ্জলা এই বার কোন্ দিন পুণ্ড্রবর্দ্ধনের সিংহাসনে যদি না উঠিয়া বসে, তবে সে তাহার নাসিকা এবং কর্ণ স্বহস্তে ছেদন করিয়া আঁস্তাকুঁড়ে ফেলিয়া দিবে।

বলা বাহুল্য, এ সংবাদ পরদিন প্রাতঃসূর্য্যের অভ্যুদয় সহ অর্দ্ধ-পৌণ্ড্রবর্দ্ধনেই সুপ্রচারিত হইয়া গেল।

## অষ্টম পরিচ্ছেদ

কৈবর্ত্তপাড়ায় উদ্দোক-দিব্বোক জালিকের গৃহস্থালীতে ভোর না হইতেই বিষম রকম একটা সাড়া পড়িয়া যায়। কারণ, গৃহবাসী পুরুষগুলি প্রায় সকলেই ভোরের পাখী ডাকিতে না ডাকিতে, ঊষার আলো অস্ফুট থাকিতে থাকিতে, আকাশের গ্রহ-তারা নিবিতে না নিবিতেই ছোট বড় বালক বৃদ্ধ মিলিয়া জাল-স্কন্ধে দলে দলে মৎস্য-শিকারে বাহির হইবে। আবার মধ্যাহ্নের জ্বলন্ত সূর্য্য মাথার উপর বসিয়া

যখন তাহাদের সর্ব্বাঙ্গে তাঁহার অগ্নিময় কশাঘাত করিতে থাকেন, মস্তকের কেশ হইতে পদগ্রন্থি অবধি যখন সেই কশাহত হইয়া রক্তস্রোতের মতই ঘর্ম্মস্রোত প্রবাহিত হইতে- থাকে, যখন উদরের সমস্ত নাড়ীগুলার প্রচণ্ড ক্ষুধায় টান ধরিতে থাকে, তখনই তাহাদের বাড়ী ফিরিবার কথা মনে পড়িয়া যায়। তখন আবার শ্রান্ত শরীরে ক্লান্ত-পদে দীর্ঘ পথ ফিরিয়া আসা! ইহার ভিতর কোন্ খালের ধারে, কোন্ বিলের মধ্যে, কোন্ নদীর বক্ষে এই ধীবর-পরিবারের বৃদ্ধ, যুবা এবং বালকের দলকে না দেখা যায়? ইহাদের ছোট ছোট জেলে-ডিঙ্গীগুলি মোচার খোলার মত নদীর স্রোতের বিপরীতে জাল টানিয়া লইয়া যায়। ধৃত মৎস্য আহরণে সমুৎসুক আরোহীর দল নদীবক্ষ মুখরিত ও সচকিত করিয়া তুলে। আবার মধ্যে মধ্যে কোন প্রকাণ্ডকায় রোহিত-কুলপ্রদীপের সন্দর্শন মিলিয়া গেলে তাহারই বিজয়ানন্দের উচ্চরোলে অপরাপর নৌকা-রোহী এবং স্নানার্থীর দলও চকিত হইয়া তাহাদের দিকে চাহিয়া দেখে এবং সমুৎসুক হইয়া তাহাদের সেই আনন্দ-গৌরব উপভোগও করিয়া লয়। "অত বড় মাছ নিয়ে কি করবে? কেটে বেচবে, না রাজ-বাড়ীতে আস্ত পাঠাবে?" এই জিজ্ঞাসার উত্তর তাহাদের বহুবার না দিয়া রক্ষা নাই। প্রৌঢ়ের দল এ প্রশ্নের উত্তরে প্রায় বিনীতভাবে "আজ্ঞে, রাজ-বাড়ীতেই এটা পাঠাব স্থির করেছি" এমনই ধারাই উত্তর দিত, কিন্তু উদ্দোকের জ্যেষ্ঠ পুত্র ভীমের সাক্ষাতে এরূপ প্রশ্ন উঠিলেই সে সদম্ভে হয় ত জবাব দিয়া বসিত—"কেন, তাই বা রোজ রোজ দিতে চল্লুম ক্যান? রাজা ছাড়া কি ভাল মন্দ জিনিষটা খাবার ক্ষমতাও কাউকে দেয় নি দেবতারা? এটাকে আজ ভাগা দিয়ে দিয়ে হাটের মধ্যে বেচতে পাঠাবো, যার যার খুসী হবে, সেই সেই কিনে কিনে খাক্ না।"

এই কথা শুনিয়া প্রবীণের দল ঈষৎ বিষণ্ণ হইত। "আহা, এত বড় জীবটেকে কেটে খণ্ড করবি, ভীমে! তার চেয়ে বরং রাজবাড়ীতে তাজা জিনিষটা দিয়ে এলে দামটাও নগদে হাতে আসবে, আর—"

যৌবন-বলদৃপ্ত ভীম তাহার কেশবহুল প্রকাণ্ড মাথাটাতে প্রবল বেগে একটা ঝাঁকানি দিয়া এই চিরন্তন যুক্তিকে তাহার মেঘগম্ভীর ও প্রতিজ্ঞা-স্থির দৃঢ়স্বরে তৎক্ষণাৎ পাল্টা জবাব দিয়া বসিত, "না হোক্ নাই হোক্ গে নগদ পয়সা, তা ব'লে রোজ রোজই ভাল জিনিষটে যে ঐ এক জনকেই খেতে হয়, এমন ত কিছু কথা নেই, হাটে বেচে আমি তোদের নগদ পয়সাই এনে দেব, তাই হলেই হবে ত!"

ভীমের কথার যে নড়-চড় নাই, তাহা আজ আর নূতন করিয়া কেন, যে দিন হইতে এই শিশুটির তাহাদের ঘরে প্রথম বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইয়াছে, সেই দিন হইতেই তাহাদের উত্তমরূপে জানা আছে; তাই তাহারা বিশেষ অনিচ্ছা থাকিলেও বড় সহজে তাহার কথায় বাদ-প্রতিবাদ করে না।

জালিকের দল বাড়ী ফিরিলে তাহাদের পরস্পর সংলগ্ন গৃহগুলি একসঙ্গে ব্যস্ততা ও কলরবের কলরোলে মুখরিত হইয়া উঠিতে থাকে। ভিজা জাল টাঙ্গানো, মৎস্য-সম্ভার হাটে পাঠানো, তাহার পর একটুখানি বিশ্রামান্তে ভিজা ছোলা ও গুড় দিয়া জলযোগ এবং সঙ্গে সঙ্গেই আঙ্গোট কলাপাতে স্তূপীকৃতভাবে ঢালিয়া দেওয়া কখন আউস, কখন আমন ধান-কোটা আরক্তাভ অন্নরাশির ধ্বংস-সাধনে বসিয়া পড়া! এই সকল কার্য্য সমাধার পর কিছুক্ষণের জন্য গৃহস্থালী একটুখানি নিস্তব্ধ হইত, তবে দিব্বোকের বাড়ীতে না কি নিস্তব্ধতা জিনিষটার সহিত গৃহবাসীদিগের বিরোধ ছিল, তাই সে গৃহ দিবসোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হইয়া রাত্রি দেড় প্রহরাবধি সকল সময়েই প্রায় শিশু, কিশোর, যুবা, বৃদ্ধ সকল বয়সের নরনারীদিগের কর্কশ চীৎকারের কলহ-কোলাহলে ভরিয়া থাকিত। প্রথমতঃ উদ্দোক-পত্নী [illegible] দিব্বোক-পত্নী এই জা-দ্বয়ের পরস্পরের প্রতি আক্রমণের জন্য স্থানকাল কোন কিছুরই বাধা বাধিত করিতে পারে না। তাহার উপর উদ্দোকের শাশুড়ীঠাকুরাণীটির না কি কলহ-বিদ্যায় পারদর্শিত্ব ঐ অঞ্চলের মধ্যে একান্তই সুব্যক্ত, সেই ঠাকুরাণীটির নিজ গৃহখানিতে অগ্নিসংযোগ হওয়ায় এবং অপর সেবাধিকারী বর্ত্তমান না থাকায় জামাতৃ-গৃহবাস-গৌরবে এ গৃহের কলহকাণ্ডের সুবর্ণযুগের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল বলা যায়।

বাতব্যাধিতে অষ্টাবক্রাবস্থায় দড়ি-ছাওয়া খাটুলীতে বসিয়া বসিয়া তিনি শ্যেনদৃষ্টিতে পৌরজনের ত্রুটি খুঁজিতে থাকেন, আর সুযোগ পাইবামাত্র সেই অনুসন্ধানফল-গুলিতে ( প্রায় সমান সমান, কখন বা কিছু মাত্রাধিক্য

ঘটিয়া যায় ) বর্ণসমাবেশ পূর্ব্বক সেগুলি তাঁহার শান্ত-প্রকৃতিশালিনী কন্যারত্নের কর্ণকুহরে ঢালিয়া দিয়া পরিতৃপ্ত করেন। ফলে বাড়ীর মধ্যে সদাসর্ব্বদাই প্রায় রাম-রাবণের যুদ্ধ লাগিয়া থাকে।

সে দিন গৃহস্বামীদিগের গৃহে ফিরিতে বিলম্ব ঘটিয়া গিয়াছিল। বিলের জলে দিব্বোকের কনিষ্ঠ জামাতাকে জোঁকে ধরে, তাহা ছাড়াইতে খানিকটা সময় লাগে। সচিব-পুত্র বোধিদেবের বিবাহ-ভোজের জন্য সে দিন প্রচুর পরিমাণে মৎস্যাহরণের প্রয়োজনীয়তার জন্য একেই প্রায় অর্দ্ধ-রাত্রি হইতে বিপুল পরিশ্রম করিতে হইয়াছে, তাহা ব্যতীত মাথার উপর প্রায় আড়াই প্রহরের প্রখর সূর্য্যতাপ ও নিদারুণ ক্ষুৎপিপাসার দুঃসহ জ্বালা! গৃহাভিমুখীন জালিকরা সে দিন গৃহ-পথের দৈর্ঘ্যে যেন অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিল। সকলেই ঘন-ঘন অদূরস্থ ঘনায়মান নারিকেল-কুঞ্জের মাথার দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ধীবর-পল্লীর দূরত্ব পরিমাপ করিতে করিতে চলিতেছিল, উহার পাশেই যে তাহাদের গম্যস্থান। —রাস্তায় তাহাদেরই মত কর্ম্মব্যস্ত অল্প-স্বল্প লোকজন গমনাগমন করিতেছিল, দুই ধারে বিপণি-শ্রেণীতে কেনা-বেচা ক্ষণকালের জন্য বন্ধ হইয়া রহিয়াছে, প্রাসাদ-ভবনে গৃহবাসিগণ দ্বৈপ্রহরিক বিশ্রাম-সুখভোগে নিরত।

পথের প্রান্তে কুকুরগুলাও কুণ্ডলী পাকাইয়া পড়িয়া আছে। জালিকের দল ধীবর-পল্লীর মধ্যে পা দিয়াই একটা ঘোরতর কোন্দলের সাড়া পাইল। শব্দটা যে উদ্দোক জেলের কুটীরের দিক্ হইতেই আসিতেছিল এবং ঐ কাংস্যকণ্ঠও যে ভীম-জননীর, তাহা অনুমান করিতে কাহারও অণুমাত্র বিলম্ব ঘটে নাই। আজ এই ক্ষুৎপিপাসায় পীড়িত ও বিশেষভাবে পরিশ্রান্ত হইয়া আসিয়াই এমন অসময়ে কোন্দলের কচকচি শুনিয়া সকলকারই মন একটু দমিয়া গিয়াছিল, বিশেষতঃ বয়স্ক দুই জন ইহাতে বিশেষ বিপন্নই বোধ করিল। উদ্দোক নিজের কপালে একটা ঘা মারিয়া কহিয়া উঠিল, "ওকেও যমে নেবে না, আমারও মরণ লেখেনি দেবতায়! এই তেতে-পুড়ে তেষ্টায় টাটা করছে পরাণটা, এক্ষুনি আর ও বাজখেঁয়ে চীৎকার সয় কখনও!"

দিব্বোক জেলে গম্ভীর হইয়া জবাব করিল, "মাগী দুটোর গলা চিরে রক্ত ছোটে না যে কেমন ক'রে, আমি ব'সে ব'সে সেই কথাটারই বিচার করি! তা উহু, তোর আর ভাবনা কিসের, ভীমের বউবেটীটা তবু যা হোক্ একটা মানুষের মেয়ে আছে; ভাত-জলটা সেই ত এখন দেয় তোকে, বরাতে দুঃখু লেখা আছে এই আমারই! আবাগীর পেটের বেটী দুটোও ঐ আবাগীদের মতনই না কোঁদল করতে আছে। তেলরত্তি খ্যায়, কি জলঘট্‌টে খ্যায়, তারই যুগ্যতা নেই মোটে কারুর।"

## নবম পরিচ্ছেদ

বাড়ী পৌছিয়া সে দিন দেখা গেল, ব্যাপার কিছু গুরুতর! গত রাত্রিতে দিদিশাশুড়ীর 'লাগানীর' দায়ে শাশুড়ীর হাতের ঠোনা খাইয়া উজ্জ্বলা আজ সকাল হইতেই বাঁকিয়া আছে, কিছুতেই সে আজ তাঁহার বাতে বাঁকা গায়ে-পায়ে তেল ডলিতে যায় নাই; বিশু ও-বাড়ীর ধনার ছোট ছেলেকে ইট ছুড়িয়াছিল বলিয়া তাহাকে দিয়া উহাদের কাছে সে মাপিয়া সাত হাত নাক-খত দেওয়াইয়াছে, ধান কুটিয়া প্রত্যহ প্রতিদিনের খরচের জন্য চাউল করার বেশীর ভাগ খাটুনী তাহার বিবাহের পর হইতে সে-ই খাটে; আজ কিছুতেই ঢেঁকি-ঘরে সে পা মাড়াইল না। শাশুড়ী রাগ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, অমন বউকে ঢেঁকিতে ফেলে কুটে ফেলাই উচিত! উজ্জ্বলারও ত মুখখানি বড় কম নয়, সে-ও তৎক্ষণাৎ শাশুড়ীর মুখের উপর ফের্‌তা জবাব দেয়— "ঢেঁকিতে ফেলে আমায় কুট্‌লে গুষ্ঠীশুদ্ধর কুঁড়ো পাথরটা ভরাবে কে গো? ধানের গাদা ভানাটি ত আর রোজ সোজা কথাটি নয়! তোমার আদুরে মেজুনী, সেজুনী, ছুট্‌কী ওঁদের দিয়ে কি সে কাযটি এক বেলার তরে হবে?"

শাশুড়ী বলেন, "হয় কি না হয়, তুই পোড়ারমুখী ব'সে থেকে একটা বেলা দেখ ত দেখি, কেমন বা না হয়! মুখের উপর আবার চোপা শোন না? কেন, তুই যখন এ বাড়ীতে আসিস্ নি, তখন কি আমার সোয়ামী-পুত্তুররা সব উপোসীই থাক্‌তো না কি লা? শতেকখোয়ারীর ঝি! তোর দিব্যি রইলো, যদি তুই আজ কিচ্ছুটিতে আমার হাত ঠেকাবি!"

তাহার ফলে এই ঘটিয়াছে যে, বাড়ীশুদ্ধ মিলিয়া এতক্ষণে ধান ভানিয়া সেই ধান-ভানা চাউলের ভাত সবেমাত্র

উনানের উপর চড়ানো হইয়াছে, তাহার উপর আখায় দিবার কাঠ ফাড়া নাই এবং সেই মোটা কাঠের গুঁড়ি ফাড়িবার মত শক্তিও ইহাদের অপেক্ষা ঐ উজ্জ্বলারই বেশী। বিপন্ন হইয়া এখন উহাকে দু'খানা কাঠ চিরিয়া দিতে বলায় সে কথা যেন তাহার কানেই ঢুকে নাই—এমনই করিয়াই সে নীরব রহিল।

তাহার পর সকলকার কাঠ লইয়া ধস্তাধস্তি দেখিয়া মুখ টিপিয়া হাসি চাপিতে চাপিতে সেখান হইতে উজ্জ্বলা গমনোদ্যতা হইল। ইহা দেখিয়া তাহার সেজ ও ছোট 'জা' মিনতি করিয়া কহিল, "দিদভাই, দুখান চেলিয়ে দিয়ে যা না ভাই, তোর পায়ে ধরি।"

উজ্জ্বলা কোন উত্তর করিল না। মেজবৌ নথ নাড়া দিয়া একটু তিক্তকণ্ঠে কহিল, "দিলে কি তোমার মান যাবে গা? স্বোয়ামী-শ্বশুর এসে খেতে পাবে না—সেটা কি খুব আহ্লাদের কথা হবে?"

উজ্জ্বলা এবার গর্ব্বিত তাচ্ছীল্যের সহিত উত্তর করিল, "তা না পায় না পাবে,—আমার কি ব'য়ে গেল?"

এই বলিয়া সে দৃঢ় গম্ভীর পদক্ষেপে রান্নামহলের পিছন দিকে পগারের ধারে গিয়া ঝুপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল ও নিতান্ত শান্তভাবে বসিয়া বসিয়া কান খাড়া করিয়া গৃহস্থবর্গের দুরবস্থার সকল তথ্য সংগ্রহ করিতে লাগিল। মুখে গাম্ভীর্য্য থাকিলে কি হয়, মনের মধ্যে তাহার যথেষ্ট তৃপ্তির আনন্দ উঁকি দিয়া উঠিতেছিল।

এ দিকে কোন রকমে আধসিদ্ধ ভাতের হাঁড়ি দুই জনে ধরাধরি করিয়া নামাইয়া ডাল চড়াইতে না চড়াইতেই পুরুষের দল আসিয়া বাড়ী পৌঁছিল এবং তাহাদের আসার সাড়া পাইবামাত্রই রণরঙ্গিণী-মূর্ত্তি ধরিয়া ভীম-জননী সনকা গলা ফাড়িয়া বধুর উদ্দেশ্যে গালির ফোয়ারা উৎসারিত করিয়া দিল।

"দূর ক'রে দে, দূর ক'রে দে; মুড়ো খ্যাংরা মার্‌তে মার্‌তে চুলের ঝুঁটি ধ'রে টান্‌তে টান্‌তে শতেকখোয়ারীকে দূর ক'রে দে—জ্যান্ত মুখে নুড়ো জ্বেলে দিয়ে আয়"—ইত্যাদি ইত্যাদি—

উদ্দোক অঙ্গনে পা দিয়াই বিরক্তি-বিপন্ন কণ্ঠে উজ্জ্বলার উদ্দেশ্যে ডাকিয়া উঠিল,—"পাগলা বেটী! এক ঘটী জল নে' আয় ত, বাবা! তেষ্টায় গলা বুক কাঠ হয়ে গেছে। সর্ব্বশরীরে টাঁক ধ'রে যাচ্ছে?"

সনকা বধুর প্রতি স্বামীর এই 'আধিক্যেতার' আদরে হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়াই থাকে, আজ আবার এ সময়ে তাহারই প্রতি এই অযোগ্য আদর দেখিয়া তাহার পিত্ত অবধি জ্বলিয়া উঠিল; কোপে কপিশবর্ণ ধারণ করিয়া কর্কশ চীৎকারে সে চেঁচাইয়া উঠিল—"দেবে, তোমার আদুরে বৌ তোমার ছেরাদ্দর পিণ্ডি চট্‌কে দেবে। বড় যে বলা হয়, আমি রাঁড়ীই যত না মন্দ, বেটার বৌ তোমার বড়ই না কি গুণবতী! এখন নিজের চোখ দুটোর যদি মাথাটা না একেবারে খেয়ে ফেলে থাক, তা হ'লে সে দুটোকে মেলে ধ'রে একবারটি নিজের চোখেই দেখে যাও দেখিন, তোমার বিদ্যেধরী পুতের বউ-ঠাক্‌রুণ এর ভেতর কোন্‌খানটায় আছেন! এত বড় দস্ত মেয়েমানুষের—সকাল থেকে আজ একখানি কুটি ভেঙ্গে দুখানি করাতে পারলুম না, উনি কি না রাজার রাণী, আসনপীড়ি হয়ে ব'সে আছেন, আর আমি এই বুড়োবয়সে হাড়ভাঙ্গা খাটুনী খেটে খেটে মরতে লেগেছি। কেন, আমার কি একার সংসার? আর কি কেউ খাবে না, আর কি কেউ নিজে গব্‌গবিয়ে গিল্‌বে না যে, আমায় একাই সব ভার বইতে হবে?"

সহসা সেই সময়ে বিরক্তিপরুষ একান্ত গাম্ভীর্য্যময় ভীমের মুখের উপর চোখের দৃষ্টি পড়িতেই ভীম-জননীর কণ্ঠ হইতে আবার বর্ষাকাশের মেঘ গুরু গুরু শব্দে গর্জ্জিয়া উঠিল;—"বলি ওরে ও হতভাগীর পুত! বলি, কটা চামড়াখানা কি এতই মিষ্টি যে, তার লেগে ওই দস্যি দামাল মেয়েমানুষের পায়ের তলার ছুঁচো হয়ে প'ড়ে থাকতে হবে? এই তোকে ব'লে রাখলুম, ভীমে, যদি তিন দিনের ভেতর ওটাকে লাথি মেরে দূর ক'রে তাড়িয়ে দিয়ে তুই আমায় আর একটা বউ এনে না দিবি ত তোর উপরে তোর বাপের দিব্যি রইলো।"

ভীমের জলদগম্ভীর মুখে এই কঠোর মাতৃ-আদেশে মুহূর্ত্তমধ্যে একবারের জন্য একটা ব্যথার বিদ্যুৎ চকিত হইয়া উঠিয়াছিল; পরক্ষণেই সরোষ লজ্জায় সেটা ঢাকা পড়িয়া গেল। সে রোষ-ক্ষুব্ধ কণ্ঠে সবেগে বোধ করি মায়ের আদেশপালনেরই প্রতিজ্ঞা যেন তৎক্ষণাৎই করিতে যাইতেছিল, কিন্তু অকস্মাৎ বাধা প্রাপ্ত হইয়া সেই উদ্যত কঠিন

প্রতিজ্ঞার কঠোর বাক্যপ্রবাহ তাহার ক্রোধস্ফুরিত ওষ্ঠাধরের গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া রহিল। একান্ত বিস্ময়াশ্চর্য্যের সহিত সে শুনিতে পাইল, তাহার মায়ের কাছে চির-সহিষ্ণু বুড়া বাপ আজ সম্পূর্ণরূপেই তাহার বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়া যথাসাধ্য তীব্র কণ্ঠে প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছে—“খবরদার ভীমে! পাগলীর গায়ে হাত তুল্‌বি কি, আমি তক্ষুনি তার হাত ধ’রে বাড়ীর বা’র হবো! বুঝে কায করিস্ ব্যাটা, বুড়ো বয়েসে বাপকে তোর থানছাড়া করিস্ নে যেন।”

এই অলঙ্ঘ্য আদেশে রুদ্রপ্রকৃতি ভীম ঝঞ্ঝা-তাড়িত নদীস্রোতের মত চঞ্চল-বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিল।

“তা’ হ’লে বউ নিয়ে আর বউ-সোহাগী বাপ নিয়েই তুই রৈলি ভীমে, পরব জেলের ঝি কারু পায়ে তেল দিয়ে তার আটচালাতে বাস করে না। এই রৈলো তোদের ঘর-কন্না, বুজে সম্‌জে নিয়ে নিস্ সব, আমার বুড়ো মায়ের হাত ধ’রে গাছতলায় ব’সে ভিথ্ মেগে খাব, তবু তোর ধিঙ্গীনাচন বউএর পা ধোয়ানো পারবো না?”—ক্রোধে কাঁপিয়া ফুলিয়া রণরঙ্গিণীমূর্ত্তি সনকা স্বামি-পুত্রের উপর একটা অগ্নি-দৃষ্টি হানিয়া সমবেত দর্শকমণ্ডলীর মধ্যবর্ত্তিনী, যষ্টি-হস্তে কোনমতে দণ্ডায়মানা মাতৃমূর্ত্তির উদ্দেশে হাঁকিয়া উঠিল—“আয় লো মাই আয়, আমরা মায়ে-বেটীতে এ পোড়া বাড়ীর বা’র হয়ে যাই আয়। কিন্তু তুইও ভাল ক’রেই এই কথাটা আজ থেকে জেনে রাখিস্ ভীমে! ঐ বউ হ’তেই তোর যদি সর্ব্বনাশ না ঘটে, তবে আমি তোর মা নই। তুই কি ভেবেছিস্, ও ছিরকাল ধ’রেই তোর ঘরেই ঘর করবে? তুই কি মনে ভাবিস, তোর প্রতি তার অন্তরের কোণেও একরত্তা একটু টান আছে? ও ভদ্দরলোক-ঘেঁষা কটা-চামড়ার ছুঁড়ী, ও হ’তে যদি না এই সদ্দার-বংশের নাম ডোবে, তা হ’লে আমায় তোরা—”

“থেমে থাকো, ফের যদি একটা কথা কবে, তা হ’লে ঐ জিভখানাকে সাত হাত ক’রে টেনে বা’র ক’রে আঁস্তাকুঁড়ে ফেলে দেব। শাউড়ী ব’লে মনের কোণেও তোমায় ক্ষ্যামা দেব না।”

ধীবর-পল্লীর দ্বিশতাধিক ব্যক্তি আজিকার এই রঙ্গভূমে সমবেত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে ক্ষুৎপীড়িত শিশুর দল, ক্রীড়া-চঞ্চল বালক-বালিকাবৃন্দ, শ্রমকাতর বৃদ্ধসকল এবং কার্য্যপরায়ণা গৃহিণী, কন্যা ও বধূগণ সকলেই নিজ নিজ উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া গিয়া কেহ ভীত, কেহ বিস্মিত এবং কেহ বা পুলকিতচিত্তে এই কোন্দলের রসোপভোগ করিয়া লইতেছিল। উজ্জ্বলার দৃপ্তস্বভাব ও দীপ্তমূর্ত্তি এ সংস্কারের নারীদিগের মধ্যে—বিশেষ করিয়া আবার কম-বয়সীদের মধ্যে অনেকেরই চক্ষুঃশূল; পথে, পল্লীতে, ঘাটে ও বাটে যে কেহ তাহাকে দেখে, সেই সবাইকে তুচ্ছ করিয়া তাহার রূপের প্রশংসায় শতমুখ হইয়া উঠে। ভদ্রঘরের মেয়েরা তাহারই সহিত সাধিয়া কথা কয়। আবার নিজের ঘরের পুরুষরাও কি না তাহারই গৌরবে আত্মহারা! তাহার উপর, খাটিতে পারে সে অসুরের মত। তাহার নিজের শাশুড়ী ছাড়া অপর সমুদয় শাশুড়ীই নিজ নিজ বধূকে উঠিতে বসিতে তাহারই কর্ম্মশক্তির উপমা দিয়া লাঞ্ছনা করিয়া থাকেন, বুড়া-বুড়ীদেরও সে যেন চোখের মণি, কাহারও জাল মেরামত করিয়া দিতে, কাহারও বা মাথার পাকা চুল তুলিতে, উকুন বাছিতে, কাঁথা সিয়াইতে—সকল কাযেই উজ্জ্বলী বউ আগে-ভাগে ছুটিয়া যাইবে। আবার ছোট ছেলেরাও কি না ঐ হতচ্ছাড়ীর তেমনই বশ! মার খায়, তবু সঙ্গ ছাড়ে না। কাহার গুলী-ডাণ্ডা তৈয়ারী করিতে হইবে, কাহার ভঁাটা গড়াইয়া দিতে হইবে, কাহার একটা ছাক্‌নি-জালের দরকার, সবাই ঘুর্‌বে ঐ উজ্জ্বলী বউয়ের পাছে পাছে। আর এ সব ছাড়া সব চেয়ে বেশীর ভাগ বিরাগ সকলেরই এই জন্য যে, অন্য জেলের ছেলেদের প্রায় সকলেরই ঘরে দুই বা ততোধিক করিয়া বিবাহিতা এবং তাহারও উপর আবার কাহারও কাহারও এক আধখানা উপসর্গ না কি আছে বলিয়া শুনা যায়; কিন্তু কোন-কিছুই নাই না কি কেবল একমাত্র ঐ উজ্জ্বলী-বউয়ের বর ভীমের, এটা বড়ই অসঙ্গত ও যুবতীবৃন্দের পক্ষে একেবারেই অসহনীয়! তাই উপযুক্ত সন্তানের প্রতি যখন তাহার জীবিত ও সশরীরে সে স্থানে বর্ত্তমান পিতার দিব্য দিয়া স্ত্রীকে ঝাঁটা-পেটা করিয়া বাহির করিয়া অপর স্ত্রী গ্রহণ করিবার জন্য স্নেহময়ী জননী আদেশ প্রচার করিয়া দিলেন, তখন অনেকগুলি নারীর ঠোঁটের পাশে হাসির বিজলী যে উঁকি-ঝুঁকি মারিয়াছিল, তাহা বড়ই সুপ্রত্যক্ষ। উজ্জ্বলার দুই জা পিঙ্গলা ও সূর্য্যি এই প্রস্তাব শুনিয়া পরস্পরে চোখ ঠারিল, দুই জনে দুই জনের কানের কাছে

ফিস-ফিস করিয়া বলিল—"তাই ব'লে অত বাড় ভাল নয়, ঝড়ে ভেঙ্গে যাবে।"

তাহার পর যখন কোথাও কিছু নাই, অমনই খামোকা গায়ে-পড়া হইয়া উদ্দোক বুড়া হঠাৎ ফোঁস করিয়া ফণা তুলিল, তখন অনেকগুলা বুকের মধ্যেই উদ্যত আশার স্রোত ধাক্কা খাইয়া ছাঁৎ করিয়া থমকিয়া পড়িল। কোন কোন নিরাশাহতা মহিলা ঐ অযাচিত করুণাপরায়ণ ও বয়োবৃদ্ধ লোকটির উদ্দেশ্যে চোখের মধ্যে বিষ-বাণ হানিয়া মনে মনে উচ্চারণ করিল, "মরণ আর কি ড্যাকরা মিন্‌ষের!"

এমন সময় সেই দ্বিশতাধিক কৈবর্ত্ত-পরিবার যেন আকস্মিক বজ্রপাতরবে একসঙ্গে চমকিত হইয়া উঠিল। আজিকার এই রঙ্গভূমির প্রধানা অভিনেত্রী কোথায় অদৃশ্য থাকিয়া এতক্ষণের পর অতিশয় অতর্কিতেই আবির্ভূতা হইলেন। সকলেই যেন মনে মনে ইঁহারই প্রতীক্ষা করিতেছিল, তবে নিতান্ত দুই এক জন হিতৈষী ব্যক্তি প্রমাদ গণিয়া ব্যগ্র হইয়া উঠিল।

উজ্জ্বলার এই আকস্মিক প্রবেশ ও স্বামীর ঐ প্রকার ভীষণ মন্তব্যে ক্ষণকাল অভিভূতাবৎ থাকিয়া অবশেষে বর্দ্ধিতরোষা ভীমজননী একবার স্বামিপুত্রের স্তব্ধমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিল ও তাহার পর গগনবিদারী আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—"ওরে, এত কালের জেলে মরদগুলো ম'রে গেছে রে! ওরে আমার স্বোয়ামী-পুত্তুর বেঁচে থাক্‌লে আমার কখন বউএর হাতে মরণ ঘটে রে—"

একে ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর, তাহার উপর এত বড় হাঙ্গামায় আজ ভীম মায়ের প্রতি একটু বিশেষভাবেই ক্রুদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু পিতৃমাতৃভক্ত পুত্রের তাহা প্রকাশ করিবার শক্তি না থাকায় ক্রোধের অধিকাংশই বধূর প্রতি ধাবিত হইয়াছিল; এখন উজ্জ্বলাকে ঐ অতগুলি মান্যগণ্য পুরুষের সাক্ষাতে নির্লজ্জভাবে ছুটিয়া আসিতে দেখিয়া এবং তাহার মায়ের প্রতি অবমাননাজনক বাক্য প্রয়োগ ও আক্রমণোদ্যত ব্যবহারে তাহার বিরক্তিটা ক্রোধের আকার ধারণ করিল। উজ্জ্বলার সেই দৃপ্ত মূর্ত্তির প্রতি দৃষ্টি হানিয়া সে দাঁতে-দাঁতে ঘর্ষণ করিয়া কহিল,—"তোর কি মরণ হয় না, হতভাগী!"

উজ্জ্বলা স্বামীর মুখ হইতে এই তীব্র তিরস্কার লাভ করিয়া চঞ্চল তড়িৎমূর্ত্তির মতই সবেগে তাহার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল, মুখে তাহার অর্দ্ধাবগুণ্ঠনমাত্র ঢাকা ছিল, তাহাতে তাহার বিদ্যুতে ভরা বিশাল নেত্র ঢাকা পড়ে নাই, সেই বড় বড় কালো চোখে তীব্র রোষের আলো জ্বালিয়া সে অকুণ্ঠিত মুখে স্বামীর ভৎর্সনার প্রত্যুত্তর করিল, "কেন, তা হ'লে মায়ের পছন্দসই আর একটা এনে দেবে? তা আমি মরি বা না মরি, তাতেই বা তোমাদের কি আটক হচ্ছে? কেন দশটা আর অমনিতেই এনে দাও না—বারণ করবে কে তোমায়? দিলেই ত হয়।"

ভীম তাহার বজ্রহস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া হুঙ্কার ছাড়িল—"থাম্ শীগ্‌গির, ফের চোপা করছিস?"

উজ্জ্বলা নির্ভয়ে দুই পদ অগ্রসর হইয়া আসিয়া স্বামীর ঠিক সম্মুখে দাঁড়াইল। উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল,—"কেন, মারবে না কি? তা মার না এসে, মায়ে যা কয়েছে, তাই করবে এস—বউটা মেরে দূর ক'রে দাওসে—"

"তোর মরণ ঘুনিয়ে এসেছে দেখছি"—বলিয়া ভীম সবেগে অগ্রসর হইয়া যাইতেই ভীমের জ্যেষ্ঠতাত দিব্বোক আসিয়া উভয়ের মাঝখানে দাঁড়াইল;—

"ভেমা! ঘরের লক্ষ্মীর গায়ে হাত তুলিসনে, বাবা! আর যা করিস্ তা করিস্।" উজ্জ্বলার দিকে চাহিয়া বলিল, "ছোটলোকের মেয়ের মতন খাওয়া-খাওয়ি করা কি ভাল? যা', শাশুড়ীর পায়ে ধ'রে মাপ চা গে, নে, আয়।"

উজ্জ্বলা বিদ্যুতের মত ছিট্‌কাইয়া পিছনদিকে সরিয়া গেল, স্বামীর দিকে একটা তীব্র রোষদৃষ্টি হানিয়া লইয়া সে ক্রোধগম্ভীর স্বরে উত্তর করিল—"আমার ব'য়ে গেছে পায়ে ধর্ত্তে, আমি আর এদের বাড়ী থাক্‌বো কি না।"

বলিয়া সে খর-চরণে খিড়কীর দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল। তাহা দেখিয়া তাহার কালিন্দী-সদৃশী শাশুড়ী দাঁতে-দাঁতে কিড়মিড় করিয়া কহিল—"যাবি কোন্ চুলোয় লো চুলোমুখী! কোন্ কুলে কে আছে যে সেইখানে যাবি? তবে যদি—"

শাশুড়ীর এই সুমন্তব্যের মাঝখানে হঠাৎ দাঁতে-দাঁতে চাপিয়া পিছন ফিরিয়া উজ্জ্বলা ধমক দিয়া কহিয়া উঠিল, "চুপ!" তাহার পর পিছন ফিরিয়া খিড়কির দ্বার দিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

উদ্দোক তাহার দাদার দিকে ব্যাকুল চক্ষুতে চাহিল,

তাহার পর ছেলের দিকে মুখ ফিরাইয়া তাহাকে নির্ব্বিকার দেখিয়া কাতর হইয়া কহিতে লাগিল—"কোথায় গেল দেখ দিকি রে—"

ভীম গুম্ হইয়া উত্তর করিল, "যাক্ গে, মরুক্ গে !" বলিয়া সেও দুম্‌দুম্ শব্দে তাহার বলিষ্ঠ পা ফেলিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। ভীমের মা তখন নির্ভয় তেজের সহিত কটুক্তির বহু ভাষা বধূর উদ্দেশে প্রয়োগ করিতে করিতে মন্তব্য করিলেন—"এখনই আবার আস্‌বে না ত যাবে কোথায় ? তবে যদি—হুঁঃ তবে যদি—"

প্রবীণ দুই জনেই দুই হাতে দুই কান ঢাকা দিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া উচ্চারণ করিয়া উঠিল—"আঁরে ছ্যা ! মাগীর মুখে পোকা না পড়ে।"

## দশম পরিচ্ছেদ

নগরীর বাহিরে ইহার উত্তরপূর্ব্ব ভাগে জনশূন্য নীরব প্রান্তর ; বহু বহু—দূরে তাহার দিক্‌চক্রবালরেখা যেন নীল গিরিশ্রেণীর মতই অচল ও কঠিন হইয়া অনিমেষে চিরকাল চাহিয়া আছে। প্রান্তর-পথ তৃণহীন, গৈরিকবর্ণ তপ্ত বালুকা-মরুর মত দেখাইতেছে, তাহার আশে-পাশে কোথাও দুই একটা ক্ষুদ্রতম হরিদ্রপুষ্পখচিত কাঁটাভরা আরণ্যগুল্ম ; চলনপথের কোনখানে এতটুকু একটু ছায়া নাই, অনেক দূরে দূরে কচিৎ কোথাও এক একটা শাল, তাল প্রভৃতি যেন সেই বনপথের প্রহরিস্বরূপে একা-একা দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদের উন্নত শিরের সমুচ্চ উষ্ণীষ রৌদ্রতপ্ত বায়ুর বেগে অতি সামান্যমাত্রই আনত হইতেছিল। পদতলে তাহাদেরই রৌদ্রবর্ণ দীর্ঘচ্ছায়া।

মধ্যাহ্নের সেই জ্বলন্ত সূর্য্য বিশ্বের অঙ্গ নিজের অগ্নিময় কশাঘাতে জর্জ্জরিত করিয়া শেষে নিজেও যেন সেই পরিতাপে অবসন্নশরীরে অবসানের পথে চলিয়া পড়িলেন। সেই দারুণ রৌদ্র উপেক্ষা করিয়া জ্বরতপ্ত দগ্ধদেহে পাগলের মত জলারণ্য ও নির্জ্জন পথে পথে ভীম সারাদিন ধরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। তাহার ঐ ক্ষিপ্তমূর্ত্তি দেখিয়া পরিচিতগণ সবিস্ময়ে পথ ছাড়িয়া দিতেছিল। অপরিচিতগণ তাহার দশা দেখিয়া 'আহা, কাদের বাছা রে ! ক্ষেপে গেছে !' বলিয়া সহানুভূতি জানাইতেছিল। ভীম কাহারও প্রতি দৃক্‌পাত পর্য্যন্ত করিল না, সারাদিনের উপবাসে, উদ্বেগে ও পরিশ্রমে তৃষ্ণায় তাহার হৃদয় ফাটিতেছিল, নদীর তীরে তীরে বালুকারাশির উপর দিয়া ছোট দুটি পদচিহ্নকে সে প্রাণপণে অনুবর্ত্তন করিতেছিল, পাছে সে রেখাটি হারাইয়া ফেলে, তাই নদীনীর নিতান্ত সমীপবর্ত্তী হইলেও এক বিন্দু জলও সে স্পর্শ করিল না। সারা অপরাহ্ণ এমনই করিয়া একটা পথিভ্রান্ত দৈত্যের মতই সে সারা নদীকূল ও পরিশেষে নগরীসীমার পরপারে এই নির্জ্জন প্রান্তর-পথকে তন্ন তন্ন করিয়াছে, কোথাও তাহার হারানো বস্তু সে খুঁজিয়া পায় নাই।

উজ্জ্বলা যখন দুর্জ্জয় রোষভরে বাড়ী ছাড়িয়া গেল, তখন ক্রোধাতিশয্যে ভীমের মনে তাহার জন্য এতটুকুও দুশ্চিন্তার উদয় হয় নাই। শাশুড়ী-বউয়ে ইহাদের প্রায়ই কলহ হয়, এবং অনেক দিন উজ্জ্বলাও রাগ করিয়া বলে যে, সে এ বাড়ীতে আর থাকিবে না এবং একটুখানি পড়সী-বাড়ী বা আদাড়ে-পাঁদাড়ে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহার পর বিশু প্রভৃতিরা ডাকিতে গেলেই ভালমানুষটির মত চলিয়া আসিয়া আপনার নিত্যকর্ম্ম আপনার হাতে-মাথায় তুলিয়া ত লইয়াই থাকে, উপরন্তু সে দিন তাহার কাজের ঝোঁক যেন আরও বাড়িয়া উঠে। কোথায় কি জঞ্জাল জমা হইয়া আছে, কোন্ কাপড়গুলা ক্ষারে চড়াইতে হইবে, ছেলেগুলার মাটীমাখা গায়ে খইল মাখাইয়া ধোয়াইয়া দেওয়া, এমন কি, দিদি-শাশুড়ীর বাতের ব্যথায় সেক-মালিসের সময়টাকে দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করিয়া দিয়া হয় ত বা তাঁহার মুখ হইতে একটা ভাল কথা আদায় করা-রূপ আশ্চর্য্য ঘটনাও কখন কখন ঘটাইয়াছে। এই সব দেখিয়া ভীম বরং কত দিন কৌতুক করিয়া তাহার কানের পাশটা ধরিয়া নাড়িয়া দিয়া হাসিয়া বলিয়াছে,—"যদি সেই গুষ্টীশুদ্দুর খোসামোদ ক'রেই মরবি, তবে দশ হাত-বুক ক'রে সবার সাতে যুঝতে যেয়ে মরিস্ কেন ?"

উত্তরে উজ্জ্বলাও হয় ত ভীমের ঘনায়মান গোঁফের প্রান্তটা টানিয়া ভ্রূভঙ্গী করিয়া কহিয়া উঠিত—"খুব করি।" না হয় বলিত—"ওরা আমায় ঘাঁটায় কেন ? সবাইকার জন্যে আমি রাত্তির দিন সাতটা গতর বা'র ক'রে খেটেও মরবো, আবার ওদের সব্বাইকার ঝাঁটা-লাথিও খাবো, অত আমি পারিনে !"

ভীম কত দিন উজ্জ্বলার এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে তাহাকে বুকের উপর টানিয়া লইয়া তাহার সেই ভ্রূকুটি-কুটিল ললাটে আদরের গভীর রেখা অঙ্কিত করিয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে কহিয়াছে—"পারিস্ তুই সেই সবই—কেবল একবার শরৎকালের মেঘের মতন গর্জ্জে ওঠা তোর রোগ! আচ্ছা, আচ্ছা, যা করেছিস্, বেশ করেছিস্; শুধু আমার এই কথা, পেটে ধরেছিল, যাই হোক মা ত বটে, মন্দ হ'লেই বা করছি কি? একটু সামাল দিস্, বে-ধড়োক কিছু ব'লে বসিস্নি টসিসনে যেন ফস্ ক'রে।"

আজও ভীমের বিশ্বাস ছিল, এই রকমটাই ঘটিবে। বিশেষতঃ আজিকার এই বিবাদফলে বাড়ীশুদ্ধ সকলের অনাহার ঘটায় এবং নিজেকেও তাহার ফলভোগ করিতে হওয়ায় তাহার মনে উজ্জ্বলার প্রতি বিরক্তিটা কিছু অধিকতরই হইয়াছিল। সে বেশ জানে যে, এই কাযটার ভার সে না রাখিলে এই রকমই বিপ্লব ঘটে; অথচ জানিয়া শুনিয়া তাহার বুড়া বাপ হইতে শিশু ভাইটার পর্য্যন্ত উপবাসের ব্যবস্থা করিয়া নিজে অনায়াসেই নির্লিপ্ত হইয়া রহিল। না, উজ্জ্বলার স্পর্দ্ধা সত্য সত্যই কিছু বেশী হইয়া দাঁড়াইয়াছে!

ভীম ঘরে ঢুকিয়া দরজার হুড়কা টানিয়া দিল। ঘরের মধ্যে একখানা তালপাতার চেটাই বিছানো, তাহারই এক প্রান্তে লম্বা একটা বালিস ও দুখানা মোটা মোটা কাঁথা জড় করা আছে, বালিসটা টানিয়া লইয়া শুইয়া পড়িয়া সে মনে মনে দৃঢ় করিয়া কহিল, "ওকে জব্দ করা দরকার হয়েছে।"

তাহার পর কয়েক দণ্ড ধরিয়াই স্ত্রীকে জব্দ করিবার নানারকম উপায় সে আবিষ্কারচেষ্টা করিল; কিন্তু দুঃখের বিষয়, কোনটাই শেষ পর্য্যন্ত তাহার মনঃপূত থাকিতে পারিল না। সর্ব্বপ্রথম সে স্থির করিল, উজ্জ্বলা বাড়ী ফিরিলে আজ সে তাহাকে ঘা কতক বসাইয়া দিবে; এই কথা মনে করিতে গিয়াই সে জিভ কাটিল। সেই রাজোদ্যানের মর্ম্মরমূর্ত্তির মতই শুভ্র ও সুকুমার দেহে আঘাত! মনে হইতেই নিজের লজ্জায় সে নিজেই নতমুখ হইল।

তাহার পর ভাবিল, 'না, ও-সব নয়; তবে বড় তার দেমাক হয়েছে। বুঝেছে যে, ওর ঐ রূপের পায়ে আমি বিকিয়ে গেছি, লোকে যা বলে, তা বড় মিথ্যেও ত নয়, হয় ত আমি তাই গেছিও। তা এইবার সেই গুমোরটাই তার ভাঙ্গতে হবে। আর একটা বিয়ে ক'রে দেখি, তা হ'লেই সত্যিকারের জব্দ হবে!' এই উপায়টার আবিষ্কারে ভীম মনে মনে খুব উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। মনে মনে বলিল, 'এই ভাল; মা'ও খুসী হবে, বউও ঠাণ্ডা হ'তে পথ পাবে না, আর আমারও তা মন্দ কি? মনসাদেবীকে ত মাসের মধ্যে সাতাশ দিনই মান ভাঙ্গাতে প্রাণ যায়, দু'জন থাকলেই তখন মানের বদলে কচু আসবে! বাঃ, যাকে বলে এক ঢিলে দুটো পাখী মারা! সেই ভাল, এই আমি করবো—যাই মা'কে ক'নে ঠিক করতে ব'লে আসি।'"

এই ভাবিয়া উঠিতে গিয়া ভীমের দৃষ্টি তাহার সম্মুখের গৃহভিত্তির উপরে পতিত হইল। ঐ দেওয়ালটির গায়ে আলিপনা দ্বারা একটি পদ্ম-সরোবর চিত্রিত হইয়াছিল; সরোবরে দুইটি মরাল ভাসিতেছে, সপত্র, সনাল, বিকসিত ও মুদ্রিত কমলের শ্রেণী।

চিত্রটির অঙ্কন-সৌকুমার্য্যে মুগ্ধ ও বিস্মিত হইয়া গিয়া ভীমের চিত্ত হইতে সহসাই নব-পরিণয়ের উদ্দাম আগ্রহ অপহৃত হইয়া গেল। ক্ষণকাল চিত্রার্পিতবৎ চাহিয়া থাকিয়া সে একটা মৃদু শ্বাস মোচন করিল ও আপনা-আপনি বলিয়া উঠিল, "কোন্ কাযটায় তার আট্‌কায়! রূপেও যেমন, গুণেও তার জোড়া মেলা ভার! মন্দ আমার বাড়ীর লোকগুলোই, তাই তাকেও তারা ক্ষেপিয়ে তোলে! নাঃ, কাকে কোথা থেকে এনে ওর পাশে বসাব? কৈবর্ত্ত-পাড়ায় ওর পা ধোয়াবার মতনও কি কেউ আছে? আরে ছ্যাঃ, আমার কি ওর বদলে একটা কোন্ পেত্নীকে এনে পাশে বসাতে-শোয়াতে ঘেন্না করবে না? নাঃ, বিয়ে-টিয়ে আমি করছি নে। যাই, দেখি গিয়ে বউটা কি করছে।"

ভীমকে বাহির হইতে দেখিয়া তাহার ছোট বোন্ সল্লা আসিয়া হাসিতে হাসিতে তাহাকে জানাইয়া দিল যে, ধম্মঠের মেয়ে সুগলার সহিত ভীমের বিবাহের কথা পাকা হইয়া গিয়াছে। তিন দিনের দিন গোধুলিসময়ে তাহাদের বিবাহ হইবে।

সংবাদ শুনিয়া মুখ খিঁচাইয়া ভীম উত্তর দিল, "তবে আর কি! আমি রাজা হয়ে গেছি!"

সল্লা এইটুকুতেই দমিবার পাত্রী নহে, সে হি হি করিয়া হাসিতে হাসিতে একটু দূরে সরিয়া গিয়া বলিতে লাগিল, "রাজা না হও, আমাদের রাণীবৌয়ের এইবার ত দফা শেষ হ'ল ! যেমন কর্ম্ম, তার তেমনই ফল !"

একটি ক্ষুদ্র বালিকার এই একান্ত অনাবশ্যক ঈর্ষ্যা-সংযুক্ত অবজ্ঞা প্রকাশে ভীমের মুখ ক্রোধ-পরুষ হইয়া উঠিল, সে সক্ষোভ বিরক্তির সহিত "হোগ্ গে, তোর তাতে কি !" বলিয়া অগ্রসর হইল।

সনকা তখন রান্নাঘরের দুয়ারে দাঁড়াইয়া মধ্যমা বধূর উপর শ্বশ্রুত্ব প্রকাশ করিতেছিল, ছেলের গলার সাড়া পাইয়া "অ ভীম ! আয়, ভাত খেয়ে যা রে", বলিয়া তাহাকে সাদরে আহ্বান জানাইয়া তৎক্ষণাৎ সেই পোড়া কাঠের মত নীরস মুখে অনেকখানি হাসি ফুটাইয়া তুলিয়া উৎফুল্লকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "সব ঠিক ক'রে এলাম, মুগলী মেয়ে খুব ঠাণ্ডা, মেরে যদি তাহাকে কুটেও ফেল, তবু সে একটু রা' কাড়তে জানে না, আপদটা যখন নিজে হ'তেই বিদেয় হলো, তখন এক রকম সে ভালুই হলো বল্‌তে হয়।"

ভীম অসহিষ্ণু চোখে চারিদিকে চাহিতেছিল, মায়ের ঐ কথাটা শুনিয়াই সে এক লম্ফে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

তাহার পর সেই শরতের রৌদ্রদীপ্ত তপ্ত-পথে তাহার বাকি দিনটাই কাটিয়া গেল। কোথাও সে উজ্জ্বলার চিহ্ন পাইল না। অবশেষে ভীমেরই এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হইয়া গেল, বন্ধু সুমঙ্গল তাহাকে দেখিয়াই মুখ টিপিয়া হাসিল,—"ব্যাপার কি ভীমচন্দ্র ! উড়োপাখীর সন্ধানে ছুটেছ না কি ?"

ভীম দাঁড়াইয়া পড়িল, "দেখেছ কি, কোন পথে গেছে ?"

সুমঙ্গল টিপি-টিপি হাসিতে হাসিতে মুখ-ভঙ্গী করিয়া বলিল, "যদি বলি রাজপ্রাসাদের পথে গেছে ?"

ভীম সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যি ?"

বন্ধু কহিল, "সত্যি-মিথ্যে জানিনে, এই রকমই ত শুন্‌ছি। আর তাও বলি, সেইটেই কিন্তু ওর পক্ষে সব চেয়ে স্বাভাবিক, আর সঙ্গত—বাপ্—"

ভীমের পালোয়ানী হাতের বিষম কিল খাইয়া বন্ধু তাহার রসিকতা অর্দ্ধপথেই পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিল।

ভীম তখন নদীকূল ছাড়িয়া প্রান্তরের পথ ধরিয়াছে।

উজ্জ্বলার প্রতি ভীমের মনের মধ্যে যে কতখানি প্রেম প্রসুপ্ত ছিল, সে বোধ করি নিজেও সেটা বেশ ভাল করিয়া জানিত না। সংসারে যে জিনিষটাকে আমরা বড় সহজেই পাইয়া বসি, সেটার বাস্তব মূল্য নিরূপণ করিতে আমরা বড় সহজেই ভুল করিয়া ফেলি। এমন কি, তাহার যে কোন মূল্য আছে, এমন কথাটাও হয় ত সকল সময় আমাদের মনে পড়ে না। তাই সে জিনিষটা যতই কেন দুর্ম্মূল্য হউক না, ভীমের ব্যাপারটাও সেই রকম ঘটিয়া-ছিল। এই অপরূপ-রূপসী বালিকা তাহাদের ঘরে এতই সহজে আসিয়া পড়িয়াছিল যে, তাহার এই অযোগ্য বা অপ্রত্যাশিত আগমনের সম্বন্ধে কাহারও মনে এতটুকু আগ্রহ বা বিস্ময় জাগ্রত হইতে অবসরমাত্র ঘটে নাই। মাতৃ পিতৃহীনা পরাশ্রয়-পালিতা অনাথাকে তাহারা নিজে যাচি য়াই তাহার নিতান্ত বাল্যকালেই সামান্যমাত্র পণ লইয়া ভীমের হাতে দিয়াছিল, সেই জন্যই ইহার অপরূপত্বটা তাহার কাছে অতি সহজ ও সাধারণরূপে প্রকটিত হইয়াছিল। ভীম তাহাকে স্নেহ করিত, ভালবাসিত না, তাহাও নয়, তবে তাহার মধ্যে কোন প্রকার উচ্ছ্বাস ছিল না। আজ সহসা তাহার প্রতি নিজের ব্যবহার স্মরণ করিয়া সে এক-কালে জাগ্রত, সন্তপ্ত ও অনুতপ্ত হইয়া উঠিল। উজ্জ্বলার সেই অবমাননায় আরও দলিতা সর্পীর মত ক্রোধ-ক্ষুব্ধ মূর্ত্তি মনে পড়িয়া তাহার বুকের মধ্যে একটা ব্যগ্র-ব্যাকুলতার সৃষ্টি করিয়া তুলিল। কোন্ প্রাণে তাহাকে—যাহার পক্ষে রাজ-প্রাসাদই স্বাভাবিক ও সঙ্গত স্থান, তাহাকেই সে অবমাননার উপরে আবার অমন করিয়া অপমান করিল। যদি সত্যই তাহার উপর অভিমান করিয়া উজ্জ্বলা আজ মরিয়া গিয়া থাকে ? ভীমের পদনখ হইতে কেশাগ্রাবধি এই ভীষণ চিন্তায় একেবারে শিহরিয়া কাঁটা দিয়া উঠিল। তাহার তখনই মনে হইল, যেন বিশ্বসংসারটা এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার কাছে এককালে অন্ধকারের মধ্যে ডুব খাইয়া ডুবিয়া গেল।

সে তখন ঘর্ম্মাক্ত-শরীরে প্রায় রুদ্ধশ্বাসে এক রকম ছুটিয়া চলিল। এই পথ দিয়া দিন দুই চলিলে ব্যাঘ্রতটীতে পৌঁছান যায়, এই খবরটুকু যে উজ্জ্বলার জানা আছে, সে কথা সেও জানিত। কারণ, রাগ করিলেই সে এই বলিয়া শাসাইত যে, সে এখনই বাঘতটীতে চলিয়া যাইবে। [ ক্রমশঃ।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

## অস্থি-নির্ম্মিত নকল জাহাজ

প্রশান্ত মহাসাগরে যে সকল জাহাজ গতায়াত করে, তাহার কোন একটি জাহাজের জনৈক নাবিক বড় দিনের উৎসব উপলক্ষে যে সকল 'টর্কী' মোরগ খানায় ব্যবহৃত হয়, তাহাদের অস্থিখণ্ড সংগ্রহ করিয়া দুইখানি ক্ষুদ্র জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়াছে। প্রত্যেক জাহাজের ৩টি করিয়া নানাবর্ণ-রঞ্জিত মাস্তল আছে। বুকের পঞ্জর-সাহায্যে জাহাজের খোল ও গলুই এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থিগুলিতে জাহাজের অন্যান্য অংশ নির্ম্মিত হইয়াছে।

পক্ষীর অস্থিনির্ম্মিত ক্ষুদ্র জাহাজ

## ক্রীড়া দর্শনের অভিনব ব্যবস্থা

আমেরিকায় ইভান্‌ষ্টন্‌ইলএ ছাত্রদিগের ফুটবল ক্রীড়া দর্শনের সুবিধার জন্য বিরাট ব্যবস্থা হইতেছে। ক্রীড়াক্ষেত্রের উভয় পার্শ্বে দর্শকদিগের বসিবার জন্য যে স্থায়ী ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে ৭৫ হাজার দর্শক অনায়াসে আসন গ্রহণ করিয়া ক্রীড়ারঙ্গ দেখিতে পাইবে। ক্রীড়াক্ষেত্র বহু অর্থব্যয়ে নির্ম্মিত হইতেছে।

## ছিন্ন-বস্ত্র-রচিত চিত্র

ছিন্ন-বস্ত্রাংশ-রচিত চিত্র

জনৈক মার্কিণ মহিলা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্ত্রাংশ বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত করিয়া তদ্দ্বারা বিচিত্র চিত্র রচনা করিয়াছেন। চিত্রাধারে বস্ত্রাংশগুলি সু-সন্নিবিষ্ট করিয়া এই নিপুণা শিল্পী তাঁহার সৌন্দর্য্যানুরাগ ও কলা-কৌশলের যে নমুনা দেখাইয়াছেন, তাহাতে অভিজ্ঞগণ তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

## উভচর মোটর-চালিত যান

মার্কিণ দেশে সম্প্রতি এক প্রকার উভচর যান নির্ম্মিত হইয়াছে। এই যান ত্রি-চক্র-সংবলিত। সম্মুখের চাকা এমন ভাবে নির্ম্মিত যে, জলের মধ্যে অবস্থানকালে উহা জাহাজ বা ষ্টীমারের চাকার ন্যায় জল কাটিয়া অগ্রসর হয়। এই মোটর-চালিত যান জলে ও স্থলে অবলীলাক্রমে দ্রুতগতি অগ্রসর হইয়া থাকে। আমেরিকার 'মিচিগান' হ্রদে ও তত্রত্য রাজপথে ইহার গতিশক্তির পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছে। দুই জন আরোহী ইহাতে আরোহণ করিয়া পরম আরামে স্থল ও জল-যাত্রার আনন্দ উপভোগ করিতে পারে।

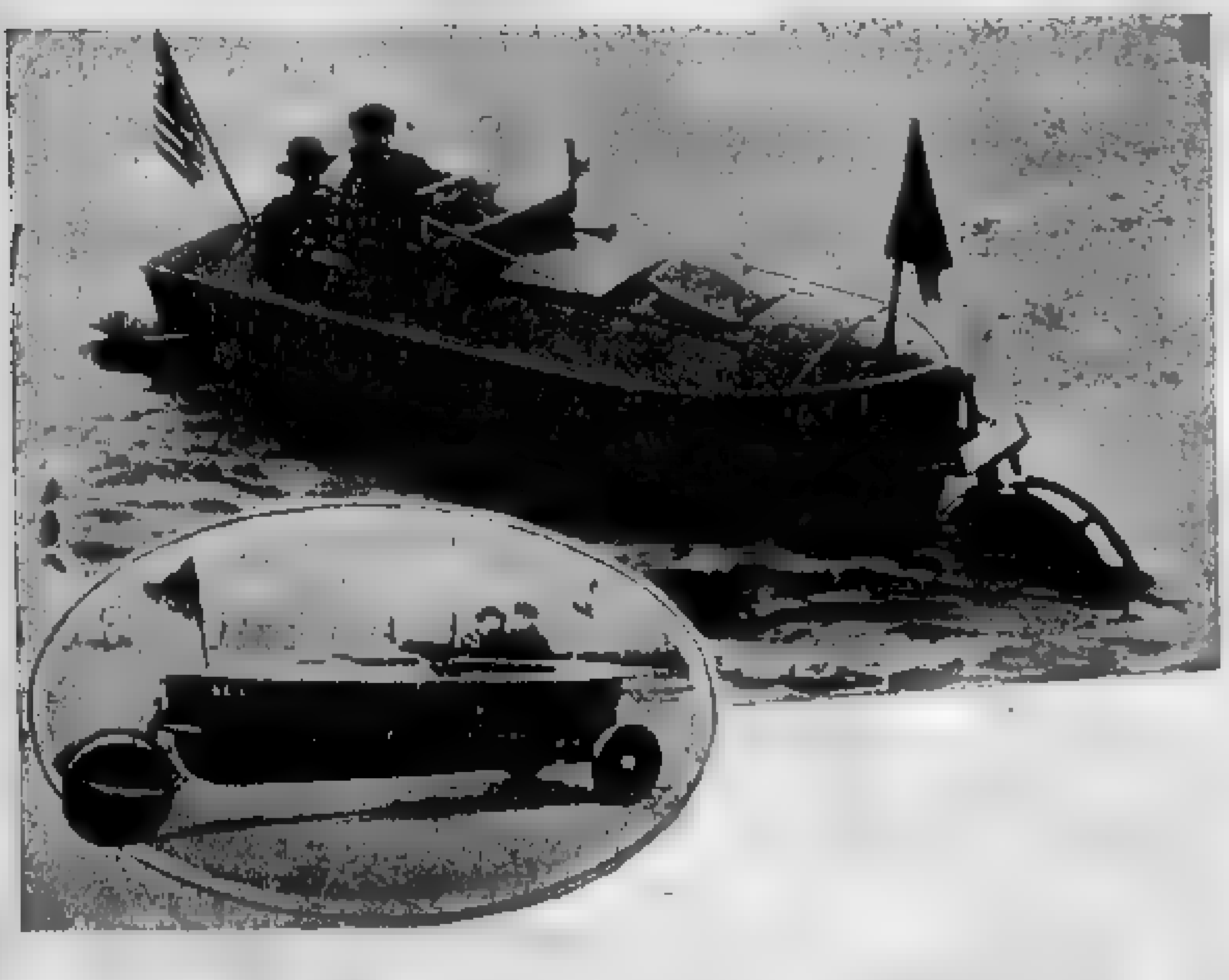

জল ও স্থল উভয় ক্ষেত্রে মোটর-যানের চিত্র

## অভিনব উপায়ে দস্যু-দলন

দস্যু রাহাজানী করিবার সময় পথিককে পিস্তল দেখাইয়া ঊর্দ্ধে হাত তুলিতে বলিয়া থাকে। সে সময়ে পথিকের নিকট অস্ত্র থাকিলেও ব্যবহার করিতে পারে না, বাধ্য হইয়া তাহাকে আত্ম-সমর্পণ করিতে হয়। এইরূপ অবস্থায় দস্যুকে দমন করিবার এক অভিনব উপায় জনৈক জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন করিয়াছেন। ক্যামেরার আকার-বিশিষ্ট একটি আধার শরীরে সংলগ্ন থাকে। সেই আধারের মধ্যে পিস্তল লুক্কায়িত রাখা হয়। পিস্তল হইতে আপনা হইতে গুলী নির্গত হইবার যে ব্যবস্থা আছে, তাহা দেহাভ্যন্তরে লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকে। দস্যু হাত তুলিবার আদেশ করিলে, আক্রান্ত ব্যক্তি যেমনই ঊর্দ্ধে হাত তুলিবে, অমনই লুক্কায়িত পিস্তল হইতে গুলী নির্গত হইয়া দস্যুকে আহত করিবে।

চিত্রস্থিত নকল দস্যুর প্রতি পুলিসপ্রহরী হাত তুলিয়া গুলী বিক্ষেপের অভ্যাস করিতেছে

## ঘোড়-দৌড়ের ঘোড়া চালান

জার্ম্মাণীতে ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া চালাইবার শিক্ষানবিশী করিবার নূতন ব্যবস্থা আছে। ছেলেদের জন্য যেরূপ খেলার ঘোড়া আছে, ঠিক সেই প্রণালীতে নির্ম্মিত দোলায়মান ঘোড়ায় চড়িয়া প্রথম শিক্ষার্থী ঘোড়-দৌড়ের ঘোড়া চালান অভ্যাস করিয়া থাকে। যে ঈষৎ বক্র কাঠের ফ্রেমের উপর ঘোড়া অবস্থিত, তাহার তলদেশে চাকা;

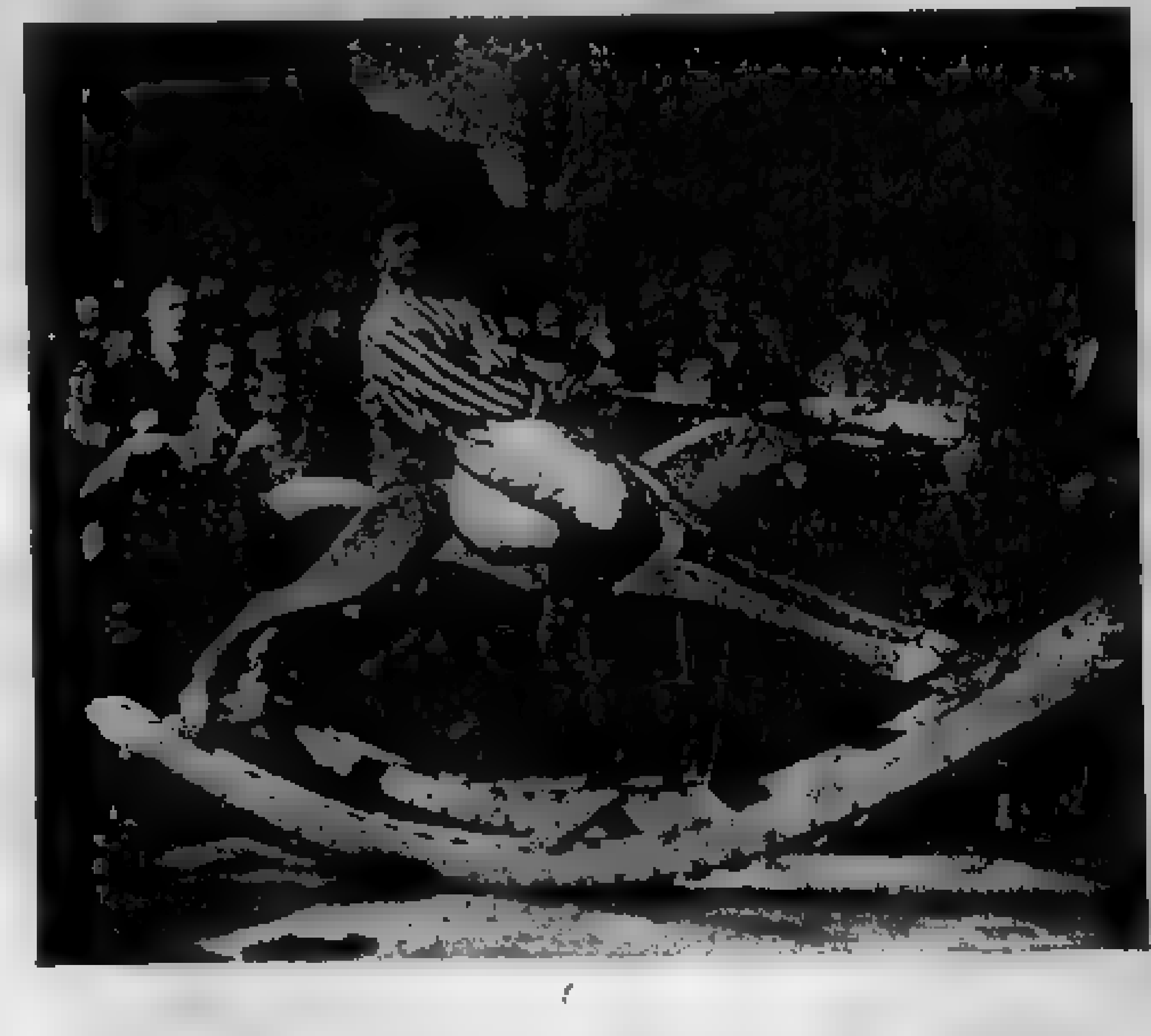

কাঠের ঘোড়ায় অশ্বচালনা শিক্ষা

সংলগ্ন থাকে। সেই চাকার সাহায্যে সম্মুখভাগে ঘোড়াটি বেশ অগ্রসর হইতে পারে। ঘোড়া হইতে পড়িবার কোন আশঙ্কা নাই। শিক্ষার্থী এইরূপ খেলার ঘোড়ায় চড়িয়া ঘোড়া-চালানর কৌশলগুলি আয়ত্ত করিয়া লয়।

## অগ্নি-নির্ব্বাণকল্পে জাহাজ

সমুদ্রবক্ষে জাহাজে আগুন লাগিলে, উহা নির্ব্বাপিত করা বড় কঠিন। এ জন্য অগ্নি-নির্ব্বাপক জাহাজ নির্ম্মিত হইয়াছে। বৈদ্যুতিক প্রবাহে এই জাহাজ চালিত হয় এবং বিভিন্ন স্থান হইতে ৩৯টি প্রবল জলধারা নির্গত হইয়া অগ্নি-নির্ব্বাপে সহায়তা করে। এই জাহাজের গতি অত্যন্ত অধিক। জাহাজের অগ্নি-নির্ব্বাণে এই বিদ্যুৎ-চালিত জাহাজ বিশেষ উপযোগী।

অগ্নি-নির্ব্বাপক জাহাজ

## অন্ধের পুস্তক পাঠ

জনৈক ইংরাজ অধ্যাপক এক প্রকার বৈদ্যুতিক যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন, উহার সাহায্যে অন্ধ মুদ্রিত পুস্তকাদি অনায়াসে পাঠ করিতে পারে। যন্ত্রের উপর কোনও পুস্তক অথবা সংবাদপত্রের মুদ্রিত অংশ স্থাপন করিলে যন্ত্র-সাহায্যে অক্ষরগুলি শব্দায়মান হইয়া অন্ধের কর্ণে প্রবেশ করিবে। পাঠকের কর্ণে শব্দবহ যন্ত্র মস্তক বেষ্টন করিয়া সন্নিবিষ্ট থাকে। এই শব্দবহ যন্ত্রই অন্ধের 'নয়ন।' এই 'নয়ন'রূপ যন্ত্রটির মধ্যে একরূপ ধাতু আছে, তাহাকে 'সেলিনিয়ম্' বলে। ইহার উপর আলোকপাত হইলে, সেই আলোকের মৃদুতা বা তীব্রতার অনুযায়ী বৈদ্যুতিক প্রবাহকে নিয়ন্ত্রিত করিবার অপূর্ব্ব শক্তি এই সেলিনিয়মের আছে। শব্দ গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা এই শব্দবহ যন্ত্রে বিদ্যমান। একটি ব্যাটারী বা তাড়িৎ উৎপাদক যন্ত্র শব্দবহ যন্ত্র ও সেলিনিয়মের সহিত সন্নিবিষ্ট থাকে। কোন একটা বৈদ্যুতিক বাল্ব বা গোলক হইতে যখন আলোক নির্গত হইয়া সেলিনিয়মে পতিত হয়, সেই সময় একটা বিদ্যুৎ-প্রবাহ শব্দবহ যন্ত্রে সঞ্চারিত হয়, তাহার ফলে একটা মধুর শব্দ উৎপাদিত হইয়া শ্রোতার কর্ণে প্রবিষ্ট হয়। শব্দের মধুর ধ্বনি আলোকস্পন্দনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যন্ত্রটির উপর একখানি কাচ আছে, কাচের নিম্নেই সেলিনিয়মের একটি চাকৃতি আছে। এই চাকৃতির উপরিভাগ এমন ভাবে নির্ম্মিত যে, বৈদ্যুতিক আলোক তন্মধ্য দিয়া কাচে প্রতিফলিত হয়। সেই কাচের উপর পাঠক যে কোনও ছাপান বই অথবা কাগজ উপুড় করিয়া রাখিলে—অর্থাৎ লিখিত অংশ কাচের উপর স্থাপন করিলে, বৈদ্যুতিক আলোকরেখা কাচ ভেদ করিয়া লিখিত অংশে পতিত হয়। মোটর

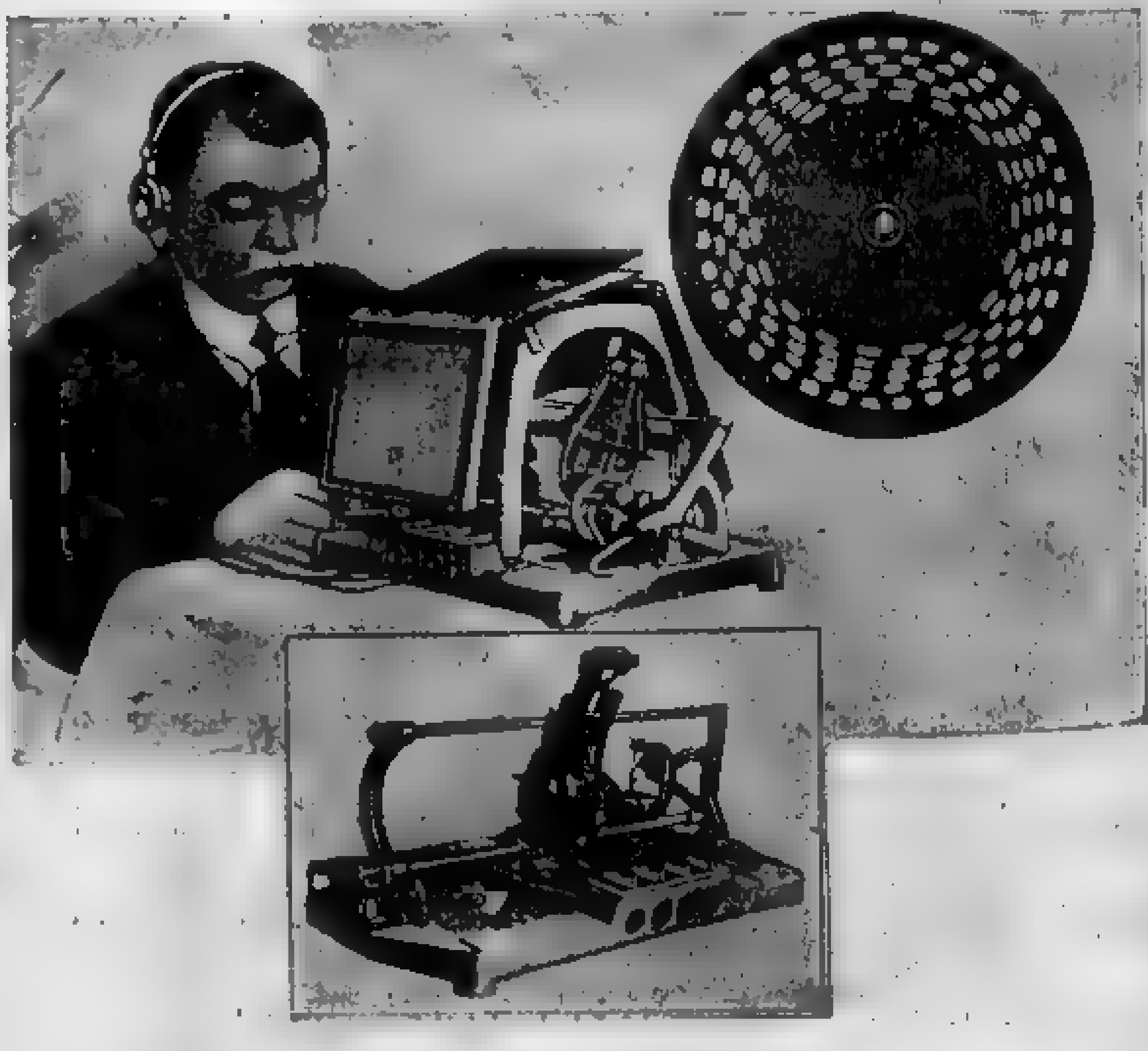

অন্ধ পুস্তক পাঠ করিতেছে—উপরে দক্ষিণভাগে চিত্র-সংবলিত চাকৃতি এবং নিম্নে সম্পূর্ণ যন্ত্রটি

সাহায্যে চাকৃতিটি আবর্ত্তিত হয়। চাকৃতির গাত্রে ৫ সারি ছিদ্র আছে। বৈদ্যুতিক গোলকসমূহ হইতে নিক্ষিপ্ত আলোক ছাপান পুস্তকের অক্ষরগুলির উপর পতিত হয়। প্রত্যেক অক্ষরের বিভিন্ন শব্দ উৎপাদিত হইয়া কর্ণে প্রতিধ্বনিত হয়। অন্ধকে শুধু শব্দের অক্ষরগুলির সহিত প্রথমে পরিচিত হইতে হইবে। ইহা অতি সহজসাধ্য ব্যাপার। ১২ হইতে ২০ ঘণ্টার মধ্যে উহা আয়ত্ত করা যায়। ৩।৪ মাসের মধ্যে প্রতি মিনিটে ৬০টি বাক্য পাঠ করিবার শক্তি যে কোনও অন্ধ ব্যক্তি অর্জ্জন করিতে পারে।

## সুবৃহৎ বল্মীক-স্তূপ

অষ্ট্রেলিয়ার কোন শুষ্ক নদীর ধারে একটা বৃহৎ বল্মীক-স্তূপ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই স্তূপটি ৩২ ফুট উচ্চ। বল্মীক-কীটের (উই) খেয়াল বশতঃ এই স্তূপের দক্ষিণভাগে—পাদদেশে একটি স্ত্রীমূর্ত্তি গড়িয়া উঠিয়াছে। স্তূপের অভ্যন্তরে গোলোকধাঁধার ন্যায় পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে। স্তূপটি এমন দৃঢ় যে, ইহার শীর্ষদেশে জনৈক পরিব্রাজক আরোহণ করায় উহার কোনও অংশ ভগ্ন হয় নাই।

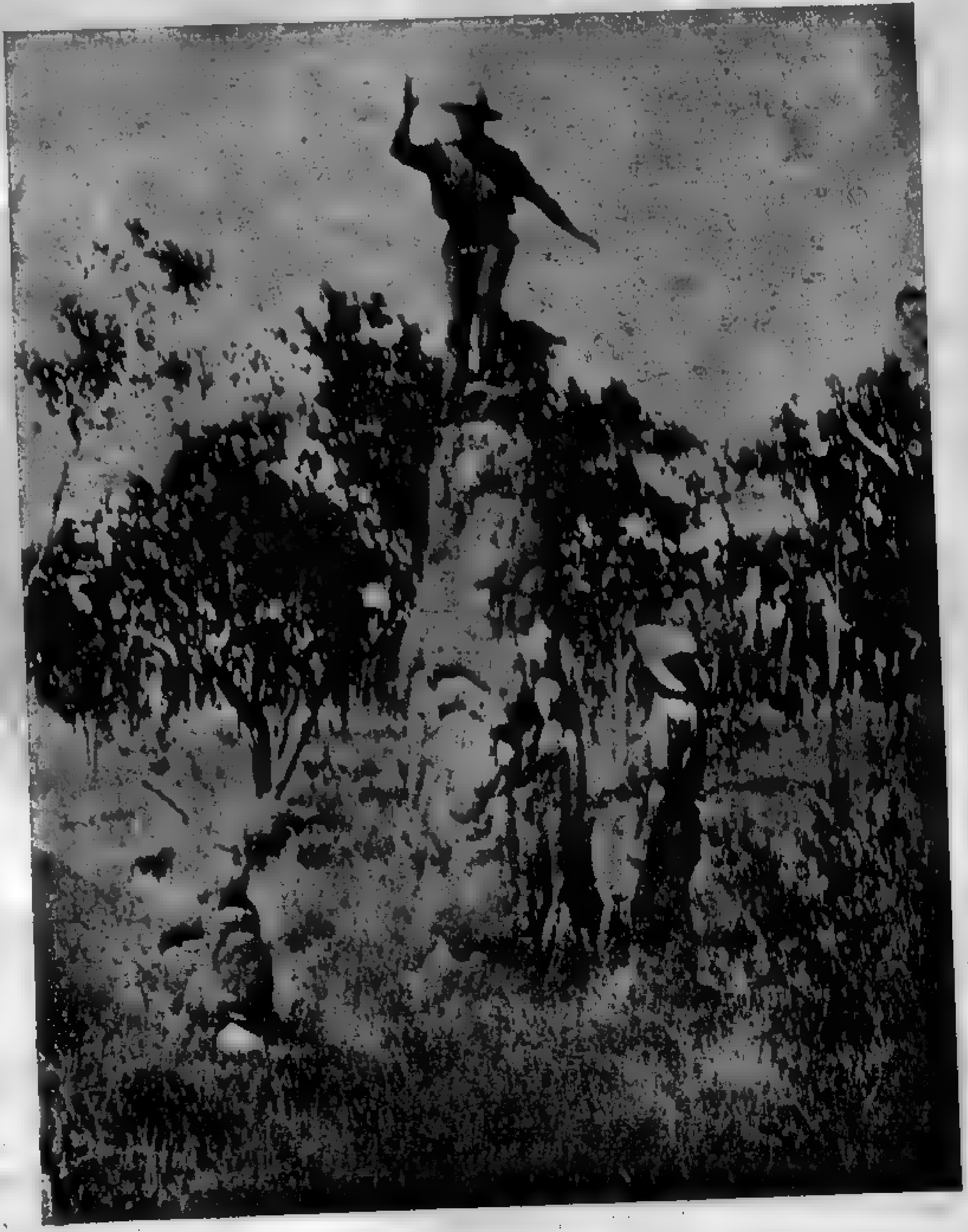

বিচিত্র বল্মীক-স্তূপ

## আধার-সংলগ্ন ছত্র

জার্ম্মাণীতে এক প্রকার ছত্র নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার সঙ্গে বিলাসিনীদিগের পাউডার প্রভৃতি রাখিবার এক জাতীয় সুন্দর আধার সংলগ্ন থাকে। ছত্র-ব্যবহারের প্রয়োজন না হইলে তাহাকে এমনভাবে ভাঁজ করিয়া রাখা যায় যে, বিলাসিনীরা অনায়াসে হাতে ঝুলাইয়া লইয়া যাইতে পারে। এইরূপ আধার-সংলগ্ন ছত্র জার্ম্মাণীর নারীরা ব্যবহার করিতেছেন।

## চীনের বিচিত্র ঘুড়ি

চীনদেশে ঘুড়ি উড়াইবার খেলা বিশেষভাবে প্রচলিত। চীনারা নানাবিধ জীব ও পতঙ্গের আকারে ঘুড়ি প্রস্তুত করিয়া থাকে। কোনও কোনও উৎসব উপলক্ষে এইরূপ জীব-জন্তু ও পতঙ্গাকৃতি ঘুড়ি উড়াইবার প্রথা চীনদেশে প্রচলিত। এই সকল ঘুড়ি বিশেষ পুরু কাগজে নির্ম্মিত হয়। কোন কোন ঘুড়ির লাঙ্গুল প্রায় ৪০ ফুট দীর্ঘ হইয়া থাকে। বাঁশের বাঁখারীর সাহায্যে ঘুড়ির সমগ্র দেহটি গঠিত হয়। এই সকল ঘুড়ি বিভীষিকাপ্রদ মূর্ত্তিবিশিষ্ট হইলেও চীনারা উহাতে অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়া থাকে। ঘুড়ি যখন ব্যোমপথে ধাবিত হয়, তখন একখানি ঘুড়িকে

চীনের বিচিত্র ঘুড়ি

৪।৫ জন লোক ছাড়া অন্য লোক ধরিয়া রাখিতে পারে না। খৃষ্ট-জন্মের ৩ শতাব্দী পূর্ব্বে চীনদেশে ঘুড়ির প্রচলন হয়। য়ুরোপে খৃষ্ট-জন্মের পর সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রথম ঘুড়ি উড়িয়াছিল।

---

# তবু

থেমে গেছে গান, তবু
আছে তার সুর—
ঝ'রে গেছে ফুল, তবু
গন্ধে ভরপুর!
ম'রে গেছে নদী, তবু
আছে তার রেখা,
অস্ত গেছে রবি, তবু
আছে রশ্মি-লেখা!

চুকে গেছে ভুল, তবু
আছে হাহাকার,—
ভেঙে গেছে স্বপ্ন, তবু
আছে মোহ তা'র।
মমতাজ গেছে, আছে
সাজাহান-প্রীতি,—
সে চ'লে গিয়েছে, তবু
আছে তা'র স্মৃতি!

শ্রীবিজয়মাধব মণ্ডল।

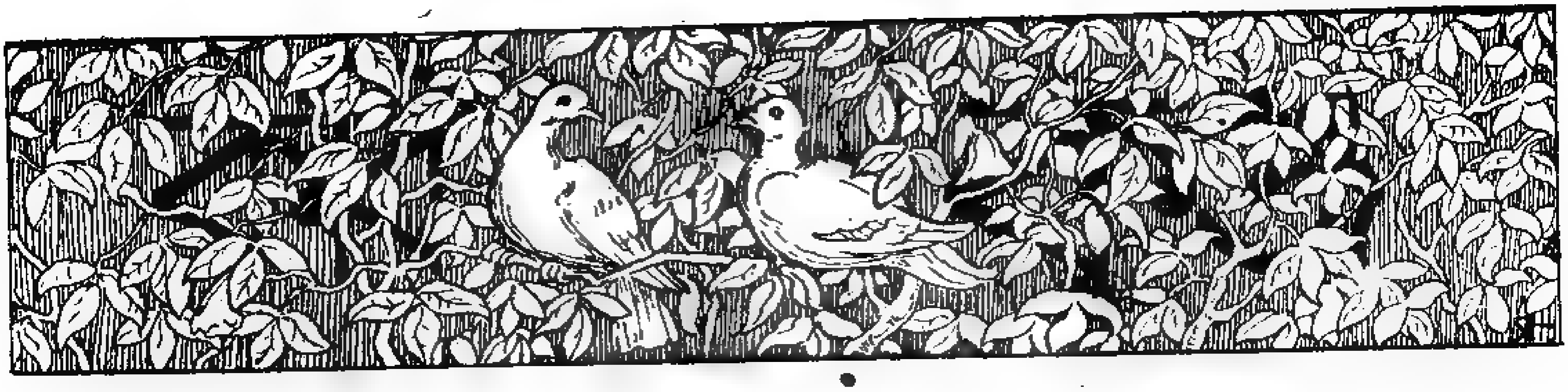

# বর্ষামঙ্গল

## ( ক )

( ভবভূতির মালতী-মাধবের ভাবানুগত )

সানু-কন্দরে প্রতিমন্দ্রিত
গিরি-প্রপাত মিশিছে নদে,
যেন গজানন-কণ্ঠ গরজে
ভৃগুরাম সহ রণোন্মদে।

দাত্যূহ-নীড় ভেঙে ফেলে আজ,
কপোতেরা নব কুলায় রচে,
শিখিরাজ গিরি-নাট-মণ্ডপে
বারিদ-বিতানে মাণিক খচে।

বেতসী-কুসুমে বাসিত-সলিলা
কুঞ্জ-সরিৎ বেত্রবতী ;
বায়ু, গজাহত-শল্লকীদল-
গন্ধ বহিছে মন্দগতি।

পূর্ব্বপবনে গিরি-বনশ্রী—
বিহগী হইয়া উড়িতে চায়,
স্ফুট কদম্বে আজিকে তাহার
শত সহস্র ডিম্ব ভায়।

কেলি-কদম্বে কল-কাদম্বে
মেঘমালা আজ 'কাদম্বিনী',
পীন শিলীন্ধ্র কন্দলদলে
মেদিনী আজিকে মেদস্বিনী।

সাশ্রু-নয়না বিদ্যুন্ময়ী
'কৃষ্ণা' দিবস-রাণীর কেশে,
সর্জ্জের সাথে অর্জ্জুন আজি
বিজয়-মাল্য পরায় হেসে।

রাজ-গৌরবে বারিধর শোভে
শ্রীদামিনী তুষে আলিঙ্গনে,
কলাপি-চারণ, স্তুতি-সঙ্গীতে,—
প্রাচ্য সমীর সংবাহনে।

অশনি করিছে শাসন-ঘোষণা,
'দ্বিজ' চাতকেরা যাচক দ্বারে।
ইন্দ্রধনুটি রাজ-লক্ষ্মীর
শৌর্য্য-গরিমা দিয়াছে তারে।

গণ্ড-মদিরাসক্ত ভৃঙ্গে—
শ্রুতি-পল্লবে তাড়ায় গজ,
অবশাঙ্গের জড়িমা দুরিতে
মাখে মধুকর কেতকীরজ ;

কেতকীকুঞ্জে ক্ষত-বিক্ষত,
জুড়াইতে যায় কামিনীবনে,
পরশে পাখার—ঝরে দল তার—
মধুকর আজি প্রমাদ গণে।

---

## ( খ )

( মহাকবি মাঘের শিশুপাল-বধের ভাবানুসরণে )

নীলাম্বরের তমালবনে ফুট্‌ল তড়িৎ মঞ্জরী,
চন্দ্রকচূড় পীতাম্বর—আজ দোল খেলে তায় সঞ্চরি'।
গোঠে---গোপাঙ্গনা উন্নয়নে,
দেখ্‌ছে কি তাই ক্ষুণ্নমনে ?
আজকে শিখী কোকিল হ'লো, চাতক হ'লো চঞ্চরী।

পুষ্পিতা আজ বন্ধ্যাভূমি, ফুট্‌ল কোমল কন্দলী,
মল্লিকাতে বল্লী আজি ভর্‌ল শ্যামল অঞ্জলি।
যূথী—শিলীন্ধ্র-সু-গন্ধভারে,
পথ খুঁজে পাই অন্ধকারে ;
চন্দ্র গলে, সূর্য্য গলে, বজ্রেরো যায় মন গলি'।

এমন দিনে বিদায় দিয়ে আপন প্রাণের বন্ধুরে,
নীপের শাখার দীপের শিখায় শলভ হয়ে মন পুড়ে।
বৃথা—কুটজ ছিটায় দধির কণা
পথিকবধূ অধীরমনা,
সর্প হয়ে তুল্ল ফণা স্মরের সায়ক বন জুড়ে।

"এমন দিনে কে রবে হায় বঁধূর 'পরে মান করি",
মধুপ আজি বল্‌ছে শোনো মধুর স্বরে গান ধরি',
যেন—মেঘাবৃত শশীর কলা,
কোষাবৃত অসির ফলা,
কেতক, আজি গন্ধ হানে, কখন বা নেয় প্রাণ হরি'।'

### ( গ )

( মৃচ্ছকটিকের ভাবানুসরণে )

ভৃঙ্গনীলদেহে চপলাপীত পট,
বকালী-শঙ্খ শ্রী-হস্তে,
চরণ বিক্রম করে কি নারায়ণ
আজিকে বলিরাজ মস্তে ?

সঘন ব্যোম, ধৃতরাষ্ট্র সম, শিখী
দুর্য্যোধন সম গর্জ্জে,
কোকিল, দ্যূতজিত ধর্ম্মরাজ সম
নীরবে হৃতদেশ বর্জ্জে।

ভ্রাতারা অনুগামী হংস সম, ভেক
কর্ণসম মাতে হর্ষে,
ভীষ্ম দ্রোণ সম গ্রীষ্ম ক্রমগণ
অশ্রু, নতশিরে বর্ষে।

বৃষ্টিধারা ঝরে রূপালি জরি যেন
দামিনীদীপালোকে ঝলিয়া,
ছিন্ন অম্বর-পটের দশাসম
বারিদ পড়ে আজি গলিয়া।

আর্ত্তনাদ করে বিরহি-হৃদি সম
নীরদ, ঢলি গিরি-শিখরে,
ব্যজন করে তারে শিখীরা শিখা মেলি,
মণির দ্যুতি তায় ঠিকরে।

হৃষ্ট দর্দ্দুর পঙ্ক ক্লেদ-জলে
মেতেছে ভূরি-ভোজে তড়াগে,
নীপের দীপ জ্বলে অটবীতমঃ হরি'
ষড়্‌জ গায় শিখী সরাগে।

মেনকালিঙ্গনে ঋষির তপসম
নিশীথনাথ আজি মগ্ন,
গণিকানারীসম চপলা চঞ্চলা,
রয় না এক দেহে লগ্ন !

প্রবল ধারা শরে, তড়িৎকেতু রথে,
অশনি-দুন্দুভি বাজিয়ে,
দিবসনাথে জিনি হরিছে 'কর' তার
বিজয়ী পয়োধর আজিকে।

সোমের আঁখি ঝুরে, ব্যোমের বনে বনে,
জ্যোছনা হৃতা মেঘাবরণে,
গলিত বল্মীক, গলিল বাল্মীকি-
চিত্ত যথা সীতাহরণে।

সুরেশ, নানা সুরে বাজায় বন-বীণা
দিবস-নিশা-ভেদ লুপ্ত ;
গগন দ্রবীভূত বজ্রানলে, মহী
কমল-আঁখি মুদি সুপ্ত।

---

### ( ঘ )

( কাজরীগানের অনুসরণে )

শোভন গহনে ঘন হরিৎ-ঘটা,
ত্বরা—বনে এস সই ;
সঘন গগনে হেন তড়িৎ-ছটা,
মোরা,—কোণে কেন রই ?

কি কথা শুনাল 'দেয়া' নীপের কানে
সে যে—শিহরে শাখে,
রজনীগন্ধা কেয়া-গন্ধ হানে,
অলি—বিহরে ঝাঁকে।

বুলবুল কূজে মুহু গুলবাগানে
শিখী—ক্রৌঞ্চ ডাকে,
ষোল সাজে সেজে এস বনের পানে,
নাচ'—তাথৈ তাথৈ।
ত্বরা—বনে এস সই ॥

কবরী দুলায়ে এস ঘাঘরা পরি
ভরা—গাগরী কাঁখে,
মঞ্জীর-রবে সারা নগরী ভরি
এস—নোলক নাকে।

বরষা চলিয়ে যায়—এসেছে তরী,
ফিরে—পাইবে তাকে,
ফিরিবে না যৌবন বিশ-বছরী,
তুমি—কাঁদ না যতই।
ত্বরা—বনে এস সই ॥

শ্রীকালিদাস রায়

# বলরামের দোল

বলরামের দোলের কথা শুনিয়া হয় ত অনেকে মনে করিবেন, আমরা শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ হলায়ুধ বলরামদেবের দোলযাত্রার বিবরণ লিখিতেছি। আমরা এই প্রবন্ধে যে বলরামের কথার আলোচনা করিতেছি—তিনি ধর্ম্মপ্রচারক ছিলেন। স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের প্রণীত ‘ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়’ নামক গ্রন্থে বলরামী সম্প্রদায় সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়।

বলরাম নদীয়া জিলার মেহেরপুর গ্রামে কোনও হাড়ীর গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি জাতিতে হাড়ী ছিলেন বলিয়া তাঁহার শিষ্যরা তাঁহার প্রসঙ্গে কোন কথা বলিবার সময় তাঁহার উদ্দেশে ভক্তিভরে ললাট স্পর্শ করিয়া বলে, ‘বলরামচন্দ্র—হাড়ীরামচন্দ্র।’ তাহারা আরও বলে, হাড়ীর বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই যে তিনি ‘হাড়ী’, এরূপ নহে, তিনি হাড় নির্ম্মাণ করিতেন, অর্থাৎ মনুষ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়াই ‘হাড়ী!’ তাহাদের বিশ্বাস, বলরামচন্দ্র ভগবানের অবতার; অবিশ্বাসী ও অধার্ম্মিক মানবজাতির মনে ভগবদ্ভক্তি ও ধর্ম্মানুরাগ উৎপাদনের জন্যই তাঁহার আবির্ভাব। বলরামের শিষ্যরা তাঁহার অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে অনেক গল্প বলিয়া থাকে এবং সেই সকল গল্প তাহারা সত্য বলিয়াই বিশ্বাস করে।

বলরাম মেহেরপুরের মালোপাড়ার কোন অজ্ঞাতনামা হাড়ীর পুত্র। তাঁহার জন্মের সন-তারিখ জানিবার উপায় নাই। বলরামকে যাঁহারা দেখিয়াছেন, এরূপ দুই চারি জন বৃদ্ধ এখনও জীবিত আছেন। তাঁহারা বলেন, বলরাম বাঙ্গালা দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং প্রায় ৬০ বৎসর জীবিত ছিলেন। তিনি দীর্ঘদেহ, গৌরবর্ণ সুপুরুষ ছিলেন, হাড়ী-বাগ্দী প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে তাঁহার ন্যায় রূপবান্ সৌম্যমূর্ত্তি নিতান্ত বিরল। তাঁহার মাথায় লম্বা চুল, মুখে দীর্ঘ দাড়ী ও গোঁফ ছিল; এ জন্য তাঁহার ধর্ম্মাবলম্বী অনেকেরই ঐরূপ দাড়ী, গোঁফ ও মস্তকে দীর্ঘ কেশ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা সাধারণতঃ ‘দরবেশ’ নামে পরিচিত। মালোপাড়ার অদূরে ভৈরব নদের তীরে ‘বলরামের আখড়া’ প্রতিষ্ঠিত। স্থানীয় লোকেরা এই আশ্রমটিকে ‘দরবেশের আখড়া’ বলে।

কথিত আছে, শৈশবকাল হইতেই বলরামের হৃদয় ধর্ম্মপ্রবণ ছিল। তিনি মাছ-মাংস খাইতেন না, বাল্যকাল হইতেই নিরামিষভোজী ছিলেন। তাঁহার পিতার ‘খোঁয়াড়ে’ এক পাল শূকর ছিল, কিন্তু অন্যান্য হাড়ীর ছেলের মত সেগুলিকে তিনি চরাইতেন না, এই অস্পৃশ্য জীবগুলিকে স্পর্শ করিতেও তিনি ঘৃণা বোধ করিতেন। মুখুয্যে বাবুদের গৃহদেবতা গোপালদেবের আঙ্গিনায় সে কালে সর্ব্বদা কথকতা, সংকীর্ত্তন প্রভৃতি হইত; বলরাম ভক্তিভরে তাহা শ্রবণ করিতেন, নগরসংকীর্ত্তন বাহির হইলে সেই দলের অনুসরণ করিতেন, তিনি ভগবৎপ্রেমে বিভোর হইয়া থাকিতেন। শৈশবে হাড়ীর ছেলের এইরূপ ভগবদ্ভক্তি দেখিয়া অনেকে তাঁহাকে বিদ্রূপ করিত, বলরামকে এ জন্য কখন কখন নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইত, কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ প্রশমিত হয় নাই।

বলরাম শৈশবকাল হইতেই গম্ভীরপ্রকৃতি, চিন্তাশীল ও সংসারের প্রতি বীতস্পৃহ ছিলেন। তাঁহার অসাধারণ তর্কশক্তি ছিল। প্রথম যৌবনে এক দিন তিনি নদীতে স্নান করিতে গিয়া দেখিলেন, এক জন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ স্নানান্তে কোশা লইয়া তর্পণ করিতেছেন। তাহা দেখিয়া তিনিও জলে নামিয়া অঞ্জলি-পূর্ণ জল পুনঃ পুনঃ তীরে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। যে ব্রাহ্মণটি তর্পণ করিতেছিলেন, তিনি তর্পণান্তে বলরামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ও আবার তোর কি খেলা রে, বলা? অঞ্জলি ভরিয়া জল লইয়া ডাঙ্গায় ফেলিতেছিস্ কেন?”

বলরাম বলিল, “বাড়ীতে গোটাকতক শাক-ডাঁটার চারা লাগাইয়াছি—সেই শাকের ক্ষেতে জল দিতেছি!”

ব্রাহ্মণ হাসিয়া বলিলেন, “সাধে কি লোকে বলে তুই পাগল? তোর শাকের ক্ষেত কোথায়, আর তুই নদীর ধারে অঞ্জলি ভরিয়া জল ঢালিয়া ভাবিতেছিস—ঐ জলে তোর শাকের ক্ষেত ভিজিবে!”

বলরাম বলিল, “ঠাকুর, আপনি কোশা ভরিয়া জল তুলিয়া জলে ঢালিতেছিলেন কেন?”

ব্রাহ্মণ বলিলেন, “হাড়ীর ছেলের আর কত বুদ্ধি হইবে! আমি তর্পণ করিতেছিলাম, আমার পিতৃপিতামহদের জল দিতেছিলাম।”

বলরাম বলিল, “তাঁহারা কোথায় আছেন?”

ব্রাহ্মণ। তাঁহারা স্বর্গে আছেন।

বলরাম। স্বর্গে? সে ত অনেক দূর! আর তাঁহারা ঠিক স্বর্গেই আছেন, এ কথাও আপনি জোর করিয়া বলিতে পারেন না। আপনার কোশার জল যদি তাঁহাদের কাছে যায়, তাহা হইলে আমার অঞ্জলির জল এক রশী তফাতে আমার শাকের ক্ষেতে যাইবে না কেন?

ব্রাহ্মণ হতাশভাবে বলিলেন, “ছোঁড়া একেবারেই ক্ষেপিয়া গিয়াছে!”

মেহেরপুরের অদূরে ভৈরবের অপর পারে গোভীপুর নামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে; সে কালে এই গ্রামে অনেক ভদ্রলোকের বাস ছিল। ম্যালেরিয়ার আক্রমণে এখন এই গ্রামখানি শ্মশানতুল্য হইয়াছে; অবস্থাপন্ন বড় বড় গৃহস্থ-পরিবার বিধ্বস্ত হইয়াছে। তাহাদের ভিটা এখন অরণ্যপূর্ণ। যাহাদের সুপ্রশস্ত গৃহ-প্রাঙ্গণ এক সময় ধান, যব, অড়হর, ছোলা, মসিনা প্রভৃতি নানা শস্যে পরিপূর্ণ শ্রেণীবদ্ধ গোলায় মা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ন্যায় শোভা পাইত, সারি সারি গোশালা গাই-বলদে পূর্ণ থাকিত রাখাল, কৃষাণ, খাতক, পাইক প্রভৃতির কলরোলে যে গৃহ-প্রাঙ্গণ নিত্য মুখরিত হইত, এবং সন্ধ্যাসমাগমে সঙ্কীর্ত্তন-নিরত গ্রাম্য বালক ও যুবকবৃন্দের মিলিত কণ্ঠের হরিধ্বনির সহিত মৃদঙ্গধ্বনি মিশিয়া সমগ্র গ্রামখানি প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিত, সেই স্থান এখন প্রভাতে ও সন্ধ্যায় শৃগালের সঙ্গীতালাপে প্রতিধ্বনিত হইতেছে! গ্রামের বিভিন্ন অংশে যে দুই চারি ঘর গৃহস্থ এখনও বাস করিতেছে, সংবৎসরকাল রোগে ভুগিয়া তাহারা জীবন্মৃত।

কেবল গোভীপুর নহে, মেহেরপুর মহকুমার অধিকাংশ গ্রামের অবস্থা এইরূপ শোচনীয়; কিন্তু যখন গোভীপুরের শ্রী ও সমৃদ্ধি ছিল, সেই সময় এই গ্রামে এক জন ধনাঢ্য চর্ম্মকার বাস করিত। তাহার নাম সুবলচন্দ্র চৌধুরী। চর্ম্মের ব্যবসায়ে সে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিল; কমলার কৃপায় তাহার অবস্থা উন্নত হওয়ায়, মুচি হইলেও

তাহার চাল-চলন ও আচার-ব্যবহার ভদ্রলোকের মত হইয়াছিল। চর্ম্ম-ব্যবসায়ী হইলেও সে কখন চর্ম্ম স্পর্শ করিত না।

সুবল চৌধুরী বলরামকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি করিত। বলরাম হাড়ী, সুবল চৌধুরী মুচি; জাত্যংশে উভয়েই সমাজের একই স্তরের লোক, ইহাও তাঁহাদের বন্ধুত্ব-বন্ধনের অন্যতম কারণ। সুবল চৌধুরী বলিত, "জাতিতে আমি মুচি, এ জন্য হিন্দুসমাজে আমি অচল, আমরা কুকুরেরও অধম! উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর ঘরে কুকুর উঠিলে ঘর অপবিত্র হয় না, কিন্তু আমরা তাহাদের ঘরে উঠিলে ঘর অপবিত্র হয়, তাঁহাদের রান্নাঘরের ত কথাই নাই; কুকুর তাহাদের রান্নাঘরে প্রবেশ করিলে পাকশালার হাঁড়ীকুড়ী ফেলিতে দেখা যায় না, কিন্তু তাহাদের পাকশালার ত্রিসীমায় আমাদের যাইবারও অধিকার নাই! হিন্দুর ধোপা আমাদের কাপড় কাচে না, নাপিত আমাদের কামায় না। হিন্দু ঘরামী আমাদের ঘর ছাইবে না! এমন কি, হিন্দুর দেবমন্দিরে আমাদের প্রবেশের অধিকার নাই। হিন্দু হইয়াও আমরা—এই বাঙ্গালাদেশের লক্ষ লক্ষ মুচি উচ্চ বর্ণের হিন্দুর অস্পৃশ্য। হিন্দুর পূজার দালানে উঠিতে পাইব না, কিন্তু পূজা উপলক্ষে ঢাক-ঢোল বাজাইবার জন্য আমাদের ডাক পড়িবে। আমরা পূজা-বাটীতে ঢাক বাজাইব, কিন্তু উচ্চ সমাজের হিন্দুর সহিত মিশিয়া পূজা করিতে পাইব না! এই অবিচার, এই অত্যাচার অসহ্য মনে হয়। পাদরী সাহেব আমাকে সদলে খৃষ্টান হইতে উপদেশ দিতেছিলেন, তাহা হইলে অন্যান্য খৃষ্টান আমাদের সঙ্গে মিশিতে কুণ্ঠিত হইবে না। গীর্জ্জায় গিয়া তাহাদের সঙ্গে বসিয়া ভগবানের উপাসনা করিতে পাইব। অস্পৃশ্যবোধে কেহ আমাদের তাড়াইয়া দিবে না। 'সাতশিরের দরগার' ফকির সাহেব আমাকে বলিতেছিলেন, আমি মুসলমান হইলে আর অস্পৃশ্য থাকিব না, তখন মসজেদে গিয়া মৌলবী সাহেবের পাশে বসিয়া নমাজ করিতে পারিব, হিন্দু ধোপা মুসলমানের কাপড় কাচে, আমার কাপড়ও কাচিবে, হিন্দু নাপিত ঘাড় হেঁট করিয়া আমার পায়ের নখ কাটিয়া দিবে। হিন্দু ঘরামী মৌলবী সাহেবের ও অন্যান্য মুসলমানের ঘর ছায়, আমারও ঘর ছাইবে। মুসলমান মোল্লা আমার ধর্ম্ম-কর্ম্মের ব্যবস্থা করিবে। হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিব, অথচ হিন্দুসমাজের অস্পৃশ্য হইয়া থাকিব—এ অত্যাচার অসহ্য। যদি আমরা লক্ষ লক্ষ মুচি একযোগে খৃষ্টান বা মুসলমান হই, তাহা হইলে হিন্দু কি আরও দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে না? আমার হাতের জল অস্পৃশ্য, হিন্দু আমার ঘরে জলস্পর্শ করিবে না; হিন্দু বলিয়া আমার পরিচয় দিতে লজ্জা হয়।"

বলরাম বলিলেন, "দেখ সুবল, এক কায কর। সম্মুখেই দীপান্বিতা কালীপূজা। তুমি মহাসমারোহে কালীপূজা কর। পূজার রাত্রে মায়ের প্রসাদ গ্রহণের জন্য গ্রামের সকল ভদ্রলোককে নিমন্ত্রণ কর। তাহারা কি বলে শোন।"

সুবল চৌধুরী বলিল, "কি যে বল! মুচির বাড়ীতে কেহ ফলার খাইতে আসিবে ভাবিয়াছ? এ যে অসম্ভব ব্যাপার! দশ জনে কটু কথা বলিবে, তাহা আমি সহ্য করিতে পারিব না।"

বলরাম বলিলেন, "শিরোমণি ঠাকুর ত সামাজিক ক্রিয়াকর্ম্মের ব্যবস্থাদাতা। কা'ল সকালে চল, তাঁহার সঙ্গে দেখা করি। তিনি কি বলেন, শুনা যাইবে।"

পরদিন প্রভাতে বলরাম সুবল চৌধুরীকে সঙ্গে লইয়া শিরোমণি ঠাকুরের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। শিরোমণি ঠাকুর তখন গৃহবিগ্রহের পূজা শেষ করিয়া, বাহিরের ঘরে আসিয়া ধূমপানের অভিপ্রায়ে হুঁকাটি হাতে লইয়াছেন মাত্র, 'প্রভাতে হাড়ী ও মুচি' দুই বেটা অস্পৃশ্য নারকীর মুখদর্শন হইল বলিয়া তিনি অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন; কিন্তু সুবল চৌধুরী টাকার মানুষ, প্রকাণ্ড ধনী, তাহার মুখের উপর দুই কথা শুনাইয়া দিতে তাঁহার সাহস হইল না। 'সত্যং ব্রূয়াৎ' শ্লোকটি হঠাৎ তাঁহার মনে পড়িয়া গেল; কিন্তু তাহাদিগকে বসিতে বলিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না—যদিও তাঁহার উঠানে একখানি জলচৌকী পড়িয়া ছিল। তিনি সেই জলচৌকীতে বসিয়া পাদপ্রক্ষালন করিতেন, তাঁহার গৃহপালিত কুকুরগুলা অনেক সময় সেই জলচৌকির উপর শয়ন করিয়া নিদ্রাসুখ ভোগ করিত বটে, কিন্তু কুকুরেরও অধম হাড়ী ও মুচিকে তিনি কি করিয়া সেই জলচৌকিতে বসিতে বলিবেন? অগত্যা সুবল চৌধুরী ও বলরামকে দূরে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল।

শিরোমণি ঠাকুর শিখা আন্দোলন করিয়া বলিলেন, "কি রে সুবল! এত সকালে কি মতলবে আসিয়াছিস্ বল্।"

সুবল কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই বলরাম বলিলেন, "সুবল এবার একটু সমারোহ ক'রে মা কালীর পূজা করতে চায়। আপনারা সকলে যদি দয়া ক'রে ওর বাড়ীতে পায়ের ধূলো দেন, তা হ'লে—"

বলরামের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই ক্রোধে বিস্ময়ে শিরোমণি ঠাকুরের শিখা কণ্টকিত হইয়া উঠিল; তিনি উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "সুবল এবার কালীপূজো করবে, তার বাড়ীতে আমাদের দশ জনকে ফলারের নেমন্তন্ন করতে চায়! ওর টাকা হয়েছে ব'লে আমাদের জাত মারতে চায়? মুচির বাড়ী ফলার করতে হবে! মহাভারত! মহাভারত! ঘোর কলি আসন্ন হয়েছে, তা না হ'লে মুচির এত সাহস হয়?"

বলরাম শান্তভাবে বলিলেন, "ঠাকুর মশায়, রাগ করছেন কেন? মুচির বাড়ী ফলার, এ কথা মনে না ক'রে মায়ের প্রসাদ মনে করলে দোষ কি?"

শিরোমণি সকোপে বলিলেন, "তুই বেটা হাড়ী, তোর আর বুদ্ধির দৌড় কতখানি হবে? মুচির বাড়ী মায়ের প্রসাদও যা, ফলারও তাই। যাকে বলে চালভাজা, তাকেই বলে মুড়ী। প্রাতঃকালে কি পাপ কথাই শুনতে হ'ল! রাম, রাম!"

বলরাম বলিলেন, "মা কালী কে?"

শিরোমণি কলিকায় ফুঁ দিয়া বলিলেন, "তুই বেটা মা কালীকে চিনবি কি ক'রে? তিনি শিবসীমন্তিনী, ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী, জগজ্জননী।"

বলরাম। আজ্ঞে, আমরা সকলেই ত সেই মায়ের সন্তান?

শিরোমণি। অবিশ্যি; তিনি কেবল আমাদের কেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মা। এ গূঢ় তত্ত্ব হাড়ী-মুচির বুঝবার শক্তি নেই।

বলরাম। তা বটে, আমি আরও বুঝতে পারছিনে যে, মা যে সন্তানের ঘরে গিয়ে পূজো গ্রহণ করেন, যে সন্তানকে অস্পৃশ্য জ্ঞানে ত্যাগ না করেন, মায়ের সেই সন্তানের ঘরে গিয়ে তাঁর অন্য সন্তানে তাঁর প্রসাদ গ্রহণ করলেই তাদের জাত যাবে, মহাভারত অশুদ্ধ হবে! এ কোন্ দেশী মহাভারত ঠাকুর মশায়? আপনারা দশ ঠাকুর যার বাড়ী পায়ের ধূলো দিতে ঘৃণা বোধ করছেন, মা ত মুচি ব'লে তার প্রতি বিমুখ হন না।

শিরোমণি। তুই বেটা সত্যই ক্ষেপেছিস, নৈলে মুচির বাড়ী ব্রাহ্মণের নেমন্তন্ন করতে আ'সবি কেন? না, এখনও ধর্ম্মের, সমাজের এত অধঃপতন হয় নি যে, ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থরা মুচি-বাড়ীতে পাত পাতবে। তা দেখ চৌধুরী, যদি তোমার এতই আগ্রহ হয়ে থাকে, তা হ'লে আমাকে শ'দুই টাকা দিয়ে যেও, আমি এখানেই ফলারের আয়োজন করব। মায়ের প্রসাদটা এখানেই সকলে পাবে।

বলরাম বলিলেন, "জগজ্জননীর উপর যা আপনাদের ভক্তি, তা আপনার কথা শুনেই বুঝেছি! চল হে সুবল, এদের হৃদয়ে ভক্তি নেই, মুখে ভক্তির দোকানদারী।"

"যা কিছু ভক্তি হাড়ী-মুচির ঘরে ঢুকেছে"—বলিয়া শিরোমণি ঠাকুর

হুঁকায় এমন দম দিলেন যে, দপ্ করিয়া কলিকা জ্বলিয়া উঠিল। যাহা হউক, সুবল চৌধুরীর অর্থে সেবার অনেক ভদ্র-সন্তান স্থানান্তরে পেট ভরিয়া লুচির ফলার খাইয়া জাতি বাঁচাইয়াছিলেন।

মেহেরপুরের মল্লিক জমীদার বাবুরা 'আরিষ্টক্রাট', অর্থাৎ হাকিম ভিন্ন সাধারণের সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া আহার করিলে তাঁহাদের অনেকেরই সম্মানের লাঘব হয়! তাঁহাদের গৃহবিগ্রহ আনন্দবিহারীর এক জন দ্বাররক্ষীর প্রয়োজন হওয়ায় এবং বলরাম বলবান্ লাঠিয়াল ও বিশ্বাসী বলিয়া তাঁহাকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। বলরাম অনেক দিন এই চাকরী করিয়াছিলেন, তাহার পর এক দিন রাত্রিকালে কোন তস্কর ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিয়া ঠাকুরের বহুমূল্য অলঙ্কারাদি অপহরণ করে। বলরাম আনন্দবিহারীর দ্বাররক্ষী ছিলেন বলিয়া তাঁহাকেই চোর বলিয়া সন্দেহ করা হয়। কেহ কেহ বলেন, চোর সন্দেহে তাঁহার প্রতি উৎপীড়নেরও ত্রুটি হয় নাই। বলরাম বিবাগী হইয়া দেশত্যাগ করিলেন। তাহার পর বহু বৎসর তিনি কোথায় কি ভাবে কাটাইয়াছিলেন, স্থানীয় কোন লোক তাহা বলিতে পারে না। অনেকের ধারণা, এই সময় তিনি বিদেশে সাধন-ভজনে রত ছিলেন। তাঁহার আধ্যাত্মিক শক্তির পরিচয় পাইয়া উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গের অনেক জিলার বিস্তর লোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল, সেই সকল শিষ্যের মধ্যে উচ্চবর্ণের হিন্দু, এমন কি, ব্রাহ্মণেরও অভাব ছিল না।

প্রৌঢ়বয়সে দরবেশের বেশে তিনি বহু শিষ্য-সেবক-পরিবৃত হইয়া মেহেরপুরে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, এবং নদীতীরে নানাজাতীয় বৃক্ষাদি-পরিবেষ্টিত একটি নিভৃত স্থানে আশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন। এই আশ্রমই এখন 'বলরামের আখড়া' নামে পরিচিত; অনেকে এই আখড়াকে 'দরবেশের আখড়া' বলে।

এই স্থানে বলরাম ধর্ম্মালোচনায় এবং দরিদ্রনারায়ণের সেবায় জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করেন। তিনি বিবাহ করেন নাই; কিন্তু তাঁহার একটি সেবাদাসী ছিল। তাহার নাম 'ব্রহ্মমালোনী।' ব্রহ্ম অতিশয় ভক্তির সহিত তাঁহার সেবা করিত। বলরামের মৃত্যুর পর ব্রহ্মই তাঁহার আখড়ার কর্ত্রী হইয়াছিল। বলরামের সংস্রবে থাকায় ব্রহ্মের হৃদয়েও আধ্যাত্মিকতার বীজ উপ্ত হইয়াছিল। সে যে সকল ধর্ম্মকথা বলিত ও শিষ্যগণকে যে উপদেশ দান করিত, সাধারণ মালোর মেয়ের মুখে সে সকল উচ্চাঙ্গের কথা বাহির হইতে পারে না। বলরামের শিষ্যরা ব্রহ্মকে শক্তির অংশ জ্ঞানে ভক্তি করিত, এবং তাহার সকল আদেশ পালন করিয়া কৃতার্থ হইত।

বলরাম সুদীর্ঘকাল অজ্ঞাতবাসের পর মেহেরপুরে প্রত্যাগমন করিয়া শিষ্যসেবকগণের সহিত ধর্ম্মালোচনায় ও বিবিধ সদনুষ্ঠানে কালযাপন করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু মেহেরপুরে যাঁহারা পৈতৃক সম্পত্তির ও আভিজাত্যের গৌরব করিতেন, তাঁহারা বলরামের প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি সহ্য করিতে পারিলেন না। একটা অস্পৃশ্য হাড়ী—যে বহুদিন পূর্ব্বে চোর অপবাদে গ্রাম হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল, গ্রামে আসিয়া বহু লোক কর্ত্তৃক পূজিত হইতেছে, অনেকে তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া কায়মনোবাক্যে তাহার সেবা করিতেছে, তাঁহাদের অপেক্ষা তাহার প্রতি অধিক সম্মান প্রদর্শন করিতেছে, তাঁহাদের আভিজাত্য-গৌরব ইতর জনের এই স্পর্দ্ধায় যেন মলিন হইয়া গেল। তাঁহারা বলরামকে 'বুজরুক', 'প্রতারক', 'ভণ্ড' প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত করিয়া কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করিলেন।

এই সময় এক জন ব্রাহ্মণ জমীদার গ্রামের ভাগ্যবিধাতা হইয়াছিলেন, তাঁহার বাহুবলে এই অঞ্চলের দুর্দ্দান্ত য়ুরোপীয় নীলকরগুলা পর্য্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়া, শঙ্কাকুল চিত্তে কালযাপন করিত; তাঁহার লাঠিয়ালরা নীলের কুঠী পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়া চূর্ণ করিতে কুণ্ঠিত হইত না। তিনি মেহেরপুরে রাজার ন্যায় বিরাজ করিতেন, এবং পিনাল কোড তাঁহার লাঠির সম্মান রক্ষা করিয়া চলিত।

এই সময় এক দিন প্রভাতে জমীদার বাবু রাজপথসন্নিহিত চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া সোনার করসীতে ধূমপান করিতেছিলেন, রূপো ও সোনা নামক দুই জন খানসামা তাঁহার মাথায় ও পায়ে তৈলমর্দ্দন করিতেছিল।

জমীদার বাবুকে দেখিয়া প্রত্যেক পথিক অবনতমস্তকে তাঁহাকে অভিবাদন করিতেছিল। তিনি লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, এক জন তেলের একটি ভাঁড় লইয়া সেই পথ দিয়া চলিয়া গেল, সে তাঁহাকে দেখিয়াও দেখিল না, অভিবাদন করা ত দূরের কথা!

জমীদার বাবু সোনাকে বলিলেন, "আমার সম্মুখ দিয়ে মাথা উঁচু ক'রে চ'লে যাচ্ছে, ও কে [illegible] সোনা?"

সোনা পথের দিকে চাহিয়া করযোড়ে বলিল, "আজ্ঞে কর্ত্তা, ও বেটার নাম শিবু হাড়ী, ও বলরাম দরবেশের চেলা!"

জমীদার বলিলেন, "বটে! ব্যাটার ত ভারী আস্পর্দ্ধা, লাট সাহেবের মত মাথা উঁচু ক'রে চ'লে যাচ্ছে, আমি যে একটা লোক ব'সে আছি, তা গ্রাহ্যি হ'ল না! যা ত তোরা দু'জন, বেটার কান ধ'রে এখানে নিয়ে আয়। ওকে একটু তরিবৎ শিখানো দরকার।"

জমীদার বাবুর আদেশে রূপো ও সোনা তৈলাক্ত হস্তেই শিবু হাড়ীকে ধরিতে চলিল, এবং তাহার দুই কান ধরিয়া টানিতে টানিতে বাবুর নিকট হাজির করিল।

বাবু ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "আমাকে তুই চিনিস্?"

শিবু বলিল, "চিন্‌ব না কেন? আপনি আমাদের জমীদার বাবু।"

বাবু বলিলেন, "আমি ব্রাহ্মণ, জমীদার; তুই আমার সম্মুখ দিয়ে চ'লে গেলি, একটা প্রণাম পর্য্যন্ত করতে তোর অপমান বোধ হ'ল! তুই ভেবেছিস্ কি!"

শিবু বলিল, "বলরামচন্দরের পায়ের কাছে যে মাথা পেতে দিয়েছি, সে মাথা আর কারও কাছে নোয়াব না বাবু, তা তুমি বেরাম্ভনই হও, আর জমীদারই হও।"

বাবু ক্রোধে ক্ষিপ্তবৎ হইয়া বলিলেন, "সেই বুজরুক ভণ্ড বলা হাড়ীর চেলা হয়ে তোদের আস্পর্দ্ধা বড্ড বেড়ে গিয়েছে! দেবতা-ব্রাহ্মণ কাকেও গ্রাহ্যি করিস্‌নে। তোদের কি রকম সায়েস্তা করি—তা দেখাচ্ছি। তোর ভারী তেজ হয়েছে!"

শিবু বলিল, "আজ্ঞে, আমার ভাঁড়ে এক রত্তিও তেল নেই, তেল আনতে কলুবাড়ী যাচ্ছি।"

বাবু বলিলেন, "আবার ঠাট্টা! বেল্লিক, বাঁদর, পাজী, উল্লুক!"

শিবু বলিল, "গাল দেবেন না বাবু! আমি কোন অপরাধ করিনি। গালেরও তোয়াক্কা রাখিনে।"

বাবু ক্রোধে অধীর হইয়া ভৃত্যদ্বয়কে আদেশ করিলেন, "এই বদমায়েসকে ঘা কতক লাগা!"

রূপো ও সোনা শিবুকে মাটীতে ফেলিয়া প্রহার করিতে লাগিল। প্রহারে জর্জ্জরিত হইয়া যখন তাহার সংজ্ঞালোপের উপক্রম হইল, তখন তাহারা তাহাকে টানিয়া লইয়া গিয়া পথে ফেলিয়া আসিল। পথিকরা তাহার দুর্দ্দশা দেখিয়া 'আহা' বলিতেও সাহস করিল না, পাছে বাবু রাগ করেন!

শিবু অতি কষ্টে উঠিয়া ধীরে ধীরে আখড়ায় ফিরিয়া গেল এবং বলরামচন্দ্রের পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িয়া জমীদার বাবুর পৈশাচিক অত্যাচারের কথা তাঁহার গোচর করিল।

বলরাম ধীরভাবে সকল কথা শুনিলেন, তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল; তিনি শুষ্কভাবে শিবুর সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

শিবু বলিল, "প্রভু, বিনা দোষে জমীদার বাবু আমার হাড় গুঁড়া

ক'রে দিয়েছে! তুমি এর বিচার কর, অপরাধীকে শাস্তি দাও। আমি জানি, তুমি সব পার।"

বলরাম বলিলেন, "না শিবু, আমি কিছুই পারি নে। অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার কর্ত্তা আর এক জন। কিন্তু তুই আমার কাছে নালিশ্ করছিস কেন? কার নামে নালিস করছিস? এই জমীদারটা কি মানুষ? মানুষ কি মানুষকে মারে? মানুষ মানুষকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে, স্নেহ-মমতা করে; দুঃখীর দুঃখ মোচন করে, বিপন্নকে সাহায্য করে; আর্ত্তের চোখের জল মুছিয়ে দেয়, ইহাই মানুষের ধর্ম্ম। তুই যার কথা বলছিস, তুই দেখছিস সে মানুষ, আমি দিব্য চক্ষুতে দেখছি, সে একটা ক্ষ্যাপা কুকুর, বিষয়-বিষে ও অহঙ্কারে সে ক্ষেপে গিয়েছে! আমি তার দাঁত, নখ সকলই দেখতে পাচ্ছি! তুই কি পাগল যে, ক্ষ্যাপা কুকুরের নামে আমার কাছে নালিশ করছিস? আমার আশীর্ব্বাদে তোর গায়ের বেদনা সেরে যাবে। তুই আর দুঃখ করিস নে, শিবু।"

গুরুর কথায় শিবু সান্ত্বনা লাভ করিল। জমীদার বাবু বলরামের প্রতিও যথেষ্ট অত্যাচার করিয়াছিলেন; কিন্তু বলরাম ধীরভাবে সকল অত্যাচার সহ্য করিয়াছিলেন। তিনি মিষ্ট কথায় তাঁহার অসহিষ্ণু শিষ্য-সেবকদের সংযত করিয়া রাখিতেন।

বলরাম মৃত্যুকালে তাঁহার শিষ্যদের বলিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত দেহ যেন অগ্নিতে ভস্মীভূত বা ভূগর্ভে সমাহিত করা না হয়। তাঁহার মৃতদেহ ভক্ষণ করিয়া শৃগাল বা শকুনিরা তৃপ্তিলাভ করিলে তাঁহার মৃতদেহের সদ্ব্যবহার হইবে!

তাঁহার এই আদেশ পালিত হইয়াছিল। তাঁহার শব একটি অরণ্যে বটবৃক্ষমূলে সংরক্ষিত হইয়াছিল; তিন দিন পর্য্যন্ত সেই শব পশু-পক্ষীতে স্পর্শ করে নাই। চতুর্থ দিন সেখানে শবের চিহ্নমাত্র ছিল না।

বলরামের শিষ্যরা তাঁহার আখড়ায় একটি সুন্দর অট্টালিকা ও একটি স্মৃতিমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছে, এবং আখড়ার নীচে নদীতে একটি ঘাট বাঁধাইয়াছে। এই ঘাটটি 'দরবেশের ঘাট' নামে প্রসিদ্ধ।

অট্টালিকার একখানি খাটে বলরামের শয্যা প্রসারিত আছে। সেখানে বলরামের লাঠি, খড়ম, আসন প্রভৃতি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। বলরামের মানত করিয়া অনেকে রোগমুক্ত হইয়াছে। মৃতবৎসা রমণীগণ এখনও বলরামের 'মানত' করিয়া পুত্র লাভ করে এবং বলরামের প্রসাদে জীবনরক্ষা হওয়ায় পুত্রের নাম রাখে "বলরাম।" অনেকে গাছের ফল ও নবপ্রসূতা গাভীর দুগ্ধ বলরামের আখড়ায় উপহার দিয়া আইসে। অনেকেরই বিশ্বাস, বলরাম দৈবশক্তিসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। বলরামের আখড়ার বর্ত্তমান সেবাইতের নাম জীবন দরবেশ।

প্রতি বৎসর বারুণীর সময় বলরামের আখড়ায় বলরামের দোল হয়। এই উপলক্ষে বঙ্গের বিভিন্ন জিলা হইতে বহু ভক্তের সমাগম হইয়া থাকে। উৎসব তিন দিনস্থায়ী হয়। এক দিন লুচির ফলার, এক দিন চিড়ার ফলার, ও এক দিন "অন্ন-মচ্ছব" হইয়া উৎসব শেষ হয়। বারুণীর দিন আখড়ায় অনেক দোকান-পসারী পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিতে আইসে। আখড়ার আঙ্গিনাখানি অচিরে লাল হইয়া যায়। অনেক ভক্ত মন্দিরে মোমবাতী জ্বালিয়া দিয়া বলরামের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে; অনেকে সিকি, দুয়ানী, পয়সা দিয়া মন্দিরের সম্মুখে প্রণাম করে।

দেশবিদেশ হইতে দোলের সময় যে সকল নরনারীর সমাগম হয়, তাহারা নানা শ্রেণীর লোক; কিন্তু সকল জাতি একত্র বসিয়া আহার করে, যেন তাহারা জগন্নাথক্ষেত্রে আসিয়াছে! এই সকল যাত্রীর মধ্যে দুই চারি জন ব্রাহ্মণও দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা বলরামের হাড়ী-বাগ্দী শিষ্যের সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া ভোজন করিতে দ্বিধা বোধ করে না। ইহারা সকলেই বলরামকে ভগবানের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করে। স্থানীয় অনেক লোক তাহাদের এই বিশ্বাস নষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

আশ্রমে কয়েকখানি কুটীর আছে। কয়েকটি পুরুষ এবং কয়েক জন প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধা সেখানে বাস করে। ভিক্ষাই তাহাদের উপজীবিকা। কিন্তু প্রত্যহ নিয়মিতভাবে তাহাদিগকে ভিক্ষা করিতে দেখা যায় না। গৃহস্থ-রমণীগণ তাহাদিগকে সাধারণ ভিক্ষুকের ন্যায় অবজ্ঞা করেন না।

বলরামের দোলের তিন দিন আখড়ায় দিবারাত্রি খোল-করতাল সহযোগে সঙ্কীর্ত্তন ও সঙ্গীত আলাপ হয়। সঙ্কীর্ত্তনে বলরামের মহিমা কীর্ত্তিত হয়, এবং বলরামের রচিত দেহতত্ত্ব-বিষয়ক অনেক পদ গীত হইয়া থাকে, আর মুহুর্মুহুঃ 'জয় বলরামচন্দ্র' 'জয় হাড়ীরামচন্দ্র'—বলরামের এই জয়ধ্বনিতে ক্ষুদ্র পল্লীখানি প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

---

# জ্যোছনা রাতের ডাক

গভীর রাতে বেরিয়ে এলাম দোর খুলে' বাটটিতে
মনের কানে ডাক শুনে কার' কে জানে,
বকুলতলা পেরিয়ে গেলাম নদীর বিজন ঘা টটিতে—
ঢেউয়ের বেণী গাঁথ্‌ছে নদী উজানে!

নদী-পারের বনে থেকে বাজায় বাঁশী কোন্ জনা?
রেশ আসে—সুর যায় না বোঝা সবখানি;
কে ডেকেছে,—কোথায় সে জন? মন হ'ল যে উন্মনা—
গান হয়ে মোর ফুটতে যে চায় সব বাণী!

মিশিয়ে বকুল-ফুলের বাসে নিশীথ-নদীর জলকণা
দখিণ বাতাস বেড়ায় ভুলে চঞ্চলি';
ভিজে চুলের সুগন্ধ কার কর্‌ছি কেনই কল্পনা—
কাঁপ্‌ছে প্রাণে প্রণয়-ব্যথার অঞ্জলি!

আকাশ থেকে আস্‌ছে নেমে নীল অসীমের বুক বেয়ে
নীলবসনা কোন্ রূপসীর রূপ ঘেমে;
আত্মহারা দিগন্ত ঐ আকাশ-পানে মুক চেয়ে—
আমিও উদাস কার যে অপরূপ প্রেমে!

একলা জাগি নদীর কূলে—শিথিল বেশে ঘুমায় গ্রাম—
বের করেছে আমায় ডেকে জোছনা-রাত;
গভীর রাতে ঘুরে বেড়াই,—কোন্ বিরহের শুনায় গান
রাত্রি আমায়, রাগিণী তার জোছনা-পাত!

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী।

## মহাচীনের স্বাধীনতার স্বপ্ন

বলকানের বোসনিয়া প্রদেশের রাজধানী সেরাজেভো সহরে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে এক দিন গ্রেভিলো প্রিন্সেপ নামক এক বালক এনার্কিষ্টের গুলীর আঘাতে সারা বিশ্ব ব্যাপিয়া কালানল জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। সেই গুলীর আঘাতে অষ্ট্রীয়ার যুবরাজ নিহত হইয়াছিলেন এবং তাহারই ফলে জার্ম্মাণ-যুদ্ধের সূত্রপাত হইয়াছিল। সামান্য একটি ঘটনাসূত্র হইতে জগতে কত ভাঙ্গন-গড়নের আয়োজন হয়, তাহা এই ব্যাপার হইতে জানা যায়।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দের মে মাসে মহাচীনের সাংহাই বন্দরে চীন নাশনালিষ্টদিগের বিপক্ষে বৈদেশিক দূতাবাস হইতে যে গুলী বর্ষিত হইয়াছিল, তাহার পরিণাম কোথায় হইবে, কে বলিতে পারে?

স্বাধীনতা-প্রয়াসী চীনের নব্য-সম্প্রদায় সেই মে মাসে বিদেশী পণ্যের বিপক্ষে যে বিরাট ধর্ম্মঘটের এবং নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিল, তাহাতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বিস্ময়-বিস্ফারিতনেত্রে মহাচীনের বিরাটত্বের দিকে তাকাইয়া ভাবিয়াছিল, বুঝি বা ইহাই চীনের স্বাধীনতাসমরের প্রকৃত সূত্রপাত। তাহার পর বহুদিন গত হইয়াছে, কিন্তু এখনও চীনে নাশনালিষ্ট আন্দোলনের গতি পূর্ণমাত্রায় রুদ্ধ না হইলেও চীন যে গৃহবিবাদের হলাহলে এতাবৎ জর্জ্জরিত হইয়া আসিতেছে, তাহার প্রভাব হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই, বরং তাহার ফলে অধিকতর দুর্ব্বল এবং বৈদেশিকের স্বার্থ-সঞ্জাত চক্রান্তে অধিকতর জড়ীভূত হইয়া পড়িতেছে।

চীনের স্বাধীনতা-সূর্য্যের প্রতীক ডাক্তার সান-ইয়াট-সেন যে দিন হইতে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন, সেই দিন হইতে চীনের গৃহবিবাদ প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে। সান-ইয়াট-সেন রাজশক্তির উচ্ছেদসাধন করিয়া প্রজাতন্ত্র-শাসনের প্রবর্ত্তন করিবার পরেও যে চীনে গৃহবিবাদ একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছিল, এমন কথা বলিতেছি না। অন্তর্হিত হওয়া দূরে থাকুক, একবার এই গৃহবিবাদের ফলে সানকে চীন ছাড়িয়া জাপানে পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিতে হইয়াছিল। চীনের শক্তিশালী War-Lords বা প্রাদেশিক শাসনকর্তারা (টুচুন) য়ুরোপের মধ্যযুগের ব্যারণদিগের মত প্রায় সমস্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা স্বহস্তগত করিয়াছিলেন। য়ুরোপে যেমন সে সময়ে রাজারা এই সকল শক্তিশালী ব্যারণের হস্তে ক্রীড়নক ছিলেন, চীনের রাজশক্তি ও পরে প্রজাতন্ত্র গভর্ণমেণ্টও তেমনই এই সকল টুচুনদিগের মুখাপেক্ষী হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডের মধ্যযুগে যেমন Wa·wick, Kingmaker হইয়াছিলেন, তেমনই চীনের টুচুনরা যাঁহার পক্ষ গ্রহণ করিতেন, তিনিই চীনে কর্তৃত্ব করিবার সুযোগ পাইতেন। চীনের রাজশক্তির প্রভাবের দিনে তাঁহারাই মাণ্ডারিণরূপে পরিচিত ছিলেন। কখনও কখনও এমন ঘটিত যে, মাণ্ডারিণ বা টুচুনরা নিজ নিজ এলাকায় সমস্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তগত করিয়া সর্ব্বেসর্ব্বা হইতেন, কেন্দ্রীয় রাজশক্তি বা প্রজাশক্তিকে গ্রাহ্য করিতেন না। কখনও কখনও তাঁহারা পরস্পর শক্তিপরীক্ষায় অগ্রসর হইতেন। ফলে চীনে গৃহবিবাদ লাগিয়াই থাকিত। মাণ্ডারিণ বা টুচুনরা আপন আপন সৈন্যদল পোষণের জন্য হয় নিজ এলাকার, না হয় অপর টুচুন বা মাণ্ডারিণের এলাকার প্রজার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতেন। এ জন্য চীনের কোথাও প্রজার ধন-প্রাণ বা মান-ইজ্জৎ নিরাপদ ছিল না। সর্ব্বত্রই প্রায় অরাজকতা বিরাজ করিত।

ডাক্তার সান-ইয়াট-সেনের সময়েও চীনের এই অবস্থার কতকটা প্রতীকার হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। তিনি উত্তর-চীনে বিফলমনোরথ হইয়া দক্ষিণ-চীনে কাণ্টনের দিকে যে প্রজাতন্ত্র গভর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সেই গভর্ণমেণ্ট এই অরাজকতার মধ্যেও কতকটা শৃঙ্খলা আনয়নে সমর্থ হইয়াছিল। তিনি তাঁহার সেনা ও জনগণের মধ্যে দেশপ্রেম জাগাইতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু চীনের দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার অকালমৃত্যুর ফলে চীনে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার কথা স্বপ্নেই পর্য্যবসিত হইল।

তাঁহার সময়ে যে তিন জন War-Lord অতঃপর চীনের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের পরিচয় 'মাসিক বসুমতীতে' একাধিকবার দেওয়া হইয়াছে। জেনারল চাঙ্গ-সো-লিন, জেনারল উ-পেইফু অথবা জেনারল ফেঙ্গ-উসিয়াঙ্গ যে বর্ত্তমানে চীনের তিন জন প্রধান ভাগ্যনিয়ন্তা, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু এই তিন জন শক্তিশালী War-Lordএর পরস্পর কলহ ও দ্বেষ-হিংসার ফলে চীন আজ ছারেখারে যাইতে বসিয়াছে, তাহার স্বাধীনতার স্বপ্ন সফল হইবে কিরূপে? মার্কিণ দেশের লিবারল মতাবলম্বীরা যথার্থই চীনের স্বাধীনতা-প্রয়াসী। তাঁহারা চীনকে এই মুহূর্ত্তেই স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার দিতে চাহেন,—চীন যাহাতে কোনওরূপে কাহারও অধীন না থাকিয়া নিজের স্বাধীন শাসন-যন্ত্র পরিচালনা করিতে পারে, তাহারই কামনা করেন। কিন্তু মার্কিণের সাম্রাজ্যবাদী কনজারভেটিবরা তাহার উত্তরে ভয় দেখাইয়া বলেন, "তাও কি হয়? চীনে এখন যে জাতীয়তার অগ্নিশিখা দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে, উহা প্রকৃত দেশপ্রেম হইতে সঞ্জাত হয় নাই, যেমন অন্য অনেক সময়ে বিদেশী বিদ্বেষাগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, ইহাও তাহার পুনরাবৃত্তিমাত্র, তবে ভিন্ন আকারে। চীনের জনগণের মধ্যে আদৌ একতা নাই, সুতরাং তাহারা তুর্ক জাতির মত এক দিনে জাতীয়তা ও দেশপ্রেমের মদিরায় উন্মত্ত হইয়া স্বাধীন হইতে পারিবে না। চীনকে এখন স্বাধীনতা দিলেই সর্ব্বনাশ হইবে। চীনের বিভিন্ন স্বার্থচালিত সম্প্রদায়সমূহ ও War-Lordরা স্বাধীনতা পাইলেই পরস্পর কেন্দ্র-শক্তি হস্তগত করিবার নিমিত্ত রক্তারক্তি করিবে এবং তাহার ফল অরাজকতা ও বিদেশীয়ের বাণিজ্যনাশ।"

ঠিক এই ভাবের কথাই সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বলিয়া থাকেন। ইহাতে নূতনত্ব নাই। সুখের বিষয়, চীন ভারতের মত সকল বিষয়ে পরাধীন নহে। যদিও কয়েক মাস পূর্ব্বে চীনের নাশনালিষ্টরা মহাত্মা গন্ধীর নিকট সখেদে অনুযোগ করিয়াছিল যে, 'ভারত এক প্রভুর অধীন, চীন নানা প্রভুর অধীন', তথাপি কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যায়, Treaty ports অথবা Concessions ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে চীনের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। এই রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাকে যে

দিন চীনের War-Lordরা একযোগে কেন্দ্রীভূত করিতে সমর্থ হইবে, সেই দিন চীনের স্বাধীনতার স্বপ্ন সফল হইবে, অন্যথা নহে।

চীনের খৃষ্টান জেনারল ফেঙ্গ-যুসিয়াঙ্গ এই স্বপ্ন সফল করিবার জন্য কিছু দিন পূর্ব্বে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। কিরূপে তিনি তাঁহার সৈন্যগণকে য়ুরোপীয় প্রথায় রণশিক্ষিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া শক্তিশালী হইয়াছিলেন এবং চীন হইতে বৈদেশিকের প্রভাব দূর করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাহার পরিচয় ইতঃপূর্ব্বে 'মাসিক বসুমতীতে' দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তিনি গত এপ্রেল মাসে মাঞ্চুরিয়ার War-Lord চাঙ্গ-সো-লিন ও মধ্যচীনের জেনারল উ-পেইফুর সম্মিলিত শক্তির নিকট পরাজিত হইয়া তাঁহার Kuomanching বা People's army অথবা জনগণের সেনাদল সমভিব্যাহারে মঙ্গোলিয়ার রাজধানী উর্গায় পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহাকে মস্কৌ সহরে গিয়া রুসিয়ান বলশেভিক শক্তির সাহায্যপ্রার্থী হইতে হইয়াছে।

যে সকল চীন নর-নারী বিদেশীর বিরুদ্ধে ধর্ম্মঘট ভঙ্গ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কাণ্টনে প্রকাশ্য রাজপথে তাহাদের বিচার

এ দিকে মাঞ্চুরিয়ার War-Lord চাঙ্গ-সো-লিন ও জেনারল উপেইফু জাপানের সমর্থন লাভ করিয়া শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছেন। ফলে যাঁহারা একযোগে স্বদেশের মুক্তি-সাধনে সফলকাম হইতে পারিতেন, তাঁহারা পরস্পর দ্বেষহিংসার ফলে জগতের অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থান্ধ শক্তিসমূহের হস্তের ক্রীড়নকরূপে পরিণত হইয়াছেন। ইহা অপেক্ষা চীনের দুর্ভাগ্য আর কি হইতে পারে?

জার্ম্মাণ-যুদ্ধে জার্ম্মাণীর পতনের পরে এবং রুসিয়ার জার-শাসিত গভর্ণমেণ্টের উচ্ছেদের পরে জগতে এখন তিনটি প্রধান Imperialistic বা সাম্রাজ্যবাদী গভর্ণমেণ্টের অস্তিত্ব অনুভূত হয়;—বৃটেন, ফ্রান্স ও জাপান। বলশেভিক রুসিয়া অথবা গণতন্ত্রবাদী মার্কিণ স্বয়ং প্রচার করিয়া থাকেন যে, তাঁহারা সাম্রাজ্যবাদী নহেন, তাঁহারা চীনের স্বাধীনতা-প্রয়াসী, চীন যাহাতে শক্তিশালী ও স্বাধীন হইয়া অন্যান্য জাতির ন্যায় আত্মনিয়ন্ত্রণ করিতে পারে, তাহাই তাঁহারা দেখিতে চাহেন। বলশেভিক রুসিয়া জার-শাসিত রুসিয়ার প্রায় সমস্ত অধিকার চীনে ছাড়িয়া দিয়া চীনের সহিত সমানে সমানে ব্যবহার করিতেছেন, এ সংবাদ পূর্ব্বে অন্য সংখ্যায় দেওয়া হইয়াছে। বলশেভিকরা জগতের অপর শক্তিগণকে জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা চীনকে অতঃপর কাহারও অধীন দেখিতে চাহেন না। যদি কেহ চীনের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে, তাহা হইলে তাহার বিপক্ষে তাঁহারা চীনকে সাহায্যদান করিবেন। কিন্তু তাঁহাদের এই আপাততঃ সাধু উদ্দেশ্যে অন্যান্য শক্তি সন্দেহ করিতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন, রুসিয়ান ভল্লুক এইরূপে মুখে চীনের প্রতি বন্ধুত্ব প্রদর্শন করিয়া চীনের রেল ও ব্যবসায়ে বিশেষ অধিকার লাভের চেষ্টায় আছেন।

মার্কিণ সর্ব্বদা আপনাকে চীনের বন্ধু বলিয়া ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, তিনি কোনও কালে সাম্রাজ্যবাদী নহেন। তবে যে 'ফিলিপাইন' দ্বীপপুঞ্জ স্বাধিকারে আনিয়াছেন, তাহা কতকটা ইংলণ্ডের In a fit of absent-mindedness সাম্রাজ্যবিস্তারের মত! তিনি এ যাবৎ দুইটি নীতি অনুসরণ করিয়া আসিয়াছেন,—(১) Integrity, (২) Open Door. চীনের Integrity অর্থাৎ স্বাধীনতা ও শক্তি যাহাতে অব্যাহত থাকে, তাহাই তাঁহার প্রধান কামনা। যদি অপরাপর শক্তি তাহাতে বাধা প্রদান করে, তাহা হইলে তিনি তাহাদের বিপক্ষে যুদ্ধঘোষণা করিতে অগ্রসর হইবেন না বটে, তবে সকলের যাহাতে চীনে বাণিজ্য ও অধিকারের সমান অধিকার থাকে, তিনি তাহাতে অবহিত হইবেন; ইহাই তাঁহার Open Door policy. কোনও মার্কিণ রাজপুরুষ স্পষ্টই বলিয়াছেন,—"Our chief desire is to see firmly established the sovereignty, the independence and the territorial and administrative integrity of China. Though we have never been desirous of territory in China, we have had no intention of abandoning to other nations the great commercial possibilities of the Chinese market."

চীনের রাজনীতিক সমস্যা যে কত জটিল, তাহা ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে। চীনের market হইল মধুচক্র, ইহার আশে-পাশে প্রতীচ্যের নানা শক্তিশালী জাতি মধুকরের ন্যায় মধুর আশায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সুতরাং এ অবস্থা যত দিন থাকিবে, তত দিন চীনের মুক্তির আশা কিরূপে সম্ভবপর হইবে ? বিশেষতঃ চীন যেরূপ গৃহ-বিবাদে উৎসন্ন যাইতেছে, তাহাতে ত মধুকরদিগের মধু লুঠিবার বিশেষ সুযোগ। মার্কিণ তাঁহার সদিচ্ছার পরিচয় দিয়া ইংলণ্ডের প্রতি একটু স্নেহের কটাক্ষপাত করিয়াছেন। ইংরাজও তাহার উত্তরে বলিয়াছেন, "মার্কিণ বড় মজার লোক। তিনি সর্ব্বদা চীনের প্রতি বন্ধুত্ব দেখাইয়া থাকেন। যাহাতে চীনের প্রতি সদ্ব্যবহার করা হয়, তাহার জন্য ওকালতী করিয়া থাকেন। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে অপরাপর বৈদেশিক শক্তি যুদ্ধ বা diplomatic সন্ধির ফলে চীনে কোনও কিছু অধিকার লাভ করিয়াছে, সেই মুহূর্ত্তেই মার্কিণ অগ্রণী হইয়া তাহার ভাগ চাহিয়াছেন। তিনি নিজে কখন বীজ বপন করেন না, কিন্তু ফল উপভোগের সময়ে সকলের অগ্রগামী। তাঁহার এ ভণ্ডামীর অর্থ কি ?"

ক্যাণ্টনে ধর্ম্মঘটভঙ্গকারিণী বন্দিনী চীনা যুবতী

মার্কিণ এই উত্তরের প্রত্যুত্তরও যোগাইয়া রাখিয়াছেন। তিনি বলেন,—"মার্কিণ প্রথমাবধি চীনের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। মার্কিণ বিলক্ষণ বুঝেন যে, যদি তাঁহার এই নীতি সফল করিতে হয়, তাহা হইলে মার্কিণকে অন্যান্য বৈদেশিক শক্তির মত চীনে সমান অধিকার দখল করিয়া রাখিতে হয়, অন্যথা মার্কিণ যদি অন্যান্য জাতিকে চীনে বিশেষ অধিকার উপভোগ করিতে দিয়া নিজে সরিয়া দাঁড়ান, তাহা হইলে পরে চীনের কোনও ব্যাপারে আর তাঁহাকে কোনও কথা কহিতে দেওয়া হইবে না। মার্কিণ-দূত ক্যালেব কাসিং ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ওয়াংসিয়ায় যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করেন, তাহাতে এই সর্ত্ত করাইয়া লইয়াছিলেন যে, চীন অন্যান্য বৈদেশিককে যে অধিকার দিবে, মার্কিণকেও তাহা দিতে হইবে। ইহাই মার্কিণের Open Door Policy." মার্কিণের এ কথাটা নিতান্ত ভিত্তিহীন নহে। ইতিহাসই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে যখন রুসিয়া, জাপান, বৃটেন ও জার্ম্মাণী চীনকে ভাগাভাগি করিয়া লইবার উপক্রম করিয়াছিল, সে সময়ে মার্কিণ ষ্টেট সেক্রেটারী হে যে কড়া ঘোষণা ( Note ) করিয়াছিলেন, তাহাতেই চীনের স্বাধীনতা রক্ষিত হইয়াছিল। সেক্রেটারী হে জলদগম্ভীর স্বরে বলিয়াছিলেন, যদি শক্তিপুঞ্জ চীনকে এইভাবে ভাগাভাগি করিয়া লইতে যান, তাহা হইলে চীনে Open Door Policy অর্থাৎ সকলের সমান অধিকার রাখিতে হইবে। মার্কিণের এই হুঙ্কারে শক্তিপুঞ্জ পশ্চাৎপদ হইয়াছিলেন।

তাহার পর রুস-জাপান যুদ্ধকালে 'ক্ষুদ্র' জাপান বিরাট জার-শাসিত রুসিয়ার সাম্রাজ্যিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। সে সময়ে প্রেসিডেণ্ট রুসভেল্ট জাপানের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাহার কারণ এই যে, জাপান প্রশান্তসাগরে মার্কিণের স্বাভাবিক প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেও রুসিয়া চীনের মাঞ্চুরিয়া ও লাওটাঙ্গ উপদ্বীপ গ্রাসে উদ্যত হইয়াছিল এবং জাপান উহাতে বাধা প্রদান করিয়াছিল বলিয়া মার্কিণ জাপানের কার্য্যে উৎসাহ প্রদান করিয়াছিল। ইহাতে চীনের প্রতি মার্কিণের সহানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়।

তাহার পরে জাপান যখন নিজে রুসিয়ার মত চীনের রাজ্য-গ্রাসেচ্ছায় উদ্যত হইল, চীনে Integirty অথবা Open door নীতি মানিতে সম্মত হইল না, তখন আবার মার্কিণ জাপানের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। ইহারই ফল Washington Conference-এর অধিবেশন। ঐ বৈঠকে ইংরাজ, ফরাসী ও জাপানও যোগদান করিয়াছিলেন। ফলে সকলেই মার্কিণের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া চীনদেশে রাজ্যবিস্তারের অথবা অন্যায় অধিকারলাভের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। ইহাও মার্কিণের চীন-প্রীতির পরিচায়ক। মার্কিণ এইরূপে চীনের Integrity অথবা স্বাধীনতারক্ষায় অগ্রণী হইয়া সাফল্য লাভ করিয়াছেন। মার্কিণ Imperialistic শক্তিপুঞ্জের সহিত যোগদান করেন নাই, বরং Imperialist শক্তিরা তাঁহার প্রস্তাবমত কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। চীনের সহিত বৈদেশিক শক্তিপুঞ্জের সংস্পর্শ হওয়া অবধি এই সর্ব্বপ্রথমে চীন বৈদেশিক শক্তিপুঞ্জের উচ্চাকাঙ্ক্ষার অনল হইতে আত্মরক্ষা করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইল।

সর্ব্বশেষে মার্কিণ চীনের আরও একটি সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। মার্কিণের উদ্যোগে চীন সম্পর্কে একটি আন্তর্জাতিক Consortium এর বন্দোবস্ত হইল। এই Consortium বা সমবেত শক্তিপুঞ্জ চীনকে কোন ঋণ দিয়া সাহায্য করেন নাই, এ কথা সত্য বটে, কিন্তু অতঃপর কোনও দায়িত্বহীন সামরিক adventurerকে রেল ও অন্যান্য সম্পর্কে বিশেষ অধিকারদানের পরিবর্ত্তে চীন ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবেন না, এ কথা Consortium ধার্য্য করিলেন। জাপান এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অপরাধী ছিলেন। তাঁহার Nishihara Loans ইহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তিনি চীনকে এই ঋণ দিয়া চীনের সাম্রাজ্য কর্ত্তৃক হস্তগত করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। প্রত্যক্ষে জাপান গভর্ণমেণ্টের এই ঋণের সহিত সম্পর্ক না থাকিলেও পরোক্ষে যে ছিল, তাহার প্রমাণের অভাব নাই।

ওয়াসিংটন কনফারেন্সের আর একটি সুফল এই হইয়াছিল যে, চীন ক্রমে ক্রমে তাঁহার হস্তচ্যুত অধিকার পুনরায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কাষ্টম টেরিফের বৃদ্ধি এবং অপরাধী বৈদেশিকগণের চীনের আইন ও আদালতের প্রভাব হইতে অব্যাহতি লাভের অধিকার-লোপ ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। যাহাতে চীন এই সকল অধিকার পুনঃ প্রাপ্ত হয়, তাহার জন্য মার্কিণের চেষ্টায় পিকিং কনফারেন্সের আয়োজন হইয়াছিল। পিকিংয়ে যে কাষ্টম কনফারেন্সের অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে মার্কিণ প্রতিনিধিরা ওয়াসিংটন বৈঠকের সিদ্ধান্তের উপরেও চীনের জন্য অধিক সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রস্তাব অনুসারে শক্তিপুঞ্জ চীনকে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী হইতে কাষ্টম বিভাগে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনাধিকার দিতে প্রতিশ্রুত হয়েন। ইহা চীনের পক্ষে অল্প লাভের কথা নহে।

মস্কো সহরে জেনারল ফেঙ্গ-উসিয়াঙ্গ। মধ্যস্থলে যিনি দণ্ডায়মান, যিনি সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ ও পুষ্টকায়, তিনিই ফেঙ্গ উসিয়াঙ্গ

মার্কিণ রাজনীতিকরা এই পর্য্যন্ত মার্কিণের সদিচ্ছার পরিচয় দিবার পর বলেন যে, তাঁহারা চীনে যে সংস্কারের শুভ বেদীর ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, অকস্মাৎ চীনে বলশেভিক প্রভাব উহা শিথিল-মূল করিয়া দিয়াছে। বলশেভিকরা বন্ধুবেশে দেখা দিয়া চীনের সহিত সমানে সমানের ব্যবহারের ভাণ করিয়া, চীনে নিজের সকল প্রকার বিশেষ অধিকার ত্যাগ করিয়া ভিতরে ভিতরে শত্রুরূপে জার-শাসিত রুসিয়ার মত ধীরে ধীরে মাঞ্চুরিয়া, মঙ্গোলিয়া, তুর্কীস্থান ও উত্তর-চীনে প্রবেশ লাভ করিতে লাগিল।

ইহার ফলে বৃটেন, ফ্রান্স ও জাপান বাঁকিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহারা অতঃপর আর ওয়াসিংটন বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুসারে কার্য্য করিতে সম্মত হইলেন না। তাঁহারা মার্কিণকে স্পষ্টই বলিলেন যে, রুসিয়া গোপনে চীন গ্রাস করিবে, আর তাঁহারা 'ভালমানুষি' করিয়া চীনে তাঁহাদের সকল অধিকার ছাড়িয়া দিবেন, তাহা হইতে পারে না। মার্কিণ প্রমাদ গণিলেন, তাঁহার এত চেষ্টা বিফল হইল; মার্কিণ দেখিলেন, তিনি যদি চীনের স্বার্থরক্ষার জন্য তখন জিদ করেন, তাহা হইলে শক্তিপুঞ্জের মধ্যে নূতন সন্ধিসর্ত্ত হইবে এবং উহার ফলে কেহই মার্কিণের ওয়াসিংটন বৈঠকের সিদ্ধান্ত মানিবে না, পরন্ত রুসিয়া,—মঙ্গোলিয়া ও তুর্কীস্থান সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিবে, জাপান মাঞ্চুরিয়া দখল করিয়া লইবে, ইংলণ্ড, তিব্বত এবং হংকংএর সান্নিধ্যে ইয়াংসি উপত্যকা অধিকার করিয়া লইবে, ফরাসী য়ুনান ও কোয়াংসি অঞ্চলে খেসারতের অছিলায় নূতন ভূমি গ্রাস করিবে। এতদ্ব্যতীত প্রতিদ্বন্দ্বী War-Lordদের মধ্যে প্রভুত্ব লইয়া তুমুল সংঘর্ষ উপস্থিত হইবে; ফলে চীনের সর্ব্বনাশ হইবে।

এই সকল দেখিয়া-শুনিয়া মার্কিণ আপাততঃ চীনকে সকল বিষয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিবার অর্দ্ধ-পথে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। মার্কিণ বলিতেছেন, চীনের ভাগ্যদেবতা তাহার প্রতি সুপ্রসন্ন নহেন, তিনি কি করিতে পারেন?

বস্তুতঃ মার্কিণের এই সদুদ্দেশ্য থাকুক বা না-ই থাকুক, এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, চীন ভারতেরই মত নিজেই নিজের শত্রু। নিজের ঘোর দুর্দ্দশার কথা চীনের দেশপ্রেমিক War-Lordরা একবার স্মরণ করেন না। ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতৃগণের মত তাঁহারাও বোধ হয় মনে করেন, "চীন যদি স্বাধীন হয়, তাহা হইলে আমার দ্বারাই হউক, অপরের দ্বারা হইতে দিব না।" চীনে তাঁহাদের বিরোধ ও সংঘর্ষের ফলে অরাজকতা সর্ব্বক্ষণ বিদ্যমান। ইহার ফলে বৈদেশিকের ধনপ্রাণ সেখানে নিরাপদ নহে। সে অবস্থায় বৈদেশিক শক্তিপুঞ্জ চীনে তাঁহাদের স্বার্থসংরক্ষণের চেষ্টা না করিয়া পারেন না। চীন যত দিন নিজের ঘর সামলাইতে না পারিবে, তত দিন ভারতেরই মত তাহার পূর্ণ স্বাধীনতার স্বপ্ন সফল হইবে না।

## ইবন সাউদ

জগতে অধুনা যে কয় জন ক্ষণজন্মা পুরুষ এক একটা দেশ বা জাতির ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন, আরবের সুলতান আবদুল আজিজ ইবন সাউদ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। গাজী মুস্তাফা কামাল পাশা অথবা শা-ইন-শা মহম্মদ রেজা খাঁ পহলবী যেমন তুর্কী ও ইরাণের ভাগ্যবিধাতৃরূপে আবির্ভূত হইয়া তুর্ক ও ইরাণীকে নূতন জাতিতে পরিণত করিতেছেন, ইবন সাউদও তেমনই আরবের স্বাধীন মরুবাসীদিগকে এক সম্পূর্ণ নূতন উপাদানে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন। আর এক জন শক্তিশালী পুরুষও আর এক মুসলমান রাজ্যের নূতন ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন—তিনি রিফের রাণা প্রতাপ আবদুল করিম। গ্রহবৈগুণ্যে তিনি আজ প্রবল আততায়ীর হস্তে বন্দী—রাণা প্রতাপের মত স্বদেশ ও স্বজাতির স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়া হাসিমুখে ইহলোক ত্যাগ করিতে পারিলেন না। এ সংসারে পাশার খেলায় জয়-পরাজয় আছে-ই, কাহার ভাগ্যে লক্ষ্মী সুপ্রসন্না হয়েন, তাহা কেহই কৃতনিশ্চয় হইয়া বলিতে পারেন না, কিন্তু তাহা বলিয়া আবদুল করিমের পুরুষকারের অভাব ছিল না। তিনি আজ হৃতরাজ্য ও শত্রুর অধীনতা স্বীকার করিলেও তাঁহার উদ্যমের কথা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না।

নেজদের সুলতান আবদুল আজিজ ইবন সাউদ ভাগ্যবান্ শক্তিশালী পুরুষ। তিনি অসিহস্তে নিজের ভাগ্য-পথ পরিষ্কার করিয়া আজ প্রায় সমগ্র আরবের কর্তৃত্ব হস্তগত করিয়াছেন, আরবজাতি এখন তাঁহার মুখ চাহিয়া আপনাদের উন্নতি-কামনা করিতেছে। জাতির প্রিয়পাত্র হইবার সৌভাগ্যলাভ কয় জন ভাগ্যবানের অদৃষ্টে ঘটিয়া থাকে?

গত জার্ম্মাণযুদ্ধকালে জার্ম্মাণ-বন্ধু তুর্কীর বিপক্ষে ইংরাজ যে সময়ে যুদ্ধ ঘোষণা করেন, সেই সময়ে মক্কার সরিফ হুসেন আপন প্রভু তুর্কীর বিপক্ষে ইংরাজকে সাহায্য দান করিয়াছিলেন। ফলে ইংরাজের কৃপায় তিনি হজ্জ অর্থাৎ মুসলমান ধর্ম্মস্থানসমূহের রাজত্ব লাভ করিয়াছিলেন। আরবরা কিন্তু তাঁহার উপর সন্তুষ্ট ছিল না। ইবন সাউদ অসন্তুষ্ট আরবদিগের দলপতিরূপে তাঁহার বিপক্ষে যুদ্ধ-ঘোষণা করেন। কি জানি, কি কারণে ইংরাজ সে সময়ে রাজা হুসেনকে সাহায্য করেন নাই। ফলে ইবন সাউদ রাজা হুসেনকে রণে পরাস্ত করিয়া হজ্জের কর্তৃত্ব হস্তগত করেন।

মিশরের মরুভূমিতে উষ্ট্রপৃষ্ঠে আমীন রিহানী

সেই যুদ্ধে ইবন সাউদের গোলার আঘাতে মুসলমানের দৃষ্টিতে পবিত্র কয়েকটি সমাধিস্থান ধ্বংস হইয়াছিল বলিয়া জনরব রটিয়াছিল। ফলে মুসলমান জগতে উঁহার বিপক্ষে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। এ বিষয়ে সত্যাসত্য নির্ণয়ার্থ ভারতবর্ষ হইতেও একটি ডেপুটেশান হজ্জে গমন করিয়াছিল। ডেপুটেশানের রিপোর্টে জানা যায় যে, সমাধিমন্দির ধ্বংসের কথা মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত নহে। ইবন সাউদ সেই অভিযোগের উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, যুদ্ধের সময়ে গোলাগুলীর আঘাতে কোন স্থান ধ্বংস হওয়া আশ্চর্য্যের কথা নহে। তবে ঐ কার্য্য যে তাঁহার ইচ্ছাকৃত নহে, ইহা নিশ্চিত। শত্রু ঐ সকল স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিলে দূর হইতে গোলা মারিয়া তাহাকে স্থানচ্যুত করিলে ন্যায়যুদ্ধের আইনের ব্যতিক্রম করা হয় না। তবে যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা যখন আর ফিরাইয়া আনা যায় না, তখন তাঁহার সাধ্যমত তিনি ঐ সকল স্থানের সংস্কারসাধন করিবেন। পরন্তু তিনি এমন প্রতিশ্রুতিও দিয়াছিলেন যে, মুসলমানের ধর্ম্মস্থান হজ্জের রক্ষণাবেক্ষণ ও শাসন-ব্যবস্থার জন্য তিনি জগতের সকল মুসলমানের সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে সম্মত আছেন।

তাঁহার এই কৈফিয়তে জগতের সকল মুসলমানই যে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, এমন কথা বলা যায় না। এখনও বহু মুসলমান তাঁহার প্রতি ঘোর অসন্তুষ্ট। কিন্তু তাহা হইলেও তিনি যে স্বজাতীয় ও স্বধর্ম্মী ওহাবী আরবদিগের পূর্ণ সমর্থন লাভ করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহারা তাঁহাকেই তাহাদের দলপতিরূপে বরণ করিয়া লইয়াছে। আজ ইবন সাউদ প্রকৃতপক্ষে আরবের অবিসংবাদী রাজা।

এ হেন ইবন সাউদের সবিশেষ পরিচয় জানিবার আগ্রহ সকলেরই মনে সঞ্জাত হওয়া স্বাভাবিক। ইবন সাউদ কে, তিনি কি প্রকৃতির লোক; কোন্ গুণে তিনি মরুভূর চিরস্বাধীন দুর্দ্ধর্ষ ওহাবী আরবের হৃদয় জয় করিয়াছেন?

আমীন রিহানী জন্মে সিরিয়া দেশের আরব, তিনি ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ খৃষ্টানধর্ম্মাবলম্বী। তিনি মার্কিণ দেশে বসবাস করিয়া তথায় বিদ্যাশিক্ষা করিয়া মার্কিণ নাগরিক হইয়াছেন। ইরাকের ইংরাজ হাই কমিশনার সার পার্শি কক্স যে সময়ে ইরাক ও নেজদের মধ্যে এক সীমানা-সংক্রান্ত বিবাদের মীমাংসা করিতে ইবন সাউদের সহিত নেজদে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, সেই সময়ে আমীন রিহানী নেজদে গিয়া ইবন সাউদকে দেখিয়া আসিয়াছিলেন ও তাঁহার সহিত আলাপপরিচয় করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার এই ভূয়োদর্শনের ফল লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা তাহা হইতে ইবন সাউদের কিছু পরিচয় প্রদান করিতেছি।

আরবের মানচিত্রে পারস্যোপসাগরের দক্ষিণাংশে বাহরিণ নামে একটি দ্বীপ দেখা যায়। ঐ দ্বীপের পশ্চিমে আরবের স্থলাংশে একটি বন্দর আছে, উহার নাম ওজেরার। এই বন্দর হইতে হাসা, দাহনা, রিয়াধ, ওয়াসিম, সামার, কাসিম প্রভৃতি জনপদে যাওয়া যায়। এই বন্দর ও জনপদগুলি সুলতান ইবন সাউদের নেজদ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। সার পার্শি কক্স বাহরিণ দ্বীপ হইতে ওজেরার বন্দরে ইবন সাউদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। আমীন রিহানী তাঁহার অনুমতি লইয়া তাঁহার পূর্ব্বে ওজেরার যাত্রা করিয়াছিলেন।

বাহরিণ হইতে তিনি জালিবোটে করিয়া ওজেরারে উপস্থিত হয়েন। সেখানে জালিবোটের উপর এক পতাকা উড্ডীন করা হইল, তাহার বর্ণ হরিৎ, পাড় শ্বেত, উহাতে আরবীতে লিখা ছিল,—"লা ইলাহা এল্লেল্লা," আল্লা ব্যতীত ঈশ্বর নাই। ইহাই ইবন সাউদের জাতীয় পতাকা।

ওহাবীরা মুসলমানদের মধ্যে 'পিউরিটান' অর্থাৎ কঠোর ধর্ম্মবিশ্বাসী—কোনওরূপ ধারণা তাহাদের একেশ্বরবাদে আঘাত করিতে পারে না। এই হেতুই কি ইবন সাউদের পতাকায় কেবলমাত্র প্রথম ছত্রটি লিখিত ছিল? কে জানে!

ওজেরারে সুলতানের শাসনকর্ত্তা ওজেরারের আমীর তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। আমীর অর্থে এই স্থলে সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত আমীর নহে, সুলতানের প্রতিনিধি বলিয়া তাঁহার পদবী আমীর। নেজদের ওহাবীদের মত গণতন্ত্রবাদী জাতি ভূমণ্ডলে নাই। তাহাদের আমীর ফকীর নাই, আল্লার রাজ্যে সকলেই সমান। যাহাই হউক, ওজেরার হইতে উষ্ট্রপৃষ্ঠে ৫০ মাইল মরুভূ-পথ পর্য্যটন করিয়া

আলহাসায় পৌঁছিবার কথা; সেই স্থানে সুলতান ইবন সাউদ অপেক্ষা করিতেছিলেন।

কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে অর্দ্ধপথে দিগন্তবিস্তৃত মরুভূমির মধ্যস্থলে আমীন রিহানী সুলতানের সাক্ষাৎ লাভ করিলেন, সুলতানও স্বয়ং আলহাসা হইতে ওজেয়ারে আসিতেছিলেন।

প্রথম দর্শন রিহানীর মনে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে সন্দেহ নাই। তিনি দেখিলেন, শ্বেত ও পীত বস্ত্রে আপাদ-মস্তক-মণ্ডিত, দীর্ঘ, বৃষ-স্কন্ধ, ব্যূঢ়োরস্ক, শালপ্রাংশু, মহাভুজ মূর্ত্তি। তিনি যেন এক প্রকাণ্ড দানবের সম্মুখে বামনের মত দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। ইবন সাউদ ৬ ফুট হইতেও উচ্চ। তাঁহার মাংসপেশী-সমূহ দৃঢ়, সর্ব্বাবয়ব সুগঠিত, দীর্ঘ পুষ্ট শরীরে বসার লেশমাত্র নাই। তাঁহার দেহ শুভ্র অঙ্গরাখায় মণ্ডিত, তাহার উপর পীতবর্ণের 'আবা' আচ্ছাদিত; শিরোদেশ রক্তাভ 'চেক'-বস্ত্রে মণ্ডিত, পাদদ্বয় পাদুকা-( sandal ) শোভিত। তাঁহার নাসা তিলফুলের ন্যায় সুদীর্ঘ ও সরল, ওহাবী রীতি অনুসারে তাঁহার শ্মশ্রু ক্ষুদ্রাকারে কর্ত্তিত। দেখিলেই মনে হয়, তাঁহার মধ্য হইতে একটা শৌর্য্য, মহত্ত্ব ও মনুষ্যত্ব ফুটিয়া বাহির হইতেছে। শক্তির আড়ম্বর, বাদশাহের জাঁকজমক, প্রাচ্যের মণিমাণিক্যের ঘটা তাঁহাতে নাই! তিনিও যেন নেজদের এক জন সামান্য ওহাবী প্রজা! কেবলমাত্র তাঁহার শিরস্ত্রাণে একটি জরীর ফিতা শোভা পাইতেছিল, উহাই নেজদের রাজবংশীয়দের বিশেষ চিহ্ন।

ইবন সাউদের আরবদিগেরই মত বর্ণ, কিন্তু আরবদের মত তাঁহার কপোলাস্থি উন্নত নহে, পরন্তু তাঁহার নাসিকা সরল ও উন্নত। তাঁহার বয়স ৪৯ বৎসর হইবে। তিনি সর্ব্বদা সুগন্ধি দ্রব্যে অঙ্গ প্রসাধন করিয়া থাকেন। তাঁহার হস্তে সর্ব্বদা একটি বংশদণ্ড থাকে। যখন কোন কথার উপর জোর দিয়া বলেন, তখন তিনি সেই দণ্ডটি ভূমিতে সজোরে আঘাত করেন।

আমীন রিহানীকে দেখিয়া ইবন সাউদ বলিলেন, "আমি শুনিয়াছি যে, আপনি মার্কিণ মিশনারী খৃষ্টান, আরবদেশে খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচার করিতে আসিয়াছেন। আবার কেহ কেহ বলিয়াছে, আপনি কোনও মার্কিণ কোম্পানীর তরফ হইতে আরবদেশে ব্যবসায়ের বিশেষ অধিকার লাভের আশায় আগমন করিয়াছেন। অপর এক শ্রেণীর লোক আমায় জানাইয়াছে যে, আপনি মক্কার সরিফ হোসেনের পক্ষপাতী; তাঁহার হইয়া আমার বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্র করিতে আসিয়াছেন। আমি তাহাদিগকে বলিয়াছি, যদি তাহাই হয়, তাহাতে ক্ষতি কি? যদি এই লোকটার মধ্যে মন্দ থাকে, তাহা হইলে সেই মন্দ কিরূপে এড়াইতে হইবে, তাগ আমরা জানি। যদি উহার মধ্যে ভাল থাকে, তাহা হইলে উহার নিকট হইতে কি উপকার লাভ করিতে পারা যাইবে, তাহাও আমরা জানি। ওস্তাজ! (অধ্যাপক!) আমরা আপনার বিষয়ে অনেক খবরই রাখি। আল্লা আপনাকে রক্ষা করুন এবং আপনাকে আশীর্ব্বাদ করুন।"

এই কথা কয়টিতেই মানুষকে চিনিতে পারা কষ্টকর হয় না। তখনও মক্কার সরিফ হোসেনের সহিত ইবন সাউদের যুদ্ধ হইতেছে। সেই যুদ্ধের মধ্যেও ইবন সাউদ রাজ্যশাসন-সংক্রান্ত অন্য কথা ভুলেন নাই। তিনি অতিথিসৎকার করিতেছেন, ইংরাজ হাই-কমিশনার সার পার্সি কক্সের সহিত ইরাকের ব্যাপার লইয়া আপোষ-কথা কহিবার বন্দোবস্ত করিতেছেন, আবার অন্যান্য আরব-সর্দ্দারদিগের দমনেও মস্তিষ্ক চালনা করিতেছেন। তাঁহার মধ্যে একটা বিশেষ ব্যক্তিত্ব না থাকিলে এতগুলি কার্য্য একেবারে সম্ভব হয় না। পরবর্ত্তী কথা-বার্ত্তাতেই বুঝা যাইবে, কেন তিনি স্বয়ং আরব-সর্দ্দার হইয়া অন্যান্য স্বজাতীয় সর্দ্দারদিগের বিপক্ষে অসিধারণ করিয়াছিলেন।

যখন আমীন রিহানী বিনীতস্বরে তাঁহাকে জানাইলেন যে, আমীর ইবন সাউদ যদি ইচ্ছা করেন, তবে সমস্ত আরব-সর্দ্দারের মধ্যে একটা আপোষ-বৈঠক বসিতে পারে ও তাহার ফলে আরব জাতিদের মধ্যে একতা প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন ইবন সাউদ স্পষ্ট স্বরে বলিলেন, "আরব কাহারা?" তাঁহার চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিকীর্ণ হইতে লাগিল; কিঞ্চিৎ রুদ্ধস্বরে তিনি আবার বলিলেন, "আরব কাহারা? আপনি কাহাদিগকে আরব বলিতে চাহেন? জানেন, আরব কেবল আমরা। আমি ঐ সকল সর্দ্দারের সকলকেই জানি। তাহারা আমার মিত্ররূপে পরিগণিত। কিন্তু জানিয়া রাখিবেন, তাহাদের মধ্যে আমার অতি বিশ্বস্ত প্রিয়পাত্রও বিশ্বাসঘাতক, দেশদ্রোহী। আপনি আকাশ-কুসুমের স্বপ্নে বিভোর হইবেন না। সে একতা হইবার নহে।"

তাহার পর কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া ইবন সাউদ আবার বলিলেন, "আপনি জানেন, আমিই প্রথমে আরবে একতা-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সর্দ্দারগণকে বৈঠকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। ইহার প্রমাণ আমি দিতে পারি। কিন্তু সেই আমন্ত্রণের কি ফল হইয়াছে?"

সুলতান ইবন সাউদ

ইবন সাউদের স্বদেশ-প্রেমিকতায় সন্দেহ করিবার কারণ নাই। তিনি সরল, সত্যবাদী, কষ্টসহিষ্ণু; দেশের মঙ্গলের জন্য তিনি বিশ্বাসঘাতক দেশদ্রোহী আমীরদিগের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে তাঁহাকে অপরাধী করা যায় না।

তিনি সামান্য আরব সৈনিকের ন্যায় কর্ত্তব্য ও শৃঙ্খলা-জ্ঞানসম্পন্ন। অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করেন, অতি অল্পসময় বিশ্রাম লাভ করেন। আমীর রিহানী বলিয়াছেন, তিনি সামান্য লোকের ন্যায় মরুভূম

বালুকাস্তরের উপর বসিয়া তাঁহাদের সহিত কাফি পান করিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহার কয়েক জন জ্ঞাতি-কুটুম্ব ও বন্দী আমীর উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে তাঁহার ভ্রাতা মহম্মদ, আমীর কয়জুল ইবন রসিদ এবং হায়েলের আমীর আবদুল্লা ইবন মিতেরের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি তাহাদিগকে দেখাইয়া আমীর রিহানীকে বলেন, "ইহারাও আরব, আর এই আমার কষ্ট-সহিষ্ণু সেনারাও আরব। ইহাদের মধ্যে কত প্রভেদ! আমি আল্লার নিকটে ইহাদের সকলেরই জন্য দায়ী। আমরা নেজদবাসী আরব পয়গম্বরকে অনুসরণ করি। পয়গম্বর মুসলমানদের মধ্যে কোনও শ্রেণী বিভাগ করেন নাই, আমিও সকল মুসলমানকেই সমশ্রেণীভুক্ত দেখিয়া থাকি। সকলের উপরে আমি ধর্ম্ম ও আত্মসম্মান রক্ষার জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়া থাকি।"

তিনি ও তাঁহার ওহাবীরা অতীব ধর্ম্মপ্রাণ। সেই মরুভূর মধ্যে প্রার্থনাকালে তিনিও আরব ওহাবীদের সহিত একযোগে এক আসনে ভগবানের নাম-গান ও পূজা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সমস্বরে ইমামের প্রার্থনার পর 'আমীন' শব্দটি মরুভূমির গাম্ভীর্য্য শতগুণে বর্দ্ধিত করিয়াছিল। সে প্রার্থনা এই :—"আল্লার জয় হউক। তিনিই সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা। হে আল্লা, আমাদিগকে সত্য পথে পরিচালনা কর।"

ইবন সাউদের বিজিত আলহাসা প্রদেশের রাজধানী হোফাফের বাজার

ভয় কাহাকে বলে, তিনি জানেন না। যখন শুনিলেন, সার পার্শি তাঁহার সহিত কাউইটের ইংরাজ-দূত ও ওয়াদি-হারুণের শেখ ফাউদ-আল-হাজ্জালকে লইয়া আসিতেছেন, তখন তাঁহার মূর্ত্তি ক্রোধে অতি কঠোর ভাব ধারণ করিল। তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন, "সার পার্শি শেখ ফাউদকে কেন আনিতেছেন? কাউইটের ইংরাজ দূতকেই বা কেন আনিতেছেন? তাঁহার সহিত ত এ কথা ছিল না। তিনি কি আমায় জোর করিয়া শেখ ফাউদের সহিত সীমানা সম্পর্কে সন্ধি করিতে বাধ্য করিতে চাহেন? না, কেহ আমাকে জোর করিয়া কিছু করাইতে পারিবে না। আমার পিতৃপিতামহ যে অধিকার ভোগ করিয়া আসিতেছেন, তাহা আমার জন্মগত অধিকার। যদি সে অধিকার আমি বন্ধুতা দ্বারা রক্ষা করিতে না পারি, তাহা হইলে তরবারির দ্বারা রক্ষা করিব। অন্যে চক্রান্ত করিতে পারে। আমি চক্রান্ত জানি না। আমি কথার মানুষ, আমি সত্য পথে চলিয়া থাকি। যদি উহারা বন্ধুভাবে আমার সহিত কথা কহে, আমি তাহাতে সম্মত আছি। কিন্তু জোর করিয়া আমায় কেহ কিছু করাইতে পারিবে না।"

সে সময়ে তাঁহার ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি হইয়াছিল। অথচ অন্য সকল সময়ে তিনি শান্তপ্রকৃতির লোক। তাঁহার হৃদয় কারুণ্য-রসে পূর্ণ। একবার যুদ্ধে তিনি হতাহত সৈনিকগণকে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়াছিলেন। তিনি সে সময়ে বলিয়াছিলেন, "রাজার কর্ত্তব্য অতি কঠোর। আমি যদি রাজা না হইয়া সামান্য সৈনিক হইতাম!"

তিনি এ দিকে অতি রহস্যপ্রিয় লোক, সদালাপী, মিষ্টভাষী। যখন সার পার্শির গৃহে তাঁহার চা-পানের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল, তখন তিনি হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "আমরা এখন 'সভ্য চা' পান করিতেছি, ইহা আমাদের মরুভূমির 'অসভ্য কাফিপান' হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।"

মাত্র ২২ বৎসর পূর্ব্বে ইবন সাউদ অতি ক্ষুদ্র আমীর ছিলেন। সে সময়ে মধ্য-আরবে আমীর মহম্মদ ইবন রসিদ প্রবলপরাক্রান্ত। এখন ইবন সাউদ যেরূপ শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছেন, তিনি তখন সেইরূপ ছিলেন। সে সময়ে ইবন সাউদের পিতা আবদুল রহমান যুদ্ধে রাজধানী রিয়াদ হারাইয়া সপরিবারে কাউইটে নির্ব্বাসন বরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র আবদুল আজিজ (ইবন সাউদ) তখন মাত্র ২৪ বৎসরের যুবক। তিনি পিতার নির্ব্বাসনের ১০ বৎসর পরে কাউইটের শেখ মোবারকের সহিত যোগদান করিয়া ১৯০১ খৃঃ ইবন রসিদকে রণে পরাস্ত করেন। তখন হইতেই তাঁহার সৌভাগ্য-সূর্য্য ধীরে ধীরে আরবের গগনে উদিত হইতে থাকে। মাত্র ২০ জন ওহাবী সৈন্য লইয়া প্রথমে তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাহার পর ক্রমে ক্রমে তুর্ক ও অন্যান্য আরব সর্দ্দারদিগকে পরাভূত করিয়া তিনি আরবে সার্ব্বভৌমত্ব লাভ করিয়াছেন।

আবদুল আজিজ ইবন সাউদের সম্বন্ধে যে যাহাই বলুক, তিনি যে এক জন মানুষের মত মানুষ, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। তাঁহার অন্তঃকরণ অতি মহৎ। তিনি সরল, সত্যবাদী, কঠোর কষ্টসহিষ্ণু ওহাবী আরব। তিনি দূরদর্শী ন্যায়-বিচারক শাসনকর্ত্তা। তাঁহার মরুভূ-রাজ্যে পথঘাট, রেল, মোটর নাই বটে, কিন্তু তিনি এই বিশাল রাজ্য আপনার শক্তি ও মেধার দ্বারা সুশাসন করিতেছেন

---

## তাঞ্জিয়ার সমস্যা

পুরাণে আছে, রক্তবীজ মরিলে পর তাহা হইতে শত রক্তবীজের উৎপত্তি হইয়াছিল। মূর দেশের রিফ সর্দ্দার আবদুল করিমের সহিত যুদ্ধের অবসান হইল, আবদুল করিম বশ্যতা স্বীকার করিয়া মাদাগাস্কর দ্বীপে নির্ব্বাসিত হইলেন, তথাপি পরাজিত মূরদেশে বিজেতা ফরাসী বা স্পেন এখনও সর্ব্বরূপে অশান্তির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হয়েন নাই। মূরদেশ হইতে যেন শত আবদুল করিমের উৎপত্তি হইতেছে। গোল উঠিয়াছে তাঞ্জিয়ার নামক স্থান লইয়া। স্থানটি ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু ইহার অধিকার-স্বত্ব লইয়া ফরাসী ও স্পেনে বিশেষ মনোমালিন্যের উৎপত্তি হইয়াছে।

স্পেন হঠাৎ তাঞ্জিয়ার তাঁহার প্রভাবের অন্তর্গত বলিয়া দাবী করিয়াছেন। এ বিষয়ে তিনি জাতিসঙ্ঘের এসেমব্লিকে এবারকার অধিবেশনে বিচার-বিবেচনা করিয়া দেখিতে বলিয়াছেন। ১লা সেপ্টেম্বর এই অধিবেশনের কথা। এই অধিবেশনে জাতিসঙ্ঘের

কাউন্সিলের পুনর্গঠন করিবার এবং জার্ম্মাণীকে জাতিসঙ্ঘে তুলিয়া লইবার কথা ছিল। হঠাৎ ইহার-উপর স্পেনের নূতন প্রস্তাবে শক্তিপুঞ্জ বিচলিত হইয়াছেন,—তাঁহারা ভাবিতেছেন, যেন তাঁহাদের মধ্যে হঠাৎ একটা বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। স্পেন এ সম্বন্ধে শক্তিপুঞ্জকে এক নোটে জানাইয়াছেন যে, তাঁহাকে পূর্ণরূপে তাঞ্জিয়ারের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে দেওয়া হউক। ইহাতেই গোল উঠিয়াছে।

তাঞ্জিয়ার উত্তর-আফ্রিকার সমুদ্রোপকূলস্থ মাত্র ১৪০ বর্গ-মাইল জমী। জমী সামান্য, কিন্তু ইহার অধিকার-স্বত্ব সামান্য নহে; কেন না, যে শক্তি এই জমীটুকুর উপর প্রভাব বিস্তার করিবে, ভূমধ্যসাগরে প্রবেশপথের চাবিকাঠি তাহার হস্তে থাকিবে। ইংরাজের জিব্রাল্টার বন্দর ও দুর্গ যেমন য়ুরোপের উপকূলে ভূমধ্যসাগরে প্রবেশপথের ও তথা প্রাচ্যের পথের চাবিকাঠি, তাঞ্জিয়ারও তেমনই আফ্রিকার উপকূলে ভূমধ্যসাগর ও প্রাচ্যে যাইবার পথের চাবিকাঠি। সুতরাং এমন strategic position এর স্থান কোনও শক্তিই সহজে অপরের হস্তগত হইতে দিতে পারেন না। বিশেষতঃ ইংরাজ ত একবারেই পারেন না। কেন পারেন না, তাহা বিলাতের বৈদেশিক সচিব সার অষ্টেন চেম্বারলেন পার্লামেণ্টে বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

তিনি বলিয়াছেন, স্পেন আবদার ধরিয়াছেন, তাঞ্জিয়ার তাঁহার হস্তে তুলিয়া দিতে। স্পেন চাহিয়াছেন, হয় তাঞ্জিয়ারকে তাঁহার মুর-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেওয়া হউক, না হয়, তাঞ্জিয়ার শাসন করিবার অনুজ্ঞা তাঁহাকে দেওয়া হউক। বৃটিশ সরকারের পক্ষ হইতে স্পেনকে স্পষ্টই বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, প্রথম সর্ত্তে বৃটিশ সরকার আদৌ সম্মত নহেন, তবে দ্বিতীয় সর্ত্ত সম্বন্ধে বৃটিশ সরকার স্পেন ও ফরাসী সরকারের সহিত বিচার-আলোচনা করিয়া বলিতে পারেন, সর্ত্তে অনুজ্ঞা প্রদান করা যাইতে পারে কি না। সার অষ্টেন আরও বলিয়াছেন যে, ইংলণ্ড, স্পেন ও ফ্রান্সের মধ্যে মুরদেশ সম্বন্ধে যে কনভেনশন' হইয়াছিল, তাহা ইংরাজ এখনও মানিয়া লয়েন নাই। সুতরাং সে সম্বন্ধে স্পেনের পক্ষের সকল কথা না শুনিলে এবং তাহাতে ফরাসীর কোন আপত্তি আছে কি না, না জানিলে কোনও সিদ্ধান্তে তাঁহারা উপনীত হইতে পারেন না।

মুরদেশ সম্বন্ধে ফরাসী ও স্পেনীয় শক্তিদ্বয়ের মধ্যে কি কনভেনশন বা বন্দোবস্ত হইয়াছিল, তাহা প্রথমে জানা আবশ্যক। যদবধি ফরাসী ও স্পেনীয় শক্তিদ্বয় মুররাজ্যে স্ব স্ব প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন তদবধি তাঞ্জিয়ার নগর ও তৎসংলগ্ন ১৪০ বর্গ-মাইল ভূমি কাহারও প্রভাবান্তর্গত হয় নাই। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ফরাসী ও স্পেনে যে সন্ধি হয়, তাহার সর্ত্ত অনুসারে কেহই ঐটুকু জমীর উপর আধিপত্য বা প্রভাব বিস্তার করিবেন না বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। তদবধি পর পর কয়টি রাজনৈতিক সংসদ (Diplomatic Agency) দ্বারা তাঞ্জিয়ার শাসিত হইয়া আসিতেছে। তাহার পর ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের কনভেনসন। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও স্পেন উহার দ্বারা স্থির করেন যে, রাজনৈতিক সংবাদগুলির অবসান করিয়া এক Committee of Control ও এক ব্যবস্থাপক সভার হস্তে তাঞ্জিয়ারের শাসনভার অর্পণ করা হইবে। উক্ত কমিটীতে আলজেসিরাস বৈঠকের স্বাক্ষরকারী শক্তিগণের আট জন দূত সদস্যপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং উক্ত ব্যবস্থাপক সভায় ৪ জন ফরাসী, ৪ জন স্পেনীয় ও ৩ জন বৃটিশ প্রজা এবং ১৫ জন মুর সদস্যরূপে অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন। মাত্র গত বৎসর হইতে ঐ কনভেনসন বলবৎ হইয়াছে, কিন্তু এখনও ইটালী ও মার্কিণ উহা অনুমোদন করেন নাই। সুতরাং ঐ কনভেনসন পুরামাত্রায় বলবৎ হইয়াছে বলা যায় না। যাহাই হউক, এই কনভেনসন অনুসারে তাঞ্জিয়ারে কোনওরূপ দুর্গাদি নির্ম্মাণ করা একেবারে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

সম্প্রতি তাঞ্জিয়ারে পর পর কয়েকটি হাঙ্গামা ও গোলযোগ ঘটিয়াছে। স্পেন এই অছিলায় তাঁহার দাবী পেশ করিয়াছেন। তিনি প্রথমেই মানিয়া লইয়াছেন যে, তাঞ্জিয়ারে কনভেনসনের সর্ত্তানুসারে তিনি দুর্গাদি নির্ম্মাণ করিবেন না, অতএব তাঁহাকে তাঞ্জিয়ারে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে অথবা শাসনের অনুজ্ঞা লাভ করিতে দেওয়া হউক। মুরদেশের যে অংশ স্পেনের প্রভাবের অধীন, তাঞ্জিয়ার সেই অংশে অবস্থিত। এ জন্য তাঞ্জিয়ারে যদি নিত্য গোলযোগ ও অরাজকতা অশান্তি উপস্থিত হয়, তাহা হইলে স্পেন উহা সুশাসন করিবার দাবী করিবার পূর্ণ অধিকারী। বিশেষতঃ ইটালী স্পেনকে সমর্থন করিবেন বলিয়া শুনা যাইতেছে।

কিন্তু ফরাসী বা ইংরাজ যে কিছুতেই স্পেনকে এমন strategic position দখল করিতে দিবেন না, তাহা নিশ্চিত। মুরদেশে ফরাসীর বহুবিসারী স্বার্থ আছে; তিনিও তাঞ্জিয়ারে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে চাহেন। সুতরাং সহজে তিনি অন্য শক্তিকে তথায় প্রভাব বিস্তার করিতে দিবেন না। ইংরাজের ত কথাই নাই। এক জন বিশিষ্ট ইংরাজ রাজনীতিক স্পষ্ট বলিয়াছেন,—"আমাদের সমুদ্র-সাম্রাজ্যের সকল পথ-ঘাট নিরাপদ রাখা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যদি তাঞ্জিয়ার কোন এক বিশিষ্ট শক্তির হস্তগত হয়, তাহা হইলে আমাদের প্রাচ্যে যাতায়াতের পথ ও ঐ পথ রক্ষার প্রথম ও প্রধান কেন্দ্র জিব্রাল্টার বিপন্ন হইবে। স্পেন বা অপর কোনও শক্তি মুরদেশের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করুক বা না করুক, তাহাতে ইংরাজের ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। কিন্তু যদি কোন শক্তি মুরদেশের উপকূলে তাঞ্জিয়ারের ন্যায় স্থানে দুর্গাদি নির্ম্মাণ করিবার সুযোগ পায় এবং যাহার ফলে জিব্রাল্টারের অবস্থান বিন্দুমাত্র বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা হয়, তাহা হইলে ইংরাজ তাহাতে কিছুতেই সম্মতি প্রদান করিতে পারেন না।"

ইহা হইতে অধিকতর স্পষ্ট কথা আর কি হইতে পারে? যে কারণে জিব্রাল্টারের প্রয়োজনীয়তা ইংরাজের নিকট অতীব মূল্যবান্, সেই কারণে মাল্টা, সুয়েজ ও এডেনও ইংরাজের নিকট মূল্যবান্। এ সকল সুরক্ষিত স্থান ইংরাজের প্রাচ্য সাম্রাজ্যের চাবিকাঠিস্বরূপ। ভারত ও অষ্ট্রেলিয়ার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই ইংরাজ এ সকল স্থান দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া আছেন।

সুতরাং স্পেনের আশা সুদূরপরাহত সন্দেহ নাই। মাসোলিনির ইটালী ফরাসীর বিপক্ষে চাল চালিয়া স্পেনকে তাঞ্জিয়ার লাভে উৎসাহিত করিতে পারে। কিন্তু সে পথে ইংরাজ প্রবল অন্তরায়। ইংরাজ ও ফরাসীর বিপক্ষে মাসোলিনির বজ্রমুষ্টি উত্তোলিত হইতে পারে, ইহা কল্পনাও করা যায় না।

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

### বিশ্বস্ততার নিদর্শন

এইবার পাঠকপাঠিকাগণকে জুরিচ হইতে রুসিয়ায় লইয়া যাইব। যদিও রুসিয়া জুরিচ হইতে বহুদূরে অবস্থিত, তথাপি এই উভয় স্থানের সহিত বর্ত্তমান উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাগণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।

জোসেফ কুরেটের প্রতি কিরূপ কঠোর দণ্ডের আদেশ হইবে, রেবেকা কোহেন তাহা পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিল বটে, তথাপি তাহার দণ্ডাদেশ শুনিয়া সে ক্ষোভে দুঃখে অধীর হইয়াছিল। হতভাগ্য যুবকের প্রতি সমবেদনায় ও করুণায় তাহার কোমল হৃদয় পূর্ণ হইয়াছিল। রেবেকা তাহার পিতার নিহিলিষ্ট বন্ধুগণের সাহায্যে কারাগারে জোসেফের নিকট একখানি পত্র পাঠাইতে পারিয়াছিল। সেই পত্রে সে জোসেফকে সান্ত্বনাদানের চেষ্টা করিয়াছিল। জোসেফও সেই সকল নিহিলিষ্ট বন্ধুর সাহায্যে তাহার পিতামাতার নিকট পত্র পাঠাইতে সমর্থ হইয়াছিল। সেই পত্রে সে তাহাদিগের নিকট চিরবিদায় প্রার্থনা করিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন সে রেবেকাকেও এক ছত্রের একখানি পত্র লিখিয়াছিল; তাহাতে লিখিয়াছিল,—

“চিরবিদায়! আমাকে ভুলিয়া যাও।”

জোসেফ তাহার পিতামাতাকে লিখিয়াছিল, “বাবা, মা, তোমাদের কাছে এই পত্রই আমার প্রথম ও শেষ পত্র; আমি জীবনে আর কোন দিন তোমাদিগকে পত্র লিখিবার সুযোগ পাইব না, এই জন্য পত্রে তোমাদের আশীর্ব্বাদ ও ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। আমি জানি, আমিই তোমাদের সকল দুঃখ-কষ্টের কারণ। আমার মত হতভাগ্য সন্তানের জনক-জননী না হইলে তোমাদের জীবন সুখ-শান্তিতে অতিবাহিত হইত, কিন্তু আমি তোমাদের কুপুত্র। যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে তোমরা তোমাদের এই অযোগ্য সন্তানকে বিস্মৃত হইও। কিন্তু আমি জানি, তোমরা আমাকে ভুলিতে পারিবে না। তোমরা বোধ হয় শুনিয়া মর্ম্মাহত হইবে, আমি নিহিলিষ্ট সম্প্রদায়ে যোগদান করিয়া রাজকিঙ্করদের হাতে ধরা পড়িয়াছি; রাজবিধানে আমার প্রতি নির্ব্বাসনদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। এই পত্রখানি যখন তোমাদের হস্তগত হইবে, তাহার পূর্ব্বেই আমাকে সাইবেরিয়ায় যাত্রা করিতে হইবে। সুতরাং তোমরা বুঝিতে পারিবে, আমার জীবন-স্বপ্নের অবসান হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই। আমার জীবনের এই শোচনীয় পরিবর্ত্তনের কারণ তোমাদের অজ্ঞাত নহে। আমার অনুরোধ, তোমরা যে কোন উপায়ে পার, বার্থা স্মিটকে জানাইবে, যে হতভাগ্য যুবক তাহাকে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছিল, আরাধ্যা দেবীর ন্যায় তাহার পূজা করিত, তাহারই নিষ্ঠুর ব্যবহারে সে সাইবেরিয়ার শ্মশানে ভগ্ন-হৃদয়ে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে চলিল। বাবা, মা, আমার সকল অপরাধ ক্ষমা কর, আমাকে ভুলিয়া যাও। আমি জীবিত থাকিয়াও এখন তোমাদের নিকট মৃত; জানি না, সেই দুর্গম, দুস্তর, ভীষণ প্রান্তরে জীবন্মৃত অবস্থায় কত দিন কাটিবে! তাহার পর মৃত্যু, চির-বিস্মৃত। বিদায় দাও, বাবা, বিদায় দাও মা, তোমাদের অধম সন্তানকে।”

পত্রখানি গোপনে তাহার পিতার নিকট প্রেরিত হইবে, এই আশায় জোসেফ ইহা রেবেকার নিকট পাঠাইয়াছিল। রেবেকা পত্রখানি পাঠ করিল। পত্রখানি পাঠ করিয়া রেবেকার মূর্চ্ছার উপক্রম হইল, সে চক্ষু মুদিয়া দুই হাতে মাথা টিপিয়া ধরিয়া স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল, তখন তাহার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্তপ্রায়!

কয়েক মিনিট পরে রেবেকা হঠাৎ সোজা হইয়া বসিল, এবং উন্মাদিনীর ন্যায় শূন্যদৃষ্টিতে ঊর্দ্ধে চাহিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, “এখন সকল কথাই বুঝিতে পারিলাম! এই বার্থা স্মিট কে, জানি না, জোসেফ তাহাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিয়াছিল, কিন্তু সেই যুবতী জোসেফের প্রেম প্রত্যাখ্যান করায় জোসেফ তাহার অমূল্য জীবন এই ভাবে নষ্ট করিল! সে নিহিলিষ্ট সম্প্রদায়ে যোগদান করিয়া রুসিয়ায় আসিয়াছিল, ঘটনাচক্রে তাহার সহিত সাক্ষাৎ। সে আমাকেও

ভালবাসিয়াছিল, কিন্তু যে হতাশ প্রেমিক অপরের প্রেমে আত্মহারা, আমি ত তাহার কেহই নহি। আমার প্রতি তাহার প্রেম মোহ ভিন্ন আর কিছুই নহে। আহা, হতভাগ্য! তোমার দুঃখের কথা ভাবিয়া আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে। যদি তোমার প্রাণরক্ষা আমার অসাধ্য না হয়, তাহা হইলে আমি জীবন দিয়াও তোমাকে উদ্ধার করিব।”

রেবেকা জোসেফের পত্রখানি লেফাপায় পূরিল এবং স্বয়ং আর একখানি পত্র লিখিয়া জোসেফের পত্রের মধ্যে রাখিয়া দিল। সেই পত্রে সে লিখিল,—“আপনাদের সহিত আমি পরিচিত হইবার সুযোগ না পাইলেও আপনাদের ভাগ্যবিড়ম্বিত পুত্র আমার সুপরিচিত। আমি তাহাকে শ্রদ্ধা করি, সম্মান করি। তাহার ন্যায় মহৎপ্রকৃতি, উদারহৃদয় যুবকের এরূপ শোচনীয় পরিণাম বড়ই ক্ষোভের বিষয়। কিন্তু আপনারা তাহার আশা ত্যাগ করিবেন না; এক দিন সে আপনাদের নিকট ফিরিয়া যাইতেও পারে; এই আশায় আমি আপনাদিগকে ধৈর্য্যের সহিত তাহার প্রতীক্ষা করিতে অনুরোধ করিতেছি।”

রেবেকা পত্রখানি তাহার নিহিলিষ্ট বন্ধুগণের সাহায্যে যথাস্থানে প্রেরণ করিল। তাহার পর কালনকি যে একরারনামায় তাহাকে নাম স্বাক্ষর করিতে বলিয়াছিল, তাহা করিবে কি না, তাহাই ভাবিতে লাগিল। এ সম্বন্ধে তাহার পিতার সহিত পরামর্শ করিতে তাহার আগ্রহ হইল না; এমন কি, তাঁহার নিকট এ কথা প্রকাশ করাও সে সঙ্গত মনে করিল না। কারণ, এরূপ বিপজ্জনক দলীলে তাহার নাম স্বাক্ষরিত করিবার প্রস্তাবে তিনি সম্মত হইবেন না, ইহা সে জানিত। রেবেকাও বুঝিয়াছিল—কালনকির স্বার্থসিদ্ধি না হইলে এই সাংঘাতিক অস্ত্র সে তাহাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইবে না। কিন্তু সেই একরারনামায় স্বাক্ষর না করিলে সে কি উপায়ে কালনকিকে ভুলাইয়া রাখিবে, তাহা বুঝিতে পারিল না।

দীর্ঘকাল চিন্তার পর রেবেকা কালনকির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে বলিল, “একরারনামায় স্বাক্ষর করিবার জন্য তুমি আর আমাকে অনুরোধ করিও না, উহাতে স্বাক্ষর করিলে যে কোন মুহূর্ত্তে আমাদের সর্ব্বনাশ ঘটিতে পারে। ঐ একরারনামাই যে আমাদের মৃত্যুশর। তোমার এই খেয়াল ছাড়িয়া দিয়া, জোসেফকে কারাগার হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা কর; এখনও তোমার চেষ্টা সফল হইতে পারে।”

কালনকি বলিল, “রেবেকা, জোসেফ কুরেটের প্রতি নির্ব্বাসনদণ্ডের আদেশ হইয়াছে; তাহার আর নিস্তার নাই।—তাহার উদ্ধারের জন্য তুমি অত ব্যাকুল হইয়াছ কেন?”

রেবেকা বলিল, “তাহাকে উদ্ধার করিতে না পারিলে ত আমি শান্তি লাভ করিতে পারিব না। তাহার উদ্ধারের চেষ্টা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। সে কথা ত আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি।”

কালনকি বলিল, “তুমি তাহাকে ভালবাস কি না, এই জন্যই তোমার এই ব্যাকুলতা।”

রেবেকা ক্ষুব্ধভাবে বলিল, “এ কথা তুমি আমাকে পূর্ব্বেও বলিয়াছ। আমিও কি তোমাকে বলি নাই, আমি তাহাকে বা অন্য কাহাকেও বিবাহ করিতে পারিব না? অন্যের সহিত আমার মিলনের পথে দুস্তর বাধা বর্ত্তমান। সেই বাধা কি, তাহা জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিও না; বিশ্বাস কর—আমার এ কথা সত্য। কুরেট এখানে আসিয়া আমাদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। জুরিচে তাহার মাতা পিতা এখনও জীবিত আছে। আমরা তাহার বহু সদ্গুণের পরিচয় পাইয়াছি। আমি তাহাকে ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ করি। সে আমার সহোদর হইলে যে ভাবে তাহাকে বিপদ হইতে উদ্ধারের চেষ্টা করিতাম, ঠিক সেই ভাবেই তাহাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছি।”

কালনকি হাসিয়া বলিল, “তুমি বড় চতুর; কিন্তু তুমি হয় নিজেকে প্রতারিত করিতেছ, না হয় মনে করিয়াছ, আমি এতই সরল যে, তোমার সকল কথাই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিব! তুমি স্বীকার কর বা না কর—তুমি জোসেফ কুরেটকে ভালবাস—এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। আমি তোমাকে ভালবাসি, এ জন্য জোসেফ কুরেটকে আমি প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করি; তবে তুমি যে বাধার কথা বলিতেছ, সে বাধা থাকিতে পারে, তাহাতে কিছু যায় আসে না। প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বীকে বা শত্রুকে ভালবাসে, কিংবা তাহাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য অম্লানবদনে স্বার্থত্যাগ করে—এরূপ উদারচেতা সদাশয় ব্যক্তি পৃথিবীতে দুই চারি জন থাকিতেও পারে, কিন্তু আমি সেই শ্রেণীর লোক নহি—

এ কথা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি। এ অবস্থায় আমার প্রতিদ্বন্দ্বীর উদ্ধারের জন্য আমি কেন চেষ্টা করিব—তাহা বলিতে পার কি ?”

রেবেকা অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বলিল, “কারণ—কারণ, ইহা আমার অনুরোধ।”

কালনকি বলিল, “চমৎকার যুক্তি বটে! আর এরূপ যুক্তি নারীর মুখেই শোভা পায়। কিন্তু যুক্তি যেরূপ হউক, তোমার অনুরোধ রক্ষা করিলে কিরূপ পুরস্কারের আশা করিতে পারি ?”

রেবেকা বলিল, “কৃতজ্ঞ নারীর আন্তরিক ধন্যবাদ।”

কালনকি মাথা নাড়িয়া বলিল, “না, ইহা ঐরূপ কঠিন কার্য্যের উপযুক্ত পারিশ্রমিক নহে।”

রেবেকা বলিল, “পারিশ্রমিকই যদি তোমার প্রার্থনীয় হয়, তাহা হইলে তুমি যত টাকা চাহিবে, তাহাই পাইবে। বল, কত টাকা লইবে ?”

কালনকি ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিল, “তোমার টাকায় আমি পদাঘাত করি। আমার অর্থের অভাব নাই, আমি অর্থাকাঙ্ক্ষা করি না। আমি চাই তোমাকে। হয় ত আমার এই আকাঙ্ক্ষা কখন পূর্ণ হইবে না; কিন্তু আর এক জন তোমাকে লুফিয়া লইবে, ইহা আমার অসহ্য।”

রেবেকা বলিল, “আমি যে কথা বলি—তাহা তোমার মনে থাকে না কেন ? আমি ত বলিয়াছি, আমি কাহারও হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে পারিব না; তাহাতে যে বাধা আছে, তাহা অলঙ্ঘনীয়। সেই বাধা অতিক্রম করা আমার অসাধ্য।”

কালনকি বলিল, “হাঁ, এ কথা তুমি আমাকে একাধিকবার বলিয়াছ বটে; কিন্তু কুরেটকে ভালবাস, এ কথাও স্বীকার করিয়াছ! আবার এ কথাও বলিয়াছ, যদি আমি কোন উপায়ে কুরেটকে মুক্তিদান করিতে পারি, তাহা হইলে তোমাকে লাভ করা আমার পক্ষে অসম্ভব হইবে না। এ কি শুধু কথার কথা ?”

রেবেকা বলিল, “কুরেট আমার স্নেহের পাত্র—এ কথা আমি এখনও স্বীকার করিতেছি।”

কালনকি বলিল, “তুমি আমাকে বুঝাইতে চাও, ইহা তোমার ভ্রাতৃস্নেহ মাত্র! কিন্তু উহা যে তোমার ধাপ্পাবাজি

তোমার প্রণয়াস্পদের উদ্ধারের জন্য তুমি প্রাণপণ চেষ্টা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছ। যদি সে আমার সাহায্যে মুক্তি লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে তোমার অলঙ্ঘনীয় বাধাও সে অনায়াসে লঙ্ঘন করিতে পারিবে; আমার কেবল পরিশ্রমই সার হইবে! সেই গল্পটা জান ত ? বিড়াল আগুনের ভিতর হইতে যে পোড়া বেল তুলিয়াছিল—বানর মহাশয় তাহা ভাঙ্গিয়া, ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন, বোকা বিড়ালটার থাবা পোড়ানই সার হইয়াছিল; আমার অবস্থাও সেইরূপ হইবে।”

রেবেকা কালনকির বাচালতায় বিরক্ত হইয়া বলিল, “বেশ, তুমি জোসেফের উদ্ধারের চেষ্টা করিও না; তাহার নির্ব্বাসনের আদেশ হইয়াছে, সেই দণ্ডই সে ভোগ করুক। তাহার উদ্ধারের জন্য আমি বৃথা তোমাকে অনুরোধ করিয়াছি। তোমার যে সে সাধ্য নাই—ইহা পূর্ব্বেই আমার বিশ্বাস করা উচিত ছিল।”

কালনকি বলিল, “তোমার এই অনুমান সত্য নহে। আমি চেষ্টা করিলে এখনও তাহাকে মুক্তি দান করিতে পারি, তাহা আমার অসাধ্য নহে।”

রেবেকা বলিল, “তোমার ও কথা বিশ্বাস করি না। ও তোমার অসার দম্ভ; ধাপ্পাবাজি বলিয়াই মনে হইতেছে।”

কালনকি বিন্দুমাত্র অধীরতা প্রকাশ না করিয়া অচঞ্চল স্বরে বলিল, “আমার কথা বিশ্বাস করা না করা তোমার ইচ্ছা। আমি তাহার উদ্ধারে অসমর্থ—এইরূপ বিশ্বাস করিয়া তুমি খুসী হও, তাহাতে আমার আক্ষেপের কারণ নাই। জোসেফ নির্ব্বাসন-দণ্ড ভোগ করিলেও আমি তোমাকে লাভ করিবার আশা ত্যাগ করিব না এবং আমার এই আশা নিশ্চয়ই পূর্ণ হইবে; কারণ, তুমি জান, তুমি আমার অবাধ্য হইলে, আমি তোমাকে ও তোমার বাবাকে অতি সহজেই জোসেফের মত সাইবেরিয়ায় পাঠাইতে পারি। কিন্তু আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, তোমাদের অনিষ্ট হইতে পারে, এরূপ কোন কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিব না। তোমাদের অনিষ্ট করিবার ইচ্ছা থাকিলে বহু পূর্ব্বেই তোমাদের সর্ব্বনাশ করিতাম, কিন্তু তাহা করি নাই; কারণ, আমি জানি, সেরূপ করিলে আমাকে তোমার আশা চিরকালের মত ত্যাগ করিতে হইবে। জোসেফ

এখানে হঠাৎ আসিয়া যদি আমার প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী না হইত, আমাকে উপেক্ষা করিয়া তুমি যদি তাহারই পক্ষপাতিনী না হইতে, তাহা হইলে তুমি কোন দিন জানিতেও পারিতে না যে, আমি ইচ্ছা করিলেই তোমাদের দর্প চূর্ণ করিতে পারি। তোমার প্রত্যাখ্যান নীরবে সহ্য করিতাম।"

রেবেকা জানিত, তাহার এই উক্তি অতিরঞ্জিত নহে। কালনকি ইচ্ছা করিলে এত দিন তাহাকে ও তাহার পিতাকে সুদূর সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসিত করিতে পারিত; কিন্তু তাহা সে করে নাই, সে তাহাদের গুপ্ত কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করে নাই। ইতর হইলেও সে কৃতঘ্ন নহে।

রেবেকা নতমস্তকে দুই তিন মিনিট চিন্তা করিয়া বলিল, "আমি তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব, আশা করি, ঠিক উত্তর দিবে। তুমি বলিলে, জোসেফ কুরেটকে মুক্তিদান করা তোমার অসাধ্য নহে। কি উপায়ে তাহাকে মুক্তিদান করিবে, জানিতে চাই।"

কালনকি ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "তোমার এই প্রশ্নের উত্তর দিতে আমার আপত্তি নাই; কারণ, তাহা শুনিলে তোমার একটা ভ্রান্ত ধারণা দূর হইবে। যে সকল প্রহরী জোসেফ কুরেট ও অন্যান্য নিহিলিংষ্টদিগকে সাইবেরিয়ায় লইয়া যাইবে, আমার বৈমাত্র ভ্রাতা সেই প্রহরিদলের অধিনায়ক। আমার ভাই এই ভাবে তিন বার সাইবেরিয়ায় গিয়াছিল; এই চতুর্থ বার সে বন্দী লইয়া সাইবেরিয়ায় যাইতেছে।"

রেবেকা বলিল, "বোধ হয়, তোমার কথা সত্য; কিন্তু এক জন অপরিচিত, নির্ব্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত কয়েদীর জন্য সে নিজের জীবন বিপন্ন করিবে কেন? কোন কয়েদীকে পলায়নের সুযোগ দান করিলে, তাহাকে অতি কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে হইবে, ইহা সে কি জানে না?"

কালনকি বলিল, "এইমাত্র জানিয়া রাখ, সে আমার অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিবে না।"

রেবেকা বলিল, "কেহই কাহারও অনুরোধে নিজের জীবন বিপন্ন করে না; স্বেচ্ছায় ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয় না।"

কালনকি বলিল, "অনেক সময় তাহা করিতে বাধ্য হয়। আমি তাহার এরূপ কোনও গুপ্ত কথা জানি, যে কথা প্রকাশ হইলে তাহাকে জীবনের অবশিষ্ট কাল কারাগারে অতিবাহিত করিতে হইবে; মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহার নিষ্কৃতিলাভের আশা নাই। এমন কি, বিচারে তাহার প্রাণদণ্ডেরও আদেশ হইতে পারে। আমি তাহার ভাগ্য-নিয়ন্তা হইলেও কোন দিন তাহার অনুগ্রহপ্রার্থী হই নাই। কিন্তু আমার বিশ্বাস, আমি তাহাকে অনুরোধ করিলে সে জোসেফ কুরেটকে পলায়নের সুযোগ দান করিবে; আমার অন্যায় অনুরোধও সে অগ্রাহ্য করিতে সাহস করিবে না।"

রেবেকা আগ্রহভরে বলিল, "আমি তোমার সেই একরারনামায় নাম স্বাক্ষর করিব। জোসেফকে মুক্তি দান করিতেই হইবে।"

কালনকি বলিল, "উত্তম। তুমি আমাকে সোনার চাবি দিবে বলিয়াছিলে ত? কার্য্যোদ্ধারের জন্য আমাকে দুই হাজার রুবল আনিয়া দিতে হইবে।"

রেবেকা বলিল, "দুই হাজার রুবল! সে যে অনেক টাকা।"

কালনকি বলিল, "কাযটা কি রকম কঠিন, তাহা কি ভুলিয়া গিয়াছ? অল্প টাকার কর্ম্ম নয়।"

রেবেকা মুহূর্ত্তকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "বেশ, তাহাই দিব; টাকাগুলি আজই সংগ্রহ করিয়া রাখিব।"

কালনকি বলিল, "একরারনামাখানা কি তোমার কাছে আছে? তাহা স্বাক্ষরিত করাই প্রধান কায।"

রেবেকা তাহা পকেট হইতে বাহির করিল। কালনকি এক কলম কালি তুলিয়া লইয়া কলমটি রেবেকার হাতে দিল; বলিল, "এখনই উহাতে নাম সহি কর। বিলম্বে সকল সুযোগ নষ্ট হইতে পারে; তখন তোমার আক্ষেপ নিষ্ফল হইবে।"

রেবেকা কম্পিত হস্তে সেই দলীলে নাম স্বাক্ষর করিল, তাহার পর একরারনামাখানি তাহাকে প্রত্যর্পণ করিয়া বলিল, "তুমি আজ আমাকে মুঠার মধ্যে পূরিলে! ইহার শেষফল কি, তাহা পরমেশ্বরই জানেন।"

কালনকি একরারনামা পকেটে রাখিয়া, হঠাৎ রেবেকার সম্মুখে সরিয়া আসিয়া তাহার ওষ্ঠে চুম্বন করিল! রেবেকা ইহাতে আপত্তি করিল না বটে, কিন্তু দারুণ ঘৃণায় তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিল। অতি কষ্টে সে মনের ভাব গোপন করিয়া দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল।

কালনকি গম্ভীর-স্বরে বলিল, "এই চুম্বন আমার

বিশ্বস্ততার নিদর্শন। তুমি কপটাচরণ না করিলে আমার দ্বারা তোমাদের অনিষ্টের আশঙ্কা নাই, আমি এই চুম্বনের সম্মান রক্ষা করিব।”

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

### রেবেকার গুপ্ত কথা

কালনকি প্রস্থান করিলে রেবেকার মন আতঙ্ক ও দুশ্চিন্তায় পূর্ণ হইল। তাহার মনে হইল—একরারনামার নাম স্বাক্ষর করিয়া সে বড়ই অন্যায় করিয়াছে! যদি উপায় থাকিত, তাহা হইলে সে তাহা কালনকির নিকট হইতে ফেরত লইত; কিন্তু কালনকি তাহাকে তাহা প্রত্যর্পণ করিবে—তাহার কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না।

রেবেকা পরদিন শুনিতে পাইল, জোসেফ কুরেট সেই দিন প্রভাতে অন্যান্য অপরাধীর সহিত সাইবেরিয়ায় যাত্রা করিয়াছে। তখন তাহার মনে হইল, একরারনামায় নাম স্বাক্ষর করা তেমন অসঙ্গত হয় নাই; ইহার ফলে ভবিষ্যতে তাহাদের বিপন্ন হইবার আশঙ্কা থাকিলেও, কালনকি জোসেফের মুক্তিদানের ব্যবস্থা করিবে। ইহাও মন্দের ভাল। জোসেফ প্রহরিগণের কবল হইতে পলায়ন করিতে পারিলে আর কখন রুসিয়ায় ফিরিবে না, রেবেকার সহিত আর তাহার দেখা হইবে না; কিন্তু তাহার প্রাণরক্ষা হইবে ভাবিয়া রেবেকা কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইল; তবে কালনকি রেবেকাকে মুঠায় পূরিয়া তাহাকে লাভ করিবার জন্য উৎপীড়ন করিবে কি না, রেবেকা তাহা বুঝিতে পারিল না। কালনকির মুখ বন্ধ করিবার কোন উপায় আছে কি না, তাহাই সে ভাবিতে লাগিল; কিন্তু কোন উপায়ই সে দেখিতে পাইল না। তখন সে ঘটনাস্রোতে ভাসিয়া যাওয়াই সঙ্গত মনে করিল।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কালনকি অত্যন্ত অল্পভাষী ও গম্ভীর-প্রকৃতির লোক ছিল। সে তাহার মনের কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিত না, কোন বিষয় লইয়া কাহারও সহিত তর্ক-বিতর্ক করিত না, এবং তাহার গুপ্তসঙ্কল্প কেহই জানিতে পারিত না। তাহার চরিত্রগত বিশেষত্ব রেবেকার অজ্ঞাত ছিল না। এই জন্য রেবেকার বিশ্বাস হইয়াছিল, একরারনামায় তাহার নাম-স্বাক্ষরের কথা কেহই জানিতে পারিবে না; কালনকি তাহার নিকট যে অঙ্গীকার করিয়াছে, তাহা ভঙ্গ করিবে না। অতঃপর কালনকির ব্যবহারে রেবেকা কোন পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিল না, তবে একরারনামাখানি হস্তগত করিবার পর কালনকি সুযোগ পাইলেই রেবেকার সহিত সাক্ষাৎ করিত, এবং পূর্ব্বাপেক্ষা একটু বেশী কথা বলিত; দুই চারিটি প্রেমের কথা বলিবারও লোভ সংবরণ করিতে পারিত না। রেবেকা তাহার কথা শুনিয়া ও ভাবভঙ্গী দেখিয়া বুঝিতে পারিত—সে বেচারার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে; সে প্রেমশরে জরজর! সে তখন রেবেকাকে লাভ করিবার জন্য সকল রকম কুকর্ম্ম করিতে প্রস্তুত ছিল বুঝিয়া রেবেকার উৎকণ্ঠা বর্দ্ধিত হইল। কিন্তু রেবেকার আশঙ্কার তেমন কোন কারণ ছিল না। সে জানিত, কালনকি তাহার ও তাহার পিতার অনিষ্ট করিলে, তাহাদিগকে নিহিলিষ্ট বলিয়া ধরাইয়া দিলে তাহাকে লাভ করিতে পারিবে না।

ক্রমে কয়েক সপ্তাহ অতীত হইল; সলোমন কোহেনের কায-কর্ম্ম যে ভাবে চলিতেছিল, সেই ভাবেই চলিতে লাগিল। জোসেফের গ্রেপ্তারের পর হইতে সলোমন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করিল। কালনকিকে সে বিশ্বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য মনে করিলেও, তাহার সহিত ব্যবহারে সে ভাব প্রকাশ করিল না। কালনকিও যেন কিছুই জানে না—এই ভাবে কায-কর্ম্ম করিতে লাগিল। কালনকির সহিত রেবেকার যে চুক্তি হইয়াছিল, তাহা সলোমন কোহেনের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। কিন্তু কালনকি গবর্ণমেণ্টের গুপ্তচর; ইহা জানিতে পারিয়া সলোমন কোহেন সসর্প-গৃহে বাসের ন্যায় অত্যন্ত অস্বচ্ছন্দতা অনুভব করিতে লাগিল। তাহার মন অশান্তিপূর্ণ হইল।

সলোমন কোহেন কিরূপে কালনকিকে বিতাড়িত করিবে, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল; হঠাৎ কোন উপায় স্থির করিতে পারিল না। অবশেষে এক দিন সে কালনকিকে ডাকিয়া বলিল, “দেখ কালনকি, তোমার মত সুযোগ্য ও বিশ্বাসী কর্ম্মচারীর উপর আমার কাযকর্ম্মের সকল ভার ন্যস্ত করিয়া আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম, তুমিও যথাসাধ্য চেষ্টা-যত্ন করিয়া আমার কারবারের উন্নতি করিয়াছিলে; কিন্তু ইদানীং আমার বৈষয়িক অবস্থা এত শোচনীয় হইয়াছে যে, সরঞ্জামী খরচ না কমাইলে আর চলিবার উপায় নাই।

এই জন্য আমি তোমাকে বিদায় দিতে বাধ্য হইতেছি। তুমি অন্য কোথাও একটি চাকুরী খুঁজিয়া লও।"

কালনকি সলোমনের কথা শুনিয়া বিস্মিত হইল। সে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল; কিন্তু সে ভাব গোপন করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, "তা বেশ; আমি আপনার চাকর বৈ ত নয়; আমাকে রাখিয়া যদি আপনার না পোষায়, তাহা হইলে আমিই বা থাকিবার জন্য জেদ করিব কেন? আমি চাকরী ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছি।"

কালনকি কয়েক মিনিট পরে রেবেকার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে বলিল, "রেবেকা, তোমার বাবা আমাকে জবাব দিয়াছেন; আমি চাকরী ছাড়িয়া চলিলাম।"

কালনকির কথা শুনিয়া রেবেকা স্তম্ভিত হইল; একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল। তাহার সন্দেহ হইল, কালনকির সহিত তাহার পিতার কলহ হইয়াছে। ইহার ফল কিরূপ বিপজ্জনক হইতে পারে, তাহা বুঝিয়া রেবেকা ক্ষুব্ধস্বরে বলিল, "বাবা তোমাকে হঠাৎ জবাব দিলেন! ইহার কারণ কি?"

কালনকি বলিল,—"কিরূপে বলিব? তিনি মনিব, আমি চাকর। তিনি আমাকে পদচ্যুত করিলে আমি চলিয়া যাইতে বাধ্য, আমি ত তাঁহার কৈফিয়ৎ চাহিতে পারি না; তবে তিনি স্বেচ্ছায় কৈফিয়ৎও একটা দিয়াছেন। তাঁহার বৈষয়িক অবস্থা মন্দ হওয়ায় সরঞ্জামী খরচ কমাইবেন। কিন্তু আমাকে তাড়াইবার ইহাই প্রকৃত কারণ কি না, তাহা তোমার জানা থাকিতেও পারে।" কথাটায় গূঢ় ইঙ্গিত ছিল।

রেবেকা বলিল, "না, আমি কিছুই জানি না। সত্যই তিনি আমাকে কোন কথা বলেন নাই।"

কালনকি বলিল, "তোমার এ কথা বিশ্বাস করিলাম। তুমি আমার জন্য তোমার বাবার কাছে সুপারিশ করিও না। আমি চলিয়া যাইতেছি; কিন্তু আমি তোমাদের সংস্রব ত্যাগ করিলেও তোমার আশা ত্যাগ করিব বা তুমি আমার দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিবে, এরূপ আশা করিও না। তুমি যে বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছ, সে বন্ধন তুমি কখন ছিন্ন করিতে পারিবে না। আমাদের ভাগ্য একসূত্রে গ্রথিত হইয়াছে; আমাদের জীবনের অবশিষ্ট কাল সেই সূত্র অবিচ্ছিন্ন থাকিবে।"

কালনকির এ কথার মর্ম্ম রেবেকা তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিল না। সে বুঝিল, তাহাকে তাহার অবিমৃষ্যকারিতার ফল ভোগ করিতেই হইবে। কালনকির কবল হইতে তাহার মুক্তিলাভের আশা নাই। সে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, "জোসেফ কুরেট কি সত্যই মুক্তিলাভ করিতে পারিবে? তোমার কিরূপ ধারণা?"

কালনকি বলিল, "হাঁ, সে নিশ্চয়ই পলায়নের সুযোগ পাইবে এবং পলায়ন করিবে।"

রেবেকা বলিল, "কত দিন পরে?"

কালনকি বলিল, "সে কথা বলা অসম্ভব। আমার বিশ্বাস, এত দিন সে পলায়নের সুযোগ পাইয়াছে এবং পলায়নে সমর্থ হইয়াছে। তোমার সহিত আমার যে চুক্তি হইয়াছিল, তদনুসারে আমার অঙ্গীকার আমি পালন করিয়াছি; আমার ভাই নিশ্চয়ই আমার অনুরোধ রক্ষা করিয়াছে। তবে যদি জোসেফ কুরেট পলায়নের সুযোগ অগ্রাহ্য করিয়া থাকে, সে জন্য আমি দায়ী নহি। এখন তোমাকে তোমার অঙ্গীকার পালন করিতে হইবে, আমি আর বিলম্ব করিতে পারিব না।"

রেবেকা বলিল, "ঠিক বুঝিলাম না, তোমার কথা স্পষ্ট করিয়া বল।"

কালনকি হাসিয়া বলিল, "আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইবে?—আমি তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছি; এখন তুমি আমাকে বিবাহ করিয়া আমার বাসনা পূর্ণ কর।"

রেবেকার মাথা ঘুরিয়া উঠিল। সে মুখ চুণ করিয়া বলিল, "অসম্ভব। তোমাকে বিবাহ করা আমার অসাধ্য।"

কালনকি বিরক্তিভরে বলিল, "অসম্ভব? জানিতে চাই, কি জন্য অসম্ভব।"

রেবেকা দৃঢ়স্বরে বলিল, "তোমাকে পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, তোমাকে বিবাহ করা আমার অসাধ্য। যদি তোমাকে বিবাহ করি, তাহা হইলেও আমি তোমার পত্নী হইতে পারিব না।"

এবার কালনকির ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইল; রেবেকা তাহার চক্ষুতে হিংস্র পশুর ক্রূর দৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া ভীত হইল।

কালনকি ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, "রেবেকা কোহেন! তুমি দীর্ঘকাল হইতে আমার সঙ্গে ছলনা করিয়া আসিয়াছ; আর আমি তোমার ছলনায়

মঙ্গলের জন্য এত দিন আমি মৌন ছিলাম। আমি তোমাদের অনেক কাণ্ড প্রত্যক্ষ করিয়াছি; কিন্তু তোমাদের অনিষ্টের আশঙ্কায় আমি যেন কিছুই দেখি নাই, কিছুই জানিতে পারি নাই—এইরূপ ব্যবহার করিয়া আসিয়াছি। আমি বহুদিন পূর্ব্বে তোমাদের সুখের সংসার শ্মশানে পরিণত করিতে পারিতাম, তোমাদিগকে নির্ব্বাসিত করিবার ব্যবস্থা করিতাম; কিন্তু তোমাকে লাভ করিতে পারিব, এই আশায় তোমার ও তোমার পিতার সর্ব্বনাশসাধনে বিরত ছিলাম।"

রেবেকা অস্ফুটস্বরে বলিল, "তোমার ঐরূপ আশা করাই অসঙ্গত হইয়াছিল। যে দিন তুমি তোমার মনের ভাব আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছিলে—সেই দিনই আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম, আমাদের মিলনের পথে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা আছে; আমাকে তুমি পাইবে না।"

কালনকি বলিল, "হাঁ, তুমি প্রথমে এ কথা বলিয়াছিলে বটে, এবং তাহা সত্য মনে করিয়া তোমার আশা ত্যাগ করিয়াছিলাম, আমার মনের বেদনা নীরবে সহ্য করিতেছিলাম। শেষে দেখিলাম, জোসেফ কুরেট হঠাৎ এখানে আসিয়া জুটিল এবং তোমাকে তাহার হৃদয়-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিল! তুমিও তাহার প্রেমের অর্ঘ্য গ্রহণ করিলে, তাহার পক্ষপাতিনী হইয়া উঠিলে। তুমি তাহার প্রণয়ে বাধা দাও নাই, তাহা আমার অজ্ঞাত নহে। তাহার প্রতি তোমার অনুরাগের পরিচয় পাইয়াই আমার হৃদয়ে আগুন জ্বলিয়া উঠিল; আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম, যেরূপে পারি, তোমাকে লাভ করিবই। ইচ্ছায় না হউক, অনিচ্ছাতেও তুমি আমার হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইবে।—আমি আমার সেই প্রতিজ্ঞা পালন করিব। আমার সঙ্কল্পসিদ্ধির যে ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছি, তাহা খণ্ডন করা তোমার অসাধ্য।"

রেবেকা বলিল, "তুমি ভুল করিয়াছ; আমি জোসেফকেও বলিয়াছিলাম, সে যেন আমাকে পাইবার আশা না করে; আমাদের মিলন অসম্ভব। তোমাকে যে কথা বলিয়াছিলাম, তাহাকেও ঠিক সেই কথাই বলিয়াছিলাম।"

কালনকি উত্তেজিত স্বরে বলিল, "তোমার ও কথা আমি বিশ্বাস করি না। তুমি যে জোসেফ কুরেটের অনুরাগিণী, ইহার অনেক প্রমাণ অনেকবার পাইয়াছি। প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আমার অসহ্য। তোমার সহিত আমার কলহ করিবার ইচ্ছা নাই। তোমার মনোরঞ্জনের জন্য আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত। আমি তোমাকে এখন এরূপ একটি গুপ্ত কথা বলিব—যাহা শুনিয়া তুমি কেবল বিস্মিত নহে, স্তম্ভিত হইবে এবং আমি তোমার প্রতি কিরূপ অনুরক্ত, তাহাও বুঝিতে পারিবে। আমি বহুদিন পূর্ব্বে জানিতে পারিয়াছি, তুমি ও তোমার পিতা নিহিলিষ্ট-সম্প্রদায়ে যোগদান করিয়া নানা ভাবে তাহাদের সাহায্য করিয়া আসিতেছ; রুসিয়ার নিহিলিষ্টরা তোমাদের আশ্রিত, তোমাদের অর্থসাহায্যে তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া রুসিয়ার রাজসিংহাসন চূর্ণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। তোমাদের অপরাধের অকাট্য প্রমাণও আমি সংগ্রহ করিয়াছিলাম; সুতরাং বুঝিতে পারিতেছ, ইচ্ছা করিলে বহুপূর্ব্বেই আমি তোমাদের হাতে দড়ি দিয়া সাইবেরিয়ায় পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে পারিতাম। রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইলে সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াও তোমরা মুক্তিলাভ করিতে পারিতে না, তোমাদের সর্ব্বনাশ হইত। কিন্তু আমি তোমাদের বিরুদ্ধে কোন কথা প্রকাশ করি নাই; তোমাকে লাভ করিতে পারিব, এই আশায় তোমাদের অনিষ্ট-সাধনে বিরত ছিলাম। গবর্মেণ্ট আমাকে বিশ্বাস করিয়া আমার হস্তে যে ভার অর্পণ করিয়াছিলেন, তোমার মুখের দিকে চাহিয়া—এত দিন তাহা উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছি; কিন্তু আজ তুমি আমাকে নিরাশ করিতে উদ্যত হইয়াছ! ইহার কি ফল হইবে, তাহা কি বুঝিতে পার নাই?"

কালনকির কথা শুনিয়া রেবেকার মুখ বিবর্ণ হইল, সে ঘৃণাভরে বলিয়া উঠিল, "তুমি গবর্মেণ্টের গুপ্তচর? কি সর্ব্বনাশ!"

কালনকি বলিল, "হাঁ, আমি গবর্মেণ্টের গুপ্তচর, এ কথা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত নহি। গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহের জন্য এই নগরে আমার ন্যায় সরকারের বৃত্তিভোগী শত শত গুপ্তচর আছে।"

রেবেকার চক্ষুতে হতাশভাব পরিস্ফুট হইল; কিন্তু কালনকির কথায় সে না দমিয়া তীব্রস্বরে বলিল, "গোয়েন্দাগিরীতে তুমি বেশ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছ! তুমি আমাদিগকে বিপন্ন করিবার জন্য অতি চমৎকার ফাঁদ পাতিয়াছ! কিন্তু সেই সঙ্গে নিজের জন্যও যে আর একটি ফাঁদ পাতিয়া রাখিয়াছ, সে কথা কি তোমার স্মরণ নাই? তুমি গবর্মেণ্টের গোয়েন্দা হইয়া এক জন নির্ব্বাসিত নিহিলিষ্টের পলায়নের

ব্যবস্থা করিয়াছ,—তোমার এই অপরাধ সপ্রমাণ হইলে কিরূপে নিষ্কৃতি লাভ করিবে—তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি ?”

কালনকি হাসিয়া বলিল, “জোসেফ কুরেটের কথা বলিতেছ ? আমি তাহার পলায়নে সাহায্য করিয়াছি—ইহার কোন প্রমাণ নাই ; এই অমূলক অভিযোগে আমার কোন অনিষ্ট হইবে না। এ সকল কথা লইয়া তোমার সহিত তর্ক-বিতর্কেও আমার অভিরুচি নাই। রেবেকা ! আমি তোমার সহিত কলহ করিতে আসি নাই ; কলহ করিয়া আমার লাভ কি ? আমি তোমার গুপ্ত কথা গোপনে রাখিয়া তোমার বন্ধুর কায করিয়াছি। তুমি ইচ্ছা করিলে এই বন্ধুত্ব চিরজীবন অক্ষুণ্ণ থাকিবে, চিরকালের জন্য আমাকে গোলাম করিয়া রাখিতে পারিবে। এখন আমাকে ভাল না বাসিলেও কিছু দিন পরে ভালবাসিবে। আমার সুখ-শান্তির জন্য তোমাকে পাইতেই হইবে। তোমার অনুরোধে আমি আমার প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বীকে, আমার মহাশত্রুকে মুক্তিদান করিয়াছি, ইহাতেই তোমার প্রতি আমার অনুরাগের প্রগাঢ়তা বুঝিতে পারিতেছ। তুমি আমাকে বিবাহ করিতে প্রতিশ্রুত হও, তাহা হইলে তোমার স্বাক্ষরিত একরারনামা তোমার সম্মুখেই খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিব।”

রেবেকা দৃঢ়স্বরে বলিল, “আমি পুনর্ব্বার বলিতেছি, তোমার আশা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। তোমাকে আমি বিবাহ করিতে পারিব না।”

কালনকি বলিল, “আমিও তোমাকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিতেছি, কি কারণে আমাকে বিবাহ করিতে পারিবে না ?”

রেবেকা ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, “কারণ, আমি অপরের বিবাহিতা পত্নী !” [ ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

# তাজমহল

চমৎকার !
করাল কালের কণ্ঠে কে দুলা'লো কুন্দ-শুভ্র হার !
মহাকাল চিরকাল ভীষণ ভ্রূকুটিভরে সবার উপরে,
রা'খয়াছে আপনার ধ্বংস-দৃষ্টি. তবু
নারিবে সে প্রেমিকের অশ্রু-মুক্তা বিনাশিতে কভু !
সবুজ প্রান্তর,
প্রেমিকের অবুঝ অন্তর !
তা'র মাঝে মর্ম্মরের সুষমা-মন্দির !
প্রেম যেন মর্ম্মতলে স্পন্দন সুস্থির !
বাগিচাতে ফুল ফুল, উৎসে-স্বচ্ছ জল,
স্ফটিকের প্রতিবিম্ব তাতে টলমল !
আতর ফুরায়ে গেছে বিলায়ে সৌরভ,
মণি-মাণিক্যের দ্যুতি হারালো গৌরব।
তবু কি যে অনুপম গন্ধ আজি ফিরে
তাজমহলের প্রতি মহলেরে ঘিরে !
আকাশেরে নীল রাঙে করিয়া উতল,
মন্দ বায়ে গন্ধ ভরি', জোৎস্নার ভূতল,
অমানিশা, পৌর্ণমাসী, রাত্রি দিবা যত
সবি মধুময় করে মাধবের মত !
অতুল প্রেমিক-রাজ পার্শে শুয়ে থাকি'
প্রেমিকার কবরের 'পরে মেলে আঁখি !
প্রেমের প্রভায় তাহা মধু, শুভ্র আলো,
কোথা মূল্যবান্ মণি মাণিক্যের আলো !
সম্রাটের মর্ম্মদাহী বিরহ-বেদনা
মর্ম্মরের মূর্ত্তি ধ'রে লভেছে চেতনা !
হৃদয়ের সে কাতর ক্রন্দন আজিকে,
দীর্ঘশ্বাসে রাত্রিদিন ব্যাপ্ত দিকে দিকে !
প্রেমিক শাশ্বত, প্রেম চির-মৃত্যুহীন,
অমর এ বিশ্বমাঝে বাঁচে চিরদিন।
জাতি, ধর্ম্ম, ভেদ নাই—আসিছে সবাই।
নিখিল-প্রেমিক-তীর্থ হইয়াছে আজ,
প্রেমিক কবির স্বপ্ন এ সুন্দর তাজ !
দলে দলে আসে হিন্দু, আসে মুসলমান,
জৈন, বৌদ্ধ, পারসিক, ইহুদি, খৃষ্টান !
স্ফটিকের এই আঁখি-জল—
নহে শিল্প-সৌন্দর্য্যের প্রতীক কেবল,
নিখিল-প্রেমিক-তীর্থ, প্রেম-তীর্থ সার,
এই মঠ, চৈত্য, কাবা, মন্দির, বিহার !

হেথা সারা বর্ষ ধরি', সারা দিন রাত
ভিজিতেছে নিত্য নব নয়নের পাত ;
সপত্নীক আসিতেছে, কেহ বন্ধু সহ,
কেহ প্রিয়-শোকাতুর, আনিছে বিরহ !
নিশিদিন উঠিতেছে কাঁপায়ে মিনার
নিখিল বক্ষের সুর, বেদন-বীণার !
শ্যামসুন্দরের মূর্ত্তি দেখেছি হেথায়,
প্রেমময় শ্যাম এল নীল যমুনায় !
যমুনা মোদের চির-প্রেমের চারণ,
ঝুনু ঝুনু গীতি তা'র হরে প্রাণ-মন !
হিন্দুর প্রেমের গীতি
বৃন্দাবন মধু-স্মৃতি,
ওতঃপ্রোত মিশালো তাহায়,
তাজের সোপান সেই ধৌত করি' যায় !

অনুপম সুষমার মণ্ডিত মন্দির,
এই তাজ মহিমায় র'বে চিরস্থির,
নহে আজ কোন এক সম্রাটের ধন,
মুক্ত হয়ে গেছে এর জাতির বন্ধন,
মুক্ত হয়ে গেছে এর কাল-পরিমাণ
এক সুরে, এক বর্ণে, চলিয়াছে এক প্রেম-গান !

শ্রীরামেন্দু দত্ত।

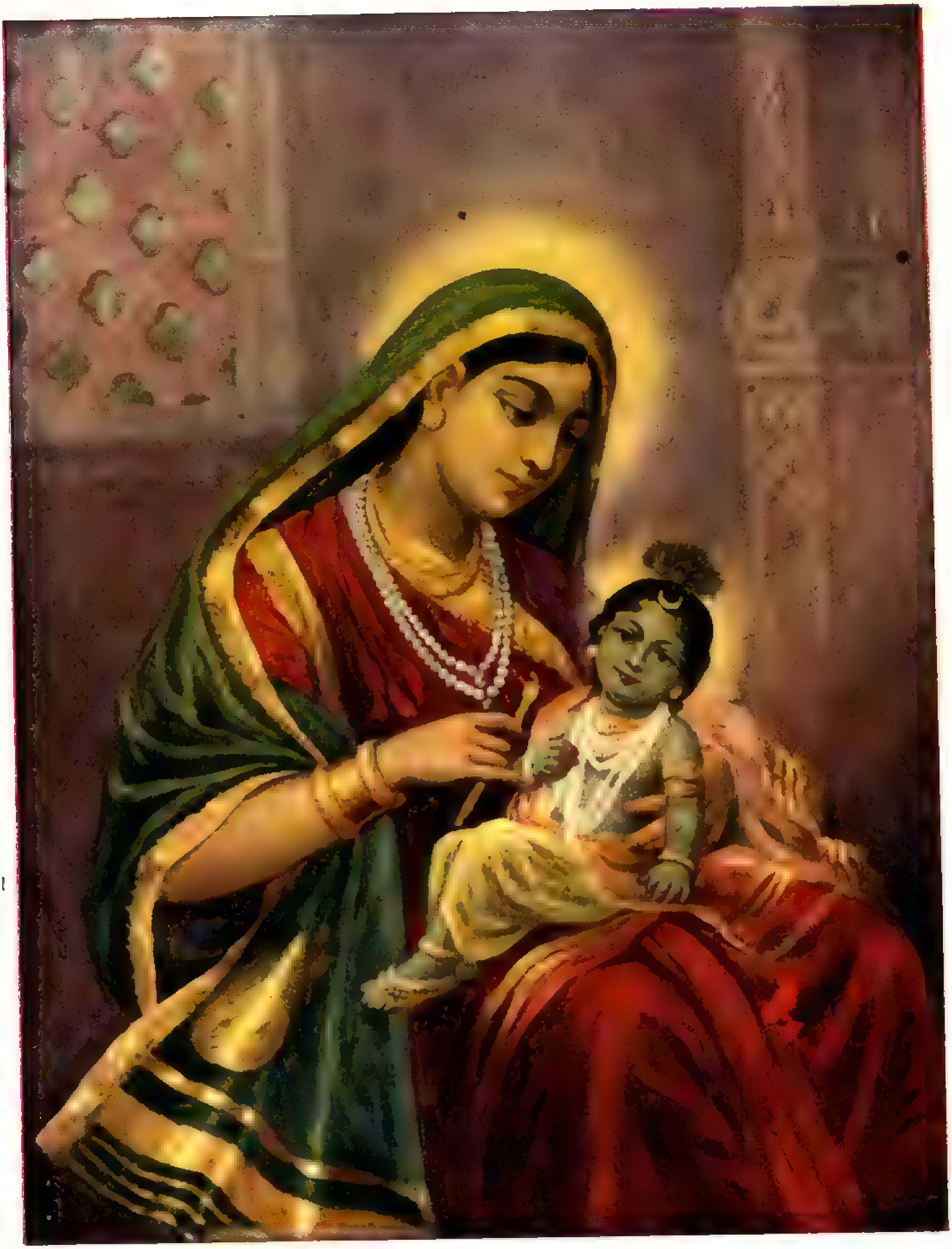

মাতৃ-মূর্ত্তি

[ শিল্পী—শ্রীহরেকৃষ্ণ সাহা ।

বসুমতী প্রেস ]

# রাষ্ট্রনীতি *

বাঙ্গালার জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ তুইটি বিষয়ে কতকগুলি বক্তৃতা করিবার ভার আমার উপর অর্পণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে একটি 'রাষ্ট্রনীতি'; আর একটি 'ঐতিহাসিক নীতি।' তাঁহারা বাঙ্গালা দেশে ইংরাজী শিক্ষা এবং ইংরাজ শাসনের আদি ইতিহাস ব্যাখ্যা করিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন। রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে প্রথমে কিছু বলিব।

আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে রাজনীতি বলিয়া কোন কথা নাই, রাজধর্ম্ম কথাটা আছে, আর আছে নীতি। আমরা ইংরাজীতে যাহাকে পলিটিকস্ বলি, তাহা কতকটা রাজধর্ম্মের অন্তর্গত, আর কতকটা প্রাচীনরা সংস্কৃতে যাহাকে নীতি বলিতেন, তাহার অন্তর্গত। আধুনিক বাঙ্গালায় আমরা ইংরাজী মর্যালিটী শব্দের অনুবাদ করিয়াছি নীতি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতে ইংরাজী মর্যালিটী শব্দের প্রতিশব্দ ছিল না। ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য অথবা রাষ্ট্রের ভিতর পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ যে সকল নিয়ম দ্বারা শাসিত বা পরিচালিত হইত, তাহাকেই তাঁহারা নীতি বলিতেন, ইংরাজীতে যাহাকে 'ষ্টেট্ ক্র্যাফট' বলে, তাহাই আমাদের প্রাচীন ভাষায় নীতি ছিল। ইংরাজীতে যাহাদিগকে 'ষ্টেট্স্ম্যান' বলে, আমাদের প্রাচীন পরিভাষায় তাঁহারা নীতিজ্ঞ ছিলেন। শুক্রনীতি, কৌটিল্যনীতি, চাণক্যনীতি—এই সকল ইংরাজী ষ্টেট্ ক্র্যাফটের অন্তর্ভূত। রাজধর্ম্ম কথা প্রচলিত ছিল। আমাদের কোন বিষয় ব্যাখ্যা করিতে হইলে, কোন বিষয়ে গ্রন্থাদি লিখিতে হইলে তিনটি প্রশ্ন উঠিত, অথবা একটা প্রশ্নের তিনটি শাখা ছিল;—(১) অভিধেয় (২) প্রয়োজন, (৩) সম্বন্ধ। সকল শাস্ত্রের প্রারম্ভেই আছে—ঐ শাস্ত্রের অভিধেয় কি অর্থাৎ বিষয়টা কি, শাস্ত্রের প্রয়োজনটা কি—নিষ্প্রয়োজনে কোন শাস্ত্রের ব্যাখ্যা বা প্রতিষ্ঠা হইত না। আর ঐ শাস্ত্রের সম্বন্ধটাই বা কি? এই তিন প্রশ্ন তুলিয়া শাস্ত্রকাররা প্রত্যেক বিষয়ের আলোচনা করিতেন। আমরা আজ যে বিষয়ের আলোচনা করিতে আসিয়াছি, তাহার অভিধেয় কি? ইহাই প্রথম প্রশ্ন। ইংরাজীতে যাহাকে পলিটিক্স্ বলে, তাহার 'সাবজেক্ট ম্যাটার' কি—এই প্রথম প্রশ্ন। দ্বিতীয় প্রশ্ন ইহার প্রয়োজন কি, পলিটিক্স্ আলোচনা করিবার প্রয়োজন কি? তৃতীয় প্রশ্ন—এই পলিটিক্সের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি, অথবা সমাজের বা জনগণের সম্বন্ধ কি। এখানে প্রথমেই আমি প্রয়োজনের কথা আলোচনা করিতে চাহি। নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন বা অনুশীলন করিবার আবশ্যকতা কি?

আপনারা যদি আমাদের প্রাচীন নীতিশাস্ত্র একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখেন, তাহা হইলে দেখিবেন, নীতিশাস্ত্রকাররা প্রথমেই বলিয়াছেন, (শুক্রনীতিতে তাহাই বলিয়াছে) প্রয়োজন মোক্ষ, জীবের মুক্তি অর্থাৎ মনু প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র, মানবশাস্ত্র—এ সকলের মূল প্রয়োজন হইতেছে জীবের মুক্তির সহায়তা করা। ইহারা মুক্তির পথ দেখাইয়া দেয়, মুক্তিসাধনা প্রতিষ্ঠিত করে। উপনিষদাদি প্রাচীন যে সকল শাস্ত্রগ্রন্থ, আপ্তবাক্য বা তত্ত্ববিস্তার শাস্ত্র আছে, তাহাদেরও প্রয়োজন মোক্ষ বা জীবের মুক্তিসাধন করা। নীতিশাস্ত্র আলোচনা করিতে গেলে সকলের আগে এ কথাটি মনে রাখা প্রয়োজন, আমাদের যাহা কিছু ব্যবস্থা—সমাজব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থা বা ব্যক্তিগত আচার আচরণের ব্যবস্থা, সকলেরই চরম লক্ষ্য ছিল মুক্তি। আপনারা জানেন, উপনিষদে গল্প আছে—ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মজ্ঞ ছিলেন। সংসারধর্ম্ম প্রতিপালিত হইলে পর যখন তাঁহার বনে যাইবার সময় হইল, যখন তিনি বানপ্রস্থ অবলম্বন করিতে প্রস্তুত হইলেন, তখন তাঁহার উভয় পত্নী—মৈত্রেয়ী এবং গার্গীকে ডাকিলেন। আমরা কখন কখনও মনে করি যে, প্রাচীন আর্য্য-ঋষিরা কেবল তত্ত্বজ্ঞানীই ছিলেন, কেবল ব্রহ্মজ্ঞানীই ছিলেন, তাঁহারা বিষয়ের ধার ধারিতেন না। তাঁহারা "কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ" এই আদর্শের অনুসরণ করিতেন। ইহা সত্য নহে। প্রাচীনকালে যাঁহারা মহাজ্ঞানী মহাজন ছিলেন, তাঁহারাও বিষয়ের সাধনা করিতেন, বিষয় অর্জ্জন করিতেন, ভোগ করিতেন, কিরূপ ভাবে ভোগ করিতেন—

---

* থিওসফিক্যাল সোসাইটী হলে বক্তৃতা।

ঈশাবাস্যং ইদং সর্ব্বং যংকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ
তৎসর্ব্বং ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা কস্যচিৎ ধনং।

উপনিষদ বলিতেছে—"এই চঞ্চল জগতে যাহা কিছু চঞ্চল বস্তু আছে, ঈশ্বর দ্বারা তাহাকে আচ্ছাদন করিতে হইবে অর্থাৎ সকল বিষয়ে ঈশ্বরকে, পরমপুরুষকে, ভগবান্‌কে বা ব্রহ্মকে অনুভব করিতে হইবে, আর ত্যাগের দ্বারা, আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই বিষয় বা রাজ্য ভোগ করিতে হইবে।" তাহার পরেই বলিয়াছেন,—"কাহারও ধনে লোভ করিও না।" ইহাই তাঁহাদের পন্থা ছিল। যাজ্ঞবল্ক্য উপনিষদে বলিয়াছেন, জগতে যাহা কিছু প্রার্থনীয় বস্তু আছে, একে একে তাহার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,—"বিত্তের জন্য বিত্ত প্রিয় নহে, আত্মার জন্য বিত্ত প্রিয়; পুত্রের জন্য পুত্র প্রিয় নহে, আত্মার জন্য পুত্র প্রিয়; স্ত্রীর জন্য স্ত্রী প্রিয় নহে, আত্মার জন্য স্ত্রী প্রিয়।" এইরূপ ভাবে যাহা কিছু ভোগ্যবস্তু, সকলের অন্তরালে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রচেষ্টা, ব্রহ্মানুভূতির প্রতিষ্ঠা রহিয়াছে। এই ভাবে তাঁহারা বিষয় ভোগ করিতেন। সুতরাং যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি প্রাচীনকালের জ্ঞানী ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিরা কেবল কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ ছিলেন না, মধ্যযুগের সন্ন্যাসের আদর্শ তাঁহারা অনুসরণ করিতেন না। গীতাতেও তাহাই পাওয়া যায়। তাহাতে বাহিরের সন্ন্যাসের প্রশংসা করে নাই, গীতার সন্ন্যাসের অর্থ কর্ম্মসন্ন্যাস অর্থাৎ ফললিপ্সা পরিত্যাগ করা। কর্ম্মের যে ফল, তাহার প্রতি যে লোভ, সেই লোভ পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মসাধন করা। তাহাকেই গীতায় সন্ন্যাস বলে।

"ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ......ন চ শোকভাক্।" যাহারা সমাজবন্ধন স্বীকার করেন নাই, যাহারা আত্মাশ্রয়ী, তাঁহারাই যে সন্ন্যাসী, তাহা নহে। যাহারা ভগবান্ বা ব্রহ্মে সব কর্ম্ম সমর্পণ করেন, তাঁহারাই সন্ন্যাসী। সুতরাং যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন বলিয়া বিষয়ের যে তাঁহার কোন অভাব ছিল, তাহা নহে। বিস্তর বিষয় তাঁহার ছিল। যাজ্ঞবল্ক্যাদি ঋষিগণ রাজসভায় উপস্থিত হইতেন। সেখানে তত্ত্ববিচার বা তত্ত্বমীমাংসা হইত, এই তত্ত্ববিচারে যাহারা জয়ী হইতেন, রাজারা তাঁহাদিগকে পুরস্কৃত করিতেন, বহু গোধন—প্রত্যেক গোধনের শৃঙ্গে স্বর্ণ বাঁধিয়া তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতেন এবং বলিতেন—আপনারা—জ্ঞানীরা,—ঋষিরা বিচার করিয়া দেখুন, কে সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী, এই গোধন সকল রহিয়াছে, সুবর্ণ-অলঙ্কৃত এই গোধন আপনাদের প্রাপ্য। উপনিষদাদিতে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

যাজ্ঞবল্ক্য যখন বানপ্রস্থ অবলম্বন করিতে প্রস্তুত হইলেন, তখন তাঁহার উভয় পত্নীকে ডাকিয়া বলিলেন—"দেখ, আমি ত এখন বানপ্রস্থ অবলম্বন করিব, আমার যে বিষয় আছে, তোমরা দুই জনে বণ্টন করিয়া লও।" গার্গী বলিলেন—"আপনি যাহার কথা বলিতেছেন, তাহা ত বিষয়, বলুন ত, এই বিষয় দ্বারা আমার কি হইবে?" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "বিষয়ীরা যে সুখভোগ করে, তোমার তাহাই হইবে, তুমি স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে, তোমার গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব হইবে না।" গার্গী বলিলেন—"এই যে ধন তুমি আমাকে দান করিতেছ, ইহার দ্বারা আমি অমৃতত্ব লাভ করিতে পারিব কি না, অর্থাৎ আমি মুক্তিলাভ করিতে পারিব কি না?" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—"তাহা নহে। বিত্তশীল লোকরা যেরূপ সুখ ভোগ করে, তুমি তাহাই ভোগ করিবে।" গার্গী বলিলেন, "যেনাহং ন অমৃতস্য তেনাহং কিং করিষ্যামি,"—"যাহার দ্বারা আমি অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইব না, সংসার হইতে মুক্তি পাইব না, পরমার্থলাভ যাহা দ্বারা হইবে না, তাহা লইয়া আমি কি করিব?" এ কথাটি এখানে তুলিলাম এই জন্য যে, আমাদের প্রাচীন সাধনার প্রত্যেক বিভাগে এই ভাব অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। সকল শাস্ত্র—সকল বিদ্যার মূল লক্ষ্য মোক্ষ, প্রয়োজন প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া শুক্রনীতি প্রথমেই বলিয়াছে—এই নীতির প্রয়োজন মোক্ষ—জীবকে মুক্তির দিকে অগ্রসর করিয়া দেওয়া। তেমনই রাজধর্ম্ম সম্বন্ধেও দেখিতে পাই। মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বে রাজধর্ম্ম সম্বন্ধে যে আলোচনা আছে, তাহাতে দেখিতে পাই—ভিন্ন ভিন্ন পর্ব্বের যে ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে, যে ইঙ্গিত করা হইয়াছে, তাহাতে সর্ব্বশেষে বলা হইয়াছে,—"ইতি মহাভারতে অমুক পর্ব্বের মোক্ষপর্ব্বাধ্যায়ে রাজধর্ম্মপর্ব্বাধ্যায়, অর্থাৎ রাজধর্ম্মপর্ব্বাধ্যায়কে মোক্ষপর্ব্বের অন্তর্গত করা হইয়াছে। পলিটিক্স্ আলোচনা করিবার সময় এ কথাটি সর্ব্বদা মনে করিয়া রাখিতে হইবে। স্বাধীনতা যাহাকে বলি, তাহা আমাদের প্রাচীন

সাধনার লক্ষ্য ছিল না। স্বাধীনতা যে হেয় ছিল, তাহা নহে। স্বাধীনতার প্রয়োজন প্রাচীনরা অস্বীকার করেন নাই। কিন্তু তাঁহারা বলিয়াছেন, স্বাধীনতা প্রিয় নহে, আত্মার জন্য স্বাধীনতা প্রিয়; স্বাধীনতা যখন মোক্ষের দিকে জীবকে অগ্রসর করে, তখনই স্বাধীনতার মূল্য আছে, অন্যথা নহে। পলিটিক্সের লক্ষ্য হইতেছে মোক্ষ, এ কথাটি মনে না রাখিলে আমাদের সাধনার, রাষ্ট্রনীতি, রাজনীতি বা পলিটিকসের আলোচনা হয় না। কেবল আমাদের দেশেই যে ইহা সত্য, তাহা নহে, অন্য দেশেও তাই। আজকাল পলিটিকাল্ সায়ান্সের গ্রন্থ বিস্তর হইয়াছে। ৪০ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের বাল্যকালে পলিটিকাল সায়ান্স একরূপ অজ্ঞাত ছিল। আমার হস্তে পলিটিকাল সায়ান্সের যে গ্রন্থ পড়িয়াছিল, তাহা লর্ড ক্রমের গ্রন্থ। আর একখানা গ্রন্থ ছিল, নাম তাহার "ডিমক্রেসী ইন্ আমেরিকা।" এই দুইখান গ্রন্থমাত্র আমরা দেখিয়াছিলাম; এখন সেই দুই গ্রন্থের কেহ খোঁজ করেন না, কারণ, পালিটিকস্ বা রাষ্টনীতিবিজ্ঞান সম্বন্ধে নূতন নূতন গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, অনেক আলোচনা হইতেছে, সমাজ-বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে লোকের জ্ঞান বিস্তৃত হইয়াছে, পরিপক্কতা কিয়ৎপরিমাণে লাভ হইয়াছে। ক্রম তাঁহার পলিটিকাল ফিলজফিতে বলিয়াছেন—Politics is a department of Ethics রাষ্ট্রনীতি বা রাজনীতি ধর্ম্মনীতির একটা অঙ্গ। এ কথার অর্থ এই যে, সমাজের ভিন্ন ভিন্ন লোক ও পরস্পরের প্রতি যে সমুদয় কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য আছে, তাহা প্রদর্শন করা ইথিক্সের উদ্দেশ্য। যদি মানুষ একাকী থাকিত, মানুষ যদি সমাজবন্ধনে না থাকিত, তাহা হইলে ইথিক্সের প্রতিষ্ঠা হইত না, তাই ক্রম বলিয়াছেন, এই যে মানুষের পরস্পরের সম্বন্ধের আলোচনা—যাহার বিষয় হইতেছে ইথিক্স—তাহারই এক অংশ পলিটিক্স্। এই জন্য পলিটিক্স্ও এই সম্বন্ধের আলোচনা করে, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে যে ইথিক্স্, তাহারই আলোচনা করে। আর ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সমষ্টিভূত যে শক্তি, যাহাকে রাজশক্তি বা রাষ্ট্রশক্তি বা ষ্টেট বলা যায়, তাহার সঙ্গে সম্বন্ধের আলোচনা করে পলিটিক্স্। আর ষ্টেটের অন্তর্গত যে জনসমষ্টি, ষ্টেট সম্বন্ধে পরস্পরের সঙ্গে তাহাদের যে সম্বন্ধ, তাহাও পলিটিক্সের অন্তর্গত। পলিটিক্সের এই দুই দিক, (১) সমাজের সমষ্টিভূত শক্তির যে প্রতীক—যাহাকে গভর্ণমেণ্ট, রাষ্ট্র বা ষ্টেট বলি, তাহার সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির সম্বন্ধের আলোচনা করে পলিটিক্স্। (২) ষ্টেটের প্রজা বলিয়া, ভিন্ন ভিন্ন প্রজার মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহারও আলোচনা করে পলিটিক্স্, এই জন্য পলিটিক্স্কে ইথিক্সের একটা অঙ্গ বা অংশ বলা হইয়াছে। এই পলিটিক্স্ আর মোক্ষের সার সম্বন্ধের বিচার করিতে যাইয়া কেন ঋষিরা বলিলেন—পলিটিক্স্ মোক্ষপ্রতিপাদক শাস্ত্র? এই জন্য বলিলেন যে, মানুষ যদি সমাজশৃঙ্খলার মধ্যে বাস না করে, তাহা হইলে তাহার দেহশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি সম্ভব হয় না, তাহার জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন সম্ভব হয় না, তাহার মনুষ্যত্বের বিকাশের সম্ভাবনা অত্যন্ত হ্রাস এবং লঘু হইয়া যায়। এই সমাজ আছে বলিয়া সমাজের সমষ্টিভূত যে জ্ঞান-ভাণ্ডার বহু প্রাচীনকাল হইতে পুরুষপরম্পরায় চলিয়া আসিয়াছে, যে জ্ঞানের ভাণ্ডার উপনিষদাদিতে সঞ্চিত রহিয়াছে, সেই জ্ঞান-ভাণ্ডারের উত্তরাধিকারী আমরা হইয়াছি, আমাদের জ্ঞানপ্রবৃত্তিকে ফুটাইয়া তুলিবার অবসর পাইয়াছি। আমরা যদি এমন অবস্থায় জন্মিতাম—যেখানে মানুষ নাই, পশ্চাতে কিছু নাই, প্রত্যেকে আমরা নিঃসঙ্গ পুরুষ—যদিও এমন অবস্থা সম্ভব নহে, তবু যদি তাহা একবার মানস-নেত্রে কল্পনা করি, তাহা হইলে মানুষের কি অবস্থা হইত? সে মানুষ বন্য পশু হইতে অধিক কিছু হইত না। পশুর যেমন পশ্চাতে কিছু নাই, সেইরূপ তাহারও পশ্চাতে ইতিহাস থাকিত না, সাধনার ধারা থাকিত না, পিতৃ-পিতামহদের সঞ্চিত জ্ঞান-ভাণ্ডার থাকিত না, বহু পুরুষপরম্পরা যে ভাষার অনুশীলন করিয়া তাহার উৎকর্ষ সম্পাদিত করিয়াছে, যে ভাষার সাহায্যে সে আপনার মনোবৃত্তির বিকাশসাধন করিয়াছে এবং তাহাতে কত আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই কাব্য, সঙ্গীত প্রভৃতি যদি মানুষের পশ্চাতে না থাকিত, তাহা হইলে বন্য পশুর মত সে জন্মগ্রহণ করিত, বন্য পশুর মত সে বাস করিত, বন্য পশুর মত সে মরিয়া যাইত। সুতরাং মনুষ্যত্বের বিকাশের জন্য সমাজের প্রয়োজন।

সমাজ বহু লোকের সমষ্টি, এক জনে সমাজ হয় না। ১০ জনে মিলিয়া একসঙ্গে বাস করিতে গেলে, পরস্পরের স্বার্থে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, পরস্পরের প্রবৃত্তির একটা রেষারেষি ভাব উপস্থিত হয়, সুতরাং সেখানে প্রত্যেকে নিজ নিজ

প্রবৃত্তিকে এবং স্বার্থকে যদি সংযত করিয়া না চলে, তাহা হইলে সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করা জীবের সম্ভব হয় না। ইহাই সমাজের প্রথম কথা। আমরা যদি অনাচারী হই, যাহা ইচ্ছা তাহা করি, আমার প্রকৃতি যাহা চায়, তাহা যদি করি, তাহা হইলে কোন নিয়মের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু এই যে আমরা সহরে অথবা গ্রামে সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতেছি, সেখানে আমরা যথেচ্ছাচারী হইতে পারি না, যদি হই, তবে আমার স্বার্থে ব্যাঘাত হয়, আমার নিজের স্বার্থ-সাধনা করিতে গেলে, অপরের স্বার্থ-হানি হয়। আমার প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তিসাধনা করিতে গেলে, অপরের ইষ্টে ব্যাঘাত উৎপন্ন হয়। সুতরাং সমাজে থাকিতে গেলেই আমার ব্যক্তিগত স্বার্থকে সঙ্কুচিত করিয়া চলিতে হইবে, প্রবৃত্তি সকলকে আমার সাধনাধীনে আনিয়া সংযত করিয়া রাখিতে হইবে। এই জন্য সমাজ-শাসন দ্বারা জীবের দেহশুদ্ধি, আত্মশুদ্ধি বা চিত্তশুদ্ধি হয়, বনে গেলে তাহা হয় না, সুতরাং সমাজবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যে সমুদয় সমাজরক্ষণের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহা মানিয়া চলিতে হইবে। যেমন বিবাহ-বন্ধন মানিয়া চলিতে হয়। ইহার আকার ভিন্ন ভিন্ন সমাজে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বটে, কিন্তু বিবাহের যে একটা বন্ধন সকল সমাজেই আছে, তাহা যথেচ্ছাচারিতায় বাধা দেয়। যেখানে এই নিয়ম নাই, সেখানে সমাজ বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে, তাহা হইলে বিপ্লব উপস্থিত হয়। নানা দিক্ দিয়া সমাজের অন্তর্গত ব্যক্তির পুষ্টি হয় এবং তাহারা মানব-জীবনের চরিতার্থতা লাভ করিতে সমর্থ হয়। সুতরাং সমাজের প্রয়োজন মানুষকে শাসন করিবে; শাসনের প্রয়োজন মানুষকে সংশোধন করিবে, পশুত্বের ভূমি হইতে তুলিয়া লইয়া মানবত্বের ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করিবে। এ দিক হইতে যখন দেখি, তখন সমাজ-শাসনের ভিতর দিয়া আমরা যে মোক্ষের দিকে অগ্রসর হই, তাহা বুঝিতে পারি।

রাষ্ট্রের সঙ্গে আমার সম্বন্ধের প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারি—যদি রাষ্ট্রের অধীন হইয়া চলি, রাষ্ট্রের প্রতি আমার যে কর্ত্তব্য, তাহা যদি পালন করিয়া চলি, তাহা হইলে আমার নিজের, আমার পরিবারের অথবা আমার গোষ্ঠীর স্বার্থকে সংযত করিয়া রাষ্ট্রের অন্তর্গত সমগ্র সমাজের সমগ্রীভূত স্বার্থকে অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে। আমার স্বার্থে আর আমার পরিবারের স্বার্থে যেমন বাস্তবিক কোন বিরোধ নাই, তেমনই আমার অথবা আমার পরিবারের অথবা আমার গোষ্ঠীর স্বার্থের সঙ্গে সমগ্র রাষ্ট্রের স্বার্থেরও কোনও বিরোধ নাই। আমার পরিবারের সঙ্গে যখন আমি মিলিত হই, তখন আমাকে আমার নিজের খেয়াল কিছু কিছু ছাড়িতে হয়। পরিবারের মধ্যে থাকিয়া যাহা ইচ্ছা তাহা আমি করিতে পারি না। যুবক-যুবতী যত দিন অবিবাহিত থাকে, তত দিন তাহারা অনেকটা নিজের খেয়ালমত চলিতে পারে। দুই জনে মিলিয়া যখন তাহারা পরিবারের সৃষ্টি করে, তখন আর সেরূপ খুসীমত চলিতে পারে না। তখন পরস্পর পরস্পরের পছন্দ অনুসরণ করিয়া চলে, আপনার পছন্দকে খাট করিয়া অপরের পছন্দকে বড় করিয়া চলিতে হয়, না হইলে পরিবারবন্ধন থাকে না। স্বামী যদি যথেচ্ছাচারী হয়, তাহা হইলে যেমন দাম্পত্য-বন্ধন নষ্ট হইয়া যায়, স্ত্রী যদি যথেচ্ছাচারিণী হয়, তাহা হইলেও তেমনই দাম্পত্য-বন্ধন নষ্ট হইয়া যায়, স্বামি-স্ত্রীর বন্ধন পরস্পরের ব্যক্তিত্বকে সংযত করে; কেবল সংযত করে, তাহা নহে, তাহাতে আমরা লাভবান্‌ও হই, আমার পূর্ব্বতন নিরঙ্কুশ ব্যক্তিত্ব দ্বারা যাহা আমি পাইতাম, তাহা অপেক্ষা অধিক এখানে পাই। আমি যদি একাকী থাকি, তাহা হইলে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য আমাকে সমস্ত সময় অতিবাহিত করিতে হয়, অন্যান্য বিষয় অনুশীলন করিবার সময় আমার থাকে না। কিন্তু যখন পরিবারে আবদ্ধ থাকি, তখন দশ জন মিলিয়া পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করি। পরিবারের অন্যান্য লোকের সহযোগিতা যদি আমি প্রাপ্ত না হই, তাহা হইলে অন্যান্য বিষয়ে মনোনিবেশ করিবার আমার অবসর থাকে না, তাহা হইলে মানুষের উন্নত-রঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলন অথবা ধর্ম্মসাধন সম্ভব হয় না। এই জন্য একটু চিন্তা করিলে দেখিতে পাই, মানুষ যখন দশ জন মিলিত হইয়া থাকে, তখন আপনাকে একটু খাট করিয়া চলিতে হয়, তাহাতে সে যে অবসর ও সুযোগ পায়, তাহা উন্নততর বৃত্তির অনুশীলনে নিযুক্ত করিতে পারে, ইহাই তাহার লাভ।

আমি যখন একাকী থাকি, তখন আমি অত্যন্ত স্বাধীন; পরিবারের মধ্যে যখন থাকি,তখন সেই স্বাধীনতা কিছু সংযত হয়। কারণ, পরিবারের অন্তর্গত ১০ জনের স্বাধীনতাকে আমার মানিয়া চলিতে হয়, অন্য দিকে তাহাদিগকেও আমার স্বাধীনতা মানিয়া চলিতে হয়; সুতরাং এখানে একটা রফা

হয়, পরিবারস্থ সকল লোক আপন আপন স্বাধীনতাকে কিছু কিছু বর্জ্জন করে। আমিও আমার স্বাধীনতাকে কিছু কিছু বর্জ্জন করি। এই জন্য বর্জ্জন করি যে, একাকী থাকিলে যে ক্লেশ আমাকে পাইতে হইত, তাহা পাইতে হয় না। ইহাই আমার লাভ।

আদিম অবস্থায় যখন পরিবারে পরিবারে ঝগড়া হইত, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে খাদ্য বা বাসভূমি লইয়া ঝগড়া হইত, সমাজের যখন এই সামরিক অবস্থা ছিল, তখন দেশের কি অবস্থা ছিল, আর যখন পরিবারের মধ্যে—গোষ্ঠীর বেষ্টনের মধ্যে একত্র হইয়া বাস করি, তখন দেশের যে অবস্থা হয়, এই উভয় অবস্থার যদি তুলনা করি, কল্পনার দৃষ্টিতে অবলোকন করি, তাহা হইলে বুঝিতে পারা যায়, আমি যে আমার স্বাধীনতাকে খর্ব্ব করিতেছি, একটু সংযত করিতেছি, তাহার পরিবর্ত্তে আমি আর একটা খুব বড় স্বাধীনতা লাভ করিতেছি, পরিবারের অন্তর্গত হইয়া আমি একটা বৃহত্তর স্বাধীনতা সম্ভোগ করি। আবার যখন গোষ্ঠীর বেষ্টনের মধ্যে বাস করি, তদপেক্ষা বৃহত্তর স্বাধীনতা লাভ করি, আবার ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর সমষ্টিতে যে জাতি গঠিত হয়, সেই জাতির ভিতর যখন বাস করি, তখন জাতির সমষ্টিভূত শক্তি দ্বারা আমার শক্তি ও স্বাধীনতাকে কিয়ৎপরিমাণে খর্ব্ব করি বটে, কিন্তু তাহাতে একটা বৃহত্তর শক্তি আমার লাভ হয়। সুতরাং এই ব্যবসায়ে ক্ষতি নাই, এই ত্যাগে হানি নাই, ইহাতে কেবল লাভই হয়।

আবার সম্বন্ধ হইলেই কিছু কিছু যুদ্ধ বাধিবে, স্বার্থের সংঘর্ষ ঘটিবে, কেহ ইচ্ছা করিয়া ত্যাগ করিবে, কেহ করিবে না, যে ইচ্ছা করিয়া সমাজ-শাসন মানিবে না, তাহাকে শাসনে রাখিবার ব্যবস্থা চাই, না হইলে সমাজে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে। সমাজের সমষ্টিভূত শক্তি, যাহাকে ষ্টেট বা গভর্ণমেণ্ট বলা হয়—যেমন থাকিবে, সেই শক্তি সেখানে প্রত্যেককে তাহার ন্যায্য অধিকারে প্রতিষ্ঠিত রাখিবে এবং প্রত্যেককে রক্ষা করিবে। আমার ধন রক্ষা করিবার জন্য তখন আমাকে চেষ্টা করিতে হইবে না, আমার স্ত্রী-পুত্রদিগকে রক্ষা করিবার জন্য আমাকে বেগ পাইতে হইবে না। সে ভার গ্রহণ করিবে কে? সমাজের প্রতিভূ বা প্রতিনিধিস্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির সংযত, কেন্দ্রীভূত শক্তির আধারস্বরূপ রাষ্ট্র, ষ্টেট বা রাজা, তাঁহারাই এই ভার গ্রহণ করেন। এই ভাবে রাষ্ট্র মোক্ষপর্য্যায়ভুক্ত হয়। মোক্ষ আকাশ হইতে পড়ে না, সাধনা দ্বারা মোক্ষ লাভ করিতে হয়। মোক্ষ আর কিছু নহে, জীবের শিবত্বপ্রাপ্তিই মোক্ষ, মানুষের দেবত্বলাভই মোক্ষ। শিবত্ব বা দেবত্ব বাহিরের জিনিষ নহে, প্রত্যেক মানুষের ভিতর এই শিবত্ব-দেবত্ব রহিয়াছে। সেই জন্য প্রাচীন নিয়মানুসারে সন্ধ্যাবন্দনাদির সময় যখন ব্রাহ্মণরা পূজা করিতে বসেন, তখন মন্ত্র আবৃত্তি করেন :—

অহং দেবো ... ... ... ন চ শোকভাক্
সচ্চিদানন্দোঽহং ... ... ... নিত্যমুক্তস্বভাববান্

ইহার অর্থ এই—এই যে আমি উপাসনা করিতেছি, কে কার উপাসনা করে? সমানে সমানে না হইলে উপাসনা হয় না। মানুষ যদি ব্রহ্মভাবাপন্ন না হইত, জীব এবং ব্রহ্ম যদি স্বজাতীয় বস্তু না হইত, যদি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় হইত, তাহা হইলে ইহাদের মধ্যে জ্ঞানের বা প্রেমের কোনরূপ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইত না। ব্রহ্ম এবং জীব, জীব এবং শিব, মানুষ এবং ঈশ্বর স্বজাতীয় বস্তু। উপাস্য এবং উপাসক স্বজাতীয় বস্তু বলিয়াই উপাসনা সম্ভব হয়, সাধন-ভজন সম্ভব হয়, জীবের ঈশ্বরপ্রাপ্তি, ব্রহ্মলাভ প্রভৃতি সম্ভব হয়। এই জন্য উপাসনার পূর্ব্বে যাহা পরে প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহাকে ধ্যান করিয়া আরম্ভ করিতে হয়। এই জন্য সন্ধ্যা-বন্দনার সময় ব্রাহ্মণরা ধ্যান করেন—আমি দেবতা অর্থাৎ যে দেবতার ভজনা করিতেছি, তিনি এবং আমি এক জাতীয়, আমি ব্রহ্ম অর্থাৎ যে ব্রহ্মের ধ্যান-ধারণা করিতে আমি যাইতেছি, তিনি এবং আমি স্বজাতীয়, আমি শোকভাক্ নহি, সচ্চিদানন্দস্বরূপ ঈশ্বর, ভগবান্ বা ব্রহ্ম যেমন সচ্চিদানন্দস্বরূপ, আমিও সেইরূপ। আর তিনি যেমন নিত্যমুক্তস্বভাববান্, আমিও সেইরূপ, আমি যে বন্ধনদশায় পড়িয়া আছি, আমি যে শোক ভোগ করি, ইহা মায়াবশে, অজ্ঞানতা নিবন্ধন। যদি আমার জ্ঞানের বিকাশ হয়, আমি যদি ব্রহ্ম উপলব্ধি করিতে পারি, ঈশ্বরকে যদি জ্ঞানে ধারণা করিতে পারি, ব্রহ্মজ্ঞানে যদি প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে আমি শোকাতীত হইব, শোকাতীত ব্রহ্মলোকে প্রতিষ্ঠিত হইব—এই বলিয়া ব্রাহ্মণরা সন্ধ্যা আরম্ভ করেন।

জীবকে যদি শিবত্ব প্রাপ্ত হইতে হয়, তাহা হইলে তাহার ভিতর যে সমুদয় পাপের বীজ আছে, যে সমুদয় অজ্ঞানতা আছে, যে সমুদয় ক্ষুদ্র দৃষ্টি আছে, সে যে আপনাকে

ছোট বা আংশিক বলিয়া ভাবে, তাহার যে দেহাত্মবোধ আছে অর্থাৎ সে যে দেহকে আত্মা বলিয়া মনে করে, এই সকল নষ্ট না হইলে মানুষ দেবত্ব লাভ করিতে পারে না। জীবের যে সমুদয় মোহ, অজ্ঞানতা বা সঙ্কীর্ণতা আছে, যে জন্য তাহার নিজের শিবত্বকে প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব হইয়াছে, তাহাকে সরাইয়া দেওয়া সমাজবন্ধনের ও সমাজধর্ম্মের উদ্দেশ্য। রাষ্ট্রীয় বন্ধন এবং রাষ্ট্রধর্ম্মেরও সেই উদ্দেশ্য। কেমন করিয়া রাজধর্ম্মের উৎপত্তি হইল, মহাভারতে তাহা সুন্দর বিবৃত হইয়াছে। যুধিষ্ঠির পিতামহ ভীষ্মের কাছে গিয়া রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে উপদেশ লাভ করেন—ইহা এক অদ্ভুত কথা। রামায়ণেও তাহাই আছে। রামচন্দ্র রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করিলেন, তাহাতে রাবণের প্রতি রামের কোন বিদ্বেষ বা অশ্রদ্ধার উদ্রেক হইল না। রাবণ যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত, শ্মশানে উঠিবেন,রাম তখন তাঁহার কাছে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "আমাকে রাজনীতি শিক্ষা দাও। তুমি ত চলিয়া যাইতেছ,আমি রহিলাম, আমাকে রাজনীতি পালন করিতে হইবে।" শ্রীরামচন্দ্র রাবণের কাছে রাজনীতি শিখিতে চাহিয়াছিলেন, সুতরাং যুধিষ্ঠির যে জ্ঞানবৃদ্ধ, গুরুজন, পিতামহ ভীষ্মের নিকট রাজনীতি শিক্ষা করিতে চাহিবেন, তাহা বিচিত্র নহে। যুধিষ্ঠির ভীষ্মের কাছে গিয়াছেন, এখানে মহাভারতে রাজধর্ম্মপর্ব্বাধ্যায়ের আরম্ভ হইল। যুধিষ্ঠির রাজনীতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। একটা প্রশ্ন এই,—"আপনি বলুন, রাজার উৎপত্তি কিরূপে হইল, রাজধর্ম্মের উৎপত্তি কিরূপে হইল?"

ভীষ্ম বলিলেন,—"আদিতে রাজাও ছিল না, দণ্ডও ছিল না, বিধিবিধান কিছুই ছিল না। তবে তখন সমাজ কিরূপে চলিত? সেই সময় সমাজের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি আপন আপন ধর্ম্ম সহজে আপনারা প্রতিপালন করিত; সুতরাং তখন শাসনের প্রয়োজন ছিল না। তখন সমাজে কোন বিশৃঙ্খলাও উপস্থিত হয় নাই। কেহ কেহ যখন অলসতা বশতঃ আপন ধর্ম্ম—আপন কর্ত্তব্য প্রতিপালনে বিমুখ হইল, সমস্যা উপস্থিত হইল, তুমি যদি তোমার কর্ত্তব্য প্রতিপালন না কর, তাহা হইলে সে কর্ত্তব্য প্রতিপালনের উপর তোমার যে স্বত্ব-স্বার্থ প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহাও রক্ষিত হইবে না। সমাজে তোমার যে 'রাইট' বা যে 'ডিউটী' না কর, তাহা হইলে তোমার ডিউটীর উপর প্রতিষ্ঠিত তোমার রাইটও থাকিবে না। তোমার ডিউটী যে করিবে, সে তোমার রাইটও লইয়া যাইবে, তোমার গ্রাসাচ্ছাদনের প্রয়োজনে যতটা ভূমি কর্ষণ করা প্রয়োজন, ততটা তুমি কর্ষণ করিবে, যদি না কর, সে ভূমি অনাবাদ থাকিবে না। তোমার প্রতিবেশী, যাহার কর্ম্মলিপ্সা প্রবলতর, যাহার শক্তি তোমা অপেক্ষা বেশী, সেই প্রতিবেশী ঐ ভূমি কর্ষণ করিবে। তাহাতে ভূমির উপর তোমার যে রাইট, দাবী বা স্বত্ব আছে, তাহা তাহার হস্তগত হইবে। এই ভাবে তুমি যদি কর্ত্তব্য পালন না কর, অপরে তোমার কর্ত্তব্যের বোঝা মাথায় লইবে; সঙ্গে সঙ্গে সে তোমার স্বত্ব বা রাইটও লইয়া যাইবে, তুমি তাহার অধীন হইবে, সে তখন আপনার শক্তি দ্বারা, আপনার কর্ম্মের প্রভাব দ্বারা তোমার উপর উৎপীড়ন করিবে, ইহা অনিবার্য্য। তাই ভীষ্ম বলিলেন, প্রথমে রাজাও ছিল না,দণ্ডও ছিল না,তখন প্রত্যেকে আপন আপন ধর্ম্ম প্রতিপালন করিত, আপন আপন কর্ত্তব্য পালন করিয়া চলিত। ক্রমে কতকগুলি লোক আলস্যবশতঃ আপন কর্ত্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হইল। তখন সে কর্ত্তব্য পালন করিয়া অন্য লোক শক্তিশালী বা প্রবল হইয়া উঠিল। সে যে প্রথম হইতেই প্রবল হইয়াছে, তাহা নহে। তোমার কর্ত্তব্যপালনে বিমুখতা হইতে তাহার শক্তিলাভ হইয়াছে; বাহুবলে শক্তিশালী হইল, তাহা নহে, সমাজশাসনের দ্বারা সে শক্তিশালী হইয়া উঠিল। শক্তিশালী হইয়া সে তোমার উপর অত্যাচার আরম্ভ করিল, মারামারি আরম্ভ করিল। এই ভাবে অরাজকতার উৎপত্তি হইল। সমাজের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা যদি নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন না করে, তাহা হইলে অরাজকতা উপস্থিত হয়। হিন্দুরা যদি তাহাদের কর্ত্তব্যপালনে বিমুখ হয়, মুসলমান অথবা শিখরা যদি তাহাদের কর্ত্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হয়, তাহা হইলে যে সেই কর্ত্তব্য পালন করিবে, সমাজধর্ম্ম বা সমাজশক্তি তাহাকে আশ্রয় করিবে; যে কর্ত্তব্য পালন করিবে না, সে দুর্ব্বল হইবে, প্রবলের দ্বারা সে প্রপীড়িত হইবেই হইবে, কেহ তাহাতে বাধা দিতে পারিবে না। এই ভাবে সমাজে অরাজকতা উপস্থিত হয়, ইহাই প্রাচীন কাহিনী। অরাজকতা যখন উপস্থিত হয়, সর্ব্বংসহা ধরিত্রী সেই অধর্ম্মের ভার সহ্য করিতে পারেন না, তখন

বলিলেন, এই অরাজকতার ভার হইতে আমাকে তুমি মুক্তি দান কর। তখন ব্রহ্মা ধ্যানস্থ হইলেন। ধ্যানস্থ হইয়া কতকগুলি আইনের সৃষ্টি করিলেন, এই ভাবে "ল"এর সৃষ্টি হইল, জীবের কল্যাণকামনায় সমাজস্থিতির জন্য ব্রহ্মা ধ্যানস্থ হইয়া, ভবিষ্যৎ দর্শন করিয়া, স্বত্ব বা রাইট মানস দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করিয়া কতকগুলি আইন রচনা করিলেন। শাস্ত্রকারেরা "রচনা" বলেন নাই, বলিয়াছেন—কতকগুলি বিধি "সৃষ্টি" করিলেন। সৃষ্টি করিলেই হয় না, আইন চালাইবে কে, আইনের পরিচালক চাই, সেই জন্য আইন সৃষ্টি করিয়া ব্রহ্মা আপনার মানসপুত্র সৃষ্টি করিলেন, যিনি প্রথম রাজা হইলেন। কি সুন্দর ব্যবস্থা! আমাদের নীতিশাস্ত্রমতে আইন আগে, রাজা পরে। প্রজা যেমন আইনের বশীভূত, রাজাও তেমনই বশীভূত, এক আইন, এক বিধি দ্বারা রাজা প্রজা উভয়েই শাসিত। প্রজা যে বিধি মানিয়া চলিবে, রাজাকেও সেই বিধি মানিয়া চলিতে হইবে। রাজা বিধি সৃষ্টি করেন নাই। বিধি ব্রহ্মার সৃষ্টি, ইহা ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। আজকাল, ধরুন, বিলাতে কি ব্যবস্থা দেখিতে পাই? পার্লেমেণ্ট যে আইন পাশ করেন, তাহাতে রাজার সহী চাই, 'এসেণ্ট' চাই। তিনি তাহা অনুমোদন করিতেও পারেন, না-ও করিতে পারেন। আইন রচনা করিবার উপর রাজার যদি হাত থাকে, তাহা হইলে কি হয়? রাজা ইচ্ছামত—আপন খুসীমত আইন করিবেন, তাহাতে প্রজার উপর অত্যাচার হইতে পারে। হিন্দুধর্ম্মমতে আইন করিয়াছেন বিধাতা পুরুষ বা ব্রহ্মা এবং সেই আইন চালাইবার জন্য সেই আইন, বিধান বা সেই ধর্ম্মশাস্ত্র অনুযায়ী সমাজশাসন ও সমাজ রক্ষা করিবার জন্য রাজার প্রয়োজন আছে। সেই রাজা কে? ব্রহ্মার মানসসৃষ্টি, ব্রহ্মার মন হইতে যে রাজবিধান এবং সমাজবিধানের প্রতিষ্ঠা হইল, সে এই বিধান অনুযায়ী শাসন করিবে। ইহাই প্রাচীন কাহিনী।

এই কাহিনীর অন্তরালে একটা বিরাট সত্য রাষ্ট্রনীতির মূলসূত্রস্বরূপ বিদ্যমান আছে। সেই সত্যটা এই,—রাষ্ট্রনীতির দুই অঙ্গ;—(১) কর্ম্মাঙ্গ বা শাসনাঙ্গ (২) বিধানাঙ্গ। একটি 'একজিকিউটিভ' আর একটি 'লেজিস্লেটিভ ফাঙ্কসান।' যাহাতে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সংপ্রসারণ হয়, যাহাতে রাজার যথেচ্ছাচার সংযত হয়, সেই উদ্দেশ্যে সমাজবিকাশের ধাপে কর্ম্মাঙ্গ এবং বিধানাঙ্গ পৃথক্ হইয়া গিয়াছে। এক সময় তাহা ছিল না। যথেচ্ছাচারশাসন যেখানে আছে, সেখানে তাহা নাই, সেখানে প্রজা-প্রতিনিধিসভা নাই, যখন যাহা ইচ্ছা, রাজা তাহাই জারী করিতে পারেন। স্বেচ্ছাচার-শাসিত রাজ্যে চিরদিন তাহাই হইয়া আসিয়াছে। রাজধর্ম্মপরিচালনের জন্য রাজস্বের প্রয়োজন; সুতরাং রাজকার্য্যের প্রয়োজন হিসাবে রাজস্ব নির্দ্ধারিত হইবে। স্বেচ্ছাচার রাজ্যে রাজা আপন খেয়ালমত, সুখভোগ বা বিলাসব্যসনের প্রয়োজনমত রাজস্ব পরিমিত করিতেন; যাহার কাছে যাহা পাইতেন, লুণ্ঠন করিয়া লইতেন। যতই প্রজার স্বত্ব-স্বার্থ সম্প্রসারিত হইতে লাগিল, ততই কর্ম্মাঙ্গ এবং বিধানাঙ্গ পৃথক্ হইয়া গেল। বহু দিন পূর্ব্বে ইংলণ্ড প্রভৃতি যে সকল দেশে আধুনিক প্রজাতন্ত্রশাসন প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহারা যখন কল্পনাও করিতে পারে নাই, 'লেজিস্লেটিভ' এবং 'একজিকিউটিভ' এই দুই 'ফাঙ্কসান' পৃথক্ হওয়া উচিত, তখন আমাদের প্রাচীন নীতিশাস্ত্র সেই বিভাগ করিয়া গিয়াছেন। আমাদের প্রাচীন নীতিশাস্ত্র আলোচনা করিতে হইলে, আমাদের সাধনায় পলিটিক্স্ কি জিনিষ ছিল, বুঝিতে হইলে প্রথমেই বুঝিতে হইবে পলিটিক্সের প্রয়োজন মোক্ষ। দ্বিতীয়তঃ বুঝিতে হইবে, পলিটিক্সের অভিধেয়—রাজশক্তি এবং প্রজামণ্ডলী ইহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ নির্ণয় করা এবং সেই সম্বন্ধ যাহাতে উভয়ের ধর্ম্মের অনুমোদিত হয়, উভয়ের মুক্তির অনুমোদিত হয়, সেই ভাবে তাহা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। ইহাই রাষ্ট্রনীতির মূল লক্ষ্য। ইহা করিতে যাইয়া, প্রজার স্বত্ব-স্বার্থকে স্বেচ্ছাচারী রাজশক্তির প্রতিকূলে রক্ষা করিতে যাইয়া 'লেজিস্লেটিভ' এবং 'একজিকিটিভ ফাঙ্কসান' পৃথক্ করা হইয়াছে। মনে রাখিতে হইবে, আইন রাজা করেন নাই, তাহা ব্রহ্মার কৃত, অপৌরুষেয়। নিসর্গের আইন যেমন সৃষ্টিকর্ত্তা করিয়া দিয়াছেন, নিসর্গের পরস্পরের ভিতর যে সম্বন্ধ তাহাকে সুরক্ষিত করিবার জন্য তিনি যেমন আইন করিয়া দিয়াছেন, তেমনই সমাজের ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি এবং সমাজের সমষ্টিভূত রাজশক্তির মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহাও বিধাতা পুরুষ সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন। এই জন্য পলিটিক্সের আলোচনা বা অনুশীলন মোক্ষধর্ম্মের অন্তর্গত।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

# কোনার্ক

কপিল-সংহিতাতে যে চারিটি ক্ষেত্রের উল্লেখ আছে, তাহার মধ্যে কোনার্ক একটি। ইহার অপর নাম সূর্য্য, অর্ক, রবি বা পদ্মক্ষেত্র। পুরী হইতে সাড়ে ১০ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বদিকে ইহা অবস্থিত; সমুদ্র হইতে ১ ক্রোশমাত্র ব্যবধান। চন্দ্রভাগা নামক একটি শুষ্ক নদীর খাত ইহার উত্তরদিকে অবস্থিত। পুরী হইতে গো-যানে বালুকা-প্রান্তরের মধ্য দিয়া যাইলে কোনার্ক পৌছিতে ১০।১২ ঘণ্টা সময় লাগে। এখন মোটর-গাড়ীর সাহায্যে যাইবার সুবিধা হইয়াছে। এখানে পাল্কীর সাহায্যেও যাওয়া যায়।

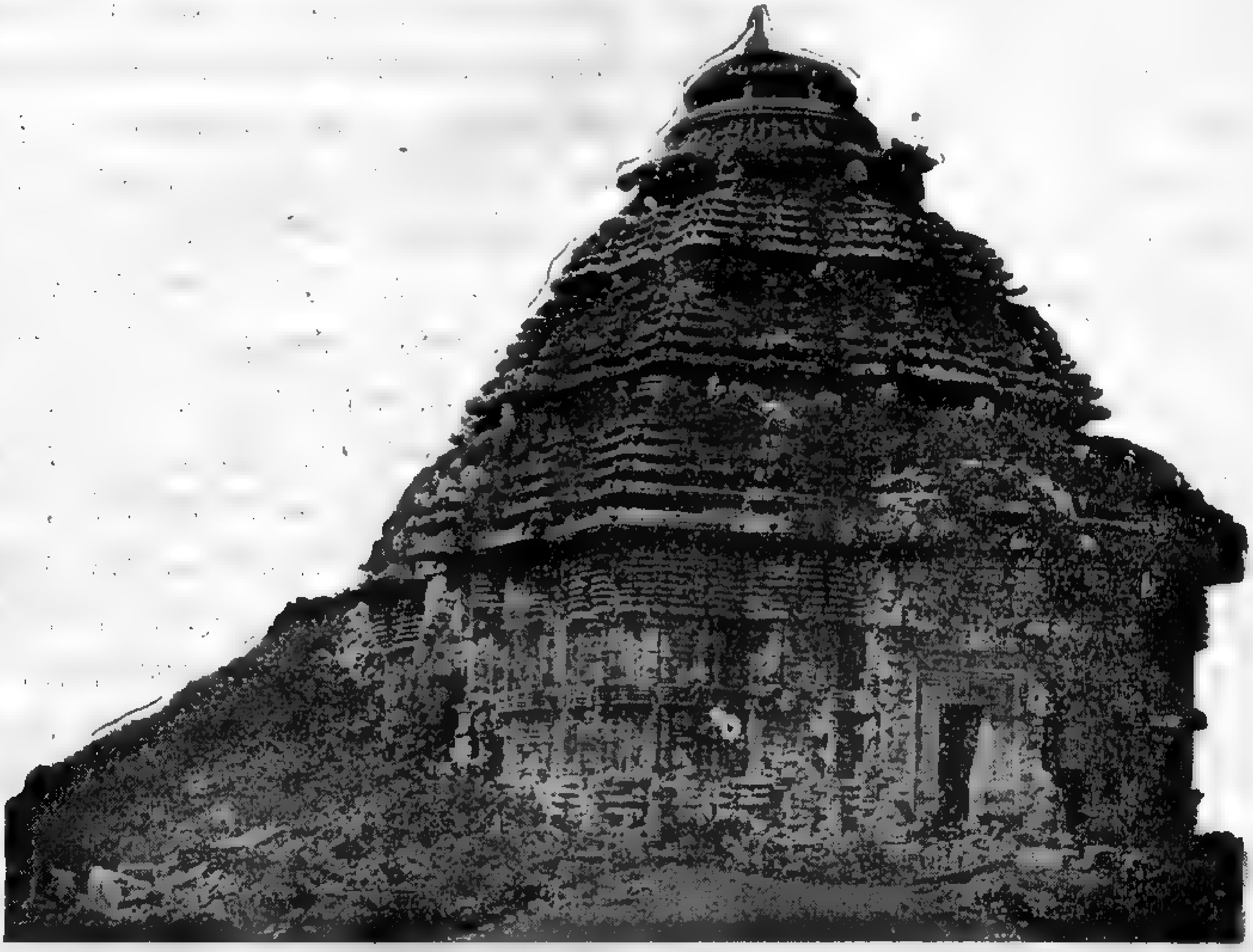

কোনার্ক

এই ক্ষেত্রে সূর্য্যদেবের একটি সুবৃহৎ সৌষ্ঠব-সম্পন্ন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ প্রাচীন আর্য্যকীর্ত্তির চিহ্নস্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে। পুরাণকথিত প্রবাদ এই যে, শ্রীকৃষ্ণের পুত্র শাম্ব নারদের কৌশলে পিতা কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া এই স্থানে আগমন করেন এবং সূর্য্যের উপাসনা করিয়া শাপমুক্ত হয়েন। তিনি চন্দ্রভাগায় স্নান করিবার সময়ে নদীমধ্যে সূর্য্যমূর্ত্তি প্রাপ্ত হন এবং তাহার প্রতিষ্ঠার জন্য এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন।

কপিল-সংহিতাতে এই ক্ষেত্রে অবস্থিত অনেকানেক দেব-মন্দিরের বর্ণনা আছে, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে এই এক সূর্য্য-মন্দিরের ভগ্নাবশেষ ভিন্ন অপর কোনটির বিশেষ সন্ধান পাওয়া যায় না।

কোনার্কের সূর্য্যমন্দির বিমান, জগমোহন ও ভোগ-মণ্ডপ এই তিন অংশে বিভক্ত। জগমোহন ও ভোগ-মণ্ডপের মধ্যস্থলে নাটমন্দির নাই, কিন্তু উহার পরিবর্ত্তে এক খণ্ড উন্মুক্ত ও বিস্তৃত ভূমি পড়িয়া রহিয়াছে। বিমানের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। অল্পদিন হইল, ইহার কিয়দংশমাত্র মৃত্তিকার মধ্য হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে। ইহার পশ্চিমদিকে একখানি প্রস্তর-নির্ম্মিত বেদী বা সিংহাসন দৃষ্টিগোচর হয়। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন যে, এই বেদীর উপরে এক সময়ে

সূর্য্যমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। বিমানের প্রস্তর-নির্ম্মিত ভিত্তির গাত্রে অতি সুন্দর কারুকার্য্যসম্পন্ন ২৪ খানি রথচক্র ক্ষোদিত রহিয়াছে, দেখা যায়। অনুমান এই যে, এইগুলি সূর্য্যদেবের রথের চক্ররূপে তথায় অবস্থিতি করিতেছে। বিমানের প্রাচীরের অন্তঃস্থলে তিনটি বৃহদাকার সূর্য্য-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত থাকিতে দেখা যায়। মধ্যের মূর্ত্তি বীরবেশে সজ্জিত ও অশ্বারূঢ়; ইহার দুই পার্শ্বে দুইটি ভগ্ন পুরুষমূর্ত্তি অবস্থিত।

পুরীমন্দিরের ইতিবৃত্তমধ্যে উল্লিখিত আছে যে, দেবদ্বেষী কালাপাহাড় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে কোনার্ক আক্রমণ করিয়া সূর্য্য-মন্দির ভূমিসাৎ করিবার চেষ্টা করে। একবারে ভূমিসাৎ করিতে সমর্থ না হইলেও মন্দির ভাঙ্গিয়া এবং নানা প্রকারে স্থান অপবিত্র করিয়া কালাপাহাড় দেবমন্দিরের বহুমূল্য সম্পদ সংগ্রহ করিয়া ঐ স্থান পরিত্যাগ করে। মন্দির এইরূপে ভগ্ন ও কলুষিত হইবার পর হিন্দুগণও উহা দেবস্থান বলিয়া পুনর্ব্বার ব্যবহার করে নাই এবং তদবধি ইহা এই ধ্বংসাবস্থায় পতিত রহিয়াছে।

বিমানের সম্মুখেই জগমোহন। ইহার ছাদ ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। ইহার প্রস্তরময় প্রাচীরে অনেকানেক স্ত্রীমূর্ত্তি এবং বিবিধ বাদ্যযন্ত্র ক্ষোদিত রহিয়াছে। ইহার চতুর্দ্দিকে চারিটি দ্বার; মধ্যের দরজার শিরোদেশে শিবমূর্ত্তি অবস্থিত। জগমোহনের কারুকার্য্য অতি সুন্দর ও সূক্ষ্ম। পূর্ব্বদিকের দ্বারের উপরিভাগে নবগ্রহের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত।

জগমোহনের সম্মুখভাগে কিয়দ্দূরে ভোগমণ্ডপ অবস্থিত। ইহার চারিদিকেই উপরে উঠিবার সোপানাবলী আছে। ইহার পূর্ব্বদিকে দুইটি বৃহদাকৃতি প্রস্তরের সিংহমূর্ত্তি বালুকার মধ্যে অর্দ্ধ-প্রোথিতাবস্থায় অবস্থিত থাকিতে দেখা যায়। ভোগমণ্ডপের প্রাচীরের গাত্রে বিস্তর প্রস্তরমূর্ত্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে এবং ইহার মেঝের উপর অনেক প্রস্তরমূর্ত্তি রক্ষিত হইয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে সূর্য্য, বিষ্ণু, গঙ্গা, অগ্নি, মহিষমর্দ্দিনী, জগন্নাথ প্রভৃতি দেবমূর্ত্তি এবং সীতার বিবাহ প্রভৃতি পৌরাণিক ঘটনা-ক্ষোদিত প্রস্তরফলকসমূহ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

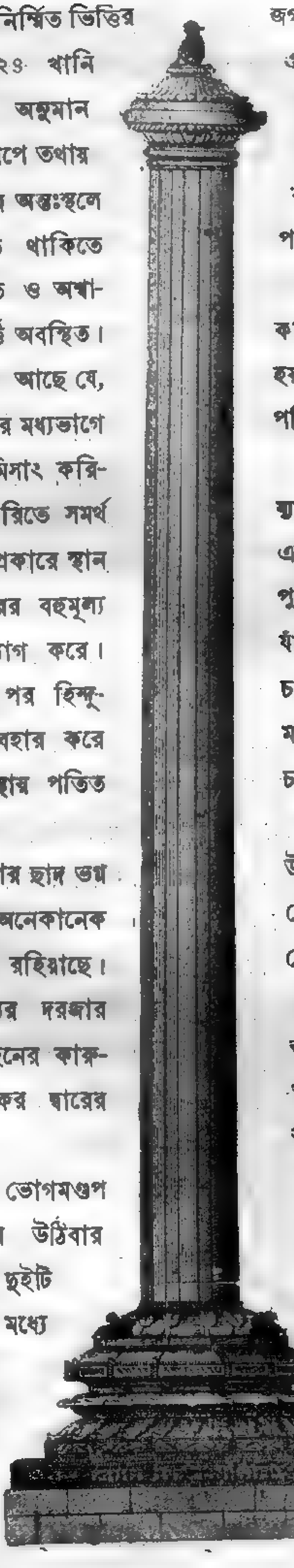

অরুণস্তম্ভ

সূর্য্য-মন্দিরের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে রামচণ্ডী বা মায়াদেবীর মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

উড়িষ্যার রাজা প্রথম নৃসিংহ দেবের রাজত্বকালে (১২৭৮ খৃষ্টাব্দে) এই সূর্য্য-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতিহাসে তিনিই ইহার নির্ম্মাণকর্ত্তা বলিয়া পরিচিত।

আইন-ই-আকবরীতে উল্লিখিত আছে যে, উড়িষ্যার বার বৎসরের রাজস্ব ব্যয় করিয়া কোনার্কের এই সূর্য্য-মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। সে সময়ে পুরীর বার্ষিক রাজস্ব তিন ক্রোর টাকা ছিল। যাঁহারা ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যবিদ্যা সূক্ষ্ম বিচারকের চক্ষু দ্বারা দৃষ্টি করিতে সমর্থ, তাঁহারা যে এই মন্দিরের বিশালতা, সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইবেন, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

গভর্ণমেন্ট প্রায় এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া উড়িষ্যার এই প্রাচীন কীর্ত্তির সংস্কারসাধন করিয়াছেন। ভারতবাসী হিন্দুমাত্রেই ইহার জন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট কৃতজ্ঞ।

*পুরীর শ্রীমন্দিরের সিংহদ্বারের সম্মুখে যে অরুণস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহা মহারাষ্ট্রীয়গণ কর্ত্তৃক অষ্টাদশ শতাব্দীতে কোনার্ক হইতে পুরীতে স্থানান্তরিত হইয়াছিল।

## চিল্কা

যাঁহারা পুরী গমন করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই চিল্কা-হ্রদ না দেখিয়া ফিরিয়া আইসেন না। তীর্থ হিসাবে তথায় কিছু না থাকিলেও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগের জন্য মধ্যে মধ্যে তথায় অনেক লোকের সমাগম হয়।

এই হ্রদ উড়িষ্যার পূর্ব্ব-উপকূলে সমুদ্রতটে অবস্থিত। মাদ্রাজের রেলগাড়ী

চিল্কা-হ্রদের পশ্চিম তীর দিয়া দক্ষিণাভিমুখে গমন করে। রেলগাড়ীতে যাইবার সময় বহু দূর পর্য্যন্ত চিল্কা-হ্রদের দৃশ্য নয়ন-পথে পতিত হয়। রেললাইনের এক দিকে উত্তুঙ্গ ঘন-পাদপরাজি-বেষ্টিত ঘাট-শৈলমালা, অপর দিকে চিল্কা-হ্রদের বাত্যা-সংক্ষুব্ধ বহুবিস্তৃত ধূসর বর্ণের জলরাশি পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

চিল্কা দেখিতে হইলে রম্ভা নামক রেলওয়ে ষ্টেশনে অবতরণ করিতে হয়। ষ্টেশন হইতে চিল্কা বেশী দূর নহে এবং এখানে বিশ্রাম করিবার স্থানের ব্যবস্থা আছে। এক দিনের মত খাদ্যদ্রব্যাদি সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলে কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না।

চিল্কা হ্রদ দৈর্ঘ্যে প্রায় ২২ ক্রোশ এবং বঙ্গোপসাগরের উত্তর-পশ্চিম উপকূলে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। হ্রদের উত্তরাংশ, দক্ষিণাংশ অপেক্ষা অধিক বিস্তৃত। কোন কোন স্থানে উত্তরাংশের প্রস্থ প্রায় ১০ ক্রোশব্যাপী,কিন্তু দক্ষিণাংশ প্রস্থে কোথাও ২৷৷০ ক্রোশের অধিক নহে। ইহা একটি অতি-বিস্তৃত স্বল্প-গভীর জলাশয়; ইহার গভীরতা কোন স্থানেই ৪ হাতের অধিক নহে। একটি বহু বিস্তৃত উচ্চ বালির বাঁধ ইহাকে সমুদ্র হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে। এক সময়ে যে এই হ্রদ সমুদ্রের অধিকারভুক্ত ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কালে নৈসর্গিক ঘটনাসূত্রে বালুকারাশি এক স্থানে স্তূপীকৃত হইয়া প্রাচীরের আকারে সমুদ্রের অখণ্ড জলরাশিকে খণ্ডীভূত করিয়া এই বিপুল হ্রদের সৃষ্টি করিয়াছে। শুনিলাম, বালুকাময় প্রাচীরের মধ্য দিয়া সমুদ্রের সহিত এই হ্রদের যোগ আছে। বৎসরের অধিকাংশ সময় এই হ্রদের জল সমুদ্রজলের ন্যায় লবণাক্ত থাকিলেও, স্থানীয় লোকের মুখে অবগত হইলাম যে, বর্ষার পরে হ্রদের জলের লবণাক্ত দোষ কাটিয়া যায়, এমন কি, তখন ঐ জল পান করিবার উপযুক্ত হয়। আমি গ্রীষ্মকালে যখন হ্রদ দেখিতে গিয়াছিলাম, তখন হ্রদের জল ব্যবহারের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ছিল এবং দেখিতেও পরিষ্কৃত ছিল না। হ্রদের তীরে যাইয়া একটা অপ্রীতিকর 'আঁসটে' গন্ধ অনুভূত হইয়াছিল। সে সময়ে বায়ুসংযোগে অপার জলরাশিমধ্যে তরঙ্গমালা উত্থিত হইয়া হ্রদটি সমুদ্র বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল।

আমরা নৌকা সংগ্রহ করিয়া তীর হইতে বহু দূরে গমন করিয়াছিলাম। জলবিহারের ইচ্ছা থাকিলে পূর্ব্ব হইতে নৌকার ব্যবস্থা করিতে হয়। হ্রদের মধ্যে ৪।৫টি হরিদ্বর্ণ বৃক্ষলতা-শোভিত মনোরম ক্ষুদ্র দ্বীপ অবস্থিত আছে। এই সকল দ্বীপে মনুষ্যের বাস নাই। আমরা কোন দ্বীপে নামিতে সাহস করি নাই। দ্বীপগুলি শরবনে আবৃত, ব্যবসায়ীরা মধ্যে মধ্যে নৌকায় আসিয়া এই স্থান হইতে শর সংগ্রহ করে। এই দ্বীপশ্রেণীর মধ্যে পারিকুদ্ নামক দ্বীপপুঞ্জ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহা বিবিধ পাদপরাজিতে পরিপূর্ণ এবং নানা জাতীয় সুকণ্ঠ বিবিধ বর্ণে চিত্রিত পক্ষিকুল তথায় বাস করে। অন্য দ্বীপ হইতে ইহা আকারে অনেক বড় এবং দৃশ্যে অতীব রমণীয়।

চিল্কায় বিস্তর মাছ আছে। ধীবররা নৌকাসাহায্যে জাল ফেলিয়া মাছ সংগ্রহ করে। মাছ এখানে খুব সস্তা দরে কিনিতে পাওয়া যায়। ছোট চিংড়ি অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে হ্রদের মধ্যে জন্মে।

এই হ্রদ ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বতমালার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি রমণীয় ও চিত্তাকর্ষক। কথিত আছে যে, ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব এই স্থানে প্রকৃতির স্নিগ্ধ, শান্ত, নয়ন-মনোরম দৃশ্য দর্শন করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া হ্রদের জলে পতিত হইয়াছিলেন।

শ্রীচুণীলাল বসু।

# বিশ্ব-তীর্থ

যখন মগন সকল ভুবন মোহের অন্ধকারে,
প্রথম উষার আলোক ভাতিল ভারত-গগন-দ্বারে,
তাহারি পূজার অর্ঘ্য হইয়া কুসুম মেলিল আঁখি,
তাহারি প্রাণের ভকতি বহিয়া বিহগ উঠিল ডাকি',
সকল জগৎ চমকি চাহিল, পুলকে তাহারি মহিমা গাহিল,
তাহারি মন্ত্র মাগিয়া মানিল কৃতার্থ আপনারে।

সারা জগতের তীর্থ যে দেশ, সারা ভুবনের গুরু,
আজি সে সবার পিছনে পড়িয়া,—হিয়া কাঁপে দুরু দুরু,
যে আপন আলোকে উজলি' পন্থা দেখাল সকল নরে,
হায় আপনার পথ আপনি আজি সে খুঁজে খুঁজে শুধু মরে,
আপনার প্রতি নাহি বিশ্বাস, আছে শুধু তার শেষ নিশ্বাস,
হরি দাও পথ দাও, নাও ডেকে নাও এই বিপদের পারে।

৺শরদিন্দুনাথ রায়।

# কারেন্সি কমিশন

গত মাসে হিল্টন-ইয়ং কারেন্সি কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। যুদ্ধের পর বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারতের প্রচলিত মুদ্রা 'টাকা'র বিনিময়-মূল্য অত্যন্ত অনিশ্চিত হইয়া পড়ে। তাহার প্রতিক্রিয়াফলে ভারতীয় পণ্যের মূল্য ঘন ঘন বিপর্য্যস্ত হইতে থাকে। সেই জন্য ব্যবসায়-বাণিজ্যের বিলক্ষণ অসুবিধা ঘটিতে এবং সময়ে সময়ে অত্যন্ত ক্ষতি হইতেও থাকে। ভারতে এই ক্ষতি নিতান্ত অল্পকাল আরব্ধ হয় নাই। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ হইতেই বৈদেশিক বাণিজ্যে টাকার সহিত বিলাতী সভীরেণের বিনিময়ের হার বিপর্য্যস্ত হইতে আরম্ভ হয়। যে কারণে এই বিনিময়ের হার বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়, তাহার জন্য ভারতবাসী বিন্দুমাত্রও দায়ী নহে। ইংলণ্ড এবং য়ুরোপের আর কতকগুলি উন্নত দেশের ন্যায় ভারতেও অতি প্রাচীনকাল হইতে সুবর্ণের এবং রৌপ্যের মুদ্রা প্রচলিত ছিল। ভারতে সুবর্ণের মূল্য রৌপ্যের মূল্যের প্রায় ১৫ গুণ ছিল। য়ুরোপীয় দেশগুলিতেও সুবর্ণের ও রৌপ্যের মূল্যগত তারতম্য প্রায় এইরূপই ছিল। সুতরাং অতি পূর্ব্বকালে বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারতীয় মুদ্রার বিনিময়গত হার লইয়া কোন গোলই উঠিত না।

য়ুরোপে নেপোলিয়ানের সহিত যুদ্ধ এবং অন্যান্য হাঙ্গামা মিটিয়া যাইলে পর ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ সরকার বিলাতে রজতকে মুদ্রার আসন হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া কেবল সুবর্ণকে মৌদ্রিক ধাতুরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন অর্থাৎ ঐ সময়ে বৃটেনে সভারেণই দেনা-পাওনার বৈধ মুদ্রা (legal tender) বলিয়া গণ্য এবং রজতমুদ্রা সিলিং সঙ্কুচিত হইয়া * সভারেণেরই ভগ্নাংশ মুদ্রা বা খুচরা মুদ্রা বলিয়া চলিত হয়। ভারতে তখন পর্য্যন্তও দুই ধাতুর মুদ্রাই প্রচলিত ছিল। কিন্তু অতঃপর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা উহা অত্যন্ত অসুবিধাজনক বলিয়া অনুযোগ করিতে আরম্ভ করেন। সেই সময়ে ভারতে সুবর্ণ-মুদ্রা প্রচলিত করা কর্ত্তব্য কি না, তাহা লইয়া তর্ক উঠিয়াছিল। শেষে সাব্যস্ত হয় যে, তখন মাদ্রাজ অঞ্চলে প্রচলিত এক তোলা ওজনের রৌপ্য-মুদ্রাই ভারতের সর্ব্বত্র দেনাপাওনায় বৈধ মুদ্রা বলিয়া প্রচলিত হইবে এবং সুবর্ণ-মুদ্রাকে আর বৈধভাবে প্রচলিত মুদ্রা বলিয়া গণ্য করা হইবে না। কিন্তু তাহা হইলেও কোম্পানীর টাঁকশালে সুবর্ণ-মোহর প্রস্তুত করিবার কোন বাধা ছিল না। উহা কোম্পানীর টাঁকশালে প্রস্তুত হইয়া জনসমাজে ক্রয়বিক্রয় কার্য্যে মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হইত। ভারতের এবং বৃটেনের মুদ্রায় ধাতুগত পার্থক্যের ইহাই প্রারম্ভ।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মোটামুটি বিলাতী সুবর্ণ-মুদ্রার সহিত ভারতীয় রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ব্যাপারে বিশেষ কোন বিভ্রাট উপস্থিত হয় নাই। ইতোমধ্যে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ভারতস্থ য়ুরোপীয় বণিকরা এবং ভারতীয় নেতৃবর্গ সরকারের নিকট ভারতে সুবর্ণ-মুদ্রা প্রচলিত করিবার জন্য এক আবেদনপত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। সরকার কিন্তু ভারতে সুবর্ণ-মুদ্রা প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা বা হৈমমুদ্রাশালা (gold mint) প্রতিষ্ঠিত করেন নাই। তাঁহারা সরকারী আফিসের এবং পেপার কারেন্সির কর্তৃপক্ষকে কেবলমাত্র ১০ দশ টাকা মূল্যে সভারেণ গ্রহণ করিবার অনুমতি দিয়া এক ইস্তাহার প্রচার করিয়াছিলেন। এই সময়ে সরকার তদানীন্তন রাজস্বসচিব মিষ্টার লেংএর পরামর্শ অনুসারে মুদ্রাব্যাপারে যেন কতকটা অনিশ্চিত নীতি অবলম্বন করেন। ভারতে সুবর্ণ-মুদ্রা প্রচলনে সরকারের অরুচি প্রকাশ পায়। তদানীন্তন ভারতসচিব সার চার্লস্ উড হৈম-মুদ্রাকে বৈধ মুদ্রা (legal tender) করিতে অসম্মত হয়েন। কিন্তু তাহা হইলেও তিনি তর্ক-যুক্তির দ্বারা এ কথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, "বহুকাল ধরিয়া ভারতে যে রীতি প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, তদনুসারে সরকার তাহাদের খাজনা-খানায় একটা নির্দ্দিষ্ট হারে সুবর্ণ-মুদ্রা গ্রহণ করিতে পারেন। সরকার সেই হার নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন।"

কিন্তু এ ব্যবস্থা অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। রূপার দর নানা কারণে হ্রাস পাইতে থাকায় সরকার ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে সভারেণের মূল্য ১০ টাকা ৪ আনা এবং অর্দ্ধ-সভারেণের মূল্য ৫ টাকা ২ আনা ধার্য্য করিয়া দেন।

---

(১) সিলিঙের ওজন কমাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

ইহাই বাটা-বিভ্রাটের প্রারম্ভ। এই সময় হইতে এ কাল পর্য্যন্ত সরকারের অবলম্বিত মুদ্রানীতির ফলে ভারতবাসীর যে কত ক্ষতি ও কত লোকসান হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। কারণ, এই সময় হইতে প্রায় ক্রমাগতই রজতের মূল্য কমিতে থাকে। ক্বচিৎ কখনও রৌপ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে সত্য, কিন্তু অধিকাংশ সময়েই রজতের মূল্য যে অধোগত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সরকার যদি এই সময়েও ভারতে সুবর্ণ-মুদ্রা প্রচলিত করিতেন, তাহা হইলে ভারতবাসীকে কখনই এই দারুণ ক্ষতি সহ্য করিতে হইত না।

এই ক্ষতির পরিমাণ কিরূপ হইয়াছে, তাহা টাকার বিনিময় মূল্য হ্রাসের ইতিহাস হইতে জানিতে পারা যায়। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত টাকার এই বিনিময় মূল্য কি ভাবে হ্রাস পাইয়াছে, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদান করিলাম। ইহার পর টাকার মূল্য ১ শিলিং ৪ পেন্সে দাঁড়ায়।

| খৃষ্টাব্দ | টাকার বিনিময় মূল্য |
|---|---|
| ১৮৬৩-৬৪ | ১ শিলিং ১১ পেন্স ৩॥০ ফার্দিং |
| ১৮৬৭-৬৮ | ১ ” ১১ ” ॥০ ” |
| ১৮৭১-৭২ | ১ ” ১১ ” ॥০ ” |
| ১৮৭৫-৭৬ | ১ ” ৯ ” ২॥০ ” |
| ১৮৭৯-৮০ | ১ ” ৮ ” ০ ” |
| ১৮৮৩-৮৪ | ১ ” ৭ ” ২ ” |
| ১৮৮৭-৮৮ | ১ ” ৪ ” ৩॥০ ” |
| ১৮৮৮-৮৯ | ১ ” ৪ ” ১॥০ ” |
| ১৮৯০-৯১ | ১ ” ৬ ” ॥০ ” |
| ১৮৯১-৯২ | ১ ” ৪ ” ৩ ” |
| ১৮৯২-৯৩ | ১ ” ৩ ” ০ ” |
| ১৮৯৩-৯৪ | ১ ” ২ ” ২ ” |
| ১৮৯৪-৯৫ | ১ ” ১ পেনী ॥০ ” |
| ১৮৯৫-৯৬ | ১ ” ১ ” ২ ” |
| ১৮৯৬-৯৭ | ১ ” ২ পেন্স ২ ” |
| ১৮৯৭-৯৮ | ১ ” ১ পেনী ১॥০ ” |
| ১৮৯৮-৯৯ | ১ ” ৪ পেন্স ০ ” |

পাঠক দেখুন, ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দ হইতে টাকার মূল্য প্রায় ২ শিলিং ছিল, তাহার পর ইহা ক্রমশঃ ধীরে ধীরে কমিতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ হইতে ইহা দ্রুত কমিতে থাকে। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে টাকার মূল্য প্রায় ১ শিলিংএ আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ভারতকে বহু কোটি টাকা বিদেশে পাঠাইতে হয়। বিলাতের হোম চার্জ্জ, বিলাত হইতে আমদানী পণ্যের মূল্য,—রেলওয়ে প্রভৃতির সাজ-সরঞ্জাম খরিদ প্রভৃতি বাব সেই জন্ত ভারতকে প্রায় কোন কোন বৎসর দ্বিগুণ টাক দিতে হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহার জন্ত সরকারকে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে এই দরিদ্র দেশের অধিবাসীর উপর কত কর বসাইতে হইয়াছে; ভারতের ঋণ-পরিমাণ কত বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার হিসাব দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। এক সময়ে ভারতের ভূতপূর্ব্ব অর্থ-সচিব মিঃ ওয়েষ্টল্যাণ্ড ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় দাঁড়াইয়া জমা-খরচ মিলাইবার কোন পথ দেখিতে না পাইয়া, “টাকা, টাকা, টাকাই আমার গানের একমাত্র ধুয়া” ( money, money, money is the burden of my song ) বলিয়া দিগ্‌বধূকে মুখরা করিয়া তুলিয়াছিলেন। লর্ড ডাফরিণের আমলে লবণ, পেট্রোলিয়াম প্রভৃতির উপরও কর ধার্য্য করা হইয়াছিল। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারী তারিখে লর্ড ডাফরিণ ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন, Since my arrival in India, owing to the depreciation of silver, the annual accumulative loss to the Government has progressively increased year by year by a million pounds sterling অর্থাৎ “আমি ভারতে আসিবার পরে, রৌপ্যের মূল্য-হ্রাস হেতু সরকারের ক্ষতির পরিমাণ প্রতি বৎসর বৃদ্ধি পাইয়া ক্রমশঃ ১০ লক্ষ পাউণ্ডে ( দেড় কোটি টাকার উপরে ) পরিণত হইয়াছে।” ইহার উপর ঐ সময়ে এই দরিদ্র ভারতবাসীর নিত্য প্রয়োজনীয় লবণ, কেরাসিন প্রভৃতির উপর মাশুল বসান হইয়াছিল। সুতরাং এই মুদ্রামূল্য হ্রাসের ফলে মূক জনসাধারণের ক্ষতি ও কষ্ট অল্প হয় নাই। অতএব মুদ্রামূল্য হ্রাসে যে ভারতের লাভ, ইহা কখনই বলা যাইতে পারে না।

এখন দেখিতে হইবে, যে সময়ে মুদ্রার বিনিময় মূল্য হ্রাস পাইয়াছিল, সেই সময়ে বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর উহার প্রভাব কিরূপ হইয়াছিল। এ কথা সহজেই বুঝা যায় যে, টাকার মূল্য যদি হ্রাস পায়, তাহা হইলে দেশের রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়, কিন্তু আমদানী বাণিজ্য সঙ্কুচিত হয়।

তাহার কারণ, টাকা সস্তা হওয়াতে বিদেশে ভারতজাত পণ্য সস্তা এবং বিদেশ হইতে আমদানী পণ্য মহার্ঘ্য হইবেই হইবে। পণ্য স্বল্পমূল্য হইলে উহার কাট্‌তি অধিক হয়, আর দুর্ম্মূল্য হইলে উহার কাট্‌তি কমিয়া যায়, ইহাই মোটামুটি সাধারণ নিয়ম। পক্ষান্তরে, যদি বিদেশী মুদ্রার সহিত বিনিময়ে টাকার মূল্য বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে রপ্তানী বাণিজ্য সঙ্কুচিত এবং আমদানী বাণিজ্য প্রসৃত হইয়া পড়ে। কারণ, বিদেশে দেশীয় ( ভারতজাত ) পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি এবং বিদেশ হইতে স্বদেশে আমদানী পণ্য হ্রাস পায়। ইহাই মোটামুটি আমদানী এবং রপ্তানী বাণিজ্যের হ্রাস বৃদ্ধির একটা প্রবল কারণ। মত, বুদ্ধি এবং বিবেচনা অনুসারে এই নিয়মকে উপেক্ষা করা যায় না।

কিন্তু তাহা হইলে এ কথাও স্বীকার করিতেই হইবে যে, আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্যের হ্রাস-বৃদ্ধি-নিয়ন্ত্রণের উহাই একমাত্র কারণ নহে। উহার আরও বহু কারণ বিদ্যমান। এ ক্ষেত্রে সেই সকল কারণ আলোচনা করিয়া প্রবন্ধকে অতিরিক্ত ভারাক্রান্ত করিতে চাহি না। তবে এইমাত্র বলিতে পারি, সেই কারণ-সমূহের কতকগুলি কারণ স্থায়ী, আর কতকগুলি কারণ অস্থায়ী। ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য-সম্পর্কিত ব্যাপারে সেই ভিন্ন কারণগুলি সমস্ত বা উহার কতকগুলি বিদ্যমান আছে কি না, তাহাও দ্রষ্টব্য। কিন্তু তাহা দেখা সহজ নহে। কারণ, পৃথিবীর সকল দেশেই ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য বিস্তৃত; সকল দেশের অবস্থাও সমান নহে। এরূপ ক্ষেত্রে ভারতে মুদ্রামূল্য যখন অতিশয় হ্রাস পাইয়াছিল, তখন ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের উপর তাহার প্রভাব কিরূপ হইয়াছিল, তাহা সর্ব্বাগ্রে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা আবশ্যক।

বাণিজ্যের হিসাবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বুঝা যায় যে, যে সময়ে টাকার মূল্য হ্রাস পাইয়াছিল, সে সময়ে বিদেশে ভারতজাত পণ্যের রপ্তানী বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায় নাই। অন্ততঃ কৃষিজ পণ্যের রপ্তানী অধিক হয় নাই। বরং বিশেষ লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় যে, ঠিক যে সময়ে মুদ্রা-মূল্য অচল ছিল অথবা কিঞ্চিৎ বাড়িয়াছিল, সেই সময়ে ভারতের কৃষিজ পণ্যের রপ্তানী বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পক্ষান্তরে, যখন টাকার বিনিময় মূল্য অতি দ্রুত হ্রাস পাইয়াছে, তখনও ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য অতি দ্রুত প্রসার লাভ করে নাই। *

পক্ষান্তরে, ঐ সময়ে য়ুরোপের যে যে দেশে স্বর্ণ-মুদ্রা প্রচলিত ছিল, সেই সেই দেশে তখন স্বর্ণের মূল্য বৃদ্ধি হেতু পণ্য-মূল্য হ্রাস পাইয়াছিল। মুদ্রার মূল্যবৃদ্ধি পাইলেই পণ্য-মূল্য হ্রাস পায়, ইহা স্বাভাবিক। আমাদের দেশেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে সরকার যখন টাঁকশালে অবাধে মুদ্রাপ্রস্তুত কার্য্য বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহার অল্পদিন পরেই পঞ্চনদপ্রদেশে, যুক্তপ্রদেশে, বাঙ্গালাদেশে, বোম্বাই ও মাদ্রাজপ্রদেশে, আসাম অঞ্চলে এবং মধ্যপ্রদেশে, এক কথায় ভারতের সর্ব্বত্রই খাদ্য শস্য সস্তা হইয়াছিল।* সুতরাং মুদ্রার মূল্যবৃদ্ধি পাইলে খাদ্য শস্য সুলভ হয়, ইহার প্রমাণ সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। ফলে কেবলমাত্র টাকার মূল্য হ্রাস পাইলেই যে বিদেশে দেশীয় পণ্যের রপ্তানী অতিশয় বৃদ্ধি পায় অথবা বিদেশ হইতে আমদানী পণ্যের পরিমাণ অতিশয় বাড়িয়া যায়, তাহা মনে হয় না।

তবে এ কথা খুবই সত্য যে, যখন কোন দেশের মুদ্রামূল্য কমিতে থাকে, তখন যাহারা এ দেশ হইতে বিদেশে এ দেশী পণ্য রপ্তানী করিয়া থাকে, তাহারা সময় সময় প্রচুর লাভ করে। যে সময় এ দেশের টাকার মূল্য ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছিল, তখন এ দেশের রপ্তানী-কারক বণিকরা টাকার দরে এ দেশে পণ্য কিনিয়া সভারেণের দরে উহা বিলাতে ও য়ুরোপের অন্যান্য দেশে বিক্রয় করিয়াছিলেন। উহাতে তাঁহারাই প্রভূত লাভ করিয়াছিলেন। এই সময়ে বোম্বাইয়ের এবং কলিকাতার প্রায় সকল রপ্তানীকারক সওদাগরই অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া উঠে। সেই লব্ধ অর্থেই বোম্বাইয়ে কার্পাস-কলের এবং বাঙ্গালার পাট-কলের সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

এ দিকে এই ব্যাপারে সরকারের বিশেষ ক্ষতি হইতে থাকিল। এই সমস্যার সমাধানকল্পে সরকার এ পর্য্যন্ত বিশেষজ্ঞদিগের দ্বারা পাঁচটি কমিটী ও কমিশন নিয়োগ করিয়াছেন। যথা—হার্শেল কমিটী, ফাউলার কমিটী, চেম্বারলেন রয়েল কমিশন, ব্যারিংটন স্মিথ কমিটী এবং ( আলোচ্য ) হিল্টন ইয়ং রয়েল কমিশন। বার্ত্তাশাস্ত্রে বড়

---

* Vide Prof H Stanley Jevon's Banking and Exchange in India page 127.

* Vide Evidence of Late Mr. R. C. Dutta before the Fowler's Committee.

বড় বিশেষজ্ঞ দ্বারা গঠিত কমিশনগুলি পরিশ্রম সহকারে তথ্য সংগ্রহ এবং তথ্যের আলোচনা পূর্ব্বক সিদ্ধান্তও করিয়া দিয়াছেন; সরকারও সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে কাষ করিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী কোন কমিশনের ফলই সন্তোষজনক হয় নাই। তাহার কারণ, আমাদের মতে, ভারতে সুবর্ণ-মুদ্রার অবাধে প্রচলনই এই সমস্যার একমাত্র সমাধান। পূর্ব্ববর্ত্তী চারিটি কমিশনের একটি কমিটী ও কমিশনও তাহা করেন নাই। তাঁহারা জোড়তালি দিয়া এই সমস্যার সমাধান করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ফাউলার কমিটী ভারতীয় টাকাকে নামে রজত-মুদ্রা রাখিলে কাযে পাউণ্ডের সহিত উহার মূল্য বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। অর্থাৎ টাকাকে তাঁহারা আসল মুদ্রা না রাখিয়া উহাকে পাউণ্ডের সহিত মূল্য পরিচয় দিতে বাধ্য করিয়া উহাকে অভিজ্ঞানমুদ্রা ( token money ) করিয়া দিলেন। অভিজ্ঞান অর্থে—যাহা দেখিলে দ্বিতীয় ব্যক্তি বা বিষয়কে মনে পড়ে। টাকা যদি নিজের পরিচয় না দিয়া পাউণ্ডের একটা ভগ্নাংশের ( ১ শিলিং ৪ পেন্সের ) পরিচয় দেয়, তাহা হইলে টাকাও আসল মুদ্রা হয় না, অভিজ্ঞানমুদ্রাই হইয়া থাকে। ঐ হিসাবে নোটও অভিজ্ঞানমুদ্রা।

এই ক্ষেত্রে সরকার যদি ভারতে অবাধে সুবর্ণ-মুদ্রা প্রচলিত করিতেন, তাহা হইলে, কখনই মুদ্রা লইয়া এত জটিলতার সৃষ্টি হইত না। সে কথা আমরা পরে বলিব। তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, উপস্থিত আমাদের দেশে টাকা ও নোট চলিত আছে। ঐ দুইটি ভাক্ত-মুদ্রা বা অভিজ্ঞানমুদ্রা ( token coin ) ভিন্ন এ দেশে আসল মুদ্রার দেখা নাই। এ ব্যবস্থা পৃথিবীর আর কুত্রাপি নাই। কারণ, কেবল ভাক্তমুদ্রা বা অভিজ্ঞানমুদ্রা যে দেশে প্রচলিত থাকে, সে দেশের সরকার প্রয়োজনের অতিরিক্ত পরিমাণে সেই ভাক্তমুদ্রা বাহির করিতে প্রলুব্ধ হয়েন। তাহার ফলে মুদ্রামূল্য কমে এবং দেশে দুর্মূল্যতা দেখা দেয়। বর্ত্তমান সময়ে সকল সভ্য দেশই সুবর্ণ-মুদ্রা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। তাহার কারণ, পৃথিবীতে যত জিনিষ আছে, তাহার মধ্যে সুবর্ণের মূল্য অনেকটা স্থায়ী থাকে। সেই জন্য ভারতে সুবর্ণ-মুদ্রা প্রচলনের প্রয়োজন অধিক। কেন, তাহা বোধ হয় কাহাকেও বিস্তৃতভাবে বুঝাইবার প্রয়োজন নাই

ফাউলার কমিটী হইতে ব্যারিংটন স্মিথ কমিটী পর্য্যন্ত চারিটি কমিটীর কথা আমি এই প্রবন্ধে আলোচনা করিব না। এ ক্ষেত্রে আমি কেবল ইয়ং কমিশনের কথাই বিশেষভাবে বলিব।

এই কমিটী তাঁহাদের পরামর্শদান সম্বন্ধে একমত হইতে পারেন নাই। তাঁহাদের ১০ জন কমিশনারের মধ্যে ৯ জন একমত হইয়াছেন, আর এক জন অর্থাৎ সার পুরুষোত্তম দাস টাকার মূল্য নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে ভিন্নমত হইয়াছেন। সার পুরুষোত্তম দাস বোম্বাই অঞ্চলের রপ্তানীকারক বণিকদলের মুখপাত্র

কমিশনের সদস্য ছিলেন এই কয় জন :—

(১) মিষ্টার এডওয়ার্ড হিল্টন ইয়ং
(২) সার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
(৩) সার নর্কট হেষ্টিং ইলস ওয়ারেণ
(৪) সার রেজিনাল্ড আর্থার ম্যাণ্ট
(৫) সার মানেকজী বৈরামজী দাদাভাই।
(৬) সার হেন্‌রী ষ্ট্রাকোশ্চ
(৭) সার আলেকজাণ্ডার রবার্টসন মারে
(৮) সার পুরুষোত্তম দাস ঠাকুর দাস
(৯) অধ্যাপক জাহাঙ্গীর কুবেরজী কয়াজী
(১০) মিষ্টার উইলিয়ম এডওয়ার্ড প্রেষ্টন।

এই কমিশন সরকারকে মুদ্রা সম্বন্ধে এইরূপ কার্য্য করিতে অনুরোধ করিয়াছেন ;—

(১) টাকার মূল্য এক শিলিং ৬ পেন্স অর্থাৎ ১৮ পেন্স ধার্য্য করিতে হইবে। এই স্থলেই কেবল সার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস অন্য সকলের সহিত ভিন্নমত হইয়া টাকার মূল্য ১ শিলিং ৪ পেন্স অর্থাৎ ১৬ পেন্স ধার্য্য করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।

(২) টাকার মূল্য বিলাতী সভারেণের সহিত গাঁথিয়া না দিয়া একটা নির্দ্দিষ্ট-পরিমাণ সুবর্ণের ( সাড়ে ৮ গ্রেণ ) মূল্যের সহিত গাঁথিয়া দিতে হইবে। অর্থাৎ সভারেণের বিনিময় মানে টাকার মূল্য ধার্য্য না করিয়া সুবর্ণের ধাতব মানে টাকার মূল্য ধার্য্য করিতে হইবে। সুতরাং টাকা অতঃপর আর বিলাতী পাউণ্ডের অংশবিশেষের অভিজ্ঞান না হইয়া একটা নির্দ্দিষ্ট-পরিমাণ সুবর্ণের অভিজ্ঞান হইবে।

(৩) টাকার নির্দ্দিষ্ট মূল্য এবং বাজার পসার অবিচলি

রাখিবার জন্য একটা সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক স্থাপিত করিতে হইবে। ঐ ব্যাঙ্ক সরকারের অধীন হইবে না।

(৪) আর নূতন করিয়া রূপার টাকা প্রস্তুত করা হইবে না। যে রূপার টাকা আছে, বাজারে কেবল তাহাই চলিবে অতঃপর সরকার কেবল এক টাকার নোট প্রস্তুত করিতে থাকিবেন।

(৫) ভারতবাসীরা অত্যন্ত মুদ্রাসঞ্চয়প্রিয় উহারা ধাতু-মুদ্রা মাটীর মধ্যে পুতিয়া অথবা অন্য উপায়ে আটক রাখে। যাহাতে লোক আর ঐ ভাবে টাকা ফেলিয়া না রাখে, সেই জন্য কমিশন পরামর্শ দিয়াছেন যে, যাহারা ঐ সঞ্চিত মুদ্রা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখিবে, তাহাদিগকে সেই সঞ্চিত মুদ্রার জন্য সার্টিফিকেট দেওয়া হইবে। সেই সার্টিফিকেট ভাঙ্গাইবার সময় হইলে সার্টিফিকেটের অধিকারী যদি তৎ-পরিবর্ত্তে স্বর্ণ চাহে, তাহা হইলে সেই টাকার পরিবর্ত্তে তাহার যে কয় তোলা সোনা প্রাপ্য হয়, সে সেই কয় তোলা সোনা পাইবে। অর্থাৎ এক তোলা সোনার মূল্য ২১ টাকা ৩ আনা ১০ পাই, এই হিসাবে তিনি যত টাকা গচ্ছিত রাখিবেন, তত টাকার সোনা পাইবেন। লোকের টাকা গচ্ছিত রাখিবার প্রবৃত্তি দমনের জন্য সরকার এই ব্যবস্থা করিয়াছেন।

(৬) নোটই আইন অনুসারে দেয় ও গ্রাহ্য মুদ্রা হইবে। ছুরা নোটের পরিবর্ত্তে কেহ স্বর্ণমুদ্রা পাইবেন না। তবে কলিকাতার, বোম্বাইয়ের এবং মাদ্রাজের ব্যাঙ্কে কেহ স্বর্ণের প্রার্থী হইলে ব্যাঙ্ক ৪ শত আউন্স অর্থাৎ ১ হাজার ৬৫ তোলা ওজনের সোনার বার ঐ দরে ( ২১ টাকা ৩ আনা ১০ পাই ) পাইবেন। অর্থাৎ টাকা নামধেয় কাগজের বা রূপার নোটের অধিকারী ইচ্ছা করিলে তাহার সেই নোট ভাঙ্গাইয়া সে প্রতি টাকায় সাড়ে ৮ গ্রেণ সোনা পাইবে না। সে যদি প্রায় ২৩ হাজার টাকা যোগাড় করিয়া ঐ ব্যাঙ্কে হাজির হইয়া সোনা চাহে, তাহা হইলে সে সোনা পাইবে, অন্য কেহ তাহা পাইবে না। অর্থাৎ প্রায় ২৩ হাজার টাকার নোট একত্র না করিলে আর কেহ নোট ভাঙ্গাইতে পারিবেন না। রিপোর্টের সমস্ত গোলের কেন্দ্র এইখানেই।

ইহাই হইল কমিশনের মোট পরামর্শ। এখন প্রশ্ন হইতেছে, সরকার যদি এই পরামর্শ অনুসারে কার্য্য করেন, তাহা হইলে ভারতবাসীর লাভ হইবে না ক্ষতি হইবে?

দেখা যাইতেছে যে, টাকার মূল্য ১৮ পেন্স হইবে কি ১৬ পেন্স হইবে, তাহা লইয়াই দুই পক্ষে তুমুল তর্ক বাধিয়াছে। আমার মনে হয়, এ তর্ক উঠিতেই পারে না। কারণ, কমিশন যখন বলিতেছেন, টাকার মূল্য আর সভারেণের সহিত গ্রথিত থাকিবে না, স্বর্ণের সহিতই গ্রথিত হইবে, অর্থাৎ ভারতে Gold exchange standard না হইয়া Gold bullion standardই হইল, তখন এই প্রসঙ্গে মুখ্যভাবে পাউণ্ড অথবা তস্য ভগ্নাংশ মুদ্রা শিলিং পেন্সের কথা না তোলাই উচিত। এখন কথা হইতেছে, ভারতীয় মুদ্রায় যখন স্বর্ণমানই প্রবর্ত্তিত হইবে, তখন টাকার মূল্য হিসাবে উহা কতখানি খাঁটি সোনার দরে বিকাইবে, তাহাই এ স্থলে আলোচ্য। এখন বুঝা যাইতেছে যে, সরকার টাকাকে সাড়ে ৮ গ্রেণ পাকা সোনারই প্রতিভূ বা অভিজ্ঞান করিতে চাহিতেছেন। তাহা হইলে আজকালকার বাট্টায় বাজারে উহার দর হইবে ১ শিলিং ৬ পেন্স বা ১৮ পেন্স। সার পুরুষোত্তম দাস ঠাকুর দাস বলিতেছেন, উহার মূল্য ১ শিলিং ৪ পেন্স বা ১৬ পেন্স করাই কর্ত্তব্য অর্থাৎ তাঁহার মতে টাকার মূল্য শতকরা সাড়ে ১২ টাকা হিসাবে কম ধার্য্য করিতে হইবে। তাহা করা কিছুমাত্র কঠিন নহে. টাকার মূল্য হইতে যদি প্রায় ১ গ্রেণ সোনা বাদ দেওয়া যায়, অর্থাৎ টাকা যদি সাড়ে ৮ গ্রেণ সোনা না হইয়া ৭·৫৫ গ্রেণ সোনা হয়, তাহা হইলে উহার মূল্য ১ শিলিং ৪ পেন্স হইবে। কিন্তু সার পুরুষোত্তম দাসের পরামর্শমতে কার্য্য করিলে টাকার মূল্য শতকরা সাড়ে ১২ টাকা হারে কমিয়া যাইবে টাকার মূল্য সাড়ে ৮ গ্রেণ সোনার সমান হইবে কি ৭·৫৫ গ্রেণ সোনার সমান হইবে,—এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে বোধ হয় যত লোক টাকা পাইয়া থাকে বা টাকা সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহারা সকলেই টাকার মূল্য সাড়ে ৮ গ্রেণ সোনায় পরিণত দেখিতে চাহে। বাজারে যদি কেহ সোনা কিনিতে যায়, তাহা হইলে পোদ্দার যদি তাহাকে এক টাকায় ৭·৫৫ গ্রেণ সোনা দেয়, তাহা হইলে তাহাতে খরিদদার খুসী হইবে, না যদি পোদ্দার তাহাকে সাড়ে ৮ গ্রেণ সোনা দেয়, তাহা হইলে সে অধিক খুসী হইবে? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে বোধ হয় কেহ দ্বিধা বোধ করিবেন না। সকলেই সাড়ে ৮ গ্রেণ সোনাই চাহিবেন। কিন্তু টাকার বিনিময়ে একটি শিলিং ৪টি পেনী, পাওয়া যাইবে, কি ১ শিলিং ৬ পেনী পাওয়া

যাইবে, এই প্রশ্নে এত গোল উঠে কেন? সমস্যা ত সেই একই।

অবশ্য টাকার বিনিময় মূল্য বর্দ্ধিত হইলে যে কেবল টাকার বদলে সোনা এবং বিলাতী মুদ্রা অধিক পাওয়া যাইবে, তাহা নহে,—উহার বিনিময়ে সকল জিনিষই অধিক পাওয়া যাইবে। যত বিদেশী পণ্য এ দেশে আমদানী হইয়া থাকে, তাহা শতকরা সাড়ে ১২ টাকা হিসাবে সস্তা পাওয়া যাইবে। বিলাতে যত টাকা দিতে হয়, তাহা শতকরা সাড়ে ১২ টাকা কম পাঠাইলেই তাহাদের সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। চাকুরিয়ার সুবিধা—তাহাদের আয় শতকরা সাড়ে ১২ টাকা হারে বৃদ্ধি পাইবে। তবে ক্ষতি কাহার? ক্ষতি দেনদারের। তাহার সূক্ষ্ম হিসাবে শতকরা সাড়ে ১২ টাকা অধিক দিয়া দেনা শোধ করিতে হইবে। কিন্তু সে ব্যক্তি যখন তাহার পাওনা (বেতন প্রভৃতি) শতকরা সাড়ে ১২ টাকা হারে অধিক পাইবে, তখন তাহার তাহাতে ক্ষতি বোধ হওয়া উচিত নহে।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, টাকার মূল্য যাহাই হউক, উহার প্রভাবে দেশের পণ্য-মূল্যের ইতর-বিশেষ হইবে না। অর্থাৎ টাকার মূল্য ৭'৫৫ গ্রেণই হউক আর ৮'৫ গ্রেণই হউক, তাহাতে চাউল, দাইল, লবণ প্রভৃতির মূল্যের তারতম্য হইবে না। ইহা বিষম ভুল। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রেলিয়া এবং কালিফোর্ণিয়াতে সুবর্ণখনি হইতে ভূরি পরিমাণে সুবর্ণ উত্তোলিত হওয়াতে ১৮৫১ হইতে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় ১৫ বৎসর সুবর্ণ সস্তা হইয়াছিল। ঐ সময়ে যে কয়টি দেশে সুবর্ণ-মুদ্রা প্রচলিত ছিল, সেই কয়টি দেশেই পণ্যমূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই সময়ে ফ্রান্সে সুবর্ণ-মুদ্রা প্রচলিত করা হয়। তাহার পর ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ হইতে যেমন সুবর্ণ দুর্মূল্য হইতে থাকে, অমনই যে সমস্ত দেশে সুবর্ণ-মুদ্রা প্রচলিত ছিল, সেই সকল দেশেই পণ্য-মূল্য সুলভ হইতে থাকে। এখনও তাহাই হইতেছে। গত বৎসর বাঙ্গালায় শস্য অল্প জন্মিয়াছিল। কিন্তু তাহা হইলেও উহার মূল্য যেরূপ অধিক হওয়া উচিত ছিল, সেরূপ অধিক হয় নাই, তাহার কারণ, গতবার টাকার মূল্য অধিক ছিল।

একটা আপত্তি এই হইতে পারে যে, যদি টাকার মূল্য-বৃদ্ধিফলে পণ্য-মূল্য হ্রাস পায়, তাহা হইলে চাষীরা তাহাদের কৃষিজ পণ্য বিক্রয় করিয়া অল্প টাকা পাইবে। তাহারা দৃশ্যতঃ অল্প টাকা পাইবে সত্য,কিন্তু যে টাকা পাইবে, তাহার মূল্য অধিক। তাহার বিনিময়ে তাহারা সকল পণ্যই সস্তায় পাইবে। সুতরাং তাহাতে তাহাদের ক্ষতি নাই, বরং লাভ আছে।

আর এক কথা। টাকার মূল্য বৃদ্ধি পাইলে শিল্পীদিগের ক্ষতি হইবে। উহার ফলে বিদেশী পণ্য সুলভ হইবে, সুতরাং তাহার সহিত দেশীয় শিল্পীরা প্রতিযোগিতা করিয়া উঠিতে পারিবে না। এই আপত্তিই সহসা সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু একটু অনুধাবন করিলে এই আপত্তি তত প্রবল বলিয়া মনে হয় না। ইহাতে কুটীর-শিল্পের তাদৃশ ক্ষতি হওয়া উচিত নহে। কারণ, যদি জীবনধারণের জন্য আবশ্যক জিনিষের ও পণ্যের উপাদানের মূল্য হ্রাস পায়, তাহা হইলে কুটীর-শিল্পের প্রতিযোগিতার তীব্রতা বৃদ্ধি পায় না। কল-কারখানায় প্রস্তুত পণ্যেরও যদি উপাদানের মূল্য হ্রাস পায়, তাহা হইলে সেই দ্রব্য কতকটা সুলভে বিক্রয় করা যায়। তবে উহাদের মজুরের মজুরী হ্রাস করা বড় কঠিন। মজুররা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া মজুরী-হ্রাসে বাধা দেয়। কিন্তু জীবনধারণের জন্য আবশ্যক পণ্য-মূল্য কমিলে মজুরীর মূল্য সেই অনুপাতে হ্রাস পাওয়াই উচিত। তবে এই সম্বন্ধে একটা বিশেষ কথা এই যে, যদি মুদ্রা-মূল্যের সামান্য ইতরবিশেষ হয়, তাহা হইলে মুদ্রা-মূল্যের সহিত পণ্য-মূল্যের সামঞ্জস্য সাধিত হইতে কিছু বিলম্ব ঘটে। সেই জন্য কলকারখানা হইতে প্রস্তুত শিল্পজ পণ্যের পক্ষে কিছু অসুবিধা জন্মে; টাকার মূল্য ১৬ পেন্সের স্থানে ১৮ পেন্স করিলে যে সে অসুবিধা অন্ততঃ কিছুকালের জন্য হইবে না, তাহা নহে। বোম্বাইয়ের কলওয়ালারা এই জন্যই টাকার মূল্যবৃদ্ধি প্রস্তাবে এত আপত্তি করিতেছেন।

যে সময়ে ভারতে টাকার মূল্য কমিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহার কয়েক বৎসর পর হইতেই বোম্বাই কার্পাস-কলের শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে। যত দিন টাকার মূল্য কম ও চঞ্চল ছিল, তত দিন উহা বেশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত তালিকা দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ হইতে টাকার মূল্য কমিতে থাকে, ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উহা কমিতে থাকে। টাকার মূল্য হ্রাস হইতে আরম্ভ হইবার ৩ বৎসর পরে ভারতে ৫৮টি মাত্র কার্পাস-কল ছিল, ১৮৯৮-৯৯ খৃষ্টাব্দে

উহার সংখ্যা ১ শত ৭৪টিতে দাঁড়ায়। এরূপ অবস্থায় বোম্বাই কার্পাস কলওয়ালাদের শঙ্কিত হইবার কারণ আছে। তবে সে সম্বন্ধে সকল কথা বলিবার এবার স্থানাভাব।

আসল কথা, টাকার মূল্য ১৮ পেন্স ধার্য্য হইলে অর্থাৎ সাড়ে ৮ গ্রেণ সোনা হইলে কাহারও বিশেষ ক্ষতি হইবার কারণ নাই। সেই জন্য আমরা উহার সমর্থন করি। কিন্তু ইয়ং কমিশন যেরূপ পরামর্শ দিয়াছেন,—সরকার যে ভাবে ঐ সম্বন্ধে আইন করিতে চাহিতেছেন, তাহাতে আমাদের ঘোর আপত্তি আছে। কারণ, তাঁহারা নামে ইহা Gold Bullion Standard বা সুবর্ণমান মুদ্রা বলিলেও উহা কার্য্যে সেই Gold Exchange Standard বা সুবর্ণ-বিনিময় মুদ্রাই রহিয়া গিয়াছে। কমিশন সুবর্ণ-মুদ্রা প্রবর্ত্তিত করিবার পরামর্শ দেন নাই। সরকারও তাঁহাদের প্রস্তাবিত আইনে সুবর্ণ-মুদ্রা প্রচলন করিবার ব্যবস্থা করেন নাই। সুতরাং এ ব্যবস্থা টিকিবে না। ইতঃপূর্ব্বে ব্যারিংটন স্মিথ কমিটী টাকার মূল্য ১১'৩০০১৬ গ্রেণ ধার্য্য করিয়া উহার বিনিময় মূল্য ২ শিলিং ধার্য্য করিবার এবং ভারতে অবাধে সুবর্ণ আমদানী রপ্তানী করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু সে ব্যবস্থা কিছু দিনও টিকে নাই। তাহার কারণ, সরকার সুবর্ণ-মুদ্রা প্রচলিত করেন নাই। তখন যদি সরকার ১৬৯'৫০২৪ গ্রেণ ওজনের খাঁটি সোনা দিয়া ১৫ টাকা মূল্যের সুবর্ণ-মুদ্রা চালাইয়া তাহাই legal tender করিয়া দিতেন, তাহা হইলে আজ টাকার মূল্য এত কমিয়া যাইত না এবং সেই মূল্য ঠিক রাখিবার জন্য ভারতের অর্থ এরূপ নির্ম্মমভাবে জলে যাইত না। এবারও যদি সরকার ১৩২'৫ গ্রেণ খাঁটি সোনা দিয়া পনর টাকা মূল্যের সুবর্ণ-মোহর অথবা ১৭০ গ্রেণ খাঁটি সোনা-সংবলিত ২০ টাকা মূল্যের সুবর্ণ-মুদ্রা প্রচলিত না করেন, তাহা হইলেও টাকার এই মূল্য স্থির থাকিবে না। যদি সুবর্ণমানে মুদ্রা প্রচলিত করিবার সত্য সত্য ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে সুবর্ণ-মুদ্রাকেই বৈধ মুদ্রা (legal tender) করিতে হইবে। ৪ শত ঔন্সের অর্থাৎ ১ হাজার ৬৫ তোলা ওজনের সোনার বার টাকায় সাড়ে ৮ গ্রেণ সোনার দরে বিক্রয় করিলে টাকার মূল্য 'স্থিতিমান' হইবে না। সুতরাং এই টাকার দরের গোলও মিটিবে না। ব্যারিংটন কমিটী বাবদ খরচের ন্যায় এবারও ইয়ং কমিটীর খরচ বাবদ ৩ লক্ষ ৩১ টাকা ত জলে যাইবেই, অধিকন্তু আরও কত টাকা জলে যাইবে, তাহাই বা কে বলিতে পারে?

এ সম্বন্ধে অন্যান্য অনেক কথা বলিবার আছে। এবার স্থানাভাব। আসল কথা, আমরা টাকার মূল্য ১ শিলিং ৬ পেন্স ধার্য্য করিবার পক্ষপাতী হইলেও সরকার যে ভাবে উহা বহাল করিবার প্রস্তাব করিতেছেন, তাহার সমর্থক নহি। উহা স্থায়ী হইবে না—উহা স্থায়ী হইতেই পারে না। কিছু দিন পরে আবার গোলযোগ ঘটিবে।

যে কমিশনে অধ্যাপক কয়াজীর মত সদস্য ছিলেন, সেই কমিশন যে কতকগুলি বাজে তর্ক করিয়া সুবর্ণ-মুদ্রা প্রচলনে আপত্তি করিবেন, ইহা আমরা পূর্ব্বে কল্পনাও করিতে পারি নাই। ভারতবর্ষ বহুকাল হইতেই ব্যবস্থা পূর্ব্বক প্রবর্ত্তিত মুদ্রার (managed currency)র ফলে অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া আসিতেছে, এবারও যে তাহা হইবে না, ইহা কেহই বলিতে পারেন না। এখন মুদ্রার পক্ষে সুবর্ণই প্রকৃষ্ট ধাতু, তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু ভারতে সেই সুবর্ণই ধাতু-মুদ্রারূপে গ্রহণ করিতে সরকার বরাবরই অরুচি প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। এবারও বিলাতের মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্কের মাসিক সমালোচনী পত্রিকায় স্পষ্টই বলা হইয়াছে, ভারতের পক্ষে মুদ্রার মূল্য হৈম বিনিময় মানে (Gold exchange standard) ধার্য্য করাই উচিত, তাহাদের পক্ষে সুবর্ণ-মুদ্রা বা হৈমধাতুমানে ধার্য্য মূল্যে মুদ্রা প্রচলন করিলে ভাল হইবে না। চক্ষুলজ্জা পরিহার পূর্ব্বক এমন ভাবে পক্ষপাতমূলক যুক্তি প্রদর্শন করা কেবল পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের পক্ষেই সম্ভবে। বরং যে দেশ স্বাধীন, যে দেশে লোকমত দ্বারা রাজনীতিক ও আর্থিক সকল ব্যাপারই নিয়ন্ত্রিত হয়, সে দেশে বরং ব্যবস্থা পূর্ব্বক অবাধে নোট বা অভিজ্ঞানমুদ্রা চলিতে পারে—কিন্তু যে দেশে লোকমত অবজ্ঞাত, জনসাধারণের স্বার্থ জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ উপেক্ষিত বলিয়া দেশবাসীর বিশ্বাস, সেই পরাধীন দেশে কেবল ভাক্তমুদ্রা প্রচলিত করা কখনই বিচক্ষণতার পরিচায়ক হইতে পারে না।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

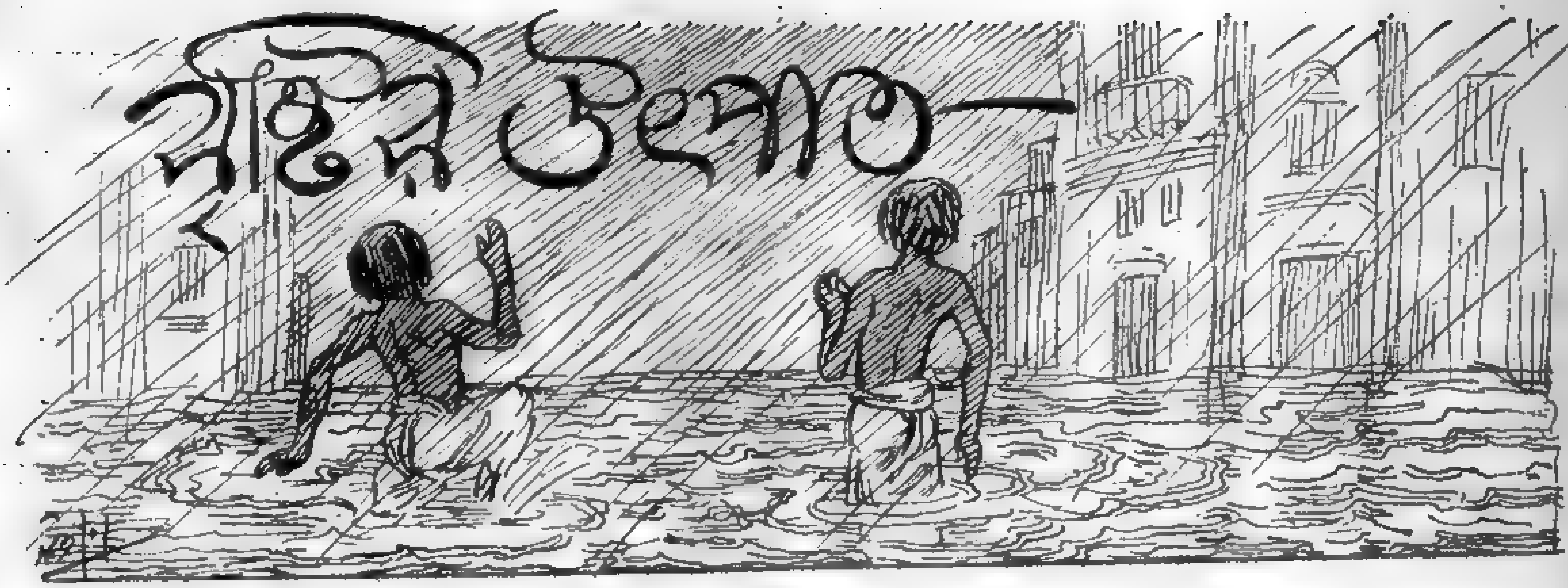

বাঃ রে বাঃ ! মুন্সীপাল—বাহবা স্বরাজ !
পাকা পথে খাল খুলেছে খেলতে মজা আজ ॥

## কুঁপোকাৎ

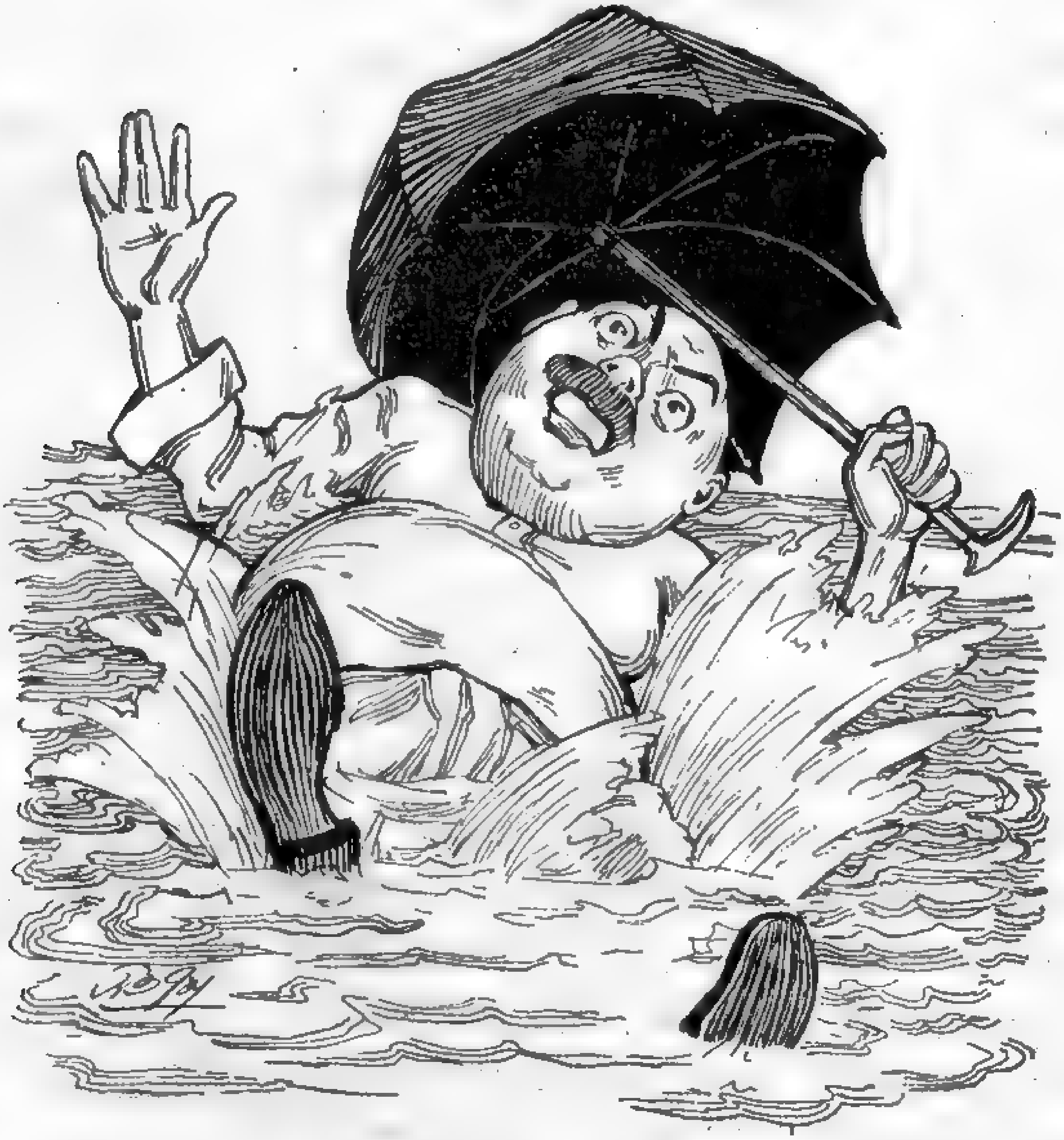

বৃষ্টি ত আর মুন্সীপালের নিজের সৃষ্টি নয়।
ভুঁড়ি নিয়ে পথে কেন চল মহাশয় ?

## আফিস যাত্রা

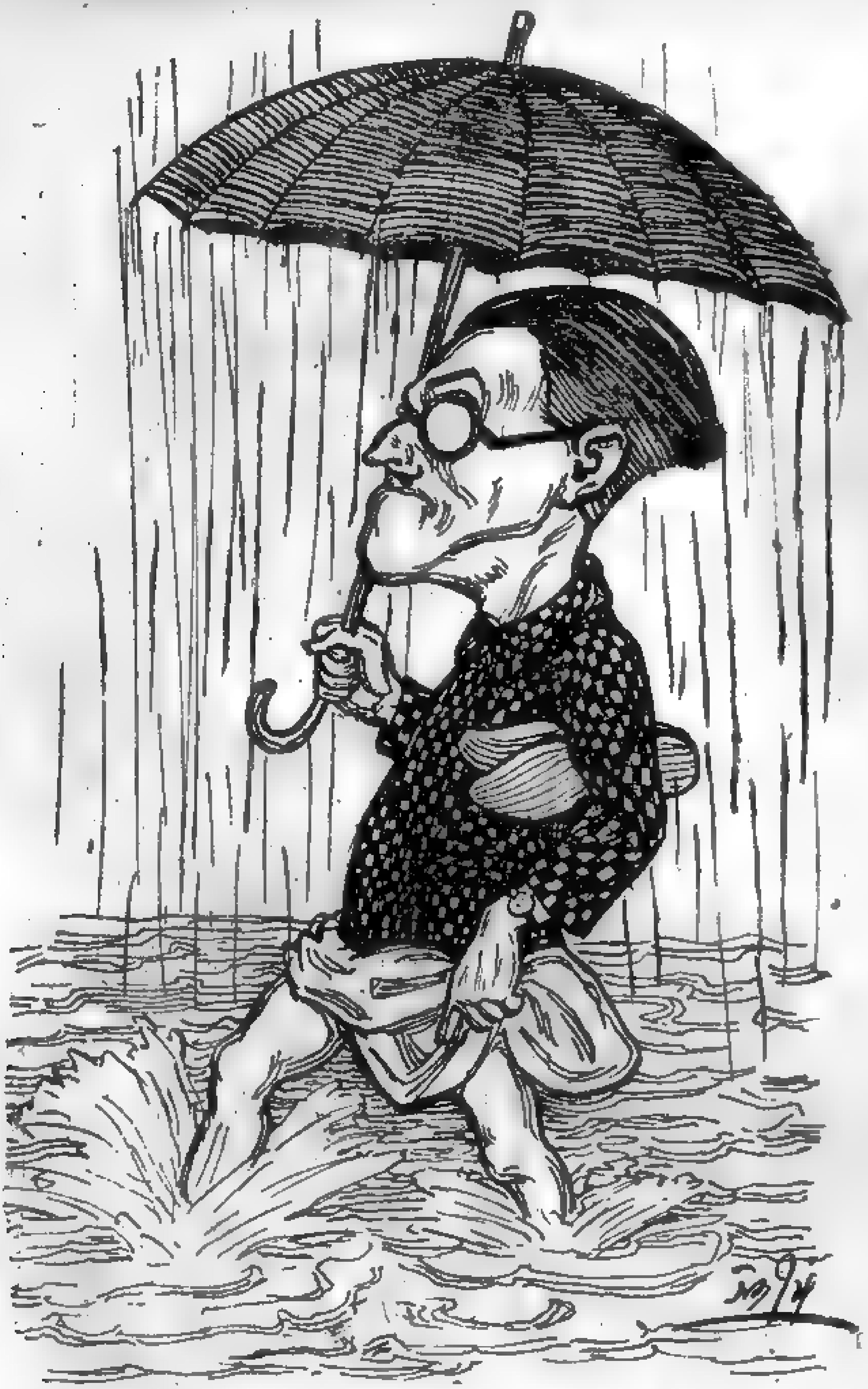

রাস্তা তৈরী পাটের গাড়ী মোটর লরীর জন্য।
তোরই তরে মোর এ দুর্গতি হা রে হা রে অন্ন॥

## ছাতার বিশ্বাসঘাতকতা

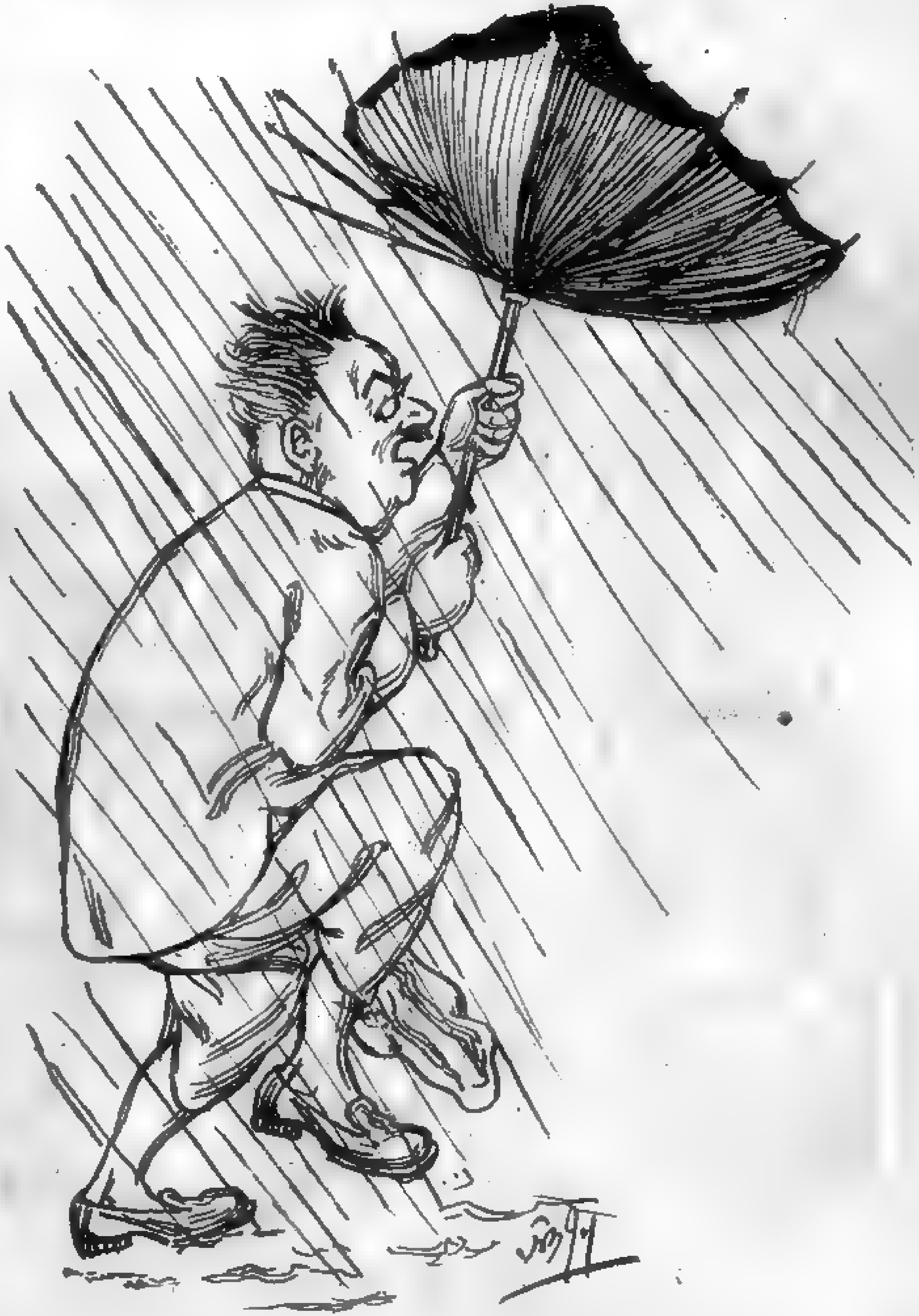

স্বাধীনতার দিনে সবার ঘুরে গেছে মাথা।
শীকে আটক রইলেন নাকো উল্টে পড়লেন ছাতা॥

### বৃষ্টির বর্ম

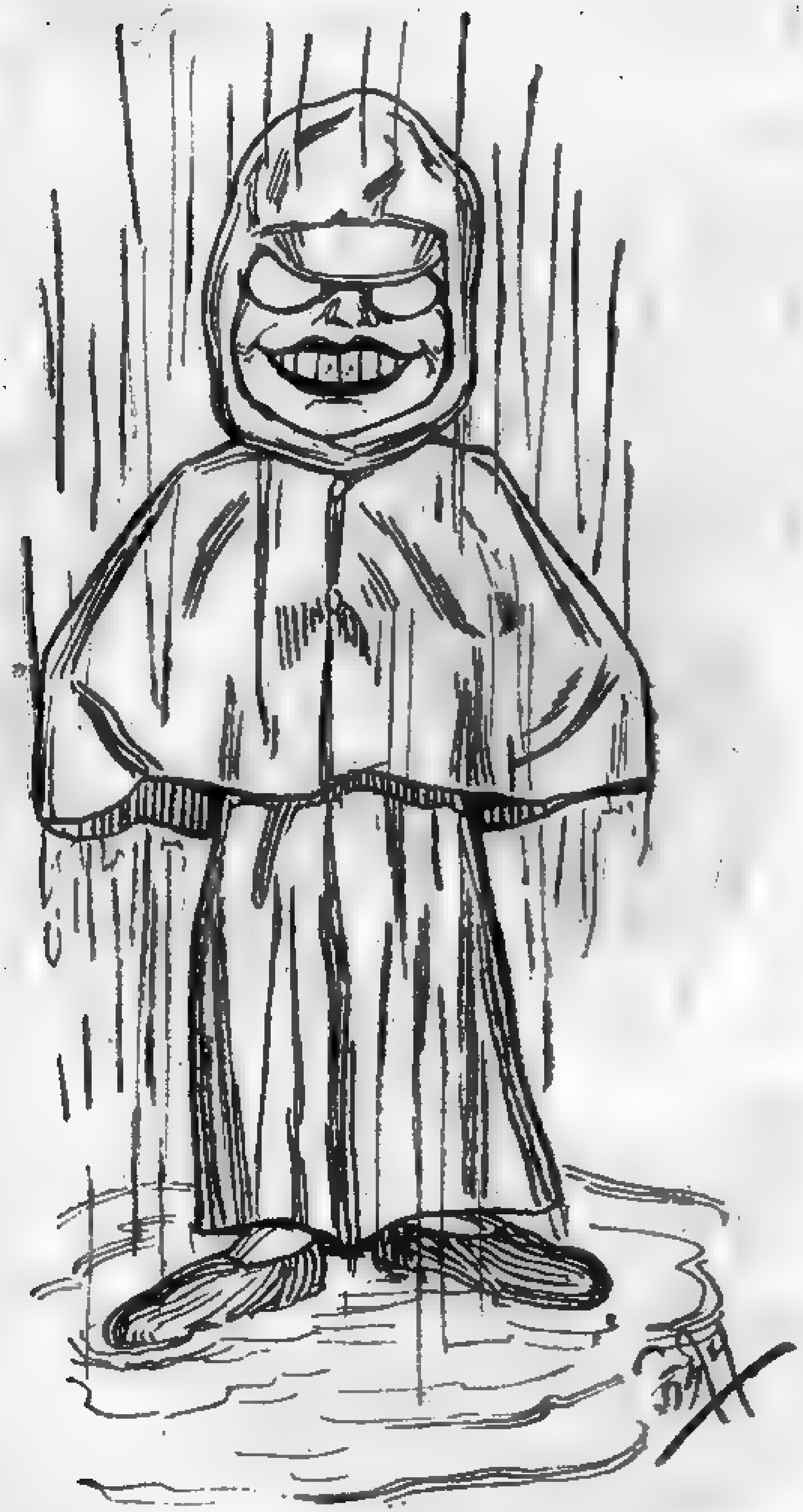

দেড়শ'র গ্রেডে উঠে আমি পেয়েছি পানি-কোট।
পাঁচশ'র পারে পৌঁছুলেই মিটিং মোটর ভোট॥

### লজ্জা রক্ষে

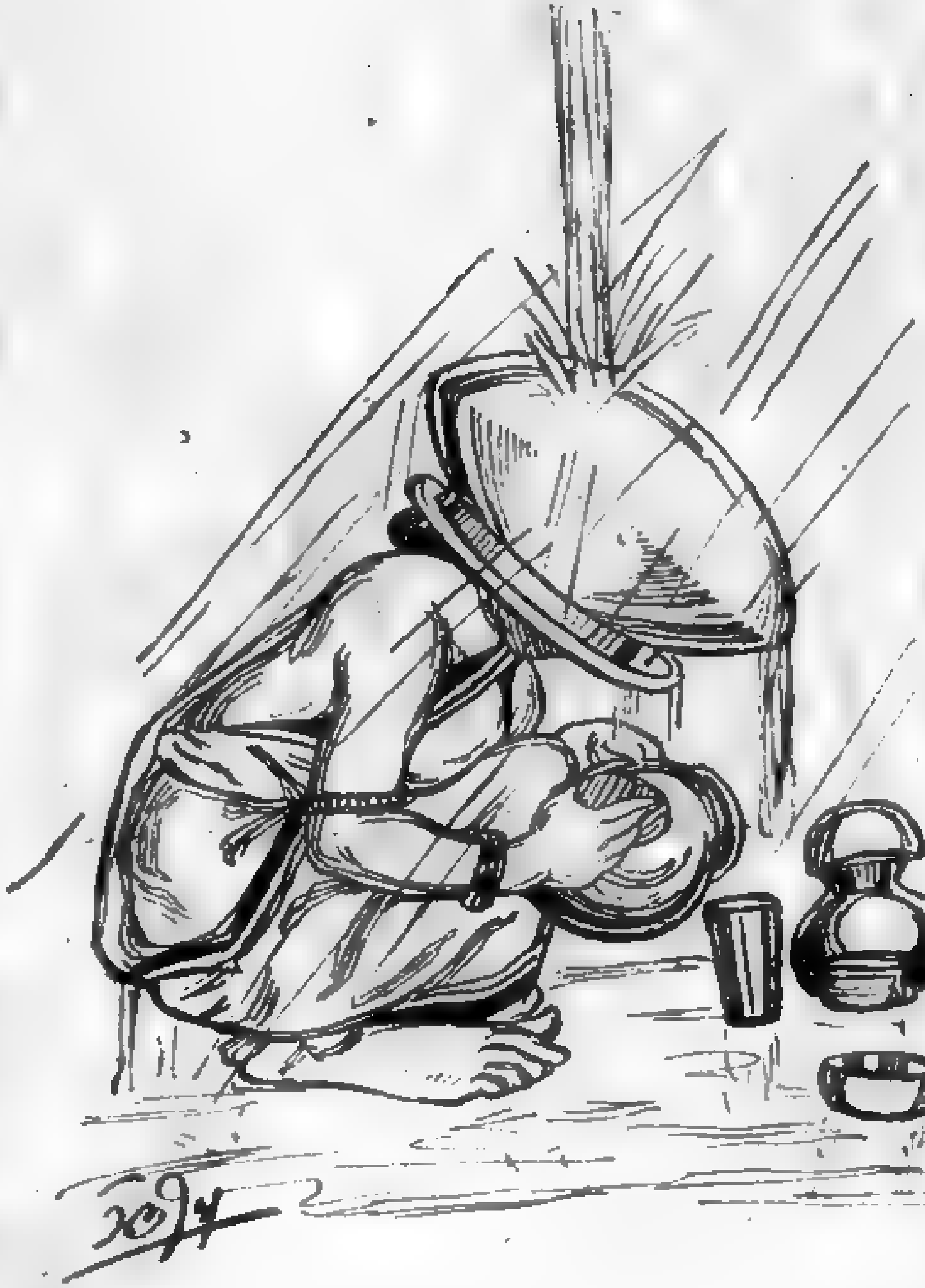

মাথা রক্ষে লজ্জা রক্ষে দুই-ই হ'ল লক্ষ্মী।
এই বাজারে বাসন মাজে কোন্ বৌ সয় ঝক্কি ?

### বাবুর বাহার

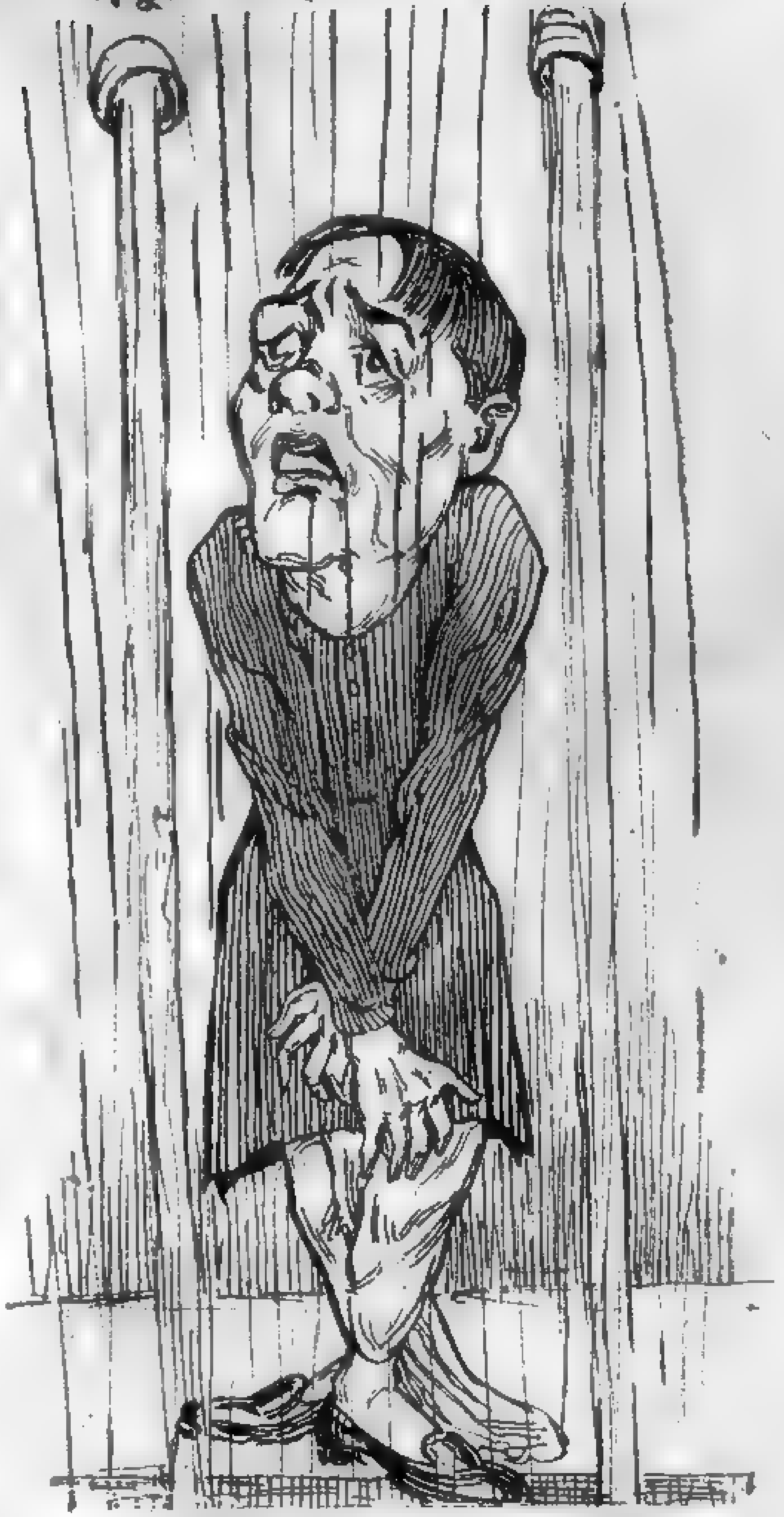

সাধের সাজান চুল, কোঁচার গোছান ফুল,
ফিন্‌ফিনে পাঞ্জাবী মাঞ্জা করা জুতো।
মাটী হলো সব সজ্জা, কোথায় রাখিবে লজ্জা,
আল্‌সের আড়ালে খাড়া ভাবে তাই ভূতো॥

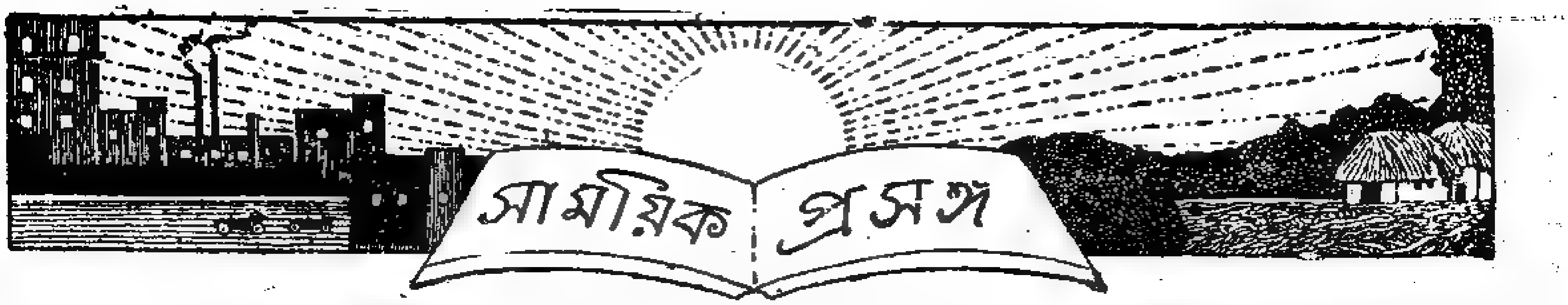

# সাময়িক প্রসঙ্গ

## বাঙ্গালীর সংগঠন-শক্তি

কোনও অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্র সখেদে বলিয়াছেন,—আজ সহর কলিকাতার ২ শত ৩৬ বৎসর বয়স হইল, অথচ যে শক্তিমান পুরুষ এই সহরের ভিত্তিপত্তন করিয়াছিলেন, সেই জব চার্ণকের স্মৃতিপূজায় কোনও গা-বরাই কলিকাতাবাসী করে নাই। জব চার্ণকের সমাধি-মন্দির কেহ পুষ্পমাল্য অথবা ধ্বজা-পতাকা দিয়া সুসজ্জিত করে নাই, কেহ কোনও ক্লাবে তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে সুরাপানের সঙ্গে সঙ্গে বক্তৃতাবর্ষণ করে নাই, কেহ তাঁহার কোনওরূপ প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করে নাই। এ দুঃখ রাখিবার কি স্থান আছে?

যে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজের মুখপত্র স্বজাতি স্বধর্ম্মী পুরুষ-প্রবরের স্মৃতিরক্ষার জন্য এত করুণরসের অবতারণা করিয়া লোকের সহানুভূতি আকর্ষণের প্রয়াস পাইয়াছেন, সেই অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সমাজ বাঙ্গালীর জনপদ-সংগঠনের শক্তি কখনও স্বীকার করেন না কেন, কেহ বলিয়া দিতে পারেন কি? ভীষণ শ্বাপদসঙ্কুল পার্ব্বত্য অরণ্যকে গ্রাম-জনপদে গড়িয়া তুলিবার শক্তি যে জব চার্ণকের দেশের লোকের নিজস্ব, তাহা নহে, বাঙ্গালীও এ বিষয়ে পথি-প্রদর্শকরূপে সাঁওতাল পরগণাকে কিরূপে গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহার পরিচয়ের অসদ্ভাব নাই।

সত্য বটে, প্রতীচ্যের স্বাধীন শক্তিশালী জাতিগণ জগতের দিগ্‌দিগন্তে ভীষণ অরণ্যে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া মনুষ্যবাসযোগ্য করিয়াছে। সত্য বটে, বিলাতের Pilgrim fatherরা মার্কিণ মুলুকে বন-জঙ্গল কাটিয়া হিংস্র পশু ও তদপেক্ষা হিংস্র আদিমনিবাসীর সহিত যুদ্ধ করিয়া য়ুরোপের তুল্য সুন্দর গ্রাম জনপদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। সত্য বটে, কষ্টসহিষ্ণু সাহসী ওলন্দাজরা দক্ষিণ-আফ্রিকার কালা জঙ্গলে Trek করিয়া সিংহের এবং সিংহ অপেক্ষাও ভীষণ কালা নিগ্রোর সহিত যুদ্ধ করিয়া কত সুন্দর গ্রাম, নগর ও বাজার-গঞ্জের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। সত্য বটে, অষ্ট্রেলিয়ায়, পূর্ব্ব-আফ্রিকায়, পশ্চিম-আফ্রিকায়, উত্তর-আফ্রিকায়, নিউগিনিতে, নিউজিল্যাণ্ডে, যবদ্বীপে ও অন্যান্য স্থানে নানা য়ুরোপীয় জাতি জঙ্গলকে মনুষ্যাবাস-ভূমিতে পরিণত করিয়া তাঁহাদের উপনিবেশ সংগঠনের অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় দিতেছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে বাঙ্গালীর গ্রাম-জনপদ-গঠনের অক্ষেয় শক্তির কথা ভুলিয়া গেলে চলিবে কেন? আজ সাঁওতাল পরগণা বিহার-সরকারের এলাকাভুক্ত হইয়াছে বলিয়া তথা হইতে বাঙ্গালাকে বিতাড়িত করিবার নানা পন্থা অবলম্বিত হইতেছে। অথচ এই বাঙ্গালীই সাঁওতাল পরগণাকে নিজের অধ্যবসায়ে ও অর্থব্যয়ে গড়িয়া তুলিয়াছে! ইহাও কি জব চার্ণকের প্রতি অকৃতজ্ঞতার মত অকৃতজ্ঞতা প্রকাশের পরিচয় নহে? সীতারামপুর, মিহিজাম, জামতাড়া, কারমাটার, মধুপুর, জে সদি, বৈদ্যনাথ, শিমুলতলা, ঝাঁঝা,—কোথায় না বাঙ্গালীর সংগঠন-ক্ষমতার অদ্ভুত শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়?

ইতিহাসের কথা তুলিব না। সুদূর অতীতে বাঙ্গালী সিংহলে তাহার সভ্যতা ও সংস্কার লইয়া গিয়াছিল। বাঙ্গালী ধর্ম্মযাজক সুদূর ব্রহ্ম, শ্যাম, যবদ্বীপ, সুমাত্রা, তিব্বত, ইন্দো-চীন ও চীনদেশে তাহার ধর্ম্ম ও সভ্যতা প্রচার করিয়াছিল। আজও তাহার বহু নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। আজিও শ্যামদেশের নামে এবং শ্যাম-রাজবংশের ও প্রকৃতিপুঞ্জের আচার-ব্যবহারে, পোষাক-পরিচ্ছদে তাহার ছাপ অঙ্কিত আছে। পরলোকগত রাজা চূড়ালঙ্করণ অথবা তাঁহার পরবর্ত্তী রাজা ও রাণীগণের নামে ও পরিচ্ছদে বাঙ্গালার সভ্যতা ও শিক্ষাদীক্ষার প্রভাব পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান রহিয়াছে। সে সকল ইতিকথার বিস্তারিত বর্ণনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে।

মাত্র ১।৫ শত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালী তাহার সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা জন্মভূমির শীতল ক্রোড় হইতে বিদায় লইয়া গভীর গহন পার্ব্বত্য অরণ্যমণ্ডিত সাঁওতাল পরগণায় গমন করিয়া কিরূপে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, তাহা ভাবিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। বর্ত্তমান কারমাটার ষ্টেশন হইতে ১।৫ মাইল দূরে করোর একটি বর্দ্ধিষ্ণু জনপদ। এই করোরে প্রায় ৩ শত ঘর বাঙ্গালীর বাস। এই সকল বাঙ্গালীর মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বণিক, মোদক, পরামাণিক প্রভৃতি সকল জাতির লোকই দেখা যায়। তাহাদের মুখেই শুনা যায়, এই স্থানে তাহাদের পূর্ব্বতন সপ্তপুরুষ বসবাস করিয়া আসিতেছেন। করোর ব্যতীত আরও কয়েকটি গ্রামে এইরূপ বাঙ্গালীর প্রাচীন উপনিবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। তবে তাহারা সংখ্যায় অল্প।

এ সমস্ত বাঙ্গালী কোথা হইতে আসিল? প্রায়শঃ বর্দ্ধমান, মানভূম, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর অঞ্চল হইতে ইহাদের পূর্ব্বপুরুষরা কৃষি বা শিল্প-বাণিজ্যের উদ্দেশে এই সুদূর পার্ব্বত্য অরণ্যপ্রদেশে উদরান্ন সংস্থানের জন্য আসিয়াছিল। তাহারা স্থানীয় বন্য অসভ্য সাঁওতালদিগের উপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাদিগকে ক্রমশঃ ‘আপনার’ করিয়া লইয়া এই সকল স্থানে ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, অথবা জমীর মালিক হইয়া কৃষিকার্য্যের দ্বারা লক্ষ্মী-দেবীকে বরণ করিয়া ঘরে তুলিয়াছে।

কিন্তু বাঙ্গালীরা কেবল স্বার্থসাধনোদ্দেশে এ দেশে বসবাস করে নাই। তাহারা যেমন সাঁওতাল পরগণাকে জন্মভূমি করিয়া তাহারই পীযূষ-স্তন্যে পুষ্ট হইয়া আসিতেছে, তেমনই সেই জন্মভূমিকেও তাহাদের নিজস্ব অনেক দান করিয়াছে। তাহারা তাহাদের ভাব, ভাষা, আচার ব্যবহার, ধর্ম্ম-কর্ম্ম অসভ্য দরিদ্র নিরক্ষর সাঁওতাল ভ্রাতৃবৃন্দকে উপহার দিয়াছে। এখন সাঁওতাল পরগণার আদিম নিবাসীরা তাহাদেরই মত ভাঙ্গা ভাঙ্গা সুমিষ্ট সুরে বাঙ্গালাভাষায় কথা কহিতে অভ্যস্ত হইয়াছে, বাঙ্গালী হিন্দুর মনসাপূজা, কালীপূজা আপনাদের করিয়া লইয়াছে। শ্রাবণ মাসে কারমাটারে থাকিতে দেখিয়াছি, স্থানীয় আদিম নিবাসীরা মনসাপূজায় বাঙ্গালীর মনসার গানের উদ্যোগ-আয়োজন করিয়াছে, বাঙ্গালী খোল-করতাল সহযোগে মনসাতলায় মনসার গান গাহিতেছে, আর বহুসংখ্যক সাঁওতাল নরনারী একাগ্রচিত্তে তাহা শুনিয়া আনন্দ উপভোগ করিতেছে। সেই কীর্ত্তনের দল করোর গ্রাম হইতে আনীত হইয়াছে।

বাঙ্গালীর সহিত একত্র বসবাসের ফলে আদিম নিবাসীরা সভ্যতার আলোক প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারাও ভদ্র গৃহস্থের মত বসবাস করিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। তাহারাও বাঙ্গালীর সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, পূজা-পার্ব্বণাদিতে যোগদান করিতেছে। ফল কথা, তাহারা বাঙ্গালী হিন্দুর বৈশিষ্ট্যের প্রভাবে যতদূর সম্ভব প্রভাবাম্বিত হইয়াছে.

কার্মাটার হইতে করোর যাইবার মাঝামাঝি পথে খৃষ্টান মিশনারীদের একটি বড় আস্তানা আছে। সেখানে মিশনারীরা স্কুল, হাঁসপাতাল, বাগ-বাগিচা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করিয়া স্থানটিকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। সেখানে গেলে দেখা যায়, সাঁওতাল খৃষ্টান নরনারী খৃষ্টান সভ্যতার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছে। কিন্তু ইংরাজ শাসনের প্রথম আমলে এই যে সাঁওতালদের মধ্যে খৃষ্টান-প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল, সে প্রভাবের গতি বাঙ্গালী হিন্দুই রুদ্ধ করিয়াছে। এখন আর সাঁওতালরা খৃষ্টান হয় না। দুর্ভিক্ষের সময় যদিও বা দুই এক জন সাঁওতাল পেটের জ্বালায় খৃষ্টানধর্ম্ম গ্রহণ করে, কিন্তু আবার স্বচ্ছলতার সময় আসিলেই তাহারা পুনরায় হিন্দুধর্ম্মে প্রত্যাবর্ত্তন করে। বাঙ্গালী হিন্দুর এই প্রভাব বড় সামান্য নহে। আজ যদি বাঙ্গালী হিন্দু সাঁওতাল পরগণায় উপনিবেশ স্থাপন না করিত, তাহা হইলে সমগ্র সাঁওতাল পরগণা যে খৃষ্টান হইয়া যাইত না, তাহাই বা কে বলিতে পারে? ভারতের সমগ্র হিন্দুজাতি এ জন্য বাঙ্গালীর নিকট কৃতজ্ঞ থাকিতে পারেন সন্দেহ নাই। বাঙ্গালী হিন্দু সাঁওতালদিগকে মুসলমান মৌলভী ও মোল্লার প্রভাব হইতেও রক্ষা করিয়াছে। বাঙ্গালীর এ কৃতিত্ব সামান্য নহে।

এই যে মধুপুর, গিরিডি, বৈদ্যনাথ প্রভৃতি স্থানে সৌধকিরীটিনী নগরী সমূহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইহার মূলেও বাঙ্গালীর কৃতিত্ব অস্বীকার করা যায় না। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে মধুপুর একখানি ক্ষুদ্র গ্রামমাত্র ছিল। বৈদ্যনাথ বা গিরিডিরও অবস্থা তদ্রূপ ছিল। কিন্তু স্বাস্থ্যান্বেষণে বাঙ্গালী যে দিন হইতে এই সকল স্থানে গৃহ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই দিন হইতে এই সকল স্থানের সৌভাগ্যের ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। মধুপুরে তখন ক্ষুদ্র বাজারের পরে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে বাঙ্গালীর মাত্র ৫।৬ খানি বাংলো নির্ম্মিত হইয়াছিল, অবশিষ্ট প্রান্তরে গোরা সেনাদের Rest Camp ছিল। মধুপুরের বাজার-হাটও ক্ষুদ্রায়তন ছিল। কিন্তু এখন মধুপুর এত বড় সহরে পরিণত হইয়াছে যে, সেখানে পাওয়া যায় না, এমন নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য নাই বলিলেও চলে। মিউনিসিপ্যালিটী, ষ্ট্রীট, লেন, পল্লী, স্কুল, হাঁসপাতাল, ঔষধালয়, ক্লাব, হোটেল,—কিছুরই অভাব নাই। যেখানে রেষ্ট ক্যাম্প ছিল, সেখানে এখন বড় বড় বাড়ী হইয়াছে, এমন কি, মধুপুর হইতে ২ মাইল দূরে পাতরোল নদীর কিনারা পর্য্যন্ত লোকের বসতি হইয়াছে। কত লোক যে এখন মধুপুরে অন্নসংস্থান করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

গিরিডি ও বৈদ্যনাথও বড় বড় সহরে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু ঐ দুটি স্থানের সহরে পরিণতির অন্য কারণ আছে। গিরিডি কয়লার খনি ও অভ্রের কারবারের জন্য প্রসিদ্ধ, বৈদ্যনাথ দেবস্থান, হিন্দুর তীর্থ। সুতরাং এই দুই স্থানে সহর গড়িয়া উঠা আশ্চর্য্যের কথা নহে। কিন্তু মধুপুর সম্বন্ধে এ কথা বলা যায় না। এই প্রকাণ্ড সহর বাঙ্গালীই গড়িয়া তুলিয়াছে। মধুপুরে বাঙ্গালীর উপনিবেশস্থাপনের সম্যক্ পরিচয় পরিস্ফুট।

বাঙ্গালীর যে সাহস, উদ্যমশীলতা, অধ্যবসায় নাই, এ কথা কেহ জোর করিয়া বলিতে পারেন না। অন্ততঃ সাঁওতাল পরগণায় বাঙ্গালীর উপনিবেশসমূহ দেখিলে এ কথার যাথার্থ্য সহজেই উপলব্ধি হয়। কারমাটারে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একখানা 'বাংলো' আছে, এ কথা বাঙ্গালীমাত্রেই জানেন। রেলষ্টেশনের অতি নিকটে বর্ত্তমান বাজারের গায়ে এই 'বাংলো'খানি অবস্থিত। খাপরার ছাদ-সমন্বিত প্রাচীন 'বাংলো' এখন আর নাই, কলিকাতার ধনী সিংহদাস মল্লিক মহাশয় এখানি ক্রয় করিয়া এখন একতল ইষ্টকালয়ে পরিণত করিয়াছেন এবং ঐ ইমারতে একখানি প্রস্তরফলকে লিখিয়া দিয়াছেন, "বিদ্যাসাগরের চরণাশ্রিত সিংহদাস মল্লিক।" বিদ্যাসাগর মহাশয় নাই, তাহার 'বাংলো'ও হস্তান্তরিত হইয়াছে, কিন্তু এখনও তাঁহার নাম কারমাটারে লুপ্ত হয় নাই। এখনও সেখানে প্রাচীন অধিবাসীরা তাঁহার নাম করিয়া থাকে। স্থানীয় নীলাম্বর মিস্ত্রী পরিণত-বয়স্ক; সে শিশুকালে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এখানে দেখিয়াছিল। সে বলে, বাঙ্গালী বিদ্যাসাগরই এই কারমাটারের পার্ব্বত্য জঙ্গলকে জনপদে পরিণত করিবার মূল। তিনি এই স্থানে মাঝে মাঝে বাস করিয়া সাঁওতালদিগের সহিত মিলামিশা করিতেন, তাহাদের সুখে-দুঃখে সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেন, তাহাদের মানসিক উন্নতির নিমিত্ত যথেষ্ট পরিশ্রম করিতেন। তাঁহার পুণ্যময় সংস্রবে আসিয়া বহু সাঁওতাল বাঙ্গালাভাষা শিখিয়াছিল, বাঙ্গালীর মত থাকিতে অভ্যস্ত হইয়াছিল, বাঙ্গালীর আচার-ব্যবহার ও ধর্ম্মকর্ম্ম পালন করিত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই প্রভাব সামান্য নহে। এখনও সেই জন্য এই 'বিদ্যাসাগর বাংলো' বাঙ্গালীর তীর্থক্ষেত্ররূপে পরিগণিত। প্রবাসী বাঙ্গালী এখানে আসিলেই 'বিদ্যাসাগর বাংলো' না দেখিয়া পারে না। বাঙ্গালী বিদ্যাসাগরের নামে এখনও বহু বৃদ্ধ সাঁওতালের চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হয়।

বাঙ্গালীর এই প্রভাব ভারতের নানা দিকে বিসর্পিত। বাঙ্গালী যেখানে বসবাস করিয়াছে, সেইখানেই তাহার বৈশিষ্ট্যের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। পশ্চিমের যে কোন সহরে যাওয়া যায়, সেইখানেই বাঙ্গালীর কালীবাড়ী, বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব, বাঙ্গালীর ক্লাব-লাইব্রেরী, বাঙ্গালীর স্কুল, বাঙ্গালীর আচার-ব্যবহার, বাঙ্গালীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, বাঙ্গালীর মনীষা, বাঙ্গালীর যাত্রা-থিয়েটার, বাঙ্গালীর ব্যায়াম ও সঙ্গীতচর্চ্চা আপনার বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে, অধিকন্তু তাহার প্রভাবে অপর জাতিকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। বাঙ্গালীর কলিকাতা বা বঙ্গদেশে ভিন্নদেশীয় ভারতবাসী বহুদিন বসবাস করিলে তাহাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্যের বহুলাংশ হারাইয়া ফেলে, এ দৃশ্য নূতন নহে। কলিকাতায় বহু মাদ্রাজী, উড়িয়া, মাড়োয়ারী, ভাটিয়া,—বাঙ্গালীর সাজে সাজিতে অভ্যস্ত হইয়াছে, বাঙ্গালীর মত খাইতে পরিতে শিখিয়াছে, প্রায় সকল বিষয়ে বাঙ্গালীকে অনুকরণ করিতেছে। কিন্তু বাঙ্গালী সর্ব্বত্রই নিজের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। অবশ্য অপর দেশের ভাষার প্রভাব যে বাঙ্গালীর উপর একবারে বিস্তৃত হয় নাই, এমন কথা বলিতে পারা যায় না, কিন্তু পোষাক-পরিচ্ছদে, আচার-ব্যবহারে, আমোদ-প্রমোদে, ধর্ম্মে-কর্ম্মে বাঙ্গালা সর্ব্বত্র বাঙ্গালীই আছে, অধিকন্তু অপর জাতিকে তাহার বৈশিষ্ট্যে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। রাজপুতানার জয়পুরাদি সহরে বাঙ্গালী চাকুরীয়া রাজ-সরকারে চাকুরী করিবার কালে স্থানীয় পরিচ্ছদে ভূষিত হয় বটে, কিন্তু অন্যত্র ঘরে-বাহিরে বাঙ্গালী সাজিয়াই থাকে। এ দেশে কিন্তু মাড়োয়ারী বা উড়িয়া বাঙ্গালীর কাপড়েই ভূষিত হইয়া কর্ম্মস্থানে যাইতে অভ্যস্ত হইয়াছে।

বাঙ্গালীর এই যে Colonisation এর ক্ষমতা, ইহার অস্তিত্ব কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। বাঙ্গালী যদি এই ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করিতে শিখে, তাহা হইলে বাঙ্গালী সমগ্র ভারতে চিরদিন আপনার প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবে।

## সম্পাদকের দায়িত্ব

কলিকাতার দাঙ্গা ও হাঙ্গামা সম্পর্কে স্থানীয় কয়েকখানি সংবাদপত্রের নামে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবুদ্ধির অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছিল। ইহার মধ্যে দুইটি মামলার কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য,—( ১ ) 'ফরওয়ার্ড' পত্রের নামে অভিযোগ এবং ( ২ ) 'দৈনিক বসুমতী' পত্রের নামে অভিযোগ। 'ফরওয়ার্ড' পত্র একখানি মুদ্রিত ও প্রচারিত পুস্তিকা প্রকাশ করিলে তাহার উপর অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঐ পুস্তিকা বা প্যাম্ফ্লেটে মুসলমানদিগকে হিন্দুর

বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রকাশ করিতে উত্তেজিত করা হইয়াছিল। 'ফরওয়ার্ড' ঐ পুস্তিকা উদ্ধৃত করিয়া উহার দ্বারা সমাজের পক্ষে কি ক্ষতি হইতেছে, তাহার প্রতি কর্তৃপক্ষের ও সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন, অন্ততঃ তাঁহারা আত্মপক্ষসমর্থনে এই কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। তথাপি নিম্ন আদালতে 'ফরওয়ার্ডের' দণ্ড হইয়াছিল। হাইকোর্টে আপীলের ফলে বিচারপতি র‍্যাঙ্কিন রায়ে বলিয়াছিলেন, "এই ব্যাপারে 'ফরওয়ার্ড' পত্র সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত ও আইনসঙ্গত সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা প্রকাশ করিয়া তাঁহারা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবৃদ্ধির চেষ্টা করেন নাই। যদিও বা এরূপ সম্ভব হয় যে, কোন কোন লোক ইহা পাঠ করিয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতি অন্যায়রূপে বিদ্বেষবুদ্ধি-প্রণোদিত হইতে পারে, তাহা হইলেও এই ভাবের সংবাদ প্রকাশ করিয়া সংবাদপত্র কোনও অপরাধে অপরাধী হইতে পারে না।" বিচারপতি র‍্যাঙ্কিন এ ক্ষেত্রে সম্পাদকের বিদ্বেষবুদ্ধির কোনও পরিচয়ই প্রাপ্ত হয়েন নাই। সুতরাং তাঁহাকে পিনাল কোডের ১৫৩ ক ধারার আইনে অপরাধী বলিয়া মনে করেন নাই।

অপরটি 'দৈনিক বসুমতীর' মামলা। উক্ত পত্রে কলিকাতার দাঙ্গার সময়ে একটি তারের সংবাদ প্রকাশিত হয়। তারের সংবাদের মর্ম এইরূপ যে, মরিশস দ্বীপের কোনও মুসলমান ভদ্রলোক নাখোদা মসজেদের ইমামকে তারে জানাইতেছেন যে, মুসলমানদিগের পক্ষ হইতে দাঙ্গা চালান হউক, তিনি অর্থ লইয়া, মুসলমান ভ্রাতাদিগকে সাহায্যদানের জন্য শীঘ্র আসিতেছেন। এই সংবাদ ব্যতীত আর একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধও মামলার অভিযোগের বিষয় ছিল। এই দুইটি সূত্র উপলক্ষ করিয়া 'দৈনিক বসুমতী'-সম্পাদকের ও প্রিণ্টারের নামে কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫৩ ক ধারা অনুসারে অভিযোগ উপস্থিত করা হয়। বিচারক প্রবন্ধ সম্বন্ধে অভিযোগ হইতে সম্পাদক ও মুদ্রাকরকে অব্যাহতি প্রদান করেন; কিন্তু তারের সংবাদ প্রকাশের জন্য উভয়কে দায়ী ও অপরাধী করিয়া ফৌজদারী দণ্ডবিধির ৫৬২ ধারা অনুসারে ভবিষ্যতে সাবধান হইতে বলিয়া দেন।

এই দণ্ডের বিপক্ষে হাইকোর্টে আপীল হয়। বিচারপতি চৌজনার ও ডুবালের বিচারে দণ্ডিত আসামীরা নির্দ্দোষ বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছেন। বিচারপতি চৌজনার রায়ে বলিয়াছেন, "মরিশস হইতে যে তার আসিয়াছিল এবং 'দৈনিক বসুমতীতে' উহার যে অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা মিলাইয়া দেখিয়া ধারণা হয় যে, উক্ত তার পাঠ করিয়া তাহার এইরূপ অনুবাদ করা যায়। যদি তারের মর্ম যথার্থই এইরূপ হয়, তাহা হইলে দেখিতে হইবে, সম্পাদক বা মুদ্রাকর ইহা আইন অনুসারে প্রকাশ করিতে পারেন কি না। আমি বিচার করিয়া দেখিলাম যে, এই ক্ষেত্রে অভিযুক্তদিগের বিপক্ষে দণ্ড দিবার ম্যাজিষ্ট্রেটের কোনও কারণ ছিল না। এই হেতু আমি তাঁহাদিগের বিপক্ষে ফৌজদারী দণ্ডবিধির ৫৬২ ধারা অনুসারে সতর্ক করিয়া দিবার [illegible] নাকচ করিয়া দিলাম।"

এই দুইটি মামলার বিচারফল সংবাদপত্র-সম্পাদকের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হয়। ভারতে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সম্প্রতি যে বিরোধ ও সংঘর্ষ দেখা দিয়াছে, তাহাতে সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোন্ প্রবন্ধ বা কোন্ সংবাদ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বৃদ্ধি করিবে, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। হিন্দু বা মুসলমান,—যে কোন সংবাদপত্রে যদি স্ব স্ব সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের বক্তৃতা প্রকাশিত হয়, তাহা হইতে বিদ্বেষের গন্ধ খুঁজিয়া বাহির করিতে কষ্ট হয় না। কেন না, প্রত্যেকেই স্ব স্ব সম্প্রদায়ের পক্ষে ও ভিন্ন সম্প্রদায়ের বিপক্ষে অভিমত প্রকাশ করিতে পারেন, ইহা স্বাভাবিক, কোথাও উভয় পক্ষে সংঘর্ষ [illegible] আপন সম্প্রদায়ের পক্ষে ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিপক্ষে যে সংবাদ প্রাপ্ত হয়েন, তাহা প্রকাশ করিতে স্বভাবতঃই উৎসুক হয়েন। কিন্তু তাহাতেই [illegible] পরস্পর বিদ্বেষবৃদ্ধির প্রকাশের গন্ধ পাওয়া যায়, এমন কথা কেহ বলিতে পারেন না।

দেখিতে হইবে, প্রবন্ধ বা সংবাদ প্রকাশের উদ্দেশ্য কি। যে সংবাদপত্র ইচ্ছা পূর্ব্বক মিথ্যা সংবাদ রটনা করিয়া আপন সম্প্রদায়ের লোককে ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের বিপক্ষে উত্তেজিত করে, তাহার কথা স্বতন্ত্র। কোন কোন ক্ষেত্রে এই দাঙ্গা উপলক্ষে দেখা গিয়াছে যে, এক শ্রেণীর সংবাদপত্র ক্রমাগত ভিন্ন সম্প্রদায়ের বিপক্ষে লেখনী চালনা করিয়াছে, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলনের কোনও চেষ্টাই করে নাই। অথচ এই সকল সংবাদপত্রের রচনা অভিযোগের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু যে সকল সংবাদপত্র চিরদিন হিন্দু মুসলমানে মিলন-সংঘটনে প্রয়াস পাইয়াছে, যাহাদের লক্ষ্য,—হিন্দু-মুসলমান-মিলনের ভিত্তির উপর ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা, তাহাদের প্রকাশিত প্রবন্ধ বা সংবাদের বিপক্ষে অভিযোগ আনয়ন করিতে হইলে দেখা কর্ত্তব্য যে, কি উদ্দেশ্যে ঐ প্রবন্ধ বা সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। 'দৈনিক বসুমতী' বা 'ফরওয়ার্ড' চিরদিনই হিন্দু-মুসলমান মিলন কামনা করিয়া আসিয়াছে, এ কথা উক্ত পত্রদ্বয়ের নিত্য পাঠক অবশ্যই স্বীকার করিবেন। সুতরাং এই দুই পত্রে কেন 'উর্দ্দু পুস্তিকার রচনা' অথবা মরিশসের সংবাদ প্রকাশিত হইল, তাহার উদ্দেশ্য অনুসন্ধান করিয়া তাহাদের বিপক্ষে অভিযোগ আনয়ন করা কর্ত্তব্য ছিল। দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিচারালয়ের সিদ্ধান্তে স্থির হইয়াছে যে, এই দুইটি বিষয় সম্পূর্ণ আইন ও ন্যায়সঙ্গতভাবে উক্ত সংবাদপত্রদ্বয়ে প্রকাশিত হইয়াছে। এই ভাবের পুস্তিকা প্রচারিত হওয়ায় দেশে কি অমঙ্গলের বিষ বিসর্পিত হইতেছে, তাহাই কর্তৃপক্ষকে ও জনসাধারণকে প্রদর্শন করা 'ফরওয়ার্ডের' উদ্দেশ্য ছিল। পরন্তু মরিশসের তার যথার্থ কি না এবং ঐ সম্বন্ধে নাখোদা মসজেদের ইমাম কি কৈফিয়ৎ দিতে চাহেন, তাহাই নির্ণয় করা 'দৈনিক বসুমতীর' উদ্দেশ্য ছিল। এই ভাবের তার সেই দাঙ্গার সময়ে কিরূপ অনিষ্টকর, তাহা সহজেই অনুমেয়। সমাজের সেই অনিষ্ট নিবারণকল্পে উক্ত সংবাদপত্র উহার প্রতি কর্তৃপক্ষের ও জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। এই উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলে উক্ত সংবাদপত্রদ্বয়ের বিপক্ষে অভিযোগ আনয়ন করা সম্ভবপর [illegible] না, বিচারালয়ে দণ্ডেরও অবসর হয় না। সরকার বাহাদুর যাঁহাদের উপর এই ভার দিয়া নিশ্চিন্ত আছেন, তাঁহাদের এ বিষয়ে অবহিত হওয়া কর্ত্তব্য ছিল। অনর্থক নির্দ্দোষ সংবাদপত্রকে হায়রাণ করিয়া ও অনর্থক অর্থব্যয়ে বাধ্য করিয়া তাঁহারা কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন বলিয়া মনে করা যায় না। যে দুইখানি সংবাদপত্রের এই অনর্থক হায়রাণি হইল, তাঁহাদের যদি উক্ত আদালতে বিচারপ্রার্থী হইবার সামর্থ্য না থাকিত, তাহা হইলে কি হইত? তাঁহাদের এই অনর্থক অর্থব্যয়ের ক্ষতিপূরণ করিবে কে?

## পুলিপোলাও

এ দেশে যাহারা রাজদ্বারে দণ্ডিত হইয়া আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে নির্ব্বাসিত হয়, তাহাদিগকে পুলিপোলাও চালান দেওয়া হইয়াছে, এই কথা এ দেশের সাধারণ লোক বলিয়া থাকে। পুলিপোলাও চালানী ব্যাপার বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে।

৬ বৎসর পূর্ব্বে জেল কমিটীর উপদেশ অনুসারে ভারত সরকার পোর্ট ব্লেয়ারের (আন্দামানের প্রধান সহর) কয়েদী উপনিবেশ একেবারে তুলিয়া দিবেন বলিয়া ঘোষণা করেন। তবে একবারে একসঙ্গেই [illegible] সকল কয়েদীকে পোর্ট

ব্লেয়ার হইতে ভারতের জেলে স্থানান্তরিত করা হইবে, এমন কথা ভারত সরকার বলেন নাই। ইহার কারণ এই যে, ইহাদের সকলের জন্ত একসঙ্গে ভারতের জেলসমূহে স্থান সঙ্কুলান হইত না। এই হেতু স্থির হয় যে, ক্রমে ক্রমে কয়েক বৎসরের মধ্যে কয়েদীদিগকে স্থানান্তরিত করিয়া এই কয়েদী-নিবাসটিকে উঠাইয়া দেওয়া হইবে এবং প্রার্থীকে ঐ স্থানে স্বাধীনভাবে বাস করিয়া স্থানটিকে একটি উপনিবেশে পরিণত করিবার সুযোগ দেওয়া হইবে।

কিন্তু জেল কমিটীর উপদেশ এ যাবৎ পালিত হইবার লক্ষণ দেখা যায় নাই। ব্যবস্থা পরিষদে স্বরাষ্ট্র-সচিব স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন যে, আন্দামান অত্যন্ত স্যাঁতসেঁতে, জ্বর ও ম্যালেরিয়ার আবাসভূমি। ইহাও জানা গিয়াছে যে, আন্দামানের কয়েদীদিগের মধ্যে অধিকাংশই ভারতে ফিরিয়া আসিতে চাহে। অথচ জেল কমিটীর পরামর্শ ও উপদেশ সত্ত্বেও এ যাবৎ কেন যে আন্দামানের কয়েদীনিবাস ভাঙ্গিয়া দিবার ভিত্তিপত্তন করা হইল না, ইহার একটা নিগূঢ় কারণ থাকা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

ভারত সরকার যখন এই কয়েদীনিবাস তুলিয়া দেওয়া তাঁহাদের শাসন-নীতির অঙ্গ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন, তখন সকলেই মনে করিয়াছিলেন, এই নীতি অক্ষরে অক্ষরে না হইলেও অন্ততঃ আংশিকভাবেও পালিত হইবে। কিন্তু এখনও আন্দামানে কয়েদী শ্রমিকের চাহিদা হ্রাস করা হয় নাই; পরন্তু বহুসংখ্যক মোপলা কয়েদীকে আন্দামানে প্রেরণ করা হইয়াছে। তাহাদের চাষবাসের ও স্থায়ী বসবাসেরও জন্ত সুবাবস্থা করা হইয়াছে। ইহার কারণ কি?

নৈতিক হিসাবে মানুষের চরিত্র-সংশোধনের চেষ্টা করাই সকল সভ্য সরকারের দণ্ডপ্রদানের উদ্দেশ্ত। কিন্তু আন্দামানে কয়েদীদিগকে যে ভাবে জীবন যাপন করিতে দেওয়া হয়, তাহাতে তাহাদের চরিত্র সংশোধনের উপায় থাকে বলিয়া মনে হয় না। আন্দামানে পুরুষ-কয়েদীর সংখ্যা স্ত্রী-কয়েদীর অপেক্ষা বহুল পরিমাণে অধিক। এই অবস্থায় যাহা অবশ্যম্ভাবী, তাহা ঘটিয়া থাকে। পুরুষ ও স্ত্রী কয়েদীদিগের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষরূপে বসবাস করা অসম্ভব হইয়া থাকে। প্রায়ই দেখা যায়, উহারা চরিত্রহীন হইয়া পশুবৎ জীবন যাপন করে। নৈতিক হিসাবে ইহা অতীব নিন্দনীয়। ইহা ছাড়া আন্দামানের স্বাস্থ্যও ভাল নহে। স্বরাষ্ট্রসচিবের মতে এই স্থান কয়েদীর স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টজনক। এই কারণে এখানে হইতে কয়েদীনিবাস উঠাইয়া দেওয়াই বৃটিশ সরকারের মত সভ্য সরকারের অবশ্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু সে কর্ত্তব্যের পথে প্রবল অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছে।

আসল কথা এই যে, এই কয়েদীনিবাস আজ ৪০ বৎসর যাবৎ ভারত সরকারের স্কন্ধে অতিরিক্ত ব্যয়ের ভার চাপাইয়া আসিতেছে। সম্ভবতঃ এই কারণেই কয়েদীনিবাস উঠাইয়া দিবার কথা ধার্য্য হইয়াছিল। জ্বর ও আমাশয় রোগে কয়েদীদের মধ্যে প্রতি বৎসর মৃত্যুসংখ্যা অত্যন্ত অধিক হইয়া থাকে, কয়েদীরা স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যার অসামঞ্জস্ত হেতু চরিত্রহীনও হইয়া থাকে। ইহাও কয়েদীনিবাস উঠাইয়া দিবার সঙ্কল্পের অন্যতম কারণ হইতে পারে, কিন্তু মূল কারণ যে ব্যয়াধিক্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। সরকার যে অনুপাতে এই কয়েদীনিবাসে ব্যয় করেন, সেই অনুপাতে লাভবান্ হইতে পারেন না। আমাদের মনে হয়, যদি সরকার বুঝিতেন যে, কয়েদীনিবাসে আয়ের সম্ভাবনা আছে, তাহা হইলে সম্ভবতঃ অন্ত কারণ থাকিলেও সরকার কয়েদীনিবাস উঠাইয়া দিবার সঙ্কল্প করিতেন না।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে সরকার একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, এই কয়েদীনিবাস আয়ের কারণ হইতে পারে কি না। এতদর্থে সেই সময় আন্দামানের চীফ কমিশনার কর্ণেল ডাগলাসকে এ বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান করিবার ভার প্রদান করা হয়। তিনি অনুসন্ধান করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন যে, যদি কয়েদীদিগকে এক এক কেন্দ্রে অধিক সংখ্যায় রাখা যায়, তাহা হইলে তাহাতে তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় বহুল পরিমাণে হ্রাস হয়; পরন্ত কলকজার আমদানী ও কারখানাসমূহ প্রতিষ্ঠা করিয়া যদি কয়েদীদিগের শ্রমের দ্বারা কৃষি ও শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিসাধন করা যায়, তাহা হইলে উহার ফলে সরকারের একটা বিশেষ আয়ের পথ উন্মুক্ত হয়। দ্বীপপুঞ্জে নারিকেলবৃক্ষের অভাব নাই। উহা হইতে দড়ী, তৈল ও ছোবড়ার ব্যবসায় চালান সম্ভবপর হইতে পারে। কয়েদীদিগের শ্রম বিনামূল্যে পাওয়া গেলে এবং এই কারবারের জন্ত কারখানা প্রতিষ্ঠা করিলে আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে এই ব্যবসায় সুন্দররূপে চালান যাইতে পারে। ইহা ছাড়া দ্বীপে রবারের চাষও অল্প নহে। জঙ্গলে সরকারের রক্ষিত গাছ হইতে কাঠের ব্যবসায়ও চলিতে পারে। অন্ত স্থান হইতে পয়সা দিয়া কুলী-মজুর আনাইয়া ব্যবসায় চালান কষ্টসাধ্য, অধিকন্তু ব্যয়সাপেক্ষ। কিন্তু যদি কয়েদীদিগের মূল্যহীন শ্রমের সাহায্যে ব্যবসায় চালান যায়, তাহা হইলে সরকারের বিশেষ আয়ের সুবিধা হইতে পারে। এই সকল কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইলে উহাদের কল্যাণে বহু অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ও য়ুরোপীয়ের উদরান্নের সংস্থান হইতে পারে। সম্ভবতঃ এই হেতু কর্ণেল সিডনি আন্দামানে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান উপনিবেশ স্থাপনের স্বপ্ন দেখিয়াছেন।

যাহাই হউক, কর্ণেল ডাগলাস তাঁহার রিপোর্টে সরকারকে যে লোভ দেখাইয়াছেন, তাহা বিফল হয় নাই। আন্দামান অস্বাস্থ্যকর হইলেও এবং আন্দামানে কয়েদীদিগের চরিত্রহীন হইবার বিশেষ সম্ভাবনা থাকিলেও যখন আন্দামানে আয়ের সম্ভাবনা আছে তখন জেল কমিটীর পরামর্শ যে শীঘ্র গৃহীত হইবে না, তাহাতে সন্দেহ নাই। সভ্য সরকারের এ সম্বন্ধে বলিবার কি আছে?

## নূতন শৃঙ্খল

এই ব্যুরোক্রেসী-শাসিত দেশে সংবাদপত্র-সেবীদিগকে কি বিপদ মাথায় করিয়া সংবাদ ও মতামত সরবরাহ করিতে হয়, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। রাজদ্রোহ আইনের ভীষণ খড়্গ সদাই তাহাদের মস্তকের উপর দোদুল্যমান—কখন্ Disaffection অর্থে want of affection-এর অনুযায়ী নীতি অনুসরণ করিয়া তাহাদের রচনায় রাজদ্রোহ খুঁজিয়া বাহির করা হয়, তাহার স্থিরতা নাই। সেই রাজদ্রোহের অভিযোগে তাহাদের কাগজ সরকারে বাজেয়াপ্ত হইতে পারে, সম্পাদক ও মুদ্রাকরের জেল হইতে পারে।

এ ভয় ত আছেই, আবার এ ভয়ের উপরেও আর এক জুজুর ভয় উপস্থিত। ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র-সচিব স্যর আলেকজাণ্ডার মুড্ডিম্যান তাঁহার উর্ব্বর মস্তিষ্ক হইতে সংবাদপত্র এবং পুস্তক-পুস্তিকার জন্ত আর একটি নূতন শৃঙ্খলের সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি সরকার পক্ষ হইতে সাম্প্রদায়িক বিরোধের অবসান করিতে অতিমাত্র ব্যগ্রতা দেখাইয়া ব্যবস্থা পরিষদে এক নূতন আইন প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। প্রস্তাবের মর্ম্ম এই যে, সংবাদপত্রে ও পুস্তক-পুস্তিকায় যদি সম্প্রদায়গত বিদ্বেষ প্রচারিত হয়, তাহা হইলে ঐ সকল সংবাদপত্র ও পুস্তক-পুস্তিকা সরকারে বাজেয়াপ্ত করা হইবে। অর্থাৎ রাজদ্রোহ আইনে সরকার যে ক্ষমতা হস্তগত করিয়াছেন, এই আইনে তাহার উপর সম্প্রদায়গত বিরোধ সম্পর্কে দেশের সংবাদপত্র ও পুস্তক-পুস্তিকা সকলকে নূতন শৃঙ্খল পরাইবার ক্ষমতা হস্তগত করিবার সংকল্প করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, প্রস্তাব আইনে পরিণত হইয়াছে।

কোন সংবাদপত্র, পুস্তক বা পুস্তিকা যদি সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচার করে, তাহার দমনের জন্ত বিচারালয় আছে। এবারের

কলিকাতার দাঙ্গা উপলক্ষে এ বিষয়ে বহু সংবাদপত্রের বিচারালয়ে প্রকাশ্য বিচার হইয়া গিয়াছে। বিচারে কোন কোন সংবাদপত্র দণ্ডিতও হইয়াছিল। কিন্তু উচ্চতর আদালতে আপীলের ফলে কোন কোন সংবাদপত্র নির্দ্দোষ সাব্যস্ত হইয়া অব্যাহতি লাভও করিয়াছে। বোধ হয়, ইহাতে দায়িত্বহীন আমলাতন্ত্র সরকারের মনস্তুষ্টি হয় নাই। তাহারই জন্য সরকার বিচারের অপেক্ষা না রাখিয়াই স্বহস্তে দণ্ডের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। সরকারের শাসন বিভাগ যদি দেখেন, তাঁহাদের মতে (In the opinion of the Government) কোনও সংবাদপত্র, পুস্তক বা পুস্তিকা এ বিষয়ে অপরাধী হইয়াছে, তাহা হইলে ঐ সকল সংবাদপত্র, পুস্তক বা পুস্তিকা বাজেয়াপ্ত করিয়া উহাদিগকে দণ্ডিত করিবেন। ইহার জন্য প্রকাশ্য বিচারের কোন আবশ্যকতা থাকিবে না, অথবা সরকারের দণ্ডাদেশের বিপক্ষে কোনও আপীলও থাকিবে না। ইহা কি চমৎকার ব্যবস্থা নহে?

ব্যবস্থাপরিষদে এই বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন যে হয় নাই, তাহা নহে। শ্রীযুক্ত রঙ্গ চারিয়ার, শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী প্রমুখ সদস্যগণ বিলের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। পণ্ডিত মদনমোহন ও লালা লাজপৎ রায় সরকারের এই ক্ষমতালাভ ক্ষমতা অপব্যবহারের কারণ হইতে পারে বলিয়া নানা দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। ডাক্তার সার হরি সিং গৌর বিলখানি প্রচার করিয়া জনসাধারণের মতামত সংগ্রহ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র রায় বিলখানির বিচার-আলোচনার ভার এক সিলেক্ট কমিটীর হস্তে দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রঙ্গচারিয়ার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, অন্ততঃ উপযুক্ত বিচারক যদি সিদ্ধান্ত করেন যে, রচনা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচার করিয়াছে, তাহা হইলে শাসন-বিভাগ দণ্ড দান করিবেন।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই। স্বরাজ্য দল ব্যবস্থাপরিষদে ইচ্ছাপূর্ব্বক উপস্থিত না থাকায় সরকার পক্ষ ভোটের জোরে বিল আইনে পরিণত করিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে স্বরাজ্য দলের মনের ভাব বুঝিয়া উঠা কঠিন। তাঁহারা কোন কোন বিলের আলোচনাকালে (যেমন কারেন্সী বিল) পরিষদে উপস্থিত থাকিয়া সরকারের বিপক্ষে দাঁড়াইয়াছিলেন, আবার আন্দামান বিল অথবা সংবাদপত্র-দলন বিলের আলোচনাকালে পরিষদের বাহিরে থাকিয়া আগামী নির্ব্বাচনের যুদ্ধের জন্য কোমর বাঁধিতেছিলেন! এ লীলা-খেলার অন্ত পাওয়া ভার। এ মনোবৃত্তির মূল কি, কেহ বুঝাইয়া দিতে পারেন কি? যে আইনে দেশের জনসাধারণের মতামত প্রকাশে বাধা প্রদান করে, তাহা তাঁহাদের ঔদাসীন্যে পাশ হইয়া গেল, ইহা কি পরিতাপের বিষয় নহে? যদি বুঝিতাম, তাঁহারা সরকারের সহিত অসহযোগ করিয়া সকল বিলের আলোচনায় ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহাদের নীতির সামঞ্জস্য আছে বুঝা যাইত। কিন্তু তাঁহারা যখন কাউন্সিলে বাধাপ্রদাননীতি অনুসরণ করিয়া কংগ্রেসের নামে কাউন্সিল প্রবেশ করিয়াছেন, তখন তাঁহাদের এই ব্যবহারে দেশের লোকের নিকট তাঁহারা কি কৈফিয়ৎ দিবেন?

এই বিল আইনে পরিণত হওয়ায় দেশের কি ক্ষতি হইল, তাহা একবার আলোচনা করা যাউক। শাসন বিভাগ যদি নিজ হস্তে বিচারের ক্ষমতা গ্রহণ করিয়া কোনও সংবাদপত্র, পুস্তক বা পুস্তিকাকে দোষী সাব্যস্ত করেন এবং ঐগুলিকে বাজেয়াপ্ত করিয়া দণ্ডিত করেন, তাহা হইলে উহারা প্রকৃত অপরাধী কি না, সাব্যস্ত করিবার কেহ থাকিবে না—সরকারই সে ক্ষেত্রে অভিযোক্তা, বিচারক ও দণ্ডদাতা। বাঙ্গালায় সম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় দুইখানি সংবাদপত্র সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-প্রচারের জন্য নিম্ন আদালতে অভিযুক্ত ও দণ্ডিত হইয়াছিল, অথচ উচ্চতর আদালতের আপীলের ফলে নির্দ্দোষ বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছিল ও অব্যাহতি লাভ করিয়াছিল। যদি উচ্চতর বিচারালয় ও আপীল না থাকিত, তাহা হইলে কি হইত? বর্ত্তমান আইনে 'সরকারের মতই' final, উহার উপরে কথা কহিবার কেহ রহিল না। ইহাতে কি ক্ষমতার অপব্যবহারের সম্ভাবনা থাকে না? এমন কি 'ষ্টেটসম্যান' পত্রও বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, "এমন অবস্থারও কল্পনা করা যাইতে পারে, যেখানে কোনও সম্প্রদায়ের নেতার বক্তৃতার রিপোর্ট অন্য সম্প্রদায়ের শত্রুতা ও হিংসাদ্বেষ সঞ্চার করিতে পারে। যে সংবাদপত্র ঐ রিপোর্ট জনসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ ও প্রচার করিবে, সেই সংবাদপত্র আপনার ধ্বংসের কারণ আপনিই ডাকিয়া আনিবে। হয় ত আইনের ইহা উদ্দেশ্য না হইতে পারে, কিন্তু সঙ্কীর্ণচেতা সরকারী শাসকের হস্তে পড়িলে এ ক্ষেত্রে যে আইনের অপব্যবহার হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে?" রাজদ্রোহ আইনে Disaffection অর্থে Want of affection যদি করিয়া লওয়া যাইতে পারে, তবে সাম্প্রদায়িক নেতামাত্রেরই বক্তৃতায় বিদ্বেষের গন্ধ খুঁজিয়া বাহির করিতে পারা যাইবে না কেন? সংবাদপত্রের কার্য্য সকল প্রকার সংবাদ সরবরাহ করা। সে জন্য জনসাধারণ তাহা মূল্য দিয়া ক্রয় করে। কিন্তু বক্তৃতাদি প্রকাশ করা যদি এরূপ বিপজ্জনক হয়, তাহা হইলে অতঃপর কোন্ সংবাদপত্র বাজেয়াপ্ত হইবার আশঙ্কা থাকিতে এ সকল বক্তৃতা প্রকাশ করিতে সাহসী হইবে? আর তাহা হইলে ক্রেতারাই বা কেন পয়সা খরচ করিয়া সংবাদপত্র ক্রয় করিবে? 'ষ্টেটসম্যানও' এ জন্য বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, "হিন্দু-মুসলমান-বিরোধ সম্পর্কে উভয় সম্প্রদায়ের যে কেহ কোন কথা লিখুন, তাহার মধ্যে যে বিদ্বেষের গন্ধ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না, তাহা কে বলিতে পারে? "সুতরাং হিন্দু-মুসলমান-বিরোধ সম্পর্কে যে কোন কথা লিখিত হউক না, তাহার জন্য সংবাদপত্র, পুস্তক বা পুস্তিকা বাজেয়াপ্ত করিবার ক্ষমতা এই আইনে দেওয়া হইয়াছে, এ কথা মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু এইভাবে সাম্প্রদায়িক তর্ক-বিতর্কের রচনাকে রাজদ্রোহের অপরাধের সহিত সমপর্য্যায়ে ফেলা যে আইনের বিপজ্জনক প্রসারবৃদ্ধির পরিচায়ক হয়, তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত।"

"ষ্টেটসম্যান" সরকারের শত্রু নহেন, বরং তিনি প্রায় সকল ক্ষেত্রেই সরকারের মতের সমর্থক। সুতরাং তিনি যে বিদ্বেষ-বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া এমন কথা বলিতেছেন, তাহা সম্ভব নহে, বরং তিনি সরকারের ভ্রান্তি দেখাইয়া দিয়া বন্ধুর কার্য্য করিয়াছেন। সরকার এই ভ্রান্তি অপনোদন করিবেন কি? মনে ত হয় না। যে উদ্দেশ্যে তাঁহারা এই নূতন শৃঙ্খল গড়িলেন, সে উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না, সাম্প্রদায়িক বিরোধ ইহাতে অবসান হইবে না। তবে এই নূতন শৃঙ্খল গঠনের অন্য উদ্দেশ্য কি? উহা কি দেশে অসন্তোষবৃদ্ধির অন্যতম কারণ হইবে না?

## মহাত্মা গন্ধীর বাণী

কয়েক জন হিন্দু ও মুসলমান নেতা দেশের এই সঙ্কটসঙ্কুল অবস্থায় মহাত্মা গন্ধীকে ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে পুনরায় নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। মহাত্মাজী তাহার উত্তরে যাহা বলিয়াছেন, তাহা কেবল তাঁহাতেই সম্ভব। দেশের লোক তাঁহার এই বাণী যদি হৃদয়ে ধারণ করিয়া মুক্তির পথে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হয়, তাহা হইলে দেশের মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী।

তিনি প্রথমেই বলিয়াছেন যে, তিনি রাজনীতিক্ষেত্র হইতে একবারে আপনাকে অপসারিত করেন নাই, মাত্র এক বৎসরের জন্য অবসর-ও বিশ্রাম গ্রহণ করিতেছিলেন। তাঁহার আশ্রমের কার্য্য এখনও শেষ হয় নাই, এখনও কিছু দিন তাঁহাকে তাহার জন্য আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, মহাত্মার

সবরমতী আশ্রম এ দেশের মধ্যে একটি আদর্শ আশ্রম, সেখানে প্রকৃত মানুষ গড়িয়া তোলা হয়। মহাত্মাজীর মঙ্গল হস্তস্পর্শের অভাবে আশ্রমের প্রভূত ক্ষতি হইতেছিল। যে আশ্রমে য়ুরোপের বিলাস-লালসাময় ক্ষেত্রে লালিতা-পালিতা কুমারী স্লেডের মত বিদুষী গুণবতী মহিলা ভারতের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইতে আসিয়াছেন, যে আশ্রমে ভারতের বহু ত্যাগী কর্ম্মী পুরুষ সংযম ও শৃঙ্খলায় অভ্যস্ত হইতেছেন, সে আশ্রমের উপকারিতা অবশ্যই স্বীকার্য্য। মহাত্মা সেই আশ্রমের উন্নতিকল্পে আত্মনিয়োগ করিয়া থাকেন, ইহা নিশ্চিতই বাঞ্ছনীয়। সেখানে মানুষ গড়িয়া উঠুক, ইহা কাহার না কাম্য? পরন্তু রাজনীতিক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরিশ্রমে মহাত্মার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। তাঁহার শরীরের ভালমন্দ দেখা সমগ্র জাতি ও দেশের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য। সুতরাং তাঁহার রাজনীতিক্ষেত্র হইতে দূরে থাকিয়া কিছু দিন বিশ্রাম গ্রহণ করাও কর্ত্তব্য হইয়াছিল। উপযুক্ত সময়ে মহাত্মা আবার যে দেশের রাজনীতির কর্ণ ধারণ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আপাততঃ তিনি রাজনীতিক্ষেত্রে নেতৃত্ব গ্রহণ না করিলেও তিনি দেশবাসীকে কর্ত্তব্য-পথ নির্দ্দেশ করিতে বিরত হয়েন নাই। তাঁহার প্রত্যেক বাণীতে তাঁহার আন্তরিক স্বাধীনতাকামনা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাঁহার অন্তরের উদারতা ও মহত্ত্বের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার বিশাল অন্তঃকরণে কাহারও প্রতি দ্বেষ-হিংসা বা ক্রোধ নাই, সকলের জন্য তাঁহার মুখে ভালবাসার বা সহানুভূতির কথা আছে। এমন কি, তিনি স্যার আবদর রহিমের মধ্যেও স্বদেশ-প্রেমের বীজ দেখিতে পাইয়াছেন। বর্ত্তমান সাম্প্রদায়িক বিরোধের মধ্যেও তিনি ভবিষ্যৎ একতা ও জাতীয়ত্বের বীজ নিহিত আছে দেখিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "একান্ত সহায়হীনতা ও কাপুরুষতা অপেক্ষা রক্তের পথ—বিবাদ-বিরোধের পথ বাঞ্ছনীয়।" মানুষ জড়ের মত বসিয়া থাকে, পুরুষকারকে বর্জ্জন করে, ইহা তাঁহার অভিপ্রেত নহে; বরং ইহা হইতে পরস্পর বিবাদে মনুষ্যত্বের ও শৌর্য্যের পরিচয় প্রদান করে, ইহাই বাঞ্ছনীয়। এই মনুষ্যত্বের ও শৌর্য্যের ভিত্তির উপরেই ভবিষ্যৎ জাতিগঠনের সৌধ গড়িয়া উঠিবে।

যাহারা আজ সাম্প্রদায়িক স্বার্থকে বড় করিয়া পরস্পর বিরোধ ও বিবাদ করিতেছে, তাহারাই ভবিষ্যতে বুঝিবে, একযোগে দেশের কার্য্য করা ব্যতীত স্বরাজ বা মুক্তি লাভ হইবে না। মহাত্মা তাই দেশকে জানাইয়াছেন যে, তিনি রাজনীতিক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করেন নাই, তিনি কেবল 'নীচের দিক' হইতে কার্য্য করিতেছেন, অর্থাৎ স্বরাজের ভিত্তি গড়িবার দিকেই বর্ত্তমানে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, সাম্প্রদায়িক স্বার্থসাধনের উপর তাঁহার আস্থা নাই। তাঁহার বিশ্বাস, চরকাই স্বাস্থ্যপ্রদ, অহিংস, গঠনমূলক কার্য্যের ভিত্তি। যাঁহাদের সে বিশ্বাস নাই, তাঁহারা তাঁহাদের মনোমত পথে দেশের কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারেন। ভারতের লোক নানা পথে নানাভাবে রাজনীতিক্ষেত্রে কার্য্য করিতে পারেন। সকল কার্য্যই স্বরাজের সহায়ক হইতে পারে, যদি সকলের লক্ষ্য এক থাকে—দেশের মুক্তিসাধন।

ইহা অপেক্ষা সদুপদেশ কি হইতে পারে, আমরা জানি না। রহিম-গজনবি অথবা মালব্য-মুঞ্জে,—যিনি যে ভাবেই কার্য্য করুন, সকলের যদি লক্ষ্য এক হয়, যদি সকলে কায়-মনে দেশের মুক্তি-সাধনে ব্রতী হয়েন, তাহা হইলে দেশের মুক্তি সুদূরপরাহত হইবে না।

মহাত্মার অহিংস অসহযোগ নীতি 'মরিয়াছে', কেহ কেহ এই কথা বলিয়া থাকেন। বস্তুতঃ দেশের বর্ত্তমান রাজনীতিক অবস্থা দেখিয়া সে কথা মনে হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, অসহযোগনীতির প্রভাব এখনও ভারতের রাজনীতির সকল স্তরেই বিদ্যমান রহিয়াছে। কোনও মার্কিণ পত্র লিখিয়াছেন,—"ভারতের অসহযোগনীতি উপযুক্ত অবসরের প্রতীক্ষা করিতেছে, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। নূতন উদ্যমে প্রকট হইবার জন্য ইহা শক্তিসঞ্চয় করিতেছে। গান্ধী যে সুন্দর ধর্ম্মের উদ্বোধনের আলোক জ্বালিয়াছেন, তাহা এখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই। তবে গান্ধী যে পথ দেখাইয়াছেন, সেই পথে ভারতের ক্রমাক্রম জাতীয়তার গতি প্রসারিত হইবে, কি নিয়মানুগ পথে য়ুরোপেশীয় হস্ত হইতে ক্রমশঃ ক্ষমতা ও অধিকার কাড়িয়া লইবে, অথবা হিংসার পথে বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিয়া অসাফল্য লাভ করিবে, তাহা বলা এখন অসম্ভব।"

কথাটা ভাবিবা দেখিবার। যিনি যত বড় রাজনীতিকই হউন, এ কথা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন না যে, অসহযোগ 'মরিয়াছে।' তাহা যদি হইত, তাহা হইলে দেশের এই সঙ্কটসঙ্কুল সময়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মতাবলম্বী নেতৃগণ অসহযোগের মন্ত্রগুরু মহাত্মা গান্ধীকে দেশের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করিতেন না। আমাদের বিশ্বাস, এবার যখন মহাত্মা রাজনীতিক্ষেত্রে যোগদান করিবেন, তখন তাঁহার নীতি সাফল্য-গৌরবে মণ্ডিত হইবে।

## সাম্প্রদায়িক বিরোধ

যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে মনে হয়, বাঙ্গালায় সাম্প্রদায়িক বিরোধ হ্রাস না পাইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হইতেছে। এ বিরোধ কতকাল স্থায়ী হইবে, তাহা কেহ নিশ্চিতরূপে বলিতে পারেন না। তবে কোনও মুসলমান নেতা যাহা কোনও বন্ধুর নিকট বলিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যাইতেছে, তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আগামী কাউন্সিল নির্ব্বাচন পর্য্যন্ত ইহার স্থিতি বলিয়া মনে হওয়া আশ্চর্য্যের কথা নহে।

এ বিরোধ যে প্রকৃত ধর্ম্মগত, তাহা কিছুতেই স্বীকার করা যায় না। মসজেদের সম্মুখে বাদ্যের সমস্যা নূতন উঠিয়াছে। কেন উঠিয়াছে আর কে বা কাহারা ঐ সমস্যা জাগাইয়া রাখিয়াছে, পরন্তু তাহাদের উদ্দেশ্যই বা কি, তাহা অবস্থাভিজ্ঞ লোকমাত্রেই জানেন। মূল কথা, ধর্ম্মের আবরণ না দিলে বিরোধ জাগাইয়া রাখা যায় না বলিয়া আজ এই সমস্যা তুলিবার কারণ উপস্থিত হইয়াছে। গো-কোরবাণীর সমস্যা ভারতে নূতন নহে, বর্ত্তমানে এ সমস্যা নূতন করিয়া জাগাইয়া তুলিবার ধর্ম্মগত কারণ থাকিলে দেশীয় রাজ্যসমূহেও ইহার মন্দ প্রভাব অনুভূত হইত। মূল কথা, বর্ত্তমান বিরোধ ধর্ম্মগত নহে, ইহাকে অর্থ-সমস্যা ও রাজনীতিক সমস্যাগত বলিলেই প্রকৃত কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়।

আরল উইণ্টার্টন স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন যে, "সংস্কার আইনের পূর্ব্বে হিন্দু ও মুসলমান পরস্পর সদ্ভাবে বসবাস করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিল; সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য ও বিরোধের উদ্ভব আধুনিক।" ইহার অর্থ কি? সংস্কার-আইনই এই সাম্প্রদায়িক বিরোধের মূল। যে দিন হইতে সংস্কার-আইন অনুসারে সংখ্যানুপাতে সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা হইয়াছে, যে দিন হইতে সরকার সংস্কার-আইন অনুসারে মন্ত্রিত্ব প্রভৃতি মোটা বেতনের চাকুরীর টোপ ফেলিয়াছেন, সেই দিন হইতে যে ভোট ও চাকুরী লইয়া উভয় সম্প্রদায়ে রক্তারক্তির সৃষ্টি হইবে, তাহা ভবিষ্যদ্দর্শিমাত্রেই বুঝিয়াছিলেন। তাই যুগাবতার মহাত্মা গান্ধী এ দেশবাসীকে যত্নসহকারে কাউন্সিল বর্জ্জন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন।

ইংরাজ যখন মারাঠা, শিখ প্রভৃতি প্রবল হিন্দু শক্তির হস্ত হইতে ভারত সাম্রাজ্য জয় করিয়া লয়েন, সে সময়ে মুসলমান অতীত সাম্রাজ্য ও গৌরবের স্বপ্নে বিভোর ছিল। হিন্দু রাজ্য হারাইয়া নূতন অবস্থায় উপনীত হইয়া আপনাকে অবস্থানুযায়ী করিয়া চালাইবার প্রয়াস পাইয়াছিল। তাই সে ইংরাজের অধীনে ইংরাজী

শিক্ষা-দীক্ষায় অভ্যস্ত হইয়া সরকারী চাকুরী ও সম্মান লাভে যত্নবান্ হইয়াছিল। মুসলমান তখনও আপনাকে 'রাজার জাতি' মনে করিয়া অতীত মোগল ও পাঠান সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখিয়া আপনাকে ইংরাজী শিক্ষা-দীক্ষা ও সরকারী চাকুরী ও সম্মান হইতে দূরে রাখিয়াছিল।

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য

তাহার পর সার সৈয়দ আমেদের 'আলিগড়ের' সৃষ্টি। মুসলমান ক্রমে ইংরাজী শিক্ষা-দীক্ষায় অভ্যস্ত হইতে লাগিল। পূর্ব্বে যে জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসকে বিষবৎ বর্জ্জন করিয়াছিল, তাহার প্রতি অথবা তাহারই অনুরূপ মুসলমান প্রতিষ্ঠানের প্রতি আকৃষ্ট হইল,—পরে হিন্দুরই মত "অধিকার," "চাকুরী" ও সম্মানের দাবী করিতে লাগিল।

তুর্কী ও খিলাফতের অপমানের দিনে মুসলমান ইংরাজের প্রতি ক্রোধের বশে হিন্দুর সহিত জাতীয় আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিল। কিন্তু যখন তুর্কী বা খিলাফতের জন্য আন্দোলনের প্রয়োজন অন্তর্হিত হইল, যখন ইংরাজ এ দেশে 'সংস্কার-আইনের' টোপ ফেলিলেন, তখন মুসলমান 'আপনার গণ্ডা' বুঝিয়া লইবার জন্য ব্যগ্র হইল। তখন মুসলমানের মুখে রব উঠিল, "আমাদিগের রাজনীতিক ও ঐতিহাসিক প্রাধান্যের অনুযায়ী অধিকার আমাদিগকে দিতে হইবে।" পেটনীতি ও রাজনীতি বিরোধের মূল হইয়া দাঁড়াইল, ধর্ম্মনীতির সহিত ইহার সম্পর্ক নাই। তবে পাছে ধর্ম্মের মোড়ক না দিলে কৃষাণ দিনমজুর প্রভৃতি সাধারণ শ্রেণীর লোক উহাতে না মজে, এই জন্য সম্প্রতি ধর্ম্মের মোড়ক দিয়া বিরোধকে সাজান হইয়াছে।

মহাত্মা গন্ধীকে আমরা বিনা কারণে যুগাবতার ও ভবিষ্যদ্দর্শী বলিয়া আসিতেছি না। এই পুরুষশ্রেষ্ঠ বহু পূর্ব্ব হইতেই কাউন্সিলের মোহের অপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। এ জন্য তিনি দেশের লোককে উহা বর্জ্জন করিতে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু রক্তমাংসে জড়িত মানুষ—সকলেই তাঁহার মত ত্যাগে অভ্যস্ত হইতে পারে না। তাই তাঁহার উপদেশ সত্ত্বেও অনেকে সেই মোহ ত্যাগ করিতে পারেন নাই। বরং ক্রমে এমন অবস্থা দাঁড়াইল যে, দেশের লোকের বিশ্বাস দাঁড়াইল, বর্জ্জন বা অসহযোগে কোন ফল নাই, উহাতে কয় বৎসর দেশের ক্ষতিই হইয়াছে, অতএব কাউন্সিল গ্রহণই মুক্তিলাভের প্রকৃষ্ট পন্থা। ইহার ফলে যে হলাহল উঠিয়াছে, তাহা আমরা দুই হস্তে আকণ্ঠ পূর্ণ করিয়া ভোজন করিতেছি।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন হইয়াছিল,—মহাত্মার উপদেশকেও ঠেলিয়া ফেলিয়া দেশকে কাউন্সিলের ও সংস্কারের মোহে আকর্ষণ করিতে। যদিও দেশবন্ধুর উদ্দেশ্য মহৎ ছিল, তথাপি উহা পরিণামে ফলপ্রদ হইবে না, উহা মহাত্মার মত ভবিষ্যদ্দর্শী জানিতেন। তাই তিনি ভারতের রাজনীতিক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। তবে তিনি দেশবন্ধুর ব্যক্তিত্ব ও প্রভাব অবগত ছিলেন, তাই তাঁহার কার্য্যের প্রতিবাদ করেন নাই, বরং তাঁহার রাজনীতিক দলকে নিজের প্রভাব দ্বারা সহায়তা করিয়াছিলেন। কিন্তু যাহা অবশ্য ঘটিবে, তাহা মহাত্মাও নিবারণ করিতে পারেন না। তাই কাউন্সিলে বাধাপ্রদান ফলপ্রদ হয় নাই। দেশবন্ধু শেষ জীবনে কতকটা সহযোগের আহ্বানে সাড়া দিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার সিরাজগঞ্জের বক্তৃতাতেই স্বপ্রকাশ।

দেশবন্ধুর অকালে ইহলোকত্যাগের পর তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাব অন্তর্হিত হইলে কাউন্সিল প্রবেশের কুফল আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। তখন দেশে নানা শ্রেণীর রাজনীতিক দেখা দিতে লাগিলেন। সহযোগের পরিমাণ কতটুকু হইবে, উহা লইয়া মতবিরোধ আরম্ভ হইল। কতটুকু সহযোগ কোন্ কোন্ বিষয়ে দেওয়া যাইতে পারে, তাহা লইয়া চুলচেরাচিরি আরম্ভ হইল। দেশ হইতে একতা অন্তর্হিত হইল। সকলেই স্ব স্ব মতের পরিপোষক অসহযোগ বিদ্রোহমূলক অসহযোগিতা, পূর্ণ সহযোগিতা, অর্দ্ধ-সহযোগিতা ইত্যাদির সমর্থন করিতে লাগিলেন। ফলে কেবল যে হিন্দু কংগ্রেসপন্থীদিগের মধ্যে

মিঃ জয়াকর

মিঃ কেলকার

দলাদলি উপস্থিত হইল, তাহা নহে, মুসলমানরাও ইহার ফলে আপনাদের স্বতন্ত্র দল গঠন করিয়া আপন সম্প্রদায়ের স্বার্থের গণ্ডা বুঝিয়া লইতে ব্যস্ত হইলেন। যে একতার ভিত্তির উপর স্বরাজের প্রকৃত চণ্ডীমণ্ডপ গড়িয়া উঠিতে পারে, তাহা দূরে পরিত্যক্ত হইল। চাকুরী ও ভোটের জন্য তখন গৃহবিবাদ উপস্থিত হইল, সাম্প্রদায়িক বিরোধ তাহারই একটা অঙ্গমাত্র।

এই বিরোধে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজ ও তথা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীর দল মহা আনন্দিত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই বিরোধের ফলে ব্যুরোক্রেসীর জীবন যে আরও বহু বৎসর বাড়িয়া গেল, ইহাতে তাঁহাদের আনন্দিত হইবারই কথা। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ার মুখপত্র 'ষ্টেটসম্যান' মহা আনন্দে লিখিয়াছেন, "পণ্ডিত মালব্য পূর্ব্বে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ছিলেন, এখন প্রতিদানমূলক সহযোগী। লালা লাজপৎ পূর্ব্বে স্বরাজী ছিলেন, এখন প্রতিদানমূলক সহযোগী। ইঁহারা উভয়েই হিন্দু মহাসভার পাণ্ডা। ইঁহারা এক্ষণে মারাঠা নেতা জয়াকর ও কেলকারের সহিত প্রায়শঃ তারে মত আদান-প্রদান করিতেছেন। স্বরাজী দলপতি পণ্ডিত মতিলাল এই চারি জনের সহিত রফা করিবার শেষ চেষ্টা করিতেছেন। যাহাতে রফার দ্বারা আগামী নির্ব্বাচনে হিন্দুদিগের মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত না হয়, তাহার চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু মিঃ দাস ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন; মিঃ গান্ধী মূক; পণ্ডিত নেহরু রাজনীতিক্ষেত্রে মৃতবৎ। তাঁহাকে ঠেলিয়া কংগ্রেসের অভ্যর্থনা কমিটি সহযোগকর্মী শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারকে এ বৎসরের কংগ্রেস প্রেসিডেণ্টের পদে মনোনীত করিয়াছেন। এ সকল ব্যাপার দেখিয়া মনে হয়, সরকারের প্রতিপক্ষেরা ( left ) এ কয়বৎসর বৃথা বাক্যের স্রোত বহাইয়াছেন। ভারতের এই দিনে—দলপতিহীন দল ও দলহীন দলপতিদিগের দিনে, কংগ্রেসের সদস্যদিগের কাউন্সিলে নির্ব্বাচন ব্যাপারে কোনও মুসলমানের নাম দেখা যাইতেছে না। বরং মুসলমানরা হিন্দুদিগের সাহচর্য্য হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়া আপনাদের স্বতন্ত্র দল গড়িবার আয়োজন করিতেছেন। সার আবদর রহিমের ঘোষণাপত্র ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। সার আবদর তাহাতে বরং প্রকাশ্যভাবে মুসলমানদিগকে হিন্দুদিগের সাহায্য ত্যাগ করিয়া আপনাদের নিজস্ব দল গড়িবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন।"

বস্তুতঃ ভারতের বর্ত্তমান রাজনীতিক অবস্থা এমন স্পষ্টভাবে চিত্রিত কেহ করিতে পারেন নাই। মহাচীনেরও ঠিক এই অবস্থা। এ অবস্থায় দেশ যদি চিরদিন পরাধীন থাকে, তাহা হইলে তাহাতে কাহারও আক্ষেপ করিবার কোনও কারণ নাই।

এ ঘোর দুর্দ্দিনে কয়েক জন নেতা মহাত্মা গন্ধীকে আবার ভারতের রাজনীতিক দলপতিত্ব গ্রহণ করিতে আহ্বান করিয়াছেন। তারের সংবাদে প্রকাশ, মহাত্মাজী অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন। আর একবার এমনই ভাবে তাঁহাকে হিন্দু-মুসলমান বিবাদে মধ্যস্থ হইয়া মীমাংসা করিতে আহ্বান করা হইয়াছিল। সে সময়ে তিনি যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা এখনও অনেকের হৃদয়তন্ত্রীতে করুণ সুরে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইয়া থাকে। মহাত্মা বলিয়াছিলেন, "আমাকে আর ডাকা কেন? হিন্দু-মুসলমানের উপর আমার প্রভাব আমি হারাইয়াছি। এখন কেহ আমার কথা শুনিবে না। আমার মনে হয়, হিন্দু মুসলমান পরস্পর রক্তারক্তি করিয়া মনের সাধ না মিটাইলে এবং ক্লান্ত না হইলে এ বিরোধের অবসান হইবে না। সুতরাং Let them fight it out," কত দুঃখে মহাত্মা এ কথা বলিয়াছিলেন, তাহা প্রকৃত দেশহিতকামিমাত্রেই বুঝেন। হিন্দু-মুসলমান যখন পরস্পর রক্তারক্তি করিয়া বুঝিবে, এ রক্তারক্তিতে তাহাদের ক্ষতি বই লাভ নাই, তখনই তাহারা বিরোধে ক্ষান্ত হইবে। আজ হিন্দু মুসলমান সংস্কারের টোপ গিলিয়াছে—সে মোহে তাহারা আচ্ছন্ন, এখন শত হিতবাণীও তাহাদের কর্ণকুহরে পশিবে না। সুতরাং মনে হয়, মহাত্মা গন্ধী দেশের রাজনীতির কর্ণধার হইলেও শুভফল ফলিবার সম্ভাবনা অল্প। বাঙ্গালার স্বরাজ্য দলপতি ও স্বরাজ্য দলের একাংশ রহিম-গজনবির লীলাখেলা দেখিয়াও প্রাণপণে মুসলমানের মন যোগাইয়া চলিয়া আসিতেছেন—হিন্দুর স্বার্থের প্রতিকূলেও মুসলমানের পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাঁহাদিগকে দলে রাখিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন, আগামী নির্ব্বাচনদ্বন্দ্বে যাহাতে তাঁহাদের প্রিয় 'প্যাক্টের' মুখরক্ষা হয়, তাহার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে কি ফল হইয়াছে? হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মে'র ন্যায় রহিম-গজনবির স্বার্থলালসা হু হু বৃদ্ধি পাইতেছে। সুতরাং মহাত্মা গন্ধীও যে এই লালসানলের 'খাণ্ডব-ক্ষুধা' নিবারণে সমর্থ হইবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। আসল কথা, যত দিন না আমরা কাউন্সিল-মোহের—চাকুরী ও ভোটের মোহের অসারতা উপলব্ধি করিতে পারিব, যত দিন না আমরা বুঝিব, তুচ্ছ সাম্প্রদায়িক স্বার্থ অপেক্ষা দেশের স্বার্থ বড়, তত দিন এ বিরোধের অবসান হইবে না। বর্ত্তমানে হিন্দু-মুসলমানের যে মনের অবস্থা, তাহাতে এ কথা বুঝিবার যে সময় আসে নাই, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

## অপরাধী কে?

এই বৎসরের জন্মাষ্টমী পর্ব্বের শোভাযাত্রা উপলক্ষে কলিকাতার খিদিরপুর পল্লীতে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শিবপুর, ঢাকা প্রভৃতি কয়েক স্থানে দাঙ্গা হইবার উপক্রম হইয়াছিল অথবা দাঙ্গা সংঘটিত হইয়াই অঙ্কুরে লয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে খিদিরপুরের দাঙ্গাই প্রধান। সুতরাং এই দাঙ্গা সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন।

প্রতি বৎসর জন্মাষ্টমী উপলক্ষে খিদিরপুরে যে ভাবে মিছিল বাহির হইয়া থাকে, এ বৎসরও সেই ভাবে শোভাযাত্রা বাহির করিবার জন্ম হিন্দুরা পুলিসের নিকট পাশের আবেদন করিয়াছিল। এ সকল হিন্দুর অধিকাংশই পশ্চিমদেশীয় গাড়োয়ান ও ডকের কুলী-মজুর। উহারা বেলা ২টা হইতে ৩॥০টা পর্য্যন্ত পাশ চাহিয়াছিল। কিন্তু পাছে মুসলমানের নমাজে ব্যাঘাত ঘটে, এই আশঙ্কায় পুলিস শোভাযাত্রার সময় বেলা ১০টা হইতে ১২॥০টা পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিল। তদনুসারে হিন্দুরা নির্দ্দিষ্ট সময়ে সার্কুলার গার্ডেন্ রীচ হইতে শোভাযাত্রা করিয়া ভূ-কৈলাসের রাজবাটীর শিবমন্দিরের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। একখানি লরীর উপর দেববিগ্রহ অধিষ্ঠিত ছিল এবং সঙ্গে বাদ্যাদি ছিল। বেলা প্রায় ১২ টার সময় ঐ মিছিল পাইপ রোড ও সার্কুলার গার্ডেন রীচ রোডের সঙ্গমস্থলে উপস্থিত হইলে নিকটবর্ত্তী এক ক্ষুদ্র মসজেদ হইতে এক জন মুসলমান আসিয়া তাহাদিগকে বাদ্যাদি বন্ধ করিতে বলে। টেলিফোনযোগে ওয়াটগঞ্জ থানার ইন্‌স্পেক্টর আবদুল হামিদকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি ঐ সময় নমাজের সময় নহে বলিয়া লাইসেন্সের সর্ত্তানুসারে বাদ্যসহ শোভাযাত্রা মসজেদের সম্মুখ দিয়া যাইতে অনুমতি প্রদান করেন।

তদনুসারে মিছিল বাদ্যসহ মসজেদের সম্মুখ দিয়া অগ্রসর হয়। প্রকাশ, তখনই মসজেদের মধ্য হইতে শোভাযাত্রাকারীদের উপর ইষ্টকাদি বর্ষিত হয়; পরন্তু কয়েক জন মুসলমান লাঠি হস্তে হিন্দু শোভাযাত্রাকারীদিগকে আক্রমণ করে। বলা বাহুল্য, পুলিসের হুকুমে হিন্দুগণ পূর্ব্ব হইতেই নিরস্ত্র ছিল। বাবুবাজারের নিকটে এবং আর একটি মসজেদের নিকটবর্ত্তী কয়েকটি মুসলমানবস্তী হইতে হিন্দুদিগের উপর ইষ্টকাদি বর্ষিত হইয়াছিল। এই ভাবের আক্রমণের ফলে কয়েক জন হিন্দু ও কয়েক জন পুলিস আহত হয়। তন্মধ্যে ওয়াটগঞ্জ থানার ৩টি কনষ্টেবল ও ১টি জমাদার এবং ইনস্পেক্টর আবদুল হামিদ অন্যতম।

ঘটনাটি এই। ইহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, পূর্ব্বাপর যাহা হইয়া আসিতেছে, খিদিরপুরেও তাহাই হইয়াছে। গত রাজরাজেশ্বরী বিসর্জ্জনের শোভার্যাত্রায়, অথবা চীৎপুর-বরাহনগরের রথযাত্রায় বা মহরম পর্ব্বে যেমন ঘটিয়াছিল, এ ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিয়াছে। হিন্দুরা পূর্ব্বাপর পুলিসের আইন মান্য করিয়াছে, পুলিসের নির্দ্দেশমত চলিয়াছে, পরন্তু নির্দ্দিষ্ট সময়ে কার্য্য সমাধা করিয়াছে। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই দেখা গিয়াছে, মুসলমানরা অসহিষ্ণু হইয়া উদ্ধতভাবে পুলিসের আইন বা নির্দ্দেশ অগ্রাহ্য করিয়াছে, লাঠি-সোটা ইট-পাটকেল লইয়া হিন্দুগণকে ও তথা পুলিসকে আক্রমণ করিয়াছে। মহরমের সময় এমনও দেখা গিয়াছে যে, পুলিস হইতে তাজিয়ার নম্বর ও মহল্লা এবং মহল্লার সর্দ্দারের নম্বর ও ঠিকানা প্রত্যেক তাজিয়ার শোভাযাত্রার পতাকায় লিখিত থাকা সত্ত্বেও শোভাযাত্রার মুসলমানরা লাইন ছাড়িয়া সম্ভ্রান্ত হিন্দু গৃহস্থের গৃহ আক্রমণ করিয়াছে ও নিরীহ নিরস্ত্র হিন্দু পথিককে প্রহার করিয়াছে। হিন্দুরা পূর্ব্বাপর শান্তিরক্ষা করিয়া আসিয়াছে, মুসলমানরা ইচ্ছাপূর্ব্বক শান্তিভঙ্গ করিয়াছে। আরও একটা বিশেষ লক্ষ্য করিবার আছে! সকল ক্ষেত্রেই মুসলমানরা যেন পূর্ব্বাহ্নে প্রস্তুত হইয়া দাঙ্গা বাধাইয়াছে।

সংবাদসংগ্রাহককে বলিয়াছেন যে, মসজেদের সম্মুখে গীতবাদ্য ধর্ম্মের হানিকর নহে; তবে হিন্দুরা মসজেদের সম্মুখে বহুক্ষণ জোরে বাদ্যাদি করে বলিয়া মুসলমানরা উত্তেজিত হইয়া থাকে। শেষোক্ত কথা সত্য কি না, বিচারসাপেক্ষ। অন্ততঃ খিদিরপুরে, রাজরাজেশ্বরীর শোভাযাত্রায় অথবা রথের শোভাযাত্রায় যে তাহা হয় নাই, তাহা সকল রিপোর্টেই প্রকাশ। হিন্দুরা কুত্রাপি নমাজের নির্দ্দিষ্ট কালে বাদ্যাদি করে নাই। রাজরাজেশ্বরীর-বিসর্জ্জন চিরাচরিত প্রথানুসারে অপরাহ্নে সমাহিত হইয়া আসিলেও এবার পুলিসের নির্দ্দেশ অনুসারে হিন্দুরা প্রাতঃকালে নমাজের সময় বাদ দিয়া শোভাযাত্রা করিয়াছিল। খিদিরপুরেও পুলিস যে সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিল, হিন্দুরা সেই সময়ে শোভাযাত্রা লইয়া গিয়াছিল। তথাপি মুসলমানরা অসহিষ্ণু হইয়া তাহাদিগকে পুলিসের সাক্ষাতেই আক্রমণ করিয়াছিল এবং তাহাদিগকে রক্ষক পুলিসের সহিত এক পর্য্যায়ে ফেলিয়া প্রহার করিয়াছিল। সুতরাং অপরাধী কে, বুঝিতে বিলম্ব হয় কি? মহম্মদ আলি ব্যতীত অন্যান্য কয়েক জন নিরপেক্ষ মুসলমান ভদ্রলোক বলিয়াছেন, মসজেদের সম্মুখে বাদ্যাদিতে ধর্ম্মের হানি হয় না। মহারাজ সার প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর এক প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন যে, সঙ্গীত কোনও কালে মুসলমানের নিকট অনাদৃত ছিল না। মিঞা তানসেন মুসলমান ছিলেন, শ্রেষ্ঠ গায়ক বলিয়া তাঁহার খ্যাতি আছে। মোগল দরবারে সঙ্গীতের আদর ছিল। মুসলমান শাসনকালে মসজেদের মধ্যেও গীতবাদ্য হইত। পারস্য, তুর্কী, আরব, মিশর প্রভৃতি মুসলমান রাজ্যেও গীতবাদ্যে মসজেদের ধর্ম্মহানি হয় নাই। অথচ বর্ত্তমান মুসলমানের নিকট গীতবাদ্যে মসজেদের ধর্ম্মহানি হইতেছে কেন, কেহ বুঝাইয়া দিতে পারেন কি?

গীতবাদ্য হিন্দুর ধর্ম্মের অঙ্গ। মুসলমানের অন্যায় আবদারে হিন্দু ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারে না। বাঙ্গালা সরকার কলিকাতায় মসজেদের সম্মুখে বাদ্যের যে নিয়ম বাঁধিয়া দিয়াছেন, তাহা হিন্দুর পক্ষে ধর্ম্মের হানিজনক হইলেও হিন্দু শান্তির আশায় সেই নিয়ম পালন করিতেছে। তথাপি হিন্দুর উপর অযথা আক্রমণ হইতেছে, এমন কি, মসজেদ ব্যতীত অন্যত্রও মুসলমান হিন্দুর গীতবাদ্যে আপত্তি করিতেছে, বলপূর্ব্বক হিন্দুর সন্ধ্যা আরত্রিক বা সঙ্কীর্ত্তনাদি বন্ধ করিবার জন্য আবদার করিতেছে। ইহার কারণ কি?

ঢাকা ও অন্যান্য স্থানেও হিন্দুরা সরকারের আইন মানিয়া পুলিসের ব্যবস্থা অনুসারে মিছিল বাহির করিয়াছে, অথচ তাহাতেও আপত্তি উঠিয়াছে, ছোট-খাট হাঙ্গামাও বাধাইয়াছে অথবা বাধাইবার চেষ্টা করিয়াছে। ইহারই বা কারণ কি?

শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী বলিয়াছেন, "সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণ ধর্ম্মগত নহে, কয়েক জন রাজনীতিক আন্দোলনকারী আপনাদের স্বার্থসাধনোদ্দেশে দাঙ্গা বাধাইয়া সরকারকে জানাইতে চাহিতেছে যে, তাহারা তাহাদের সম্প্রদায়ে 'কেও কেটা' লোক নহে, দাঙ্গা থামাইতে হইলে তাহাদের সাহায্য আবশ্যক।" ইহাই কি এই সকল অনর্থপাতের মূল? কিন্তু সরকার কি এতই নির্ব্বোধ যে, এ সকল সন্ধান রাখেন না? তাঁহারা জানিয়াও কি এই সকল স্বার্থানুসন্ধিৎসু নেতৃগণকে ছাড়পত্র দিয়া রাখিয়াছেন? এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, অজ্ঞ জনসাধারণ নিজের খেয়ালে এরূপ অকারণ দাঙ্গা-হাঙ্গামা করে না, উহাতে তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাহাদিগকে অন্তরাল হইতে কে বা কাহারা নাচাইতেছে, ইহাই মনে হয়। দেশের অনিষ্টকারী এই সকল অপরাধীকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া দণ্ডিত করিবার সময় কি এখনও উপস্থিত [illegible] নাই? দাঙ্গার জড় না মারিলে কেবল দাঙ্গার ক্ষতের মুখে প্রলেপ দিলে কি হইবে?

# হামিদের হিম্মৎ

৪

এক সময়ে বটতলায় আসাদ দপ্তরীর যেমন নাম, তেমন-ই পসার ছিল। বেণীমাধব দে কোম্পানী, নৃত্যলাল শীল প্রভৃতি বড় বড় পাবলিশারদের কাযে তার ত একচেটে অধিকার ছিল-ই, তা ছাড়া তার অল্প-স্বল্প বাঙ্গালা লেখাপড়া জানা ছিল এবং পুস্তকপ্রকাশ-কার্য্যে বুঝে চ'ল্‌তে পার্লে লাভবান্ হ'তে পারা যায় জেনে নিজে মুন্সী সরিফউদ্দীনকে দিয়ে মোছলমানী বাঙ্গালা পয়ারে হাতেম-তাই ও চাহার দরবেশ লিখিয়ে ছাপিয়ে বিক্রী কর্ত্তো, আর মহেশ ঘোষকে দিয়ে একখানা মৎস্যপুরাণ লিখিয়ে-ও ছাপিয়েছিল। অবশেষে আসাদ দপ্তরীর কাযের সঙ্গে গরাণহাটার বেশোপটির কাছে একখানি ঘর ভাড়া নিয়ে একটি বইয়ের দোকান-ও খোলে।

দপ্তরীর কায ক'রবে ব'লে ঢাকা থেকে কল্‌কাতায় পৌঁছে প্রথমে-ই আসাদ দর্জ্জীপাড়া অঞ্চলে একখানি খোলার ঘরে বাসা নেয়। উপার্জ্জনের সঙ্গে সঞ্চয়ের শক্তি সকলের থাকে না, কিন্তু আসাদের তা' ছিল, সুতরাং বইয়ের দোকান খোলবার অল্পদিন পরে-ই সে ছিদাম মুদীর গলির মোড়ে একখানি ছোট-খাটো কোঠা কিনে ফেলে। তখন কল্‌কাতায় ছোট-খাটো কোঠা কেনা আজকালকার মত দুঃস্বপ্ন ব'লে মনে হ'ত না। বাড়ী কেনার পর সে দেশে গিয়ে এখানে পরিবার আনে এবং সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না ক'র্‌তে থাকে। কেবল একটি দুঃখ তার মনে ছিল যে, বিবির গর্ভে একমাত্র কন্যা-সন্তান ভিন্ন আর কিছুই হয় নি।

তালতলাবাসী লালবাজারের প্রসিদ্ধ চাবুক ও ছড়িওলা গোফুর মিঞার মেজ ছেলে বখতিয়ারের সঙ্গে আসাদ আপনার কন্যার বিবাহ দেয়। উপর্য্যুপরি তিনটি সন্তানকে সূতিকাগারে হারিয়ে শেষে একটি দেড় বছরের মেয়ে রেখে আসাদের কন্যা নিজে মারা পড়ে।

এ শোক আসাদের বুকে বাজের মত বাজে, আর মন দিয়ে সে কাযকর্ম্ম চালাতে পারে না; কখন-ও তার বিবি কাঁদে, সে চোখ মুছিয়ে দেয়, আবার নিজে-ই কখন-ও মেয়েমানুষের মত ভেউ ভেউ ক'রে কেঁদে ফেলে, বিবি তাকে বোঝায়।

সন্তান-শোক ত আছে-ই, তার ওপর সে কিছু সঙ্গতি ক'রেছে—দপ্তরীর কাযে, বই বিক্রীতে এবং কিছু কিছু ঘরোয়া তেজারতীতে-ও। লোকে বল্‌তো যে, আসাদ মিঞার ঘরে যেমন ক'রে হোক্ বিশ তিরিশ হাজার টাকা জমা আছে; কারো কারো আন্দাজ বা তার ওপরে-ও যেতো। এই কষ্টার্জ্জিত সম্পত্তি 'আমরা ম'লে কার হাতে যাবে, কে ভোগ ক'রবে, মমতাজের ঐ লেড়কীটুকুকে আল্লা কি বাঁচিয়ে রাখবে' এই দুশ্চিন্তা সন্তান-শোকের চেয়ে জ্বালার ওপর যেন জ্বালা হয়ে দাঁড়ালো। যা হোক্, এই রকম ক'রে বছর তিনেক কেটে যাবার পর আসাদ নিজের বৈবাহিকের ওপর এখানকার বিষয়সম্পত্তি দেখবার ভার দিয়ে আপনার বিবিকে সঙ্গে ক'রে এক সন্ হজ্জে যাত্রা কল্লে। ফের্‌বার পথে ওলাউঠো রোগে আসাদের মৃত্যু হয়, সহযাত্রীদের সান্ত্বনা ও যত্নে তার বিবি কল্‌কাতার নিজ বাড়ীতে ফিরে আসে।

বেয়াই-বেয়ানকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে আসাদের বিবি আপনার দৌত্তুরীকে নিজের কাছে এনে রাখলে। হজ থেকে বিধবা হয়ে ফেরার পর আসাদের বিবি আপনার আপাদমস্তক সবুজ বোর্‌খায় আবৃত ক'রে পাড়ার চেনা-পর্‌চের ঘরে আসা যাওয়া করতো, নাতনীটিকে-ও মধ্যে মধ্যে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতো। হামিদ যেমন হেম হয়ে আমাদের বাড়ীর ছেলেপুলের মধ্যে এক জন হয়ে গেছলো, যাওয়া আসা করতে করতে ক্রমে নসীবন-ও অনেকটা সেই রকম হয়ে দাঁড়ালো, বাড়ীর মেয়েরা কেউ বা তাকে নসী, কেউ বা নিশি ব'লে ডাক্‌তো।

টাকা জমাবার প্রবৃত্তি প্রবল থাক্‌লে-ও পাড়ার লোকজন দেখতো, আসাদের একটু আধটু দান-খয়রাৎ-ও আছে; কিন্তু তা'র মৃত্যুর পর সবাই বুঝতে পাল্লে, তা'র দয়ার উৎস বিদ্যমান ছিল—মক্কাবুড়ীর কোমল হৃদয়ে। হজ্ থেকে ফেরার পর আসাদের বিবিকে সকলে মক্কাবুড়ী নামে অভিহিত কর্‌তো।

বছর সাতেকের মেয়ে নসীবনটি দেখতে যেন ছবিখানির মত ছিল; যেমনি টুক্‌টুকে রং, তেমনি সুডৌল গড়ন; বড় বড় চোখ দুটিতে কাজল প'রলে যেন আলো জ্বল্‌তো; ঠোঁট দুখানিতে কে যেন হাসি মাখিয়ে রেখেছে আর এই বয়েসে-ই চুলগুলির যেমন গোছ, তেমনই বাহার; ঐ যা বল্লেম, মোছলমানের ঘরের মেয়ে হ'লেও সে যখন কপাল অবধি ঘোমটা টেনে বেড়াতো, তখন তাকে দেখে মনে হ'ত, যেন ছোট্ট একখানি ঠাকুরের প্রতিমা। বাড়ীর ছোট ছোট মেয়েদের সঙ্গে সর্ব্বদা মেশামিশি ক'র্‌তো, খেলা ক'র্‌তো, একসঙ্গে পড়তো শুন্‌তো, কিন্তু এমন বুদ্ধি—এমন সাবধানী যে, কখন-ও কাকে-ও তাকে বল্‌তে হয় নি যে, নিশি এ দিকে আসিস্ নি, কি এখান থেকে স'রে যা।

লালুদা ভুলুদার মত হামিদ-ও নসীবনের হেমদা। মোছলমানের রান্নার গন্ধে আমাদের পাড়ার কোন-ও মেয়েছেলেকে-ই কখন-ও নাকে কাপড় দিতে হয় নি। আমরা যেমন কালে ভদ্রে পাঁঠাটা আস্‌টা খেতুম্, তাদের-ও প্রায় তাই। বস্তির ভেতর কারুর কারুর ঘরে পালা মুরগী ছিল বটে, কিন্তু তার জন্যে কাউকে কখন-ও কোন-ও উৎপাত সহ্য কর্‌তে হয় নি; অনেকে-ই মনে কর্‌তো যে, ওটা বেশ গেরস্ত পোষা পাখী, তাই ওরা ওটা স্বচ্ছন্দের জন্যে রাখে। বাস্তবিক আমি এখন-ও মনে করি যে, আমাদের শাস্ত্রকাররা মুরগীটা নিষিদ্ধ ক'রে না দিলেই ভাল কর্‌তেন; এই মাছ-দুধের অভাবের দিনে ছেলেপুলের দোহাই দিয়ে আমাদের দু মুঠো খেয়ে-ও তৃপ্তি হ'ত, গায়ে-ও গত্তি লাগতো।

প্রতি শুক্রবার সকালে মক্কাবিবির দরজায় শতাবধির ওপর মোছলমান ফকির ভিকিরী মেয়ে পুরুষ জমা হ'ত। দু'খানা ক'রে বড় বড় আটার রুটী আর খানিকটা গুড় প্রত্যেকে-ই পেতো; ইদ্ কি অন্য অন্য মোছলমানী পরবের দিনে বখরীর মাংসর কাবাব-ও হাতাখানেক ক'রে এক এক

আসাদের জীবিতাবস্থায় ভগবতীবাবু তার লেখাপড়ার কাজ অনেক দেখে শুনে দিতেন, তাঁর সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে আসাদ প্রায় কোন-ও বৈষয়িক কায-ই ক'রতো না; সম্ভ্রান্ত লোককে মাইনে বা মাসোহারা ব'লে কিছু দিতে আসাদ ভরসা করতো না বটে, কিন্তু ভগবতী অতি সাঁচ্চা লোক আর তাঁর সামান্য পেন্‌সন্ বই অন্য আয় নাই বুঝে আসাদ প্রায়ই কোন না কোন উপায়ে তাঁকে কিছু কিছু পাইয়ে দিত।

মক্কাবুড়ী ভগবতী বাবুকে বাবা ব'লে ডাক্‌তো এবং স্বামীর ন্যায় সব কাযে-ই তাঁর পরামর্শ নিতো। হিন্দু ভিকিরী কাঙালকে দিতে বা দুঃস্থ গৃহস্থকে সাহায্য ক'র্‌তে ভগবতী বাবু ছিলেন তার হস্তস্বরূপ। দু পাঁচ জন ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-ও মক্কাবুড়ীর সাহায্যে কন্যাদায় হ'তে নিষ্কৃতি পেয়েছেন, এ কথা আমরা জানি। আজকাল এ কথা অনেকেই বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু তাঁদের উপলব্ধির জন্য আমরা একটিমাত্র যুক্তি প্রয়োগ ক'র্‌বো, তাই যথেষ্ট হবে; যুক্তিটি এই,---তখন ইউনিটি ইউনিটি বা একতা একতা ব'লে এত হাঁকডাক্ ছিল না আর মুসলমান প্রতিবেশী আত্মীয়দের আমরা চাচা ব'লেই ডাক্‌তুম্, ভাই ব'ল্‌তে সুরু করি নি; কাযে-ই একতা ও ভ্রাতৃভাব বস্তু দুটি মুখের উচ্ছিষ্ট না হয়ে সত্যি সত্যিই বুকের মধ্যে বিদ্যমান ছিল।

মক্কাবুড়ী নমাজ ক'র্‌তো, রোজা রাখতো, তস্‌বী ফেরাতো, আবার হিঁদুর ঘরের বিধবার মত নিরামিষ খেতো; গয়না পরতো না এবং কখন-ও কখন-ও চরণামৃত চেয়ে-ও ধারণ ক'রতো।

নারী যেমন চট্ ক'রে নিজের চাল্‌চলন্‌-চরিত্রাদি অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য ক'রে ঘুরিয়ে নিতে পারে, পুরুষ তত শীঘ্র তা' পারে না। দুঃখীর ঘরের মেয়ে-ও রূপ বা কৌলীন্যের জোরে রাজার ঘরে প'ড়লে অতি সত্বর-ই রাজবধূর মর্য্যাদা রক্ষা ক'রে সকলের সন্তোষ-সাধনে সমর্থ হয়, এর ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত অনেকে-ই দেখেছেন; কিন্তু বড়মানুষের বাড়ীর ঘরজামাই মাথায় সিঁথি কাট্‌তে শেখে বটে, ফুল-কোঁচা-ও দোলায়, কিন্তু আচরণে যে লাংলা সেই লাংলা; মাণিকপীর সেজে নকল দেখানর ওপর তার ইয়ার্কির মাত্রা আর অধিক দূর চড়ে না। সেই ইস্কুলে 'শর্টস্' প'রে গিয়ে

এক জন বাবুকে সাহেব হ'তে কতটা সময় লাগে, কিন্তু তাঁর অন্তঃপুররুদ্ধা অবগুণ্ঠনবতী সহধর্ম্মিণী বিলাতপ্রত্যাগত স্বামীর হুজুরিমল্‌স্ ট্যাঙ্ক লেনস্থিত ভাড়াটিয়া বাড়ীতে যাবার পর বছরখানেক দেড়েকের মধ্যে-ই বেশ চলনসই মিসেস সো এণ্ড সো হয়ে পড়েন।

হামিদ ত বেশ ভাল রকম হেম হয়ে গেছল-ই, কিন্তু নসীবনের বালিকা-জীবনের দূর চতুঃসীমা থেকেও এতটুকু প্যাঁজের গন্ধ পাওয়া যেত না; কুমারীর দিদিমার শুদ্ধি, নিষ্ঠা এবং মহৎ হৃদয়ের সংদৃষ্টান্ত তা'র জীবনগঠনে অল্প সাহায্য করে নি।

উপাসনা, ধর্ম্মচর্চ্চা, দান-খয়রাৎই আজকাল মক্কাবুড়ীর জীবনের ব্রত হয়েছে বটে, তবে সাংসারিক একটি ভাবনা তার প্রাণকে সতত-ই উদ্বিগ্ন ক'রে রাখে। মাতৃহীন নাতনীটিকে কি ক'রে একটি সৎপাত্রের হাতে তুলে দেবে, এই তা'র দিবারাত্রির ভাবনা। বরের বাপের ঘরে "পয়সা আছে কি না, তা' দেখবার দরকার নেই, বিবাহের সময় গয়না-গাঁটি, ভোজ-উৎসবাদিতে খরচ কর্ব্বার জন্যে যথেষ্ট সঙ্গতি দিদিমার হাতে আছে, আর ভবিষ্যতে নসীবন বল্‌তে গেলে একটা বিষয়ের অধিকারিণী।

রূপ-ও আছে, রূপী-ও বিলক্ষণ আছে, তার ওপর এক জন পতি-পুত্রহীনা প্রাচীনা বিধবার বিষয়-সম্পত্তির অছি হবার সম্ভাবনা অনেক হোম্‌রা চোম্‌রা বুদ্ধিমান মিঞাজানকে বেয়াই সম্বন্ধে আবদ্ধ হবার আশায় আকর্ষিত ক'র্ল্লে। এমন কি, ডিঙ্গেভাঙ্গার এক জন চামড়ার মহাজন হাজার আড়াই টাকার সোনা-চাঁদির জেওর আপনার ঘর থেকে এনে পরিয়ে মেয়েটিকে নিজের মাদ্রাসায়-পড়া ছোট ছাবালটির জন্যে নিয়ে যেতে-ও প্রস্তুত, কিন্তু কানাঘুষোয় মক্কাবুড়ী শুনেছিল,প্রার্থী কেবল শুক্‌নো চাম্‌ড়ার-ই যে ব্যবসা করেন, তা নয়, স্বার্থের জন্যে আবশ্যক হ'লে নিজের চোখের চাম্‌ড়াখানি পর্য্যন্ত বিক্রী ক'রে ফেল্‌তে পারেন; আর তাঁর ছেলেটির প্রাণে ইস্‌লামধর্ম্মের আধিপত্য বেলকুল থাক্ বা না থাক্, চালে আর বোলে নবাবীর অস্তিত্ব বেশ ভাল রকম জাহির হয়।

অনেক দিন এক পাড়ায় বাস, সুতরাং সোনাউল্লার ঘরের চালচলন ও তার সাংসারিক অবস্থার কথা মক্কাবুড়ীর বাড়ীতে উভয় পক্ষের যাতায়াতে হামিদকে সে হামেসাই দেখতে পেত এবং বুদ্ধিমান্ সচ্চরিত্র শান্ত ছেলে বোলে মনে মনে বিশ্বাস-ও ছিল। এ দিকে সার্ব্বভৌম ঠাকুরকে পাড়ার অন্যান্য লোক যেমন শ্রদ্ধা, ভক্তি, সম্মান ক'র্ত্তেন, তেমনি মক্কাবুড়ীর-ও ঐ ব্রাহ্মণটির প্রতি বিশেষ ভক্তি ছিল; বুড়ী জান্‌ত যে, ব্রাহ্মণ একান্ত নির্লোভ, কারণ, সার্ব্বভৌম মশায়ের সুপারিশে বৃদ্ধা দু পাঁচ জন দুঃস্থ লোককে সময়ে সময়ে সাহায্য ক'ল্লেও তাঁকে কখন-ও কিছু প্রণামীস্বরূপ দিতে চাইলে ব্রাহ্মণ অতি মিষ্ট বাক্যে বৃদ্ধার প্রস্তাব বার বার প্রত্যাখ্যান ক'রেছেন।

সার্ব্বভৌম ঠাকুরের চতুষ্পাঠী ও সোনাউল্লার কাঠের দোকান এক-ই জমীর উপর। সেই সার্ব্বভৌম ঠাকুরের মুখে যখন বৃদ্ধা শুন্‌লে যে, মুসলমানের ছেলে হ'লেও বালকটির সদাচার, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও মেধাশক্তি দেখে তিনি তাকে ডেকে নিজের টোলের দাওয়ায় ব'স্‌তে দেন ও তার কলেজের সংস্কৃত পড়া সম্বন্ধে উপদেশাদি-ও দেন, তখন মক্কাবুড়ীর মন থেকে সোনাউল্লার কাঠ চেলানর কুড়ুল খানিকটা স'রে গেল; বিশেষ সে নিজে ভোলে নি যে, তার স্বামী-ও দপ্তরীর কাযে অনেক কাগজ-কাটা কাতান চালিয়ে গেছেন, আর তাঁর শ্বশুর মাণিকগঞ্জ মহকুমার পাঁচপাড়া গাঁয়ে স্বহস্তে জমীতে হল কর্ষণ ক'র্ত্তেন ও পূজাপার্ব্বণ বিবাহ আদি উৎসবে বাজাবার জন্য তাঁর একটি ঢুলীর দল ছিল।

ঘর-জামাই রাখার প্রস্তাব শুনে সোনাউল্লা এমন একটা অন্তর্ঘাতী "তোবা তোবা!" উচ্চারণ ক'রেছিল যে, শুনে-ই মক্কাবুড়ী ও সম্বন্ধে কেবল যে একবারে বোবা হয়ে গেল, তা নয়, তার চক্ষুতে সোনাউল্লার মূর্ত্তি কাঠ চেলান কুড়ুলের পরিবর্ত্তে স্বার্থের নীচতা বলিদানের খড়্গ-হাতে দাঁড়াল। তবে ইতঃপূর্ব্বে হামিদ বার বার অনুরোধ ক'রেছিল, তা স্মরণ কোরে আর অমন সুখের ঘরের মেয়ে এনে বস্তীর ভিতরকার সেই পুরানো ঝুঁকে পড়া খোলার ঘরের ভিতর রাখা ভাল দেখায় না ভেবে সোনাউল্লা রাস্তার ধারের খানিকটা জমী ইজারা কোরে নিয়ে সেইখানে একখানি বেশ ভাল উঁচু পোতাওলা সিমেণ্টের মেঝে-করা ভাল জানালা-দরজা বসানো ছোট-খাট খোলার বাড়ী প্রস্তুত করালে।

আবার আই. এ. পাশ, আবার জলপানি, তার উপর

ত আছে, সুতরাং নাতির বিয়েতে সোনাউল্লা দুপয়সা বেশ খরচ কোরে ফেল্লে। ইংরিজি বাজনা, মাদ্রাজি ব্যাগ্‌পাইপ, নবাবী রোসন-চৌকী, দিশি ঢোল, য়্যাসিটিলিনের আলো, রামবাগানের ময়ূরপঙ্খী পাহাড় পর্ব্বত কিছু-ই বাকী রইল না, আমাদের বাড়ীর বিন্দি ঝি, আর স্বপ্‌না উড়ে-ও ফাঁকতালে একখানা কোরে লাল কাপড় পেয়ে গেল। বরযাত্রা দেখ্‌তে ছাদে ছাদে বারান্দায় বারান্দায় যেমন মেয়েদের ভিড়, রাস্তার ধারে, বাড়ীর রকে, সদরে তেমনই ভদ্রেতর সমস্ত পুরুষের ভিড়। সোনাউল্লাকে সবাই ভালবাসে আর হামিদ ত অনেকের-ই বাড়ীর ছেলের মত; কাযে-ই যেখান দে’ যেখান দে’ বর গেল, মন্দির, মসিদ, দেবালয়, সব যায়গা থেকে-ই আশীর্ব্বাদ কুড়ুতে কুড়ুতে আমাদের হেম নদীর মত সুন্দর বৌ আন্‌তে অগ্রসর হ’ল।

বরের বাড়ী ক’নের বাড়ী, আত্মীয় কুটুম্ব স্বজাতির ভোজ, ধুমধামে পাঁচ সাত দিন ত চ’ল্ল-ই, তার উপর পাড়ার হিঁদুদের প্রায় অনেকের-ই বাড়ীতে দু বাড়ী থেকে-ই মাছ, দৈ ও মিছরির থালার উপহার এসে পৌঁছল। আমাদের ন্যায় আর-ও দশ বার ঘর প্রতিবেশী বর-ক’নেকে আইবুড়ো-ভাতের কাপড় পাঠিয়েছিল; সোনাউল্লা বাড়ী বাড়ী গিয়ে হাত জোড় ক’রে জানিয়ে গিয়েছিল, পত্র ছাপায় নি, সুতরাং “ত্রুটী মার্জ্জনা”র আদেশ-ও এসে আমাদের হস্তগত হয় নি।

[ ক্রমশঃ।

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

# সমালোচনা

কলিকাতার স্বনামখ্যাত স্ত্রী-চিকিৎসক ডাক্তার বামনদাস মুখোপাধ্যায়ের পরিচয় নূতন করিয়া দিবার প্রয়োজন নাই। ধাত্রী-বিদ্যায় তিনি যে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহাতে বাঙ্গালীর নিকট তাঁহাকে পরিচিত করিতে যাওয়া বাহুল্য বলিয়াই মনে হয়।

বামনদাস বাবু সম্প্রতি ‘প্রসূতি-পরিচর্য্যা’ নামে একখানি চিকিৎসা-বিজ্ঞানসম্মত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্য দিয়া চিকিৎসাশাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের পরিচয় দেওয়া তাঁহার পক্ষে এই নূতন নহে। ‘মাসিক বসুমতীর’ গ্রাহকবর্গ ধারাবাহিকরূপে তাঁহার দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা ও উপদেশ-সংবলিত বহু সুষ্ঠু প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থের বহু রচনা ইতঃপূর্ব্বে ‘মাসিক বসুমতীতে’ স্থান লাভ করিয়া বাঙ্গালী পাঠককে একাধারে আনন্দ ও অভিজ্ঞতা বিতরণ করিয়াছিল।

আলোচ্য গ্রন্থে বামনদাস বাবু সূতিকা-গৃহে প্রসূতির পরিচর্য্যা এবং শিশুপালন সম্বন্ধে তাঁহার বহুদিনের সাধনালব্ধ বহু তথ্যের সমাবেশ করিয়াছেন। প্রসূতির শরীর সুস্থ ও সবল না হইলে গর্ভস্থ বা গর্ভজাত সন্তানের শরীর সুস্থ ও সবল হয় না। অধুনা অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারবশতঃ প্রসূতির ও শিশুর পক্ষে অবশ্যপালনীয় বহু নিয়ম ও ব্যবস্থা পালিত হয় না। এই সকল কারণে বাঙ্গালার সন্তান ও সন্তান-জননীদিগের নানারূপে স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতেছে, প্রসূতি ও শিশুর অকালমৃত্যুও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। কলিকাতার প্রায় শতকরা ৪৭ জন ১৬ বৎসর হইতে ২৫ বৎসরবয়স্কা জননী দুঃসাধ্য যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইতেছেন, এরূপ সংবাদও প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত রক্তহীনতা বা রক্তাল্পতা রোগও প্রবলভাবে দেখা দিয়াছে। অসুস্থ জননীর শিশুও যে স্বাস্থ্যহীন হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। অথচ শিশুই ভবিষ্যৎ জাতীয় জীবনের প্রধান বল ও ভরসা।

বিজ্ঞ চিকিৎসক বামনদাস বাবু এই সকল দেখিয়া-শুনিয়া সহজ সরল সুখপাঠ্য ভাষায় সন্তান ও সন্তান-জননীদিগের স্বাস্থ্যোন্নতিকল্পে এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। যাহাতে সূতিকা-গৃহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে, যাহাতে প্রসূতি সুস্থ প্রফুল্লচিত্তে সুপ্রসব করিতে পারেন, যাহাতে শিশু সুস্থ ও সবলকায় হয়, তাহারই উপায় ইহাতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। রোগলক্ষণ বর্ণনাকালে প্রত্যেক রোগের মোটামুটি নিদান অর্থাৎ কারণ, যথাসময়ে চিকিৎসা না হইলে তাহার ফল অর্থাৎ পরিণাম, রোগ যাহাতে না হয়, তাহার উপায় অর্থাৎ প্রতিষেধ এবং রোগ জন্মিলে তাহা হইতে মুক্তিলাভের উপায় অর্থাৎ প্রতীকার যথাক্রমে এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। ঋতুকালীন নিয়মপালন, গর্ভাবস্থায় নিয়মপালন, প্রসবকালীন আবশ্যক নিয়মপালন, সূতিকা-গৃহের নিয়মপালন, প্রসূতি ও শিশুর মঙ্গলার্থ আঁতুড়ে অবশ্যকর্ত্তব্য ক্রিয়া, শিশুপালন, শিশুর খাদ্য, শিশুর স্নান, সংক্রামক রোগে সতর্কতা, ডাক্তারের জন্য যোগাড় ইত্যাদি নানা বিষয় এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। ফল কথা, প্রসূতি ও শিশুর মঙ্গলের জন্য যাহা করা কর্ত্তব্য, তাহা এই গ্রন্থে সহজ সরল কথায় বুঝান হইয়াছে।

এমন গ্রন্থ প্রত্যেক গৃহস্থের পক্ষে কিরূপ উপকারী, তাহা সহজেই অনুমেয়। ডাক্তার বামনদাস বাবু নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ। পাশ্চাত্য বিদ্যায় তিনি সম্যক্ পারদর্শী হইলেও হিন্দুর আদর্শ ও ভাবধারায় অনুপ্রাণিত। তাই তিনি বলিয়াছেন,—“মহাশক্তির অংশরূপিণী জননীগণ নীরোগ শরীরে জীবনযাপন করত নিজ নিজ সন্তান-দেহে পূর্ণশক্তি সঞ্চারিত করুন। সুস্থ বলিষ্ঠ চরিত্রবান্ ও ধর্ম্মপ্রাণ সুসন্তানে দেশ পূর্ণ হউক। ভারতের লুপ্তগৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হউক!” তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণতা ও দেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া দেশের লোক তাঁহার উপদেশ অনুসারে সন্তান ও সন্তান-জননীগণের স্বাস্থ্যসংরক্ষণে আত্মনিয়োগ করুন, ইহাই কামনা।

সুন্দর কাগজ, সুন্দর ছাপা, বাঁধাইও সুন্দর। এমন গ্রন্থের মূল্য মাত্র ২৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—১৩২নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, পল্লী-মঙ্গল সমিতি এবং অন্যান্য পুস্তকালয়।

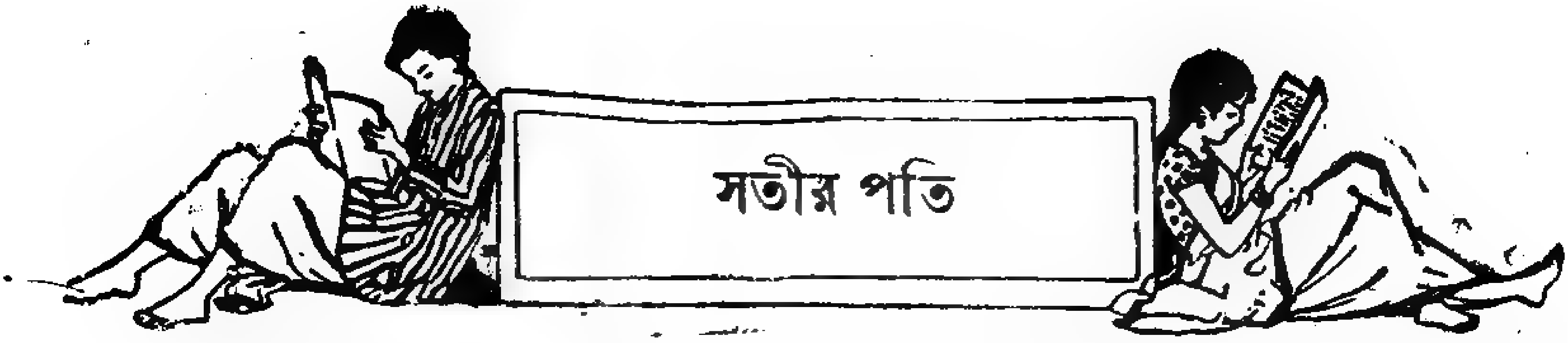

# সতীর পতি

( উপন্যাস )

## নবম পরিচ্ছেদ

### অতিথি-সংকার।

দ্বিতলে একটি সুদৃশ্য গালিচা-মোড়া সুসজ্জিত কামরার বাহিরে দাঁড়াইয়া রেবতী বলিল, "আপনি ঘরে গিয়ে একটু বসুন, আমি চট্ ক'রে গোসলখানা থেকে হাত-মুখ ধুয়ে, কাপড় বদ্‌লে আসি। আপনিও হাত-মুখ ধোবেন নিশ্চয়—কিন্তু গোসলখানা আমার মাত্র একটি—আমি সেরে এসে ততক্ষণ দুটি ভাতের ব্যবস্থা করবো। দরোয়ান, বাবুকে বসাও, পাখা খুলে দাও।"—বলিয়া রেবতী বারান্দা দিয়া অদৃশ্য হইল।

হীরালাল বাহিরে আবুহোসেনের নাগরা জুতা ত্যাগ করিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিল, এখানি বসিবার কক্ষ। কয়েকটি সুদৃশ্য সোফা ও চেয়ার ইতস্ততঃ সাজানো রহিয়াছে। দরোয়ান পাখার নিকটবর্ত্তী একটা সোফা দেখাইয়া বলিল, "মিঞাজী বৈঠিয়ে।"

হীরালাল হাসিয়া ফেলিল। দ্বারবান্ তাহার পানে উৎসুক নেত্রে চাহিল। হীরালাল বলিল, "ওহে হরিসিং—আমি মিঞা-টিঞা নই—আমি বাঙ্গালী হিন্দুর ছেলে। এটা আমার থিয়েটারের পোষাক।"

হরিসিং বলিল, "ওঃ,—হুজুরভি থেটরমে হ্যায়? হামারা গল্‌তি হুয়া! সিগ্রেট পিতে হেঁ?"

"পেলে খাই বৈ কি!"—বলিয়া হীরালাল 'আঃ' বলিয়া সোফার কোণে দেহ এলাইয়া দিল। দ্বারবান্, হীরালালের কাছে একটা ছোট টেবল সরাইয়া, দেওয়াল-আলমারী হইতে সিগারেট-পূর্ণ একটা রূপার কৌটা, দেশলাই ও ছাইদানি আনিয়া টেবলের উপর রাখিয়া, নীরবে প্রস্থান করিল।

হীরালাল উৎসুকনেত্রে কক্ষখানির চারিদিক দেখিতে লাগিল। সাজসজ্জাগুলি সমস্তই মহার্ঘ—ধনিজনোচিত। ভাবিল, হবে না কেন? একে এত বড় অ্যাক্‌ট্রেস্—তার উপর আবার উপরি পাওনাও বোধ হয় বিলক্ষণ! দেওয়ালে কতকগুলি বাঁধানো ফটোগ্রাফ টাঙানো রহিয়াছে—তন্মধ্যে গিরিশ ঘোষ, অমৃত বোস ও দানী বাবুকে চিনিল। অপরগুলি কাহার ছবি, চিনিতে পারিল না। ঐ ও দিকে—ঐ যে একখানি বড় ব্রোমাইড ছবি—ও-খানি বোধ হয়, রেবতীর সেই তথাকথিত স্বামীর—যিনি চাচা আপনা বাঁচা নীতির অনুসরণ করিয়া, চাচার কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

হীরালাল কৌটা হইতে একটি সিগারেট লইয়া দেশলাই জ্বালিয়া ধরাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু অদূরে মাথার উপর অম্বারের পাখা বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরিতেছে—দেশলাই নিবিয়া গেল। দুই তিনটি কাঠি নষ্ট করিয়া, পাখা হইতে দূরে গিয়া সিগারেট ধরাইবার মানসে হীরালাল উঠিল। পূর্ব্বোক্ত ব্রোমাইড ছবিখানির নিকট গিয়া দাঁড়াইয়া, সিগারেট ধরাইল। তাহার পর ছবিখানি নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিল, ইহা সেই ব্যক্তির প্রতিমূর্ত্তিই বটে। ছবির নিম্নভাগে কোণে হস্তাক্ষরে লেখা আছে—"তোমার প্রেমাথাংকী সতীষ।" লোকটার বিদ্যার দৌড় দেখিয়া হীরালাল হাসিল। ফিরিয়া আসিয়া, সোফায় বসিয়া ধূমপান-সুখ উপভোগ করিতে লাগিল।

এই অবসরে কয়েকটি চিন্তাও হীরালালের মনের মধ্যে প্রবেশ করিল। এ ত দেখিতেছি—একটা ইয়ে—অর্থাৎ কি না—পতিতা স্ত্রীলোক। ভদ্রসন্তান হইয়া, ইহার গৃহে সাময়িক আতিথ্য-স্বীকার—এটাই বা কেমন? কিন্তু উপায়ই বা কি? এই ডামাডোলের বাজারে, এত রাত্রে যাই বা কোথায়? এক জন অভিনেত্রীর গৃহে আমি রাত্রিযাপন করিয়াছি, এ কথা যে শুনিবে, সে কি আমায় সুচরিত্র বলিয়া আর বিশ্বাস করিবে? একেই বলে দশচক্রে ভগবান্ ভূত! যা হোক, রাত্রিটা রাম রাম করিয়া কাটাইয়া, কল্য প্রাতে উঠিয়াই চম্পট দিতে হইবে। কিন্তু সে কার্য্যটাই বা কিরূপে হইবে? থিয়েটারে ঢুকিব উদ্দেশ্য করিয়া

আসিয়াছি, রেবতী এক জন প্রধানা অভিনেত্রী—তার যা হোক একটু কিছু উপকার আমার দ্বারা সাধিত হইয়াছে—সে ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই আমার উদ্দেশ্যটি সফল করিয়া দিতে পারে—এ অবস্থায় তাহাকে চটানো কি নির্ব্বোধের কার্য্য হইবে না? এ ত রীতিমত উভয়সঙ্কটে পড়া গেল দেখিতেছি!

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে হীরালাল উপর্য্যুপরি দুইটি সিগারেট ভস্ম করিয়া ফেলিল। ঘড়ীর পানে চাহিয়া দেখিল, রাত্রি দুইটা বাজে। ক্ষুধাও পাইয়াছে—আবার এ দিকে ঘুমেও চক্ষু জড়াইয়া আসিতেছে। "চট্ ক'রে সেরে আসি"—বলিয়া গৃহ-স্বামিনী স্নানকক্ষে গেল—আধ ঘণ্টা হইতে চলিল, এখনও ত ফেরে না! কাপড়-চোপড়গুলা ছাড়িয়া, একটু স্নান করিয়া লইতে পারিলেই ভাল হয়—শরীরের গ্লানি যায়। আহার কিছু জুটুক ভাল, না জুটুক নেই নেই—একটু ঘুমাইতে পাইলে এখন প্রাণটা বাঁচে।

হীরালাল ঊর্দ্ধমুখে বসিয়া চিন্তা করিতেছিল, রেবতী নিঃশব্দে প্রবেশ করিয়া হাসিয়া বলিল, "ক'খানা কড়িকাঠ গুণলেন, বলুন দেখি?" হীরালাল চমকিয়া, প্রশ্নকারিণীর পানে চাহিল। রেবতী সদ্য-স্নাতা, একখানি সাদাসিধা দেশী কালাপাড় শাড়ী পরিয়াছে, এলো চুলগুলি পৃষ্ঠ-বসনের উপর ছড়াইয়া রহিয়াছে, ঠিক যেন গৃহস্থ-ঘরের বৌটি! দেখিতে, হীরালালের বেশ মিষ্ট লাগিল। তাড়াতাড়ি বলিল, "না, কড়িকাঠ গুণিনি, ভাবছিলাম, নীচে থেকে মুসলমানে আপনাকে আবার ধ'রে নিয়ে গেল না কি?"

রেবতী বলিল, "দৈত্য যদি উর্ব্বশীকে ধরতে আসতো, আমি চীৎকার করতাম,—রাজা পুরূরবা হয়ে আপনি গিয়ে আমায় উদ্ধার করতেন।"—বলিতে বলিতে রেবতী পাখার ঠিক নিম্নে একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিল। উভয় বাহু পৃষ্ঠের দিকে লইয়া গিয়া, শুকাইবার জন্য চুলগুলি চিরিতে চিরিতে বলিল, "ভেবেছিলাম, শুধু পা দুটো, মুখটো হাতটা ধুয়ে নেবো, কিন্তু জল দেখে, স্নান করবার লোভ আর সংবরণ করতে পারলাম না। এক রাত এক দিন ট্রেণে কেটেছিল—তার পর গুণ্ডা-গৃহে দু'দিন—প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছিল। স্নানটা সেরে আসতে দেরী হয়ে গেল। গোসলখানা ঠিক ক'রে, ঝি এখনই এসে খবর দেবে। আমার এত দেরী হবে জানলে, আপনাকে আমি আগেই পাঠিয়ে দিতাম—অতিথিকে বসিয়ে রেখে স্বার্থপরের মত নিজে স্নানে যাওয়াটা আমার ঠিক হয়নি!"

হীরালাল বলিল, "কেন, তাতে কি হয়েছে? আপনি বেশ করেছেন—আমার এমন তাড়াতাড়িই বা কি?"

রেবতী বলিল, "ঐ যে, ঝি এসেছে। গোসলখানা ঠিক হয়েছে সদু?—আচ্ছা, বাবুকে নিয়ে যা। আমি ততক্ষণ দুটো ভাতের যোগাড় দেখি। আপনি দুটি ভাত খাবেন ত হীরালাল বাবু?"

হীরালাল বলিল, "খেলেও হয়—কিন্তু—"

"কিন্তু কি? হ্যাঁ, তা বটে, আমার পাচিকাটি ব্রাহ্মণকন্যা নয়—সদ্গোপের মেয়ে;—তাতে যদি আপনার আপত্তি থাকে, তবে সে চড়িয়ে দিক, আপনি এসে নামিয়ে নেবেন এখন!"

হীরালাল বলিল, "সে জন্যে কিন্তু বলিনি—ও সব প্রেজুডিস্ আমার নেই। কিন্তু এই রাত্রে আপনাকে কষ্ট দেবো? তাই সঙ্কোচ হচ্ছে।"

রেবতী বলিল, "কষ্ট আর কি? আমিও খাব যে! ট্রেণে দু'দিন খাবার খেয়ে কেটেছিল, তার পর গুণ্ডাগৃহে মিহিদানা আর সীতাভোগ ভক্ষণে জীবনধারণ! তা খেয়ে কি বাঙ্গালীর মেয়ের প্রাণ বাঁচে? আচ্ছা, আপনি এ দু'দিন ওখানে কি খেলেন?"

হীরালাল বলিল, "মুসলমানী দোকানের রোটী গোস্ত!"

"তবে আপনিও দুটি ভাত খাবেন বৈ কি! কিন্তু ভাতে-ভাত, তাও ব'লে রাখছি। এত রাত্রে বেশী কিছু হয়ে উঠবে না। আলু ভাতে, মুসুরীর ডাল ভাতে, হাঁসের ডিম ভাতে—আর মাখন-গলানো ঘি আছে ঘরে—ব্যস্।"

হীরালাল বলিল, "সে ত অমৃত!"

"ক্ষিধের সময় তাই বটে—তা হ'লে আপনার খুব ক্ষিধে পেয়েছে নিশ্চয়। যান তবে, শীগ্‌গির সেরে আসুন। বাবুকে নিয়ে যা সদু, সব দেখিয়ে শুনিয়ে দিয়ে আয়। আমি ততক্ষণ ষ্টোভ জ্বেলে জল চড়িয়ে দিই—তুই এসে চা'ল ধুবি।"

দাসীর সঙ্গে হীরালাল গোসলখানায় গেল। ভিতরে বিদ্যুতের আলো জ্বলিতেছে। পিপা-কাটা কাঠের চারিটি টব সারি সারি সাজানো—দুইটা খালি, দুইটা জলে ভর্ত্তি। গত

কল্য সন্ধ্যার ট্রেণেই গৃহস্বামিনীর ফিরিবার সংবাদ ছিল, --তাই জল ধরিয়া রাখা হইয়াছিল। সুগন্ধি নূতন সাবান, ধোয়া তোয়ালে, গন্ধতৈল, হেয়ার লোশন, চিরুণী, বুরুষ, --দেওয়ালে বেলোয়ারি আর্শি বাঁধা। ঝিকে বিদায় দিয়া হীরালাল গোসলখানার দ্বার বন্ধ করিল।

প্রাণ ভরিয়া স্নান করিয়া, ধুতি-গেঞ্জি পরিধান করিয়া, কেশসংস্কারান্তে হীরালাল উপরে গিয়া দেখিল, রেবতী তাহারই পূর্ব্ব-অধিকৃত সোফায় হেলান দিয়া বসিয়া সিগারেট খাইতেছে, সম্মুখে টেবলের উপর আধ গেলাস একটা কি তরল পদার্থ। হীরালালকে দেখিয়া, রেবতী একটু উঠিয়া বসিয়া বলিল, "বাঃ,—এইবার আপনাকে খাসাটি দেখাচ্ছে! ও পয়জামা-ফতুই প'রে বাঙ্গালীর ছেলেকে কি মানায়? আসুন, বসুন—ততক্ষণ একটু সিগারেট খেয়ে নিন। একটু ক্ষিধে ক'রে নেবার জন্যে—আর কিছু—দেবে কি.?" বলিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া রেবতী বক্রকটাক্ষে নিজ সম্মুখস্থ গ্লাসটির পানে চাহিল।

রেবতীর পানীয় কি পদার্থ, তাহা অবশ্য হীরালাল পূর্ব্বেই অনুমান করিয়াছিল; হাতযোড় করিয়া বলিল, "মাফ করবেন, আমার চৌদ্দ পুরুষেও কখনও ও-জিনিষ খায় নি।"

"আচ্ছা--নিন, তবে সিগারেট নিন"---বলিয়া সিগারেট-কৌটা ও দেশলাই হীরালালের দিকে ঠেলিয়া দিয়া, রেবতী গ্লাসে মুখ দিল।

কথায় কথায় সতীশের প্রসঙ্গ উঠিল। সতীশের সহিত গত দুই বৎসর তাহার কি সম্বন্ধ ছিল, তাহা রেবতী সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া বলিল, "উঃ, কি বিশ্বাসঘাতক লোক! আমায় বাঘের মুখে ফেলে রেখে স্বচ্ছন্দে গা-ঢাকা দিলে!"

হীরালাল বলিল, "তিনি বোধ হয় ইচ্ছা ক'রে এ রকম করেননি। টাকা বোধ হয় সংগ্রহ ক'রে উঠতে পারেন নি।"

"ক্ষেপেছেন আপনি হীরালাল বাবু! মস্ত কারবার তার—পাঁচ হাজার টাকা সংগ্রহ করা তার পক্ষে মোটেই শক্ত কথা নয়। আর ধরুন, যদি সব টাকাটা সংগ্রহ করতে না-ই পেরে থাকে, যতটা পেরেছে, ততটা এনে করিমকে দিয়ে, তার হাতে-পায়ে ধ'রে সময়টা বাড়িয়ে নিলেও ত পারতো। অক্ষমতা নয় হীরালাল বাবু--অনিচ্ছা! ভেবেছে বোধ হয়, সখ ত মিটে গেছে---আবার টাকা খরচ কেন? বিশেষ, তা'র কাছে আমার দু'মাসের মাইনে হাজার টাকা পাওনা আছে—সেটাও দিতে হবে না--সব দিক থেকেই লাভ। ফের যদি কোনও দিন আসে, মুড়ো খ্যাংরা পেটা ক'রে তা'কে বিদায় করবো আমি!"

হীরালাল নীরবে বসিয়া সিগারেট পান করিতে লাগিল।

অল্পক্ষণ পরেই সদু আসিয়া সংবাদ দিল, অন্ন প্রস্তুত। রেবতী বলিল, "এই ঘরেই দে।" ঝি একটা মাঝারি আকারের টেবলে ধোয়া টেবল-ক্লথ বিছাইয়া, কাঁটা চামচ প্লেট প্রভৃতি সাজাইয়া রাখিয়া খাবার আনিতে গেল। একটা ট্রের উপর ডিশে পূর্ণ ভাত, তিনটা প্লেটে কাঁচা লঙ্কা. ও পেঁয়াজের টুক্‌রা-মাখা তিন রকম "ভাতে"—এবং একটা ছোট মিল্ক-জগে ধূমায়মান সুগন্ধি গব্যঘৃত—এই সমস্ত দ্রব্য আনিয়া, টেবলে সাজাইয়া দিল। দুইটা কাচের গ্লাসে জল ভর্ত্তি করিয়া প্লেটের পাশে পাশে রাখিল। রেবতী তাহার গ্লাসের অবশিষ্ট পানীয়টুকু শেষ করিয়া বলিল, "আসুন, হীরালাল বাবু—এইবার দু'জনে মিলে ক্ষুধাসুর বধ করা যাক।"

ভোজনান্তে, অতিথিকে তাম্বূল প্রদানের পর, "আমায় এক মিনিট মাফ করুন"—বলিয়া রেবতী বাহিরে গেল। দাসীর সঙ্গে নিজ শয়নকক্ষে গিয়া বলিল, "আজ এই ঘরেই বাবু শোবেন। আমার একটা বিছানা, বসবার ঘরে মেঝের উপর পাখার নীচে পেতে দিস্। এখানে খাবার জল, দেশলাই, সিগারেট—এই সব ঠিক ক'র রেখে গিয়ে খবর দিস।"

ঝি বলিল, "এই ঘরে আলমারীতে তোমার সব গয়না-গাঁটি রয়েছে—আন্‌কা লোককে এখানে শোয়াবে দিদি বাবু? তার চেয়ে, বসবার ঘরের মেঝেতেই কেন বাবুটির জন্যে বিছানা পাতি না?"

রেবতী বলিল, "না সদু, তা হয় না। ভদ্রলোক—তায় অতিথি---শুধু তাই নয়--মহাবিপদ থেকে উনি আমায় উদ্ধার ক'রে এনেছেন---উনি আমার জীবনদাতা!—সে সব অনেক কথা—পরে তোরা শুনবি এখন।"—বলিয়া রেবতী বাহির হইয়া গেল।

অল্পক্ষণ পরেই সদ্ গিয়া সংবাদ দিল, শয্যা প্রস্তুত। রেবতী উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—"আচ্ছা, তা হ'লে যান হীরালাল বাবু—বিশ্রাম করুন গে। গুড নাইট্।"—বলিয়া রেবতী হস্ত প্রসারণ করিল।

হীরালাল শেক্-হ্যাণ্ড করিয়া, "গুড নাইট্" বলিয়া ঝির সহিত শয়নকক্ষে গেল।

শুভ্র সুকোমল শয্যা—বিদ্যুৎপাখা ঘুরিতেছে—আলো নিবাইয়া দিয়া, অল্পক্ষণমধ্যেই হীরালাল গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইল।

পরদিন নিদ্রাভঙ্গে দেখিল, অনেক বেলা হইয়াছে এবং এক ব্যক্তি তাহাকে ঠেলিয়া ক্রুদ্ধস্বরে দাঁত খিচাইয়া বলিতেছে—"কে রে তুই ড্যাম রাস্কেল এখানে শুয়ে ঘুমুচ্ছিস্?"

হীরালাল লোকটার মুখপানে চাহিবামাত্র চিনিল, এ ব্যক্তি আর কেহই নহে, রেবতীর সেই "প্রেমাখাংকী সতীষ।"

[ ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

# সোজা দেখা ও উল্টা দেখা

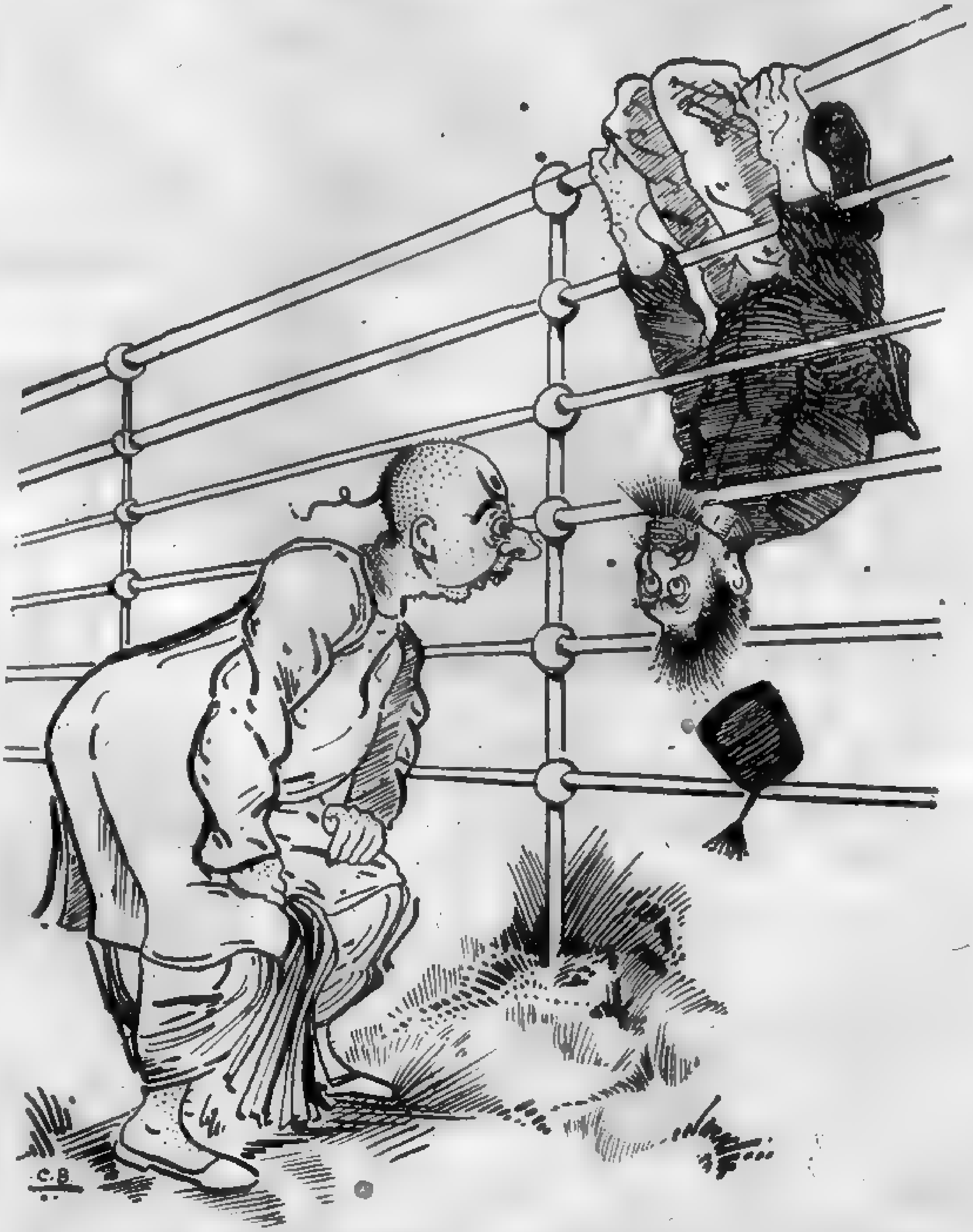

এক জেলে টিকি দাড়ি মিঞা ভট্‌চায! ছুজনেরই "কিয়া থাঙ্গা" তবু দাঙ্গাবাজ॥

# ইটালীতে রবীন্দ্রনাথ

বিগত ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ-আমেরিকা হইতে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ কয়েক দিন ইটালীতে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। সেই সময় ইটালীর জনসাধারণ তাঁহাকে নানা স্থানে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, কিন্তু অসুস্থতা নিবন্ধন তিনি তখন নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে না পারিয়া ভারতে ফিরিয়া আইসেন। আসিবার কালে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, ভবিষ্যতে তিনি এই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবেন।

বর্ত্তমান বর্ষের মে মাসে তিনি প্রতিশ্রুতিরক্ষার উদ্দেশে ইটালী যাত্রা করেন। নেপল্‌স্ সহরে পদার্পণ করিলে পর তত্রত্য ইটালীয় রাজপুরুষগণ, জনসাধারণ ও ইটালীর প্রধান মন্ত্রী সিনর ম্যাসোলিনীর পক্ষ হইতে কবিবরকে ইটালীর রাজ-অতিথিরূপে অভ্যর্থিত করেন।

ইটালীর নানা স্থানে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ সমাদরে অভিনন্দিত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে কয়েকটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গ্র্যাণ্ড হোটেলে রবীন্দ্রনাথ

**ফ্লোরেন্সের বিশ্ববিদ্যালয়ে**—ফ্লোরেন্সের বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা সম্বন্ধে একটি সুন্দর বক্তৃতা করেন। ফ্লোরেন্স সহরের এবং অন্যান্য স্থানের বহু সম্ভ্রান্ত উচ্চপদস্থ ব্যক্তি এবং বহু বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক ও শিল্পী সভায় উপস্থিত থাকিয়া অখণ্ড মনোযোগের সহিত তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভলণ্টীয়ার ছাত্রসেনা সামরিক পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া তাঁহার সম্মানার্থ শ্রেণীবদ্ধভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সোপানশ্রেণী ও হলের মধ্যে দণ্ডায়মান ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার অধ্যাপক বার্কি ( Burci ) তাঁহার সহকর্ম্মিগণপরিবৃত হইয়া রবীন্দ্রনাথকে সমাদরে অভ্যর্থনা করেন। রবীন্দ্রনাথ সমবেত সভ্যমণ্ডলীকে যুক্তকরে অভিবাদন করেন। ভারতবর্ষের এই বিশিষ্ট অভিবাদন-প্রণালীতে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত অধ্যাপক পাভোলিনী ইটালীয় ভাষায় সমাগত দর্শকমণ্ডলীকে কবির পরিচয় প্রদান করেন এবং কবির বক্তৃতা উক্ত ভাষায় অনূদিত করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দেন। পরে তিনি কবিবরকে একটি সংস্কৃত শ্লোক উপহার দেন। তাহার অর্থ :—ফ্লোরেন্স এত দিন পুষ্পপুর বলিয়া খ্যাত ছিল, এখন হইতে—গুরুর অমৃতময় বাণী শুনিবার পর—উহা ফলপুর বলিয়া বিদিত হইল।

**রোমের বিশ্ববিদ্যালয়ে**—রোম বিশ্ববিদ্যালয়ে কবিবরের অভ্যর্থনায় এমন জনতা হইয়াছিল যে, শ্রীমতী প্রতিমা দেবী ও রাণী দেবীকে পশ্চাতের দ্বার দিয়া বক্তৃতা-সভায় প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। কবিবর অতি কষ্টে সভায় নীত হইয়াছিলেন। এই সভায় রবীন্দ্রনাথ যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে সমবেত দর্শকদল আনন্দে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিয়াছিল। বিশেষতঃ জনৈক ছাত্রের অনুরোধে তিনি যখন ইটালীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের চিহ্নিত শিরস্ত্রাণ মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন, তখন জনতা উল্লসিত হইয়া বক্তৃতাসভা জয়ধ্বনিতে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল। ইটালীয় ছাত্রগণ তাঁহাকে দেখিবার জন্য অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া গ্যালারী ও প্রাঙ্গণে ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং তাঁহার হস্তলিপি পাইবার জন্য ব্যাকুল অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছিল। কবীন্দ্র যথাসাধ্য তাহাদিগের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছিলেন।

**কলোসিয়মে**—কবিবর যখন কলোসিয়ম দেখিতে যাত্রা করেন, তখন সেই স্থানে ন্যূনাধিক ৫০ হাজার দর্শক সমবেত হইয়াছিল। প্রায় ১ হাজার

ফ্লোরেন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ

কলোসিয়মে রবীন্দ্রনাথ

রোমের বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ

বালক-বালিকা সমস্বরে গান গাহিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করে।

**চিত্রার অভিনয়**—ইটালীয় ভাষায় আর্জ্জেনটাইন রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্রনাথ-রচিত চিত্রা অভিনীত হয়। ইটালীয় অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ যে কবি-রচিত বাঙ্গালা নাটকের রস-মাধুর্য্য সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল, তাহা তাহাদের অভিনয়ে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইয়াছিল।

**টিউরিণে**—টিউরিণের "প্রোকল্টুরা ফেমিনিল" নামক নারীসমিতি কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। সমিতির সভানেত্রী ডাক্তার লিয়া মেজ কবিবরকে একখানি সুদৃশ্য বাঁধান 'এলবামে' করিয়া একখানি অভিনন্দনপত্র উপহার দিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাহার উত্তরে বলেন যে, আমাদের দেশের মহিলারা কোনও অতিথিকে সংবর্দ্ধনা অথবা বিদায়কালে বরণ করিয়া থাকেন। আপনারা সেই ভাবে আজ আমাকে বরণ করিতেছেন, আমার মনে হইতেছে, যেন আজ আমি ইটালীর হৃদয়-রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলাম। আপনারা আমাকে আপনাদের নিজের কবি বলিয়া হৃদয়ের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, কবির অধিকার জগতের সকল দেশের উপরেই—শুধু নিজের দেশে নহে।

রবীন্দ্রনাথ টিউরিণের কাসা-ডেল-সোল অর্থাৎ সূর্য্যমন্দিরও দর্শন করিয়াছিলেন। এই স্থানে পিতৃমাতৃহীন বালক-বালিকারা উন্মুক্ত আকাশ-তলে সূর্য্যালোকে নানা বিষয়ে শিক্ষালাভে অভ্যস্ত হয়। কবিবর তাহাদিগকে দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন।

**থিয়েটার কুইরিণো**—এই স্থানে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ললিতকলার সার্থকতা সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা করেন।

ইটালীর রাজা, প্রধান মন্ত্রী সিনর মাসোলিনী প্রভৃতি কবিবরকে অভ্যর্থিত করিয়া তাঁহার সহিত নানা বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলেন।

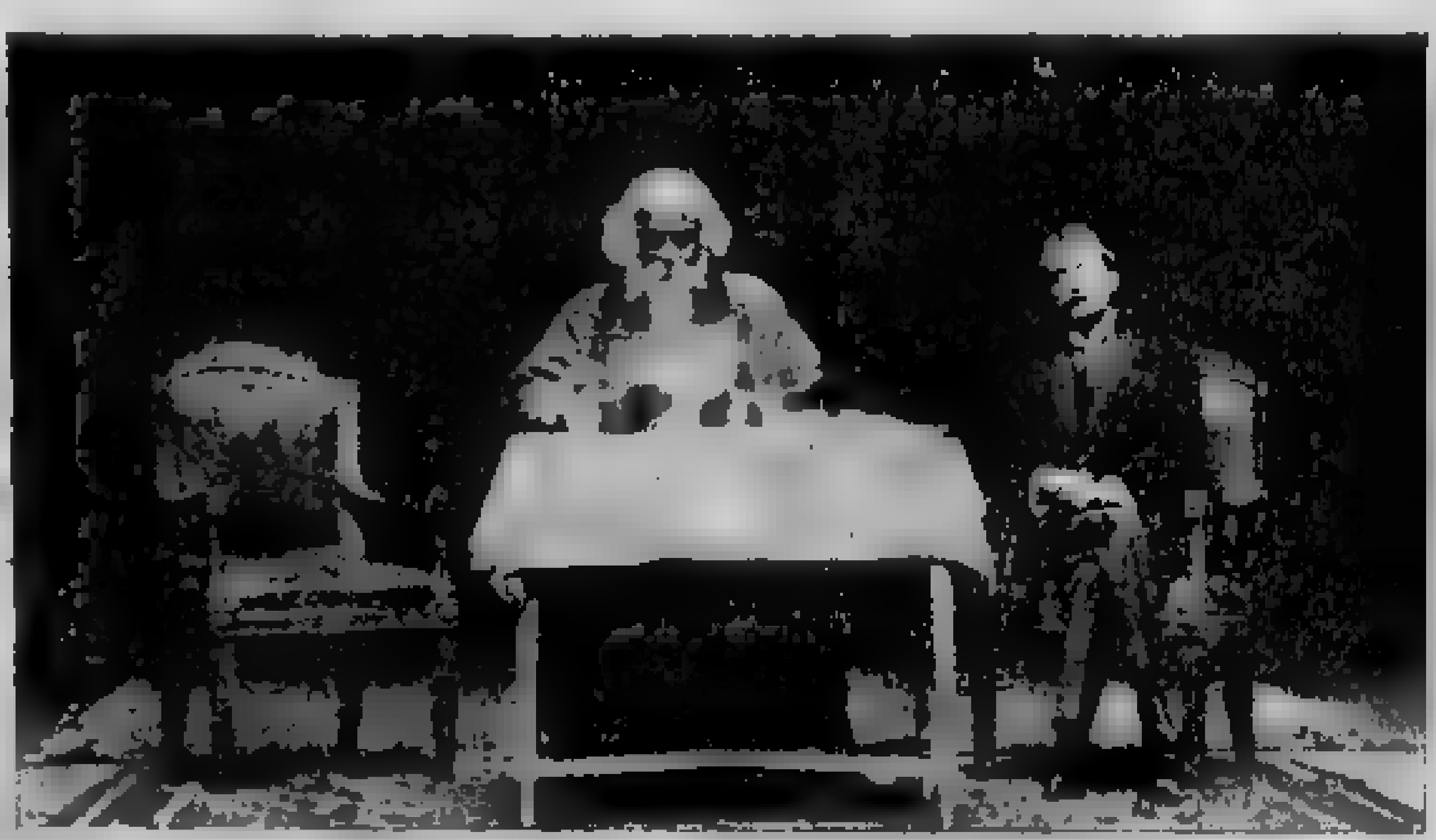

থিয়েটার কুইরিণোতে রবীন্দ্রনাথ

সম্পাদক—শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু
কলিকাতা, ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' 'বৈদ্যুতিক-রোটারী-মেসিনে' শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

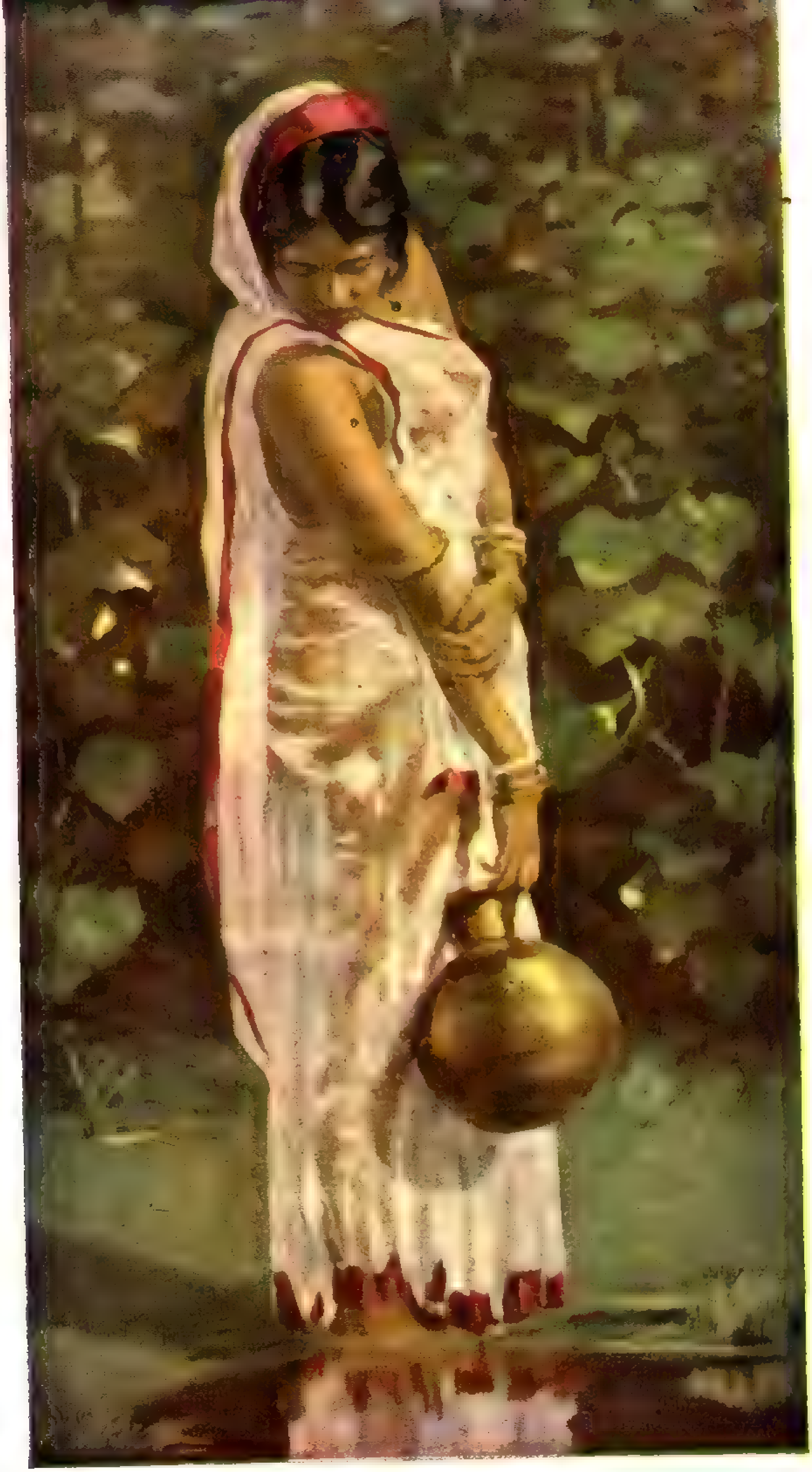

ছায়া

বসুমতী প্রেস ] [ শিল্পী—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মজুমদার ]

৫ম বর্ষ ] আশ্বিন, ১৩৩৩ [ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

# মিলনের রাতে

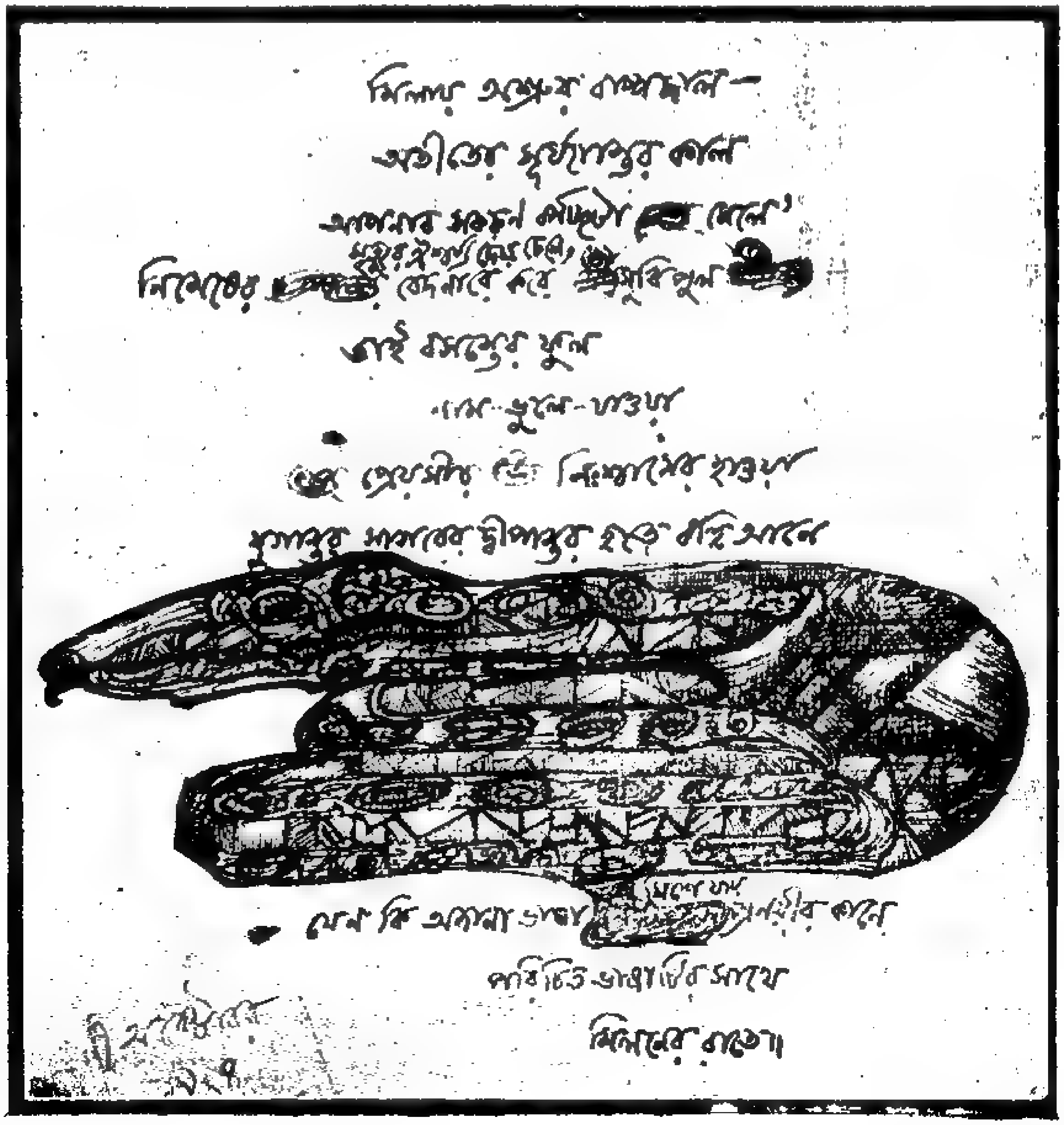

মিলনের অশ্রুর বাষ্পজাল—
অতীতের সূর্য্যাস্তের কাল
আকাশের সকল দিগন্তে [illegible] মেলে
মধুর ঐশ্বর্য্য দেয় ঢেলে,
নিমেষের [illegible] বেদনারে করে [illegible]সুরভি ফুল [illegible]
তাই বসন্তের ফুল
নাম-ভুলে-যাওয়া
[illegible] প্রেয়সীর [illegible] নিশ্বাসের হাওয়া
সুদূর সাগরের দ্বীপান্তর হতে বহি আনে
মনে মনে
যেন কি অজানা ভাষায় [illegible] কানে
পরিচিত ভাষাটির সাথে
মিলনের রাতে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

# ইংলণ্ডে ধনাগম ও তাহার ব্যবহার

এবার আমাকে আড়াই মাসের জন্য হঠাৎ য়ুরোপ যাইতে হইয়াছিল। একে বৃদ্ধবয়স, তাহার উপর সমসাময়িক প্রায় সকলেই পরলোকগত; কাযেই এখন প্রবাসযাত্রার নামে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। কিন্তু কিছু দিন পূর্ব্বেও মনে করিতে পারি নাই যে, এ বয়সে পঞ্চম বার আমার ফ্রান্স, ইংলণ্ড, আয়র্লণ্ড ও জার্ম্মাণীর কিয়দংশ দেখিবার সুযোগ হইবে। পূর্ব্বে যে কয় বার বিদেশে গিয়াছি, প্রত্যেক বারই একটা বিশেষ নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল। যথা, ল্যাবরেটরী—গবেষণাগার দেখা, বড় বড় রাসায়নিকের সহিত ভাববিনিময় করা ইত্যাদি। কিন্তু এবার আমি নূতন ধরণের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি। আজ প্রায় পঞ্চদশ বৎসর যাবৎ আমি দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা লইয়া কিছু কিছু আলোচনা করিতেছি; তাই সাধ হইয়াছিল, বিদেশের সকল জিনিস অর্থনৈতিক দিক দিয়া দেখিবার চেষ্টা করিব।

প্রথম যখন মার্সেল ( Merseilles ) সহরে নামি, তখন মনে হইল, সে দেশের ঘোড়াগুলি যেন হাতীর মত। সকালবেলা বারো হইতে পনের বছরের মেয়েরা স্কুলে চলিয়াছে, যেন ব্রিটোল স্বাস্থ্যের জাজ্বল্যমান প্রতিমূর্ত্তি! প্যারিস মার্সেল হইতে প্রায় ১৪।১৫ ঘণ্টার পথ। ফ্রান্স কৃষিপ্রধান দেশ। বাঙ্গালা দেশকে কবিরা বলেন সুজলা, সুফলা শস্যশ্যামলা; ফ্রান্সও অনেকটা সেইরূপ। সেখানে এক টুকরা ভূমিও খালি পড়িয়া নাই। নানা নদনদী ও স্বভাবজ ঝরণার জলে ফ্রান্সের সমতল ভূমি সিক্ত হইতেছে; বরুণদেবও নিতান্ত বিরূপ নহেন। সুতরাং নানা প্রকার ফল, শস্য—যথা গম, যব, আলু, দ্রাক্ষা, কমলালেবু, আপেল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে। লিওঁর ( Lyons ) রেশমের চাষ ( Sericulture ) বিশ্ববিশ্রুত। গ্রাসে ( Grasse ) চামেলী প্রভৃতি নানা প্রকার গন্ধদ্রব্য প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

প্যারিসে যে হোটেলে আমি ছিলাম, তাহার নিকটেই একটি প্রসিদ্ধ বাগান ( বাগিচা ) আছে। সেখানে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা প্রাতঃ-সন্ধ্যা মুক্ত বায়ু সেবন করিতেছে; মুক্ত প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাইবার আশায় দলে দলে মিলিয়াছে। আর আমাদের এই বৃহৎ সহর কলিকাতার যুবকবৃন্দের উন্মুক্ত মাঠে যাইবার খেয়াল হয় শুধু সেই দিন—যে দিন মোহনবাগান বা অন্য কোন প্রসিদ্ধ দলের খেলা ময়দানে থাকে। তাও যদি যাতায়াতের সময় নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে দুঃখ করিবার কিছু থাকিত না। ফুলের প্রতি সমগ্র ফরাসী জাতির অগাধ ভালবাসা। প্রতি মোড়ে ফুলের দোকান। এক পয়সা, দুই পয়সা হইতে আরম্ভ করিয়া চারি পাঁচ টাকা মূল্যের ফুল বা তোড়া যাহার যেমন সাধ্য কিনিতেছে। পূর্ব্ববঙ্গে খদ্দরপ্রচার উপলক্ষে অনেকে আমাকে দয়া করিয়া ফুলের মালা দিয়া সংবর্দ্ধিত করেন; কিন্তু সে সব বনফুলের তীব্র গন্ধে আমার শিরঃপীড়া উপস্থিত হয়। আমাদের দেশে ফুলের চাষ উঠিয়া গিয়াছে। বরং ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে অনেক সৌখীন ব্যক্তি সখ করিয়া ফুলের বাগান করিতেন। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে এই কলিকাতার ময়দানে ধনিসন্তানগণের মধ্যে ঘোড়ায় চড়ার রেওয়াজ ছিল, এখন উঠিয়া গিয়াছে।

ক্যালে বন্দরে জাহাজে চড়িয়া ডোভারে আসিয়া নামিলাম। কে বলে, ইংলণ্ড শুধু ইট-কাঠ-পাতরের স্তূপ? ডোভার হইতে লণ্ডন পর্য্যন্ত রেলের দুই

পার্শ্বে চাষের জমী; মাঝে মাঝে স্থূলকায় বৃষ স্বচ্ছন্দে চরিতেছে বা শুইয়া আছে। আর আমাদের দেশের গোজাতির কি দুর্দ্দশা! ইংলণ্ডের শতকরা ৬০ জন লোক সহরে বাস করে, সেখানে বছরে যত শস্য হয়, তাহাতে ৩'৪ মাসের বেশী কুলায় না। কিন্তু যখনই রেলের দুই পার্শ্বে চাহিয়া দেখি, তখনই যত দূর দৃষ্টি চলে, দেখি শস্যের ক্ষেত। লণ্ডন হইতে এডিনবর্গ যাইবার পথে মিডলাণ্ড রেলওয়ের দুই পার্শ্বে শুধু শস্য ও ঘাসের ক্ষেত।

সেখানে দুধই বা কি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে মিলে! প্যারিসে খাঁটী দুধ টাকায় ৮ সের পাওয়া যায়। লণ্ডন সহরে লোকসংখ্যা ৭০ লক্ষ; উত্তরে বারাকপুর আর দক্ষিণে বজবজ, পূর্ব্বে ভাঙ্গড় ও পশ্চিমে কদমতলা কলিকাতার সীমানা বাড়াইয়া দিলে যাহা দাঁড়ায়, লণ্ডনের ব্যবসাবাণিজ্য ব্যাঙ্কের কেন্দ্র বাদ দিলেও প্রায় সেইরূপ হয়।

এই লণ্ডন সহরে কেহ ১২টা ১টার আগে রাত্রিকালে শুইতে যায় না; সুতরাং সকালে উঠিতে একটু দেরী হয়। আর শীতপ্রধান দেশে ভোরও হয় একটু বিলম্বে। সেখানকার সকাল সাতটা আমাদের দেশের রাত্রি চারিটার সমান।

ভোর হইবার পূর্ব্বে ৭০ লক্ষ লোকের দুধ টিনে বোঝাই হইয়া লণ্ডনের উপকণ্ঠ বা গ্রাম হইতে রেলে আসিয়া হাজির হয়। আর সকাল ৭টার পূর্ব্বে টিনে বা বোতলে করিয়া এই দুধ লণ্ডনের অধিবাসীর দুয়ারে উপস্থিত হয়। এই দুধ কেহ হস্তের দ্বারা স্পর্শ করে না। কোন রকম দুষ্ট জীবাণু ইহার ভিতর ঘরকন্না পাতাইতে পায় না। গোয়ালা আসিয়া সুপ্ত গৃহস্বামীকে বিরক্ত করে না। নিঃশব্দে দ্বারের পার্শ্বে নির্দ্দিষ্ট স্থানে দুধের পাত্র রাখিয়া চলিয়া যায়। কোন রকম গোলযোগ নাই; গোয়ালার সহিত বকাবকি নাই; সবই যেন কলে চলিতেছে! আবার ১২টা ১টার মধ্যে খালি পাত্র সংগৃহীত হইয়া সহরতলীতে চালান হইয়া যাইতেছে। বৎসরের ৩শত ৬৫ দিন এই ব্যাপার যন্ত্রচালিতের মত চলিয়া যাইতেছে; এক দিনের তরেও বিকল হইতেছে না। শুধু লণ্ডন বলিয়া নহে, এডিনবরা, ম্যানচেষ্টার যেখানেই গিয়াছি, সেখানেই এই ব্যাপার লক্ষ্য করিয়াছি। আর সে দুধই বা কি ঘন ও সুমিষ্ট! কৃষিমন্ত্রী, স্বাস্থ্যসচিব সকলেরই নজর আছে, যেন পীড়িত গাভীর দুধ বিক্রয় না হয়। সর্ব্বদাই গরুর পরীক্ষা চলিতেছে। যক্ষ্মা বা আন্থ্রাক্স (anthrax) রোগদুষ্ট গরু বিনা বাক্যব্যয়ে গুলী করিয়া মারিয়া ফেলা হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে পুড়াইয়া ফেলিয়া রোগের শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত করা হইতেছে, পাছে ব্যাধি সংক্রামিত হইয়া মহামারীতে পরিণত হয়। দুধও টিনে বা বোতলে পূরিবার পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিক উপায়ে তাহার বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করা হইতেছে। দামও প্রায় কলিকাতার কাছাকাছি, টাকায় আড়াই সের হইতে তিন সের। আবার পাড়ায় পাড়ায় দুধের আড়ৎ (Dairy) আছে। সেখানে গব্যপ্রস্তুত সব জিনিষ যথা—পনীর, ননী প্রভৃতি এবং ডিম্ব যথেষ্ট পরিমাণে মজুত থাকে। যাহার খুসী যখন তখন আসিয়া খাইয়া বা লইয়া যাইতেছে। কলিকাতার কথা ছাড়িয়া দিন, মফঃস্বলেও বৎসরের অধিকাংশ দিন ৮ আনা সেরের কমে দুধ পাওয়া যায় না। ঘাসের চাষের সুবন্দোবস্ত সেখানে আছে; বৎসরে দুই তিন বার ফসল কাটা হয়। গ্রীষ্মকালে যখন প্রচুর ঘাস জন্মে, তখন শুকাইয়া রাখা হয়, যাহাতে শীতের সময় কম না পড়ে। তাহা ছাড়া গরুর জন্য শালগম, বীট্ প্রভৃতি ফসলের রীতিমত চাষ করা হয়। সে দিন আমি একটি ডেয়ারী ফার্ম্ম (গোশালা) দেখিতে গিয়াছিলাম। দেখিয়া মনে হইল যে, যদি কেহ গরুর যত্ন ও সেবা করে, তাহা হইলে সে জাতি ইংরাজ। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে একটা গরু এক মণ দুধ দিয়াছিল বলিয়া খবরের কাগজে হুলস্থূল পড়িয়া যায়; অবশ্য সাধারণ গরু প্রতিদিন ১৫ সের হইতে আধমণ পর্য্যন্ত দুধ দেয়। ইংরাজ অবশ্য গোখাদক জাতি; কিন্তু আমাদের দেশে প্রতি বার গোমড়কে যত গরু মরে, তাহার এক-চতুর্থাংশও ইংরাজ খায় কি না সন্দেহ। খাইবার জন্যই গরুর সংখ্যা আমাদের দেশে কমিতেছে, এ কথা মোটেই সত্য নহে। আসল কথা, আমরা মুখে বলি, আমাদের গোমাতার প্রতি ভক্তি

অসাধারণ; কিন্তু গোজাতিকে আমরা যেরূপ তাচ্ছীল্য করি, বিলাতের গোখাদক জাতিও সেরূপ করে না।

আয়র্লণ্ডকে বলা হয় এমারেল্ড আইল্; আয়র্লণ্ড চিরসবুজ কৃষিপ্রধান দেশ। অজস্র গোল আলু, গোধূম, বার্লি, যব সেখানে জন্মে। গোপালনও সেখানে কৃষির আনুষঙ্গিক বলিয়া বিবেচনা করা হয়। গোময় কৃষির প্রধান সার। যথেষ্ট পরিমাণে মাখন, পনীর আয়র্লণ্ড হইতে ইংলণ্ডে চালান হয়।

যখন ডাবলিনে যাই, তখন কাষ্টম কর্ত্তৃপক্ষ আমার জিনিষপত্র আটক করিয়া দেখিয়া লইল যে, বে-আইনী কোন জিনিষ সঙ্গে আছে কি না। প্রথমে মনে হইয়াছিল, বৃটিশ-শাসিত দেশে এ আবার কি নূতন উপদ্রব! পরক্ষণেই মনে হইল যে, আইরিশ স্বাধীন রাজ্যে (Irish free state) আসিয়াছি। আবার ডবলিন হইতে বেলফাষ্টের রেলপথে ট্রেণের মধ্যে পরীক্ষক দেখা দিলেন। আমার জিনিষপত্রের বালাই কোন কালেই বিশেষ থাকে না, সহজেই রেহাই পাইলাম। কিন্তু কয়েক জন আমেরিকান্ সহযাত্রীর দুর্দ্দশার একশেষ হইল। তাঁহারা সখ করিয়া কিছু রেশম কিনিয়া লইয়া যাইতেছিলেন। আর যাইবে কোথা! শুল্ক বিভাগের প্রভুরা কড়ায় গণ্ডায় প্রাপ্য বুঝিয়া লইলেন; সহযাত্রিগণ দুঃখ করিতে লাগিলেন, এমন জানিলে কখনও রেশম কিনিতেন না।

আলষ্টারের রাজধানী বেলফাষ্টে গেলাম। আলষ্টার অতি প্রসিদ্ধ স্থান। পূরা আয়র্ল্যাণ্ড রোমান কাথলিক মতাবলম্বী, শুধু আলষ্টারে ক্রমওয়েলের সময় হইতে প্রোটেষ্টাণ্টগণের লীলাভূমি। ব্যবসাবাণিজ্যে আলষ্টার ইংলণ্ড বা স্কটলণ্ডের বড় বড় কেন্দ্রের তুলনায় নেহাৎ হেয় নহে। পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ সূক্ষ্মকাপড়ের কারখানা আলষ্টারে। তিসির গাছ হইতে এক প্রকার আঁশ বাহির হয়, পাটের মত জলে ভিজাইয়া এই আঁশ বাহির করিতে হয়। কি করিয়া আঁশ হইতে সূতা হয়, সূতার সাধারণ লাল আভা কি করিয়া দূর করা হয়, এ সকল দেখিলে প্রচুর শিক্ষা হয়। পৃথিবীর সর্ব্ববৃহৎ দড়ির কারখানাও আলষ্টারে; শণের দড়ি, কাছি প্রভৃতি পৃথিবীর সর্ব্বত্র চালান হইতেছে। আলষ্টারে জাহাজ নির্ম্মাণের কারখানাও আছে। কিন্তু আলষ্টারকে বাদ দিলে আয়র্লণ্ড পূরাদস্তর কৃষিপ্রধান দেশ।

জাভা, মরিসস্ প্রভৃতি নানা দেশে পৃথিবীতে যত চিনি উৎপন্ন হয়, এক ইংলণ্ড তাহার আঠার ভাগের এক ভাগ খাইয়া ফেলে। অথচ পৃথিবীর জনসংখ্যার অনুপাতে ইংলণ্ড ত নগণ্য। ইংলণ্ডে ধনবাহুল্য কেন হয়? লণ্ডনে ২।৪ মিনিট অন্তর বাস্, রেল, টিউবরেল্ অনবরত চলিতেছে; লোকেরও অভাব নাই। আমাদের দেশেও অবশ্য বাস্ ও মোটর আছে। কিন্তু পার্থক্য এই যে, বিলাতে লোকের এ সব জিনিষ নিজস্ব আর আমাদের অন্যের ধার-করা জিনিষ। সুতরাং এক জন ইংরাজ যখন দুই আনা পয়সা খরচ করিয়া বাসে চড়ে, তখন দুই আনার সমস্ত অংশই দেশে থাকে। আর আমরা যে মোটরে চড়ি, তার কলকজা, সাজ-সরঞ্জাম সমস্তই বিলাত হইতে আইসে। কিনিবার সমস্ত টাকাটাই বিদেশে যায়। পেট্রলের জন্যও বিদেশী কোম্পানীকে টাকা দিতে হইতেছে। কেবল সোফেয়ার,—তাও বাঙ্গলাদেশে পাঞ্জাবী। সুতরাং যখন আমরা রেল, ষ্টীমার বা মোটরে চড়ি, তখন এক টাকার চৌদ্দ আনা যায় বিলাতী মহাজনের পকেটে, আর বাকী দুই আনা সারং, চালক, টিকিটবাবুর মধ্যে ভাগ হয়। সুতরাং দেশে অর্থের সৃষ্টি হওয়া দূরে থাকুক, যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, তাহাও বৈদেশিকের উদরস্থ হয়।

এক জন ইংরাজ গড়ে কত খায়! শুধু মদই কত পান করে—হুইস্কী, বিয়ার,—সব তাহাদের নিজস্ব। অবশ্য কিছু কিছু সাম্পেন্, শেরী ফ্রান্স হইতে আইসে। ইংলণ্ডে দুনিয়ার অর্থ ঝাঁটাইয়া আইসে। বাল্যে পড়িয়াছিলাম, ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের দুগ্ধবতী গাভী (Milch Cow); আমার মনে হয়, এ কথা সম্পূর্ণ সত্য নহে। সারা পৃথিবীই ত ইংলণ্ডের দ্বারে অর্থের ডালি লইয়া উপস্থিত। ভাগ্যবান্ জাতি ইহাকেই বলে;—যদিও ইংলণ্ডের প্রতি আট জনের এক জনের অন্নসংস্থান ভারতবর্ষের উপর নির্ভর করে।

আসাম ও বাঙ্গালায় যত চা-বাগিচা আছে, তাহার শতকরা সাতানব্বই ভাগ ইংরাজের। শতকরা তিন ভাগ বাঙ্গালী ও আসামীর। অর্থাৎ যখন আমরা ১ শত

টাকার চা কিনি, তখন ৯৭৲ টাকার অধিক শ্বেতদ্বীপে গিয়া হাজির হয়। কয়লার খনি গিরিডি, ঝরিয়া, আসানসোল প্রভৃতি স্থানে আছে। ইহাদের মধ্যে গভীর খাদ যেগুলি, তাহা প্রায় সবই ইংরাজের। কেনিয়া কয়লা আমদানী হওয়ায় ইংরাজ মালিকের বিশেষ অনিষ্ট হয় নাই, কিন্তু বাঙ্গালী ও মাড়োয়ারীর সর্ব্বনাশ হইয়াছে।

পাটের কল বাঙ্গালাদেশে প্রায় ৮৩টি। দুইটা মাড়োয়ারীর আর বাকী সব ইংরাজের ও স্কটলণ্ডবাসীদিগের। বৎসরে ৫০।৬০ কোটি টাকার কাঁচা পাট (Raw jute) বাঙ্গলাদেশে উৎপন্ন হয়। তাহার পর, সূতা ও বস্তায় পরিবর্ত্তিত হইলে ইহার মূল্য অনেক গুণ বাড়িয়া যায়। এ সব টাকা পায় স্কটলণ্ডের ডাণ্ডীর বণিকরা।

আসাম ও বাঙ্গালাদেশের উপকণ্ঠে তৈলের খনি আছে; কিন্তু মালিক ইংরাজ। বর্ম্মার সেগুণকাষ্ঠ, তৈলের খনি, মূল্যবান্ চুণি সবই ইংরাজের হাতে কেনা-বেচা হইতেছে। মহীশূরের অন্তর্গত কোলার প্রদেশের স্বুবর্ণের খনি ইংরাজ চালাইতেছে ও শতকরা এক শত টাকা লভ্যাংশ প্রতি বৎসর দিতেছে। কি অসাধারণ অধ্যবসায়! ২৮ মন পাতর হইতে নানা প্রক্রিয়ার পর এক পেনীর ওজনের সোনা বাহির হয়।

পৃথিবীর মালবাহী জাহাজের অধিকাংশই ইংরাজের। প্রতি বৎসর ভারতবর্ষের সঙ্গে ইংলণ্ডের ৬শত কোটি টাকার জিনিষের লেনদেন কারবার হয়। আর যে সকল জাহাজে এই সকল জিনিষ যাওয়া-আসা করে, তাহাদের দুই চারিখানি ছাড়া সমস্তই ইংরাজের। আর এক একখানি জাহাজের ভার বহনের ক্ষমতাই বা কি! ইংলণ্ডের Ocean Liner কোম্পানীর Vaterland* (Leviathan) জাহাজখানি পঞ্চাশ হাজার টনবাহী; আর একখানি ষাট হাজার টনের জাহাজ তৈয়ারী হইতেছে। ইহাদের মধ্যে বাগান, নাচঘর, মজলিসঘর সমস্তই আছে। একবার ইহাদের এক একখানির দাম জানিবার বাসনা হইয়াছিল। অনুসন্ধানে জানিলাম, ১৬ হাজার টন জাহাজের মূল্য অনুমান দেড় কোটি টাকারও অধিক ($1\frac{1}{4}$ million sterling); সুতরাং ত্রৈরাশিক নিয়ম অনুসারে পঞ্চাশ হাজার টন জাহাজের মূল্য কষিয়া বাহির করা নিতান্ত কষ্টসাধ্য নহে। লয়েডের খাতা (Llyod Register) হইতে জানা যায় যে, সুয়েজ প্রণালী দিয়া যে সকল জাহাজ যাতায়াত করে, তাহার শতকরা নব্বইটি ইংরাজের।

মিশর ছিল পূর্ব্বে ফ্রান্সের করদ রাজ্য। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে এক জন ফরাসী এঞ্জিনিয়ার (মুসিয়ে লিসেপ্স) উদ্যোগী হইয়া এই খাল কাটাইয়াছিলেন। কিন্তু ইংরাজের কূটবুদ্ধি অসাধারণ। ডিসরেইলী তখন বিলাতের প্রধান মন্ত্রী। মিশরের সুলতান ইসমাইল পাশার চারি কোটি টাকার সেয়ার বেনামী করিয়া কৌশলে ইংরাজ হস্তগত করিল। ফলে সুয়েজ প্রণালীর উপর ইংরাজের পূর্ণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল। মিশর আস্তে আস্তে ফ্রান্সের হাত হইতে খসিয়া পড়িল আর এখন মিশর, সুডান প্রভৃতি দেশে ইংরাজের প্রভুত্ব পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত। জাহাজের শুল্ক হইতে সুয়েজে যথেষ্ট আয় হয়; প্রতি জাহাজ পিছু প্রায় দশ হাজার মুদ্রা দিতে হয়।

রবারের ব্যবসা ইংলণ্ডের একচেটিয়া বলিলেও হয়। মালয়, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের রবারের বাগিচাগুলি ইংরাজের। দক্ষিণ-আমেরিকা যদিও ইংরাজের রাজত্ব নহে, তথাপি বাগানের মালিক অধিকাংশই ইংরাজ। কাঁচা মাল হইতে পাকা রবার (Finished product) করিবার কারখানা ইংলণ্ডে অনেকগুলি আছে। ইহাদের এক একটির মূলধন কয়েক কোটি টাকা।

রাসায়নিক মাল প্রস্তুতের কারখানাও ইংলণ্ডে অপ্রতুল নহে। অবশ্য সূক্ষ্ম রাসায়নিক মাল প্রস্তুত করিতে জার্ম্মাণী অদ্বিতীয়; কিন্তু Heavy chemicals ভারী রাসায়নিক মাল ইংলণ্ডের একচেটিয়া ব্যবসা। সোডা, গন্ধক-দ্রাবক, এসিড্, ব্লিচিং পাউডার পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ইংলণ্ডে প্রস্তুত হয়। এক শত বৎসর আগে প্রসিদ্ধ রাসায়নিক লিবিগ্ বলিয়াছিলেন যে, এইগুলি রসায়নশিল্পের মূলসূত্র। ব্রানার মণ্ড কোম্পানীর সোডার কারখানা পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম। লেভার ব্রাদারের সাবানের কারখানার নাম কে না শুনিয়াছে? এই কারখানার প্রতিষ্ঠাতা লর্ড লেভার

---

* জাহাজখানি পূর্ব্বে জার্ম্মাণদিগের ছিল। যুদ্ধের ফলে ইংলণ্ডের করায়ত্ত হইয়াছে।

হিউম ( Lord Lever hulme ) ৫৫ বৎসর আগে মুদীর দোকানে সামান্য চাকুরী করিতেন আর এখন এই কোম্পানীর মূলধন ৬০ কোটি টাকা। ওয়েষ্ট ইণ্ডিস, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশ হইতে নারিকেল, পাম তেল জাহাজে বোঝাই হইয়া লিভারপুলের কাছে পোর্ট সান্‌লাইট দ্বীপে হাজির হয় এবং সেখানে সাবানে পরিবর্ত্তিত হয়।

কার্পাস-শিল্প ম্যানচেষ্টার ও লাঙ্কাশায়ারের একচেটিয়া। এক ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর ৬০ কোটি টাকা মূল্যের মাল আমদানী হয়। লিড্‌স্ পশম প্রস্তুতের প্রধান কেন্দ্র। বার্মিংহামে সেফিল্ডে নানা প্রকার কলকব্জা, এঞ্জিন ও কামান সর্ব্বদাই প্রস্তুত হইতেছে। কয়লাও ওয়েলেস, নিউক্যাসলে প্রচুর। সুতরাং কারখানা চালাইবার আনুষঙ্গিক সব জিনিষই ইংলণ্ডে যথেষ্ট মিলে। পারস্যোপসাগরের কূলে যে সকল তৈলের খনি আছে, তাহাও এখন ইংরাজের করায়ত্ত হইয়াছে।

ফোর্ডের মোটরের কারখানা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। কিন্তু অক্সফোর্ডের কাছে মরিস্ ব্রাদারের যে কারখানা আছে, তাহা নিতান্ত ছোট নহে। আমরা বিদেশী জিনিষ পাইলে পারতপক্ষে দেশী জিনিষ কিনি না, আর বিলাতে আমেরিকান বলিয়া ফোর্ডের গাড়ী কেহ কিনিত না। ফলে বাধ্য হইয়া ফোর্ডকে ইংলণ্ডে এক কারখানা খুলিতে হইয়াছে। তাহার মূলধনের কিয়দংশও ইংলণ্ড হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে। ফলে মজুরীর টাকা সমস্তই ইংলণ্ড পায়।

নকল রেশম ( Artificial silk ) প্রস্তুতের জন্য কোর্টলেণ্ড ব্রাদার প্রসিদ্ধ। গত বৎসর ঐই কোম্পানী সাড়ে ছয় কোটি টাকা মুনাফা দিয়াছিল।

এখন দেখিতে পাইতেছি, ইংলণ্ডের ধনাগমও যেমন প্রচুর, ব্যয় করিবার শক্তিও সেইরূপ অসাধারণ। অর্থের কোন শাশ্বত বা নিত্য মূল্য থাকিতে পারে না, ইহা সম্পূর্ণ আপেক্ষিক। সাঁওতাল পরগণার নিভৃত পল্লীবাসীর নিকট চারি পয়সার যাহা মূল্য, তাহা কলিকাতাবাসী আমাদিগের নিকট হয় ত চারি আনার সমান। সে হিসাবে ইংলণ্ডে যদি টাকায় /২॥০ সের দুধ হয়, তবে কলিকাতায় হওয়া উচিত টাকায় দুই মণ। ইংলণ্ডে গড়পড়তা লোকের আয় ভারতবাসীর অপেক্ষা অন্যূন চল্লিশ গুণ বেশী; সুতরাং ইংরাজ আমাদের অপেক্ষা চল্লিশ গুণ বেশী খরচ করিতে পারে। করাচী হইতে গম চালান হইয়া বিলাতে যাইতেছে আর সেখানে হইতেছে হন্দর পিছু মাশুল ( freight ) এক সিলিং। ইংলণ্ডের রুটীর দামের সঙ্গে আমাদের রুটীর দামে বিশেষ পার্থক্য হইবে না। অথচ ইংরাজের খরচ করিবার ক্ষমতা কত গুণ বেশী। সে দিন মার্সেলে Daily Mailএর ফরাসী সংস্করণে একটি তৈলচিত্র নীলামের সংবাদ পড়িলাম। যে চিত্রের দাম চিত্রকর রম্‌নির ( Romney ) জীবদ্দশায় ১০।১৫ পাউণ্ডের বেশী হয় নাই, নীলামে তাহার দর উঠিল ৬১ হাজার পাউণ্ড, আট লক্ষ টাকা। জাহাজে করেন্সী কমিসন্ ও স্কিন্ কমিটীর হোমরা-চোমরা সদস্যরা আমার সহযাত্রী ছিলেন। বোম্বাইয়ের ধনকুবের বণিকদিগকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আচ্ছা বাঙ্গালাদেশের কথা ছাড়িয়া দিন, আপনাদের বোম্বাইয়ের ধনী বণিকমহলে কেহ কি এত টাকা দিয়া একটি তৈলচিত্র কিনিতে পারে?' বলা বাহুল্য, সকলেই নিরুত্তর রহিলেন।

স্বাবলম্বন ইংলণ্ডের মূলমন্ত্র। সেখানকার দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলি পর্য্যন্ত গবর্মেণ্টের কাছে সাহায্য ভিক্ষা করে না।

লণ্ডনে গাইস্, সেণ্ট বারথলমিউস্, কিংস হস্‌পিটাল প্রভৃতি কয়েক শত হাঁসপাতাল আছে। এক একটি ৫।৭ শত বৎসরের পুরাতন। কোনটা বা যক্ষ্মারোগের, কোনটা হৃদ্‌রোগের, কোনটা চক্ষুরোগের জন্য। হাজার বারো শত শয্যা প্রায় প্রত্যেকটিতেই আছে; এগুলি রাখিবার খরচ বছরেই বা কত! কিন্তু এই সব হাঁসপাতাল চলে সাধারণের দাতব্য অর্থে, লোক উপযাচক হইয়া টাকা দিয়া যায়। কোন কোন রবিবার হয় ত হাঁসপাতাল দাতব্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়; লোক গির্জ্জা হইতে বাহির হইয়া যথাসাধ্য অর্থ দিয়া বাড়ী ফিরিয়া যায়। তাহার পর যখন টাকার প্রয়োজন হয়, টাইমস্, ডেলী মেল প্রভৃতি বড় বড় কাগজে বিজ্ঞাপন বাহির হয়—'অমুক হাঁসপাতালের ৫০ হাজার পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ৭ লক্ষ টাকা বিশেষ দরকার।' অমনই কোন অজ্ঞাতনামা পুরুষ

হয় ত একখানি চেক কর্ত্তৃপক্ষকে পাঠাইয়া কৃতার্থ হইলেন। বারণার্ডোর হোম নামে ইংলণ্ডে একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠান আছে, সেখানে সহস্রের অধিক অনাথ, পিতৃমাতৃহীন বালকবালিকা প্রতিপালিত হইতেছে। এ সমস্ত চলিতেছে দানের উপর। যখনই ডাক্তার বারণার্ডোর অর্থের অভাব হইত, তিনি ভক্তিভরে উপাসনা করিতেন। পরদিন যেন যাদুমন্ত্রবলে টাকা আসিয়া উপস্থিত হইত। লণ্ডন টাইমস্, ইলাষ্ট্রেটেড্ লণ্ডননিউস্ প্রভৃতি কাগজে একটা পূরা কলম থাকে মৃতব্যক্তির উইল ও দানপত্র সম্বন্ধে। সে দিন দেখিলাম যে, এক জন লোক ৪৭ লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। ইহা প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার।

আমাদের দেশে ধনসৃষ্টি করে একমাত্র কৃষক। মামলায় দেশে টাকা বাড়ে না ; উকীল-ব্যারিষ্টারের টাকা বিদেশ হইতে আইসে না। শুধু দেশের টাকা এক হাত হইতে অন্য হাতে যায় ; তাহাতে জাতীয় ধনাগম হয় না। ডাক্তার, দালাল বা ফড়িয়াও টাকা সৃষ্টি করে না। তাহারা দেশের টাকা বিদেশে চালান দেয় মাত্র।

ইংরাজ আমাদের অপেক্ষা বড় কিসে ? দৈববলে নহে নিশ্চিত। যাহাদের শক্তি, সামর্থ্য, বিদ্যাবুদ্ধি আছে, তাহারা অনাহারী থাকে না, এ কথা অর্থনীতিক দিক দিয়া এবার লক্ষ্য করিয়াছি।

“উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মী-
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি॥”

আমরা এখন নিশ্চেষ্ট, অলস, অথর্ব্ব ও জড়ভরত হইয়া পড়িয়াছি ! আজ বাজারে যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, কেবল দেখি, ‘বেলাতী’ অর্থাৎ বিদেশী মালে দোকান বোঝাই। আমরা নিজেরা কিছুই প্রস্তুত করিতে পারি না। ৫৪ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার Bentinck streetএ অর্থাৎ কসাইটোলায়, ধর্ম্মতলা মোড়ের নিকট চীনাদের জুতার দোকান ছিল। এখন দেখিতেছি, কেবল Bentick streetএর দুই পার্শ্বে নহে, লালবাজার হইয়া চিৎপুর রোড্, ফৌজদারী বালাখানা পর্য্যন্ত চীনামিস্ত্রীর জুতার দোকান ; মাঝে মাঝে লাকৃচাঁদ, লালচাঁদ প্রভৃতি উত্তরপশ্চিমপ্রদেশীয় চামারদিগের দোকান। তাহা ছাড়া আবার লালবাজারের মোড় হইতে বহুবাজারের চৌরাস্তা পর্য্যন্ত পূর্ব্বদিকে চলিতে হইলে, কেবল চীনামিস্ত্রীর জুতার দোকান। আবার এই চীনামিস্ত্রীদের টেংরা অঞ্চলে Tannery অর্থাৎ চর্ম্মসংস্কার করিবার কারখানা এবং সেই অঞ্চলে জাট মুসলমানদেরও অনেকগুলি চামড়া পরিষ্কার করিবার কারখানা আছে। ইহারা মাসে ২ শত ৫ শত বা ১ হাজার পর্য্যন্ত টাকা উপায় করে। আর বাঙ্গালী চামার আজ কোথায় ? কলিকাতার আশেপাশে, এমন কি, দমদমা অঞ্চলে অনেক বাঙ্গালী চামার ‘হা অন্ন’ করিয়া বেড়াইতেছে। এক জন জুতা “সেলাই”কারীর মূলধন কি ? কতকগুলি ছেঁড়া জুতা রাস্তা হইতে কুড়াইয়া লইলে, তাহারা সুকতালা বানাইতে পারে এবং এই শ্রেণী প্রত্যহ ১৲ টাকা ১।০ সিকা উপার্জ্জন করে।

তাই বলি যে, কেবল ইংরাজ ও বিদেশীর দোষ দিলে চলিবে না। এই ভীষণ প্রতিযোগিতার দিনে, হাত-পা কোলে করিয়া কেবল অদৃষ্টের দোষ দিলে বাঙ্গালীজাতি —বিশেষতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী—অন্নাভাবে অচিরে ধরাপৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হইবে।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।

# সাধন-পথে

## ১

নিদাঘের জালাময় দ্বিপ্রহর—চারিদিকে যেন অগ্নিবর্ষণ হইতেছিল। বেলা প্রায় একটার সময় ঘর্ম্মাক্তদেহে বাড়ী ফিরিয়া অবনী শ্রান্তকণ্ঠে এক বার "মা" বলিয়া ডাকিয়াই রান্নাঘরের সাম্‌নের বারান্দায় বসিয়া খদ্দরের অর্দ্ধ-মলিন ঘর্ম্মসিক্ত কামিজটা খুলিয়া অদূরে মেঝের উপর ফেলিয়া দিয়া হাঁপাইতে লাগিল। মা রান্নাঘরে ছিলেন, একখানা পাখা হাতে বাহির হইয়া আসিয়া ছেলেকে ব্যজন করিতে লাগিলেন, তাহার পর পাখাখানা অবনীর হাতে দিয়া ঘর হইতে এক গ্লাস সরবৎ লইয়া আসিলেন। এই সময় হ্যাট-কোট পরিয়া অখিল বাড়ী ফিরিল—হ্যাটটা হাতে লইয়া এদিক ওদিক তাকাইয়া ছোক্‌রা চাকর কালীচরণকে ডাকিয়া ঘরে যাইবার সময় উগ্রকটাক্ষে অবনীকে দেখিয়া গেল। বলা বাহুল্য, সে দৃষ্টির মধ্য দিয়া প্রীতিসুধা বর্ষিত হইল না।

অখিল, মৃত পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আদিনাথের প্রথম পুত্র; আদিনাথের প্রতি স্নেহশীল এক জন পদস্থ ইংরাজের অনুকম্পায় সম্প্রতি পুলিস বিভাগে মোটা বেতনে কাযে ভর্ত্তি হইয়াছে। অখিলের জননী পিতৃহীন অনেকগুলি সাবালক ছেলে-মেয়েকে বুক দিয়া ঢাকিয়া মানুষ করিতেছেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র উৎসাহের সহিত কলেজে পড়িতেছিল, কিন্তু সমস্যা বাধিয়াছে সম্প্রতি এই অবনীকে লইয়া।

দাদার উগ্রকটাক্ষ অবনীর তীক্ষ্নদৃষ্টি এড়ায় নাই—সে বক্রস্বরে মা'কে সম্ভাষণ করিয়া কহিল—"রোজগেরে ছেলে বাড়ী এলো, মা। এ দীন মজুরের কাছে দাঁড়িয়ে থেকে কোনও ফল নেই। চারটে পয়সা যা' রোজগার করেছিলাম, তা' একটা ভিখারীকে দিয়ে বাড়ী এসেছি, দেখ গিয়ে, ও ছেলে অন্ততঃ পাঁচ সাত টাকা এনেইছে।"

মা হাসি চাপিয়া কহিলেন—"তা' আসুক, তুই এখন সরবৎটুকু খেয়ে নে ত! ওর কাছে আমি যাই। তুই সকালে কিছু না খেয়ে বেরিয়েছিলি। এখন চান্ কর্—বড়দি ভাত দিয়ে তবে খেতে বসবে, কাল একাদশীর উপোস গেছে, আজ দ্বাদশীর পারণ।"

মা'রও উপবাস ছিল, ইহা ভাবিয়া অবনীর মন একটু নরম হইয়া আসিল। মা সরবতের গ্লাস মুখের কাছে ধরিয়াছিলেন, ঠেলিয়া দিবার ইচ্ছা থাকিলেও দেহের মধ্যস্থ প্রবল তৃষ্ণা উহাকে উপেক্ষা করিতে পারিল না, সুতরাং সে এক নিশ্বাসে সুগন্ধী লেবুর রস-মিশ্রিত সুমিষ্ট শীতল পানীয়টুকু পান করিয়া যেন নবজীবন লাভ করিল। মা স্নান করিতে বলিয়া অখিলের কাছে আসিলেন, অখিলের সরবৎ টেবলের উপরেই ঢাকা ছিল। সে পান করিয়া টানা পাখার নীচে বসিয়া ক্লান্তি দূর করিতেছিল, মা'কে দেখিয়া বলিয়া উঠিল—"দেখ মা, তোমার ছেলের জালায় আমার মান-সম্ভ্রম আর রইলো না, শেষে চাক্‌রী নিয়েও না টান পড়ে।"

মা বুঝিলেন—কথার মধ্যে নূতনত্ব কিছু নাই, পুরাতনেরই পুনরাবৃত্তি—এখন উত্তর দিলে কথা বাড়িবে, সুতরাং কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। অখিল মা'র নিকট হইতে প্রশ্ন শুনিবার জন্য উৎসুক ছিল, কিন্তু তাহার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া আপনা হইতেই কহিল, "স্বদেশী করছিস্, পিকেটিং করছিস্, তাই কর, আজ আবার করেছে কি না, আমারই থানার অফিসের সাম্‌নে গেছে হতভাগা খাবারের 'খুঞ্চা' নিয়ে খাবার বেচতে—না লজ্জা, না অপমান বোধ! কনেষ্টবলগুলো গিয়ে আমায় খবর দিলে। আমি বাইরে এসে রিপোর্ট লিখছি, 'বড় সাহেব' এলো, তবুও ছোঁড়া সর্‌লো না—এগিয়ে এসে খাবার বেচ্‌ছে ত খাবারই বেচ্‌ছে। 'সাহেব' ওকে চেনে ত। আমায় জিজ্ঞেস করলে—'রায়—ও তোমার ভাই না, ছোট রায়?' আমি আর কি বলি, শুধু একটু 'হুঁ' ব'লে মাথা হেঁট ক'রে কায করতে লাগ্‌লাম, 'সাহেব'

হেসে বল্‌লে—'স্বদেশী করছে বুঝি? রায় সাহেবের ছেলের উপযুক্ত কায বটে।' আমি তা'র সে টিট্‌কারী হজম ক'রে চুপ ক'রে রইলাম।"

পরিপাক যে মোটেই হয় নাই, এ পরিচয় স্পষ্ট জানিয়াও মা কেবল ধীরস্বরে কহিলেন—"দুদিনের পাগলামী কোথায় মিলিয়ে যাবে বাবা,—সবুর সয়ে থাক্, দেখতেই পাবি, রোদ্দুরে ঘুরে ঘুরে হাড়-মাস কালী ক'রে ফেলেছে, দেখি আর কদ্দুর গড়ায়।"

অসহিষ্ণুভাবে অখিল কহিল—"দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমার চাক্‌রী যে শিকেয় উঠবে, তখন এত বড় গোষ্ঠীর অন্নের জোগাড় হবে কোত্থেকে?"

মা দেখিলেন, কথায় কথা বাড়ে, কিন্তু একটা কিছু না বলিলেও নয়; তাই বলিলেন—"মা'র পেটে পাঁচটা ভাই পাঁচ রকম হয়, এক জনের ত্রুটিতে আর এক জনের যদি অন্নের সংস্থান নষ্ট হয়, সে দোষ তা হ'লে নেহাৎ গ্রহ-বৈগুণ্যের—তুমি স্বচ্ছন্দে 'সাহেবকে' বল্‌তে পার—ও ভাই তোমার আশ্রিত নয়, ওর ভাল-মন্দর দায়িত্ব তোমার ঘাড়ে নেই—বাপ-পিতামোর ভিটের এক কোণে ও প'ড়ে আছে, সে আশ্রয় ঘোচাবার সাধ্য তোমারও নেই, আমারও নেই।" উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া মা চলিয়া গেলেন। অবনী স্নান করিয়া খাইতে বসিয়াছিল। দেশের কাযে মাতিয়া পর্য্যন্ত সৌখীন আহার সে ত্যাগ করিয়াছিল, সরু চালের ভাত খাইত না, মা-ও জিদ করিতেন না, বুড়ী পিসীমা চাকরদের মোটা চাউলের ভাত অবনীকে বাড়িয়া দিয়া পাতের কাছে বসিয়া অনর্থক হা-হুতাশ করিতেন, মাছের মুড়া, দুধের সর অবনীর অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য হইলেও ইদানীং সে লোভ সংবরণ করিয়াছিল। এক টুক্‌রা মাছ দিয়াই এক থালা ভাত সে খাইয়া ফেলিত, দুধ-ক্ষীর পাতে পাড়িত না। আজ বাড়ীতে একটি বৃহৎ রুইমাছ ভেট আসিয়াছিল, উহার সংযোগে নানা উপাদেয় ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইয়াছিল। বৃদ্ধা পিসীমা কাছে বসিয়া তাই অনুরোধ করিতেছিলেন—"আমার মাথা খা অবনী—খানিকটা মুড়ো তোর জন্যে আলাদা ক'রে রেখেছি, খেয়ে দেখ, বড় যত্ন ক'রে রেঁধেছি।" অবনীর জিহ্বা সরস হইয়া উঠিলেও সে সংযত স্বরে কহিল, "এই ত ছ্যাঁচড়া আর কলাইয়ের ডাল দিয়েই একরাশ ভাত ওড়ালাম পিসীমা, আর কেন—জান, পিসীমা, আমাদের দেশের পনেরো আনা লোকের কপালে এক বেলাও পূরোপেট আহার জোটে না, আর আমরা যে ভাতের উপর এত মাছ, মাংস, দুধ, ক্ষীরের শ্রাদ্ধ করি, তার মানে—তাদেরই মুখের ভাগ কেড়ে খাই।"

এতখানি দূরদর্শিতার ও লোভ-সংবরণের পরিচয় দিয়া গর্ব্বোজ্জ্বল হাস্যে অবনীর মুখ দীপ্ত হইয়া উঠিল। পিসীমা কপালে করাঘাত করিয়া কহিলেন—"আপন আপন বরাতে সবাই খায়-পরে রে—অমুক পায় না ব'লে তুই হতভাগা কেন নিজের মুখের গ্রাস খোয়াতে যাবি? আপনার আত্মাপুরুষকে শুকিয়ে রাখলে নিজেরই যে অধর্ম্ম হয়।"

অবনী হটিবার পাত্র নহে। আই, এ, পড়িবার সময় ন্যায়ের পাঠ লইয়াছিল, আসন্ন পরীক্ষার সময় দেশমাতৃকার আহ্বানে পরীক্ষার আহ্বান অবহেলা করিয়া পূর্ব্বের ডাকটিতেই সাড়া দিয়াছিল। সে বলিল—"আচ্ছা, পিসীমা, এই যে কাঠফাটা রোদ্দুরে একাদশীর উপোস ক'রে আত্মারামকে তেষ্টায় ছট্‌ফট্ করিয়ে মারো, এর অর্থ কি বল্‌তে পার? এতে তোমাদের আত্মনির্য্যাতন হয় না?"

পিসীমা বালবিধবা। আজ চল্লিশ বৎসর যাবৎ কৃচ্ছ্র-সাধনে তিনি জীবনের তিন ভাগ অতিবাহন করিয়াছেন, তাই ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রশ্নের উত্তরে কহিলেন—"এ যে বিধবার ধর্ম্ম বাবা, শাস্তর যে হুকুম দিয়েছে, তাই পালন করছি—আর আমাদের কপালের লেখনও বটে, একে খণ্ডাবার অন্তর আমাদের হাতে নেই।"

মা আসিয়া কাছে দাঁড়াইয়াছিলেন। অবনী ইচ্ছা করিলে ক্ষুরধার তর্কের মুখে পিসীমা'র যুক্তিগুলিকে খান খান করিয়া ফেলিতে পারিত, কিন্তু ইঁহাদের অভুক্ত রাখিয়া কষ্ট দেওয়া হয় জানিয়া কহিল—"আমরাও ধর্ম্ম পালন করছি, পিসীমা, এতে তোমার দুঃখের কোনও কারণ নেই। কি বল মা?"

মা কহিলেন,—"তা বই কি—যার যখন যা ইচ্ছা হবে, অন্যের ক্ষতি না ক'রে তা করুক, তাতে হানি কি?"

অবনী উঠিয়া পড়িল। ননন্দা ভ্রাতৃজায়ার এ কথায় জ্বলিয়া উঠিয়া কহিলেন—"বউয়ের আস্কারাতে ছেলেটা

এত বেড়ে উঠলো—তুমি জেদাজিদি করলে না খেতে ছেলে পথ পেতো কি ?"

অখিল আসিয়া পড়িল। অবনী আর দাঁড়াইল না। পিসীমা শশব্যস্তে পঞ্চব্যঞ্জন সাজাইয়া অন্নের থালা সম্মুখে আনিয়া ধরিলেন। মা কহিলেন - "দিদি, তুমি ঝি-চাকরদের ভাত দিয়ে আমাদেরও বেড়ে নিয়ে বসো গে ; আমি এলাম ব'লে। বড় বেলা হয়েছে, অত দেরী করো না।"

পিসীমা কহিলেন—"আমি সকালে সন্দেশ খেয়েছি, ফল খেয়েছি, তোমার মুখে কিছু রোচে নি, তুমি এসে আগে বসো।"

অখিল কহিল—"যাও না মা, আমার ত এই নিয়ে তিন বার হচ্ছে, তোমরা কাল থেকে উপোস ক'রে কেন যে হাঁ ক'রে আমার জন্যে ব'সে থাক, তা জানি না।"

মা কহিলেন—"এই যাচ্ছি এখুনি—তুমি গিয়ে ভাত বাড়ো দিদি, আমার দেরী হবে না।"

অখিল মাছের মুড়া ভাঙ্গিয়া খাইতে খাইতে কহিল, "দেখো মা, বউকে তোমার একটু ধমক দেওয়া উচিত ছিল। স্বচ্ছন্দে স্বদেশী বক্তৃতা শুনতে গিয়ে হাতের চারগাছা চুড়ি খুলে দিয়ে এল! কম ক'রে তার দাম দেড়শো টাকা! আবার কোন্ দিন কোন্ গয়না খুলে দিয়ে আসবে। আজ যদি তুমি না ধমক-টমক কর, এর পর মোটেই মানবে না। আমায় জিজ্ঞেস না করুক, তোমার মত নেওয়াও উচিত ছিল।"

মা কহিলেন, "ওর নিজের জিনিষ ও যদি ইচ্ছে ক'রে দিয়ে সুখী হয়, তা'তে আমারও ত কিছু বলা সাজে না, বাবা, —বিশেষ আরও পাঁচ জন মেয়েতে দিয়েছে, ওটা কিছু মন্দ কাযও নয় যে অন্যায় করেছে।"

অখিল ঢোক গিলিয়া কহিল, "তবেই তুমি বৌ-ঝিদের দাবিয়ে রেখেছ! এর পর মান্ছে না ব'লে পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসো না যেন।"

মা হাসিয়া কহিলেন, "দাবতে গেলে তোরাই আবার উল্টো গাইবি, এম্নিতে যা রয়-সয়, সেই ভাল।"

অখিল হাল ছাড়িয়া কহিল, "তোমার আস্কারায় ছেলে, বৌ, মেয়ে সব যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে। আমার কি! এর পর ভুগবে তুমি-ই।"

মা বুঝিলেন, বধূকে নিজে না আঁটিতে পারিয়া গহনা দানের জন্য তাঁহার নিকট আর্জ্জি পেশ করিয়া জিতিবার মৎলব অখিলের ছিল। তিনি সে কথা আর গ্রাহ্য না করিয়া শুধু কহিলেন, "তুই বাড়ীর বড় ছেলে, তুই যখন ব'য়ে যাস্নি, তখন তোর পথ ধরেই সবাই আস্বে, মিছে ভাবিস্ কেন?"

অখিল খাওয়া শেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "অবনীটাই হচ্ছে রাস্কেল। বৌটাকে বেগড়াচ্ছে শুধু অই। কানে কেবল ফুস্ মন্তর আওড়াবে। দেশ উজাড় হ'তে আর দেরী নেই। দেখছি স্বরাজ হাতে হাতে মিল্বে এবার!"

মা উচ্চবাচ্য করিলেন না। অখিল মুখ-হাত ধুইয়া পান লইয়া বধূ শৈলজার ঘরে যাইয়া দেখিল, খোকাখুকী ঘুমাইতেছে, শৈলজা একমনে বসিয়া চরকা কাটিতেছে, অবনী কাছে বসিয়া। দাদাকে দেখিয়া তদ্দণ্ডেই সে পলায়ন করিল, অখিল খাটের উপর বসিয়া কহিল, "দুপুর রোদ্দুরে ভেনর-ভেনর একটু থামাও, ছেলেরা ঘুমুচ্ছে, আর তুমি কানের কাছে আচ্ছা ঘ্যান্-ঘ্যান্ করছ! ঘুম হবে কোত্থেকে ?"

শৈলজা চরকা ঘুরাণ বন্ধ করিয়া হাসিয়া কহিল, "ছেলেরা এটাকে ঘুম-পাড়ানী গান ব'লে জেনেছে। তোমার কবে সে শুভমতি হবে, জানি না—যে দিন তা হবে, সে দিন আমি সওয়া পাঁচ টাকার হরির লুট দেব।"

অখিল একটা বালিস টানিয়া তাহার উপর কাৎ হইয়া সিগারেট ধরাইতে ধরাইতে কহিল, "যে দিন ইংরেজ-সরকার তোমাদের স্বরাজ declare করবে, সেই দিনই সেই মুহূর্ত্তে আমি তোমাদের চেলা ব'নে যাব—নইলে আমার পুলিসের চাক্রীও থাক্বে না—উঁচু পদটদ কিছু পাবার সম্ভাবনা থাকে ত তাও রদ্ হয়ে যাবে।"

শৈলজা উত্তর দিল না, নাটাই ঘুরাইয়া চরকার কাটা সুতা জড়াইয়া তুলিতে লাগিল। বার দুই চার সিগারেটে টান দিয়া অখিল ধোঁয়া ছাড়িয়া কহিল, "তোমার বড়দা'র বোধ হয় রাজগৃহে শীগগিরই নেমন্তন্ন হবে গো—ইচ্ছে হয় ত তার আগে এক দিন এ বাড়ীতে নেমন্তন্ন ক'রে খাওয়াতে পার। কেন না, সেখানকার খানাপিনা যা' হবে, তা' বিশেষ মুখরোচক হবে না।"

শৈলজা মুখ কালো করিয়া কহিল, "তোমার বাড়ীর এক দিনের কালিয়া-পোলাও দাদার রাজঘরের খাবার

দুঃখ ভুলিয়ে রাখতে পারবে না, তবে খাবার দিকেই দাদার নজর থাকে না, এ খবর তোমার চাইতে বোধ হয়, আমিই ভাল জানি।"

অতঃপর আজিকার মধ্যাহ্ন অবসর সরস দাম্পত্য-প্রেমালাপে কাটাইবার পক্ষে মোটেই সুবিধাজনক নয় দেখিয়া ক্ষুণ্ণ মনে অখিল দিবানিদ্রার সাধনায় মনোনিবেশ করিল।

## ২

সে দিন দ্বিপ্রহরের তপ্ত মধ্যাহ্নে হঠাৎ কালবৈশাখীর ঝড় উঠিয়া এক পশলা শিলাবৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল। সেই জন্য বাতাসে একটু স্নিগ্ধতার আমেজ লাগিয়াছিল, জানালা খুলিয়া দিয়া অবনী একটা বালিসের উপর কাৎ হইয়া শুইয়া রাস্তার দিকে চাহিয়া ছিল, একটা ডাষ্ট বিনের চারি পার্শ্বে গৃহস্থবাড়ীর রাশি রাশি আবর্জ্জনা পড়িয়া সেটি পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে; কতকগুলা এঁটো কলাপাতা এ দিকে সে দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল; গোটা দুই শীর্ণকায় কুকুর ক্ষুধার তাড়নায় বার বার উহা চাটিতেছিল; অদূরে একটি অপেক্ষাকৃত স্থূলকায় কুকুর শুইয়া স্তিমিত নেত্রে বুভুক্ষুদের কাঙ্গালবৃত্তি দেখিয়া লেজ নাড়িতেছিল, আর বুঝি বা মনে মনে বলিতেছিল, আমি সমস্তই শেষ করিয়া আসিয়াছি, তোমরা শুধু চাটিয়া মর।

পাশের বাড়ীর এক জন ঝি এই সময় কতকগুলা ভুক্তাবশিষ্ট মাছের কাঁটা ও একরাশি অন্ন ঐ স্থানে ঢালিয়া দিয়া গেল, ক্ষুধার্ত্ত কুকুর দুইটার চোখ আনন্দে জ্বলিয়া উঠিল, উহারা খাইতে লাগিল। ও দিকে ঐ স্থূলকায় কুকুরটির আর শুইয়া থাকা পোষাইল না, কাঙ্গালদের উপর কাঙ্গাল-বৃত্তি চালাইবার জন্য সে উঠিয়া পড়িল, একটু আড়ামোড়া ভাঙ্গিয়া গভীর গর্জ্জনে ঘেউ ঘেউ করিয়া সে ঘোষণা করিল—'সরিয়া দাঁড়াও, আমি আসিতেছি।'

ক্ষুধার্ত্ত কুকুর দুইটা কিন্তু ভয় পাইল না, তবে সবল প্রতিদ্বন্দ্বী উপর-চড়াও হইয়া যখন খাইতে সুরু করিল, তখন কাছে ঘেঁসিতেও পারিল না—দূরে দাঁড়াইয়া ক্ষীণস্বরে শুধু প্রতিবাদ করিতে লাগিল। ও দিকে আর একটা ডাষ্ট বিনের কাছে খুব হৃষ্টপুষ্ট এক বলদপুঙ্গব পাত চাটিতেছিল, তাড়িত কুকুর দুইটা উহার মুখের দিকে চাহিয়া বার বার কাতর স্বরে যেন আপনাদের আর্জ্জি পেশ করিতে লাগিল। বলদটি অগ্রসর হইয়া আসিল, তাহার গম্ভীরভাব দেখিয়া মনে হইল, সে যেন বিচারক হইয়া আসিতেছে। সে মন্থরগমনে আসিয়া অন্নের স্তূপে নিজের মুখ লাগাইল, তাহার বিপুলকায় ও সুবৃহৎ শৃঙ্গ দুইটির দিকে চাহিয়া বলশালী কুকুরটিও এবার পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইল। ও দিকে ক্ষুধার্ত্ত কুকুর দুইটার ভিক্ষাপ্রার্থী করুণ সুরের একটানা জের চলিতেই লাগিল। কিন্তু তাহাতে কর্ণপাত করে কে? বলদ-পুঙ্গব পাতাগুলি পর্য্যন্ত চিবাইয়া সব শেষ করিয়া যেমন মন্থরগমনে আসিয়াছিল, তেমনই ভাবেই চলিয়া গেল; যেন বলিয়া গেল, আর বিবাদের দরকার নেই, মূলশুদ্ধ মিটাইয়া দিলাম; দরকার হইলে আবার ডাকিও, এমনই করিয়া সব মিটাইয়া দিব।

অবনী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, পাশে শুইয়া সুচারুভূষণ সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিল, সে চমকিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি হলো রে—হাসিস কেন?"

অবনী উঠিয়া বসিয়া ব্যাপারখানা সব খুলিয়া বলিল, সুচারু হাসিয়া কহিল—"তোর কল্পনাশক্তি মন্দ নয়, ইচ্ছা করলে গুছিয়ে একটু লিখতে টিখতে পারিস।"

অবনী কিছু গম্ভীর হইয়া কহিল, "সত্যি সুচারু-দা, আমি কি ভাবছি জানো? এ ঠিক যেন আমাদের দশা, বিদেশীকে আমরা এক সময় ঘরোয়া বিবাদ মিটাবার জন্য ডেকেছিলাম, সে পাপের প্রায়শ্চিত্তের জের আজও চলছে—প্রায় হাজার বছরেও তার শেষ হয়নি।"

সুচারু উত্তর দিল না। অবনী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল—"এবার বোধ হয়, শেষ হয়ে এসেছে, তোমার কি মনে হয়, সুচারু-দা, এ বছরের মধ্যেই স্বরাজ-লাভ হবে কি না?"

সুচারু গম্ভীরস্বরে কহিল—"আমি তা কেমন ক'রে বলতে পারি, ভাই? ভবিষ্যতের ব্যাপার এখন গভীর অন্ধকারে, আলো না ফুটলে তাকে আবিষ্কার করি কি ক'রে?"

অবনী কহিল "বাঃ, মহাত্মাজী নিজে এই সত্য ঘোষণা করেছেন, এ কি না হয়ে যায়? আচ্ছা সুচারু-দা, তুমি বিশ্বাস কর কি না, তাই বল।"

সুচারু বলিল—"লোকের বিশ্বাসের উপর আমি হাত

দিতে চাই না, নিজে কিন্তু আমি খাঁটি কাযকে যতটা বিশ্বাস করি, অন্য কিছুতে ততটা বিশ্বাস করি না।"

অবনী কথাটা পরিষ্কার করিয়া বুঝিল না, কিন্তু সুচারুকে আর প্রশ্ন করিতেও সাহস করিল না। সে সুচারু অপেক্ষা আট নয় বৎসরের ছোট। সুচারু গত বৎসর এম্-এ পাশ করিয়া পাটনা কলেজে প্রফেসারী লইয়াছিল, তাহার পর সব ছাড়িয়া দেশের কাযে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। সে কংগ্রেসের কায লইয়া কাল কলিকাতায় আসিয়াছিল। আজ সকালে মামার বাড়ী দেখা করিতে আসিয়াছে। রাত্রিতেই চলিয়া যাইবে।

অবনী কহিল,—"আচ্ছা সুচারু-দা, এখন তুমি এই কাযেই লেগে থাকবে ত?

সুচারু কহিল—"তাই ত স্থির করেছি।"

অবনী কহিল—"আমায় সঙ্গে নিতে পার, সুচারু-দা? আমাকে নিয়ে বাড়ীতে ভারি গোলমাল চল্‌ছে, বড়দা বড় বিরক্ত হচ্ছেন—আমিও হাঁপিয়ে উঠেছি, ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে এমন ক'রে পিষে ফেলে সব বিষয়ে তাঁর অনুগত হয়ে চলা—এ আমার পক্ষে অসম্ভব।"

সুচারু কহিল—"কিন্তু দেশের কাযে যখন নিজেকে উৎসর্গ করবে, তখন ত নিজের অনেকখানি তোমায় দিয়ে ফেলতে হবে; তাতে তোমার স্বাধীনতা যে খর্ব্ব হবে না, তা নয়।"

অবনী উৎসাহভরে কহিল,—"সে কিন্তু অন্য জিনিষ—দাদা চান, আমি শান্ত-শিষ্ট হয়ে পরের গোলামী করি—দেশসেবায় না মাতি, খদ্দরের হাঙ্গামা না করি, পিকেটিংএ না যাই। কেন, সুচারু-দা, আমি কি কিছু অন্যায় কায কর্‌ছি?"

এই সময়ে চাকর আসিয়া সুচারুকে বাড়ীর মধ্যে আহ্বান করিল। অবনী সুচারুকে লইয়া পিসীমা'র ঘরে আসিল। বৃদ্ধা আহারাদি সারিয়া তখন বিশ্রাম করিতেছিলেন। অবনীর মা কাছে বসিয়া তেঁতুল কাটিতেছিলেন,; সুচারু আসিয়া কাছে বসিয়া এক টুকরা তেঁতুল মুখে দিয়াই বলিয়া উঠিল—"বাবা রে, কি টক!"

অবনীর মা কহিলেন—"টক্ ত বটেই—কিন্তু অখিলের খোকাখুকীগুলো যেন অমৃত মনে ক'রে খায়, দুধে দাঁতে একটুও টক্ লাগে না। আচার খাবি? এনে দেবো? ছেলেবেলায় যে আচার খেতে ভালবাসতিস।"

সুচারু কহিল—"এখনও বাসি মাসীমা, কিন্তু আর পাই কৈ? মা ম'রে গিয়ে আর কেউ ক'রেও দেয় না, তোমরাও আর খবর রাখ না।"

পিসীমা ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিলেন—"ষাট্ ষাট্—মা মরলেও মাসী রয়েছে। তোর ভাবনা কি বাপ! তুই নিজেই উড়ু উড়ু ক'রে বেড়াবি, একবার কি বুড়ো মাসীর খবর নিস্?—মরেছি কি বেঁচে আছি? এতগুলো পাশ করলি—অমন দুশো টাকার চাকরী পেলি, তবু বিয়ে করলি না—আবার এই হুজুগ ক'রে বেড়াচ্ছিস্—ঘরে কোন দায় নেই, মাথার উপর কেউ নেই যে, আটকে রাখবে!"—মাসীমা'র চক্ষুর পাতা অনুযোগের সুরে ভিজিয়া আসিল।

অবনীর মা পাতরবাটিতে করিয়া তিন চার রকম আচার আনিয়া সুচারুর সম্মুখে ধরিয়া দিলেন। সুচারু আস্বাদ লইতে লইতে কহিল—"তোমার দোহাই বড় মাসী, কেঁদো না—কেটো না—বিয়ের বয়স যায় নি, এর পর করতেও পারি। একটা কাযে লেগেছি, একটু লেগে প'ড়ে থাক্‌তে দাও। তুমি ত এখানে থাকবার মৌরসী পাট্টা নিয়ে আস নি। তা' যদি আস্‌তে, তা হ'লে এখনই বউ এনে তোমার জিম্মায় চিরকালের জন্যে রেখে নির্ভাবনা হ'তে পারতাম।"

তাহার মাসীমা কহিলেন—"তোর ভাবনা তুই নিজেই ভাববি, তার জন্যে ত পরের খাতির দরকার নেই, বাবা।"

সুচারু কহিল—"এখন যে ভাববার সময় নেই, মাসীমা! অন্য ভাবনা আপাততঃ ঘাড়ে চেপে বসেছে। কি বল মামী?"

মামীমা কহিলেন—"তা সত্যি কথা—এক দিক নিয়েই মেতে থাকা ভাল। নইলে এ কূল ও কূল দুকূলই যায়—তা আর দুদিন থেকে যা না সুচারু, পাঁচ ছ'বচ্ছর পরে ত এ দিক্ মাড়ালি।"

সুচারু কহিল, "না মামীমা, কায ত আছেই, তা ছাড়া অখিলের এই নতুন চাক্‌রী, সে আমায় দেখে শঙ্কিত হয়ে উঠেছে, তার শঙ্কার মাত্রা আর বাড়াতে চাই নে, আবার দেখা হবে, ভাবনা কি?"

মাসী কহিলেন, "এই পাঁচ-ছ বচ্ছর পরে দেখা দিলি, আবার এদ্দিন পরে যদি আসিস্, আমাকে আর দেখতেও পাবি নে। কি সন্ন্যেসীর মত ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিস্! এখন

কি এই সবের বয়েস রে? থিত্-ভিত্ হয়ে এক ঠাঁই বস—বে থা কর—যে বয়সের যা, তেমনটি না হ'লে মানাবে কেন?"

অবনী কহিল, "উঠে পড়, সুচারু-দা, পিসীমা'র কাছে ক্রমাগত এই ধরণেরই বক্তৃতা শুনে শুনে কান ঝালাপালা হয়ে উঠবে।"

অবনীর মা কহিলেন, "না রে, ভয় পাস্ নি। তুই একা বিয়ে না করলে দেশে ঘরে এমন কিছু আজ অভাব প'ড়ে যাবে না—এখন তোদের কংগ্রেসের কাযের কথা একটু বল দেখি, শুনি।"

ও দিকে ভ্রাতৃজায়ার মন্তব্য শুনিয়া ননন্দার অনুনাসিক সুরে চন্দ্রবিন্দু যোগ হইল। তিনি সুর টানিয়া কহিলেন, "বউ ত যত নষ্টের মূল—ঘরে নিজের এই একটি ছেলেকে আস্কারা দিয়ে মাথায় তুলেছে, ছেলে যেন কেমন এক রকম হয়ে যাচ্ছে, তবু চেতনা নেই—আজ যদি দাদা থাকত গো—"

বেগতিক দেখিয়া অবনী আগেই ঘরের বাহিরে পা বাড়াইয়া হাঁকিয়া কহিল, "মা, একবার এ দিকে এসে শুনে যাও না—একটা কথা বলব।"

পিসীমা'র অনুযোগ চলিতে লাগিল, অবনীর মা তেঁতুলের ডালি উঠাইয়া সুচারুর সহিত পুত্রের আবেদন শুনিবার জন্য বাহির হইয়া গেলেন।

### ৩

মাস ছয় সাত পরে বিহারের কোন একটি ক্ষুদ্র নগরীতে স্থানীয় এক জন অবসরপ্রাপ্ত সম্ভ্রান্ত রাজকর্ম্মচারীর গৃহে সুচারু অতিথি। সঙ্গে অবনী, এক বস্তা খদ্দরের কাপড় ও একটি ম্যাজিক লণ্ঠন। গ্রামে স্বদেশী প্রচারের জন্য তাহার আগমন, কিন্তু কিছুই সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিতেছে না—চারিদিকে ১৪৪ ধারা জারী হইয়াছে। এক যায়গায় পাঁচ জন লোক একত্র হইয়া কথা বলিলেই রাজ-অতিথি হইতে হইবে, এমনই কড়া আদেশ; আদেশের উপর এক দুই কাঠি উঁচুতে চলিতেছে দেশীয় কর্ম্মচারিবৃন্দ—এমনই তাহাদের প্রখর কর্ত্তব্যজ্ঞান।

গৃহস্বামী শৈলেশ্বর হুজুগে মাতিবার লোক নহেন। তাহার উপর তিনি বিশেষ রাজভক্ত; স্বদেশীর ধাক্কা তাঁহাকে এতটুকু টলাইতে পারে নাই। গ্রামে গ্রামে যখন মহাত্মাজীর নামে বিষম সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল, তখনও তিনি এতটুকু বিচলিত হয়েন নাই। তাঁহার স্ত্রী, কন্যা, পুত্রও সেইরূপ—অবশ্য বড় ছেলে শ্রীকান্ত ছাড়া। শ্রীকান্ত পাটনায় কলেজে আইন পড়িতেছিল। সে ছিল আবার সুচারুর সহাধ্যায়ী। সে নিজের চিন্তার ধারা অনুসরণ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রেও হঠাৎ বিপরীতপথাবলম্বী হইয়া যুগপৎ আত্মীয়-স্বজন সকলেরই হৃদয়ে আশঙ্কার সৃষ্টি করিয়াছিল; কিন্তু যাহাই হউক, দূরে রাখিলে পাছে সে একবারে আয়ত্তের বাহিরে গিয়া পড়ে, সেই জন্য পিতামাতা আপাততঃ ছেলের কলেজ বন্ধ রাখিয়া তাহাকে নিজের কাছে আনিয়া চোখে চোখে রাখিয়াছিলেন এবং ছেলের মনটি সম্পূর্ণ আবদ্ধ করিবার জন্য সাগ্রহে একটি সুরূপা তরুণী পাত্রীর সন্ধান করিতেছিলেন। শ্রীকান্তেরই আগ্রহাতিশয্যে সুচারু তাহার পিতৃগৃহে অতিথি হইয়াছে। নহিলে এ গৃহে তাহার প্রবেশের সম্ভাবনা সুদুর্লভ। সুচারু সুশিক্ষিত, সুশ্রী, সুস্থকায় যুবক—শৈলেশ্বরের অনেক দিনেরই পরিচিত। তাঁহার শিক্ষিতা কন্যা মীরার জন্য তিনি পাত্রের সন্ধান করিতেছিলেন। সুচারুকে দেখিয়া তাঁহার চমক হইল। কিন্তু এ সব (ভ্যাগাবণ্ড) ধরণের ছেলের হাতে কন্যা-সমর্পণ অসম্ভব, তবে যদি এ পথ হইতে সে ফিরিয়া দাঁড়ায়। কিন্তু সে সুদূর-ভবিষ্যতের আশামুখ চাহিয়া ত বসিয়া থাকা চলে না।

সে দিন রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত কোন বন্ধু-গৃহে নিমন্ত্রণ সারিয়া মীরা ও শ্রীকান্ত আসিয়া যখন পিতার বসিবার ঘরে ঢুকিল—দেখিল, শৈলেশ্বর ও তাঁহার এক বন্ধু গল্প করিতেছেন; অবনী ও সুচারু বসিয়া আছে। মীরা ঘরে ঢুকিয়াই সুচারুকে সম্ভাষণ করিয়া কহিল, "আপনি আজ বাঙ্গালীপাড়ায় খদ্দর বেচতে গেছলেন বুঝি—ক'খানা সাড়ী বেচতে পারলেন? শুনলাম, ৩০।৪০ ঘর ঘুরেছিলেন।"

মীরার প্রশ্নের মধ্যে প্রচ্ছন্ন শ্লেষ ছিল। সুচারুর কাছে উহা অস্পষ্ট রহিল না, সে শান্ত স্বরে কহিল, "বেচেছি মাত্র খান চার, কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য নিরাশ হইনি।"

মীরা হাসিতে হাসিতে উচ্ছলভাবে কহিল, "ধন্য আপনার ধৈর্য্য—একেই বলে অধ্যবসায়!"

শ্রীকান্ত বসিয়া পড়িয়া কহিল, "এখন তোমারই মত সকলের খদ্দর পরলেই চামড়া ছিঁড়ে যাওয়া সম্ভব, সেই ভয়ে পরতে সাহস করছে না। দিন কতক পরে গা ছিঁড়ে যাওয়া অভ্যাস হ'লেই খদ্দরও সইতে পারবে।"

সুচারু কহিল, "ক্রমেই খদ্দরের উন্নতি হবে জানবেন, এক দিন এ দেশের ঢাকার মস্‌লিন পৃথিবীর সমস্ত সৌখীন-দের কাছেই কামনার বস্তু ছিল।"

বন্ধু সুরেনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ হে, এখানকার হুজুগগুলো একটু কমাতে পারলে? ব্যাটারা ছাগল, ভেড়া সব বিক্রী ক'রে দেশ উজাড় ক'রে ফেল্‌ছে যে—এর পর শুনছি, মাংসও আর পাওয়া যাবে না। আমার মালী বেটা এই রবিবারে তার সাতটা ছাগল বিক্রী ক'রে ফেল্‌লে। জিজ্ঞাসা করলে বলে, 'গান্ধী বাবার হুকুম হয়েছে—মাংসও খাবে না, কাযেই ছাগল-ভেড়া আর পুষতে ত হবে না'—হাঃ,—হাঃ! এদের কি ভূতের মত বুদ্ধি!"

দেশবাসীর অজ্ঞতার কথায় শৈলেশ্বরও হাসিয়া উঠিলেন।

মীরা কহিল, "দোলের সময় মনে নেই বাবা—লোকগুলো সকলেই একটা ক'রে নতুন হাঁড়ি কিনলে, যা'তে দেড় সের দু'সের চালের ভাত হয়—ওদের মধ্যে আদেশ হয়েছিল, ঐ নতুন হাঁড়িতে এক পো চাল চাপালেই গান্ধী বাবার বরে সে হাঁড়ি পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে—তবে যেন কিছু ছুঁৎ না হয়;—কিন্তু এমন ব্যাপার, কা'রও হাঁড়ি ভরলো না। তবু বেটাদের কি বিশ্বাস! বলে নিশ্চয় কিছু ছুঁৎ-টুৎ হয়েছিল—একসঙ্গে কি দেশশুদ্ধ লোকের নতুন হাঁড়িতে ছুঁৎ লেগে গেল!"

বেশ একটা হাসির সাড়া পড়িয়া গেল। অবনী ও শ্রীকান্তও হাসিতে লাগিল; সুচারুও কষ্টে ঈষৎ হাসিল—সে হাসি কিন্তু বেদনার হাসি—দেশবাসীর অজ্ঞতা ও ভ্রান্ত বিশ্বাস অন্যের কাছে বিদ্রূপ উপহাসের রসদ যোগাইলেও তাহার নিকট সে খোরাক মোটেই যোগাইতে পারিল না। তাহাদের অজ্ঞতার দায়িত্ব যে শিক্ষিতদিগেরই, এটুকু বুঝিবার মত শক্তি বিধাতা তাহার চিন্তায় জাগাইয়াছিলেন, তাই সে মুখ নত করিয়া রহিল।

এক পক্ষ হইতে উৎসাহ না পাইলে অন্য পক্ষের হাসি বল, বক্তৃতা বল, টীকা-টিপ্পনী কিছুই তেমন জোর পায় না; সুতরাং মীরাদের সমালোচনাও নিস্তেজ হইয়া আসিল। তাহার পর এ কথা সে কথায় দেশের বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির কথা উঠিল। মীরা বলিল, "দেখুন সুচারু বাবু, ইংরাজী শিক্ষার কাছে আমরা যে কত দূর ঋণী, তা' যদি ভাল ক'রে ভেবে দেখ্‌তেন, তা হ'লে অকৃতজ্ঞের মত কখনই অস্বীকার করতে পারতেন না। আজ যে এত স্বরাজ স্বরাজ ক'রে চীৎকার করছেন, এ স্বরাজ চাইবার আকাঙ্ক্ষার মূলেও এই ইংরাজী শিক্ষা—ওরাই আপনাদের দেশকে ভালবাসতে শিখিয়েছে।"

শ্রীকান্ত কহিল, "আপনাদের ব'লে বলিস্ নে, মীরা, বল্ আমাদের—তুই কিছু ইংরাজের দেশে জন্মাস্ নি।"

সুচারু কহিল, "'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী' এটা কিন্তু আমাদের দেশে শাস্ত্রকার ইংরাজী সভ্যতার বহু শত বৎসর পূর্ব্বেই ব'লে গিয়েছেন।"

মীরা কহিল, "তা বলুন! কিন্তু মেনে ত আমরা কতই ব'সে আছি। স্কন্ধে একের পর এক বিদেশীর উপর দেশের ভার তুলে দিয়ে যুগ যুগ ধ'রে নিশ্চিন্ত হয়ে ব'সে রয়েছি, ওরা এসে দিব্য সুশাসনে রেখেছে—নইলে আরও কি দুর্দ্দশা হ'ত, কে জানে। কি বল, বাবা?"

শৈলেশ্বর তামাক টানিতেছিলেন, সাড়া দিলেন না। সুরেনবাবু কহিলেন, "ঠিক বলেছ, মা। এখন ত রাম-রাজত্ব চলছে। এর আগে দিন-রাত্রি প্রাণ মান ধন কিছু নিয়েই মানুষ কি নিশ্চিন্ত হয়ে বাস করতে পারত? তা'র উপর শত শত কু-প্রথা দেশের বুকে শিকড় গেড়ে ব'সে দেশের কি সর্ব্বনাশই না করছিল!"

সুচারু কহিল, "তা ব'লে যে আমাদের কোন কালেই আর স্বাধীনতা পাবার অধিকার থাক্‌বে না, এমন প্রশ্ন বা সমস্যা ত উঠতে পারে না—দীর্ঘকাল জড়ের মত কাটিয়েছি ব'লে যে, আর আমাদের বেঁচে ওঠবার দাবী নেই, এমন কথা কি ক'রে স্বীকার করি?"

ইহার উত্তর সহসা কেহ দিলেন না, কেন না, মুখে হাজার প্রতিবাদ করিলেও অন্তরের মধ্যে স্বাধীনতার গৌরবকে স্বীকার করিবার জন্য হৃদয়ের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি থাকেই। মীরা কিন্তু তর্কে হার মানিতে চাহিল না; সে সুচারুর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "কিন্তু বিকারগ্রস্ত রোগী যদি তা'র শয্যার আশ্রয় ছেড়ে নিষেধ-বন্ধনকে অস্বীকার ক'রে

স্বাধীনতার দাবী জানাতে চায়, তবে সেটাকে রোগীর প্রলাপ ছাড়া আর কি বলা যায় ?”

সুচারু উত্তর দিল না, তাহার মন মূর্চ্ছাহত হইয়া পড়িতেছিল। দেশে দেশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কর্ম্মের প্রেরণায় নব নব কর্ম্মিবৃন্দের সহায়তায় দেশবাসীর যে পরিচয় সে পাইতেছে, তাহাতে যতটা উচ্ছ্বাসের আভাস সে পাইয়াছে, প্রাণের সাড়া তেমন পায় নাই, আশু ফলের প্রতীক্ষায় দেশবাসী যেন উন্মত্ত উৎসবে মাতিয়া উঠিয়াছে—যদি অচিরাৎ এ ফলপ্রাপ্তি না ঘটে, তাহা হইলে সত্যই ত’ কোথায় রহিবে এ বিরাট উদ্দীপনা, এ বিপুল উত্তেজনা ? কেবল গভীর অবসাদ মৃত্যুর অন্ধকার ছায়ার মত কি দেশের বুক জুড়িয়া নামিয়া আসিবে না ? এ তিমিরাচ্ছাদনীর কল্পনায় সুচারুর মন শুকাইয়া আসিল—তাহার অন্তরাত্মা ত কিছুতেই ইহাকে স্বীকার করিতে চায় না। তবে কি সত্যই দেশের মুক্তি নাই ? এমন নৈরাশ্যের বাণী সে শুনিতে প্রস্তুত নয়—লক্ষ কোটি জীবন যাহার দাসত্ব-পণে ব্যয়িত হইয়াছে, আজ ততোধিক জীবন-পণে অবশ্যই তাহার মুক্তি ফিরাইয়া আনা সম্ভব। তবে দুঃখ কিসের, কিসের নৈরাশ্য ? সমস্ত জীবন দিয়া সে যেন শুদ্ধ-মনে একান্ত-চিত্তে স্বদেশের মঙ্গল-ব্রতে একনিষ্ঠ সাধকের মত সমগ্র চিন্তা, সমগ্র শক্তি উৎসর্গ করিয়া চলিতে পারে—নিজের জীবনের পক্ষে এই তাহার যথেষ্ট—মৃত্যুর পথে যাইবার সময় সে যেন অমৃত বিশ্বাস পাথেয় লইয়াই যাত্রী হয়—তাহার পর বিরাট ভবিষ্যৎ ও ভূত-ভবিষ্যতের দেবতা আছেন, দেশে কালে সর্ব্বস্থানে তাঁহার বিচার—তাঁহার অমোঘ বিধান সর্ব্বজয়ী।

## ৪

রাত্রি দশটার সময় গ্রামবাসীর সমক্ষে সুচারু যখন ম্যাজিক-লণ্ঠন দেখাইতেছে, তখন পুলিস-জমাদার আসিয়া তাহাকে দারোগার আহ্বান জানাইল। শ্রীকান্ত ও অবনীর উপর কার্য্যভার দিয়া সুচারু বাহিরে আসিয়া পুলিস-কর্ম্মচারীকে নমস্কার জানাইল।

দারোগা হিন্দুস্থানী—তিনি ইংরাজীতে কহিলেন, “আপনি কাল হ’তে অন্যায়ভাবে রাজ-বিদ্বেষের মন্ত্র প্রচার করছেন, এখনই নিবৃত্ত হউন, আপনাকে গ্রেপ্তার করবার পরোয়ানা আছে, কালই যদি উচিতমত জবাবদিহি না করতে পারেন, তা হ’লে খুব সম্ভব আপনার বিপদ হবে।”

সুচারু জানিত, এ অভ্যর্থনা অবশ্যম্ভাবী। সে কহিল, “একটা জিনিষের অনেক রকম অর্থ করা যায়। আমি পল্লীবাসীদের বিভিন্ন পল্লীর অবস্থা, কৃষির অবস্থা, এই সব শুধু জানাতে চেষ্টা করছিলাম। আপনাদের অভিধানে যে তাহার অর্থে রাজদ্রোহ প্রচার হয়, তা আমার মত মূর্খের জানা ছিল না।”

দারোগা কহিল, “জানা উচিত ছিল। রাজা আমাদের রক্ষক, পালক, দেবতার প্রতিনিধি—দেশের অবস্থা হেনো-তেনো সাত-সতেরো জানতে গিয়ে যদি ঘুণাক্ষরে সেই রাজদেবতার প্রতি আমাদের এতটুকু অশ্রদ্ধা, এতটুকু অবিশ্বাস আসে, তা অপরাধ ভিন্ন আর কিছু না।”

“সে অপরাধ তখন রাজা ও রাজভক্তের কাছে নিশ্চয়ই অমার্জ্জনীয়”—এই কথা বলিয়া সুচারু ভিতরে আসিয়া শ্রীকান্ত ও অবনীকে ম্যাজিক লণ্ঠন তুলিয়া লইতে বলিল। ক্ষুণ্ণ মনে সকলেই ঘরে ফিরিয়া আসিল।

রাত্রি তখন গভীর, সুচারুর নয়নে নিদ্রা নাই। যে কার্য্যে সে অগ্রসর হয়—তাহাতেই বাধা ; কিন্তু এই বাধার সহিত সংগ্রামে পৌরুষের আনন্দ আছে, উত্তেজনা আছে। সে কত কথাই ভাবিতেছিল। এই ত যাত্রার সুরু—এ দুর্গম পথে জয়-যাত্রার অভিসারে তাহাকে যাইতেই হইবে—নিত্য নব নব পথ আবিষ্কার করিয়া চলিবে, পরাজয়ের অপমানকে তবু স্বীকার করিবে না। রক্ত লেখায় যাত্রার পথ চিহ্নিত করিয়া যাইবে – যাহাতে ভবিষ্যৎযাত্রীর পক্ষে সে পথ সুগম হয়, সহজ হয়, তবু সে ফিরিবে না—ফিরিবে না। পাশে শুইয়া অবনীও নিদ্রাহীন নয়নে রাত্রির প্রহর গনিতেছিল। তাহারও মনে নানা চিন্তার ঘাত-প্রতিঘাত চলিতেছিল। সুচারু বহুক্ষণ নিজের চিন্তার মধ্যে তন্ময় থাকিয়া যখন অবনীর জাগ্রতভাব লক্ষ্য করিল, তখন সস্নেহে প্রশ্ন করিল—“কি রে, ঘুমুস্ নি কেন ?”

অবনী কহিল—“ঘুম আস্‌ছে না।”

আজ সাত মাস পর্য্যন্ত অবনী সুচারুর পিছনে ছায়ার মত ঘুরিতেছে, মাস দুই সুচারুর সহিত জেল খাটিয়াও আসিয়াছে, নির্য্যাতন কিছু কম সহ্য করে নাই। তাহার

উপর নানা অনিয়মে দেহ শুষ্কপ্রায়। ইদানীং সুচারুর মনে হইতেছিল—অবনী শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, আগেকার উৎসাহের প্রেরণা আর তাহার মনের মধ্যে নাই। কথাটা মনে হইলেও উহাকে গুছাইয়া ভাবিয়া দেখিবার অবসর সুচারুর ছিল না, এখন নিভৃত অবকাশে তাহা মিলিল, সে আর্দ্রকণ্ঠে কহিল, "অবনী, তোর শরীরটা ভাল নেই, না রে ?"

অবনী কহিল, "আচ্ছা, সুচারু-দা, তোমার কি মনে হয়, বল্‌তে পার ? দেশের যা অবস্থা, স্বরাজ আমাদের ভাগ্যে নেই—দেখছ না, দেশব্যাপী কি অন্তর্বিদ্রোহ।"

সুচারু কহিল, "দেখে কি কর্‌বো, ভাই—আমাদের নিজের কায যেন সাধ্যমত করতে পারি, এ ছাড়া আর কি বলি ?"

অবনী কহিল, "আমার কিন্তু শৈলেশ্বরবাবুর কথাই ঠিক মনে হচ্ছে। দেশ স্বরাজ পাবার উপযুক্ত হয় নি, এর স্বরাজের আকাঙ্ক্ষা করা ধৃষ্টতা মাত্র, মহাত্মাজী ভুল বুঝেছেন।"

সুচারু শ্রদ্ধাভরে কহিল, "এ ভুল যেন যুগ যুগ ধ'রে সকল দেশবাসীই বুঝে আর সাধনা করে। যাক্, আমি স্বরাজ পাবার জন্যে তেমন ব্যস্ত নই, সাধনার পথে যেন নির্ভয়ে চল্‌তে পারি, তা হ'লেই আমার জন্ম সার্থক হবে জান্‌ব। এখন তোকে একটা কথা বলি, শোন্। তুই ছেলেমানুষ, তোর শরীরটাও ভেঙ্গে পড়েছে, তোর কিছু দিন মা'র কোলে বিশ্রামের দরকার। তুই বাড়ী ফিরে যা, মামীমাকে আমি চিঠি লিখে দিই, আমার সঙ্গ বড় সৎসঙ্গ নয়, দেখছিস্ না ? আবার টিক্‌টিকি পিছনে লাগলে, ছুতো-নাতা ক'রে শ্রীঘরে পাঠাতে কতক্ষণ ? তুই সঙ্গে থাক্‌লে তোরও এ দশা ঘটতে পারে, এ শরীরে কিন্তু রাজবাড়ীর আদর তোর সহ্য হবে না।"

অবনী উত্তর দিল না, মনটা তাহার গুমরিয়া উঠিতেছিল। মায়ের কথা অনেক দিন যাবৎ তেমন করিয়া ভাবে নাই, সে মায়ের কোলের ছেলে, বহু দিন যাবৎ বহু অত্যাচার আবদার করিয়া সে মায়ের কোলে বাড়িয়া উঠিয়াছিল, দাদারা এ জন্য অনেক সময় মা'কে অনুযোগ করিত, আত্মীয়-স্বজন অনেকেই কিছু কিছু বলিত, মা নীরবে শুনিয়া যাইতেন, দুরন্ত অশান্ত ছেলের আবদার সহিতে তবু কোন দিন তাঁহার শ্রান্তি বা বিরক্তি ছিল না, চিরটাকাল সে মায়ের কোল ছাড়া রাত্রিতে ঘুমায় নাই, বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াও মায়ের গলা ধরিয়া না শুইলে তাহার ঘুম হয় নাই, অথচ সে যখন মাকে ছাড়িয়া দেশমাতার সেবার জন্য বাহিরে আসিতে চাহিল, মা নিষেধ করেন নাই, চোখের জল ফেলেন নাই।—কিন্তু—কিন্তু অবনী জানে, মনে প্রাণে বিশ্বাস করে, মা কোল পাতিয়া ছেলের ফিরিবার পথ চাহিয়া অশ্রান্তভাবেই বসিয়া আছেন। অবনীর চোখের পাতা ভিজিয়া আসিল, সুচারুর অবস্থিতি তাহার স্মরণ রহিল না, অবোধ শিশুর মতই সে চোখের জল ফেলিতে লাগিল। সুচারু অবনীর অবস্থা বুঝিতে পারিয়া সান্ত্বনা দিবার বৃথা চেষ্টায় বেচারীর লজ্জার মাত্রা বাড়াইবার দুরাশা করিল না। নানা চিন্তার মধ্যে কখন্ সুপ্তির স্নেহস্পর্শে সে অচেতন হইয়া পড়িল।

* * * * *

মাস কয়েক পরে মহাত্মার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয় নাই। স্বরাজ-স্বপ্ন বিফল হওয়ায় দেশের মধ্যে হঠাৎ বিপরীত স্রোত বহিতে সুরু হইয়াছে। অবনী শান্তশিষ্টভাবে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া দাদার সুবোধ ভাইটির মত সেই পথেরই পথিক হইয়া ভাল করিয়া মাছ-ভাত খাইতেছে। তখন আর অরুচি নাই—বউ-দিদির উপহাস-পরিহাসগুলা পর্য্যন্ত সহজভাবেই পরিপাক করিয়া ফেলে, এমনই তাহার ক্ষুধার উত্তেজনা। আর সুচারু ? মাস কয়েক আর একবার শ্রীঘরবাস করিয়া মুক্তিলাভের পর কিছুকাল ভগ্ন স্বাস্থ্যের সংশোধন করিয়া পুরা উদ্যমে আবার নিজের কাযে লাগিয়াছে ; দিন, মাস, তারিখের মেয়াদ লইয়া তাহার সাধনা নয়, সুতরাং তাহার মধ্যে না আছে অবসাদ, না আছে আশাভঙ্গের ক্লান্তি। দেশমাতৃকার বেদীর সম্মুখে আরতির প্রদীপের মত সে তাহার নবজাগ্রত যৌবন-জীবন উৎসর্গ করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছে। সে অম্লান দীপশিখার জ্যোতিতে তাই তাহার সম্মুখের পথ আলোকবিভাসিত—পূজার আনন্দ-দীপ্তিতে ললাট তাহার সমুজ্জ্বল, দুই নয়নে প্রীতির অক্ষয় শান্তদ্যুতি। জীবন-মরণের মধ্যে তাহার সেতু সম সন্ধি রচনা করিতেছে পবিত্রতম সাধনার শান্ত গভীরতা।

শ্রীমতী সরসীবালা বসু।

## সপ্তম পরিচ্ছেদ

### দুর্গম পথের যাত্রী

জোসেফ কুরেট ও ষ্ট্রোভিল নির্ব্বাসন-দণ্ডাজ্ঞা পাইয়া সাইবেরিয়ায় প্রেরিত হইবার পূর্ব্বে কারাগারের একই কক্ষে আবদ্ধ ছিল, এ জন্য তাহারা পরস্পর গল্প করিয়া সময় কাটাইবার সুযোগ পাইয়াছিল। রুসিয়ার রাজনীতিক কয়েদীদের প্রতি পৈশাচিক উৎপীড়নের বিরাম না থাকিলেও তাহারা পরস্পর গল্প করিতে পারে, তাহাদের মুখ বন্ধ করা হয় না।

নির্ব্বাসন দণ্ডের আদেশ শুনিয়া জোসেফ কুরেটের মানসিক অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা আমাদের অসাধ্য এবং আমাদের পাঠক-পাঠিকাগণও তাহা বুঝিতে পারিবেন না। রেবেকা নিহিলিষ্ট বন্ধুগণের সাহায্যে কারারুদ্ধ জোসেফের নিকট যে সংক্ষিপ্ত পত্রখানি পাঠাইয়াছিল, তাহা পাঠ করিয়া জোসেফ কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিল, কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় নাই; দুই এক দিন পরে মন পুনর্ব্বার গভীর বিষাদে ও অবসাদে অভিভূত হইয়াছিল। তাহার হতাশ হৃদয় হইতে সুখ-দুঃখের অনুভূতি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছিল।

কিন্তু ষ্ট্রোভিলের হৃদয় সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধাতুতে নির্ম্মিত; কঠোরতম দণ্ডের আদেশ তাহার হৃদয়ে রেখাপাত করিতে পারে নাই। তাহার মানসিক ভাবের কোনও পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল না। জোসেফের অবস্থা দেখিয়া তাহার হৃদয় করুণায় পূর্ণ হইয়াছিল। সে নানা কথায় জোসেফকে আশ্বস্ত করিবার চেষ্টা করিত; তাহাকে বলিত, সাইবেরিয়ার প্রান্তরে নির্ব্বাসিত জীবন অতিবাহিত করিবার জন্য পরমেশ্বর তাহাকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন নাই; সে নিশ্চয়ই মুক্তি লাভ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে পারিবে। দুঃখ-নিশার অবসানে আবার তাহার সুখের দিন ফিরিয়া আসিবে। এই সকল কথা শুনিয়া জোসেফের মুখে অবিশ্বাসপূর্ণ বিষাদের হাসি ফুটিয়া উঠিত; সে কোন কথা বলিত না।

অবশেষে এক দিন নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত কয়েদীগণ সাইবেরিয়ায় প্রেরিত হইল। সাইবেরিয়ার বিভিন্ন প্রদেশে নির্ব্বাসনের জন্য তাহাদিগকে তিন দলে বিভক্ত করা হইল। কুরেট ও ষ্ট্রোভিল যে দলে ছিল, তাহাদিগকে সাইবেরিয়ার পূর্ব্বপ্রান্তে ইর্খুটস্কের গবর্ণমেণ্টের সীমায় নির্ব্বাসিত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। অন্য দুই দলের গন্তব্য স্থল সাইবেরিয়া হইলেও তত দূরে নহে; তাহাদিগের প্রতি সাইবেরিয়ার অন্য দুইটি প্রদেশে নির্ব্বাসনের আদেশ হইয়াছিল।

সাইবেরিয়া রুস সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত একটি বিশাল দেশ। এই দেশটি বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত; প্রত্যেক প্রদেশ তাহার প্রধান নগরের নামানুসারেই পরিচিত। সমগ্র সাইবেরিয়া যে পাঁচটি প্রদেশে বিভক্ত, ইর্খুটস্ক তাহাদের অন্যতম। প্রত্যেক প্রদেশ স্বতন্ত্র শাসনকর্ত্তার অধীন। ইর্খুটস্ক বৈকাল হ্রদের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত। ডিসেম্বর হইতে এপ্রিল মাসের শেষ পর্য্যন্ত এই হ্রদ কঠিন তুষাররাশি দ্বারা সমাচ্ছন্ন থাকায় হ্রদের তীরবর্ত্তী গ্রাম সমূহের অধিবাসিগণ এই জমাট বরফের উপর দিয়া পদব্রজে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমন করে; বরফের উপর দিয়াই গাড়ী-বোঝাই পণ্যদ্রব্য বিভিন্ন গ্রামে বিক্রয়ের জন্য লইয়া যায়। এই অঞ্চলে শীতের প্রকোপ কিরূপ দুঃসহ, তাহা আমাদের কল্পনা করিবারও শক্তি নাই। বৃক্ষলতাদিবর্জ্জিত বরফাবৃত বিরাট বিশাল প্রদেশ মরুভূমির ন্যায় প্রতীয়মান হয়। বৎসরের যে কয়েক মাস উত্তর মেরু-মণ্ডল হইতে তুষার-শীতল বায়ু প্রবাহিত হয়, সেই কয়েক মাস স্থানীয় অধিবাসিগণ প্রাণ হাতে করিয়া ঘরের বাহির হয়। এই সময় শীতের প্রকোপ এরূপ বর্দ্ধিত হয় যে, মধ্যাহ্নকালেও কোন রুদ্ধ গৃহের দ্বার হঠাৎ উন্মুক্ত হইলে, সেই গৃহস্থিত আর্দ্র বায়ু গৃহের বাহিরে আসিবামাত্র তুষারে পরিণত হইয়া মৃত্তিকা আচ্ছন্ন করে! ইর্খুটস্ক নির্ব্বাসিত কয়েদীদের একটি

আড্ডা। ইহার উত্তরাঞ্চলে যে সকল কয়েদী নির্ব্বাসিত হয়, প্রকৃতির প্রতিকূলতায় তাহারা তিন বৎসরের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। নারীগণের প্রতিও বিন্দুমাত্র দয়া প্রদর্শিত হয় না। তাহারা যত দিন জীবিত থাকে, তত দিন তাহাদিগকে প্রতিনিয়ত পাশবিক অত্যাচার সহ্য করিতে হয়, তাহার ভীষণতা ভাষায় প্রকাশিত হইবার নহে। সেই অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া অনেকেই পাগল হইয়া যায়; তথাপি তাহারা কর্ত্তৃপক্ষের বিন্দুমাত্র করুণা লাভ করিতে পারে না। যাহারা পীড়িত হয়, তাহাদের সেবা-শুশ্রূষার কোন ব্যবস্থা নাই। অত্যাচার অসহ্য হওয়ায় যদি কেহ অবাধ্যতাচরণ করে, তাহা হইলে তাহাকে বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত করা হয়; কখন কখন অবাধ্যতার জন্য নির্ব্বাসিত অপরাধী কয়েদীদিগকে গুলী করিয়া হত্যা করা হয়, তাহার পর তাহাদিগের মৃতদেহ বরফে প্রোথিত করা হয়। যদি কোন নির্ব্বাসিতা নারী সন্তান প্রসব করে, তাহা হইলে, সেই সদ্যোজাত শিশুকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করা হয়। প্রহরিগণের সতর্কতা সত্ত্বেও, অনেক কয়েদী প্রাণের আশা বিসর্জ্জন করিয়াই পলায়ন করে; কিন্তু পলাতকগণের প্রায় কেহই সাইবেরিয়ার সীমা অতিক্রম করিতে পারে না, পথের কষ্টে, অনাহারে, অথবা নেকড়ের আক্রমণে তাহাদের প্রাণবিয়োগ হয়। গ্রন্থকার এক জন নির্ব্বাসিত নিহিলিষ্ট যুবকের নিকট এই সকল বিবরণ জানিতে পারিয়াছিলেন। এই যুবকটি পাঁচ বৎসর নির্ব্বাসনদণ্ড ভোগের পর মঙ্গোলিয়ার পথে সাইবেরিয়া হইতে পলায়ন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমনে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু এরূপ দৃষ্টান্ত দশ সহস্রের মধ্যে একটিও পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। এই নিহিলিষ্ট যুবক যে সময় স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছিল, তখন তাহার বয়স ৩৩ বৎসরের অধিক হয় নাই; কিন্তু দুঃখে, কষ্টে, উৎপীড়নে ও মানসিক উৎকণ্ঠায় তাহার মস্তকের কেশরাশি ও দাড়ি-গোঁফ তুষার-শুভ্র হইয়াছিল এবং দেহ এরূপ জীর্ণ হইয়াছিল যে, তাহাকে দেখিলে ৬০ বৎসরের বৃদ্ধ বলিয়া মনে হইত।

জোসেফ কুরেট ও ষ্ট্রোভিল কিরূপ ভীষণ স্থানে নির্ব্বাসিত হইয়াছিল, পাঠকগণ তাহা বুঝিতে পারিবেন—এই উদ্দেশ্যে এখানে এই অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করিতে হইল।

নির্ব্বাসিত কয়েদীগণ ইউরাল পর্ব্বত পর্য্যন্ত পথের কষ্ট বুঝিতে পারে নাই, কারণ, এই দীর্ঘ পথের অধিকাংশ রেলে ও কিয়দংশ ষ্টীমারে অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। তাহাদিগকে প্রথমে সেণ্টপিটার্সবর্গ (বর্ত্তমান নাম পেট্রোগ্রাড) হইতে রেলপথে মস্কো নগরে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। সেখান হইতে তাহারা রেল-পথেই নিজনি নবগরদে নীত হয়। এই স্থানে রেল-পথের শেষ বলিয়া তাহাদিগকে জাহাজে তুলিয়া লওয়া হয়; সেই জাহাজ প্রথমে ভল্গা ও পরে ভার্না নদী দিয়া নিজনি নবগরদের সহস্র মাইল দূরবর্ত্তী পার্ণ বন্দরে উপস্থিত হইয়াছিল। এই বন্দর হইতে ইউরাল পর্ব্বত-প্রদেশের রেলপথ একাটেরিনবর্গ পর্য্যন্ত প্রসারিত। এই নগর হইতে সাইবেরিয়ার সীমান্তপ্রদেশের দূরত্ব প্রায় দুই শত মাইল। একাটেরিনবর্গ হইতে সাইবেরিয়া পর্য্যন্ত সুপ্রশস্ত রাজপথ বর্ত্তমান। এরূপ সুপ্রশস্ত সুদীর্ঘ রাজপথ অতি বিরল; ইহা তিন সহস্রাধিক মাইল দীর্ঘ। নির্ব্বাসিত কয়েদীদিগকে একাটেরিনবর্গের রেল-ষ্টেশনে নামাইয়া লইয়া, গরুর গাড়ীর মত স্প্রিং-বিহীন গাড়ীতে তুলিয়া দেওয়া হইল। বিগত ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল হইতে এই শতাব্দী শেষ হইবার কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উক্ত সুদীর্ঘ রাজপথ দিয়া ন্যূনাধিক পাঁচ লক্ষ রাজনীতিক অপরাধী সাইবেরিয়ায় প্রেরিত হইয়াছিল। ইহারা সকলেই নিহিলিষ্ট বলিয়া ধৃত এবং রাজবিধানে নির্ব্বাসিত হইয়াছিল।

সাইবেরীয় সীমায় প্রবেশ করিয়া নির্ব্বাসিত নরনারীগণ পথের ভীষণতা বুঝিতে পারিল। ইউরাল পর্ব্বতমালা ইউরোপীয় ও এসিয়াটিক রুসিয়ার ভৌগোলিক সীমা। কয়েদীরা এই স্থানে নীত হইলে, বিভিন্ন দল বিভিন্ন পথে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে প্রেরিত হইল। এক দল উত্তরাঞ্চলে ‘স্তব্ধতা ও মৃত্যুর রাজ্যে’ পরিচালিত হইল। দ্বিতীয় দলের গন্তব্য স্থান এই প্রদেশের উত্তরপূর্ব্বাঞ্চলে। তৃতীয় দল—জোসেফ ও ষ্ট্রোভিল যে দলে ছিল, পূর্ব্বমুখে চলিল। এই শেষোক্ত দলের প্রধান পরিচালক কালনকির বৈমাত্র ভাই ওরজেসকি।

ওরজেসকি দীর্ঘকায় বলবান্ যুবক; সে ‘বুলডগ’-জাতীয় কুকুরের ন্যায় স্থিরলক্ষ্য, সিংহের ন্যায় সাহসী এবং কালনকি অপেক্ষাও স্বল্পভাষী। তাহার প্রকৃতি অত্যন্ত গম্ভীর। তাহার স্বাস্থ্য অটুট এবং দেহ ইস্পাতের মত

সুদৃঢ়। বিপদে সে কখন বিচলিত হইত না এবং কোন শ্রমসাধ্য কার্য্যে পরাঙ্মুখ হইত না। সে সুশিক্ষিত সৈনিক; কিন্তু তাহাকে যে কার্য্যের ভার প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহা সৈন্যপরিচালন অপেক্ষা কঠিন। তাহার হৃদয়ে দয়ামায়া বা করুণার স্থান ছিল না। নির্ব্বাসিত কয়েদীদিগকে পরিচালিত করিবার জন্য সে ষোল জন প্রহরীর কর্ত্তৃত্বভার পাইয়াছিল। প্রহরীরা সকলেই সশস্ত্র, প্রত্যেকের হস্তে সঙ্গীন সহ এক একটি রাইফেল, যে কোন মুহূর্ত্তে গুলী চালাইবার প্রয়োজন হইতে পারে, এ জন্য প্রত্যেক রাইফেল টোটা-ভরা। এতদ্ভিন্ন, প্রত্যেক প্রহরীকে এক একটি ছয়-নলা পিস্তল দেওয়া হইয়াছিল; কারণ, পথে নেকড়ের আক্রমণের আশঙ্কা ছিল।

জোসেফ কুরেটকে মুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে কালনকি ওরজেস্কিকে প্রচুর উৎকোচদানে বশীভূত করিয়াছিল, এ সংবাদ জোসেফ জানিতে পারে নাই। যাত্রা আরম্ভ করিয়া জোসেফ ওরজেস্কির কঠোর ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিল এবং ওরজেসকিকে নরপিশাচ বলিয়াই তাহার ধারণা হইয়াছিল। কিন্তু কয়েক দিন পরে জোসেফের এই ধারণা পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল; কারণ, কাপ্তেনের ব্যবহারে সে কিঞ্চিৎ সহানুভূতির পরিচয় পাইতেছিল। কিন্তু কাপ্তেন ওরজেস্কির নিকট সে বিন্দুমাত্র অনুগ্রহের আশা করে নাই। কয়েদীরা সকলেই অত্যন্ত হতাশ ও বিমর্ষ হইয়াছিল, কিন্তু ষ্ট্রোভিলের ভাব অন্য প্রকার; সে কাতরতা প্রকাশ করা দূরের কথা—সঙ্গীদের প্রফুল্ল করিবার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করিতেছিল। তাহার স্ফূর্ত্তি ও উৎসাহ দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইত; কেহ কেহ তাহাকে পাগল মনে করিত! কিন্তু সেই দলে এরূপ লোক এক জনও ছিল না—যে তাহাকে ভাল না বাসিত। ষ্ট্রোভিল যেন তাহাদের হতাশ জীবনের অবলম্বন।

যখন তাহারা ইউরাল পর্ব্বত অতিক্রম করিল, সেই সময় হইতেই তাহাদের কষ্টের আরম্ভ। তাহাদের সম্মুখে যত দূর দৃষ্টি চলে—তত দূর শুভ্র তুষাররাশি-সমাচ্ছন্ন নির্জ্জন নিস্তব্ধ প্রান্তর। কোন দিকে জীবনের কোন চিহ্ন বর্ত্তমান ছিল না। তাহার উপর ডিসেম্বরের অসহ্য শীত। এই দুর্গম পথে যাত্রা করিয়া এক সপ্তাহমধ্যে দুই জন কয়েদী পথের কষ্টে ও নিদারুণ শীতে প্রাণত্যাগ করিল। রক্ষীরা তাহাদের মৃতদেহ শকট হইতে পথিপ্রান্তে তুষাররাশির উপর নিক্ষেপ করিবার অব্যবহিত পরেই নেকড়ের দল আসিয়া তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া খাইল! নেকড়ের দল সেই পথের চারিদিকে আহারের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, কেবল প্রহরীদের গুলীর ভয়ে তাহাদিগকে আক্রমণ করে নাই। দূরে নেকড়ের দল দেখিলেই প্রহরীরা তাহাদিগকে গুলী করিতেছিল।

তাহারা যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, পথের ভীষণতা তাহাদের মনে ততই বিভীষিকার সঞ্চার করিতেছিল! দূর-দূরান্তরে পাইনের অরণ্য বরফে আবৃত হওয়ায়, বৃক্ষগুলি শুভ্র বস্ত্র-মণ্ডিত দীর্ঘাকার প্রেতযূথের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল! সেই সকল অরণ্যে ক্ষুধিত নেকড়ের গর্জ্জন যেন নরশোণিত-লোলুপ পিশাচের লুব্ধ হুঙ্কার! সেই নিষ্পত্র পাইনের অরণ্য হইতে দলে দলে নেকড়েকে তাহাদের দিকে ধাবিত হইতে দেখিয়া, প্রহরীদের ষোলটা রাইফেল এক সঙ্গে গর্জ্জন করিয়া উঠিল; তৎক্ষণাৎ এক দল নেকড়ের শোণিতে শুভ্র তুষাররাশি রঞ্জিত হইল; নেকড়েগুলার প্রাণহীন দেহ পড়িয়া রহিল। অন্য নেকড়েগুলা দূরে পলায়ন করিল বটে; কিন্তু কয়েদীর দল প্রায় এক শত গজ সম্মুখে অগ্রসর না হইতেই, পলায়নপর নেকড়েগুলা সেখানে ফিরিয়া আসিয়া নিহত নেকড়েগুলার মৃতদেহ লইয়া টানাটানি করিতে লাগিল এবং কয়েক মিনিটেই তাহাদের অস্থি ভিন্ন দেহের আর কিছুই অবশিষ্ট রহিল না। অতি ভীষণ দৃশ্য!

ইহার উপর যে দিন উত্তরদিক্ হইতে প্রবল বেগে বায়ু বহিতে লাগিল, সে দিন পথে অগ্রসর হওয়া তাহাদের অসাধ্য হইয়া উঠিল! তাহারা প্রান্তরমধ্যে আড্ডা করিয়া, তুষার-শীতল বায়ুপ্রবাহ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য তাহাদের আশ্রয়-স্থানের চতুর্দ্দিকে বরফের প্রাচীর তুলিয়া, তাহার অন্তরালে বাস করিতে বাধ্য হইল এবং শীত-নিবারণের জন্য পাইনের অরণ্য হইতে শুষ্ক তরুশাখা সংগ্রহ করিয়া আগুন জ্বালিল। তাহারা সেই আগুনের উত্তাপে শরীর গরম করিতে লাগিল। এই সময় প্রহরীদের সতর্কতা শিথিল হইত; কারণ, তাহারা জানিত—সেরূপ স্থান হইতে কোন কয়েদী পলায়নের চেষ্টা করিবে না, করিলেও অধিক দূর যাইতে পারিবে না। নেকড়ের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইলেও শীতে ও অনাহারে তাহার মৃত্যু অপরিহার্য্য।

এই পথে কয়েদীদিগকে জমাট গোমাংস, কদর্য্য রুটীর টুকরা ও চা খাইতে দেওয়া হইত। বাজরীর রুটী। লম্বা লম্বা শুক্‌নো রুটী কাঠের চেলার মত আঁটি বাঁধিয়া সঙ্গে লওয়া হইত এবং ভোজনকালে তাহাই খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া দেওয়া হইত।

এইভাবে কয়েদীরা সাইবেরিয়ার অভ্যন্তরে যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, তাহাদের আতঙ্ক ও হতাশভাব ততই বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। অনেকেরই মনে হইল, যদি তাহাদের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইত, তাহা হইলে তাহাদিগকে এইরূপ কষ্টভোগ করিয়া তিল তিল করিয়া মরিতে হইত না।

অনেক কয়েদী নির্ব্বাসিত জীবনের দুঃসহ কষ্ট অপেক্ষা মৃত্যুই প্রার্থনীয় মনে করিত। ষ্ট্রোভিল ও জোসেফ কুরেটকে লইয়া যে দল সাইবেরিয়ায় যাইতেছিল—সেই দলে এক জন রুসীয় কয়েদী ছিল; তাহার বয়স প্রায় ৫০ বৎসর। রাজদ্রোহের অভিযোগে তাহারও নির্ব্বাসন দণ্ডের আদেশ হইয়াছিল। সাইবেরিয়ার পথে অগ্রসর হইয়া তাহার উদ্বেগ ও আতঙ্ক এরূপ বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে, সে আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিল। এক দিন রাত্রিকালে প্রহরীরা শীতের প্রকোপে তাহাদের গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে না পারায়, তুষারাবৃত একটি পাইন অরণ্যের অদূরে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বালিত করিয়া সদলে বহ্নিসেবনে প্রবৃত্ত হইল। প্রহরীদিগকে অসতর্ক দেখিয়া সেই কয়েদীটা হঠাৎ উঠিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে অরণ্যের দিকে পলায়ন করিল; কিন্তু তাহাকে অধিক দূর যাইতে হইল না, ক্ষুধার্ত্ত নেকড়ের দল নরশোণিতের আঘ্রাণ পাইয়া শিকারের লোভে অগ্নিকুণ্ডের অদূরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। তাহারা হতভাগ্য পলাতককে দেখিবামাত্র আক্রমণ করিল এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে তাহার সকল যন্ত্রণার অবসান হইল। আত্মহত্যার উদ্দেশ্য না থাকিলে সে নেকড়ে কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবে—ইহা জানিয়াও রাত্রিকালে ঐ ভাবে পলায়ন করিত না।

এই শোচনীয় কাণ্ডের পর অন্যান্য কয়েদীরা তাহাদের ভাগ্য-বিড়ম্বনার কথা চিন্তা করিয়া অধিকতর ম্রিয়মাণ ও হতাশ হইল; কিন্তু ষ্ট্রোভিল সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার! সে নানা কথায় তাহাদের আতঙ্ক ও মানসিক অবসাদ দূর করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু তাহার চেষ্টা সফল হইল না। এই দুর্গম পথে সপ্তাহের পর সপ্তাহকাল দুঃসহ কষ্টভোগের পর কয়েদীর দল টোমস্ক নগরে উপস্থিত হইল। বহুদিন পরে তাহারা লোকালয় দেখিতে পাইল।

টোমস্ক নগরের এক প্রান্তে একটি পুরাতন 'ফাঁড়ি' ছিল, তাহা প্রস্তর ও কাষ্ঠ-নির্ম্মিত। কয়েদীদিগকে এই গৃহে আবদ্ধ করিয়া প্রহরীরা আহারামোদে শ্রান্তি দূর করিবার জন্য নগরে প্রবেশ করিল। এখানে তাহারা দুই দিন বিশ্রামের অনুমতি পাইয়াছিল।

ফাঁড়ির প্রশস্ত 'হলে' সকল কয়েদীকে একত্র বাস করিতে দেওয়া হইল। সেই ঘরে শীতের প্রকোপ-হ্রাসের কোন ব্যবস্থা ছিল না; ভিতরের দেওয়ালে কাঠের আবরণও ছিল না। ঘরের মেঝেতে তিন ফুট উচ্চ কাঠের পাটাতন, তাহার উপর কতকগুলা দুর্গন্ধময় নোংরা বিচালী প্রসারিত ছিল; কয়েদীগণকে সেই অপূর্ব্ব শয্যায় শয়ন করিতে হইল। শীত-নিবারণের জন্য লেপের পরিবর্ত্তে তাহারা কয়েকখানি মেষচর্ম্ম পাইল। তাহার দুর্গন্ধে সকলেরই বমনোদ্রেক হইল। সেগুলি যে কত কাল হইতে এই শ্রেণীর কয়েদীদের শীতবস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইতেছিল—তাহার ইতিহাস কেহই জানিত না। এই কক্ষের ছাদের নিকট একটি গোলাকার বাতায়ন ছিল, ঘরের মেঝে হইতে তাহার দূরত্ব ২০ ফিট। ঘরের দেওয়ালে লৌহ-নির্ম্মিত একটি 'ব্রাকেটে' একটি মাটীর গ্লাস সংস্থাপিত ছিল; মেষের চর্ব্বি দ্বারা তাহা পূর্ণ করিয়া এবং তাহার ভিতর একটি মোটা পল্‌তে বসাইয়া রাত্রিকালে তাহাই দীপরূপে ব্যবহৃত হইল। এই অপরূপ বর্ত্তিকা প্রজ্বলিত হইলে তাহা হইতে যে পরিমাণ আলোক নিঃসৃত হইত, তাহার দশ গুণ ধূম উদ্গত হইয়া সেই কক্ষে দৃশ্যমান অন্ধকারের সৃষ্টি করিত। মহাকবি মিল্টন-বর্ণিত নরকান্ধকারের সহিত তাহার তুলনা চলিতে পারে! মেষের পচা কাঁচা চর্ব্বি অগ্নিসংযোগে যে সৌরভ উৎপাদন করিত, ধাপার মাঠ হইতে সংগৃহীত ও ক্যানেস্তারায় সংরক্ষিত 'ঘৃত' নামক পদার্থ লুচি ভাজিবার জন্য জ্বালে চড়াইলে সেই প্রকার সৌরভই নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করে।

কয়েদীরা সেই নরকতুল্য কক্ষে শয়ন করিয়া নিমীলিতনেত্রে ভাগ্য-বিড়ম্বনার কথা চিন্তা করিতেছিল, এমন সময় এক জন প্রহরী নিঃশব্দে জোসেফ কুরেটের সম্মুখে আসিয়া তাহাকে তাহার অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিল।

জোসেফ ও ষ্ট্রোভিল একখানি মেষচর্ম্মে দেহদ্বয় আবৃত করিয়া পাশাপাশি বিচালীর উপর শায়িত ছিল।—জোসেফ প্রহরীর ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া ষ্ট্রোভিলকে জার্ম্মাণ ভাষায় বলিল, "প্রহরীটা আমাকে উহার সঙ্গে যাইতে ইঙ্গিত করিল। উহার উদ্দেশ্য কি?"—জোসেফের কণ্ঠস্বরে বিস্ময় ও উৎকণ্ঠা পরিস্ফুট হইল।

ষ্ট্রোভিল বলিল, "উহার মতলব আমিও বুঝিতে পারিতেছি না; কিন্তু আমরা কয়েদী, উহারা যে আদেশ করিবে, আমাদিগকে তাহা পালন করিতেই হইবে। উঠিয়া উহার সঙ্গে যাও।"

প্রহরী কসাক সৈন্য। জোসেফ তৎক্ষণাৎ শয্যা ত্যাগ করিয়া চিন্তাকুল-চিত্তে সেই কসাক প্রহরীর অনুসরণ করিল। এই কসাকটার বেশ-ভূষা দেখিয়া জোসেফের মন আতঙ্কে পূর্ণ হইল। লোকটা প্রকাণ্ড জোয়ান। তাহার দেহে মেষচর্ম্মের পরিচ্ছদ। অমার্জ্জিত গোচর্ম্ম-নির্ম্মিত 'বুটে' পদদ্বয় আবৃত। হস্তে সুদীর্ঘ রাইফেল, কোমরবন্ধে একটি পিস্তল আবদ্ধ; এতদ্ভিন্ন কোমরবন্ধের দুই পাশে দুইখানি তীক্ষ্ণধার ছোরা ঝুলিতেছিল, প্রত্যেক ছোরা আড়াই ফুট দীর্ঘ!

জোসেফ সেই কক্ষের বাহিরে আসিয়া প্রহরীকে বলিল, "আমাকে তুমি কোথায় লইয়া যাইবে?"

প্রহরী রুক্ষস্বরে বলিল, "মুখ বুজিয়া আমার সঙ্গে চল। কয়েদীর কোন প্রশ্ন করিবার অধিকার নাই। আমি হুকুম তামিল করিতে আসিয়াছি।"

জোসেফ আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না; সে ত সকল আশা বিসর্জ্জন করিয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিল, তবে আর বিপদের আশঙ্কায় বিচলিত হইয়া ফল কি? সে একবার মনে করিল—ইচ্ছা করিলে সে ত মুহূর্ত্তমধ্যে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে পারে; পলায়নের চেষ্টা করিলে কসাকটা তাহাকে তৎক্ষণাৎ গুলী করিয়া মারিবে; পলায়নের চেষ্টা না করিয়া পশ্চাৎ হইতে হঠাৎ তাহাকে আক্রমণ করিলে কসাকটা ছোরার এক আঘাতে তাহার মস্তক দেহচ্যুত করিবে; তাহা হইলেই ত তাহার সকল যন্ত্রণার অবসান হইবে। আশাহীন, সুখহীন, শান্তিহীন ব্যর্থ জীবনের ভার বহন করিবার প্রয়োজন কি? জোসেফ তখনই মরিতে পারিত, কিন্তু প্রহরীটা কি উদ্দেশ্যে তাহাকে কোথায় লইয়া যাইতেছে, তাহা জানিবার জন্য জোসেফের অত্যন্ত কৌতূহল হইল। সে মন সংযত করিয়া প্রহরীর অনুসরণ করিল।

প্রহরী জোসেফকে সঙ্গে লইয়া অদূরবর্ত্তী একটি অট্টালিকার দ্বারের সম্মুখে আসিল। দ্বার রুদ্ধ ছিল; প্রহরী তাহাতে করাঘাত করিয়া বলিল, "কয়েদী হাজির।"

মুহূর্ত্তে দ্বার খুলিয়া গেল। ভিতর হইতে কে এক জন মোটা গলায় বলিল, "ভিতরে এস।"

জোসেফ সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া কাপ্তেন ওরজেস্কির সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল।

---

## অষ্টম পরিচ্ছেদ

### নূতন আশার অঙ্কুর

জোসেফ কুরেট যে কক্ষে প্রবেশ করিল, তাহা ক্ষুদ্র হইলেও বৃহৎ লোহার ষ্টোভের আগুনে উত্তপ্ত এবং মেষের চর্ব্বির বাতির আলোকে আলোকিত।

ওরজেস্কি ষ্টোভের সম্মুখে বসিয়া ছয় ইঞ্চি লম্বা একটা চুরুট মুখে গুঁজিয়া ধূমপান করিতেছিল। তাহার পাশে একটি ছোট টেবলের উপর একটা প্রকাণ্ড পেয়ালা, তাহা দুগ্ধবর্জ্জিত চা'য়ে পরিপূর্ণ; তাহাতে কয়েক খণ্ড লেবু ভাসিতেছিল। চায়ের পেয়ালার পাশে এক বোতল ভডকা—অর্থাৎ রুসিয়াদেশের ধান্যেশ্বরী!

জোসেফকে দেখিয়া ওরজেস্কি উঠিয়া দাঁড়াইল; সে দ্বারপ্রান্তে কসাক প্রহরীকে দণ্ডায়মান দেখিয়া বলিল, "প্রহরী, তুমি বাহিরে গিয়া দাঁড়াও।"

প্রহরী ওরজেস্কিকে অভিবাদন করিয়া দ্বারপ্রান্ত হইতে অদৃশ্য হইল।

কারারুদ্ধ হইবার পর জোসেফের চেহারার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। তাহার কপালের ও গালের হাড় বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, মুখ লাবণ্যহীন হইয়াছিল, চক্ষু দুইটি অবসাদবিজড়িত। কেশগুলি অযত্নে কপালে ও ঘাড়ে লতাইয়া পড়িয়াছিল এবং দাড়ি-গোঁফে মুখ ঢাকিয়া গিয়াছিল। নিয়মিতভাবে স্নানের অভাবে সর্ব্বাঙ্গে ময়লা জমিয়াছিল; তাহার উপর তাহার

বিবর্ণ ছিন্ন পরিচ্ছদে তাহাকে অত্যন্ত বিশ্রী দেখাইতেছিল।

ওরজেস্‌কি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে জোসেফের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি রুসিয়ান?"

জোসেফ মাথা নাড়িয়া বলিল, "না।"

ওরজেস্‌কি। কোন্ দেশের লোক তুমি?

জোসেফ। সুইট্‌জারল্যাণ্ডে আমার বাড়ী; সুইট্‌জারল্যাণ্ডের জুরিচে।

ওরজেস্‌কি দ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়া একবার বাহিরে দৃষ্টিপাত করিল, কিন্তু প্রহরীটাকে দেখিতে পাইল না; সে দ্বার রুদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার ষ্টোভের নিকট সরিয়া গেল। তাহার পর জোসেফকে তাহার কাছে যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিল।

জোসেফ তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। তখন ওরজেস্‌কি তাহাকে মৃদুস্বরে বলিল, "জুরিচে তোমার বাড়ী; তোমার কি সেখানে ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা আছে?"

প্রশ্নটা শুনিয়া জোসেফের মনে হইতে পারিত, নির্ব্বাসিত বন্দীকে বিদ্রূপবাণে বিদ্ধ করিবার জন্যই প্রহরিদলের নিষ্ঠুর অধিনায়ক এই ভাবে রসিকতা করিতেছে; কিন্তু জোসেফ ওরজেস্‌কির কণ্ঠস্বরে বিদ্রূপের আভাস পাইল না, বরং তাহার কণ্ঠস্বরে আন্তরিকতা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। এই জন্য ওরজেস্‌কির প্রশ্ন জোসেফের হৃদয়স্পর্শ করিল, মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার হতাশ হৃদয়ে নবীন আশা অঙ্কুরিত হইল; যেন মৃত দেহে জীবনসঞ্চার হইল! অব্যক্ত আনন্দে ও উৎসাহে তাহার জীর্ণদেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল; প্রাবৃটের মেঘান্ধকার-সমাচ্ছন্ন নিশায় সহসা যেন কোন ঐন্দ্রজালিকের মন্ত্রবলে কনককান্তি ঊষালোকের সমাগম হইল। তাহার নিস্পন্দপ্রায় বক্ষে শোণিতের প্রবাহ চঞ্চল হইয়া উঠিল। দুর্দ্দিনে সে পরমেশ্বরকেও ভুলিয়া গিয়াছিল, ওরজেস্‌কির এই একটিমাত্র প্রশ্নে হঠাৎ তাহার মনে হইল, পরমেশ্বর আছেন, নিশ্চয়ই আছেন এবং তিনি সত্যই করুণাময়। তাঁহার করুণায় অসম্ভব সম্ভব হইতে পারে।

বিপুল চেষ্টায় মনের চাঞ্চল্য দমন করিয়া জোসেফ বলিল, "দেশে ফিরিতে কাহার অনিচ্ছা? বিশেষতঃ জানি না, হতভাগ্য বন্দীকে ডাকিয়া আনিয়া এরূপ নিষ্ঠুর বিদ্রূপের কি প্রয়োজন ছিল!"

ওরজেস্‌কি নীরস স্বরে বলিল, "কাহাকেও আমার বিদ্রূপ করিবার অভ্যাস নাই।"—সে গ্লাসে খানিক ভডকা ঢালিয়া গ্লাসটা জোসেফের সম্মুখে ধরিল, বলিল, "ইহা পান করিয়া সুস্থ হও।"

জোসেফ বহুদিন ও রসে বঞ্চিত ছিল, সে ব্যগ্রহস্তে গ্লাসটা টানিয়া লইয়া সেই উগ্র মদিরা এক নিশ্বাসে গলাধঃকরণ করিল; তাহার পর গ্লাসটা টেবলের উপর রাখিয়া বলিল, "ধন্যবাদ।"

তরল অনলবৎ উগ্র সুরা পান করিবার মুহূর্ত্ত পরে তাহার সর্ব্বাঙ্গে যেন বিদ্যুৎপ্রবাহের সঞ্চার হইল; সে মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের আলোড়ন অনুভব করিতে লাগিল। জোসেফ বিস্ফারিত নেত্রে ওরজেস্‌কির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ওরজেস্‌কি গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "এ দেশ সম্বন্ধে তোমার কোন অভিজ্ঞতা আছে?"

জোসেফ বলিল, "না। এ দেশে আমি অল্পদিন পূর্ব্বে আসিয়াছি। যদি আমি এই দেশ পরিত্যাগের সুযোগ পাই, তাহা হইলে এই অভিশপ্ত ভূমিতে জীবনে আর কখনও পদার্পণ করিব না।"

ওরজেস্‌কি মৃদু হাসিয়া বলিল, "সব বেটা সয়তানই ঐ রকম কথা বলিয়া থাকে; তাহাদের কেহ কখন যদি দেশে ফিরিবার সুযোগ পায়, তাহা হইলে অভ্যাস-দোষে আবার ফাঁদে পড়িবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠে!"

জোসেফ ব্যাকুলস্বরে বলিল, "দোহাই তোমার, একটিবার আমাকে এই সুযোগ দান কর; তাহার পর যদি কখন এ দেশের মাটী স্পর্শ করি, তাহা হইলে—আমাকে ধরিয়া জীবন্ত অবস্থায় আমার শরীরের চামড়া ছুলিয়া লইও, আমি আপত্তি করিব না।"

ওরজেস্‌কি বলিল, "তোমার কথা সত্য কি না, পরীক্ষা করিবার জন্য আমার আগ্রহ হইতেছে।"

জোসেফ উত্তেজিতভাবে ওরজেস্‌কির দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া আবেগ-কম্পিতস্বরে বলিল, "তবে কি সত্যই আমি পলায়নের সুযোগ পাইব?"

দিয়া বলিল, "সাবধান, মূর্খ! দেখিতেছি, তোমার মাথা বিগ্‌ড়াইয়াছে।"

এই তিরস্কারে জোসেফ সংযত হইয়া বলিল, "না, আমার মাথা ঠাণ্ডা আছে; তুমি আমার অঙ্গীকারে নির্ভর করিতে পার, কাপ্তেন!"

ওরজেন্স্কি ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, "কোন কারণে আমি তোমাকে মুক্তিদান করিব; সেই কারণটি কি, তাহা জানিবার জন্য কখন আগ্রহ প্রকাশ করিও না। তাহা তোমার অজ্ঞাত থাকাই বাঞ্ছনীয়। এখানেই তুমি পলায়নের সুযোগ পাইবে; কারণ, আমাদের গন্তব্য স্থলে উপস্থিত হইলে তোমার উপর আমার কর্তৃত্ব থাকিবে না। বিশেষতঃ, যদি তুমি ভবিষ্যতে কোন উপায়ে ইর্খুটস্ক হইতে পলায়ন করিতে পার, তাহা হইলেও পথের কষ্টে তোমার মৃত্যুর আশঙ্কা আছে। আজ গভীর রাত্রিতে তুমি কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া নিঃশব্দে তোমাদের ঘর হইতে বাহির হইবে। ঘরের দ্বার বাহির হইতে বন্ধ করা হইবে না, কিন্তু দ্বারের বাহিরে ঐ কসাক প্রহরীটা পাহারায় থাকিবে। সে আমার অনুগত লোক হইলেও, কেহ তাহাকে সন্দেহ করিতে না পারে, এই উদ্দেশ্যে তুমি তাহাকে আক্রমণ করিবে; সে সহজেই তোমার নিকট পরাজয় স্বীকার করিবে, তুমি তাহার পিস্তলটা কাড়িয়া লইয়া পিস্তলের কুঁদা দিয়া তাহার মস্তকে আঘাত করিবে। আঘাতটা সাংঘাতিক না হয়, সে দিকে লক্ষ্য রাখিবে। তবে একটু রক্তপাত হওয়া আবশ্যক। সেই আঘাতে সে মূর্চ্ছার ভাণ করিয়া পড়িয়া থাকিবে। সেই সুযোগে তুমি দক্ষিণদিকে পলায়ন করিবে। কোন নগরে প্রবেশ করিবে না; অরণ্য, প্রান্তর পার হইয়া আল্‌টাই পর্ব্বতে উপস্থিত হইবে। তাহার পর দক্ষিণ-পশ্চিম-দিকে চলিতে চলিতে তুর্কিস্থানে পৌঁছিতে পারিবে। তুর্কিস্থানের বোখারা বা সমরকন্দ নগরে তোমার আশ্রয়ের অভাব হইবে না। পথ সুদীর্ঘ, পথে বিপদেরও আশঙ্কা আছে, যদি তুমি পথশ্রমে কাতর না হও, যদি তোমার সহিষ্ণুতা ও সঙ্কল্পের দৃঢ়তা থাকে, তাহা হইলে তুমি কৃতকার্য্য হইতে পারিবে। টেবলের উপর কাগজ-মোড়া কয়েকটা 'রুবল' (রুসিয়ার প্রচলিত মুদ্রা) আছে, লইয়া যাও। উহাই তোমার পাথেয়, সর্ব্বদা সতর্ক থাকিবে এবং বিবেচনা করিয়া কায করিবে, যেন তোমার নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য আমাকে বিপন্ন হইতে না হয়।"

জোসেফ টেবলের উপর হইতে টাকাগুলি তুলিয়া লইল বটে, কিন্তু তখনও তাহার মনে হইতে লাগিল, এ সকল ব্যাপার সত্য নহে, স্বপ্নমাত্র; স্বপ্নভঙ্গে সে জাগিয়া দেখিবে, ষ্ট্রোভিলের পাশে শায়িত আছে! এই ভাবে সে মুক্তিলাভ করিবে, ইহা যে আশার অতীত, স্বপ্নেরও অগোচর!

ষ্ট্রোভিলের কথা স্মরণ হইতেই জোসেফ ওরজেন্স্কিকে বলিল, "তুমি কি কারণে আমাকে পলায়নের সুযোগ দান করিবে, তাহা জানিবার জন্য আমি আগ্রহ প্রকাশ করিব না; কিন্তু আমার সঙ্গী, আমার সুখ-দুঃখের বন্ধু ষ্ট্রোভিলকেও আমি সঙ্গে লইতে চাই। সে যদি আমার সঙ্গে পলায়নের সুযোগ লাভ করিতে না পারে, তাহা হইলে আমি পলায়ন করিব না।"

জোসেফের কথায় ওরজেন্স্কি অত্যন্ত বিস্মিত হইল, বোধ হয়, তাহার একটু রাগও হইল। সে উত্তেজিত স্বরে বলিল, "এ তোমার অসঙ্গত আবদার! তোমার বন্ধুপ্রীতি প্রশংসনীয় বটে, কিন্তু আমি তোমার এই প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারি না; ষ্ট্রোভিলকে আমি ছাড়িতে পারিব না। বিপদে পড়িয়া প্রাণ যায়, এখন নিজের পথ দেখ, পরের জন্য ব্যস্ত হইও না।"

জোসেফ দৃঢ়স্বরে বলিল,—"আমি পলায়ন করিব না!"

ওরজেন্স্কি বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে জোসেফের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বন্ধুর প্রাণরক্ষার জন্য সে জীবনবিসর্জ্জনে প্রস্তুত! ত্যাগের এরূপ দৃষ্টান্তে পিশাচ ভিন্ন সকলেই মুগ্ধ হয়, ওরজেন্স্কিও মুগ্ধ হইল। সে কয়েক মিনিট চিন্তা করিয়া বলিল, "বেশ, তাহাই হউক, তোমরা উভয়ে পলায়ন করিলে আমাকেও বোধ হয় কেহ সন্দেহ করিতে পারিবে না। ষ্ট্রোভিলকেও সঙ্গে লইও। এখন তোমার ঘরে যাও। কাঁড়ির দেউড়ির শিকল খোলা থাকিবে। দেউড়ির পাশে একটা বাণ্ডিল পাইবে, তাহাতে শুষ্ক খাদ্যদ্রব্য এবং তোমার পিস্তলে ব্যবহারের জন্য কতকগুলি টোটা

থাকিবে। পলায়নের ব্যস্ততায় তাহা লইয়া যাইতে ভুলিও না; ভুলিলে পথে অনাহারে মরিবে।"

ওরজেন্স্কি দ্বার খুলিতেই কসাক প্রহরী দ্বারের নিকট উপস্থিত হইল।

ওরজেন্স্কি প্রহরীকে বলিল, "কয়েদীকে উহার বাসের ঘরে লইয়া যাও।"

প্রহরী কাপ্তেনকে অভিবাদন করিয়া জোসেফকে লইয়া চলিল। জোসেফ আড্ডা-ঘরে ফিরিয়া আসিয়া, অন্যান্য কয়েদীদের দেখিয়া বুঝিতে পারিল, তাহারা পথশ্রমে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছে। সকলেই মেষচর্ম্মে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া মৃতবৎ পড়িয়াছিল। জোসেফ ষ্ট্রোভিলের পার্শ্বে শয়ন করিয়া তাহার নিদ্রাভঙ্গ করিল; তাহার পর তাহার কানে কানে বলিল, "আজ রাত্রে আমরা দু'জনে পলায়ন করিব। আমরা পলায়নের সুযোগ পাইব। এ সম্বন্ধে কোন কথা জানিতে চাহিও না। তুমি উঠিয়া নিঃশব্দে আমার অনুসরণ করিবে। প্রহরীর সঙ্গে আমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে; কিন্তু তুমি নির্লিপ্ত থাকিবে, তাহাকে আক্রমণ করিবে না। আমার কথা বুঝিয়াছ?"

ষ্ট্রোভিল কিছুমাত্র বিস্ময় বা উৎসাহ প্রকাশ না করিয়া সহজ স্বরে বলিল, "হাঁ, বুঝিয়াছি। ভালই হইবে।"

অতঃপর তাহারা মেষচর্ম্মে আপাদমস্তক আবৃত করিয়া দুই তিন ঘণ্টা ঘুমাইয়া লইবার জন্য চক্ষু মুদিয়া নিস্তব্ধভাবে পড়িয়া রহিল; কিন্তু তাহাদের নিদ্রা হইল না। তাহাদের হৃদয়ে তখন ঝটিকা বহিতেছিল।

রাত্রি ক্রমে গভীর হইল। অবশেষে জোসেফের মনে হইল, আর অধিক বিলম্ব করা সঙ্গত হইবে না। সে উঠিয়া বসিল এবং চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিল; কান পাতিয়া নিদ্রিত কয়েদীদের নাসিকা-গর্জ্জনধ্বনি ভিন্ন অন্য কোন শব্দ শুনিতে পাইল না। চর্ব্বির বাতি তখন নির্ব্বাণোন্মুখ; মিট্‌মিট্ করিয়া জ্বলিতে জ্বলিতে কয়েক মিনিট পরে দীপ নির্ব্বাপিত হইল।

জোসেফ ষ্ট্রোভিলের মাথার কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়া মৃদুস্বরে বলিল, "ঘুমাইয়াছ কি?"

ষ্ট্রোভিল বলিল, "না, জাগিয়াই আছি। সময় হইয়াছে কি?"

জোসেফ বলিল, "হাঁ, উঠিয়া আমার অনুসরণ কর।"

ষ্ট্রোভিল বলিল, "চল; দু'খানা মেষচর্ম্ম চুরি করিয়া লইয়া যাই, পথে কাযে লাগিবে। যে হাড়ভাঙ্গা শীত!"

তাহারা উভয়ে দ্বারের নিকট আসিয়া দেখিল, দ্বার খোলা আছে, প্রহরী বাহির হইতে শিকল বন্ধ করে নাই। তাহারা নিঃশব্দে বাহিরে আসিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল। বাহিরে খোলা বারান্দা; সেই বারান্দায় একখানি কাঠের বেঞ্চিতে বসিয়া প্রহরীটা ঢুলিতেছিল; তাহার পাশেই একটা 'ষ্টোভ', তাহা না থাকিলে প্রহরীটা শীতে মরিয়া যাইত।

প্রহরী জোসেফকে দেখিয়াই লাফাইয়া উঠিল; জোসেফও ওরজেন্স্কির উপদেশ স্মরণ করিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। প্রহরী ইচ্ছা করিলে জোসেফকে অবলীলাক্রমে ভূতলশায়ী করিতে পারিত, সাহায্যলাভের জন্য চীৎকারও করিতে পারিত; কিন্তু সে অতি সহজে জোসেফের হস্তে আত্মসমর্পণ করিল। জোসেফ তাহার পিস্তলটা কাড়িয়া লইয়া, পিস্তলের কুঁদা দিয়া তাহার মস্তকে আঘাত করিল। কসাকটা তৎক্ষণাৎ ঘুরিয়া পড়িয়া মূর্চ্ছিতের ন্যায় নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

ফাঁড়ির দেউড়ির পাশে একটা বোঁচ্‌কা পড়িয়াছিল; জোসেফ তাহা তুলিয়া লইয়া কাঁধে ফেলিল, তাহার পর ষ্ট্রোভিলকে সঙ্গে লইয়া পথিপ্রান্তবর্ত্তী প্রান্তরে প্রবেশ করিল। মুক্ত প্রান্তরের তুষারশীতল সমীরণ-হিল্লোলে তাহারা মুক্তির আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল। সেই গভীর নিশীথে তাহাদের যে যাত্রার আরম্ভ হইল, তাহার শেষ কোথায়? অনাহারে অনিদ্রায় শত শত বিঘ্ন-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া, অসংখ্য নদ-নদী, অরণ্য, মরু, পর্ব্বত, কান্তার পার হইয়া কোনও দিন তাহারা সহস্র সহস্র ক্রোশ দূরবর্ত্তী গন্তব্য স্থানে উপনীত হইতে পারিবে, কি পথিমধ্যেই তাহাদের দুর্ব্বহ জীবনের অবসান হইবে — এ চিন্তা তাহাদের মনে স্থান পাইল না। সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন নিস্তব্ধ নিশীথকালে তাহারা গগনবিহারী উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজির আলোকে নির্ভর করিয়া দক্ষিণাভিমুখে

দ্রুতবেগে ধাবিত হইল। তাহারা কোন দিকে কোন জীবিত প্রাণী দেখিতে পাইল না।

তাহারা দুই ঘণ্টাকাল দ্রুতবেগে সুদীর্ঘ প্রান্তর-পথে ধাবিত হইয়া বুঝিতে পারিল, টোমস্ক নগর বহু পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছে, প্রহরীরা তাহাদের অনুসরণ করে নাই; তখন তাহারা অপেক্ষাকৃত ধীরে চলিতে লাগিল।

ষ্ট্রোভিল জীবনে বহু দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিয়াছিল, নানা-প্রকার নির্য্যাতনে তাহার দেহ জীর্ণ হইয়াছিল, তাহার মন পাষাণে পরিণত হইয়াছিল; সুখ-দুঃখের অনুভূতিও বিলুপ্ত হইয়াছিল। কেহ কোনও দিন তাহার চক্ষুতে অশ্রু দেখিতে পায় নাই; মস্তকের উপর উদ্যত বজ্র মুহূর্ত্তের জন্যও তাহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। সেই পাষাণহৃদয় ষ্ট্রোভিল, সেই রাত্রিশেষে অকূল সমুদ্রবৎ অসীম শুভ্র তুষারমণ্ডিত প্রান্তরবক্ষে চলিতে চলিতে হঠাৎ জোসেফকে ক্রোড়ে টানিয়া লইয়া, অশ্রুধারায় তাহাকে প্লাবিত করিতে লাগিল; কি একটা প্রচণ্ড বেদনায় তাহার বুকের ভিতরটা ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল।

মনের ভার লাঘব হইলে ষ্ট্রোভিল আবেগভরে বলিল, "ভাই, বন্ধু, প্রিয়তম! আমি জানি, আমি তোমার স্নেহের, বিশ্বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য; কিন্তু তুমি দেবতা, তোমার অনুগ্রহেই সমাধিগহ্বর হইতে জীবিত অবস্থায় বাহির হইতে পারিয়াছি। এখন আমরা মুক্ত, আমরা স্বাধীন; প্রাণ দিয়া এই স্বাধীনতা রক্ষা করিব,—মরিব, কিন্তু আর ধরা দিব না। বল, আমাদিগকে কত দূর যাইতে হইবে? কোন্ দিকে? কোথায়?"

ষ্ট্রোভিলের আলিঙ্গন-পাশ হইতে মুক্ত হইয়া জোসেফ বলিল, "দক্ষিণ, দক্ষিণ দিক লক্ষ্য করিয়াই এখন আমাদিগকে সপ্তাহকাল চলিতে হইবে। তাহার পর অন্য ব্যবস্থা। জানি না, কবে আমাদের এই যাত্রার অবসান হইবে?—জানি না, এই সুদীর্ঘ পথের শেষ কোথায়!"

মেষচর্ম্মে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া পুনর্ব্বার তাহারা সেই তুষারাচ্ছন্ন প্রান্তরে নিস্তব্ধভাবে চলিতে আরম্ভ করিল।

[ ক্রমশঃ ]

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়

# শরতে

প্রাবৃটের জাল অপসারি' দূরে—শরৎ এসেছে ফিরে,
আজিকে জীমূত মন্দ্রিছে বৃথা, হারায়ে ফেলেছে নীরে;
সতেজ বিটপীগুলি দাঁড়ায়ে শীর্ষ তুলি
কভু বা নমিয়া শরৎ রাণীরে—অভিনন্দিছে ধীরে।

স্নিগ্ধ-মধুর-শিশু-রৌদ্রের ঝলমল আলোরাশি,
বরষার ঘন-তমোযবনিকা নিমেষে ফেলেছে নাশি',
অম্বুজ দলে দলে ফুটেছে সরসী-জলে
কহ্লার আর কুমুদীর দল—হিল্লোলে মৃদু হাসি'।

ওই দূরে দূরে কাশের ক্ষেত্রে সিত-উত্তরীখানি
কে দিল বিছায়ে?—নিপুণ কাহার পঙ্কজ দুটি পাণি?
শ্যাম-প্রান্তর আজি গলিত-স্বর্ণে সাজি'
সোনার ধানের মঞ্জরী পরি সাজিছে অরণ্যানী!

সোহাগী করবী বিরহিবালার কবরী-শোভার তরে
উঠে বিকশিয়া শত শত ঝাড়ে বিপুল পুলকভরে;
প্রিয় আশে বিরহিণী উন্মনা আমোদিনী
চম্পকে গাঁথে সুচারু মালিকা লাজ-কম্পিত করে।

হিন্দু-বিধবা সম পবিত্রা শুভ্র শেফালিদল
পড়িছে ঝরিয়া ঝুর্ ঝুর্ ঝুর্ পুষ্পিত-তরুতল,
শ্যাম-শস্পের পরে সারা নিশি পড়ে ঝ'রে
শতেক অবীরা ঝরিছে যেমতি বিতরিয়া পরিমল।

ঊর্দ্ধের ওই সুনীল সায়রে কেবা পাল তুলে যায়?
সিত-উত্তরী দুলায়ে নাবিক ওই ডাকে "আয়—আয়"!
"তাপিত পান্থ যারা ভাঙ নশ্বর 'কারা'
নাই ব্যাধি জরা—এ মধুরাজ্যে বহে আনন্দ বায়!"

বৎসর পরে এ শুভ শরতে মিলিছে আত্ম-জন,
কত দিনব্যাপী বক্ষোবেদনা হ'তেছে বিস্মরণ;
( মম ) চিত্ত পাগলপারা অশ্রু—বাঁধন হারা—
অন্ধ কারা মোর উজলিবে কবে আসি অন্তরধন?

ঢালিছে ইন্দু রজতের ধারা—ব্যাপ্ত যে চারি ধার,
ওই যে তরুর শীর্ষে—পর্ণে ঝরিছে মুক্তা-হার!
এ মোর ব্যথার গান তুলিল স্বরগে তান?
শিশিরের বেশে তাই কি ঝরিছে বন্ধুর আঁখি-ধার?

শ্রীমতী বীণাপাণি রায়।

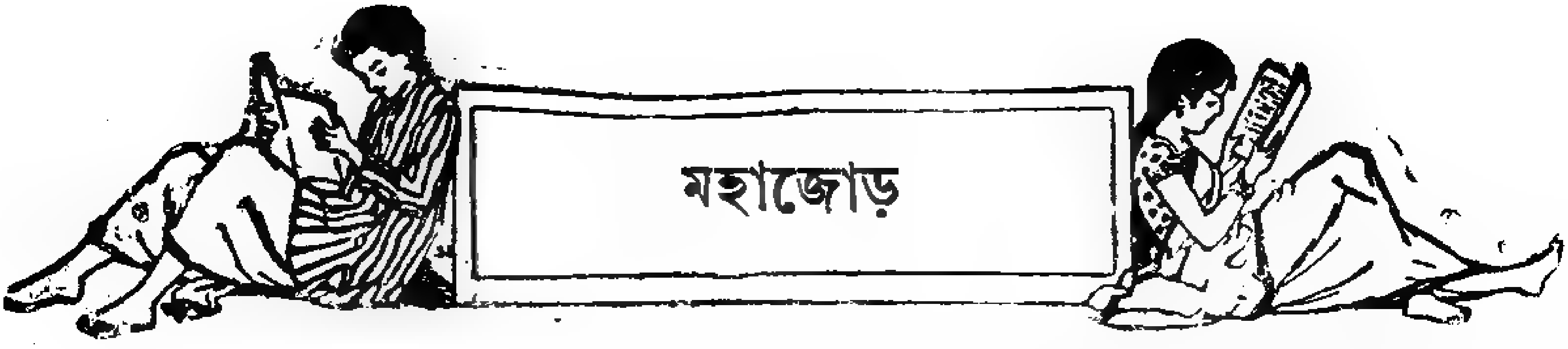

# মহাজোড়

## ১

"আরে বাপ রে!—আঁধার ঝাতিয়ার মত আকাশ হ'তে মেঘ নামছে,—আয় দুধিয়া, ঘরকে যাই।" মাথার উপরে একবার তাকাইয়া মুনিয়া দুধিয়ার হাত ধরিয়া টানিল। তাহার পর যে দিকে সোনার বরণ গ্রামের পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া দূরে মহুয়া ও আম্রকুঞ্জের মধ্যে গিয়া আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছে, সেই দিক্ লক্ষ্য করিয়া তীরের মত ছুট দিল। হু হু বায়ু-তাড়নায় তাহার রুক্ষ অযত্নবিন্যস্ত কেশরাশি উড়িতে লাগিল। দুধিয়া তাহার দিকে ভ্রূক্ষেপও করিল না। পশ্চিমে দিক্চক্রবালে যেখানে গাঢ়কৃষ্ণ মেঘের রাশি স্তরের পর স্তর ধূমায়মান পাহাড়ের শ্রেণীর সহিত মিশামিশির প্রয়াস পাইতেছিল, সেইখানে সতৃষ্ণ হর্ষ-বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়ন নিবদ্ধ করিয়া জীর্ণ সেতুর উপর বসিয়া রহিল।

মুনিয়া দুধিয়ার প্রতিবেশিনী—উভয়ে প্রায় সমবয়স্কা। উভয়েই কারমাটারের খৃষ্টান মিশনারীদের উপনিবেশে কায করে। সংসারে মুনিয়ার বাপ-মা থাকিলেও দুধিয়ার কেহ নাই, কেবল ভ্রাতা ছোট্টু ও সে। প্রতিদিন সে যেমন মুনিয়ার সহিত দুই ক্রোশ হাঁটিয়া তাহাদের পাতায় ঢাকা পাখী-ডাকা গ্রাম হইতে কারমাটারে চাকুরী করিতে যায়, আজও তেমনই গিয়াছিল; ফিরিবার পথে জীর্ণ সেতুর উপর বসিয়া তাহারা পথশ্রম অপনোদন করিতেছিল। মুনিয়া সত্যই ক্লান্ত হইয়াছিল—সে সেতুর উপর বসিয়া হাঁপাইতেছিল। দুধিয়ার কিন্তু শরীরের দিকে আদৌ লক্ষ্য ছিল না—সে একমনে একপ্রাণে সমস্ত আগ্রহটুকু দৃষ্টির মধ্যে দিয়া দূরে দিক্চক্রবালে মেঘের শ্রেণীর উপর অস্তগমনোন্মুখ তপনদেবের সহস্ররশ্মির বিচিত্র ক্রীড়া দেখিতেছিল। মুনিয়া কখন্ চলিয়া গেল, সে দিকে তাহার লক্ষ্যই ছিল না, এমনই তন্ময় হইয়া সে প্রকৃতির নগ্ন সৌন্দর্য্যে আপনাকে ডুবাইয়া দিয়াছিল!

তখনও সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আইসে নাই; তখনও সহস্রকিরণের লোহিত-রশ্মি-গলিত সুবর্ণের ন্যায় মেঘের গায়ে প্রতিফলিত হইয়া নানা রঙের রেখাপাত করিতেছিল, গোধুলির আলো-আঁধারের ভিতর দিয়া সোনার বরণ সূর্য্য-কিরণ ঝিকিমিকি খেলিতেছিল। মুহূর্ত্তে বহুরূপীর মত বর্ণপরিবর্ত্তনে মেঘগুলিকে কখনও পীতাভ, কখনও নীল, কখনও বা মখমলের মত, আবার কখনও বা রক্তজবার মত দেখাইতেছিল।

যত দূর চক্ষু যায়, সেতুর পূর্ব্ব ও পশ্চিমে অনন্ত অবিশ্রান্ত তরঙ্গায়িত নিবিড়বিন্যস্ত দূরবিসারী ধান্যক্ষেত্র ও প্রান্তর,—স্তরের পর স্তর, কেহ উচ্চ, কেহ নীচ, অবিচ্ছিন্ন হরিৎমণ্ডিত, সুন্দর, নয়নাভিরাম!

শ্রাবণের ধারাপাতে ঘাট, মাঠ, ক্ষেত্র, প্রান্তর স্নাত প্লাবিত। কলকল স্বরে ক্ষেত্রপ্রান্তরের জলধারা উচ্চ হরিৎস্তর হইতে নিম্নস্তরে নামিতেছে, আবার সেই স্তর হইতে পার্ব্বত্য স্রোতস্বিনীর মত তীরবেগে নিম্নতর স্তরে আপতিত হইতেছে। অবিরাম অশ্রান্ত কলকলধ্বনি—সেই ধ্বনিতে বিশ্বব্যোম ছাইয়া গিয়াছে। উত্তরে ও দক্ষিণে সরল সুন্দর কারমাটারের রাজপথ কখনও উচ্চে উঠিয়া, কখনও নিম্নে নামিয়া করোর ও দুমকার অভিমুখে ছুটিয়াছে। লোহিতাভ কঙ্কর শ্বেতাভ প্রস্তরখণ্ডের সহিত মিলিত হইয়া পথের উপর যেন পুষ্পরাশির মত শোভা পাইতেছে। সে পথের কোথাও শ্রাবণের অবিশ্রান্ত ধারাপাতেও এতটুকু কর্দ্দমক্লেদ নাই।

ক্রমে মেঘের পশ্চাতে মেঘ আসিয়া আকাশ ছাইয়া ফেলিতে লাগিল, হু হু গর্জ্জনে বায়ু বহিতে লাগিল, দূরে ও নিকটে গাছ-পালা যেন ভূমিতলে মাথা লুটাইয়া পড়িতে লাগিল। প্রভঞ্জনের ভীম-গর্জ্জন জলকোলাহলের সহিত মিশ্রিত হইয়া যেন এক প্রলয়ের সূচনা করিয়া তুলিল।

দুধিয়ার লক্ষ্য সেই দিকে ছিল। কিন্তু সে বহির্দৃষ্টিতে প্রকৃতির এই ভীমকান্ত রূপ উপভোগ করিলেও তাহার মন কোথায় কোন সুদূর অতীতের স্মৃতিক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছিল; তাহার আচরণে ইহা সহজেই অনুমান

করা যায়। একে পার্ব্বত্য পথ, তাহাতে সন্ধ্যার অন্ধকার ও ঝড়বৃষ্টি, সর্ব্বোপরি এখনও অর্দ্ধপথে নদী পার হইতে হইবে,—সে কোন্ সাহসে মুনিয়ার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া এই নির্জ্জন প্রান্তরে একাকিনী বসিয়া রহিয়াছে?

প্রকৃতির ভীমকান্ত রূপসাগরে সে আপনাকে ডুবাইয়া দিলেও মনটিকে কোন এক কল্পনারাজ্যে প্রেরণ করিয়া আপনহারা হইয়া অতীতের একটি দিনের কথা ভাবিতেছিল। সে কি দিন—তাহার ক্ষুদ্র বৈচিত্র্যহীন জীবনে! সে যে এখনও এক বৎসর পূর্ণ হয় নাই,—তাহার নারীজীবনের প্রথম প্রভাতে সেই যে সেই এক জন এমনই ভীষণ দুর্য্যোগের দিনে তাহাকে বক্ষে ধরিয়া মহাজোড়ের উদ্দাম উন্মত্ত খরস্রোতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল—আজ 'সে' কোথায়? সেই যে সে দিন সেই এক জন—তাহার পরশে তাহার হৃদয়ের সুপ্ত নারীত্বকে সোনার কাঠির পরশে সুপ্ত রাজকন্যার মত জাগাইয়া তুলিয়াছিল,—এক বৎসরের মধ্যে আবার ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে দাবী করিবে বলিয়া গিয়াছিল, সে ত আজিও ফিরিয়া আইসে নাই! দিনের পর দিন গিয়াছে, সে ত তাহার অপেক্ষায় কার্য্যের সময় অথবা অবসরকালে অনুক্ষণ দিন গণিয়া আসিতেছে। কিন্তু আজ কোথায় সে? সংসারে ভ্রাতার অনুযোগ, প্রতিবাসিনীগণের তাড়না, কিছুই তাহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই, সে ত ধ্রুবতারার মত তাহারই স্মৃতির আলোকিত পথ ধরিয়া জীবন-সংগ্রামে অগ্রসর হইতেছে। আবার কি সে মহাজোড়ের তটে তেমনই করিয়া গোচারণ করিতে আসিবে না?

মহাজোড়!—কড়-কড় শব্দে অশনি পতিত হইল, ঝমঝম রবে বারি বর্ষিত হইল, সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি উদ্দাম তাণ্ডবনৃত্য করিতে লাগিল। এ দারুণ দুর্য্যোগে মহাজোড় পার হইতে হইবে,—দুধিয়ার দিবাস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, সে সেই ঝড়ঝঞ্ঝার সহিত যুদ্ধ করিয়া যথাসম্ভব দ্রুতপদে মহাজোড়ের দিকে অগ্রসর হইল। নাতিদূরে পশ্চাতে মিশনারী পল্লীর মধ্য হইতে বিপদে বন্ধুর মত প্রীতির অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া আলোকরশ্মি নির্গত হইতেছিল। দুধিয়া সে দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াও দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল,—সে তখন কেবল ভাবিতেছিল, কিরূপে এই দুর্য্যোগে মহাজোড় পার হইয়া ঘরে ফিরিবে। যদি মহাজোড়ে ঢল নামে, তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ! কয় দিন অতিরিক্ত বারিপাতে শীর্ণকায় উপলগর্ভ মহাজোড় স্ফীতোদর ও মহাশক্তিমান হইয়া উঠিয়াছে, ইহার উপর আজিকার এই ধারাপাত,—আশ্চর্য্যই বা কি?

পথ উচ্চ-নীচ হইলেও সরল, দুধিয়া হন্ হন্ করিয়া অন্ধকারের মধ্য দিয়া পথাতিক্রম করিতে লাগিল। তখন মুষলধারে বৃষ্টি নামিয়াছে, শালপত্রের সাঁই সাঁই শব্দ বারিধারাপাতের ভীম গর্জ্জনে মিলাইয়া গিয়াছে, কিন্তু অকস্মাৎ সেই শব্দকেও ডুবাইয়া দিয়া নদীর জলকল্লোল আকাশ-মেদিনী ছাইয়া ফেলিল। দুধিয়ার বুক দুরুদুরু কাঁপিয়া উঠিল। সে সাঁওতালের মেয়ে, বনজঙ্গল, পাহাড়-পর্ব্বত অথবা জলঝড়ে তাহার ভয় ছিল না, কিন্তু মহাজোড়!—সে স্বতন্ত্র কথা। মহাজোড় 'দেওতা' কি দানা, কখন্ কি মূর্ত্তি ধারণ করে সে,—জঙ্গলের সাঁওতাল তাহা ভালরূপই জানে!

হঠাৎ দুধিয়া চমকিত হইয়া উঠিল, নাতিদূরে বিদ্যুদালোকে দেখিল, দীর্ঘ মনুষ্যমূর্ত্তি পথ আগুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে! মুহূর্ত্তমাত্র চারি চক্ষুর দেখা, কিন্তু তাহাতেই সে চিনিল, তাহার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্ত পরেই দুধিয়া শুনিল, সেই মূর্ত্তি বলিতেছে, "দুধিয়া, পণ রাখতে এল মুন্নু! আয় আবার তোরে নদী পার করি।" দুধিয়া কম্পিতকণ্ঠে কেবলমাত্র বলিল, "মুন্নু।" তাহার পর সেই মূর্ত্তি দীর্ঘ বাহু প্রসারণ করিল, দুধিয়া তাহাতে ঢলিয়া পড়িল, তাহার পর আর তাহার সংজ্ঞা ছিল না।

## ২

ভীষণ ঝড়ে বুঝি পাতার কুঁড়েখানা উড়িয়া যায়! কিন্তু শালের খুঁটির জান্ শক্ত, তাই এই ঝড়ের দেশে ছোট্টুর ছোট কুঁড়েখানা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ছোট্টু পিছনের ঝাঁপখানা আগড় দিয়া শক্ত করিয়া বাঁধিতেছিল, কিন্তু বাহিরের ঝড় ঘরে ঢুকিয়া তাহাকে যেন ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতেছিল। ছোট্টু প্রাণপণে ঝাঁপখানা চাপিয়া ধরিয়া দাঁতে দাঁত চাপিয়া ডাকিল, "বুদ্ধুদা, ঝটকে আয়;"

বুদ্ধু চৌকীদার তখন পর্ণকুটীরের পাকশালে পশিয়া অন্ধকারে দাঁড়াইয়া হাঁকিতেছিল, 'দুধিয়া', 'দুধিয়া'। এমন

অনেক দিন হয়, হুধিয়া তাহাদের অজ্ঞাতসারে বাহির হইতে কায সারিয়া আসিয়া পাকশালায় পশিয়া আহারের উদ্যোগ করে। আজ ঝড়ে হুধিয়া যে বাহিরে থাকিবে না, তাহা নিশ্চিত; সুতরাং সে হয় ত নিঃসাড়ে পাকশালায় পশিয়াছে, অথবা পাকশালার কানাচে বাঁধা হাঁস, মুরগী ও গরু-ছাগলগুলাকে ঝড়বৃষ্টি হইতে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছে। বুদ্ধু তাই ছোট কুঁড়েখানায় ঢুকিয়া হুধিয়াকে ডাকিতেছিল। কিন্তু ছোট্টুর হাঁক শুনিয়া সে বড় কুঁড়েখানার ভিতর ছুটিয়া গেল। ছোট্টু বলিল, "সামাল দে ঝাঁপটা, শালার হাওয়া, বুদ্ধু দা, উড়িয়ে নে যাচ্ছে।"

উভয়ে কার্য্য সমাধা করিয়া ঝড়ে নির্ব্বাপিত দীপশিখা আবার জ্বালিয়া দিয়া মেঝের উপর মুখোমুখি হইয়া বসিল। বুদ্ধু বলিল, "বাত ঠিক? আর মাহিনার ১৭ দিনে সাদি?"

ছোট্টু বাধা দিয়া উদ্বিগ্নস্বরে বলিল, "আরে থাম্, বুদ্ধ! জল হাওয়া, আঁধার রাতিয়া—হুধিয়া ত ফিরল না, কি হ'ল?"

বুদ্ধু হাসিয়া বলিল, "আরে দূর! না এলো, কি হ'ল? সাঁওতালের বেটী—ডর কি আছে রে? বিষ্টি নামছে, কোথাকে দাঁড়িয়েছে।"

ছোট্টু কিন্তু উহাতে শান্তি পাইল না, বলিল, "না, দেখে আসি: তুই দম ধর হেথা, চটকে আসছি।"

বুদ্ধু কিন্তু ঘরে রহিল না, বাহিরে গিয়া একবার বিশ্ব-প্রকৃতির তাণ্ডবলীলা প্রত্যক্ষ করিয়া আসিল; বলিল, "আরে না, এ বিষ্টিতে সে দাঁড়িয়েছে কুথাকে, ভাবিস না।"

উভয়ে আবার বসিল। বুদ্ধু কোন ভণিতাই না করিয়া বলিল, "আচ্ছা, শুন্ ত ছোট্টু, হুধিয়া দুষমণ শালার নাম না করছে ত? শালা মুন্ন পালিয়েছে, ডাকাতী ক'রে পালিয়েছে, সে ত ভালই হয়েছে। হুধিয়ারে দিবি ত? কথা নাড়বি না, ছোট্টু?"

ছোট্টু বলিল, "ভাবিস না, জান্ নড়চড় হবে, কথা নড়চড় হবে না।"

বুদ্ধু আশ্বস্ত হইল; কিন্তু তথাপি তাহার বুকের স্পন্দন গেল না, কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "আর হুধিয়া?"

ছোট্টু বলিল, "হুধিয়া কি বলবে? তার বি কথা নড়বে না।"

বুদ্ধু আনন্দে এক গাল হাসিয়া বলিল, "ঠিক, ঠিক, হুধিয়া বি কথার মানুষ আছে। দেখ, জমী-জমা যা আছে আমার—সব হুধিয়ার। আর তোরে যা কথা দিয়েছি—রাঙ্গী গাই, কুড়ি মুরগী, দশ ছাগল—"

ছোট্টু কথাটা শেষ করিতে না দিয়া বলিল, "হাঁস কটা দিবি?"

বুদ্ধু বলিল, "ঐটে মাপ করতে হবে,—হাঁস মাঙ্গা।" কিন্তু ছোট্টুর মুখ ভারী দেখিয়া তৎক্ষণাৎ বলিল, "আচ্ছা, হাঁস বি দেবো।"

ছোট্টু বলিল, "তা যা হয় দিস।"

বুদ্ধু কিন্তু আবার কুম্পিতস্বরে বলিল, "তুই ত বললি রে, কিন্তু হুধিয়া? ও ত মোদের সাঁওতালের মত না, পাদরীদের সাথে থেকে কেমন হইয়ে গিয়েছে। ঘরে মোর ছাওয়াল রইয়েছে, ঘর করবে ত? বড় ডর লাগে মোর। ডাগর আঁখে যখন আগ ঝাঁকে!"

ছোট্টু হো হো হাসিয়া বলিল, "তুই ত বড় মরদ চৌকীদার রে! হুধিয়ারে ডর? ছোঃ ছোঃ! কোলে পিঠে মানুষ করলুম। কথা দিল যখন, তখন পাহাড় ভেঙ্গে মাথায় পড়লেও কথা নড়বে না। যা।"

বুদ্ধু অতিরিক্ত আনন্দে ছোট্টুর হাত দুইখানা ধরিয়া বলিল, "মহাজোড় তোর ভাল করুক। মনসার কিরে, তোরে পাদরীর ঘরের দুধা খাওয়াব।"

ছোট্টু হাসিয়া বলিল, "দুধা আনবি কি ক'রে? চুরি ক'রে? হাঃ হাঃ! ভাল চৌকীদার আছিস্ তুই!"

বুদ্ধু বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া বলিল, "চুরি? হুধিয়ার লাগে কি না পারি? হুধিয়া মোর কলিজা।"

বলিতে বলিতে বুদ্ধুর কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া আসিল। ছোট্টু এতক্ষণ কথায় মগ্ন ছিল, তাই তত চঞ্চল হয় নাই, কিন্তু সে আর নিশ্চেষ্ট নীরব রহিল না, ব্যস্তভাবে বলিল, "বুদ্ধু দা, দম ধর, আমি দেখি হুধিয়ারে।"

বুদ্ধু উঠিয়া বাহিরের ঝাঁপ খুলিয়া বলিল, "বা রে, আশমানে চাঁদিয়া ঝক ঝক করছে। হাওয়া মারছে না, জল ঝরছে না। দেখি হুনিয়ার বাড়ী খবর নিয়ে। সাদি ঠিক রইলো, ভাই। হুধিয়ারে ঘরকে না মিললে জানে বাঁচবো না, ছোট্টু।"

বুদ্ধু চলিয়া গেল, ছোট্টু তাহার কথার উত্তরে কেবল

একটি ছোট্ট হাঁ দিয়া কুটীরের বাহিরে আসিল। আশ্চর্য্য, তখন চাঁদের আলোয় চারি দিক কুটিপাটি। এই জলঝড়, এই জ্যোৎস্না, এ পাহাড় অঞ্চলের স্বভাবই এইরূপ! ছোট্টুর পক্ষে এ দৃশ্য নূতন নহে, সুতরাং সে বিস্ময় প্রকাশ করিল না। তাহার মনটাও সে দিকে ছিল না, সে চঞ্চল-চরণে এক বার ঘর, এক বার বাহির করিয়া বেড়াইতে লাগিল। বিশেষতঃ বুদ্ধু চলিয়া যাইবার পর সে নিঃসঙ্গ অবস্থায় অত্যধিক চঞ্চল হইয়া উঠিল, তাহার মন নানা অমঙ্গল গাহিতে লাগিল,—যদি দুধিয়ার কিছু হইয়া থাকে! বাপ রে! ছোট্টু দ্রুতপদে সদর পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল। তাহার দুধিয়া—এ মুল্লুকে যাহার মত মেয়ে নাই, যাহার মত মেয়ে আর কখনও জন্মিবে না, জন্মিতে পারে না, সেই দুধিয়া, শৈশবে পিতৃ-মাতৃ-হারা তাহার ছোট্ট দুধিয়া—তাহার যদি কোনও বিপদ্‌-আপদ ঘটিয়া থাকে! ছোট্টু দীর্ঘ পাদবিক্ষেপে ছুট দিল। তাহার দুধিয়া তাহাকে ভিন্ন সংসারে আর কাহাকেও জানে না, সে যে তাহার মা-বাপ! দুধিয়া যে কেবল তাহারই কথায় বয়সে বড় বুদ্ধু চৌকীদারকে বিবাহ করিতে সম্মত হইয়াছে—বুদ্ধুর ছেলেটারই বয়স ১০।১১ বৎসর। সে দুধিয়ার ভবিষ্যৎ ভাবিয়াই এ বিবাহে সম্মতি দিয়াছে। বুদ্ধুর মত অবস্থাপন্ন সাঁওতাল এ অঞ্চলে নাই। সে সরকারের চৌকীদার, সরকারী বেতন পায়, তদ্ভিন্ন তাহার আয় অনেক প্রকার। তাহার বাড়ীতে যত গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগী, এত কার বাড়ীতে আছে? তাহার ধানের ক্ষেত আর তরিতরকারীর বাগান যত বড়, এত বড় এক পাদরী-সাহেবদের ছাড়া আর কাহারও নাই। দুধিয়া সুখে থাকিবে। তাহার মত দুধিয়াকে কে ভালবাসিবে—আদর-যত্ন করিবে?

কিন্তু একটা ভয় আছে, যদি সেই ছোঁড়াটা ফিরিয়া আইসে! তাহার কালো চেহারার ভিতর দিয়া কি একটা জ্যোতি বাহির হইত, যাহাতে তাহাকে সকলে ভাল না বাসিয়া পারিত না। মাথায় তাহার ছিল টোপরের মত এক রাশ কাল কুচকুচে কোঁকড়ান চুল, ভাসা ভাসা টানা ডাগর দুটো চোখ,—আর ছিল গায়ে অসুরের মত শক্তি, আর বাঘের মত সাহস। মহাজোড়ের ধারে শালের জঙ্গলে সে গরু চরাইত, জঙ্গলের মধ্যে গরু পথ হারাইলে বাঘের মুখে গিয়া তাহাকে ফিরাইয়া আনিত। তাহার পর যে দিন সে মহাজোড়ের কোল হইতে দুধিয়াকে তুলিয়া আনিল, সে দিন তাহার দাদার বুকে মুখ লুকাইয়া দুধিয়া বলিয়াছিল, সে মুন্নুকে ভালবাসে—দুধিয়ী বাল্যকাল হইতে কোনও কথাই দাদার কাছে লুকায় নাই। ছোট্টুর মুখ গম্ভীর হইয়াছিল। চালচুলা নাই মুন্নুর, সে পরের গরু চরাইয়া উদরান্ন সংস্থান করে। কিন্তু দুধিয়ার মনের বাসনা ত অসম্পূর্ণ রাখিতে পারে না। তাই সে মনের অনিচ্ছা ও অসন্তোষ চাপিয়াও সম্মতি দিয়াছিল। কিন্তু বিধাতা তাহার প্রতি সুপ্রসন্ন হইলেন। করোরে এক ডাকাইতী হইল, সে ডাকাইতীর সর্দ্দার মুন্নু! মুন্নু গ্রাম ছাড়িয়া পলাইল, বিবাহের কথাও চাপা পড়িল। কিন্তু যে দিন মুন্নু গ্রাম ত্যাগ করে, সেই দিনও দুধিয়া তাহার দাদার বুকে মুখ লুকাইয়া বলিয়াছিল,—"সে ব'লে গেছে, বছর না ঘুরতেই ফিরে আসবে।"

কিন্তু দিনের পর দিন গিয়াছে, মুন্নুর কোন সংবাদ নাই, যেন এই পৃথিবী তাহাকে গ্রাস করিয়াছে। ছোট্টুও আশ্বস্ত হইল। সে জানিত, তাহার দুধিয়া যদি আকাঙ্ক্ষিত বস্তুকে না পায়, তাহা হইলে তাহার দাদা যাহারই হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিবে, তাহাকেই বিবাহ করিবে, কোনও আপত্তি করিবে না। তাই ধীরে ধীরে সে তাহার নিকট বুদ্ধুর কথা পাড়িয়াছিল। সে জানিত, বুদ্ধু বর্দ্ধিষ্ণু লোক, বয়স তাহার অধিক হইলেও সে অন্য অকর্ম্মণ্য যুবক সাঁওতাল অপেক্ষা দুধিয়াকে সুখে রাখিতে পারিবে। দুধিয়াও বহু দিন মুন্নুর জন্য বৃথা অপেক্ষা করিয়া শেষে দাদার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে বুদ্ধুর সহিত বিবাহে সম্মত হইয়াছিল। সে জানিত, মুন্নু যখন ফিরিয়া আসিল না, তখন যাহারই সহিত তাহার বিবাহ হউক না, তাহাতে ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই।

ছোট্টুও তাহার মনের কথা জানিত। তাই সে যখন তাহার সন্ধানে ছুটিয়া বাহির হইল, তখন সেই জ্যোৎস্না-পুলকিত রাজপথে অগ্রসর হইবার কালে মনের মধ্যে এই অতীত কথা আলোচনা করিতে লাগিল। সে এমনই তন্ময় হইয়া ছুটিতেছিল যে, মাত্র দুই হস্ত দূরে যখন দুধিয়া তাহাকে 'দাদা' বলিয়া ডাকিল, তখন সে চমকিত হইয়া উঠিল। সে এক লম্ফে দুধিয়ার নিকটস্থ হইয়া তাহাকে

দুই হাতে বুকের মধ্যে টানিয়া লইতেই দুখিয়া তাহার বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া মৃদুস্বরে বলিল, "সে ফিরে আসলো, দাদা।"

ছোট্টুর শিরে যেন অশনিপাত হইল। সে বিস্মিত হইয়া তাহার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "কে ফিরে আস্‌লো? মুন্নু?"

দুখিয়া মুখ অবনত করিয়া নীরব রহিল।

ছোট্টুর মুখ গম্ভীর হইল। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, "হুঁ, তা, কোথায় দেখলি তারে? জলে ঝড়ে ছিলি কোথায়, দুখিয়া?"

দুখিয়া কোন কথাই গোপন করিল না। ছোট্টু সমস্ত শুনিয়া একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "সে ডাকাত, কোম্পানীর পুলিস তারে দেখলেই ধরবে।"

দুখিয়া বলিল, "না, ধরবে না। তেমন কায সে করে নি। আমারে সব বলেছে।"

ছোট্টু আরও গম্ভীর হইল, বলিল, "তা হ'লে—বুদ্ধু? কি হবে?"

দুখিয়া তাহার বড় বড় ডাগর চোখ দুইটা ভ্রাতার মুখের উপর স্থাপিত করিয়া গম্ভীরস্বরে বলিল, "কথার নড়চড় হবে না, দাদা। চল, ঘরকে যাই।"

দুখিয়া আর দাঁড়াইল না, চঞ্চল চরণবিক্ষেপে কুঁড়ের দিকে অগ্রসর হইল, ছোট্টু বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে তাহার অনুসরণ করিল।

## ৩

শাল ও মহুয়া মহাজোড়ের উচ্চ তটভূমি জঙ্গল করিয়াছিল, সেই জঙ্গলে মুন্নু আবার পূর্ব্বের মত গরু চরাইতে লাগিল, যেন তাহার জীবনের অতীত ইতিহাসে এমন কিছু ঘটে নাই, যাহাতে সে ভীত বা লজ্জিত হইয়া চিরতরে গ্রাম ত্যাগ করিয়া যাইবে। গ্রামের লোক তাহার ব্যবহারে বিস্মিত; তাহারা ভাবে, কোম্পানীর পুলিস এখনও তাহাকে ধরে না কেন? গ্রামের চৌকীদারের সহিত তাহার যে বিশেষ সদ্ভাব ছিল না, তাহাও জানিতে কাহারও বাকী ছিল না। তথাপি চৌকীদার বুদ্ধু তাহার কোনও অনিষ্ট করে না কেন, এ প্রহেলিকা কেহই বুঝিতে পারিল না। মুন্নু স্বভাবতঃই গম্ভীরপ্রকৃতির ছিল,—তাহার অসুরের মত শক্তির কথাও কাহারও অবিদিত ছিল না; সুতরাং কেহ যে সাহস করিয়া তাহাকে এই প্রহেলিকার অর্থ সমাধান করিতে আহ্বান করিবে, এমন লোক এতদঞ্চলে ছিল না। চৌকীদার বুদ্ধুও তাহার বিষয়ে নীরব ছিল। কাযেই ডাকাইত মুন্নুর সম্বন্ধে প্রকৃত কথা জানিবার ঔৎসুক্য হইলেও গ্রামবাসীর সেই ঔৎসুক্য নিবারণের কোনও উপায় ছিল না।

তবে কেন যে চৌকীদার বুদ্ধু তাহার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী মুন্নুকে 'বাগে' পাইয়াও নিশ্চেষ্ট ছিল, তাহার একটা বিশেষ কারণ ছিল।

এবার মুন্নুর গোধন ও অন্যান্য পশুপক্ষী নিজস্ব,—সে পরের গরু চরাইত না। সে গ্রামে আসিবার পূর্ব্বেই গোপনে বাবুলাল মাড়োয়ারীর সমস্ত সম্পত্তি খরিদ করিয়া লইয়াছিল,—এ কথা ক্রেতা ও বিক্রেতা ভিন্ন বড় কেহ জানিত না। বাবুলালের করোয়ে একখানা মুদীখানার দোকান ছিল; কয়েক বৎসর কারবারে লোকসান হওয়ায় সে দোকানপাট এবং গ্রামের আবাস-কুটীর, জমীজমা ও গৃহপালিত গোধন বিক্রয় করিয়া অন্যত্র উঠিয়া গিয়াছিল। মুন্নু যেখানেই থাকুক আর যেরূপেই সন্ধান পাউক, তাহার গ্রামের কুটীর, জমীজমা ও গোধন ক্রয় করিয়া লইয়াছিল। এ সকল লেখাপড়া মহকুমা দুমকায় সমাহিত হইয়াছিল, সুতরাং গ্রামের লোক এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিল।

চৌকীদার বুদ্ধু এ সকল সংবাদ গোপনে সংগ্রহ করিয়াছিল। তাহার কৌতূহল পূর্ণমাত্রায় জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে বিষম মনঃপীড়া দিতে লাগিল—এঁ্যা, ডাকাত মুন্নু জেলে না গিয়া এত টাকার মালিক হইল কিরূপে! সে তাহাকে ধরিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। কিন্তু একা অত বড় দুর্দ্ধর্ষ বলিষ্ঠ যুবককে ধরিতে সাহসী হইল না, বিশেষতঃ তাহার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানাও ছিল না। সে এক দিন কারমাটারের পুলিস ফাঁড়িতে গিয়া দারোগার সহিত সাক্ষাৎ করিল; কিন্তু সেখানেও কোন ভরসা পাইল না। দারোগা বলিলেন, "মুন্নুর নামে কোন গ্রেপ্তারী পরোয়ানা নাই—পূর্ব্বে যে পরোয়ানা ছিল, তাহা দুমকার হাকিম 'সাহেব' নাকচ করিয়া দিয়াছেন।"

দ্ধু হতাশ হইয়া পড়িল, এই দুষমন লোকটা গ্রামে থাকিতে তাহার আশা-ভরসা থাকিবে না। কেন না, দুখিয়া যে তাহাকে বহু পূর্ব্ব হইতে ভালবাসিত, তাহা সকলেই জানে, সে-ও জানে। বিশেষতঃ এখন তাহার হাতে পয়সা হইয়াছে, তাহাকে গ্রামের লোক ভয় ত করিতই, অধিকন্ত এখন মান্য করে। না, আর বিলম্ব করিলে চলিবে না, যত শীঘ্র সম্ভব দুখিয়াকে বিবাহ করিয়া ঘরে তুলিতেই হইবে। তবে তাহার পূর্ব্বে একবার মুন্নুর সহিত বোঝাপাড়া করিতে হইবে।

এক দিন সে মহাজোড়ের তটে শালবনে মুন্নুর সহিত সাক্ষাৎ করিল, মুন্নু তখন গরু চরাইতেছিল। সে ঠিক গরু চরাইতেছিল বলা যায় না, কেন না, সে দূরে গরু-ছাগল ছাড়িয়া দিয়া উচ্চ তটভূমে বসিয়া একদৃষ্টে মহাজোড়ের খরস্রোতের দিকে তাকাইয়া ছিল। বুদ্ধু পশ্চাৎ হইতে ডাকিল, "মুন্নু!"

মুন্নু চমকিত হইল না। সে জঙ্গলের মানুষ, চিরদিন জঙ্গলেই কাটাইয়াছে, সুতরাং সে দূর হইতেই বুদ্ধুর পদশব্দ শুনিয়াছিল, চকিতে একবারমাত্র বক্র দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাকে দেখিয়া লইয়াছিল। সে তাহার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। পশ্চাতে না ফিরিয়াই সে বলিল, "কে বটে, চৌকীদার না? কি চাও?"

বুদ্ধু অগ্রসর হইয়া তাহার পার্শ্বে বসিল; হাসি হাসিমুখে তাহাকে আপ্যায়িত করিয়া বলিল, "ঘরকে ফিরেছ শুনে দেখতে এলাম এক বার। বেশ, বেশ, মুন্নু, ঘর-গরু হ'ল, এবার জরু ঘরকে তোল।"

মুন্নু গম্ভীরস্বরে বলিল, "হুঁ। তা মোরে ধরলি না চৌকীদার—মুন্নু ফেরার আসামী বটে না?"

বুদ্ধু বলিল, "আরে রাম! তুই মোর গাঁয়ের লোক, তোরে ধরিয়ে দেব? ছো ছো!"

মুন্নু হাসিল, পরে আবার গম্ভীর হইয়া বলিল, "জরুর কথা কি বল্‌ছিলি, চৌকীদার? মোর ত আর জরু হবার নেই। যে ছিল, সে ত তোর ঘরকে যাবে রে। যা, কথা ত হয়ে গেল, ঘরকে যা।" মুন্নু একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া মুখ ফিরাইয়া বসিল।

এত সহজে এই ব্যাপারের সমাধান হইবে, বুদ্ধু বুঝিতে পারে নাই, সে বিস্মিত হইল, মুন্নুর প্রতি কি জানি কেন একটা অজানা সহানুভূতির স্রোতে তাহার অন্তর ভরিয়া উঠিল, সে ছলছল-নেত্রে মুন্নুর হাত দুখানা ধরিয়া বলিল, "মুন্নু, ভাই, তোর কিসের দুঃখু? আমি তোরে ভাল জরু আনিয়ে দেব।"

হঠাৎ মুন্নুর শান্ত দুঃখভরা মুখখানা বিজাতীয় ক্রোধে দীপ্ত হইয়া উঠিল, সে সজোরে বুদ্ধুর হাত দুখানা ছুড়িয়া ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার বলিষ্ঠ দেহের মাংসপেশী-সমূহ স্ফীত হইয়া উঠিল, চোখ দুইটা জবাফুলের মত রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তাহার সে মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে বুদ্ধুর অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল, সে তাড়াতাড়ি মুন্নুর ক্রোধোপশমনের জন্য কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু মুন্নু তাহাকে কোনও অবসরই না দিয়া ক্রোধ-গম্ভীরস্বরে বলিল, "ঘরকে যা চৌকীদার। তোরে কথা যখন দিয়েছে, তখন সে তার নড়চড় করবে না,—মোরেও তার নড়চড় করতে দেখবি না। যা, ঘরকে যা।"

মুন্নু আর দাঁড়াইল না, জঙ্গলের দিকে চলিয়া গেল। বুদ্ধু বিস্মিত ও নির্ব্বাক্ হইয়া তাহার চলন্ত মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিল।

## ৪

আজ গ্রামে মনসাপূজা, মহাধুম। গ্রামের মেয়ে-পুরুষ, ছেলে-বুড়া সকলেই সামর্থ্যমত মনসাতলায় পূজা দিতে আসিয়াছে। গ্রামে একখানা মুদীর দোকান, উহাই গ্রামের হাট-বাজার, যাহাই বল তাই। উহার পার্শ্বে একখানা চালাঘর গোময় ও কর্দ্দম দিয়া লিপ্ত করা হইয়াছে, এবং উহার মধ্যে পরিষ্কার ধবধপে চন্দ্রাতপতলে মনসার মূর্ত্তি রক্ষিত হইয়াছে। মনসা রক্তবসনা, তাঁহার দুই পার্শ্বে দুইটি উদ্যতফণা ভীষণ কৃষ্ণসর্প। ধূপ-ধুনায় ঠাকুর-ঘর আমোদিত হইয়াছে, করোর হইতে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ আসিয়া পূজা করিতেছেন। করোর বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম, কারমাটার হইতে ৪ মাইল দূরে অবস্থিত, সেখানে প্রায় ৩ শত ঘর বাঙ্গালী গৃহস্থ আজ ৭ পুরুষ ধরিয়া বসবাস করিয়া আসিতেছে। বোধ হয়, তাহাদের সংস্রবে সাঁওতালরা বাঙ্গালীর ভাষায়, আচার-ব্যবহারে ও ধর্ম্মকর্ম্মে কতক পরিমাণে অভ্যস্ত হইয়াছে।

হরিৎ ও পীত বস্ত্রে মণ্ডিতা দুই তিনটি হিন্দুস্থানী মহিলা পূজার আয়োজন করিয়া দিতেছেন। সাঁওতাল-নারীরা বহুদূরদূরান্তর হইতে নানা দ্রব্যসম্ভার লইয়া মনসাদেবীর পূজায় নিবেদন করিতে আসিয়াছে। কেহ কেহ পূজা দিয়াই চলিয়া যাইতেছে, কেন না, দূরের পথ—রাত্রির অন্ধকারে পথাতিক্রম করা কষ্টকর ও বিপজ্জনক। কিন্তু অধিকাংশ নরনারীই পূজার ঘরের সম্মুখস্থ পরিষ্কৃত অঙ্গনে চন্দ্রাতপতলে সমবেত হইতেছে, কেন না, সন্ধ্যার পরে মনসার গান হইবে। করোর হইতে মনসার গান-গায়ক বাঙ্গালীর কীর্ত্তন দল আসিয়াছে। এ দিকে সাঁওতাল নরনারীরাও মাদল বাজাইয়া তাহাদের জাতীয় সঙ্গীত করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। ফল কথা, সে দিন আশপাশের কয়খানা গ্রামের লোক মনসাতলায় পূজার আমোদে যোগদান করিয়াছে।

ছোট্টুর শরীরটা ভাল ছিল না, এ জন্য সে বুদ্ধুর সহিত ছুখিয়াকে মনসাতলায় গান শুনিতে পাঠাইয়া দিয়াছিল, যাইবার পূর্ব্বে বুদ্ধু ছোট্টুকে বলিয়া গিয়াছিল, "ছাওয়াল রইলো ঘরকে, মালোরি, হুঁস নেই। বুড়ী আই, কানে শুনছে না, চোখে দেখছে না, খবর নিস, ছোট্টু।"

ছোট্টু আপন মনে বসিয়া একটা বেতের চুবড়ী বুনিতেছিল ও গুন্‌গুন্ স্বরে গান করিতেছিল, এমন সময়ে মুন্নু তাহার কুঁড়ে-ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "ছোট্টুদা, একটা কথা বলবো, শুনবি ?" কথাটা বলিয়াই সে তাহার পার্শ্বে বসিয়া পড়িল। ছোট্টু বিস্মিত হইল, গ্রামে ফিরিবার পর এ যাবৎ মুন্নু তাহার ঘরে পদার্পণ করে নাই। কিন্তু বিস্ময়ের ভাবটা চাপিয়া রাখিয়া ছোট্টু জিজ্ঞাসা করিল, "গান শুনতে যাস নি, মুন্নু ?"

মুন্নু বিরক্তির ভাব দেখাইয়া বলিল, "ভাল লাগে না। যাক, কথা বলি, হয় ত সময় হবে না। গাঁ ছেড়ে চ'লে যাচ্ছি শীগ্‌গির। যাবার আগে আমার যা কিছু আছে, ছুখিয়ারে দিয়ে যেতে চাই—তার জন্যে লিখাপড়াও ক'রে এনেছি। এই তার কাগজ।"

ছোট্টু এত দিন কখনও মুন্নুর উপর সন্তুষ্ট ছিল না, কিন্তু তাহার কথায় আনন্দিত হইলেও হৃদয়ে একটা ঘর ছেড়ে যাবি কেন ? আমরা তোরে ছাড়ব না ত—তোরে ঘর-সংসারী ক'রে—"

মুন্নু বাধা দিয়া বিরক্তির স্বরে বলিল, "তুইও মরেছিস, ছোট্টু ? আমি ছুখিয়ারে তার সাদির যতুক দিচ্ছি, তাতে তোদের কি ?"

ছোট্টু তাহার প্রকৃতি জানিত, কাযেই সে কথা চাপা দিয়া বলিল, "তা তখন দিস। আচ্ছা, বল দিকি কোথাকে ছিলি এদ্দিন, তোরে চৌকীদার ছাড়ান দিলে কেন ? এত টাকা পেলি কোথা ?"

মুন্নু বলিল, "সে ঢের কথা।"

ছোট্টু বলিল, "তবু শুনি।"

মুন্নু বলিল, "কুন্নারে জানতিস ত ?—ঐ যার ঘরকে ডাকাতি হ'ল ? ও শালা পাদরী লোকের খানসামাগিরী করত না ? তাই ওর বুকের পাটাটা এত বড় হয়েছিল ! এক দিন মহাজোড়ের ধারে সাঁঝের আঁধারে ছুখিয়ার গায়ে হাত দিল মরবার জন্যে। তাই মহাজোড়ের গায়ে হাত দিয়ে কিরে করলুম ছুখিয়ার কাছে, শালা খানসামার লৌ দেখবো !"

ছোট্টুর কৌতূহল জাগিয়া উঠিল, সে জিজ্ঞাসা করিল, "তার পর ?"

মুন্নু বলিল, "তার পর এক দিন রাতে শালা খানসামার বাড়ী চড়াও হয়ে টাঙ্গীর চোপ বসিয়ে দিলুম। ভাবলুম, শালা মরেছে, তাই গাঁ ছেড়ে পালালুম,—একবারে হাঁটাপথে সীতারামপুরে। সেই রাতে খানসামার ঘরে ডাকাত পড়লো। আমি তা জানি নি।"

ছোট্টু সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "তুই ডাকাতী করিস নি ?"

মুন্নু বলিল, "না। সীতারামপুরে কয়লার খনিতে কুলীর কায মিল্‌ল। সবসে সেরা কায করতুম, সাহেব ভালবাসত। এক দিন সাহেব মাতাল হয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে লাগাম ফস্কেছিল, খানায় পড়ছিল, ছুটে গিয়ে ঘোড়া ধ'রে সাহেবকে বাংলায় দিয়ে এলুম। আমার মাথায় আর গায়ে চোট লেগেছিল। সাহেব হাঁসপাতালে মোরে দেখতে আসত। সেরে উঠলে বাংলার জমাদার ক'রে দিলে। এক দিন সাহেব একখানা ছবি দেখালে—তাতে

সাহেবকে সব বল্লুম। সাহেব খোঁজ করলে। পাদরী খানসামা মরে নি, দুমকার হাঁসপাতালে সেরে উঠেছিল, সে সব সত্যি বল্লে। আমার সাহেব তাই দুমকার পুলিস সাহেবকে সব লিখে দিলে। ডাকাতীর নালিশ তাই পুলিস তুলে নিলে। খানসামা মারপিটের নালিশও করলে না। তাই চৌকীদার ছাড়ান দিয়েছে। নইলে —হুঁ!"

ছোট্টু বলিল, "তা যেন হ'ল, কিন্তু টাকা?"

মুন্নু বলিল, "টাকা? সাহেব ভালবাসত, অনেক দিত। তার পর সাদি কর্‌তে মুল্লুক চ'লে গেল। যাবার আগে পঁচিশ পঁচিশ পঞ্চাশ গণ্ডা টাকা দিয়ে গেল—আরও কত কি দিয়ে গেল, আমিও ঘরকে এলুম।"

ছোট্টু বলিল, "সেই টাকায় বাবুলালের জমীজমা কিন্‌লি? তা বেশ করেছিস, মুন্নু।"

হঠাৎ মুন্নু দাঁড়াইয়া উঠিয়া ভীত-চকিত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল, "ও কি ছোট্টুদা, ও কি? আগদেওতা কারে দয়া করল—কার ঘরকে—"

ছোট্টুও দাঁড়াইয়া উঠিয়াছিল। উভয়ে দৌড়িয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, নাতিদূরে এক পর্ণশালা দাউ দাউ জ্বলিয়া উঠিয়াছে—অগ্নিদেব ভীষণ মূর্ত্তি ধরিয়া সেই পল্লী ভস্মীভূত করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

ছোট্টু চীৎকার করিয়া উঠিল, "সত্যনাশ হ'ল! আরে বাপ রে, ও যে বুদ্ধুর ঘরের দিক—ঘরে বুড়ী কাণী আয়ী আর মালোরি ছাওয়াল—যাঃ, সব্বনাশ হ'ল!"

মুন্নু ততক্ষণ অগ্নিকাণ্ডের দিক লক্ষ্য করিয়া প্রাণপণে ছুট দিয়াছিল; ছোট্টুর সকল কথা শুনিবারও তাহার অবসর হয় নাই।

ছোট্টু যখন বুদ্ধুর কুটীরের সম্মুখে পৌছিল, তখন দেখিল, পল্লীর দুই তিনখানি গৃহ ভস্মীভূত হইয়াছে, ক্রুদ্ধ বৈশ্বানর রক্তের আস্বাদ পাইয়া দ্বিগুণ তেজে চটচটা রবে জ্বলিয়া উঠিয়াছে, বুদ্ধুর ঘরখানিও দাউ দাউ জ্বলিতেছে। পল্লী প্রায় জনশূন্য—সকলেই গ্রামে মনসার গান শুনিতে গিয়াছে। যে দুই চারি জন অসমর্থ ও অকর্ম্মণ্য লোক পল্লীতে ছিল, তাহারা অগ্নি-নির্ব্বাণের কোন চেষ্টা না করিয়া বুদ্ধুর কুটীরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া হাহুতাশ করিতেছে। ছোট্টু জিজ্ঞাসাবাদে জানিল, মুন্নু কাহারও নিষেধ না শুনিয়া, বন্য মহিষের মত গোঁভরে জ্বলন্ত কুটীরে প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু এ যাবৎ বাহির হইতে পারে নাই।

তাহাদের কথা শেষ হইতে না হইতেই ছোট্টু আতঙ্ক ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া দেখিল, সেই সপ্তজিহ্ব জাতবেদার লক্‌লক্ রসনার মধ্য হইতে উজ্জ্বল আলোকরেখামণ্ডিত হইয়া মুন্নু অসুরের মত অগ্নির সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে অঙ্কে বালককে ও স্কন্ধে বৃদ্ধাকে লইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে। সে-ও কুটীরের বাহিরে পদার্পণ করিয়াছে, অমনই কুটীরখানি আগুনে শেষ জ্বলিয়া উঠিয়া সশব্দে ধরাশায়ী হইল।

* * * *

সংজ্ঞাহীন মুন্নুকে যখন ছোট্টুর কুটীরে আনয়ন করা হইল, তখন আগুন-লাগার কথা চারি দিকে রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে ও দলে দলে গ্রামবাসীরা মনসাতলা হইতে পল্লীতে ছুটিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। বুদ্ধু যখন অন্যান্য অনেকের সহিত দুধিয়াকে লইয়া কুটীরে উপস্থিত হইল, তখন দুধিয়া কোনও দিকে না চাহিয়া ছুটিয়া গিয়া মুন্নুর বুকের উপর আছাড় খাইয়া পড়িল। সে যখন মুন্নুর অর্দ্ধদগ্ধ দেহ বুকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার কচি করুণকণ্ঠে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, তখন সে ঘরে কেহ অশ্রু সংবরণ করিতে পারিল না। কেবল এক জন সেখানে অশ্রুশূন্য নিষ্পলক দৃষ্টিতে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া সেই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিল—সে বুদ্ধু!

* * *

আজ গ্রামে মনসাপূজা হইতেও অধিক ধুম—আজ চৌকীদার বুদ্ধু ও ছোট্টুর ভগিনী দুধিয়ার বিবাহ। বুদ্ধু দুই হাতে পয়সা ছড়াইতেছে—কোন আমোদ, কোন পানভোজনের যেন ত্রুটি না হয়। দুই দিন হইতে 'হাঁড়িয়া' চলিতেছে, মহুয়ার 'মধু' আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে মাতাইয়া তুলিয়াছে। দুই দিন হইতে মাদলের বাদ্যে ও নৃত্য-গীতে পল্লী মুখর হইয়া উঠিয়াছে। সাঁওতাল নর-নারীর যেন অন্য কায নাই, বিবাহের আমোদে সকলেই গা ঢালিয়া দিয়াছে।

কেবল এক জন নির্জ্জনে আপন পর্ণকুটীরে বসিয়া

আছে—সে মুন্নু। তাহার শরীরের আসুরিক শক্তিই তাঁহাকে অগ্নিদাহের বিষময় ফল হইতে এ যাত্রা রক্ষা করিয়াছে। আর রক্ষা করিয়াছে বুদ্ধু ও হুধিয়ার অক্লান্ত সেবা। বস্তুতঃ চৌকীদার বুদ্ধু এবার তাহার যে সেবা করিয়াছে, তাহার তুলনা নাই। গ্রামের লোক অবাক্ হইয়া দেখিয়াছে, বুদ্ধু যেন আর পূর্ব্বের সে বুদ্ধু নাই, তাহার সহিত যে কোন কালে মুন্নুর মনোমালিন্য ছিল, এ কথা কেহ মনেও করিতে পারিতেছিল না। মুন্নুর শরীরের দাহজনিত ক্ষত প্রায় শুকাইয়া আসিয়াছিল। হুধিয়া বনে জঙ্গলে গিয়া কত রকম লতাপাতা আনিয়া তাহার প্রলেপ লাগাইয়া দিত, সে সব প্রলেপ আশ্চর্য্য ফলপ্রদ, সাঁওতাল ভিন্ন অন্য কেহ তাহার কথা জানিত না।

মুন্নু আরোগ্যলাভ করিবার পরে হুধিয়াকে তাহার কুটীরে এক দিনও দেখে নাই, তবে চৈতন্যলাভের পরে তাহাকে মাঝে মাঝে যেন অস্পষ্ট ছায়ার ন্যায় তাহার ঘরে চলাফিরা করিতে দেখিয়াছিল। আরোগ্যলাভের পরে সে কেবল শুনিয়াছিল, আর ৭ দিন পরে হুধিয়ার বিবাহ হইবে। সে তখন হুধিয়াকে দান করিবার যৌতুকের কথাটা আবার মনের মধ্যে তোলাপাড়া করিতেছিল।

হঠাৎ কাহার ডাকে সে মুখ তুলিল, দেখিল, সম্মুখে দাঁড়াইয়া বুদ্ধু। বুদ্ধু যে কখন্ নিঃশব্দপদসঞ্চারে তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা সে জানিতে পারে নাই।

শয্যাগ্রহণের পর এই দুই সপ্তাহে বুদ্ধুর প্রতি মুন্নুর মনের ভাব অনেকটা নরম হইয়াছিল। সে অপেক্ষাকৃত কোমলকণ্ঠে বলিল, "এস, ব'স।" আজ বিবাহের দিন প্রাতে হঠাৎ বুদ্ধু কেন তাহার ঘরে আসিল, এ কথাটা সে বুঝিতে পারিতেছিল না।

বুদ্ধু নিকটে আসিয়া বসিয়া মুন্নুর অঙ্গে হস্তাবমর্ষণ করিয়া বলিল, "মুন্নু, কেমন আছিস, ভাই?"

মুন্নু সরিয়া বসিয়া বলিল, "ভাল। তুই যা করেছিস্, বুদ্ধু, তোর দেনা শুধতে নারব।"

বুদ্ধু আরও কাছে সরিয়া গিয়া সাগ্রহে বলিল, "সত্যি বলছিস্, মুন্নু? তা হ'লে আমি তোর হাতে ধরিয়ে যা বল্‌ব, তা করবি বল্? না হ'লে আমার বড় কষ্ট হবে।"

মুন্নু বেশী কথার মানুষ ছিল না, তাহার কথায় উচ্ছ্বাসও ছিল না, সে কেবল বলিল, "কি করতে হবে, বল।"

বুদ্ধু সাহস পাইয়া বলিল, "বেশী কিছু না, কেবল আজ আমার সাদিতে যাবি—ঐ দেখ, ঐ তোর মুখখানা কাল হাঁড়ির তলা হইয়ে গেল!"

মুন্নু গম্ভীরস্বরে বলিল, "আমার এ কাঠের মত পোড়া শরীর নিয়ে সেখানে কি করব? তোরা আমোদ করবি, তার অন্দরে এ ভূতের চেহারা সবাইকে ভয় দেখাবে। হাঃ হাঃ!"

মুন্নুর হাসিতে প্রাণ ছিল না। বুদ্ধু তাহা বুঝিল। সে কাতর কোমল কণ্ঠে বলিল, "না মুন্নু, তোরে যেতেই হবে, সবাই আমোদ করবে, তুই একেলা ঘরে পড়িয়ে থাকবি?"

মুন্নু একটু বিরক্তির সুরে বলিল, "কেন, বুধিয়ারে সব লিখে দিয়ে যাচ্ছি, তাতেও তোদের মন উঠল না? ছোঃ!"

বুদ্ধু বলিল, "তোরে যেতে দিচ্ছে কে রে? আমিও না, হুধিয়াও না। চল ভাই। তুই না গেলে আমি সাদি করব না, হুধিয়াও করবে না।"

মুন্নু সক্রোধে বলিল, "এ তোদের কি জুলুম রে! আমি যাবেই না।"

বুদ্ধু তাহার হাত দুখানা ধরিয়া বলিল, "এই তুই কি বলি রে ভাই—আমার দেনা শুধবি না?"

মুন্নু মাথা হেঁট করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। ক্ষণপরে বলিল, "চল্, তোদের সাদি দেখবো।"

মহাজোড়ের তটে গ্রামের নর-নারী সমবেত হইয়াছে, মাদলের গুরুগম্ভীর গর্জ্জন দূর হইতে মেঘগর্জ্জনের মতই অনুমিত হইতেছে। মাদলের বাদ্যের সহিত বহু সাঁওতাল নরনারী তালে তালে নৃত্য করিতেছে—পুরুষরা যখন শ্রেণীবদ্ধ হইয়া তালে তালে পাদবিক্ষেপ করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে, তখন নারীরা শ্রেণীবদ্ধভাবে তালে তালে পাদবিক্ষেপ করিয়া পশ্চাদাবর্ত্তন করিতেছে, আবার পুরুষরা পশ্চাদাবর্ত্তন করিলে নারীরা অগ্রসর হইতেছে, এইরূপ অগ্রগমন ও পশ্চাদাবর্ত্তন অবিরাম চলিতেছে। তাহার সহিত নর-নারীর মিলিত কণ্ঠে "আরে আরে বঁধুয়া, বঁধুয়া, বঁধুয়া রে!" সঙ্গীত কি মিষ্টই শুনাইতেছে!

পল্লীর সকলেই উপস্থিত। এখনই মহাজোড়ে পূজা ও স্নান, তাহার পর বিবাহ। মহাজোড়ের পূজা-স্নান না হইলে বিবাহ হয় না। ছোট্টু ভগিনীকে বধূবেশে সজ্জিত করিয়া সকলের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া সঙ্গীত ও নৃত্যের আনন্দ উপভোগ করিতেছিল, কেবল বুদ্ধু এখনও বরবেশে উপস্থিত হয় নাই। সাঁওতাল প্রথানুযায়ী ভূতসিদ্ধি ও নাগসিদ্ধির আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়া আছে, এখনই মহাজোড়ে স্নানের ও মহাজোড়পূজার অনুষ্ঠানের কার্য্যারম্ভ হইবে। সকলেই আগ্রহের সহিত বরের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে।

অকস্মাৎ সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া বুদ্ধু মুন্নুকে লইয়া নদীতটে উপস্থিত হইল, তাহার অঙ্গে বরের পরিচ্ছদ শোভা পাইতেছিল না। মুন্নু এ বিবাহ-সভায় উপস্থিত থাকিবে না, এ কথা সকলেই জানিত, তাই মুন্নুকে দেখিয়া সকলে পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। একটা কিছু অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিবে বলিয়া কেহ কেহ আশঙ্কা করিল। মুন্নুকে দেখিবামাত্র ছুধিয়া জড়সড় হইয়া এক পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল।

বুদ্ধু কাহাকেও কথা কহিবার অবসর না দিয়া হাসিয়া বলিল—সে হাসিতে কি প্রাণ ছিল?—"এই যে সাদির যোগাড় সব ঠিক হ'ল। খালি বাকী মহাজোড়ের পূজা, দেওতার পূজা। ছুধিয়া! বল ত, ভূত-রাজার সামনে, বল ত নাগ-রাজার সামনে, বল ত এই মহাজোড়ের সামনে, কারে সাদি করতে তোর দিল চাইছে?"

সকলে বিস্ময়ে অবাক্। ছোট্টু কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু বুদ্ধু তাহাকে বাধা দিয়া নতবদনা আরক্তমুখী ছুধিয়ার দিকে চাহিয়া আবার বলিল, "বলবি না, সরম লাগছে, না রে! আচ্ছা, মুন্নু, তুই বল ত ভাই, ছুধিয়া কারে চায়? তুই তারে চাস কি না? বল, এই মহাজোড়ের জল ছুঁয়ে।"

মুন্নুও অধোবদনে নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল। আজ যেন বুদ্ধু দিন পাইয়াছে, সে হাসিয়া বলিল, "তুইও বলবি না? বেশ, তা হ'লে আমার যা বলবার, শোন্। এই মহাজোড় সাক্ষী, তুই ছুধিয়ারে পেয়ার করিস, তাই জমীজমা, গরু, ছাগল যতুক দিয়ে'ছস। আমিও ছুধিয়ারে পেয়ার করি, তাই তোরে তার হাতে যতুক দিচ্ছি। নে ছুধিয়া যতুক! ওরে, দে মাদলে ঘা।" বুদ্ধু এই কথা বলিয়া মুন্নুকে এক হস্তে এবং অপর হস্তে ছুধিয়াকে ধরিয়া মহাজোড়ের শীতল ক্রোড়ে ধীরে ধীরে অবতরণ করিল এবং উভয়ের হস্ত একত্র করিয়া মহাজোড়ের খরস্রোতের মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া অবিকম্পিত ধীরস্বরে বলিল, "মহাজোড় তোদের সুখে রাখুক, তোরা সুখে থাক—আমি দেখব আর সুখ পাব।"

মুন্নুর চোখ দিয়া ঝরঝরধারে অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছিল, মহাজোড়ে সেই অপূর্ব্ব বিবাহসভার কাহারও নয়ন অনার্দ্র রহিল না।

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।

# সার্থকতা

কুমার ধনীর পূজা-মণ্ডপে
দুর্গা-প্রতিমা গড়ে,
চাহিয়া রয়েছে নিঃস্ব ভক্ত
গণ্ডে অশ্রু ঝরে।

মনে মনে দেয় শত-ধিকার
অদৃষ্টে নিজ—কহে বার বার—
এলি নাক শুধু জননী আমার
এ দীনের কুঁড়ে-ঘরে।

সহসা আকাশ-সম্ভবা বাণী
কর্ণে পশিল তার,
স্তম্ভিত হয়ে শুনিল ভক্ত—
নয়নে অশ্রু-ধার।

দেশ-জননীর প্রতিমাটি আজ
গ'ড়ে তোল্ মনোমন্দিরমাঝ,
হেরিবি সেখানে পূর্ণ-বিকাশ
আমারি [illegible] আত্মার!

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়, বি, এ।

# সহধর্ম্মিণী

## ১

হরিনারায়ণ চৌধুরীর পুত্র বিমলকুমারের সহিত যখন অনুপমার বিবাহ স্থির হইয়া গেল, তখন প্রতিবেশিমহলে বিশেষ চাঞ্চল্য দেখা গেল। কেমন করিয়া ইহা সম্ভবপর হইল, সে সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা চলিতে লাগিল। বৎসরখানিক পূর্ব্বে যে হরিনারায়ণ নগদ ও অলঙ্কারে দশ সহস্র মুদ্রা না পাইলে কিছুতেই পুত্রের বিবাহ দিবেন না বলিয়া কোট করিয়া বসিয়াছিলেন, সেই হরিনারায়ণ আজ শুধু শাঁখা হাতে অনুপমাকে পুত্র-বধূরূপে বরণ করিয়া লইয়া যাইতেছেন। ইহা কি কম বিস্ময়ের কথা! কেহ বলিল, "নিশ্চয়ই ছেলের বিষম গলদ বার হয়ে পড়েছে, দু'দিন পরে তা জানা যাবে।" কেহ বলিল, "ছেলেটির চরিত্র-দোষ আছে।" কেহ বলিল, "কোন রকম কুৎসিত ব্যাধি আছে।" কেহ বলিল, "শুধু কুৎসিত নয়, মারাত্মক ব্যাধিই আছে।" ক্রমাগত এই ভাবেরই আলোচনা চলিতে লাগিল। এক জন সহৃদয় প্রতিবেশী বলিল, "যে যার ভাগ্য নিয়ে আসে, মেয়েটি সেই রকম বরাত নিয়ে এসেছে, তাই এমন ঘরে বরে তার বিয়ে হচ্ছে।" এ কথার আর কেহ জবাব দিল না বটে, কিন্তু সকলের মুখই অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া রহিল।

যথাসময়ে বিমলকুমারের সহিত অনুপমার বিবাহ হইয়া গেল। বর দেখিয়া অনেকেই হাসিমুখে কানাকানি করিতে লাগিল,—"আগেই বলেছিলাম ত, এই রকম না হয়ে যায়!" বিবাহের পর এক জন দুঃখপ্রকাশচ্ছলে অনুপমার পিতাকে বলিল, "কি করলে ভায়া, একটা ঘাটের মড়া ধ'রে মেয়েটার বিয়ে দিলে। ছেলেটাকে বুঝি একবার চোখেও দেখ নি!" অনুপমার পিতা কপালে হাত ঠেকাইয়া বলিলেন, "অদৃষ্ট! কি করব।"

কথাটা অনুপমার জননীর কানে আসিয়া পৌঁছিল। তিনি নির্জ্জনে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অনুপমা তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া বসিয়া বলিল, "মা, তুমি অমন ক'রে কাঁদছ কেন?" জননী কন্যার মুখের দিকে চাহিতে পারিলেন না, আরও উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কন্যা সস্নেহে জননীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "আজ শুভ দিন, চোখের জল ফেল্‌তে নেই, মা, এতে যে আমার অমঙ্গল হবে, মা।" জননী শিহরিয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি অঞ্চলপ্রান্তে চোখের জল মুছিয়া ফেলিলেন। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে অতিবাহিত হইবার পর অনুপমা বলিল, "একটা কিছু দোষ না থাকলে তোমার মেয়েকে ওঁরা নেবেন কেন, মা, আমি ত এমন কিছু সুন্দরীও নই,—চার বছর চেষ্টা ক'রে দেখলে ত মা, শুধু হাতে কেউ কি তোমার মেয়েকে ঘরে নিয়ে যেতে রাজি হ'ল? এঁরা যে দয়া ক'রে আমায় নিয়েছেন, এই যথেষ্ট নয় কি, মা?"

সম্প্রদান পর্য্যন্ত বিমলের জ্বরটা কোন রকমে চাপা ছিল, কিন্তু বাসরঘরে তাহাকে লইয়া যখন বসান হইল, তখন জ্বরে সে কাঁপিতেছিল, বসিতে আর পারে না, তবুও সে জোর করিয়া বসিয়াছিল। অনুপমা তাহা লক্ষ্য করিয়া তাহারই এক বাল্যসখীকে চুপি চুপি বলিল, "দেখছ না, উনি কি রকম জ্বরে কাঁপছেন, তুমি ভাই সবাইকে এ ঘর থেকে ডেকে নিয়ে যাও, উনি লজ্জায় শুতে পারছেন না, ভারী কষ্ট হচ্ছে ওঁর।" বাল্যসখী তাহার মুখের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল, মনে মনে বলিল,—"অ্যাঁ, এ বলে কি! বিয়ের কনেকে ত এমন কথা কেউ কখনও বল্‌তে শুনি নি। আমাদেরও ত বিয়ে হয়েছে, আমরা বরের সাম্‌নে মুখ তুলেই বস্‌তে পারি নি!" প্রকাশ্যে সে বলিল, "ধন্যি মেয়ে তুমি, ভাই,—" সে আরও কি বলিতে যাইতেছিল, অনুপমা তাহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া অনুনয়ের

স্বরে বলিল, "আজকে তোমাদের একটা আমোদের দিন, তা আমি জানি, যদি ভগবান্ দিন দেন, আর এক দিন এর শোধ নিও; আজকে ওঁকে রেহাই দাও। একে এই কাহিল শরীর, তার ওপর জ্বর এসেছে, ওঁর সত্যিই ভারী কষ্ট হচ্ছে।" বাল্যসখীটি আর কিছু না বলিয়া অপর সকলকে ডাকিয়া লইয়া বাসরঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

এইবার অনুপমা স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল, "তোমার ভারী কষ্ট হচ্ছে, তুমি শোও।"

বিমলের তখন বসিয়া থাকিতে সত্যই অত্যন্ত কষ্ট হইতেছিল, শুইতে পারিলেই সে বাঁচে। কিন্তু অনুপমার এই কল্পনাতীত ব্যবহারে ও কথায় সে এতই মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল যে, যন্ত্রণার কথা সে মুহূর্ত্তের জন্য ভুলিয়া গেল এবং অনুপমার মুখের দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া তেমনই ভাবে বসিয়া রহিল।

অনুপমা বলিল, "ব'সে রইলে কেন, শোও!"

বিমল নিঃশব্দে শয়ন করিল।

বাহিরে তখনও কৌতূহলী প্রতিবেশীদের দল মজা দেখিবার জন্য জানালার ধারে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, অনুপমা তাহা বুঝিয়াও সে দিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র করিল না। সে স্বামীর শিয়রের আরও নিকটে সরিয়া বসিয়া তাহার কপালে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। জানালার পাশ হইতে চাপা হাসির শব্দ তাহার কানে আসিয়া বাজিতে লাগিল, সে তাহার কর্ত্তব্যে অচল অটল হইয়া রহিল।

এক জন আর থাকিতে পারিল না, বলিয়া বসিল, "নিশ্চয়ই বিয়ের আগে থেকেই দু'জনের ভাবসাব ছিল, না হ'লে কি কখনও এমন হয়? অসুখ-বিসুখ কিছু নয়, আমাদের তাড়াবার ফন্দী।"

অনুপমার মনে হইল, কথাটা সত্য, ইঁহার সহিত যেন তাহার কত দিনের পরিচয়।

প্রায় শেষরাত্রিতে বিমলের জ্বরটা যখন কম পড়িল, সে চাহিয়া দেখিল, অনুপমা তখনও তাহার শিয়রের কাছে বসিয়া আছে। বিহ্বলকণ্ঠে সে বলিল, "তুমি সেই অবধি ঠায় ব'সে আছ; শোও নি?"

অনুপমা বলিল, "তোমার এই রকম অবস্থা দেখে আমি শুতে পারি?"

বিমল ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিল, "তোমায় তা হ'লে ত ভারী কষ্ট দিয়েছি।"

অনুপমা বলিল, "আমার একটুও কষ্ট হয় নি। তা ছাড়া জ্বর আসা না আসা আর ত তোমার ইচ্ছের উপর নির্ভর করে না। আজ থেকে ত তোমার সেবার ভার আমাকেই নিতে হবে, তাই প্রথম দিন থেকেই অভ্যাস ক'রে নেওয়া ভাল। এখন তুমি কি অনেকটা সুস্থ বোধ করছ?"

শুধু ছোট একটি "হ্যাঁ" বলিয়া বিমল চুপ করিল। অনেকগুলি কথা একসঙ্গে আসিয়া তাহার মনের দুয়ারে ঘা দিতে লাগিল। এক বৎসরের উপর ক্রমান্বয়ে জ্বরে ভুগিয়া ভুগিয়া সে একেবারে কঙ্কালসার হইয়া গিয়াছে। দেহের এই অবস্থায়ও সে কেবল পিতা-মাতার আগ্রহাতিশয্যে বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছে। কে এক জন জ্যোতিষী না কি কয়েকটি লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া তাহার পিতাকে বলিয়াছে, ঐ সব-লক্ষণযুক্তা কন্যার সহিত বিবাহ দিতে পারিলে তাহার পুত্র নিরাময় হইয়া উঠিবে। প্রথমে পিতা ধনীর গৃহেই পাত্রীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু এইরূপ রুগ্ন পাত্রের সহিত কোন্ ধনী তাহার কন্যার বিবাহ দিবে? পিতাকে দুই এক যায়গায় অপমানিত হইয়াও ফিরিতে হইল। হতাশ হইয়া তিনি দরিদ্রের কুটীরেই পাত্রীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অবশেষে সর্ব্ব-সুলক্ষণযুক্তা অনুপমার সন্ধান পাইয়া সেই দিনই বিবাহ পাকাপাকি করিয়া ফেলিলেন। আজ বিমলের মনে হইল, মরণপথযাত্রী সে কেন এমন কায করিল? কেন সে এই সর্ব্বসুলক্ষণযুক্তা বহুগুণসম্পন্না নিরপরাধা বালিকার সর্ব্বনাশসাধন করিল? তাহার রোগজীর্ণ অস্থি-পঞ্জর ভেদ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল।

সে নিশ্বাসের শব্দ অনুপমার অন্তরে আসিয়া বাজিল। ব্যথা চাপিয়া সে বলিল, "জ্বর হয়েছে, সেরে যাবে, তার জন্য ভাবনা কি? এমন কত লোক দু'চার-বছর জ্বরে ভোগে, আবার সেরে উঠে।"

বিমল তেমনই নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল, কোন উত্তর দিল না। খানিক পরে হঠাৎ অনুপমার দুইখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, "ভগবান্ তোমার কথা

শুন্‌বেন, তাঁর কাছে প্রার্থনা কর, আমি যেন সেরে উঠি। না হ'লে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই।"

উচ্ছ্বসিত হইয়া অনুপমা বলিল, "ওগো কেন তুমি ও কথা ভেবে নিজের মনকে কষ্ট দিচ্ছ? দরিদ্র পিতামাতার ঘরে জন্মালেও তোমাকে যে আমার পেতেই হবে; তাই ত ভগবান্ তোমার দেহে ব্যাধির সৃষ্টি ক'রে তোমায় পাবার পথ আমার মুক্ত ক'রে দিয়েছেন!"

বিবাহের মন্ত্রের অত্যদ্ভুত শক্তির কথা ভাবিয়া বিমল মোহাবিষ্টের মত পড়িয়া রহিল।

## ২

তাহার পর মাস ছয় অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। বিবাহের পূর্ব্বে জ্বরটা ছাড়িয়া ছাড়িয়া হইত এবং বিবাহের পর একটা মাস বিমলের জ্বর একেবারে ছাড়িয়া গেল বটে, কিন্তু তাহার পর জ্বরটা স্থায়িভাবে বিমলের দেহে জাঁকিয়া বসিল। চিকিৎসার কোন ত্রুটি হইল না, বড় বড় ডাক্তার কবিরাজ কেহই বড় আর বাকী রহিল না, কিন্তু বিষম জ্বর কিছুতেই বাগ মানিতে চাহিল না। রক্তপরীক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া যাবতীয় পরীক্ষাই শেষ হইয়া গেল, জ্বরের কোন কারণই ধরা পড়িল না। এক এক জন চিকিৎসক এক একটি রোগ অনুমান করিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া যাইতে লাগিলেন, এই পর্য্যন্ত, কিন্তু সমস্ত ঔষধকে ব্যর্থ করিয়া জ্বর সমভাবে দেহের উপর বিরাজ করিতে লাগিল। শেষে চিকিৎসকরা একযোগে মত প্রকাশ করিলেন, "ইহা থাইসিসেরই পূর্ব্বলক্ষণ, ঔষধ চলুক, তবে বায়ুপরিবর্ত্তন এখনই করিতে হইবে। ঔষধ ও বায়ু একত্র ক্রিয়া করিলে রোগ উপশম হইতে পারে।" চিকিৎসকরা গোপনে আর একটি পরামর্শ দিয়া গেলেন, স্ত্রীকে যেন কিছুতেই কাছে রাখা না হয়।

সত্বরই সে কথা অনুপমার কর্ণগোচর হইল। অনুপমা শ্বশ্রূমাতার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল, "ডাক্তার-কবিরাজরা যাই বলুন, আমি যাব, মা। আমার স্বামীর ভালমন্দ কিসে হয়, আমি তা যত বুঝব, ডাক্তার কবিরাজরা বাইরের লোক, তাঁরা তার কি বুঝবেন, আমি তাঁদের কথা শুন্‌ব না, মা, আমি যাবই।"

শ্বশ্রূ বধূকে কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া অনেক করিয়া বুঝাইলেন, কিন্তু অনুপমা তাহার সঙ্কল্পে অচল অটল হইয়া রহিল। এখনও যাত্রার দিন তিনেক বাকী, তাই শ্বশ্রূ আপাততঃ আর কিছু বলিলেন না। কিন্তু যাত্রার দিন অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্বে যখন তিনি জানাইলেন, অনুপমার যাওয়া হইবে না, তখন অনুপমা কাঁদিয়া কাটিয়া কোন গোল বাধাইল না, বেশ সহজ শান্তভাবে বলিল, "আমায় যে যেতেই হবে, মা।" একটু থামিয়া সে আবার বলিল, "মা, কথাটা খুব শক্ত হবে, কিন্তু আপনারা আমায় বলতে বাধ্য করছেন, মা, ডাক্তার-কবিরাজরা যে অসুখের কথা বলছেন, সে অসুখ যদি সত্যই হয়ে থাকে, তা হ'লে রক্ষার আশা খুবই কম, এ ত জানেন মা, তখন জেনে শুনে সে কটা দিনই বা কেন সবাই মিলে আমায় স্বামি-সেবা থেকে বঞ্চিত করবেন!" তাহার কথা শুনিয়া শ্বশ্রূ একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন।

খানিক পরে বিমলকে ধরাধরি করিয়া যখন মোটরের উপর বসাইয়া দেওয়া হইল, অনুপমা ধীরপাদবিক্ষেপে মোটরে উঠিয়া তাহার পার্শ্বে গিয়া উপবেশন করিল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কেহ কোন কথা বলিতে পারিল না।

নূতন যায়গায় যাইবার তিন দিন পরেই বিমলের জ্বরটা ছাড়িয়া গেল। যখন পনর দিন জ্বর হইল না, বিমলও দেহে একটু বল পাইল, তখন সকলেরই মন বেশ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

সম্মুখে শারদীয়া পূজা, প্রতি বৎসরই খুব ধুমধাম করিয়া মায়ের পূজা হইয়া থাকে, কিন্তু বিমলের জন্য হরিনারায়ণ এতই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, এবার কোন রকমে পূজাটা সারিয়া ফেলিবারই সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। এইবার পুত্র কতকটা সুস্থ হইয়া উঠায়, তিনি উৎসাহভরে গৃহিণীকে বলিলেন, "আর ক'টা দিন যদি বিমলের এই অবস্থায় কেটে যায়, তা হ'লে আরও ঘটা ক'রে এবার মা'র পূজা করতে হবে, কি বল?"

গৃহিণী বলিলেন, "তা ত করতেই হবে। সত্যই আমাদের ওপর মা'র যথেষ্ট কৃপা, তাঁর কৃপা না হ'লে কি সাক্ষাৎ লক্ষ্মীকে আমরা পুত্রবধূরূপে পেতাম! এমন নিশ্চিন্ত হাসিমুখে আর কাউকে কখনও সেবা করতে দেখি নি।"

হরিনারায়ণ উজ্জ্বলমুখে বলিলেন, "বৌমা আমার সতী

লক্ষ্মী বটে! এঁকে ঘরে এনে বাঁধতে না পারলে আমরা বিমলকে ফিরিয়ে পেতাম না।”

তাহার পর আরও চারিটা দিন অতিবাহিত হইয়া গেল। সে দিন অপরাহ্নে বিমল বাড়ীর সংলগ্ন পরিচ্ছন্ন মাঠের উপর পায়চারী করিয়া বেড়াইতেছিল। অনুপমাও তাহার সঙ্গে ছিল, সে সব সময় স্বামীর কাছে কাছেই থাকিত।

বিমল বলিল, “অনু, তুমি তা হ’লে আমায় এ যাত্রা বাঁচিয়ে তুললে। তোমাকে না পেলে অনেক আগেই আমি চ’লে যেতাম, কেউ ধ’রে রাখতে পার্‌ত না।”

অনুপমা বলিল, “তুমি কি চ’লে যেতে পার! আমি যে সাবিত্রী-ব্রত আরম্ভ করেছি—তা কি কখনও নিষ্ফল হ’তে পারে!”

বিমল হাসিয়া বলিল, “ব্রত করলে যে কোন ফল হয়, এ বিশ্বাস আমার কোন দিন ছিল না, কিন্তু তুমি দেখছি, অনু, আমার অনেক বিশ্বাসই উল্টে দিয়েছ! যাক্, দেখ অনু, পূজোর সময় আমি কখনও বাড়ী-ছাড়া হয়ে থাকি নি, এখনও ত পূজোর মাসখানিক দেরী আছে, তত দিনে আমি ঠিক যেতে পারব, কি বল, অনু!”

অনুপমা উৎসাহভরে বলিল, “খুব পারবে, মা’র পূজোর ক’টা দিন তোমায় বাড়ীতে থাক্‌তেই হবে।”

### ৩

সেই রাত্রিতেই বিমল আবার প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইল, এত বেশী জ্বর পূর্ব্বে কোন দিন হয় নাই। সকলে উদ্বিগ্ন হইয়া রাত্রিটা কোন রকমে কাটাইয়া দিল। স্থানীয় যে প্রবীণ চিকিৎসক প্রতিদিন দুই বেলা আসিয়া বিমলকে দেখিয়া যাইতেন, সংবাদ পাইয়া তিনি প্রত্যূষেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রোগীকে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া বলিলেন, “এ সে জ্বর নয়, নূতন জ্বর; এর জন্য কিছু ভাববেন না। বোধ হয়, কোন রকম অনিয়ম বা অত্যাচার হয়েছে; যাক্, এখনই ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি, খাওয়ালেই জ্বরটা যাবে’খন।”

ডাক্তারবাবুর মুখে অনিয়ম-অত্যাচারের কথা শুনিয়া অনুপমা ভিতরে ভিতরে শিহরিয়া উঠিল এবং তাহার মুখ একেবারে বিবর্ণ পাণ্ডুর হইয়া গেল। ঘৃণায় তাহার মরিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল। সে যে এক দিন বড় মুখ করিয়া শ্বশ্রূকে বলিয়াছিল—‘আমার স্বামীর ভাল-মন্দ কিসে হয়, আমি তা যত বুঝব, ডাক্তার-কবিরাজরা বাইরের লোক, তাঁরা তার কি বুঝবেন?’ তাহার সে মুখে এমনই করিয়া কালী পড়িল, এমনই ভাবে তাহার সে দর্প চূর্ণ হইয়া গেল! এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাহাকে করিতেই হইবে, না হইলে তাহার স্বামীকে ফিরিয়া পাইবার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাইবে। তাহার সারাদেহ মুহুর্মুহুঃ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল।

ঔষধ সেবন করিয়া বিমলের জ্বরটা সেই দিনই কমিয়া গেল বটে, কিন্তু একেবারে ছাড়িল না। সকলে মনে করিল, দুই তিন দিনের মধ্যে জ্বরটা ছাড়িয়া যাইবে, কিন্তু সপ্তাহখানিক কাটিয়া গেল, জ্বর ছাড়িল না, প্রতিদিনই একটু একটু করিয়া জ্বর হইতে লাগিল। অনুপমা এত দিন হাসিমুখে স্বামীর সেবা করিয়া আসিতেছিল, কিন্তু এইবার তাহার সে মুখের হাসি মিলাইয়া গেল। তাহারই অপরাধের ফলে তাহার স্বামীর যে এই অবস্থা, এই কথাটি অহরহঃ অতি নিদারুণভাবে তাহার ধিকৃত অন্তরকে পীড়ন করিতেছিল এবং তাহাকে কেবলই স্মরণ করাইয়া দিতেছিল, একটা কঠোর প্রায়শ্চিত্ত চাই।”

দেখিতে দেখিতে পূজা আসিয়া উপস্থিত হইল। সপ্তাহখানিক মাত্র বাকী। বিমল শয্যা গ্রহণ না করিলেও জ্বরটা সব সময় তাহার দেহে লাগিয়াই থাকিত। সকলেই মনে মনে বুঝিল, ইহা অত্যন্ত মন্দ লক্ষণ। চিকিৎসকরাও শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন! হরিনারায়ণও কোন রকমে পূজা সারিবার সঙ্কল্প করিলেন। অনুপমা তাহার শ্বশ্রূর পদপ্রান্তে বসিয়া বলিল, “মা, আমি যে সঙ্কল্প করেছি, এবার ঘটা ক’রে মা’র পূজোর আয়োজন করব; পূজোর সময় উনি কোন দিন বাড়ীর বাইরে থাকেন নি, এবারও ওঁকে আমরা বাড়ীর বাইরে রাখব না মা। আপনি বাবাকে ব’লে আমাদের সবাইয়ের যাবার ব্যবস্থা ক’রে দিন, মা।”

হরিনারায়ণ কথাটা শুনিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া ভাবিলেন, শেষে চিকিৎসকের সহিত পরামর্শ করিয়া বিমলকে দেশে লইয়া যাওয়াই স্থির করিলেন।

বহু দিন পরে আবার অনুপমার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল।

পঞ্চমীর দিন হরিনারায়ণ সপরিবারে পল্লীভবনে গিয়া পৌঁছিলেন। বিমলের জন্য সকলে বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন, পথের কষ্টে জ্বরটা যদি বাড়িয়া যায়, বিমল যদি অবসন্ন হইয়া পড়ে! কিন্তু গৃহে পৌঁছিয়া বিমলকে অনেকটা সুস্থই দেখা গেল। জনক-জননী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। অনুপমা নির্জ্জনে দাঁড়াইয়া মা আনন্দময়ীর উদ্দেশে বারংবার গভীর ভক্তি-ভরে প্রণাম করিতে লাগিল।

সপ্তমীর দিন বিমল অনুপমাকে বলিল, "এখানে এসে শরীরটা আমার বেশ ভাল বোধ হচ্ছে। জ্বরের কোন গ্লানিই টের পাচ্ছি না, জ্বরটা বোধ হয় ছেড়ে গেছে, এক বার দেখ ত!"

অনুপমা বলিল, "আজ আর দেখে কায নেই। জ্বর ছেড়ে যাবে বৈ কি! পরশু সকাল থেকে তুমি একেবারে সুস্থ হয়ে উঠবে।"

বিমল বলিল, "আমারও যেন তাই মনে হচ্ছে, অনু।"

পরদিন মহা অষ্টমীর বলির অব্যবহিত পূর্ব্বে অনুপমা যখন বুক চিরিয়া সরায় রক্ত ধরিয়া মা দশভুজার সম্মুখে রাখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মা'র আরাধনায় বসিল, তখন কোলাহল-মুখরিত চণ্ডীমণ্ডপ সহসা নিস্তব্ধ হইয়া গেল। ক্ষণকাল পরে সমস্ত স্থানটি প্রকম্পিত করিয়া বলির বাজনা বাজিয়া উঠিল। অনুপমা তেমনই ধ্যানস্তিমিতলোচনে বসিয়া রহিল।

তাহার পর দুই মাস অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। বিমল দিন দিন সুস্থ হইয়া উঠিতেছে। ডাক্তার-কবিরাজরা নানা রকম করিয়া তাহার দেহ পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন, "দেহে রোগ কিছু নাই বটে, কিন্তু আরও এক বৎসর বিশেষ সাবধান হইয়া থাকিতে হইবে। সামান্য অনিয়ম বা অত্যাচারে পুনরাক্রমণের বিশেষ সম্ভাবনা। এই একটা বছর কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করাই সমীচীন।"

চিকিৎসকগণের পরামর্শ অনুযায়ী সমস্ত ব্যবস্থাই হইল। কেবল একটি বিষয়ে হরিনারায়ণ তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিলেন। তাঁহারা অনুপমাকে পিত্রালয়ে পাঠাইবার ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা না করিয়া বিমলের সেবা যত্নের সমস্ত ভারই হরিনারায়ণ নিঃসঙ্কোচে সেই পুত্র-বধূরই উপর সমর্পণ করিলেন। অন্য লোক যাহাই ভাবুক, তিনি জানিতেন, এই লক্ষ্মীর কৃপায়ই তিনি পুত্রকে ফিরাইয়া পাইয়াছেন।

## ৪

নূতন যায়গায় আসিবার মাসখানিক পরে বিমল অনুপমাকে বলিল, "সত্যি, অনু, এখানে আসার পর থেকে তুমি যেন কেমন এক রকম হয়ে গেছ, আমার সেবাযত্ন সবই কর, তবু তুমি সব সময় আমার কাছ থেকে দূরে দূরে থাক।"

অনুপমা হাসিয়া বলিল, "তুমি ত বেশ কথা বল্‌ছ—সেবা-যত্ন কি দূরে থেকে করা যায়! সেবা-যত্ন করতে হলেই ত সব সময় কাছে কাছে থাকতে হয়।"

বিমল তেমনই গম্ভীরভাবে বলিল, "কথাটা তুমি মিথ্যে চাপা দেবার চেষ্টা করছ,—তুমি এমনই ভাবে আমার সেবাযত্ন কর, যেন তুমি মাইনে-করা নার্স।"

অনুপমা আবার হাসিয়া বলিল, "নার্সগিরি কখনও করি নি, নার্সের কাযের মর্ম্ম বুঝব কোত্থেকে! তা ছাড়া গরীবের ঘরে জন্মেছি, নার্স দেখবার সৌভাগ্য ত কখনও হয় নি। অথচ তুমি—"

বিমল বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "তোমার ও সব কথা আমি শুনতে চাই না; ক'দিন থেকেই আমি লক্ষ্য ক'রে আস্‌ছি, তোমাকে কিছু বল্‌তে গেলেই তুমি তার উল্টো উল্টো জবাব দাও। আমার এ ভাল লাগে না।"

অনুপমা সহসা গম্ভীর হইয়া বলিল, "বেশ, ভাল না লাগে, আমায় বিদেয় ক'রে দাও।"

বিমল দুঃখিত হইয়া বলিল, "আমি কি তাই বল্‌ছি না কি, এ রকম কথা বলা তোমার ভারী অন্যায়।" এই বলিয়া সে অগ্রসর হইয়া আসিয়া অনুপমার হাত ধরিল এবং অন্য হস্তে তাহার গলদেশ বেষ্টন করিয়া ধরিয়া মুখচুম্বন করিয়া বলিল, "আর অমন কথা কিন্তু বল্‌তে পারবে না।"

ক্ষণকালের জন্য আত্মবিস্মৃত হইয়া অনুপমা স্বামীর কাঁধের উপর মাথা রাখিল। তাহার পর সহসা নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া ছুটিয়া কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

পরদিন বিমলের আহ্বানে অনুপমা যখন বিমলের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইল, তখন তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বিমল যতখানি বিস্মিত হইল, তাহার অপেক্ষা অনেক অধিক ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। কাল অনুপমার সহিত বিমলের যখন দেখা হইয়াছিল, অনুপমার সমস্ত মুখ হাসিতে ভরিয়া ছিল এবং প্রতিদিনই সে এমনই হাসিমুখেই বিমলের সব কায করিত, ফাই-ফরমাস খাটিত। হঠাৎ বিমলের একবার মনে হইল, হয় ত অনুপমার কোন অসুখ করিয়া থাকিবে। তাহার উপর ক্রুদ্ধ হওয়া তাহার উচিত হয় নাই। তাই কুণ্ঠিতভাবে সে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কি আজ শরীরটা ভাল নেই, অনু?"

অনুপমা বলিল, "অসুখ করবে কেন? আমি বেশ ভালই আছি। কিন্তু তুমি কি জন্য ডেকেছ?"

বিমল ব্যথিত স্বরে বলিল, "শুধু শুধু কি ডাকতে নেই, অনু?"

অনুপমা বলিল, "না, যখন তখন এমন ক'রে আর ডেক না। এখন তুমি ভাল হয়ে উঠেছ, তোমার না লজ্জা করতে পারে, কিন্তু আমার করে।" এই বলিয়া সে চলিয়া গেল।

বিমলের সর্ব্বশরীর ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। অনুপমার এইরূপ আচরণ তাহার নিকট অত্যন্ত গর্হিত বলিয়াই বোধ হইল। আজ যেমন করিয়া হউক, ইহার একটা কৈফিয়ৎ সে লইবেই।

সেই দিন মধ্যাহ্নে স্বামি-স্ত্রীতে অনেক কথা-কাটাকাটির পর শেষে রীতিমত কলহ হইয়া গেল। অনুপমা বিমলকে স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিল যে, আজ হইতে বিমল যেন তাহাকে নার্স ব্যতীত অন্যভাবে না দেখে। সে যে তাহার স্ত্রী, এ কথা সে যেন ভুলিয়া যায়, অন্যথা সেবার ভার অন্য কাহারও উপর দিয়া সে পিতৃগৃহে চলিয়া যাইবে।

বিমল খানিকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর রোষকম্পিতকণ্ঠে বলিল, "বটে, এতদূর! বেশ, আজ থেকে আমিও তোমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখব না। নার্স রাখবার আমার কোন প্রয়োজন নেই, আমি মাকে বলব, তিনি নার্সকে যেন এখনই বিদায় ক'রে দেন।"

অনুপমা বলিল, "বেশ, সেই ভাল।" এই বলিয়া সে তাহার শ্বশ্রূর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "মা, আমায় বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিন।"

শ্বশ্রূ স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "বাপমা'র জন্যে মন কেমন কচ্ছে বুঝি! তা করবারই কথা, সেই বিয়ের কনে এসেছ, আর ত যাও নি। আচ্ছা, ওঁকে বলব'খন।"

হরিনারায়ণ কিন্তু কিছুতেই এ সময় অনুপমাকে পিতৃগৃহে পাঠাইতে রাজি হইলেন না। তিনি বলিলেন, "বৌমা গেলে বিমলকে দেখবে কে? এমন সেবাযত্ন কি আর কেউ করতে পারবে? দেশে ফিরে বৌমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দেব। এখন না।"

অনুপমা কিন্তু একেবারে কোট করিয়া বসিল, সে যাইবেই। তাহার শ্বশুর-শাশুড়ী অনেক বুঝাইয়াও যখন কিছুতেই তাহার মন ফিরাইতে পারিলেন না, তখন হরিনারায়ণ রুক্ষকণ্ঠে পত্নীকে বলিলেন, "তুমি বৌমাকে ব'লে দাও, তা হ'লে এই যাওয়াই তার শেষ যাওয়া হবে, এ বাড়ীতে আর তার যায়গা হবে না।" তিনি মনে করিয়াছিলেন, এত বড় কথার পর অনুপমা আর বাপের বাড়ী যাইবার নাম মুখে আনিবে না, কিন্তু তিনি ভুল বুঝিলেন।

তিনি কেমন করিয়া বুঝিবেন, নারী-জীবনের 'শ্রেষ্ঠ-তীর্থে' পুণ্য সঞ্চয়ের অধিকার হইতে চিরজীবনের জন্য বঞ্চিত হইতে হইলেও যে, অনুপমাকে যাইতে হইবে, সে যে নিজের উপর তাহার বিশ্বাস হারাইয়াছে। নিজেকে সে যে আর বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না।

কথাটা শুনিয়া অনুপমা বেশ ধীর শান্তভাবেই বলিল, "এই শাস্তিই যদি বাবা আমার বিধান ক'রে থাকেন, তাই মাথা পেতে নেব, আমায় যে যেতেই হবে, মা।"

এইবার হরিনারায়ণ একেবারে রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলিলেন, "গরীবের মেয়ের বরাতে রাজরাণী হওয়া সইবে কেন,—চিরদিনের জন্য বাপের কুঁড়েতে প'ড়ে থাকবার ব্যবস্থাই ক'রে দেব, এমন বৌ ঘরের কলঙ্ক! এখনই ওকে বিদেয় ক'রে দাও।"

হায় হরিনারায়ণ! তুমি যদি বুঝিতে, যৌবনের অসংযম হইতে ক্রমশঃ রোগমুক্ত স্বামীকে রক্ষা করিবার জন্য তরুণী পত্নী কি অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার করিতেছে, তাহা হইলে তুমি এমন কথা মুখে আনিতে পারিতে না।

শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল।

# রূপের মোহ

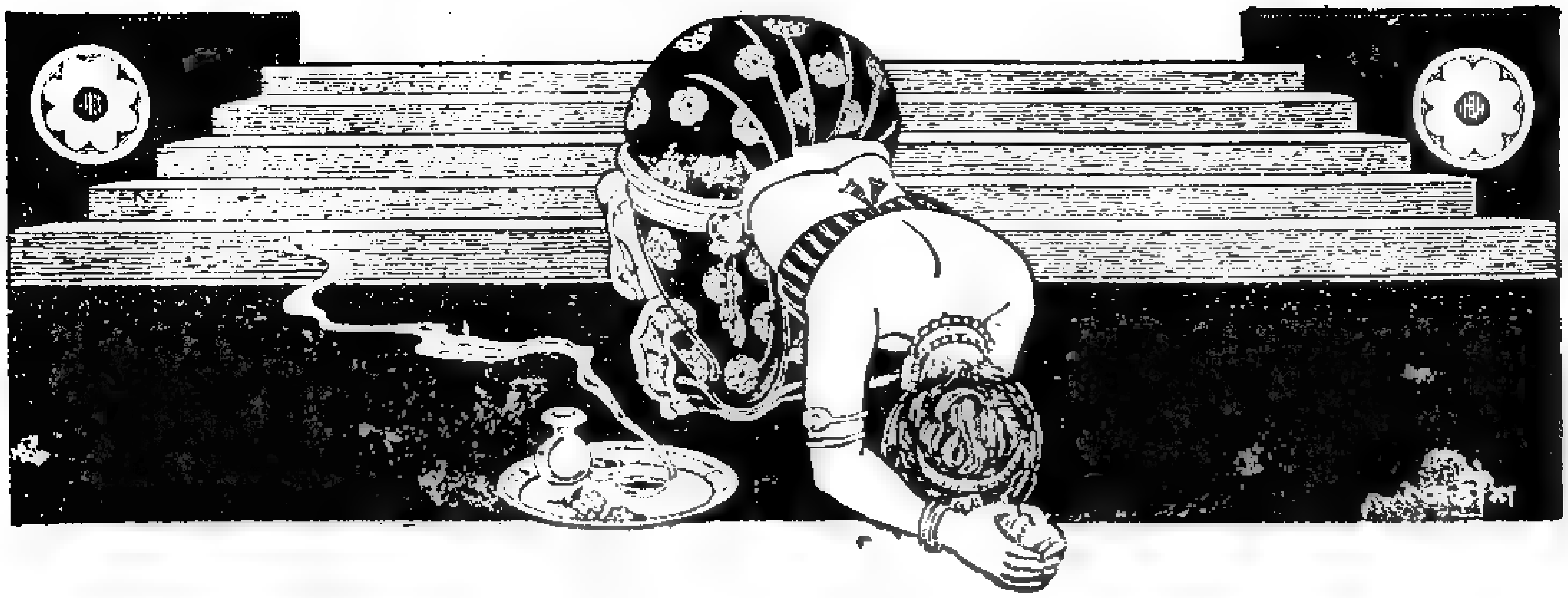

## সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সিক্ত বস্ত্রাদিত্যাগের পর গরম চা ও জলখাবার খাইয়া সুরেশচন্দ্র সুস্থ হইলেন। মাধব জিজ্ঞাসা করিল, "তামাক ইচ্ছে করেন কি ?"

সুরেশচন্দ্র অতিরিক্ত পরিমাণে তাম্রকূটের ভক্ত; বিশেষতঃ অনেকক্ষণ তাঁহার সে তৃষ্ণা মিটে নাই। প্রশ্নমাত্রেই তিনি বলিলেন, "আছে না কি ?"

বাঙ্গালার পল্লীতে আবার তামাকের বন্দোবস্ত নাই ? মাধব হাসিয়া বলিল, "এ কিন্তু আপনার বালাখানা-গয়ার তামাক নয়, সুরেশবাবু। আমার ক্ষেতে এ তামাক জন্মেছে ; নিজের হাতে তৈরী দা-কাটা তামাক। আপনার ভাল লাগ বে কি না, জানি না।"

"খুব ভাল লাগ্‌বে—সারাদিন তামাক জোটে নি, মাধবদা।"

বড় একটা কলিকায় তামাক সাজিয়া, রূপাবাঁধা হুঁকায় জল ভরিয়া মাধব সুরেশচন্দ্রকে তামাক দিল। তিনি বেশ আরাম করিয়া ধূমপান করিতে লাগিলেন। নানাবিধ মশলামিশ্রিত প্রসিদ্ধ বালাখানা অথবা গয়ার তামাক যে ইহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে, সুরেশচন্দ্রের মনে সে বিষয়ে সংশয় রহিল না। প্রকাশ্যে সে কথা তিনি স্বীকার করিলেন।

আলাপপ্রসঙ্গে সুরেশচন্দ্র জানিতে পারিলেন, রমেন্দ্র কোথায় গিয়াছে, তাহা কেহ অবগত নহে। প্রায় ৩ সপ্তাহ পূর্ব্বে পশ্চিম হইতে একখানা পত্র আসিয়াছিল, তাহাতে ঠিকানা ছিল না। রমেন্দ্র লিখিয়াছিল যে, সে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে বেড়াইতে যাইতেছে। আপাততঃ তাহার অর্থাভাব নাই। প্রয়োজন হইলে জানাইবে। পত্র পাইতে বিলম্ব ঘটিলে যেন মা চিন্তিত না হন।

সকল কথা শুনিয়া সুরেশচন্দ্র ভাবিলেন, পুরী হইতে চলিয়া আসিবার সময় রমেন্দ্র দেশে যাইতেছে বলিয়া লিখিয়াছিল—এ কথা সত্য নহে। ধূমপান করিতে করিতে এই কথাটাই তাঁহার মনে তোলাপাড়া করিতে লাগিল। এই আকস্মিক অনিশ্চিত প্রবাসযাত্রা কেন ? কৈশোরের সখা, যৌবনের সুহৃদ, সতীর্থ রমেন্দ্রের মনের কোন্ কথাটা তাঁহার জানা নাই ? সে যে কি ধাতুতে গড়া, তাহা কি তিনি জানেন না ?—দোষ অংশতঃ তাঁহারই। কিন্তু রমেন্দ্র বিবাহ করিয়াছে, জীবনের এমন বড় ঘটনাটা সে কেন তাঁহাদের কাছে প্রকাশ করে নাই ?

সুরেশচন্দ্র ঘটনার পর ঘটনার সূত্র ধরিয়া মনে মনে সকল বিষয়ের বিশ্লেষণ করিয়া চলিলেন। মানবের মনোবৃত্তি, যৌবনের ধর্ম্ম—ইন্দ্রিয়ের প্রাবল্য,—না, নিজের বিধিব্যবস্থার ত্রুটিই অধিক, সে জন্য অন্যকে অপরাধী করা অন্যায়। খুবই স্বাভাবিক ; কিন্তু কখনই সমর্থনযোগ্য নহে। অগ্নি ও ঘৃতকে শাস্ত্রকারগণ দূরে রাখিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন, না শুনিলে পরিণাম অভ্রান্তরূপে একই হইবে। সংস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষগণ সমাজ-স্থিতির জন্য সুস্থ ও অনুকূল নিয়মাবলীর ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। এখন তাহা ফুৎকারে উড়াইয়া দিতে গেলেই নানাবিধ অশান্তির উপদ্রব সহ্য করিতে হইবে।

য়ুরোপ, আমেরিকা ও ভারতবর্ষের নানা দৃশ্য, নানা কথা বিভিন্নভাবে তাঁহার চিত্তে সমুদিত হইল।

ভারতবর্ষের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণের বিচক্ষণতার কথা স্মরণ করিয়া তিনি মুগ্ধ হইলেন। কি ভূয়োদর্শনই তাঁহাদের ছিল! মানব-মনোবৃত্তিগুলিকে তাঁহারা কিরূপ নিপুণভাবেই না বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছিলেন! এ বিষয়ে প্রাচ্যের কাছে প্রতীচ্যদর্শন শিশুর মত নহে কি?

সহসা তাঁহার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইল। মাধব বলিতেছিল, "আপনি একটু বসুন, আমি একবার বাগানের দিকে যাব।"

"কোথায় যাচ্ছ, মাধব দা?"

তাহার বাম হস্তে লণ্ঠন, দক্ষিণ স্কন্ধে একগাছা জাল।

"বাগানের পুকুরে এক ক্ষেপ জাল ফেল্‌তে হবে।"

অনুমানে ব্যাপারটা বুঝিয়া সুরেশ বলিলেন, "এই অন্ধকারে—মাছের কি দরকার? ঘরে যা আছে, তাই যথেষ্ট, মাধবদা।"

"সে কি হয়! কতক্ষণ লাগ্‌বে বলুন? ৫।৭ মিনিটের মধ্যেই ফিরে আস্‌ব। অতিথ-দেবতার সেবা কি যা তা দিয়ে হয়, সুরেশবাবু? আমাদের অসভ্য পাড়াগাঁয়ে তা হয় না।"

হুঁকা রাখিয়া সুরেশচন্দ্র বলিলেন, "তবে চল, আমিও তোমার সঙ্গে মাছধরা দেখ্‌তে যাব, মাধবদা।"

মাধব আপত্তি করিল না, অগ্রে অগ্রে সে চলিল।

আকাশ তখনও সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয় নাই; কিন্তু চাঁদ উঠিয়াছিল। মাঝে মাঝে খণ্ডমেঘ আসিয়া চাঁদের উপর পড়িতেছিল। অন্ধকার তেমন গাঢ় নহে। বৃষ্টিধারাস্নাত গাছপালা নীরবে দাঁড়াইয়া ছিল। লণ্ঠনের আলোকে সব স্পষ্ট দেখা যায় না, তথাপি সুরেশচন্দ্র বুঝিলেন, উদ্যানটি সযত্নবিন্যস্ত। পথের দুই ধারে নানাবিধ সব্জীর আবাদ। দূরে উন্নতচূড় বৃক্ষরাজি প্রাচীরের মত দাঁড়াইয়া আছে। মাধব সানবাঁধান ঘাটের কাছে আসিয়া লণ্ঠন মাটীতে রাখিল। তাহার পর স্থান লক্ষ্য করিয়া অপূর্ব্ব কৌশলে জালখানা মাথার উপর ঘুরাইয়া জলে নিক্ষেপ করিল। প্রথম বারে চারা মাছ কতকগুলি উঠিল। মাধব তাহাদিগকে সাবধানে জলে ছাড়িয়া দিল। দ্বিতীয় বারে অনেকগুলি ছোট ও কয়েকটি বড় মাছ জালে পড়িল। মাধব একটা ৩ সের আন্দাজ রুই মাছ রাখিয়া বাকী সব জলে ছাড়িয়া দিল।

মাছ দেখিয়া সুরেশচন্দ্র প্রফুল্ল হইলেন; বলিলেন, "পুকুরে অনেক মাছ আছে, না, মাধবদা?"

মাধব বুঝাইয়া দিল যে, প্রয়োজন হইলে এই পুষ্করিণী হইতে ২০।২২ মণ মাছ পাওয়া যাইতে পারে।

"তোমরাই সুখী, মাধবদা।"

মাধব তৃপ্তির হাসি হাসিল। সে বলিল, "মানুষ কি সুখে সহরে থাকে, বল্‌তে পারি নে। আমাদের এই পাড়াগাঁয়ে কোন্ জিনিষের অভাব বলুন ত? এই বাগান—রাত্রিতে আপনার দেখার সুবিধে হবে না। সকালবেলা দেখ্‌বেন—যা খুঁজবেন, তাই পাবেন। আমাদের সংসারের পক্ষে যা কিছু দরকার, সবই আছে।"

মুগ্ধনেত্রে সুরেশ একবার প্রশস্ত বাগানের চারিদিকে চাহিলেন। বিশেষ কিছুই দেখা গেল না। কিন্তু স্বল্পালোকে যাহা দেখিলেন, তাহাতে মাধবের কথা সত্য বলিয়া মনে হইল। কপির ক্ষেত, কড়াইশুঁটি, আলু, বেগুণ, নানাবিধ শাকের ক্ষেত তিনি পুষ্করিণীতে আসিবার সময় দেখিয়াছিলেন।

মাছটি তুলিয়া লইয়া, স্কন্ধদেশে জাল রাখিয়া মাধব আবার পথ দেখাইয়া গৃহে ফিরিল।

সুরেশচন্দ্র নানাকথা ভাবিতে ভাবিতে বাহিরের ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। এই পল্লীজীবন, ইহার মত সুখের আর কি আছে! সহরে শুধু কোলাহল, অশান্তি ও ব্যস্ততা। অর্থের জন্য, যশের জন্য, স্বার্থসিদ্ধির জন্য কতই না মারামারি, কাড়াকাড়ি—ইতরতা! না—সুরেশচন্দ্র যদি কখনও গৃহস্থ-জীবনযাপনের সুযোগ পান, তবে পল্লীর অঞ্চলচ্ছায়ায় তিনি আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। তাঁহার জমীদারীর অন্তর্গত কোনও গ্রামে তিনি আদর্শ পল্লী স্থাপনের চেষ্টা করিবেন। ম্যালেরিয়া?—কৈ, পূর্ব্ববঙ্গের নদীমাতৃকপল্লীতে তাহার প্রাদুর্ভাব কোথায়? যদিও বা থাকে, সামর্থ্য ও অর্থ উভয়ের সমবায়ে পল্লীকে কি সুখের লীলা-নিকেতনে পরিণত করা যায় না? এই পল্লীই ত এক দিন সমগ্র বাঙ্গালার যাবতীয় সুখ, আনন্দ, তৃপ্তি ও স্বাস্থ্যের আবাস ছিল। কেন গেল? বাঙ্গালীর দোষ কি কিছুই নাই? বাঙ্গালার জমীদার, ধনিসম্প্রদায়ের উপেক্ষা কি পল্লীধ্বংসের অন্যতম কারণ নহে? সকলেই সহরের ইন্দ্রজাল, আরাম ও

ভোগবিলাসের উপকরণে মুগ্ধ হইয়া পল্লীকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালী যদি গ্রামের উন্নতির চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিত, তবে কি পল্লী এমন শ্মশান হইতে পারিত? না, এ অপরাধ হইতে দেশবাসীকে সম্পূর্ণ মুক্তি দেওয়া যায় না। অন্যান্য মারাত্মক কারণ যাহাই থাকুক, বাঙ্গালী পল্লীকে বিস্মৃত হইয়া আত্মহত্যা করিতেছে। তাই সোনার বাঙ্গালা আজ শ্মশান, তাই বাঙ্গালী অধঃপতনের পথে দ্রুত নামিয়া চলিয়াছে। কোথায় ইহার সমাপ্তি?

কলিকায় নূতন করিয়া তামাক সাজিয়া মাধব তাঁহার চিন্তাস্রোতে বাধা দিল। মাধব এতক্ষণ সুরেশদের এ অঞ্চলে আসিবার কারণ, নৌকাডুবীর ইতিহাস কিছুই জানিতে পারে নাই। সে এতক্ষণ অতিথি-সৎকারেরই চেষ্টা করিতেছিল। এ দেশে তাঁহাদের আসিবার যে সম্ভাবনাও আছে, ইহা তাহার কল্পনারও অতীত ছিল। এখন একটু অবকাশ পাইয়া সে বলিল, "এত দেশ থাক্‌তে এই বাঙ্গালদেশে আপনারা হঠাৎ কেন এলেন, বুঝ্‌তে পাচ্ছি না, সুরেশবাবু!—নৌকাডুবী হ'ল কি রকমে, বলুন ত?"

সুরেশচন্দ্র সব কথা বলিলেন না। শুধু পূর্ব্ববঙ্গের দুর্ভিক্ষের সংবাদে এ অঞ্চলে আসিয়া তিনি জিলা সহরেই আছেন, এইটুকু প্রকাশ করিলেন। কৌতূহলবশে এই দিকের গ্রামগুলি দেখিতে আসিয়াছিলেন। খালের মধ্যে হঠাৎ নৌকা বানচাল হইয়া যায়। তীর নিকটে বলিয়া সাংঘাতিক কিছু হয় নাই। সুরেশচন্দ্র আপনাকে অন্তরালে রাখিবার জন্য কোনও মতে অবস্থাটা বুঝাইয়া দিলেন।

মাধব স্থির দৃষ্টিতে সুরেশচন্দ্রের দিকে চাহিয়া ছিল। সহসা সে বলিয়া উঠিল, "ওঃ! বুঝেছি, আপনি তবে তিনি!"

সুরেশ সবিস্ময়ে বলিলেন, "কি রকম?"

মাধব শ্রদ্ধামিশ্রিত কণ্ঠে বলিল,—"শুনেছিলুম বটে, কলকাতা থেকে কে এক জন দাতা—মস্ত এক জমীদার এসে এ দেশে হাঁসপাতাল খুলেছেন, দীন-দুঃখীকে খাওয়াচ্ছেন—দু'হাতে অন্ন বিলুচ্ছেন! সে দিন সহরে গিয়ে শুনেছিলুম। কিন্তু আপনিই যে সেই দাতা, মহাপ্রাণ লোক, তা ত' জান্‌তাম না।"

অত্যন্ত লজ্জিতভাবে সুরেশ বলিলেন, "মানুষ বড় বাড়িয়ে বলে, মাধবদা। ও সব কথায় কান দিও না। তবে আমার দেশের, মা-ভাই-বোন্ না খেতে পেয়ে বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে, আর ব'সে ব'সে দেখ্‌ব, এ কি হ'তে পারে, মাধবদা? তাই যৎসামান্য—"

বাধা দিয়া মাধব গাঢ় কণ্ঠে বলিল, "এ আপনার মত লোকের উপযুক্ত কথা, সুরেশবাবু; কিন্তু আমি যা শুনেছি, আপনি যা করেছেন, এ পোড়া বাঙ্গালাদেশে তা করা দূরে থাক্, এমন ভাবে ক'জন বল্‌তে পারেন? বিদ্যুতের গতিতে আপনার কীর্ত্তি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। ভগবান্ আপনার মঙ্গল করুন। এই আমাদের ২।৪ খানা গ্রাম ছাড়া, চারদিকে যে অন্নকষ্ট আর রোগের বাড়াবাড়ি হয়েছে, তা ব'লে শেষ করা যায় না। শুনেছি, দু'জন দেবী না কি অন্ন বিলুচ্ছেন। তাঁরা তবে এঁরাই?"

মাধবের প্রশংসায় সুরেশচন্দ্র বড় বিব্রত হইয়া পড়িলেন। কথাটা অন্য দিকে ঘুরাইয়া লইবার অভিপ্রায়ে বলিলেন, "আচ্ছা, মাধব-দা, তোমাদের এ দিকের ২।৪ খানা গ্রামে দুর্ভিক্ষ নেই বল্‌ছ; এমনটা হ'ল কি ক'রে?"

"ভগবানের নেহাৎ দয়া। আমাদের এখান থেকে পদ্মা অনেকটা দূরে। আপনারা যে খালের ভেতর দিয়ে এলেন, এর পাড় খুব উঁচু। বানের জল তাই এ দিকের কখানা গ্রামের তেমন অনিষ্ট কর্‌তে পারে নি। তা ছাড়া, আমাদের গাঁয়ে দলাদলি নেই। আমাদের এই লোচনগঞ্জ গ্রামে প্রায় ৪।৫শ ঘর গেরস্তর বাস। সব-রকম জাতই আছে। তার মধ্যে খোকা—আপনার বন্ধুকে আমরা খোকা বলেই ডাকি—তালুকদার, জমীদার, যা ইচ্ছা বল্‌তে পারেন। আমাদের কর্ত্তামশাই এ গ্রামকে এমন ভাবে গ'ড়ে বেঁধে রেখে গেছেন যে, সবাই এঁদের অনুগত। ঝগড়া, বিবাদ দূরে থাক্, এক জন অপরের দুঃখ দূর করবার জন্য জান্ পর্য্যন্ত কবুল কর্‌তে পারে। কাযেই গ্রামের কারও অভাব হ'লে সকলে মিলে তার দুঃখ দূর কর্‌বার চেষ্টা করে।"

সুরেশচন্দ্র বিস্মিত হইলেন। পল্লী সম্বন্ধে তাঁহার যে ধারণা ছিল, তাহা এই বর্ণনা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। গ্রামের মধ্যে দলাদলি, মন-কষাকষি, ইতরতা,

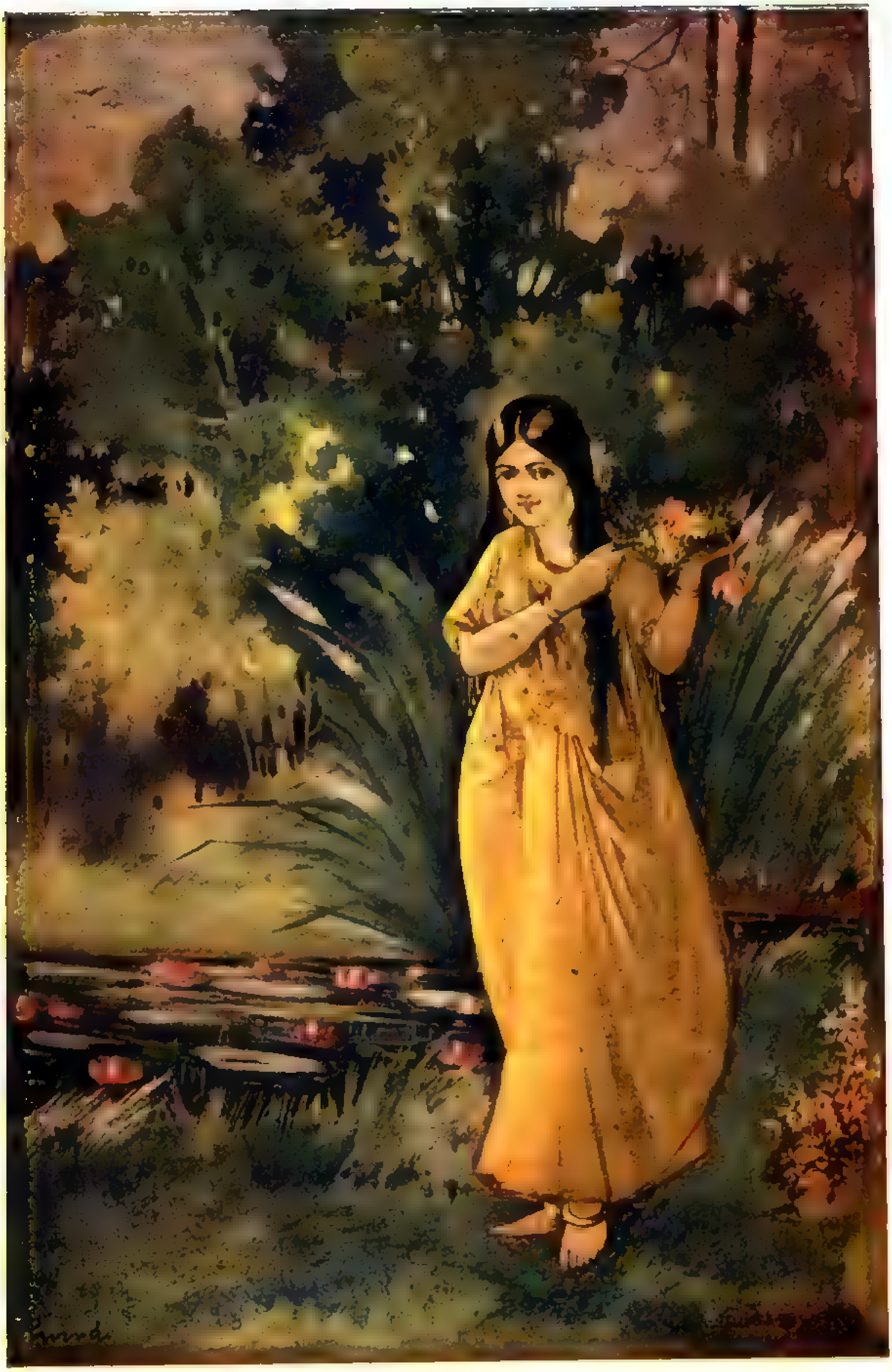

"বসন্ত লাবণ্যে সাজি গো!
এ কি হর্ষ—হর্ষ আজি গো!
উষারাণী দাঁড়াইয়া শিয়রে তাহার
হেরিছে ফুলের ঘুম ভাঙা,
হরষে কপোল তার রাঙ্গা।"

বসুমতী প্রেস ]

[ শিল্পী—শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

হিংসা-দ্বেষ দিনদিনই প্রবল হইয়া উঠিতেছে, ইহাই তিনি জানিতেন। বাঙ্গালার বর্ত্তমান পল্লীর অবস্থা এইরূপ। কিন্তু মাধব-দা আজ তাঁহাকে এ কি অবিশ্বাস্য কথা শুনাইতেছে ?

বুদ্ধিমান্ মাধব বোধ হয় তাঁহার মনের কথা বুঝিতে পারিয়াছিল। সে মৃদু হাসিয়া বলিল, "কথাটা বিশ্বাস করবার মত নয়, না সুরেশবাবু ? আপনারা পশ্চিমবঙ্গের লোক, পূর্ব্ববঙ্গের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের তুলনা করবেন না। সত্য বটে, আমাদের দেশে এখন সে যুগ আর নেই; কিন্তু বাঙ্গালার খাঁটি পল্লীর যদি সন্ধান পেতে চান, তবে তা এখনও পূর্ব্ববঙ্গেই পাবেন। আমাদের অনেক অবনতি হয়েছে সত্য, তবু একেবারে অধঃপাতে যায়নি। তা ছাড়া এ গাঁয়ের কথা আলাদা।"

মাধব আর কিছু বলিল না। তাহার মাতাঠাকুরাণীর অমায়িক, সদয় ব্যবহার; মাধবের দয়া, পরোপকার-প্রবৃত্তি, ন্যায়নিষ্ঠা এবং দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ গ্রামের সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। সকলেই তাহার অনুরক্ত ভক্ত—সে কথাটা প্রকাশ করা সে অশোভন বলিয়া মনে করিল।

সুরেশচন্দ্র নীরবে ধূমপান করিতে লাগিলেন। মাধব তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া ভিতরে আহারের কত দূর যোগাড় হইয়াছে, দেখিতে গেল।

---

## অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

"সুরেশবাবু, ভেতরে চলুন, ঠাঁই হয়েছে।"

তখন আকাশ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। মেঘমুক্ত আকাশে চাঁদের আলো—স্নিগ্ধ পল্লীর উপর চন্দ্রতরঙ্গের উচ্ছ্বাস। সে মধুর দৃশ্যে আকৃষ্ট হইয়া মুহূর্ত্তমাত্র সুরেশচন্দ্র মুগ্ধভাবে দাঁড়াইলেন। তাহার পর মাধবের সঙ্গে ভিতরের দিকে চলিলেন।

প্রশস্ত বারান্দায় আহারের স্থান হইয়াছিল। সুরেশচন্দ্র দেখিলেন, তাঁহার একা বসিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। পল্লীর—হিন্দুগৃহস্থের ব্যবস্থা অনুসারে মেয়েদের জন্য স্বতন্ত্র স্থানে আহারের বন্দোবস্ত হইয়াছিল। সুরেশ বলিলেন, "তুমি বস্‌বে না, মাধবদা ?"

মাধব যুক্তকরে বলিল, "তা কি এখন পারি ? অতিথসেবা না হ'লে গেরস্থের খাবার অধিকার নেই। এ আমাদের চিরকালের পাড়াগেঁয়ে ব্যবস্থা। আপনি বসুন।"

সুরেশচন্দ্র এ প্রথায় অভ্যস্ত না হইলেও সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন না। প্রথাটা ভাল কি মন্দ, তাহার আলোচনার প্রয়োজন কি ? কিন্তু ব্যবস্থাটি যে বড়ই মধুর, সুরেশ তাহা অস্বীকার করিতে পারেন না।

মাধব অনতিদূরে উবু হইয়া বসিয়া অতিথির আহারের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিল। সুরেশচন্দ্র দেখিলেন, আয়োজন পর্য্যাপ্ত; এত অল্পসময়ের মধ্যে এরূপ ব্যবস্থা সম্পন্ন ও সুপরিচালিত পল্লীগৃহস্থগৃহেই সম্ভবপর।

আহারে বসিয়া সুরেশচন্দ্র বুঝিলেন, শুধু আয়োজনই পর্য্যাপ্ত নহে, প্রত্যেক ব্যঞ্জনের স্বাদ অভিনব। তিনি বহুবার বহু স্থানে নানাপ্রকার ভোজসভায় যোগ দিয়াছেন, কিন্তু এমন উৎকৃষ্ট এবং বিচিত্র স্বাদযুক্ত, রসনাতৃপ্তিকর আহার্য্য অতি অল্প স্থানেই দেখিয়াছেন। মনে মনে অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হইয়া সুরেশ বলিলেন, "বড় চমৎকার রান্না, মাধবদা !"

মাধব হাসিয়া বলিল, "এ আমাদের গরীবখানা। আপনি যদি তৃপ্তি পান, সে আমাদের সৌভাগ্য। একটা কথা এখানে নিবেদন ক'রে রাখি, যা কিছু উপাদান দেখ্‌ছেন, সব আমাদের বাড়ীতেই জন্মেছে।"

সবিস্ময়ে সুরেশ বলিল, "বটে !"

মাধব বলিল, "আজ্ঞে, হ্যাঁ। মায় পোলাওয়ের চাউল পর্য্যন্ত। বাজারের ঘি, তেল কখনও কিন্‌তে হয় না—অবশ্য ক্রিয়াকর্ম্ম ছাড়া। হলুদ, লঙ্কা, ধনে, সরষে, তেজপাতা সবই আমাদের বাগানে হয়। কোন জিনিষের জন্য দোকানে বা হাটে আমাদের যাবার দরকার হয় না। এক লবণ, তা যদি আইন থাক্‌ত, ঘরে তাও তৈরী করা যেত।"

অবাক্ বিস্ময়ে এই পল্লী-প্রৌঢ়ের দিকে চাহিয়া সুরেশচন্দ্র ভাবিলেন, এমন আর এক জন লোক তিনি জীবনে দেখিয়াছেন কি ? স্বাবলম্বনের এমন উজ্জ্বল

দৃষ্টান্ত দেশবাসীর সমক্ষে ধরিয়া গৌরব অনুভব করিতে হয়।

শুভ্রবসনা গৃহিণী ধীরে ধীরে পুত্রবন্ধুর কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "বাবা সুরেশ, তোমরা বড়ঘরের ছেলে, আমাদের এ পাড়াগাঁয়ে তোমাদের যোগ্য আদর-যত্ন—"

বাধা দিয়া সুরেশচন্দ্র বলিলেন, "মা, কি বল্‌ছেন? এমন চমৎকার রান্না আমি জীবনে খুব কমই খেয়েছি।"

গৃহিণী সহর্ষে বলিলেন, "এ সবই আমার বৌমার রান্না।"

"বটে! রমেনের স্ত্রী এমন চমৎকার রাঁধ্‌তে পারেন?—সে খুব ভাগ্যবান্‌।"

কথাটা বলিয়াই সুরেশ অন্যমনা হইলেন। এমন গুণবতী স্ত্রী থাকিতে—

মাতা বলিলেন, "বৌমা আমার বড় লক্ষ্মী। কাযে-কর্ম্মে, দেখ্‌তে শুন্‌তে—এমন সকল রকমে ভাল মেয়ে খুবই কম দেখা যায়, বাবা। আমার ইচ্ছে ছিল, তোমরা যখন এসেছ, আর দিনকতক তাকে এখানে রাখি। কিন্তু তা' আর ঘটে উঠ্‌বে না দেখ্‌ছি। আগে থেকেই ঠিক হয়ে আছে, কালই ওকে নেবার জন্য লোক আস্‌বে।"

"রমেনের স্ত্রী বাপের বাড়ী যাচ্ছেন না কি?"

"হাঁ বাবা, কালই যাত্রার দিন।"

"তা বেশ ত। আমরা ত এ দেশে আর ২।১ দিন আছি। আমাদের জন্য তাঁকে আট্‌কে রাখবার কোন দরকারই নেই। কাল সকালেই আমাদের সহরে ফিরে যেতে হবে।"

"তা কি হয়, বাবা! তোমরা কখনও আস নি। এক দিনেই কি ছেড়ে দিতে পারি?"

সুরেশচন্দ্র বলিলেন, "আমাদের বিলম্ব করবার কোন উপায় নেই, মা! আপনি মাধবদাকে জিজ্ঞাসা করুন, আমাদের হাতে কি রকম জরুরী কায রয়েছে। এ ত আমার নিজের বাড়ীর মত। পরে আবার আস্‌ব, তখন দিনকয়েক থেকে যাব।"

আহারশেষে সুরেশ বহির্ব্বাটীতে গেলেন। তাঁহার "মাধব-দা, দয়া ক'রে একটা কাযের ভার নেবে?"

হুঁকাটা সুরেশচন্দ্রের হাতে দিয়া সে বলিল, "কি বলুন ত?"

"এ অঞ্চলে আমি বেশী দিন থাক্‌তে পারব না। ওঁদের নিয়ে শীঘ্রই এলাহাবাদে যেতে হবে। কিন্তু এখানে ঢের কায বাকী। আমি অবশ্য জিলার হাকিমের কাছে টাকাটা দিয়ে যেতে পারি; কিন্তু আমার ইচ্ছে, আমরা দেশের লোক মিলেই কাযটা করি। এ দেশে এখনও কিছু দিন হাঁসপাতাল ও অন্নসত্র রাখ্‌তে হবে। তুমি ভার নেবে, মাধব-দা?"

সুরেশচন্দ্র যেরূপ গভীর আগ্রহভরে প্রস্তাব করিলেন, তাহাতে মাধবের উপর অগাধ বিশ্বাস ও নির্ভরতা যেন প্রকাশ পাইল। মাধব বলিল, "এত বড় কায কি আমরা চালাতে পারি? আমরা মূর্খ, পাড়াগেঁয়ে ভূত।"

সুরেশ বলিলেন, "ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তোমার মত লোকের সংখ্যা দেশে বাড়্‌তে থাকুক। সত্যি মাধব-দা, লেখাপড়ার কথা তুলে বড় লজ্জাই দিলে। লেখাপড়া শিখে আমাদের দেশে বড় একটা মানুষ তৈরী হচ্ছে না। তুমি আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার মত মানুষ হ'তে পারি।"

তখনকার মত কথাটা চাপা রহিল। আহারশেষে মাধব বাহিরে আসিলে অনেক আলোচনা হইল। অবশেষে মাধব গুরু কার্য্যভার গ্রহণ করিতে স্বীকার করিল। কথায় কথায় সুরেশচন্দ্র বুঝিতে পারিলেন, মাতার সহিত পরামর্শ করিয়া মাধব ঠিক করিয়াছে, গোলায় সঞ্চিত ধান্য হইতে হাজার মণ ধান সে দুর্ভিক্ষ-দান-ভাণ্ডারে দিবে। ইহার পূর্ব্বে তাহারা দুস্থদিগের জন্য কি দান করিয়াছে, সে কথাটা কোনও মতেই তিনি মাধবের নিকট হইতে আদায় করিতে পারিলেন না।

এই স্বল্পশিক্ষিত, বলিষ্ঠদেহ, হৃদয়বান্‌ প্রৌঢ়কে সুরেশচন্দ্র মনে মনে বহুবার প্রণাম করিলেন। এমন খাঁটি বাঙ্গালী এ যুগে থাকিতে পারে, পূর্ব্বে তিনি বিশ্বাস করিতেন না।

# মাসী

## ১

সকালবেলা অশ্রু-লাঞ্ছিত গণ্ডে উভয় হস্তে চক্ষু রগড়াইয়া অস্ফুট স্বরে ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে মীনু আসিয়া মায়ের জানুদেশে মুখ লুকাইল।

"কি হয়েছে রে?"—বলিয়া মা তাহার ক্ষুদ্র হাত দুইখানি আপনার জানু হইতে খুলিবার চেষ্টা করিলেন।

মীনু আরও জোরে শক্ত করিয়া মা'কে আঁকড়াইয়া ধরিয়া মুখ গুঁজিয়া ফোঁপাইতে লাগিল।

মা সস্নেহে অভিমানিনী কন্যাকে জানু হইতে মুক্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে? সকালবেলাই কান্না কেন?"

ক্রন্দনবিজড়িত স্বরে মীনু বলিল, "অজিত মেরেছে।"

"অজিত মেরেছে? তারই জন্য কান্না? ছি, ছি, কি লজ্জার কথা! ও যে তোমার ছেলে হয়, তুমি হচ্ছ ওর মাসী, ওর মারে তুমি কেঁদে ফেলেছ?"

লজ্জিতা মীনু ময়লা ফ্রকের প্রান্তে চক্ষু মুছিতে মুছিতে অপ্রতিভ স্বরে বলিল, "শুধু মারেনি, আমার রবারের বেলুনও কেড়ে নিয়েছে!" মীনুর চক্ষুতে আবার বন্যা আসিল।

মা আনতা হইয়া অঞ্চল-কোণে কন্যার অশ্রু মুছাইতে মুছাইতে মিষ্ট হাসিয়া বলিলেন, "তারই জন্যে তুমি কাঁদছ? কিন্তু তুমি অজিতের মাসী—তোমার ত নিজ থেকেই বেলুনটা তোমার ছেলেকে দিয়ে দেওয়া উচিত ছিল।"

মীনু লজ্জিত হাস্যে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "না, মা, না, তার জন্যে আমি কাঁদবো কেন? বেলুন ও নিক্ না, কিন্তু ও যে আমার সঙ্গে আর খেল্‌বে না বলেছে!"

মীনুর ধূলি ও অশ্রু-লাঞ্ছিত সুন্দর কচি মুখখানি অঞ্চল দিয়া সস্নেহে পরিষ্কার করিতে করিতে মা হাসিমুখে বলিলেন, "বললেই বা! ওর কথা কি তোমার গ্রাহ্য করতে আছে? তবে তুমি কি রকম মাসী! অজিত তোমার ছেলে কি না, ওর কথায়—ওর মারে কাঁদতে নেই, বুঝেছ?"

মীনু নিতান্ত লজ্জিতভাবে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়া চপলচরণে শশক-শিশুর মত ছুটিয়া পলাইল। তাহার ক্রন্দনারক্ত অশ্রুসিক্ত মুখখানিতে তখন হাসির উজ্জ্বল দীপ্তি বর্ষণান্তে স্বর্ণ রৌদ্ররেখার ন্যায় ঝল্‌মল্‌ করিয়া উঠিয়াছে।

অজিত ছিল মীনুর চেয়ে পাঁচ বছরের বড়, মীনুর বিধবা বড়দিদির একমাত্র সন্তান। পিতৃ-মাতৃহীন অজিতকে নিরাশ্রয় করিয়া তার মা'ও যখন পরপারে যাত্রা করিল, তখন মীনুর মা কন্যাশোক সংযমিত করিয়া পিতৃমাতৃহীন দৌহিত্রটিকে আপনার কাছে লইয়া আসিয়া মানুষ করিতে লাগিলেন।

স্বাস্থ্যসবল হৃষ্টপুষ্ট অজিতকে মীনু অপেক্ষা অনেক অধিকবয়স্ক বলিয়া ভ্রম জন্মিত। দৈহিক আয়তনে বড় হইলে কি হয়? পিতৃমাতৃহীন বালক মাতামহীর স্নেহাদরে লালিত হওয়ায় তাহার স্বভাবটি হইয়াছিল নিতান্ত শিশুর মত চঞ্চল, অবুঝ, আবদারী, অভিমানী।

মীনু বাহিরে গিয়া হাসিমুখে রাঙ্গা বেলুনের স্বত্ব ত্যাগ করিবামাত্র অজিত খুসী হইয়া সন্ধিস্থাপনা করিয়া ফেলিল,—"মীনু ভাই, দাদুকে ব'লে আমি তোকে একটা বেলুন কিনে দেব।"

"না, না, আমার দরকার নেই। ও বেলুনটা আমি তোকে আগেই দিতুম, ভাই! আমি তোর মাসী হই কি না, আমাকে দিতে হয়।"

চিন্তিত মুখে অজিত বলিল, "আচ্ছা, তুই যদি আমার মাসী হ'স, আমি তা হ'লে তোর কে হই, বল দিকিন?"

আনন্দ-দীপ্ত মুখে মীনু বলিল, "ছেলে!"

"দূর! তা কি হয়? আমি তোর চেয়ে ক—ত বড়! আয় না, মেপে দেখ্!"

শঙ্কিত মুখে মীনু বলিল, "না, না, তুমি আমার ছেলে হও, মা ব'লে দিয়েছেন। তাই ত তোমাকে খেলনা দিয়ে কাঁদতে নেই!"

ভ্রূকুটিপূর্ণ সন্দিগ্ধ মুখে অজিত বলিল, "আচ্ছা, চল্ দিকিনি দিদা'র কাছে।"

মীনু উদ্বিগ্ন মুখে বলিল, "হ্যাঁ, চল না।"

উভয়ে ছুটিতে ছুটিতে অন্তঃপুরে আসিয়া প্রায় সমস্বরে চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ, দিদা, মিনি আমার কে হয়?"

উচ্চহাস্যে বলিলেন, "বাঃ! এতে অন্যায় কায কি হয়েছে? তাঁরা গলা ছেড়ে গান গাইতে পারেন, আর আমাদের শুন্‌তে দোষ?"

রমেন্দ্র বলিল, "আপনার পক্ষে দোষ নয়, সঙ্গত। কিন্তু অন্তঃপুরের দিকে, অনাহূত হয়ে শুন্‌তে যাওয়া অপরাধ নয়? শুধু গান নয়, কবিতা আবৃত্তি পর্য্যন্ত শুনেছি। কাযটা অন্যায়, গোপন রাখা আরও অন্যায়। তাই আপনার কাছে প্রকাশ কর্‌লাম।"

"বটে! আবার কবিতা আবৃত্তি পর্য্যন্ত শুনেছেন্? আপনার ভাগ্য ভাল বল্‌তে হবে। কি কবিতা, শুনি?"

ডাক্তারবাবু ব্যাপারটাকে সহজভাবে উপেক্ষা করিলেও রমেন্দ্র তাহাতে সায় দিতে পারিল না। সে ক্ষুব্ধভাবে বলিল, "কুমারসম্ভবের রতিবিলাপ।"

"সংস্কৃত শ্লোক! কিন্তু আপনার বোধ হয় ভ্রম হয়েছে। আমার স্ত্রী গাইতে জানেন বটে, আবৃত্তিও মন্দ পারেন না; কিন্তু আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, সে গান, সে আবৃত্তি আমার স্ত্রীর নয়। আমার শালী এসেছে, তারই হবে। সে চমৎকার গায়। আমি একবার তার মুখে রতিবিলাপের আবৃত্তি শুনেছিলাম।"

"যিনিই হ'ন,—আমার অনধিকার ব্যবহারের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কচ্ছি। আপনি আমায় ক্ষমা করুন।"

ডাক্তারবাবু এবার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। রমেন্দ্রও একটু অপ্রতিভ হইল। হাসি থামিলে গিরীন্দ্রনাথ বলিলেন, "ক্ষমা?—আচ্ছা, যাঁদের কাছে আপনি অপরাধী, আপনার আরজি তাঁদের কাছেই পেশ করা যাবে। ক্ষমা করা না-করার মালিক ত তাঁরাই।—এখন ঐ নিম্‌কী ক'খানা শেষ ক'রে ফেলুন ত।"

[ ক্রমশঃ।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

---

# শোকাতুরা

নিঠুর কে গো কোল থেকে মোর
ছিনিয়ে নিলি দুলালী রে!
মায়াবী কোন্ নূতন খেলার
আশায় তারে ভুলালি রে!

আলোক দেশের পথে পথে
ফিরতেছিল সোনার রথে
চপলা সে ঝাঁপ দিয়ে যে
নাম্‌ল আমার কোলে,

ডাক্‌লে মা মা ব'লে,
( ওরে ) কোন্ যাদুকর নয়নে তার
নিদের কাঠি বুলালি রে?

ঘুমুল সে কি কাল-ঘুম
চায় না যে আর স্নেহেরো চুম,
নাম-না-রাখা নাম ধ'রে তায়
ডাকি, 'আয় মা ঘুরে'
( ও তোর ) মা যে সদাই ঝুরে
( ওরে ) পাষাণ কে গো প্রথম হাটেই
বেচা-কেনাই তুলালি রে!

কোন্ ঝড়ে তা কে বলিবে,
জীবনের দীপ গেল নিভে,
আলো বাতাস, গন্ধ বরণ
মিশ্‌ল আঁধারমাঝে,

আজি দীপ হারানো সাঁঝে,
( ওরে ) কোন্ মায়াবী আমাকে হায়,
ব্যথার মদে দুলালি রে!

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

## ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

মানুষের জীবনটা কি সুধু প্রহেলিকা ?—মন কি এমনই জটিল ?—নহেই বা কেন ? কবি, দার্শনিক, মনস্তত্ত্ববিদ্ বহু অভিজ্ঞতার ফলে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, সে স্বয়ং কবি হইয়া নিজের জীবনেই কি তাহার পর্য্যাপ্ত প্রমাণ পায় নাই ? বাল্য, কৈশোর, তরুণ যৌবনের মনের ইতিহাসটা আগাগোড়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলেই ত বুঝা যায়—ধারাবাহিকতা সত্ত্বেও মনের জটিলতা যেমন বিচিত্র, তেমনই অদ্ভুত ! কোন্ প্রবৃত্তি কখন্ কি ভাবে উদ্দাম হইয়া উঠিয়া, পূর্ব্বসঙ্কল্পকে দুর্নিবার স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারে, মানুষ কি তাহা কল্পনাতেও আনিতে পারে ? ষড়রিপু যেন স্ব স্ব দুর্গমধ্যে আত্মগোপন করিয়া আছে, অকস্মাৎ কে কবে কোন্ দিক্ দিয়া আক্রমণ করিয়া বসিবে, বেচারা মন তাহার কোনও পূর্ব্বাভাসও পায় না। যখন অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হয়—অভিভূতের মত কায করিয়া যায়। পরে সংশয়, অনুশোচনা, নির্ব্বেদ জীবনকে ধিক্কারে পূর্ণ করিয়া ফেলে।

চলিতে চলিতে রমেন্দ্র এমনই কত কি ভাবিতেছিল। আজ সে মধ্যাহ্নে আহারের পর একাই বাহির হইয়াছিল। ডাক্তারবাবুর কোনও আত্মীয় আসিবেন, তাঁহাকে আনিবার জন্য ষ্টেশনে যাইবেন বলিয়া তিনি রমেন্দ্রের সাথী হইতে পারেন নাই। রমেন্দ্র মুসলমান নবাবগণের অন্যান্য কীর্ত্তির যে সকল নিদর্শন তখনও দেখে নাই, আজ তাহা দেখিবার জন্য বাহির হইয়াছিল। শাহানাজফ, ভিক্টোরিয়া পার্ক প্রভৃতি কয়েকবার দেখা থাকিলেও আবার সেগুলি দেখিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে গোমতীর লোহার পুল পার হইয়া গেল।

সন্ধ্যার অন্ধকার অনেকক্ষণ ঘনাইয়া আসিয়াছিল। রমেন্দ্র বাসার দিকে ফিরিল। সে ভাবিতেছিল, আর এখানে থাকা সঙ্গত নহে। আজ প্রায় তিন সপ্তাহ সে এখানে আসিয়াছে। সম্পূর্ণ অপরিচিত ও অনাত্মীয়ের গৃহে সে যে এত দিন অতিথিরূপে বাস করিবে, ইহা এক মাস পূর্ব্বে তাহার কল্পনারও অতীত ছিল। এখানে গৃহের অপেক্ষাও পর্য্যাপ্ত আদর-যত্ন পাইতেছিল, ডাক্তারবাবুর সরল, অনাড়ম্বর, সস্নেহ ব্যবহারে সত্যই সে মুগ্ধ হইয়াছিল। কত বার সে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে, কিন্তু জ্যেষ্ঠ সহোদর যেরূপ পবিত্র বন্ধনে কনিষ্ঠকে বাঁধিয়া রাখেন—সে বন্ধন এড়াইয়া যাওয়া যেরূপ সহজ নহে, রমেন্দ্রের পক্ষেও ঠিক তাহাই হইয়াছিল।

রমেন্দ্র চলিয়া যাইবার প্রস্তাব করিলে স্নেহভরা অথচ যুক্তিপূর্ণ আলোচনার দ্বারা ডাক্তারবাবু তাহার সকল যুক্তি খণ্ডন করিয়া ফেলিতেন। অন্তঃপুর হইতে ডাক্তারবাবুর পত্নীর তরফ হইতে এমনই মিষ্ট অনুরোধ আসিত যে, তাহা উপেক্ষা করা নিতান্ত মূঢ়ের পক্ষেই সম্ভব। তাই, যাই যাই করিয়াও এত দিন সে যাইতে পারে নাই। কিন্তু সকল বিষয়েরই ত একটা সীমা আছে ? না—রমেন্দ্র এবার বিশেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবে—অচিরেই তাহাকে এ স্থান ত্যাগ করিতে হইবে। সত্যই আর ভাল দেখায় না। ডাক্তারবাবুর আত্মীয়-পরিজন আসিতেছেন, তাঁহারাই বা কি মনে করিবেন ? এত দিন কেহ ছিল না, সে এক কথা। এখন সমাগত আত্মীয়রা তাহার সম্বন্ধে কোনওরূপ ধারণা করিয়া লইতে পারেন, সে কেন তাহার অবকাশ দিবে ?

ফটকের কাছে আসিতেই চমক ভাঙ্গিল। অনতিদূরেই গাড়ীর আস্তাবল ও দ্বারবানের গৃহ। রমেন্দ্রকে দেখিয়া দ্বারবান্ সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল। রমেন্দ্র তাহার কাছে জানিতে পারিল, ষ্টেশন হইতে ফিরিয়া ডাক্তারবাবু রোগী দেখিতে গিয়াছেন।

রমেন্দ্র বাহিরের ঘরে প্রবেশ করিল। আলোকিত কক্ষ জনহীন। সে অন্যমনস্কভাবে বাহিরে আসিয়া বাগানের মধ্যে বেড়াইতে লাগিল। বাগানে তখন কেহ ছিল না। অনেক সময় সে এই প্রশস্ত উদ্যানমধ্যে পরিক্রমণ করিত। ডাক্তারবাবুর স্ত্রী কদাচিৎ বাগানে আসিতেন, অন্ততঃ রমেন্দ্র আসিবার পর সে কোনও দিন তাঁহার বসনের অঞ্চল পর্য্যন্ত দেখিতে পায় নাই। কাযেই অসঙ্কোচে সে যখন তখন বাগানের মধ্যে বেড়াইত। বিবিধ ফলের গাছ ছাড়া, নানাবিধ ফুলের গাছ উদ্যানে ছিল। বেড়াইতে বেড়াইতে সন্নিহিত একটা রজনীগন্ধার ঝাড়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ডাক্তার

রজনীগন্ধার বিশেষ ভক্ত ছিলেন। তাঁহার যত্নে অসময়েও টবের গাছে রজনীগন্ধা-ফুল ফুটিত। এই ফুল সম্বন্ধে তাঁহার এমনই পক্ষপাতিত্ব ছিল যে, বাগানে গাছ থাকা সত্ত্বেও শয়নকক্ষে, বসিবার ঘরে সর্ব্বত্রই টবে করা রজনীগন্ধার গাছ দেখিতে পাওয়া যাইত। রমেন্দ্রও রজনীগন্ধার বিশেষ অনুরাগী ছিল। আধ-আলো আধ-ছায়া-ঢাকা উদ্যানে রজনীগন্ধা গাছের কাছে দাঁড়াইয়া রমেন্দ্র প্রস্ফুটিত ফুলগুলি নাসিকার কাছে আনিয়া ঘ্রাণ লইতেছিল।

সহসা মৃদু সঙ্গীতের শব্দ তাহার কানে প্রবেশ করিল। রমেন্দ্র উৎকর্ণ হইল। বড় মিষ্ট কণ্ঠস্বর ত! অজ্ঞাতসারে সে এক পদ অগ্রসর হইল। বাতাসে মধুর নারী-কণ্ঠে গান ভাসিয়া আসিল:—

"কেন বঞ্চিত হব চরণে!"

বংশীরবে আকৃষ্ট হরিণের ন্যায় রমেন্দ্র ধীরে-ধীরে অদূরবর্ত্তী বাতায়নের দিকে অগ্রসর হইল। বহু দিন পরে তাহার প্রিয় কবির মধুর গানটি, সুকণ্ঠে গীত হইতে শুনিয়া সে আর আত্মসংবরণ করিতে পারিল না।

"আমি কত আশা ক'রে ব'সে আছি,—
পাব জীবনে না হয় মরণে।"

ইহা ত শুধু গান নহে,—গায়িকা যেন প্রাণ কণ্ঠে আনিয়া, হৃদয় উজাড় করিয়া দিয়া গাহিতেছিল। কাহার এ কণ্ঠ? ডাক্তারবাবুর স্ত্রীর? হইবে বা। রমেন্দ্র ত এ পর্য্যন্ত তাঁহার চেহারা পর্য্যন্ত দেখে নাই, গান শুনা ত দূরের কথা। রমেন্দ্র ভাল করিয়া শুনিবার জন্য নিঃশব্দে বাতায়নের নীচে আসিয়া দাঁড়াইল।

সুরে সুরে অন্তর্নিহিত ভাবধারা যেন গানে মূর্ত্তিমতী হইয়া উঠিতেছিল। শিক্ষিত কণ্ঠের গান—গমক, মীড় ও মূর্চ্ছনা চমৎকার! বাহিরের ঘরে রমেন্দ্র একটা টেবল-হারমোনিয়ম্ দেখিয়াছিল, কিন্তু এ পর্য্যন্ত সে কাহাকেও তাহা বাজাইতে দেখে নাই। তাহার গানের খুব সখ ছিল, সে বাজাইতে জানিত। কিন্তু মানসিক অশান্তির জন্য ও দিকে তাহার খেয়াল ছিল না। আজি এ গানটি বড়ই মিঠা লাগিতেছিল:—

"হয়ে পথের ধূলায় অন্ধ,
এসে দেখিব কি খেয়া বন্ধ?
তবে পারে ব'সে, পার কর ব'লে পাপী,
কেন ডাকে দীন-শরণে?"

সত্য, অতি সত্য!—কিন্তু কে এই গায়িকা? তাহার হৃদয়যন্ত্রে যে সুর—যে কথা অহরহঃ বাজিতেছে, গায়িকা যেন তাহারই মূর্ত্তি ফুটাইয়া তুলিয়াছে! সুন্দর! চমৎকার! অতি মধুর!

রমেন্দ্রের মন সঙ্গীতস্রোতে ভাসিয়া চলিল, তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন সঙ্গীতের মোহে অভিভূত হইয়া পড়িল।

গান থামিয়া গেল। রমেন্দ্র তখনও মন্ত্রমুগ্ধবৎ দাঁড়াইয়া।

ভিতরে একাধিক লোকের কথা শুনা গেল।

এক জন বলিতেছিল, "তুই রোজ গান গাইতিস্?"

উত্তরে আর এক জন বলিল, "না দিদি, গান গাইবার সময় কোথায়? তবে বাড়ী গেলে, বাবা যখন বল্তেন, মাঝে মাঝে গাইতাম।"

"তোর গলাটা কিন্তু আগেকার মতই আছে, টুনি। আর একটা গান কর্।"

"কে এসে পড়্বে, দিদি, আজ আর না।"

"কে এসে পড়্বে? উনি এলে গাড়ীর শব্দ হবে। আর ওঁর কাছে তোর ভারী ত লজ্জা! আগে কত গান গেয়েছিস্। নে, আর একটা ধর্।"

অপরা বলিল, "তবে আগে তুমি একটা গাও, কত দিন তোমার গান শুনি নি।"

"আমি আবার কি গাইব? তোর মত অমন গলা আমার যদি থাক্‌ত, গাইতাম। তোর বড় কষ্ট হচ্ছে বুঝি, টুনি? গাড়ীতে ঘুমুতে পেরেছিলি?"

"না, কষ্ট কিছুই না; সেকেণ্ড ক্লাস রিজার্ভ গাড়ী। মামাবাবু, মামীমা, মিনু আর আমি, কষ্ট হবে কেন? খুব ঘুমিয়ে এসেছি।"

"আচ্ছা, গান আজ থাক্। কিন্তু তোকে পেয়ে আমার আজ খালি বাড়ীর কথা মনে হচ্ছে ভাই।

সন্ধ্যাবেলা বাবার কাছে ব'সে গান, আবৃত্তি, শ্লোক রচনা—মনে পড়ে, টুনি ?"

"কি সুখের দিনই গিয়েছে, দিদি ! মনে আবার পড়ে না ? ইচ্ছে করে, আবার সে যুগে ফিরে যাই !"

কক্ষমধ্যে খানিক নীরবতা বিরাজ করিতে লাগিল। রমেন্দ্র সে স্থান ত্যাগ করিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় সে আবার শুনিতে পাইল,—"টুনি, সেই শ্লোকটা তোর মনে আছে ?—কুমারসম্ভবের মদনভস্মের পর রতিবিলাপের সেই শ্লোকটা ?—'উপমানমভূদ্বিলাসিনাং' শ্লোকটা একবার বল না ভাই, বাবা প্রায়ই তোর মুখে শ্লোকটা শুন্‌তে চাইতেন ; আমার বড় ভাল লাগে।"

রমেন্দ্র ফিরিয়া দাঁড়াইল ; তাহার কৌতূহল অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইল। সে কয় দিনে এইটুকু বুঝিয়াছিল, ডাক্তার-গৃহিণী পাঠানুরাগিণী। আজকাল অনেক মেয়ে যেমন মাসিকপত্রিকার ভক্ত—উপন্যাসপাঠিকা, তাঁহাদেরই মত এক জন। কিন্তু শুধু ত তাই নয় ! ইনি কাব্যানুরাগিণী—মহাকবি কালিদাসের ভক্ত। সে অনুমান করিয়াছিল, দুই ভগিনীতে কথা হইতেছে। আজ যাঁহার আসিবার কথা ছিল, ইনিই তিনি। হিন্দু বাঙ্গালীর ঘরের মেয়েদের মধ্যে আজকাল পাঠস্পৃহা শুধু উপন্যাসেই সীমাবদ্ধ নহে—কাব্য-সাহিত্যের আলোচনাও তাঁহারা করেন। কালিদাসের কুমারসম্ভব পর্য্যন্ত।

তাহার মন বিমর্ষ হইল। হায় ! তাহার পত্নীও যদি এমনই বিদুষী হইত !—চিন্তায় বাধা পড়িল। সে শুনিল, বামাকণ্ঠে মহাকবি কালিদাসের অতুলনীয় কাব্য-শ্লোক কি নির্দ্দোষভাবেই উচ্চারিত হইতেছে :—

"উপমানমভূদ্বিলাসিনাং
করণং যত্তব কান্তিমত্তয়া।
তদিদং গতমীদৃশীং দশাং
ন বিদীর্য্যে কঠিনাঃ খলু স্ত্রিয়ঃ ॥"

কালিদাসের শোকমুহ্যমানা, পতিবিয়োগকাতরা রতির বিলাপগাথা, এই নারীর কণ্ঠে যেন বিলাপধ্বনির মতই করুণ, হৃদয়বিদীর্ণকারী বিষাদ-সঙ্গীতের মতই শুনাইতে লাগিল।

আবৃত্তির ভঙ্গী ও মাধুর্য্য কি চমৎকার ! রমেন্দ্র মুগ্ধ হইল। সংস্কৃত সাহিত্যে জ্ঞান ও অধিকার না থাকিলে এমন অভ্রান্তভাবে আবৃত্তি কখনই সম্ভবপর নহে। সে স্বয়ং কবি ; কিন্তু হয় ত সে-ও এমন ভাবে আবৃত্তি করিতে পারিত না।

"ক নু মাং ত্বদধীনজীবিতাং
বিনিকীর্য্য ক্ষণভিন্নসৌহৃদঃ।
নলিনীং ক্ষতসেতুবন্ধনো
জলসঙ্ঘাত ইবাসি বিদ্রুতঃ ॥"

ব্যথা অনুভব না করিলে, বিয়োগযন্ত্রণা অনুভব না করিলে এমন ভাবে বিধুরা নারীর শোকগাথাকে কে মূর্ত্তি দিতে পারে ?

রমেন্দ্র স্তব্ধ বিস্ময়ে শুনিল,—

"রজনী তিমিরাবগুণ্ঠিতে
পুরমার্গে ঘনশব্দবিক্লবাঃ।
বসতিং প্রিয় কামিনাং প্রিয়া-
স্ত্বদৃতে প্রাপয়িতুং ক ঈশ্বরঃ ॥"

নারীকণ্ঠ হইতে বিলাপের আর্ত্তস্বর কবিতার ছন্দে ছন্দে যেন মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া কক্ষমধ্যে বিচরণ করিয়া ফিরিতে লাগিল। কলেজের প্রবীণ অধ্যাপক—সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত মহামহোপাধ্যায়ের অধ্যাপনাকালে আবৃত্তি শুনিয়া রমেন্দ্র মুগ্ধ হইত ; কিন্তু এই তরুণীর কণ্ঠোত্থিত বিলাপগাথা আজ তাহার চিত্তকে যেমন অভিভূত ও বিচলিত করিল, এমন আর কোনও দিন হয় নাই। বাঙ্গালা ও সংস্কৃত কবিতা আবৃত্তি করিয়া একবার প্রতিযোগী পরীক্ষায় সে প্রথম পুরস্কার পাইয়াছিল, কিন্তু রমেন্দ্রের মনে হইল, এমন ভাবলালিত্যের সাহায্যে সে কখনও আবৃত্তি করিতে পারে নাই।

এই অপরিচিতার প্রতি রমেন্দ্রের শ্রদ্ধা বাড়িয়া গেল। নিবিষ্টমনে শুনিতে শুনিতে সে এমনই তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিল যে, আবৃত্তি শেষ হইবার পরও কণ্ঠরবের ঝঙ্কার, গুঞ্জনগীতি তাহার কানের কাছে ফিরিয়া ফিরিয়া সঞ্চারিত হইতেছিল।

সহসা একটা শব্দে সে মুখ তুলিয়া চাহিল। বাতায়নের নিম্নভাগ বন্ধ ছিল ; খড়খড়িগুলি খোলা ছিল না ; সুতরাং ভিতরে কি হইতেছিল, দেখিবার উপায়

ছিল না। দ্বারোদ্ঘাটনশব্দে সে বুঝিল, ঘরের মধ্যে যাহারা ছিল, তাহারা স্থান ত্যাগ করিতেছে। কৌতূহল-ভরে রমেন্দ্র উপরের দিকে চাহিল; কিন্তু কিছুই দেখা গেল না। রমেন্দ্র ভাবিল, কাযটা ভাল হইতেছে না। এমন গোপনে পরস্ত্রীকে দেখা ভদ্রতারীতিসঙ্গত নহে; কিন্তু সকল সময়ে বিচার পূর্ব্বক সকলে কি কায করিয়া থাকে?

"চল্, টুনি, মহারাজ কি রাঁধ্‌লে, দেখে আসি।"

চুড়ীর রিনি-রিনি ও অঞ্চলের খস্-খস্ শব্দে রমেন্দ্র বুঝিল, গৃহ লোকশূন্য হইল। কয়েক মুহূর্ত্ত স্থিরভাবে দাঁড়াইবার পর তাহার মনে হইল, কাযটা ভাল হয় নাই। ধীরে ধীরে সে বাহিরের ঘরের দিকে চলিল।

গাড়ী-বারান্দায় পৌঁছিয়া সে দেখিল, ডাক্তারবাবু দাঁড়াইয়া। তিনি কখন্ ফিরিয়া আসিয়াছেন?

"এই যে, শিশিরবাবু, আপনি কতক্ষণ?"

রমেন্দ্র আত্মসংবরণ করিয়া বলিল, "খানিক আগেই এসেছি। আপনি বাড়ী নেই, তাই বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম।"

সিগারেটে টান দিয়া ডাক্তার বলিলেন, "বেশ! বেশ!—আজ অনেক দূর বেড়িয়ে এসেছেন বোধ হয়?"

"হাঁ, গোমতীর ওপারে গিয়েছিলুম। বাস্তবিক, লক্ষ্ণৌ সহরটা দেখে শেষ করা কঠিন।"

"কথা মিথ্যা নয়। আসুন, ভিতরে বসা যাক্। আজ সারাদিনটাই পথে পথে কেটে গেল। আসুন, দুটো খোসগল্প করা যাক্।"

পরিচিত আসনে রমেন্দ্র বসিল। ডাক্তার বলিলেন, "আজ বিকালে আপনার ভাগ্যে চা জোটেনি; সেই ১টায় বেরিয়েছিলেন ত? বেহারা!"

"হুজুর!" বলিয়া ভৃত্য হাজির হইল।

ডাক্তার ঘড়ীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "সবে ৭টা; এখনও খাওয়ার বিলম্ব ঢের। রামদীন, অন্দর যাকে কহ, দো পেয়ালা চা।"

দীর্ঘ পর্য্যটনের পর চা-পানের স্পৃহা রমেন্দ্রেরও প্রবল হইয়াছিল।

অল্পসময়ের মধ্যে চা ও রেকাবি-ভরা গরম সিঙ্গাড়া আসিয়া উপস্থিত হইল। ভোজনে ডাক্তারবাবুর আগ্রহ সর্ব্বদাই বিদ্যমান! উপস্থিতকে ত্যাগ করা তাঁহার কোষ্ঠীতে লেখা ছিল না।

"আসুন, শিশির বাবু, সদ্ব্যবহার করা যাক্। আঃ!—সারা দিনটা খেটে খেটে এমন ক্ষিধেও পেয়েছে!—আপনি ত বেরিয়ে গেলেন; আমিও ষ্টেশনে গেলাম। আমার ছোট শ্যালিকা এসেছেন। প্রায় ৪ বছর দুই বোনের দেখা-সাক্ষাৎ নেই। আমার মামাশ্বশুর জয়পুরে থাকেন কি না। এই পথেই যাবার সময় নামিয়ে দিয়ে গেলেন। তাঁকে এত ক'রে বল্লাম, কিন্তু নাম্‌লেন না। দরবার না কি আছে, বিলম্ব করা চল্‌বে না। দেখুন, শিশিরবাবু, এই দাসত্বটা, তা বড়ই হোক্, আর ছোটই হোক্—সব সমান। কেমন, ঠিক নয় কি?"

দাসত্ব যে অতি হেয়, তাহাতে রমেন্দ্রের অণুমাত্র সংশয় ছিল না। কিন্তু মানবের এমনই অদৃষ্ট, এ দাসত্বের শৃঙ্খল হইতে তাহার মুক্তি নাই! হয় মানুষের নিকট, নয় ত প্রকৃতির নিকট দাসখত লিখিয়া দিয়া তাহাকে জন্ম-জন্মান্তর চালিত হইতে হইতেছে! কোথায় মুক্তি! কবে ইহার অবসান!—কখনও তাহা সম্ভবপর হইবে কি?

চিন্তার ধারার সঙ্গে রমেন্দ্রের মন অনেক দূর—সুদূর অতীতে চলিয়া গিয়াছিল।

"শিশিরবাবু, আর খানকয়েক গরম সিঙ্গাড়ায় আপত্তি আছে?"

প্রকৃতিস্থ হইয়া রমেন্দ্র বলিল, "না।"

রামদীন ভিতর হইতে শুধু সিঙ্গাড়া নহে, নিম্‌কী সহ হাজির হইল।

ভৃত্য চলিয়া গেলে রমেন্দ্র গম্ভীরভাবে বলিয়া উঠিল, "একটা অন্যায় কায ক'রে ফেলেছি, ডাক্তারবাবু!"

গিরীন্দ্রনাথ নিম্‌কী চর্ব্বণ করিতে করিতে বলিলেন, "কি রকম?"

"আপনি আস্‌বার আগে বাগানে বেড়াচ্ছিলাম। হঠাৎ মধুর কণ্ঠের গান শুন্‌তে পেয়ে এগিয়ে গিয়েছিলাম। বোধ হয়, আপনার স্ত্রী গাইতেছিলেন। ভারী মিষ্ট লাগল, তাই শুনেছি। কিন্তু কাযটা ভাল হয় নি। স্ত্রীলোকের গান গোপনে শুনে অভদ্রতা করেছি।"

ডাক্তারবাবু কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে রমেন্দ্রের গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন। বক্তব্য শেষ হইলে ডাক্তার.

উচ্চহাস্যে বলিলেন, "বাঃ! এতে অন্যায় কায কি হয়েছে? তাঁরা গলা ছেড়ে গান গাইতে পারেন, আর আমাদের শুন্‌তে দোষ?"

রমেন্দ্র বলিল, "আপনার পক্ষে দোষ নয়, সঙ্গত। কিন্তু অন্তঃপুরের দিকে. অনাহূত হয়ে শুন্‌তে যাওয়া অপরাধ নয়? শুধু গান নয়, কবিতা আবৃত্তি পর্য্যন্ত শুনেছি। কাযটা অন্যায়, গোপন রাখা আরও অন্যায়। তাই আপনার কাছে প্রকাশ কর্‌লাম।"

"বটে! আবার কবিতা আবৃত্তি পর্য্যন্ত শুনেছেন্? আপনার ভাগ্য ভাল বল্‌তে হবে। কি কবিতা, শুনি?"

ডাক্তারবাবু ব্যাপারটাকে সহজভাবে উপেক্ষা করিলেও রমেন্দ্র তাহাতে সায় দিতে পারিল না। সে ক্ষুব্ধভাবে বলিল, "কুমারসম্ভবের রতিবিলাপ।"

"সংস্কৃত শ্লোক! কিন্তু আপনার বোধ হয় ভ্রম হয়েছে। আমার স্ত্রী গাইতে জানেন বটে, আবৃত্তিও মন্দ পারেন না; কিন্তু আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, সে গান, সে আবৃত্তি আমার স্ত্রীর নয়। আমার শালী এসেছে, তারই হবে। সে চমৎকার গায়। আমি একবার তার মুখে রতিবিলাপের আবৃত্তি শুনেছিলাম।"

"যিনিই হ'ন,—আমার অনধিকার ব্যবহারের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কচ্ছি। আপনি আমায় ক্ষমা করুন।"

ডাক্তারবাবু এবার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। রমেন্দ্রও একটু অপ্রতিভ হইল। হাসি থামিলে গিরীন্দ্রনাথ বলিলেন, "ক্ষমা?—আচ্ছা, যাঁদের কাছে আপনি অপরাধী, আপনার আরজি তাঁদের কাছেই পেশ করা যাবে। ক্ষমা করা না-করার মালিক ত তাঁরাই।—এখন ঐ নিম্‌কী ক'খানা শেষ ক'রে ফেলুন ত।"

[ ক্রমশঃ।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

# শোকাতুরা

নিঠুর কে গো কোল থেকে মোর
ছিনিয়ে নিলি দুলালী রে!
মায়াবী কোন্ নূতন খেলায়
আশায় তারে ভুলালি রে!

আলোক দেশের পথে পথে
ফিরতেছিল সোনার রথে
চপলা সে ঝাঁপ দিয়ে যে
নাম্‌ল আমার কোলে,

ডাক্‌লে মা মা ব'লে,
( ওরে ) কোন্ যাদুকর নয়নে তার
নিদের কাঠি বুলালি রে?

ঘুমুল সে কি কাল-ঘুম
চায় না যে আর স্নেহেরো চুম,
নাম-না-রাখা নাম ধ'রে তায়
ডাকি, 'আয় মা ঘুরে'
( ও তোর ) মা যে সদাই ঝুরে
( ওরে ) পাষাণ কে গো প্রথম হাটেই
বেচা-কেনাই তুলালি রে!

কোন্ ঝড়ে তা কে বলিবে,
জীবনের দীপ গেল নিভে,
আলো বাতাস, গন্ধ বরণ
মিশ্‌ল আঁধারমাঝে,

আজি দীপ হারানো সাঁঝে,
( ওরে ) কোন্ মায়াবী আমাকে হায়,
ব্যথার মদে দুলালি রে!

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

# ছুটী

## ১

গুরুমহাশয় লোচন সরকার ছাত্রদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখ্, যে যত সকাল সকাল পূজোর পার্ব্বণী দিতে পারবে, তার তত সকাল সকাল ছুটী। নইলে বুঝেছিস্?"

নইলে কি যে হইবে, তাহা গুরু মহাশয় স্পষ্ট না বলিলেও ছাত্ররা কিন্তু স্পষ্টই তাহা বুঝিয়া লইল এবং বুঝিয়া গুরুমহাশয়ের সম্মুখে পতিত বেতখানির দিকে সকলেই শঙ্কাকাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। গুরুমহাশয় বামহস্ত দ্বারা দীর্ঘ গুম্ফরাশিকে সংযত করিতে করিতে বলিলেন, "পূজোর পার্ব্বণী কত জানিস্? দু'আনা। এ ত ষষ্ঠীপূজো, মাকালপূজো নয় যে, দু' এক পয়সা পার্ব্বণী দিলেই চলবে। বড় পূজোর বড় পার্ব্বণী। বুঝে'ছস্ সব?"

কতকগুলি ছাত্র সমস্বরে উত্তর দিল, "আজ্ঞে।" যাহারা মুখে কিছু বলিল না, তাহারা ঘাড় নাড়িয়াই এ উত্তরে সায় দিল। গুরু মহাশয় বলিলেন, "কাল-পরশুর মধ্যে পার্ব্বণী সব আনা চাই। শুক্রবারে ছুটী দিয়ে ছেলেদের জন্যে কাপড়-চোপড় কিনতে আমাকে কলকাতায় যেতে হবে; বুঝেছিস্?"

পুনরায় উত্তর হইল, "আজ্ঞে।"

দুই দিন পরেই ছুটী। ছেলেদের মনে আনন্দ যেন আর ধরে না। পাঠশালার ছুটীর পর তাহারা হর্ষ-কোলাহলে পল্লীপথ মুখরিত করিতে করিতে গৃহাভিমুখে ধাবিত হইল। কেবল একটি ছেলে তাহাদের এই আনন্দ-কোলাহলে যোগ দিল না; সে ম্লান বিবর্ণ মুখে ধীরে ধীরে সকলের পশ্চাতে চলিল।

বড় গরীবের ছেলে। বাপ বছরখানেক আগে মারা গিয়াছিল। পিতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই যে দুই চারি বিঘা জমীজমা ছিল, বাকী খাজনার দায়ে জমীদার তাহা নীলাম করিয়া খাসে ডাকিয়া লইলেন। বিধবা মা বাড়ীর পূই-শাক, লাউ-কুমড়া বেচিয়া, লোকের ঘরে ধান ভানিয়া

বয়স বেশী না হইলেও সাত আট বৎসরের ছেলে, কিন্তু নিজেদের অবস্থা বুঝিল, মায়ের দুঃখ-কষ্ট বুঝিতে পারিল। মা যে তাহারই জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া, সকাল হইতে দুপুর পর্য্যন্ত ঢেঁকি টানিয়া আধ সের চাউল সংগ্রহ করিতেছে, নিজের ভাতগুলি তাহাকে দিয়া নিজে উপবাস দিয়া থাকিতেছে, বালক-বুদ্ধিতেও ইহা বুঝিয়া লইতে তাহার বিলম্ব হইল না। কাযেই সে কাহারও গরু চরাইয়াও নিজের পেটের খোরাকের যোগাড় করিতে ইচ্ছুক হইল। মা কিন্তু তাহা করিতে দিল না; বলিল, "না, বাছা, তাঁরও ইচ্ছা ছিল, আমারও ইচ্ছা, তুই দু'কলম লিখতে পড়তে শিখবি।"

ছেলে বলিল, "আমি লেখাপড়া শিখবো, আর তুমি ধান ভেনে বেড়াবে?"

মা হাসিয়া বলিল, "তা ধান ভান্‌লেই বা, কেব্‌লা। তুই লেখাপড়া শিখে দু'পয়সা রোজগার কত্তে পারলে আর ত আমাকে ধান ভান্‌তে হবে না?"

তাহাই হইল। গুরুমহাশয় লোচন সরকারের হাতে পায়ে ধরিয়া বিনা বেতনে কেব্‌লাকে পাঠশালায় ভর্ত্তি করিয়া দিল। কেব্‌লা গুরুমহাশয়ের এঁটো বাসন মাজিয়া, তামাক সাজিয়া, পা টিপিয়া দিয়া, যতটুকু অবসর পাইত, লেখাপড়া শিখিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিত।

আপনাদের অবস্থার হীনতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া কেব্‌লা অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে মিশিত না। পাঠশালার ছুটীর পর ছেলেরা রাস্তায় আসিয়া যখন খেলায় প্রবৃত্ত হইত, কেব্‌লা তখন পাশ কাটাইয়া ঘরে চলিয়া যাইত। কেহ খেলিবার জন্য ডাকিলে বলিত, "না ভাই, ঘরে গিয়ে বেলাবেলি পড়া মুখস্থ কত্তে হবে।"

"দূর বোকা, বেলাবেলি পড়া মুখস্থ করবি কেন? করবি রাত্রে।"

"রাত্রে পড়া কত্তে তেল কোথা পাব, ভাই?"

করিতে থাকিত। কেব্‌লা কিন্তু তাহাতে কর্ণপাত করিত না।

আজ কিন্তু আসন্ন ছুটীর সম্ভাবনাতেও কেব্‌লাকে এমন নিরুৎসাহভাবে বাইতে দেখিয়া ঘোষেদের জানকী তাহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিল, "কি রে কেব্‌লা, ছুটীর সময়েও পড়া মুখস্থ করবি না কি ?"

কেব্‌লা ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিল, "হুঁ।"

রায়েদের হরিধন বলিল, "কেব্‌লা হাজরা জজ-মেজেষ্টর হবেই হবে।

জানকী বলিল, "কাল পার্ব্বণী নিয়ে আসবি ত ?

ঘাড় দোলাইয়া কেব্‌লা বলিল, "আন্‌বো।"

জানকী বলিল, "না আনলে কিন্তু মজাটা দেখবি।"

## ২

"মা !"

"কে রে, কেব্‌লা এয়েছিস্ ? ঘরে আয়।"

"তুমি শুয়ে কেন, মা ? জ্বর হয়েছে না কি ?"

কাঁথার ভিতর হইতে মুখটা একটু বাহির করিয়া শীতকম্পিত স্বরে মা বলিল, "হাঁ বাছা, পোড়া জ্বর কিছুতেই ভুল্‌তে চায় না। বোসেদের পুজোবাড়ীর ধান ভান্‌তে ভান্‌তে কাঁপুনি এলো।"

কেব্‌লা ঘরে ঢুকিয়া মায়ের মাথার কাছে গিয়া বসিল, এবং তাহার কপালে হাত দিয়া বলিল, "উঃ, তোমার কপালটা আগুনের মত গরম যে, মা।"

মা বলিল, "জ্বরটা এই এসেছে কি না।"

কেব্‌লা নিঃশব্দে গিয়া মায়ের কপালে হাত বুলাইতে লাগিল। মা বলিল, "ব'সে রইলি যে, খাবি না ?"

মুখ মচকাইয়া কেব্‌লা বলিল, "কি আর খাব ?"

মা বলিল, "হাঁড়িতে ওবেলার ভাত রয়েছে, তাই জল ঢেলে খা।"

"খাচ্ছি।"

"কিন্তু তরকারী ত কিছুই নাই। কি দিয়ে খাবি বল দেখি ?"

"কি দিয়ে আর ? নুণ আছে ত !"

ঈষৎ হাসিয়া মা বলিল, "ক্ষেপা ছেলে! শুধু নুণ দিয়ে কি ভাত খাওয়া যায় ? গাছে একটা বেগুণ ঝুলছে; এক নুড়ো খড় জেলে সেটাকে পুড়িয়ে নে।"

কেব্‌লা বলিল, "আজ আমি বেগুণটা পুড়িয়ে খাব, কাল কি দিয়ে খাবে তুমি ? জ্বরে জ্বরে তোমার মুখে ত কিছু রোচে না ?"

জ্বরে হাঁপাইতে হাঁপাইতেও মা উচ্চ হাসি হাসিয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে বলিল, "আমার মুখে রোচে না ব'লে তুই শুধু ভাত খাবি ? আমার পোড়া পেটে আগুন লাগুক্ !"

কেব্‌লা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। মা বলিল, "আচ্ছা, থাম্, আমার শীতটা একটু ক'মে এলে আমি নিজেই উঠে—"

ব্যস্ততা সহকারে কেব্‌লা বলিয়া উঠিল, "না না, তোমাকে আর উঠতে হবে না, আমি জোগাড় ক'রে নিচ্ছি।"

বলিয়া সে উঠিয়া পড়িল, এবং বেগুণ পোড়াইয়া জল-ঢালা ভাত খাইয়া পুনরায় মায়ের কাছে আসিয়া বসিল।

সন্ধ্যার পর শীতটা কমিয়া আসিলে মা উঠিয়া বসিল। কেব্‌লা মায়ের কোলের কাছে শুইয়া বলিল, "দেখ মা, গুরু মহাশয়কে পূজোর পার্ব্বণী দিতে হবে।"

মা জিজ্ঞাসা করিল, "পার্ব্বণী কি রে, কেব্‌লা ?"

কেব্‌লা বলিল, "পূজোর পার্ব্বণী গো, দু'আনা পয়সা। গুরু মশায় বলেছে, কাল-পরশুর ভিতর যে ছেলে পার্ব্বণী না আন্‌বে, তাকে ছুটী দেবে না। তা ছাড়া মেরে হাড় গুঁড়ো ক'রে দেবে।"

মা বলিল, "পার্ব্বণী দিতে আর সব ছেলেদের বলেছে। গুরু মশায় জানে, তুই গরীবের ছেলে, তোকে কিছু দিতে হবে না।"

মাথা নাড়িয়া কেব্‌লা বলিল, "কিন্তু না দিলে যদি মারে ?"

মা বলিল, "না, না, মারবে না, তোর ভয় নাই।"

মায়ের কথায় কেব্‌লা অপেক্ষাকৃত নিঃশঙ্ক হইল। খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল, "দেখ মা, তিনে মাইতি বলছিল, পূজোর সময় তার বাবা তাকে ফুল-পেড়ে কাপড় কিনে দেবে।"

দুঃখ-গম্ভীর স্বরে মা বলিল, "পূজোর সময় ছেলে-পিলেকে নতুন কাপড় কিনে দিতেই ত হয়, বাছা। কিন্তু আমার যেমন কপাল! গাছে গোটা দশেক কুমড়ো

হয়েছিল। ভেবেছিলাম, দশটা কুমড়ো বেচলে কোন্ না পাঁচ সিকে হবে। তার ভেতর থেকে তোর কাপড় একখানা কিনে দেব। কিন্তু দীনু ঠাকুর এসে ধরলে, মায়ের কাছে বলির জন্যে তিনটে কুমড়ো দিতে হবে। বামুন মায়ের নাম ক'রে চাইলে, দিতে হ'লো। তার পর বোসেরা পাঁচটা নিয়েছে। তা ওরা কি লেহ্য দাম দেবে? বড় জোর দেয় ত গণ্ডা পাঁচেক পয়সা।"

মায়ের কাতরতা দেখিয়া কেব্‌লা বলিল, "আমার নতুন কাপড়ে দরকার নাই, মা। কেন, পুরানো কাপড় প'রে কি ঠাকুর দেখা যায় না?"

মা জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া দুঃখগাঢ় কণ্ঠে বলিল, "তা পুরানো কাপড়ই তোর কোথায়, বাছা? ঐ ত একখানি কাপড়, তার সাত জায়গায় ছেঁড়া।"

কেব্‌লা বলিল, "হোক্ ছেঁড়া। কাপড়খানা কেচে দিও, তা হ'লেই হবে। কিন্তু গুরুমশায়ের পার্ব্বণীর পয়সা না দিলে হয় ত ছুটী দেবে না।"

মা বলিল, "না দেয়, বোসেদের ঘর থেকে কুমড়োর দাম আদায় ক'রে এনে দেব তখন।"

মায়ের কথায় আশ্বাস পাইয়া কেব্‌লা নিশ্চিন্তচিত্তে ঘুমাইয়া পড়িল।

### ৩

গুরুমহাশয় ডাক দিলেন, "কে রে, পার্ব্বণীর পয়সা সব এনেছিস্?"

ছেলেরা একে একে উঠিয়া পার্ব্বণীর পয়সা লইয়া গুরুমহাশয়ের সম্মুখে হাজির করিল। সকলেই উঠিল, শুধু কেব্‌লা উঠিল না। ঘোষেদের রমা বলিল, "কেব্‌লা পয়সা আনে নি, গুরুমশায়।"

গুরুমহাশয় ডাকিলেন, "কেব্‌লা!"

"আজ্ঞে।"

"এ দিকে আয়।"

কেব্‌লা ধীরে ধীরে আসিয়া গুরুমহাশয়ের সম্মুখে দাঁড়াইল। গুরুমহাশয় বেত হাতে লইয়া বজ্রগম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর পার্ব্বণীর পয়সা কোথায়?"

ভীতিবিবর্ণমুখে কেব্‌লা বলিল, "মা বলেছে, গুরুমশায়, আমাকে পার্ব্বণীর পয়সা দিতে হবে না।"

দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া গুরুমহাশয় বলিলেন, "কেন, তুমি আমার গুরুপুত্তুর না কি?"

কেব্‌লা ভয়ে মুখ নীচু করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। গুরুমহাশয় ক্রোধে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "এক পয়সা মাইনে নাই, পার্ব্বণীর দুটো পয়সা দেবে না, বেয়ারিং-পোষ্টে লেখাপড়া শিখবে। ব্যাটা আমার আলালের ঘরের দুলাল রে! ধ'রে নিয়ে আয় ত ব্যাটাকে।"

কেব্‌লা গুরুমহাশয়ের সম্মুখে একটু দূরে দাঁড়াইয়া ছিল। গুরুমহাশয়ের আদেশ পাইয়া একটি ছেলে আসিয়া তাহাকে খুব কাছে ঠেলিয়া দিল। কেব্‌লা ভয়ে চারি দিক্ অন্ধকার দেখিল। ভীতিবিজড়িত স্বরে বলিল, "মা বলেছে, গুরুমশায়—"

তাহাকে কথা শেষ করিবার অবসর না দিয়া গুরুমহাশয় সগর্জ্জনে বলিয়া উঠিলেন, "তোর মা তোর মাথা খেয়েছে। ব্যাটা গাধা!"

কথার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হাতের বেত সপাং করিয়া কেব্‌লার পিঠে পড়িল। কেব্‌লা "মা গো" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহার এই সকাতর চীৎকারে গুরুমহাশয়ের হৃদয় কিন্তু বিচলিত হইল না. তাঁহার হস্তস্থিত বেত্রদণ্ড কেব্‌লার পিঠে, পায়ে, মাথায়, হাতে সপাং সপাং করিয়া পড়িতে লাগিল। কেব্‌লার সকরুণ চীৎকারে ক্ষুদ্র পাঠশালা-গৃহ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। কাঁদিতে কাঁদিতে, প্রহৃত স্থানে হাত বুলাইতে বুলাইতে কেব্‌লা অবসন্নভাবে বসিয়া পড়িল।

গুরুমহাশয় এতক্ষণে প্রহার হইতে নিবৃত্ত হইয়া হাতের বেত উঠাইয়া বলিলেন, "বল্ ব্যাটা, পার্ব্বণীর পয়সা আন্‌বি কি না?"

কাঁদিতে কাঁদিতে, হাঁপাইতে হাঁপাইতে কেব্‌লা বলিল, "আন্‌বো, গুরুমশায়, মা বলেছে. কুমড়োর পয়সা আদায় ক'রে—"

গুরুমহাশয় বলিলেন, "কুমড়োর পয়সা? তোদের গাছে কুমড়ো হয়েছে না কি?"

রমা বলিয়া উঠিল, "বিস্তর কুমড়ো ফলেছে, গুরুমশায়।"

গুরুমহাশয় বলিলেন, "এত কুমড়ো হয়েছে, কৈ, আমার জন্যে ত একটাও নিয়ে আসিস্ না। আজ গোটা দুই নিয়ে আসিস্।"

কেব্‌লা তাঁহার আদেশে স্বীকৃতি জ্ঞাপন করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়া স্বস্থানে বসিল। গুরুমহাশয় বলিলেন, "কাল থেকে সকলের ছুটী, শুধু কেব্‌লার ছুটী নাই। যদ্দিন না পার্ব্বণী নিয়ে আসবে, তদ্দিন তাকে দু'বেলা হাজিরী দিতে হবে।"

ছাত্রদিগকে আদেশ জ্ঞাপন করিয়া গুরুমহাশয় পার্ব্বণীর পয়সা গণিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

কেব্‌লা মার খাইয়া ততটা কাতর হইল না, যতটা কাতর হইল অঙ্গের এই সকল প্রহারচিহ্ন লইয়া ঘরে ফিরিতে। বেত্রের নিষ্করুণ আঘাতে তাহার দেহের অনেক স্থানই ফুলিয়া উঠিয়াছিল, দুই এক যায়গায় কাটিয়া গিয়া একটু একটু রক্তও পড়িতেছিল। এই সকল প্রহার-চিহ্ন লইয়া সে কিরূপে মায়ের সম্মুখে উপস্থিত হইবে? ইহা দেখিলে মা ত কাঁদিয়াই আকুল হইয়া পড়িবে। হায়, গুরুমহাশয় তাহার দেহকে এরূপে প্রহার-চিহ্নিত না করিয়া অন্য কোনরূপ কঠিন সাজা দিলেন না কেন? কেব্‌লা প্রহার-চিহ্নগুলাকে ঢাকিবার অভিপ্রায়ে কোঁচার খুঁটটা গায়ে দিয়া ঘরে ফিরিল।

দুপুরবেলা তাহাকে গায়ে কাপড় দিতে দেখিয়া মা জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ রে কেব্‌লা, গায়ে কাপড় দিয়েছিস্ কেন? কিছু অসুখ-বিসুখ কচ্ছে না কি?"

কেব্‌লা একটু শুষ্ক হাসি হাসিয়া উত্তর দিল, "না না, অম্নি কাপড়টা গায়ে জড়িয়েছি।"

"কৈ, দেখি তোর গা।"

মা তাড়াতাড়ি আসিয়া কেব্‌লার কপালে হাত দিয়া শঙ্কিত স্বরে বলিয়া উঠিল, "এই যে কপালটা একটু গরম মনে হচ্ছে। এ কি, মাথার সাম্‌নেটা এত ফুলে উঠেছে কেন?"

কেব্‌লা মাথা নাড়া দিয়া মায়ের কাছ হইতে একটু সরিয়া আসিয়া বলিল, "রাস্তায় আস্‌তে আস্‌তে প'ড়ে গিয়েছিলুম, তাই ওখানটা ফুলে উঠেছে। হাঁ মা, কুমড়ো দুটো কি হ'লো?"

মা বলিল, "সে দুটো গাছ থেকে তুলে রেখেছি। বোসেরা আরও দুটো কুমড়ো চেয়েছিল। বিকেলে নিয়ে যাব। দেখি, যদি সাতটা কুমড়োর দাম পাই, তোকে একখানা কাপড় এনে দেব।"

কাপড়ের নামে কেব্‌লার মুখখানা উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কিন্তু মুহূর্ত্ত পরেই তাহা ম্লান হইয়া আসিল। বলিল, "কাপড় ত এনে দেবে, কিন্তু গুরুমশায় যে দু'টো কুমড়ো চেয়েছে।"

মা বলিল, "চেয়েছে—দেব। গাছে ত আরও অনেক ফল ধরেছে। বড় হ'লে দিয়ে আসবি।"

ঘাড় নাড়িয়া কেব্‌লা বলিল, "না মা, গুরুমশায় রাগ করবে। আমার কাপড়ে কায নাই।"

ঝঙ্কার দিয়া মা বলিল, "তোর কায নাই, আমার কায আছে। সব ছেলে নতুন কাপড় প'রে ঠাকুর দেখতে যাবে, আর তুই আমার ছেঁড়া কাপড় প'রে বেড়াবি? কপালই না হয় মন্দ হয়েছে, কিন্তু সাধ-সয়াল ত যায় নি, বাছা! আজ যদি সে বেঁচে থাক্‌তো।"

বলিতে বলিতে মায়ের চোখ দুইটা জলে ভরিয়া আসিল। কেব্‌লা বলিল, "ভাত দেবে চল, মা, বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে।"

মা তাড়াতাড়ি আঁচলে চোখ মুছিয়া ছেলেকে ভাত দিতে চলিল।

ভাত খাইতে খাইতে কেব্‌লা বলিল, "গুরুমশায়ের পার্ব্বণীর পয়সাটা দিতে হবে, মা। নইলে ছুটী দেবে না।"

মা বলিল, "তা হ'লে তোর কাপড় হবে কি ক'রে?"

কেব্‌লা বলিল, "কাপড় হোক্, না হোক্, পার্ব্বণী দিতেই হবে। সব ছেলে ঠাকুর দেখে বেড়াবে, আর আমিই কি পাঠশালে গিয়ে ব'সে থাকবো?"

মা বুঝিল, কথাটা ঠিক। বিষাদখিন্ন স্বরে বলিল, "তাই যা হয় হবে।"

কেব্‌লা বলিল, "যা হয় হবে নয়, দিতেই হবে। আজ তুমি গিয়ে কুমড়োর দাম আদায় ক'রে নিয়ে এস। কাল সকালে পার্ব্বণী দিয়ে ছুটী নিয়ে আসবো। আর ঐ কুমড়ো দুটোও গুরুমশায়কে দিয়ে আসতে হবে। নয় ত গুরুমশায় বড্ড রাগ করবে।"

"আচ্ছা" বলিয়া মা কেব্‌লার এঁটো পাতর ধুইতে চলিল। কেব্‌লা জিজ্ঞাসা করিল, "পাতর ধুতে যাচ্ছো, তুমি ভাত খাবে না?"

মা উত্তর করিল, "না। গেল রাত্রে অত জ্বর হয়েছিল, আজ আর ভাতটা খাব না।"

সন্দিগ্ধ স্বরে কেব্‌লা বলিল, "কেন, জ্বর ছেড়ে গেলেই ত তুমি ভাত খাও।"

গম্ভীর মুখে মা বলিল, "খাই ব'লেই ত পোড়া জ্বর ছাড়তে চায় না।"

মা ঘাটে চলিয়া গেল। কেব্‌লার সন্দেহ হইল। সে ঘরে ঢুকিয়া চাউলের হাঁড়ি খুঁজিয়া দেখিল, হাঁড়িতে এক মুঠাও চাউল নাই। মা ঘাট হইতে ফিরিলে কেব্‌লা জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ মা, জ্বরের জন্তে ভাত খেলে না, না চাল নাই ব'লে উপোস দিলে?"

মা একটু ইতস্ততঃ করিয়া উত্তর দিল, "জ্বরের জন্তেও বটে, চালও আজ বাড়ন্ত। সকালে ধান ভান্‌তে গেলে আধ সের চাল আসতো, তা রেতে জ্বরে হাড় ভেঙে দিয়েছে, সকালে আর ঢেঁকি টান্‌তে যেতে পারলুম না। দেখি, পারি যদি এ বেলা যাব।"

ভারীমুখে কেব্‌লা বলিল, "তা পারলে না যখন, তখন অতগুলো ভাত আমাকে না খাইয়ে তুমিও ত ওর এক মুটো খেলে পারতে?"

ঈষৎ হাসিয়া মা বলিল, "পাগল ছেলে! তোকে আধ-পেটা খাইয়ে তোর ভাত আমি খেতে যাব?"

রাগতভাবে কেব্‌লা বলিল, "আর তোমাকে উপোস রেখে আমাকেই পেট ভ'রে খেতে হবে বুঝি?"

স্নেহসজল দৃষ্টিতে পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া মা বলিল; "ওরে ক্ষ্যাপা, ছেলের পেট ভরলেই মায়ের পেট ভরে, তা জানিস্‌?"

রাগে মুখখানাকে ভারী করিয়া, জোরে মাথা নাড়িয়া কেব্‌লা বলিল, "হাঁ, জানি।"

বলিয়াই সে মায়ের সম্মুখ হইতে চলিয়া গেল। মা স্নেহ-প্রফুল্ল মুখে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল, 'আমি বড় দুঃখী, কিন্তু এত দুঃখের মধ্যেও আমার মত সুখী কে? এমন মাতৃভক্ত ছেলে কোন্‌ ভদ্রলোকের ঘরে আছে?'

বিকালে কেব্‌লার মা কিন্তু ধান ভানিতে যাইতে পারিল না। রাত্রিতে জ্বর ভোগ করিয়াছে, তাহার উপর সারাদিনের উপবাস। কিন্তু রাত্রিতে কেব্‌লা কি খাইবে? কেব্‌লার মা ভাবিল, "দেখি যদি কুমড়োর দাম পাই, তা থেকেই না হয় এক আনার চাল কিনে আনবো। কাপড় কেনা ত হ'লো না।"

এইরূপ স্থির করিয়া কেব্‌লার মা কুমড়ার দাম আদায় করিবার জন্য বোসেদের বাড়ীতে উপস্থিত হইল। কিন্তু সকালে ধান ভানিতে না আসায় বোস-গিন্নী তাহার উপর এতই রাগিয়াছিলেন যে, তাহাকে দেখিয়াই ক্রোধে গর্জ্জিয়া উঠিলেন এবং কেব্‌লার মা যে নেহাৎ ছোটলোকের মেয়ে, তাহার আদৌ কথার ঠিক নাই, তাহার কথার উপর নির্ভর করিয়া বোস-গিন্নী দয়ে ডুবিতে বসিয়াছেন, বলিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন। কেব্‌লার মা আপনার অসুখের কথা জানাইয়া তাঁহার ক্রোধশান্তির চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার অসুখে বোস-গিন্নীর কি আইসে যায়? পূজায় দশ মণ চাউলের খরচ। কেব্‌লার মা ধান ভানিয়া এই চাউল তৈয়ার করিয়া দিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। এখন অসুখের দোহাই দিয়া কথার খেলাপ করিলে চলিবে কেন? শেষে কি তাঁহাকে লোকের কাছে 'অভ্রম' হইয়া পড়িতে হইবে?

কেব্‌লার মা বিস্তর অনুনয়-বিনয় করিয়া, কাল সকালে নিশ্চয়ই ধান ভানিতে আসিবে বলিয়া তাঁহাকে শান্ত করিল। তাহার পর সে কুমড়া পাঁচটার দাম চাহিল। বোস-গিন্নী তখন আর দুইটা কুমড়া আনিবার কথা বলিলে কেব্‌লার মা জানাইল যে, সে দুইটা কুমড়া আপাততঃ দিতে পারিবে না। ইহাতে বোস-গিন্নী পুনরায় রাগিয়া উঠিলেন; ক্রোধভরে জানাইলেন যে, বাকী কুমড়া দুইটা না দিলে এক পয়সাও দিবেন না। কেব্‌লার মা কাতরতা সহকারে বলিল, "নিদেন আজ তিন গণ্ডা পয়সা দাও, মা। নইলে ছেলেটা পাঠশালে ছুটী পাবে না, আজ রাত্রে তাকে উপোস দিতে হবে।"

বোস-গিন্নী কিন্তু তাহার কাতরতায় বিচলিত হইলেন না; বলিলেন, "কাল সকালে কুমড়ো দুটো নিয়ে ধান ভানতে আসবি। সব পয়সা মিটিয়ে দেব।"

কেব্‌লার মা নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িল। অন্ততঃ এক আনা পয়সার জন্য বিস্তর কাকুতি-মিনতি করিতে লাগিল। বোস-গিন্নী কিন্তু এই ছোটলোক মাগীর ঘ্যান্‌ঘ্যানানিতে কর্ণপাত করা আবশ্যক বোধ করিলেন না। বাড়ীতে পূজা, তাঁহার কত কায; বসিয়া বসিয়া কেব্‌লার মা'র দুঃখের কাহিনী শুনিলে ত তাঁহার চলিবে না। কাযেই তিনি কেব্‌লার মাকে কল্য আসিবার জন্য আদেশ

দিয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন। কেব্‌লার মা চোখের জল চোখে চাপিয়া হতাশভাবে ঘরে ফিরিল!

কিন্তু ঘরে ফিরিয়া সে যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার চক্ষুস্থির হইয়া গেল। দেখিল, কেব্‌লার জ্বর আসিয়াছে, তাহার দেহের স্থানে স্থানে ফুলিয়া উঠিয়াছে। সে ছেঁড়া কাপড়ের খুঁটটা গায়ে জড়াইয়া ঘরের বাহিরে রোদে পড়িয়া রহিয়াছে। কেব্‌লার মা ছেলের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে ব্যগ্র, শঙ্কিত স্বরে বলিয়া উঠিল, "এ সব কি রে কেব্‌লা?"

কেব্‌লা জ্বরে ধুঁকিতে ধুঁকিতে বলিল, "ও সব কিছু নয়, কুমড়োর দাম পেয়েছ?"

মা বলিল, "আজ পাওয়া গেল না, বাছা, কাল দেবে বলেছে।"

কেব্‌লার জ্বরস্ফীত মুখখানা নৈরাশ্যে বিবর্ণ হইয়া আসিল; বলিল, "কাঁথাখানা এনে আমার গায়ে চাপা দাও, মা, বড্ড শীত কচ্ছে।"

সন্ধ্যার পর জ্বরটা খুব প্রবল হইয়া উঠিল। জ্বরের প্রকোপে কেব্‌লা সারারাত্রি ছট্‌ফট্‌ করিয়া কাটাইল। মধ্যে মধ্যে করুণকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "আমাকে ছুটী দেবে না, মা গো, আমাকে ছুটী দেবে না!"

### ৮

সকালেও জ্বরের বেগ কমিল না দেখিয়া কেব্‌লার মা ভীত হইয়া পড়িল। শুধু জ্বর নয়, সর্ব্বাঙ্গে ভয়ানক বেদনা, সারা দেহটা ফুলিয়া লাল হইয়া উঠিয়াছে। এমন অবস্থায় কেব্‌লার মা ছেলেকে ফেলিয়া রাখিতে সাহস করিল না, ডাক্তারের কাছে ছুটিল।

গ্রামে একমাত্র ডাক্তার হরিশ বোস। কিন্তু ম্যালেরিয়া আসিয়া দেশের উপর এমন আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল যে, তাঁহার স্নানাহারের সময় পর্য্যন্ত ছিল না। লোক হাতে টাকা গুঁজিয়া দিয়াও তাঁহার সাক্ষাৎ পাইতেছিল না। এ অবস্থায় কেব্‌লার মা তাঁহার সহিত একটা কথা কহিবার অবকাশও পাইল না।

আধ ক্রোশ দূরে সরকারী দাতব্য চিকিৎসালয় ছিল। কেব্‌লার মা অগত্যা ছেলেকে লইয়া সেখানে উপস্থিত হইল। কিন্তু সেখানেও রোগীর সমাগমে যেন রথযাত্রার মেলা বসিয়া গিয়াছে। ডাক্তারবাবু প্রত্যেক রোগীর নাড়ী দেখিবারও অবসর পাইতেছেন না। তিন জন কম্পাউণ্ডার ঔষধ যোগাইতে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া পড়িতেছে।

ডাক্তারবাবু কেব্‌লার হাতখানা একবার স্পর্শ করিয়াই জ্বর-মিক্‌শ্চারের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। কেব্‌লার মা ছেলের গা-হাতের বেদনার কথা বলিতে গেল। কিন্তু এত কথা শুনিবার অবসর তাঁহার ছিল না। তিনি কেব্‌লার মাকে ধমক্ দিয়া অন্য রোগী দেখিতে ব্যস্ত হইলেন।

ঔষধ পাইতে বেলা এগারটা বাজিয়া গেল। এখন শরতের রৌদ্র বেশ প্রখর হইয়া উঠিয়াছে। সেই রৌদ্রে সাত বছরের ছেলেকে কোলে লইয়া, জল-কাদা ভাঙ্গিয়া ঘরে ফিরিতে কেব্‌লার মা এতই পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল যে, রাস্তার মাঝে মাঝে না বসিয়া আসিতে পারিল না। সুতরাং ঘরে ফিরিতে মধ্যাহ্ন অতীত হইয়া গেল।

ঔষধ ত পাওয়া গেল, কিন্তু পথ্যের উপায়? কেব্‌লার মা ছেলেকে ঘরে শোয়াইয়া বোস-গিন্নীর কাছে ছুটিল। সকালে ধান ভানিতে না আসায় বোসগিন্নী একে ত তাহার উপর খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন; তাহার উপর এমন অসময়ে পয়সার তাগাদায় বিরক্ত হইয়া যাহা মুখে আসিল, তাহাই বলিয়া ছোটলোক মাগীকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। কেব্‌লার মা সে সকল তিরস্কার মাথা পাতিয়া লইয়া, স্বীয় দুঃখকাহিনী বিবৃত করিয়া দুই গণ্ডা পয়সার জন্য কাঁদাকাঁটা করিতে লাগিল। অগত্যা বোস-গিন্নী তাহাকে দুই গণ্ডা পয়সা দিয়া বিদায় করিয়া, ছোটলোকের যে আজকাল কিছুমাত্র আঁকেল নাই, এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

কেব্‌লার মা সেই দুই গণ্ডা পয়সা পাইয়াই কৃতার্থ হইল। তাহা হইতে সে ছেলের জন্য সাবু-মিছরী কিনিয়া আনিল এবং দুই পয়সার মুড়ী আনিয়া নিজের দুই দিনের উপবাসের পারণা করিল।

সেই দিন বৈকালে কেব্‌লার মা নিজেও জ্বরে পড়িল। কিন্তু নিজের জ্বরকে সে গ্রাহ্য করিল না। পরদিন সে আবার কেব্‌লাকে কোলে লইয়া সরকারী ডাক্তারখানায় গেল, এবং সেখান হইতে ফিরিয়া, জলখাবার ঘটীটি বাঁধা দিয়া নিজের ও পুত্রের পথ্যের যোগাড় করিল।

সরকারী ঔষধে কেব্‌লার জ্বর কিন্তু কমিল না। আগে জ্বর ছাড়িয়া ছাড়িয়া হইতেছিল! এখন কিন্তু দিনরাত

সমানভাবে জ্বর ভোগ করিতে লাগিল। গায়ের বেদনাও বাড়িয়া উঠিল, চোখ দুইটা লাল হইল; জ্বর যখন বেশী হইত, তখন নানাবিধ প্রলাপ বকিতে থাকিত। জ্বর একটু কমিয়া আসিলে নির্জ্জীবভাবে পড়িয়া থাকিত।

প্রতিবেশীরা কেব্‌লার অবস্থা দেখিয়া তাহার মাকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলিল, "ও কেব্‌লার মা, তোর কেব্‌লার অসুখ শক্ত। হরিশ বোসকে এনে দেখা।"

কিন্তু হরিশ বোসের একে ডাক্তারীর ঝঞ্ঝাট, তাহার উপর বাড়ীতে পূজা। সুতরাং কেব্‌লাকে দেখিতে আসা দূরের কথা, কেব্‌লার মা'র কাঁদাকাটা শুনিবার অবসরও তাঁহার ছিল না।

সে দিন ষষ্ঠী। লোচন সরকার ছেলেদের কাপড়-চোপড় কিনিয়া মুটের মাথায় দিয়া কলিকাতা হইতে ফিরিতেছিলেন। গ্রামের কাছাকাছি আসিয়া দেখিলেন, রাস্তার পাশে বটগাছের তলায় কেব্‌লার মা কেব্‌লাকে কোলে লইয়া বসিয়া রহিয়াছে। দেখিয়া সরকার মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই এখানে কেন, কেব্‌লার মা?"

ডাক্তারখানা হইতে ফিরিতে ফিরিতে কেব্‌লার মা'র জ্বর আসিয়াছিল। কাযেই সে আর অগ্রসর হইতে না পারিয়া বটগাছের ছায়ায় বসিয়া পড়িয়াছিল; গুরুমহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে সে ধুঁকিতে ধুঁকিতে বলিল, "কেব্‌লার আজ পাঁচ দিন জ্বর। ওকে নিয়ে কোম্পানীর ডাক্তারখানা গিয়েছিলাম। কিন্তু রাস্তার মাঝে মুর্খ-পোড়া জ্বর এসে আমাকে ধরেছে।"

তাহার কথাসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে কেব্‌লা বিকৃতকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল, "জল, জল। আমাকে ছুটী দেবে না, মা গো, আমাকে ছুটী দেবে না।"

গুরুমহাশয় ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দ্রুতপদে গ্রামের দিকে চলিয়া গেলেন।

সেই দিন সন্ধ্যার সময় কেব্‌লার অবস্থা দেখিয়া প্রতিবেশীরা ভীত হইয়া বলিল, "এক কায কর্, কেব্‌লার মা, বোস-গিন্নীকে গিয়ে ধর্। সে বললে ডাক্তারবাবু নিশ্চয় আসবে।"

বোস-গিন্নী তখন গা-কাপড় ধুইয়া বোধনের পূজার উদ্যোগ করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় কেব্‌লার মা গিয়া তাঁহার পায়ের কাছে আছাড় খাইয়া পড়িল এবং তাঁহার পা দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "মা গো, আমার কেব্‌লাকে বাঁচাও।"

বোস-গিন্নী শশব্যস্তে দুই পা পিছাইয়া দাঁড়াইয়া ক্রোধ-রুক্ষকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "মর্ মাগী, আমি নেয়ে-ধুয়ে পূজোর জো কত্তে যাচ্ছি, এমন সময় এসে ছুঁয়ে দিলি! পুকুরে আবার ডুব দিয়ে মরি। ছোটলোক মাগীর কি একটুও আক্কেল নাই?"

কেব্‌লার মা স্বীয় অন্যায় কার্য্যের জন্য লজ্জিত হইয়া পড়িল। বোস-গিন্নী তাহাকে গালি দিতে দিতে পুনরায় স্নান করিতে চলিয়া গেলেন।

* * * *

সেই দিন ভোরের সময় বোসেদের বাড়ীতে সানাইটা যখন আগমনীর সুরে গ্রামখানাকে জাগরিত করিয়া গাহিয়া উঠিল—

"দেখ না নয়নে গিরি গৌরী আমার সেজে এলো।
এত দিনের পরে আমার পূর্ণিমার চাঁদ উদয় হ'লো।"

ঠিক সেই সময় কেব্‌লার মা'র ঘর হইতে একটা আর্ত্ত-চীৎকার উত্থিত হইয়া ঊষালোকপ্রফুল্ল শারদাকাশে বিলীন হইয়া গেল। কেব্‌লা ছুটী পাইয়া কোন্ অজানিত দেশে পূজা দেখিতে চলিয়া গেল!

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

## শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

অপার করুণা-নিধি তুমি বিধি হরি-হর,
চিন্ময় পরমব্রহ্ম ধরি নর-কলেবর!

নির্গুণে সগুণ কায়া,
অরূপে সরূপ মায়া,
অভয় চরণ-ছায়া বাঞ্ছা-কল্পতরুবর!

অহেতুকি কৃপাসিন্ধু,
অজ্ঞান তিমির-ইন্দু,
অকিঞ্চন-জন-বন্ধু প্রেমার্ণব-সুধাকর!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

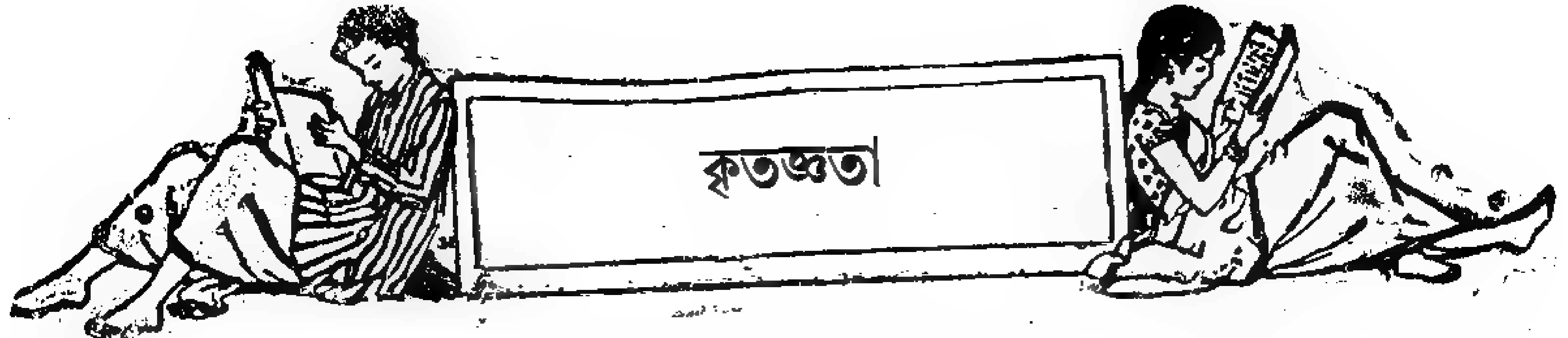

# কৃতজ্ঞতা

শুব্ধ গভীর রাত্রি। মেঘলা—থম্‌থমে অন্ধকার। ভাদ্র-মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথি। পঞ্চমীর চন্দ্রকলা অনেকক্ষণ অস্তমিত। ঢাকার জন্মাষ্টমীর মিছিল দুদিন আগে চুকে গেছে, কিন্তু নিরীহ হিন্দু পথিকদের বুকে গুণ্ডাদের ছোরা বিঁধার রক্তপাত এখনও বন্ধ হয় নি। তাই সন্ধ্যা হ'তে না হ'তে সকল বাড়ীর দরজা-জানালা বন্ধ হয়েছে; সন্ধ্যা-রাতেই পাড়া নিশুতি; এখন ত গভীর রাত্রি। কিন্তু কেউ নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমাতে পার্‌ছিল না, কখন্ কি হয়, এই ভয়ে সকলের গা ছম্‌ছম্ কর্‌ছিল, ছ্যাক্‌ছ্যাক্ ক'রে ঘুম ভেঙে ভেঙে যাচ্ছিল। গুজব রটেছে, গুণ্ডারা বাড়ী লুঠ কর্‌বে, স্ত্রীলোকদের বে-ইজ্জত কর্‌বে। মেয়েরা শিয়রের কাছে বঁটি রেখে শুয়েছে, পুরুষরা হাতের কাছে যা-হোক একটা কিছু হাতিয়ার রেখে দিয়েছে; কিন্তু কার ঘরে কিই বা হাতিয়ার আছে? একগাছা মোটা পোক্ত বড় লাঠিরও ত সঙ্গতি নেই। তাই, সকলের প্রাণ কি-হয় কি-হয় ভয়ে সদাই তুরুতুরু কর্‌ছে।

এক বাড়ীর বারান্দায় দুপ ক'রে কিছু পড়ার শব্দ হ'ল। কোমলা সেই শব্দে চম্‌কে জেগে উঠলো। কোমলা আজ রক্ষা-পঞ্চমীর ব্রত করেছে; স্বামি-সৌভাগ্য ও অবৈধব্য কামনায় সে উপবাসী আছে। উপবাসের ক্লেশে আর মুসলমান-উপদ্রবের উদ্বেগে তাহার নিদ্রা বেশ গভীর হয় নি। সে জেগে উঠ্‌তেই তার বুক ভয়ে টিপ-টিপ কর্‌তে লাগল। সে তাহার পার্শ্বে শয়ান স্বামীকে হাত দিয়ে নাড়া দিতে দিতে ভয়ে-ভয়ে চাপা স্বরে ডাক্‌লে—"ওগো, শুন্‌ছো? বারান্দায় ঢিল পড়ল কিংবা কোন লোক লাফিয়ে পড়লো!"

বীরেন্দ্র বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মত তড়াক্ ক'রে লাফিয়ে উঠে বিকট স্বরে চীৎকার কর্‌তে লাগল—"পাড়াপড়শী, জাগো জাগো! সাবধান! সাবধান! হুঁসিয়ার! ঢিল! ঢিল!"

নিমেষ-মধ্যে সমস্ত পাড়া উচ্চকিত হয়ে উঠল। ঘরে ঘরে হারিকেন্-লণ্ঠন জ্বালাই ছিল, লণ্ঠনের প্যাঁচে মোচড় লেগে চকিতে শত শত শিখা উস্কে জ্ব'লে উঠলো।

সাহসী যুবকরা শাল, আলোয়ান, র‍্যাপার, দোলাই যে যা হাতের কাছে পেলে, তাই দিয়ে মাথায় পাগড়ী বেঁধে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হ'তে লাগল। এক বাড়ীতে কাঁসর বেজে উঠল; সেই শব্দ শুনে দূরের এক বাড়ীতে শাঁখ বাজল। এম্‌নি ক'রে কাঁসরের ঝন্‌ঝনা আর শাঁখের শব্দ এক পাড়া থেকে আর পাড়ায় ছড়িয়ে গিয়ে বহুদূরের লোককেও সজাগ ক'রে তুল্‌লে। কোন কোন বাড়ী থেকে বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করা হ'ল; কোন কোন বাড়ীতে বড় বড় পট্‌কা সংগ্রহ ক'রে রাখা হয়েছিল, মুসলমান আক্রমণকারীদের ভয় দেখাবার জন্যে তাতেও আগুন দিয়ে দমাদম্ শব্দ করা হ'তে লাগল। পাড়ার রায়-বাহাদুর মুক্তকচ্ছ হয়ে থর্‌থর্ ক'রে কাঁপতে কাঁপতে পুলিসে টেলিফোন কর্‌তে লাগলেন। পাড়ায় বিষম গণ্ডগোল লেগে গেল। কেউ জিজ্ঞাসা করে—"কোথায় কোন্ দিকে?" কেউ বলে—"ঐ দিকে। ঐ দিকে!" কেউ বলে—"না, না, শব্দটা ও-পাড়া থেকে এলো মনে হ'ল।" কেউ বলে—"চল্, বেরিয়ে দেখি।" কেউ বলে—"রোস, গোঁয়ারতুমি করিস্‌নে, অন্ধকারে চোরা-গোপ্তা কে কোথায় ছোরা বসিয়ে দেবে!" কেউ বল্‌লে,—"বাছাধনরা ঢিল ফেলেছেন, এইবার পাট্‌কেলটি খেয়ে ফির্‌বেন।"

পাড়ার দু-চারখানা বাড়ীর ছাদ থেকে হুড়দাড় ক'রে ইষ্টকবৃষ্টিও হয়ে গেল—অন্ধকারে অদেখা দুষমন্‌দের উদ্দেশে।

চারিদিকের হট্টগোলের মধ্যে কোমলার বারান্দা থেকে একটু কোমল শব্দ হলো—"মিউ!"

কোমলা সেই শব্দ শুনে আশ্বস্ত ও লজ্জিত হয়ে বল্‌লে—"ও মা! ঢিল্ নয়! বেড়াল! বেড়ালটা পাশের বাড়ী থেকে বারান্দায় লাফিয়ে পড়েছে।"

কোমলা ঘরের দরজা খুলে দিতেই বিড়ালটা পথ পেয়ে ঘরের ভিতর দিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল।

তা দেখে বীরেন্দ্র বল্লে—"তা হোক্, সাবধানের বিনাশ নাই। পাড়া-সরগরম থাক্‌লে শালারা আস্‌তে সাহস কর্‌বে না।"

কোমলা হেসে বল্লে—"ওরা আমার ভাই হ'লে অত দুঁদে দজ্জাল গুণ্ডা হ'ত না।"

বীরেন্দ্র লজ্জিত হয়ে বললে—"তাও বটে! যারা অকারণে নরহত্যা করে, তারা সয়তানের সহোদর!"

কোন্ বাড়ী থেকে ঢিল পড়ার সংবাদ প্রচারিত হয়েছে, ঘুমের ঘোরে কেউ ঠাহর কর্‌তে পারে নি। সবাই সবাইকে জিজ্ঞাসা কর্‌তে লাগল,—"কোন্ বাড়ীতে কোন্ দিক থেকে ঢিল পড়লো?"

কিন্তু চেঁচামেচিই সার হ'ল, কিছুই নির্ণয় হ'ল না। বীরেন্দ্র আর সাড়াশব্দ কর্‌ছিল না।

কোথায় ঢিল পড়েছে, জান্‌তে না পেরে এবং মুসলমানের কোনও পাত্তা না পেয়ে, সকলে যুগপৎ হতাশও হ'লো এবং আশ্বস্তও হ'লো। সকলে খানিকক্ষণ গোলমাল ক'রে আবার শুয়ে পড়বার জোগাড় কর্‌ছে, এমন সময় গলীর বুকের উপর উজ্জ্বল আলোক-ধারার দীর্ঘ স্রোত বইয়ে দিয়ে একখানা মোটরগাড়ী ভেঁপু বাজাতে বাজাতে ছুটে এলো। সকলে সচকিত হয়ে দেখে ব'লে উঠল—"পুলিস! পুলিস!……অ্যারে!……পুলিস সাহেব নিজে এসেছেন!"

কাঁসর, শাঁখ, বন্দুক আর পট্‌কার শব্দ শুনে, আর রায়-বাহাদুরের টেলিফোন পেয়ে পুলিস তৎপরতার সঙ্গে ছুটে এসেছে। তারা শব্দ ধ'রে আন্দাজ ক'রে এক পাড়ায় গিয়ে সন্ধান কর্‌তেই সে পাড়ার লোকরা ব'লে দিলে—"এ পাড়ায় ত নয়, ঐ দক্ষিণদিক থেকে শব্দ এসেছিল।" সেই পাড়ায় গেলে, সেই পাড়ার লোকরা বল্লে—"এ পাড়ায় ত নয়, ঐ পশ্চিমদিকে হবে বোধ হয়।"

পুলিস এম্‌নি ক'রে গলীর গোলকধাঁধায় ঘুর্‌পাক খেতে খেতে বীরেন্দ্রদের পাড়ায় উপস্থিত হয়েছে।

পুলিস ও পুলিস-সাহেবকে সমবেত দেখে সকল বাড়ী থেকে দুই এক জন সাহসী লোক বাইরে বেরিয়ে এল।

তাদের সমবেত দেখে পুলিস-সাহেব জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"ক্যা হুয়া?"

অনেকে একবাক্যে ব'লে উঠল—"বাড়ীতে ইটা ফেক্‌তা হায়, হুজুর!"

সাহেব জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"কোন্ কোঠীমে ইটা গিরা?"

সবাই সমস্বরে ব'লে উঠল,—"সব বাড়ীমে হুজুর, সব বাড়ীমে!"

সাহেব আবার জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"নজদিক্‌মে কোই মুসল্‌মান হায়?"

অনেকে ব'লে উঠল—"হায়, হুজুর, হায়, এই বগলমে বসিরুদ্দীন মিঞা রহতা হায়……"

হিন্দু পাড়ার মধ্যে বসিরুদ্দীন ভয়ে-ভয়ে বাস কর্‌ছিল। তাহার স্বধর্ম্মীদের অপরাধে ক্রুদ্ধ হিন্দুরা কোন্ দিন বা তাকে লাঞ্ছনা করে। পাড়ায় গোলমাল শুনেই সে বেচারার ত্রাস-তরল নিদ্রা ভেঙে গিয়েছিল; সে কান পেতে শুন্‌ছিল—ব্যাপার কি? এত গোলমাল কিসের? যখন সে বহুলোকের মুখ থেকে তার নিজের নাম উচ্চারিত হ'তে শুন্‌ল, তখন তার বুক ভয়ে কেঁপে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গেই দরজায় কড়ায় করাঘাত এবং বজ্র-কণ্ঠের আহ্বান শুন্‌তে পেলে—"কোন্ হায়, কেওয়াড়া খোলো……"

বসিরুদ্দীন ঘরের কোণে অন্ধকারে লুকিয়ে আল্লার নাম স্মরণ কর্‌তে লাগল।

বাড়ীর ভিতর থেকে কারও সাড়া না পেয়ে, পুলিস দমাদম্ লাথি মেরে দরজা ভেঙ্গে ফেল্‌লে। মড়াৎ ক'রে দরজা ভেঙ্গে খুলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বসিরুদ্দীনের বাড়ীর মধ্য থেকে রমণীর ও শিশুর ভয়ব্যাকুল আর্ত্তনাদ উত্থিত হ'ল, কিন্তু বসিরুদ্দীনের কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

পুলিস রোরুদ্যমানা রমণীদের আশ্বাস দিয়ে বল্লে—"রোও মৎ, রোও মৎ, জানানা ঔর বাচ্চোঁকা কুছ ডর নেহি হায়। মরদ্ আদমী কোই হায় ত বাৎলাও।"

রমণীরা ক্রন্দন-কম্পিত কণ্ঠে ব'লে উঠল—"নেহি, হুজুর, নেহি, কোই মরদ্-আদমী কোঠীমে নেহি হায়।"

পুলিস এই কথায় প্রত্যয় না ক'রে সব ঘরে

বিদ্যুৎ-মশালের আলো ফেলে ফেলে তল্লাস ক'রে দেখলে, কেউ কোথাও নেই।

তারা সব ফিরে আস্‌ছে, এক জন বল্‌লে—"পাইখানাটা দেখা হয় নি।"

অম্‌নি দুজন কনষ্টেবল পাইখানার সাম্‌নের ছেঁড়া চটের পর্দ্দা সরিয়ে দেখলে, এক জন পুরুষ পাইখানার ফোকোর দিয়ে নীচে নেমে পড়বার চেষ্টা করছে।

হিন্দু কনষ্টেবল মুসলমানের নাগাল পেয়ে উল্লসিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল—"ইহাঁ পর ছিপাকে হ্যায়, হুজুর!" এবং বসিরুদ্দীনের দাড়ি ধ'রে হিড়হিড় ক'রে টান্‌তে টান্‌তে তাহাকে বাইরে নিয়ে এল, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার উপরে লাথি, কিল, চড় বর্ষণও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ হয়ে গেল।

সাহেব হুকুম দিলেন—"হাত বাঁধ্‌কে উস্‌কো থানামে লে যাও।"

বসিরুদ্দীন ভয়বিহ্বল কাতর স্বরে বল্‌লে—"আমার কি কসুর, হুজুর? আমি ত বাড়ীর বাইরে বি যাই নি..."

সাহেব ধমক্ দিলেন—"চোপ্ রও শূয়ার ..."

এই সব শুনে ও বসিরুদ্দীনের লাঞ্ছনা দেখে ব্যথিত হয়ে কোমলা স্বামীকে ডেকে বল্‌লে—"ওগো, নির্দ্দোষী লোকটাকে অপমান কর্‌ছে আর তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছ? বলো না গিয়ে সাহেবকে যে, ঢিল্-টিল্ কিছু পড়ে নি, একটা বেড়াল লাফিয়ে পড়েছিল, তাতেই ঘুমের ঘোরে ঢিল পড়া ব'লে ভুল হয়েছিল..."

বীরেন্দ্র স্ত্রীর প্রস্তাবে উপেক্ষা প্রদর্শন ক'রে বল্‌লে—"হ্যাঃ, আমি বল্‌তে গিয়ে ফ্যাসাদে পড়ি আর কি! যাক্ বেটা গরুখোর মোস্‌লা, মজাটা টের পেয়ে আসুক!"

কোমলা ব্যথিত হয়ে বল্‌লে—"আহা, না না, নির্দ্দোষী মানুষ, তাতে আবার পড়শী, তাকে মিছিমিছি কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। তুমি সাহেবকে গিয়ে বল...আমার নামেই দোষ দিয়ে বোলো, তা হ'লে সাহেব তোমাকে কিছু বল্‌বে না, আমি মেয়েমানুষ ব'লে আমাকেও কিছু বল্‌বে না ..."

যে দেশের নীতিশাস্ত্রের উপদেশ "আত্মানং সততং রক্ষেদ্ দারৈরপি ধনৈরপি" সেই দেশের বীরপুরুষ বীরেন্দ্র; সে মনে কর্‌লে—স্ত্রীর উপর দোষারোপ ক'রে আপনি বেঁচে যদি পরকে বাঁচানো যায় ত মন্দ কি? সে বাহিরে গিয়ে সাহেবকে লম্বা সেলাম ক'রে বল্‌লে—"হুজুর, আমার স্ত্রী বল্‌ছে, বাড়ীতে ঢিল-টিল কিছু পড়ে নি, একটা বিড়াল লাফিয়ে পড়েছিল, তাই ঘুমের ঘোরে সে মনে করেছিল, ঢিল পড়লো বুঝি।"

সাহেব জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "তা হ'লে কোন বাড়ীতে ঢিল পড়ে নি?

বীরেন্দ্র বল্‌লে—"আজ্ঞে না, হুজুর।"

সাহেব আবার জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"তা হ'লে এই আদ্‌মীর কোন দোষ নেই?"

বীরেন্দ্র আবার বল্‌লে—"আজ্ঞে না, হুজুর।"

তখন সাহেব একটু হেসে বসিরুদ্দীনকে ছেড়ে দিতে হুকুম দিলেন।

বসিরুদ্দীন মুক্তি পেয়ে সাহেবকে দুহাতে সেলাম ক'রে পলায়নোদ্যত হ'ল।

সাহেব বসিরুদ্দীনকে ধম্‌কে বললেন—"এই বাবুকো সেলাম করো: বাবুকা ওয়াস্তে তোম্ খালাস পায়া .."

বসিরুদ্দীন যেতে যেতে ফিরে দাঁড়িয়ে নত হয়ে পুনঃ পুনঃ সেলাম কর্‌তে কর্‌তে বীরেন্দ্রকে বললে—"বাবু, তোমার বড় মেহেরবানি বাবু! খোদায় দোয়া কর্‌বো! খোদায় তোমারে সেলামতে রাখবো! তোমার গাও-গুতর ভালা থাক্‌বো! সেলাম বাবু! আমরা ত তোমাগো পায়ের জুতি!......"

পুলিস মোটর ঘুরিয়ে ভেঁপু বাজিয়ে চ'লে গেল।

পাড়ার লোকরা একবাক্যে বীরেন্দ্রকে তিরস্কার করতে লাগলো—"আঃ! তোমার আবার ধর্ম্মজ্ঞান চেগে উঠল! বেটা মোস্‌লাকে বাঁচিয়ে দিলে! বাছাধন একটু ঘোল খেয়ে ঢিট্ হয়ে ফিরে আস্‌তো!"

বীরেন্দ্র বল্‌লে—"আহা, নির্দ্দোষী বেচারা!"

কেউ বীরেন্দ্রের বোকামীর ও কেউ বা তার সাধুতার সমালোচনা কর্‌তে কর্‌তে যে যার বাড়ীতে চ'লে গেল। অল্পক্ষণের মধ্যে পাড়া আবার নিস্তব্ধ হয়ে পড়ল।

পরদিন সকালে বীরেন্দ্র বাড়ী থেকে বাহির হতেই তাহার সঙ্গে বসিরের দেখা হ'ল। বীরেন্দ্র লজ্জিত হয়ে বল্‌লে—"সেলাম, মিঞা সাহেব, কাল একটা ভুলের জন্যে তোমার উপরে খামাখা জুলুম হ'ল, তুমি কিছু মনে ক'র না, ভাই ...।"

বসির বল্লে—"আমার তগদিরে বে-ইজ্জতি আছিলো, নসিবের লেখা, বাবু, ক্যাটা রদ করবো? তুমি কসুর কবুল না কোল্লে ত আরও বি ফৈজতি অইতো। আল্লা তোমার জান্-মালের উপর দোয়া কর্‌বো; আমি তোমার গোলাম অইয়া রইলাম..."

যাহারা বসিরের এই কথা শুন্‌লে, তাহারা সবাই বল্‌লে —"লোকটা কিন্তু পাজি নয়।"

বীরেন্দ্র বল্‌লে—"মুসলমানদের মধ্যেও ত সাধু মহাত্মা আছেন; তাদের মধ্যেও ভাল লোকের অভাব নেই। কত হিন্দুকে মুসলমানের হাত থেকে মুসলমানই বাঁচিয়েছে। বদ্‌মায়েস গুণ্ডা সকল জাতের মধ্যেই আছে, হিন্দুর মধ্যেও আছে।"

এক জন প্রতিবাদ ক'রে বল্‌লে—"তা বটে, কিন্তু সংখ্যায় বেশী আর কম দেখে জাতের ভাল মন্দ বিচার হয়। ওদের মত নির্দ্দোষী পথিককে খুন্ কর্‌তে হিন্দু সহসা পারে না।"

মুসলমানের পক্ষ নিয়ে বীরেন্দ্র বল্‌লে—"যত ডাকাইতী হয়, তা কি সব মুসলমানই করে?"

এই সব তর্ক-বিতর্ক শুন্‌তে শুন্‌তে বসির "ইয়া আল্লা!" ব'লে দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে বাড়ীর মধ্যে চ'লে গেল।

বসির চ'লে গেলে এক জন বীরেন্দ্রকে বল্‌লে—"তা যা বল, ভাই, 'বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু মোসলা-কুলেষু চ।' কারণ, দু-জনেরই কাছা নেই! সাবধান! সাবধানের বিনাশ নেই, ভাই।"

বীরেন্দ্রে বল্‌লে—"সাবধান ত আছিই।"

পাড়ার লোক যে যার কাযে চ'লে গেল।

বীরেন্দ্র বাড়ীর ভিতরে আস্‌তেই কোমলা তাকে বল্‌লে—"ওগো, চাল বাড়ন্ত। কাছাকাছি কোনও দোকানে কি চাল পাওয়া যাবে?"

বীরেন্দ্র বল্‌লে—"কারও বাড়ী থেকে ধার ক'রে..."

কোমলা বল্‌লে—"কাল দুবেলা দু-বাড়ী থেকে ধার ক'রে এনেছি, আর কার কাছে···"

বীরেন্দ্র বল্‌লে—"আচ্ছা, তবে আমার জামা-ছাতা আর একখানা নোট এনে দাও দেখি..."

কোমলা জামা, ছাতা ও নোট এনে দিলে।

বীরেন্দ্র বাহির হয়ে চল্‌ল।

কোমলা বল্‌লে—"বেশী দূরে যেও না, খুব সাবধান হয়ে যেও ..."

বীরেন্দ্র অদৃশ্য হয়ে যেতে যেতে ব'লে গেল—"হুঁ, সদর রাস্তা দিয়ে যাব, সদর রাস্তায় গুর্খা সৈন্য পাহারা দিচ্ছে।"

বীরেন্দ্র সদর রাস্তা দিয়ে একটু ঘুরেই বাজারের দিকে চল্‌ল। বীরেন্দ্রকে যেতে দেখে বসিরও চট্ ক'রে বাড়ী থেকে বেরিয়ে একটা গলীর মধ্যে ঢুকে পড়লো।

কিছু দূর গিয়ে বসির গলী থেকে বেরিয়ে বীরেন্দ্রের সাম্‌নে উপস্থিত হ'ল এবং হঠাৎ যেন সাক্ষাৎ হয়ে গেল, এই ভাবে হেসে বল্‌লে—"এই যে বাবু, কুন হানে যাইবা?"

বীরেন্দ্র বল্‌লে—"বাড়ীতে চাল বাড়ন্ত, তাই চারটি চাল আন্‌তে চলেছি।"

বসির বল্‌লে—"একলা যাইবা? দিনকাল ভালা না। চলো আম্ বি যাই। মোছল্‌মান্ মার্‌তে আইলে তোমারে আমি বাঁচামু, আর হিন্দু মার্‌তে আইলে তুমি আমারে বাঁচাইবা।"

বীরেন্দ্র সাহস পেয়ে বল্‌লে—"তাই বেশ হবে, দুজনে যাই চল···তোমার কোন কায আছে বাজারে?"

বসির বল্‌লে—"হাঁ, আমারও কিছু সওদা কর্‌তে অইবো—"

তাহারা দুই জনে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের সম্বন্ধেই আলোচনা কর্‌তে কর্‌তে চল্‌ল।

বসির বল্‌লে—"যতো হালা পাজি বদমায়েস কি কাণ্ড-টাই কোল্লে, বাবু? আমরা সব পাড়া-পড়শী ভাই-বেরাদরের সামিল, আমাগো না অইলে তোমাগো চল্‌বো না, আর তোমাগো না অইলে আমাগো চল্‌বো না···"

বীরেন্দ্র বললে—"হ্যাঁ, তা ত বটেই! এক দেশের বাসিন্দা আমরা, এক মায়ের পেটের ভাই-ই ত।"

বসির এ কথার আর কোনও উত্তর না দিয়ে বল্‌লে—"চলেন বাবু, এই গলী দিয়া জল্‌দি যাওন যায়..."

বীরেন্দ্র একটু ইতস্ততঃ ক'রে বল্‌লে—"গলী দিয়ে যেয়ে কায নেই, মিঞা, কি জানি, কোথা থেকে কে··"

বসির বল্‌লে—"ভয় কি, বাবু, আমরা দুই জনা, নিজেরা নিজেরা সামাল দিয়া ঝট কইরা চইলা যামু······ ঘোরা পথ......"

বীরেন্দ্র এক বার চারিদিকে তাকিয়ে দেখে নিয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সম্মতি দিয়ে বল্‌লে—"আচ্ছা চলো তবে .."

গলীর মধ্যে ঢুকে বসির বল্‌লে—"এই গলীর মধ্যে পর্‌শুকা খুব খুন-খারাপী আইয়া গেচে ....."

বীরেন্দ্রের গা ছম্‌ছম্ করতে লাগল। সে বল্‌লে—"গলী-ঘুঁজিতে না আইলেই ভাল হইতো মিঞা......"

বসির বীরেন্দ্রের পাশ থেকে একটু পিছিয়ে প'ড়ে বল্‌লে—"ঐ......ঐ যে বাওদিগের চিপা গলীটা, ঐহান্ থেইকা একটা মোছল্‌মান্ লড়িয়া আইয়া এক হালা ইন্দু কাফেররে কেইশা দিচিলো......"

বীরেন্দ্র বাঁ-দিকের গলীর উল্লেখে বাঁ-দিকে চোখ ফিরিয়েছিল; পরক্ষণেই বসিরের বাক্যের মধ্যে হিন্দুর সম্বন্ধে কটূক্তি শুনে, আশ্চর্য্য হয়ে ও ভয় পেয়ে সে মুখ আর একটু পিছনদিকে ঘুরিয়ে বসিরকে দেখবার চেষ্টা যেই কর্‌লে, অমনই বসির বাঁ-হাতে বীরেন্দ্রের মুখ চেপে ধ'রে তাহার বুকে একখানা প্রকাণ্ড শাণিত ছোরা আমূল বসিয়ে দিলে!"

বীরেন্দ্র বসিরের বিশ্বাসঘাতকায় চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে কিছু বল্‌তে গেল, কিন্তু একটি শব্দও উচ্চারণ কর্‌বার আগেই সে গতপ্রাণ হয়ে মাটীতে প'ড়ে লুণ্ঠিত হ'তে লাগলো।

বসির এদিক্ ওদিক্ তাকিয়ে দ্রুতপদে জনপ্রাণিহীন গলী পেরিয়ে বাজারের দিকে পলায়ন কর্‌ল, তাহার গায়ের হল্‌দে রঙের গেঞ্জিতে বীরেন্দ্রের তপ্ত রক্ত ছিট্‌কে লেগেছিল। সে গেঞ্জি খুলে ফেলে গাম্‌ছা দিয়ে গা মুছে সেই গেঞ্জি আর গাম্‌ছাখানা হাতে জড় ক'রে নিয়ে বাজারে গেল।

বসির জনমানবশূন্য বাজারে গিয়ে এক কসাইকে বল্‌লে—"দোস্ত, কিছু লৌ-মাখা গোস দাও ত, গামছায় বাইন্ধ্যে লইয়া যাই......এক হালা ইন্দু কাফেররে জহান্নামে দিয়া আইলাম। হালার খুন গাম্‌ছায় লাইগা রইচে..."

বসির খাসীর মাংসের রক্ত দিয়ে বীরেন্দ্রের খুন গোপন ক'রে দিব্য ভাল মানুষটির মত যেন বাজার ক'রে নিয়ে বাড়ী ফিরে চললো। সে তাহার পাড়ার কাছাকাছি এসে বিষম সোরগোল শুনতে পেলে। সে ছুটে এগিয়ে এসে দেখলে—এক-শো সওয়া-শো জন মুসলমান হল্লা কর্‌তে কর্‌তে ছুটে আসছে। বসিরকে দেখেই সেই দলের এক জন ব'লে উঠলো—"এই যে বসির মিঞা! কোন্ হালা তোমার বে-ইজ্জত কোর্‌চে, বাতাও ত দেখি, হালারে—হালার জান্ লিয়া লিমু, ইজ্জত লিমু, বাড়ী লুট কর্‌মু ·—"

রণোন্মত্ত মুসলমানদের আক্রমণের ভয়ে পাড়ার সব লোক লুকিয়ে পড়েছিল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ দেখলে ও শুন্‌লে, বসির কানে হাত দিয়ে জিব কেটে বললে—"তোবা! তোবা! বেগর তস্কিয়ে কারো উপরে জুলুম কোর্‌লে গুণাহ অয়; খোদা বি নারাজ অয়। কেউ ত আমার নামে কিছু নালিশ করে নিকো, আর বি বীরেন্দ্র-বাবু নিজের দোষ কবুল কইরা আমারে বাচাইচে! ফিরা যাও ভাই সব; এ মহল্লার হগলেই আমার দোস্ত! এই হানে হক্-নাহক্ কোনো জুলুম অইতে আমি দিমু না—জান্ কবুল, খোদা কসম্!"

কোমলা মুসলমানের হল্লা শুনে ভয়ে কাঁপিতেছিল, সে বাড়ীতে একাকিনী; তাহার স্বামী বাহিরে। কিন্তু সে যখন বসিরকে উচ্চ চীৎকার ক'রে আক্রমণকারীদের নিষেধ কর্‌তে শুনলে এবং দেখলে যে, মুসলমানরা সব ফিরে চ'লে গেল, তখন সে আশ্বস্ত হয়ে গলায় কাপড় দিয়ে মাটীতে মাথা ঠেকিয়ে অশ্রুপ্লাবিত নেত্রে প্রার্থনা করতে লাগ্‌ল—"হে ভগবান্, ভাগিস্ বসির মিঞা এসে পড়েছিল! নইলে আমাদের কি সর্ব্বনাশ হ'ত, ভাবলেও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে! বসির মিঞা আমাদের প্রাণ আর ইজ্জত বাঁচিয়ে যে উপকার করলে, তার পুরস্কার তাকে তুমি দিও, প্রভু——তার যেন কখনও কোনও অকল্যাণ না হয়, ঠাকুর!"

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

# পোড়ো বাড়ী

সেবার পূজার ছুটিটা কাশীতে কাটাইব স্থির করিয়া পঞ্চমীর দিন রাত্রিতে পঞ্জাব মেলে আমি কলিকাতা হইতে বারাণসী অভিমুখে রওনা হইলাম। দশাশ্বমেধ ঘাটের নিকট ঘোড়ার গাড়ী হইতে নামিয়াই আমার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হইল চতুর্ভুজ পাণ্ডার। চতুর্ভুজকে কাশীর লোকরা 'চতুরী' 'চতুরী' বলিয়া ডাকে। বাস্তবিকই চতুরী চতুরতায় যেমন পাণ্ডা-মহলের অগ্রণী, শিষ্ট ব্যবহারে ও মধুর আলাপেও সে সেইরূপ ছিল। তাহার চেহারাটি বেশ নাহুস্ নুহুস্; তাহার মুখ হাসি-মাখান। চতুরী গঙ্গাস্নান করিয়া বাড়ী ফিরিতেছিল। আমি গাড়ী হইতে নামিয়া কোথায় যাই, কোথায় গিয়া বাসা লই, তাহাই চিন্তা করিতেছিলাম। আমি ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও কাশীতে আসি নাই।

চতুরী কটাক্ষে আমার মনোভাব বুঝিয়া লইয়া বহুকালের পরিচিত বান্ধবের ন্যায় হাস্য-প্রফুল্লমুখে ভাঙ্গা-ভাঙ্গা বাঙ্গালায় কহিল, "বাবুজী! আপনি বাসা খুঁজিতেছেন? আমার সঙ্গে আসুন। আপনাকে উত্তম বাসা দিব। সেখানে সকল রকম আরাম আপনি পাইবেন। বাবা বিশ্বনাথের মন্দিরের অতি নিকটেই আমার বাড়ী। আমার বাড়ীতেই আপনাকে বাসা দিব।"

আমি চতুরীর বাড়ীতে গিয়া উঠিলাম। চতুরীর পরিবারে লোকজন বেশী দেখিলাম না। চতুরী নিজে, তাহার স্ত্রী, এক জন প্রৌঢ়া বিধবা ব্রাহ্মণী ও এক জন অনিন্দ্যসুন্দরী কিশোরী ব্রাহ্মণকন্যা। এই কিশোরীর নাম শুনিলাম—রেখিয়া। আমার পাকশাক প্রস্তুত করিবার জন্য চতুরী তাহার নিজের পরিবারভুক্ত সেই বিধবা ব্রাহ্মণ-কন্যাকে ঠিক করিয়া দিল ও হাট-বাজার ও পরিচর্য্যার জন্য এক জন ইতরজাতীয় পরিচারকও নিযুক্ত করিয়া দিল। সত্য সত্যই প্রবাসে আসিয়া যে এতটা আরাম পাইব, তাহা আমি আদৌ আশা করি নাই। প্রথম সাক্ষাৎকারমুহূর্ত্তে চতুরী আমার নিকট যে প্রতিশ্রুতি করিয়াছিল, তাহা সে অক্ষরে অক্ষরে পালন করিল। কাশীতে আসিয়া আমি খুব ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

* * * * *

ভাগীরথীর সহিত বরুণা-সঙ্গমের সমীপবর্ত্তী স্থানটি আমার নিকট অত্যন্ত মনোরম বলিয়া বোধ হইত। আমি প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় একাকী এইখানে বেড়াইতে যাইতাম। বরুণার অপর পারে গঙ্গার ধারে এই অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন পল্লীতে চতুর্দ্দিকে মেহেদীগাছের বেড়া দেওয়া বাগানের মধ্যে একটি পুরাতন পোড়ো বাড়ী ছিল। সেইখানি আমার কাছে এত ভাল লাগিত যে, প্রতি সন্ধ্যাকালে নৌকাযোগে বরুণা পার হইয়া আমি এই বাড়ীটির কাছে গিয়া বসিতাম। এই বাগানবাড়ীটির ফটক বাহির হইতে প্রকাণ্ড একটি লৌহ-অর্গলে আবদ্ধ ও একটি দৃঢ় লৌহময় তালা দ্বারা আটকান। বহুকাল ব্যবহৃত না হওয়ায় অর্গলে ও তালার উপরে পুরু হইয়া জঙ্গ ধরিয়া গিয়াছে। বেড়ার মেহেদীগাছগুলির ডালপালা বহুকাল ধরিয়া ছাঁটকাট না করায় জঙ্গল হইয়া গিয়াছে। বাড়ীর সম্মুখের বাগানের মধ্যে গোলাপ, মল্লিকা, যুঁই, কুরুবক, কুন্দ প্রভৃতি নানাজাতীয় কুসুমের গাছ ও পশ্চাদ্দিকের বাগানে আম, লিচু, পেয়ারা, সফেদা প্রভৃতি ফলের গাছ এখন যত্নের অভাবে ফলপুষ্পহীন আগাছায় পরিণত হইয়াছে। বাগানের মধ্যে একটি প্রকাণ্ড দ্বিতল অট্টালিকা। ইহার উপর-নীচের সমস্ত দরজা-জানালা ভিতর হইতে বন্ধ। কেবল ইহার প্রবেশদ্বারটির বাহিরে মোটা মোটা লোহার কড়ায় একটি সুবৃহৎ লোহার তালা দিয়া আটকান। এই বাড়ীর ছাতগুলি জীর্ণ হইয়া গিয়াছে, দেওয়ালে বড় বড় ফাট ধরিয়াছে। সেই ফাটা যায়গায় বহু বট ও অশ্বত্থের গাছ জন্মিয়া দেয়ালের মধ্যে চারিধারে শিকড় নামাইয়া

দিয়াছে। খোলা বারান্দাগুলিতে অসংখ্য চামচিকা ও চটক পক্ষী আসিয়া বাসা বাঁধিয়াছে। ক্রমাগত রৌদ্র-বৃষ্টিতে ইহার দরজাজানালাগুলির রং ধুইয়া বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে ও স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গিয়াছে। বাহিরের সিঁড়িগুলি যায়গায় যায়গায় ধসিয়া গিয়াছে, ফাটিয়া গিয়াছে, সেই ফাটলে আগাছা ঘাস ও উলু খড় জন্মিয়াছে। অন্ধকার ও নিস্তব্ধতা এখানে অব্যাহতভাবে রাজত্ব করিতেছে। চামচিকা, চড়াই, ইঁদুর, বাঁদর, টিকটিকি, অহি, নকুল এখানে অবাধে বিচরণ করিতেছে, ক্রীড়া করিতেছে, কলহ করিতেছে, বসবাস করিতেছে। এই পোড়ো বাড়ীর সমস্তটা অংশই যেন একটি কুহেলিকাময় বিরাট রহস্যের আবরণে ঢাকা রহিয়াছে।

এই বাড়ীটি আমি দেখিতাম, আর ইহার এই শোচনীয় পরিণামের কারণ সম্বন্ধে নানারূপ কল্পনা-জল্পনা করিতাম। এই বাড়ীখানির উপর কি কোন কারণে ভগবানের অভিশাপরূপ বজ্রানল বর্ষিত হইয়া গিয়াছে, না, এই বাড়ীর যে স্বত্বাধিকারী ছিল, সে কখনও কোন জাগ্রত দেবতাকে ছলনা করিয়াছিল, সেই জন্য এই বাড়ীর এই দুর্দ্দশা হইয়াছে? সেখানে বসিয়া এই সকল প্রশ্ন স্বতই আমার মনে উদিত হইত। কিন্তু কে ইহার উত্তর দিবে? কীট-পতঙ্গ, সরীসৃপ বুকে হাঁটিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া যায়, কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর কিছুই দেয় না। এই জনশূন্য পোড়ো বাড়ীটির মধ্যে একটি ভয়ানক রহস্য লুক্কায়িত আছে। কিন্তু সেই রহস্যের সূত্র যে কোথায়, মানুষ তাহা জানে না। এই বাড়ীটি যে এখনও পর্য্যন্ত খাড়া রহিয়াছে, তাহাও যেন এক জন খামখেয়ালী লোকের ক্ষণেকের খেয়ালের উপর, এটুকু স্পষ্টই অনুমান করা যায়।

আমি এই বাড়ীটির আশেপাশে বসিয়া থাকিতে থাকিতে এবং ইহার সম্বন্ধে ভাবিতে ভাবিতে সময়ে সময়ে এতদূর তন্ময় হইয়া পড়িতাম যে, তখনই খেয়ালের বশে ইহার বাগানের বেড়া ফাঁক করিয়া বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিতাম। কাঁটার খোঁচায় লাগিয়া আমার পরিধেয় ছিন্ন হইয়া যাইত, পা-হাত কাটিয়া যাইত, সে দিকে আমার ভ্রূক্ষেপও ছিল না। বাগানের মধ্যে বিভ্রান্তের ন্যায় ঘুরিয়া ফিরিয়া আমি অতুলনীয় তৃপ্তি লাভ করিতাম। আশ-পাশের লোকজনের নিকট হইতে আমি এই বাড়ীটির সম্বন্ধে কোন খোঁজখবর লইতে চেষ্টা করিতাম না। আমি মনে করিতাম যে, তাহারা হয় ত আসল কথা কেহই জানে না। হৃদয়হীন বিবেকহীন লোকের মুখের মিথ্যা গুজব শুনিয়া আমার কল্পনারচিত বিচিত্র স্বপ্নগুলিকে টুটিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিতে এক মুহূর্ত্তের জন্য ইচ্ছা হইত না। এই জনহীন পরিত্যক্ত অভিশপ্ত উদ্যান-বাটিকাটি আমার নিকট, আজ এক, কালি অন্য, এখন এক, পর-মুহূর্ত্তে অপর কোন এক মূর্ত্তি প্রকটিত করিত। এই আমি ইহাকে দেখিলাম দেবতার মন্দিরের মত, পরক্ষণেই ইহাকে শবদেহপূর্ণ শ্মশানভূমি বলিয়া মনে হইতে লাগিল। এই আমি ইহাকে দেখিলাম, ঐশ্বর্য্যশালী রাজ-প্রাসাদের তুল্য, পরক্ষণেই ইহা আতুরাশ্রমের আকার ধারণ করিল। এখানে আসিলেই আমার কেবল কান্না পাইত, কখনও হাসি আসিত না। কত দিন প্রদোষে এই পোড়ো বাড়ীটির ছাতের কোণে পেচকের বিকট ঘুৎকার শুনিয়া ভয়ে আমার অন্তরাত্মা শিহরিয়া উঠিয়াছে। আমি তখনই সেখান হইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছি।

এক দিন সেই বাগানের মধ্যে বসিয়া স্বপ্নের জাল বুনিতে বুনিতে আমি এমন তন্ময় হইয়া পড়িলাম যে, কখন্ যে সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, তাহা আমার জ্ঞান ছিল না। সহসা একটা দমকা হাওয়া আসিয়া প্রাচীরগাত্রে একটি ভগ্ন নলের মধ্যে প্রবেশ করাতে গোঁ গোঁ শব্দ হইতে লাগিল। আমার মনে হইল যে, ঘরের মধ্যে কে যেন যন্ত্রণায় গোঙাইতেছে। আমি ভয়ে শিহরিয়া উঠিলাম; তখনই ছুটিয়া সেখান হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম ও সোজা বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

আমি একাকী আমার ঘরে বসিয়া এই রহস্যময় পোড়ো বাড়ীটির বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম।

মার্জ্জারের ন্যায় সতর্ক পাদবিক্ষেপে চতুরী আমার কক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিল, "বাবুজী! জয়করণ বাবু আপনার সহিত দেখা করিতে চাহেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে জয়করণ বাবু, পাণ্ডাজী?

পাণ্ডাজী যেন আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিল, "জয়বাবুকে

চেনেন না? এখানকার ফৌজদারী আদালতের এক জন ছঁদে মোক্তার।"

ফৌজদারী আদালতের নামে সত্যই আমি একটু বিস্মিত হইলাম। সহসা চাহিয়া দেখি যে, এক জন পরিণত-বয়স্ক লোক আমার কক্ষে আসিয়া প্রবেশ করিতেছে। তাহার চোখের চাহনি উদ্ধত ও অবজ্ঞা-মিশ্রিত, আদালতে এক পক্ষের উকীল বা মোক্তার তাহার প্রতিপক্ষীয় লোক অথবা প্রতিপক্ষীয়ের উকীল বা মোক্তারের দিকে যেরূপ অবজ্ঞামিশ্রিত গর্ব্বিত কুটিল কটাক্ষ নিক্ষেপ করে, এই মোক্তারটিও আমার দিকে সেইরূপ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। এই লোকটির পরিধানে একটি লংক্লথের চুড়ীদার পায়জামা, গায়ে লংক্লথের আচকান, মাথায় পাগড়ী। ইহার বামহস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে একটি বৃহদাকারের হীরার আংটী; আংটীর হীরাখানি বেশ মূল্যবান্ বলিয়া বোধ হইল; কিন্তু তাহার পরিচ্ছদের সহিত সুসঙ্গত বলিয়া মনে হইল না।

এই লোকটিকে আমার ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া চতুরী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। লোকটি বেশ সপ্রস্তুতভাবে আমার বিছানার উপর বসিয়া, আমারই তাকিয়ায় রীতিমত আরামে ঠেস দিয়া তাহার পক্ক গুম্ফে 'তা' দিতে দিতে কহিল, "আমার নাম হচ্ছে জয়করণ মিশ্র। আমি এখানকার ফৌজদারীর মোক্তার।"

আমি কহিলাম, "আপনার পরিচয় শুনিয়া সুখী হইলাম। কিন্তু আমি কোন্ মামলা-মোকর্দ্দমায় পড়ি নাই যে, আপনাকে আমার পক্ষে মোক্তার নিযুক্ত করিব।"

সে কহিল, "পড়েন নি বটে, কিন্তু পড়াটা বিচিত্র নহে। মহাশয়! আগে আমার কথাটাই শুনিয়া লন।"

আমি কহিলাম, "আচ্ছা, তাই ব'লে ফেলুন, শোনা যাক্।"

সে কহিল, "আপনি প্রায় রোজই সন্ধ্যার সময়টা বরুণা-সঙ্গমের ঐ অঞ্চলে বেড়াতে যান?—না?"

আমি কহিলাম, "আজ্ঞে হাঁ! কাশীর ঐ অঞ্চলটা আমার কাছে বেশ ভাল লাগে। এ ধারটা বড় বিশ্রি আর অপরিষ্কার।"

সে আমার কথায় বাধা দিয়া কহিল, "আপনি চুপ করুন, আগে আমার কথাটাই শেষ করতে দিন। বরুণার ওপারে যে একটি পুরানো পোড়ো বাগানবাড়ী আছে, আপনি সেই বাগানের মধ্যে রোজ সন্ধ্যের সময় গিয়ে ব'সে থাকেন?"

আমি কহিলাম, "আজ্ঞে হাঁ! তা থাকি, তাতে হয়েছে কি?"

সে কহিল, "এমন কিছু হয় নি। তবে আপনার বোধ হয় জানা নেই যে, যে কোন ঘেরা যায়গায় মালিকের বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করাটাই হচ্ছে অনধিকারপ্রবেশ। আর অনধিকারপ্রবেশ ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইনের একটি অপরাধ। ঐ বাড়ীটি কাহার সম্পত্তি, তাহা বোধ হয়, আপনি জানেন না। ওটি হচ্ছে বিলাসপুরের মহারাণী নর্ম্মদা বাইয়ের ত্যক্ত সম্পত্তি। আমিই তাহার উইলের অছি। আমি অবশ্য এমন ছোট লোক নহি যে, আপনাকে ফৌজদারীতে দিব। কিন্তু আমি আপনাকে সাবধান করিয়া দিতেছি যে, আপনি ইচ্ছা হইলে ঐ বাড়ীর আশে-পাশে ঘুরিয়া দেখিতে পারেন, কিন্তু ভবিষ্যতে আর কখনও বেড়ার ফাঁক দিয়া বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিবেন না। মৃতার ইহাই নিষেধাজ্ঞা। এই আদেশ যাহাতে পালিত হয়, তাহা করিতে আমি ন্যায়ত ও আইনত বাধ্য। আমি যে দিন এই উইলখানি রাখিয়াছি, সেই দিন হইতে আমি নিজেই ঐ বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করি নাই। মহারাণীর মৃত্যুর পরে আমি তাঁহার ত্যক্ত অন্য সম্পত্তির আয় হইতে ইহার চৌকীদারী টেক্স, খাজানা ইত্যাদি নিয়মিতভাবে চালাইয়া আসিতেছি। অবশ্য, এই উইল সম্বন্ধে কাশীর নানা লোকের মুখে নানাপ্রকার আজগুবি গল্প শুনিতে পাইবেন বটে, কিন্তু তাহার কোনটিই ঠিক নহে। আমি যাহা বলিতেছি, এইটিই ঠিক।"

এই কথা বলিয়া সেই বাক্পটু মোক্তার বাবুটি যেখানে বসিয়াছিল, সেখান হইতে না উঠিয়াই, আমার শয্যার অনতিদূরে নাক ঝাড়িতে আরম্ভ করিয়া দিল। আমিও তাহার কথায় বা কার্য্যে কোনরূপ বাধা না দিয়া, তাহার চরিত্রের কোন্ দুর্ব্বলতার রন্ধ্রপথে প্রবেশ করিয়া তাহার অন্তরের অন্তস্তল হইতে যে এই পরিত্যক্ত উদ্যানবাটিকাটির গুপ্ত রহস্যের সূত্র টানিয়া বাহির করিব, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। আমি বুঝিলাম যে, এই বৃদ্ধ ব্যবহারাজীবের নিকট মহারাণী নর্ম্মদা বাইয়ের উইল ভিন্ন যে

জগতে অন্য কিছু আবশ্যক বস্তু আছে, তাহা বলিয়াই বোধ হয় না। মহারাণী নর্ম্মদা বাইয়ের চরমপত্রই বৃদ্ধ মোক্তার জয়করণের সমস্ত চিন্তা, সমস্ত ভাবনা, সমস্ত কল্পনা, তাহার জীবনের গর্ব্ব, তাহার মরণের স্বর্গ।

আমি এত দিন এই পোড়ো বাড়ীটি দেখিতেছিলাম, আর মনে মনে কত লোমহর্ষণ কাল্পনিক নাটকের আখ্যানভাগ ছকিতেছিলাম, রচিতেছিলাম, ভাঙ্গিতেছিলাম, গড়িতেছিলাম, তাহা যে আজ এই প্রাণহীন মস্তিষ্কহীন ক্ষুদ্র জীব মোক্তারের মুখ হইতে নিঃসৃত একটিমাত্র বিশেষত্বহীন কথার আঘাতে চুরমার হইয়া গেল, সেই জন্য আমি মনে মনে সত্যই একটু বেদনা অনুভব করিলাম।

আমি কহিলাম, "মোক্তারবাবু! আমি যদি আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করি যে, আপনাদের স্বর্গগতা মহারাণীর এরূপ অদ্ভুত খেয়ালের কারণটা কি, তাহা হইলে আমার এই প্রশ্নটিকে কি আপনি অশিষ্ট বা অসঙ্গত বলিয়া মনে করিবেন?"

সে কহিল, "আমরা আদালতে সাক্ষীর মুখে ইহা অপেক্ষা অনেকগুণে বেশী অসঙ্গত প্রশ্ন শুন্‌তেও অভ্যস্ত। তবে রাজারাজড়ার অদ্ভুত খেয়ালের কারণ খুঁজে বের করা সহজ নহে। আর মহারাণী নর্ম্মদা বাইয়ের কৃত কার্য্যের বিচার করবার শক্তি আমার নাই, কারণ, আমি তাঁর নুণ খেয়েছি ও খাবার আশা করছি। এই যে হীরের আংটীটি আমার হাতে দেখছেন, এটি মহারাণীরই দেওয়া উপহার। বিশেষ, মহারাণীর সহিত আমার পরিচয়ও কয়েক ঘণ্টার জন্য। কাযেই আমি আপনার প্রশ্নের সদুত্তর দিতে অশক্ত। আমি মৃজাপুরে এক জন জজকোর্টের উকীলের মুহুরী ছিলাম। মাত্র চারি পাঁচ মাস পূর্ব্বে মোক্তারী পাশ ক'রে কাশীতে এসে মোক্তারী করতে বস্‌লাম। হঠাৎ এক দিন রাত্রিতে এক জন যুবতী পরিচারিকা এসে আমায় বললে, 'রাণীজী এখনই আপনাকে নিয়ে যাবার জন্য আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।' মহারাণী তখন তাঁর গণেশ মহল্লার বাড়ীতে থাকতেন। দাসী আমাকে সঙ্গে ক'রে বরাবর রাণীর শয়নকক্ষে নিয়ে গেল। ঘরে অন্য লোক কেহই ছিল না। চাদর দিয়ে ঢাকা একটি জীর্ণ-শীর্ণ কঙ্কালসার নারীমূর্ত্তি ঘরের মাঝখানে খাটের উপর দুগ্ধফেননিভ শয্যার উপর শুয়ে ছিল। ইনিই শুনলাম মহারাণী নর্ম্মদা বাই। আমি সেই কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র মহারাণী অতি কষ্টে কহিলেন, 'এই নিন মোক্তারবাবু! এইখানি আমার উইল, প'ড়ে দেখবেন। আর এই আংটীটি আমার স্মৃতি-চিহ্ন। বাবা বিশ্বনাথ! আমায় পায়ে রাখ।'

"বাবা বিশ্বনাথ ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু। তিনি তৎক্ষণাৎ আমাদের মহারাণীজীকে পায়ে স্থান দিলেন। আমার ফিস্‌টা যে মাঠে মারা গেল, এই কথা ভাবিতে ভাবিতে আমি বাড়ী ফিরিয়া গেলাম। বাড়ী গিয়া প্রথমেই আমার বসিবার ঘরে আলো জ্বালিলাম ও ঘরের দরজা-জানালা ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দিয়া লেফাপার মুখ ছিঁড়িয়া উইলখানি বাহির করিলাম। বিস্ময়ের সহিত আমি দেখিলাম যে, মহারাণী তাঁহার উইলে আমাকেই একমাত্র অছি নিয়োগ করিয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহার বরুণাসঙ্গমের সন্নিকটস্থ বাগানবাড়ী সম্বন্ধে যে বিধান করিয়া গিয়াছেন, তাহার স্থূল মর্ম্ম এই যে, 'উক্ত সম্পত্তির সীমানার মধ্যে কোন মনুষ্য যাইতে বা থাকিতে পারিবে না। ঐ বাড়ীর দরজা, জানালা, ফটক ইত্যাদি যেমন তালাবদ্ধ অবস্থায় আছে, সেইরূপই থাকিবে। ইহার কোনরূপ সংস্কার করা হইবে না। অছি আমার অন্য সম্পত্তির আয় হইতে এই বাগানবাড়ীর টেক্স, খাজানা ইত্যাদি রীতিমতভাবে আঞ্জাম করিয়া যাইবেন। উইলকারিণীর মৃত্যুর তারিখ হইতে পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত ঠিক এই ভাবেই থাকিবে। উইলকারিণীর মৃত্যুর পর পঞ্চাশৎ বৎসরের শেষ দিন অতিক্রান্ত হইলে অর্থাৎ একান্ন বৎসরের প্রথম দিবসে, এই উইলে নিয়োজিত অছি অথবা অছির বংশধর কেহ যদি বাঁচিয়া থাকে, তাহা হইলে সে অথবা তাহাদের সংখ্যা একের অধিক হইলে তাহারা তুল্যাংশে এই সম্পত্তি পাইবে।' * * *"

এই কথা বলিয়া মোক্তার জয়করণ উঠিয়া দাঁড়াইল ও প্রস্থানের উদ্যোগ করিল। যাইবার সময় সে সিঁড়ি হইতে আর একবার আমাকে শাসাইয়া যাইতে ছাড়িল না।

জয়করণ মোক্তার বাহির হইয়া গেলে পরই চতুরী ধীরে ধীরে আমার কক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিল, "জয়করণ মোক্তার বোধ হয় আপনার কাছে মহারাণী নর্ম্মদা বাইয়ের উইলের গল্প করতে এসেছিল?"

আমি বলিলাম, "হাঁ পাণ্ডাজী! তাই বটে। তবে

আপনি কি ক'রে জানলেন। লোকটা ঘরে ঢুকতেই ত আপ'ন ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আড়ালে লুকিয়ে সব শুনেছেন না কি?"

চতুরী তাহার স্বাভাবিক সরল হাসি হাসিয়া কহিল,—"লুকিয়ে শুনতে হবে কেন, বাবুজী? আমার বাড়ীতে যে ভাড়াটেই আসুক না কেন, জয়করণ মোক্তার একবার এসে তাকে একটু বেয়ে চেয়ে দেখে যাবেই যাবে। আপনি ত বেফাঁস্ কোন কথা তাঁর কাছে ব'লে ফেলেন নি? দেখবেন: লোকটা কিন্তু ভয়ানক ফিচেল।"

আমি কহিলাম,—"ফিচেল্ হ'ল ত আমার কি?"

চতুরী কহিল,—"আপনার কিছু নয় বটে, বাবুজী! কিন্তু আমাদের ত কাশীবাস করতে হবে। তা ছাড়া আমার বেশী ভাবনা ঐ রেখিয়াটার জন্য।"

আমি কহিলাম,—"রেখিয়ার জন্য ভাবনা কেন, পাণ্ডাজী? আপনার কথাটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।"

চতুরী কহিল,—"আপনি বুঝবেন কি ক'রে, বাবুজী! আপনি ত ব্যাপারটা কিছুই জানেন না। ঐ রেখিয়াই রাণী নর্ম্মদা বাইয়ের কন্যা।"

আমি বিস্মিত হইয়া কহিলাম, "রেখিয়া তাহা হইলে আপনার কন্যা নহে?"

চতুরী আবার একগাল হাসি হাসিয়া কহিল, "না, বাবুজী! আমি নিঃসন্তান।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "রেখিয়া রাজার কন্যা; সে আপনার আশ্রয়ে আসিল কেমন করিয়া?"

চতুরী কহিল, "রেখিয়া রাজার কন্যা নহে, বাবুজী! রাণীর কন্যা।"

আমি জিজ্ঞাসিলাম, "সে কি প্রকার?"

চতুরী কহিল, "বাবুজী, বড় ঘরের বড় কথা! আমাদের গরীব গৃহস্থের ঘরে হ'লে জাত যায়; কিন্তু বড়লোকের জাতকুল সব লোহার সিন্দুকের মধ্যে। রেখিয়ার জন্ম আমার এই বাড়ীতেই হইয়াছে। তাহার জন্মদাতা এক জন বাঙ্গালাদেশীয় পাচক ব্রাহ্মণ। যে প্রৌঢ়া ব্রাহ্মণীটি আপনার পাকশাক করিতেছে, উহারই স্বামী।"

আমি মনে মনে ভাবিলাম যে, যে রহস্যের সূত্র সন্ধান করিবার জন্য আমি এতটা ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছি, সেই রহস্যময় নাটকের অনেকগুলি চরিত্রই ত আমার চোখের সামনে ঘুরিতেছে ফিরিতেছে। তবে আর ভাবনা কিসের?

আমি কহিলাম, "পাণ্ডাজী! এই ঘটনা সম্বন্ধে আপনি যাহা জানেন, আমার নিকট খুলিয়া বলুন দেখি। কি জানি কেন, ইহা জানিবার জন্য আমার বড়ই কৌতূহল হইয়াছে। আমা হইতে আপনাদের কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই।"

চতুরী কহিল, "আমাকে সে কথা বুঝাইয়া দিতে হইবে না, বাবুজী! আমি মানুষ চিনি। যদি সত্য সত্যই এ কথা শুনিতে আপনার আগ্রহ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি এ সম্বন্ধে যাহা জানি, তাহা বলিতেছি, শুনুন। আমি এ কথা আজ পর্য্যন্ত ঘুণাক্ষরে কাহারও নিকট প্রকাশ করি নাই। প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে এক জন দরিদ্র বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ তাহার স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া কাশীতে আইসে। সে আসিয়া আমার বাড়ীতেই একতলায় মাসিক আট আনা করিয়া ভাড়া বন্দোবস্তে একখানি ঘর ভাড়া লইয়া থাকে। আমাদের কাশীর মত সস্তা-গণ্ডা বায়গায়ও এই নিঃস্ব পরিবারের দুই বেলা পুরা আহার জুটিত না। মাসেক দেড়মাস এই ভাবে কাটাইবার পর বাবা বিশ্বেশ্বরের অনুগ্রহে মহারাণী নর্ম্মদা বাইয়ের বাড়ীতে ইহাদের দুই জনের কাযের যোগাড় হইয়া গেল। স্থির হইল যে, ব্রাহ্মণ পাচকের কার্য্য করিবে এবং তাহার স্ত্রী রাণীজীর নেপথ্যকারিণী ও সঙ্গিনী হইবে। এই ব্রাহ্মণ যুবকের চেহারাখানা বেশ সুন্দর ছিল। সে কথায়-বার্ত্তায়ও লোককে বেশ মুগ্ধ করিতে পারিত। মহারাণী তাহার উপর অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন। এই দরিদ্র দম্পতির ভাগ্য ফিরিল।

"মহারাজা বাহাদুর সে সময় বড় একটা এখানে থাকিতেন না। অধিক সময় তিনি বিলাতের নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, মহারাজা তখন মার্কিণ মুলুকে দীর্ঘ প্রবাস করিতেছিলেন। এই সময়ে মহারাণী গর্ভবতী হইলেন এবং অতি গোপনে আমার এই বাড়ীতেই একটি সুন্দরী কন্যারত্ন প্রসব করিলেন। নির্ম্মম নিয়তির অদ্ভুত খেয়ালে এই কন্যাটির চেহারা হইল মহারাণী নর্ম্মদা বাইয়ের অবিকল প্রতিকৃতি। কন্যার মুখ দেখিয়া মহারাণী ভয়ে শিহরিয়া উঠিলেন।

"অর্থেই সমস্ত মানাইয়া যায়, অর্থেই সকল দোষ— সকল পাপ ঢাকিয়া যায়। বাবুজী! আপনি সজ্জন ও বুদ্ধিমান্ লোক। আপনার নিকট আমি আমার নিজের দুর্ব্বলতার কথাও গোপন করিব না। অর্থে আমারও মুখ বন্ধ হইয়া গেল। অর্থে এই নবজাত শিশুর দরিদ্র বিমাতা সপত্নী-কন্যাকে নিজের গর্ভজাত বলিয়া সাদরে অঙ্কে স্থান দিল। অর্থে সর্পের ন্যায় খল, শার্দ্দূলের ন্যায় হিংস্র, শৃগালের ন্যায় ধূর্ত্ত মোক্তার জয়করণও বশীভূত হইল। এই কন্যার বয়স যখন দেড় বৎসর, মহারাজা তখন দেশে ফিরিয়া আসিলেন। ইতোমধ্যে তাঁহার রাজশ্রী যে তস্করের দ্বারা লুণ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল, তাহার কোন চিহ্নই তিনি পাইলেন না। প্রায় দুই বৎসর এই ভাবেই চলিল। হঠাৎ এক দিন প্রাতে সহরে রাষ্ট্র হইল যে, বিলাসগঞ্জ রাজবাড়ীর পাচক মহারাণীর গহনার বাক্স চুরি করিয়া পলাইয়াছে। সহরের অনেকেই এই রটিত গল্পে বিশ্বাস করিল বটে, কিন্তু আমি পারিলাম না, পাচকের স্ত্রীও না। ব্রাহ্মণকন্যা আমাদের বারংবার নিষেধ সত্বেও এই ঘটনার পরদিনই কুশপুত্তলি দগ্ধ, ত্রিরাত্রান্তে স্বামীর প্রেতকৃত্য শেষ করিয়া বৈধব্য-বেশ পরিধান করিল। এই ঘটনার দুই মাস পরে মহারাজা পুনরায় বিলাতযাত্রা করিলেন। বিলাতে পৌছিবার পূর্ব্বে জাহাজেই তিনি বন্দুকের গুলীতে আত্মহত্যা করিলেন। মহারাণীও মহারাজের মৃত্যুর কয়েক দিন মাত্র পরে ভীষণ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোকগমন করিলেন। এই সম্বন্ধে এতদতিরিক্ত যদি কেহ কিছু জানে, তবে সে পাচক ব্রাহ্মণের পত্নী। যে রাত্রে রাজবাড়ীতে গহনা চুরির রটনা হয়, সেই রাত্রে সে রাজবাড়ীতেই উপস্থিত ছিল।"

আমি কহিলাম, "আপনি তাহার নিকট হইতে আসল কথাটা বাহির করিতে চেষ্টা করেন নাই?"

চতুরী কহিল, "আমি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছি, বাবুজী! কিন্তু এই রমণী পাষাণের ন্যায় দৃঢ়, পাষাণের ন্যায় শীতল ও পাষাণের ন্যায় মূক। সে আমা অপেক্ষাও চতুর।"

আমি কহিলাম, "আমি একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব না কি?"

চতুরী কহিল, "দেখিতে পারেন। তবে আপনাকে বলিয়া রাখি যে, সে কোন প্রলোভনেই ভুলিবার লোক নহে। পরলোকগতা মহারাণীর কৃপায় অর্থ কিংবা অন্য কিছুরই অভাব তাহার নাই।"

আমি কহিলাম, "প্রলোভনে ভুলে না, এমন লোক জগতে নাই। তবে প্রলোভন প্রলোভনের মত হওয়া চাই, এই মাত্র। যেমন করিয়া হউক, আমি আসল কথা বাহির করিবই করিব।"

আমার আরও কয়েক দিন কাশীতে কাটিল। এই কয় দিনে চতুরী ও তাহার পরিবারভুক্ত সকলের সহিত আমার ঘনিষ্ঠতাও যথেষ্ট বাড়িয়া গেল। তাহারাও আমাকে চিনিয়া লইল, আমিও তাহাদের কাহার দুর্ব্বলতা কোথায়, তাহাই অন্বেষণ করিতে লাগিলাম।

শীঘ্রই আমি তাহা ধরিয়া ফেলিলাম। আমি যে কলিকাতা হাইকোর্টের এক জন খ্যাতনামা কৌঁসুলী, তাহাও তাহারা সকলে জানিল। আমি যে আদালতে সওয়াল-জবাবে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, তাহা তাহারাও বুঝিল। আমি যে মোকর্দ্দমার কোন জোর না থাকিলেও হয়কে নয় করিয়া দিতে পারি, তাহাও তাহারা শুনিল। আমি তাহাদের সকলেরই হৃদয় আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হইলাম। বলিতে বাধা নাই, রেখিয়ার উপর আমার একটু অনুরাগও জন্মিয়াছিল। এই অনাঘ্রাত রমণীকুসুমলাভের জন্য আমার বলবতী আকাঙ্ক্ষা হইল।

আদালতে যে সকল সাক্ষী সাক্ষ্যপ্রদানে অনিচ্ছুক, তাহাদিগকে অনুকূল সাক্ষ্যপ্রদানে বাধ্য করিবার জন্য উকীল-কৌঁসুলীরা আদালতে এক প্রকার কৌশল অবলম্বন করে। এই কৌশলের নাম browbeating অথবা ভ্রূকুটি দ্বারা ভড়কাইয়া দেওয়া। আমি এই কৌশলে সিদ্ধহস্ত ছিলাম। কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এই নিরক্ষর পাচক-পত্নীর সম্পর্কে সেই উপায় অবলম্বন করিতে আমার আদৌ সাহসে কুলাইল না। অগত্যা আমি ভুলাইয়া ফুসলাইয়া কথা আদায় করিয়া লওয়ার যে শাশ্বতী রীতি ব্যবহারাজীব-সমাজে প্রচলিত আছে, সেই রীতিই অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলাম।

ব্রাহ্মণী নিত্যই আহারের সময় আমার কাছে বসিয়া আমাকে বাতাস করিত। আমি এক দিন তাহাকে একাকী পাইয়া সেই পোড়ো বাড়ীটির রহস্য সম্বন্ধে সে কি জানে, তাহাই আমার নিকট প্রকাশ করিতে অনুরোধ

করিলাম। ভাবে ভাবে আমি ইহাও তাহাকে জানাইয়া দিলাম যে,আমি ঠিক বুঝিতে পারিয়াছি যে, এই ব্যাপারের মধ্যে একটা বা ততোধিক খুন ও বিরাট জালিয়াতী লুকানো আছে। আমি তাহাকে স্পষ্টই বলিলাম যে, আমার ধারণা এই যে, তাহার স্বামীর নামে যে চুরির অপবাদ রটিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা, আর যে উইলের উপর ভিত্তি করিয়া মোক্তার জয়করণ এখন মহারাণী নর্ম্মদা বাইয়ের অছিস্বরূপে তাহার ত্যক্ত সম্পত্তি ভোগ-দখল করিতেছে, সেই উইলও আসল উইল নহে—জাল। আমি ইহাও তাহাকে জানাইলাম যে, এই মামলা আদালতে সপ্রমাণ করিতে হইলে যে যে প্রমাণ-প্রয়োগের প্রয়োজন, তাহাও আমি সংগ্রহ করিতেছি। এখন কেবলমাত্র সেই ব্রাহ্মণ-পত্নী এই বিষয়ে কি জানে, সেইটুকু জানিতে পারিলেই যে আদালতে মোকর্দ্দমা করিয়া আমি মোক্তার জয়করণের হাত হইতে এই বিশাল সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়া রেখিয়াকেই সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী সাব্যস্ত করাইতে সমর্থ, ইহাও তাহাকে পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দিলাম।

ব্রাহ্মণী আমার কথায় ও আমার সামর্থ্যে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস স্থাপন করিল। সে আঁচলে মুখ লুকাইয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। আমি তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলাম, "আপনি এ সম্বন্ধে যাহা যাহা জানেন, সমস্ত বলুন। আমি নিশ্চয়ই আপনাদিগের একটি মহদুপকার করিতে পারিব ও জয়করণ প্রভৃতি যে সকল দুষ্ট লোক এই দুষ্কার্য্যে লিপ্ত আছে, তাহাদিগের সম্বন্ধে আইনের কঠোরতম শাস্তিবিধান করাইতে পারিব।"

ব্রাহ্মণী আমার কথায় কতকটা শান্ত হইয়া কহিল, "মহাশয়, শুনুন। আমাদের বাড়ী বিষ্ণুপুরে ছিল। আমরা ফুলের মুখুটি, বিষ্ণুঠাকুরের সন্তান। আমার শ্বশুর-বাড়ীতে জমা-জমী কিছু ছিল, কিন্তু আমার স্বামী সে সমস্ত উড়াইয়া পুড়াইয়া দেন। দৈন্য-দশায় পড়িয়া ভাগ্যপরিবর্ত্তনের জন্য আমরা কাশীতে আসিলাম। আমার স্বামী বিলাসপুরের রাজবাড়ীতে পাচকের কায পাইলেন। আমি রাণীমা'র সঙ্গে সঙ্গে থাকিতাম। মহারাণী আমাদের দুই জনকেই খুব ভালবাসিতেন। আমার স্বামীকে ভালবাসিতেন তাঁহার নিজের জন্য। আমাকে ভালবাসিতেন আমার স্বামীর জন্য। আমি কিন্তু মনে মনে তাঁহার উপর ভয়ানক চটা ছিলাম। মহারাণী বুদ্ধিমতী হইলেও রূপ-যৌবন ও ঐশ্বর্য্যের উন্মাদনায় এমনই অজ্ঞান ছিলেন যে, তিনি এই ক্ষুদ্র কথাটুকু বুঝিতে পারিতেন না যে,স্ত্রীলোকের স্বামী কাড়িয়া লওয়া অপেক্ষা অধিকতর কষ্টকর ব্যথা আর নাই। কিন্তু কি করিব? আমরা দরিদ্র, তাহার উপর আবার আমার স্বামী লম্পট। আমার নিজের মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণায় নিজেকেই জ্বলিতে হইত। মহারাজা তখন প্রবাসে। মহারাণী অবাধে তাঁহার উচ্ছৃঙ্খলতাপূর্ণ জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। পাপের ফল হাতে হাতে। অচিরেই তিনি গর্ভবতী হইলেন। রেখিয়াই এই পাপ সংসর্গের পরিণাম-ফল। মহারাণীর এই অবৈধ প্রেমব্যাপার চাপা দিয়া রাখিবার জন্য তাহাকে জলের মত অর্থ ব্যয় করিতে হইত। তাঁহার অনুগ্রহে আমাদের অর্থের কোন অভাব ছিল না, অভাব ছিল কেবল মানসিক শান্তির। আমরা যখন দরিদ্র ছিলাম, তখন আমি এখনকার অপেক্ষা অনেকগুণ বেশী সুখে ও শান্তিতে ছিলাম। এখন আমি রাতদিন দুঃখে, শোকে, অশান্তিতে ও দুর্ভাবনায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছি। মহাশয়! আপনাকে আমরা যে কি চক্ষুতে দেখিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। আমি আপনাকে আমার পেটের সন্তান অপেক্ষাও অধিকতর স্নেহ করি। রেখিয়াও আপনাকে মনে মনে এত ভালবাসিয়াছে যে, তাহার হৃদয় নিরন্তর পুটপাকে দগ্ধ হওয়ার মত নিজের তাপে নিজেই দগ্ধ হইতেছে। মহাশয়! আপনি আমাদিগকে বাঁচান।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "যে রাত্রিতে রাজবাড়ীতে চুরি হয়, সেই রাত্রির ঘটনা আপনি কি জানেন, বলুন দেখি।"

সে কহিল, "এই চুরির অপবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা রটনা।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তবে আপনার স্বামী এখন কোথায়?"

সে একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া প্রথমে ঊর্দ্ধে ও পরে নিম্নদিকে দেখাইয়া কহিল, "হয় স্বর্গে, না হয় নরকে; কোথায় যে, তাহা বিশ্বনাথই জানেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার স্বামীকে কি তাহা হইলে উহারা হত্যা করিয়াছে?"

সে কহিল, "কেবল হত্যা নয়! তার চেয়েও ভয়ঙ্কর! মহারাজা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে রাণীর চোখের সামনে, আমার চোখের সামনে, আমার স্বামীকে জীয়ন্তে কবর দিয়েছে। উঃ—কি নৃশংস হত্যা! ব্রহ্মহত্যা! মহাপাতক!"

ব্রাহ্মণী ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

আমি তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলাম, "আপনি ঘটনাটি আমার কাছে খুলে বলুন দেখি।"

ব্রাহ্মণী কহিল, "বিলাত হ'তে ফিরে আসার পরে কেন জানি না, মহারাজা মহারাণী এক বাড়ীতে বাস করতেন বটে, কিন্তু একসঙ্গে থাকতেন না। মহারাজা থাকতেন দোতলায়, মহারাণী একতলায়। মহারাণী সেই সুবিধা পেয়ে প্রায় প্রত্যহই আমার স্বামীর সঙ্গসুখে মগ্ন হয়ে রাত্রি কাটাতেন। ঘটনার রাত্রিতে মহারাজের বাড়ী ফিরতে একটু দেরী হয়েছিল। সেই দিন কোন একটা রাজার ওখানে তাঁহার নিমন্ত্রণ ছিল। রাণীর শোবার ঘরে অত রাত্রিতে আলো জ্বালা দেখে সন্দেহ হ'ল। অন্য দিন তিনি সোজা উপরে চ'লে যেতেন, সে দিন আর তা গেলেন না। রাণীর শোবার ঘরের দরজায় গিয়ে ধাক্কা দিতে লাগলেন। তখন আমার স্বামীও সেই ঘরে ছিলেন। রাণীর ঘরের পাশেই একটা ছোট মালকুঠুরী ছিল, সেই ঘরে একটিমাত্র দরজা, জানালা, গবাক্ষ বা অন্য কোন রন্ধ্র নাই।

মহারাজা তখন বেশ একটু রঙের মুখে ছিলেন। তিনি রাণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'নর্ম্মদা, তুমি একলা আছ? তোমার ঘরে অন্য কোন লোক নেই?'

রাণী অম্লানবদনে কহিল, 'না মহারাজ!'

মহারাজ একবার ঘরের এদিকে ওদিকে চাহিয়া দাঁড়াইলেন ও মালকুঠুরীর দরজা খুলিতে গেলেন।

রাণী তাহাকে বাধা দিয়া কহিলেন, 'মহারাজ! ঐ কুঠুরীর দরজা খুলিয়া যদি কাহাকেও না পান, তাহা হইলে আজই আমার সহিত আপনার শেষ দেখাশুনা জানিবেন।'

মহারাজা কি জানি কি ভাবিয়া আর মালকুঠুরীর দরজা খুলিলেন না। শয়নকক্ষের ঠিক মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া রাণীর চোখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া মহারাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'রাণি, তুমি ঠিক বলিতেছ যে,ওই মালকুঠুরীতে কোন লোক নাই?'

রাণী উত্তর দিলেন, 'না মহারাজ!'

বজ্রগম্ভীরস্বরে মহারাজ কহিলেন, 'বাবা বিশ্বনাথের দিব্য করিয়া বল দেখি, রাণি! ঐ কক্ষে কোন লোক লুকাইয়া নাই?'

রাণী পূর্ব্ববৎ অবিচলিতভাবে কহিলেন, 'বাবা বিশ্বনাথের দিব্য, ঐ কুঠুরীতে কোন লোক লুকাইয়া নাই।'

মহারাজা কহিলেন, 'উত্তম! কে আছিস্?'

সশস্ত্র প্রহরী আসিয়া রাজারাণীকে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল ও আদেশ অপেক্ষা করিতে লাগিল।

রাজা প্রহরীকে কাছে ডাকিয়া তাহার কানে কানে কি আজ্ঞা দিলেন।

দশ মিনিট পরেই এক জন রাজমিস্ত্রী একটি ঝুড়িতে করিয়া ইট, চুণ, সুরকী প্রভৃতি গাঁথনির সরঞ্জাম লইয়া সেই কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল।

মহারাজ হুকুম দিলেন, 'এখনই ভিৎ গাঁথিয়া এই দরজাটি বন্ধ করিয়া দাও। এই কার্য্যের জন্য পারিশ্রমিক বেনারস ব্যাঙ্কের উপর এই দশ হাজার টাকার চেক্। সর্ত্ত—আজ রাত্রেই কাশী ছাড়িয়া যাবজ্জীবন অন্যত্র গিয়া বাস।'

মহারাজের আজ্ঞা তখনই পালিত হইল। মিস্ত্রী একখানি একখানি করিয়া ইট গাঁথিতে লাগিল আর একখানি করিয়া আমার বুকের পাঁজরা খসিয়া যাইতে লাগিল। মহারাণীও তাহার হৃদয়মধ্যে সহস্র বৃশ্চিকের দংশনজ্বালা সহ্য করিতেছিলেন। তাঁহার নির্নিমেষ অশ্রুহীন চক্ষুর্দ্বয় দেখিতে দেখিতে জবাফুলের মত লাল হইয়া উঠিল।"

গল্পটি শেষ করিয়া ব্রাহ্মণী আবার অঞ্চলে চোখ ঢাকিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। ইতোমধ্যে আমি মনে মনে একটা মোকর্দ্দমার খসড়া করিয়া ফেলিয়া দিলাম।

* * * *

ফৌজদারী ও দেওয়ানী উভয় আদালতে একসঙ্গে মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়া দিয়া আমি সর্ব্বপ্রথমেই পুলিসের জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে মোক্তার জয়করণ ও স্থানীয় বহু গণ্য-মান্য লোকের সাক্ষাতে, আমি সেই পোড়ো বাড়ীর মহারাণীর শয়নকক্ষের সংলগ্ন মালকুঠুরীর দরজা বন্ধ

করিয়া, যে দেওয়ালটি গাঁথান হইয়াছিল, সেই দেওয়ালটি ভাঙ্গাইয়া দিলাম ও দরজা খুলিয়া সেই অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম যে, মেঝের মাঝখানেই একটি নর-কঙ্কাল পড়িয়া আছে। এই কঙ্কালটির কোন অংশ এখনও নষ্ট হয় নাই। সেই ঘরে একটি মজবুত লোহার সিন্দুকের মধ্যে বহু মূল্যবান্ জড়োয়া গহনা এবং এক তাড়া দলীল ও কাগজপত্র ছিল। সেই তাড়াটি খুলিয়া প্রথমেই পাওয়া গেল—মহারাণী নর্ম্মদা বাইয়ের উইল। এই উইলখানি কলিকাতার নামজাদা এটর্ণী স্যাণ্ডারসন এণ্ড কোম্পানীর দ্বারা প্রস্তুত ও কলিকাতার রেজেষ্ট্রী আফিসে রেজেষ্ট্রী করা। এইখানিই মহারাণীর আসল উইল। যেখানি মোক্তার জয়করণের হাতে দেওয়া হইয়াছিল, সেইখানি জাল; আসল উইলে মহারাণী তাঁহার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি অব্যূঢ় স্বত্বে তাঁহার একমাত্র কন্যা রেখিয়াকে দান করিয়া গিয়াছেন এবং পাচকের পত্নী সেই ব্রাহ্মণকন্যাকে উইলের একমাত্র একজিকিউট্রিকস্ ও রেখিয়ার গার্জ্জেন নিযুক্ত করিয়া গিয়াছেন।

* * * *

ফৌজদারী মোকর্দ্দমায় মোক্তার জয়করণ ৫ বৎসরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইল।

দেওয়ানী মোকর্দ্দমা বিলাত পর্য্যন্ত লড়ালড়ি করিয়া সাত বৎসর পরে এই সম্পত্তি উদ্ধার করিয়া যখন আমি বিধবা ব্রাহ্মণীর হাতে আমাদের পক্ষীয় বিলাতের এটর্ণীর টেলিগ্রামটি আনিয়া দিলাম, ব্রাহ্মণী তখন যৌবনভারাবনত-দেহা লজ্জাবনতমুখী রেখিয়ার বাঁ হাতখানি আমার ডান হাতে দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "ব্যারিষ্টার সাহেব, এই নিন আপনার ফিস্।"

সেই দিনই আর্য্য-সমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী আমাদের বাড়ীতে আসিয়া পবিত্র হোমাগ্নির সম্মুখে ধীরোদাত্ত-স্বরে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে আমাদের বিবাহগ্রন্থি বন্ধন করিয়া দিলেন।

শ্রীমনোমোহন রায়।

## শারদীয়া

সকাল বেলায় কানন-পথে
কে এসেছে আজ,—
শিউলী যে তার আঁচল থেকে,
ছড়ায় শুভ 'লাজ।'
ভুঁই-চাঁপা ঐ আসন পাতে,
রূপার ঝারি যূথীর হাতে,
অপরাজিতা দাঁড়িয়ে—নিয়ে
নীলাম্বরীর সাজ।

হৃদয়-ছেঁচা আল্‌তা দিলে
হিজল তারে আনি,
সাম্‌নে এসে ধর্‌লে জবা
সোনার সিঁদুর-দানী।
দূর্ব্বাদলের সবুজ থালায়
শিশির সাজায় মোতির মালায়,
'কাশের' চামর ঢুলিয়ে নদী
কয় স্বাগত বাণী।

সকালবেলা কানন-পথে
কে এসেছে আজ,—
ঘরের কথা গেলাম ভুলে,
আজ যেন নেই কায।
ঘুরে' বেড়াই কানন-পথেই,
আজ সকালের কায যেন এই,
বুকের মাঝে ছন্দে বাজে
কার নূপুরের বাজ' !

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী।

# মোহ-ভঙ্গ

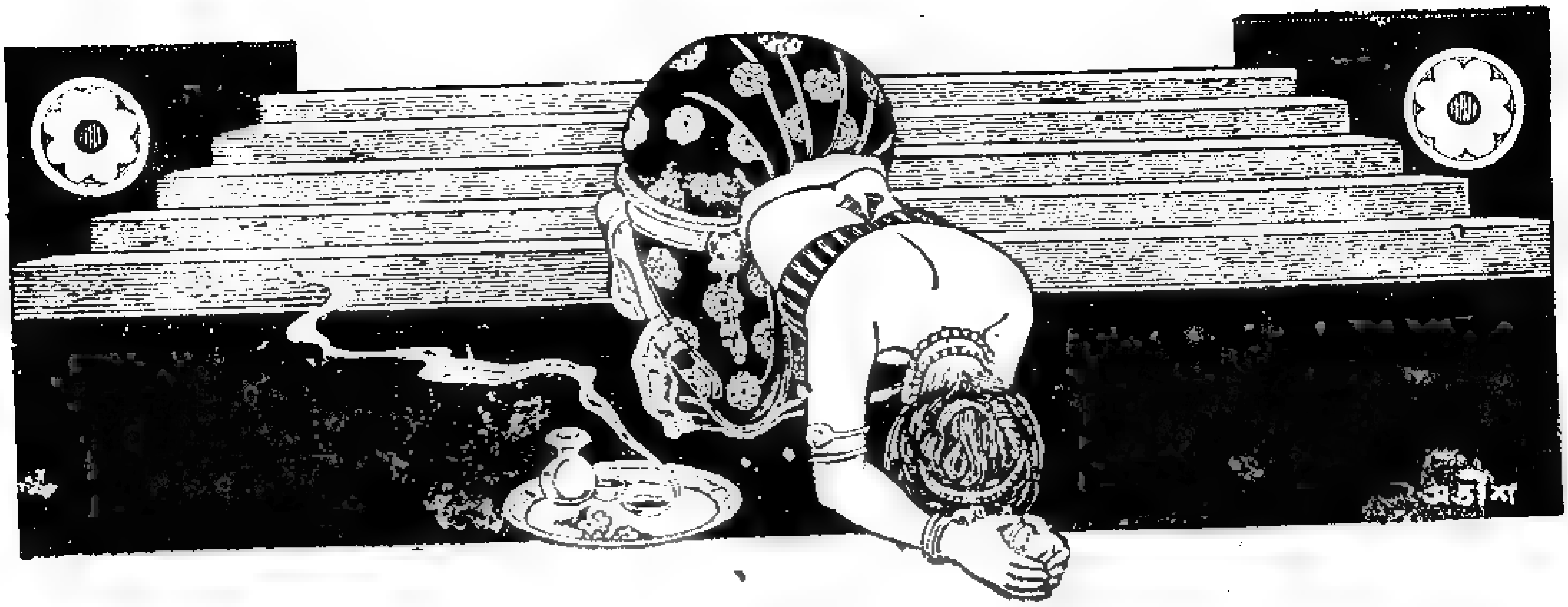

## ১

শীতের প্রভাত। হেমন্তকুমার বার বার ঘড়ীর দিকে চাহিতেছিল; ৭টা বাজিয়া যায়, এখনও ভিতর হইতে চায়ের আহ্বান আসিল না! কারণ কি?

নটবর অতি ধীর পাদবিক্ষেপে গৃহে প্রবেশ করিয়া টেবলের উপর চায়ের পেয়ালা ও একখানি রেকাবিতে পরিপাটী করিয়া ভাজা চিঁড়া রাখিয়া দিল। চিঁড়া কয়টি গাওয়া ঘি মাখান। ঘরে তৈয়ারী টাট্‌কা ঘিয়ের গন্ধে কক্ষটি আমোদিত হইল।

হেমন্ত জিজ্ঞাসা করিল—"তুই নিয়ে এলি যে, ?"

নটবর কুণ্ঠিত হইয়া বলিল—"মা পূজো কচ্ছেন।"

হেমন্ত এক মুঠা চিঁড়া মুখে দিল। পরে চায়ের বাটিতে এক চুমুক দিয়া বলিল—"চা কে করেছে রে?"

"আজ্ঞে, আমি।"

"চিঁড়ে কে ভাজলে?"

"কর্ত্তামা।"

"তুই কি ক'রে কত্তে শিখ্‌লি রে?"

"মা শিখিয়ে দিয়েছেন—সকালে আপনাকে চা ক'রে দিতে হবে, তাই।"

"ওঃ, আচ্ছা যা; এগুলো নিয়ে যা!"

"খেলেন না যে? ভাল হয় নি?"

"এই ত খেলাম; বেশ হয়েছে।"

নটবর একটু ক্ষুব্ধচিত্তে পাত্রগুলি উঠাইয়া লইয়া গেল।

হেমন্ত ভাবিতে লাগিল—মাত্র কয় মাস সে বাড়ী ছিল না, ইহারই মধ্যে অনেক অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে ত! স্ত্রীর হঠাৎ ধর্ম্মে অনুরাগ, যে নটবর চা কি রকম খাইতে, তাহা বুঝিবার জন্য এক দিন সিদ্ধ করা কতকগুলি চায়ের পাতা চিনিসংযোগে খাইয়া ফেলিয়া বলিয়াছিল যে, ইহার চেয়ে গুড় দিয়া মুড়ি খাওয়া ঢের ভাল, সেই নটবর স্বহস্তে চা পরিবেশন করিয়া গেল!

এতক্ষণে স্ত্রীর পূজা সমাপ্ত হইয়াছে, অনুমান করিয়া অনেকক্ষণ পরে হেমন্ত ভিতরে আসিল। ঠাকুর-ঘরের সম্মুখে আসিয়া দেখিল, স্ত্রী পূজান্তে গীতাপাঠ করিতেছে। একখানি গৈরিকবর্ণের রেশমী সাড়ী সৌষ্ঠবের সহিত অঙ্গ বেড়িয়া আছে।

হেমন্তের স্ত্রীর নাম সরোজিনী। স্বামীকে সম্মুখে দেখিয়া সরোজিনী একটু সলজ্জভাবে মুখ নীচু করিল বটে, কিন্তু গীতাপাঠ ত্যাগ করিল না। গীতা যাঁহার মুখনিঃসৃত বাণী—শুধু তাঁহারই কাছে অগোচর রহিল না যে, স্বামী আসিয়া দেখিবেন—শুধু ইহারই অপেক্ষায় পূজারিণীর পাঠ এখনও সাঙ্গ হয় নাই।

হেমন্ত সেখানে না দাঁড়াইয়া বরাবর মায়ের ঘরে গেল। দেখিল, মা তাহার বৎসর দেড়েকের ছেলেকে দুধ খাওয়াইতেছেন।

হেমন্ত জিজ্ঞাসা করিল—"এ সব কি, মা?"

"কি বাবা?"

"তুমি দুধ খাওয়াচ্ছ, নটবর চা কচ্ছে, বৌ গীতাপাঠে ব্যস্ত, এই সব?"

মা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—"চা বুঝি ভাল হয় নি? তা বৌমা আর একবার ভাল ক'রে চা ক'রে দেবে'খন!"

"চা না হয় যাক্‌—দুধ খাওয়ানোর ভার তোমার ওপর কবে থেকে পড়ল?"

দুধ খাওয়ানো শেষ করিয়া খোকার মুখ একখানি গামছা দিয়া বেশ করিয়া মুছাইয়া মা বলিলেন—"এ আর ভার পড়া কি ! ছেলেমানুষ, পূজো আচ্ছায় মন গিয়েছে—একবার না হয় আমিই দুধ খাইয়ে দিলাম।"

"পূজায় হঠাৎ এত অনুরাগ কেন হ'ল, মা ?"

"সে কথা বৌমাকে সময়ান্তে জিজ্ঞাসা করিস্। আর তাতে রাগ কেন, বাবা ?"

"রাগ ত কচ্ছিনে, মা ! শুধু তোমার কাছে জিজ্ঞাসা কত্তে এসেছি, হঠাৎ এ সব কি হ'ল। তুমি উত্তর দিলে, চ'লে যাচ্ছি।"

হেমন্ত ফিরিয়া গেল।

মায়ের মনে ব্যথা বাজিল। তাঁহার হেমন্ত যে কাহারও কোন অসুবিধা রাখে না, নিজের দিকে না চাহিয়া যে অপরকে সব সুবিধা বিলাইয়া দেয়, সে আজ ব্যথা পাইয়াছে। কিন্তু এ ব্যথা দূর করিবার উপায় ত মায়ের হাতে নাই।

মাতৃ-অন্ত-প্রাণ শৈশব যখনই মানুষ অতিক্রম করে, তখন হইতেই তাহার চিত্ত ক্ষণে ক্ষণে মায়ের কোল ত্যাগ করিয়া জগতের নব রূপ, নব রস, নব গন্ধ ও নব স্পর্শের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ায়। ব্যথা পাইলেই সে মায়ের কাছে ফিরিয়া আইসে, মায়ের সান্ত্বনায় ব্যথা কমিলেই আবার সে বাহিরে ছুটিয়া যায়। যৌবনে তরুণী তাহাকে মুগ্ধ করে; তাহারই হাতে সে তাহার সুখ-দুঃখের ভাণ্ডার ছাড়িয়া দেয়। বিশাল বনস্পতির মত সে মাটী ছাড়িয়া আলোক, বাতাস ও আকাশের সন্ধানে বাড়িয়া চলে—কিন্তু মাটী তাহাকে সর্ব্বক্ষণ রস ও খাদ্য যোগায় এবং স্নেহ-মুগ্ধ-নেত্রে তাহার বর্দ্ধমান উন্নত দেহ ও ঘন শ্যামল মুখের পানে চাহিয়া থাকে। পুত্র ব্যথা যখন পায়, তাহার আঘাত মায়ের বুকে সব চেয়ে আগে ও সব চেয়ে বেশী করিয়া বাজে।

হেমন্তকুমারের কলিকাতাতেই বাড়ী। সে উচ্চশিক্ষিত যুবক; বয়স ত্রিশ—লাটদপ্তরে উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত। হেমন্ত বৎসরের মধ্যে অর্দ্ধেকের কিছু বেশী কলিকাতাতে থাকে—অবশিষ্ট ভাগ দার্জ্জিলিংয়ে কাটায়। মা ও স্ত্রী বরাবরই সঙ্গে থাকেন। এইবার প্রথম তাহাকে একা দার্জ্জিলিংয়ে থাকিতে হইয়াছিল। কারণ, বিধবা মাতা বৃদ্ধাবস্থায় দার্জ্জিলিংয়ের শীত আর সহিতে পারেন না। আর মায়ের পক্ষে এ বয়সে একা কলিকাতায় থাকা সম্ভব নহে; সে জন্য স্ত্রীকেও মায়ের কাছে রাখিয়া যাইতে হইয়াছিল।

শরৎকালের প্রারম্ভেই হেমন্ত দার্জ্জিলিং হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে! মাত্র গত কল্য অপরাহ্নে কলিকাতায় আসিয়া পৌছিয়াছে।

## ২

"সন্ধ্যাবেলা চা খেলে না কেন ?"

"চা ছেড়ে দিলাম।"

"কেন ?"

"এম্‌নি, কোন কারণ নেই।"

"কারণ ছাড়া কার্য্য হয় না। কি জন্য ছেড়ে দিলে বল ?"

"সব কারণ বলা যায় না—অনুভব বা অনুমান ক'রে নিতে হয়।"

"আমি আজ চা ক'রে দিই নি ব'লে ?"

"তা ঠিক নয়—তবে তার সঙ্গে কিছু সম্বন্ধ আছে বটে, মনের দুর্ব্বলতা টের পেলাম—অতি সামান্য কারণে আমার কতদূর ধৈর্য্যচ্যুতি হ'তে পারে, তা বুঝতে পার্‌লাম। এ রকম আর ঘট্‌তে দেব না, তাই চা ছেড়ে দিয়েছি।"

"তুমি দেখতেই ত পেলে, আমি তখন পূজোয় বসেছিলাম।"

"দেখেছি ব'লেই ত ও প্রসঙ্গ আর তুলি নি। আর তোমার যে হঠাৎ পূজায় এত অনুরাগ হয়েছে, তা ত আমাকে আগে জানাও নি।"

"ভাল কথা, তোমাকে একটা কথা বলা হয় নি। মা'র কাছে শোন নি ?"

"পরচর্চ্চা করা মায়ের কখন অভ্যাস নেই, জান ত !"

"আষাঢ় মাসে আমি মন্ত্র নিয়েছি—তোমাকে লিখি লিখি ক'রে লেখা হয় নি। স্বামীর অনুমতি না পেলে মন্ত্র নেওয়া যায় না জানি, কিন্তু গুরুদেবের আদেশমত মা'র মত নিয়েই মন্ত্র নিয়েছি।"

"বেশ করেছ, কিন্তু এবার গুরুদেব এলে জিজ্ঞাসা কোরো দিকি—বুড়ো শাশুড়ীর ওপর ছেলের ভার আর

চাকরের ওপর স্বামীর ভার দিয়ে গীতাপাঠ কর্‌লে কতখানি পুণ্য লাভ হয়।"

স্ত্রী মৃদু হাস্তে বলিল, "কি যে বল, তার ঠিক নেই। চাকরে একবার চা ক'রে দিলেই বুঝি চাকরের উপর স্বামীর ভার দেওয়া হ'ল।"

"না, তা ঠিক হয় না। স্বামিসম্বন্ধে যেটুকু কষ্ট কর্‌তে হয়—শুধু তার ভার দেওয়া হয়। তা হঠাৎ যে মন্ত্র নেবার ইচ্ছা হ'ল! গুরুদেব বল্লেন?"

"আমি ত তাঁর কাছ থেকে মন্ত্র নিই নি।"

"কার কাছ থেকে নিয়েছ তবে?"

"তিনি এক সন্ন্যাসী, সংসারত্যাগী—পুরীতে তাঁর আশ্রম; মাঝে মাঝে এখানে আসেন।"

"তিনি একে সন্ন্যাসী, তায় সংসারত্যাগী; অদ্ভুত বটে! কিন্তু আমাদের কুলগুরু কি অপরাধ কল্লেন?"

"এ ত অপরাধের কথা হয় না। ইনি বৌদিদির গুরু, কিরণবাবুর সঙ্গে দিদিও তাঁর কাছ থেকে মন্ত্র নিলেন। আমার ভক্তি হ'ল—আমিও নিলাম। তুমি তখন দেশে ছিলে না—তাই তোমার মত নেওয়া হয় নি। এতে এত ঠাট্টা কেন—গুরুনিন্দারই বা কি দরকার?"

"তোমার গুরু কে, তা যখন জানি নে—তখন তাঁকে নিন্দে কি ক'রে কর্‌ব? তবে আমাদের গুরুকে জানি, তাই বল্‌তে পারি, ও রকম সাধু পুরুষ দুর্লভ। আমার বিশ্বাস, অন্য গুরুর কাছে মন্ত্র নিয়ে তোমার লাভ হয় নি।"

"তাঁকে ত তুমি দেখ নি—তাঁর সম্বন্ধে কিছু জানও না—তবে এ কথা কি ক'রে বল্‌তে পার?"

"যাঁর ওপর আমার ভক্তি, তাঁকে বড় বল্‌লে দোষের হয় না। যদি তোমার গুরুকে দেখে মত বদলায়, তখন তাঁর কাছে ও তোমার কাছে মার্জ্জনা চাইব। আপাততঃ তাঁর যা পরিচয় পেয়েছি, তাতে তাঁর উপর শ্রদ্ধা হবার কোন কারণ হয় নি।"

স্ত্রীর মুখ গম্ভীর হইল, সে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "তার মানে?"

"যখন সংসারে রয়েছ, তখন সেটা বজায় রেখে তবে ত ধর্ম্ম কর্‌তে হবে। যাঁর উপদেশ শিশুকে বুভুক্ষু রেখে গীতাপাঠে প্রবৃত্তি দেয়, স্বামী শাশুড়ীকে চ'রে খেতে বাধ্য করে, তাঁর উপর কি ক'রে শ্রদ্ধা হয় বল।"

"তা হ'লে বল, শুধু পেতরের সঙ্গেই সম্বন্ধ। পান থেকে চুণ খস্‌লেই সর্ব্বনাশ।"

"সম্বন্ধটা সেই রকমেরই বটে। পৃথিবীতে কোন জিনিষই একতরফা চলে না। আমার কর্ত্তব্য প্রাণপণে তোমাদের অসুবিধা দূর করা, তোমাদের খাবার পর্‌বার সংস্থান করা, অর্থ অভাবে তোমরা কখন যাতে কষ্ট না পাও দেখা। আমার যদি ক্ষমতা থাক্‌তে তা না করি, তোমার টান ক'মে আস্‌বে, আর যদি ক্ষমতা না থাকে, তা হ'লে হয় ত ঘৃণা কর্‌বে। তুমি যদি সংসারের দিক্ থেকে মন গুটিয়ে নিয়ে শুধু গীতা, গুরু ও পূজোর দিকে মন ছেড়ে দাও, আমার মনে তাতে কি হ'তে পারে, ভেবে দেখ।"

"ঘৃণা হয়, এই ত? তা বেশ। গুরু সত্যই বলেছেন,—সংসারে শুধু ধর্ম্মই সার আর ঈশ্বরই একমাত্র বন্ধু।"

"অতএব সংসারে আগুন জেলে দিয়ে শুধু গীতায় মন দাও—আর সময়মত খাও দাও, যাতে পূজাপাঠে ব্যাঘাত না ঘটে। অতি উঁচু কথা বলেছেন তোমার গুরু; সেই জন্যই ব'লে থাকে, সাধুরা শুধু তত্ত্বদর্শী নন—আত্মদর্শীও বটেন!"

সরোজিনী স্বামীর এই শ্লেষবাক্যে আগুন হইয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

ক্রোধ একটু কমিলে সাশ্রুনেত্রে সরোজিনী ভাবিতে লাগিল—পাঁচ মাস পরে গৃহে ফিরিয়া একটা সামান্য ব্যাপার লইয়া এই কাণ্ড!

হেমন্ত ভাবিল—এত দিন পরে গৃহে ফিরিলাম—কিসের জন্য?

এইরূপে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে এই প্রথম ব্যবধানের সুদৃঢ় প্রাচীর গড়িয়া উঠিতে লাগিল।

### ৩

সরোজিনীর ছোট বোন্ নলিনীর বিবাহও কলিকাতায় হইয়াছে। স্বামী উকীল—পসার নাই, কিন্তু পয়সা আছে।

শীতের দ্বিপ্রহরে এক দিন বেড়াইতে আসিয়া নলিনী জিজ্ঞাসা করিল,—"দিদি, যাবি ত?

"কি জানি, ভাই!"

"কি জানি কি? বেশ ত!"

"কি কর্‌ব, ভাই, এঁকে যে বল্‌তেই সাহস হয় না—হয় ত ব'লে বস্‌বেন,—'গিয়ে কায নেই।'"

"এ যে বড় জুলুম, দিদি! ওঁরা হিল্লী দিল্লী বেড়াতে যান, তখন কি একবার আমাদের কথা ভাবেন? আর আমরা যদি ধর্ম্মে কর্ম্মে একটা যায়গায় যেতে চাই, তাতে বাধা দিতে আসেন কেন?"

"সে কথা কে বলে, ভাই! এই, না ব'লে মন্ত্র নিইছি, তাই কত রাগ!"

"এ বড় অন্যায় রাগ, দিদি! মেয়েমানুষ হ'য়ে জন্মেছি ব'লে কি ধর্ম্মকার্য্যেও অধিকার নেই?"

"কি কর্‌ব, আমার অদৃষ্ট!"

"তা বল্লে চলবে না, দিদি,—যেতে হবেই; বিশেষ গুরুদেব তোমার ও আমার কথা বিশেষ ক'রে লিখেছেন। বছরে একটা দিন তাঁর জন্মোৎসব, এ দিনটায় না গেলে তিনি কি ভাববেন, দিদি? মনে করবেন, সংসারই ওদের সব—আমি কেউ নই।"

"দেখি ব'লে আজ। নরেন সহজে রাজী হ'ল ত তোকে ছেড়ে দিতে?"

"তোর ওই এক কথা, দিদি! রাজী আবার হবে না কেন? আমি ত এই সে দিনও একবার ঘুরে এলাম। এবার বলেছি, মেয়েটাকে নিয়ে যাব না—তোমায় নিয়ে থাক্‌তে হবে। বলেছে, আচ্ছা।"

আর দুই একটা কথা কহিয়া নলিনী উঠিল।

স্বামীর উপর নলিনীর এই প্রভাব ও তাহার প্রতি এই যথেচ্ছাচারকে স্বামিসৌভাগ্য মনে করিয়া সরোজিনী আপনাকে নিরতিশয় দুর্ভাগিনী মনে করিল। আর এই দুঃখের কথা নলিনীকে প্রকাশ করিয়া বলিতে হইল, ইহার লজ্জা তাহাকে অধিকতর পীড়া দিতে লাগিল।

সেই রাত্রিতেই সরোজিনী স্বামীর কাছে কথাটা পাড়িল।

হেমন্ত বলিল,—"বেশ, যেও।"

সরোজিনী নলিনীর কথা তুলিয়া বলিল,—"নলিনী তার মেয়ে রেখে যাবে,—নরেন দেখ্‌বে।"

হেমন্ত বলিল,—"নরেনের কোর্টে না গেলে চলে, কারণ, তার বাপের অগাধ পয়সা আছে। আমার ত

গুরুদেবের জন্মোৎসব ব্যাপারটা কত বিশাল ও পবিত্র, এ প্রসঙ্গ সরোজিনী আর একবার তুলিল। কিন্তু হেমন্ত তাহাতে কিছুমাত্র আগ্রহ না দেখাইয়া পাশ ফিরিয়া শুইতে সে প্রসঙ্গ চাপা পড়িয়া গেল।

হেমন্ত ঘুমাইয়া পড়িলে সরোজিনী খানিকক্ষণ জাগিয়া রহিল। স্বামীর মত হইবে না,—এই তাহার আশঙ্কা ছিল। আজ এত সহজে মত পাইয়াও সে সুখী হইতে পারিল না।

হেমন্ত যদি এক কথায় রাজী না হইয়া প্রথমে একটু আপত্তি তুলিত ও তাহার পর সম্মতি দিত, তবে হয় ত সরোজিনীর ভিতরকার স্ত্রী ও শিষ্যা উভয়েই তৃপ্তি পাইত।

সরোজিনী জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল,—"সত্যই সংসারের প্রতি তাহার আকর্ষণ বেশী—অন্ততঃ নলিনীর চেয়ে বেশী ত বটেই!"

## ৪

"তুই যেতে দিলি কেন, বাবা?"—মা অশ্রুমোচন করিলেন।

"না দিয়ে কদিন তুমি ঠেকিয়ে রাখতে বল? ধর্ম্মের নামে যখন ঝোঁক চেপেছে, তখন তাকে জোর ক'রে নামান যাবে না, মা! তুমি কিছু দিন একটু শান্ত হয়ে থাক,—সব ঠিক হয়ে যাবে। শীঘ্রই ফিরে এসে তাকে বল্‌তে হবে—আমার ভুল হয়েছে, ধর্ম্মের পথ এ নয়।"

হেমন্তের কথায় মায়ের মন প্রবোধ মানিল না। তিনি বলিলেন, "খোকাকে রেখে দিলেই পার্‌তিস্‌—খোকার টানে তাকে দুদিনেই ফিরে আস্‌তে হ'ত দেখতিস্।"

হেমন্ত লজ্জার মধ্যে ইষৎ হাসিয়া বলিল,—"তা' হ'লে তাকে ফিকির ক'রে আনান হ'ত; আবার কিছু দিন পরেই যাবার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ত, আর দ্বিতীয় বার খোকাকে ছেড়ে কিছু দিন বেশীও থাক্‌তে পারত। সংসারেই তার কর্ত্তব্য আছে, বাবুয়ানী ধর্ম্মে নয়, এটুকু বুঝে সে যদি ফিরে আসে, তবেই সে আসুক্‌,—নইলে আর কি হবে, মা?"

এ ত একটাও তোর মনের ব্যথা নয়,—অভিমান তোকে এই সব কথা বলাচ্ছে।"

হেমন্ত নিরুত্তরে ভাবিতে লাগিল। বোধ হয়, তাহার প্রতিবাদ করিবার কিছু ছিল না।

মা কিছুক্ষণ পুত্রের মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন,—"কাল থেকে ত বড়দিনের ছুটী, আজই তুই আফিস ক'রে বরাবর পুরী চ'লে যা। সেখানে না হয় ২।১ দিন থেকে বৌমাকে নিয়ে আয়।"

"এ যে বড় লজ্জার কথা মা যে, যেখানে সে যাবে, তার পিছনে পিছনে সেখানে গিয়ে তাকে ফিরিয়ে আন্‌তে হবে!"

"সে কি কথা, বাবা! ছেলেমানুষ যদি ভুলে বিপথে গিয়ে পড়ে, তাকে তুই সেই পথে ছেড়ে দিয়ে চুপ ক'রে ব'সে থাক্‌বি—তাকে সেখান থেকে ফিরিয়ে আন্‌বিনে?"

"এ পথকে ওরা ত বিপথ বল্‌ছে না,—এ যে ওদের ধর্ম্মের পথ।"

"ছাই ধর্ম্মের পথ! স্বামী পুত্র সংসারের মঙ্গল ছাড়া যে পথ, সে মেয়েমানুষের ধর্ম্মের পথ কখন নয়। তুই যা, তাকে সে পথ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আয়।"

"সে পথেও যে এক বিপদ, মা! ওদের গুরু যখন স্বামীদের যেতে অনুমতি দেবেন, তখন তারা যেতে পাবে, নইলে নয়।"

এবার মায়ের রাগ হইল। বলিলেন, "আমাদের সময় যদি কেউ এ কথা বল্‌ত, আমরা তার মুখ দেখতাম না। তা তিনি কেন যত বড়ই হোন না। এ ত কম আস্পর্দ্ধার কথা নয় যে, সে স্বামীর মত না নিয়ে স্ত্রীদের নিয়ে যাবে, আর স্বামীদের যেতে হবে সেখানে তার মত নিয়ে!"

"এ যে তোমার অন্যায় রাগ, মা! তোমার নিজের লোকের উপর তোমার জোর নেই;—আর রাগ করবে বাইরের লোকের উপর!"

"তা করব না? সে কি সাধু? সে যে জুয়াচোর, ধর্ম্মের মুখোস্ প'রে মেয়েমানষের মন ভোলাচ্ছে;—নইলে সাধ্যি কি তার বৌমার মত মেয়ের পায়ের নখ দেখতে পায়! তুই নিজের মনকে ভুল বুঝে আমার সঙ্গে বাজে তর্ক করিস্ নে।"

হেমন্ত চুপ করিয়া রহিল।

মা আবার বলিলেন,—"কালই তুই যা, বাবা! সে যখন নিজেকে সাধু বলে, সবারই তার সঙ্গে দেখা করবার অধিকার আছে। যদি সুবিধা বুঝিস্, তার আশ্রমে থাকিস্; না হয়, কাছাকাছি একটা বাসা নিবি।"

রাত্রিতে আহারাদির পর মাতাপুত্রে এই সব কথাবার্ত্তা হইল।

পরদিন ছুটীর পর হেমন্ত মায়ের কথামত পুরীযাত্রা করিল।

## ৫

বেলা দ্বিপ্রহর। হেমন্ত একাকী সমুদ্রতীরে বসিয়া কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তী একখানি বাড়ীর দিকে মাঝে মাঝে চাহিতেছিল।

বাড়ীখানি গৈরিক বর্ণের। সচরাচর এই বর্ণের বাড়ী বড় একটা চোখে পড়ে না। বাড়ীখানির নামটিও একটু অসাধারণ—'সাধনাশ্রম, তরুণ ও তরুণীর জন্য।'

একটি ৮।৯ বৎসরের বালক সেই বাড়ীর ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ক্ষণেকের জন্য দুয়ারের সম্মুখে দাঁড়াইল; তাহার পর হেমন্তকে দেখিতে পাইয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইল। কাছে আসিয়া বলিল,—"দেখুন,—শুন্‌ছেন? একটা কায করতে পারেন?"

হেমন্ত। কি বল।

বালক পকেট হইতে একখানি চিঠি বাহির করিয়া বলিল,—"এই চিঠিখানি ডাকে দিতে হবে, পারবেন?"

চিঠিখানি খামে বন্ধ, খামের উপর ঠিকানা লেখা।

বালকের ভঙ্গীতে কৌতুক অনুভব করিয়া হেমন্ত বলিল,—"হ্যাঁ, বোধ হয় পারব।"

বালক বলিল,—"আমি ডাকঘর চিনি নে।"

"তা যিনি চিঠি ডাকে দিতে দেছেন, তাঁকে কি বল্‌বে?"

বালক বলিল, "বলব, এক জন ভদ্রলোককে ডাকে দিতে দিয়েছি।"

হেমন্ত হাত বাড়াইয়া বালকের নিকট হইতে চিঠিখানি লইল। ঠিকানা পড়িতে গিয়া সবিস্ময়ে দেখিল, তাহারই নাম ও ঠিকানা এবং হস্তাক্ষর তাহার স্ত্রীর।

বালক তাহাকে লক্ষ্য করিতেছিল। বলিল, "আপনি

যে অবাক্ হয়ে গেলেন! তা ব'লে যেন চিঠি পড়বেন না, মেয়েমানষের চিঠি পড়তে নেই।"

হেমন্ত আপাততঃ চিঠিখানি খুলিবার কৌতূহল দমন করিয়া বলিল, "তাই না কি? তুমি কি ক'রে জানলে?"

বালক খুব সহজভাবেই বলিল,—"তা আর জানব না কেন? মেজ-দি বলেছে।"

"বটে! তা মেজ-দি হঠাৎ এত বড় কথাটা তোমাকে বল্লেন কেন? তুমি বুঝি তাঁর চিঠি পড়েছিলে কখন?"

বালক অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া হেমন্তের মুখপানে চাহিয়া বলিল,—"আপনি কি ক'রে জানলেন? আমি কিন্তু চিঠি পড়িনি, চিঠিতে ছবি ছিল, তাই দেখছিলাম।"

"ওঃ, তা হ'লে আর তোমার দোষ কি! তোমাদের বাড়ী কোথায়?"

"বাড়ী আমাদের বসিরহাট। আমরা এখানে এখন থাকি। ঐ যে হলদে বাড়ীটা দেখছেন, ঐটেতে আমরা থাকি। আমি এই বেলা যাই, নইলে মা আবার বক্‌বেন; তা হ'লে চিঠিখানা ঠিক যেন ফেলবেন। যাঁর ঠিকানা খামে আছে, তিনি যেন ঠিক পান।"

বলিয়া বালক এক ছুট্ দিল।

হেমন্ত বলিল,—"হাঁ, নিশ্চয়ই তিনি পাবেন। ভয় নেই।"

বালক চলিয়া গেলে হেমন্ত খাম খুলিয়া চিঠিখানি পড়িল।

"সাধনাশ্রম।
স্বর্গদ্বার পুরী।
সোমবার—

শ্রীচরণকমলেষু,—

তোমার অমতে এখানে আসিয়া ভাল লাগিতেছে না। তুমি পত্রপাঠ আসিয়া আমাকে লইয়া যাইও, ক্ষণমাত্রও বিলম্ব করিও না। এখানে তোমাকে পত্র লেখা বারণ, লুকাইয়া লিখিলাম ও অতি কষ্টে ডাকে দিবার ব্যবস্থা করিলাম। আসিতে কোনমতে অন্যথা করিও না।

পুনশ্চ—খোকার যত্ন হইতেছে না। রোগা হইয়া গিয়াছে। ইতি—

সেবিকা—সরোজিনী।"

হেমন্ত চিঠিখানি ৩৷৪ বার মন দিয়া পড়িল। যত বার পড়িল, তত বারই মনে হইল, চিঠিতে যাহা সে লিখিয়াছে, তাহার চেয়ে ঢের বেশী বলিবার আছে। 'ভাল করি নাই' কথাটা কাটিয়া দিয়া লিখিয়াছে, 'ভাল লাগিতেছে না।' সব শেষে আবার 'তাহাকে' কাটিয়া ইতি দিয়া শেষ করিয়াছে। খোকার সম্বন্ধে যেন আরও কিছু লিখিবার ইচ্ছা ছিল।

চিঠিখানা পকেটে ফেলিয়া হেমন্ত সাধনাশ্রমের দিকে অগ্রসর হইল।

সাধনাশ্রমের দ্বারবান্ গুরুর সঙ্গে থাকিয়া থাকিয়া হাল্‌কা কয়েকটি বাঙ্গালা গান তাহার নিজস্ব বাঙ্গালা ভাষায় শিখিয়াছিল। তাহারই একটা গান সে গুণ্ গুণ্ করিয়া গাহিতেছিল। এমন সময় এক জন ভদ্রলোককে আশ্রমের দিকে আসিতে দেখিয়া চুপ করিয়া আপনাকে যথাসম্ভব গম্ভীর করিয়া লইল।

হেমন্ত একেবারে সম্মুখে আসিয়া বলিল,—"দরোয়ানজী, সব কুশল মঙ্গল ত?"

দ্বারবান্ একটু সন্দেহের চক্ষুতে চাহিয়া বলিল,—"হ্যাঁ, বাবু, ভাল। আপনি কোথা থেকে আস্‌ছেন?"

হেমন্ত বলিল,—"আমি অন্য দেশ থেকে আসছি। তোমাদের এ আশ্রমের নাম খুব শুনেছি। একবার ভিতরটা দেখে যাব ব'লে এসেছি।"

দ্বারবান্ আবার গম্ভীর হইয়া বলিল,—"সে ত হবে না, বাবু। ঠাকুরজীর হুকুম আছে, মাইজী লোক ছাড়া কেউ ভিতরে যেতে পাবে না।"

হেমন্ত বিস্ময়ের ভাণ করিয়া বলিল,—"তার মানে? তোমাদের ঠাকুরজী কি স্ত্রীলোক না কি?"

দ্বারবান্ বিস্মিত হইয়া বলিল,—"কি বোলেন আপনি, বাবু! আমার ঠাকুরজীর নাম তরুণানন্দ স্বামী—কেতো লোকে তাকে জানে, আপনাদের ইস্ত্রিলোক ঠাকুরজীর হাতমে ছাড়িয়ে দেয়।"

"বটে। তবে ত তোমার ঠাকুরজী মহাপুরুষ। এতদূর এসে তাঁকে দর্শন না ক'রে গেলে যে, মহাপাপ হবে। আমি একটিবার যাব, আর তাঁকে দর্শন ক'রে কিছু প্রণামী দিয়ে আস্‌ব। আর তুমি যে আমাকে যেতে দিচ্ছ, তার জন্য তোমার পুরস্কার এই নেও।"

বলিয়া হেমন্ত বিস্মিত দ্বারবানের পুলকিত ও প্রসারিত হস্তে ৫টি উজ্জ্বল রৌপ্যমুদ্রা রক্ষা করিল।

দ্বারবান্ নিরতিশয় প্রফুল্ল হইয়া টাকা কয়টি বস্ত্রমধ্যে সযত্নে রাখিয়া বলিল,—"আপনি ভিতরমে গিয়ে আশ্রমের সব আচ্ছা করিয়ে দেখিয়ে লিবেন। তার পর খবর ভেজিয়ে দিবেন। ঠাকুরজী দেখা কোর্‌বেন।"

হেমন্ত তখন ভিতরে প্রবেশ করিল।

* * *

প্রথমেই বারান্দাযুক্ত দুইটি নাতিবৃহৎ কক্ষ, সম্মুখে প্রাঙ্গণ। একটি কক্ষে কয়েকটি শিশু লইয়া একটি ঝি বসিয়া আছে। কাহাকেও ঘুমের জন্য তাড়না করিতেছে, কাহাকে বা দুইটি চড় বসাইয়া দিয়া শান্ত করিবার পরিবর্ত্তে আরও অশান্ত করিয়া তুলিতেছে, কখন বা বলিতেছে,—"এমন মা-ও দেখিনি বাপু যে, ছেলে-মেয়ে ফেলে ওপরে মত্ত আছেন।" হেমন্ত সবিস্ময়ে দেখিল, তাহার পুত্রও এই শিশু-কোম্পানীর মধ্যে আশ্রয় পাইয়াছে। ঝি তাহাকে যেমন করিয়াই হউক, ঘুম পাড়াইয়া ফেলিয়াছে।

হেমন্ত অল্পক্ষণের মধ্যেই ঝিকে বশীভূত করিয়া ফেলিল। ছেলেদের দুর্ভাগ্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া ঝির কঠিন কার্য্যের জন্য সহানুভূতি দেখাইল। পরিশেষে ঝিয়ের হাতে পাঁচটি টাকা দিয়া বলিল, "দুই টাকার মিষ্টান্ন কিনিয়া এই শিশুদিগকে দিবে এবং অবশিষ্ট ৩টি টাকা দিয়া যখন দেশে যাইবে, তখন তোমার আপন ছেলেমেয়েদের জন্য মিষ্টান্ন কিনিয়া লইয়া যাইবে।" ঝির আপন কোন সন্তান-সন্ততি না থাকিলেও এই ব্যবস্থায় ঝি পরম সন্তোষ লাভ করিল এবং আশ্রমের কোন কার্য্যই হেমন্তের অজ্ঞাত রাখিল না।

বাড়ী দ্বিতল। নিম্নতল পাশাপাশি তিনটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রবেশ করিতেই শিশুখণ্ড—যেখানে শিষ্যাগণের শিশুগণ আশ্রয় পাইয়াছে। এই শিশুগণ মায়ের কাছে দিনান্তে একবারমাত্র যাইতে পায়। বেশীক্ষণ থাকিলে না কি তাহারা মাতৃগণের ধর্ম্মকার্য্য ও ধ্যানধারণাদির বিঘ্ন উৎপাদন করে, সে জন্য এইরূপ ব্যবস্থা।

দ্বিতীয় খণ্ডে পুরুষগণ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। ইহারা কেহ কেহ গুরুজীর কাছে মন্ত্রগ্রহণ করিয়াছে—কেহ বা অর্দ্ধাঙ্গিনীর মন্ত্র গ্রহণের জন্য বাধ্য হইয়া আছে। কেহই কিন্তু গুরুর অনুমতি না পাইলে স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পারে না।

তৃতীয় খণ্ড রন্ধনের জন্য ব্যবহৃত হয়। এখান হইতে অন্ন শিষ্যাগণের জন্য উপরে ও শিশুগণের জন্য শিশুখণ্ডে যায়।

উপরে সর্ব্বশুদ্ধ ৭টি শয়নকক্ষ। দুইটি গুরুর দ্বারা অধিকৃত, অপর ৫টি শিষ্যাগণ অধিকার করেন। এক কালে ৫টির বেশী শিষ্যা থাকিবার নিয়ম নাই। প্রাতঃকালে গুরুর কক্ষে নির্দ্দিষ্ট সময়ে সকল শিষ্যা সমবেত হইয়া উপদেশ গ্রহণ করেন। অন্য সময়ে শিষ্যাগণের কক্ষে গুরু স্বয়ং আসিয়া অধিকারভেদে উপদেশাদি প্রদান করেন। যিনি পুত্র, কন্যা ও স্বামীর প্রতি—অর্থাৎ সংসারের প্রতি আকর্ষণ যত ত্যাগ করিতে পারেন, গুরুর স্নেহ তাঁহার প্রতি তত আকৃষ্ট হয়।

হেমন্তের মনে হইল, এ কি সাংঘাতিক ব্যবস্থা! মেয়েরা উপরতলে একেবারে গুরুর করতলগত হইয়া আছে! ইচ্ছা করিলেও সহজে সন্তানের সঙ্গে দেখা করিবার তাহাদের উপায় নাই, কারণ, রন্ধনখণ্ড, পুরুষদের খণ্ড পার হইয়া তবে তাহাদিগকে আসিতে হইবে। হেমন্ত সন্ধান লইয়া জানিল, গুরু ঘুমাইলে রাত্রিতে যে কোন স্বামী তাহার স্ত্রীর সঙ্গে নিভৃতে দুই দণ্ড বিশ্রম্ভালাপ করিয়া লইবে, তাহার উপায়ও নাই। কারণ, নীচে নামিবার দুয়ার গুরু প্রতি রাত্রিতে স্বহস্তে বন্ধ করিয়া চাবি নিজের কাছে রাখিয়া দেন—পাছে দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে কোন স্বামি-স্ত্রী দেখা-সাক্ষাৎ করিয়া ফেলে।

হেমন্ত বিস্মিত হইয়া ভাবিল—তবে কিসের লোভে বা প্রত্যাশায় হতভাগ্য স্বামীরা এখানে পড়িয়া থাকে! শুধু কি ধর্ম্মপিপাসায়? কৈ, এমন ধর্ম্মানুরাগ ত সে লক্ষ্য করিতে পারে নাই। তবে ইহা কি?

হেমন্ত স্থির করিল, এ কয় দিনের মধ্যে ইহার সন্ধান লইতেই হইবে।

সন্ধান লইতে লইতে হেমন্ত একটি সূত্র পাইল—যাহা অবলম্বন করিয়া সে প্রকাশ্যে এই স্থানে অবস্থান করিতে পারে। আর ঘণ্টা দুই পরে গুরু নিম্নতলে নামিয়া কিছুক্ষণের জন্য শিষ্যগণের সহিত কথাবার্ত্তা কহিবেন।

কেবল সেই সময়ে বাহিরের ধর্ম্মপিপাসু লোকজন তাঁহার কাছে আসিতে পারে ; সেই সময়ে তিনি ভক্তগণের ভবিষ্যৎ গণনাও করেন এবং এমন দুই একটি অদ্ভুত শক্তি প্রদর্শন করেন—যাহা দেখিয়া লোক বিস্মিত ও পুলকিত হইয়া উঠে। তবে নিতান্ত অনুরোধে না পড়িলে তিনি গণনাদিতে হাত দেন না ; যদি কোন ভক্ত অত্যন্ত ধরিয়া বসেন এবং আশ্রমের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য কিছু অর্থও দিয়া ফেলেন, তবেই তাঁহাকে গণনায় হাত দিতে হয়।

হেমন্তের পকেটেই কলম, কাগজ সব ছিল। বাহির করিয়া সরোজিনীর নামে এক পত্র লিখিল ঃ—"আমি আসিয়াছি। বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিলাম, পত্র পাইয়া ভিতরে আসিয়াছি। ভয় নাই। খোকাদের বাহিরে আনিবার সময়ে সব শেষে তোমার খোকাকে আনিবে। সেই সঙ্গে তুমিও চলিয়া আসিবে। পুরুষ-মহলের ঠিক দুয়ারের কাছে আমি অপেক্ষা করিব।"

হেমন্ত ঝির সঙ্গে আরও একটু আলাপ করিয়া লইল ও তাহার হাতে চিঠিখানি দিয়া রাখিল। বুঝাইয়া দিল, যখন গুরু পুরুষ-মহলে আসিয়া বসিবেন এবং সে শিশুগণকে লইয়া তাহাদের মায়ের কাছে যাইবে, তখন ঐ চিঠিখানি সরোজিনীর হাতে দিতে হইবে। সরোজিনী কে, তাহা বর্ণনা দ্বারা বুঝাইয়া দিতেই সে বলিল—"হাঁ বাবু, তা আর চিনিনে। তিনিই ত হিরণকুমারের মা। আহা, তেনারই ত ছেলের জন্য বেশী কষ্ট দেখি ; আর সবাই ত দিব্যি নিশ্চিন্দি হয়ে আছে।"

ঝিকে সব বুঝাইয়া দিয়া হেমন্ত কিছু কালের জন্য বাহিরে গেল। দ্বারবান্ সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল। হেমন্ত বলিল—"আমি একটু ঘুরে আসি ; এখনও তোমার ঠাকুরজীর নামতে দেরী আছে ত ?"

দ্বারবান্ বলিল "জী হাঁ, এখনও ঘণ্টা দেড়েক দেরী।"

হেমন্ত চলিয়া গেল। ঘণ্টাখানেক পরে একটি প্রিয়দর্শন যুবক ও একটি ভৃত্য সঙ্গে হেমন্ত পুনরায় আশ্রমে ফিরিল।

## ৬

নিম্নতলে একটি সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, গুরুর নীচে নামিবার সময় হইয়াছে। পুরুষ-মহলের নির্দ্দিষ্ট কক্ষে শয্যা বিছান ছিল। ঘর জুড়িয়া একখানি দামী কম্বল, মধ্যস্থলে পশমের একটি প্রস্ফুট রক্ত-কমল ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে ; গুরু তাহারই উপর উপবেশন করিবেন। কমলের পশ্চাতে একটি উপধান—গৈরিক বর্ণের সূক্ষ্ম আবরণে তাহা আবৃত।

কয়েক জন শিষ্য বা শিষ্যার স্বামী সেখানে উপস্থিত আছেন ; বাহিরের দুই চারি জনও সমবেত হইয়াছেন।

গুরু আসিবামাত্র সকলে দণ্ডায়মান হইলেন ; গুরু মধ্যস্থলে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলেন। শিষ্যগণ পদধূলি লইলেন।

গুরু যুবা পুরুষ, গৌরবর্ণ, দীর্ঘকেশ ; গৈরিক বর্ণের কৌষেয় পরিচ্ছদ ; গাত্রাবরণী পুরাতন আঙ্গরাখা বা আজিকালিকার কোন প্রকার কোট, কামিজ বা পাঞ্জাবীর অন্তর্গত না হইলেও বেশ সুদৃশ্য ও মনোরম। বয়স দেখিলে ত্রিশের বেশী মনে হয় না।

গুরু মধুর হাসিয়া কুশলপ্রশ্নে সকলকে তুষ্ট করিলেন।

এক নবাগত ভদ্রলোক প্রণামান্তে পাঁচটি টাকা গুরুর পদপ্রান্তে রাখিয়া বলিলেন,—"প্রভু, একটু গণনার জন্য এসেছি।"

গুরু হস্তোত্তোলনে তাহাকে আর কিছু বলিতে নিষেধ করিলেন ও ক্ষণকাল তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

পরে গণনার প্রক্রিয়া আরম্ভ করা হইল।

গুরুর দক্ষিণ হস্তের কাছে কয়েকখান কাগজ এক খণ্ড প্রস্তর দিয়া চাপা ছিল। তাহা হইতে এক খণ্ড কাগজ লইয়া একটি নীল পেন্সিল দিয়া গুরু কতকগুলি কি লিখিয়া উল্টাইয়া রাখিলেন।

তাহার পর নিম্নলিখিত কথাবার্ত্তা চলিল ঃ—

"একটি ফলের নাম কর।"

"আনারস।"

"একটি ফুলের নাম।"

"পদ্ম।"

"নক্ষত্র।"

"শতভিষা।"

"নদীর নাম।"

"যমুনা।"

পরক্ষণে গুরু পূর্ব্বলিখিত কাগজখানি লইয়া ভদ্র-

যে কয়েকটি দ্রব্যের নাম তিনি করিয়াছেন, ঠিক সেই নাম কয়টি গুরু পূর্ব্ব হইতে লিখিয়া রাখিয়াছেন।

পরিপূর্ণ ভক্তিভরে ভদ্রলোক গুরুর পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিলেন,—"আপনার অসাধ্য কি আছে?"

তখন গুরু ভবিষ্যৎ গণনা আরম্ভ করিলেন।

"তুমি কি কায কর? রাজকার্য্য?"

"আজ্ঞে, আমি হাঁটুভাঙ্গা পরগণার নায়েব।"

"হ্যাঁ, তা হলেই রাজকার্য্য হ'ল। আমাদের রাজা আর কে? জমীদারই ত? আর জমীদারদের রাজা হচ্ছেন ইংরাজ। নয় কি?

"আজ্ঞে, তা ত বটেই!"

"তোমাদের অবস্থা আগে খুব ভালই কেটেছে।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, এক সময়ে দিন খুব ভালই কেটেছে।"

"এখন একটু মন্দা চল্‌ছে।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আবার ঠিক হয়ে যাবে।"

"আজ্ঞে, তাই আশীর্ব্বাদ করুন।"

"টাকা ত খুবই রোজগার কর দেখ্‌ছি। হাতে থাকে না কেন?"

"আজ্ঞে, কি করি বলুন,—প্রকাণ্ড সংসার, পাঁচ জনকে দেখ্‌তে হয়; কিছু রাখ্‌তে পারিনে।"

"তা হ'লে কি চলে? কিছু কিছু রাখ্‌বে। দেখি হাত আর একবার। ধর্ম্মস্থান খুব ভাল দেখছি যে! শেষবয়সে তীর্থ কিছু বাকী রাখ্‌বে না হে। তুমি ত ভাগ্যবান্ পুরুষ দেখ্‌ছি!"

"আজ্ঞে, যা কিছু আপনার আশীর্ব্বাদে।"

চার পাঁচ জনের ভবিষ্যৎ যৎসামান্য ইতরবিশেষ করিয়া গণনা করান হইল। কিন্তু যাহারা গণনা করাইতেছিল, তাহাদের মনে কোনরূপ বৈলক্ষণ্য জন্মিল না। ফুল ফল ইত্যাদির নাম আশ্চর্য্যভাবে মিলিয়া যাইতে দেখিয়া সকলেরই ভক্তি অটুট রহিয়া গেল।

হেমন্ত ব্যাপারটা খানিকক্ষণ ভাবিয়া লইল। তাহার পর গুরুর কাছে অগ্রসর হইয়া বলিল—"আমিও গণনার জন্য এসেছি—তবে দক্ষিণাটা আমি গণনা সত্য হ'লে তবে দেব।"

ভক্তগণ গর্জ্জিয়া উঠিল—বিশেষতঃ যাহারা আগে টাকা দিয়া ফেলিয়াছিল।

এক জন বলিল—"ঠাকুর অন্তর্য্যামী; নইলে আমরা কি ফুলের নাম কর্‌ব, তা উনি আগে থেকে কি ক'রে জান্‌লেন?"

হেমন্ত সবিনয়ে বলিল,—"উনি পারেন না, এ কথা ত আমি বল্‌ছিনে। যদি ফল ও ফুলের নাম ওঁর লেখার সঙ্গে মিলে যায়, নিশ্চয়ই দেব।"

এক ভক্ত বলিল,—"অবিশ্বাসী!" হেমন্ত মৃদু হাসিয়া বলিল,—"বেশ ত, উনি আমার অবিশ্বাস দূর ক'রে দিন!"

গুরু খানিকক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে হেমন্তের মুখপানে চাহিয়া কাগজের উপর কতকগুলি নাম লিখিয়া রাখিলেন। পরে একটু থামিয়া বলিলেন,—

"একটি ফুলের নাম কর।"

"যোজনগন্ধা।"

"ফলের নাম!"

"চাল্‌তা।"

"নক্ষত্রের নাম?"

"মৃগশিরা।"

গুরু এবার কাগজপত্র বাহির করিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন দেখিয়া হেমন্ত হাসিয়া ফেলিল।

গুরু আর একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে হেমন্তের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন—"তুমি নিশ্চয়ই অশুচি অবস্থায় এখানে আসিয়াছ, তাই তোমার কথা মিলিল না। তোমার ভবিষ্যৎ আমি গণিব না।"

হেমন্ত শান্তমুখে বলিল,—"আপনি গণনা জানেন না, তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। আপনি গণিতে চাহিলেও আমি আপনার কাছে গণাইতাম না। একটা ফলের নাম বা ফুলের নাম বলা কিছুই শক্ত নয়। এ অল্প চেষ্টাতেই হয়।"

গুরু শ্লেষ করিয়া কহিলেন,—"বিশেষ শক্ত নয়—করই না দেখি।"

হেমন্ত একটুখানি ভাবিয়া লইল। পরে ভক্তমণ্ডলীর মধ্য হইতে এক জনকে বাছিয়া লইয়া বলিল,—"আসুন ত, মহাশয়, দেখা যাক্, পারা যায় কি না।"

সে একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—"আসুন!" হেমন্ত পকেট হইতে এক টুক্‌রা কাগজ লইয়া কি লিখিল; পরে সেখানি ভাঁজ করিয়া অপর এক ভক্তের হাতে দিয়া প্রথম ভক্তকে ফল-ফুলাদির নাম জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। সে-ও স্বেচ্ছায় উত্তর দিল।

হেমন্ত বলিল—"এবার খুলুন।"

সকলে সবিস্ময়ে দেখিল—"কেবল নক্ষত্রের নাম ছাড়া সব নাম মিলিয়া গিয়াছে।"

গুরু অনেকখানি নিষ্প্রভ হইয়া গেলেন। তিনি উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন—"লালসিং।"

লালসিং 'জী হুজুর' বলিয়া আসিয়া দাঁড়াইতেই হেমন্তের সঙ্গে যে পরিচারক আসিয়াছিল, সে-ও আপনার হাতে লাঠি বাগাইয়া ধরিয়া লাল-সিংহের সম্মুখীন হইল। হেমন্তের সঙ্গের যুবক মৃদুমন্দ হাসিতে লাগিল।

পরক্ষণে আর এক অভিনব ব্যাপার ঘটিয়া গেল। দুয়ারের কাছে যেখানে হেমন্ত দাঁড়াইয়া ছিল, ছেলে কোলে করিয়া সরোজিনী উৎকণ্ঠিতভাবে সেখানে আসিয়া পৌছিল। পূর্ব্বনির্দ্দেশমত স্বামীকে দ্বারপ্রান্তে দণ্ডায়মান দেখিয়া সে স্বামীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।

গুরু বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"সরোজিনী এখানে!"

সঙ্গে সঙ্গে দুই লাফে তিনি সরোজিনীর কাছাকাছি আসিয়া পৌছিলেন।

সরোজিনী ভয়ে স্বামীর হাত চাপিয়া ধরিল। খোকা ঝাঁপাইয়া বাপের কোলে গেল।

হেমন্ত এতক্ষণ পরে ক্রুদ্ধস্বরে বলিল—"এই স্বভাব নিয়ে আপনি গুরুগিরী করেন? আমার স্ত্রী আজ থেকে শিষ্যা নন—এখনই আমরা আপনার এই অপবিত্র স্থান ত্যাগ কর্‌ছি।"

ক্রোধে গুরুর মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল; বলিলেন—"আমার আশ্রমে এসে আমার শিষ্যাকে নিয়ে যাও, এত বড় স্পর্দ্ধা তোমার! স্বামী! কে জানে, তুমি এর স্বামী? বদ্‌ মৎলব নিয়ে তুমি আসনি, তার প্রমাণ কি? কি বল তোমরা?"

শেষের কথাটা যাহাদের জিজ্ঞাসা করা হইল, তাহারা কিন্তু কোন উত্তর দিল না। তাহাদের মনেও খট্‌কা লাগিয়াছিল।

হেমন্তের সঙ্গে যে প্রিয়দর্শন যুবক আসিয়াছিলেন, তিনি সঙ্গের পরিচারককে বলিলেন—"অর্জ্জুন, ও ঘরে গিয়ে ইনি যে ঘরে থাক্‌তেন, সে ঘর থেকে এঁর জিনিষপত্র নিয়ে এস ত।"

হেমন্ত বলিল—"সেখানে ঝি আছে—তাকে জিজ্ঞাসা কল্লেই সে দেখিয়ে দেবে।"

বিস্ময়ে, ক্রোধে গুরুর খানিকক্ষণ বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। একটু পরে তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"এ সব কি হচ্ছে তোমাদের? আমার বাড়ী এসে অত্যাচার, আমি এখনই পুলিসে খবর দিচ্ছি, এত বড়—"

বাধা দিয়া হেমন্তের সঙ্গী বলিলেন,—"আপনি অনর্থক ব্যস্ত হবেন না; আমি এখানকার সদর এস্‌, ডি, ও, আপনার হাত থেকে মহিলাদের রক্ষা কর্‌বার জন্যই আমি এখানে এসেছি।"

হেমন্ত বিস্মিত ভক্তমণ্ডলীর দিকে চাহিয়া বলিল,—"যাবার সময় আমি আপনাদের গোটাকতক কথা ব'লে যাই। আপনারা বিচার ক'রে দেখ্‌বেন। যাঁদের স্ত্রী এখানে আছেন, তাঁরা জানেন, স্ত্রীর সঙ্গে দেখা-শুনা এখানে মহাপাপ। এটুকু বোধ হয় জানেন না যে, রাত্রিতে সিঁড়িতে চাবি দিয়ে ইনি চাবি নিজের কাছে রাখেন, পাছে দৈবাৎ তাঁরা আপনাদের কাছে চ'লে আসেন।"

পরে হেমন্ত গুরুর দিকে চাহিয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন,—"আমি এখানে অনেকের কাছে তোমার গুণগ্রাম রাষ্ট্র করেছি। কল্‌কাতা ফিরে গিয়েই আমি তোমার কীর্ত্তি সব কাগজে প্রকাশ ক'রে দেব। তোমার এ ভণ্ডামী আর বেশী দিন চল্‌বে না।"

সরোজিনীর হাত ধরিয়া হেমন্ত সে কক্ষ পার হইয়া বাহিরে আসিল। উদ্বেগে ও লজ্জায় সরোজিনী তখন কাঁপিতেছিল।

অর্জ্জুন ততক্ষণে জিনিষপত্র আনিয়া তাহার অনুসরণ করিল।

সদর S, D, O, গুরুকে বলিলেন,—"আপনি কালই এ স্থান ত্যাগ করবেন, নইলে বিপদে পড়বেন। মহিলাদের বাড়ী পাঠাবার আমি বন্দোবস্ত করছি।" বলিয়া ইনিও ধীরে ধীরে বাহিরে আসিলেন।

গুরু চিত্রার্পিতের মত চাহিয়া রহিলেন। ভক্তগণ একসঙ্গে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে গুরুর পানে চাহিল।

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য।

# রূপ-পূজারী

রেবার চিররুগ্ন স্বামী তাহার বুকের পাঁজরগুলা নাড়াইয়া নাড়াইয়া একেবারে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যে দিন তাহাকে চিরবৈধব্য দিয়া চলিয়া গেলেন, ঠিক সেই দিন হইতেই তাহার বাল্যসখা হেমেন্দ্রের রাশীকৃত ভালবাসা ও সমানুভূতি রেবার সমস্ত দুঃখটা ঢাকা দিয়া ফেলিতে চাহিল। যেখানটায় খুব ব্যথা, সেখানে খানিকটা বরফ দিলে যেমন স্বস্তি হয়, আবার অধিকক্ষণ রাখিলে তদপেক্ষা যেমন অধিক কষ্ট হয়, রেবার ঠিক তেমনই হইয়াছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর হেমেন্দ্র যখন তাহার দুঃখটাকে একটু লঘু করিবার জন্য ব্যগ্র হইল,তখন রেবা যে তাহাকে খুব আপনার মনে করিয়া একটু সান্ত্বনা না পাইয়াছিল, তাহা নহে। কিন্তু যখন দেখিল—মঙ্গলঘটের পার্শ্বে চারা কলাগাছটির মত তাহার জীবনের দ্বারে আসিয়া সে একেবারে ঝাড় বাঁধিয়া বসিয়াছে, তখন রেবার যেন কেমন একটু ভয় হইল। তাহার স্বামী যথেষ্ট সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। ভৃত্য-পরিজনদের লইয়া বালবিধবা বেশ একরকম সংসার পাতিয়াছিল। কিন্তু যখনই সেই বিপুল সম্পত্তির মাঝখানে ছোট সংসারের ভিতর উচ্ছৃঙ্খল হেমেন্দ্রের চলা-ফেরা দেখিত, তখনই সে শিহরিয়া উঠিত।

এক দিন হেমেন্দ্রকে নিরালায় পাইয়া রেবা সাহস করিয়া কহিল,—"হেমদা, তুমি বাড়ী যাও। তোমার বাড়ী থেকে এত চিঠি আস্‌ছে, তুমি যাচ্ছ না কেন?"

হেমেন্দ্র কেমন যেন একটু লজ্জিত হইয়া পড়িল। মুখখানা ভার করিয়া বলিল,—"আপাল ঝাঁজের মোকর্দ্দমাটা না চুকলে কেমন ক'রে যাই বল দেখি? আমি চ'লে গেলেই এ তিন শ টাকা যে জলে যায়।"

"তা যাক্, হেমদা, তুমি বাড়ী যাও, আমার জন্যে তোমার সংসারটা কেন মাটী কর্‌বে?"

"কি আর করব? এ ত শুধু আজকের কথা নয়। ছেলেবেলা থেকে তোমাকে খুব আপনার ভেবে আসছি, আর চিরকাল তাই ভাব্‌ব। কত দিন না খেতে পেয়ে—সংসারের কষ্ট দেখে তোমারি কাছে ছুটে এসেছি, তুমি অকাতরে আমার সে অভাব মোচন করেছ, সে সব কথা আমি কি ভুলেছি, না ভুল্‌তে পারব?"

"ভুল্‌তে ত বল্‌ছি না, হেমদা,—তুমি বাড়ী যাও, মাঝে মাঝে এসে সব দেখা-শুনা ক'রো।"

বৃদ্ধা দাসী আসিয়া বলিল,—"তুমি কেমন মেয়ে গা, সারাদিনের পর কাঁচকলা-সেদ্ধ দিয়ে দুটো আলোচালের ভাত খাবে—তাতেও সাধাসাধি!"

রেবা তাহার খুব দরকারী সুখস্বাচ্ছন্দ্যগুলাকে অবহেলায় ফেলিয়া দিত আর এই পুরাতন দাসী সেইগুলা কুড়াইয়া তাহার কাছে লইয়া আসিত; ইহাতে রেবা সুখী কি অসুখী হইত, তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিত না।

রেবা ফিরিয়া বলিল, "এই যে যাই, সব যোগাড় করেছিস্?"

"যোগাড় আবার কি করব? একরত্তি মেয়ের আবার ভিট্‌কেল্‌মি কত? কাঁরও ছোঁয়া জলটি পর্য্যন্ত ব্যভার করবেন না।"

হেমেন্দ্র হো হো হাসিয়া উঠিল। রেবা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া একটু অনিচ্ছার হাসি হাসিল। বলিল, "আমি না খেলে—তোদের আর বুঝি খেতে নেই?"

বড় এক ফোঁটা চোখের জল বৃদ্ধার কুঞ্চিত কপোলের উপর ঝরিয়া পড়িল। রেবা ইঙ্গিতে হেমেন্দ্রকে বুঝাইয়া দিল যে, 'বুড়ো ঝি আর একটু হইলেই ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া ফেলিবে।

বুড়ো ঝি ও রেবা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

রেবার কথায় হেমেন্দ্রের প্রাণটা কেমন যেন এক রকম হইয়া গেল। শরীরের কোনও স্থানে একটা কাঁটা ফুটিলে

যেমন খিচ্-খিচ্ করে, রেবার কথাগুলা ঠিক তেমনই করিয়া তাহার প্রাণের ভিতর খানিকটা অস্বস্তি দিতে লাগিল।

পরদিন সকালবেলা আপালকে অন্দর হইতে বাহির হইতে দেখিয়া হেমেন্দ্র ভয়ানক চটিয়া গেল। বলিল, "এত সকালে একেবারে বাড়ীর ভিতরে কোথা গেছ্লি রে ?"

বৃদ্ধ চাষী সেইমাত্র রেবার অভয়-নির্ম্মাল্য লইয়া বাহিরে আসিতেছে। কোন উত্তর করিল না।

হেমেন্দ্র পাঁড়েজীকে ডাকিয়া খুব খানিকটা ভৎ'সনা করিল; বলিল, "তোম্ কাঁহে উস্‌কো অন্দরমে যানে দিয়া ?"

পাঁড়েজী সেইমাত্র ভাঙটি ঘুঁটিতেছিল। হেমেন্দ্রের কথায় রাগিয়া গিয়া বলিল, "কেয়া করেগা—মাইজীকা হুকুম !"

তখন লজ্জা ও অপমান আসিয়া হেমেন্দ্রের সমস্ত রোষ-টাকে একেবারে গলা চাপিয়া ধরিল। সত্যই ত ! সে এ বাড়ীর কে ? রেবাই যখন তাহাকে তাড়াইয়া দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে, তখন ঝি-চাকর তাহাকে মানিবে কেন ? আপাল পাঁড়েজীকে একটা 'রাম রাম' দিয়া চলিয়া গেল।

রাগে, দুঃখে, অভিমানে হেমেন্দ্র অন্দরমহলে চলিয়া গেল। রেবাকে বলিল, "আমি এখনই বাড়ী যাব।"

"কেন, হেমদা ?"

হেমেন্দ্র গম্ভীরভাবে বলিল, "যাব, এর আবার কেন কি ? তোমার জন্যে আমার সংসারটি ত আর গোল্লায় দিতে পারি না !"

"আমি ত অনেক দিন থেকেই তোমায় যেতে বলছি, হেমদা, তা যেতে হয় যাবে,—এখন কি যায়, খেয়ে-দেয়ে যাবে'খন।"

"না, আমি এখনই যাব, পরন্তু আপালের মোকর্দ্দমা, যা হয় কোরো, আমি চল্লাম।"

"সে যা হয় আমি করব'খন। এখন কিন্তু তোমার যাওয়া হবে না, আমার মাথা খাও—দুটি খেয়ে বরং বিকেলে যেও। উঠন্ত রদ্দুর মাথায় ক'রে কেউ কখনও যায় ?"

রেবার কথায় হেমেন্দ্র ভারী খুশী হইল। বেলা দশটার সময় ভাত খাইয়া নিজের ঘরে একটু ঘুমাইয়া লইবার ভাণ করিয়া সমস্ত দিন চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল। সন্ধ্যার সময় রেবা আসিয়া বলিল, "হেমদা, সন্ধ্যে হয়েছে, ওঠ না ! আমি মনে করেছিলুম—তুমি বুঝি আমায় না ব'লেই চ'লে গেছ !"

হেমেন্দ্র একটু অপ্রস্তুত হইল। তাড়াতাড়ি বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া বলিল, "অ্যাঁ ! সন্ধ্যে হয়ে গেছে ?"

"তা আর কি হয়েছে—না হয় কাল যাবে ?"

হেমেন্দ্র আর কোন কথা কহিল না। রেবা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

তাহার পর এক মাস কাটিয়া গেল। আজ-কাল করিয়া আর এ পর্য্যন্ত হেমেন্দ্রের যাইবার সুবিধা হইয়া উঠে নাই। আপাল এক দিন তাহার লাঙ্গল-গরু বিক্রয় করিয়া রেবার সমস্ত টাকা কড়ায়-গণ্ডায় হিসাব করিয়া মিটাইয়া দিয়া গেল। আপাল বিনা আপত্তিতে নেহাৎ ভালমানুষটির মত তাহার সমস্ত ঋণ শোধ করায় হেমেন্দ্র একটু চিন্তিত হইয়া উঠিল। তাহার কুবুদ্ধির চারিদিকে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিল,—আর ত কোন ছল নাই। তবে কি করিবে ! কেমন করিয়া সে রেবার মিথ্যা আত্মীয় সাজিয়া তাহার বাড়ীতে বাস করিবে ?

বিজয়া-দশমীর দিন রেবা তাহার স্বামীর কথা স্মরণ করিয়া কত কাঁদিল। স্বামীর ফটো, আর ব্যবহৃত দ্রব্যগুলি যেন তাহার প্রাণের ভিতর ধাক্কা দিয়া বুকের খানিকটা ধ্বসাইয়া দিয়া গেল ! রেবা বিছানায় শুইয়া ছটফট্ করিতেছে, সহসা দরজা খোলার শব্দ হইল। রেবা তাড়াতাড়ি বিস্রস্ত বসন সংযত করিয়া বলিল, "কে ও, হেমদা ? হঠাৎ আজ এ ধারে যে ?"

হেমেন্দ্র হাসিয়া বলিল, "কেন, রেবা ? আস্তে নেই ? এলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় ?"

রেবা কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "না, হেমদা, তুমি বেরিয়ে যাও, আমি তোমায় বিশ্বাস করতে পারছি না।"

হেমেন্দ্র মেঝের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল, "সে কি, রেবা ! তুমিই না বলতে যে, তুমি আমায় খুব ভালবাস ! আমি কোথাও গেলে তোমার মন কেমন করে ?"

"ভালবাসার এ রকম অর্থ করবার সাহস ভগবান্ যেন কখনও আমায় আর না দেন। যাক্ সে কথা। বিধবা পরনারীর কাছে অমন বিশ্রী চোখ নিয়ে কেন এলে তুমি? কি সাহসে—কোন্ পশুত্বের প্রেরণায়?"

"রেবা, তুমি কি বল্‌ছ? ভগবান্ জানেন, আমি তোমায় কত ভালবাসি।"

"কিন্তু সে ভালবাসার ভিতর যে রাশীকৃত ময়লা জড় ক'রে নিয়ে এসেছ। আমার রূপ, যৌবন, ঐশ্বর্য্য দেখে তুমি ভালবেসেছ। আমার এগুলা বাদ দিলে আর তুমি ভালবাসবে না—বাস্‌তে পার না।"

হেমেন্দ্র ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "ভুল বুঝেছ।"

"হ'তে পারে ভুল বুঝেছি—তুমি কিন্তু বেরিয়ে যাও।"

হেমেন্দ্র কহিল, "রেবা—আমি—"

"না, আর আমি কোন কথা শুন্‌তে চাই না, তুমি বেরিয়ে যাও, যাও—যাও বল্‌ছি!"

হেমেন্দ্র একটু নরম হইয়া বলিল, "আমায় এমন অপমান ক'রে তাড়িয়ে দেওয়া ভিন্ন তোমার কি কোন কর্ত্তব্য নেই?"

"কিছু না! বিধবার আবার কর্ত্তব্য? থান কাপড় প'রে জীবনটাকে মৃত্যুর দ্বার পর্য্যন্ত পৌঁছে দিতে পারলেই শেষ!"

রেবা তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া দ্বারে শিকল লাগাইয়া দিল। হেমেন্দ্র চীৎকার করিতে করিতে উঠিতে গিয়া নেশার ঝোঁকে ঘরের মেঝেতে বিগতচেতন হইয়া পড়িল।

পরদিন বেলা ১০টার সময় হেমেন্দ্রের চেতনা হইলে—দেখিল, দরজা খোলা। হা—হা করিতেছে। বাড়ী যেন জনশূন্য নীরব। হেমেন্দ্র উদ্‌ভ্রান্ত প্রাণে ঘরের বাহিরে আসিয়া বারান্দায় দাঁড়াইল। কৈ, কেউ ত নাই! উঠানে একটা গরু বাঁধা থাকিত, সেটা পর্য্যন্ত নাই। তবে কি রেবা বাড়ী একেবারে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে? শত বৃশ্চিকের দংশন বুকে করিয়া হেমেন্দ্র নীচে আসিল। পাঁড়েজীকে জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি—এরা সব কোথায় গেল?"

"ফজিরমে সবকোই কাশীজী চল্ গিয়া—আপ্ জান্‌তা নেই?"

"কুচ্ ঠিকানা দে গিয়া?"

পাঁড়েজী অবহেলার স্বরে 'নেহি' বলিয়া তাহার সেই খাটিয়ার উপর শুইয়া পড়িয়া গান ধরিল, "সীতারাম ভজ রে মনুয়া—"

হেমেন্দ্র সে দিকে আর লক্ষ্য না করিয়া উদাস হৃদয়ে ষ্টেশনের দিকে ছুটিল। সাড়ে পাঁচটার সময় কাশীর একখানা টিকিট করিয়া সে গাড়ীতে উঠিল।

কাশীতে গাড়ী হইতে নামিয়া হেমেন্দ্র প্রমাদ গণিল। সেই অচেনা দেশে লোকারণ্যের মাঝে কেমন করিয়া রেবার বাসা বাহির করিবে? বসিয়া বসিয়া অনেক ভাবিল। অকৃতজ্ঞ বুদ্ধি তাহাকে যেন উপায় স্থির করিয়া দিতে পারিল না।

চার পাঁচ দিনের পর হেমেন্দ্র বিশ্বনাথের নাটমন্দিরে বসিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতেছিল। সহসা রেবার বৃদ্ধা দাসীকে দেখিতে পাইয়া ছুটিয়া গিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল। বলিল, "বুড়ো ঝি, তোমরা কোথায় আছ?"

বুড়ো ঝি তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "তুমি কেমন বামুনের ছেলে গা, হেথা পর্য্যন্ত তাড়া করেছ। যেও না দেখি এবার বৌমার কাছে, মেরে হাড় গুঁড়ো ক'রে দেবোনি।"

মুখ বাঁকাইয়া হাত ছিনাইয়া লইয়া বুড়ো ঝি চলিয়া গেল। হেমেন্দ্র তাহার সমস্ত অপমানটাকে বেমালুম হজম করিয়া তাহার অনুসরণ করিল।

পরদিন প্রাতঃকালে রেবা ঠাণ্ডা মেঝেতে পড়িয়া খোলা গায়ে গড়াইতেছিল। হেমেন্দ্র আসিয়া ডাকিল, "রেবা!"

তাড়াতাড়ি রেবা উঠিয়া বসিল। কাপড়খানা বুকে মাথায় জড়াইয়া বলিল,—"এ কি? হেম-দা? তুমি কবে এলে?"

হেমেন্দ্র তাহার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া, কেমন একতর হইয়া গিয়া বলিল, "এ কি করেছ, রেবা?"

"কেন? কি করেছি, হেমদা, মাথা নেড়া করেছি! বেশ ত হয়েছে, পাঁশগাদায় আর ঘি ঢেলে কি হবে? চুলগুলো ভারী বোঝা হয়েছিল। এক দিন তেল না দিলে গুমো গন্ধ ছাড়ত। জ্বালাতন হয়ে তাই বিশ্বনাথের পায়ে দিয়ে দিয়েছি।"

হেমেন্দ্রের চক্ষুতে জল আসিল। সে কোন কথা কহিল না। মুখখানা চুণ করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিল, রেবা বাধা দিয়া বলিল, "কোথায় যাচ্ছ, হেমদা ?"

"চ'লে যাচ্ছি।"

"না, তা হবে না, যদি এসেছ, একটু বিশ্বনাথের প্রসাদ খেয়ে যাও।"

হেমেন্দ্র মাথা নাড়িয়া জানাইল, "না।"

"কেন হেমদা ? আমায় এবার ঘৃণা করেছ ব'লে বিশ্বনাথের প্রসাদকে পর্য্যন্ত অবহেলা করবে ?"

হেমেন্দ্র দরজার দিকে চাহিয়া বলিল, "বুড়ো ঝি কোথায় ?"

"এই কি কিন্‌তে গেল। ভুলে দরজাটা খুলে রেখে গেছে, তাই ত তুমি আসতে পেরেছ, তা না হ'লে বাহিরে চাবি দিয়ে তবে সে যায়।"

হেমেন্দ্র কোন কথা কহিল না। ছুটিয়া বাটীর বাহির হইয়া গেল। বাড়ীর ভিতর দেখিলে বুড়া ঝি তাহার হাড় গুঁড়া করিয়া দিবে, সে কথা তখনও সে ভুলে নাই।

রেবা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মেঝেতে আবার শুইয়া পড়িল। মনে মনে বলিল, সংসারে পুরুষগুলো কি ঝুঁটা রূপ নিয়েই উন্মত্ত হয়! প্রাণ কি তাদের এত হেলাফেলার জিনিষ ?

হেমেন্দ্র দেশে ফিরিল। এক মাস পরে হেমেন্দ্র একটা নূতন মতলব আঁটিয়া রেবার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার দলীলপত্র কোথায় কি থাকে, সবই ত সে জানে। এই অবসরে সেগুলা হস্তগত করিয়া জাল করিয়া ফেলিবে। সেখানে বৃদ্ধ দ্বারবান্ বাড়ী পাহারায় নিযুক্ত ছিল। পাঁড়েজী হেমেন্দ্রকে দেখিয়া ব্যস্ততার সহিত একটা অভিবাদন করিল। হেমেন্দ্র তাহার হাতে দশ টাকার একখানা নোট গুঁজিয়া দিয়া বলিল, "অন্দরকা চাবী কাঁহা হ্যায় ?"

পাঁড়েজী হাসিতে হাসিতে বলিল, "খুলা হ্যায়—আপকো জানানা লোক বিলকুল আ গিয়া বাবু।"

হেমেন্দ্র সব কথায় কান না দিয়া ভিতর-বাড়ীর দিকে ছুটিতেছিল; দেখিল, তাহার সেই দারিদ্র্য শীর্ণ পুত্র-কন্যাগুলি বেশ সাদা ধবধবে পোষাক পরিয়া তাহার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। পুত্র-কন্যারা আহ্লাদে পিতাকে জড়াইয়া ধরিল। তাহাদিগকে দেখিয়া হেমেন্দ্রের মুখ শুকাইয়া গেল। অন্দরে প্রবেশ করিয়াই সে তাহার বৃদ্ধা মাতা ও স্ত্রীকে জিজ্ঞাসিল, "এ কি, ব্যাপার কি ? তোমরা এখানে ?"

হেমেন্দ্র ঠাট্টা করিতেছে মনে করিয়া তাহার স্ত্রী মুচকিয়া হাসিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। মাতাও পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতেছিলেন। হেমেন্দ্র উদাসভাবে উঠানে বসিয়া পড়িল। বলিল, "মা, তোমরা হাসছ—কিন্তু আমার কান্না পাচ্ছে,—তোমার পায়ে পড়ি, বল, কি হয়েছে, তোমরা এখানে কেন ?"

বৃদ্ধা আরও একটু জোরে হাসিয়া বলিলেন, "আমায় আবার লুকুচ্ছিস কি ? রেবা তোকে উইল ক'রে দিয়েই আমাদের আসতে চিঠি লিখেছিল। আহা, অমন মেয়ের এমন ভাগ্যও হয় !"

হেমেন্দ্রের আর বুঝিতে বাকী রহিল না। তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। যাহার সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিবার জন্য সে তাহার সমস্ত কুটিল বুদ্ধিটি খরচ করিয়া কাশীতে ব্যস্ত হইয়া গিয়াছিল, আজ সেই রেবা তাহার মতলবটাকে এত সহজসাধ্য করিয়া দিয়া তাহার মর্ম্মে বিষাক্ত তীর বিঁধিয়া দিয়াছে। সে যে শরীর, রূপ, যৌবন, ধনসম্পত্তিতে তাহার প্রেম লুটাইয়া দিয়াছিল। এতগুলার পিছনে এমন চিরমধুর পবিত্র প্রেম লুকাইয়া রহিয়াছে, তাহা যে সে এক দিনও দেখে নাই। তাহার চক্ষু টন্-টন্ করিতেছিল। প্রাণের ভিতর চোখের জলের ভিতর দিয়া রেবার মাতৃমূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিল।

হেমেন্দ্র তখনই আবার কাশী রওনা হইবার জন্য দাঁড়াইল। বৃদ্ধা মাতা পুত্রের মুখের ভাব দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "কি রে, কোথায় আবার যাচ্ছিস ?"

হেমেন্দ্রের চক্ষু দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। সে বলিল, "ভয় নেই তোমাদের, আমি শীগ্‌গির ফিরে আসব, আবার আমি কাশী যাচ্ছি।"

মাতা কি বলিতে যাইতেছিলেন, হেমেন্দ্র তাঁহার কথায় কান না দিয়া ষ্টেশনের দিকে ছুটিল।

হেমেন্দ্র কাশীতে পৌঁছিয়া যে বাড়ীতে রেবা ছিল, সেই বাড়ীতে অনুসন্ধান লইয়া জানিল, রেবা সেই দিন সকালবেলা সেখান হইতে উঠিয়া গিয়াছে। বাড়ীওয়ালা বলিল,

"মেয়েটির শরীর ক্রমশঃ ভেঙে পড়ছে ব'লে এখান থেকে চ'লে গেছে—এ বাড়ীতে তাদের না কি কষ্ট হ'ত।" সে ইহা ছাড়া তাহার আর কোন সংবাদ দিতে পারিল না। তিন চারি দিন হেমেন্দ্র সমস্ত কাশীসহর পাঁতি পাঁতি করিয়া খুঁজিল। অবশেষে নিরাশ হইয়া কাশীতেই কোন রকমে তাহার জীবনের গণা দিন কয়টা কাটাইয়া দিবার সঙ্কল্প করিল। দেশে রেবার ঘরে তাহার রাশীকৃত স্মৃতির মাঝখানে স্ত্রী-পুত্র লইয়া বাস করিতে তাহার আর আদৌ ইচ্ছা হইল না।

তিন চারি বৎসর পরে জটাজূটধারী হেমেন্দ্র রেবার বাড়ীতে এক বার আসিয়া দেখিল, উপরের ঘরে মৃত্যু-শয্যায় শুইয়া রেবা। মরিবার জন্য আজ দুই তিন মাস সে কাশী ছাড়িয়া স্বামীর ভিটায় আসিয়াছে। হেমেন্দ্র হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। খাটের পার্শ্বে জানু পাতিয়া বিছানার উপর রেবার শীর্ণ কঙ্কালসার হস্তে তাহার অশ্রুপ্লাবিত রুক্ষ গণ্ড চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "রেবা, রেবা, সত্যই কি আজ তুমি বিধবার কর্ত্তব্য শেষ করতে এসেছ? আমায় এত শিক্ষা দিয়েও কি হয় নি? তোমার মৃত্যুতেই কি আজ তার সমাধান ক'রে যাবে?"

রেবার কথা কহিবার শক্তি ছিল না। সে অসহ্য যাতনায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে স্বামীর ফটোখানি ক্ষীণ বক্ষে চাপিয়া ধরিল। কিয়ৎক্ষণ পরেই বাড়ীতে ক্রন্দনের রোল উঠিল। হেমেন্দ্রের আর্ত্তনাদ সেই তুমুল রোদন-ধ্বনি ভেদ করিয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত পৌছিয়াছিল।

শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

# দুগ্ধবান্ ছাগ

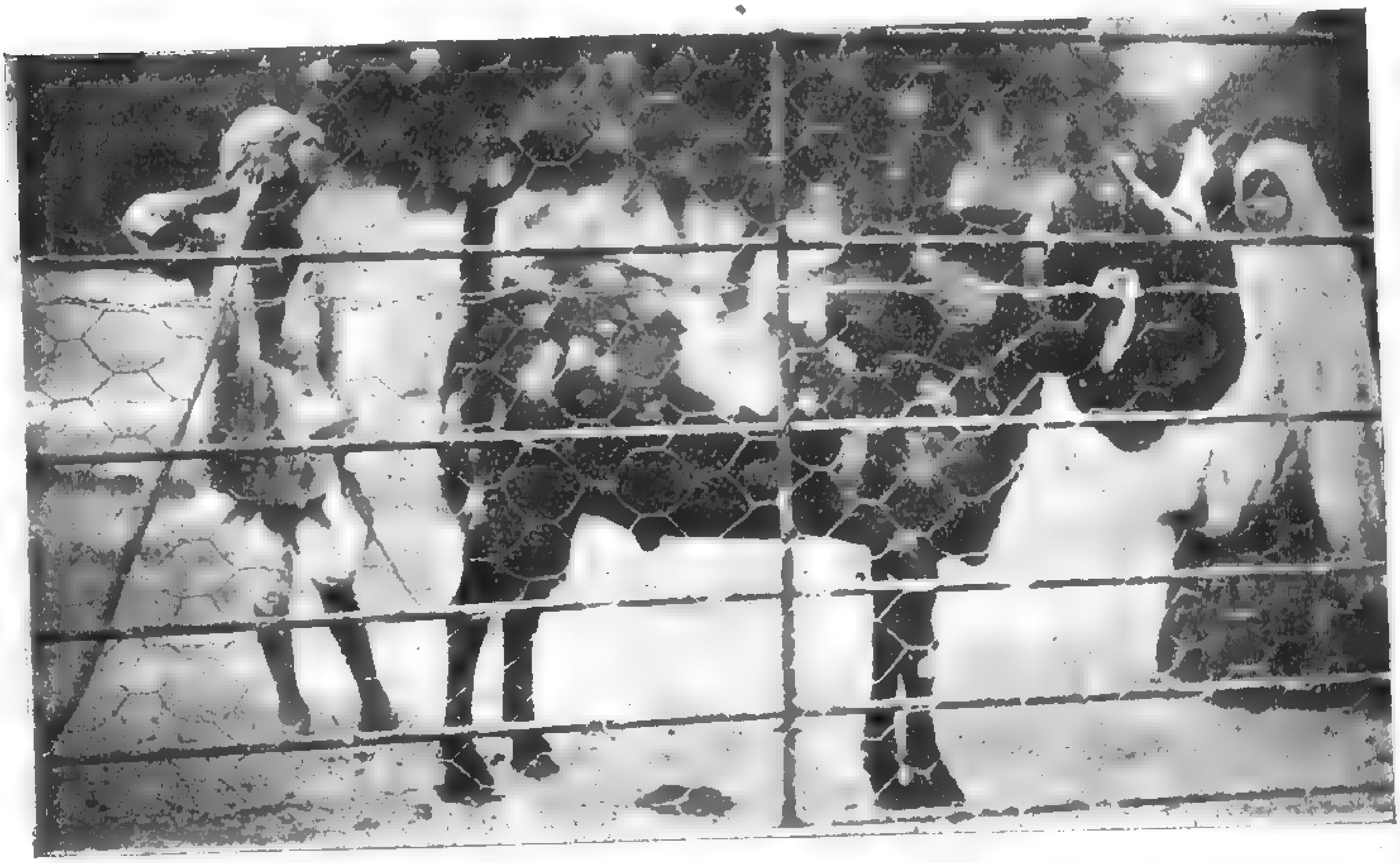

ছাগ কখনও দুগ্ধদান করে না—উহা ছাগীরই একচেটিয়া অধিকার। কিন্তু বিংশশতাব্দীতে অসম্ভবও সম্ভব হইতেছে। জয়পুরে রামনিবাস-উদ্যানে একটি ছাগ আছে, তাহার একটি বাঁট—সেই বাঁট হইতে দোহন করিলে প্রকৃতই দুগ্ধ নির্গত হইয়া থাকে। জয়পুর আর্টস্কুলের অধ্যক্ষ শ্রীযুত হিরণ্ময় রায় চৌধুরী, এ, আর, সি, এ মহোদয় উল্লিখিত ছাগের ছবি পাঠাইয়া দিয়াছেন।

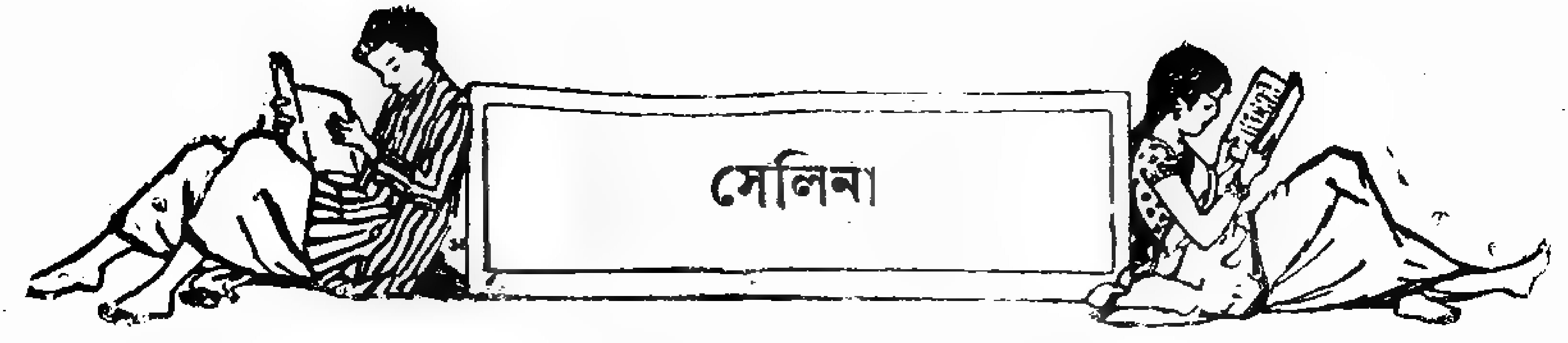

# সেলিনা

জব্বর শিশুকাল হইতে লতিফের বাড়ীতে মানুষ। তাহার মা তাহাকে কোলে করিয়া পনর বৎসর পূর্ব্বে লতিফের বাড়ীতে চাকরী করিতে আসিয়াছিল। মাঝে এক প্রথম বর্ষায় এক দিন জ্বর-গায়ে তিন চার ঘণ্টা ভিজার পরে তাহার সর্দ্দি-জ্বর যে কি করিয়া ডবল নিউমোনিয়ায় পর্য্যবসিত হইয়া তাহাকে ভবলোকের পরপারে লইয়া গেল, তাহা জব্বরের স্পষ্টভাবে মনে পড়িত না। এখন সে এক-বিংশবর্ষবয়স্ক যুবক। জব্বর লতিফের ডান হাত। সে গরুর তত্ত্বাবধান করে, ক্ষেতে লাঙ্গল দেয়, বীজ ছড়ায়, বাগান দেখে, প্রয়োজন হইলে গরুর গাড়ীখানা লইয়া ভাড়া-ও বয়।

লতিফের 'দুই মেয়ে। দুই জনেরই বিবাহ হইয়া গিয়াছে। সে বিপত্নীক বলিয়া মেয়েদের বাড়ীতে আনার পর্ব্বটা বাদ দিয়াই চলিত। কিন্তু জগতে বেশীর ভাগ সময় আমরা যাহাকে বাদ দিয়া চলিতে চাই, সে-ই নানা ছলে আমাদের সমগ্র পথটা যোড়া করিয়া বসে। লতিফের-ও বড় মেয়ে এক দিন হঠাৎ কাঁদিতে কাঁদিতে পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসিল। তাহার স্বামীকে সাপে কামড়াইয়াছিল —চব্বিশ বৎসর বয়সে সেলিনা বিধবা হইল।

লতিফ লোকটা সর্ব্বাংশে-ই মন্দ ছিল না। কিন্তু তাহার হৃদয়ে যে সন্তান-স্নেহ অপেক্ষা অর্থ-লিপ্সা বেশী যায়গা যুড়িয়া ছিল, তাহা যে কেহ নিঃসন্দেহে বলিতে পারিত।

এ দিকে জব্বরের সহিত সেলিনার বেশ বন্ধুত্ব হইল; অবশ্য পূর্ব্ব-বঙ্গের অশিক্ষিত মুসলমান চাষীদের মধ্যে যেমনটি হওয়া স্বাভাবিক! এক দিন লুব্ধ জব্বর সাহসে ভর করিয়া লতিফের নিকট তাহার কন্যার পাণিপ্রার্থনা করিল। দরিদ্র ভৃত্যের এই স্পর্দ্ধায় সেলিনার পিতার মনের মধ্যে অগ্ন্যুৎপাত আরম্ভ হইল। ক্রোধের সেই গলিত ধাতু-বৃষ্টি হইতে অতি কষ্টে পরিত্রাণ পাইয়া জব্বর যে কষ্টসহিষ্ণু ও পরিশ্রমী যুবক, তাহা সকলেই জানিত, সে সাধুতাতেও কাহারও অপেক্ষা বিশেষ নিকৃষ্ট ছিল না; তাহার পক্ষে কায জুটাইয়া লওয়া শক্ত ব্যাপার নহে।

কায পাইয়া অবধি জব্বর অর্থসঞ্চয়ে মন দিল। অতিরিক্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফল ফলিতে দেরী লাগিল না। জব্বর অল্পসময়েই বেশ কিছু জমাইয়া ফেলিল।

ইতোমধ্যে লতিফ তাহার মেয়ের 'নিকা' দিয়াছে। জব্বর যখন মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া দারিদ্র্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছিল, তেমন সময় এক দিন ঘটা করিয়া তাহার কানে এই খবরটা পৌঁছাইয়া দেওয়া হইল। সে দ্বিগুণিত উৎসাহে পরিশ্রম করিতে লাগিল।

সেলিনার নিকা দেওয়া হইল বটে, কিন্তু বৃদ্ধ ইসমাইলকে কেবল তাহার অর্থের জন্য ভালবাসা তাহার বয়সের মেয়েদের পক্ষে শুধু অসম্ভব নয়, অস্বাভাবিক। তাহার মন পড়িয়া রহিল, সুন্দর-সুগঠিত-দেহ যুবক জব্বরের নিকট।

পদে পদে ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অবহেলা যখন অসহ্য হইয়া উঠিল, তেমন সময় এক দিন রাগের মাথায় ইসমাইল বলিয়া ফেলিল, "যে মেয়ের ওপর বাপের দরদ নাই, সে আর কত ভাল হবে। এমনই ছেনাল বলেই ত লতিফ তোকে বিদেয় ক'রে বেঁচেছে।" এই কথা বলায় সেলিনা যাহা নয় তাই বলিয়া তীব্রভাষায় ইসমাইলকে সমস্ত দিন এমন গালাগালি করিল যে, সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে ইসমাইল তাহাকে 'তালাক' দিয়া গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিল।

আবার এক অন্ধকার-শ্রাবণ-সন্ধ্যায় লতিফের বদ্ধদ্বারে ক্রন্দনরতা সেলিনার মৃদু হস্তের করাঘাত পড়িল। সমস্ত শুনিয়া লতিফের-ও রাগ হইল। সে বলিল, "বেশ হয়েছে, থাক্ তুই ঘরে।" এই হতভাগ্য মেয়েটাকে সে একটু ভালই বাসিত। কিন্তু মেয়েকে যতই ভালবাসুক ও

করুক, যখন সঙ্গতি-সমৃদ্ধ জব্বরের নিকট হইতে সেলিনাকে নিকা করিবার প্রস্তাব আবার আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন আর লতিফের চক্ষুতে যত দূর দৃষ্টি যায়, বাধা বলিয়া কোন কিছু নয়নগোচর হইল না। রজত-চক্রের এমনই মাহাত্ম্য যে, দুর্গমতম পথ-ও তাহার অনতিক্রমণীয় থাকে না; এ চক্রের গতিরোধ করে, এমন বাধা পৃথিবীতে দুর্লভ! সেলিনার মনোভাব লতিফের অজ্ঞাত ছিল না, এবং বিনা ঘটায় এক দিন সেলিনার সহিত জব্বরের নিকা হইয়া গেল।

* * * * *

এখন নিজের নূতন সংসারে প্রবেশ করিয়া সেলিনার মনে হইল, এই বুঝি তাহার প্রথম বিবাহ। সে পূর্ণোদ্যমে ঘর-সংসার গুছাইতে লাগিল। অক্লান্ত পরিশ্রমে সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সে অবিশ্রান্তভাবে জব্বরের অর্থাগমের উপায় করিয়া দিত। সকালে গৃহকর্ম্ম করিয়া, স্বামীর পাজালীতে আগুন দিয়া, তাহার কাপড়ে গুড়-মুড়ি বাঁধিয়া দিয়া সে স্নান করিতে যাইত। তাহার পর রান্না-বাড়া হইলে দারুণ রৌদ্রকে অগ্রাহ্য করিয়া মাঠে জব্বরের জন্য একটা জামবাটিতে শান্‌কী ঢাকা দিয়া ভাত লইয়া যাইত। জব্বরের খাওয়া হইলে নিজের হাতে যত্ন করিয়া তাহার তামাক সাজিয়া দিত ও যতক্ষণ জব্বর তামাক টানিত, ততক্ষণ সে আপনার করণীয় কাযগুলি তাহার কাছে শুনিয়া লইত। বাড়ী গিয়া তাড়াতাড়ি দুটা মুখে দিয়া সে জব্বরের দেওয়া কাযগুলি করিতে বসিয়া যাইত। এইরূপে এক বৎসর গেলে তাহার একটি পুত্র হইল।

* * * *

সে বৎসর জব্বর আচার্য্য মশাইয়ের অনেকটা জমী 'ভাগে' লইয়াছিল; তাহাকে সেই জন্য অত্যন্ত পরিশ্রম করিতে হইত। একলা পারিয়া উঠিত না বলিয়া লোক-জনও রাখিতে হইয়াছিল। তাহার উপর সেইবারই সে দেড়শত টাকা দিয়া একযোড়া ভাল চাষের বলদ কিনিয়াছিল। পুঁজি-পাটা যাহা ছিল, সবই প্রায় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, তবে আশানুরূপ ফসল হইলে যে এই সমস্ত খরচ সুদেমূলে দ্বিগুণিত হইয়া ঘরে উঠিবে, তাহা সে জানিত। কিন্তু হঠাৎ সেলিনার খুব অসুখ হইল। তাহার জ্বর আর ছাড়ে না। জব্বরের কাযের ক্ষতি ও অসুবিধা হইতে লাগিল; রুগ্ন সেলিনার দেখাশুনা করে, এমন লোক তাহার কেহ ছিল না, তাই তাহাকে ও চার বৎসরের পুত্রটিকে সে কতক দিনের জন্য লতিফের বাড়ীতে রাখিয়া দিবে ঠিক করিল।

প্রত্যহ সন্ধ্যার পর কর্ম্মান্তে বিশ্রাম না করিয়াই সে লতিফের বাড়ী যাইত ও সেলিনার জন্য কিছু ঔষধ, পথ্য ও ফলমূল সঙ্গে লইত। এ দিকে লতিফ প্রত্যহ ডাক্তার ডাকিয়া মেয়ের রীতিমত চিকিৎসা করাইতে লাগিল। বলা বাহুল্য, তাহার পয়সা দিতে হইত জব্বরকে। স্ত্রীর অসুখে রোজই পাঁচ ছয় টাকা খরচ হইতে লাগিল।

এক দিন অনেকগুলা টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে। জব্বরের মনটা তত ভাল নাই। তাহার উপর স্ত্রীর এই একটানা অসুখের মধ্যে সারিয়া উঠার কোন চিহ্নই না দেখিতে পাইয়া তাহার সহিষ্ণুতা নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছিল। সে শূন্য হাতে লতিফের বাড়ী ঢুকিল। তাহার ছেলেটা রোজ যেমন করিত, সে দিন-ও 'বাবা, বাবা' বলিয়া ছুটিয়া যেমন তাহার কোলে ঝাঁপাইয়া উঠিতে যাইবে, জব্বর তাহাকে রূঢ়ভাবে ঠেলিয়া সরাইয়া দিল।

লতিফ, জব্বরকে দেখিবামাত্র বলিল যে, ডাক্তারবাবু একটা কি "ইন্‌জিসিন্‌" (Injection) করিয়াছেন, তাঁহাকে ভিজিট বাদে আরও দুই টাকা দিতে হইবে ও এরূপভাবে আরও ছয় দিন দুই টাকা করিয়া লাগিবে। এতক্ষণ ধরিয়া নানা কারণে জব্বরের মনটা বিরক্ত হইয়াছিল; কিন্তু 'ঝাল ঝাড়িবার' পাত্রের অভাবে সে চুপ করিয়া ছিল। লতিফের এই কথায় তাহার ক্রোধের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল ও সমস্ত তিক্ততা-তীব্রতা গিয়া পড়িল লতিফের উপর। লতিফ-ও রাগে কাহার-ও নিকট খাট নয়। সে-ও বলিল যে, যাহার স্ত্রীর অসুখের ব্যয় বহন করিবার সামর্থ্য নাই, তাহার আবার বাহাদুরী করিয়া বিবাহ করিতে যাওয়া কেন? কথায় কথা বাড়ে। রাগের মাথায় জব্বর-ও এমন সমস্ত কথা বলিয়া ফেলিল, যাহা সে কখনও বলিতে পারে বলিয়া ভাবে নাই। বাদানুবাদের উত্তেজনায় হার স্বীকার করা অসম্ভব হইয়া উঠে ও তখন মুখ দিয়া এমন সমস্ত কথা-ও বাহির হইয়া যায়—যাহা পরে কেহ শুনাইয়া দিলে নিজের কথা বলিয়া চিনিতে পারা যায় না। পরিত্যক্তা ও বিতাড়িতা সেলিনাকে জব্বর যে দয়া করিয়া স্ত্রীরূপে গ্রহণ

করিয়াছে, এই কথাটা-ও তাহার মুখ দিয়া সেইরূপে বাহির হইয়া গিয়াছিল। একটা মিথ্যা-ও ইহার সহিত যুক্ত করিয়া জব্বর নিজের মহত্ত্ব ও সেলিনার ক্ষুদ্রত্ব প্রমাণিত করিয়া দিয়াছিল। সে বলিয়াছিল, সেলিনা তাহাকে নিকা করিবার জন্য কাকুতি-মিনতি করে ও সেই জন্য লতিফের বরং কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

ইহার পর যাহা হয়, তাহাই হইল। লতিফ উগ্রভাবে জানাইয়া দিল, তাহার কৃতজ্ঞ হইতে দায় পড়িয়াছে। জব্বরের মত জামাই তাহার চাকর হইবার-ও উপযুক্ত নয়। এই কথায় জব্বরের হৃদয়ের একটা ক্ষতস্থানে নূতন করিয়া রক্তস্রাব হইতে লাগিল। সে আর সহ্য করিল না। ছেলেটাকে কোলে লইয়া সটান সে লতিফের বাড়ীর বাহির হইয়া গেল। যাইবার সময় বলিয়া গেল, যেন সেলিনাকে তাহার বাড়ী পাঠান না হয়।

* * * *

সে বৎসর ফসল ভালই হইল। জব্বর আশানুরূপ অর্থলাভ করিল। এইবার সে নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে ও সংসারের দিকে মনোনিবেশ করিবে ভাবিল। সে ভুলিয়া-ও লতিফের বাড়ীর দিক্ মাড়ায় না বা ছেলেটাকে-ও সেই দিকে পাঠায় না। জোর করিয়া সে এইবার সেলিনার স্মৃতি সম্পূর্ণরূপে হৃদিপট হইতে মুছিয়া ফেলিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। কিন্তু মনোরাজ্যের নিয়ম এমন-ই অদ্ভুত যে, সেই দিন হইতে-ই সেলিনার স্মৃতি যেন তাহাকে বিশেষভাবে পাইয়া বসিল! এত দিন এক রকম ছিল ভাল। কায-কর্ম্মের মধ্যে মনোবৃত্তির হাঙ্গাম প্রবেশ করিবার ছিদ্রই পাইত না। কিন্তু ক্ষেত্রের ফসল ঘরে আসার পর যে হতভাগ্য কৃষকের সংসারে মন খুলিয়া আনন্দের ভাগ লইবার লোক থাকে না, তাহার শস্যসম্ভার, তাহার পরিপূর্ণ মরাই-খামার তাহাকে কোন সুখই দিতে পারে না। শুভ-নবান্ন তাহার ব্যর্থ হইয়া যায়! জব্বরের-ও শ্রমজল সফল করিয়া যখন এই অসম্ভাবিত শস্য উৎপন্ন হইয়া তাহার প্রচুর অর্থাগমের পথ খুলিয়া দিল, তখন তাহার কেমন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকিতে লাগিল। শস্য ঘরে উঠিলে যতটা আনন্দ হইবে বলিয়া সে আশা করিয়াছিল, সে আনন্দের কিছুই যখন সে অনুভব করিতে পারিল না,তখন সে হতাশ হইয়া পড়িল। শূন্য উঠান, শূন্য ঘর, শূন্য হৃদয়—সে অনন্ত শূন্যতার মধ্যে আপনাকে অসহায় বোধ করিতে লাগিল। তাহার পর ছোট ছেলেটা—তাহার অগণিত আবদার-ঝঞ্চাটে ক্লান্তি আসিত না বটে, তবে তাহার সঙ্গে সঙ্গে সে সেলিনার খুঁটি-নাটি স্মৃতিগুলিকে এমন ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া রাখিয়াছিল যে, জব্বর যে চিন্তা মন হইতে দূর করিতে চাহিত, সেই চিন্তাই জীবন্ত শক্তিতে তাহার মনোমধ্যে ক্ষণে ক্ষণে উদিত হইতে লাগিল। শেষে লতিফের প্রতি রাগটাই জব্বরের মনে প্রবল হইয়া উঠিল। সে ভাবিল, প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে তাহাকে শাস্তি দিতেই হইবে।

এই শাস্তির সে এক অদ্ভুত উপায় ঠিক করিল। অনায়াসে এক পাত্রী সংগ্রহ করিয়া অনাড়ম্বরে সে তাহাকে বিবাহ করিয়া ফেলিল। কিন্তু হায়, এ বিবাহে তাহার অন্তর-মন যোগ দিল না; এ বিবাহ করিয়াছিল তাহার ক্রোধ, তাহার ভ্রান্ত আক্রোশ! সে দেখিল, না, যে শূন্যতা তাহাকে দিবারাত্র উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছিল, তাহা ইহার দ্বারা পূর্ণ হইবার নহে। এমন কি, ছেলেটা-ও ইহার মধ্যে কোন আশ্রয় খুঁজিয়া পাইল না। জব্বরের অন্তরাত্মা এই নিষ্ফলতা উপলক্ষ করিয়া অহোরাত্র তাহাকে জ্বালাইয়া তুলিল। এ ক্ষেত্রে নিষ্পত্তি হইতে দেরী লাগে না বা সে দেরীটুকু সহ্য-ও হয় না। এক এক দিন নিঝুম সন্ধ্যায় দাওয়ায় বসিয়া উঠানের স্ফীত মরাইগুলার দিকে চাহিতে চাহিতে জব্বরের বিষণ্ণ অবসন্ন মন যেন শোকরাজ্যের কোন্ দূর-দূরান্তরে চলিয়া যাইত; দুইটি প্রীতি-মঞ্জুল চক্ষু স্মরণ করিয়া তাহার বিশাল বক্ষ অশান্ত দীর্ঘশ্বাসে নাড়া দিয়া উঠিত; অসীম বেদনাময় ক্রন্দন-আলোড়নে তাহার সমগ্র হৃদয় হাহাকার করিয়া উঠিত!

শীঘ্রই এই নব-পরিণীতার সহিত জব্বরের এক দিন মনোমালিন্য ঘটিল; প্রায় অকারণেই এবং সহসা সে তাহাকে 'তালাক' দিয়া তাড়াইয়া দিল। কিন্তু তাড়াইয়া দিয়া বেশী দিন চলিল না। পরিবর্ত্তনের নেশা তাহাকে পাইয়া বসিয়াছিল, সে পুনরায় আর এক জনকে বিবাহ করিয়া ঘরে আনিল। কিন্তু পাড়ার লোকরা সবিস্ময়ে দেখিল যে, জব্বর তাহাকে-ও অল্পদিন পরেই তাড়াইয়া দিল।

* * *

এক দিন শূন্যগৃহে ছেলেটাকে কোলে করিয়া জব্বর সন্ধ্যাকাশের স্পন্দমান তারকারাশির দিকে নিষ্পন্দ নয়নে

চাহিয়া যখন মনটাকে একান্তই বিশ্রী করিয়া ফেলিয়াছে, তেমন সময় কি খেয়ালের বশে সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, “খুশরু বাপ, মা’র কাছে যাবি ?” এক হাতে পিতার গলাটা আরও নিবিড়ভাবে বেষ্টন করিয়া অপর হাতখানা মুখে পূরিয়া ম্লান দৃষ্টিতে সে পিতার সজল চক্ষুর দিকে চাহিল ও নীরবে মাথাটি একবার খুব খানিকটা হেলাইয়া মৌন-ভাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

পরদিন সন্ধ্যায় লোকজন লইয়া জব্বর লতিফের বাড়ী হাজির হইল। গিয়া বলিল যে, সে সেলিনাকে লইয়া যাইবে। লতিফ প্রচণ্ডভাবে রুখিয়া বলিল যে, সে ছোট লোকের বাড়ীতে মেয়ে পাঠাইতে রাজী নয়। কিন্তু আজ তাহার এই অস্ত্র তীক্ষ্ণতা-হীন হইয়া পড়িল। আজ জব্বর সঙ্কল্প স্থির করিয়া, মনকে ভালরূপে যাচাই করিয়া আসিয়াছিল। সে জোর করিয়া সেলিনাকে লইয়া গেল।

জনবলে হীন থাকায় লতিফ কিছু করিতে পারিল না। ব্যর্থ ক্রোধে ফুলিয়া লতিফ জব্বরকে জানাইল যে, সে কত বড় মরদ, পরে দেখিয়া লইবে এবং কন্যাকে অভয় দিয়া বলিল যে, সে পরে তাহাকে তাহার পাষণ্ড স্বামীর কবল হইতে উদ্ধার করিবে।

পরদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে যথেষ্ট লোকজন লইয়া লতিফ বিপুল আয়োজন সহকারে জব্বরের বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল। বাড়ীতে তখন জব্বর ও সেলিনা ভিন্ন কেহ ছিল না। হঠাৎ লতিফ ও তাহার লোকদের হুঙ্কারে জব্বর তাহার প্রকাণ্ড লাঠিটা কাঁধে ফেলিয়া বাহির হইয়া আসিল। একটা রক্তারক্তি যখন নিতান্ত অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছে, তেমন সময় সেলিনা কোথা হইতে আসিয়া স্বামীকে টানিয়া গৃহমধ্যে লইয়া গেল। পরিশেষে পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল যে, সে স্বেচ্ছায় জব্বরের সহিত আসিয়াছে ও এইখানেই থাকিবে; পিতৃগৃহে যাইবার তাহার কোন আগ্রহই নাই। বিপুল বিস্ময়ে লতিফ তাহার এই নূতন অভিজ্ঞতা স্তম্ভিতভাবে পরিপাক করিল।

শ্রীরামেন্দু দত্ত।

---

# নিবেদন

হে মোর দেবতা তব
কেউ যদি করে অনাদর,
দৃপ্ত রোষে গরজিয়া
উঠে যেন আমার অন্তর।

হ’তে পারি আমি দীন
হীনমতি দুর্ব্বল মানব,
রাজরাজেশ্বর তুমি
বিশ্বজোড়া তোমার বিভব।

তোমার ন্যায়ের বাণী
মুক্তকণ্ঠে করিতে প্রচার,
নির্ভীক হৃদয়ে যেন
অবহেলি শত অত্যাচার।

শক্তি-মন্ত্রে দাও দীক্ষা
প্রভু মোরে কর বীর্য্যবান,
সত্যের প্রতিষ্ঠা তরে
অকাতরে সঁপি যেন প্রাণ।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন বিশ্বাস বি, এ।

# চাল

চাল জিনিষটা যেমন বাঙ্গালার নিজস্ব, এমন আর কোন কিছুই নহে। বাঙ্গালী জাতি 'গেহু' বা ডাল-রুটীর ভক্ত নয়, কিন্তু চাল-ডালের ভক্ত। বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রধান খাদ্য হইতেছে চাল। সমগ্র আসিয়ায় বোধ করি বাঙ্গালার চালের মত চাল আর কোথাও হয় না। In India generally, rice is produced in every variety of soil at every altitude and in every latitude, * * * The finest is the Bengal table rice.* বাঙ্গালার চালের যত নাম আছে, সব সংগ্রহ করিলে একটা বহি হইতে পারে। এক চাল হইতে বাঙ্গালাদেশে কত রকমের খাদ্য-সামগ্রী প্রস্তুত হয়! চাল থেকে ভাত, পোলাও, খিচুড়ী, পায়স, মুড়ি, মুড়কি, চিঁড়া, খই, নবান্ন, পৌষ-পার্ব্বণের নানারকম পিঠে, আর কত নাম করিব, এই সকলই তৈয়ারী হয়,—ইহা ছাড়া মালপোয়া, মেঠাই, রসগোল্লা আদি নানা মিষ্টান্নে চালের সহযোগিতা চাই।† শরতে যখন ধানের অঙ্কুর হইবার সময় আইসে, তখনই বাঙ্গালার ঘরে ঘরে অন্নপূর্ণার পূজা হয়। আবার যখন শারদ ধান্যের নূতন উদ্গম হয়, তখন সর্ব্বত্র নবান্নোৎসবের ধূম পড়ে। সমস্ত পৌষমাসের যে পিঠে-পার্ব্বণের উৎসব, তাহা ঐ নূতন চালের আনন্দোৎসব ভিন্ন আর কিছু নয়।

বাঙ্গালার প্রধান খাদ্য-সামগ্রী চাল যেমন না হইলে বাঙ্গালীর জীবন অচল হইয়া পড়ে, তেমনই 'চাল' শব্দেরও বাঙ্গালা ভাষায় এত বিবিধ প্রকারে ব্যবহার যে, 'চাল'কে বাদ দিলে বাঙ্গালীর 'বোলচাল' যেন নির্জ্জীব হইবার উপক্রম হয়। 'চাল' শব্দের এত রকমের বাঙ্গালাভাষায় প্রয়োগ যে, বাঙ্গালা দেশে যেমন চাল উৎপন্ন না হইলে দুর্ভিক্ষের অবস্থা আইসে, সেইরূপ বাঙ্গালা ভাষা হইতে যদি 'চাল' শব্দকে হরণ করা যায় ত মনে হয়, বঙ্গ-ভাষায়ও ভাব-প্রকাশের দুর্ভিক্ষ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। বস্তুতঃ নানা ভাব-ব্যঞ্জক এক 'চাল' শব্দ কত রকমে না বঙ্গ-ভাষাকে পুষ্ট করিয়া তুলিয়াছে!

সংস্কৃত 'চল' ধাতু যদিও 'চাল' শব্দের মূলে, কিন্তু 'চাল' শব্দটি বাঙ্গালা ভাষার নিজস্ব সম্পত্তি। অনেকের মতে উহা প্রাচীন সংস্কৃত 'তণ্ডুল' শব্দ হইতে উৎপন্ন, কিন্তু প্রকৃত তাহা নয়। 'তণ্ডুল' যে অতি প্রাচীন সংস্কৃত শব্দ, তাহাতে সন্দেহ নাই। গোভিল-কৃত বৈদিক গৃহ্য-সূত্রে যেখানে চরু পাক করার বিধান লেখা আছে, সেখানে 'তণ্ডুল' শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

"স্থালী পাকাবৃতা তণ্ডুলানুপস্কৃত্য চরুং শ্রপয়তি।"

(গোভিল গৃঃ সূত্র)

এমন কি, সুশ্রুতে তণ্ডুলের গুণাগুণ পর্য্যন্ত লেখা আছে—

"সুদুর্জ্জরঃ স্বাদুরসো বৃংহনস্তণ্ডুলো নবঃ।"

(সুশ্রুত-সংহিতা)

অর্থাৎ "নূতন চাল খাইতে সুস্বাদু, কিন্তু অতি কষ্টে জীর্ণ হয়, এবং জীর্ণ করিতে পারিলে উহা খুব পুষ্টি-কারক।"

সংস্কৃত আমলে চালকে যে কেন 'তণ্ডুল' বলিত, তাহার কারণ এই—'তণ্ড' ধাতুর অর্থ নৃত্য করা। নৃত্যার্থ-বাচক 'তাণ্ডব' শব্দও এই 'তণ্ড' ধাতু হইতে উৎপন্ন। পুরাকালে ধান হইতে চাল বাহির করিবার সময় যখন উদূখলে মুষল দ্বারা অবহনন করা হইত, তখন চালগুলি মুহুর্মুহুঃ নৃত্য করিয়া উঠিত, তাহা দেখিয়া সংস্কৃতে চালের নাম তণ্ডুল রাখা হইয়াছে।* কিন্তু আমাদের এই 'চাল' নামের সঙ্গে 'তণ্ডুল' নামের সম্পর্ক নাই। চালের নৃত্যের প্রতি ততটা দৃক্‌পাত না করিয়া উহার প্রকরণের উপর আস্থা প্রদর্শনপূর্ব্বক এই লোক-প্রিয় খাদ্যের নাম রাখা হইয়াছে 'চাল।' আমরা বাঙ্গালায় শুদ্ধ ভাষায় সচরাচর লিখিয়া থাকি 'চাউল' 'দাইল' ইত্যাদি। এইরূপ লেখার কোন প্রয়োজন দেখি না – মধ্যের উকারের ও ইকারের আমদানী নিরর্থক। পশ্চিমারা শব্দের উচ্চারণে টান দিতে ভালবাসে বলিয়া 'চাল' না বলিয়া 'চাওল' বলিয়া থাকে। আমরা তাহারই অনুকরণে শুদ্ধ ভাষায় 'চাউল' লিখিয়া থাকি। 'চাল' শব্দের আসলে উৎপত্তি

---

* Encylopaedia India.

† চাল-ধোয়া জল ও চালের মণ্ড আদি চিকিৎসায় ও অনেক কাযে লাগে।

* পুরাকালে ধান্য হইতে কিরূপে যে তণ্ডুল বা চাল বাহির করা হইত, তাহার বিবরণ গৃহ্যসূত্রে স্পষ্ট লেখা আছে।

চালন বা চালিয়া লওয়া হইতে। ধানকে তুষবর্জ্জিত করিবার জন্য সূর্প বা চালনীতে চালিয়া লওয়া হয় বলিয়াই উহার নাম 'চাল।' খোসা-সমেত যাহা, তাহা 'ধান'—খোসা বা তুষবর্জ্জিত ধান্যের যে সারভাগ, তাহারই নাম 'চাল।' এই কারণে শুধু যে ধানের সার ভাগকে চাল বলে, তাহা নয়; ধান ছাড়া অন্য কোন কোন সামগ্রীরও খোসা-বর্জ্জিত সারাংশকে বাঙ্গালায় 'চাল' বলা হয়ে থাকে। যেমন "ধনের চাল" ইত্যাদি। যখন ধনের খোসা পরিবর্জ্জনের জন্য চালিয়া লওয়া হয়, তখন তাহা-কেও 'ধনের চাল' বলে।

বাঙ্গালা ভাষায় 'চাল' শব্দ যে চালিয়া লওয়া হইতে হইয়াছে, তাহা আরও অন্যান্য উদাহরণ দ্বারা প্রতিপন্ন করা যায়। "ঘরের চাল" কেন বলে?—খোড়ো ঘরের ছাদকেই 'চাল' বলা হয়—কোঠাবাড়ীর ছাদকে ত চাল বলে না—'ছাদ' বলা হইয়া থাকে। খোড়ো ঘরের ছাদ তৈয়ারীর সময় খড়গুলো চালিয়া চালিয়া বিছাইয়া দেওয়া হয় বলিয়াই খড়ের চাল বলে। খোড়ো ঘরের এক নামই ত 'আটচালা।' খড়কে বিচালি বলা হয়। কেন না, 'বি' অর্থাৎ বিশেষ রকমে চালিয়া লওয়া হয় বলিয়া। এই কারণে আবার একটা কাঠকে টুকরা টুকরা করিয়া চালিয়া লইলে তাহাকে আমরা "চালা কাঠ" বলি।

এই এক 'চাল' শব্দ হইতে বাঙ্গালা ভাষায় যে কত ভাবের অভিব্যক্তি হইয়াছে, পাঠকগণের গোচরার্থ কতকগুলিমাত্র উদাহরণ দ্বারা নিম্নে তাহা দেখান হইল—

বাঙ্গালীর আহারে বিহারে চাল, যথা—"অমুকের চাল বড় খারাপ", "চালচুলো", "চাল-চলন", "বেচাল", "চাল মারা", "চালবাজী", "চাল দেখানো" ইত্যাদি। এইরূপ কত ভাবেই যে এই এক চাল শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, তাহা বলা যায় না। বাঙ্গালীর খেলাতেও চাল, যথা—'দাবার চাল' 'বড়ের চাল' ইত্যাদি। আমাদের রাজনীতিতে 'চাল'এর প্রয়োগবাহুল্য দেখা যায়, যথা—'খুব ভাল চাল চেলেছে, "diplomatic চাল" ইত্যাদি। সময়ে সময়ে ওজনেও চাল শব্দ ব্যবহৃত হয়, যথা—'এক চাল ভর জাফরান।' চতুর লোককে যে আমরা 'চালাক' বলি এবং কাহারও সঙ্গে রহস্য করিলে যে 'চালাকি করা' বলিয়া থাকি, এই শব্দদ্বয়ের সঙ্গে 'চাল'-এর ঘনিষ্ঠতা থাকা সম্ভব।

'চাল' থেকে বঙ্গভাষায় আর একটি কথা আসিয়াছে, যাহার ব্যাখ্যা প্রয়োজন। দুর্গা-প্রতিমার পৃষ্ঠভাগে যে "চালচিত্র" করা হয়, তাহাকে "চালচিত্র" বলে কেন? হিমালয় অঞ্চলে ভুটিয়া প্রভৃতি পাহাড়ী মেয়েরা প্রকৃতই দেখা যায়, দুর্গা-পূজার সময় চাল দিয়া ললাট প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চিত্রিত করিয়া থাকে। পুরাকালে খুব সম্ভবতঃ হিমালয়-কন্যা অন্নপূর্ণাকে প্রকৃতই হিমালয়-বাসী মেয়েদের মত চাল দিয়া চিত্রিত করা হইত—এখন আর সে প্রথা নাই, সার জিনিষ চালের পরিবর্ত্তে চাক্‌চিক্যশালিনী রাংতা চালচিত্রে শোভা পাইয়া থাকে।

এইবার দেখা যাউক, চালের ইংরাজী নাম 'rice' কোথা হইতে আসিল। য়ুরোপের অধিকাংশ ভাষাতেই চালের নামটা ঠিক rice না হলেও, প্রায় তদনুরূপ শব্দ ব্যবহৃত হয়, যথা—জর্ম্মণ ভাষায় 'reis', ফরাসী ভাষায় 'riz' ইটালীয় ভাষায় 'riso' ইত্যাদি। যখন এই সব নানা ভাষায় চাল অর্থবাচক শব্দগুলি শুনিতে প্রায় একই ধরণের, তখন নিশ্চয়ই ইহার গোড়া যে কোন একটি আদি ভাষার মধ্যে নিহিত, তাহাতে ভুল নাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা সকলেই মানেন যে, ভারতবর্ষ হইতে পারস্য অতিক্রম করিয়া এই চালের নামগুলি য়ুরোপে উপনীত হইয়াছে। চালের আদি স্থান এই ভারতবর্ষ হইতে কোন একটি শব্দ কোন্ যুগে ঐ সকল দেশে উপনীত হইলে, উহার আকৃতির কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে মাত্র। সেই আদি শব্দ সংস্কৃত ধান্য-বাচক "ব্রীহি" শব্দ। 'ব্রীহির' 'হ' 'স'র মত * উচ্চারিত হইলে, এবং আদ্যক্ষর 'ব'র লোপ হইলে, "রীসি"তে পরিণত হয়; 'রীসি' হইতে এইরূপ ক্রমে rice (রাইস) আদি শব্দের উদ্ভব হওয়া সম্ভব। পারস্য ভাষায় চালকে 'Birinch বলে—'Birinch'এর সহিত সংস্কৃত "ব্রীহির" খুব সাদৃশ্য।

বাঙ্গালা দেশে চালের এত আদর কেন? চাল হইতে যে ভাত হয়, তাহা বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য বলিয়া ভাতের সংস্কৃত নাম 'ভক্ত'—

---

* কোন একটি শব্দ এক ভাষা হইতে ভাষান্তরে গেলে 'হ' অক্ষর 'স'তে কিংবা 'স' 'হ'তে পরিণত হয়; তাহার নিদর্শনের অভাব নাই—যেমন, 'হপ্তা' সংস্কৃতে 'সপ্তাহ' ইত্যাদি।

"ভক্তং বহ্নিকরং পথ্যম্"। *

বোধ হয়, পশ্চিমাদের আটার ন্যায় 'ভাত' অত রজোগুণবর্দ্ধক নয়। সাত্ত্বিকপ্রকৃতি ভক্ত লোকদের খাদ্য বলিয়াই হউক, অথবা সকলেই ইহার ভক্ত কিংবা সকলকে ভাগ করিয়া দেওয়া হইত বলিয়া ইহার 'ভক্ত' নাম হইয়া থাকিবে। লাটিন Victus শব্দ, যাহার অর্থ খাদ্য, সংস্কৃত এই 'ভক্ত' শব্দ হইতেই তাহার উৎপত্তি মনে হয়।

খুব প্রাচীনকালে প্রাণধারক খাদ্যদ্রব্যমাত্রকেই 'অন্ন' বলিত। তাই বেদবচনে দেখা যায়—

"অন্নং ন নিন্দ্যাৎ অন্নং বৈ প্রাণাঃ"

বৈদিক যুগে 'অন্ন' বলিতে চর্ব্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয় প্রভৃতি আটাইশ রকমের খাদ্যদ্রব্য বুঝাইত।

'অষ্টাবিংশতিরন্নম্'

মহাভারতে গয়রাজর্ষির যজ্ঞে যে অন্নকূট বা অন্নগিরির কথা আছে, তাহা কেবলমাত্র স্তূপাকার ভাত নয়, এ স্থলে অন্ন বলিতে পুঞ্জীভূত নানাবিধ খাদ্যসামগ্রীর কথা জ্ঞাপন করিতেছে। † কিন্তু ক্রমে 'ভাত' বা 'ভক্ত' ভারতবাসীর এত প্রিয়খাদ্য হইয়া উঠিল যে, 'অন্ন' বলিতে একমাত্র 'ভাত'কেই বুঝাইতে লাগিল—

"ভক্তমন্ধোঽন্নমোদনো"

(অমর-কোষ)

অমরকোষের আমলে 'ভক্ত' ও অন্ন একার্থবাচক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

আজকাল য়ুরোপ ও আমেরিকার অনেক দেশে ভারতের ন্যায় চাল একটি প্রধান খাদ্যরূপে পরিণত হইতে চলিয়াছে। আমেরিকার Coroline riceএর সুখ্যাতি বিশ্ব-বিশ্রুত। আমাদের "ভেতো বাঙ্গালী" বলে বলুক, কিন্তু আজকাল ইংরাজদের খানায় নিত্য "কারীভাত" না হইলে চলে না। অথচ ইংরাজরা কিছু কাল-পূর্ব্বে চাল সম্বন্ধে এতটা অনভিজ্ঞ ছিল যে, কোম্পানীর আমলে যখন বড় "সাহেব" তাঁহার আফিসের বড় বাবুকে জিজ্ঞাসা করেন, rice বা চাল কি করিয়া তৈয়ারী হয়—বড় বাবু তখন বেশ জবাব দিয়াছিলেন—

"Two man ধাপুস ধুপুস
One man সেঁকে দেয়
তবে সাহেব rice হয়"

অর্থাৎ "প্রথমে দুজনে ঢেঁকীতে ধাপুস্ ধুপুস্ করিয়া ধান কুটিয়া দেয়, তাহার পর এক জন সেঁকিয়া দেয়, তবে চাল তৈয়ারী হয়।"

শারদোৎসবে অন্নপূর্ণার পূজায় চালের নৈবেদ্য দেওয়া হিন্দুদের প্রথা—আজ তাই পূজার 'মাসিকে' এই 'চাল' প্রবন্ধ নৈবেদ্যরূপে উৎসর্গ করিলাম।

শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

* বৈদিক নিঘণ্টু, পূর্ব্বাষ্টক, ৩য় অধ্যায়।

† মহাভারত বনপর্ব্ব।

* ভাবপ্রকাশ।

---

# মাতৃ-পূজা

শুনেছি শাস্ত্রের উক্তি শক্তি-অংশ নারী।
মাতৃজাতি পুরুষের পূজা-অধিকারী ॥
ভক্তি বিনা ডাকি তাই শক্তি রেখে ঘরে।
তুমি কি এস মা বঙ্গে মরা সিংহ'পরে ?
নহিলে তুমি মা দুর্গা যথা বিদ্যমান।
নারীজাতি সহে সেথা কেন অপমান ॥
সতীর সর্ব্বস্ব যায় লজ্জা দেহ-শুদ্ধি।
চক্ষে দেখি বঙ্গে রাজে দুষ্ট কুবুদ্ধি ॥

শুদ্ধা ভক্তি মা জননী দেহ করুণায়।
মজা ত্যজি ব'সে যাই তোমার পূজায় ॥
গভীর বিশ্বাসে লয়ে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা।
কর্ম্মফল ধর্ম্মবল করি পদে ভিক্ষা ॥
নির্ভয় আশ্রয় জেনে জননীর কোল।
আনন্দ-উৎসব রবে বাজাইব ঢোল ॥

# টঙ্কনাথ

১

সব জজ অম্বিকাবাবু এইমাত্র আদালতের ধড়া-চুড়ো ছেড়ে বৈঠকখানার সম্মুখস্থ ফুলবাগানে পাইচারী করছেন। গণেশের ধ্যানের সঙ্গে তাঁর চেহারার খুব একটা নিকট-সাদৃশ্য বেরিয়ে পড়েছে। খর্ব্ব অর্থাৎ প্রমাণসই লম্বা নয়, স্থূল তনু অর্থাৎ ব্যাঘ্রজাতীয় জীবের লালানিঃসারক নাদুস-নুদুস ভাব, গজেন্দ্রবদন না হইলেও গজেন্দ্রমস্তক অর্থাৎ চুলের মধ্যে যথেষ্ট হাওয়া খেলার স্থান আছে—লম্বোদর অর্থাৎ নাভিনিম্নস্থ নীবিবন্ধের উপর সের দুই আন্দাজ নেয়াপাতি ভুঁড়ি।

তবে গণেশের ধ্যানের সঙ্গে কিছু পার্থক্যও যে না ছিল, তা নয়। পায়ে শুঁড়তোলা কটকী শ্লিপার, পিঠে অজস্র ঘামাচি—যা দূর হ'তে ইরিসিপ্লাসের মত দেখায় এবং হাতে সদ্য কল্‌কে-চড়ানো বাঁধানো হুঁকো—যা হ'তে স্নিগ্ধ অম্বুরী তামাকের মিঠে মিঠে খোসবুটুকু ঝির-ঝিরে হাওয়া চুরি ক'রে নিয়ে পালাচ্ছে।

দু'পাশে ফ্যান্সী বাঁথারীর অনুচ্চ বেড়ার মধ্যে গোলাপ, বেল, রজনীগন্ধার দল মাথা দুলিয়ে তাঁকে আম্‌লা-চাপরাসীর মত সেলাম করছে, মাঝখান দিয়ে একটি টুকটুকে লাল পথ চুলের ভিতরকার তেড়ীর মত সরল স্বচ্ছন্দ গতিতে সবুজ গেট পর্য্যন্ত ছুটে গিয়েছে।

'আপ এ্যাণ্ড ডাউন' পাইচারী করতে করতে অম্বিকাবাবু তাঁর জীবনের 'আপস্ এ্যাণ্ড ডাউনের' কথা চিন্তা করছিলেন। সেই প্রথম ওকালতী পাশ ক'রে কিছু দিন ঝাউতলায় ঘুরে বেড়াতেন, লাইব্রেরীর 'চিড়িয়াখানায়' ভর্ত্তি না হ'তে পেরে, আটপ্‌কা হাব্‌লা মক্কেলের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়তেন, কিন্তু বেশীর ভাগই ছিট্‌কে যেতো, চার টাকার কাযে সাড়ে তিন টাকা দস্তুরী ঢুকিয়ে দিয়ে, পান, বিড়ি, ট্রামভাড়ার সংস্থান ক'রে নিতেন এবং মাঝে মাঝে খোলার সেরেস্তায় ব'সে ব্রীফের বদলে এক আধখানা গোপনীয় পত্র পকেট হ'তে বের ক'রে লুকিয়ে প'ড়ে ফেলতেন। তার পর অনেক উপযুক্ত মুরুব্বী পাকড়ে নিয়ে মুনসেফীর জন্য কি দৌড়া-পিটাই না করলেন; কখনও নিউ মার্কেট হ'তে উপ-ঢৌকন-ফুল কিনে নিয়ে শ্বেতাঙ্গ জজের সঙ্গে এই ব'লে দেখা করতেন—'এ আমার বাগানের ফুল, ইওর লেডিসিপের পদপ্রান্তে যৎকিঞ্চিৎ সম্মানের চিহ্ন'; কখনও নামডাক মরীচিকার পিছনে লুব্ধ হরিণের মত রোদ-বৃষ্টি মাথায় নিয়ে পদব্রজে ঘুরে দেখে তার পর হাস্তে তার অদৃষ্টাকাশে সৌভাগ্যের দ্বাদশ সূর্য্য জ্ব'লে উঠলো। তিনি হাকিমী গদী পেলেন। দীর্ঘ কুড়িটি বছর উপর-আলার মন বুঝে ফাইল ক্লিয়ার করবার পর সবজজের পদে তাঁর প্রোমোশন হলো! ঈশ্বরেচ্ছায় আজ পাঁচ বছর নির্ব্বঞ্ঝাটে উক্ত পদের মর্য্যাদা রেখে চ'লে আসছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখনও তেমন কিছু জমিয়ে তুল্‌তে পারেন নি। খুব হিসাব ক'রে চলা সত্ত্বেও মোটে আধ লাখ টাকার কোম্পানীর কাগজ। তায় ও পক্ষের ছেলেটা হয়েছে উড়নচড়াই বয়াটে, ভিখিরীকে পর্য্যন্ত পয়সা দেয়। আর এ পক্ষের যদিও ছেলেপিলে হয়নি ব'লে গৃহিণীকে প্রশংসা করা যায়, কিন্তু গৃহিণী নিজে একেবারে বিকচ্ছ। নৈলে জন্মতিথি ত বছর বছরই আসে। তার মধ্যে কি এমন উৎসবের কারণ থাকতে পারে যে, গৃহিণী আজ আত্মীয়স্বজনের বাড়ী ছুটেছে নিমন্ত্রণ করতে! না, আর কিছু জমাতেই হচ্ছে—নৈলে তিনিও চোখ বুজবেন, আর সব ফুঁকে দেবে। কিন্তু উপায় কি? বাঁধা মাইনের আঁটাসাঁটা বহর থেকে আর কতটুকু ছাঁট বেরোয়? কত হাকিম উপরিগণ্ডার জোরে দু'চার মাসেই লাল হয়ে গেল, আর তিনি—তাঁর যে বড়ই রাশভারি চেহারা, লোক এগোতে সাহস করে না, এখন থেকে একটু রাশ আল্‌গা দিতে হবে লোক বুঝে। তা লোক বুঝ্‌তে তাঁর মত আর কে পারে? পঁচিশ বছর হাকিমী ক'রে তাঁর আর কিছু না হোক, লোকচরিত্র

সম্বন্ধে একটা অসীম অভিজ্ঞতা জন্মেছে। এমন চরিত্রের মানুষ বোধ হয় হ'তেই পারে না—যা তিনি দেখেন নি বা বোঝেন নি। তাঁর স্বাভাবিক দ্বিধা ও মিতভাষিতা—যা ওকালতীর যুগে লোক মুখচোরামী ব'লে নিন্দা করতো, তাই যে তাঁর বিজ্ঞতা, গাম্ভীর্য্য ও অন্তর্ভেদী প্রতিভার লক্ষণ, তা আজ তিনিও বুঝেছেন, লোকেও বুঝেছে। কত ধাপ্পাবাজ উকীল তাঁর সামনে আইনের মত-ফেরেক্কা ঝাড়ে, কিন্তু পেরে উঠবে কেন? তুরপুনের গায়ে বিঁধ! তাঁর উপর টেক্কা দেওয়া কি যার তার কায! তিনি হাঁ করলে লোকের নাড়ী-নক্ষত্র দেখতে পান; মামলা পড়তে না পড়তেই তাঁর কাছে জল। হাতে নথী, মাথায় বুদ্ধি, তাঁর কাছে আবার সওয়াল-জবাব কি? ও দিকে জেরা হচ্ছে, তিনি রায় লিখছেন। তাঁর হাতে প'ড়ে কত জমীদার ঢিট হয়ে গেল—কত মামলাবাজ নাস্তানাবুদ নাকালের একশেষ। হেঃ! লোক আবার চেনা যায় না—লোক আবার ঠকায়! সব লোকই ত ঘষা পয়সার মত প্লেন। উপন্যাসে বটে অনেক আজগুবি লোক দেখা যায়; কিন্তু সে ত আর বাস্তব জগৎ নয়—সে মনগড়া খামখেয়ালের রাজ্য। বাস্তব জগতের মানুষগুলো নিয়ে তিনি খোলামকুচীর মত ছিনিমিনি খেলতে পারেন। অধরপ্রান্তনিবদ্ধ হাসির সঙ্গে অম্বিকাবাবু বৈঠকখানার সম্মুখস্থ একটি সান-বাঁধান বেদীর উপর ব'সে পড়লেন।

## ২

গেটের দরজা ঠেলে একটি লোক আঙ্গিনার মধ্যে ঢুকে পড়লো। ত্রিবলীরেখান্বিত ভুঁড়িটিকে কিঞ্চিৎ সটান ক'রে অম্বিকাবাবু আগন্তুকের দিকে চাইলেন। কপালের চশমাটিকে নাকের মাঝামাঝি টেনে নামিয়েও তিনি সেই দশ বারো হাত দূরস্থ লোকটিকে চিন্‌তে পারলেন না—সুতরাং মন একটু বিশেষ রকম প্রফুল্ল হয়ে উঠলো। যখন অচেনা, তখন অন্ন-ধ্বংসকারী আত্মীয় নয়—তখন চাই কি কাযের দরবারেই এসেছে—চাই কি সে কায আদালতের সম্পর্কিতও হ'তে পারে এবং খুব সম্ভব, হালে যে একটা সঙ্গীন উইলের মামলা চলছে—এই রকম একটা কার্য্য-কারণঘটিত চিন্তাস্রোত বানের জলের মত দ্রুতবেগে তাঁর মাথার ভিতর দিয়ে যেই খেলে যাওয়া, অমনই তিনি রাশ মধ্যে প'ড়ে হাবুডুবু খেতে লাগলেন। গোড়াতেই রাশ আল্‌গা দিলে প্রত্যাশার মাত্রা কিছু কম হয়ে দেখা দিতে পারে, এই আশঙ্কায় তিনি চট্ ক'রে তাঁর প্রফুল্লতার বালিসকে গাম্ভীর্য্যের ওয়াড়ের মধ্যে পুরে ফেল্লেন এবং হাঁটুর কাপড়টাকে একটু টেনে নামিয়ে দিয়ে মৃদুমন্দ কাস্‌তে আরম্ভ করলেন। একবার তাঁর ইচ্ছা হ'ল, একটু রুক্ষস্বরে প্রশ্ন করেন 'কে?' কিন্তু-পাছে মাছ ভয় পেয়ে চারে না ভেড়ে—এই সুবিবেচনা তাঁর স্বাভাবিক দ্বিধার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে তাঁর উক্ত ইচ্ছাকে আর কাযে পরিণত হ'তে দিলে না।

আগন্তুকের ছিপছিপে লম্বা চেহারা, উজ্জ্বল চোখ ও উস্কোখুস্কো চুল। একটি তিলে-ধরা সার্ট, শাড়ীপাড় ধুতি ও কান-ছেঁড়া পম্পসু—তার চেহারাতে বেশ একটু বিশেষত্ব এনে দিয়েছিল। সে অম্বিকাবাবুর দিকে চেয়েই আধ-গাল আন্দাজ হেসে নিয়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে পটাপট্ ক'রে গোটা দুইচার মল্লিকা-ফুল তুল্‌তে তুল্‌তে—অম্বিকাবাবুর সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো। অম্বিকা-বাবুর মা পূজার জন্য রোজ সকালে ৩টি ক'রে দোপাটি, ২টি ক'রে মল্লিকা এবং ১টি ক'রে জবাফুল তুল্‌তে পাবেন, এই ছিল অম্বিকাবাবুর বরাদ্দ। এ ছাড়া অন্য লোক দূরে থাক্—নিজেকেও কোন দিন একটি ফুল তুল্‌তে দিতেন না—অন্যমনস্কেও নয়, মনের ভুলেও নয়। কাযেই তিনি শুধু বিরক্ত নন, একটু হতভম্ব হয়ে এই দুঃসাহসিক লোকটির দিকে চেয়ে রইলেন এবং কিছু বলবার জন্য তাঁর ঠোঁট দুটি ঈষৎ কম্পিত হয়ে একবার বিকসিত ও একবার মুদিত হ'তে লাগলো। কিন্তু তাঁর কিছু বলবার পূর্ব্বেই আগন্তুক ব'লে উঠলো—'তার পর—মশায়ের নামটি কি?'

হুঁকোর মাথার চেয়েও সবজজ বাবুর মাথা বেশী গরম হয়ে উঠলো।—তিনি চোখ বুজে হুঁকোয় প্রকাণ্ড একটা টান দিয়ে ঠিক ক'রে নিলেন—যে চোখ চেয়েই ব'লে উঠবেন—'কোথাকার অসভ্য লোক আপনি!' কিন্তু চাইবার সঙ্গে সঙ্গেই আগন্তুকের বিস্ফারিত তীব্র কটাক্ষের নীচে তাঁর অত বড় মানসিক সঙ্কল্পটা সঙ্কুচিত হয়ে একটা 'হুঁঃ' শব্দে পর্য্যবসিত হলো এবং সেটা শুন্‌তে হলো—কোন বন্য জন্তুর অস্পষ্ট রুদ্ধ গর্জ্জনের মত।

হঠাৎ আগন্তুক হো হো ক'রে হেসে উঠে বললে, 'আরে

নাম দেখে এলুম—আবার জিজ্ঞাসা করছি। ও অম্বিকাবাবু, একটু হাওয়া খাচ্ছেন বুঝি? খান খান—খাবেন বৈ কি, যে গরম—আষাঢ় মাস পড়লো, এক ফোঁটা বৃষ্টি নেই—তবে বাগানটি করেছেন খাসা—চমৎকার মল্লিকে ফুল—ডবল মল্লিকে কি না—গন্ধও তেমনই—শরীর জুড়িয়ে যায়—আর—এর গন্ধও বেশ—আপনার তামাকটির টাকা টাকা সের—কি বলেন? তার কমে আর পাননি—না, নিশ্চয়ই নয়—খাঁটি বিষ্ণুপুরের সঙ্গে লক্ষ্ণৌএর মেশাল আছে—দশ আনা ছ আনা ভাগ—আমি শুঁকেই বুঝেছি—এখানে এসে মনে করছেন? না, না, রাস্তা থেকেই। ও কি, টানুন টানুন—নিভে যাচ্ছে যে। কিংবা দিন, আমি ধরিয়ে দিচ্ছি—আমিও ব্রাহ্মণ, আমার নাম টঙ্কনাথ চক্রবর্ত্তী—" এই ব'লে আগন্তুক বা টঙ্কনাথ অম্বিকাবাবুর হাতের হুঁকো ধ'রে টান দিলে। অম্বিকাবাবুর মুখ দিয়ে একটা 'আঃ' শব্দ বেরিয়ে গেল বটে, কিন্তু তাঁর অবশ হাতের শিথিল মুঠো হ'তে হুঁকোটি যে টঙ্কনাথের শিরাবিজড়িত মোটা গাঁটআলা আঙ্গুলের মধ্যে চালান হয়ে গেল, তা নিঃসন্দেহ।—"দেখুন না, ঠিক ধরিয়ে দিচ্ছি, নিভলেই হলো?" ব'লেই টঙ্কনাথ হুঁকোয় মুখ দিয়ে গোণাগুন্তি তিনটি টান দিলে এবং তার মধ্যে কোন্‌টি সুখটান, তা ঠিক বুঝা গেল না। টঙ্কনাথের গাল দুটি একটা চচ্চড় শব্দের সঙ্গে চুপসে গেল, কলকের আগুন লাফিয়ে উঠে যেন দেখতে চাইলে কে টানে এবং তার পরই একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলীতে অম্বিকাবাবুর মুখ ঝাপসা হয়ে গেল। 'নিন্' ব'লে টঙ্কনাথ তার ডান-হাতের কনুয়ের তলায় বাঁ-হাত ঠেকিয়ে—হুঁকোটিকে অম্বিকাবাবুর দিকে বাড়িয়ে ধরলে। কাঠের পুতুলের মত অম্বিকাবাবু নলচেটিকে হাতে নিয়েই—"ও ব্বাবা" ব'লে ছেড়ে দিলেন। হুঁকোটি সশব্দে সানের উপর প'ড়ে গিয়ে বুগ্‌বুগ্ শব্দে সধূম দুর্গন্ধ জল ওগ্‌রাতে লাগলো। উল্টে-পড়া কলকের রক্তবর্ণ গুলের উপর ক্ষিপ্রহস্তে হুঁকোর জল ঢাল্‌তে ঢাল্‌তে টঙ্কনাথ বল্লে, "ফেলে দিলেন যে—যাক্—অমন গিয়ে থাকে—কিছু ছিলও না দেখছি—কি ক'রে থাক্‌বে? একে নরম তামাক, তায় গুড় দিয়েছে কম—চোর বেটারা—জিনিষ ভাল হ'লে কি হয়—আর ও দোকান থেকে কিনবেন না।"

অম্বিকাবাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালেন—বোধ হয় বাড়ীর ভিতর যাবার জন্য। এমন অসম্ভব অপ্রত্যাশিত ঘটনা তাঁর জাগ্রত জীবনে ত কখনও ঘটেই নি, স্বপ্নজীবনেও ঘটেছে ব'লে তিনি মনে করতে পারলেন না। না, যা ভেবেছিলেন, তা নয়। স্খলিত কাছাটিকে যথাসম্ভব গুঁজতে গুঁজতে তিনি দ্রুতকণ্ঠে ডাকলেন—'বটু বটু।' বটুক নামে তাঁর ওপক্ষের পুত্রটি বেশ একটু 'বলিষ্ঠ গোঁয়ার' গোছের ছিল—এ তাকেই আহ্বান। তিনি ভুলে গিয়েছিলেন যে, বটুক এখনও আপিস থেকে ফেরে নি এবং এও ভুলে গিয়েছিলেন যে, বটুক তাঁর প্রায় সমস্ত আদেশই লঙ্ঘন দ্বারা পালন করতেন। টঙ্কনাথ কিন্তু 'বটু বটু' শুনেই ছাদের কার্ণিসের দিকে চেয়ে বল্লে—'বট কৈ মশায়—ও যে অশ্বত্থ—হাঃ হাঃ, গাছ চেনেন না অম্বিকাবাবু—তবে বটের চেয়েও বড় কম যায় না—এ বছর কিছু না বলুক, আসছে বছর দেয়াল শুদ্ধ ভেঙ্গে নামাবে—হাঁ, আলবৎ নামাবে, আমি লিখে দিতে পারি। এঃ; একটা আঁকুশী আছে? দিন, আমি ওর দফা সেরে দিচ্ছি। আর না থাকে ত ঐ পাঁচীলে উঠে হাত দিয়েই—অমন শত্তুর রাখতে আছে—হু' চারখানা ইট খ'সে পড়বে, এই যা—কি করবেন? শিকড় পর্য্যন্ত টেনে তুল্‌তে হবে ত। মিস্ত্রী ডাকিয়ে কাল গেঁথে নিলেই পারবেন।'

এইবার অম্বিকাবাবু হন্ হন্ ক'রে বৈঠকখানার মধ্যে ঢুকে গিয়ে চাপা ক্রুদ্ধস্বরে বল্লেন—'যান্—যান্—আশ্চয্যি—"

"কি আশ্চয্যি? গাছ ওপড়ানো? এইটে বিশ্বাস হ'ল না? ভারী ত একটা গাছ! রাগ ক'রে চল্লেন! টঙ্কনাথ মিথ্যা কথা বলে না—তার যে কথা, সেই কায—একটু দাঁড়িয়ে যান্—দেখিয়ে দিচ্ছি।" এই কথাগুলো টঙ্কনাথ এক নিশ্বাসে ব'লে যেতেই অসহিষ্ণু অম্বিকাবাবু দরজার খিলে হাত দিয়ে বল্লেন—'না—না, ভাল আপ—।' টঙ্কনাথ হেসে উত্তর কর্‌লে—"ওঃ, আপশোষ হচ্ছে? নিজে ওপড়ান নি, তাই? তা বেশ ত, আপনিই ওপড়ান না। এক জন ওপড়ালেই হলো—আমিও যা, আপনিও তাই। আচ্ছা, আসুন, তা হ'লে যা হোক্ একটা কিছু নিয়ে আসুন—আঁকুশী কি দা যা হোক্—একটা কিছু নিয়ে আসুন, আমি আছি এখানে—যাচ্ছি না।"

সোঁ ক'রে একখানা মোটর-গাড়ী এসে গেটের সাম্‌নে

লাগলো। গুর্—র্—র্—ঝক্ ঝক্—ঝাঁ। সোফার ব্রেক টেনে দিয়ে লাফিয়ে নীচে নেমেই অম্বিকাবাবুকে লক্ষ্য ক'রে ব'লে উঠলো—"মোশায়, হামাকে ইস্তাফা দিন। হামি আপনার কায করতে পারবো না, হামার প্রাণটা কি প্রাণ আছে না? সেই দুপরবেলা সবে.দুটি খেয়ে লিয়েছি, আর মাইজী বল্লে গাড়ী সাজতে। গাড়ী সাজলুম, তিন তিন বাগায় লিয়ে গেলুম, সাঁঝ ঘুরে গেলে। এখনও হাত-মুখে জল দিতে পারলুম নি, আর উনি বলে কি না, সিকদারপাড়া চল্। বুনের বাড়ী নিমন্ত্রণ করবো। হামি পারবো না, চল্লিশ টাকার লেগে জান্ দিব না কি?" এই বলেই সোফার তার তেলকালিমাখা ছেঁড়া আস্তীনে কপালের ঘাম মুছতে লাগলো।

মাস তিনেক হ'ল অম্বিকাবাবু কিস্তীবন্দীমতে একখানা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড ফোর্ড গাড়ী কিনেছিলেন। তাঁর এ পক্ষের গরবিণী গৃহিণী বিদ্যুদ্বালার নির্ব্বন্ধে প'ড়ে এ অপব্যয়টুকু তাঁকে করতেই হয়েছিল।

গৃহিণী গাড়ী হ'তে নামেন না দেখে অম্বিকাবাবু বুঝতে পারলেন, তাঁর অভিপ্রায়টা কি। তিনি বেরিয়ে এসে সোফারের প্রায় হাত ধরেই বল্লেন—"হরিসিং—বাবা! বুঝেছ—" 'কিন্তু হরিসিং তার কাকাতুয়ার ঝুঁটীর মত লম্বা চুলগুলোকে এক ঝট্‌কায় মাথার পিছনদিকে ঘুরিয়ে দিয়ে বল্‌লে—"হাঁ, খুব বুঝেছি, বাবু মোশা—হামি পারবো না—দুস্‌রা লোক দেখুন" বলেই হরিসিং বাগানের প্রান্তস্থিত একটি ছোট্ট টিনের ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো।

মাথা চুলকোতে চুলকোতে এবং অনুচ্চস্বরে 'আজ কার মুখ দেখেই—' বলতে বলতে অম্বিকাবাবু গাড়ীর সামনে গিয়ে হাজির হলেন এবং ঢোক গিলে নিয়ে মিহি আওয়াজে বল্লেন—"কি আর করবে? নেমে এসো—কাল তখন—"

এক জন অচেনা পুরুষ উঠানে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখে বিদ্যুদ্বালা ঠিক তাঁর নিজমূর্ত্তিটা ধরতে পারলেন না—ঠোঁট ঘুরিয়ে নাক নেড়ে একটা বিশ্রী চাপা সুরে ব'লে উঠলেন—"আহাহা! কাল তখন!"

ঘোর সমস্যা! অম্বিকাবাবু নিজে গাড়ী চালাতে তিনি দুর্জ্জয় সাহসে ভর ক'রে আবার ব'লে ফেল্লেন—'শুন্‌ছো, নেমেই এসো না।" কথাটা করুণ মিনতির সুরে উচ্চারিত হলেও কেন জানি না, বিদ্যুদ্বালার কানে একটু কঠোর বলেই ঠেক্‌লো। তিনি 'আচ্ছা, এই জন্মের মত নামছি' ব'লে তাঁর জরীদার শান্তিপুরে আঁচলাটা চোখে দিয়ে নামবার উদ্যোগ করলেন।

টঙ্কনাথ সটান গাড়ীর কাছে এসে অম্বিকাবাবুর দিকে চেয়ে বল্লে—"কি হয়েছে? আপনার স্ত্রী ত? সিকদারপাড়ায় যাবেন?" তার পর বিদ্যুদ্বালাকে লক্ষ্য ক'রে বল্লে—'বসুন আপনি, নামবেন না।' থতমত খেয়ে বিদ্যুদ্বালা ফের সিটের উপর ব'সে পড়তেই টঙ্কনাথ চক্ষুর নিমেষে গাড়ীর মাথায় চাবি ঘুরিয়ে দিয়ে ড্রাইভারের সিটে চ'ড়ে বস্‌লো। 'আরে আরে করেন কি?' বলতে 'না বল্‌তেই গাড়ী হর্ণ বাজিয়ে পেট্রোলের ধোঁয়া উড়িয়ে উধাও হলো। অম্বিকাবাবু গাড়ীর পিছনে পিছনে থপ থপ ক'রে ছুটতে ছুটতে ভাঙা-ভাঙা রুদ্ধকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন—'দাঁড়ান্ মশায়, থামান্ বল্‌ছি, আমিও যাব।" কিন্তু টঙ্কনাথ অম্লানবদনে মুখ বাড়িয়ে এই সান্ত্বনার কথাগুলি তাঁর দিকে ছুড়ে ফেলে দিলে—"আপনি আর কেন যাবেন? আমি এলুম ব'লে, আপনি ততক্ষণ অশথগাছটা।—"

হার্টের প্যালপিটেসন্ বশতঃ অম্বিকাবাবু অগত্যা দাঁড়িয়ে প'ড়ে ক্রন্দনের মত উচ্চৈঃস্বরে আবার চেঁচিয়ে উঠলেন—'থামান্ বল্‌ছি, নৈলে ভাল হবে না।' সে কথা বোধ হয় টঙ্কনাথের কানেই পৌঁছাল না। তা সত্ত্বেও সে আর একবার মুখ বাড়িয়ে ব'লে গেল—"কিছু ভয় নেই—আমি নিয়ে যাচ্ছি—"

গাড়ী দৃষ্টির বাইরে চ'লে যেতেই অম্বিকাবাবু উন্মত্তের মত চেঁচাতে লাগলেন "নিয়ে গেল! কি ভয়ঙ্কর—দিনে ডাকাতী—জেলে দেব—কোন্ হায়! চোর—চোর—পুলিস! পাক্‌ড়ো।" কিন্তু কোথায় বা পুলিস আর কে-ই বা পাকড়ায়? লাভে হ'তে দুচার জন নিষ্কর্ম্মা কৌতূহলী লোক তাঁর চারদিকে জড় হয়ে তাঁকে প্রশ্নের উপর প্রশ্নে বিব্রত ক'রে তুললে। তিনি গেট বন্ধ ক'রে দিয়ে হন্‌হন্ ক'রে বৈঠকখানায় ঢুকেই টেলিফোন চোঙ হাতে তুলে নিলেন। দু একবার 'হ্যালো হ্যালো' করবার পর তিনি যে

নম্বরের ঠিক উল্‌টো। মন উল্‌টে গেলে, নম্বর উল্‌টে যাবে, সে আর বেশী কি ? তিনি 'হ্যালো' ব'লে ডাকতেই এক জন ভারী গলায় উত্তর দিলে—"ইয়েস, কে আপনি ?" অম্বিকাবাবু এতক্ষণ মনে মনে টঙ্কনাথ জপছিলেন, কাযেই "আমি টঙ্কনাথ বাবু, সবজজ।" উত্তর এলো,—"কোথাকার সবজজ ?" অম্বিকাবাবু ক্রুদ্ধ হয়ে বল্লেন, "এইখানকারই, আবার কোথাকার ? আপনি কি মহিমবাবু ?" "ওঃ, মহিম বাবুকে চান্, ডেকে দিচ্ছি।" বলেই উত্তর নিবৃত্ত হলো। অবশ্য ইনস্পেক্টারের নাম ছিল—মদীন্দ্র বা মদীন। কিন্তু মদীন যে কোন্ মনোবিজ্ঞানের আইন অনুসারে মহিম হয়ে গেল, তা সুস্থ মনের পক্ষে আবিষ্কার করা একটু শক্ত। যাই হোক্, মহিম বাবু যখন ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—'হ্যালো, কি চাই ?" তখন অম্বিকাবাবু তাঁকে অবিলম্বে অকুস্থানে আসবার জন্য অনুরোধ করলেন, কেন না, ঘটনা অত্যন্ত সাংঘাতিক—লোমহর্ষণ বল্লেও চলে। এবার মহিমবাবুর তরফ থেকে বেশ একটু হাস্যোদ্দীপক পাল্টা জবাব এলো—

"বুঝলুম না। ব্রুকবণ্ড, না দার্জ্জিলিং না লিপটন ? আমার কাছে তিনই আছে। আচ্ছা, আজ আর পারবো না, কাল সকালে তিন রকম স্যাম্পেল নিয়ে আপনার বাড়ীতে গিয়ে হাজির হব।"

অম্বিকাবাবু—"ধুত্তোর, আমার সঙ্গে ঠাট্টা !"—ব'লে সক্রোধে চোঙ ছুড়ে ফেলে দিলেন।

### ৩

"কোথায় ছিলি এতক্ষণ, হতভাগা ?"

"ঐ ত তোমার দোষ। কথায় কথায় যা তা ব'লে গালাগালি দাও। জানো না, মা বলেছিলেন ফল আনতে ? আপিস থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলুম—নিউমার্কেটে। এই এক বাজরা নিয়ে এসেছি—সব রকম আছে, আম, ম্যাঙ্গোষ্টীন, পিচ্—"

"রেখে দে তোর পিচ—চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে আমার গলা ভেঙ্গে গেল। এ দিকে যে সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে, তার খবর রাখিস্ ?"

"কিসের সর্ব্বনাশ ? তুমি বড্ড মিছিমিছি হেদোও।"

"মিছিমিছি বৈ কি—দেখ গে ঘরে গিয়ে—তোর মা আর নেই।"

"সে কি !"

"আর সে কি ! নিয়ে পালিয়ে গেল—এক বেটা। ওঃ—তুই-ও যেমন ত্যাঁদোড়—সেও তেম্‌নই—ব্যাদড়া, বিট্‌কেল, বজ্জাৎ। বাড়ীতে এলো, ফুল ছিঁড়লে, তামাক পোড়ালে—তার পর তাঁকে নিয়ে লম্বা। আচ্ছা, আমি যদি টঙ্কনাথ—ধুত্তোর—সেই বেটারই নাম মনে আসে—আমি যদি অম্বিকা হই, তা হ'লে এই ব'লে রাখছি—আর একবার তার দেখা পেলে হয়—গুঁড়িয়ে পিষে ছেড়ে দেব।"

"তা তখন দাও নি কেন ?"

"চুপ কর্, পাজী—মুখে মুখে উত্তর ! তখন দিতে পারলুম কৈ ? তিনিও মোটরে ক'রে এলেন—সোফার বেটাও চ'লে গেল—আর সে-ও লাফিয়ে গাড়ীতে উঠে—ওঃ কোথায় না জানি নিয়ে গেল ! পারিস্ ত এই বেলা খোঁজ কর্ গে যা—মান-ইজ্জত সব গেল—এখন প্রাণে রাখ্‌লে হয়। এক গা গয়না—এঃ, কেনই পাপ গাড়ী কিনেছিলুম। আর বেটা ইন্‌স্পেক্টার মহিম—ধুত্তোর মহিম কেন হবে, মদীন—তাকে টেলিফোঁয় ডাকলুম—আর এই বিপদে সে আমার সঙ্গে ঠাট্টা করলে, যেন আমি তার কত কালের ইয়ার ! আচ্ছা, আমি যদি ডিষ্ট্রীক্ট জজের ফেভারিট সবজজ হই, তা হ'লে সে কত বড় ইন্‌স্পেক্টার, আমি দেখে নেব।"

"কি যে পাগলের মত বকো, তার ঠিক নেই। তোমার মত ঘাবড়াতে যদি আমি আর কাকেও দেখে থাকি। আগে দেখ, কি হয়। সে আবার আসে কি না।"

"আর এসেছে—তুই ভাবছিস্, সে তাঁকে সিকদারপাড়ায় পৌঁছে দিয়ে আবার লক্ষ্মী ছেলের মত ফিরে আসবে ? আরে, সেই ভাগ্যিই যদি আমার হবে, তা হ'লে তোর মত একটা উজবুক আমার ছেলে হয়ে জন্মাবে কেন ?"

"ঐ ত তোমার দোষ, খামকা গালাগালি দাও। সাধে তোমার ওপর চটি ! —সে যে-ই হোক্, তার সাধ্যি কি যে আমার মা'র কোন ক্ষতি করে ! আমার মা তেমন মেয়েই নয়। তবে হাঁ, ভয়ের লোক বটে, চাল চালতে জানে। বুকের পাটা আছে। আমার ইচ্ছে হচ্ছে, তাকে একবার দেখতে।"

"দূর—দূর—দূর হয়ে যা—বেরিয়ে যা। তোর মুখ দেখতে নেই।"

বৈঠকখানায় ব'সে পিতা-পুত্রে এই রকম কথাবার্ত্তা হচ্ছে, এমন সময় টঙ্কনাথ আধগাল আন্দাজ হাসি নিয়ে বৈঠকখানায় ঢুকেই অম্বিকাবাবুর দিকে চেয়ে বল্লে, "এই নিন্, পাঁচ সিকে ফিরেচে। আমি ব'লে তাই পেরেছি, আর কেউ হ'লে—আপনিও বোধ হয় পারতেন না। কি ক'রে পারবেন? অশত্থগাছটাও ত এখনও পারেন নি দেখলুম। কি, বুঝতে পারছেন না? আচ্ছা, গোড়াগুড়ি থেকেই শুনুন।" এই ব'লে মবলগ এক টাকা চার আনা অম্বিকাবাবুর টেবলের উপর রেখে একখানা চেয়ারের উপর ব'সে পড়লো।

অম্বিকাবাবু ভ্যাকাচাকাগ্রস্ত মুখে একবার টঙ্কনাথ ও একবার বটুকের দিকে চেয়ে বল্লেন, "বাবা বটু—এই—এই সেই।"

বটুক টঙ্কনাথকে আপাদ-মস্তক শ্রদ্ধার সঙ্গে নিরীক্ষণ করতে করতে বল্লে, "তা আমি দেখেই বুঝেছি।"

অম্বিকাবাবু বিরক্তির পরাকাষ্ঠাসূচক ভ্রূভঙ্গীর সঙ্গে বল্লেন, "জিজ্ঞেস কর্ না, তিনি কোথায়।"

টঙ্কনাথ ফরাসের উপর হ'তে একখানা হাতপাখা তুলে নিয়ে বাতাস খেতে খেতে বল্লে, "কি অম্বিকাবাবু—আপনার স্ত্রীর কথা বল্ছেন? তিনি সিকদারপাড়ায় তাঁর বোনের বাড়ীতে।—যখন বলেছি পৌঁছে দেব—দেব না?—আপনিও যেমন পিছনে ডাক্লেন—হাতে হাতে ফল—পোয়াটেক পথ গিয়েছি কি লাগলো একখানা গরুর গাড়ীর সঙ্গে ধাক্কা। ট্রামের ডানদিকে বেরিয়ে যাব ব'লে একটু জোরে হাঁকিয়েছিলুম কি না।—আর এমনই কাণ্ড, এক লালপাগড়ী, যাদের অন্য সময় দেখাই যায় না—যেন ভুঁই ফুড়ে ঠেলে উঠলো! ভাবলুম, প্ল্যানটেন শো ক'রে বেরিয়ে যাই, তা সামনে পড়লো গোটা দু'তিন ছেলেমেয়ে—আর কি এড়াতে পারি? উঠলো বেটা এসে ফুটবোর্ডে। বল্লুম, জেনানা যাচ্ছে, নম্বর টুকে নিয়ে ছেড়ে দাও। তা শুন্লে না। বুঝলুম, কিছু ট্যাঁকস্থ করতে চায়—নিজের কাছে কিছুই নেই—কি করি? চাইলুম আপনার স্ত্রীর দিকে। তিনি ঘোমটার ভিতর দিয়ে মাথা নাড়লেন। বুঝলুম তাঁরও বক্তব্য। বল্লুম, করেছিলেন—বুঝলেন, মানের চেয়ে বড় কিছুই নয়—অমনই খুলে দিলেন—পাশেই ছিল পোদ্দারের দোকান—নাম মনে রেখেছি, রসীদও আছে—বাঁধা দিয়ে পেলুম সতের টাকা। কাল খালাস ক'রে আনতে পারবেন। সে বেটাকে দিলুম পাঁচ—বাকী রইলো বারো। আরও বেটা বলে, গলা ভিজিয়ে দাও। বুঝলুম দারু পিলাবার কথা। কি করবো? নৈলে থানায় যেতে হয়। নামলুম এক দোকানের সাম্নে—কিন্লুম এই এক পাঁট—তের সিকে। খালি হয়ে গেছে, রেখে দিন, কাযে লাগবে, তবে সবটা বেটাকে টানতে দিই নি—চার আনা আন্দাজ সে, বারো আনা আন্দাজ আমি, তবু খানিকটা উসুল, ব্যস্—সেও ভাগলো, গুণে দেখি আছে আট টাকা বারো আনা, তাই নিয়েই দিলুম হাঁকিয়ে। আর কোন গোলমাল নেই, একদম সিকদারপাড়া, জিজ্ঞেস করলুম, নম্বর কত, উত্তর না দিয়ে বাড়ী দেখিয়ে দিলেন। দরজার গোড়ায় নামিয়ে দিলুম, ফিরেই আবার ফের রওনা। পথে তেল নেই, কিনলুম এক টিন—গেল তিন টাকা, তার পরই টায়ার বার্ষ্ট এঞ্জিন বন্ধ। ডাকালুম কুলী, ঠেলাতে ঠেলাতে নিয়ে গেলুম গ্যারেজে—কুলীভাড়া লাগলো বারো আনা, ম্যানেজার নিলে আগাম দু' টাকা—কাল আর ১০ টাকা দিয়ে নিয়ে আসবেন। ব্যস্, হাতে রইলো ৩ টাকা, তাই নিয়ে করলুম একখানা ট্যাক্সি ভাড়া, সটান গেটে এসে নামলুম। মিটারে উঠেছিল ২ টাকা ৮ আনা, দেব কেন? স্মরণ করেছিলুম সাত সিকেয়, মুখটি চুণ ক'রে তাই নিয়েই লম্বা। ঐ নিন পাঁচ সিকে ফেরত, এই নিন পোদ্দারের নাম আর রসীদ, এই নিন গ্যারেজের বিল, আর ঐ পাঁটটাও আগেই দিয়েছি, ব্যস্, আর কিছু নেই, দেখুন, কত সস্তায় কায হাসিল ক'রে এলুম; এখন চলুন, দেখি আপনার অশত্থগাছটা।"

অম্বিকাবাবু অজগরের মত ফোঁস ক'রে একটা প্রকাণ্ড দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্লেন—"বটু, দেখ ত টেলিফোঁ ক'রে, সিকদারপাড়ায় গেছেন কি না।"

টঙ্কনাথের চোখের তারা ধারালো ছুরির ফলার মত চক্চক্ ক'রে উঠলো। সে দাঁত দিয়ে জিভের ডগা কামড়ে ধ'রে বল্লে, "ছি ছি, অম্বিকাবাবু, আমায় আপনি মিথ্যাবাদী পেলেন? টঙ্কনাথ মিথ্যে কথা বলে না। তার যে কথা,

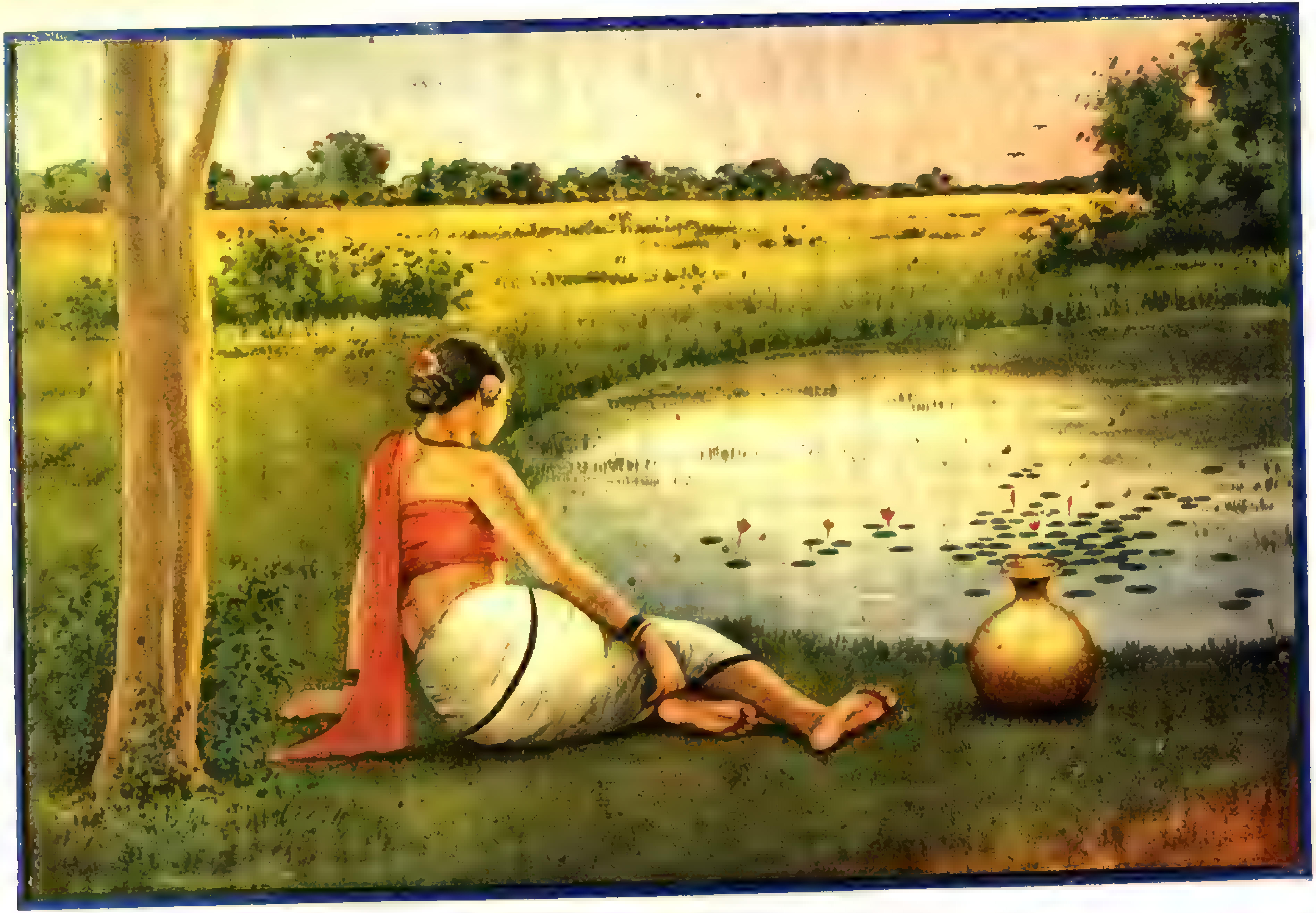

তন্ময়

বসুমতী প্রেস ]

শিল্পী—শ্রীসমরেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মণ—ত্রিপুরা।

হাঁসপাতালে পাঠিয়েছি কি না ? তদ্দূর হ'তে পারতো কাঁচা ড্রাইভার হ'লে,—যেমন আপনার ঐ হরিসিং। গরুর গাড়ীও যেতো, আপনার স্ত্রীও যেতেন। আমি ঐ ব্রেক টেনে একেবারে চিৎ হয়ে পড়লুম কি জন্যে ? তাঁকে বাঁচাবো বলেই না ? বেশ, টেলিফোঁ করেই দেখুন। কিন্তু বাজী রাখুন ; যদি শোনেন, আপনার স্ত্রী সিকদেরপাড়ায় আছেন আর কিচ্ছু চোট লাগে নি, তখন ? বলুন, কি বাজী রাখবেন ?" এই ব'লে টঙ্কনাথ একটা অস্বাভাবিক বিকট হাস্যে সমস্ত ঘর মুখরিত ক'রে তুল্লে। তার পর বটুকের দিকে চেয়ে বল্লে—"কি দাদা, একটু জল খাওয়াতে পারবে ? একেবারে 'র' টেনেছি কি না—তার পর এই দৌড়-ঝাঁপ—তার পর এই এতখানি বক্‌লুম, তবু বেশী খাব না—স্রেফ এক চুমুক।"

বটুক এতক্ষণ নির্ব্বাক্—বিস্ময়ে ও প্রশংসমান নিষ্পলক দৃষ্টিতে টঙ্কনাথের দিকে চেয়ে ছিল। হঠাৎ টঙ্কনাথের অনুরোধে সুপ্তোত্থিতের মত ব'লে উঠলো—"নিশ্চয় খাবেন—বসুন, এনে দিচ্ছি। আপনার সাকরেদী করতে ইচ্ছে করে।" এই বলেই এক দৌড়ে বাড়ীর ভিতর হ'তে এক গ্লাস কর্পূর দেওয়া ঠাণ্ডা জল ও এক রেকাবী সন্দেশ এনে টঙ্কনাথের হাতে দিলে।

অম্বিকাবাবু বটুকের কাণ্ড দেখে বিদ্রূপের সুরে বল্লেন—"দাও, ঐ ফলগুলোও দাও।"

টঙ্কনাথ হেসে বল্লে—"না অম্বিকাবাবু, মাপ করবেন, অতগুলো কি আর পারবো ? আপনি কৃতজ্ঞতা না কি বলে, তাই দেখাচ্ছেন—খোস্‌মেজাজ হয়ে,—কেন না, আপনি দিলদরিয়া লোক। কিন্তু—দাঁড়ান, না খেলেও আপনি দুঃখিত হবেন, ভাববেন, অপমান করলুম। আচ্ছা, দেখি চেষ্টা ক'রে।" ব'লে নিজেই ফলের বাজরা কোলের কাছে টেনে নিয়ে বস্‌লে। এ অসহনীয় দৃশ্য অম্বিকাবাবুর চোখে সইলো না। তিনি বটুকের দিকে কটমট ক'রে চেয়ে গন্‌গন্ ক'রে বাড়ীর ভিতর চ'লে গেলেন।

দুই এক মিনিট পরে অম্বিকাবাবু যখন ফিরে এলেন, তখন রেকাবীতে একটিও সন্দেশ নেই, বাজরাতে একটিও ফল নেই। দেখেই তাঁর অন্তরাত্মার গায়ে কে যেন জলবিছুটী আর ধানী লঙ্কা একসঙ্গে ঘষে দিলে। তিনি ফরাসের উপর একটা তাকিয়ে পেড়ে দিয়ে বল্লেন—"এই বার এখানে একটু শুয়ে পড়ুন—আমি বাতাস করি।"

টঙ্কনাথ হো হো ক'রে হেসে উঠে বল্লেন—"বুঝেছি, অম্বিকাবাবু, বুঝেছি। ইচ্ছেটা এইখানেই রাত কাটাই—দুটিতে গল্পসল্প ক'রে। কিন্তু কি করবো, আজ আমায় ছেড়ে দিতে হচ্ছে। হাঁ, একটা মস্ত কায মনে প'ড়ে গেল। আচ্ছা—তা তার জন্য দুঃখ কি ? আর এক দিন আসা যাবে। হাঁ, টঙ্কনাথ মিথ্যা কথা বলে না—আজকের দোষটা—সে দিন বেশীক্ষণ থেকে পুষিয়ে দিয়ে যাব।"

এই বলেই টঙ্কনাথ হাসতে হাসতে তীরের মত বেগে বেরিয়ে পড়লো।

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘট ক।

# মরমের বীণা

আমার মরমের বীণা
মরমেই যেন বাজে গো
তব রাতুল চরণ, নিশি-দিন যেন,
আমার হৃদয়-আসনে রাজে গো।
শতেক আঘাতে হইয়ে কাতর,
বেদনায় যদি হই জর-জর,
মেনে লই যেন সেই সমুদায়,
তোমার কঠোর করুণা,
প্রলয়ের মেঘ ঘনায়ে আসিলে
অশনি গর্জ্জনে মেদিনী কাঁপিলে
তব চরণ-নূপুর রুণুধ্বনি যেন ঢালে কানে সুধা-মূর্চ্ছনা ॥
আমার মরণের গান তুমি আর আমি
শুনি গো নীরবে ওগো প্রাণ-স্বামী
আর যেন কেহ নাহি জানে শুনে, আমারই হৃদয়-মাঝে গো,—
তুমি অনিবার হে বঁধু আমার থেকো পাশে চারু সাজে গো ॥

শ্রীমাধবচন্দ্র শীকদার।

# চপলার লীলা

## বীজ

শিলিগুড়ি ষ্টেশনে একখানি গাড়ী দখল করিয়া সুশীলবাবু যখন শ্যালী ও পত্নীর সহিত গল্প-গুজবে তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন, ঠিক সেই সময়ে একটি সুদর্শন যুবক ব্যস্তভাবে আসিয়া সুশীলবাবুকে কহিলেন, "মশাই, একটু যায়গা দেবেন? কোনখানে একটুও যায়গা পেলাম না, সেই জন্যে বাধ্য হয়ে—"

তাহার কথা ফুরাইতে না ফুরাইতে সুশীলবাবু কহিলেন, "তাতে কি হয়েছে, আপনি আসুন—তবে—কি জানেন, আমার এই শ্যালীটিকে নিয়েই মহা মুস্কিল—পাছে—"

দূর হইতে সকোপ কটাক্ষে ভগিনীপতির দিকে চাহিয়া লজ্জাজড়িত মৃদুকণ্ঠে সীতা কহিল, "যান—আপনি—ভারী—অসভ্য।"

গভীর স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে সীতার দিকে চাহিয়া মৃদু-মন্দ হাসিতে হাসিতে সুশীলবাবু কহিলেন, "তোর কাছে ত চিরদিনই ঐ নামে পরিচিত রয়ে গেলাম। ভাল আর তুই বল্লি কবে?" এই বলিয়া নিজের হাতের রিষ্ট ওয়াচের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই তিনি আগন্তুককে তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিতে বলিলেন এবং নিজে তাহাকে তাঁহার যায়গা ছাড়িয়া দিলেন।

অপরিচিতের আগমনে সীতা ও তাহার দিদি অত্যন্ত জড়সড়ভাবে এক দিকে সরিয়া বসিলেন।

সুশীলবাবুর কোষ্ঠীতে চুপ করিয়া বসিয়া থাকা কোন কালেই কেহ লেখে নাই। তিনি আগন্তুককে এক ধারে পথের দিকে চুপ করিয়া চাহিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া নিজেই উপযাচক হইয়া কহিলেন, "আপনিও দেখছি স্ত্রী- স্ত্রীলোককে আমি কিছুতেই বুঝিয়ে উঠতে পাল্লুম না, দেখুন না, দুজনে বসেছেন যেন ধোবার পুঁটুলী।"

তাঁহার কথা শুনিয়া আগন্তুকও আর হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না, উভয়েই একসঙ্গে হাসিয়া উঠিলেন। শান্তি তখন স্বামীর উপর অত্যন্ত চটিয়া গিয়াছিল, সে ক্রূর দৃষ্টিতে একবার তাঁহার দিকে চাহিতেই সুশীলবাবু কহিলেন, "দেখলেন ত মশাই, উচিত বল্লেই রাগ, শাসনে শাসনেই আমি রোগা হয়ে গেলাম; ঐ অস্ত্রই শিখে রেখেছেন। দিন দিন তিল তিল ক'রে যে দেহ ক্ষীণ হচ্ছে, সে কেবল—"

আগন্তুক আর নীরব থাকিতে না পারিয়া হাস্যোজ্জ্বল বদনে কহিলেন, "আপনাকে দেখলে ত কেউ সহজে স্বাস্থ্যহীন বলতে পারে না!"

"ওহে ভাই, এ কি ওপরে দেখে কেউ বুঝতে পারে—যাই হোক, আর বেশী বলব না, তা হ'লে পরিণাম যে শুভ হবে,—তা বুঝতেই পাচ্ছ—স্ত্রী জিনিষটি—বড় ভয়ানক বি—"

আগন্তুক কহিলেন, "মাপ করবেন, মেয়েদের সঙ্গে মেশবার বড় অবসর—পাই—" তাঁহার মুখের কথা ফুরাইতে না ফুরাইতে সুশীলবাবু কহিলেন, "এ্যা! বল কি, বিয়ে করনি?"

ম্লান হাস্যের সহিত সে কহিল, "আপনি অত আশ্চর্য্য হচ্ছেন কেন? এতে আশ্চর্য্য হবার কি আছে?"

"আরে, এতে আশ্চর্য্য হব না ত আশ্চর্য্য হব কিসে? তুমি ত তা হ'লে দুনিয়ার সব রসেই বঞ্চিত আছ; বিয়ে না ক'রে কি মানুষ থাকতে পারে? এত অভাব-অভিযোগ—বিশেষ ধর, এই ঝগড়াটাই ত এক জন না

অযোগ্য। আমি বোধ হয় এক মিনিটও শান্তি নইলে চলতে পারি না। এ দিকে ত দেখছি, কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী মহাপুরুষও নও। তবে—স্ত্রীরত্নটি না থাকলে দুনিয়ায় চলা ফেরাই যে কঠিন হয়ে দাঁড়ায়!” এই বলিয়া তিনি একবার পত্নীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; দেখিলেন, শান্তির সুন্দর মুখখানি লজ্জায় রক্তিমাকার ধারণ করিয়াছে এবং সে মস্তক অবনত করিয়া রহিয়াছে। শান্তি তখন মনে মনে ভাবিল, ভদ্রলোক আর যাবার গাড়ী পেলেন না, এঁর সঙ্গে আবার মানুষে যায়!

আগন্তক মনে মনে ভাবিলেন, লোকটা অত্যন্ত স্ত্রৈণ। তাহার পর ঈষৎ হাসিয়া ম্লান হাস্যের সহিত কহিলেন, “সবই অভ্যাস, আপনারা চিরদিন এই ভাবেই চ’লে এসেছেন, সুতরাং আপনাদের বোধ হয় অসুবিধা হয়। আমার তো—” এই বলিয়া তিনি অন্যমনস্কভাবে চাহিতেই অদূরবর্ত্তিনী সীতার দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। মুহূর্ত্তে তিনি আবার তাঁহার চক্ষু নত করিলেন; কিন্তু সুশীলবাবুর দৃষ্টি সেটুকু এড়াইয়া গেল না। তিনি কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিলেন, সহসা চুপ করিয়া গেলেন।

ক্ষণপরে সুশীলবাবু কহিলেন, “তা হ’লে আপনি এক জন ভীষণ নারী-দ্বেষী দেখছি—”

একটুখানি হাসিয়া আগন্তক কহিল, “সেটা ঠিক বলতে পারি না—তবে—”

গাড়ী ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর স্থানে ছুটিয়া চলিতেছিল। যে দিকেই দৃষ্টি যায়, সেই দিকেই পাহাড়, স্তব্ধ অচঞ্চল ভীষণদর্শন ঘনান্ধকার পর্ব্বতসকল ভেদ করিয়া দীপশলাকার বাক্সের মত গাড়ীগুলি অমিতবিক্রমে ছুটিয়া চলিয়াছে। হিমালয়ের অগণিত শৃঙ্গরাজিতে রৌদ্রালোক পড়িয়া পরম রমণীয় করিয়া তুলিয়াছিল। বর্ষণলঘু পুঞ্জীভূত মেঘের রাশি বাত্যাতাড়িত হইয়া ছিন্ন-ভিন্নভাবে পাহাড়ের গায়ে আশ্রয় লইয়া, যূথিকা-স্তবকের মত অপূর্ব্ব শোভায় হিমাদ্রির সম্পদ বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিল, হিমকণাবাহী শীতল সমীরণ আসিয়া বাঙ্গালাদেশের অগ্নি-দগ্ধ দেহটাকে স্নিগ্ধ করিয়া তুলিতেছিল। পথের ধারে বক্ষ টিয়াগুলি তারের উপর বসিয়া কিচিমিচি করিতেছিল। সীতা একাগ্রচিত্তে ইহাই নিরীক্ষণ করিতেছিল। সে আরও দেখিতেছিল, গাড়ীখানি কিরূপ বক্রগতিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া উপরে উঠিতেছে। পাহাড়ের পথে এই তাহার প্রথম যাত্রা, সুতরাং এ যাত্রা তাহার অবসাদগ্রস্ত মনকে বড়ই উৎফুল্ল করিয়া তুলিতেছিল।

পার্ব্বতীয় বালক-বালিকাগুলি মৃগশিশুর ন্যায় লম্ফে লম্ফে কখনও ঊর্দ্ধে, কখনও নিম্নে পর্ব্বতের শৃঙ্গে শৃঙ্গে ফুল ও ফল আহরণ করিয়া বেড়াইতেছিল। তাহাদের উচ্চহাস্য যেন মৌন পার্ব্বত্য বনভূমিকে জাগরিত করিয়া তুলিতেছিল। অদূরে পর্ব্বত-গাত্র-নিঃসৃত কত শত ঝরণা বর্ষার অপরিমিত বারিরাশিতে নাচিয়া নাচিয়া, ফুলিয়া, দুলিয়া রজতধারার মত পর্ব্বতের নিম্নপ্রান্তে ক্ষরিত হইতেছিল। পর্ব্বতগাত্রের নানাবিধ ‘ফারণ’ পুষ্পের একটি মৃদু মধুর সুগন্ধ সমীরণে ভাসিয়া আসিতেছিল। সীতা মুগ্ধনেত্রে সেই দিকেই চাহিয়া ছিল।

বহুক্ষণ নীরব থাকিয়া সুশীলবাবু কহিলেন, “মশায়ের নাম? কি করা হয়?”

“আমার নাম রঘুপতি, আমি ইলেক্‌ট্রিক এঞ্জিনীয়ার।”

সুশীলবাবু কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া, আগন্তকের আপাদমস্তক একবার নিরীক্ষণ করিয়া পরক্ষণেই কহিলেন, “দার্জ্জিলিংয়ে কোথায় থাকা হবে?”

“আজ্ঞে, লিলি কটেজ। নম্বর দুই।”

গভীর আনন্দের সহিত সুশীলবাবু কহিলেন, “বাঃ বাঃ, এ যে—পরম সৌভাগ্য, মণিকাঞ্চনযোগ। এমন যোগাযোগ দেখাই যায় না। আমরাও ঐ এক নম্বর ভাড়া করেছি। আপনাকে যে সর্ব্বদা পাওয়া যাবে, সেইটাই বেশী আনন্দ মনে কচ্ছি।”

রঘুপতি ভাবিতেছিল, লোকটি বড় সরল, উদার। দুই চার মিনিটের পথের পরিচয়ে যে অপরিচিতকে এমন আপন করিয়া তুলিতে পারে, তাহার মন যে কতখানি উচ্চ, তাহা সে নিজের মনেই সম্যক্ উপলব্ধি করিল। গাড়ী ধীরে ধীরে দার্জ্জিলিং ষ্টেশনে প্রবেশ করিল।

### অঙ্কুর

এক দিন বাদলের ধারাবর্ষণ-প্রভাতে রঘুপতি জানালার ধারে নিজের ঘরটিতে একখানি বই লইয়া বসিয়া ছিল। প্রায় দুই মাসকাল সে দার্জ্জিলিং আসিয়াছে। এই দুই মাস সে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় সকল সময় সকল যায়গাতেই

সুশীলবাবুদের সঙ্গী হইয়াছে। গৃহে ফিরিয়া অবসরকালটুকুও সে প্রায়ই তাঁহাদের সঙ্গলাভ করিয়া থাকে। নিজের মনটাকে সে যতটা সম্ভব উঁহাদের সান্নিধ্য হইতে দূরে রাখিতে সচেষ্ট হইত, কিন্তু কোন্ সম্মোহনশক্তির বশবর্ত্তী হইয়া সে যেন চুম্বকাকৃষ্ট লৌহের মত নিয়তই উঁহাদের নিকট গিয়া পড়িত, তাহা সে বুঝিতে পারিত না। নিজের শত বাধা সত্ত্বেও তাহার বিদ্রোহী মন-প্রাণকে সে কিছুতেই দৃঢ় করিতে পারিত না।

সীতার সেই কলকণ্ঠের উচ্চ হাসি, নিমেষহারা লজ্জারুণ দৃষ্টি, মনোমোহিনী রূপরাশি তাহাকে মদিরাপায়ীর ন্যায় মাতাল করিয়া তুলিয়াছিল, তাই এই নবোন্মেষিত যৌবনে তৃষিত হৃদয়ের পরিপূর্ণ প্রেম-অর্ঘ্য যে সে কবে কোন্ দিনে সীতার চরণে ঢালিয়া দিয়াছিল, তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিল না। কিন্তু বিশ্বের অন্তরালে থাকিয়া বিশ্বপিতা যে কাহার ভাগ্যে কি লিখিয়া থাকেন, জ্ঞানহীন মানবের বুঝিবার সাধ্য কোথায়?

সীতা যে তাহার পক্ষে দুর্ল্লভ, তাহা সে ভাল করিয়াই জানিত। কারণ, সীতার সীঁথিতে সিঁদূর দেখিয়া সে বুঝিয়াছিল যে, সীতা বিবাহিতা। তাই আজ নিজের মনকে প্রবলভাবে শাসিত করিয়া, একখানি বই লইয়া সে জানালার ধারে বসিয়াছিল। সে ঠিক করিয়াছিল, এ প্রলোভন তাহাকে জয় করিতেই হইবে। কিন্তু দুষ্ট মনকে সে প্রবলভাবে শাসিত করিয়া রাখিলেও, হৃদয়ের প্রতি অণু-পরামাণু আজ বিদ্রোহী হইয়া সকল বাধা-বিপত্তি ঠেলিয়া ঐ গৃহের দিকেই ছুটিয়া যাইতে চাহিতেছিল।

এমন সময় পার্শ্ববর্ত্তী গৃহ হইতে এস্রাজের সহিত সীতার সুমধুর কণ্ঠের অপূর্ব্ব সঙ্গীত তাহার কর্ণে আসিয়া বিক্ষিপ্ত মনটাকে আরও চঞ্চল করিয়া তুলিল। সে শুনিল, সীতা গাহিতেছে—

"সারা পথের ক্লান্তি আমার
সারা দিনের তৃষা,
কেমন ক'রে মেটাব যে খুঁজে না পাই দিশা;
এ আঁধার যে পূর্ণ তোমার
সেই কথা বলিয়ো
শুধু তোমার বাণী নয় গো হে বন্ধু, হে প্রিয়!

সে ভাবিতেছিল, কি সুন্দর, এ কি তাহার প্রাণের কথা? সীতা গাহিতেছিল—

"হৃদয় আমার চায় যে দিতে,
কেবল নিতে নয়,
ব'য়ে ব'য়ে বেড়ায় সে তা'র
যা কিছু সঞ্চয়।"

বাদল বাতাসে সীতার গানের মধুর সুরটুকু ঘরের ভিতর যেন ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। সঙ্গীতের মোহমন্ত্র যেন তাহাকে পাষাণে পরিণত করিয়া দিয়াছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সে প্রকৃতিস্থ হইয়া ভাবিতে লাগিল, এমন সুমধুর কণ্ঠ কি মানুষের হয়? কিন্তু একটা কথা সে কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছিল না যে, সীতার প্রাণে এমন কি বেদনা সঞ্চিত আছে যে, সে নিত্য নিত্য এই রচিত গাথায় নিজের অব্যক্ত বেদনার ব্যথা মানুষের মন-প্রাণকে জাগরিত করিয়া তুলে? তবে মনের ভিতর একটা অমীমাংসিত জটিলতার সংশয় আসিয়া আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিল। গায়িকার হৃদয়ে কিসের এ প্রচ্ছন্ন ব্যথা, সে কাহার পরশ চায়? আজ বলিয়া নয়, সীতার গান যখনই সে শুনিয়াছে, তখনই যেন তাহার মনে হইয়াছে, গায়িকার অন্তরস্থ অকথিত বেদনারই এ সকরুণ ধ্বনি—নিশীথরাতের বাদলধারার মত এস্রাজের করুণ ঝঙ্কার তাহারই প্রাণের ভিতর এমন সুরে বাজিয়া উঠিতে চায় কেন? চির-পরিচিত মৌন কাতর সজল আঁখি দুইটি সততই হৃদয়াভ্যন্তরে ফুটিয়া উঠে কেন? তাহার সঙ্গ—তাহার সঙ্গীত এত মধুর বোধ হয় কেন? সে পরস্ত্রী, তাহার উপর এ অনুরাগ কি শিক্ষিত পুরুষের আদর্শ?

এই যে অতি পবিত্র শুভ্র চিত্তকে সে অতি যত্নে রক্ষাকবচের মত গঠিত করিয়া তুলিয়াছিল, ধরণীর অপবিত্র ধূলিকণাস্পর্শে পাছে সে কোনও দিন কলুষিত হইয়া উঠে! আর আজ সেই অনিন্দিত উন্নত সংযমী চিত্ত কিসের প্রলোভনে আকৃষ্ট? কি তাহার কাম্য? প্রাণ কেন ঐ দূরশ্রুত মধুর স্বরলহরীতে ডুবিয়া যাইতে চায়? অরুণকিরণ সদৃশ স্বচ্ছ মুখমণ্ডল—সেই নীলেন্দীবর তুল্য বিশাল নয়নদ্বয় কেন তাহার মানস-দর্পণে নিয়ত ফুটিয়া

অবসর-সময়ে কিসের আকর্ষণে এই জানালার ধারে কাহার প্রতীক্ষায় সে নিজের উৎকণ্ঠিত আঁখি দুইটিকে রুদ্ধ জানালার দিকে উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়া দিয়া থাকে? এ তৃষা লোকের অগোচর থাকিলেও তাহার অগোচর আছে কি?

এই প্রতীক্ষিত সুন্দর সময়টুকু তাহার কাছে এত প্রিয়,—এত মধুর ও সমস্ত সুখ-দুঃখের অতীত বলিয়া মনে হয় কেন? পর্দ্দার অন্তরাল হইতে নিজের সুন্দর দেহটিকে লুক্কায়িত রাখিয়া দুইখানি কুসুমপেলব হস্ত যখন রুদ্ধ জানালার দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়া নিমেষেই অন্তর্হিত হইয়া যাইত, তখন তাহার মনে হইত, পূর্ণিমার ফুটন্ত জ্যোৎস্নার সুবিমল কান্তি যেন ক্ষণিকের জন্য তাহার নয়ন দুইটিকে পরিতৃপ্ত করিয়া দিল। এমনই ভাবে দুই মাস ধরিয়া সে তাহার পিপাসিত আঁখি দুইটিকে সার্থক করিয়া তুলিয়াছে। সীতার দৃষ্টির সম্মুখে নিজের দৃষ্টি স্থির রাখিতে তাহার অন্তরাত্মা যেন কম্পিত হইয়া পড়িত, আশা মিটাইয়া তাহাকে দেখিতে গিয়া লজ্জায় চক্ষু নত হইয়া যাইত—তাই এই গোপনতার অন্তরালে নিজেকে গোপন রাখিয়া নিমেষহারা দৃষ্টিতে সে শুধু হাত দুইখানির দিকেই চাহিয়া থাকিত। এ প্রলোভন সে কিছুতেই দমন করিতে পারিত না।

কে সে—? কোন্ চিরপরিচিতা জন্মজন্মান্তরের কাঙ্ক্ষিতা প্রিয়তমা, কোন্ অদৃশ্য নিগূঢ় আকর্ষণে তাহাকে প্রতিনিয়ত আকর্ষণ করিতেছে যে, সে আজ সমস্ত বাধা লঙ্ঘন করিয়া যাইবার জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে—দেশাচার, সমাজ, ধর্ম্ম সমস্তই অতিক্রম করিয়া সর্ব্বহারা, রিক্ত প্রাণ আজ তাহারই বাহুবন্ধনে ধরা দিবার জন্য অসীম অনির্দ্দেশ্য পথে ছুটিয়া যাইতে চাহিতেছে? কিন্তু বাধা, এই - অসীম—অনন্ত যোজনাধিকপরিমাণ দুর্লঙ্ঘ্য বাধা—কে সৃষ্টি করিয়াছে? এই বাধা সে কেমন করিয়া লঙ্ঘন করিয়া যাইবে? বিবাহের আগে কেন সে সীতার সহিত মিলিত হইল না? এই কথা যখন সে ভাবিতে লাগিল, তাহার তৃষিত হৃদয়-পঞ্জর ভেদ করিয়া মর্ম্মভেদী অনুশোচনায় চিরদিনের রুদ্ধ অশ্রুরাশি নয়ন বাহিয়া অবিরল ধারায় ধরণীকে সিক্ত করিয়া তুলিল।

এই ঘটনার চারি পাঁচ দিন পরেই সুশীলবাবু কি একটা কাযে কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়াছেন। তিনি যাইবার সময় রঘুপতিকে সকল সময়ে ইহাদের দেখিতে বলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং রঘুপতি যে এ ভারগ্রহণে নিতান্ত অনিচ্ছুক, তাহা তাহাকে দেখিলে বোধ হয় না।

এক দিন ভ্রমণ করিয়া আসিয়া সীতা বিশ্রাম করিতে করিতে তাহার দিদিকে কহিল, "আচ্ছা, দিদি, এই সীতা নামটা আমার কে রেখেছিল, বলতে পার?"

ভগিনীর অন্তরের ব্যথা নিজের অন্তরে অনুভব করিয়া বেদনাবিদ্ধকণ্ঠে শান্তি কহিল, "নামের দোষ কি, সীতা, সবই অদৃষ্টের দোষ—দাদামশাই তোর ঐ নাম রেখেছিলেন। মাসীমা বারণ করেছিলেন, কিন্তু তিনি বল্লেন, লোকের ভয় ভেঙ্গে যাবে বলেই আমি ওর এই নাম রাখছি, দেখ, ও কি রকম সুখী হয়।"

শুষ্ককণ্ঠে সীতা কহিল, "তা ত দেখতেই পাচ্ছি। সুখী যে কত, তার প্রমাণ ত পড়েই রয়েছে। এর চেয়ে আর বেশী কিছু কষ্ট মেয়েদের আছে কি না, তা ভগবান্‌ই বলতে পারেন। সব সময়ে অদৃষ্টের দোষ মেনে নেওয়া যায় না, দিদি।"

সীতার ম্লান গম্ভীর মুখখানির দিকে শান্তি তাহার সজল নয়নযুগল তুলিয়া ধরিয়া ক্ষুণ্ণকণ্ঠে কহিল, "তবে কি তুই নামেরই দোষটা ধরতে চাস, সীতা?"

বেদনাজড়িতকণ্ঠে সীতা বলিল, "কিছুই আমি বলতে চাই না, দিদি, তবু সময় সময় কি মনে হয় জান? মনে হয়, যে নামটা চিরদিন ধ'রে হিন্দুর মনে পরিত্যক্ত নারীর স্মৃতি জাগিয়ে তোলে, সেই নামটাই তিনি কেন জোর ক'রে রাখলেন?"

শান্তি ভগিনীর কথার যথার্থ সদুত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া সান্ত্বনাচ্ছলে তাহাকে বলিল, "তিনি দেবতা ছিলেন, সীতা। তাঁর কথা—"শান্তির কথা শেষ হইল না। কক্ষান্তরে খোকার ক্রন্দন শুনিয়া সে তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সীতা তখন ভাবিতেছিল, এই দুর্ভাগ্যের সঙ্গে অবিরত যুদ্ধ করিয়া কত যুগ-যুগান্তর ধরিয়া তাহাকে যে স্থির নির্দ্দিষ্ট পথে চলিতে হইবে, তাহা কে জানে? চিরদিনই

কি তোমাদের বিধান জয়ী হইবে? বাল্যে পিতামাতা যাঁহার সহিত তাহার অদৃষ্টকে একই সূত্রে গ্রথিত করিয়া দিয়া যে আশার বাতি জ্বালাইয়া দিয়াছিলেন, জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ত সে প্রদীপ নিবিয়া গিয়াছে। যে দেবতার পবিত্র স্পর্শে তাহার হৃদয়পদ্ম ফুটিয়া উঠিয়াছিল, চির-কাঙ্ক্ষিত সেই পাদমূলে তাহার ভক্তিপূত অর্ঘ্য পৌছে না কেন? প্রাণের গভীর বেদনার নীরব নিবেদন তাঁহার কর্ণ স্পর্শ করে না কেন? হে আমার—জন্মজন্মান্তরের—প্রিয় দেবতা, একবার আমায় তোমার কাছে লইয়া যাও—আমি তোমার চরণতলে বসিয়া কেবল ক্ষণিকের জন্য বলিতে চাই যে, সত্য, ন্যায় ও ধর্ম্মের বিচার করিয়া তবে আমার চির-নির্ব্বাসন দিও—আমি হাসিমুখে তাহা গ্রহণ করিব।

কোন্ পরশ্রীকাতর দুষ্টের কালকূটভরা রসনা হইতে কি বিষ নির্গত হইল যে, নির্ব্বিচারে আমাকে চির-পরিত্যক্তা করিয়া রাখিলে—অলীক রচনায় ভীত হইয়া সত্য, ধর্ম্ম সমস্ত ভুলিয়া গেলে?

যাহার সঙ্গে আজীবনের বন্ধন স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, সেই বাঞ্ছিত সর্ব্বস্বকে একান্ত দূরান্তরে রাখা যে কি নির্ম্মম, কি কঠিন, তাহা কেবল ভুক্তভোগী উপলব্ধি করিতে পারে।

অকরুণ নির্ম্মম কঠিন বর্ত্তমান যখন সর্ব্বদিক্ হইতে তাহাকে নাগপাশের মত বেষ্টন করিয়া ধরিত, সে তখন প্রাণপণে নিজের অদৃষ্টকেই ভর্ৎসনা করিত। উদয়ের আরম্ভ হইতে জীবনের অন্ত অবধি এই আশাহীন, উদ্দেশ্যহীন, অলস জীবনটাকে বিশাল ধরণীর স্নেহমমতাহীন সংস্পর্শে লুণ্ঠিত করা ছাড়া আর তাহার কোন উপায়ই নাই। এ জীবনে অনাবিল স্নেহের স্নিগ্ধ ধারা দূরে থাক, বিন্দুমাত্র বারিদানেও কেহ কখনও তাহার আজন্ম-তাপিত দেহকে স্নিগ্ধ করিবে না, ইহাই বিধিলিপি।

দশ বৎসর বয়সের সময় সীতার বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু বিবাহের এক মাস পরেই সীতার শ্বশুরের সঙ্গে তাহার পিতার একটা সামান্য কথায় মনোমালিন্য হইয়াছিল, সেই সামান্য বিবাদ ক্রমশঃ অসামান্য মনান্তরে পরিণত হইয়া সীতার শ্বশুর সীতার পিতৃবংশে একটা কলঙ্ক আরোপ পুত্র রমানাথকে প্রতিশ্রুত করাইয়া লইলেন যে, এই নীচ বংশের মেয়েকে যদি তুমি কখনও গ্রহণ কর, তবে পিতার সহিত কখনও কোন দিন তোমার কোন সম্পর্ক থাকিবে না। সপ্তদশবর্ষীয় মাতৃহীন রমানাথ শিশুকাল হইতে পিতার অশেষ যত্নে পালিত হইয়াছিল; সুতরাং পিতার সম্মুখে সে কোন দিনই কোন মত প্রকাশ করিত না। তাহা ছাড়া রমানাথের তখনও ভাল-মন্দ বিচার করিবার সম্পূর্ণ জ্ঞান জন্মায় নাই, কৈশোরের প্রবল লজ্জা সে তখনও অতিক্রম করে নাই, সুতরাং ভয়ে বা লজ্জায়, যে কারণেই হউক, সে পিতৃ-আজ্ঞা নতমস্তকে মানিয়া লইয়া নিরপরাধা সীতাকে পরিত্যাগ করিল। সীতা তখন নিতান্ত বালিকা, সুতরাং ভবিষ্যৎ ভাবিবার ক্ষমতা তখনও তাহার জন্মায় নাই।

বৈবাহিকের এই অকারণ নির্ম্মম অত্যাচারের ফলে সীতার পিতামাতা অকালে ইহলোক ত্যাগ করিলেন। সীতা আশ্রয়হারা হইয়া মাসীর বাড়ী আসিল। তাহার মাসতুতো ভগিনী শান্তি নিজের গৃহে আনিয়া তাহাকে শিক্ষিতা করিয়া তুলিয়াছিল। নিরাশ্রয়া, পিতৃমাতৃহীনা, স্বামিবঞ্চিতা সীতা, শান্তির এবং তাহার স্বামীর অশেষ স্নেহযত্নে বর্দ্ধিতা হইতেছিল। জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সে যখন নিজের চরম দুর্দ্দশার কথা প্রথমে জানিতে পারিল, তখন কি গভীর বেদনায় যে তাহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল, তাহা তিনি ভিন্ন আর কেহ বলিতে পারে না।

ভগবান্ যাহার উপর বিরূপ হন, সে আশাতীতভাবে সমস্ত পাইলেও তাহার আশা পূর্ণ হয় কি? সীতার অদৃষ্টেও তাহাই হইয়াছিল। গরীবের ঘরের মেয়ে রাজরাণী না হইলেও সে যাহা পাইয়াছিল, তাহা তাহার আশার অতীত বলিয়াই এখন মনে হয়। দুঃখী জনের নিকট দেবতার মন্দিরদ্বার চিরদিনই রুদ্ধ থাকে, তেমনই স্বামীর ভালবাসা কি সকল নারীর ভাগ্যে সকল সময় পরিমিতরূপে পাওয়া যায়? আবহমানকাল পর্য্যন্ত দুর্ভাগ্য যাহার পিছনে পিছনে অনুসরণ করিয়া চলিতেছে, তাহার সুখ কোথায়?

সেই ঘনায়মান সন্ধ্যার গভীর অন্ধকারে বসিয়া সে তাহার বেদনাজড়িত রক্তারুণ হৃদয়পুষ্পে ও নয়নের পূত পবিত্র অশ্রুধারায় কোন্ দেবতার কৃপালাভের জন্য প্রতিদিন অর্চনা করিত, তাহা কেবল অন্তর্য্যামীই বলিতে

## কোরক

এক দিন সিঞ্চল পাহাড়ে মাউণ্ট এভারেষ্ট দেখিতে সুশীলবাবু সপরিবারে রওনা হইলেন। রঘুপতি তাঁহাদের প্রদর্শক হইয়া সঙ্গে রহিল।

রঘুপতির মুখে মাউণ্ট এভারেষ্টের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের কথা শুনিয়া সীতা একান্ত জিদ ধরিল যে, দিদিকে লইয়া সে উহা দেখিতে যাইবে। সীতাকে সামান্য উল্লসিত করিবার জন্য শান্তি সর্ব্বদাই উৎসুক থাকিত, সুতরাং পথজনিত ক্লেশে তাহার অত্যন্ত কষ্ট হইবে বুঝিয়াও সে সীতার আবদারে 'না' বলিতে পারিল না। সীতার সন্তোষবিধানের জন্য খোকাকে বাড়ীতে রাখিয়া এক দিন, রাত্রি চারিটার সময়ে সকলে সিঞ্চলের পথে যাত্রা করিল।

সীতা দ্রুতগতি উচ্চ চড়াই অতিক্রম করিয়া চলিতেছিল। সুশীলবাবু তাহাকে দ্রুতপদবিক্ষেপে যতই যাইতে নিষেধ করিতেছিলেন, সে তাঁহার সেই স্নেহের নিষেধে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া নিজের অবাধ্যতা আরও বাড়াইয়া তুলিতেছিল।

ক্রমশঃ সে সিঞ্চলের উচ্চশিখরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পশ্চাতে রঘুপতি। কিন্তু জামাইবাবুর আর দিদির তখনও দেখা নাই দেখিয়া সীতা লজ্জাজড়িত-কণ্ঠে রঘুপতিকে কহিল, "তাঁরা এখনও আসছেন না কেন?"

অবনত মুখে রঘুপতি বলিল, "আপনি যে দৌড়ে এসেছেন—ওঁরা কি তত শীগ্‌গির আসতে পারেন?"

পুনরায় সীতাকে চঞ্চলা হরিণীর মত পর্ব্বতের এধার ওধার অবধি ছুটিয়া যাইতে দেখিয়া রঘুপতি অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িল; অথচ মুখে কিছু বলিতেও পারিতেছিল না। একা পরস্ত্রীর সহিত এই নির্জ্জন পর্ব্বতশিখরে আসিয়া সে নিজের মনের কাছে অত্যন্ত অপরাধী হইয়া পড়িতেছিল। সুশীলবাবুও আসিতেছেন না! সে এখন কি করিবে?

এমন সময় এমন একটা অঘটন ঘটিয়া গেল যে, সে আর সীতার নিকটস্থ না হইয়া পারিল না। নিজের জুতার ফিতা বাঁধিয়া রঘুপতি দাঁড়াইয়া উঠিয়া সীতাকে কোথাও দেখিতে পাইল না। মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার প্রাণ কম্পিত হইয়া উঠিল, নিমেষের ত্রুটিতে সীতা হয় ত গভীর খাদে পড়িয়া প্রাণ হারাইয়াছে, সে এখন কি করিবে? এই ভাবিয়া সে তখনই দ্রুতপদধাবনে কিঞ্চিৎ উপরে উঠিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি-সঞ্চালন করিয়া দেখিল, কিঞ্চিৎ দূরে একখানি প্রকাণ্ড পাতরের অন্তরালে দাঁড়াইয়া সীতা একাগ্রচিত্তে দূরবর্ত্তী পর্ব্বতশৃঙ্গের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। কিন্তু সে এমন যায়গায় গিয়া উপস্থিত হইয়াছে যে, সামান্য অসতর্কতায় যদি তাহার পদস্খলন হয়, তবে সীতা নাম জগৎ হইতে লুপ্ত হইয়া যাইবে।

সে আর ভাবিতে পারিল না, তাহার মাথার ভিতর কেমন করিয়া উঠিল, জ্ঞানশূন্য হইয়া দৌড়াইয়া গিয়া সে সীতার একখানি হাত ধরিয়া টানিয়া আনিতেই পাতরের ধাক্কা লাগিয়া সীতা একেবারে রঘুপতির অঙ্কে পড়িয়া গেল, তীব্র তাড়িতস্পর্শ মুহূর্ত্তমধ্যে মানুষকে যেমন বিচলিত করিয়া তুলে, সীতার স্পর্শ সেইরূপ রঘুপতির অঙ্গে সহস্র বিদ্যুতের ধারা ছুটাইয়া দিল। নিদারুণ লজ্জায় সীতার মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইতেই রঘুপতি রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "কি হ'ত বলুন দেখি? আপনি আজ কি সর্ব্বনাশই করেছিলেন।"

নিজের বিশাল নীলেন্দীবরতুল্য যুগ্ম নয়ন দুইটি রঘুপতির মুখে স্থাপিত করিয়া সীতা শান্ত অচঞ্চল স্নিগ্ধ স্বরে কহিল, "কেন—কি—আর—হ'ত, ভালই হ'ত—সব মিটে—যেত।"

ম্লান হাস্যের সহিত রঘুপতি কহিল, "এখন ত ও কথা বলবেনই। কিন্তু—এ এখুনি যে দুজনে পাষাণসমাধি লাভ কর্ত্তুম, দাদা দিদি এঁরা সব কি বলতেন—কি মনে করতেন?"

সীতা হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, "মনে আর কি করবেন হয় ত ভাবতেন, এদের দুজনে খুব ভাব ছিল, তাই—" তাহার মুখের কথা ফুরাইতে না ফুরাইতে সুশীলবাবু ও শান্তি আসিয়া উপস্থিত হইল, কথার শেষটুকু রঘুপতি আর শুনিতে পাইল না।

সীতার মুখে এই কথা শুনিয়া রঘুপতি একবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। বিবাহিতা নারীর মুখে পরপুরুষকে এই সম্ভাষণ সে আর কোথাও কখনও শুনিয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারিল না। তবে—তবে কি সীতা—তাহারই মত বিপথে চলিয়াছে? সে-ও কি তাহার প্রতি মুগ্ধ? না না, এ তাহার ভুল ধারণা; বন্ধুও ত বন্ধুকে ভালবাসে,

ভগিনীও ত ভাইকে স্নেহ করে, সেই হিসাবেই যদি সীতা তাহাকে ভালবাসিয়া ঐ কথা বলিয়া থাকে, ইহাতে দোষই বা সে ধরিতেছে কেন? সকাম লালসাতেই কি জগৎ ভরিয়া আছে? পবিত্র ভ্রাতা-ভগিনীর অকলুষ ভালবাসা কি বিশ্বজগতে দুষ্প্রাপ্য? বিচার না করিয়া মন্দ কথাটাই লোক ধরিয়া বসে কেন? সে পরস্ত্রী, সে কেন তাহাকে ভালবাসিতে যাইবে? হয় ত ঠাট্টাচ্ছলে সে তাহাকে ঐ কথা বলিয়াছে। তথাপি অপঠিত তাম্রশাসনের মত সীতার কথাটা তাহার মনের ভিতর একটা জটিলতার সৃষ্টি করিয়া তুলিতেছিল।

ফিরিবার পথে রঘুপতিকে নিতান্ত চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া সুশীলবাবু কহিলেন, "রঘুপতি যে আজ এত চুপ-চাপ? ব্যাপার কি?" রঘুপতি কহিল, "এমনিই।" শান্তি তখন বলিল, "তোমার শালীটি কি আজ আর রঘুপতি-বাবুর কথা বলবার শক্তি রেখেছে, ওঁকে যে রকম দৌড় করিয়েছে, তেমন মানুষে পারে না। সীতা আজকাল ভারী দুষ্ট হয়েছে।"

সন্ধ্যার প্রাক্কালে ড্রয়িংরুমে সকলকেই উপস্থিত থাকিতে দেখিয়া সুশীলবাবু কহিলেন, "সীতা কোথায় গেল? তাকে দেখছি না যে?"

শান্তি কহিল, "সে সুটকেস গোছাতে গেছে, কাল কার্সিয়ং যাবে কি না।"

"ও!—ঠিক কথা, আমাকেও ত পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে, সে কথা মনেই ছিল না। তা কবে আবার আসছে?"

শান্তি কহিল, "তা ত বলতে পারি না।"

নিজের অসম্ভব আগ্রহটাকে কিছুতেই দমন করিতে না পারিয়া রঘুপতি রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "কার্শিয়ং যাচ্ছেন কেন?"

বিদ্রূপচ্ছলে সুশীলবাবু কহিলেন, "ও সব কর্ত্তার ইচ্ছেয় কর্ম্ম, জান ভায়া, মালিকবিহীন জিনিষ যখন যা ইচ্ছে, তাই করেন। ওঁর আর দার্জ্জিলিঙ্গ ভাল লাগছে না। আর কি জান, ভাবনা ত নেই, দিদির যখন এমন দাসানুদাস রয়েছে যে, হাকিম নড়ে, তবু ওঁদের হুকুম নড়লেই মহা অনর্থ। জানই ত গৃহিণীর বোন্—সুতরাং গিন্নীর চেয়ে—"

শান্তি কহিল, "সকল সময়ই কি তোমার রঙ্গ।" এমন সময় এক মুখ হাসি লইয়া আসিয়া সীতা ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিল, "আমার পিছনে আবার লাগলেন কেন, রায় মশাই, এ অভ্যেসগুলো এবার ত্যাগ করুন না।"

"কি জানিস, ভাই, তোর পিছনে না লাগলে আমার দিনটাই বৃথা মনে হয়। এখন তুই যদি একটা গান করিস, তা হ'লে আর তোর পিছনে লাগব না। আবার কবে আসছিস, বল্ দেখি?"

সীতা ঈষৎ হাসিয়া ভগিনীপতির দিকে চাহিয়া বলিল,—"তা কেমন ক'রে বলবো বলুন, তারা ছেড়ে না দিলে কি ক'রে আসবো। আপনিই ত যত নষ্টের গোড়া।"

"তা ত বলবিই এখন—যাক, তুই এখন গান শোনা।"

সীতা এস্রাজ লইয়া গাহিতে বসিল—

"দুজনে দেখা হলো মধু যামিনীরে,
কোন কথা কহিল না চলিয়া গেল ধীরে—
নিকুঞ্জে দখিণা-বায় করিছে হায় হায়,
লতা-পাতা হেলে দুলে ডাকিছে ফিরে ফিরে।"

এমন সময় রঘুপতির চাকর আসিয়া একখানি টেলিগ্রাম দিল, সে উৎকণ্ঠিতভাবে খুলিয়া পড়িল। সীতা তখন গান বন্ধ করিল। টেলিগ্রামে লিখিত ছিল, —"আমি বৌমাকে লইয়া অদ্য যাত্রা করিতেছি, তুমি ষ্টেশনে আসিবে।—পিতা।"

হঠাৎ তাহার জগৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, বাসন্তী পূর্ণিমা মেঘের আড়ালে ঢাকিয়া গেল, কে যেন দারুণ আঘাতে তাহার সমস্ত সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিল। কি একটা অজ্ঞাত ব্যথায় রঘুপতির সমস্ত অন্তরিন্দ্রিয়গুলা যেন সাড়হীন জড়পদার্থে পরিণত হইয়া গেল, অসহ্য যন্ত্রণায় হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া যেন রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, সে ভূতগ্রস্ত রোগীর মত নীরবে বসিয়া রহিল।

তাহাকে তদবস্থায় বহুক্ষণ থাকিতে দেখিয়া সুশীলবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "সব ভাল ত? তুমি অমন হয়ে গেলে কেন?" অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে রঘুপতি কহিল, "না, কিছু না।" সুশীলবাবু কহিলেন, "তাই ভাল।" এই বলিয়া তিনি টেলিগ্রামখানি পড়িয়াই আশ্চর্য্যান্বিতভাবে পুনরায় কহিলেন, "এ কি! আপনি বিবাহিত?—তবে সে দিন—" তাঁহার মুখের কথা না ফুরাইতেই রঘুপতি ক্ষুব্ধকণ্ঠে

কহিল, "বিয়ে করিনি, এ কথা ত আপনাকে সে দিন বলিনি, তবে সে অনেক কথা—" সে আর কিছু বলিল না দেখিয়া সুশীলবাবু জিজ্ঞাসা করা অনুচিত বোধে পত্নীর দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"রঘুপতির বাবা আর স্ত্রী আসছেন, এখানে খাওয়ার যোগাড় ক'রো; নূতন আসছেন। আমিও সীতাকে পৌঁছে দিয়ে ওঁদের গাড়ীতেই ফিরে আসবো। তবে চেনাচিনি এখানে এসে হবে। ত' সীতা তুই কালকের দিনটা থেকে যা না?"

অবনত বদনে শান্তি কহিল, "সে কি ক'রে হয়, ওঁরা অপেক্ষা ক'রে থাকবেন, চিঠি দেওয়া হয়েছে।"

"তবে আর কি হবে, তুই গানটা শেষ কর্। ঐ গানটা বড় সুন্দর।"

সীতা গাহিল—

> "দুজনের আঁখিবারি গোপনে গেল ঝ'রে,
> দুজনের প্রাণের কথা প্রাণেতে গেল ম'রে,
> আর ত হ'ল না দেখা, জগতে দোঁহে একা,
> চিরদিন ছাড়াছাড়ি যমুনাতীরে ॥"

সীতা একান্ত মন-প্রাণ দিয়া যখন এই গানটি গাহিয়া শেষ করিল, তখন গৃহস্থিত শ্রোতৃগণের কেহই চক্ষুর জল সংবরণ করিতে পারিল না।

## কুসুম

রাত্রিতে গৃহে ফিরিয়া রঘুপতি কিছুই আহার করিবে না বলিয়া শয্যায় আশ্রয় লইল। কিন্তু নিদ্রাদেবী তাহাকে একবারেই ত্যাগ করিয়া গেলেন।

অন্ধকারের আশ্রয়ে বিছানায় শুইয়া আজ কেবলই সীতার উজ্জ্বল মুখখানি তাহার হৃদয়ে ফুটিয়া উঠিতেছিল, তাহার সুকোমল দেহের মধুর স্পর্শ সে যেন এখন নিজের বক্ষে অনুভব করিতেছিল। ভাবিতেছিল, সে-ও কি তাহাকে ভালবাসে? আমারই মত সে-ও কি বিপুল বেদনায় জর্জ্জরিতা হইয়া অপ্রাপ্তির দারুণ যন্ত্রণায় পলে পলে মৃত্যুকে আহ্বান করিয়া থাকে? হয় ত হইতে পারে, সে ভাবে কি না, তাহা কে বলিতে পারে? নির্জ্জন পাহাড়ের উপরে জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিস্থলে সেই সুগভীর কৃতজ্ঞতা-ভরা বিশাল ভ্রমরকৃষ্ণ নয়ন দুইটি যখন নিমেষের জন্য অবাক্ হইয়া গিয়াছিল, তখন সীতার নয়ন দুইটি তারহীন তাড়িতবার্ত্তায় কি ভাষা প্রকাশ করিয়াছিল—শুধু সে কি প্রাণদাতার প্রতি প্রাণের গভীর কৃতজ্ঞতা? না, তাই কি? সে যেন ক্রমশঃ অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিল।

সে ভাবিতে লাগিল, এই কি জগতের সনাতন রীতি? আরাধিতা প্রার্থিতা প্রিয়জনকে পাইবার জন্য বাসনা যখন শতধারায় হৃদয়ের অভ্যন্তর পরিপূর্ণ করিয়া তুলে, অনির্ব্বাণ আকাঙ্ক্ষার দাবাগ্নিতে প্রাণ-মন যখন জ্বলিতে পুড়িতে থাকে, কাম্য কি তখন এমনই করিয়া দূরে সরিয়া যায়? অশ্রুর উৎস কোথায় লুকায়িত ছিল, আজ আর সে বাধা মানিল না। অবিরল অশ্রুধারায় তাহার উপধান সিক্ত হইয়া গেল, দেহ অবসন্ন হইয়া পড়িল; সে যেন অনুভবের শক্তি হারাইয়া ফেলিল।

কবে কোন্ দিনে কোন্ শুভ কি অশুভক্ষণে তাহার হৃদয়খানি যে সে কখন্ সীতার হৃদয়ের সঙ্গে একই সূত্রে বাঁধিয়া দিয়াছিল, তাহা ত সে বুঝিতে পারে নাই। নিমেষের দৃষ্টিপাতে তাহার মানসী মূর্ত্তি তাহার অন্তরের গভীরতম প্রদেশে কোন্ সুদক্ষ শিল্পী কখন্ অঙ্কন করিয়াছিল যে, সেই ক্ষণিকের দৃষ্টিপাতেই তাহার হৃদয়কুঞ্জের অস্ফুটন্ত ফুলগুলি নিমেষমধ্যেই ফুটিয়া উঠিয়া ব্যর্থ জীবনের নিবেদিত অর্ঘ মুহূর্ত্তেই সার্থক করিয়া তুলিয়াছিল। সীতাকে সে ভুলিতে পারিবে না, চিরদিন ধরিয়া অন্তরের অন্তস্তলে অন্ধকারের গভীর গহ্বরে—এ স্মৃতি সে—গোপন করিয়া রাখিবে—এ আরাধনায়—যদি কিছু দোষ থাকে, সে তাহা সানন্দে গ্রহণ করিবে।

ব্যর্থ হৃদয়ের গভীর ভালবাসা দান করিবার জন্য সে যখন একান্তই উন্মত্ত হইয়াছিল, তখন কে জানিত যে, তাহার তাসের ঘর একই ফুৎকারে ভাঙ্গিয়া পড়িবে! চিরদিনের মত এক অপরিসীম অজেয় দুর্লঙ্ঘ্য বাধা তাহাকে আবহমানকাল তৃষ্ণার্ত্তই করিয়া রাখিবে। হৃদয়ের এই দুর্জ্জয় উন্মত্ত আবেগকে সে যতই বাধা প্রদান করিতেছিল, ততই তাহার উপলরুদ্ধ প্রবল স্রোতোবেগ তাহার সমস্ত বাধাকে ক্রমশঃই পরাক্রান্ত করিয়া তুলিতেছিল। তরুণ জীবনের আকুল বাসনা ত সে মুহূর্ত্তেই হৃদয়ের গভীর গহ্বরে লুকায়িত করিয়া রাখিয়া দিয়াছিল, যাহাকে দুর্লভ জানিয়াও মৌন সাধকের মত সে নীরব পূজায় দিন-রাত্রি অতিবাহিত করিতেছিল, বাসনার উন্মত্ত আবেগের সহিত যে অবিরত যুদ্ধ করিয়া নিজেকে পরাস্ত বোধ করিতেছিল,

আজ সেই সুপ্ত—নিদ্রিত চিত্তবৃত্তিগুলাকে আবার এমন করিয়া জাগরিত করিয়া দিল—সে কে?

দীর্ঘ দিবসের পরে একান্ত প্রতীক্ষিত সাক্ষাৎ, এ কি—অসময়ে উপস্থিত হইল? নিয়তির এ কি নির্ম্মম পরিহাস—অদৃষ্টের এ কি নিষ্ঠুর-খেলা?

সারারাত্রি চিন্তার অসহ্য দংশন সহ্য করিয়াও প্রতীকারের কোন উপায়ই সে খুঁজিয়া পাইল না। কেবলই তাহার মনে হইতে লাগিল—কোন উপায়ই নাই—সে অন্যাসক্তা—সীতার চিন্তা সে কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারিবে না। আজ দুই দিন হইল, সে মাধুরী লইয়া—কেহই তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায় নাই। কিন্তু প্রাণ-মন যেন সর্ব্বদাই তাহার দীপ্তিতে ভরিয়া আছে। তাহার স্ত্রী আসিলে সে সকল কথা বলিয়া এ দেশ ত্যাগ করিয়া যাইবে।

পরদিন বৈকালে দার্জ্জিলিং মেলে রঘুপতির পিতা ও স্ত্রী আসিয়া পৌঁছিল। সুশীলবাবু ষ্টেশনেই ছিলেন। তিনি সেখান হইতেই রঘুপতির পিতাকে ও স্ত্রীকে লইয়া সাদরে নিজের গৃহে লইয়া আসিলেন।

রাত্রিতে আহারাদির পর শান্তি রঘুপতিকে বলিল, "আপনি আজ এ বাড়ীতে শোবেন।" তাহার পর সুশীলবাবুর দিকে মুখ ফিরাইয়া হাস্যোজ্জ্বলবদনে কহিল, "শুনছ গা, রঘুবাবুকে ঘরে দিয়ে এস, দেখো যেন, না পালান।"

বিদ্রূপপূর্ণকণ্ঠে সুশীলবাবু কহিলেন, "কেন হে, লজ্জা কচ্ছে না কি? বটে-বটে—তা হয়—সময় সময় হয়, অনেক দিন হলো কি না। তা যাই হোক, আজ এই আনন্দের দিনে মুখ এত ভার কেন হে ভায়া? ওঃ, বুঝেছি, আজকে ঐ রকমই লোককে দেখাতে হয়।"

ম্লানহাস্যের সহিত রঘুপতি কহিল, "আপনার সঙ্গে ত কথায় কেউ পারবে না।"

"এক জন আমার সঙ্গে পারে, কিন্তু সে আজ গরহাজির। এমন দিনে তার অভাবটা বড্ড বেশী মনে লাগছে।"

শান্তি কহিল, "এখন তর্ক রাখ। তোমার ঐ সব বকামীর জন্তেই আজ রঘুবাবুর বিছানা এখানে ক'রে দিয়েছি। বাবা রাত্রি জেগে এসেছেন, তোমার ত বড়

সুশীলবাবু আর কিছু না বলিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

দুর্ব্বল ও অবসন্ন মন লইয়া রঘুপতি ধীরে ধীরে ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। গৃহটি গভীর অন্ধকার, কাচের জানালায় কাল বনাতের পর্দ্দা দিয়া ঘরটির অন্ধকার আরও গভীর করিয়া তুলিয়াছে। অন্ধকারে প্রতি পদক্ষেপে পদস্খলনের আশঙ্কা প্রবল থাকিলেও সে ইচ্ছা করিয়া আলো জ্বালিল না। যাহাকে এত দিন সে ইচ্ছা সত্ত্বেও দেখিতে পায় নাই, আজ এই চিরবিদায়ের শেষ মুহূর্ত্তে বিরহ ও মিলনের পথে ইহাকে না দেখাই ভাল।

এই রিক্তা সর্ব্বহারা স্ত্রীর ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তাহার প্রাণ যে কাঁদিয়া না উঠিল, এমন নহে। চিরদিনের পরিত্যক্তা এই পত্নী যে কোন্ অশুভক্ষণে ধরণীতে প্রথম মৃত্তিকাস্পর্শ করিয়াছিল, তাহা যদি সে একবার বিচার করিয়া দেখিতে পারিত, বহুদিনের আরাধনায় সাধনার সিদ্ধিটুকু লইয়া সে আজ কত আশা-আকাঙ্ক্ষায় হৃদয় ভরাইয়া স্বামি-সকাশে তাহার পূজার অর্ঘ্য লইয়া নিবেদন করিতে আসিয়াছে, সেই স্থানে সেই জনের নিকট হইতে সেই অর্ঘ্য যে পুনরায় তাহার নিকট ফিরিয়া আসিবে, তাহা এ জানে না। কে এ অঘটনের কর্ত্তা? চিরদিনের তরে চির-অদৃশ্য লোকে থাকিয়া উপায়হীন নরনারীকে কি তিনি চিরদিনই এমনই নির্য্যাতন করিবেন? এমন সুন্দর ধরণীতে এত অকরুণ বেদনা—জ্বালা কোন্ নাগিনীর মুখ হইতে কোন্ বিষাধার জগতের ধূলিকণাকে বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে? চিরদিনই কি দুঃখী জন জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিবে—এর নির্ব্বাণ আছে কি না, কে জানে?

তাহার পর সে ধীরে ধীরে খাটের পার্শ্বে অগ্রসর হইয়া দেখিল, তাহার স্ত্রী বসিয়া আছে। সে তখন সমস্ত দ্বিধা, সঙ্কোচ, লজ্জা ত্যাগ করিয়া কম্পিতকণ্ঠে কহিল, "একটা কথা তোমায় বলি, তুমি স্থির হয়ে শোন। এ ঘরে তোমার স্থান পাবার আশাই ছিল না। জানি না, ভগবান্—কি মানুষের দয়ায় তুমি যখন এসেছ, তখন আশীর্ব্বাদ করছি, এ গৃহে তোমার স্থান চিরপ্রতিষ্ঠিত হ'ক। কিন্তু—কিন্তু—আমি তোমার—অযোগ্য—আ—মা—য়—বি—দায়—দাও।"

অপরাধ? আপনি কি আমায় আবার—ত্যা—গ—করছেন?"

রঘুপতি চমকিয়া উঠিল। এ কণ্ঠস্বর কি স্বাভাবিক? এত কর্কশ কণ্ঠ সে কোন নারীতে শুনে নাই।

হতাশভরা কণ্ঠে রঘুপতি কহিল, "তা জানতে চেয়ো না, শুনলে দুঃখ বাড়বে বৈ কমবে না। আমি চ'লে যাবার পর তুমি সমস্তই হয় ত বুঝতে পারবে, তখ—ন—আমার—অবস্থা—বুঝে—পা—রো—ত আমায় ক্ষমা ক'রো—।"

রুদ্ধকণ্ঠে বিকৃতস্বরে কিশোরী কহিল, "তবে একটু অপেক্ষা করুন। জীবনে আমার—যে সৌভাগ্য হয় নি, আজ—আজ—যদি—সে—দিন—পেয়েছি—তবে—একটু—পায়ের—" বাকীটুকু সে আর বলিতে পারিল না, ইলেক্‌ট্রিকের তীব্র আলোকে ঘর উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। মুক্ত অবগুণ্ঠন টানিয়া দিতে যাইতেই রঘুপতি বিস্মিতভাবে কহিল, "সীতা—তু—মি—"

এক মুখ হাসি লইয়া আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে সীতা কহিল,—"হাঁ, আমি তোমার নির্ব্বাসিতা সীতা।" আর বলিতে হইল না, অন্তরাল হইতে সুশীলবাবু এক রাশ ফুল লইয়া তাহাদের অঙ্গে ও বিছানায় ছড়াইয়া দিয়া কহিলেন, "ভায়া, এ শুভ মিলনের ঘটকালিটা আমারই প্রাপ্য। নাম জাল কল্লেও, আমার চোখদুটাকে তুমি ফাঁকি দিতে পার নাই। কাল সব বলবো এখন।" এই বলিয়া তিনি দুয়ার বন্ধ করিয়া দিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

বহু দিনের কাঙ্ক্ষিত প্রিয়তমাকে তখন রঘুপতি ব্যাকুল বাহুবেষ্টনে নিজের বক্ষের মধ্যে টানিয়া লইল।

শ্রীমতী কাঞ্চনমালা দেবী

---

# মনুষ্যগর্ভে ব্যাঘ্রশাবক

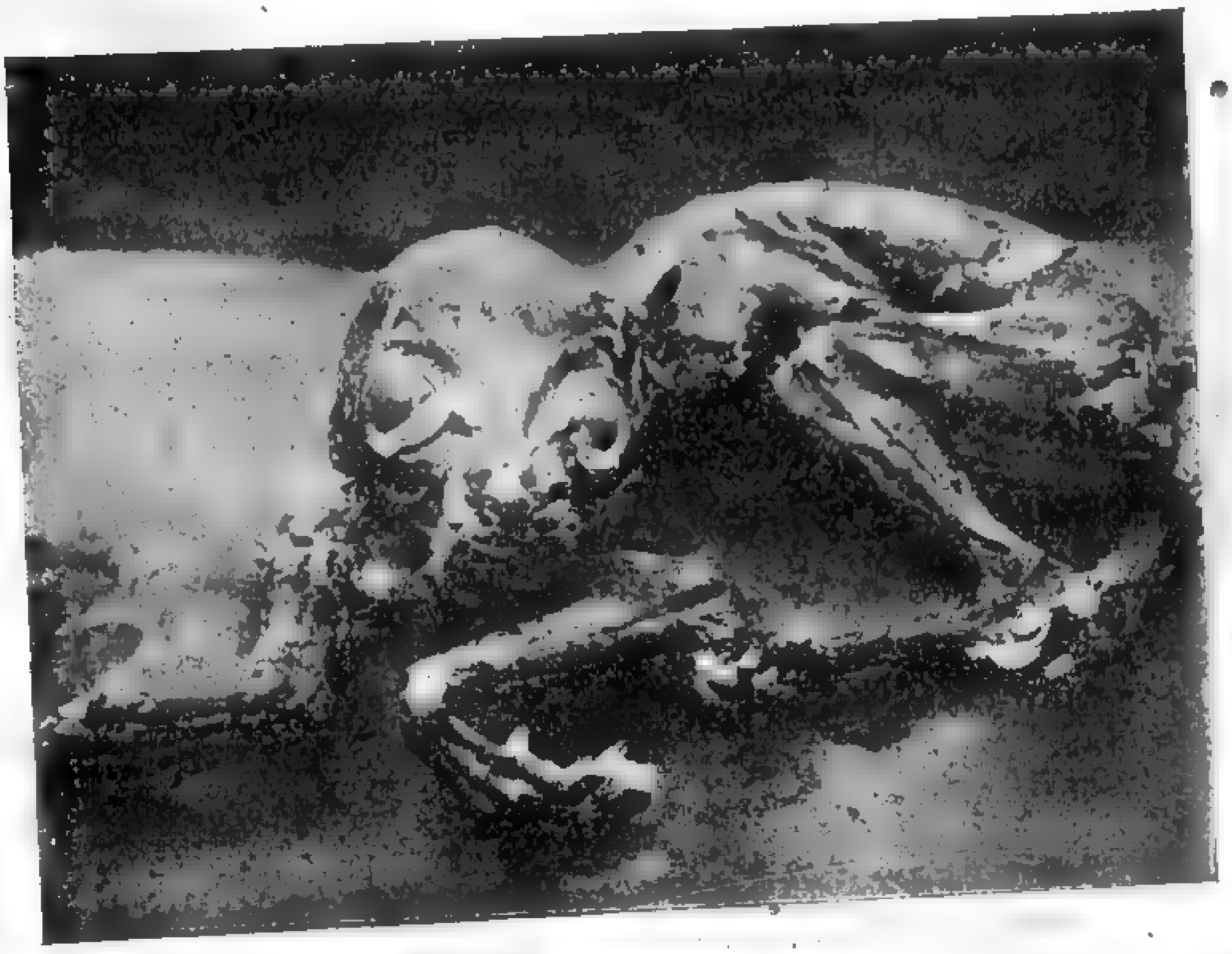

নোয়াখালি জিলার অন্তর্গত সাহাপুর পোষ্ট আপিসের অধিকারভুক্ত করটসিল গ্রামে কোনও ভদ্রপরিবারে মৃতাবস্থায় একটি অপূর্ব্ব জীব প্রসূত হইয়াছিল। ইহার চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ, দন্ত, নখ প্রভৃতি সমস্ত অবয়বই ব্যাঘ্রের ন্যায়। ইহার দৈর্ঘ্য ১২ ইঞ্চ। স্থানীয় মোসলেম ফার্ম্মেসীতে শবদেহ বৈজ্ঞানিক উপায়ে রক্ষিত আছে। প্রায় দেড় মাস পরে আলোক-চিত্র গৃহীত হওয়ায়, শবের মুখমণ্ডল একটু বিকৃত দেখাইতেছে।

# শিক্ষার দান

## ১

"উমা, মা !"

"আমায় ডাক্‌ছেন, বাবা ?"

অষ্টাদশবর্ষীয়া তরুণী ধীর মন্থরপদে পিতার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ঘর-জোড়া ফরাস পাতা শয্যার উপর তাকিয়া হেলান দিয়া রমানাথবাবু আলবোলায় ধূমপান করিতেছিলেন।

স্মিতাননা কন্যাকে দেখিয়া পিতা বলিলেন, "তোমার পরীক্ষার খবর শুনেছ, মা ?"

নত নেত্রে উমা গ্রীবা হেলাইয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "দাদার পত্রে শুনেছি।"

রমানাথবাবু কন্যাকে কাছে ডাকিয়া প্রফুল্ল কণ্ঠে বলিলেন, "তোমার সাফল্যে আমি আনন্দিত। আই, এ, পরীক্ষায় তোমার ফল যে ভাল হবে, সে বিশ্বাস আমার ছিল; তার জন্য নয়। তুমি বোধ হয় এখনও জান না যে, বঙ্কিমচন্দ্র রৌপ্যপদক এবার তুমিই পাবে। বাঙ্গালার প্রধান পরীক্ষক যিনি, তিনি আমার সহপাঠী ও বাল্যবন্ধু। তিনি লিখেছেন, তোমার মত বেশী নম্বর আর কেউ পায় নি।"

উমা পিতার নগ্ন পৃষ্ঠদেশে ঘামাচির সন্ধানে মনোনিবেশ করিল।

ছুটীর দিনে, দিবা দ্বিপ্রহরে পিতাপুত্রীর আলাপে বিঘ্ন ঘটিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। তাই নিঃসঙ্কোচে কন্যা পিতার বৈঠকখানা-ঘরে আসিয়াছিল। ব্যবহারাজীবের কার্য্যে রমানাথবাবু সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিতেন। জিলা-কোর্টে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ ছিল না। এ জন্য অন্য দিন অবকাশ তাঁহার অল্পই থাকিত। তাই ছুটীর দিন তিনি বাহিরের কোন কায করিতেন না। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতির সহিত বিশ্রম্ভালাপে সময় কাটাইতেন। উমা দ্বিপ্রহরে পিতার কাছে বসিয়া তাঁহার নিকট হইতে দেশ-বিদেশের নানা গল্প শুনিত, তাঁহার ভাগবতপাঠের সেই প্রধান শ্রোতা।

কন্যার দিকে মুখ ফিরাইয়া রমানাথবাবু বলিলেন, "বাঙ্গালা পরীক্ষায় তুমি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার ক'রে বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের স্মৃতি-পূজার পুরস্কার লাভ করবার যোগ্য হয়েছ, এর চেয়ে আনন্দ আমার আর বেশী কিছু হ'তে পারে না।"

মৃদু হাসিয়া উমা বলিল,—"বাবা, আপনি বঙ্কিমচন্দ্রকে বড় ভালবাসেন বুঝি ?"

"হ্যাঁ মা, আমি তাঁর বড় ভক্ত। আমাদের হিন্দুর আদর্শ তিনি যেমন ক'রে সাহিত্যের নানা দিক্ দিয়ে দেখিয়ে গেছেন, কেউ তা পারে নি। হতভাগা বাঙ্গালী জাতটাকে তিনি অনেক পুণ্যকথা নূতন ক'রে শুনিয়ে গেছেন। আমার কাছে তাঁর চেয়ে বড় লেখক আর কেউ নেই।"

উমা পিতার মনের গতির সহিত পরিচিত ছিল। আধুনিক জগতের বিভিন্ন মতবাদের সহিত রমানাথবাবু যে ঘনিষ্ঠ সংস্রব রাখিতেন এবং প্রাচীন যুগের মতবাদেরও যে তিনি বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন, ভক্ত ছিলেন, ইহা তাঁহার পরিবারস্থ সকলেই ভালরূপ অবগত ছিল। তাঁহার পুত্র, কন্যা, স্ত্রী প্রভৃতি সকলেরই স্বাধীনভাবে যে কোন বিষয়ের সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিবার অধিকার ছিল, তাহাতে কখনও তিনি বাধা দিতেন না। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই, সকলেরই উপর যেন তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাব অনুভূত হইত। কাহাকেও তিনি জোর করিয়া কোনও কিছু করিতে বলিতেন না। অথচ প্রত্যেকেই যেন তাঁহার গোপন অভিপ্রায় বুঝিয়া লইয়া ঠিক তাঁহারই মনোমত কার্য্য সম্পাদন করিত। স্বাধীনতা সত্ত্বেও কেহ স্বেচ্ছাচারিতার আশ্রয় গ্রহণ করিত না। তাঁহারই চিন্তার ধারা অলক্ষ্যভাবে প্রত্যেকেরই জীবনে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, অথচ কেহ তাহা উপলব্ধি করিতেও পারিত না।

কন্যার মস্তকে সস্নেহে হস্তাবমর্ষণ করিতে করিতে রমানাথবাবু বলিলেন, "আশীর্ব্বাদ করি, তুমি বাঙ্গালার মেয়ে যেন হ'তে পার।"

এমন সময় গৃহিণী পানের বাটা হাতে করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। স্বামীকে গোটাকয়েক পান

দিয়া ফরাসের এক প্রান্তে বসিয়া বলিলেন, "দাদার চিঠির জবাব দিয়েছ?"

রমানাথবাবু আলবোলার নলটা পুনরায় তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "তাকে লিখে দিয়েছি, তুমি ও উমা মা আস্‌ছে রবিবার কল্‌কাতায় রওনা হবে।"

উমা বলিল,"আমি ও মা দুজনেই চ'লে গেলে আপনার কষ্ট হবে যে, বাবা!"

প্রসন্ন হাস্যে প্রৌঢ় রমানাথ বলিলেন, "কোন কষ্ট হবে না, মা! বড় বৌ-মা, মেজ বৌ-মা দুজনকেই তোমার গর্ভধারিণী যে রকম ক'রে তৈরী ক'রে তুলেছেন, তাতে তোমার বুড়ো বাবার কষ্ট হবার যো কি।"

দ্বারের কাছে চুড়ীর রিণিরিণি শুনা গেল। পরক্ষণেই মন্থর গতিতে পুত্রবধূযুগল ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া শ্বশ্রূঠাকুরাণীর পার্শ্বে উপবেশন করিল। ছুটীর দিন আপনা হইতেই সকলে আহারাদির পর রমানাথবাবুর কাছে আসিয়া বসিত। তিনি কোনও দিন এইরূপ আদেশ কাহাকেও করেন নাই। কিন্তু তাঁহার মনের গতি বুঝিয়া অকুণ্ঠিতভাবে তাঁহার অবসরসময়ে সকলে তাঁহার কাছে আসিয়া বসিত।

"আমার দাদাভাই কই, মা লক্ষ্মি?"

জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ মৃদুগুঞ্জনে বলিল, "সে আস্‌ছে।"

### ২

কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হইতে প্রশংসার সহিত এম্ বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ধরণীনাথ মাতাকে বন্ধুর দ্বারা জানাইয়া দিল, বিবাহে এখন তাহার বেশ মত আছে, তবে মেয়ে সে স্বয়ং দেখিয়া পছন্দ করিবে। পল্লীগ্রাম হইতে একটা অশিক্ষিতা বা অর্দ্ধ-শিক্ষিতা মেয়ে আনিয়া তাহার ঘাড়ে চাপাইলে চলিবে না। সে চাহে—হাল ফ্যাসানে সুশিক্ষিতা মার্জ্জিতরুচি ভব্যা জীবনসঙ্গিনী। তথাকথিত লজ্জাশীলা বঙ্গবধূ লইয়া সে জীবনযাত্রার দীর্ঘ পথ অতিবাহিত করিতে রাজী নহে।

বুদ্ধিমতী মাতা পুত্রের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিলেন না। নাবালক পুত্রকে লইয়া স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণে তাঁহাকে ধৈর্য্য ও বুদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় দিতে হইয়াছিল। অসহায় দেখিয়া প্রবল পক্ষ নানারূপে তাঁহাকে বিপন্ন করিতেও চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু অসীম সহিষ্ণুতা এবং সবিশেষ বুদ্ধি-কৌশলের সাহায্যে তিনি সকলকেই পরাজিত করিয়া স্বামীর সম্পত্তি ও অর্থ রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। তবে স্বামীর স্মৃতিবিজড়িত, শ্বশুরালয়ের পবিত্র তীর্থ ছাড়িয়া পুত্রের শিক্ষার জন্য তাঁহাকে কলিকাতায় থাকিতে হইত। এ জন্য তাঁহার মনে গভীর ক্ষোভ ছিল, তবে পুত্রের কল্যাণের জন্য সে দুঃখও তিনি সহ্য করিয়াছিলেন। এখন পুত্র কৃতবিদ্য হইয়া বাহির হইয়াছে, সে যদি ইচ্ছামত পত্নী মনোনয়ন করে, তাহাতে দুঃখের কথা কি আছে? মনের কোনও প্রান্তে একটা কাঁটা খচ্‌খচ্ করিলেও তিনি প্রসন্নমনে পুত্রকে স্বয়ং মেয়ে দেখিবার অনুমতি দিলেন।

ধরণী সন্ধান লইয়া জানিয়াছিল, হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল ভবানীবাবুর একটি ভাগিনেয়ী এবার আই, এ পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছে। কন্যার পিতাও মফঃস্বল কোর্টের খ্যাতনামা ব্যবহারাজীব। ভবানীবাবুর একপুত্রের সহিত সে বি, এস, সি ক্লাসে পড়িয়াছিল। সে জানিত, আভিজাত্য-মর্য্যাদা ও অর্থ-সম্পদে ভবানীবাবু কলিকাতার সমাজে গণনীয় ব্যক্তি। সামাজিক হিসাবে তাঁহার ভাগিনেয়ীর সহিত তাহার বিবাহে কোন প্রতিবন্ধক ঘটিতে পারে না। বিশেষতঃ সে যাহা চাহে, ভবানীবাবুর ভাগিনেয়ীকে বিবাহ করিলে তাহা হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে না।

ধরণীনাথের মত সুপাত্র—রূপ, গুণ, কুলশীল এবং অর্থসম্পদ সকল বিষয়েই প্রার্থনীয় এই যুবকটিকে ভবানীবাবু সমাদরেই অভ্যর্থনা করিয়া কন্যা দেখাইলেন। বন্ধুসহ ধরণীনাথ উমাকে দেখিতে আসিয়াছিল।

সঙ্কোচবিরহিতা অথচ আত্মস্থা এই বিদুষী সুন্দরী তরুণীকে দেখিয়া ধরণীর চিত্ত পলকিত হইল। কলিকাতার আবহাওয়া অনুসারে পাশ্চাত্য রুচিপ্রিয় ভবানীবাবু তাহাকে এমন ভাবে সাজাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে, ধরণীনাথ এই পল্লীসহরবাসিনী তরুণীর মধ্যে বাহিরের দিক্ দিয়া অমনোনীত করিবার মত কিছুই খুঁজিয়া পাইল না। বরং, গোপন করিবার সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও তাহার ব্যবহারে এমন ভাব সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল যে, কন্যাপক্ষ তাহাতে বিস্ময়ান্বিত হইলেন।

ধরণী শুনিয়াছিল, দ্বাদশ বৎসর বয়সে উমার কণ্ঠসঙ্গীত 'রেকর্ডে' উঠিয়াছিল; সেই রেকর্ডের গান, বিবাহ সম্বন্ধ হইবার বহুপূর্ব্বে সে কতবার শুনিয়াছে। সুতরাং ইচ্ছা থাকিলেও বালিকার তরলকণ্ঠ তরুণীর আবেগময় ব্যঞ্জনায় কি ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা জানিবার আগ্রহ প্রবল হইয়া উঠিলেও, সে গান শুনিবার প্রস্তাব উপস্থাপিত করিতে পারিল না। ভবানীবাবুর সম্মুখে ততখানি প্রগল্‌ভতা প্রকাশ করা সে সমীচীন মনে করে নাই। উমার সূচিশিল্প এবং রেখাচিত্র কয়েকখানি কন্যাপক্ষ দেখাইলেন। ধরণী বুঝিল, তাহার ভবিষ্যজীবন সমুজ্জ্বল।

কথাবার্ত্তা পাকা হইয়া গেল; কিন্তু বিবাহ কলিকাতায় হইবে না, রমানাথবাবু দেশে নিজের বাড়ীতে বসিয়াই সম্প্রদান করিবেন। তাঁহার সঙ্কল্প অচল, অটল। প্রথমতঃ কিছু আপত্তি করিলেও পরিশেষে ধরণীনাথকে সে প্রস্তাবে সম্মতি দিতে হইল।

### ৩

বিবাহ করিয়া ধরণীনাথ আশাতীত সুখী হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু মামাশ্বশুর ভবানীবাবুর চালচলন বাহির হইতে দেখিয়া তাহার শ্বশুরালয় সম্বন্ধে সে যেরূপ কল্পনা করিয়াছিল, বার কয়েক তথায় যাইবার পর সে ধারণা তাহাকে বহুলাংশে বর্জ্জন করিতে হইয়াছিল।

রমানাথবাবুর সহিত জিলার শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের মিলামিশা - ঘনিষ্ঠতা যেমন ভাবে ছিল, দেশের ধনী নির্ধন—সকল শ্রেণীর সকল লোকের সহিত তাঁহার আত্মীয়তার তেমনই সুদৃঢ় বন্ধন ছিল। তিনি য়ুরোপীয় বন্ধুবান্ধবদিগকে উপযুক্ত প্রথা বা প্রণালীতে অভিনন্দিত বা অভ্যর্থিত করিলেও,উহা তাঁহার শুদ্ধান্তঃপুরের প্রাচীরসীমা পার হইতে পারিত না। প্রাচ্যের যাহা কিছু সবই মন্দ এবং প্রতীচ্যের সবই ভাল, ইহা তিনি বিশ্বাস করিতেন না। বরং প্রাচ্যের বহু বিষয়েই তাঁহার শ্রদ্ধা ও একান্ত অনুরাগ ছিল।

ধরণীনাথ শ্বশুরালয়ের প্রত্যেকেরই আচার-ব্যবহারে প্রাচ্যভাবের প্রভাব দেখিয়া অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল, সে বিংশ শতাব্দীর প্রতীচ্য মনোবৃত্তির অনুরাগী ছিল। কিন্তু সুপণ্ডিত শ্বশুর এবং শ্যালকদিগের মধ্যে উদারতা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে থাকিলেও প্রত্যেকেরই আচার-ব্যবহারে, নিষ্ঠা ও সংযম যে ভাবে আত্মপ্রকাশ করিত, তাহাতে সে অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছিল। বিজ্ঞানের তরুণ অধ্যাপক এবং রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ বৃত্তিধারী যুবকদিগের মধ্যে এরূপ দুর্ব্বলতা সে আদৌ প্রত্যাশা করে নাই।

উমাও যদি ঐরূপ আচারপরায়ণা এবং প্রাচ্যানুরাগিণী হয়, তাহা হইলেই ত ঘোর বিপদ! সে স্ত্রীকে লইয়া যে ভাবে জীবনপথে চলিবে বলিয়া কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা করিতে না পারিলে তাহার দাম্পত্য-জীবনই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। সুতরাং পত্নীকে পিত্রালয়ের প্রভাব হইতে সযত্নে দূরে রাখিয়া মনোমতভাবে গড়িয়া তুলিবার জন্য সে চেষ্টা করিতে লাগিল।

তাহার বিবাহিত বন্ধুগণ খোলা মোটরে স্ত্রীকে লইয়া কেমন আনন্দে বায়ুসেবন করিয়া বেড়ায়, বক্সে বসিয়া থিয়েটার-বায়স্কোপ দেখে! প্রমোদ-উদ্যানে অসঙ্কোচে হাত ধরাধরি করিয়া বেড়াইয়া অপরাহ্নের স্নিগ্ধ শোভা, নিশীথ রজনীর মাধুর্য্য উপভোগ করিয়া থাকে! বন্ধু-বান্ধবের সহিত স্ত্রী যদি আলাপ-পরিচয় না করিল, আদর-অভ্যর্থনা করিয়া তাহাদিগকে প্রীতিমুগ্ধ করিতে না পারিল, তাহা হইলে সুখ কোথায়? সে ডাক্তারী শাস্ত্র অধ্যয়নের অবকাশে বহু প্রাচ্য ও প্রতীচ্য গল্প—উপন্যাস,নাটক পড়িয়াছিল। প্রতীচ্য ভাবধারা তাহার তরুণ মনকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল যে, সে বিদেশীয় যাহা কিছু, সবই অনুকরণীয় বলিয়া মনে করিত; কলিকাতার বর্ত্তমান আবহাওয়ার মধ্যে বাস করিয়া প্রতীচ্য প্রথানুরাগী এবং য়ুরোপীয় ভাবানুকারী বন্ধুদিগের সাহচর্য্যে তাহার ভিতরের মানুষটি এমন অনুকরণপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছিল যে, সুবিধা পাইলেই সে আপনাকে সেই প্রণালীতেই পরিচালিত করিত। তবে নিষ্ঠাপরায়ণা স্নেহময়ী জননীর মনে আঘাত দিবার আশঙ্কায় সে আপনার মনের গতিকে সংযত করিয়া রাখিত।

বিবাহের পর তাহার মনের সাধগুলিকে সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য সে ব্যগ্র হইয়া উঠিল। হ্যারিসন রোডে সে ডিস্‌পেন্‌সারী খুলিয়া চিকিৎসা-ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিল সত্য; কিন্তু অর্থোপার্জ্জনের দিকে তেমন মন দিতে পারিল না। প্রয়োজনও ছিল না। স্বচ্ছন্দজীবনযাত্রার পাথেয়

তাহার পর্য্যাপ্তই ছিল। কাযেই সে বিবাহিত জীবনের পরিপূর্ণ মাধুর্য্যটুকু উপভোগের জন্য প্রায় সকল সময়েই ব্যস্ত থাকিত।

অল্পদিনের মধ্যেই সে বুঝিতে পারিল, তাহার আশঙ্কা অমূলক। হিন্দুনারী স্বামীকে সুখী করিবার জন্য তাহার আজন্মের সংস্কার অনায়াসে না হউক, স্বল্পায়াসেই ত্যাগ করিতে পারে। সে দেখিল, তাহার মনের অভিপ্রায় উমার কাছে প্রকাশ করিবার পর হইতেই স্বল্পভাষিণী তরুণী অকুণ্ঠিতভাবে স্বামীর মনোমত কার্য্যগুলি তাহারই অভিপ্রায়ানুরূপে পালন করিতে লাগিল—কোনও প্রতিবাদ করিল না। রিজার্ভ করা বক্সে বসিয়া থিয়েটার বা বায়স্কোপ দর্শনে কোন বিঘ্ন ঘটিল না। মোটরে বসিয়া প্রকাশ্য রাজপথে বায়ুসেবনেও অপর পক্ষ হইতে কোন আপত্তি উত্থাপিত হইল না। তবে সকল ক্ষেত্রেই উমা তাহার শ্বশ্রূমাতাকে সঙ্গে লইত। ধরণী মনে মনে ইহাতে কিছু ক্ষুণ্ণ হইত বটে; কিন্তু প্রতিবাদ করিবার কিছুই ছিল না।

কিন্তু ধরণী একটা সাধ মিটাইবার উপায় কিছুই দেখিতে পাইল না। বন্ধুবান্ধবদিগের সম্মুখে স্ত্রীকে বাহির করিয়া প্রতীচ্য নরনারীর ন্যায় বিশ্রম্ভালাভের সুযোগ সে এখনও পায় নাই—মধুর সন্ধ্যা বা জ্যোৎস্না-পুলকিত রজনীতে খোলা ময়দানে উভয়ে হাত ধরাধরি করিয়া বেড়াইবার আনন্দ উপভোগ করিবার ব্যবস্থা সে এখনও করিতে পারে নাই। তাহার মনে সন্দেহ ছিল, এ বিষয়ে তাহার জননীর পক্ষ হইতে প্রবল বাধা উপস্থিত হইবে।

মনের এই সাধটা মিটিতেছে না বলিয়া সে প্রকৃতই মনে মনে অশান্তি অনুভব করিতে লাগিল। আলোচনা-প্রসঙ্গে সে বন্ধুবান্ধবদের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া পাকে-প্রকারে মাতা ও পত্নীর কাছে মনের কথা ইঙ্গিতে জানাইয়াছিল।

তাহার মাতা ও পত্নী কথাটি বুঝিলেন কি না, তাহা সে জানিতে পারিল না। তবে কিছু দিন পরে তাহার জননী দেশে যাইতে চাহিলেন। সেখানকার একটা সম্পত্তির সম্বন্ধে ব্যবস্থা করার বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। নায়েব দেশে যাইবার জন্য ধরণী অথবা কর্ত্রী ঠাকুরাণীকে পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিতেছিল।

ধরণী নায়েবের শেষ পত্র পড়িয়া মাকে বলিল, "আমার হাতে কয়েকটা রোগী আছে, আমার যাওয়া ত হ'তে পারে না।"

মাতা বলিলেন, "কিন্তু না গেলে ত অনেকগুলো টাকা নষ্ট হয়ে যাবে!"

পুত্র বিব্রতভাবে মাতার দিকে চাহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে বলিল, "তা ত বুঝলুম; কিন্তু নায়েব মশাই যা লিখেছেন, তাতে দেশে অনেক দিন গিয়ে না থাকলে এ ব্যাপারের মীমাংসা হবে না। আমি বড় জোর ২।১ দিনের জন্য এর পর যেতে পারি। কিন্তু বিষয়-আশয় আমি কিছুই বুঝতে পারি না। আমি গিয়েই বা কি ক'রব?"

বিধবা বলিলেন, "তা ব'লে ত এত টাকার জিনিষ নষ্ট করা যায় না। তা হ'লে আমাকেই যেতে হয়।"

জননী পুত্রের মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন।

ধরণীর নয়নযুগল সহসা উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "সে ত খুবই ভাল হয়, মা। তুমি কবে যাবে, কাল?"

কিন্তু মাতাকে এক দিনের জন্যও ছাড়িয়া থাকিতে এই ধরণীনাথ পূর্ব্বে কখনও রাজী হয় নাই।

প্রৌঢ়া মুখ ফিরাইয়া চাহিতেই অদূরে দণ্ডায়মানা অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা পুত্রবধূর দিকে দৃষ্টি পড়িল। শ্বশ্রূ ও পুত্রবধূর নয়নের দৃষ্টি মিলিত হইল। ধরণীনাথ তাহা দেখিতে পাইল না। আকস্মিক আনন্দের আতিশয্যে সে তখন অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল।

মাতা বলিলেন, "অনেক দিন দেশে যাইনি। এবার গেলে তাড়াতাড়ি আসতে পারব না। পূজো পর্য্যন্ত থাকতে হবে। ২০ বছর পরে সেখানে যাচ্ছি।"

ধরণীনাথ প্রফুল্লভাবে বলিল, "তা বেশ ত! কিন্তু পূজোর সময় আমি সেখানে যেতে পারব না, তা ব'লে রাখছি। নৌকো ক'রে না কি সেখানে এ বাড়ী ও বাড়ী যেতে হয়! সে আমার দ্বারা হবে না, মা। আমি দার্জ্জিলিঙ্গে যাব, ঠিক ক'রে রেখেছি।"

মাঘ হইতে আশ্বিন—৯ মাস মা দেশে থাকিবেন! ভাবী স্বাধীন জীবনযাত্রার কথা মনে করিয়া ধরণীনাথ আনন্দে চঞ্চল হইয়া উঠিল। এই দীর্ঘ কয় মাস ধরিয়া সে

উমাকে লইয়া কি ভাবে সময় কাটাইবে, মনে মনে তাহার একটা খসড়া করিয়া লইল।

মাতা বলিলেন, "তবে কাল ভাল দিন আছে, আমার যাবার যোগাড় ক'রে দে। বৌমা একা থাকবেন, তুই তাঁকে ভাল ক'রে দেখিস্।"

"সে জন্য তুমি কিছু ভেব না, মা। কিন্তু তোমার শরীরের দিকে দৃষ্টি রেখ। জ্বর টর বাধিয়ে বসো না যেন।"

মাতার ওষ্ঠপ্রান্তে একটি মৃদু হাসির তরঙ্গ খেলিয়া গেল। তাহা হর্ষ বা বিষাদের দ্যোতক, কে বলিবে!

কক্ষত্যাগের সময় আবার প্রৌঢ়া ও তরুণীর দৃষ্টি-বিনিময় হইল। অবগুণ্ঠনের প্রান্ত মুখের উপর টানিয়া দিয়া উমাও শ্বশ্রূর পশ্চাতে কক্ষ ত্যাগ করিল।

ধরণীনাথ তখন গুণ্ গুণ্ করিয়া একটা গানের কলি ভাঁজিতেছিল।

## ৪

জমাট অন্ধকাররাশি ভেদ করিয়া ডাক-গাড়ী হু হু শব্দে ছুটিতেছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা পাখা খুলিয়া দিয়া দিব্য আরামে নিদ্রা যাইতেছিল। পূজার বন্ধে অসংখ্য যাত্রী স্থানান্তরে ছুটীর অবকাশ কাটাইয়া আসিবে বলিয়া গাড়ীতে অসম্ভব ভীড়। তখনও পূজার ৫।৭ দিন বিলম্ব ছিল।

ধরণীনাথ পত্নীকে লইয়া নৈনিতাল যাইতেছিল। সে শুনিয়াছিল, পূজার সময় সেখানে পরম আরাম লাভ করা যায়। দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি কামরা রিজার্ভ করিয়া লইয়াছিল। কাযেই তাহার গাড়ীতে যাত্রি-সমাগমের হাঙ্গামা ছিল না। মাতা দেশে যাইবার পর হইতেই সে আপনার সুপ্ত, অপরিতৃপ্ত সাধগুলিকে পূর্ণমাত্রায় মিটাইয়া লইতেছিল। উমা স্বামীর সকল কথাই অক্ষরে অক্ষরে পালন করিত। কোন কোন বিষয়ে ক্ষীণ আপত্তি উত্থাপন করিলে ধরণী যখন পরিপূর্ণ আবেগের সহিত বলিত যে, এমনই ভাবে না চলিলে তাহার আত্মা তৃপ্তিলাভ করিবে না, হৃদয়ে বড় বেদনা পাইবে, তখন সে অবিচারিতভাবে স্বামীর নির্দ্দেশ অনুসারে চলিত। আপনার স্বাতন্ত্র্যকে কোন ব্যাপারেই প্রকট হইতে দিত না।

একটা ষ্টেশনে গাড়ী থামিবার পর আবার চলিতে আরম্ভ করিল। সেই সময়ে দরজা খোলার শব্দে ধরণীনাথের নিদ্রাভঙ্গ হইল। সবিস্ময়ে সে দেখিল, গাড়ীর দরজায় 'রিজার্ভ' লেখা থাকা সত্ত্বেও দুই জন গোরা তাহার কামরায় প্রবেশ করিয়াছে। সে এক লম্ফে উঠিয়া তাহাদের সম্মুখীন হইল।

তাহাদের অনধিকারপ্রবেশ সম্বন্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিবামাত্র গোরা দুই জন অশ্লীল অঙ্গভঙ্গী করিয়া তাহাকে মারিতে উঠিল। ধরণীর রক্তও চঞ্চল হইয়া উঠিল; কিন্তু সে একা, এই দুই জন পানমত্ত—কথা কহিবার সময় তাহাদের মুখ হইতে সুরার উৎকট গন্ধ নির্গত হইতেছিল—অসুরের সহিত সে কি করিতে পারে?

গোলমাল শুনিয়া উমারও নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল। সে ধড়মড় করিয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিল। সুন্দরী তরুণীকে দেখিতে পাইয়া গোরা দুই জনের মধ্যে কি কথা হইল। সবটা শুনিতে না পাইলেও যাহা শুনিল, তাহাতেই ধরণীর শরীরের রক্ত হিম হইয়া গেল।

উভয়ে উমার দিকে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া ধরণী তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া এক জনকে সজোরে ধাক্কা দিল। সে টাল সামলাইয়া লইয়া ধরণীকে আক্রমণ করিল। তখন উভয়ের মধ্যে প্রলয়কাণ্ড বাধিয়া গেল।

এ দিকে অপর গোরাটা স্খলিত চরণে উমার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। উমা তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়া মটকার ওভার-কোটটা তাড়াতাড়ি পরিধান করিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইল।

গোরাটা অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া সে বিশুদ্ধ ইংরাজীতে দৃঢ়স্বরে তাহাকে থামিতে বলিল। অসুরটা মুহূর্ত্ত স্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইল। উমার প্রদীপ্ত আননে উত্তেজনার আরক্ত আভা দেখিয়া মাতালটা উন্মত্ত হইয়া দুই বাহু প্রসারিত করিল।

পর-মুহূর্ত্তেই "মাই গড!" বলিয়া সে দুই পদ পিছাইয়া গেল। কিন্তু অতিরিক্ত মদ্যপান হেতু সে টাল সামলাইতে না পারিয়া সশব্দে নীচে পড়িয়া গেল।

উমার হস্তে তীক্ষ্ণধার ছোরা। গাড়ীর আলোকে তাহার শাণিত জিহ্বা লক্-লক্ করিয়া উঠিল। ভূপতিত মাতালটার দিকে ছোরা তুলিয়া ধরিয়া উমা দৃঢ়স্বরে ইংরাজীতে বুঝাইয়া

দিল, সে নড়িবার চেষ্টা করিলেই উহা তাহার বক্ষোদেশে বিদ্ধ হইবে। বাঙ্গালী তরুণীর এরূপ সাহস গোরার কাছে অভিনব দৃশ্য, সে কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া রহিল।

উমা দৃষ্টি ফিরাইতেই দেখিতে পাইল, অপর গোরাটা তাহার স্বামীকে এমনভাবে চাপিয়া ধরিয়াছে যে, ধরণীনাথ কোনও মতেই তাহার হস্ত হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে পারিতেছে না। উমার সমগ্র চিত্ত বিপদের আকস্মিকতায় স্তব্ধ হইয়া গেল। অপর গোরাটা তাহার সম্মুখে, সে উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহাকে অতিক্রম করিয়া যাইবার উপায় নাই। তখন সন্নিহিত বাতায়নপথে মুখ বাড়াইয়া সে চীৎকার করিয়া ডাকিল, "ইন্দ্রসিং!"

"দিদিজী!"—

পর-মুহূর্ত্তেই দরজা খোলার শব্দ হইল। সঙ্গে সঙ্গে উর্দ্দীপরা এক বলিষ্ঠ ব্যক্তি ভৃত্যের কামরা হইতে নির্গত হইয়া গাড়ীর হাতল ধরিয়া দ্রুতবেগে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল।

মুহূর্ত্ত দৃষ্টিপাতে ব্যাপারটা বুঝিয়া লইয়া লোকটা প্রচণ্ড মুষ্টি উদ্যত করিয়া ধরণীর আক্রমণকারী গোরাটার পৃষ্ঠদেশে বজ্রের ন্যায় প্রহার করিতে লাগিল। তাহার পর বলপূর্ব্বক তাহার আক্রমণ হইতে ধরণীকে মুক্ত করিয়া গোরাটার কটিদেশ ধরিয়া ব্যায়ামকৌশলে তাহাকে ভূপাতিত করিল।

এ দিকে অপর গোরাটা তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে আসিয়া বজ্রমুষ্টিতে ইন্দ্রসিংকে পশ্চাদ্দেশ হইতে চাপিয়া ধরিল। কিন্তু স্বল্পায়াসেই ইন্দ্রসিং তাহার বাহুপাশ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া প্রচণ্ডবেগে তাহার মুখে ও বক্ষোদেশে ঘুষি মারিতে লাগিল।

উমা চীৎকার করিয়া বলিল, "ইন্দ্রসিং, বাবুকে দেখ।" সঙ্গে সঙ্গে সে বিপদ্‌জ্ঞাপক শিকল ধরিয়া ঝুঁকিয়া পড়িল।

ইন্দ্র দেখিল, ধরণীনাথের নাসিকা হইতে রক্ত নির্গত হইতেছে। সে গোরাটাকে ছাড়িয়া দিয়া ধরণীর দিকে ছুটিয়া গেল।

গাড়ী থামিয়া গেল। তাহারা দেখিল, গোরা দুই জন অপর দিকের দরজা খুলিয়া পলায়নের চেষ্টা করিতেছে।

ইন্দ্রসিং এক লম্ফে তাহাদের সন্নিহিত হইল এবং উভয়কে একসঙ্গে তাহার লৌহপেশীবৎ বাহুযুগলের বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া ফেলিল। গোরা দুই জনের মদের নেশা তখন তিরোহিত হইয়াছিল। তাহারা প্রাণপণ শক্তিতে ঘুষি মারিয়া ইন্দ্রসিংএর কবল হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা করিতে লাগিল।

আলোক-হস্তে মস্ মস্ শব্দ করিয়া গার্ড সেই কামরায় প্রবেশ করিল। ধরণী তখন অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়াছে; কিন্তু তাহাকে কোন কথা বলিবার অবকাশ না দিয়াই উমা বলিয়া উঠিল, "আমাদের রিজার্ভ গাড়ীতে ঐ দুটো পশু জোর ক'রে ঢুকে আমাদের উপর অত্যাচার করেছে। ওদের গ্রেপ্তার করুন।"

য়ুরোপীয় গার্ডের মুখ সহসা আরক্ত হইয়া উঠিল। ভদ্রমহিলার প্রতি অসম্মান! এইরূপ বর্ব্বর পশুর জন্যই ইংরাজের সুনাম ধূলায় লুটাইতেছে। সঙ্গের এক জনকে গার্ড আদেশ করিল, "উহাদিগকে গ্রেপ্তার কর।" গোরা দুইটা তখন আর পলায়নের চেষ্টা নিষ্ফল দেখিয়া আত্মসমর্পণ করিল।

গার্ড ধরণীকে বলিল যে, পরের ষ্টেশনে সে উহাদিগকে পুলিসের হস্তে সমর্পণ করিবে। যদি উহাদিগকে বিচারার্থ চালান দিবার ইচ্ছা থাকে, সেখানে ধরণী ও তাহার স্ত্রী যেন এজাহার দেয়!

ধরণী উমাকে বলিল, "কেলেঙ্কারী বাড়িয়ে লাভ কি? এই নিয়ে খবরের কাগজে হৈ-চৈ প'ড়ে যাবে। সে বড় লজ্জা! কোর্টে সাক্ষী দেওয়া—সে অসম্ভব।"

উমা তীব্র দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল, "তা হবে না। মোকর্দ্দমা হয় হবে। এ সব অত্যাচার নীরবে সহ্য কর্‌লে পাপের ও অনাচারের প্রশ্রয় দেওয়া হয়। আমি এজাহার দেব।"

ধরণী মিনতিভরা কণ্ঠে বলিল, "না, উমা, লক্ষীটি, ও সব হাঙ্গামায় কায নেই। ইন্দ্রসিং ওদের যে রকম মেরেছে, তাই যথেষ্ট শাস্তি। আর কেন।"

"না, যে তোমার শরীর থেকে রক্তপাত করেছে, তাকে আমি ক্ষমা করতে পারি নে—কখনও না।"

গার্ড তখন গোরা দুই জনকে নীচে নামাইয়া দিয়া স্বয়ং নামিয়া যাইতেছিল।

ধরণী পত্নীর করযুগল চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "দোহাই তোমার, উমা, ওদের ছেড়ে দিতে ব'লে দিই। কেলেঙ্কারী আর বাড়িয়ে কায নেই।"

ধীরে ধীরে স্বামীর হস্তবন্ধন হইতে তাহার করযুগল মুক্ত করিয়া লইয়া উমা স্নিগ্ধস্বরে বলিল, "তোমার সব কথাই শুনেছি, এ কথাও শুনব, কিন্তু বল, তুমিও আমার কথা শুন্‌বে?"

"সহস্রবার—নিশ্চয়।"

"তবে গার্ডকে ব'লে দাও, ওদের মুক্তি দিতে পারে। আমরা মোকর্দ্দমা করব না।"

ধরণী গার্ডকে তাহার অভিপ্রায় জানাইলে সে বলিল, "বাবু, তোমাদের দুর্ব্বলতার জন্যই এই সব লোকের অনাচার বৃদ্ধি পায়। আইনতঃ আমি ওদের পুলিসের হাতে দিতে বাধ্য; কিন্তু আদালতে সাক্ষী দিতে গিয়ে ঐ মহিলার ইজ্জতহানি হ'তে পারে ভেবে আমি তোমার কথামতই ওদের ছেড়ে দেব। কিন্তু তাও ব'লে রাখি, এটা ঠিক ক্ষমা নয়, কাপুরুষের দুর্ব্বলতা মাত্র!"

ইন্দ্রসিং তাহার কক্ষে ফিরিয়া গেল। ৪৫ বৎসরবয়স্ক এই নেপালী ভৃত্যটিকে উমার পিতা ধরণীনাথকে উপহার দিয়াছিলেন। পিতৃমাতৃহীন অবস্থায় তিনি উহাকে বাড়ী আনিয়াছিলেন। ইন্দ্রসিং উমাকে কোলে-পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছিল। ধরণীনাথের মতিগতির কথা রমানাথবাবু জানিতে পারিয়া কন্যা ও জামাতার পৃষ্ঠরক্ষকস্বরূপ এই সাহসী, বলিষ্ঠ ভৃত্যকে তিনি কন্যার কাছে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। উমা ভবিষ্যৎ ভাবিয়া উহাকে সঙ্গে আনিয়াছিল।

যাত্রাপথে বাধা পড়ায় ধরণীনাথ পরের ষ্টেশনে নামিয়া কলিকাতাগামী গাড়ী চড়িয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

### ৫

ষষ্ঠীর প্রভাত। নীল আকাশের মাঝে মাঝে ছোট ছোট সাদা মেঘ—তরুণ তপনের উজ্জ্বল মধুর আলোকধারায় বিচিত্র সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত হইয়াছিল। শানাই আগমনীর করুণ তান বিলাইয়া শুভসুন্দর শরৎ-প্রভাতকে অভিনন্দিত

তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন। দাস-দাসীরা প্রভুর আদেশে কর্ম্মে ব্যস্ত। প্রৌঢ়ার সৌম্য আননে স্নিগ্ধ করুণ মৌন রেখা। কত যুগ পরে শ্বশুরের ভিটায়—স্বামীর সহস্র স্মৃতিবিজড়িত ভবনে বাৎসরিক মহাপূজার আয়োজনে তিনি আজ আপনাকে নিয়োজিত করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু এই আনন্দের দিনে—

"মা।"

জননী ফিরিয়া চাহিতেই তাঁহার আনন বিস্ময়ানন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

"আমরা এসেছি, মা!"

ধরণীনাথ মাতার পদধূলি লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। পশ্চাতে উমা। তাহার লুণ্ঠিত শিরে প্রৌঢ়ার সজল নেত্র হইতে এক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

বৃহৎ ভবনে একটা নূতন সাড়া পড়িয়া গেল। বহু কালের পরিত্যক্ত জমীদার-গৃহে মহামায়ার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আজ নবীন শ্রী ফিরিয়া আসিয়াছে! কুললক্ষ্মীর অভ্যর্থনার আনন্দে নহবৎও যেন নূতন উৎসাহে মাতিয়া উঠিল।

* * * * *

রাত্রি দ্বিপ্রহরে সুপ্তির ছায়ায় সমগ্র গ্রামখানি যখন আচ্ছন্ন—পূজাবাড়ীর কর্ম্মকোলাহল স্তব্ধ, তখন পূজামণ্ডপে—প্রতিমার সম্মুখে পট্টাম্বরধারিণী তরুণী আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার পশ্চাতে নগ্নপদ ধরণীনাথ, তাহারও অঙ্গে পট্টাম্বর।

স্বামীর হাত ধরিয়া তরুণী প্রতিমার সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিল। ঝাড়ের উজ্জ্বল আলোকধারা মাতার আননে পড়িয়া নৃত্য করিতেছিল।

উমা শান্ত, গাঢ় কণ্ঠে স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল, "মা'র কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, তোমাকে ফিরিয়ে আনব। ভগবান্ আমার মুখ রেখেছেন। আমরা সবাই বুঝেছিলাম, লেখা-পড়া শিখেও তোমার মন দেশ ছেড়ে বিদেশের দিকে বড়ই ঝুঁকে পড়েছে। কিন্তু আমরা যে বাঙ্গালী হিন্দু, লেখা-পড়া শিখে তা ভুলে যাওয়ার মত দুর্ভাগ্য কিছু নেই। আজ শক্তিরূপিণী জগজ্জননীর কাছে—এস, আমরা প্রার্থনা

ধরণীনাথের হৃদয় ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিল। সে ভূমিষ্ঠ হইয়া মহামায়ার চরণতলে লুণ্ঠিত হইল। তাহার পর স্ত্রীর করপল্লব দৃঢ়হস্তে ধারণ করিয়া বলিল, "উমা, সার্থক তোমার লেখা-পড়া। তুমি আমাকে হাত ধ'রে এমনই করেই সংসারপথে চালিয়ে নিও—শক্তি দিও। আমি কায়মনোবাক্যে তোমার কাছেই আত্মসমর্পণ করলুম।"

মাতার প্রশান্ত স্নিগ্ধ দৃষ্টি হইতে যেন আশীর্ব্বাদধারা ঝরিয়া পড়িয়া তাহাদিগকে অভিষিক্ত করিয়া দিল।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

---

# প্রসাধন

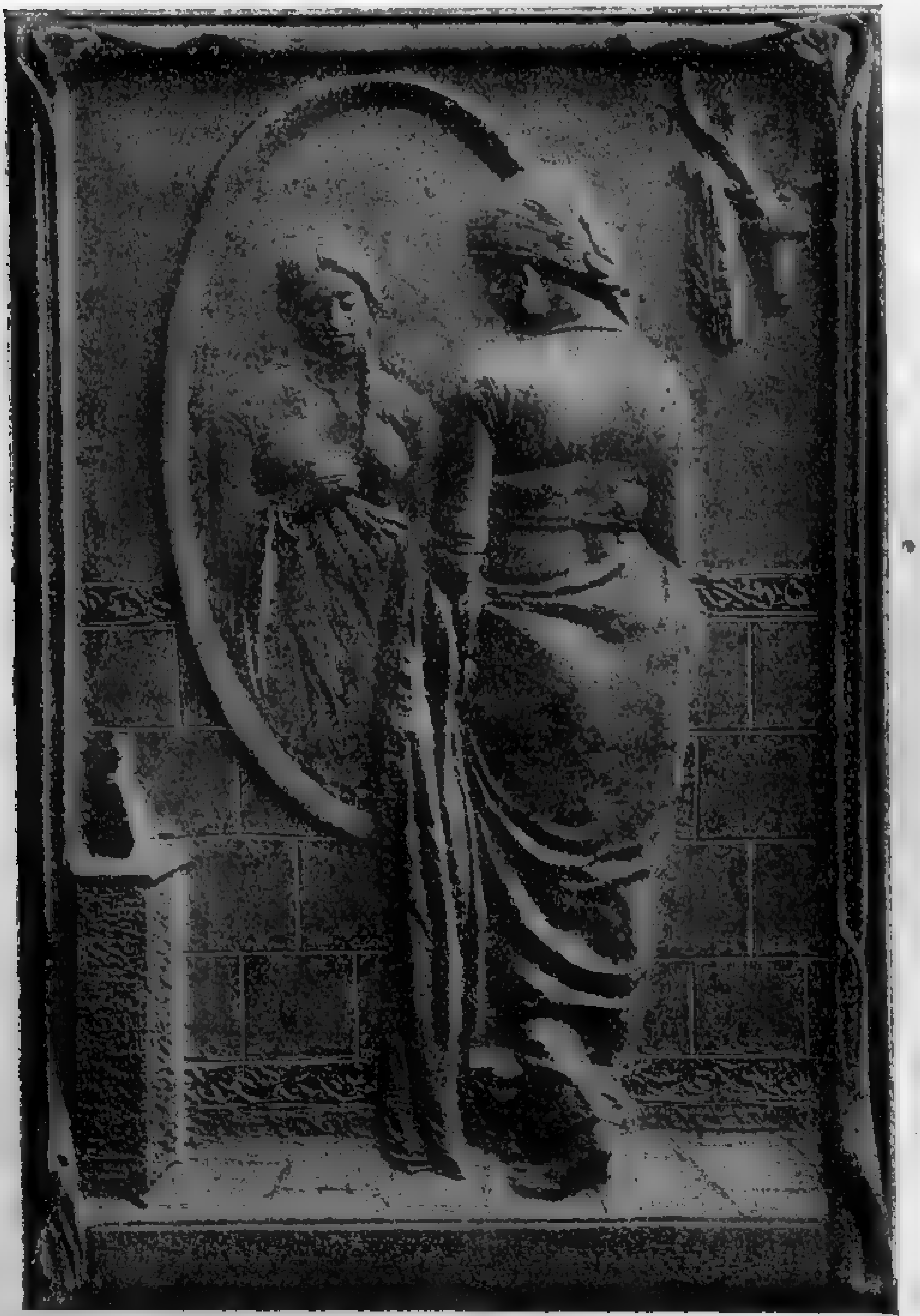

[ মৃন্ময় মূর্ত্তি ]

[ ভাস্কর—শ্রীপ্রমথনাথ মল্লিক।

# গনির মা

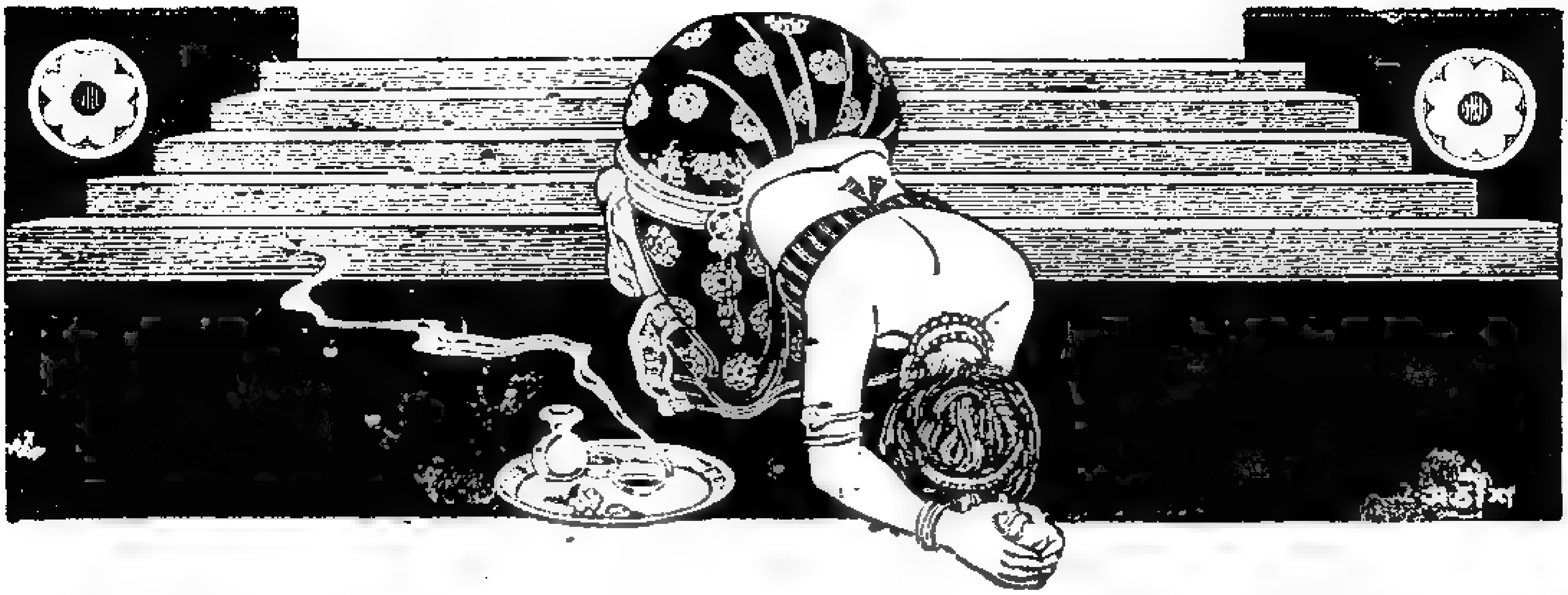

## ১

কুতুবপুরের রহম সেখ তাহার স্ত্রী ফুলজান বিবি ও একমাত্র শিশুপুত্র গনিকে রাখিয়া হঠাৎ মারা গেল। ফুলজানের বয়স তখন ২৫, দেখিতেও সে সুন্দরী। আবার রহম সেখ যে দশ বিঘা জমী রাখিয়া গিয়াছিল, তাহাতে খুব ধান ও পাট জন্মায়। অল্পদিনের মধ্যেই ফুলজানের চারি পাশে অনেক মধুকর গুণ্ গুণ্ করিতে লাগিল! কিন্তু ফুলজান বলিল --"আমি কোনও গোলামের ধার ধারি না, আল্লার দোয়ায় আমার গনি বাঁচিয়া থাকুক্।"

ফুলজানের পাণিপ্রার্থীদের মধ্যে কেফাতুল্লা সেখ সেই গ্রামের এক জন মাতব্বর। তাহার মত দাঙ্গাবাজ ও অত্যাচারী লোক আশেপাশে চারি পাঁচ গ্রামের মধ্যে ছিল না। তাহার বয়স প্রায় ৪৫, দেখিতে অত্যন্ত কদাকার; কিন্তু খুব বলবান্। তাহার লাঠির জোরে কেহ তাহার সম্মুখীন হইতে সাহস করিত না। এই মুসলমান-প্রধান গ্রামে তাহার একটা প্রবল দল ছিল। আবশ্যক হইলে এই দলের লোক অন্য লোকের বাড়ী লুঠ করিত, কেফাতুল্লার ভয়ে কেহ থানায় এজাহার দিতে যাইত না। এজাহার দিলেও কোন ফল হইত না, কারণ, পুলিস কি প্রকারে বাধ্য রাখিতে হয়, কেফাতুল্লা সে বিষয়ে এক জন ওস্তাদ ছিল।

এ হেন কেফাতুল্লা যখন ফুলজানের প্রেমপ্রার্থী হইয়া তাহার নিকট যাতায়াত আরম্ভ করিল, তখন সে বেচারী প্রমাদ গণিল। সে জানিত, কেফাতুল্লার আর দুইটি কবিলা আছে, তাহারা তাহার প্রহারের চোটে সর্ব্বদা চোখের জলে ভাসিত।

এক দিন বৈকালে ফুলজান তাহার উঠানে বসিয়া ধান ঝাড়িতেছিল, তখন সে কেফাতুল্লার চীৎকার শুনিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সে দেখিল, তাহার আট বৎসরবয়স্ক পুত্র গনি ভীত-চকিত হইয়া ছুটিয়া আসিতেছে, আর কেফাতুল্লা লাঠি হাতে করিয়া তাহাকে তাড়া করিতেছে।

"শালার বেটা শালা! গরু ছাইড়িয়া দিয়া আমার পাট খাওয়াইস্! এই লাঠির বাড়িতে তোর পাট খাওয়ান বাইর কর্যা দেব! হারামজাদা!"

ইহা বলিতে বলিতে কেফাতুল্লা গনির অনুসরণ করিয়া ফুলজানের কাছে আসিল। গনি কাঁপিতে কাঁপিতে মাতার বস্ত্রাঞ্চলে আশ্রয় লইল। তখন কেফাতুল্লা রোষ-কষায়িত নয়নে ফুলজানের দিকে তাকাইয়া বলিল—"মাগী, তোর গরু বাঁধতি পারিস্ না! হারামজাদী—শালী!"

ফুলজান মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া ভীত কণ্ঠে বলিল -"মাতুব্বরের বেটা, আমার গরু ত বাঁধাই থাকে, আজ ক্যামনে ছুটে গেছিল। আমি জান্তি পার্যা গরু ধরতি গনিরে পেঠেয়াছিলাম। আমার ছাওয়াল নিতান্ত নাবালক। আজকার কসুর মাপ কর।"

ফুলজানের এই কাতরোক্তিতে কেফাতুল্লা একটু নরম হইয়া বলিল—"আচ্ছা, আজকের কসুর যেন মাপ করলাম। কিন্তু ফুটি বড্ড, আমার সাথে আড়ি কর্যা কয়দিন তুই এখানে থাক্‌বি?"

ফুলজান কেফাতুল্লাকে বসিবার জন্য একখানা পিঁড়ি আগাইয়া দিয়া বলিল—"তুমি আমার উপর অনুরাগ করলে এক দিনও আমি এ গেরামে টিক্‌তে পারব না, তা ত আমি খুব জানি।" কেফাতুল্লা সেই পিঁড়িতে বসিয়া বলিল,

—"তবে আমার কথা শুনিস্ না ক্যান্ ? আমি ত তোর ভালোর জন্তিই কই, আমার সাথে নিকা বস্তা আমার বারীতে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকৃবি—আমার আর যে দুই কবিলা আছে, তারা তোর বাঁদী হইয়ে থাক্‌বে। ঐ যে রাণী রাসমণি যেমন খাটের উপর পা ছড়াইয়া বস্তা থাকে, তেনার দুই পাশে দুইটা চিনির বস্তা থাকে—একবার ডান হাত দিয়া এক মুঠো চিনি মুখে ভায়, আবার বাও হাত দিয়া আর এক মুঠো চিনি মুখে আয়—তোরও সেই রকম সুখ হবে।"

ফুলজান তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিল—"মাতুব্বরের বেটা, আমার কথা ত তোমারে আগেই বল্‌ছি। আমি রাণী রাসমণির সুখ চাই না। আমার জীবনের সুখ সেই এক জনের সাথেই গেছে। এখন খোদাতাল্লার মরজীতে নাবালক বাঁচ্যা থাক্।"

কেফাতুল্লা উঠিয়া দাঁড়াইয়া ক্রোধভরে বলিল—"তবে তুই তোর ছাওয়াল নিয়ে থাক। আবার যদি আমার ক্ষ্যাতে তোর গরু যায়, তবে তার মাথা কাটাব, এ কথা আমি আগেই বল্যা গেলাম।"

এই বলিয়া ক্রোধভরে কেফাতুল্লা চলিয়া গেল।

## ২

ইহার তিন দিন পরে ফুলজানের গরু আবার ছুটিয়া গেল। গনি সারাদিন গরু খুঁজিয়া পাইল না। তাহাদের প্রতিবেশী তমিজদ্দী আসিয়া সংবাদ দিল, সেই গরু দুই মাইল দূরে রসুলপুর খোঁয়াড়ে আটক রহিয়াছে। ফুলজানের বুঝিতে বাকী রহিল না যে, ইহা কেফাতুল্লার কারসাজি। সে তমিজদ্দীকে ধরিল—"চাচা, তুমি গনির সাথে যাইয়া আমার গরুডা খালাস কর‍্যা আন, যে পয়সা লার্গে, তা আমি দিতেছি।"

তাহার অনুনয়ে বাধ্য হইয়া তমিজদ্দী গরু খালাস করিতে গেল। খোঁয়াড়ের মাসুল আইনানুসারে ।/০ আনা, গনি ॥০ আনা লইয়া গিয়াছিল, কিন্তু সেই খোঁয়াড়ের মুন্সী বলিল, ৩ টাকা না পাইলে সে কিছুতেই গরু ছাড়িবে না। তমিজদ্দীও অগত্যা ফিরিয়া আসিল। ফুলজানের হাতে তখন টাকা ছিল না, সে তমিজদ্দীর নিকট একখানা "জেওর" অর্থাৎ রূপার মল বন্ধক রাখিয়া ৩ টাকা সংগ্রহ করিয়া তাহার দ্বারা গরু খালাস করিয়া আনিল।

আর এক দিন ফুলজানের বর্গাদার আরজান আসিয়া তাহাকে জানাইল যে ফুলজানের বর্গা জমীতে যে আউস-ধান বুনিয়াছিল, কেফাতুল্লা লোকজন জুটাইয়া আনিয়া তাহা কাটিতেছে। সে জমীটা ফুলজানের বাড়ীর খুব নিকটে। ফুলজান আরজানকে সঙ্গে লইয়া সেখানে গিয়া দেখিল, তিন জন লোক সেই জমীর ধান কাটিতেছে, কেফাতুল্লা সেখানে দাঁড়াইয়া আছে। ফুলজান কাঁদিতে কাঁদিতে সরকার বাহাদুরের দোহাই দিল। কেফাতুল্লা তাহার কাছে আসিয়া বলিল—"ফুটি বড্ড, এখন কাঁদলি কি হবে ? আমি তোর দোহাই মানি না। তোর খসম আমার কাছে এই জমী বন্ধক র‍্যাখ্যা ৫০ টাকা কর্জ্জ নিয়াছিল। এর অর্দ্ধেক ফসল আমি পাব, বাকী অর্দ্ধেক বর্গাদার নেবে। এই ত্যাখ সেই দলীল।" এই বলিয়া কেফাতুল্লা একখানা ষ্ট্যাম্পে লেখা খত ফুলজানকে দেখাইল।

ফুলজান চক্ষু মুছিয়া বলিল—"মাতুব্বরের বেটা, আমার খসম ত কোন দিনও টাকা কর্জ্জ করার কথা কয় নাই, সে বরাবর এই জমী নিজ হাতে চষিত, আমি এবার আরজানরে বর্গা দিছি। দোহাই তোমার খোদাতালার! আমি নিতান্ত কাঙ্গাল, কোন রকমে নাবালক ছাল্যাডা নিয়ে ভিটাডার উপরে আছি। তারে ফাঁকি দিয়া বঞ্চিত কইরো না।"

কেফাতুল্লা বলিল—"আমার এই দলীল বুঝি মিথ্যা ? গ্রামের তিন চার জন লোক সাক্ষী আছে। হারামজাদী! মুখ সামলাইয়া কথা কহিস্।"

এই বলিয়া কেফাতুল্লা সেই জমীতে ফিরিয়া গেল। ফুলজান দুঃখিত অন্তঃকরণে বাড়ী আসিয়া মুখে হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। ধান কাটা শেষ হইলে, কেফাতুল্লা তাহার বাড়ীর নিকট দিয়া যাইবার সময় তাহাকে সেই অবস্থায় দেখিয়া তাহার কাছে আসিল এবং মৃদু হাস্য করিয়া বলিল,—"কি বিবিজান! আমার আরজডা শুন্‌লে না, তোমার সেই ছিল ভাল, না এই ভাল ?"

ফুলজান তাহার প্রতি রোষপূর্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া ঘরের মধ্যে গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িল। সে শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিল, কি প্রকারে সে এই দুর্দান্ত

লোকের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবে? তাহার অত্যাচারের মাত্রা যে ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। সে কি প্রকারে তাহার নাবালক পুত্রকে বাঁচাইবে? তবে কি সে পুত্রের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া এই অত্যাচারীর নিকট আত্মসমর্পণ করিবে? কিন্তু তাহার মৃত স্বামীকে সে কিরূপে ভুলিবে? সে যে এখনও তাহাকে কত ভালবাসে? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সে চোখের জলে মাটী ভিজাইল। অবশেষে সে সঙ্কল্প করিল, যদি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া খাইতে হয়, তাহাও স্বীকার, তবু সে তাহার স্বামীকে ভুলিয়া আর কাহারও সঙ্গে নিকা বসিবে না। খোদা কি তাহার শিশুসন্তানকে রক্ষা করিবেন না?

### ৩

ইহার কিছু দিন পরে সেই গ্রামে কলেরা দেখা দিল। গ্রামের মেনাজদ্দী সেখের প্রথমে ভেদবমি হয়; তাহাতেই সে দুই দিনের দিন মারা গেল। পরে তাহার কবিলার ও দুইটি ছেলের এই ব্যারাম হইল। কেফাতুল্লা গ্রামের অন্যান্য মাতব্বরের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ১০৲ টাকা চাঁদা তুলিয়া হেমাইতপুরের কেরামতালী ফকিরকে লইয়া আসিল। ফকির আসিয়া গ্রামের চারি কোণে চারিটা গাছের শিকড়মাত্র পড়িয়া পুতিয়া দিল, ইহাতে না কি এই গ্রামের কলেরা অন্য গ্রামে তাড়িত হইবে। আর মেনাজদ্দীর কবিলা ও ছেলেদিগকে জল পড়িয়া খাওয়াইল, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। এই তিনটি রোগীই মারা গেল এবং হেনাজদ্দীর বাড়ীতে আর দুইটির ব্যারাম হইল। ইহার পরে সেই কেরামতালী ফকিরের যখন এক দিন ভেদবমি আরম্ভ হইল, তখন সে গ্রাম ছাড়িয়া পলাইয়া গেল। হেনাজদ্দী কতকটা অবস্থাপন্ন লোক, সে কেফাতুল্লার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া রহমতপুর হইতে আবদুল করিম ডাক্তারকে আনিল। আবদুল করিম এক জন হাতুড়ে, সে সামান্য বাঙ্গালা লেখাপড়া শিখিয়া একটা ডাক্তারখানার কম্পাউণ্ডারের সঙ্গে দুই বৎসর কায করিয়াছিল। এখন সে নিজ গ্রামে বসিয়া চিকিৎসা করিতেছিল। ডাক্তার আসিয়া কেফাতুল্লার বাড়ীতে বাসা করিয়া রোগীদিগের চিকিৎসা আরম্ভ করিল এবং সৌভাগ্যক্রমে হেনাজদ্দীর বাড়ীর একটি লোক আরাম হইল, অন্যটি মারা গেল। কিন্তু সেই দিনই আবার ভিন্ন ভিন্ন বাড়ীতে আর চারি জনের কলেরা হইল। কাযেই গ্রামের লোকরা চাঁদা করিয়া ডাক্তারকে গ্রামে রাখিতে বাধ্য হইল। ডাক্তার দেখিলেন, গ্রামের লোক যে পুষ্করিণীর জল পান করে, তাহার মধ্যে রোগীর কাঁথা-কাপড় কাচাতে উহার জল দূষিত হইয়াছে। তিনি সকলকে বলিলেন,—"তোমাদের ফকির আসিয়া গ্রামের চারিদিকে শিকড় পুতিয়া গ্রামবন্ধন করিয়াছিল, তাহাতে কলেরা থামে নাই। আমি বলি, তোমরা এই পুকুরের জল কেহ খাইও না। কলেরার বিষে ইহার জল দূষিত হইয়াছে। এই জল না খাইলেই কলেরা থামিবে।"

ডাক্তারের কথা শুনিয়া সকলে হাসিল, কেহ তাঁহার কথা বিশ্বাস করিল না, কারণ, তিনি ফকির নহেন, এক জন ডাক্তার।

এক দিন রাত্রি ৮টার সময় আবদুল করিম ডাক্তার কেফাতুল্লার "কাছারী-ঘরে" বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন, কেফাতুল্লা তাঁহার নিকটে বসিয়া ছিল। এই সময়ে তমিজদ্দী আসিয়া বলিল,—"ডাক্তার ছাহেব, আপনার একবার আসতি হবে।"

ডাক্তার বলিলেন,—"কোথায়?"

"ঐ রহম সেখের বাড়ী। তার ছাওয়াল গনির ভেদবমি হইছে।"

এই কথা শুনিয়া কেফাতুল্লা কান খাড়া করিয়া বলিল,—"গনির মা তোমারে পাঠাইছেন? ডাক্তারের টাকা দিতি পারবে?"

"কিসের টাকা? শোনলাম, ডাক্তার টাকা স্থান না, গ্রামের লোকরা চাঁদা কর‍্যা তেনারে আন্‌ছে।"

কেফাতুল্লা একটু উষ্ণভাবে বলিল—"সে মাগী এক পয়সাও চাঁদা দেয় নাই। ডাক্তার তার বাড়ী যাবেন ক্যান্? যাবেন না। সে যদি দুই টাকা দেয়, তবে ডাক্তার যাবেন।"

এই কথা শুনিয়া তমিজদ্দী চলিয়া গেল। ফুলজান তাহার ঘরে গনির পাশে বসিয়া বাতাস করিতেছিল। গনি কেবল জল জল করিয়া প্রবল তৃষ্ণায় ছট্‌ফট্ করিতেছিল। তমিজদ্দী যাইয়া কেফাতুল্লার কথাগুলি ফুলজানকে বলিল। ফুলজানের মুখ ঘৃণায় বিবর্ণ হইয়া গেল। কেফাতুল্লা এত দূর পাষণ্ড যে, এই ঘোর বিপদের সময়

তাহার উপর নির্য্যাতন করিতে একটুও কুণ্ঠিত হইল না। কিন্তু উপায়? তাহার হাতে একটি টাকাও নাই। সে নিতান্ত নিরুপায় হইয়া তমিজদ্দীকে বলিল—"চাচা, আমার আর একখান জেওর আছে, তা' রাখ্যা আমারে পাঁচটা টাকা দিতি পার?"

তমিজদ্দী কহিল,—"আমার ঘরে ত আর টাকা নাই।"

ফুলজান কহিল,—"আর কারও কাছে পাওয়া যায় কি না দেখ।"

তমিজদ্দী কহিল,—"আর কোথায় টাকা পাব? গ্রামে ত আর কোন মহাজন নাই, কেবল কেফাতুল্লাই সময় সময় টাকা ধার দেয়। সে ত তোমারে দেবে না; আচ্ছা, আমি নস্কার মামুদের কাছে একবার যাই, যদি সে টাকা দেয়।"

এই বলিয়া তমিজদ্দী প্রস্থান করিল। এই সময় গনি আর একবার বাহিরে গেল, এবং ফুলজান তাহাকে ধরিয়া আনিবার সময় সে দুর্ব্বলতার জন্ত পিঁড়ার উপর শুইয়া পড়িল। তাহার অবস্থা দেখিয়া ফুলজান কাঁদিয়া উঠিল।

কেফাতুল্লা জানিত, গনির মা ডাক্তারের জন্ত অবশেষে তাহারই শরণাপন্ন হইবে। তমিজদ্দী চলিয়া আসিলে, সে গরু খুঁজিবার ছলে বাহির হইয়া ফুলজানের কান্না শুনিয়া "ফুটি বড়ু, গণি কেমন আছে?" বলিয়া আসিয়া সে উঠানে দাঁড়াইল।

ফুলজান ক্রোধে ও ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া লইল। একবার মনে করিল, ঐ পাষণ্ডের সঙ্গে কথাই কহিবে না। পরে ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া নিতান্ত কাতর স্বরে বলিল—"মাতুব্বরের বেটা, তুমি আমার উপর বাদ সাধবার আর বুঝি সময় পাইলা না?"

কেফাতুল্লা কহিল,—"তোমারে সুখে থাকৃতি ভূতে কিলাবে, আমি তার কি করবো? আমার বাড়ীতে থাকলি তোমার এত দুক্ষু-কষ্ট হবে ক্যান্?"

ফুলজান ক্রুদ্ধা হইয়া বলিল,—"ছিঃ!—আবার সেই কথা! আমার জান্ গেলেও তোমার মত লোকের সাথে নিকা বসবো না। আমার জমীর উপর তোমার লোভ হইছে, তুমি সেই জমী ন্যাও। আজ ডাক্তার আন্যা আমার গনিকে বাঁচাও। দোহাই তোমার আল্লার!"

কেফাতুল্লা ব্যঙ্গ করিয়া বলিল,—"বিবিজান, এত গরম হও ক্যান্? তোমার এত 'ত্যাজ' ক্যান্? আমি তোমার জমীর কাঙ্গাল না। আমি চল্লাম।"

এই বলিয়া কেফাতুল্লা বাড়ীর বাহির হইল। ফুলজান নিতান্ত নিরুপায় হইয়া ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া মনে মনে বলিল,—"আল্লা! তোমার মনে এই ছিল!" এই বলিয়া এক মিনিটকাল নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া কি ভাবিল। পরক্ষণেই মন স্থির করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং বাহিরে আসিয়া কেফাতুল্লাকে ডাকিল,—"মাতুব্বরের বেটা!"

কেফাতুল্লা বেশী দূর যায় নাই, সে ডাক শুনিয়া ঘরের দুয়ারে আসিল। ফুলজান তাহাকে দেখিয়া বলিল,—"মাতুব্বরের বেটা! আমার কপালে যা আছে, তাই হবে। আমি রাজী; তুমি ডাক্তারকে বোলাও।"

এইরূপে সেই চির-মহিমময় মাতৃহৃদয় সন্তানের জীবন-রক্ষার জন্ত আত্মবিসর্জ্জন করিল!

কেফাতুল্লা অমনই দৌড়াইয়া গিয়া সেই ডাক্তারকে ডাকিয়া আনিল। ডাক্তার রোগীকে পরীক্ষা করিয়া ঔষধ দিলেন। গনির নিতান্ত পরমায়ুর জোর ছিল, তাই সেই হাতুড়ে ডাক্তারের চিকিৎসায় সে বাঁচিয়া উঠিল।

ইহার এক মাস পরে কেফাতুল্লার সহিত ফুলজানের নিকা হইল। কেফাতুল্লা আসিয়া তাহার জমী বাড়ী দখল করিয়া বসিল।

## ৪

ফুলজান কেফাতুল্লার সংসারে প্রবেশ করিয়া দেখিল, সেখানে রাণী রাসমণির সুখ ত নাই-ই, সামান্ত কৃষক-গৃহিণীর সুখও নাই। কেফাতুল্লার আর দুইটি স্ত্রীর যে দশা, তাহারও সেই দশা ঘটিল। নিজের গৃহে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল, এখানে সে সেই দুর্দ্দান্ত লোকের অধীন। কেফাতুল্লা তাহার অপর দুই স্ত্রীকে সামান্ত ত্রুটির জন্ত প্রহার করিত, ফুলজান তাহা দেখিয়া ভাবিত, কবে তাহার ভাগ্যেও সেই প্রকার আদর ঘটিবে। সে তাহার পূর্ব্ব-স্বামীর ভালবাসার কথা স্মরণ করিয়া সর্ব্বদা বিষণ্ণ থাকিত। সে তাহার জীবনের সম্বল শিশুটির প্রাণরক্ষার জন্ত স্বেচ্ছায় এই দাসীত্ব স্বীকার করিয়াছিল, এখন কিসে সেই শিশুটি মানুষ হইবে, ইহাই সে সর্ব্বদা ভাবিত। সে গনিকে গ্রামের স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়ার জন্ত কেফাতুল্লাকে অনুরোধ করিয়াছিল। কিন্তু কেফাতুল্লা বলিল—

"চাষার ছাওয়াল ন্যাখাপড়া শিখ্যা বাবু হবে, সে আর ক্ষ্যাতখামারের কাম করবে না।" সুতরাং গনিকে স্কুলে দেওয়া হইল না। কেফাতুল্লা গনির ভবিষ্যৎ জীবনযাত্রার পথ ঠিক করিয়া তাহাকে নিজের গরুর রাখাল নিযুক্ত করিল।

এক দিন মনিরদ্দী আসিয়া কেফাতুল্লার কাছে নালিশ করিল. কেফাতুল্লার এক পাল গরু তাহার কলাইয়ের ক্ষেতে ঢুকিয়া সব ফসল নষ্ট করিয়াছে। ইহা শুনিয়া কেফাতুল্লা অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিয়া গনিকে মারিবার জন্য ধাবিত হইল। গনি ভয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার সেই একমাত্র আশ্রয়-স্থান মাতৃ-অঞ্চলে লুকাইল। "শালার বেটা, আজ তোর এক দিন আর আমার এক দিন," ক্রোধভরে ইহা বলিতে বলিতে কেফাতুল্লা গনিকে লক্ষ্য করিয়া লাঠির বাড়ি মারিল। ফুলজান তাহা ঠেকাইতে গিয়া নিজে আহত হইল। সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"এই রকম একটা লাঠির বাড়ি খাইলে ও ত এখনই মরিয়া যাইত—ওর যে পুঁটীর প্রাণ। মারো—আজই ওরে ম্যার‍্যা ফ্যালো—তোমার আপদবালাই দূর হউক!"

কেফাতুল্লা আরও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—"উনি এক নবাবের বেটা নবাব! ওনারে কোন কামে দিলি এই রকম গা ফিলি করবেন আর বস্তা বস্তা চারবেলা খাবেন। এত খাওয়া আসে কোথায় থেকে?"

ফুলজান চক্ষু মুছিয়া বলিল—"ও তোমার ভাত খায় কি না? ওর যেন কিছুই নাই। ওরে ম্যার‍্যা ফেলতি পারলিই তুমি বাঁচ!"

কেফাতুল্লা ভয়ানক চটিয়া উঠিয়া বলিল—"কি বললি, হারামজাদী! তোর ছোট মুখি বড় কথা? আমি ওনারে যতই খাতির কর‍্যা চলি, উনি ততই আসকারা পাইয়্যা গেছেন। লাথির ঢেঁকি মাথায় চড়লি এই দশাই হয়।"

এ দিনকার পালা এখানেই শেষ হইল।

## ৮

কুতুবপুর স্কুলে আজ বড় ধূম। আজ ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টার মৌলবী এমদাদ আলী স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিয়াছেন। স্কুলঘর লতা-পাতা দিয়া সজ্জিত করা হইয়াছে, শিক্ষক ও ছাত্রগণ যথাসম্ভব পরিষ্কার কাপড় পরিয়া স্কুলে আসিয়াছে। এই মুসলমানপ্রধান স্থানে স্কুলের শিক্ষক তিনটিই মুসলমান, ছাত্রদের মধ্যেও অধিকাংশ মুসলমান। মৌলবী সাহেব একটি ক্লাসে বসিয়া ছাত্রদের পরীক্ষা করিতেছেন। সে ক্লাসে দশটি ছাত্র। তিনি প্রশ্ন করিলেন,—

"বল ত তাজমহল কোথায়?"

একটি ছাত্র বলিল "আগ্রায়।"

"তাজমহল কে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন?"

একটি ছাত্র বলিল—"সম্রাট আকবর।"

"না, ভুল বলিয়াছ।"

এই বলিয়া তিনি অন্যান্য ছেলেদের জিজ্ঞাসা করিলেন, কেহই সদুত্তর দিতে পারিল না। এই সময়ে স্কুল-ঘরের বারান্দা হইতে উত্তর আসিল —

"সম্রাট সাজাহান।"

মৌলবী সাহেব সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, একটি সৌম্যদর্শন বালক সেখানে বসিয়া আছে, তাহার কিছু দূরে মাঠে কতকগুলি গরু চরিতেছে। তিনি সেই বালকটিকে কাছে ডাকিলেন এবং শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ ছেলেটি বাহিরে বসিয়া আছে কেন? এ কোন্ ক্লাসে পড়ে?"

শিক্ষক বলিলেন—"আজ্ঞে, ও স্কুলে পড়ে না—এই মাঠে গরু চরায়, আর প্রায়ই এই বারান্দায় আসিয়া বসিয়া থাকে ও পড়ান শোনে।"

মৌলবী সাহেব আশ্চর্য্য হইয়া সেই ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি বই পড়তে পার?"

বালক বলিল—"না। আমি অক্ষর চিনি না।"

"আচ্ছা, সাজাহান কে, তুমি জান?"

"জানি—জাহাঙ্গীর বাদশার ছেলে সাজাহান।"

"জাহাঙ্গীরের বাপের নাম কি?"

"আকবর।"

"সাজাহানের কয় ছেলে ছিল?"

"দারা, মুরাদ, ঔরঙ্গজেব, সুজা।"

"ইহাদের মধ্যে কে বাদশা হয়েছিলেন?"

"ঔরঙ্গজেব।"

"তুমি এ সব কোথায় শিখলে?"

"এখানে বসিয়া। আমি যা' একবার শুনি, তা' কখনও ভুলি না। এই যে সব বই এখানে ছেলেরা পড়ে, আমি তা'ও কিছু কিছু শিখেছি।"

"আচ্ছা, কি শিখিয়াছ শুনি। একটা কবিতা মুখস্থ বল ত।"

অমনই সে মুখস্থ বলিল—

"ক্রোধের সমান পাপ না আছে সংসারে।
প্রত্যক্ষ শুনহ ক্রোধ যত পাপ ধরে॥
লঘু গুরু ভেদ নাহি থাকে ক্রোধকালে।
অসত্য বচন লোক ক্রোধকালে বলে॥
থাকুক অন্যের কায নিজে হয় অরি।
বিষ খায় ডুবে মরে, অস্ত্র অঙ্গে মারি॥
ক্রোধে পাপ ক্রোধে তাপ ক্রোধে কুলক্ষয়।
ক্রোধ হেতু মানুষের সর্ব্বনাশ হয়॥
হেন ক্রোধে যেই জন জিনিবারে পারে।
ধন্য তারে বলে সবে পৃথিবী-মাঝারে॥"

মৌলবী সাহেব এই রাখাল-বালকের অসাধারণ মেধা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তাহার আবৃত্তিও খুব চমৎকার। তিনি তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলে, সে বলিল, "আমার নাম গনি।"

মৌলবী সাহেব স্কুল পরিদর্শন শেষ করিয়া রসুলপুরের ডাকবাংলায় গিয়া অবস্থিতি করিলেন। যাইবার সময় এই রাখাল-বালকের অভিভাবক কেন উহাকে স্কুলে পড়িতে দেয় না, ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহ করিলেন, এবং কেফাতুল্লাকে চৌকীদার দ্বারা ডাকাইয়া পাঠাইলেন।

কেফাতুল্লা যখন শুনিল, এক ডেপুটী সাহেব তাহার তলব করিয়াছেন, তখন সে ভাল এক ছড়া পাকা কলা ভেট লইয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গেল। মৌলবী সাহেব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"গনি ছেলেটি তোমার কে?"

"আজ্ঞে, হুজুর, সে আমার স্বাবপক্ষর নিকার কবিলার প্রথম পক্ষের সন্তান।"

"তুমি তাকে স্কুলে পড়তে দেও না কেন?"

"হুজুর! আমি নিতান্ত গরীব, পড়ার খরচ দিতি পারি না।"

"আচ্ছা, যদি আমি উঁহার পড়ানর ভার লই, তবে তোমার কোন আপত্তি আছে?"

কেফাতুল্লা তাঁহার কথার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া ফ্যালফ্যাল করিয়া তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। তখন পার্শ্বে দণ্ডায়মান স্কুলের শিক্ষক মুন্সী আদিলদ্দীন তাঁহাকে সকল কথা বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন,—"মিএগ, তোমার এই হাতুয়া ছেলের অদৃষ্ট খুব ভাল। সে হুজুরের নেকনজরে পড়িয়াছে। তুমি উহাকে হুজুরের সঙ্গে যাইতে দেও। ও লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হবে।"

সেই "হাতুয়া" ছেলের উন্নতির চিন্তায় কেফাতুল্লার রাত্রিতে ঘুম হইত না। সে মনে করিল, তাহার ঘাড় থেকে যদি একটা বোঝা নামিয়া যায়, তবে সে ত ভাল কথা। আর তার জমী ও বাড়ীরও সে অপ্রতিদ্বন্দী মালিক হইবে। তবে তার মাতা ফুলজানকে রাজী করিতে পারিলে হয়। সে বলিল, "হুজুরের যে মর্জ্জী। ওরে ছাড়িয়া দিতে আমার কোন আপত্তি নাই। তবে ওর মা রাজী হইলে হয়।"

মৌলবী সাহেব গনির মাকে সকল কথা বুঝাইয়া বলিবার জন্য আদিলদ্দীন মুন্সীকে কেফাতুল্লার সঙ্গে পাঠাইলেন।

ফুলজান যখন তাহার পুত্রের গুণগরিমার কথা শুনিল, তখন সে তাহাকে কোলে করিয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিল। সে ভাবিয়া দেখিল, এখানে থাকিলে তাহার লেখাপড়া শেখার কোন আশা নাই, বরং কোন্ সময়ে কেফাতুল্লার লাঠির আঘাতে তাহার প্রাণ বাহির হইবে। মৌলবী সাহেব যদি দয়া করিয়া তাহাকে তাঁহার নিজের বাসায় রাখিয়া লেখাপড়া শেখান, তবে ত ফুলজান বাঁচিয়া যায়। তবে এক কষ্ট,সে তাহাকে দীর্ঘকাল না দেখিয়া কি প্রকারে থাকিবে? কিন্তু কাছে রাখিলেও ত তাহার সুখ নাই। যাহাতে ছেলের ভবিষ্যতে মঙ্গল হয়, তাহার তাহাই করা কর্ত্তব্য।

এই সকল বিবেচনা করিয়া সে গনিকে মৌলবী সাহেবের সঙ্গে যাইতে অনুমতি দিল। গনি মাতার নিকট হইতে যাইবার সময় কাঁদিল, ফুলজানেরও যেন তাহাকে দূরে পাঠাইতে কলিজা ছিঁড়িয়া গেল। মৌলবী সাহেব গনিকে বলিলেন, যখনই তিনি এখানে স্কুল দেখিতে আসিবেন, তখন তাহাকে সঙ্গে আনিবেন। এইরূপে গনিকে বিদায় করিয়া কেফাতুল্লা মনে করিল, তাহার ঘাড় হইতে একটা বোঝা নামিয়া গেল।

### ৬

গনি মৌলবী সাহেবের সঙ্গে জেলার সদরে আসিয়া একটা হাই স্কুলে ভর্ত্তি হইল। প্রথম প্রথম নূতন যায়গায় আসিয়া তাহার মন অস্থির হইল,- পরে স্কুলে নূতন সঙ্গী পাইয়া পড়ার উৎসাহে ও খেলার আমোদে সে বাড়ীর কথা ভুলিয়া গেল। মৌলবী সাহেবের স্ত্রীর ছেলে হয় নাই. একটিমাত্র শিশু কন্যা। তিনি গনিকে পুত্রের ন্যায় যত্ন করিতে লাগিলেন। ইহাতে সে তাহার মাতার অভাবও কথঞ্চিৎ বিস্মৃত হইল। মৌলবী সাহেব বৎসরের মধ্যে দুইবার রসুলপুর ডাকবাংলায় গিয়া স্কুল পরিদর্শন করিতেন। তখন তিনি গনিকে সঙ্গে লইয়া যাইয়া তাহার মাকে দেখাইয়া আনিতেন। গনি ভদ্রলোকের গৃহে থাকিয়া ভদ্রলোকের ছেলের মত শিক্ষিত হইতেছে দেখিয়া ফুলজানের কত আনন্দ হইত! এইরূপে ৩ বৎসর অতীত হইল। গনি অসাধারণ মেধাবী ও পরিশ্রমী বলিয়া ডবল প্রমোশন পাইয়াই প্রবেশিকা পরীক্ষা দিল এবং বিভাগের মধ্যে প্রথম হইয়া মাসিক ১৫ টাকা বৃত্তি পাইল। মৌলবী সাহেব এই সময়ে বিভাগীয় সহকারী ইন্‌স্পেক্টারের পদ প্রাপ্ত হইয়া ঢাকায় বদলী হইলেন। গনি তাঁহার সঙ্গে ঢাকায় গিয়া কলেজে ভর্ত্তি হইল। সে বি, এ, পরীক্ষা দিলে মৌলবী সাহেব তাহার সহিত তাঁহার একমাত্র কন্যার বিবাহ দিলেন।

গনি গত ৩।৪ বৎসর তাহার মাকে দেখিতে যায় নাই। তাহার কারণ, তাহার মা কেফাতুল্লার সংসারে থাকিয়া যে ভাবে জীবন যাপন করিত, তাহা তাহার নিতান্ত অসহ্য বোধ হইত। সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, তাহার মাতার দাসীত্ব মোচন করিতে না পারিলে সে আর মাকে দেখিতে যাইবে না। এ দিকে কেফাতুল্লার ঔরসে ফুলজানের আর দুইটি ছেলে হইয়াছে, ফুলজান তাহাদিগকে লইয়া সুখে দুঃখে দিন কাটাইতেছে।

মৌলবী সাহেব গনির বিবাহের সময় কেফাতুল্লাকে গনির মাকে লইয়া আসিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ফুলজান বলিল,—"আমার ছেলে বেঁচে থাকুক, সে রাজ্যিশ্বর রাজা হউক, আমি চাষার মেয়ে, চাষার বৌ, আমি ভদ্রলোকের বাড়ীতে লজ্জা দিতে ও লজ্জা পাইতে যাব না। গনির যদি কখনও সাধ হয়, তবে আমাকে তার বৌ দেখাইবে।"

গনির পরীক্ষার ফল বাহির হইলে দেখা গেল, সে ইংরাজী সাহিত্য ও ইতিহাসে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। তখন মৌলবী সাহেব তাহাকে কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে এম, এ, পড়িতে পাঠাইলেন, এবং ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী পরীক্ষা দিতে বলিলেন। গনি এম, এ পরীক্ষা দেওয়ার পূর্ব্বেই প্রতিযোগী পরীক্ষায় প্রথম হইয়া ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্যে নিযুক্ত হইল।

### ৭

এক দিন বেলা ১০টার সময় কেফাতুল্লা তাহার বাড়ীর বাহিরের উঠানে ধান মলিতেছিল। সে দেখিল, একটি সাহেবের সঙ্গে এক জন লাল পাগড়ীওয়ালা ও অনেকগুলি চৌকীদার তাহার বাড়ীর দিকে আসিতেছে। কিছু দিন হইল, সে গয়াজদ্দীর সঙ্গে একটা জমীর ধান কাটা লইয়া হাঙ্গামা করিয়া গয়া জদ্দীর মাথা ফাটাইয়া দিয়াছিল। গয়াজদ্দী থানায় কোন সুবিধা করিতে না পারিয়া সদরে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট নালিশ করিয়াছিল। তদবধি কেফাতুল্লা শঙ্কিত হইয়া আছে, কোন্ সময়ে তাহার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হয়। সে এখন মনে করিল, ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য সদলবলে আসিতেছেন। সে অমনই তাড়াতাড়ি বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটা ধানের গোলার মধ্যে আত্মগোপন করিল। এ দিকে সেই সাহেব দফাদার ও চৌকীদারগণ সহ আসিয়া তাহার উঠানে দাঁড়াইল। তাহার গায়ের রঙ খুব ফর্সা, হাট-কোট, কলার, নেক্‌টাই প্রভৃতি দ্বারা সে আগাগোড়া সজ্জিত। দফাদার হাঁকিল, "কেফাতুল্লা বাড়ী আছ? ও ভাই কেফাতুল্লা! ডেপুটী সাহেব তোমার বাড়ী আসিয়াছেন।"

কিন্তু কোথাকার কেফাতুল্লা কোথায়? একে ত সে আসামী, তাহার বাড়ীতে স্বয়ং ডেপুটী সাহেব আসিয়াছেন। সে কোন্ সাহসে তাঁহার সম্মুখীন হইবে?

দফাদারের ডাকের উত্তরে বাড়ীর মধ্য হইতে কে একটি স্ত্রীলোক বলিলেন, "সে বাড়ী নাই।"

ডেপুটী সাহেব ইংরাজী ভাষায় "Not at home" কথা স্মরণ করিয়া মনে মনে হাসিলেন।

দফাদার বলিল, "বাড়ীতে কে আছ, বসবার জন্য একটা চেয়ার কি মোড়া বাহির করিয়া দেও।"

ডেপুটী সাহেব বলিলেন, "না, সে সবের দরকার নাই। আমি ঐ কাছারী-ঘরের চৌকীর উপর বসিতেছি।"

এই বলিয়া তিনি কাছারী-ঘরে চৌকীর উপর বসিলেন এবং সুটকেশ খুলিয়া কাপড়-চোপড় বাহির করিয়া সাহেবী পোষাক ছাড়িয়া এক জন মুসলমান ভদ্রলোকের বেশ পরিধান করিলেন।

এই সকল দেখিয়া বাড়ীর মধ্যে কানাকানি চলিতে লাগিল এবং একটু পরেই কেফাতুল্লা বাহিরে আসিয়া "হুজুর, আদাব" বলিয়া করযোড়ে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল। ডেপুটী সাহেব তাহাকে সেলাম করিয়া পাশে বসিতে বলিলেন, কেফাতুল্লা বসিতে সাহস করিল না।

ডেপুটী সাহেব বলিলেন, "আমাকে চিনিলেন না? আমি গনি। মা-জী কোথায়?"

ফুলজান অদূরে দাঁড়াইয়া বেড়ার ফাঁক দিয়া দেখিতেছিল। সে অমনই দৌড়াইয়া ঘরের মধ্যে আসিল এবং "বাপজান্, এই যে আমি। এত দিনে তোর দুখিনী মারে মনে পড়েছে? আয়, আমার কোলে আয়" বলিয়া সে গনিকে জড়াইয়া ধরিল। গনিরও চোখে জল আসিল।

কেফাতুল্লা হতভম্ব হইয়া এই কাণ্ড দেখিতেছিল। এতক্ষণে তাহার মুখ ফুটিল। সে ফুলজানকে তিরস্কার করিয়া বলিল, "আলো মাগী, কি করিস্? হুজুরের গায়ে যে তোর হাতের গোবর-কাদা লাগল।"

গনি হাসিয়া বলিল—"লাগুক, লাগুক। আমি অনেক দিন মা'র কোলে যাই নাই।"

কেফাতুল্লা বলিল, "হুজুর, আপনি যে কত বড় লোক, ও মাগী তা কি বোঝে?"

গনি বলিল, "মা-বাপের কাছে ছেলে চিরদিনই ছোট। মা, আপনি এত ব্যস্ত হবেন না। মা, কাল রাত্রিতে আমার কিছু খাওয়া হয় নাই, এখন কিছু খেতে দেও।"

কেফাতুল্লা অমনই এক লাফ দিয়া বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল এবং গনির খাওয়ার যোগাড় করিতে চলিল। সে নিজে একটা ভাণ্ড হস্তে করিয়া গাভী দোহন করিতে গেল এবং বাজার হইতে মাছ কিনিয়া আনিবার জন্ত এক জন চৌকীদারের উপর হুকুম জারি করিল। এবার তাহাকে পায় কে? সে ডেপুটী সাহেবের বাপ। সে মনে মনে ভাবিল, গয়াজদ্দীর ঘড়ে কয়টা মাথা, তাহা সে এবার দেখিয়া লইবে। সে ডেপুটী সাহেবের বাপ! সে বাড়ীর বাহির হইয়া প্রতিবেশীদিগের মধ্যে প্রচার করিয়া দিল, তাহার পুত্র আবদুল গনি ওরফে গনি মিঞা ডেপুটী সাহেব অনেকগুলি "পুলুষ" লইয়া তাহার বাড়ীতে আসিয়াছে। গ্রামবাসী সকলে সাবধান! কেহ তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিও না! এই সংবাদ শুনিয়া অনেক কৌতূহলী কৃষক ডেপুটী সাহেবকে দেখিতে আসিল এবং দূরে দাঁড়াইয়া সভয়ে সেলাম করিল।

গনি আহারাদির পর বিশ্রাম করিতেছিল। তাহার মা আসিয়া তাহার কাছে বসিল। গনি ফুলজানকে বলিল, "সে অনেক দিন যাবৎ মাতৃস্নেহে বঞ্চিত হইয়া আছে, তাহার একান্ত ইচ্ছা, তাহার মা এখন গিয়া তাহার সঙ্গে থাকেন। সে আর তাহার মা'র কষ্ট দেখিতে পারে না।"

ইহার উত্তরে ফুলজান বলিল—"বাপজান, তুই যে তোর দুঃখিনী মাকে মনে রাখিয়াছিস, ইহাতেই আমি সুখী। আমার আর এখানে কোন কষ্ট নাই। আমি চাষার মেয়ে, চাষার বৌ, আমি এই চাষার বাড়ীতেই বেশ আছি। এখানে তোর যে আর দুইটা ভাই হইয়াছে, তাদের নিয়ে আমি এখানেই থাকিব। তবে মধ্যে মধ্যে তোমাদিগকে দেখিয়া আসিব।"

অবশেষে মাতা-পুত্র পরামর্শ করিয়া স্থির করিল, গনির পৈতৃক ভিটায় কেফাতুল্লা চাষ দিয়া বেগুণের ক্ষেত করিয়াছিল, গনি সেখানে একটা বাড়ী করিবে এবং তাহার মা সেখানে গিয়া বাস করিবে। কেফাতুল্লাও ইহাতে সম্মত হইল। কিন্তু গয়াজদ্দীর মোকদ্দমায় যখন তাহার তিন মাস জেল হইল, তখন সে গনির উপর রাগ করিয়া ফুলজানকে বলিল—"তোর প্যাটের ছাওয়াল ত, ও ডেপুটীই হউক আর জজই হউক, ওর তিন পয়সারও মুরাদ নাই।"

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

# স্বরলিপি

জৌনপুরী তোড়ী—একতালা।

ও রাঙ্গা চরণ আজি কি দিয়ে পূজিব শ্যামা,
রাঙ্গা পদে সাদা ফুল দিতে মন জানে না।
মনে করি রাঙ্গা জবা দিলে সাজিবে কিবা,
কিন্তু এমনি চরণ রাঙ্গা, রাঙ্গা জবা তাও সাজে না।

সুর ও কথা— শ্রীযোগেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

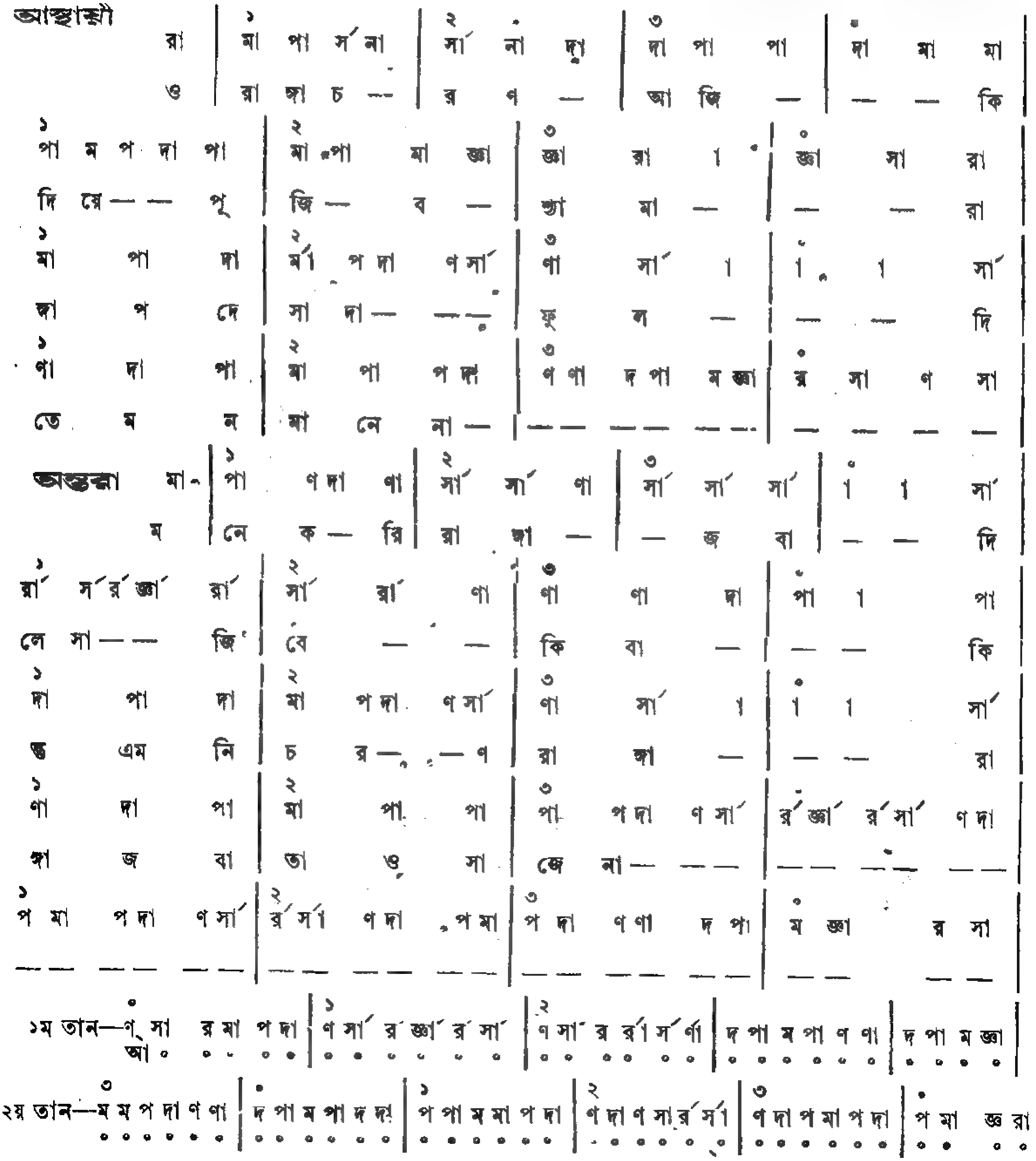
আস্থায়ী
ও রাঙ্গা চরণ আজি কি
দিয়ে পূজিব শ্যামা রা
ঙ্গা পদে সাদা ফুল দি
তে মন জানে না
অন্তরা
মনে করি রাঙ্গা জবা দি
লে সাজিবে কিবা কি
ন্তু এমনি চরণ রাঙ্গা রা
ঙ্গা জবা তাও সাজে না
১ম তান—
আ
২য় তান—

## প্ল্যাকার্ড লাগাও !

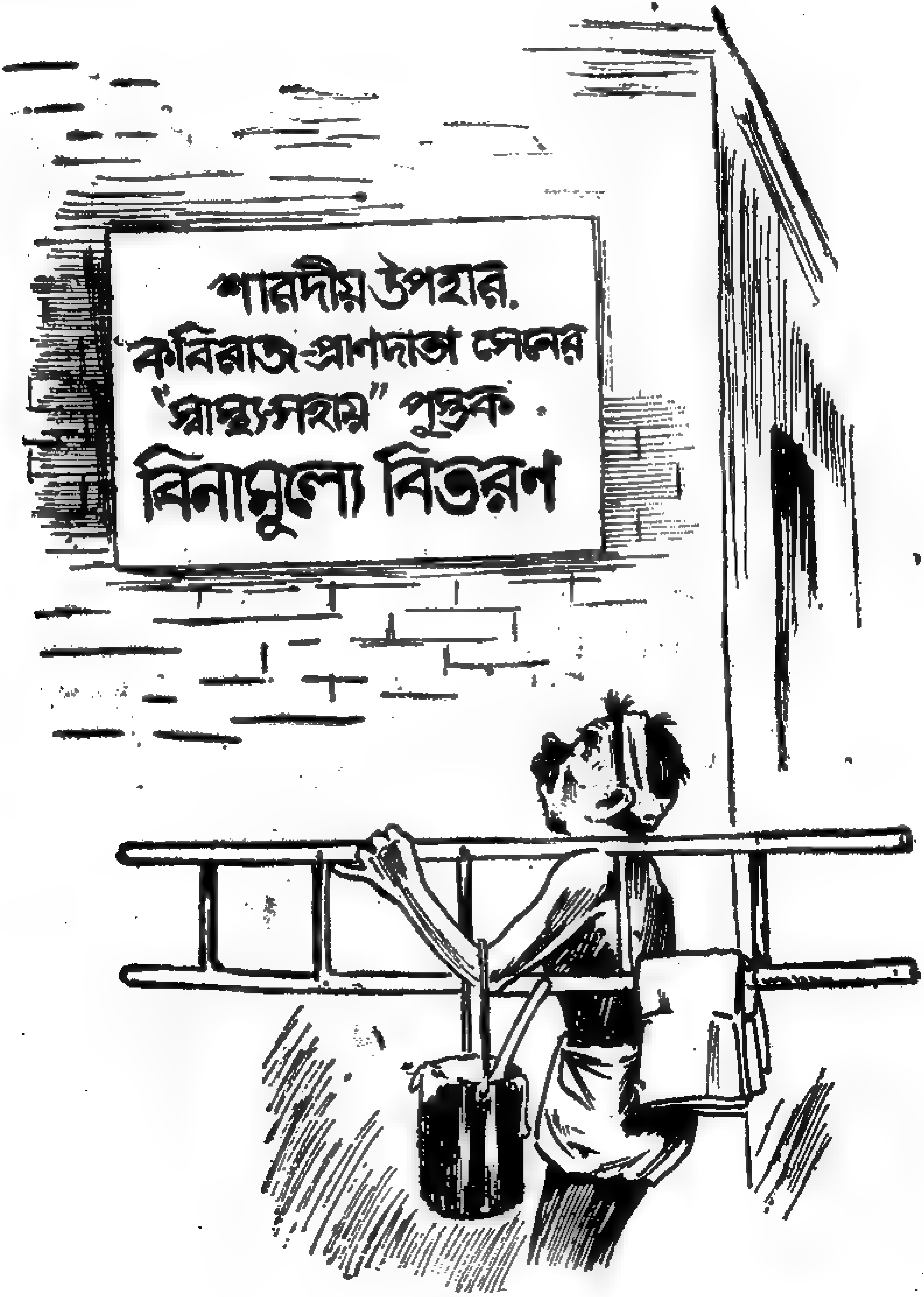
শারদীয় উপহার.
কবিরাজ-প্রাণদাতা সেনের
"স্বাস্থ্যসহায়" পুস্তক
বিনামূল্যে বিতরণ

পূজার বাজারে তাড়াতাড়ি প্ল্যাকার্ড কয়খানা মারিয়া
সরিতে পারিলেই বাঁচি !

# প্ল্যাকার্ডের উপর প্ল্যাকার্ড !

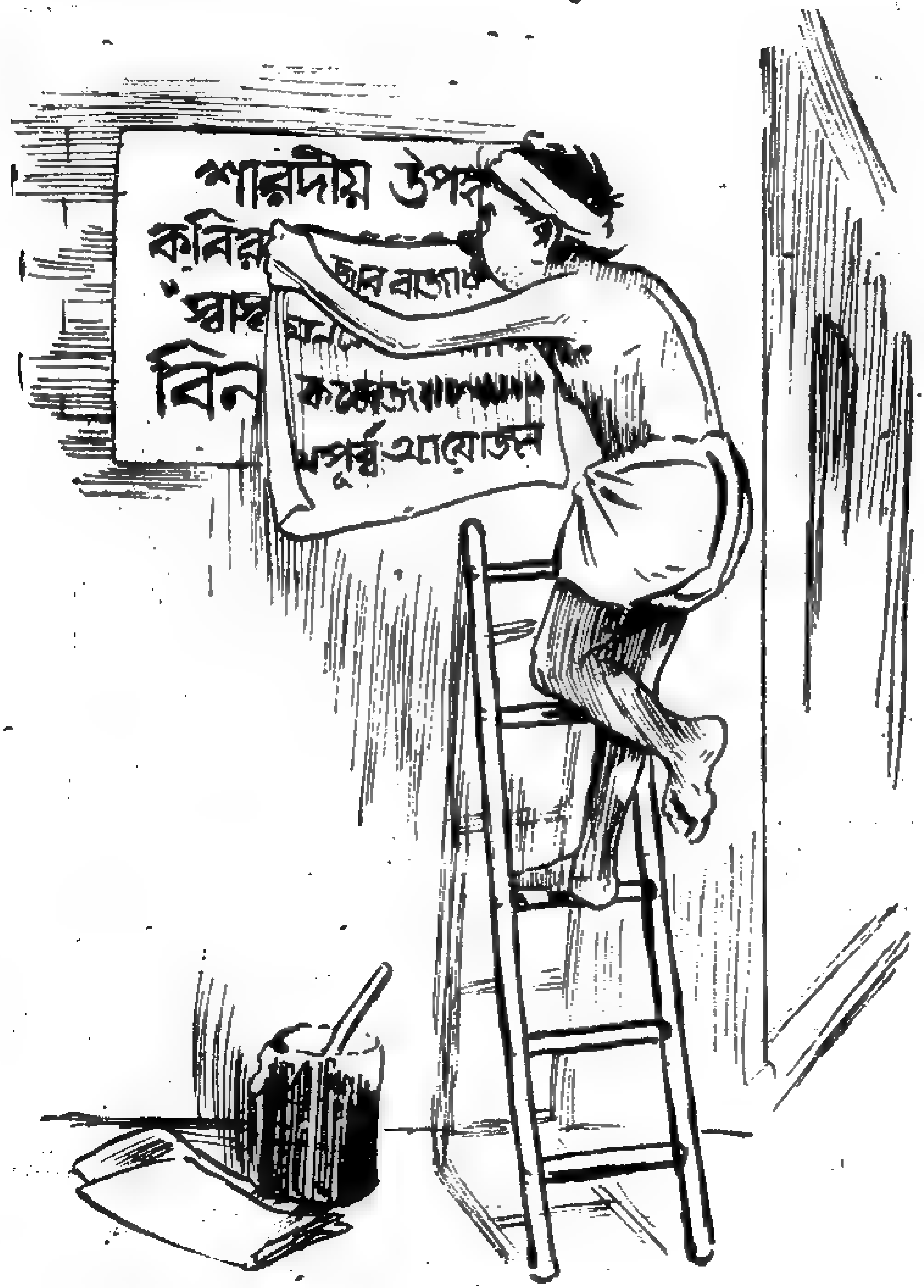
শারদীয় উপন্
কবির
স্বাস্থ
বিন
সম্পূর্ণ আয়োজন

এই যে—এই একটা প্ল্যাকার্ড মারবার যায়গা—
প্ল্যাকার্ডের উপর প্ল্যাকার্ড মারলে আঠাটাও কম লাগবে।

## দৃষ্টি আকর্ষণ।

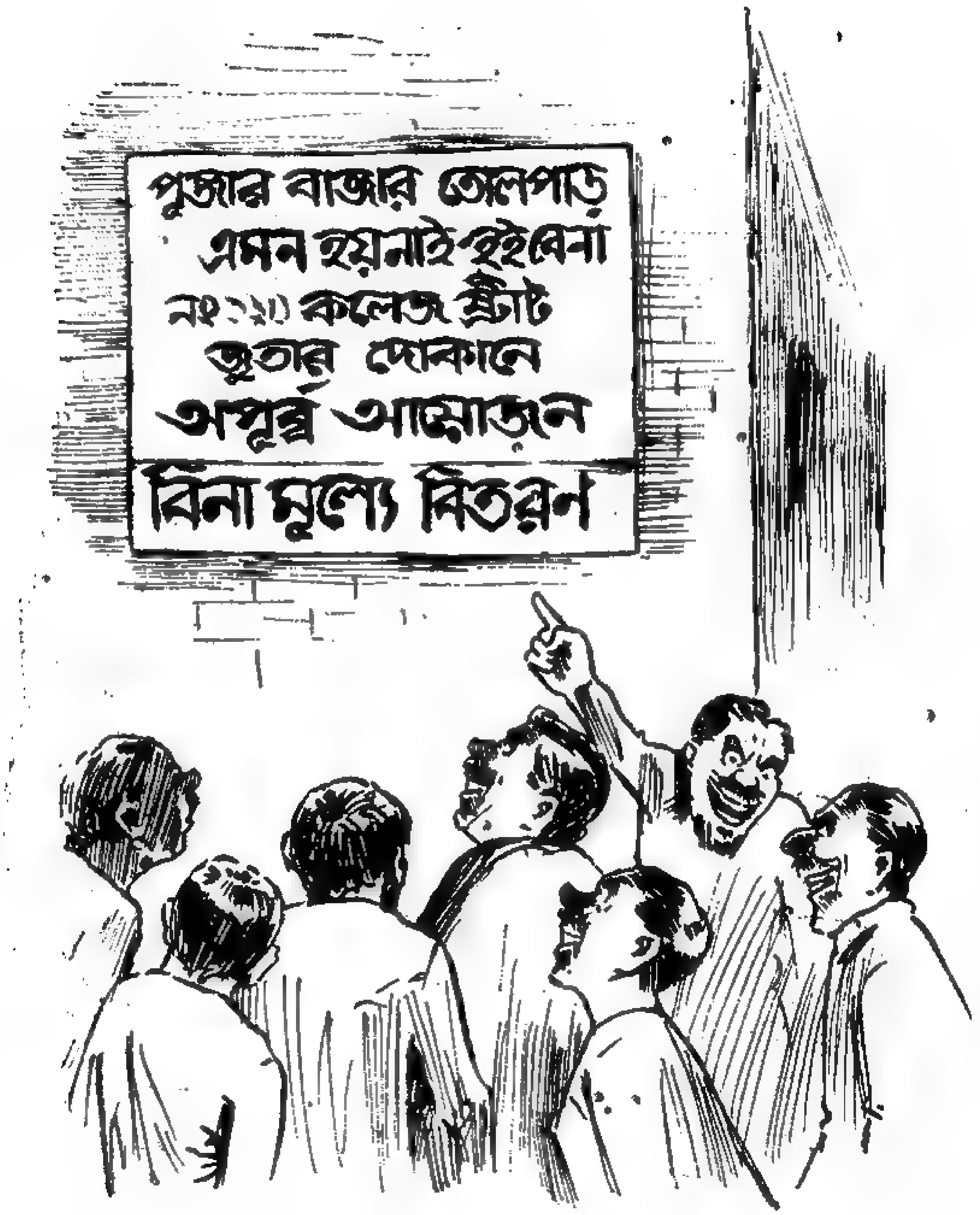
পুজার বাজার তোলপাড়
এমন হয়নাই হইবেনা
নং ২১১ কলেজ ষ্ট্রীট
জুতার দোকানে
অপূর্ব্ব আয়োজন
বিনা মূল্যে বিতরণ

লোক আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল—জুতার দোকানে 'বিনামূল্যে বিতরণ !'
'পূজার বাজার তোলপাড়ই' বটে—যে দেখিল, সেই ছুটিল।

আসুন ! আসুন !

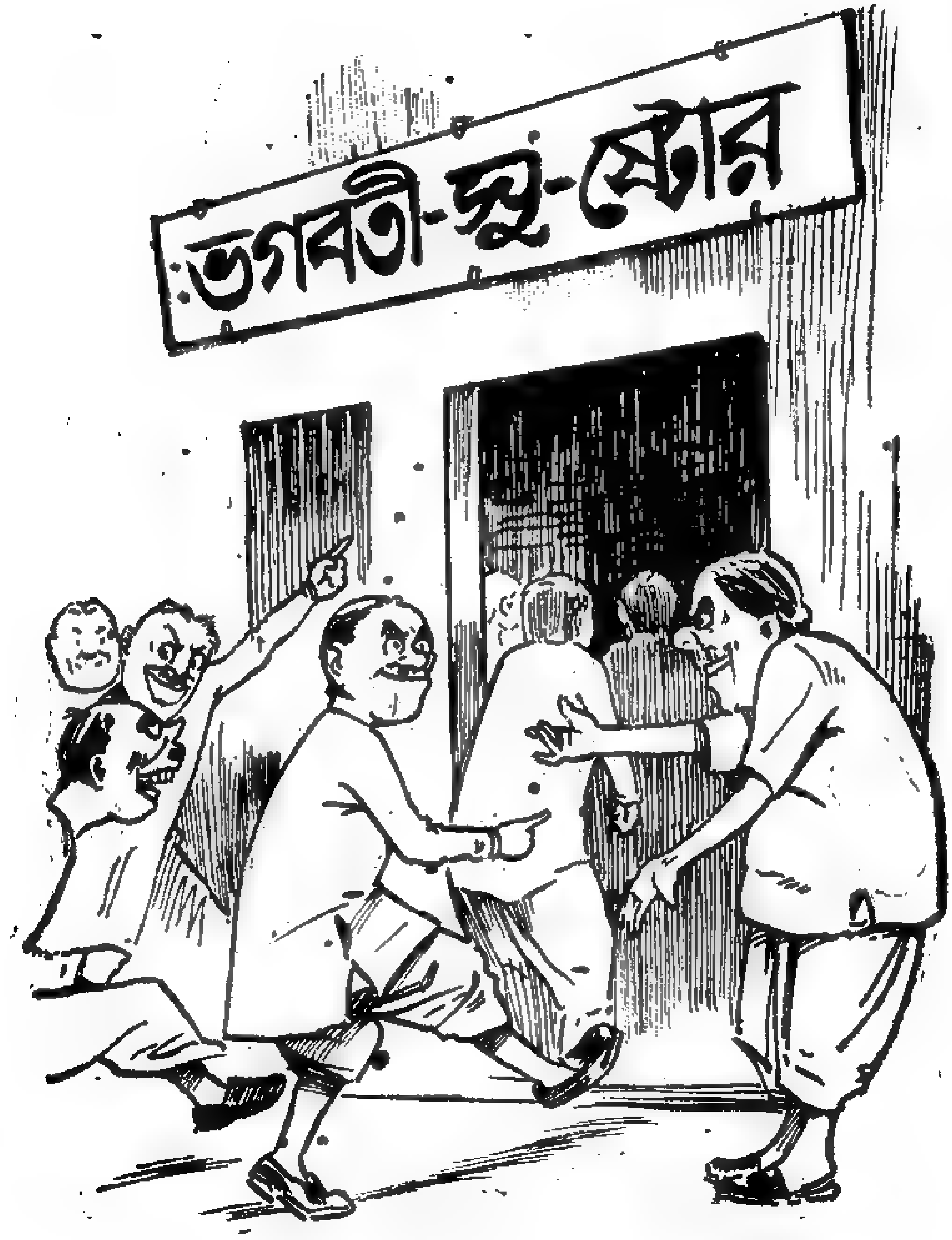

সকলে কাযকর্ম্ম ফেলিয়া একবারে 'ভগবতী-সু-ষ্টোরে' গিয়া হাজির—
আশাতিরিক্ত খরিদ্দার দেখিয়া—দোকানদারের হাসি আর ধরে না—

দোকানে বিষম ভিড়।

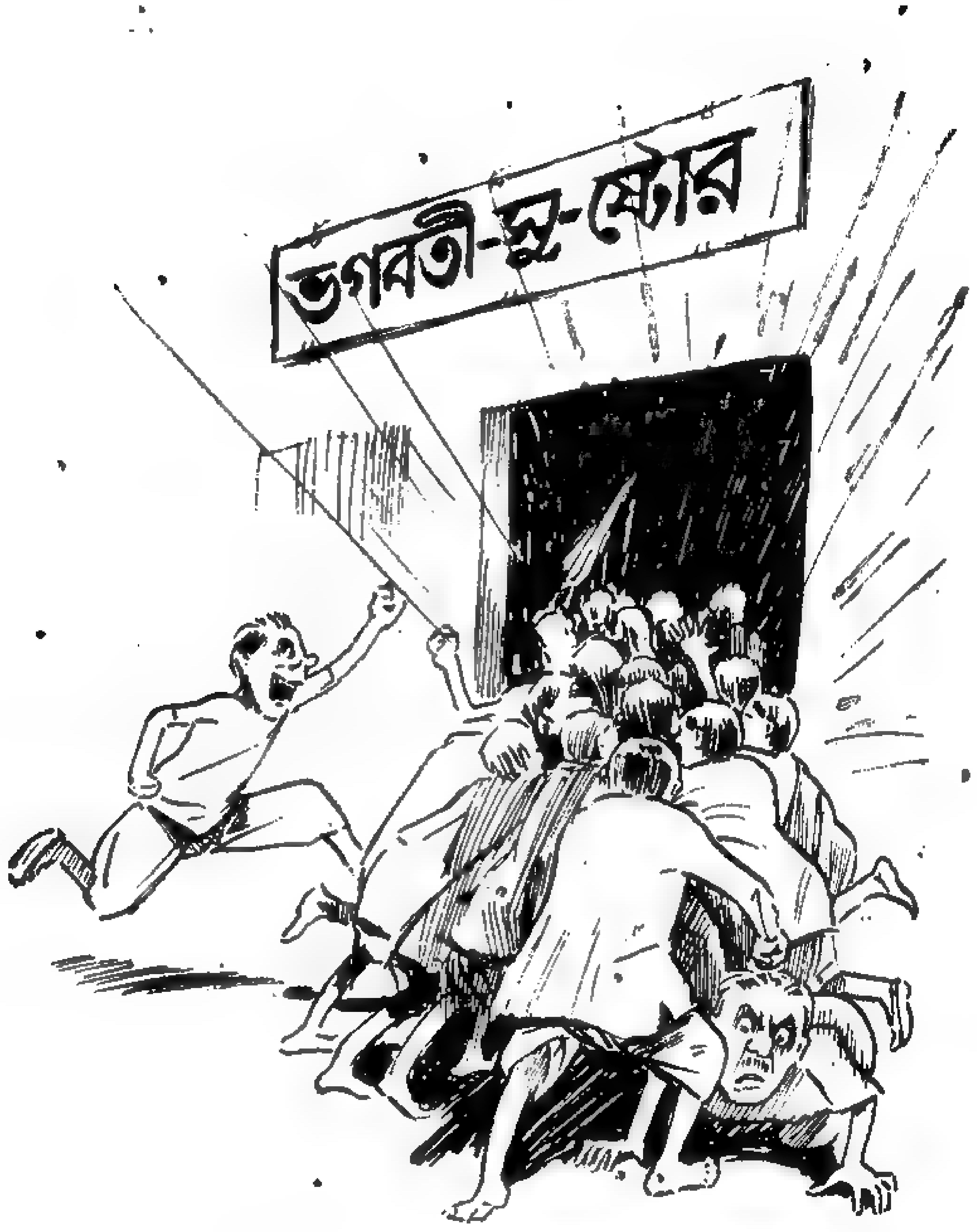

ঠেলাঠেলির চোটে প্রাণ যায়—তবু 'পেটে খেলে পিঠে সয়' ভাবিয়া
লাভের আশায় উৎফুল্ল দোকানদার সকলকে সযতনে
জুতা দেখাইতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল।

## বিনামূল্যে !

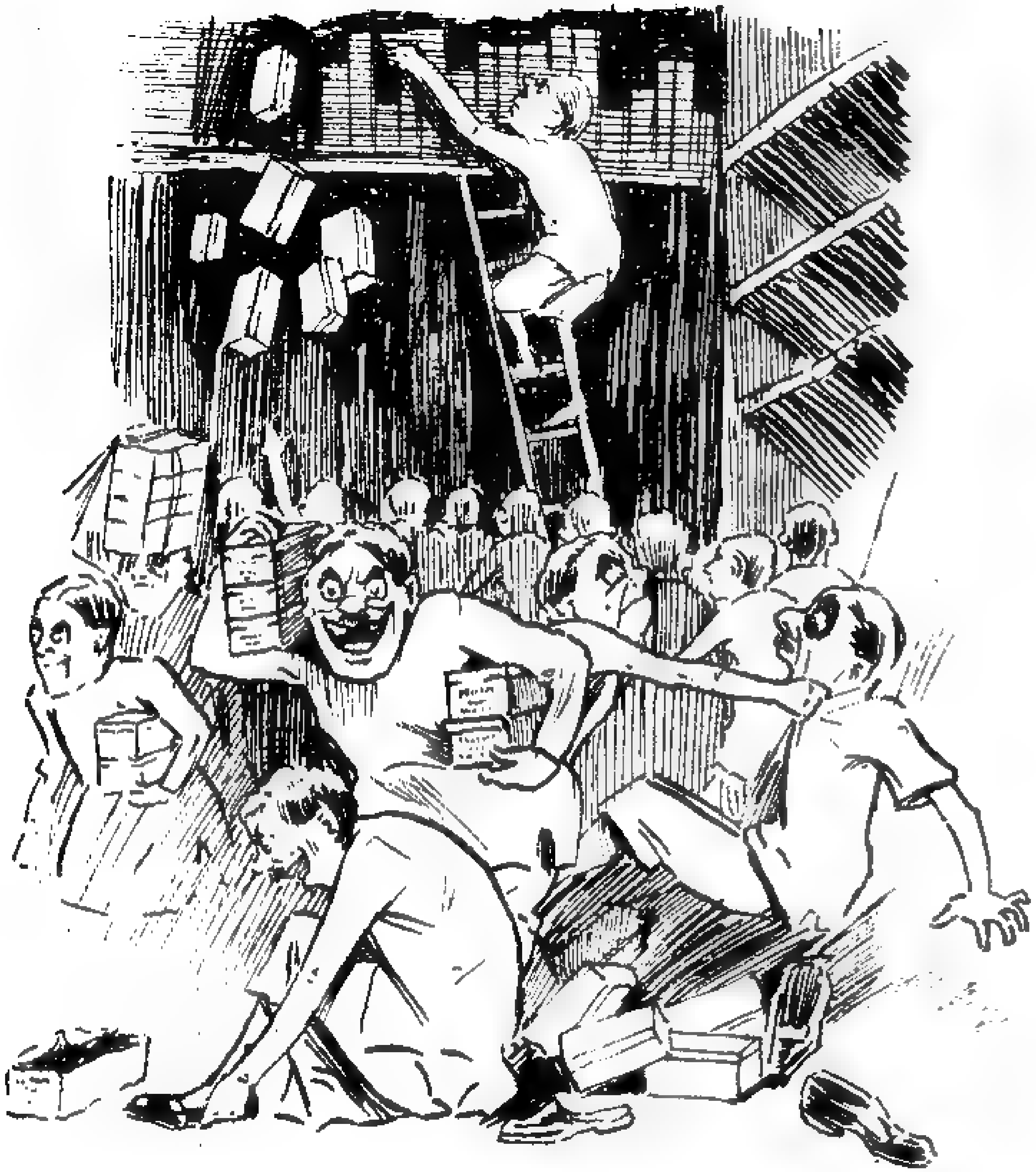

খরিদ্দারদের কাণ্ড দেখিয়া দোকানদারের আক্কেল গুড়ুম—খদ্দেরের গাঁদি লাগিয়াছে—যাহার যাহা ইচ্ছা, নিজেরাই জুতার বাক্স পাড়িতেছে—পরিতেছে, বগলে পুরিতেছে, দাম দিবার নামটি নাই—চাইতে গেলেই ঘুসি—'তোম কোন্ হ্যায়! বিনামূল্যে বিতরণ প্ল্যাকার্ড দিয়াছ, আবার দাম!'

## দোকান ফাঁক !

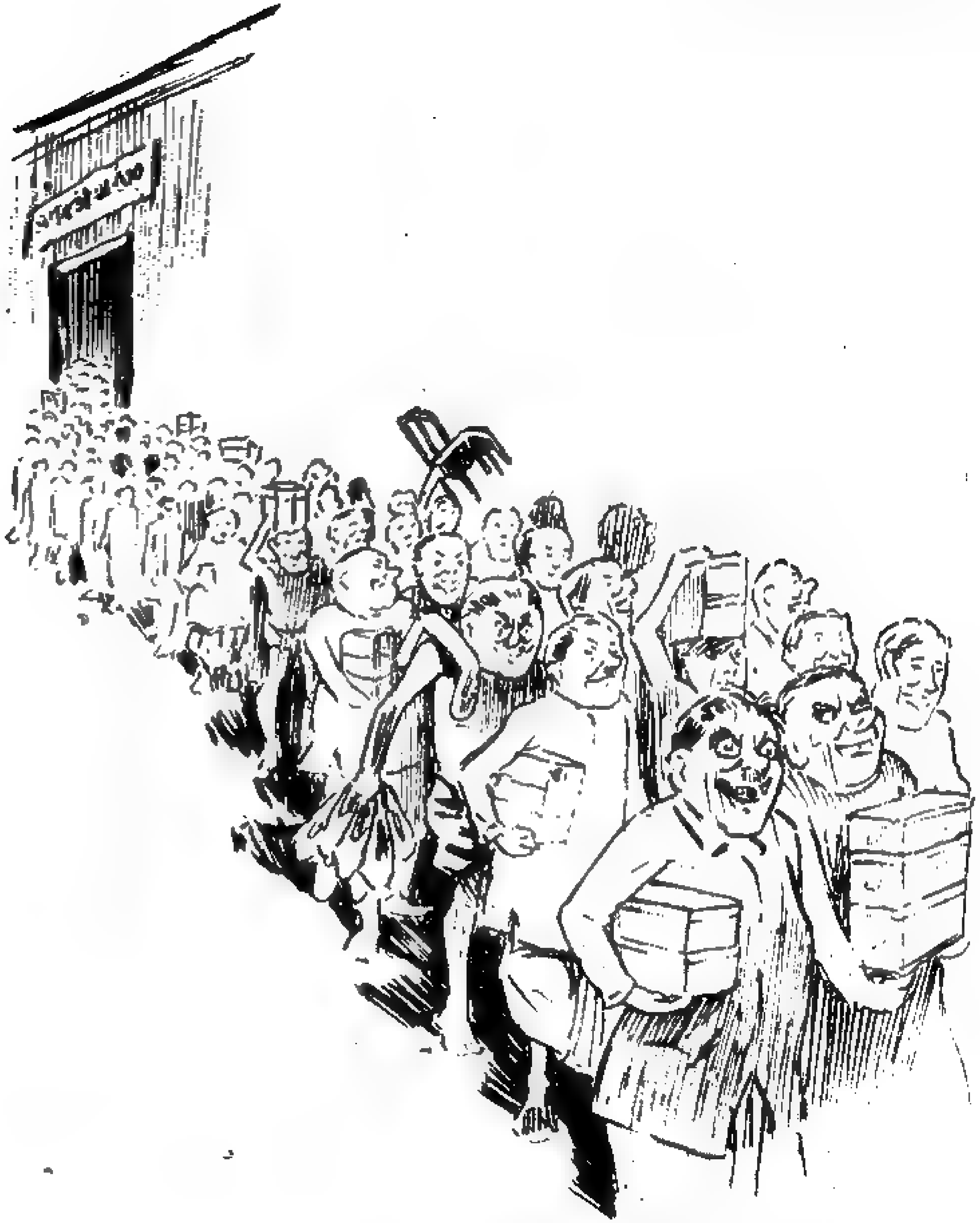

বিনামূল্যে এক ঘণ্টার মধ্যেই দোকান সাফ! শেষে যাঁহারা আসিলেন, তাঁহারা জুতার অভাবে দোকানের চেয়ার, টেবল, মায় জুতার ফর্ম্মাগুলি পর্য্যন্ত সাবাড় করিয়া—পূজার বাজার সরগরম করিতে করিতে চম্পট দিলেন! বিজ্ঞাপন সার্থক হইল!

## নগদ লাভ !

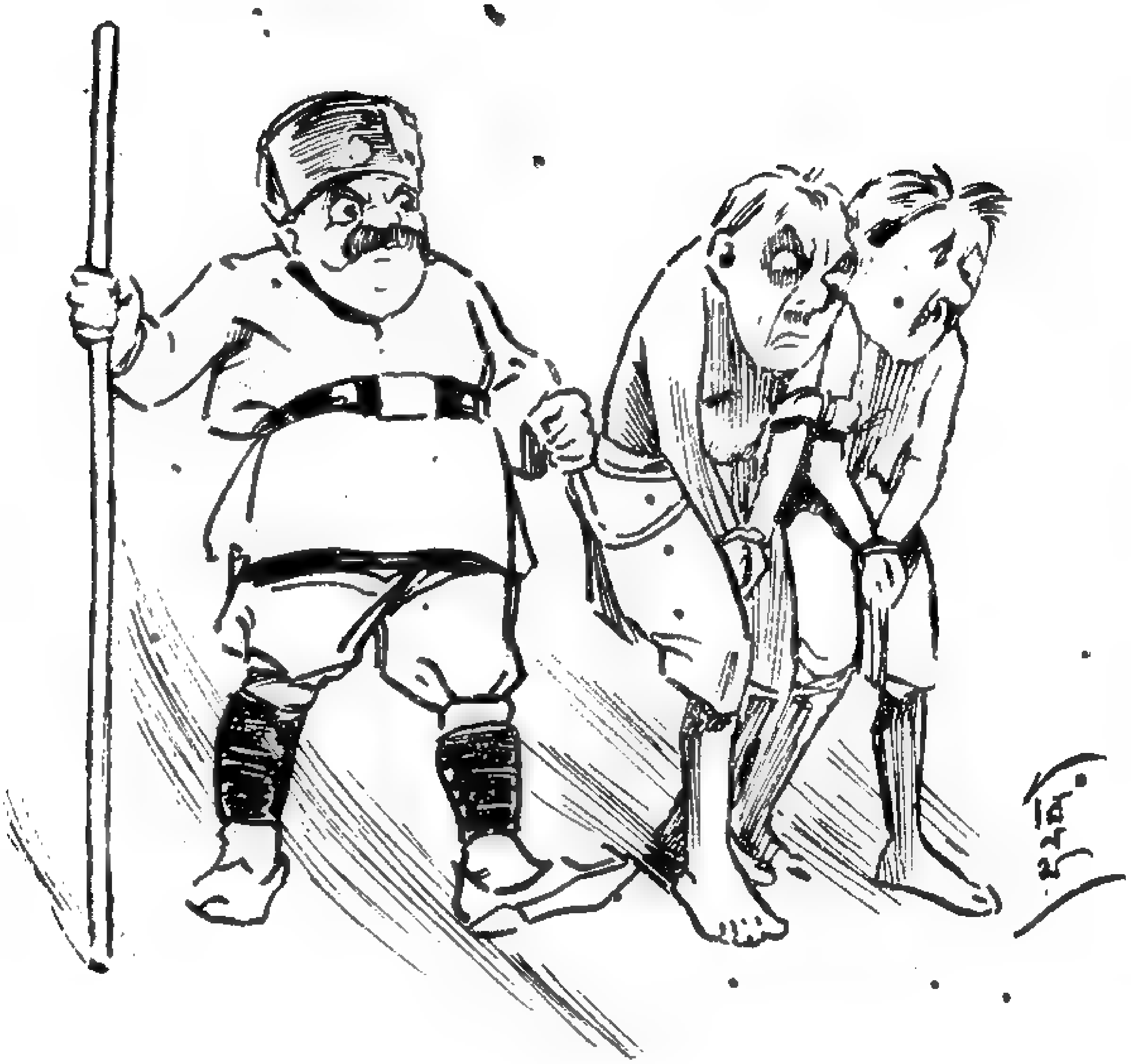

দোকানদারের নগদ লাভ হইল—কিল, চড়, ঘুসি গালি—তাহাতেও নিস্তার নাই, মাথায় হাত দিয়া বসিয়া হা-হুতাশ করিবারও তিনি বেশীক্ষণ সুযোগ পাইলেন না। দোকান সাফ হইয়া যাইবামাত্র তু' ঘণ্টার ভিতর পুলিসের দল আসিয়া হানা দিল ! দারোগা খোদাবক্স সাহেব একটি ঘণ্টা নানাবিধ সুমিষ্ট জেরা করিয়া—পরে জামিনে তল্লাস-তদন্ত সারিয়া অনেক গবেষণার পর 'রিপোর্ট' লিখিলেন—হিন্দু-মোছলমানের দাঙ্গা—তুই আসামী গ্রেপ্তার !

# গ্রেপ্তার !

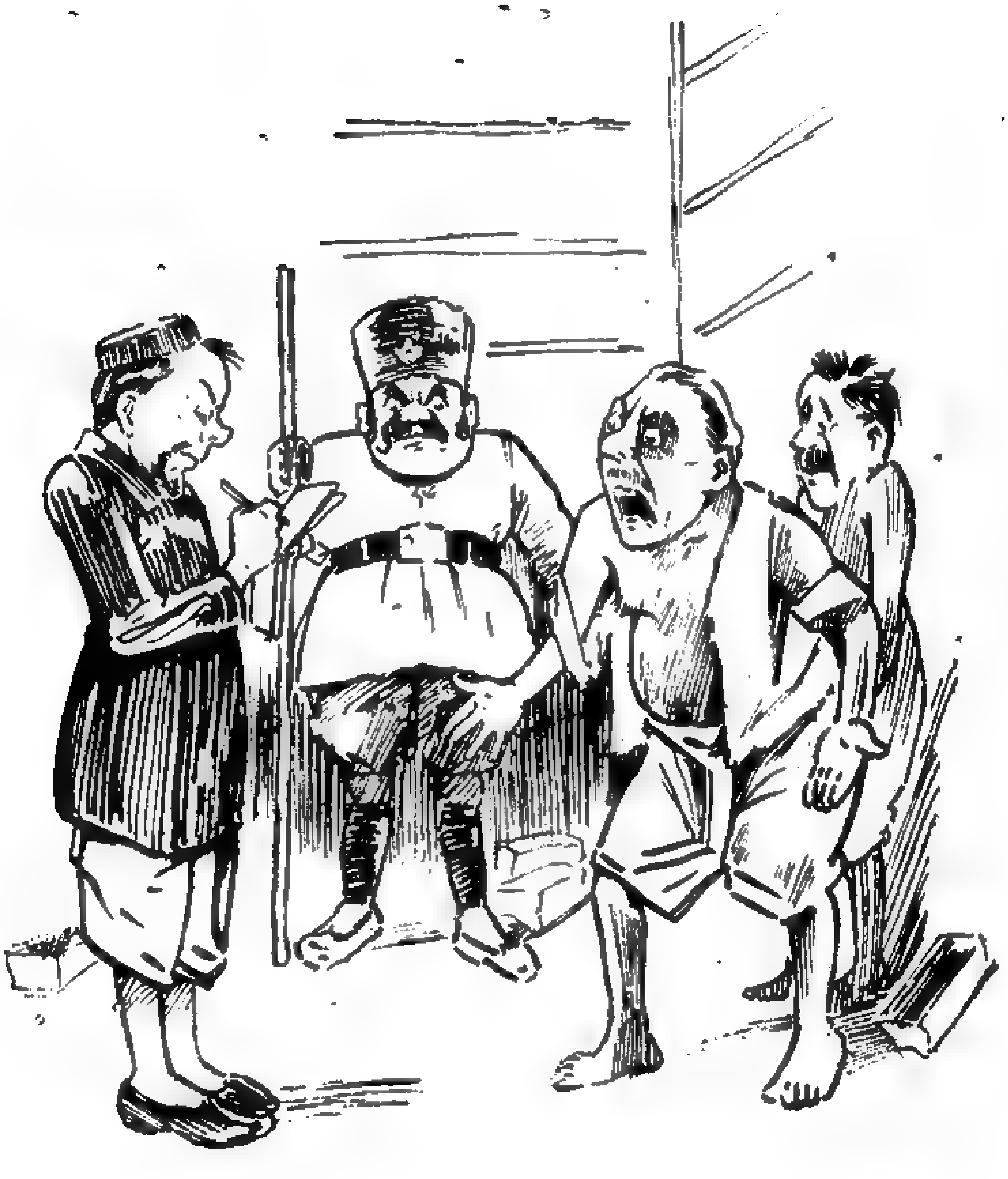

জমাদার জবরদস্ত সিং সদম্ভবিক্রমে আস্ফালন করিতে করিতে চাকর মনিবকে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় যাত্রা করিলেন !

[ শিল্পী—শ্রীবিনয়কৃষ্ণ বসু

# কবির মেয়ে

বৎসর দুই একের মধ্যে আমাদের দলের তিন চারি জন আড্ডাধারী যখন সন্ন্যাসী হইয়া বাহির হইয়া গেল, তখন আমরা দস্তুরমত শঙ্কিত হইয়া পড়িলাম। গেরুয়া না পরিলেও ত্যাগে আমরা গেরুয়াধারী অপেক্ষা কম ছিলাম না। আর এই পার্থিব জগতে আড্ডা দেওয়া হইতে যে অপার্থিব সুখ আর নাই, এ কথার ব্যবহারিক পরিচয় দিয়া অনেক গৃহবিমুখ সন্ন্যাসীকেও আমরা আড্ডামুখী করিয়া তুলিয়াছি। এ হেন আড্ডা ছাড়িয়া লোক কি সুখে সন্ন্যাসী হইতে চাহে, এ সমস্যার মীমাংসা কিছুতেই করিতে না পারিয়া আমরা সকলেই মনমরা হইয়া দিন কাটাইতেছিলাম, এমন সময় এক দিন সংবাদ পাওয়া গেল যে, আরও একটি বড় স্তম্ভ খসিয়া গিয়াছে। অর্থাৎ কি না আমাদের দীনবন্ধু হঠাৎ সন্ন্যাসী হইয়া গিয়াছে।

ভাঙ্গা আড্ডা কোনরূপে চলিতে লাগিল। বছর দুই তিন আশায় আশায় থাকিয়া পলাতক আড্ডাধারীদের ঘরে ফেরা সম্বন্ধে যখন আমরা নিরাশ হইয়া পড়িয়াছি, এমন সময় এক দিন দীনবন্ধু হৈ-হৈ করিয়া আড্ডায় উপস্থিত!

—সংবাদ কি?

—কোথায় ছিলি এত দিন?

—গেরুয়া গেল কোথায়?

—ওয়ারেণ্ট বেরিয়েছিল বুঝি?

চারিদিক হইতে তাহার উপরে সহস্র প্রশ্নের বাণ নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল।

দীনবন্ধু বলিল, "সন্ন্যাসী হয়েছিলুম, ভাই।"

সুরেশ বলিল—"সে ত আমরা সবাই জানি। কিন্তু সন্ন্যাসীই যদি হলি, তবে ফিরলি কেন?"

দীনবন্ধু বলিল—"ওরে বাবা! সংসারীর চেয়ে সন্ন্যাসী হওয়ার ফ্যাসাদ বেশী।"

মহেন্দ্র দাদা বলিল, "সেই জন্যই ত পৃথিবীতে সংসারী লোক বেশী, আর সন্ন্যাসী কম! এই কথাটা বোঝাবার জন্য অত কষ্ট করলে কেন? আমাকে জিজ্ঞাসা করলেই ত এর উত্তর পেতে।"

দীনবন্ধু বলিল—"মহেন্‌-দা, উত্তরের অভাব হ'লে নিশ্চয়ই তোমার কাছে যেতুম, কিন্তু তখন আমার যা প্রয়োজন হয়েছিল, তা উত্তরের একেবারে বিপরীত। আর সে জিনিষ অন্ততঃ তোমার কাছে পাওয়া যেত না।"

মহেন্দ্র বলিল—"কি হয়েছিল, বল ত?"

দীনবন্ধু বলিল—"পৈতৃক বাড়ীখানা বাঁধা পড়েছিল, জান ত! পাওনাদারেরা নালিশ ক'রে বাড়ীখানা বিক্রী ক'রে নিলে। এর পরে আর সংসারে টান থাকে? তুমিই বল?"

মহেন্দ্র-দা বলিল—"সংসার-সমুদ্রে অর্থই হ'ল সব থেকে বড় নোঙর, তারই শিকল যখন ছিঁড়ে গেল, তখন কিসে আর ধ'রে রাখবে বল। কিন্তু আবার ফিরে এলে কিসের টানে, বল দেখি। ছোট ছোট নোঙর কোথাও ফেলবার চেষ্টায় আছ না কি?"

দীনবন্ধু হাসিয়া বলিল—"না দাদা, আর নোঙরে কাম নেই। এই রকম ভেসে ভেসেই বেড়াব।"

সুরেশ বলিল—"আচ্ছা, বেরিয়েই বা গেলে কেন আর ফিরেই বা এলে কেন?"

দীনবন্ধু বলিল—"বেরিয়ে যাবার কারণ ত বলেছি। অবিশ্যি ফিরে আসবারও কারণ একটা আছে।"

দীনবন্ধুকে সকলে চাপিয়া ধরিলাম—"কারণ বলিতেই হইবে।" তাহারও বিশেষ আপত্তি ছিল না। সে আরম্ভ করিল।

"তোমাদের ত আগেই বলেছি, পৈতৃক আর

স্বোপার্জ্জিত পাওনাদারেরা মিলে ভিটেখানা বিক্রী করালে। তখন আমার হাতে আছে মোট তিপ্পান্ন টাকা আর কয়েক আনা পয়সা। সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি ব'সে ব'সে ভাবলুম, কি করা যায়! যেমন বাজার, তাতে চাকরীবাকরীর সুবিধা কোথাও হবে না। ও দিকে তিপ্পান্ন টাকা ফুরোবার আগে যে উদরযন্ত্রের দাবীও ফুরিয়ে যাবে, এমন কোনও আশা নেই। এই সব নানাদিক ভেবে ঠিক ক'রে ফেল্লুম, সন্ন্যাসীই হওয়া যাক্। যাঁহাতক মনে হওয়া, অমনই আনা-দুয়েকের লালমাটী কিনে এনে দুখানা ধুতি গেরুয়া রঙে ছেপে ফেলা গেল। তার পরদিন দুপুরবেলায় হরিদ্বারের গাড়ীতে সন্ন্যাস-যাত্রা।

"হরিদ্বারে গিয়ে ত পৌঁছলুম, কিন্তু গুরু আর খুঁজে পাইনে। অনেকে পরামর্শ দিলে যে, হিমালয়ে অনেক ভাল ভাল সন্ন্যাসী আছেন, সেখানে গিয়ে কারুর কাছ থেকে দীক্ষা নাও।

"হিমালয়ের দিকেই যাত্রা করা গেল। সমস্ত দিন চলি আর রাত্রে কোন চটিতে আশ্রয় নিই। পথে লোকজনের সঙ্গে দেখা হ'লে জিজ্ঞাসা করি, ভাল সন্ন্যাসী কোথায় আছে? তাদের নির্দ্দেশমতে কোনও মঠে গিয়ে উঠি। কোথাও বা যাওয়ামাত্র তাড়িয়ে দেয়, কোথাও বা দু-দিন বাদে ব'লে দেয়, তোমাকে দীক্ষা দেব না। সেখান থেকে বেরিয়ে আবার চল্‌তে আরম্ভ করি।

"এই রকম প্রায় মাসখানেক পাহাড়ে ঘুরে ঘুরে এক দিন এক সন্ন্যাসীর আস্তানায় গিয়ে উপস্থিত হলুম। এঁর নাম জীবানন্দ। হরিদ্বারে থাকতেই খুব উচ্চ-দরের সাধক ব'লে এঁর নাম শুনেছিলুম। ছোট্ট একটি উপত্যকার মধ্যে এঁর মঠ। তিন চারখানি ঘর, তাতে গুটি দুয়েক শিষ্যকে নিয়ে তখন বাস করছিলেন।

"সন্ন্যাসীকে গিয়ে প্রণাম ক'রে বল্লুম—'বাবা, আমার মনে বড় অশান্তি, তাই আপনার আশ্রয়ে এসেছি।'

"সন্ন্যাসী স্মিত হাস্যে বল্লেন—'বেশ করেছ, এখানে থাক। শান্তিময় এই স্থান, শান্তি পাবে।'

আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করব ব'লে বাড়ী থেকে বেরিয়েছি, আপনি আমায় দীক্ষা দিন।'

"আমার কথা শুনে সন্ন্যাসীর চোখ দুটো হঠাৎ লাল টক্‌টকে হয়ে উঠল। আমি তাঁর পদসেবা করছিলুম, তিনি পা গুটিয়ে নিয়ে উঠে ব'সে জিজ্ঞাসা করলেন—'কি বল্লে?'

"স্বামীজীকে হঠাৎ অমন উত্তেজিত হ'তে দেখে আমি থতমত খেয়ে গিয়েছিলুম। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন—'কি, কি বল্লে?'

"এবার আমি সাহস সঞ্চয় ক'রে ব'লে ফেল্লুম—'আপনার কাছে আমি দীক্ষা নিতে এসেছি। আমি সংসার ত্যাগ—'

"স্বামীজী সেই সুরেই বল্লেন—'কে তোমাকে সংসার ত্যাগ করতে বলেছে? আমার কাছে আসতেই বা কে বলেছে?'

"কোনও জবাব না দিয়ে চুপ ক'রে ব'সে রইলুম। কিছুক্ষণ পরে স্বামীজী আবার বল্লেন—'আমি মনে করেছিলুম, তুমি এখানে বেড়াতে এসেছ, কিছু দিন থেকে মনটা ভাল হ'লে ফিরে যাবে। এই ভেবেই তোমায় আশ্রয় দিয়েছিলুম।'

"জানোই ত! এ রকম ধরণের কথা কোন দিনই সহ্য করা আমার অভ্যাস নেই। তবুও, সন্ন্যাসী লোক, তাকে কিছু বল্‌ব না মনে ক'রে এতক্ষণ চুপ ক'রেই ছিলুম। কিন্তু আর সহ্য করা সম্ভব হলো না। ব'লে ফেল্লুম—'আশ্রয়ের আমার এমন অভাব হয়নি যে, সে জন্য এই পাহাড়-পর্ব্বত ভেঙ্গে আপনার কাছে আসতে হবে—'

"আরও একটু কড়া কথা বলতে যাচ্ছিলাম; কিন্তু স্বামীজী তার আগেই একটি প্রকাণ্ড ধমক ছেড়ে বল্লেন—'তবে ওঠ্। এই মুহূর্ত্তেই এখান থেকে দূর হয়ে যা।'

"চীৎকার শুনে শিষ্য দুজন ছুটে এল। স্বামীজী তাদের বল্লেন—'এখুনি একে মঠের চৌহদ্দী পার ক'রে দিয়ে এস।'

"আমি তখনই উঠে পড়লুম। শিষ্য দুজন আমাকে অনেকখানি এগিয়ে দিয়ে একটা রাস্তা দেখিয়ে বল্লে—'এই পথ ধ'রে যাও, কেদারে পৌঁছবে। রাস্তা দুর্গম, একটু

"শিষ্যরা চ'লে গেলে আমি সেই পথ ধ'রে হাঁটতে আরম্ভ করলুম। অনেকক্ষণ চলবার পর বিপরীত দিক্ থেকে এক জন লোক আসছে দেখে তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—'চটি কত দূরে ?'

"সে বল্লে—'এখানে চটি কোথায় ? দশ মাইল দূরে একটা চটি আছে বোধ হয়।'

"লোকটার কথা শুনে আমি একেবারে ব'সে পড়লুম। একে তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, অন্ধকারে পথও চিনতে পারি না, মঠে যাবার পথ চিনি বটে, কিন্তু সেখানে ফেরবার পথ নিজেই নষ্ট ক'রে এসেছি। এই রাত্রিতে দশ মাইল পাহাড়ে-পথ অতিক্রম ক'রে চটিতে পৌঁছিবার আশা বিড়ম্বনামাত্র। বাইরের অন্ধকার ক্রমেই ঘনীভূত হয়ে উঠতে লাগ্‌লো। অন্তরের আশার শিখাও স্তিমিত। একমাত্র ভরসা আমার দুর্জ্জয় সাহস। সেই সাহসে ভর ক'রে আমি অগ্রসর হ'তে লাগলুম।

"রাত্রি এক প্রহর কেটে যাবার পর আকাশে একটু চাঁদের আলো দেখা দিল। ক'মাইল পথ চ'লে এসেছি, তা ঠিক করতে পারলুম না, তবে যত দূর মনে পড়ে—একটা ছোট আর একটা বড় উপত্যকা পার হয়ে হাঁপিয়ে পড়েছিলুম। স্থির করলুম যে, এক যায়গায় ব'সে একটু জিরিয়ে নিয়ে আবার চল্‌তে সুরু করব।

"একটা গাছের তলায় ব'সে বিশ্রাম করছিলুম, কখন্ যে সুষুপ্তির কোলে ঢ'লে প'ড়েছি, তা জানতেই পারি নি, হঠাৎ খানিকটা ঠাণ্ডা বাতাস আমায় ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে দিলে।

"জেগে দেখি, চাঁদের আলোতে চারিদিক ভেসে গেছে। আমার চারি দিকে ছোট থেকে বড় একটার পর একটা পাহাড় থাকে থাকে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। দূরে, সবার পিছনে একটা পাহাড় আর সকলের মাথা ছাড়িয়ে নীল আকাশ ভেদ ক'রে উঠেছে। বাতাস অতি মৃদুভাবে তার গায়ে মেঘের চামর বুলিয়ে দিচ্ছে। কি স্থির আর কি শান্তভাবে তারা কাল-সমুদ্রের বুকে অনন্তের নোঙর পেতে প'ড়ে আছে!

"আমার মনে হ'তে লাগ্‌ল, পাহাড়গুলো যেন এই শব্দহীন, অন্তহীন নীল চাঁদোয়ার নীচে ব'সে মহাপ্রলয়ের দিন কে কি কাযের ভার নেবে, তারই পরামর্শ করছে। সেই বিরাট মহান্ প্রকৃতির সামনে মাথা আপনি নুয়ে পড়্‌ল।

"মাথা তুলতে না তুলতে শুনতে পেলুম—'চল্, এত রাতে আর এখানে ব'সে থাকে না।'

"পিছনে ফিরে দেখি, স্বামীজী তাঁর দুই শিষ্যকে সঙ্গে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি ফিরতেই তিনি বল্লেন,—'তুই ত ভারী অভিমানী ছেলে। চ'লে যেতে বল্লুম বলেই কি চ'লে যেতে হয় ?'

"স্বামীজীকে প্রণাম ক'রে বল্লুম—'প্রভু, আপনি তাড়িয়ে না দিলে এ দৃশ্য আমি দেখতে পেতুম না। চ'লে যেতে ব'লে ভালই করেছিলেন।'

"স্বামীজী আমার একখানি হাত ধ'রে বল্লেন—'চল্, ফিরে চল্। রাগ করিস্ নি।'

"সেই রাত্রিতে আবার মঠে ফিরে এলুম। বোধ হয়, চারদিন পরে স্বামীজী আমায় দীক্ষা দিলেন। আমার সংসারী নাম ঘুচে গিয়ে নাম হ'লা—'অরূপচৈতন্য।'

"মঠে বেশ আনন্দেই দিন কাটতে লাগল। সকালে স্বামীজী আমাদের ধর্ম্মশিক্ষা দিতেন। দূরে দু-তিনখানা গ্রাম ছিল, তারই বাসিন্দারা আমাদের আহার্য্য যোগাত, মধ্যে মধ্যে স্বামীজীর ধনী শিষ্যরা ভেট পাঠাত। শক্ত কাযের মধ্যে ছিল ঝরণা থেকে জল নিয়ে আসা। জ্যোৎস্না রাত্রি হলেই আমি পাহাড়ে বেরিয়ে পড়তুম, ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়লে মঠে এসে শুয়ে পড়তুম।

"বাইরের যে পৃথিবীটার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে চ'লে এসেছিলুম, মাঝে মাঝে অসতর্ক মুহূর্ত্তে তার আহ্বান আমার হৃদয়-দুয়ারে ঘা দিয়ে আমাকে আকুল ক'রে তুল্‌ত। কিন্তু নির্জ্জনতার মধ্যেও একটা মাদকতা আছে। তার নেশা ধরতে দেরী লাগে বটে, কিন্তু সে মৌতাত একবার অভ্যাস হয়ে গেলে আর ছাড়া মুস্কিল। আস্তে আস্তে এই একলা থাকার মৌতাতে আমি মস্‌গুল হয়ে উঠছিলুম, এমন সময় কি একটা বিশেষ প্রয়োজনে স্বামীজীকে বোম্বাইয়ের দিকে চ'লে যেতে হলো।

"মঠে তখন আমরা তিন জনমাত্র শিষ্য ছিলুম।

স্বামীজী এক জনকে সঙ্গে নিলেন, এক জনকে পাঠিয়ে দিলেন প্রয়াগ অঞ্চলে আর আমায় বল্লেন—'তুই নিজের দেশে যা। সন্ন্যাস গ্রহণ করবার পর একবার দেশে যেতে হয়।'

"মঠ ছেড়ে কোথাও যেতে আর আমার মোটেই ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু গুরুর আগ্রহে আমায় বেরুতে হ'লো। তিনি আমাদের দুজনকে ব'লে দিলেন—'দুবছর পরে আমি এইখানে ফিরব।'

"বেরিয়ে পড়তে হ'লো। বাড়ী থেকে যখন বেরিয়েছিলুম, তখন হাতে আর কিছু না থাক, রেল-ভাড়াটা ছিল, এখন একেবারে রিক্ত। বিনা টিকিটেই রেলে উঠে পড়া গেল। টিকিট নেই শুনে কেউ বা সন্ন্যাসী দেখে ছেড়ে দেয়, আর কেউ বা ঘাড় ধ'রে নামিয়ে দেয়। তখনকার মত নেমে পড়ি, পরদিন আবার ট্রেণে উঠে চলতে থাকি।

"এই রকম ক'রে অগ্রসর হ'তে হ'তে এক দিন মধুপুর রেলষ্টেশনে এক জন কর্ম্মচারী আমার টিকিট নেই দেখে ট্রেণ থেকে নামিয়ে দিলে। আমি মনে করেছিলুম, আমাকে নামিয়ে দিয়েই সে নিশ্চিন্ত হবে, আমিও আবার অন্য গাড়ীতে চড়্ব। কিন্তু তা হ'ল না, ষ্টেশন থেকে গাড়ীখানা চ'লে যাবার পর সে ব্যক্তি আমাকে একেবারে রেল-পুলিসের জিম্মায় সমর্পণ করলে। এ রকম ফ্যাসাদে এর আগে আর কখনও পড়িনি। প্রায় আট দশ দিন টানা-পড়েন থানা-পুলিস হ'তে হ'তে ব্যাপারটা আদালত অবধি গড়াল। আমি আন্দাজ করেছিলুম, এই সুযোগে জেলে যাওয়ার অভিজ্ঞতাটা বোধ হয় হয়ে যাবে। কিন্তু অবোধ হাকিম কোম্পানীর সমস্ত কথা শুনে আমায় বল্লে—'যাও, এমন কায আর করো না।'

"সন্ন্যাসীর নামে মামলা হওয়ায় সেখানে হৈ-চৈ প'ড়ে গিয়েছিল। আমি মুক্তি পেতেই সহরের এক জন ধনী আমাকে তার বাড়ীতে নিয়ে গেল। কলকাতায় যাব শুনে তারা রেলের টিকিট কিনে দিতে চাইলে। কিন্তু রেলে উঠতে আমার আর প্রবৃত্তি হ'লো না। আমি সেখান থেকে হেঁটেই রওনা হলুম।

"মধুপুর থেকে কলকাতা অবধি বেশ ভাল হাঁটা-পথ আছে। সেই রাস্তা ধ'রে কলকাতার দিকে এগিয়ে চলেছি। তখন বর্ষাকাল, মাঝে মাঝে বৃষ্টিতে কষ্ট দেয়, আর পাহাড়ে নদীগুলো ভ'রে উঠায় কোনও কোনও যায়গায় পারের জন্য একটু মুস্কিলে পড়তে হয়। তা না হ'লে সন্ন্যাসীর পক্ষে পথ চলায় কোনও কষ্ট নেই।

"মাসখানেক পথ চ'লে বাঙ্গালায় এসে পৌছলুম। বৃষ্টি তখনও থামেনি, বরং আরও বেড়েছে। মাঠ, ঘাট সব জলে ভর্ত্তি, রাস্তাও আর তেমন শুক্‌নো নয়, মধ্যে মধ্যে ভারী কাদা।

"এক দিন,—সে দিন আর কোনও গ্রামের মধ্যে ঢুকিনি। রাস্তা বয়ে তাড়াতাড়ি চলেছি; কোনও রকমে কলকাতায় গিয়ে পৌছতে পারলে হয়। কতবার বৃষ্টি এল, আর কতবার যে ভিজে কাপড় গায়েই শুকিয়ে গেল, তার ঠিকানা নেই। সমস্ত দিন চ'লে চ'লে সন্ধ্যার সময় একটা গাছতলায় আশ্রয় নিলুম। পথশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলুম, তার উপরে জলে ভিজে ভিজে ক'দিন থেকেই শরীরটা জ্বর-জ্বর করছিল।

"সন্ধ্যার কিছু পরেই আবার বৃষ্টি সুরু হ'লো। মনে করেছিলুম, রাত্রিটা সেইখানে কোনও রকমে কাটিয়ে সকালে আবার চলা সুরু করব। কিন্তু কিছুক্ষণ যেতে না যেতে আকাশ যেন ভেঙ্গে পড়ল, গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আত্মরক্ষা করা ক্রমেই অসম্ভব হয়ে উঠতে লাগ্‌ল।

"আমি যে গাছের নীচে আস্তানা করেছিলুম, তার একটু দূরেই একটা রাস্তা গ্রামের দিকে চ'লে গিয়েছে। এই দুর্য্যোগে কোনও রকমে কোনও গৃহস্থের দরজায় গিয়ে উপস্থিত হ'তে পারলে নিশ্চয় রাত্রির মত একটু আশ্রয় পাওয়া যাবে, এই ভরসায় গাছের তলা থেকে দৌড় দিলুম।

"দৌড়—দৌড়—দৌড়! কিছুক্ষণ দৌড়ুই, আবার কিছুক্ষণ হাঁটি। এই রকম ক'রে চল্‌তে চল্‌তে দূরে একটা আলো দেখতে পেলুম। ছুটতে ছুটতে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলুম। সেটা একটা মুদীর দোকান; ছোট্ট একটি চালা-ঘর। মুদী সেখানে আশ্রয় দিলে না, তবে সে দয়া ক'রে গ্রামের রাস্তাটা আমায় দেখিয়ে দিয়ে বল্লে—'গাঁয়ের ভিতরে যাও, সেখানে আশ্রয় পেতে পার।'

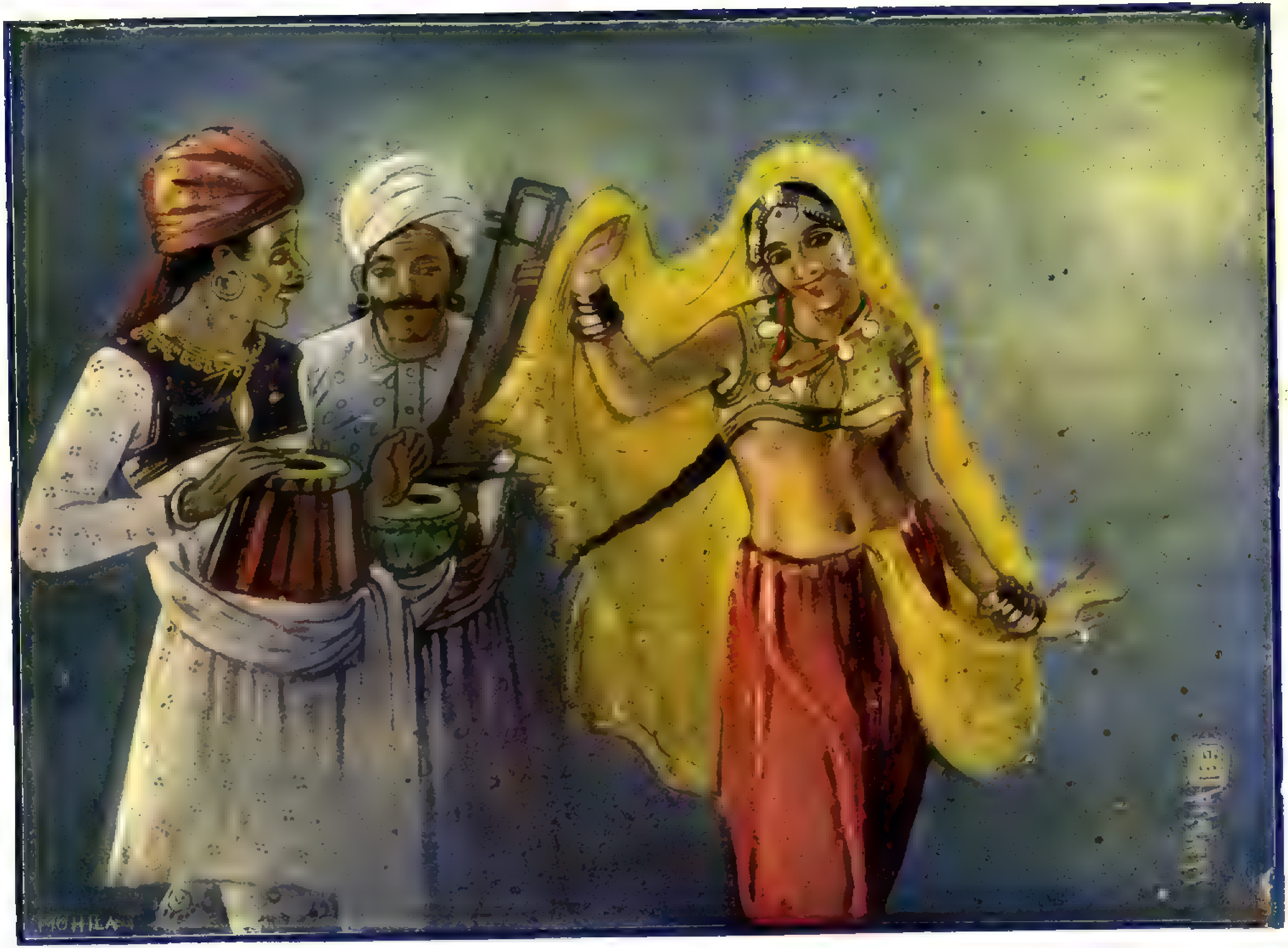

নর্ত্তকী

শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ লাহার সৌজন্যে ]

[ শিল্পী – শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ।

"গাঁয়ের মধ্যে ঢুকলুম। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, তার উপরে কালো মেঘের ছায়া ধরণীর যা কিছু সব যেন নিকিয়ে নিয়েছে। চোখে কিছুই দেখতে পাই না। অন্ধকার, কাঁটা আর কাদায় মিলে সে একটা বীভৎস ব্যাপার হয়ে রয়েছে। তার উপর দিয়ে এক রকম গড়াতে গড়াতে চল্‌তে লাগ্‌লুম।

"গ্রাম একেবারে নিশুতি। একে এই দুর্য্যোগ, তার উপরে রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর, গ্রামবাসীরা যে যার শুয়ে পড়েছে। মানুষ ত ছার, একটা কুকুরের ডাক পর্য্যন্ত শুনা যাচ্ছে না। এরই ভিতর দিয়ে আমি পিছ্‌লে পিছ্‌লে টল্‌তে টল্‌তে চলেছি। পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছে, তবুও চলেছি। এমন সময় অনেক দূরে একটা ক্ষীণ আলো দেখা গেল।

"প্রায় আধঘণ্টা সেই আলো লক্ষ্য ক'রে গিয়ে আমি একটা একতলা জীর্ণ বাড়ীর সাম্‌নে উপস্থিত হলুম। একটা খোলা জানালা দিয়ে ক্ষীণ একটু আলোর রশ্মি দেখা যাচ্ছিল। একটু ঘুরে বাড়ীর দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। দরজা ভেজান ছিল, ধাক্কা দিতেই খুলে গেল বটে, কিন্তু কেউ নেই সেখানে। আমি ডাক দিলুম,—'বাড়ীতে কে আছেন?' বাড়ীর ভিতরে রমণীকণ্ঠ শুনা গেল,—'ওরে দেখ, বোধ হয়, ডাক্তার বাবু এলেন।'

"সঙ্গে সঙ্গেই একটি কিশোরী একটা লণ্ঠন হাতে নিয়ে ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। কিশোরী প্রথমে আমাকে দেখতে পায় নি। সে লণ্ঠনটা তুলে—'কে' ব'লে আমার সামনে এসে দাঁড়াল।

"আমাকে সেই অবস্থায় দেখে তার মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরুল না। কিছুক্ষণ হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে থেকে লণ্ঠনটা ঠক্ ক'রে নামিয়ে রেখে সে ভিতরে চ'লে গেল।

"একটু পরেই এক জন বিধবা রমণী—'কে'—ব'লে ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন। তাঁর পিছনে গুটি দুই তিন ছেলে-মেয়ে।

"আমি একটু এগিয়ে এসে বল্লুম—'আমি অতিথি। এই দুর্য্যোগে বড় বিপদে পড়েছি; রাত্রির মত একটু আশ্রয় চাই।'

"রমণী স্নিগ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—'তোমার বাড়ী কোথায়, বাবা?'

"বল্লুম—'সন্ন্যাসীর আবার বাড়ী কোথায়, মা!'

"'ও, তুমি সন্ন্যাসী। তা গেরুয়া দেখেই মনে হয়েছিল। এস, বাবা, ভিতরে এস। ভগবান্ তোমায় পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

"বাড়ীর ভিতরে গিয়ে হাত-পা ধুয়ে কাপড়খানা নিংড়ে পরলুম। শরীর একেবারে ভেঙ্গে আসছিল; শোবার জন্য যায়গা খুঁজছি, এমন সময়ে সেই বিধবা আমায় বল্লেন—'বাবা, আমাদের বড় বিপদ। তাই দেখেই বোধ হয়, ভগবান্ এত রাত্রে তোমাকে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

"ঘুমটুম সব ছুটে গেল। জিজ্ঞাসা করলুম—'কি বিপদ, বলুন। আমার যদি সাধ্য থাকে—'

"তিনি বল্লেন—'আমার বড় মেয়েটি আজ ছ মাস ধ'রে জ্বরে ভুগছে। আজ সন্ধ্যেবেলায় কাস্‌তে কাস্‌তে কি রকম অজ্ঞানের মত হয়ে পড়েছে, এখনও ভাল ক'রে জ্ঞান হয়নি। এ গ্রামে কোনও ডাক্তার নেই; ভিন্ গাঁয়ে ডাক্তার ডাকতে পাঠান হয়েছে। তা এই দুর্য্যোগে সে বোধ হয় আর এল না।'

"'চলুন, তাকে দেখে আসি।'

"এই ব'লে উঠলুম। বিধবা আমাকে একটি ঘরে নিয়ে গেলেন। ঘরের এক দেওয়ালের গায়ে লাগা এক খাটে রোগিণী শুয়ে আছে। এই ঘরেরই খোলা জানালা দিয়ে যে ক্ষীণ আলো দেখা যাচ্ছিল, তাই লক্ষ্য ক'রে আমি এসেছি। রোগিণীর বয়স বোধ হয় কুড়ির কাছাকাছি। দেখতে হয় ত সুন্দরীই ছিল, কিন্তু নির্ম্মম রোগ তার সমস্ত সৌন্দর্য্যই গ্রাস করেছে।

"অনেকক্ষণ বিছানার ধারে দাঁড়িয়ে মুখ দেখলুম। চোখ বুজিয়ে সে প'ড়ে আছে। জিজ্ঞাসা করলুম—'এর নাম কি?'

"'ললিতা।'

"রোগিণীর তপ্ত ললাটে হাত দিয়ে মৃদুস্বরে ডাকলুম—'ললিতা!'

"ডাকামাত্র তার নিমীলিত চোখ দুটো খুলে গেল। সে আস্তে আস্তে পাশ ফিরে শুলে।

"রোগিণীর মা বল্লে—'সন্ধ্যার আগে একবার বমি ক'রে সেই যে চোখ বুজেছিল, আর এই খুল্ল। তোমাকে কি বল্ব, বাবা—'

"আমি বল্লুম—'আপনি গিয়ে শুয়ে পড়ুন। আর কোন ভয় নেই। কাল ডাক্তার এলে যা হয় ব্যবস্থা হবে।'

"রোগিণীর ঘরের বাইরে একটা চওড়া দাওয়া। তারই এক কোণে আমার শোবার ব্যবস্থা হ'ল।

"পাশের একটা ঘরে ছেলে-মেয়েদের মৃদু কণ্ঠস্বর শুনা যাচ্ছিল, ললিতার মা আমাকে শুইয়ে সেই ঘরে ঢুকে গেলেন।

"তখনও বৃষ্টি থামেনি। বৃষ্টির সেই অখণ্ড ঘুমপাড়ানিয়া গানে গ্রামের সমস্ত প্রাণীই নিদ্রিত। আমার চোখ থেকে কিন্তু ঘুম ছুটে গিয়েছিল। চোখ বুজলেই পাশের ঘরের সেই রুগ্না মেয়েটির জীর্ণ মুখ চোখের সামনে ভাসতে থাকে। তার কথা ভাবতে ভাবতে একটা অদ্ভুত আকর্ষণ আমাকে তার দিকে টানতে লাগ্ল।

"ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখি, বাতিটা তখনও মিট্ মিট্ করছে। কোণে এক বৃদ্ধা ঝি প'ড়ে অঘোরে নিদ্রা দিচ্ছে। খাটের দিকে চেয়ে দেখলুম, ললিতা আবার চিৎ হয়ে শুয়েছে। সেই স্তিমিত আলোতে তার মুখ ভাল ক'রে দেখা যাচ্ছিল না। আমি খাটের ধারে গিয়ে ঝুঁকে তার মুখখানা দেখতে লাগ্লুম।

"একদৃষ্টে তাকে দেখ্ছি। নিশ্বাস এত ক্ষীণ যে, তা পড়্ছে কি না, বুঝতে পারা যাচ্ছে না। তার একখানা হাত তুলে নাড়ী দেখতে লাগলুম। জীবনপ্রবাহ অতি ক্ষীণ, যে কোনও মুহূর্ত্তে তা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। হঠাৎ রুগ্নার চোখ দুটো খুলে গেল। আমাকে দেখেই সে বলে উঠল—'কে! কে তুমি?'

"আমি তাড়াতাড়ি তার হাতখানা নামিয়ে রেখে বল্লুম—'কোনও ভয় নেই। আমি সন্ন্যাসী।'

"'সন্ন্যাসী! ও, তুমিই বুঝি রোজ ঐ জানালার ধারে ব'সে থাক? আজ এত কাছে এসেছ যে?'

"আমি বল্লুম—'তুমি ঘুমোও। বেশী কথা বল্লে অসুখ বাড়্বে।'

" 'কিন্তু তুমি এত কাছে এসেছ কেন? আমাকে বুঝি নিয়ে যাবে? না না, আমি যাব না, তুমি যাও।'

"স্পষ্ট বুঝতে পারা গেল যে, বিকারের ঘোরে সে ভুল বক্ছে। আমি তার কপালে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বল্লুম—'তুমি চোখ বুজোও, ঘুমোও।'

"মেয়েটি আর একবার দৃষ্টিহীন চাউনীতে আমার দিকে চেয়ে চোখ বুজলো।

"একটু পরেই সে ঘুমিয়ে পড়্ল। তার সেই শীর্ণ মুখ আর অসহায় অবস্থা দেখে তার প্রতি করুণায় আমার মনটা আর্দ্র হয়ে উঠতে লাগ্ল। আমি ব'সে ব'সে ললিতাকে পাখার বাতাস করতে লাগ্লুম। গুরুদেবের শিক্ষা একেবারে বিফলে যায়নি। তোমাদের সত্যি বল্ছি, সেখানে ব'সে ব'সে আমার মনে হ'তে লাগল যে, এর মধ্যে ভগবানের নিশ্চয় কোন গূঢ় অভিসন্ধি আছে। তা না হ'লে কোথাকার লোক আমি আর আজ এই শেষরাতে কোথায় ব'সে কাকে বাতাস করছি। আশ্চর্য্য দৈবের খেলা!

"সূর্য্যের রথখানা তখনও উদয়াচলের শিখরে এসে পৌঁছে নি। অন্ধকার একটু ফ্যাকাসে হয়েছে মাত্র, এমন সময় ললিতার মা ঘরে ঢুকে আমাকে ঐ অবস্থায় ব'সে থাকতে দেখে বল্লেন—'সারারাত্রি এইখানে ব'সে আছ, বাবা? তুমি আর জন্মে নিশ্চয়ই আমাদের কেউ ছিলে। তা না হ'লে—'

"তাঁকে বাধা দিয়ে বল্লুম—'আপনি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হবেন না। সেবাই আমাদের ধর্ম্ম।'

"আমাদের কথা শুনে ললিতার ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে চোখ চেয়ে অবাক্ হয়ে আমার দিকে চাইতে লাগ্ল। তার মা কাল রাত্রির সমস্ত কথা ব'লে আমার সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিলেন। সে একটু হাসবার চেষ্টা ক'রে শুয়ে শুয়েই হাতজোড় ক'রে আমাকে নমস্কার করলে।

"সকালবেলা ক্রমে ক্রমে ললিতাদের বাড়ীর অবস্থা জানতে পারলুম। ললিতার বাবা ছিলেন এক জন কবি, কাযেই দরিদ্র। চাকরী-বাকরীর চেষ্টা চার পাঁচ বার করেছিলেন, কিন্তু শেষ অবধি কোথাও বনিবনাও হয় নি। অতি সামান্য আয় আছে, তাতে কষ্টে দুবেলা খাওয়া

চলে। জাতে তাঁরা ব্রাহ্মণ। বছরখানেক আগে ললিতার বাবা তিন দিনের জ্বরে মারা গেছেন। ললিতা ছাড়া আরও একটি মেয়ে আছে, তার নাম অমিতা। দুটি ছেলে, তারা মেয়েদের চেয়ে ছোট। মেয়েদের কারও বিয়ে হয় নি। ললিতার বিয়ের চেষ্টা হচ্ছিল, এমন সময় তার বাবা মারা গেলেন। তার পরে, আজ ছ মাস সে জ্বরে জ্বরেই সারা হচ্ছে। কাল্ বিকেলে সে রক্তবমি ক'রে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। ভিন্‌গাঁয়ে ডাক্তার থাকে, রাতে লোক পাঠান হয়েছিল, লোকও ফেরেনি, ডাক্তারও আসেনি।

"ললিতার মা'র বয়সও বেশী নয়, চল্লিশের কাছাকাছি হবে। সংসারের কাহিনী বলতে বলতে তিনি কেঁদে ফেল্লেন। আমায় জিজ্ঞাসা করলেন—'বাবা, ললিতা বাঁচবে ত? কর্ত্তার বড় আদরের মেয়ে ও।'

"আমি তাঁকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করলুম। বল্লুম, 'না বাঁচবার ত কোন কারণ দেখ্‌ছি না—ও সেরে উঠ্‌বে।'

"তিনি বল্লেন—'তুমি কটা দিন এখানে থাক, বাবা! তোমায় দেখে আমার ভরসা হচ্ছে।'

"মাসখানেক ধ'রে হেঁটে হেঁটে আমিও ক্লান্ত হয়েছিলুম, বিশ্রামের খুবই প্রয়োজন ছিল। তাঁর কথা শুনে বল্লুম—'বেশ, আমি আছি।'

"ললিতার মা সংসারের কাযে ব্যাপৃত হলেন, আমি আবার ললিতার বিছানার পাশে গিয়ে বসলুম। তার মনটা একটু প্রফুল্ল করবার জন্য বল্লুম—'ললিতা, গল্প শুন্‌বে।'

"সে উৎসাহিত হয়ে বল্লে—'হ্যাঁ, বলুন, শুন্‌ব।'

"একটা গল্প বল্লুম। সে শুনে বল্লে—'এ গল্প আমি জানি।' আর একটা বল্লুম, সে বল্লে—'এ-ও আমি জানি।'

"সকালবেলা গল্প ক'রে কাটল। দুপুরবেলা ডাক্তার এলেন। হাতুড়ে ডাক্তার, কলকাতার কোন এক স্বদেশী ডাক্তারী কলেজে বছর ছয়েক প'ড়ে পাঁচটি অক্ষর উপাধি পেয়েছিল। কিন্তু ললিতার যে রোগ, তা ধরবার জন্য দিগ্‌গজ ডাক্তার না এলেও চলে। ডাক্তার রোগী পরীক্ষা ক'রে দুটি টাকা নিয়ে আমায় আলাদা ডেকে নিয়ে গিয়ে বল্লে, 'রাজযক্ষ্মা হয়েছে, দুটো ফুস্‌ফুসেই আর কিছু নেই। যে কোন মুহূর্ত্তেই মৃত্যু হ'তে পারে।'

"বিকেলবেলায় ললিতার খাটের পাশে ব'সে আছি। অস্তোন্মুখ রবির এক টুকরো ম্লান রশ্মি খোলা জানালা দিয়ে বিছানার ধারে এসে পড়েছিল। ললিতা অনেকক্ষণ সেই আলোটুকুর দিকে চেয়ে চেয়ে বল্লে—'সন্ন্যাসী, ডাক্তার কি ব'লে গেল, আমি আর বাঁচব না?'

"আমি বল্লুম—'সে কি! কে বল্লে তোমাকে? ডাক্তার বল্লে, তুমি শীগ্‌গীর সেরে উঠ্‌বে। ও সব কথা ভাবে না, লক্ষ্মীটি।'

"আমার কথা শুনে ললিতার শীর্ণ মুখ খুশীতে ভ'রে উঠ্‌ল। সে বল্লে—'না না, সন্ন্যাসী, আমি ত সে কথা ভাবি না। আমি দিনরাত বাঁচবার কথাই ভাবি। শুধু ভাবি, কবে ভাল হয়ে উঠ্‌ব। এখন আমি মরতে চাই না। আমার এই উনিশ বছর বয়স, এই বয়সে কি মরতে ইচ্ছা হয়? আমার অনেক আশা আছে, অনেক—অ—নে—ক।'

"এই অবধি ব'লে সে ভয়ানক হাঁপাতে লাগ্‌ল। পাছে আবার সেই প্রসঙ্গ ওঠে, এই ভয়ে তাকে বল্লুম—'ললিতা, গল্প শুনবে?'

"ললিতা একটু হেসে বল্লে,—'না, গল্প নয়। ঐ তাকের উপরে কবিতার বই আছে, নিয়ে এসে আমায় শোনাও না।'

"তাকের উপরে সারি সারি ইংরাজী, বাঙ্গালা কবিতার বই সাজান ছিল। একখানা বাঙ্গালা বই নিয়ে এসে বল্লুম—'কোন্‌টা পড়্‌ব?'

"ললিতা বল্লে—'যেটা ইচ্ছা পড়।'

"আমি পড়তে লাগলুম আর ললিতা চোখ বুজিয়ে রইল। একটার পর একটা প'ড়ে যাই, তার আর ক্লান্তি নেই। ঝি এসে আলো দিয়ে গেল, মা এসে কাছে বসলেন, অমিতা এসে খাইয়ে গেল, মা অন্য কাযে গেলেন, পড়ার আর বিরাম নাই। একবার সে ঘুমিয়ে পড়েছে মনে ক'রে আমি পড়া বন্ধ করলুম, কিন্তু তখনই সে চোখ চেয়ে বল্লে—'কৈ, পড়ছ না?'

"আবার পড়তে সুরু করা গেল। একবার ললিতার

দিকে চেয়ে দেখলুম, তার দুই চোখ দিয়ে অনর্গল অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে।

“তার সেই অবস্থায় মনের ওপর কোন চাপ পড়া উচিত নয় ভেবে পড়া বন্ধ করলুম। ললিতা তখনই চোখ চেয়ে বল্লে—‘থামলে যে?’

“আমি বল্লুম—‘আজ এই অবধি থাক, আবার কাল হবে। কি বল?’

“ললিতা বল্লে—‘আচ্ছা।’

“তাকে বইখানা রেখে এসে তার কাছে বসামাত্র সে বল্লে, ‘সন্ন্যাসী, তুমি বড় ভাল। বড় সুন্দর পড়তে পার তুমি। আমার বাবাও খুব সুন্দর পড়তে পার্‌তেন। আমাতে আর বাবাতে বই হাতে ক’রে কখনও চ’লে যেতুম সেই নদীর ধারে, কখনও বা ঐ বড় মাঠটা পেরিয়ে সেই প্রকাণ্ড বটগাছের নীচে—সমস্ত দিন আমরা সেখানে ব’সে ব’সে কবিতা পড়তুম। এই ভাদ্র-মাসে আমরা ভাই-বোনে মিলে মাঠে ঘাটে কত খেলাই করেছি। আজ প্রায় ছ-মাস হ’লো বাড়ী থেকে বেরুইনি। প্রাণটা আমার হাঁপিয়ে উঠছে। কত দিনে আমি ভাল হয়ে উঠব, বলতে পার, সন্ন্যাসী?’

“ললিতার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বল্লুম—‘তুমি শীগ্‌গীর সেরে উঠবে। সেরে উঠ্‌লে আবার আমরা তেমনই ক’রে খেলতে যাব। তোমার শরীরটা একটু ভাল হোক্।’

“আমার কথা শুনে সে সন্দিগ্ধভাবে আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে কি বল্‌তে যাচ্ছিল, কিন্তু আমি তাকে বাধা দিয়ে বল্লুম—‘তুমি ঘুমোও, লক্ষীটি, তা না হ’লে আবার অসুখ বাড়বে।’

“ললিতা আর কিছু না ব’লে চোখ বুজিয়ে ফেল্লে।

“সে রাত্রিতে ললিতার অসুখ ভয়ানক বেড়ে উঠলো। রাত্রি বারোটা কি একটার সময় সে কাস্‌তে আরম্ভ করলে। কিছু পরেই তার মুখ দিয়ে ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠতে লাগল। আমি ছুটে গিয়ে তার মাকে খবর দিলুম। ললিতার মা আর তার বোন্ অমিতা এসে আর্ত্তের পাশে দাঁড়াল। যন্ত্রণায় সে ছটফট করতে লাগলো। বাতাস কর্‌তে কর্‌তে একটু যদি যন্ত্রণা কমে ত অমনই কাসি সুরু হয়, তার পরেই দু ঝলক লাল টক্‌টকে রক্ত। একটুখানি নিশ্বাস নেবার জন্ত সে কি চেষ্টা! শতচ্ছিদ্র ফুস্‌ফুসের সে যে কি ভীষণ যন্ত্রণা, তা যক্ষ্মারুগীকে যে না দেখেছে, সে বুঝতে পারবে না। আমার মনে হ’তে লাগল, আজ রাত্রিতে বোধ হয় শেষ। কিন্তু মানুষের প্রাণ পৃথিবীর সমস্ত পাওনা চুকিয়ে না দিয়ে ত মুক্তি পায় না। সারারাত্রি সেই যন্ত্রণা সহ্য ক’রে শেষ রাত্রির দিকে ললিতা যেন ঝিমিয়ে পড়ল। আমরা তিন জনে সারারাত তার বিছানার পাশে ব’সে ব’সে কাটালুম।

“ললিতাদের গ্রামের ধার দিয়েই গঙ্গা বয়ে গিয়েছে। আমি রোজ নদীতে গিয়ে স্নান করতুম। সকালবেলা একটুখানি ঘুমিয়ে স্নান সেরে এসে দেখি, ললিতা জেগেছে আর বেশ প্রফুল্লভাবেই তার ছোট ভাই-বোন্‌দের সঙ্গে গল্প করছে। একটি ভাই আদর ক’রে তার দিদির পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। আমি ঘরে ঢুক্‌তেই ললিতা আমায় জিজ্ঞাসা করলে—‘সন্ন্যাসী, তুমি স্নান করতে গিয়েছিলে বুঝি?’

“‘হ্যাঁ।’

“‘এখন গঙ্গার দুকূল ভ’রে উঠেছে, না?’

“‘হ্যাঁ।’

“‘আচ্ছা, সন্ন্যাসী, গঙ্গার ধারে সেই যে বড় বটগাছটা—সেটা দেখেছ?’

“‘হ্যাঁ।’

“‘তারই একটি মোটা শেকড় মাটী থেকে ধনুকের মত হ’য়ে উঠে আবার মাটীর মধ্যে ঢুকে গিয়েছে—সেটা দেখেছ?’

“‘কৈ, তা ত’ দেখিনি!’

“‘তা হ’লে সেটা জলে ডুবে গিয়েছে। আর কত দিনে যে গঙ্গার আবার সে রূপ দেখতে পাব!’

“ললিতা তার ক্লান্ত চোখ দুটো বন্ধ করলে। কিছুক্ষণ পরে ললিতার মা অমিতা ও তার ছোট ভাই দুটিকে খাবার জন্ত ডেকে নিয়ে গেলেন।

“ভাই-বোনেরা চ’লে যাবার পর ললিতা চোখ মেলে আমায় বোল্লে—‘সন্ন্যাসী, এই সময় মাঠে খুব কাশ-ফুল হয়। আমার জন্ত কাল এক গোছা তুলে আন্‌বে?’

“আমি বল্লুম—‘কাল কেন, আজই বিকেলে তোমার

জন্য কাশ নিয়ে আসব। মাঠে অনেক কাশ দেখেছি।’

“ললিতা এতক্ষণ বেশ হাসিখুসীই কচ্ছিল, হঠাৎ তার চক্ষু দুটি সজল হয়ে উঠল। অনেকক্ষণ নির্ব্বাক্ হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে সে বল্লে—‘সন্ন্যাসী, আমার যেন মনে হচ্ছে, মাঠ-ভরা কাশের সেই শোভা, বর্ষার গঙ্গার সেই আপন-ভোলা উদ্দাম স্রোত, শরতের সকালে এই মিষ্টি রোদ—এই শেষ—সব শেষ। আর দেখ্‌তে পাব না।’

“ললিতার কণ্ঠে এমন একটা অসহায় ও উদাস সুর বাজতে লাগল যে, চোখের জল সংবরণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠতে লাগল। কিন্তু তখনও সন্ন্যাসীর অভিমান আমার যায় নি। নিজের মনকে ধমক দিতে লাগলুম—ছি, এত কোমল তুমি!

“ললিতাকে বল্লুম—‘ললিতা, ও সব কথা ভেবে নিজের অসুখ বাড়িয়ে কেন আমাদের দুঃখ দিচ্ছ? তুমি ঘুমোবার চেষ্টা কর।’

“ললিতা আবার আমার মুখের দিকে তাকালে। সেই সজল দৃষ্টি। এবার সে বল্লে—‘সন্ন্যাসী, আমার জন্য তোমার দুঃখ হয়? আমি যদি ম’রে যাই—আমার কথা কি তোমার মনে থাকবে? আমি ম’রে গেলে তুমিও ত এখান থেকে চ’লে যাবে। তার পর তুমি কত দেশে দেশে ঘুরবে, কত লোকের সঙ্গে পরিচয় হবে, তারই মধ্যে সজনে কি নির্জ্জনে পাড়া-গাঁয়ের এই ললিতার কথা—যার সঙ্গে দুদিনের জন্য তোমার ভাব হয়েছিল, তার কথা কি মনে থাকবে?’

“আমার কণ্ঠ শুকিয়ে এসেছিল। কোনও রকমে গলাটি পরিষ্কার ক’রে নিয়ে বল্লুম, ‘থাকবে, ললিতা! তোমাকে কখনও ভুলব না।’

“ললিতা যেন একটা আশ্বাসের নিশ্বাস ফেলে বল্লে—‘আ সন্ন্যাসী, তুমি বড় ভাল।’

“ললিতাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে তার মাকে নির্জ্জনে ডেকে বল্লুম—‘ললিতার অবস্থা ভাল নয়, বোধ হয়, দুই এক দিনের বেশী বাঁচবে না।’

“কথাটা শুনে তিনি চমকে উঠলেন। সন্তানের মৃত্যু-সম্ভাবনার সংবাদে মায়ের সে চমকানি—তার বর্ণনা করবার ভাষা আমি জানি না। তিনি কোনও কথা না ব’লে নীরবে কাঁদতে লাগলেন। সদ্যোবিধবা সেই নারীকে সান্ত্বনা দেবার মত ভাষা আমার যোগাল না। ব’সে ব’সে ভাবতে লাগলুম, মৃত্যু এ সংসারে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা, কিন্তু ধরণীর এই অতি-পুরাতন অতিথি প্রতি গৃহে প্রতিবারেই দেখা দেয়। সকলেই জানে, এর কোন প্রতীকার নাই, তবুও তারা শোকে কাতর হয়। সকলেই জানে, সান্ত্বনার কোন মূল্য নাই, তবুও সান্ত্বনার ভাষা খুঁজে মরে। ললিতার মা’র অশ্রু দেখে আমিও দু-চারটে সান্ত্বনার বাঁধা গৎ আওড়াতে লাগলুম। কিন্তু ছেলেরা সেখানে এসে পড়ায় তাড়াতাড়ি সেখান থেকে স’রে গেলুম।

“বিকেলবেলা অমিতা ও তার ভাই দুটিকে নিয়ে মাঠ থেকে কয়েক গোছা কাশফুল তুলে নিয়ে এলুম। বেলা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ললিতা কি রকম বিষণ্ণ হয়ে পড়েছিল। ফুলগুলো দেখে তার মুখে আবার ম্লান হাসি ফুটে উঠল। সে একটি গোছা ফুল নিয়ে নিজের মুখের ওপর বুলোতে আরম্ভ করলে।

“সে দিন সন্ধ্যার দিকে ললিতা ঘুমিয়ে পড়েছিল, ঘুম ভাঙল একেবারে রাত্রি বারোটা কি একটায়। এর মধ্যে তাকে একবার জাগিয়ে খাওয়ান হয়েছিল। আমি তার পাশে বসেছিলুম, সে আমার একখানা হাত ধ’রে বল্লে—‘সন্ন্যাসী, ঠিক ক’রে বল ত, আমি বাঁচব কি না? দেখ, আমার কাছে গোপন ক’রো না? যদি আমি আর না বাঁচি, তা হ’লে তোমায় একটা কথা ব’লে যাব। সে কথা তোমাকে বলবার আগে আমি ম’রে গেলে আমার ক্ষোভের আর সীমা থাকবে না। সে দুঃখ তুমি বুঝতে পারবে না। বল—বল—আমি কি আর বাঁচব না?’

“ললিতার সে অনুরোধ উপেক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব হ’লো না। ব’লে ফেল্লুম—‘তোমার অবস্থা খুবই খারাপ, যে কোনও মুহূর্ত্তে মৃত্যু হ’তে পারে।’

“আমার কথা শুনে সে একটা আক্ষেপের নিশ্বাস ফেলে বল্লে—‘বড় উপকার করলে তুমি আমার! এ কথাটা তোমায় না বল্লে মরেও আমি শান্তি পেতুম না। শুনবে সে কথা?’

“‘বল শুনি!’

“‘আমি তোমায় ভালবাসি।’

“এ্যা! আমার সন্দেহ হ’লো যে, বিকারের ঝোঁকে

সে বুঝি ভুল বক্‌ছে। তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বল্লুম—'ললিতা, ঘুমোও তুমি। বেশী কথা কইলে—'

"ললিতা আমার কথা গ্রাহ্য না ক'রে ব'লে যেতে লাগল—'দেখ,সন্ন্যাসী,জীবনে আমার সব সাধই মিটেছে, কিন্তু আমি কখনও কারুকে ভালবাসি নি। আমার বুকে ভালবাসার যে সম্পুটখানি আছে, ধনী যেমন যত্ন ক'রে নিজের বুকের মধ্যে মহামূল্য রত্নকে আগলে রাখে, আমিও তেমনই আমার কুমারীধর্ম্ম দিয়ে আমার সেই ভালবাসাটিকে আগলে রেখেছিলুম—আমার স্বামীর হাতে অক্ষুণ্ণ সেই পাত্রটিকে তুলে দেবার জন্ত। আজ আর সময় নেই, আমি তোমার হাতে আজ সেই রত্ন তুলে দিচ্ছি। সন্ন্যাসী, শোনো—আমি তোমায় ভালবাসি।'

"আমার মনের অবস্থাটা একবার তোমরা কল্পনা ক'রে দেখ। বাক্‌পটুতার জন্ত তোমাদের কাছে কত প্রশংসাই না পেয়েছি! কিন্তু সেই মুমূর্ষু দু-দিনের পরিচিতার প্রেম গ্রহণ করবার মত ভাষা আমি খুঁজে পেলুম না! স্তম্ভিত হয়ে তার পাশে ব'সে রইলুম।'

"ললিতা আবার বল্‌তে আরম্ভ করলে—'সন্ন্যাসী, এ দিকে ফের, আমার দিকে চাও।'

"আমি তার দিকে চাইলুম। সে বল্লে, 'তুমি? তুমি আমায় ভালবাস?"

"আমি কি বল্‌ব। তাকে ভালবাসার কোনও কল্পনা তখনও পর্য্যন্ত স্বপ্নেও আমার মনের মধ্যে উঁকি দেয় নি। কিন্তু তার জীবন-মরণের মাঝে সেই ক্ষীণ ব্যবধানটুকু প্রত্যাখ্যানের লজ্জা আর দুঃখে ভরিয়ে দেবার মত সত্যনিষ্ঠা আমার নেই। ব'লে ফেল্লুম—'বাসি ললিতা, বাসি। তুমি কি বুঝতে পার না?'

"বলেই মনে হ'লো, মিথ্যা কথা বলতে শেখা আমার সার্থক হয়েছে। মিথ্যার অতখানি সদ্ব্যবহার করবার অবসর বোধ হয় জীবনে আর পাব না।

"ললিতা আমার কথা শুনে বল্লে,—'বুঝতে পারি। সেই জন্তই ত তোমাকে ভালবেসেছি।'

"আমি বল্লুম, 'ললিতা, গতজন্মে তোমার সঙ্গে নিশ্চয় আমার কোনও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। সেবার বোধ হয়, আমি তোমাকে এমনই ক'রে ফাঁকি দিয়েছিলুম, এ জন্মে তুমি আমায় ফাঁকি দিলে।'

"ললিতা একটু হেসে বল্লে, 'শোধবোধ হয়ে গেল। এবার যখন মিশব, তখন আর ছাড়াছাড়ি হবে না। যাবার আগে—'

"ললিতা আর বলতে পারলে না। আমি নীচু হয়ে তার জ্বরতপ্ত অধরে তার কুমারীজীবনে প্রথম প্রেমের চুম্বন এঁকে দিলুম।

"ললিতা জিজ্ঞাসা কল্লে—'তোমার নাম কি, সন্ন্যাসী?'

"আশ্চর্য্য! এত দিন সে আমার নাম পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করে নি। আমাকে সন্ন্যাসী বলেই ডাক্‌ত। আমি বল্লুম—'আমার নাম দীনবন্ধু।'

"সে বল্লে, 'না না, ও নাম ভাল না। ও আবার কি নাম!'

"বল্লুম, 'তা হ'লে তুমি আমার একটা নাম দাও।'

"ললিতা আবার সেই ম্লান হাসি হেসে বল্লে—'সেই বেশ। তোমার নাম তরুণ। কেমন?'

"আমার হাসি পেল। বল্লুম, 'তোমার যে নাম ইচ্ছা, সেই নাম ধরেই আমায় ডেকো।'

"সে বল্লে, 'দূর, তোমার নাম বুঝি আমায় ধর্‌তে আছে?'

"একটু চুপ ক'রে সে আবার বল্লে, 'ওগো, তোমার পায়ের ধুলো আমার মাথায় একটু দাও না।'

"আমি তাই দিলুম। একটু হাঁপিয়ে গিয়ে সে বল্লে—'ওগো, আর একবার—ওগো, আর একবার!'

"আবার তার তৃষিত অধর চুম্বনে ভরিয়ে দিতে হ'লো। চুমুতে তার যেন সাধ আর মিটছিল না। সে আমার একখানা হাত চেপে ধ'রে রইল। সেই অবস্থাতে আমাদের প্রথম প্রেমের বাসর-রাত্রি অবসান হ'লো।

"পরদিন সন্ধ্যার সময় ললিতা ইহলোক থেকে বিদায় নিলে।"

দীনবন্ধুর কাহিনী শুনিয়া আমরা নীরব রহিলাম। মহেন্দ্র দাদা জিজ্ঞাসা করিল—"গেরুয়া ছাড়লে কোথায়?"

দীনবন্ধু বলিল, "শ্মশানঘাটে স্নান ক'রে নূতন কাপড় পরবার সময় গঙ্গার জলে গেরুয়া ভাসিয়ে দিয়ে এসেছি।"

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী

# মাসী

## ১

সকালবেলা অশ্রু-লাঞ্ছিত গণ্ডে উভয় হস্তে চক্ষু রগড়াইয়া অস্ফুট স্বরে ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে মীনু আসিয়া মায়ের জানুদেশে মুখ লুকাইল।

“কি হয়েছে রে?”—বলিয়া মা তাহার ক্ষুদ্র হাত দুইখানি আপনার জানু হইতে খুলিবার চেষ্টা করিলেন।

মীনু আরও জোরে শক্ত করিয়া মা'কে আঁকড়াইয়া ধরিয়া মুখ গুঁজিয়া ফোঁপাইতে লাগিল।

মা সস্নেহে অভিমানিনী কন্যাকে জানু হইতে মুক্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি হয়েছে? সকালবেলাই কান্না কেন?”

ক্রন্দনবিজড়িত স্বরে মীনু বলিল, “অজিত মেরেছে!”

“অজিত মেরেছে? তারই জন্য কান্না? ছি, ছি, কি লজ্জার কথা! ও যে তোমার ছেলে হয়, তুমি হচ্ছ ওর মাসী, ওর মারে তুমি কেঁদে ফেলেছ?”

লজ্জিতা মীনু ময়লা ফ্রকের প্রান্তে চক্ষু মুছিতে মুছিতে অপ্রতিভ স্বরে বলিল, “শুধু মারেনি, আমার রবারের বেলুনও কেড়ে নিয়েছে!” মীনুর চক্ষুতে আবার বন্যা আসিল।

মা আনতা হইয়া অঞ্চল-কোণে কন্যার অশ্রু মুছাইতে মুছাইতে মিষ্ট হাসিয়া বলিলেন, “তারই জন্যে তুমি কাঁদছ? কিন্তু তুমি অজিতের মাসী—তোমার ত নিজ থেকেই বেলুনটা তোমার ছেলেকে দিয়ে দেওয়া উচিত ছিল।”

মীনু লজ্জিত হাস্যে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, “না, মা, না, তার জন্যে আমি কাঁদবো কেন? বেলুন ও নিক্ না, কিন্তু ও যে আমার সঙ্গে আর খেলবে না বলেছে!”

মীনুর ধূলি ও অশ্রু-লাঞ্ছিত সুন্দর কচি মুখখানি অঞ্চল দিয়া সস্নেহে পরিষ্কার করিতে করিতে মা হাসিমুখে বলিলেন, “বললেই বা! ওর কথা কি তোমার গ্রাহ্য করতে আছে? তবে তুমি কি রকম মাসী! অজিত তোমার ছেলে কি না, ওর কথায়—ওর মারে কাঁদতে নেই, বুঝেছ?”

মীনু নিতান্ত লজ্জিতভাবে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়া চপলচরণে শশক-শিশুর মত ছুটিয়া পলাইল। তাহার ক্রন্দনারক্ত অশ্রুসিক্ত মুখখানিতে তখন হাসির উজ্জ্বল দীপ্তি বর্ষণান্তে স্বর্ণ রৌদ্ররেখার ন্যায় ঝল্‌মল্ করিয়া উঠিয়াছে।

অজিত ছিল মীনুর চেয়ে পাঁচ বছরের বড়, মীনুর বিধবা বড়দিদির একমাত্র সন্তান। পিতৃ-মাতৃহীন অজিতকে নিরাশ্রয় করিয়া তার মা'ও যখন পরপারে যাত্রা করিল, তখন মীনুর মা কন্যাশোক সংযমিত করিয়া পিতৃমাতৃহীন দৌহিত্রটিকে আপনার কাছে লইয়া আসিয়া মানুষ করিতে লাগিলেন।

স্বাস্থ্যসবল হৃষ্টপুষ্ট অজিতকে মীনু অপেক্ষা অনেক অধিকবয়স্ক বলিয়া ভ্রম জন্মিত। দৈহিক আয়তনে বড় হইলে কি হয়? পিতৃমাতৃহীন বালক মাতামহীর স্নেহাদরে লালিত হওয়ায় তাহার স্বভাবটি হইয়াছিল নিতান্ত শিশুর মত চঞ্চল, অবুঝ, আবদারী, অভিমানী।

মীনু বাহিরে গিয়া হাসিমুখে রাঙ্গা বেলুনের স্বত্ব ত্যাগ করিবামাত্র অজিত খুসী হইয়া সন্ধিস্থাপনা করিয়া ফেলিল,—“মীনু ভাই, দাদুকে ব'লে আমি তোকে একটা বেলুন কিনে দেব।”

“না, না, আমার দরকার নেই। ও বেলুনটা আমি তোকে আগেই দিতুম, ভাই! আমি তোর মাসী হই কি না, আমাকে দিতে হয়।”

চিন্তিত মুখে অজিত বলিল, “আচ্ছা, তুই যদি আমার মাসী হ'স, আমি তা হ'লে তোর কে হই, বল দিকিন?”

আনন্দ-দীপ্ত মুখে মীনু বলিল, “ছেলে!”

“দূর! তা কি হয়? আমি তোর চেয়ে ক—ত বড়! আয় না, মেপে দেখ্!”

শঙ্কিত মুখে মীনু বলিল, “না, না, তুমি আমার ছেলে হও, মা ব'লে দিয়েছেন। তাই ত তোমাকে খেলনা দিয়ে কাঁদতে নেই!”

ভ্রূকুটিপূর্ণ সন্দিগ্ধ মুখে অজিত বলিল, “আচ্ছা, চল্ দিকিনি দিদা'র কাছে।”

মীনু উদ্বিগ্ন মুখে বলিল, “হ্যাঁ, চল না।”

উভয়ে ছুটিতে ছুটিতে অন্তঃপুরে আসিয়া প্রায় সমস্বরে চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “হ্যাঁ, দিদা, মিনি আমার কে হয়?”

"হ্যাঁ মা, আমি অজিতের মাসী নই ?"

মা কুটনা কুটিতে কুটিতে হাঁ হাঁ করিয়া উঠিলেন,—"থাম্ থাম্,বঁটীর উপরে প'ড়ে গিয়ে খুন্ হবি যে।" চলনবেগ সংবরণ করিয়া তাহারা আবার উৎসুক কণ্ঠে প্রশ্ন করিল। মা বঁটীখানি কাৎ করিয়া রাখিয়া অজিতকে উভয় বাহু-প্রসারণে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া মিষ্ট স্বরে বলিলেন, "মীনা তোমার মাসী হয়, দাদা!"

মীনু আনন্দে হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে অজিতের উদ্দীপ্ত মুখখানি ম্লান হইয়া গেল। সে দিদিমার ক্রোড়ের মধ্যে নিজের শরীরটাকে একটা বিপুল ঝাঁকুনি দিয়া অসন্তোষ এবং আবদারের সুরে বলিল, "ও আমার মাসী হয়, আমি তা হ'লে ওর কে হই ? আমি যদি ওকে 'মাসী' ব'লে ডাকি, ও আমাকে কি ব'লে ডাকবে ?"

মাতা হাসিতে হাসিতে অজিতের গাল টিপিয়া আদর করিয়া বলিলেন, "তুমি ওর বোন্-পো হও, ও তোমাকে 'ছেলে' ব'লে ডাকবে।"

বিদ্রোহী অজিত সজোরে মাথা নাড়িয়া বিরক্ত স্বরে কহিল, "না, আমায় 'ছেলে' বলতে হবে না! ও কি আমার চেয়ে বড় ? ঐটুকু মিনিকে আমি কক্ষনো 'মাসী' বল্‌ব না। আমি ওর চেয়ে ক—ত বড় বল ত ?"

মা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তা হ'লে তুমিই ওকে মেয়ে ব'লে ডেকো ও তোমাকে 'বাবা' বল্‌বে—কেমন ?"

অজিত আরও রাগিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, না, তাও হবে না। মীনুর বাবা ত দাদু! আমি কেন হ'তে যাব ? আমি বাবা হ'তে চাই না!"

মা বলিলেন, "তবে তুমি মীনুর কে হবে, বল, শ্বশুর ?"

রাগান্বিত অজিত বুঝিল, দিদিমা পরিহাস করিতেছে। সে ক্রোধে, ক্ষোভে, দুঃখে দিশাহারা হইয়া আরও জোরে মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "না না, কিচ্ছু না, আমি ওর কেউ হব না। ভারী ত ঐটুকুন মেয়ে!"

মীনুর ম্লান মুখখানি ক্রমশঃ অশ্রুসজল হইয়া আসিতেছিল, অভিমানিনী কন্যার ছলছল নেত্রের প্রতি কোমল দৃষ্টিপাত করিয়া ক্ষিপ্ত নাতির বিপর্য্যস্ত কেশগুলি গুছাইতে গুছাইতে স্নিগ্ধকণ্ঠে মা বলিলেন, "আচ্ছা, ওকে তোমার কিছুই বলতে হবে না। কিন্তু তুমি যখন ওর চেয়ে অনেক বড়—ও তা হ'লে তোমাকে কি ব'লে ডাকবে, সেটা ব'লে দাও!"

"না, না, ওকে কিচ্ছু বলতে হবে না, হুঁঃ!"

তার চেয়ে তুমি ওকে 'মিনু মাসী' ব'লে ডেকো, ও তোমাকে 'অজি মামা' ব'লে ডাকবে, সেই বেশ হবে, কেমন ?"

এবারও অজিত প্রবল আপত্তি করিয়া বলিল,—"না, তা হবে না। আমি ওর চেয়ে ঢের বেশী বড়, ও যদি আমাকে 'দাদা' বলে, তবে আমি ওকে 'মাসী' বলবো!"

মীনুর বাবা বারান্দায় ইজি-চেয়ারে বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে কন্যা ও দৌহিত্রের কলহ শুনিতেছিলেন, উচ্ছ্বসিত অট্টহাস্যে তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"দূর শালা!"

অপ্রতিভ অজিত দিদিমার ক্রোড় হইতে নিজেকে সজোরে ছিনাইয়া লইয়া উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। মীনুও তাহার পিছু পিছু ঝুমকো কালোচুলে ঢেউ তুলিয়া, অর্দ্ধমলিন গোলাপী ফ্রকের লেশের ঝালর দোলাইয়া, প্রভাত হাওয়ার মত চপল লঘু নৃত্যতালে ছুটিয়া চলিয়া গেল।

## ২

পাঁচ বছরের মীনু এখন বারো বছরের, আর দশ বছরের অজিত সতেরো বছরের হইয়াছে। অজিত মীনুকে আর 'মাসী' বলিতে আপত্তি করে না, মীনুও যখন-তখন মাসীত্বের দাবী লইয়া মায়ের কাছে সাশ্রু নেত্রে নালিশ করিতে ছুটে না। অজিত মীনুকে ডাকে 'মীনু মাসী' আর মীনু অজিতকে ডাকে, 'ছেলে।'

অজিত স্কুলের পড়া সাঙ্গ করিয়া কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছে, তাহার ছোট পড়ার ঘরখানি সৌখীন-রুচিতে সুন্দরভাবে সাজান হইয়াছে। বায়স্কোপ, থিয়েটার, মিটিং, বক্তৃতা, পলিটিক্স, সোসিয়্যালিজম, ইংরাজী সংবাদপত্র, বন্ধুবান্ধব ও কলেজ লইয়া অজিতের দিনগুলি কোথা দিয়া কাটিয়া যাইতেছে, তাহা সে নিজেই বলিতে পারে না।

আর মীনু মায়ের কাযের সাহায্য করে, পান সাজে, কুটনো কোটে, বাবার ও অজিতের মোজা মেরামত করে, কাপড় রিপু করে, জামার বোতাম বসায়। অবসরমত 'রয়্যাল রিডার নম্বর থ্রী' বইখানি পড়িতে বসে। সে আগে স্কুলের গাড়ী করিয়া স্কুলে যাইত, কিন্তু এখন আর তা যায় না, কারণ, তাহার বারো বৎসর বয়স হইয়াছে, বিবাহের সম্বন্ধ আসিতেছে।

বিকালবেলা মীনু কাপড় কাচিয়া ভিজা কাপড় ছাড়িয়া চাঁদের আলো রঙ্গের ডুরে শাড়ীখানি সেমিজের উপর গুছাইয়া পরিতেছিল, অজিত মুগা'র পাঞ্জাবী দোলাইয়া ব্যস্ত ভাবে সেই দিকে আসিয়া বলিল—"মীনু মাসী! একটা চুলের কাঁটা দে ত!"

মীনু কাপড় পরা শেষ করিয়া শাড়ীর প্রান্তে চাবির গুচ্ছ বাঁধিতেছিল। চাবিবদ্ধ আঁচলটা ঝনাৎ করিয়া পিঠের উপর ফেলিয়া, সযত্নরচিত উঁচা জাপানী খোঁপার উপর আলগোছে একবার বাম হাতখানি বুলাইয়া লইয়া বলিল,—"আমার খোঁপায় সেলুলয়েডের ক্লিপ আছে, লোহার কাঁটা নেই!" চঞ্চল অজিত অধীরভাবে বলিল, "একটাও নেই? আঃ, তোরা যে কি-ই ফ্যাসান করতে শিখেছিস্! মেমেদের মত ক্লিপ ইউজ করা!"

ভীত উদ্বিগ্ন মুখে মীনু বলিল, "সেফটিপিনে হবে কি?"

সাগ্রহে ঝুঁকিয়া অজিত বলিল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই দে, শীগ্‌গির—"

বাম হাতের সোনার চুড়িতে দুই তিনটা সেফটিপিন আট্‌কান ছিল, মীনু তাড়াতাড়ি একটা খুলিয়া অজিতের হাতে দিল। সেফটিপিন লইয়া অজিত অতি ব্যস্তভাবে দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

মীনু ভিজা কাপড় বারান্দার রেলিঙ্গের উপর শুকাইতে দিতে দিতে ভাবিতে লাগিল, অজিত কেন তাহাকে এত তাচ্ছীল্য করে? সে অজিতের চেয়ে বয়সে ছোট, এ ছাড়া আর তার কি ত্রুটি আছে?

বারান্দার থামের উপরকার টব হইতে বিলাতী ফুলের তীব্র গন্ধ বাতাসকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিতেছিল। মীনা চিন্তা-ম্লান মুখে ছাতে উঠিবার কাঠের সিঁড়ির উপর বসিয়া ভাবিতে লাগিল—কেন এমন হয়? সে ত অজিতের আপনার মাসী, বয়সে ছোট বলিয়া অজিত তাহাকে অগ্রাহ্য করিবে কেন?

দেওয়া-নেওয়া সম্পর্কটাও তাহাদের মধ্যে এমন দাঁড়াইয়া গিয়াছে, অজিত জানে, সে যাহা পায়, তাহা তাহার ন্যায্য প্রাপ্য, ইহার মধ্যে কিছুই বিশেষত্ব নাই। আর মীনু জানে, তার দেওয়ারই কথা, ত্রুটি হইলে অজিত অসন্তুষ্ট হইবে, ইহা স্বাভাবিক।

অজিতের জন্য মীনু নিজের হাতে সুন্দর সুন্দর রুমাল তৈয়ারী করিয়া, কোণে ফুল-লতা আঁকিয়া তাহার মধ্যে অজিতের নামে মনোগ্রাম করিয়া দেয়, ভাল কারুকার্য্যখচিত টেবল্-ক্লথ, জানালার সৌখীন পর্দ্দা সযত্নে বহু পরিশ্রমে নিজহস্তে প্রস্তুত করিয়া দেয়। অজিত গম্ভীরভাবে গ্রহণ করে, যেটা অপছন্দ হয়—'এটা ক্যাডাভারাস্ হয়েছে। অসভ্য ডিজাইন!' এমনই একটা কিছু বলিয়া নিন্দা করে; ভাল হইলে প্রায়ই কিছু বলে না।

মীনু মায়ের সঙ্গে নানা রকম খাবার তৈয়ারী ক'রে অজিতের পাতে দিয়া হয় ত হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করে—"আচ্ছা ছেলে, বল ত আজকের কপীর কচুরীটা কেমন খেতে হয়েছে?"

অজিত খাইতে খাইতে গম্ভীর ঔদাস্যভরে সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয়—"মন্দ নয়।"

তাহার পর অজিত হয় ত কোনও দিন মীনুকে শুনাইয়া বলে, তাহার কোন বন্ধুর বোন্ কি চমৎকার খাবার তৈয়ারী করিতে পারে। সে খাবার একবার খাইলে বহু দিন তার আস্বাদ ভোলা যায় না। শুধু খাবার তৈয়ারী নয়, তার মত গান গাহিতে এবং এস্রাজ বাজাইতেও না কি কম মেয়ে পারে। পড়াশুনাতেও তার খুব মনোযোগ, হাতের সেলাইও অতি চমৎকার, অথচ বয়সে সে মীনুর চেয়ে ছোট।

সে দিন মীনুরাণীর খাবার তৈয়ারীর সমস্ত উৎসাহই যেন মুহূর্ত্তের মধ্যে নিভিয়া যায়,—সে মনে মনে ভাবিতে থাকে, সে কেন এমন মূর্খ হইল!

মীনু অজিতকে এক জন অসাধারণের মধ্যে গণ্য করিয়া মনে মনে তাহার সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করিত; কিন্তু অজিত কোনও দিন কল্পনাই করিতে পারিত না—ছোট্ট মীনুমাসী—সে আবার আলোচনা, নিন্দা, প্রশংসা বা চিন্তার যোগ্য মানুষ হইতে পারে!

এইরূপে বিভিন্ন মনোভাবে দুইটি তরুণ-তরুণীর চিত্ত অভিভাবকদের স্নেহচ্ছায়াতলে পাশাপাশি বাড়িয়া উঠিতেছিল।

* * * *

দ্বিপ্রহরে তীব্রোজ্জ্বল রৌদ্র কলিকাতা মহা নগরীকে উত্তপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। স্বচ্ছ নীল আকাশ গলিত অগ্নিধারা-সিক্ত হইয়া আলোক-প্রতিফলিত একখানি প্রকাণ্ড

আয়নার মত দৃষ্টি ঠিক্‌রাইয়া দিতেছিল। শুভ্র মল্লিকাদামের মত এক এক স্তবক মেঘ আকাশের এ দিকে ও দিকে লঘুভাবে লাগিয়া আছে। চিলগুলি প্রায় মেঘের কাছ বরাবর উঠিয়া তীক্ষ্ণ করুণ চীৎকারে ক্রমাগত পাক্ খাইয়া ঘুরিতেছিল। রাস্তার গলীতে গলীতে বাসন-বিক্রেতাদের ঢং—ঢংঢং কাঁসির আওয়াজ ও জামা-বিক্রেতাদের 'বডী—জা—মা সে—মিজ চাই'র সুর ব্যতীত অন্য ফেরীওয়ালার শব্দ নাই।

মীনু মায়ের ঘরের জানালায় বসিয়া নীল ভেল্‌ভেটের উপর সিল্কের ফুল, জরি, পুঁতি প্রভৃতি বসাইয়া কৃত্রিম লতা-পুষ্প তুলিয়া একটা অ্যাল্‌বাম তৈয়ার করিতেছিল।

চাঁপা রঙ্গের সিল্কের টুকরা কাটিয়া একটি সুদৃশ্য চাঁপাফুল ভেলভেটের উপর বসাইতে বসাইতে তাহার সবুজ পুঁতির বৃন্তটি কেমনভাবে বেঁকাইয়া বসাইলে সুশোভন হইবে, একান্ত মনোযোগ সহকারে যখন সে- চিন্তা করিতেছিল, অজিত হাতে একজোড়া সাদা ধবধবে গরম দস্তানা লইয়া তখন সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল—"মিনু মাসী। আজ পিক্‌চার প্যালেসে একটা নতুন ভালো ফিল্ম আছে,—একটা টাকা দিতে পারিস? এ মাসে আমার সব খরচ-পত্র হয়ে গেছে।"

মীনু "দিচ্ছি" বলিয়া উৎসুক নেত্রে অজিতের হাতের দিকে চাহিয়া বলিল—"তোমার হাতে ওটা কি?"

অজিত গম্ভীর স্বরে বলিল—"গ্লাভস্। আমার বন্ধু বিনয়কে জানিস্ ত? তার বৌদি তৈরী করেছেন।"

মীনু উঠিয়া বাক্স খুলিয়া অজিতের হাতে একখানি এক টাকার নোট দিয়া তাহার হাত হইতে দস্তানা জোড়া চাহিয়া লইয়া আগ্রহান্বিতভাবে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে লাগিল।

অজিত মীনুর হাতে তৈয়ারী কালো রেশমে বোনা একটি সুদৃশ্য ছোট থলি বুক-পকেট হইতে বাহির করিয়া তাহার মধ্যে নোটখানি রাখিয়া পকেটে পুরিতে পুরিতে বলিল—"কেমন হয়েছে, বল্ দিকিনি? ঠিক যেন কলে তৈরী! ধরবার জো নেই! হুঁঃ, খালি মোজা বুনে আর রুমাল তৈরী করেই তোরা অহঙ্কারে গেলি, এমনি নাইস গ্লাভস করতে পারিস?"

মীনু দীপ্ত মুখে বলিল—"কেন পারবো না? বাবার জন্য যে সোয়েটারটা বুনেছি, সেটা ত এই বুনুনি! দস্তানাটা পেলে ওর ঘর হিসাব ক'রে নিয়ে আমি ঠিক তৈরী করতে পারি।"

"হ্যাঁ, এ রকম আর করতে হয় না! আচ্ছা, তোকে সাদা উল এনে দেব, দেখি কেমন করিস?"

"সাদা উল আমার আছে। তোমাকে ঐ রকম দস্তানা তৈরী ক'রে দিলেই ত হ'ল।"

অ্যালবামটার দিকে তাকাইয়া অজিত বলিল—"ওটা কি হচ্ছে, যত সব জব্বর হিজিবিজি কাব! ফাইন টেষ্টই তোদের নেই! কি জিনিষ ওটা?"

মীনু একটু ম্লান মুখে বলিল—"অ্যালবাম।"

ভাল করিয়া অ্যালবামটা দেখিতে দেখিতে সেই দিকে একটু ঝুঁকিয়া পড়িয়া অজিত জিজ্ঞাসা করিল—"কার জন্যে তৈরী হচ্ছে?"

"বাবার বন্ধু শরৎ কাকাবাবুর জন্যে।"

"গ্লাভস্ জোড়া দে, বিনয়কে দিয়ে আসি।"

মীনু মিনতিভরা চক্ষুতে কহিল—"এটা আজ আমার কাছে থাকল, ছেলে।"

অজিত অবজ্ঞার সুরে বলিল—"না না, পরের জিনিষ, আবার নোংরা-ফোংরা লেগে নষ্ট হয়ে যাবে, দিয়ে দে। তুই যে কত পারবি, সে জানাই আছে!"

মীনু আহতা হইয়া নিঃশব্দে দস্তানা জোড়া ফিরাইয়া দিল। অজিত দস্তানা লইয়া চলিয়া যাইতে যাইতে বলিয়া গেল—"আমার বিছানার চাদর ছিঁড়ে গেছে, আর গেঞ্জির বোতাম নেই, সেলাই ক'রে রাখিস।"

মীনুর গলার কাছে ঠেলিয়া আসিল,—"আমি পারবো না," কিন্তু সে মুখে কিছু উচ্চারণ করিতে পারিল না।

অজিত বি, এ, পাশ করিয়াছে। মীনুর বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে। আগামী মাঘমাসে তাহার বিবাহ।

সন্ধ্যাবেলায় মীনু বারান্দায় গ্যাস ষ্টোভ জ্বালিয়া পেয়ারার জেলি প্রস্তুত করিতেছিল। মা ঘরের ভিতর লুচি ভাজিতেছিলেন। মীনুকে ডাকিয়া বলিলেন—"মিনা, অজি'কে ডেকে দে ত! খাবার চেয়ে কোথায় চ'লে গেল? লুচি ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে!"

মীনু গর্জ্জমান ষ্টোভের উপর এলুমিনিয়ম প্যানের হাণ্ডেলটা বামহাতে শক্ত করিয়া ধরিয়া ডান হাতে

এনামেলের বড় চামচ দিয়া একান্ত মনোযোগের সহিত জেলিটা নাড়িতে নাড়িতে বলিল,—"ছেলেকে ডাকতে গেলে আমার জেলিটে নষ্ট হয়ে যাবে, মা !"

মা বলিলেন—"ঐখান থেকেই চেঁচিয়ে ডাক না,—সে বোধ হয় পড়ার ঘরে আছে।"

মীনু উচ্চ কণ্ঠে ডাকিল—"ছেলে,—ছেলে—ও ছেলে—তোমাকে মা খাবার খেতে ডাকছেন !"

উত্তর আসিল না, মীনু আবার ডাকিল।

এবার চটি-জুতায় উচ্চ চটপট শব্দ তুলিয়া অজিত ক্রুদ্ধ-মুখে ভিতরে আসিয়া বিরক্তিকঠিন স্বরে বলিয়া উঠিল, "কি যে অসভ্যের মত চেঁচাতে শিখেছিস ! ছেলে ছেলে ছেলে ! বন্ধুদের সামনে যখন তখন আমায় অপ্রস্তুত হ'তে হয় ! আমার নাম ধ'রে ডাকিস, ছেলে বলিসনি, বারণ ক'রে দিলুম।"

মা ঘরের ভিতর হইতে বলিলেন—"তা 'ছেলে' বল্লেই বা, বেশ মিষ্টিই শোনায় ত বাপু ! অত বড় বোনপোকে নাম ধরেই বা ডাকবে কি ক'রে বল্ না ?"

"না, না দিদা, আমাকে সকলকার কাছে ভারী অপ্রস্তুতে পড়তে হয় ! তা ছাড়া এইবার ওর বে'-থা হবে, এখন থেকে ঐ বদ অভ্যেসটা ছাড়ান দরকার।"

অজিত অপ্রসন্ন মুখে লুচির রেকাবীর সামনে পিঁড়ির উপর বসিয়া পড়িল।

মা বলিলেন—"আচ্ছা বাপু, এবার থেকে মীনা অজি' বলেই ডাকবে এখন, থাম্ !"

বাহিরে বারান্দায় মীনুর সুন্দর তরুণ মুখখানি লজ্জায়, অপমানে, দুঃখে রাঙ্গা হইয়া উঠিতেছিল। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, আজ হইতে প্রাণান্তেও 'ছেলে' শব্দ উচ্চারণ করিবে না। মনটা এত চঞ্চল ও ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছিল যে, অন্যমনস্কতায় সযত্ন প্রস্তুত জেলিটা বেশী পাক হইয়া চিটা হইয়া গেল।

পরদিন সকালবেলা অজিত তাহার পড়িবার ঘরের টেবল-সংলগ্ন বড় আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, শার্টের উপর গ্যালিস-সংযুক্ত প্যাণ্ট পরিয়া গলার 'কলারে'টাই' বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছিল। মীনু অজিতের চা আনিয়া টেবলের উপর রাখিয়া, কিছুক্ষণ বিস্মিত নেত্রে অজিতের নূতন সাজসজ্জা এবং টাই বাঁধিবার ব্যর্থ প্রচেষ্টার দিকে চাহিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে ঈষৎ উৎসুক অথচ কুণ্ঠিত স্বরে প্রশ্ন করিল—"কোথায় যাবে ?"

গম্ভীর মুখে নিরুত্তরে অনেকক্ষণ টাই বাঁধিবার ব্যর্থ পরিশ্রম করিয়া অজিত উত্তর দিল—"দরকার আছে এক যায়গায় !"

বার বার নানারকম কায়দায় রঙ্গীন সিল্কের ফিতা-টিতে যত রকমেই ফাঁস টানে উল্টা 'বো' হইয়া যায়, কিছুতেই ঠিক মতটি হইতেছিল না। প্রায় কুড়ি মিনিট আরশীর সামনে দাঁড়াইয়া 'নেক্‌টাই' বাঁধিবার বহু প্রয়াস ব্যর্থ হইবার পর বিরক্ত-অধীর মুখে অজিত 'দূর্ ছাই' বলিয়া টাইটা কলারের ভিতর হইতে সজোরে টানিয়া বাহির করিয়া ফেলিল।

মীনু চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া মজা দেখিতেছিল। তাহার মনে কৌতুকের সহিত সহানুভূতিও জাগিয়া উঠিতেছিল। একটু অগ্রসর হইয়া গিয়া বলিল, "আমি বেঁধে দেব, অজি ?"

বিপদ্‌গ্রস্ত উদ্বিগ্ন অজিত মনে মনে যথেষ্ট কৃতজ্ঞ ও সন্তুষ্ট হইলেও বাহিরে গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিয়া বলিল, "পারবি কি তুই ?"

মীনু বলিল, "হ্যাঁ, পারবো।"

তাহার পর মীনা অগ্রসর হইয়া গিয়া অজিতের নিকট হইতে যথাসম্ভব তফাতে দাঁড়াইয়া সন্তর্পণে ফাঁস টানিয়া অজিতের নেক্‌টাইটিতে নিপুণ সুন্দর 'বো' বাঁধিয়া দিল। সে প্রতিদিন তাহার পিতাকে পোষাক পরার সময়ে সাহায্য করিত, সেই জন্য 'নেক্‌টাই' বাঁধিবার সহজ কৌশলে অভ্যস্তা ছিল।

মীনু অজিতের ওয়েষ্টকোটের পিছনে বক্‌লস্ আঁটিয়া দিয়া কোট ও ওয়েষ্টকোটটি উত্তমরূপে 'ব্রাস্' করিয়া দিল।

অজিত খুসী হইয়া বার বার আয়নার সম্মুখে ঘাড়টি হেলাইয়া ঘুরাইয়া নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়া লইল। জুতা পরিয়া 'ফেল্ট' টুপীটি মাথায় দিয়া অত্যন্ত প্রফুল্লভাবে সাহেবী কায়দায় লম্বা পাদক্ষেপে অজিত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

যাইবার সময় সরু লোহার চেন-বাঁধা চাবি-রিংটি ঝনাৎ করিয়া মীনুর সামনে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল—

"মীনুমাসী! আমার ডেস্কের ভিতরটা বড় অপরিষ্কার হয়ে আছে, গুছিয়ে রাখিস্ ত।"

মীনু খুসী হইয়া চাবি-রিংটা কুড়াইয়া লইল। সকাল হইতে বেলা বারোটা পর্য্যন্ত ঝাঁটা ও ঝাড়ন লইয়া সমস্ত ঘরখানির কড়িকাঠ হইতে মেঝে পর্য্যন্ত ঝাড়িয়া, ধুইয়া, মুছিয়া, সুন্দররূপে বই, খাতা, জিনিষ-পত্র সাজাইয়া, গুছাইয়া, ছবি টাঙাইয়া, ফিটফাট করিয়া রাখিয়া ধূলি-ধূসরিত অঙ্গে মলিন-বসনে প্রসন্নমুখে স্নান করিতে গেল।

* * * * *

যথাসময়ে মীনুরাণীর বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহে মীনু খুবই সন্তুষ্ট হইল, কারণ, সে প্রচুর জিনিষপত্র, বস্ত্রালঙ্কার, খেলনা-পুতুল, প্রসাধন-দ্রব্যের প্রাচুর্য্যে ও সকলের নিকটে আদর-সোহাগের আতিশয্যে অভিভূতা হইয়া পড়িয়াছিল। তদুপরি নব-পরিচিত তরুণ বন্ধুটির অশ্রান্ত প্রেম-গুঞ্জন তাহাকে যেন এক মোহন স্বপ্নলোকে পৌঁছাইয়া দিয়াছিল। সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দের বিষয়, অজিত আজকাল তাহার সহিত বেশ কথাবার্ত্তা কয়,—আর 'তুই' বলে না, বেশী তাচ্ছীল্য করে না। এই আনন্দ এবং এই গর্ব্বই মীনুর ক্ষুদ্র বুকখানিকে পুলকে দোলাইয়া দিতেছিল।

স্বামী সৌরীন্দ্রের সহিত মীনু অধিকাংশ সময়ে অজিতেরই গল্প করিতে ভালবাসিত। সৌরীন্দ্র এক দিন জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা, মীনু, তুমি ত বল, অজিতকে আগে তুমি ছেলে ব'লে ডাকতে, এখন আর তা' ডাক না কেন?"

মীনু হাস্যোজ্জ্বল-নেত্রে বলিল, "ওর লজ্জা করে ব'লে!"

সৌরীন্দ্র হাসিতে হাসিতে কৌতুকের স্বরে বলিল, "আচ্ছা, আমি এবার যখন তোমাদের বাড়ী যাব, অজিতকে 'ছেলে' ব'লে ডাকবো, দেখবো, সে কি করে?"

মীনু ভীতস্বরে বলিল, "না না, খবরদার, তুমি তাকে 'ছেলে' ব'লো না! তা হ'লে সে বুঝতে পারবে, আমি তোমায় ব'লে দিয়েছি!"

"বাঃ রে, তুমি বলেই দিয়েছ ত সত্যি। আমি গিয়ে বলবো, তোমার মাসী আমাকে তোমার নাম ধ'রে ডাকতে বারণ করেছেন, ছেলে ব'লে ডাকতে ব'লে দিয়েছেন।"

মীনু কাঁদ কাঁদ মুখে বলিল—"আমি তাই বলেছি? ওঃ, কি মিথ্যে কথা!"

উচ্ছ্বসিত হাস্যবেগ অতিকষ্টে সংবরণ করিতে করিতে সৌরীন্দ্র বলিল—"আচ্ছা, তুমি নিজে বলনি অজিত তোমার ছেলে?"

ক্রুদ্ধা মীনু বলিল—"হ্যাঁ, ছেলেই ত—"

সৌরীন্দ্রের এবার হাসির বোমা সজোরে ফাটিয়া গেল—"বেশ! বেশ! বাহবা, তা' অত বড় ছেলেটির মায়ের আবার বিয়ের কি দরকার ছিল?"

"যাও, তুমি ভারী দুষ্ট!"

স্বামীর কথার পরিহাস-ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া মীনু লজ্জায় লাল হইয়া তাড়াতাড়ি সৌরীন্দ্রেরই ক্রোড়ে মুখ লুকাইয়া ফেলিল।

হাসিতে হাসিতে তরুণী বধুকে বক্ষে টানিয়া লইয়া সৌরীন্দ্র তাহার কানে চুপি চুপি বলিল—"আচ্ছা, তোমার যখন সত্যিকারের ছেলে হবে, তখন তার অজিত নাম রেখো, কেমন?"

স্বামীর বাহুডোর-বদ্ধ মীনু মুখটা স্বামীর বক্ষের মধ্যে আরও লুকাইবার চেষ্টা করিতে করিতে লজ্জাজড়িত কুপিত স্বরে বলিল—"না না—চুপ কর, ছিঃ!"

## ৪

মাত্র সাত মাস অতিক্রান্ত হইতে না হইতে সোনার স্বপ্ন অকস্মাৎ ভাঙ্গিয়া গেল। সৌরীন্দ্র 'ইরিসিপ্লাস' ব্যারামে মীনুরাণীর সীঁথির নবীন সিন্দুর-রেখা মুছিয়া দিয়া অকস্মাৎ অজানা লোকে চলিয়া গেল। মীনুরাণীর পিতা রোরুদ্যমানা সদ্যোবিধবা কন্যাকে লইয়া চলিয়া আসিলেন।

নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস এইখানেই সমাপ্ত হইল না। মীনুর পিতা মাসকতক জ্বরাতিসারে ভুগিয়া পরলোকে যাত্রা করিলেন। সংসারে রহিল দুইটি শোকাতুরা বিধবা নারী এবং সংসারানভিজ্ঞ তরুণ অজিত।

মীনু বৈধব্যের দারুণ আঘাত সংবরণ করিতে না করিতেই পিতৃশোকে মৃতবৎ হইয়া পড়িল। বক্ষের

শোকাগ্নিদাহন এবং চক্ষুর অশ্রান্ত অশ্রুধারা তাহাকে নিদাঘশুষ্ক লতা অপেক্ষা শীর্ণ ও করুণ করিয়া তুলিয়াছিল।

মাতা অভাগিনী কন্যা ও অসহায় দৌহিত্রের অবস্থা স্মরণ করিয়া নিজে সংযতা হইয়া উঠিবার চেষ্টা করিলেন।

এমনই করিয়া গম্ভীর শোকস্তব্ধতা ও বিরাট শূন্যতার মধ্য দিয়া বৎসর প্রায় শেষ হইয়া আসিল। বাটীর তিনটি প্রাণীর এক জনেরও মুখে পূর্ব্বকার সহজ হাসি ফিরিয়া আসিল না।

বৎসরান্তে অজিত কঠিন ব্যারাম প্লুরিসিতে শয্যাগত হইয়া পড়িল।

মীনু তাহার নির্জ্জন গৃহ-কোণ ছাড়িয়া অজিতের রোগশয্যাপার্শ্বে আশ্রয় লইল এবং সহরের একাধিক নাম-জাদা চিকিৎসক আনিয়া চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিল।

এই সময়ে মীনুর মা তাঁহার পুরাতন ব্যাধি লিভারের বেদনায় শয্যাগত হইয়া পড়িলেন। মীনু দুই ঘরে দুইটি রোগী লইয়া বিশ্রামহীন দিবা এবং নিদ্রাহীন রজনী অচঞ্চলভাবে কাটাইতে লাগিল। মা দিনকতক পরে একটু সুস্থ হইলেন বটে, কিন্তু অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া রহিলেন।

মীনু যন্ত্রপুত্তলীর ন্যায় একভাবে আপনাকে অজিতের শুশ্রূষায় নিয়োজিত করিয়া রাখিল। সমস্ত দিনে এবং রাত্রিতে ঘড়ীর কাঁটার সঙ্গে সঙ্গে সে আপনাকে ঘড়ীর কাঁটারই মত নিয়মিত করিয়া অজিতের মুখ ধোয়ান, ঔষধ খাওয়ান, পথ্য প্রস্তুত করা, পথ্য খাওয়ান, বুকে, পিঠে সেক দেওয়া, পুল্‌টিস্ লাগান, মালিস করা, জ্বরের উত্তাপপরীক্ষা, বমি-মলমূত্রাদি পরিষ্কার করা, বিছানা বদলান, সর্ব্বদা গৃহ পরিষ্কার রাখা, রোগীর সদাসর্ব্বদার শারীরিক অবস্থা এবং ঔষধ-পথ্য সেবনের ভিন্ন ভিন্ন চার্ট লিখিয়া রাখা, রাত্রি জাগা, বাতাস করা, নানাপ্রকার প্রক্রিয়ায় রোগীর শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্যবিধান করা, ঘুম-পাড়ান, গল্প করা, সান্ত্বনা দেওয়া, বই পড়িয়া শুনান প্রভৃতি কর্ম্ম অত্যন্ত ধীরে অথচ ক্ষিপ্রতা সহকারে শিক্ষিতা, সেবাকারিণী ও স্নেহময়ী জননীর মতই সুনিপুণভাবে করিয়া যাইত।

পীড়িত অজিত রোগযন্ত্রণায় অত্যন্ত চঞ্চলতা ও অধীরতা প্রকাশ করিত। মেজাজও অত্যন্ত রুক্ষ ও অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছিল। রোগের যন্ত্রণা তাহার অকালগাম্ভীর্য্য ও মৌনতা ভাসাইয়া দিয়া কিশোরবয়স্ক দুরন্ত অবুঝ বালকে পরিণত করিয়াছিল, কিন্তু পঞ্চদশবর্ষীয়া মীনু যেন আরও পঞ্চদশবর্ষ অতিক্রম করিয়া প্রৌঢ়াসুলভ স্থির, গম্ভীর, অচঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল।

তাহার শোকস্তব্ধ শান্ত মুখে সর্ব্বদা প্রসন্নতা বিরাজমান। রোগীর সহস্র অত্যাচারে ও অধীরতায় বিন্দুমাত্র বিরক্তি বা চাঞ্চল্য নাই, কর্ম্মে শ্রান্তি বা আলস্য নাই। ধৈর্য্যশীলা জননীর মত, স্নেহময়ী ভগিনীর মত, অন্তরঙ্গ বন্ধুটির মত আপনার বিপুল স্নেহ, যত্ন, সহানুভূতি ও সেবা দ্বারা এই রোগাতুর দুরন্ত, তরুণ শিশুটির দেহে ও মনে স্বাচ্ছন্দ্য দিয়া রাখিত।

রাত্রি দুইটা বাজিয়া গিয়াছে। নীল রেশমী শেড-ঢাকা ল্যাম্পের মৃদু আলো, গৃহখানি আলোকিত, অথচ স্নিগ্ধ ছায়াময় করিয়া রাখিয়াছে। টেবলের উপর বি-টাইমপিস ঘড়ীটি এক সুরে টিক্-টিক্ করিয়া গৃহের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল। ফর্সা ন্যাপ-কিন ঢাকা টুলের উপর ও টেবলের উপর ঔষধের শিশি, ছোট মেজার গ্লাস, বড় কাচের গ্লাস, বার্লির পেয়ালা, ছানার জলের পাত্র, ডালিম, বেদানা, থার্ম্মমিটার, ফিডিং কাপ, 'থার্ম্মফ্লাস্ক', 'হটওয়াটার-ব্যাগ' প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও ঔষধ-পথ্যাদি শৃঙ্খলা সহকারে সজ্জিত।

স্বল্প আসবাব; ঘরখানির চারিদিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ইউক্যালিপটাসের তীব্র গন্ধে ও সুমিষ্ট ধূপের সৌরভে কক্ষ বায়ুভারাক্রান্ত। রোগীর মাথার দিকে ও পাশের দিকে দুইটি জানালা রুদ্ধ, আর সমস্ত জানালাগুলি উন্মুক্ত। আধভেজান দরজায় সবুজ ছিটের মোটা পর্দ্দা টানা।

মীনু একখানি টুলের উপর বসিয়া ঘুমন্ত অজিতের শিরে হাতপাখা দিয়া মৃদু মৃদু বাতাস করিতেছিল।

অর্দ্ধপ্রহর অতীত হইয়া 'টং' শব্দে ঘড়ী জানাইয়া দিয়া গেল। অজিত অস্ফুট কাতরোক্তি সহকারে পাশ ফিরিতে ফিরিতে প্রশ্ন করিল, "ক'টা বাজল?"

মীনু বলিল—"আড়াইটা।"

"তুমি এখনও জেগে ব'সে আছ? হাত ব্যথা করছে না? এই বার একটু শোও!"

"শোব অখন! তুমি এখন একটু হরলিক খাবে কি?"

"আচ্ছা, দাও।"

মীনু ঘরের কোণে স্পিরিট ল্যাম্প জ্বালিয়া ফুড প্রস্তুত করিয়া ল্যাম্পের নীল শেডটা একটু সরাইয়া দিয়া, বাতিটার বোতাম ঘুরাইয়া, আলোক উজ্জ্বল করিয়া দিয়া, ফিডিং কাপে একটু একটু করিয়া খাওয়াইয়া দিল। তোয়ালে দিয়া মুখ মুছাইয়া, মুখের ভিতর একটি লবঙ্গ দিয়া, আবার আলোক মৃদু করিয়া শেড টানিয়া দিয়া, পাখা হাতে লইয়া টুলে বসিল।

অজিত বলিল—"আজ আমি অনেক ভাল আছি, তুমি একটু শোও না, মীনু মাসী!"

মীনু বলিল - "আমার এখনও ঘুম আসেনি। ঘুম পেলে শোব। তুমি আবার একটু ঘুমুতে চেষ্টা কর। মাথা চুলকে দেব?"

"না, থাক! আচ্ছা, দাও।—মীনুমাসী—"

"কি বাবা?"

"আমি আর তোমায় 'মীনুমাসী' বলবো না, এবার থেকে 'মাসীমা' বল্‌ব—কেমন?"

"বেশ ত!"

"আচ্ছা, মাসীমা! তুমি আমাকে বড্ডো ভালবাসো—না?"

মীনু একটু বিপন্ন হইয়া পড়িল। তাহার পর সহজ প্রসন্ন স্বরে উত্তর দিল—'তা' আর বাসবো না?'

"না, তুমি ছেলেবেলা থেকেই আমায় খুব ভালবাসো, আমার কত অত্যাচার সহ্য কর। এত দিন বুঝতে পারিনি, এখন বুঝতে পারছি। তোমার ঋণ আমি জীবনে শোধ করতে পারব না, মাসীমা!"

মীনু একটু শঙ্কিত হইয়া উঠিল। সে লক্ষ্য করিয়াছে, মাঝে মাঝে অজিত ভাবাধিক্যে অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠে! এইরূপ ধরণের কথাবার্তা সে প্রায় রাত্রির দিকে বেশী বলে। রুগ্নাবস্থায় শরীর ও মনের শক্তির অভাবে অনেক সময়ে মনের গোপন কাহিনী প্রকাশ হইয়া যায় কিংবা অল্পেই অত্যন্ত তুষ্ট বা অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া উঠে। দুর্ব্বল অজিতের এই কৃতজ্ঞতার আতিশয্যও যে রোগক্রিয়াসঞ্জাত, মীনু অনভিজ্ঞা হইলেও বুঝিতে পারিত।

অজিতের কপালে অডিকলোন-মিশ্রিত শীতল জল সিঞ্চিত করিতে করিতে মীনু বলিল—"আচ্ছা, সে হবে এখন, তুমি এখন একটু ঘুমাও দেখি!"

"না না, মাসীমা, আমি এখন ঘুমুব না। আমার কথা কইতে খুব ভাল লাগছে।.........আচ্ছা, তুমি এত আমার সেবা করছো কেন? বল, কেন? কেন? ..."

মীনু উত্তর না দিয়া বাঁমহাতে অজিতের কপালে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে ডান হাতে পাখার হাওয়া করিতে লাগিল।

"কি? তুমি বলবে না, মাসীমা?... আচ্ছা থাক........."

প্রায় মিনিট পাঁচেক চোখ বুজিয়া নিঃশব্দে পড়িয়া থাকিবার পর আবার চোখ মেলিয়া উৎসুক দৃষ্টিতে মীনুর মুখের প্রতি চাহিয়া অজিত আগ্রহভরে বলিল—আচ্ছা, আমার মা যদি বেঁচে থাকতেন, এই অসুখে এর চেয়েও কি বেশী সেবা করতে পারতেন? এর চেয়েও কি তাঁর প্রাণ আরও ব্যস্ত হ'ত?.........বল না? কথা কইচ না কেন? আর,—বাতাস করতে হবে না, জবাব দাও!"

অজিত রাগিয়া মীনুর হাত হইতে তালপাখাখানি টানিয়া লইয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল।

মীনু ধীরস্বরে বলিল—"তা কি বলা যায়? কি ক'রে জানব, তিনি কি করতেন?"

"কেন বলা যাবে না? হয় ত তোমার মত এমনই করতেন, কিন্তু এর চেয়ে বেশী করতে পারতেন না।"

"তা' হবে!"

"আচ্ছা, লোক বলে, মা-মাসী, মা আর মাসী প্রায় একই, না মাসীমা?"

অজিত মীনুর ডান হাতখানি দুই হাতে মুঠা করিয়া চাপিয়া নিজের শীর্ণ বুকের উপর রাখিল।

মীনু শান্তকণ্ঠে উত্তর দিল,—"মা আর মাসী একই বৈ কি।"

"মাসী-মা, আমি এবার যদি বেঁচে উঠি, তা হ'লে দেখো, তোমার কখনও কষ্ট হবে না। তোমায় আমি আমার মায়ের মত ক'রে—মেয়েটির মত ক'রে চির দিন আমার কাছে রেখে দেব, কোথাও যেতে দেব না।"

"তোমার আজ কি ঘুম আসছে না, অজি? বেশী রাত জাগলে আবার মাথার যাতনা বাড়বে কিন্তু!"

আমার ঘুম আসছে না। আচ্ছা, মাসীমা?"

"কি?"

শিশুর মত আবদারের সুরে অজিত বলিল—"তোমাকে যদি আমি 'মা' ব'লে ডাকি, তা হ'লে কি তোমার লজ্জা করবে?...আচ্ছা, যদি শুধু 'মা' বলতে না দাও, তা হ'লে 'ছোট-মা' বলবো—কেমন?"

অজিত মীনুর নরম হাতখানি নিজের গণ্ডে, ললাটে ও মুখের উপর বুলাইতে বুলাইতে আদরের সুরে বলিতে লাগিল—"মা-টি—আমার ছোট্ট-মা-টি—"

মীনু একটু লজ্জিত ও বিপন্ন বোধ করিতেছিল, অথচ হাতখানি অজিতের মুঠার মধ্য হইতে টানিয়া লইতেও ভরসা হইতেছিল না।

"আচ্ছা মাসী মা, 'কথা ও কাহিনী'র সেই 'দেবতার গ্রাস' কবিতাটা তোমার মনে আছে?"

"হ্যাঁ।"

"আচ্ছা, সেই যে—সেইখানটা কি চমৎকার—

'রাখাল থাকিবে সুখে
মা'র চেয়ে আপনার মাসীমার বুকে।'

তোমার কি মুখস্থ আছে সবটা?"

মীনু কুণ্ঠিত আপত্তির সুরে বলিল—"তিনটে বেজে গেছে, অজি। এখন একটু ঘুমোও। সকালবেলা তোমাকে দেবতার গ্রাস প'ড়ে শোনাব।"

"না, না, এখন আমার শুনতে বড় ইচ্ছে হচ্ছে। তোমার মুখস্থ না থাকে, বই আনো। এখন আর ঘুম হবে না।"

মীনু বুঝিল, রোগীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বেশী জেদ করিলে উল্টা ফল হইবে। আস্তে আস্তে উঠিয়া গিয়া শেল্‌ফ হইতে "কথা ও কাহিনী" বইখানি টানিয়া বাহির করিয়া আনিয়া, ল্যাম্পের শেড অল্প সরাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে পড়িতে আরম্ভ করিল—

"গ্রামে গ্রামে সেই বার্ত্তা রটি' গেল ক্রমে,
মৈত্র মহাশয় যাবে সাগর-সঙ্গমে।"

ধীর মধুর উদাত্তকণ্ঠে সুস্পষ্টস্বরে উচ্চারণ এবং কণ্ঠস্বর যথাস্থানে হ্রস্ব-দীর্ঘ করিয়া করিয়া কবিতাটি আবৃত্তি করিতে প্রায় পনেরো মিনিট সময় লাগিল। শেষের দিক্‌টা পাঠ করিবার সময়ে ভাবাবেশে মীনুর চক্ষুর্দ্বয় সিক্ত হইয়া কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া উঠিল। পড়া শেষ হইলে প্রায় দশ মিনিট কেহ কোনও কথা কহিল না!

নিশীথ রাত্রির গভীর নিস্তব্ধতা, কক্ষের ছায়াময় নীলাভ আলোক, ঘড়ীর টিক্ টিক্ শব্দ সব কিছু মিলিয়া, মনকে ঘিরিয়া অননুভূতপূর্ব্ব উদাস-বৈরাগ্য, স্নেহাকুল করুণ বেদনা জাগাইতেছিল।

"নিরুপায় অনাথের অন্তিমের ডাক"—"মাসী—মাসী—মাসী" যেন সত্যই সেই নীরব কক্ষের নিস্তব্ধতায় অনাহত-শব্দে করুণ আর্ত্তনাদে ধ্বনিত হইয়া "বহ্নিশলাকার ন্যায় রুদ্ধ কর্ণে" বিদ্ধ হইল।

রোগদুর্ব্বল অজিতের গণ্ড বাহিয়া দুই চোখে অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। অশ্রুরুদ্ধ আবেগপূর্ণ স্বরে অজিত বলিল—"আচ্ছা, রাখালের মৃত্যু তার মা মোক্ষদার বেশী বাজবে, না মাসী অন্নদার?"

মীনু ম্লান হাসিয়া উদাস স্বরে কহিল—"দু'জনারই লাগবে।"

"উহুঁ; অন্নদার বেশী লাগবে, সে-ই রাখালকে মানুষ করেছিল। সাগরে পাঠাতে রাজী হয়নি। আর রাখাল যে মায়ের চেয়ে মাসীকেই বেশী ভালবাসত! জীবন-মরণ সন্ধিক্ষণে অন্তিমসময়ে তার ত মায়ের মুখ মনে পড়লো না 'মা' শব্দ মুখ দিয়ে উচ্চারিত হ'ল না—মাসী-কেই মনে পড়েছিল—আঃ—চমৎকার 'সিন্'!"

অজিত ভাবাবেশে চক্ষু মুদ্রিত করিল। মীনু প্রস্তর-পুত্তলিকার ন্যায় নীথর হইয়া বসিয়া রহিল। টং টং করিয়া চারিটা বাজিয়া গেল। মীনু সচকিতে উঠিয়া দাঁড়াইল।

অজিত ডাকিল—"মাসীমা!"

"কি বলছো?"

আমার মাথার যাতনাটা বাড়ছে। ঘুম পাড়িয়ে ফেলতে পার?"

মীনু উদ্বিগ্নস্বরে বলিল—"আমি বলেছিলুম, এখন প'ড়ে কাম নেই, সকালে প'ড়ে শোনাব। মাথার যাতনা হচ্ছে, হয় ত জ্বর বাড়বে।"

"তুমি গান গেয়ে আমায় ঘুম পাড়িয়ে দাও!"

মীনু অজিতের মাথাটি কোলের উপর তুলিয়া লইয়া, চুলের ভিতর অঙ্গুলিচালনা করিয়া চুলকাইয়া দিতে দিতে মৃদুমন্দ গুঞ্জনে কি একটা গান ছড়ার সুরে গাহিয়া ঘুম পাড়াইতে লাগিল।

কিছুক্ষণ ছটফট করিয়া নিশাশেষের শীতল হাওয়ার স্পর্শে অজিত ঘুমাইয়া পড়িল। শ্রান্ত মীনু খাটের বাজুর উপর মাথা রাখিয়া ভারাক্রান্ত চক্ষুর্দ্বয় মুদ্রিত করিল।

সকালবেলা পিক্‌দানী ধুইতে দেরী হওয়ায় অজিত মীনুকে অত্যন্ত তিরস্কার করিল। তীব্র ঝাঁজযুক্ত বিস্বাদ ঔষধের স্বাদে ক্রোধক্ষিপ্ত হইয়া মীনুর হাত হইতে ঔষধের গ্লাস কাড়িয়া লইয়া তাহাকে ছুড়িয়া মারিল। গ্লাসটা মীনুর কপালে সজোরে লাগিয়া মাটীতে পড়িয়া টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া গেল। কপাল কাটে নাই, তবে বেশ আঘাত লাগিয়াছিল। সে নিঃশব্দে ভাঙ্গা কাচের টুকরাগুলি গৃহতল হইতে কুড়াইতে লাগিল।

অজিত তখন ক্রোধোত্তেজিতকণ্ঠে ভর্ৎসনা করিতেছে—"খবর্দ্দার, তুমি এ ঘরে ঢুকো না। জ্বালাতন হয়েছি! নার্সিং জানে না মোটেই—সবেতেই নিজের বুদ্ধি খাটান চাই। এবার থেকে আমাকে না দেখিয়ে কোনও ওষুধ আমায় খাওয়াবে না, ব'লে রাখলুম।...ওটা কখনও খাওয়ার ওষুধ নয়, নিশ্চয় মালিশ! নইলে এত ঝাঁজ হয়? লেবেল পড়বার বিদ্যে নেই যাদের, তারা আবার আসে 'নার্স' করতে! কোন্ দিন 'মার্ডার' করবে দেখছি।"

মীনু নিরুত্তরে অবিচলিত মুখে আপনার কায করিয়া যাইতে লাগিল, যেন কিছুই হয় নাই! সে যে ঔষধ খাওয়াইতে ভুল করে নাই, ঠিক ঔষধই খাওয়াইয়াছে, ইহা বুঝাইবার চেষ্টা করিল না, কারণ, তাহা বুঝাইতে হইলে বা তর্ক করিলে অজিতের আরও উত্তেজিত হইয়া উঠা সম্ভব। এরূপ ভর্ৎসনা তাহার সদাসর্ব্বদা অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল।

৫

সুদীর্ঘ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। মীনু মাঝে মাঝে শ্বশুরালয়ে যায়, অধিকাংশ সময় পিত্রালয়ে মায়ের কাছেই থাকিত। কয়েক মাস হইল, মীনুর মা-ও মারা গিয়াছেন।

আষাঢ় মাস। বর্ষণক্লান্ত অপরাহ্ণে বারিধারা-সিক্ত গাছগুলি স্বর্ণ রবিকরপাতে ঝলমল করিয়া উঠিয়াছে। দূরে একটা কাঁঠালগাছের উপর এক ঝাঁক শালিক পাখী উচ্চ কোলাহলে বিবাদ করিতেছে।

মীনু বারান্দায় বসিয়া একখানি বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকা পড়িতেছিল। পৃথিবীর অপর প্রান্তে সুদূর অন্তসীমানার কোন একটি তুষারাচ্ছন্ন দেশের বিবরণ, দেশবাসীর আচার-ব্যবহার, প্রথা, নিয়ম, সেই 'দেশ-বিবরণে' লিখিত ছিল। পাঠশেষে মীনু বইখানি মুড়িয়া কোলের উপর রাখিয়া উদাস দৃষ্টিতে পুঞ্জীভূত ঘন কালো মেঘাচ্ছন্ন সজল আকাশের পানে চাহিল। রাশি রাশি ধূমল বর্ণের, শ্যামল বর্ণের মেঘভার আকাশের এক কোণ হইতে অপর কোণে যাতায়াত করিতেছে। আবার বর্ষণের আয়োজনে তাহাদের সুগম্ভীর মূর্ত্তি চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে।

মীনু ভারাক্রান্ত মনে কত কি ভাবিতে লাগিল। অজিতের বিবাহের জন্য সে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। মা নাই, অজিতকে একা রাখিয়া সে শ্বশুরালয়ে যাইতে পারিতেছে না। অথচ বাড়ীতে এইরূপ ভাবে একাকিনী থাকিতে তাহারও ভাল লাগিতেছে না। অজিতের বিবাহের বয়সও হইয়াছে। একটি বয়স্থা পাত্রী অন্বেষণের নিমিত্ত মীনু ঘটক-ঘটকী নিযুক্ত করিয়াছে।

"কৈ গো দিদি ঠাকরুণ?"—কণ্ঠস্বরে তীক্ষ্ণ ঝঙ্কা তুলিয়া জনৈকা ঘটকী আসিয়া উঠানে দাঁড়াইল।

"কে? ঘটক ঠাকরুণ না কি?"

মীনু ব্যগ্রভাবে রেলিংএর উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া নি দৃষ্টিপাত করিল।

"হ্যাগো আমিই।"

"উপরে এসো।"

ঘটক ঠাকুরাণী দোতলায় উঠিয়া গেলে মীনু সাগ্র জিজ্ঞাসা করিল, "খিদিরপুরের মিত্রদের বাড়ীর সেই সম্বন্ধটি কি হ'ল? অজি যে কটি মেয়ে দেখে এসেছে, এর ম ঐটিই ওর পছন্দ হয়েছে ব'লে মনে হ'ল।"

ঘটক ঠাকুরাণী মুখ বিকৃত করিয়া বলিল "মেয়ে দেখতে ভাল আর বেশ ডাগরও, কিন্তু মেয়ের মা বড় দজ্জাল।"

"তা' মেয়ের মা কড়া হলেই বা! মেয়ে ত শান্ত?"

"মেয়ে শান্ত বটে, কিন্তু মায়ের বড় খুঁৎখুঁতে মন!"

"কেন ? অজি'র কি খুঁৎ আছে ?"

ঘটকী বলে—ছেলের ত বিয়ের বয়স হয়ে গেছে, এত দিন কেন বিয়ে করেনি ? বাড়ীতে বিধবা মাসী আছে শুনেছি। সে না কি ছেলের চেয়ে বয়সে অনেক ছোট ! সে ছাড়া আর ঘরে মেয়েমানুষ নেই ! তার ছেলেপিলেও হয়নি ! তা' মাসীর কি শ্বশুরবাড়ী নেই ? সে কি বারো মাস এখানেই থাকে ?"

মীনুর ব্রহ্মরন্ধ্রের ভিতর যেন জ্বালা করিয়া উঠিল ! অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর আরক্তমুখে সংযত স্বরে বলিল—"তাঁদের তুমি বোলো, এই মাসকতক হ'ল ছেলের দিদিমা মারা গেছেন, তাই মাসী একলা আছেন। বোন্‌পোর বিয়ে দিয়ে বৌয়ের হাতে সংসার তুলে দিয়ে তিনি তাঁর শ্বশুরবাড়ী চ'লে যাবেন। এখানে তিনি থাকবেন না।"

ঘটকী একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—"ঐ সম্বন্ধটা তুমি ছেড়ে দাও, দিদিমণি ! ওদের গিন্নীর বেজায় ছোট মন। তার চেয়ে শ্যামবাজারের রায়েদের বাড়ীর সম্বন্ধটা দেখ। সে মেয়েও দিব্যি সুন্দরী।"

মীনু অন্যমনস্ক শুষ্কস্বরে বলিল—"না, ঐ মেয়েটিই অজি' পছন্দ ক'রে এসেছে, ঐটিই তুমি দেখ। যদি বেশী অমত করে, তা হ'লে—তা হ'লে তুমি আমায় বোলো—আমি না হয়, বিয়ের আগেই চ'লে যাব।"

ঘটকী জিভ কাটিয়া বলিল—"ও মা, ছি ছি, তোমার বাপের বাড়ী, তুমি কেন পরের কথায় গৃহত্যাগী হবে, দিদিমণি।"

মীনু গম্ভীর স্বরে বলিল—"না, ঐ সম্বন্ধটিই ঠিক ক'রে ফেল। টাকা কিছুই চাই না। শুধু তাদের মত হলেই হোল'।"

ঘটক ঠাকুরাণী চলিয়া গেলে মীনু চিন্তা-শুষ্ক বিষাদ-গম্ভীর মুখে ঘরের ভিতর গিয়া শুইয়া পড়িল। ঘটক ঠাকুরাণী তাহাকে আজ আভাসে যে অপমানকর কথা শুনাইয়া গেল, তাহা সে আজ নূতন শুনে নাই। মা রোগ-শয্যায় পড়িয়া থাকিতে তখন হইতেই এই রকম কথা সে আত্মীয়া ও প্রতিবেশিনীদের মুখে শুনিয়াছে। অজিতের প্রতি এই অত্যন্ত স্নেহানুরক্তির জন্য শ্বশুরবাড়ীতেও সে অনেকের অপ্রিয়পাত্রী হইয়াছে। অপরাধ ! সে অজিতের জন্মের পাঁচ বৎসর পরে পৃথিবীতে আসিয়াছে ! সেই জন্য অজিতের প্রতি তাহার সন্তান-স্নেহ উদ্ভব হওয়া না কি অসম্ভব ! হায়! দুনিয়ায় বয়সের তারতম্যের উপরেই কি চিত্তবৃত্তির বিকাশ সম্পূর্ণ নির্ভর করে ?

মীনু ভাবিতে লাগিল, যদি এই সকল নীচ সন্দেহের কাহিনী অজিতের কানে উঠে ! ঘৃণায়, অপমানে, ক্ষোভে শিহরিয়া মীনু বালিসের উপরে মুখ লুকাইল।

অজিত বারান্দায় আসিয়া ডাকিল—'মীনুমাসী !'

মীনু ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বাহিরে আসিল।

"সন্ধ্যাবেলায় শুয়েছিলে কেন, অসুখ করেছে না কি ?"

মীনু সংক্ষেপে বলিল, "না।"

অজিত বলিল, "তোমার ভাসুর আর দেওর এসেছেন। তাঁরা দাদামশাইয়ের উইল দেখতে চান। উইল লোহার সিন্দুকে তোমার কাছে আছে।"

মীনু শুষ্কস্বরে বলিল, "আমি সে উইল রাখবার দরকার মনে করিনি। উইল ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি।"

"সে কি ? ছিঁড়ে ফেলেছ কেন ? তাতে যে তোমাকে বাড়ীর অংশ দিয়ে গিয়েছেন !"

ব্যথা-প্রচ্ছন্ন তাচ্ছীল্যের স্বরে মীনু বলিল, "আমার বাড়ীর অংশের কিছু দরকার নেই, ও তোমারই থাক্। সে উইল থাকলে অশান্তির সম্ভাবনা বেশী, তাই রাখিনি। বাড়ীর ন্যায্য উত্তরাধিকারী তুমিই।"

"কিন্তু তোমার দেওর-ভাসুর ওঁরা কি ভাববেন ? ওঁরা মনে করবেন, আমিই ঠকিয়ে উইল নষ্ট করেছি। তাও যদি না ভাবেন, তা হ'লে—তা হ'লে—" অজিতের মুখে-চোখে হঠাৎ অত্যন্ত অস্বস্তিপূর্ণ ব্যাকুলতার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়া কেমন কালো হইয়া গেল।

মীনু বুঝিতে পারিল, অজিত কি যেন বলিতে গিয়া বলিতে পারিল না। তাহার মুখমণ্ডল দীপ্ত হইয়া উঠিল—কঠিন স্বরে মীনু বলিল, "তা ছাড়া কি ?"

অজিত অন্ধকার মুখে বলিল, "তুমি ছেলেমানুষ, সংসারের কিছু বোঝো না, মীনুমাসী ! উইল ছিঁড়ে ভয়ানক খারাপ করেছ তুমি। এতে যা ক্ষতি হবে ? তার চেয়ে বাড়ীর অংশ নিয়ে বিবাদ করা ঢের ভাল ছিল।"

মীনু উত্তেজিতস্বরে বলিল, "কি বলতে চাও তুমি, স্পষ্ট ক'রে বল, অজি ! নীচ ইতরমনা লোকরা ছোট কথা

বলবে, তাদের নীচতাকে গ্রাহ্য ক’রে আমাকে ভয়ে ভয়ে চলতে হবে, এই কি বলতে চাও তুমি ? বেশ করেছি, আমি আমার বাবার উইল—আমার নিজের উইল ছিঁড়েছি ! আমি চাই না, আমার বাবার ভিটায় বাইরের লোক সরিকদার হয়ে এসে অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে তোলে।”

অজিত কালো মুখে বলিল, “কিন্তু এই ব্যাপার নিয়ে তোমাকেই সব চেয়ে বেশী কষ্ট পেতে হবে, এও মনে রেখো।”

“তা হোক্।”

## ৬

অজিতের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বধূ বয়স্থা, সুন্দরী ও শিক্ষিতা। সংসার এবং স্বামীর তত্ত্বাবধানভার গ্রহণ করিয়াছে।

অজিতের প্রতি মীনুর গভীর স্নেহ এবং ত্রুটিহীন যত্ন আর সকলকার মত সে-ও অপরাধেরই চক্ষুতে গ্রহণ করিল। এই লইয়া মীনুর সহিত যত হোক্ না হোক্, অজিতের সহিত শুক্লার মনোমালিন্য-মেঘ যেন একটু একটু করিয়া জমিয়া উঠিতে লাগিল। মীনু আতঙ্কিতা হইয়া উঠিল। বুঝিল, সে শুধু শ্বশুরবাড়ী চলিয়া যাইলেই যে সংসারে শান্তি স্থাপিত হইবে, তাহা নহে। যাইবার আগে অজিতের স্নেহ, শ্রদ্ধা, ভক্তি হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে, নতুবা উপায় নাই।

মীনু অজিতকে ডাকিয়া বলিল, “অজি ! আমি উইল ছিঁড়ে ভুল করেছি। মাথার ঠিক ছিল না। বাড়ীর অর্দ্ধেক অংশ আমার ছিল, সেই টাকাটা আমাকে দাও।”

অজিত বিস্মিত হইয়া বলিল, “আমি এখন টাকা কোথায় পাব ? তুমি ত সবই জানো—আমার উপার্জ্জনের উপরই সব নির্ভর করে। নগদ অত টাকা আমার নেই ”

“অজি, অনাথা বিধবাকে ফাঁকি দিয়ে কোনও লাভ নেই। আমাকে হয় বাড়ীর অর্দ্ধেক অংশ লিখে দাও, আমি অন্যের কাছে ঐ অংশ বিক্রী ক’রে টাকা নেব, না হয় আমাকে তুমি ন্যায্য দাম দিয়ে দাও, আমি টাকা নিয়ে শ্বশুর-বাড়ী চ’লে যাব। এখানে তোমার সংসারে আমার পোষাচ্ছে না।”

অজিত বলিল, “আমি কোনও দিন তোমাকে টাকা দেব বলিনি, বাড়ীর অংশও চাইনি। তুমি স্বেচ্ছায় উইল ছিঁড়েছ। তুমি টাকা চাও, আমি উপার্জ্জন ক’রে আমার সাধ্যানুসারে নিশ্চয়ই তোমায় দেব। কিন্তু এখন আমার হাতে একটি পয়সা নেই জেনেও কি জুলুম করতে চাও ?”

“বেশ, গরীব অনাথা বিধবা তার ন্যায্য পাওনা চাইলেই, বুঝি জুলুম হয় ? তোমার টাকা আছে না আছে, আমার জানবার দরকার নেই। আমি তোমার এখানে যখন থাকবোই না, তখন কেন টাকা নেব না ?”

অজিত উত্তেজিত হইয়া উঠিল—“ন্যায্য প্রাপ্য কিসের ? আমি কি তোমায় টাকা দেব বলেছিলুম ? না,—বাড়ীর অংশ চেয়েছিলুম, উইল ছিঁড়তে পরামর্শ দিয়েছিলুম ? ওঃ, স্ত্রীলোককে মোটে চেনবার উপায় নেই।”

“অজি, আমার টাকা দেবে কি না বল ? নইলে শ্বশুর-বাড়ী গিয়ে ভাসুর-দেওরকে দিয়ে আমি তোমার নামে মোকর্দ্দমা করাব।”

“তোমার যা ইচ্ছা করতে পার, আমি একটি আধলাও দিতে অসমর্থ।”

“বেশ, তাই হবে।”

অজিত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ব্যথিত, ঘৃণা-কাতর মুখে বলিল, “উঃ, পৃথিবীতে মানুষ চেনা সব চেয়ে শক্ত।”

মীনু অশ্রুসিক্ত হৃদয়ে মনে মনে বলিল, “সত্যিই।”

পাশের ঘরে শুক্লা টেবল-হার্ম্মোনিয়ামে গাহিতেছিল—

“শ্রান্তি আমার ক্ষমা কর—ক্ষমা কর—প্রভু—”

মীনু টলিতে টলিতে তাহার মায়ের ঘরের ভিতর আসিয়া মেঝের উপর উপুড় হইয়া শুইয়া, গুমরিয়া কান্না চাপিতে লাগিল। সে কতক্ষণ এই ভাবে পড়িয়া ছিল, নিজে জানে না।

শুক্লা ঘরে ঢুকিয়া সুইচ টিপিয়া আলো জ্বালিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—“মাসীমা, ভর সন্ধ্যেবেলা অমন ক’রে কাঁদবেন না, ওঁর অকল্যাণ হবে।”

মীনু ত্রস্তে উঠিয়া বসিয়া বলিল, “ষাট্—ষাট্—”

“আপনার কত টাকা চাই, বলুন, আমি ব্যবস্থা ক’রে দিচ্ছি। আমার গায়ের গয়নাও ত রয়েছে। আমি আপনাকে ফাঁকি দিতে চাই না—যদিও আইনতঃ আপনি কিছুই পান না ”

মীনু আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিল—"হ্যাঁ বৌমা, ঠিক বলেছো মা! মানুষের প্রাণটাকেও প্রাণের মাপকাঠিতে মাপতে যাওয়া ভুল, সেটাও আইনের মাপকাঠিতে মাপতে হয়। নইলে কষ্ট পাওয়া স্বাভাবিক। আইনতঃই যে আমার দুনিয়ার কাছে কোনও কিছু পাওনা দাবী-দাওয়া নেই, মা।"

শুক্লা মুখ ভার করিয়া বলিল, "আপনি শাপ-মন্যি দেবেন না, মাসীমা, আমি আপনার টাকা নিশ্চয়ই দিয়ে দেব।"

"বৌমা, তুমি মেয়েমানুষ—তুমিও মা, আমায় শাস্তি দিও না।"

শুক্লা মীনুর বেদনাবিবর্ণ কাতর মুখের প্রতি চাহিয়া থমকিয়া গেল।

মীনু অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "তুমি জন্ম-এয়োস্ত্রী হয়ে সুখে থাক, মা, আমাকে তোমায় কিছুই দিতে হবে না। শুধু দয়া ক'রে এইটি দিও,"—মীনুর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। গলা ঝাড়িয়া আবার বলিল, "শুধু এই চাইছি—যদি কখনও অজির অসুখ-বিসুখ হয় বা তোমাদের দরকার হয়, সে দিন তোমাদের মাসীমাকে ভুলে থেকো না, ডেকো। আমি, মা, তোমার ঘর-কন্না গুছিয়ে-গাছিয়ে নিষ্কণ্টক ক'রে রেখে গেলুম। অজি আর আমায় জীবনে বিশ্বাস করবে না, ক্ষমাও করবে না"—মীনুর স্বর বন্ধ হইয়া গেল, উন্মত্ত ক্রন্দন চাপিতে চাপিতে মুখে আঁচল দিয়া সে সরিয়া গেল।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা মীনু আজন্মের আশ্রয়-নীড় পিত্রালয় জন্মের মত ত্যাগ করিয়া অশ্রুসিক্ত নয়নে গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

যাইবার সময় অজিত গাড়ীর কাছে গিয়া দাঁড়াইল, মীনু কথা কহিল না। অজিত প্রণাম করিল, মীনু কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল। বাক্স-তোরঙ্গ তুলিয়া দেওয়া হইল। ঘর্ঘর শব্দে গাড়ী অন্তর্হিত হইয়া গেল।

অজিতের ম্লান ব্যথা-কাতর মুখের উপর একটা বিরাট ঔদাস্যের ছায়া জাগিয়া উঠিতেছিল। জগৎটা যেন একটা প্রকাণ্ড স্বার্থপরতার ক্ষেত্র, অবিশ্বাসের লীলাভূমিরূপে তাহার আহত অন্তরে প্রতিফলিত হইয়া উঠিল।

উপরের ঘরে শুক্লা তখন ঘরের মেঝেয় মাথা নোয়াইয়া অশ্রুসিক্ত নয়নে প্রার্থনা করিতেছিল—"মাসীমা, আমি তোমায় বুঝতে পারিনি, মাপ করো। তুমি সতীলক্ষ্মী দেবী—আমি যেন শীগ্‌গিরই তোমায় ফিরিয়ে আনতে পারি।"

শ্রীমতী রাধারাণী দত্ত।

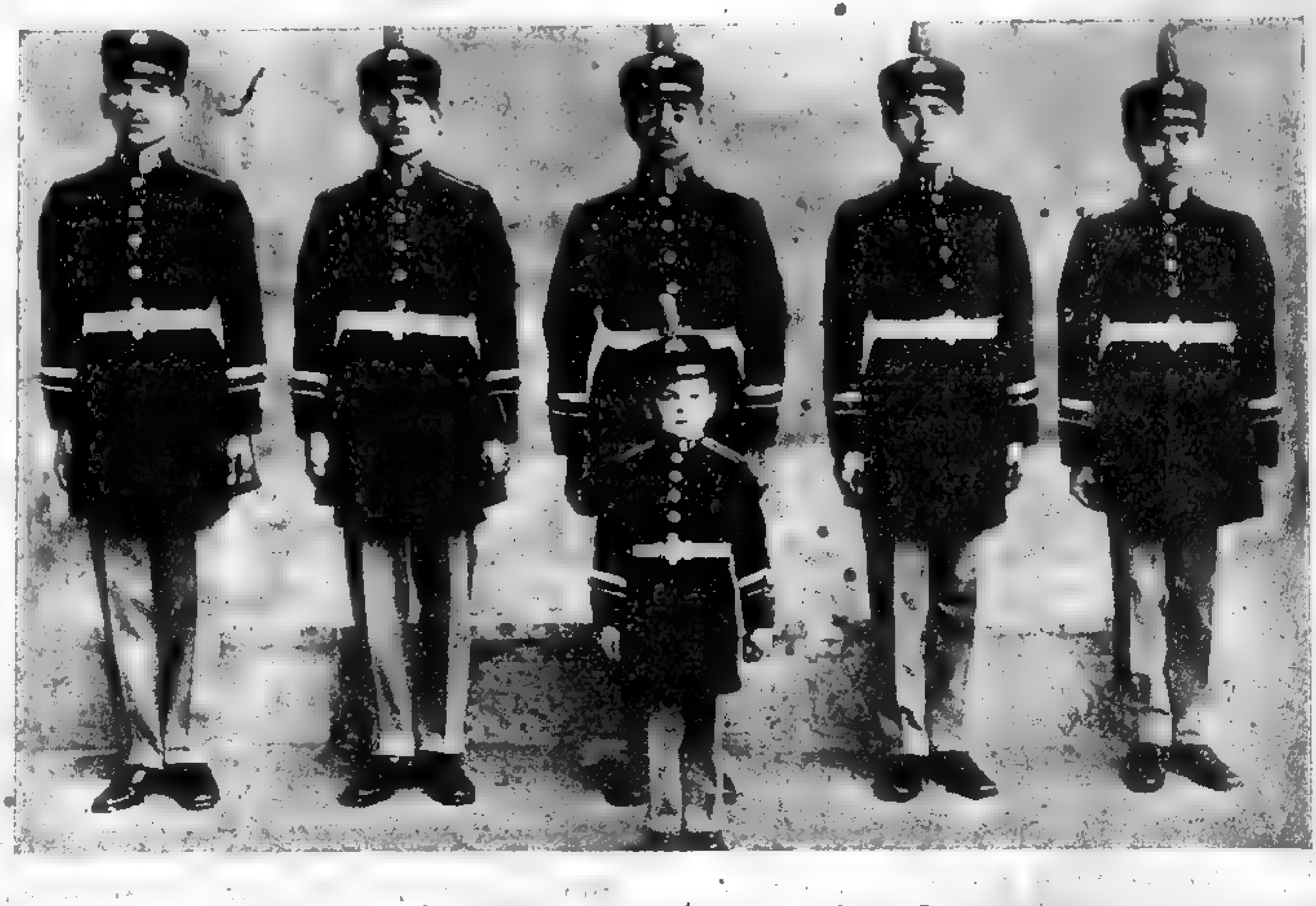

ক্রাউন প্রিন্স শাপুর রেজা খাঁ পহ্লবী। ইনি পারস্যের নূতন শা ইন শা রেজা খাঁ পহ্লবীর পুত্র। ইহার বয়স মাত্র সাত বৎসর। ইনি এই বয়সেই পিতার শরীর-রক্ষী সৈন্যগণের সহিত তাহাদের মত সামরিক পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া দণ্ডায়মান আছেন।

# মেজর হীরালাল

তখনও সূর্য্যাস্তের রক্তিম আভা পশ্চিম আকাশকে উদ্ভাসিত করিয়া স্নিগ্ধ আষাঢ়ের সন্ধ্যা স্নিগ্ধতর ও মধুরতর করিয়া রাখিয়াছিল। ঊর্দ্ধে লঘু মেঘ পবন-হিল্লোলে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছিল।

বীডন উদ্যানে অন্যান্য দিন যেমন নানা বিষয়ের আলোচনা হয়, সে দিনও সেইরূপ হইতেছিল। সে দিন সাহিত্যচর্চ্চা কিছু বেশী মাত্রায় চলিতে লাগিল। আমি বলিলাম—"হেমবাবুর দশমহাবিদ্যায় নারদের গানটি আপনার মনে পড়ে কি?

আনন্দধ্বনি করি মুখে বলি হরি, হরি,
নারদঋষি রত সুললিত নটনে;
প্রবেশিলা হেন কালে,    ত্রিতন্ত্রী বাজায়ে গানে,
বিচেত বিভুগানে ত্রিভুবন ভ্রমণে;
কেবা হেন মতিমান্,    কে ধরে সেই জ্ঞান,
জানিবে সুগভীর জগদীশ মরমে।
অনন্ত পরমাণু,    বিকট বিদ্যুৎ ভানু
উদ্ভব কোথা হতে, কি হইবে চরমে?
হরি হর ব্রহ্মন্,    সচেতন জীবগণ,
আদিতে ছিল কিবা জনমিল কারণে?
মানব কিরূপ ধন?    জড়েই কি বিশেষণ,
জড় সনে সঞ্চারে, কিবা বিধি মননে?
সুখ কি জীবিতমানে?    কিবা অথ নির্ব্বাণে?
কা হতে জনমিল জগতের যাতনা?
অশুভ সৃজন কার?    নিরমল বিধাতার
মানস হতে কি এ মলিনতা রচনা!

দেখুন, নারদের মুখে কবি যে কথাগুলি দিয়াছেন, তাহা হইতে ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসুর তত্ত্বজিজ্ঞাসার আভাস পাওয়া যায় না কি? হরি, হর, ব্রহ্ম, শুভ, অশুভ, পাপ, পুণ্য, সুখ, দুঃখ, পরমাণু, জড়, চেতনা এ সব কি? জড়বাদই কি দর্শনশাস্ত্রের শেষ কথা? এই সব বিষয় লইয়া আলোচনা ভারতবর্ষে বহু শতাব্দী ধরিয়া হইয়া আসিতেছে; কিন্তু আমার মনে হয় যে, হেমবাবুর নারদ নিতান্ত অসময়ে নিতান্ত বেসুরো কথার অবতারণা করেন নাই। সমগ্র য়ুরোপ ইহার কিছু পূর্ব্ব হইতেই ঐরূপ তর্ক তুলিয়াছিল। টেনিসনের য়ুলিসিস্ জ্ঞানের সমুদ্রে ভেলা ভাসাইয়া কোথাও কূল পান নাই; ক্রমাগত চলিয়াছেন, পথ অনন্ত; কিন্তু যেটি ধ্রুব, সত্য, সুন্দর, সেটির নাগাল পাইলেন না। আর তাঁর সহচর নাবিকগণ এক দ্বীপে আসিয়া আর যাইতে চাহিল না; অপার সাগরবক্ষে তরী বাহিয়া চিরদিন অনন্তের দিকে ধাবিত হইয়া লাভ কি? যথেষ্ট হইয়াছে; আর নূতন জ্ঞান অর্জ্জন করিবার আবশ্যকতা কি? এত করিয়া কি হইল? এস, এখানে পদ্মপত্র আহার করিয়া, সংসারের যা কিছু সব বিস্মৃত হইয়া থাকা যাউক! ভাবিয়া দেখ দেখি, আমরা কোন্ প্রত্যূষে যাত্রা আরম্ভ করিয়াছি! কিন্তু যাহার উদ্দেশে এত উদ্যম, তাহার আভাসমাত্র পাইলাম কৈ? জর্ম্মণীতে পণ্ডিতপ্রবর শোপেন্‌হয়ার বলিলেন, 'সমস্ত সৃষ্ট বিশ্বটা একটা প্রকাণ্ড ভুল'।"

হঠাৎ আমার উচ্ছ্বাস এইখানেই বন্ধ হইল। দেখিলাম, আমাদের সম্মুখে একটি ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া; পরণে সাদা ধুতি, লংক্লথের জামা; মাথার চুল খুব ছোট করিয়া কাটা; বেশ বলিষ্ঠ দেহ; কিন্তু মুখে একটি অমায়িক প্রসন্নভাব; বয়স পঞ্চাশের কিঞ্চিদূর্দ্ধ। তাঁহাকে দেখিবামাত্র বেঞ্চ হইতে দুই তিন জন ভদ্রলোক উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রণাম করিয়া বসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তিনি উপবিষ্ট হইলে, এক জন বলিলেন, "আজ আর আপনাকে ছাড়া হবে না, আপনার জীবনকাহিনী অনুগ্রহ করিয়া বলুন।"

তখন মেঘনির্মুক্ত আকাশে একাদশীর চাঁদ উঠিয়াছে। নবাগত ভদ্রলোকটি আত্মকাহিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন।

"আমার জীবনে এমন কি আছে—যা আপনাদের শুনাইবার মত বিবেচনা করিতে পারা যায়? আপনারা

লেফটেনাণ্ট সুরেশ বিশ্বাসের সহিত আমার তুলনা করিতেছেন, কিন্তু আমার এমন স্পর্দ্ধা নাই যে, আমি নিজেকে আপনাদের প্রশংসার উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া শ্লাঘা অনুভব করিতে পারি। তবে যখন আপনারা নেহাৎ পীড়াপীড়ি করিতেছেন. তখন কিছু বলিতে হইবে। এখন আমি বৌবাজারে হিদারাম বাঁড়ুয্যের গলীতে অবস্থান করিতেছি। কিন্তু এমন করিয়া আত্মীয়-স্বজনবেষ্টিত হইয়া থাকা আমার ভাগ্যে বেশী দিন ঘটে নাই।

"আমার নাম যদি জিজ্ঞাসা করেন ত আমার কুল-পরিচয় দিয়া বলিতে হইবে, আমার নাম শ্রীহীরালাল ঘোষাল। কিন্তু কাগজে কলমে আমার নাম শুধু হীরালাল. সুবাদার মেজর হীরালাল।

"আমরা তিন পুরুষ সৈনিক বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট। আমার পিতা, জেনারেল ইয়েট্‌ম্যান্ বিগসএর দক্ষিণ হস্ত-স্বরূপ ছিলেন। তাঁহারা এক তাঁবুর ভিতর নিদ্রা যাইতেন। সাহেব বাবাকে বলিতেন, তুমি ব্রাহ্মণের ছেলে, ঠিক হিন্দুর মত থাকিবে, তোমাদের শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবে, এই আমি চাই; ইংরাজী পড়িবার কোন আবশ্যক নাই; আহার-বিহার ঠিক নিষ্ঠাবান্ হিন্দুর মত রাখিও, আমার কোনও আপত্তি নাই।

"আমি পঞ্জাবে জন্মগ্রহণ করি, কিন্তু খড়দার মাতুলাশ্রয়ে থাকিয়া শৈশবে বারাকপুর গভর্ণমেণ্ট স্কুলে অধ্যয়ন করিতাম। যখন আমার বয়স চৌদ্দ বৎসর তিন মাস, আমি বাৎসরিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া পঞ্চম শ্রেণী হইতে চতুর্থ শ্রেণীতে উন্নীত হই। কিন্তু কয়েক দিবস পরেই আমার পড়াশুনা বন্ধ করা হইল।

"আমার পিতৃবিয়োগ হইল। আমি জেনারল সাহেবের নিকট একটি চাকরীর দরখাস্ত করিয়া রাখিলাম। আমার পিতার পরিচয় দিলে একটা কোনও কায পাইব, এই আশা ছিল। কিন্তু বিশেষ কোনও সুফল দেখিলাম না।

"আমার বেশ মনে পড়ে,বড় লাট লর্ড লীটন আমাদের স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন; জিমনাষ্টিক্ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। আমি নানা প্রকার ব্যায়াম শিক্ষা করিয়াছিলাম। কিন্তু মা আমাকে বলিয়া দিয়াছিলেন, মহাগুরু-নিপাতের বৎসরে ব্যায়াম-ক্রীড়া আমি যেন সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করি। কিন্তু একটি অনর্থ ঘটিল। এক জন পাকা খেলোয়াড় বারের উপর হইতে পড়িয়া গিয়া হাত ভাঙ্গিল, সাহেব-মেম টিটকারী দিল। জিমনাষ্টিক মাষ্টার আমার হাত ধরিয়া বলিলেন, 'তুমি এস।' আমি মাতৃ-আজ্ঞা স্মরণ করিয়া অসম্মত হইলাম। তখন হেড্ মাষ্টার চন্দ্রবাবু আমাকে বলিলেন, 'তোমাকে আসরে নামিতে হইবে। আমার অনুরোধ।' আমি অগত্যা যেমন ছিলাম, খালি গায়ে মালকোঁচা মারিয়া অনেক প্রকার ব্যায়ামক্রীড়া দেখাইলাম। বাহবা ও স্বর্ণ-পদক পাইলাম।

"চাকরীও পাইলাম। জেনারেল ইয়েট্‌ম্যান্ বিগস আমাকে পঞ্জাবে লইয়া গেলেন। অমৃতসরে একটি শিখসৈন্য-দলভুক্ত হইলাম। শিখরা আমায় বলিল, 'বাবুজী, তোমাকে গুরু নানকের ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবে, নহিলে তোমাকে সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইবে না।' আমি সম্মত হইলাম। তখন আমি শুধু হীরালাল,—শিখ হীরালাল; লম্বা চুল রাখিলাম, দাড়ি রাখিলাম, কায়-মনোবাক্যে শিখ হইলাম। তখন আমার অস্ত্রশিক্ষা আরম্ভ হইল। চারি বৎসরের মধ্যে আমি অস্ত্রবিদ্যায় সুনিপুণ হইলাম। আমি একটা ঘোড়া পাইলাম। প্রথম হইতেই আমি অশ্বারোহী সৈন্যদলভুক্ত হইলাম।

"বর্ম্মা অভিযানের পর আমি সুবাদার পদ প্রাপ্ত হই। কোথায় কি উদ্দেশে যাওয়া হইতেছে, তাহা আমাদের পূর্ব্বে কিছুই জানান হয় না। রেঙ্গুন অতিক্রম করিয়া মাণ্ডালে অভিমুখে চলিলাম। ইরাবতী নদীতীরে যেখানে রাজা থিব অবস্থান করিতেছিলেন, সেই প্রাসাদের নাম —'হাওয়া-ঘর।' আমরা তথা হইতে ২০।২৫ মাইল দূরে শিবির সন্নিবেশ করিলাম।

"বর্ম্মার রাজার একটি ফরাসী অফিসার ছিল। সন্ধ্যার পর আমি আমাদের সেনাপতির শিবিরে উপস্থিত হইলাম। জেনারল সাহেব ঐ ফরাসী অফিসারটির সহিত আলাপ করিতেছিলেন। আমাকে বলিলেন, 'এই ব্যক্তির মুখ চিনিয়া রাখ; ইঁহার আজ্ঞা পালন করিতে হইবে।'

"গভীর নিশীথে বিউগল্ বাজিল। তৎক্ষণাৎ সকলেই যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলাম। রাজপ্রাসাদ অভিমুখে যাত্রা করা হইল। ভোর হইবার পূর্ব্বেই সহর ঘেরা

হইল। চারিটি গেট। প্রত্যেক গেটের মুখে একটি রেজিমেণ্ট ও চারিটি কামান রাখা হইল। সাহেব আমার হাতে ওয়ারেণ্ট দিয়া বলিলেন,—'তুমি ষোল জন শিখ সঙ্গে লও। রাজাকে ধরিয়া আন।'

"আমি ষোল জন শিখ সমভিব্যাহারে প্রাসাদে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, সম্মুখে উজ্জ্বল কক্ষে রাজা বসিয়া আছেন; পার্শ্বে সেই ফরাসী অফিসার। সহচরদিগকে পশ্চাতে রাখিয়া দ্রুতপদে আমি রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া যথোচিত অভিবাদন করিলাম। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কে তুমি?' আমি ও দেশের কথা গুটিকতক শিখিয়া লইয়াছিলাম। উত্তর করিলাম,—'মহারাজ, আমি একটি বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে এমন সময়ে আপনার সমক্ষে উপস্থিত। আপনি আমার বন্দী!' সুপ্ত সিংহ যেন গর্জ্জিয়া উঠিল, 'কি,—বন্দী?' 'হাঁ মহারাজ, বন্দী; এই দেখুন ওয়ারেণ্ট!'

"রাজা স্থির কাগজখানি হাতে লইলেন। তাঁহার পার্শ্বচর ভদ্রলোকটি পড়িয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, বাস্তবিকই রাজা বন্দী।

"রাজা বলিলেন, 'যদি আমি না যাই?' 'তাহা হইলে অগত্যা আপনার উপর বলপ্রয়োগ করিতে হইবে।' রাজা বলিলেন, 'আচ্ছা, পাঁচ মিনিট অপেক্ষা কর, আমি এক বার ভিতর হইতে দেখা করিয়া আসি।' ফরাসী ভদ্রলোকটি সঙ্কেত দ্বারা আমাকে নিষেধ করিলেন; বোধ হয়, রাজা দেখিতে পাইয়াছিলেন। আমি বলিলাম, 'আপনাকে বাড়ীর ভিতর যাইতে দিতে পারি না।'

"রাজা মুহূর্ত্তের মধ্যে কোষ হইতে তরবারি নিষ্কাশিত করিয়া এক লম্ফে আমাকে আক্রমণ করিলেন; আমি হঠাৎ এরূপ ক্ষিপ্র আক্রমণের জন্য ঠিক সে সময়ে প্রস্তুত ছিলাম না; কিন্তু আমার শিখদিগের নিকট অস্ত্রশিক্ষা ব্যর্থ হয় নাই; বজ্রমুষ্টিতে তরবারির ফলক ধরিয়া রাজার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিলাম!"

এই বলিয়া মেজর হীরালাল হস্তমুষ্টি উন্মোচন করিয়া আমাদের দেখাইলেন; প্রায় এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত একটা ভীষণ ক্ষতচিহ্ন দেখা গেল।

"রাজা বন্দী হইলেন। অদূরে গাড়ী প্রস্তুত ছিল। রাজাকে লইয়া আমি গাড়ীতে উঠিলাম। প্রথমে আমার অফিসারের কাছে লইয়া গেলাম। রাজা গম্ভীরভাবে অন্য দিকে মুখ ফিরাইলেন। অফিসার বলিলেন, 'জেনারল্ সাহেবের কাছে লইয়া যাও।' সেখানেও রাজা মৌন রহিলেন। আমার প্রতি হুকুম হইল, 'লাট-সাহেবের কাছে লইয়া যাও।' অদূরে লর্ড ডাফরিন্ অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার সহিত রাজা কথা কহিলেন।

"তখন প্রভাত হইয়াছে। আমি গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া বন্দীর পার্শ্বে দাঁড়াইলাম। দুই একটি কথার পর লাট সাহেব আজ্ঞা করিলেন, 'রাজাকে জাহাজে লইয়া গিয়া আমার জন্য অপেক্ষা কর।' আমি তাহাই করিলাম।

"এ দিকে যুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছে। কি বলিলেন? যুদ্ধের কথা আপনারা শুনেন নাই? সমস্ত সংবাদ কি আপনারা পান? আমরা ইচ্ছামত সংবাদ বাহিরে প্রচার করি; সকল সময় সব কথা প্রকাশ করা উপযুক্ত বিবেচনা করা হয় না।

"বেলা ৮ টার সময় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। আমি আমার বন্দীকে লইয়া জাহাজে রহিলাম। খানিক পরে সেনাপতির নিকট হইতে জরুরী হুকুম আসিল—'তিন রেজিমেণ্টের তিন জন বিউগল্দার হত হইয়াছে, চতুর্থ রেজিমেণ্টের লোকটি কেবল জীবিত আছে; তুমি তোমার বিউগল্ লইয়া শীঘ্র এস।'

"মহাশয়, বেলা সাড়ে নয়টা হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত অশ্বপৃষ্ঠে উপবেশন করিয়া আমি আমার বিউগল্ বাজাইতে লাগিলাম। পরে পরে ছয়টা ঘোড়া পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল। কিন্তু আমার ভাগ্যবিধাতা আমার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন; আমি বিশেষরূপে আহত হই নাই।

"গর্ব্ব? গর্ব্ব অনুভব করার তখন অবসর কোথায়? কিন্তু যখন সেনাপতি আমার হাতে ওয়ারেণ্ট দিয়া রাজাকে বন্দী করিবার ভার আমার উপর ন্যস্ত করিয়াছিলেন, তখন সেই আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইয়া মনে মনে বলিয়াছিলাম,—এই আমার প্রথম সুযোগ, আমার উন্নতি এই কাযটির উপর নির্ভর করিতেছে; আজ আমার প্রথম পরীক্ষা; সেনাপতি ইয়েটম্যান্ বিগস্ আমাকে বিশেষ স্নেহ করেন, তাই এত লোক থাকিতে এই গুরু কার্য্যভার

আমার উপর অর্পিত হইয়াছে; আমি সেই বিশ্বাসের উপযুক্ত নই কি?

"যুদ্ধ শেষ হইল। রাজার বড় রাণী ও তাঁহার ধাত্রীর কন্যা রাজার সঙ্গে বন্দী হইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। আদেশ হইল, তাঁহারা কেবলমাত্র গহনার বাক্স লইয়া রাজার নিকট যাইতে পারেন। যেন কোনরূপ অস্ত্র-শস্ত্র লুক্কায়িত না থাকে; বাক্স তাঁহাদের নিকট থাকিবে; কিন্তু চাবী আমার নিকট থাকিবে। তাহাই হইল।

"এই ঘটনার পরেই আমি সুবাদার হইলাম।

"তাহার পরে তিন বৎসর আমাকে বর্ম্মায় থাকিতে হইয়াছিল। অরাজকতা নিবারণ করিয়া ব্রিটিশ শান্তি স্থাপন করাই আমাদের তখন প্রধান চেষ্টা ছিল। দস্যু দমন করিবার জন্য অনেক সময় ছদ্মবেশ ধারণ করিতে হইত।

"বিপদ কি কম! একটি অল্পবয়সী স্ত্রীলোক রোজ সকালবেলায় আমার বাসায় আসিয়া ফল বিক্রয় করিত। যাহাই বিক্রয় করুক, সে তিন পয়সার বেশী দাম লইত না; কোনও দিন এক ঝুড়ি আঙ্গুর, কোনও দিন এক ঝুড়ি আপেল, কোনও দিন বা বেদানা, যে দ্রব্যই হউক্, তার ঐ এক দাম ছিল তিন পয়সা! এক দিন আমি বলিলাম, 'আজ তুই যা, আমার দরকার নাই।' সে নাছোড়বান্দা; আমি তাকে তিন পয়সা দিয়া বিদায় করিলাম। দুই এক জন গার্ড তাহার ঝুড়ি নামাইয়া লইল; ফলের তলায় একটা ছোরা দেখা গেল। 'এ ছোরা কেন?' যুবতী নির্ভীকভাবে উত্তর করিল, 'সুবাদারকে খুন করিবার জন্য।' তাহারা তখনই তাহাকে কাটিয়া ফেলিতে উদ্যত হইলে আমি নিষেধ করিলাম। তখন তাহারা কিছু বলিল না। কিন্তু পরে শুনিলাম, স্ত্রীলোকটা বাহির হইয়া গেলে পর তাহার প্রাণ-নাশ করা হইয়াছিল।

"তাহার পর মণিপুর, চিত্রল, টেরাই;—গত কয় বৎসর আমি স্বর্গীয় সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের বডিগার্ডের কর্ত্তা ছিলাম।"

* * * *

কাহিনী এই পর্য্যন্ত বর্ণিত হইলে পর ভদ্রলোকটি উঠিয়া গেলেন। আমি সেই রাত্রিতে যথাসম্ভব তাঁহারই ভাষায় উহা লিপিবদ্ধ করিলাম।

যতক্ষণ গল্প শুনিতেছিলাম, আমরা সকলে যেন মোহাবিষ্ট, মন্ত্রমুগ্ধ! "কাব্যকণা"র রচয়িতা পুলিনবাবু মধ্যখানে একবার আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "দেখুন truth is stranger than fiction কাহাকে বলে। ওথেলো'র antlers vast and desert wild—" আমি তাঁহাকে চুপ করিতে সঙ্কেত করিলাম।

গল্প থামিল। বক্তার অবর্ত্তমানে শ্রোতৃবর্গ সমালোচকের স্থান অধিকার করিল। এক জন বলিলেন, "সি, আই, ডি, নয় ত?" আমি বলিলাম 'না, সি ডি!'

প্রশ্ন। সি ডি কি?

উত্তর। কোনাল ডয়েল্, ব্রিগেডিয়ার জেরার্ড রচয়িতা। আমাদের মেজরটি ঐ ব্রিগেডিয়ারের বাঙ্গালা সংস্করণ নয় ত?

শান্তিরাজ্যপ্রতিষ্ঠাতা সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড শান্তিময়ের ক্রোড়ে বিশ্রাম লাভ করিতেছেন। লর্ড ডাফরিন্, মার্ক্ইস অভ আভা, পেনেল সাহেবের 'গিনিপিগ' বড় লাট এখন যেখানে গিয়াছেন, সেখানে কূট রাজনীতির বশবর্ত্তী হইয়া রাজারাজড়াকে ধরপাকড় করিতে হয় না। জেনারেল ইয়েটম্যান বিগস আজ পনের বৎসর হইল, উত্তরপশ্চিম সীমান্ত অভিমুখে যাত্রা করিয়া গন্তব্য স্থানে পৌঁছিবার পূর্ব্বে রক্তামাশয় রোগে দেহত্যাগ করেন। জীবিত আছেন মেজর হীরালাল এবং তিনি ১৩১৭ সালের ৩রা আষাঢ় সন্ধ্যার সময় বাডন উদ্যানে আত্মকাহিনী বর্ণনা করিয়াছিলেন।*

শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত

---

* ১৩৩৩ বঙ্গাব্দেও ইঁহাকে বীডন উদ্যানে ভ্রমণ করিতে দেখা যায়।

# উদ্বন্ধন

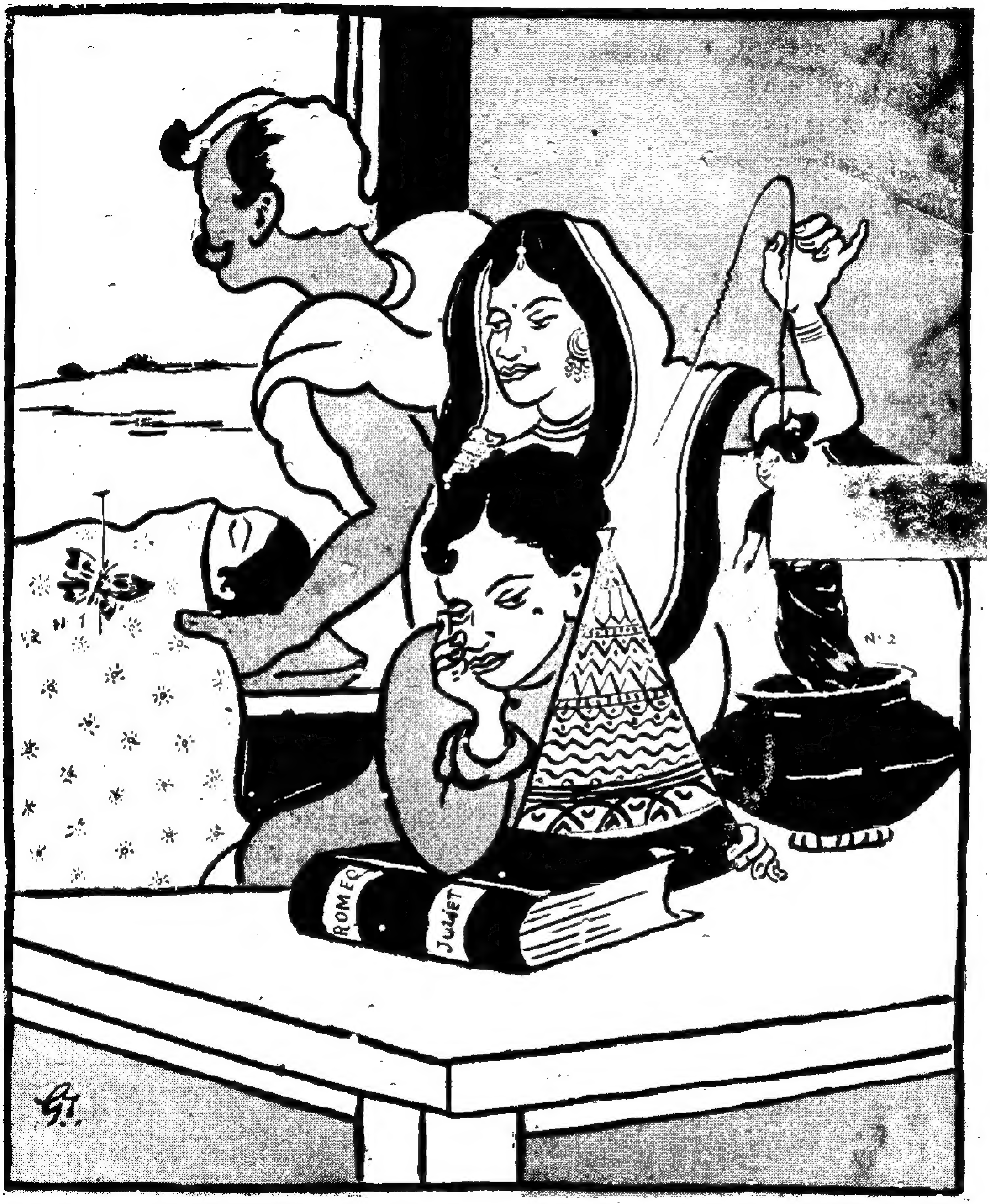
N° 1
N° 2
ROMEO
JULIET

[ শিল্পী—শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর